দেশ

ম বর্ষ] শনি ৫ই বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, ..th April, 1942. [২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

...র অভিনন্দন—

...দেখিতে দেখিতে বৎসর অ...ক্রান্ত হইল, ১৩৪৮ সাল ... গিয়া বাঙালীর জীব...১৩৪৯ সাল আরম্ভ হইল। ... ক্ষণিকতা অনাগতে... তীব্রতার মধ্যে কাল- ... তাণ্ডব তালে বিল... হইল। জীবন নূতনের ...রিল। কিন্তু নূতন...হইল কি? বাঙলার সাধকগণ ... আত্মাই চিরনূতন ...ং আত্মার স্বরূপ হইল ...পরাধীন যে, তাহার ...নে আবার নূতনত্ব কোথায়? ...আমাদিগকে সেই স্বাধ...তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ...ই আশা অন্তরে লইয়া ...ভ নববর্ষে আমরা আমাদের ...গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপো...ষক এবং দেশবাসী সর্ব-...কে আমাদের সদিচ্ছা ও স...ম্প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের ভবিষ্যৎ—

স্যার স্ট্যাফোর্ড ব্রিটিশ গ...মেণ্টের নিকট হইতে যে যে ...প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন, ...া তিনি প্রত্যাহার করিয়া-...ছেন। এখন আমাদের পক্ষে কি ...ব্য হইবে, ইহাই হইতেছে ...বেচ্য। আগামী ২৯শে এবং ৩০...এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ...ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবে...শন আহূত হইয়াছে। সেই অধি...বেশনে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ...তিকর্তব্য নির্ধারিত হইবে ব...লিয়া মনে হয়; ইতিমধ্যে দেশে...র লোকের কোন্ পথে কাজ ক...রা কর্তব্য, সম্প্রতি পণ্ডিত ...জহরলাল নেহরু দিল্লীর ... সম্মেলনে বক্তৃতায় তাহা ...আভাষ দিয়াছেন। তিনি ... দেশরক্ষা করিবার মত ক্ষমতা ...ধু রাষ্ট্রের হাতেই থাকে, ... আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। ...মরা পৌরজনগণকে লইয়া ... গঠন করিতে পারিব না; তথাপি আমাদের সম্মুখে ... যখন দেখা দিয়াছে, তখন আ...দিগকে চুপ করিয়া বসিয়া ...স চলিবে না। কংগ্রেস গঠ...নমূলক কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করি...য়াছেন, সেই কর্মপদ্ধতি অবলম্ব...ন করিয়া ...

আভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা উপদলীয় মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেশের এবং দেশবাসীর সেবার কার্যকর পন্থা অবলম্বন করুন। দলাদলির অবসর এখন নাই, দেশের সম্মুখে বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহাতে কথার লড়াই বা তত্ত্বের গবেষণা ছাড়িয়া কাজের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা জনগণের সেবায় আত্ম-নিবেদন করিয়া বাঙলার তরুণ চিত্তের বিশিষ্ট ধর্মকে আজ সর্বাংগীনরূপে সার্থক করিয়া তুলুন।

রাজদ্রোহের নিরিখ—

ভারতীয় দণ্ডবিধির রাজদ্রোহের ধারাটি এমন ব্যাপক যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঊর্ধতম বিচারালয়ের ব্যাখ্যা ভাষ্য সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন হইল না। এক বৎসরের কথা। শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাশয় রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিবার অপরাধে কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডিত হন। তিনি ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। আপীলেও দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। দত্ত মজুমদার মহশয় অবশেষে ফেডারেল কোর্টে আপীল করেন। ফেডারেল কোর্টের বিচারে তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গায়ার তাঁহার রায়ে দেখাইয়াছেন যে, মতপ্রকাশ, তাহা যতই উগ্র হউক না কেন, এবং হিংসামূলক কার্যের দ্বারা গভর্নমেণ্ট ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা, এই দুই এক জিনিস নয়, অর্থাৎ মত-প্রকাশ তীব্র হইলেও তাহাতে রাজদ্রোহ প্রচার করা হয় না। ফেডারেল কোর্টের এই সিদ্ধান্ত রাজদ্রোহ প্রচার ...প্রয়োগে এ...ং তৎসম্পর্কিত অপরাধ নির্ধারণে বিচারকে... ...

ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের সমস্যা—

প্রত্যহ সহস্র সহস্র ভারতবাসী ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিতেছে। ভারতবর্ষে আসিতে ইহাদিগকে কিরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সম্পর্কে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগও উত্থাপিত হইয়াছে—এবং ভারত গভর্নমেণ্ট তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদিগকে যে বাস্তব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহাকে অস্বীকার করা চলে না। ভারত গভর্নমেণ্ট বলিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-প্রত্যাগত শ্বেতাঙ্গগণ যে সব বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন; তাহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহেরই ব্যবস্থার ফলে। যদি ব্যাপার ইহাই হয়, তবে ভারতে যে সব জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে, ব্রহ্ম-প্রত্যাগত প্রবাসী ভারতীয়দের পথের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার জন্য ভারতের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সমধিক উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য এবং প্রাণবান ব্যক্তিদের এই পুণ্য কার্যে অর্থ সাহায্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। চট্টগ্রাম এবং কলিকাতায় ইহাদের সাহায্যের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, জন-হিতকর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে যুবক সম্প্রদায় এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন; কিন্তু এই সাহায্য কার্যকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া ব্রহ্ম পর্যন্ত লওয়া যায় কি না, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের খুবই বিশ্বাস আছে যে, উপযুক্তভাবে সুগঠিত হইলে বাঙলার যুবকেরা সকল ঝুঁকি লইয়াও এই সাহায্য কার্যে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত আছে এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে সমবেতভাবে চেষ্টায় এইরূপ সেবাব্রতী দল গঠিত হইতে পারে। এই সঙ্কটপূর্ণ ঝুঁকির ভিতর দিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ পাইয়া থাকে এবং এমন ঝুঁকির মধ্যে একটা আনন্দও থাকে। আমরা আশা করি, দেশবাসী এ বিষয়ে অবহিত হইবেন. নিজেদের দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট দেখিয়াও যদি আমরা কর্তব্যবোধে জাগ্রত না হই, তবে দাস-জীবনের গ্লানি হইতে আমরা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিব না।

বঙ্গোপসাগরে আতঙ্ক—

বঙ্গোপসাগরে সম্প্রতি জাপানীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা ইংরেজের কয়েকখানা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে. কিন্তু তাহাদের কোন রণতরী ডুবে নাই। এই বিষয় লইয়া বিলাতে আলোচনা উঠিয়াছে। বিলাতের 'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্র লিখিয়াছেন—জাপানীদের এমন কি আছে, যাহা আমাদের নাই। উত্তরে হইল সমুদ্র এবং বিমানপথের সহযোগিতা। সংবাদে এই মন্তব্যই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। যে কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়াছে, সেগুলি প্রধানত জাপানীদের উড়োজাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতেই বিদীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐসব জাহাজ রক্ষার জন্য উপযুক্ত [illegible] পাহারা ছিল না। জাপানীরা বিমানবাহী জাহাজ [illegible] বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া ঘুরিতেছে। এ পক্ষের নৌবহর এবং বিমানবহরের আক্রমণের সম্বন্ধে আতঙ্ক থাকিলে তাহারা এতটা সাহস পাইত না। ভারতের উপকূলকে নিরাপদ রাখিতে হইলে বিমানবল বৃদ্ধিরই প্রথম প্রয়োজন। কয়েকটি লড়াইতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, শুধু স্থল যুদ্ধে নয়, জল যুদ্ধেও সাফল্য বিমানবলের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

লর্ড হ্যালিফাক্সের মোড়লি—

গাঁয়ে না মানিলেও মোড়লি করিবার ঝোঁক এক শ্রেণীর লোকের থাকে। লর্ড হ্যালিফাক্স এই শ্রেণীর লোক। তিনি সেদিন নিউ ইয়র্কের টউন হলের সভায় ভারতবাসীদের উপর অযাচিতভাবে এবং অনাহূতক্রমে এক প্রস্থ মোড়লি করিয়াছেন। তাঁহার এই মোড়লির মর্ম কথা হইল এই যে, কংগ্রেস সমগ্র ভারতের সামান্য অংশের প্রতিনিধি এবং সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের জন্য কংগ্রেসীদের দাবী ভারতের অন্যান্য দল কর্তৃক অস্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মারফতে যে প্রস্তব উপস্থিত করিয়াছেন, কংগ্রেস যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করে, সেজন্য ইংরেজের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের দাবীকে কোন রকম আমল না দিয়াই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবেন। এ সম্বন্ধে লর্ড হ্যালিফাক্সের কথাটা এই যে, যদি আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইলে ভারতের সম্বন্ধে বৃহত্তর দলসমূহের বিনা সহযোগিতা ও সাহায্যেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহার নিজ কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। লর্ড মহোদয়ের এই মুরুব্বিয়ানার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, [illegible] প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতের আন্তরিক সমর্থন লাভই যদি তাঁহাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে জোর করিয়া ভারতের উপর কোন ব্যবস্থা চাপাইয়া দিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। লর্ড সাহেব ভারতের এই জন-সাধারণের কথাটাই এক্ষেত্রে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্ঘবদ্ধ বৃহত্তর যে সব দলের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের বিনা সহ-যোগিতার অর্থ, জনসাধারণেরই বিনা সহযোগিতা এবং জন-সাধারণের প্রতিনিধিত্বের উত্তম প্রতিষ্ঠানস্বরূপেই কংগ্রেসের মর্যাদা। লর্ড হ্যালিফাক্স দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সন্ধির মর্যাদা রক্ষা করিবার দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস যে ভারতবর্ষের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে. তাহার মধ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের রাজ্যগুলি ঠিক খাপ খায় না। সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির ভিত্তির উপর দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কেবল আপোষমূলক চুক্তির দ্বারাই এই সব সন্ধির পরিবর্তন সম্ভব। একপক্ষ যদি এই সব সন্ধি বাতিল করিতে চায়, তাহা হইলে একটি নীতি বাতিল করিতে হইবে—যে নীতি বাতিলের জন্য আমরা জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। লর্ড হ্যালিফাক্সের এই ধাপ্পাবাজি ভারতবাসীরা ধরিতে না পারিবে এমন নয়। দেশীয় রাজন্যকে আশ্রয় করিয়া এই সব ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী ভারতে নিজেদের ... স্বার্থ ... বজায় রাখিতে চাহেন। আমরা লর্ড মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি জার্মানীর কোন্ নীতির ব্যত্যয়ের ... তাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন? আমরা তো ইংরেজ জাতির রাষ্ট্রনীতির ধুরন্ধরদের মুখে ক্রমাগত এই কথাই শুনিতেছি যে, জার্মানেরা স্বৈরাচারী, তাহারা গণতন্ত্রের বিরোধী। স্বৈরাচারকে ধ্বংস করিয়া বিশ্বমানবের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই সংগ্রাম। অর্থাৎ জগতের সর্বত্র ইঁহারা গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, কেবল ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই নয়। ঐ সব রাজ্যে মানুষ ক্রীতদাসের জীবনই যাপন করুক এবং স্বৈরাচার সুদৃঢ় থাকিয়া সাম্রাজ্য নীতির স্বার্থের ... তুষ্টি ও পুষ্টি ঘটে, তেমন সুযোগ থাকুক, লর্ড হ্যালিফাক্সের এই হইল অভিপ্রায়; সুতরাং এক্ষেত্রে নীতির দোহাই তোলা একেবারেই অবান্তর। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে আপোষ-রফার কথা লর্ড হ্যালিফাক্স তুলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের কথা এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন, তাহা হইলে ... সঙ্গে রাজন্যবর্গের মতিগতিরও পরিবর্তন ঘটিবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির পরোক্ষ প্রশ্রয় পাইয়াই আজও ইঁহারা এদেশে মধ্য যুগীয় প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে সক্ষম হইতেছেন। ভারতের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন এবং আন্তরিক সহযোগিতাই যদি বর্তমান ক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাম্য হইয়া থাকে, তবে লর্ড হ্যালিফাক্সের এই ধরণের যুক্তি ... পক্ষে বাধাই সৃষ্টি করিবে এবং এমন মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান—

অনেক আলোচনা এবং বিবেচনার পর অবশেষে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কর্তৃক উপস্থাপিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছিলাম, দরকষাকষির মনোবৃত্তি লইয়া স্যার স্ট্যাফোর্ড যদি চলিতে চাহেন তবে, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; কারণ ভারতের বর্তমান অচল অবস্থাজনিত সমস্যা যতই জটিল বলিয়া তাঁহারা ... দেখান না কেন, সে জটিলতার জট বাঁধিতেছে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া—নহিলে ইহার সমাধান ... । স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই জট ছাড়াইতে পারিলেন না, কারণ ক্ষেত্রে তাঁহার হাত-পা বাঁধা; বিশেষত আমাদের ... কথা বলিতে গেলে তিনি যতই উদার মনোভাবসম্পন্ন ... হউন না কেন, ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ জাতিসুলভ সুদীর্ঘ সংস্কার হইতে তিনি যে একেবারে মুক্ত, ইহা ধরিয়া লওয়া কঠিন। মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হইল; কিন্তু সে ব্যর্থতার জন্য কে দায়ী ... । স্যার স্ট্যাফোর্ড যেটুকু আগাইয়া গিয়াছিলেন ... কেবল কথায়, কার্যক্ষেত্রে নয়; এজন্য তাঁহার উত্থাপিত প্রস্তাবে ভারতের কোন সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ... বাহ্য, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাবে আপাতত ভারতবাসীর হাতে কোন ক্ষমতাই দিতে রাজী হন নাই। ... বাসীদের উপর দেওয়া হইবে ... স্যার স্ট্যাফোর্ড ... আগা গোড়াই আমরা সেই কথাই শুনিতেছিলাম ... পর্যন্ত সেই কথাই তিনি বজায় রাখিতে বাধ্য হন। স্যার স্ট্যাফোর্ড এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, দেশরক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় সদস্যকে আর অধিক ক্ষমতা দিবার কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। জেনারেল ওয়াভেলের উপর ভারত রক্ষার ব্যবস্থা করার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহা ব্যাহত না করিয়া উহা করা সম্ভব নয়; কারণ ভারত রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সর্বোপরি কর্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু কংগ্রেস দেশরক্ষা সচিবের সর্বতোময় ক্ষমতাও এক্ষেত্রে চাহেন নাই। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ সম্পর্কিত বৃহত্তর, অধিকতর নিগূঢ় প্রশ্নাবলীর মীমাংসা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ভার ব্রিটিশ সমর-সভার উপরই ন্যস্ত থাকিবে; শুধু ঐ সভায় মাত্র একজন ভারতীয় প্রতিনিধিকে স্থান দান করিলেই চলিবে; কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সাক্ষাৎ সম্পর্কে এই সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং খুব সম্ভব স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াও তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের উক্ত প্রস্তাবে রাজী করাইতে পারেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেশরক্ষা ব্যাপারে মূল নীতি নির্ধারণে সহযোগিতার প্রকৃত মর্যাদা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে দিতে প্রস্তুত হন নাই। এমন ক্ষেত্রে দেশরক্ষা সচিবের একটা ঠাট খাড়া করার কোন মূল্যই থাকে না।

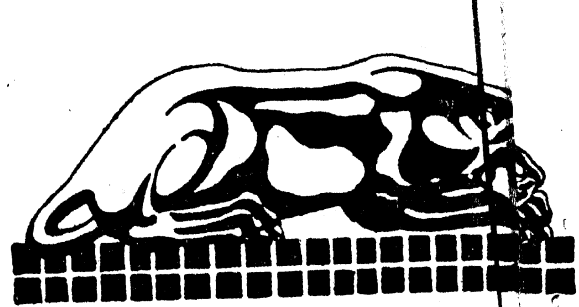
মামুলী যুক্তি—

কংগ্রেস জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছিলেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সে ব্যবস্থাও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দেখা যাইতেছে, ভারতসচিব আমেরী সাহেবের ব্যাখ্যাত সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের অজুহাতের নীতিই এক্ষেত্রে অন্তরায় ঘটাইয়াছে। ব্রিটিশ কর্তাদের মনোবৃত্তি কাঁটায় কাঁটায় ঠিকই ঘুরিতেছে। জাতীয় গভর্নমেণ্টের গঠন সম্বন্ধে স্যার স্ট্যাফোর্ড বলিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় যদি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে প্রধান প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই মন্ত্রিমণ্ডলী মনোনীত করিতে হইবে। এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের নিকট ছাড়া আর কাহারও নিকট দায়িত্বসম্পন্ন হইবে না এবং তাঁহাদিগকেও অপসারিত করা যাইবে না। কার্যত উহা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সকল সম্প্রদায়ই এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই যুক্তির মূল কোথায় রহিয়াছে, এতদিনেও তাহা আমাদের বুঝিতে বাকী নাই। প্রকৃতপক্ষে দেশের জনমতকে মর্যাদা দান না করিবার পক্ষেই দাঁড়ায় এই যুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করাই হয় এই ধরণের যুক্তির সোজা অর্থ। প্রধান প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধান্য কিসে এবং

[illegible] নিশ্চয়ই তাঁহারা বুঝেন এবং এই সম্বন্ধে যে [illegible] করিয়াছেন কংগ্রেসের কথাই যে তাঁহার প্রধানত মনে উঠিয়াছিল, ইহা আমরা বুঝি। তিনি ইহা নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই কংগ্রেসের নীতি এবং সে নীতিকে উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে, কাজ করিবার অধিকার কাহারও নাই। আসল কথা হইল, ভারতবাসীদের হাতে বর্তমান সময়ে শাসন ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য দানে অনিচ্ছা এবং সেই অনিচ্ছার মূলে রহিয়াছে হয়ত অবিশ্বাসেরই ভাব। অথচ বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইতেছে ভারতবাসীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই পথেই সমরোদ্যমে জনসাধারণের আন্তরিকতা ও উৎসাহপূর্ণ সাড়া পাওয়া সম্ভব হইতে পারে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই সোজা এবং কার্যকর পথ, এখনও ধরিতে রাজী হইতেছেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অদূরদর্শিতা বিস্ময়কর। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্যের এই ব্যর্থতায় এই কথাই আমাদিগকে নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে।

ব্যর্থতার কারণ—

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস সম্প্রতি দিল্লী হইতে বেতার-যোগে তাঁহার দৌত্যের সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহার দৌত্যের ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করিয়া বলেন, অতীতের অবিশ্বাসই এই ব্যর্থতার কারণ। স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই উক্তি কিছু অস্পষ্ট, কারণ অতীতের এই যে অবিশ্বাসের জন্য বর্তমানের আপোষ মীমাংসা সম্ভব হইল না, সে অবিশ্বাস, কাহার প্রতি কাহার অবিশ্বাস? ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর অবিশ্বাস, না ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের অবিশ্বাস? অতীতের ইতিহাস উভয়ের প্রতি উভয়ের অবিশ্বাস প্রমাণ করে এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বক্তব্যের তাৎপর্য্য হয়ত ইহাই; কিন্তু আমার মনে হয়, অতীত আচরণের জন্য ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীদের অবিশ্বাস এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ ঘটায় নাই। ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের অবিশ্বাসই ব্যর্থতার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমানের মীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য হইল বৈদেশিক আক্রমণকারীকে বাধাদানের জন্য ভারতের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে আন্তরিকতাকে জাগ্রত করা —বর্তমানের এই প্রশ্নে ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই বড় এবং ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর অবিশ্বাসের কারণ আর থাকিলেও কার্যকর বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহা অবান্তর। ভারতবাসীদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব জাগ্রত করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন, তাহার ক্ষমতা ইংরেজের হাতেই রহিয়াছে। ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীদের অতীত অবিশ্বাস সত্ত্বেও ব্রিটিশ পক্ষ যদি ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাস করিতেন এবং দেশরক্ষার সর্বতোমুখী অধিকার এদেশের লোককে দিতেন, তবেই মানের আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভব হইত। এ ক্ষমতা ইংরেজের হাতে রহিয়াছে, সুতরাং অতীতের অবিশ্বাস নিরাকরণ করার দায়িত্বও তাঁহাদের উপরই গিয়া পড়ে। ব্রিটিশ পক্ষ যদি দেশের সহিত সেই কর্তব্য প্রতিপালন করেন, তবেই কার্যকর তাঁহাদের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আপোষ-নিষ্পত্তির মূল উদ্দেশ্য সফল হইবার পথে আর কোন বাধা থাকে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এতৎ সম্পর্কিত নীতি আলোচনার এই পরিণতিতে কি আকার ধারণ করিবে, আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আশা করি, তাঁহারা ভারতের বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথে এখনও দূরদর্শিতাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিবেন।



জাপান কি করিবে ?

জাপান কি অবিলম্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, প্রশ্নটা অনেকের মনেই উঠিতেছে। ভিজাগাপট্টম এবং কোকনদে বোমা বর্ষণের পর এই প্রশ্নটি আরও জটিল আকারে দেখা দিয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের মনে হয়, বর্তমানে ভারত মহাসাগরে নিজের অব্যাহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই জাপানীদের উদ্দেশ্য, আন্দামান দখল, তারপর পশ্চিম দিকে আরও অগ্রসর হইয়া সিংহল আক্রমণ, তৎপর মাদ্রাজের উপকূলভাগে বোমাবৃষ্টি জাপানীদের সেই কর্মপ্রণালীরই পরিণতি। এখন আর ইহা বুঝিতে বাকী নাই যে, পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া পূর্ব দিকে অগ্রগমনে প্রয়াসী জার্মান বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করাই জাপানীদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে এক দিকে অস্ট্রেলিয়া এবং অন্য দিকে ইংরেজের নৌবহরের শক্তিকে খর্ব করিয়া রাখা প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়ার জন্য বেশী ভয়, তথায় রহিয়াছে মার্কিনের সাহায্য-সন্নিবেশ। এই সাহায্যসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জাপানীরা সলেমান দ্বীপপুঞ্জে হানা দিতেছে এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নৌঘাঁটিগুলি ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারত মহাসাগরে ইংরেজের সাহায্য আসিবার পথ বন্ধ করিতে জাপান উদ্যোগী হইয়াছে। হংকং এবং ফিলিপাইন দখল করিয়া সে যেভাবে সিঙ্গাপুরকে বিপন্ন করিয়াছিল এবং আমেরিকা হইতে আগত সাহায্য-সূত্র ছিন্ন করিয়াছিল, সেইভাবে জাপান এখন সিংহলের কয়েকটি নৌঘাঁটি এবং মাদ্রাজ উপকূলের পোতাশ্রয়গুলি ধ্বংস করিবার চেষ্টায় আছে। কলম্বোতে অবস্থিত ইংরেজের নৌঘাঁটি খুব সুরক্ষিত। সিঙ্গাপুরের ব্যাপার হইতে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া সিঙ্গাপুরে যেসব ত্রুটি ঘটিয়াছিল সিংহলে সেগুলির প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কর্তৃপক্ষ ত্রুটি করেন নাই। তড়িৎবেগে সিংহলের নৌঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া ক্রীটের ন্যায় সিংহলে প্যারাসুট বাহিনী নামাইয়া দিবার সংকল্প সম্ভবত জাপানীদের আছে এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পঞ্চম বাহিনীর সহায়তা লাভ করিবে বলিয়া হয়ত তাহারা আশা করিতেছে। সাক্ষাৎ সম্পর্কে কলম্বো ত্রিনকোমালী প্রভৃতি নৌঘাঁটিগুলির উপর হানা দিবার ছল অবলম্বনে সিংহলের পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে সে নৌবহর হইতে সেনা নামাইবার জন্যও চেষ্টা করিতে পারে। ক্রীটের মত এখানে তত অসুবিধা নাই; অরণ্যপূর্ণ অঞ্চলগুলি এ পক্ষে তাহার সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হইল বিমান বহরের শক্তির। সিংহলের উপর আক্রমণ করিয়া জাপানীরা এ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে। প্রথম দিনের আক্রমণেই তাহাদের বিমান বহরের প্রভূত ক্ষতি ঘটিয়াছে। বর্তমান লড়াইতে একদিনের আক্রমণে জাপান বা জার্মান কাহাকেও এতটা ক্ষতি পোহাইতে হয়



ব্রহ্মদেশে চীনা সৈন্যবাহিনী

নাই। কিন্তু জাপানীরা এমন ক্ষতি স্বীকার করিয়া নিরস্ত হইবে না, কারণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার যে নীতি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাকে অটুট রাখিতে হইলে, ভারত মহাসাগরে ইংরেজের প্রভুত্ব তাহার পক্ষে আশংকার কারণ হইয়াই থাকিবে। চীনের সহিত ইংরেজের সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উত্তর ব্রহ্মে সে যে অভিযান চালাইতেছে, তাহাকে সফল করিতে হইলে আটলাণ্টিকের পথে আমেরিকার সাহায্য ভারতে যাহাতে না পৌঁছে এবং ভারত হইতে ব্রহ্মের রণাঙ্গনে সে সাহায্য যাইতে না পারে, তাহা করা জাপানের পক্ষে প্রয়োজন। এই পথ বন্ধ করাই তৎপূর্বে তাহাকে সিংহল সমগ্রভাবে দখল করিতে হইবে এবং ভারত মহাসাগরের পথে এ দিকে ইংরেজের সাহায্য আসিবার পথ বন্ধ করিতে হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশের উপর বিমান আক্রমণ হইয়াছে; ভারত আক্রমণের উদ্যমস্বরূপে নয়, ভারত মহাসাগরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যই উহার মূলে রহিয়াছে। এই একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাহাদের পশ্চিমাভিমুখী পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করিবার জন্য কলিকাতার উপরও জাপানীরা বিমান আক্রমণ করিতে পারে। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতেছেন যে, আপাতত উত্তর ভারত এবং বাঙলা দেশকে দক্ষিণে ফেলিয়া রাখিয়াই জাপানীরা তাহাদের



জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য পোড়ামাটী নীতি অনুসারে একটি ব্রীজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে।

জাপানীদের প্রধান লক্ষ্য। ভারত এবং বাঙলা দেশ আক্রমণ করা এই নীতিরই আপাতত আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র বলা চলে। পশ্চিমাভিমুখী এই নীতির সাফল্যের উপর জাপ-জার্মান সমবেত সমর নীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। জাপানীদের বর্তমান রণনীতিকে জার্মানীর পূর্বাভিমুখী পরিকল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। এই নীতি সার্থক করিবার জন্য জাপান আরও আগাইয়া গিয়া মাদাগাস্কারও দখল করিতে পারে। আমরা সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার এই নীতিকে সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে ভারত হইতে বাধা পাইবার যে সব আশংকা রহিয়াছে, সে আপাতত সেইগুলি দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং এই নীতি সম্প্রসারিত করিয়া নিজেদের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করিয়া সে ব্রহ্মোপকূল হইতে বাঙলা দেশে অভিযান করিবার আশা লইয়া থাকিবে। সুতরাং মাদ্রাজে বোমা বৃষ্টি হইলেই যে ভারতে বা বাঙলা দেশে অথবা উড়িষ্যায় সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে পারিবে, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। উত্তর ব্রহ্মের লড়াইতে জাপান দ্রুত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না, চীনাদের সংযোগ সূত্রও সে এখনও ছিন্ন করিতে পারে নাই, ওদিকে অস্ট্রেলিয়াকেও সে কাবু করিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় বাঙলা দেশ বা উড়িষ্যার উপকূলে সে সেনা নামাইয়া দিয়া সুদীর্ঘ সাহায্য সরবরাহ সূত্র বিস্তারে সাহস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমাভিমুখী পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করিবে। জার্মানদের সহিত সংযোগ সূত্র স্থাপন করিবার পর উত্তর ভারত এবং বাঙলা দেশের উপর তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইবে। কিন্তু জাপানীদের এমন পরিকল্পনা যদি থাকে, তাহা হইলেও কলিকাতা কিংবা উড়িষ্যার উপকূল ভাগ যে তাহাদের বিমান আক্রমণ হইতে নিরাপদ এমন কথা বলা যায় না। উত্তর ভারত এবং বাঙলা দেশ হইতে বাধা পাইবার প্রচুর কারণ নাই, এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হইয়া জাপানীরা তাহাদের পশ্চিমাভিমুখী নীতিকে প্রসারিত করিতে পারে না এবং ইহাও সত্য যে, ভারত হইতে জাপানীদের পরিকল্পনাকে বাধা দানের জন্য আয়োজনও হইতে থাকিবে। রেঙ্গুনের পতনের পর কলিকাতা শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং জাপানীরা সে গুরুত্বকে একেবারে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়া পশ্চিম দিকে আগাইবে না। এই সব নানা কারণে যাঁহারা এইরূপ কথা বলিতেছেন যে, আপাতত কলিকাতার উপর বিমান আক্রমণের কোন আশংকার কারণ নাই, তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। চট্টগ্রাম বা নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে জাপানীরা সেনা নামাইবে কিংবা ব্রহ্মদেশের পথে এই সব অঞ্চলে সহজে ঢুকিয়া পড়িতে পারিবে এমন আশংকা এখনও দেখা দিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্রহ্মের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব পাকা

না করা পর্যন্ত জাপানীরা এদিকে আগাইতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা ষোল আনাই রহিয়াছে। এখন যেমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয়, জাপানীরা থাই-সেনাদের সাহায্যে মান্দালয় দখল করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে এবং তারপর ব্রহ্মের লাইন পশ্চিম দিকে প্রোমের বরাবর আগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। এই অঞ্চলে কতকগুলি তেলের খনি রহিয়াছে। সেগুলি তাহারা হাত করিতে চায়, উত্তর ব্রহ্মের এই লড়াইতে সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে জলপথে তাহারা পশ্চিম দিকে আপাতত সেনা আনিয়া নামাইতে চেষ্টা করিবে না। কারণ সে দিকেই যদি তাহারা বেশী জোর দেয়, তাহা হইলে ভারত মহাসাগরের দিকে ইংলণ্ড হইতে সাহায্য আসিবার পথ বিচ্ছিন্ন করিবার উপর তাহাদের পক্ষে জোর দেওয়া তেমন সম্ভব হইবে না। অথচ সমরনীতির দিক হইতে সেইটিই তাহাদের পক্ষে প্রথমে প্রয়োজন। এই সব হিসাব করিয়াই মনে হয় যে, সিংহলের জন্য লড়াইটা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে, সেই সঙ্গে কলিকাতা হইতে দৃষ্টি অন্য দিকে রাখিবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ উপকূলের উপরও তাহাদের আরও হানা চলিতে পারে। মনে হয়, একটা ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া এই লড়াই চলিতেছে—জাপান ও জার্মান উভয়ে যুক্তভাবেই সেই পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। মালটার উপর বিমান আক্রমণের প্রাবল্য এবং ক্রিমিয়ার উপর জার্মানদের প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যেরূপ দেখা যাইতেছে, রুশিয়ার লড়াইতে জার্মানেরা এখনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তবে রুশিয়াও যে জার্মানদিগকে ইতিমধ্যে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাও বলা যায় না। জার্মানীকে তেমনভাবে কাবু করিতে হইলে, সমগ্র রুশ সীমান্তের রুশ লাইনকে যতটা পশ্চিম দিকে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন, সামরিকগণ সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, রুশিয়া প্রবলভাবে চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত এতটা আগাইয়া প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইবার মত প্রশস্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। শীতকালের মধ্যে রুশিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে, এমন আশা করা গিয়াছিল। এখন জার্মানীর দিক হইতে বসন্তকালীন পুনরাক্রমণের অবসর আসিয়া পড়িয়াছে। রুশিয়া অবশ্য এই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য শক্তি সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া বলিতেছে। কিছু দিনের মধ্যেই রুশ রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের প্রস্তুতের পরিমাপ হইবে এবং জার্মানেরা পূর্বদিকে আগাইয়া ককেসাস অঞ্চলে ঢুকিবার যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহা কি আন্দাজ সত্য হয় বুঝা যাইবে। ইরাক এবং ইরাণের উপরও জার্মানদের পরিকল্পনা রহিয়াছে, কিন্তু এদিকেও বিরাট ব্যূহ গঠন করিয়া সেই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য বৃটিশ পক্ষ প্রস্তুত রহিয়াছে। জাপানের সাইবেরিয়া আক্রমণ কিংবা রুশিয়ার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে যে সব গবেষণা চলিতেছে, সমরচক্রের সে দিক হইতে নূতন কোন পরিণতি দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। আমাদের পক্ষে রুশিয়ার লড়াই এখন অনেকটা গৌণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখন জাপানীদের সমর নীতিই আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে। এই দিক হইতে আমাদের যতদূর বিশ্বাস তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, ভারতের উপকূলভাগে কোন কোন স্থানে বড় জোর বিমানযোগে আক্রমণ করাই জাপানের পক্ষে সম্ভব, সাক্ষাৎ সম্পর্কে ভারত আক্রমণ করা, এখনও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত আরও দুই মাস কালের সমরনীতি দেখিয়া তবে এদিকে জাপানীদের ক্ষমতা-অক্ষমতার হিসাব করা যাইবে, কিন্তু ইহার মধ্যেই হয়ত বর্ষা আসিয়া পড়িবে এবং বর্ষা আসিয়া পড়িলে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গসংকুল হইবে, তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জাহাজযোগে সেনা আনিয়া নামান যেমন কঠিন হইবে; সেইরূপ আবহাওয়ার দুর্যোগের জন্য উড়োজাহাজের আক্রমণও সহজ হইবে না।



কৃষ্ণসাগরের ককেশিয়ান উপকূলে রাশিয়ার নৌ-বন্দর নোভোরোসিকের দৃশ্য

কবিতা

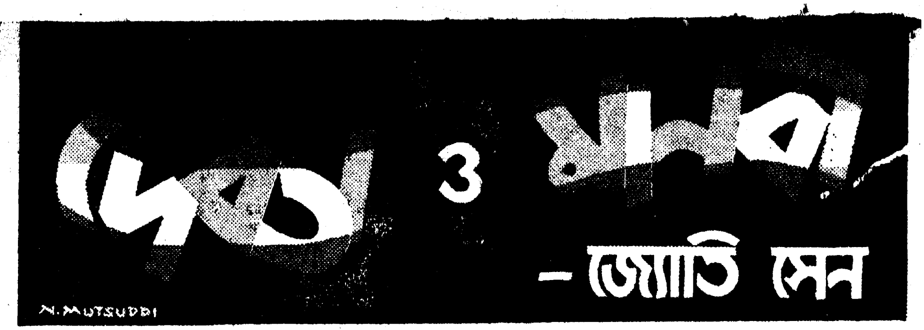
এ পৃথিবী

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক

দিগন্তের অস্ত-তীরে ম্লান তরী ডোবে সবিতার;
গাছে গাছে শতাব্দীর ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস পতন;
ফুলে ফুলে মহোল্লাসে মরণের বিপুল প্লাবন;
স্থাণুর লম্বিত পথে ভীড় যত শিকারী ছায়ার।
ঘন-সন্ধ্যা নেমে আসে কুহেলীর কুজ্ঝটিকা ভরা;
জীবনের শ্বাস যেন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হ'য়ে আসে;
বলাকার মৃতদেহ একে একে বাতাসেতে ভাসে;
রক্তের জোয়ারে আর শিশিরেতে সিক্ত হ'লো ধরা।
অদূরের বটগাছে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝুলে আছে যত
মরণের সেনানীরা—লাখো লাখো বাদুড়ের ছানা;
বিষাক্ত আকাশে জাগে বিভীষণ গোধূলির আনা
জীবনের মরা-হাটে প্রেতের উলঙ্গ চোখ যত।
অতি দূর-দূরান্তরে বধির জাহ্নবী যেন কাঁদে,
নিশার শিবিরে শুনি বাতাসের স্তিমিত শীৎকার;
শৃঙ্খলিত গ্রহ তারা মহাকাশে ঘোরে অনিবার;—
বিশাল প্রকৃতি যেন ফেটে পড়ে চাপা আর্তনাদে।

নিস্তব্ধ নিঝুম একা ব'সে আছি অতন্দ্র আলয়ে;
দেখিতেছি ধরিত্রীর লক্ষ কোটি যোজন তলায়
অন্তহীন রসাতলে অভ্রভেদী বিরাট গুহায়
সৃষ্টির দাবাগ্নি জ্বলে কি ভীষণ প্রকাণ্ড প্রলয়ে।
মনে হ'লো যেন এই পৃথিবীর সৃজনের মূলে
আছে কার পলকের অনির্দেশ উদ্ভ্রান্ত খেয়াল,
ধীরে ধীরে নিভে এলো তাই এক প্রচণ্ড ভয়াল
স্খলিত অগ্নির গোলা মুহূর্তের অসংগত ভুলে।
আজো হায় মাঝে মাঝে করাল ধ্বংসের ডাক আসে—
শিখার শাণিত হাসি ফেটে পড়ে আগ্নেয় গিরিতে,
ধূমায়িত ধূমকেতু আনাগোনা করে রজনীতে,
ভেঙে-পড়া নগরীতে ভূমিকম্প পৈশাচিক হাসে।
এত হাসি এত গান ধরিত্রীর এত যে মমতা,
এত মায়া এত প্রেম ভালোবাসা এত যে প্রিয়ার,
এরা সেই আদিতম আগুনের অজস্র বিকার,
নয় তো বা হবে কোন দুর্ঘটনা ইতিহাস কথা।

সব চেয়ে বড়ো কথা সব চেয়ে সত্য কথা ভাই—
দগ্ধ হবে ভস্ম হবে এ-পৃথিবী কোন একদিন;
সূর্যতাপে বুঝি আজো আদিম আগুন জ্বলে ক্ষীণ;
তারাদের প্রজ্বলন প্রতি রাত্রে বেড়ে ওঠে তাই।



১৩

ইন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দুমতী জয়ন্তের আশা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিমাকে জয়ন্তের সঙ্গে অবাধে ছাড়িয়া দিতে আগের মত আর তাঁহাদের আপত্তি রহিল না। কি জানি, স্রোতের গতি দৈবাৎ ঘুরিয়া যাইতেও পারে, ইহাই ছিল তাঁহাদের অবশিষ্ট ভরসা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেও প্রতিমার মুখে প্রত্যাশিত আশ্বাস না পাইয়া পুনরায় তাঁহারা হতাশ হইয়া উঠিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে ইন্দুমতী তাঁহার মেয়ে রাণুকে লইয়া ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ি আসিয়াছিলেন প্রতিমার খবর লইতে, ঠিক সেই সময় প্রতিমা বাড়ি ফিরিলে তাহার সঙ্গেই প্রথম দেখা হইল।

ইন্দুমতী কোন কথা বলিবার আগেই রাণু প্রতিমাকে অনুযোগ করিয়া বলিল—'প্রতিমাদি যে আমাদের একদম ভুলে গেলে!'

প্রতিমা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ভুলিনি রাণু। সময় পাইনে।'

একদিন প্রতিমা ছিল রাণুর আদর্শ। প্রতিমার ফ্যাসান হইতে তার চালচলন সবই রাণু ভক্তের মত অনুকরণ করিত। কিন্তু প্রতিমা যখন পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিল তাহার সঙ্গে রাণুর অন্ধভক্তিও ভাসিয়া গেল। প্রতিমার ফ্যাসানই রাণুর মনোমন্দিরে বিগ্রহ হইয়া রহিল।

রাণু প্রতিমার বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'আর পেয়েছ!'

প্রতিমা কহিল—'তুই ও ত আসতে পারিস!'

রাণু হাসিয়া কহিল—'তুমি নাকি সারাদিন বাড়িই থাক না,—এলে কি দেখা হ'ত!'

—'আসিসনি ত! আমার ওপর আগের মত আর তোর টান নেই, তাই বল!'

—'তুমি জান না প্রতিমাদি, তোমার জন্যে আমি কত দুঃখ করি! সত্যি!'

রাণুর কথায় প্রতিমা মনে মনে আহত ও আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—'রাণু, আমার জন্যে তোমার এ অহেতুক দুঃখ দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি!'

রাণু কহিল—'তুমি যদি রাগ না কর তা' হ'লে হেতুটা বলি'—

ইন্দুমতী রাণুকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন—'থাক্, থাক্, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।'

'কেন বলব না! সত্যি কথা বলতে দোষ কি!' বলিয়া রাণু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মায়ের মুখের পানে তাকাইল।

ইন্দুমতী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত বলিলেন—'দোষ আছে। সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। অপ্রিয় সত্য বলতে নেই, এটা তোমার জানা উচিত।'

তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া প্রতিমা বিরক্ত হইল। তাহার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। প্রতিমার মুখের দিকে তাকাইয়া রাণু দমিয়া গেল। প্রতিমা ইন্দুমতীকে যেন কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল এমন সময় দিলীপ সেখানে উপস্থিত হওয়ায় সে চুপ করিল।

প্রতিমাকে দেখিয়া দিলীপ হাসিয়া বলিল—'এক যুগ পরে আজ তোমার দেখা পেলাম।'

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেন বলুন ত?'

দিলীপ কহিল—'প্রতিদিন যার মুখ দেখে উঠি—আমার বেয়ারার!'

—'বেয়ারাকে তা' হ'লে বখ্‌শীশ দেবেন কিন্তু।'

—'বেচারী বাড়ি যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে—আজই তার ছুটি মঞ্জুর করে' দেব নাকি?'

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিল। হাসি থামিলে প্রতিমা দিলীপকে বলিল—'আমি যে দুদণ্ড বসে আপনার সঙ্গে কথা কইব সে শক্তিও আজ আমার নেই। শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে—বোধ করি জ্বর হবে।'

'দেখি দেখি'—বলিয়া দিলীপ অগ্রসর হইয়া প্রতিমার হাতখানি ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া বলিল—'জ্বর হ'য়েছে বলে'ত মনে হ'চ্ছে না। দু'চার দিন Rest নাও—Rest নিলেই শরীর ভাল হ'য়ে যাবে।'

প্রতিমা বলিল—'কলকাতায় আমার পক্ষে চুপ করে' বসে থাকা অসম্ভব।'

—'তা' হ'লে চেঞ্জে যাও।'

কোথায় যাই বলুন ত?

—'তাইত!'—বলিয়া দিলীপ ভাবিতে লাগিল, ভাবিয়া বলিল—'যেখানে খুশী চলে' যাও। আর সঙ্গে যদি Attending Physician চাও তা' হ'লে তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারি।'

রাণু বলিয়া উঠিল—'আমিও যাব!'

ইন্দুমতী বলিলেন—'এখন এই বর্ষাকালে কোথায় যাবে বেড়াতে? এটা কি বেড়াবার Season? তা' না হ'লেত' আমিও যেতাম।'

দিলীপ হাসিয়া বলিল—'বর্ষায় বেড়াতে চানত' চুণারে চলুন। চমৎকার লাগবে। সেখানে দেখতে পাবেন গৈরিক বসনা গঙ্গা ভৈরবীর মত ছুটে চলেছে বিশ্বনাথ দর্শনে, শ্রাবণ গগনে মেঘের গুম্ গুম্ গুরু গুরু ধ্বনি শুনে' ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য চলেছে বড়াপাহাড়ের শ্যামল প্রাঙ্গণে, বারি ঝরঝর প্রভাতে হিন্দুস্থানী তরুণীরা চলেছে শৈল নির্ঝরিণীর তীরে চিরমধুর কাজরী গান 'শাঙন কি শ্যামলিয়া' গাইতে গাইতে। যাবেন সেখানে?'

তাহার কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'যাব যাব!'

সদলবলে চুণারে যাওয়াই ঠিক হইল।

চুণারে যাইবার জন্য কি কি বন্দোবস্ত করিতে হইবে সেই আলোচনার জন্য সকলে মিলিয়া ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিল। ইন্দ্রনারায়ণও এই পরামর্শ সভায় যোগ দিলেন। কিন্তু নিজে তিনি যাইতে রাজী হইলেন না। তাঁহার যৌবনে তিনি চুণারে অনেকবার গিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে আর সেখানে যাইবার সখ তাঁহার নাই। তবে তাঁহার বন্ধু মির্জাপুরের এক জমিদার চুণারে যে বাড়িখানা তৈরী করাইয়াছেন সেখানে সকলের থাকিবার বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিতে পারিবেন। অন্যান্য বন্দোবস্তের ভার দিলীপ নিজের ঘাড়ে লইল।

তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল। তার পরদিনই বৈকালে তুফান এক্সপ্রেসে তাহারা রওনা হইল।

যাইবার আগে প্রতিমা মনে করিয়াছিল জয়ন্তকে একটা খবর দিয়া যাইবে, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও উৎসাহ ছিল না। গাড়িতে উঠিয়া তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল—জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, তা' না হোক্ অন্তত খবরটা দিলেও চলিত। দেখা না করিয়া বা খবর না দিয়া যাওয়াটা চরম দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া হইল। ইহার পর জয়ন্তের কাছে কি করিয়া সে মুখ দেখাইবে ভাবিয়া মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

এই যাওয়াই যদি এ জীবনের মত যাওয়া হইত তাহা হইলে হয়ত লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত। প্রতিমা মনে মনে ভাবিতে লাগিল আর যদি ফিরিয়া আসিতে না হয়! অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল চুণারে গিয়া জয়ন্তকে চিঠি লিখিয়া ক্ষমা চাহিবে, জয়ন্তের কাছে ক্ষমা না চাহিলে মনের অশান্তি কিছুতেই দূর হইবে না। এমন উদার, এমন মহৎ লোক সে, তাহার প্রতি রাগ করাও অন্যায়।

জয়ন্ত যেদিন তাহার চিঠি পাইল সেদিন তার বিবাহ। প্রতিমা এ বিবাহে তাহার শুভেচ্ছা জানাইয়াছে এবং বিবাহে উপস্থিত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু যাইবার সময় সে যে দেখা করিয়া যাইতে পারে নাই এজন্য বারবার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে। চিঠিখানা পাইয়া জয়ন্তের মন প্রতিমার জন্য সমবেদনায় ভরিয়া গেল। এ বিবাহই যে প্রতিমার এই দুঃখের একমাত্র কারণ তাহা মনে হওয়ায় বিবাহে তাহার উৎসাহ রহিল না।

তৎক্ষণাৎ জয়ন্ত প্রতিমাকে চিঠি লিখিল। তাহার বিবাহে শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্য প্রতিমাকে সে ধন্যবাদ জানাইল, তারপর অন্যান্য সংবাদ দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিল সে যেন অচিরেই তাহার হৃদয়ের দুর্বলতা জয় করিয়া সুস্থ মনে এবং সবল দেহে কলিকাতায় ফিরিয়া কাজে যোগ দিতে পারে। চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া জয়ন্ত মনে মনে গভীর শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

সেই সময় তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—'চুপ করে' বসে' থাকলে ত চলবে না খোকা, একা আমি ক'দিক দেখব! তুই নিজে যদি একটু দেখাশোনা না করিস তা' হ'লে আমি যে বিপদে পড়ব!'

বিবাহের আয়োজন করিয়া এখন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না ঠিকই। জয়ন্ত গা' ঝাড়া দিয়া উঠিল, বলিল—'তুমি তোমার কাজে যাও মা, আমি যাচ্ছি।'

বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে, এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। কেনই বা ফিরিবে। পদ্মার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যই সে পদ্মাকে বিবাহ করিতেছে, ইহাতে কেহ যদি ব্যথিত হয় তাহা হইলে সে দোষ তার, ইহার জন্য সে দায়ী নয়।

প্রতিমা ও ইন্দ্রনারায়ণ এ বিবাহে কোন অংশ গ্রহণ না করায় জয়ন্তকে প্রশান্তের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইয়াছে। কন্যা পক্ষের সম্পূর্ণ কাজের ভার সে লইয়াছে। কন্যা সম্প্রদান করিবেন প্রশান্তের বাবা, এই জন্য পদ্মাকে তিনি নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন। বাড়ি ভাড়া করা, বিবাহ মণ্ডপ তৈরী, বিবাহের বন্দোবস্ত, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা—সবই করিয়াছে প্রশান্ত। অবশ্য বরেণ তাহাকে কম সাহায্য করে নাই।

জয়ন্তের ইচ্ছানুযায়ী বিনা আড়ম্বের বিবাহের ব্যবস্থা হইলেও আয়োজনের দিক দিয়া কোন ত্রুটি ছিল না। আলোক-মালা বিভূষিত সুসজ্জিত মণ্ডপে বহু লোকের সম্মুখে নারায়ণ সাক্ষী করিয়া সন্ধ্যা লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অগণিত নগণ্য লোক ভূরিভোজন করিয়া বিদায় লইল। অনেক রাত্রে বাড়ির ভিড় কমিলে জয়ন্ত ও পদ্মা বাসর শয্যায় শুইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

জয়ন্ত বলিল—'বিবাহের যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে তা' হ'লে আমাদের বিবাহিত জীবনে সে উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ না হয় সেদিকে সর্বদা আমাদের সচেতন থাকতে হবে। শুধুই জৈবধর্ম পালনের জন্য যে বিয়ে করা—তা' নয়, পুরুষ ও নারীর অপরিপূর্ণ জীবনে পরিপূর্ণতা দান করাই প্রধান উদ্দেশ্য, এ জন্যে একে অপরের ধর্মে ও কর্মে এক হওয়া চাই,—বুঝেছ পদ্মা?'

পদ্মা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

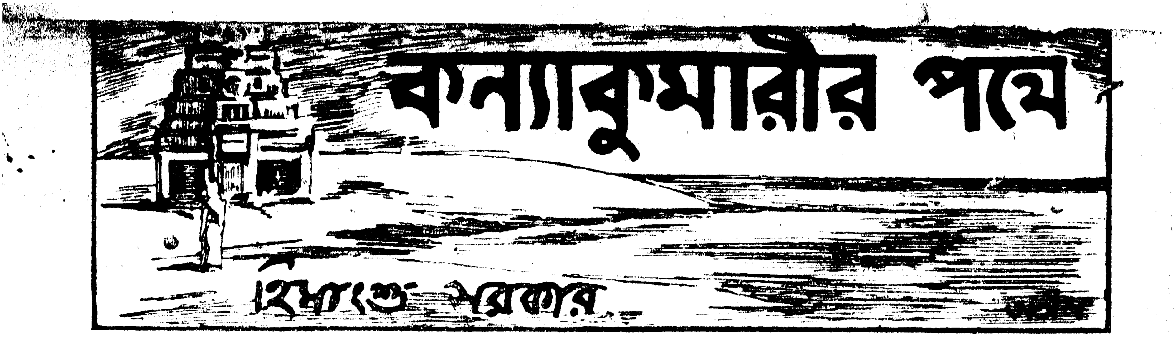
জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—'চুপ করে' রইলে যে?'

পদ্মা সরলভাবে বলিল—'তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না।'

'সে জন্যে তুমি ভেব না, সময়মত আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব'—বলিয়া জয়ন্ত পাশ ফিরিয়া শুইল।

জয়ন্ত ঘুমাইয়া পড়িলে পদ্মা হতাশ হইয়া চোখ বুজিল।

(ক্রমশ)।



[৩]

দ্বীপটির সম্বন্ধে কিছু লিখবার আগে, দ্বীপটির নাম 'ক্রশাডাই' কেন হল সে সম্বন্ধে Mr. Chackoর কাছ থেকে যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম সেটা এখানে বলি। শোনা যায় অনেকদিন আগে এক সাহেবের মৃতদেহ এই দ্বীপে কবর দিয়ে, কবরের ওপর একটা ক্রশ পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে বোধ হয় কোন লোকজন এ দ্বীপে বাস করত না। লোকেরা এর পর থেকে এটাকে 'ক্রশের দ্বীপ' বলতে আরম্ভ করে। পরে এর থেকেই এর নাম হয় 'ক্রশাডাই' দ্বীপ। আমরা অবশ্য এই কবর অথবা ক্রশের কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি।

দ্বীপটির ভৌগোলিক অবস্থান লঘিমা (Latitude) ৯·১৪ই উত্তর এবং দ্রাঘিমা (Longitude) ৭৯·১৩ পূর্ব। পূব থেকে পশ্চিমে দ্বীপটা লম্বায় প্রায় ১১ ফারলং (furlong) এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে চওড়ায় ৩ ফারলংএর মত। দ্বীপের পূব মাথাটাকে 'স্যান্ডি পয়েন্ট' (sandy point) বলা হয়; কারণ এদিকটায় সবই বালি। পশ্চিম মাথাটার নাম 'বুশি পয়েন্ট' (bushy point) কারণ এদিকটা সবই ঘন গাছে ভর্তি। বুশি পয়েন্টটা স্যান্ডি পয়েন্টে-এর চেয়ে অনেক বেশী চওড়া। দ্বীপটার প্রায় সবটা ঘিরে সমুদ্রের ভেতর 'কোরাল রিফ' আছে। শুধু দ্বীপের যেদিকে এসে লঞ্চ লাগে সেই দিকটার খানিকটা জায়গায় কোন রকম 'কোরাল রিফ' নেই। 'কোরাল রিফ' থাকার দরুণ জল এইসব জায়গায় খুব কম এবং এর ওপর দিয়ে কোন-রকম নৌকা অথবা লঞ্চ চলাচল করতে পারে না; সেই জন্য লঞ্চকে তার বাঁধাধরা চলাচলের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

লঞ্চ থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে এখানকার একমাত্র পাকা একতলা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা এখানকার ল্যাবরটারী গৃহ। এই বাড়িটি ছাড়া আর কোন পাকা বাড়ি দ্বীপে নেই। সমুদ্রের নোণা হাওয়াতে পাকা বাড়িতে তাড়াতাড়ি নোণা ধরে যায় বলে পাকা বাড়ি এখানে তৈয়ারী করা হয় না। সেই জন্য এখানকার অন্য সব বাড়িগুলো কাঁচা দেওয়াল এবং পাতার ছাউনি দিয়ে তৈয়ারী। আর আছে Incharge, Mr. Chako লঞ্চের চালক, মিস্ত্রি, একজন সর্দার এবং আর দু'চারজন এখান-কার সাধারণ কর্মচারীদের বাড়ি। সবশুদ্ধ ৭।৮ ঘর লোকের বাস। সবই মদ্রদেশীয়। Mr. Chakoর বাড়িটাই অন্যদের চেয়ে কিছু ভাল। তাছাড়া অন্যসব বাড়ি আমাদের দিককার কুঁড়ে ঘরের মত। যাই হোক আমরা এই ধরণের একটা ছোট 'কুঁড়ে' পেলাম। এখানে অবশ্য আমাদের রান্না এবং খাওয়াই কোন



ল্যাবরটারী গৃহ

রকমে হত; আর আমরা শুতাম ল্যাবরটারীর বড় মাঝের ঘরে অথবা এর বাইরের চওড়া বারান্দায়।

জিনিসপত্র নৌকা থেকে এনে গুছিয়ে বসতে বসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। কয়েকজন রান্নার জোগাড়ে লাগল—আর আমরা কয়েকজন যারা খাওয়ার পর টিপ্পনীকাটা ছাড়া অন্য কোন কাজেই লাগব না তারা—সমুদ্রের পাড়ের দিকে রওনা দিলাম। শুক্ল পক্ষের রাত থাকায় কিছুক্ষণ বাদেই চাঁদ উঠলো। আমি দল ছেড়ে একটু তফাতে সমুদ্রের পাড়ের ঢেউর গা ঘেসে বসলাম।

সমুদ্রের এক অবর্ণনীয় রূপ চোখে পড়ল। ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছিল যেন লক্ষ হীরা এক সঙ্গে জ্বলছে। সমুদ্রের নোণা বাতাস গায়ে এসে লাগছে, তার সঙ্গে কি রকম একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে,—নেশা ধরিয়ে দেয়। আলো আঁধারিতে পাড়ের কাছের ঢেউগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা মোটা কালো প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক জীব গড়াতে গড়াতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পাড়ের সঙ্গে আঘাত লাগা মাত্রই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে—বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, যুগ যুগ ধরে সেই গর্জন চলছে। সমুদ্রের রুদ্র মূর্তিই ভাল, শান্ত মূর্তি তাকে মানায় না।

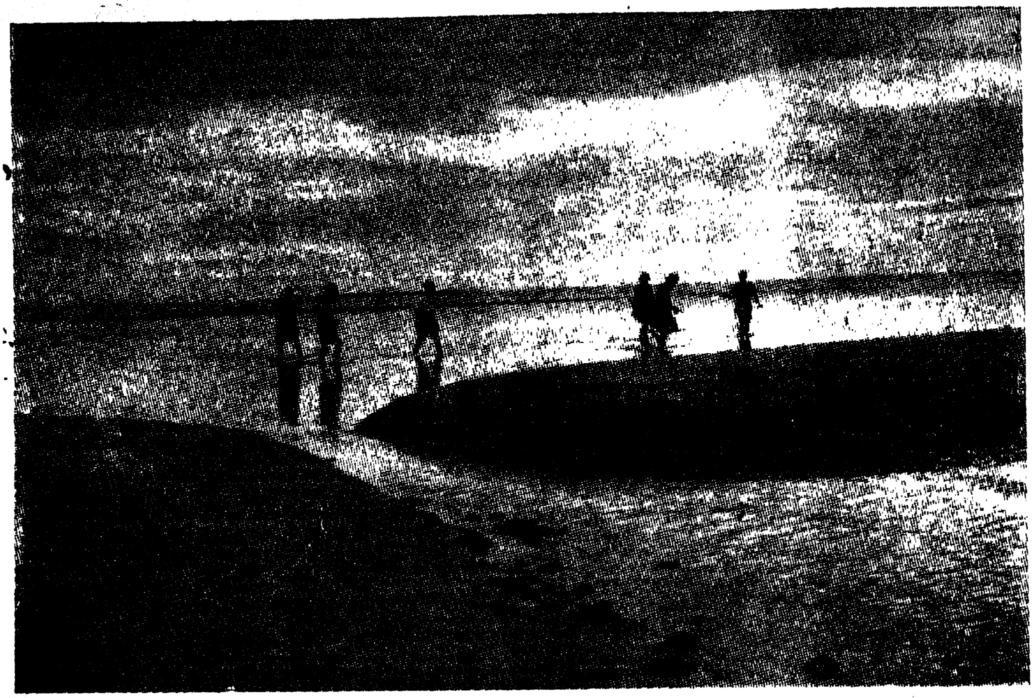
কতক্ষণ এরকম ভাবে বসে ছিলাম জানি না, খাবার ডাক পড়তে খেয়াল হ'ল। খাওয়া শেষ করে যার যেখানে এবং যেমন ইচ্ছা শুয়ে পড়লাম। একটানা সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ভোরের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঘুম ভাঙ্গার পর বন্ধু এবং আমি সারা দ্বীপটি একপাক ঘুরে আসার জন্য বের হলাম। পূব দিকের স্যান্ডি পয়েন্ট থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ পাড় ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। বালির ওপর রাত্রের জোয়ারের ঢেউতে সমুদ্রের বিভিন্ন রকমের আগাছা এসে জমেছে। এর সঙ্গে অসংখ্য নানান জাতের নানা রংয়ের ঝিনুক, শামুক আর প্রবালের নানা আকারের টুকরার সঙ্গে কিছু কিছু সামুদ্রিক প্রাণিও পড়ে রয়েছে। এখন সমুদ্রে

পয়েন্ট থেকে আরম্ভ করে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই অনেক-গুলো ছোটখাট বে (Bay)র মত তৈয়ারী হয়েছে। তার মধে কয়েকটার নাম 'ওয়েস্ট-বে' (Westbay), 'ওয়াচম্যান্স বে' (Watchman bay) ইত্যাদি।

এখানে ল্যাবরটারী এবং সব কর্মচারীদের বাসা স্যাণ্ডি পয়েন্ট-এর দিক থেকে আরম্ভ করে খানিকটা অংশ জুড়ে এই দিকটাই সমস্ত দ্বীপটির মধ্যে যা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বাসপোযোগী। বাকি অংশটা প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় গাছ পালায় ভর্তি হয়ে পড়ে রয়েছে। সমুদ্রের পাড় থেকে কিছু



প্রাণী-সংগ্রহের জন্য যাত্রা —ফটো শৈলেন ঘোষ

ভাটা। আবার জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ এগুলোকে সমুদ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। দক্ষিণ পাড় ধরে পশ্চিম কোণায় বুশি পয়েন্ট-এ পৌঁছলাম। এদিকটা সুন্দরী, গেঁয়ো জাতীয় গাছে ভর্তি। গাছগুলো ডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে একেবারে সমুদ্রের পাড় পর্যন্ত চলে গেছে। জোয়ারের সময় গাছগুলোর গোড়ার দিকের খানিকটা করে জলে ডুবে যায়। এদিকটায় পাড়ের ওপর এবং পাড়ের ধারের জলের ভেতরে কোন রকম বালির চিহ্ন নেই। শুধু কাদায় ভর্তি। আর এই ধরণের কাদা এই কোণা থেকে আরম্ভ করে উত্তর পাড় ধরে দ্বীপটির এক-তৃতীয়াংশ আসার পর জেটি (Pier)। এটি কাঠের তৈয়ারী এবং সমুদ্রের জলের ভেতর খানিক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। লম্বায় ডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে ৩৫ ফুট এবং চওড়ায় ৪ ফুট।

সমস্ত দ্বীপটা একবার ঘোরার পর দেখলাম যে, দক্ষিণ পাড়টা প্রায় অর্ধ চন্দ্রের মত এবং পাড়টাও খুব বেশী আঁকাবাঁকা নয়; কিন্তু উত্তর পাড়টা খুবই আঁকাবাঁকা। এর জন্য বুশি

ওপরে প্রায় সমস্ত দ্বীপটি তাল আর নারকোলের গাছের সারি দিয়ে প্রাচীরের মত করে ঘেরা। অবশ্য মাঝে মাঝে কোথাও আবার কোন গাছের চিহ্ন নেই। এই তাল আর নারকোল গাছ-গুলো দ্বীপে আপনা থেকেই জন্মেছে। এছাড়া আরো অনেক গাছ এখানে দেখলাম যার মধ্যে কোনটা আপনা থেকে জন্মেছে আবার কোনটা বা এখানে এনে লাগান হয়েছে।

আপনা থেকে জন্মান গাছের মধ্যে তাল, নারকোল, কেয়া, সুন্দরী, গেঁয়ো, আকন্দ, জাম ইত্যাদি। এছাড়া একরকম কাঁটাওয়ালা ছোট ছোট খেজুর গাছের মত গাছ আর একরকম ছোট ছোট পাতাওয়ালা লতান গাছ সারা দ্বীপটার বালির ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। তেঁতুল, খেজুর, নিম ইত্যাদি গাছগুলো এনে লাগান হয়েছে।

ভোর বেলায় ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে দেখলাম যে, আর সকলে প্রাণী সংগ্রহে (Specimens Collection)এ যাবার তোড়জোড় করছে। আমরাও অন্যদের মত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। পরণে হাফ্ প্যাণ্ট, আর গায়ে গেঞ্জি।

শুনলাম আমাদের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে জলের মধ্যে কোরাল রীফ্ এবং বালি থেকে।

সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা কম জলে এবং অল্প ঢেউ-এর মধ্যে বাস করে। এগুলো প্রবালের বাসাগুলোর তলায়, মধ্যে, ফাঁকে অথবা অল্প বালির নীচে থাকে। অনেকগুলো আবার পরিস্কার বালির ওপর জলের তলায় পড়ে থাকে।

আমাদের সঙ্গে চললো দ্বীপের নমুনা সংগ্রহ করবার সর্দার কৃষ্ণ পিল্লাই। তার কাছে শুনলাম যে, কোনরকম জুতো পায়ে থাকলে প্রবালের বাসার ওপর দিয়ে হাঁটার সুবিধা হয়; কিন্তু জলেতে জুতো ভেজান চলে না, তাই খালি পায়েই চললাম।

আমাদের বিভিন্ন জায়গা এবং কোরাল রীফ্ থেকে বিভিন্ন রকমের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে, কারণ এক জায়গায় যে ধরণের প্রাণী পাওয়া যায়, আর একদিকে তার কোন অস্তিত্ব নাও



কর্মচারীদের বাসা

থাকতে পারে—সেখানে আবার অন্য এক জাতীয় প্রাণী পাওয়া যাবে।

সাজ সরঞ্জাম নিয়ে পাড় ছেড়ে জলে নেমে সকলের কি আনন্দ! জলের নীচে যা কিছু চোখে পড়ে সবই সংগ্রহ করার চেষ্টা। আমাদের অবস্থা দেখে কৃষ্ণ পিল্লাই হেসে বলল য, সংগ্রহ করার জন্য এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই, কারণ পরে এত সব নানা রকমের নমুনা পাওয়া যাবে যে আর সংগ্রহ করতেই ইচ্ছা করবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে, প্রথম উৎসাহে জলের মধ্যে ঝাপাঝাপি করে, কাপড় জামা ভিজিয়ে যা পাচ্ছি তাই কাঁধে ঝোলান ব্যাগ-যাত করছি। পরে অবশ্য কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের কথাই দেখলাম ঠিক। তখন আর যা-তা সংগ্রহ না করে, পছন্দ এবং দরকার মত সংগ্রহ করতে লাগলাম।

সকলে হাঁটুভর জলের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আগের লাফালাফিতে প্যান্টের নীচের দিকে বেশ ভিজে গেছে—জল একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টটা কেউ কেউ ভেজবার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টাও করল—আর আমরা ক'জন একদম আশা ছেড়ে এগিয়ে চললাম।

এতক্ষণ পায়ের নীচে বালি ছিল, তাই পায়ের তলার দিকে লক্ষ্য না করেই বেশ জোরে জোরে এগিয়ে চলেছিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর কোরালের রীফ্ আরম্ভ হল। এ যেন প্রবালের রাজ্য। যেদিকে তাকান যায় শুধু জলের মধ্যে ডোবা অথবা খানিকটা করে জলের ওপর মাথা-তোলা প্রবাল। একটা দেখার মত জিনিস—স্বচ্ছ জলের নীচে যেন কে যত্ন করে বিভিন্ন রংয়ের এবং আকারের প্রবাল-ফুলের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। ওপরের স্বচ্ছ জলের ওপর দিয়ে সকালের পরিষ্কার রোদ প্রবালগুলোর ওপর পড়েছে। হাওয়ার জন্য জলের ওপরে ছোট ছোট ঢেউ হচ্ছে, আর নীচের প্রবালগুলো ওপরের ঢেউ-এর কম্পনে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। জগতে যে এত ধরণের রং-এর সমাবেশ হতে পারে তা এই প্রবাল রাজ্য না দেখলে বোঝা যায় না।

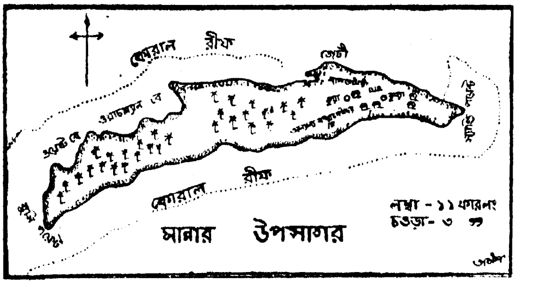
অবাক হয়ে জলের নীচের এই 'প্রবাল উদ্যান' দেখছিলাম। কৃষ্ণ পিল্লাই এগিয়ে যেতে বলল। এর ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে—কত বছরের সাধনায় এর সৃষ্টি,—আর আমরা এক মুহূর্তে পা দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনচ করে দিয়ে যাব এগুলো! কৃষ্ণ পিল্লাই বুঝল অন্যরকম; কারণ সে তার ভাঙ্গা ইংরেজী এবং হিন্দী মিশিয়ে পা কি করে বাঁচিয়ে আসতে হবে তার সম্বন্ধে খানিকটা উপদেশ দিল। না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই—যখন সকলে চলেছে এর ওপর দিয়ে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। কয়েক পা চলার পরই বুঝলাম যে কিছুক্ষণ আগে লোকটা কেন সাবধানে চলার উপদেশ দিয়েছিল। যারা এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেরই পায়ের তলা কেটে যাওয়াতে গতিবেগ কমিয়ে জায়গায় জায়গায় সারসের মত এক ঠেঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে পায়ের তলা পরীক্ষা করছে। এর পর অবশ্য সকলে বেশ সন্তর্পণেই এগিয়ে চলল। পায়ের তলায় কাটা জায়গাগুলোতে সমুদ্রের নোনা জল এবং এবড়ো খেবড়ো প্রবাল লাগার দরুণ প্রায় সকলেই মুখভঙ্গী এবং শরীরের সব অদ্ভুত ভঙ্গী করতে লাগল।

যথাস্থানে পৌঁছে সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করলাম। সেই-খানে যেসব জাতের প্রাণী থাকার কথা এবং কিরকম ভাবে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণ পিল্লাই আর এক দফা উপদেশ দিয়ে কাজে লেগে গেল। দেখলাম—এতদিনের অভিজ্ঞতার জন্য কৃষ্ণ পিল্লাই আমাদের পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে কিছু কম জানে না।

সংগ্রহের কাজের জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে কয়েকটা বালি খোড়বার মত বিভিন্ন ধরণের কোদাল নিয়েছিলাম। প্রবালের শক্ত বাসাগুলো ভেঙ্গে তার মধ্যে থেকে প্রাণী সংগ্রহের জন্য গোটাদুই হাতুড়ীও ছিল। তাছাড়া ছোট বড় কাচের নমুনা সংগ্রহের টিউব (Specimens Collecting tubes) নেওয়া হয়েছিল। ঐগুলোর মধ্যে ছোট ছোট প্রাণিগুলো সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে জল আর বালিও ভরে রাখা হচ্ছিল। বড় বড় দুটো বালতিও সঙ্গে ছিল। বালতির মধ্যে অল্প খানিকটা জল দিয়ে বড় বড় প্রাণি গুলোকে রাখা হচ্ছিল। এরকম ভাবে সংগ্রহের পর প্রাণিগুলো বাঁচিয়ে রাখার কারণ এই যে, সংগ্রহের কাজ সময় সময় ৫।৬ ঘণ্টা ধরে এক সঙ্গে চলে। এই সময়ের

মধ্যে যদি প্রাণিগুলো মরে যায় তাহলে পরে আর সেগুলোকে নিজেদের ইচ্ছা এবং দরকার মত পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে রাখা যায় (preserve) না। কাঁধে ঝোলান ব্যাগ-এ শক্ত এবং যেগুলো নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই এ রকম সব জিনিস সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছিল, যেমন—স্পঞ্জ (sponge), প্রবালের টুকরো, বিভিন্ন ধরণের ঝিনুক এবং ঐ জাতীয় সব।

সংগ্রহ শেষ করে আমরা আস্তানার দিকে ফিরলাম। এর পর আবার নিজেদের রান্না করে খেতে হবে। খিদেয় পেট



জ্বলছে। যাই হোক, ফেরার পর আর একদফা চা এবং পাউরুটির সদ্ব্যবহার করার পর কিছুটা খিদে কমল। একদল রান্নার কাজে লাগল। আর একদল সংগ্রহ করা নমুনাগুলো নিয়ে পড়ল। সংগ্রহের পর এগুলো আলাদা আলাদা করে পরিষ্কার করে preserve করার জন্য fix করার বন্দোবস্ত করা বেশ কষ্টের এবং ধৈর্যের দরকার।

রান্না শেষ হওয়ার পর সকলে স্নান করতে চল্‌লাম। স্নান মানে—সমুদ্র স্নান। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই 'শিশে' এবং 'ঘটির' দল,—অর্থাৎ একদম সাঁতার জানেনা এবং কোন রকমে হাত পা ছুড়তে জানে। মাস্টার মশাই শিশের দলের। তিনি কোন রকমে ভয়ে ভয়ে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে স্নান আরম্ভ করলেন। আমাদের সাঁতার-জানাদের কাছ থেকে অনেক রকম ভরসা পেয়ে তবে কোমর ভর জলে একবার এসে কোন রকমে একটা ডুব দিয়েই কোন কথা শোনবার আগেই সোজা পাড়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

স্নান শেষ করে সকলে মিলে খাওয়ার ঘরে গোল হয়ে বস্‌লাম। খিদের মুখে নিজেদের রান্না খিচুড়ি, সামুদ্রিক মাছ আর গাওয়া ঘি যেন রাজভোগ বলে মনে হ'ল। খাওয়াদাওয়ার পর যার যেমন খুশী ঘুরতে বেরল। আমরা কজন মাস্টার মশাইকে নিয়ে একটা নারকোল গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে Mr. Chacko এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। নানান বিষয় আলোচনা হতে লাগল। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাকে দ্বীপের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগ্‌লাম।

দ্বীপের আবহাওয়া সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আবহাওয়া বেশ ভাল। তারপর আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসও মন্দ নয়। সবচেয়ে খারাপ সময় নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস। এই সময় রাতদিন ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, সমুদ্রও অশান্ত হয়ে ওঠে—সময় সময় অশান্ত দু একটা ঢেউ পাড়- ছাপিয়ে দ্বীপের ওপর দিয়েও চলে যায়। দ্বীপের তলা দিয়ে জল ওঠার জন্য বালিও শুকনো থাকে না।

সমস্ত দ্বীপটায় বালি ছাড়া কোন রকম মাটি নেই। এজন্য বালিতে জন্মান গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ এখানে হয়না। দ্বীপেতে দুটো পাকা কূয়ো আছে। একটা ল্যাবরটারীর সামনে আর একটা কিছু দূরে Mr. Chackoর বাড়ির কাছে। জল কিন্তু নোণা। তবে সমুদ্রের জলের চেয়ে কিছু কম। সেইজন্য এর জল কোন রকম খাওয়ার ব্যাপারে ব্যবহার করা চলে না। এ ছাড়া একটা বাঁধান চৌবাচ্চা আছে। এর জলে ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ রেখে Mr. Chacko মাছের চাষ সম্বন্ধে একটা গবেষণা করছেন। এ ছাড়া সমস্ত দ্বীপটায় আর কোন রকম জল নেই বল্‌তে গেলে। কিন্তু কোন রকম জল জমবার সুযোগ না থাকা এবং সমস্ত বছর এত হাওয়া থাকা সত্ত্বেও এখানে ম্যালেরিয়া হয়। রাত্রে বাইরে হাওয়ার মধ্যে শুয়েও মশার উৎপাতে আমাদের কষ্ট পেতে হয়েছিল। দ্বীপেতে কোন রকম খাওয়ার জল না থাকার দরুণ খাওয়ার জল সেই পাম্বন ডারশন থেকে আন্‌তে হয়। বড় বড় কাঠের পিপে ভর্তি করে জল লঞ্চে করে নিয়ে আসা হয়। এক একটা বড় পিপে পিছু আট আনা করে দাম পড়ে।

সারা বছর ধরে এখানে সংগ্রহের কাজ চলে। সংগ্রহের মধ্যে প্রাণী ছাড়া সামুদ্রিক গাছগাছড়াও থাকে। সংগ্রহের পর সেগুলোকে পরিষ্কার করে preserve করা হয়। তারপর মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের যে সব জায়গায় এ সবের নিয়ে গবেষণা করা হয় সেখানে পাঠান হয়। এই কারণে এদ্বীপে খুব ভাল গবেষণাগার নেই, তবে প্রাথমিক কাজের মত যা কিছু দরকার তা সবই আছে। ল্যাবরটারী বাড়িটির মাঝের ঘরটিতে বিভিন্ন আকারের শিশিতে শ্রেণী ভাগ করে এখানকার প্রাণী এবং গাছ-গুলির নমুনা আলমারীতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরটিতে আলমারীতে কিছু কিছু বইয়ের সংগ্রহও আছে।

সকলে মিলে কথাবার্তা চলছে—এমন সময় শৈলেন এসে খবর দিল যে, বিমলের চশমা জেটীর ওপর থেকে জলের ভেতর পড়ে গেছে। কি করে পড়লো—খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, কয়েকজন মিলে একটা ছিপ তৈয়ারী করে জেটীর কাছে বড় বড় মাছ ধরবার চেষ্টা করছিল। জলের ওপর ঝুঁকে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চশমাটা জলে পড়ে যায়। মাস্টার মশাই আশা ছেড়ে দিতে বল্‌লেন—কারণ জল ওখানে এক মানুষের বেশী, তা ছাড়া ঢেউতে অন্য কোন দিকে ভেসে গিয়েছে নিশ্চয়। আমি বল্‌লাম যে, পাওয়া যেতে পারে—কারণ মাদ্রাজে এগমোর স্টেশনে প্রবোধের হাতের ঘড়ি রাতে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যাওয়ার পর যে রকম আশ্চর্যভাবে ফেরৎ পাওয়া গেছে—তাতে আমাদের সকলের ভাগ্যই বোধ হয় ভাল, সেইজন্যই যদি ফিরে পাওয়া যায়। যাই হোক Mr, Chacko কথাটা শুনে দু'জন লোক নিয়ে জেটীর দিকে চল্‌লেন। একজন জলে নেমে আন্দাজ করে দেখান জায়গাটাতে ডুব দেওয়া মাত্রই চশমাটা তুলে নিয়ে এল। বিমলের মুখে হাসি দেখা দিল। জেটী থেকে দূরে জলের ওপর কয়েকটা কাঠের পিপে ভাসতে দেখে Mr. Chackoকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বল্‌লেন যে, তিনি একটা ছোট Pearl hatchory করেছেন। সেটা পরদিন সকালে দেখা যাবে ঠিক করে আমরা সকলে জেটী থেকে বিকালের চায়ের জোগাড় করতে ঘরের দিকে ফিরলাম। Mr. Cahckoকেও আমাদের সঙ্গে চা খাবার নিমন্ত্রণ করা হ'ল।

ক্রমশ

পুরুষ ও রমণী

(বড় গল্প)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১২

আনন্দ পরের দিন সকালবেলাই আসিয়া হাজির হইল।

'বৌদি কোথায়?' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া বাহিরের টেবিলটার উপর টুপিটা ফেলিয়া বারান্দার ইজিচেয়ারেই শুইয়া পড়িল।

সারারাত্রি জাগিয়া সুকুমার ভোরের দিকটায় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহার কণ্ঠস্বর কানে যাইতে তাড়াতাড়ি মুখেচোখে জল দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার সেই আরক্ত চক্ষু এবং শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ ভুল বুঝিল। ঈর্ষাতুর কণ্ঠে কহিল, ইস্—করেছিস কি!...দেহটার দিকেও একটু নজর রাখিস্।

ম্লান হাসিয়া সুকুমার কহিল, তাই বটে। কিন্তু তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি যে, আমরা পৃথক্ শয্যাতেই কাল রাত কাটিয়েছি। ঘুমোতে পারিনি অন্য কারণে—শরীরটা ভাল ছিল না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আনন্দ প্রশ্ন করিল, পৃথক্ শয্যা কেন? কাল আমারই অবিমৃষ্যকারিতার ফল নাকি?

না, না—এমনি, স্বাস্থ্যের অনুরোধে।...তারপর চা খেয়ে এসেছিস, না খাবি এখানে—?

দেখ, চা এক কাপ খেয়েই এসেছি। কিন্তু তাই বলে বৌদির হাতের চা একটু খাবো না, এ যদি মনে করে থাকিস্ ত বিষম ভুল করবি।

সুকুমার মৃদু হাসিল। তাহার পর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, তোর বৌদিকে বল্‌গে যা, দু'পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করতে—

ইহার পর খুচরা দুই-একটা কথা কহিতে কহিতেই ইন্দিরা চা লইয়া দেখা দিল। তাহারও চক্ষু আরক্ত, চোখের কোলে কালি—দেখিয়া সুকুমার একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু ঠিক কারণটা অনুমান করিতে না পারিয়া স্বস্তি পাইল না। বরং মনে মনে যেন একটু অকারণ ঈর্ষাই বোধ করিতে লাগিল।

আনন্দ বেচারা এত কথা কিছুই জানে না—সে ততক্ষণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিতেছে, বৌদি, এখানে এসে ঘরে বসে থাক্‌লে চলবে না, বেড়াতে হবে তবে স্বাথ্য। সকালে বিকেলে বেড়াতে হবে। চলুন দেখি, বেরিয়ে পড়া যাক্—

সুকুমার কহিল, এখন কোথায় যাবি রে—? বেলা আটটা বাজে যে—

এখানে আবার আটটা কি, এখানে কি আর আফিস আছে? তা ছাড়া আজ হাটবার চল, হাটেই যাওয়া যাক্—। বৌদি, তৈরী হয়ে নিন্—

ইন্দিরা নতমুখে জবাব দিল, আপনারা ঘুরে আসুন, আমি ততক্ষণে বরং রান্নার জোগাড় দেখি—

আনন্দ সজোরে জবাব দিল, এ্যাব্‌সার্ড—এরি মধ্যে রান্নার জোগাড় কি? তা ছাড়া হাট না এলে জোগাড় দেবেনই বা কিসের। চলুন, চলুন, তৈরী হয়ে নিন্।

কিন্তু ইন্দিরা তবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল দেখিয়া আসল কথাটা এতক্ষণে আনন্দের মাথাতে গেল, ও, আসলে আপনার হাটে যেতেই আপত্তি বুঝি। মাই গুডনেস্—একি আপনাদের দেশ, না কলকাতা শহর যে মেয়েরা বাজারে গেলে নিন্দে করবে। এখানে মেয়েদের হাটে যাওয়াই চাল—না গেলেই লোকে অবাক হয়। তা ছাড়া এখানে মেয়েরাই ত বাজার করে। আর বেড়াবার জায়গাই বা এমন কোথায় আছে বলুন যে রোজ দু'বেলা গেলে অরুচি হবে না? তার চেয়ে সকালটা হাটবাজারের জন্যেই রাখুন—

কিন্তু তবু ইন্দিরা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আনন্দ পুনশ্চ কহিল, আচ্ছা, ফর ওআন্স আমাকে বিশ্বাস করুন! সেখানে গিয়ে দেখবেন যে কত সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসেছেন কর্তাদের সঙ্গে—এ যদি মিলিয়ে না পান ত আমাকে যা তা বলবেন বরং। দেখুন না, কেমন মনোরম পথ ধরে নিয়ে যাই। ওই ওধারের ঐ উচু-নীচু মাঠটা পেরিয়ে একটা গোরস্থানের পেছন দিয়ে, পুষ্পিতা মহুয়া গাছের নীচে দিয়ে যেতে যেতে এক সময় দেখবেন যে হাটের কাছে গিয়ে পড়েছেন। পথটি ভারি চমৎকার—চলুন, চলুন!

তাহার আগ্রহকে আর এড়ানো গেল না। ঈষৎ আরক্ত প্রসন্নমুখে ইন্দিরা কাপড় বদ্‌লাইতে গেল; সুকুমারও, আনন্দের সাহচর্য ও চাপল্যে গতকল্যকার মেঘটা কাটিয়া যাইতে পারে মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে আনন্দের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, নে, আফটার অল, তোরই জয়-জয়কার। চল—কোথায় হাটে-বাজারে যাবি!

বাস্তবিকই পথটি ভারি চমৎকার। শেষ পর্যন্ত শহরের পথে পড়িতে হয় বটে, কিন্তু তবু অনেকখানি নির্জন রাস্তায় চলা যায়। নিম গাছ ও মহুয়া গছের ছায়ায় পথটি শীতল ও ফুলের গন্ধে মদির। সেই পথে চলিতে চলিতে আনন্দ যেন আরও প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল। সে যে আপন মনে কত কথাই অনর্গল বকিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। কতক বা ইন্দিরার কানে গেল, কতক বা গেল না, তবু সমস্তটা জড়াইয়া তাহার বেশ ভালই লাগিতেছিল। আলো-ঝলমলে প্রভাত, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, ছায়াশীতল এই পথটি এবং ভ্রমণের আনন্দ সবগুলি মিলিয়া তাহার মনে যেন এক নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল, আর

তাহারই রঙীন অস্পষ্টতায় এই প্রিয়দর্শন যুবকটির অবিশ্রাম গুঞ্জনও ভাল লাগিতেছিল।

পথেই একটা বাঁধানো কুয়া পড়ে, কতকগুলি সাঁওতালী ও হিন্দুস্থানী মেয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া জল তুলিতেছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া ইন্দিরার মনে হইল বা, ইহারা ত বেশ! রেল কোয়ার্টারের বাগানে ফিরিঙ্গীদের ছেলেমেয়েগুলি ছুটা-ছুটি করিতেছে, সেদিকে চাহিয়াও ইন্দিরা চোখ ফিরাইতে পারে না। এ যেন কোন্ এক স্বপ্নরাজ্য, এখানে সবই নূতন, সবই মধুর। এমনটি সে কখনও দেখে নাই—তাই তাহার কাছে সবই ভাল লাগিতেছিল।

আনন্দ কথা কহিতে কহিতে তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি বৌদি, পথটি ভাল না?

ইন্দিরা বেশ একটু জোর দিয়াই কহিল, ভারী চমৎকার।

তাহার কণ্ঠস্বরে যে আবেগ ধ্বনিত হইল তাহা একেবারেই অপরিচিত। সুকুমার বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল আনন্দের উত্তেজনায় ইন্দিরার মুখ আরক্ত, বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত—এ যেন নূতন ইন্দিরা। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, আনন্দ ত বেশ জমাইয়াছে, বাহাদুরী আছে ছোক্‌রার!......

অবশ্য হাটের কাছে আসিয়া ইন্দিরা একটু প্রকৃতিস্থ হইল। লোকের ভীড়ে অসংখ্য লুব্ধদৃষ্টির মধ্যে সঙ্কুচিত না হইয়া উপায়ও ছিল না। সুকুমার মনে করিয়াছিল বাজারের কাছে গিয়া ইন্দিরা ভীড় দেখিলে কিছুতেই ভিতরে যাইতে চাহিবে না; কিন্তু ইন্দিরা মাথায় কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত সে হাটের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িল। অতি শৈশবে বাপের সহিত সে হাটে যাইত, আজ তাহার স্মৃতি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, তবু মনে হইল যেন সেই শৈশবেরই একটা আনন্দের আভাস এতদিন পরে আবার দেখা দিয়াছে—

আনন্দ কহিল, কী বৌদি কিনুন কিছু!

ইন্দিরা স্মিতমুখে জবাব দিল, আসবারই কথা ছিল, কেনবার ত ছিল না—

আনন্দ কহিল, বা, তাই কি হয়। বলুন, কি কিনবেন!

ইন্দিরা লজ্জিতভাবে কহিল, আমি আর কি কিনব বলুন, আপনারা কিনুন, আমি দেখি—

আনন্দ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে হয় না। আপনি হুকুম করুন অন্তত, আমরা কিনতে রাজী আছি।

কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে ইন্দিরা জবাব দিল, যা হুকুম করবো তাই কিনবেন?...দেখবেন, এর পর না বিপদে পড়েন!

কিছু না। আপনি বলুন না, আমি হাটসুদ্ধ কিনে ফেলছি—

অগত্যা ইন্দিরাকেও দুটা-একটা ফরমাস করিতে হইল। সুকুমার দাম দিতে যাইতেছিল আনন্দ কিছুতেই তাহাতে রাজী হইল না, উপরন্তু একরাশ আনাজ ও মাছ কিনিয়া ফেলিল।...

ফিরিবার পথে গাড়ি ভাড়া করা হইল। ফিরিতে ফিরিতে ইন্দিরা কহিল, কিনলেন ত যা মনে এল তাই, ওগুলি কিন্তু সব খেতে হবে। এবেলা, ওবেলা, কাল—যতদিন না শেষ হয়, আমাদের ওখানেই খাবেন!

আনন্দ কি একটা জবাব দিল তাহা সুকুমারের কানে গেল না। সে অবাক হইয়া ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল যে এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়, একদিনের এই সামান্য পরিচয়ে আনন্দ কেমন অনায়াসে ইন্দিরাকে চটুল ও মুখর করিয়া তুলিয়াছে, অথচ সুকুমার শত চেষ্টা করিয়াও সেই পাষাণ প্রতিমাকে এতটুকু উত্তপ্ত করিতে পারে না কেন?...

সুকুমার একটু অন্যমনস্কই হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ি যখন বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন সে সহসা সচেতন হইয়া ভাবিয়া দেখিল কোথায় যেন একটা ঈর্ষার সুরই বাজিতেছে। ছি, ছি, সে কি ছেলেমানুষ হইয়া গেল? ছিঃ!

সে জোর করিয়া আনন্দর কাঁধে একটা চাপড় মারিয়া কি একটা রসিকতা করিয়া উঠিল।

ঠাকুর সঙ্গে আসা সত্ত্বেও ইন্দিরা নিজেই রান্নাঘরে গিয়া রন্ধন কার্যে লাগিয়া গেল। শ্বশুর বাড়িতে স্নেহ যথেষ্ট পাইলেও সম্ভ্রমের খাতিরে সেখানে স্বাধীনতা থাকে খর্ব হইয়া। সহসা এখানে আসিয়া ইন্দিরা সব দিক দিয়াই স্বাধীনতা পাইল। এখানে সে-ই গৃহিণী, তাহার উপর কথা কহিবার কেহ নাই। তা ছাড়া এটা বিদেশ, এখানে এমনিই মনটা চটুল হইয়া উঠে, গতিবিধি হইয়া পড়ে স্বেচ্ছাচারী।

আনন্দও আহারের নিমন্ত্রণ পাইয়া একেবারে জাঁকিয়া বসিল। নিজের বাসা হইতে চাকরকে দিয়া ঢিলা পায়জামা আনাইয়া লইয়া সেখানেই বেশ পরিবর্তন করিল তাহার পর একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া একেবারে রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে ভর করিল। সে একাই বকিয়া যায় অনর্গল, ইন্দিরা স্মিত প্রসন্নমুখে তাহার বকুনি শোনে আর হয়ত মধ্যে মধ্যে একটা মন্তব্য করে। এই পাগল তরুণটিকে তাহার ভালই লাগিতেছিল। ইহার কাছে গম্ভীর হইয়া যেন থাকাই যায় না, যেখানেই থাকে চারিপাশে যেন চটুল আবহাওয়া একটা তৈরী করিয়া লয়।

সুকুমার এত বকিতে পারেও না, তাহার তখন সে রকম মানসিক অবস্থাও নয়। সে তাহার বকুনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল তাহার বিবাহের পূর্বের দিনটির কথা। কেমন অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি ছিল তাহার, এতটা মুখর না হইলেও সে স্ফূর্তিবাজই ছিল। বন্ধুদের লইয়া আনন্দ করিয়া দিন কাটিত, একটানা একটা উৎসবের মত। মিছিমিছি একী করিল সে, একূলও সে পাইল না, ওকূলও গেল!

সহসা তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া আনন্দ ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, লাকী ডগ! এ যে একেবারে অমূল্যরত্ন! জুয়েল! সতীশ বেচারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে!

সতীশের নামটা কানে যাইতেই সুকুমার যেন শিহরিয়া উঠিল। আড়চোখে ইন্দিরার দিকে চাহিয়া দেখিল পরিশ্রমে ও তাপে তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ললাটে সুন্দর স্বেদ-বিন্দু, আনন্দও উত্তেজনায় তাহার সমস্ত দেহ যেন উদ্ভাসিত সেদিকে চাহিলে সমস্ত বাসনা নিমেষে অত্যুগ্র হইয়া ওঠে!... চাহিয়া চাহিয়া সুকুমারের বুকটা জ্বালা করিয়া উঠিল, সে কোন মতে, প্রায় টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

ক্রমশ

সৈনিক

মার্টিন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ—গোপাল ভৌমিক

মিসেস্ মসন্ ভীষণ বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি কোনরকমে আশ্রয়প্রার্থীদের হাত এড়িয়ে এসেছেন —এই অজুহাতে যে তাঁর বাড়িতে একটিমাত্র খালি ঘর—আর সেটাতেও তাঁর এক বোন এসে দীর্ঘদিনের জন্য বাস করবে। আর এখন খৃীস্টমাসের মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁকে একজন সৈন্যকে আশ্রয় দিতে বলা হ'য়েছে; স্টর্টন প্রায়র্সে কি একটা শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের জন্য অনেকগুলো সৈন্য আস্বে—এ সৈন্যটি তাদেরই একজন। তিনি আবার প্রত্যাখ্যান কর্তে চেয়েছিলেন, কিন্তু এবার তাঁর স্বামী মৃদুভাবে জোর দিয়ে বল্লেন যে, তাঁদের এ সৈন্যটিকে রাখ্তেই হবে। "জানই তো হিল্‌হিল্‌ডা," তিনি বল্লেন, "মাত্র চৌদ্দ দিনের জন্য!"

"হ্যাঁ, জর্জ, কিন্তু সৈন্য নয়। আমি সৈন্য রাখতে পারব না। তা' ছাড়া বৃহস্পতিবার খৃীস্টমাস উৎসব।"

"তা'ত বুঝলুম, কিন্তু উপায় নেই। তোমার সৈন্যকে ভয় করার কিছুই নেই। ওত প্রায় সমস্ত দিন শিক্ষাকেন্দ্রেই থাক্‌বে।"

কিন্তু মিসেস্ মসন্ নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। সৈন্যরা বৃহদাকার, রুক্ষ এবং অপরিচ্ছন্ন; তা ছাড়া অতিরিক্ত মদ্যপান করে। তিনি রেড্ লায়নের সামনে তাদের ভারী বুটের শব্দ করতে করতে ভিতরে ঢুক্‌তে এবং বাইরে বেরুতে দেখেছেন; গাঁয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাদের অসম্বদ্ধ গানও শুনেছেন। এদেরই একজন তাঁর সুন্দর খালি ঘরটায় শোবে, একথা ভাবতেও তিনি শিউরে উঠলেন এবং তিনি তখনই বিছানা থেকে ভাল কম্বল ও চাদর সরিয়ে নিয়ে বিছানায় পুরানো কম্বল পেতে দিলেন—পরে এগুলো ধুতে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ভেবে স্থির কর্‌লেন যে, সৈন্যের বিছানায় চাদর পেতে লাভ নেই। তাকে অবশ্য রান্নাঘরে বসেই তাঁদের ঠিকা-ঝি নোরার সঙ্গে খাবার খেতে হবে—আর তার গা ধোয়া এবং দাড়ি কামানোর জন্য পিছনের বাসনপত্র ধোবার ঘরে একটা টিনের পাত্র দিতে হবে।

তবু মিসেস্ মসন্ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর কিংবা নিষ্ঠুর ছিলেন না। দশ বছর আগে এই সুন্দর পুরানো বাড়িটাতে তাঁরা যখন বাস কর্‌তে এসেছিলেন, তখন প্রতিবেশীরা সবাই মিসেস্ মসন্‌কে গম্ভীর ও অনাসক্ত প্রকৃতির ব'লে মনে করেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তারা তাঁর গাম্ভীর্যের নীচে একটা অসন্দিগ্ধ বন্ধুতার বিকাশ দেখেছিল এবং তাঁকে পছন্দ কর্‌তেও সুরু ক'রেছিল—তবে কেউ তাঁকে বুঝে উঠতে পার্‌ত না। তারা জান্‌ত না যে, তাঁর এই বিয়াল্লিশ বছরের দেহের নীচে একটা ভীরু ও সরল সতের বছরের মেয়ের মন আছে—যার অস্তিত্বকে ঘিরে আছে ছোটখাটো ভয়ের জনতা। উষ্ণতা, আর্দ্রতা, ময়লা, জীবাণু, খারাপ ব্যবহার বিবাদ প্রভৃতি সব কিছুকেই তিনি ভয় কর্‌তেন—আনন্দ পেতেন শুধু হৃদয়াবেগের স্তিমিত প্রকাশে। তাঁর সতের বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুতে তিনি গভীর আঘাত পেয়েছিলেন এবং তেইশ বৎসর বয়সে তাঁর চেয়ে সতের বছরের বড় জর্জ মসন্‌কে বিয়ে ক'রে তিনি পিতার অভাব পূর্ণ ক'রেছিলেন।

সোমবার সন্ধ্যায় সৈন্যটির আস্‌বার কথা। এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা এবং এতে তাঁর মানসিক উদ্বেগও কিছুটা কমল, কারণ সন্ধ্যার সময় জর্জ বাড়িতেই থাকেন। তিনিই সৈন্যটিকে অভ্যর্থনা ক'রে তার জন্য যে-সব ব্যবস্থা করা হয়েছে ব'লে দেবেন। তিনি নিজে খুব সম্ভব এটা করতে পারবেন না। যাই হ'ক মনে প্রবল দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি সৈন্যটির আগমন মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রইলেন।

তারপর রবিবার সকালে তাঁর মনে একটা সুন্দর পরিকল্পনার উদয় হ'ল। আগে এ কথাটা মনে পড়ে নি' ভাবাতে তাঁর নিজেকে বোকা ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল। নোরার মা মিসেস্ হেল্‌স্টন ত সৈন্যটিকে আশ্রয় দিতে পারে। তার বাড়িতে কন্যাসহ একটি স্ত্রীলোক থাকত—সে ত আগের সপ্তাহেই চ'লে গেছে—কাজেই সৈনিকটির জন্য তার বাড়িতে জায়গা যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ নোরাকে একথা বল্‌লেন, কিন্তু সে তাঁর সকল আশা উৎপাটিত কর্‌ল। তার ভাই ফ্রেড্ খৃীস্টমাসের ছুটিতে বাড়ি এসেছে, তবে সে বক্সিংয়ের দিন চ'লে যাচ্ছে—তখন হয়ত তার মা সৈন্যটিকে স্থান দিতে পারেন। তিনি সঠিক খবরের জন্য তখনই নোরাকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং উদ্বিগ্ন আশায় অপেক্ষা ক'রে রইলেন। হ্যাঁ, মিসেস্ হেল্‌স্টন সৈন্যটিকে রাখতে সম্মত হ'য়েছেন। মিসেস মসনের বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। এখন তাঁকে মাত্র তিন দিনের জন্য সৈন্যটিকে রাখ্‌তে হবে।

জর্জ রান্নাঘরে সৈন্যটির সঙ্গে কথাবার্তা বলা শেষ ক'রে এসে দেখ্‌তে পেলেন যে, তাঁর স্ত্রী বিবর্ণ মুখে, হাত দুটি জড় ক'রে তাঁদের ছোট্ট ড্রয়িংরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

"বৎসে, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বুঝি ভূত দেখেছ। ব্যাপার কি বলত? আমাদের সৈন্যটির জন্যই কি তোমার এই অবস্থা?"

তাঁর স্ত্রী প্রায় ফিস্ ফিস্ করে জবাব দিলেন: "জর্জ তুমি জানো না, এই বাড়িতে ও থাক্‌বে, একথা ভাবতেও আমার ঘৃণা হয়!"

"হিল্‌ডা, তুমি বড় বাজে বক্‌ছ! সৈন্যটি বেশ সুন্দর তরুণ যুবক—ওর কথাবার্তাও বেশ চমৎকার। তুমি বরং রান্নাঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে দুটো কথা ব'লে এস—তবেই তোমার ভয় দূর হ'য়ে যাবে।"

এ যুক্তিতে তিনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন। না, না, এটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আদৌ তার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না। সেই বেশ ভাল—মিসেস্ হেল্‌স্টন্ শুক্রবার তাকে নিতে রাজী হ'য়েছেন।

"সত্যি হিল্‌ডা! কিন্তু এটা তোমার ভারী অন্যায়!"

"মোটেই না, মিসেস হেল্‌স্টন্ তাকে পেলে আনন্দিতই হবে। আমি ঠিক জানি টাকা পেলে সে খুবই খুসী হবে!"

কাজেই মিসেস্ মসন্ সেদিন রাত্রে এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত এই অনাহূত অতিথিটির মুখ পর্যন্ত দর্শন করলেন না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তার উপস্থিতির ফলে তাঁর বাড়ির কোন পরিবর্তনই হয় নি; তিনি ত তার গলা শোনেন নি বললেই হয়; ইতিপূর্বেই তাঁর ভয় কমে যাওয়া সুরু হ'য়েছিল এবং অনেকক্ষণ ধরে' তিনি তাঁর বাড়িতে সৈন্যটির অস্তিত্বের কথাই ভুলে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সন্ধ্যার দিকে যখন সামান্য কিছু বাজার ক'রে ফিরলেন, তখন তার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন এবং পার্শ্বেলগুলো নোরাকে দেবার জন্য তিনি সোজা রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হ'লেন। রান্নাঘরের দরজা অর্ধেকটা খোলা ছিল, তিনি কিছু না ভেবেই ভিতরে ঢুকে গেলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই থমকে দাঁড়ালেন। রান্নাঘরের খাবার টেবিলে সৈন্যটি ঠিক তাঁরই দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। সেই চকিত একটিমাত্র মুহূর্তে সমস্ত দৃশ্যটি তাঁর মনের উপর অসাধারণ উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত হ'য়ে গেল। তাঁর সামনে ব'সে আছে বৃহৎ ঢিলা খাকীর পোষাকপরা সৈনিকের মূর্তি। টেবিলে তার সামনে আছে এক কাপ চা আর একটা প্লেট—তার পাশে প'ড়ে আছে একটা খোলা পকেট কেস্। তার বাঁ পাশে নোরা দাঁড়িয়ে—তার হাতে একটা চতুষ্কোণ কাগজ,—একটা ফোটোগ্রাফ্; আর সৈন্যটি একদিকে ঝুঁকে ডান হাতটি বুকের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে; আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ফোটোটা, যেন কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে।

এ সমস্তই তিনি এক নিমিষে দেখে নিলেন—তবু এর মধ্যেই কিন্তু সে দৃশ্যের ঔজ্জ্বল্য নিহিত ছিল না; তার বিবর্ণ কাদা রঙের সামরিক পোষাক, আর তার কালো চকচকে চুল, ভুরু এবং ছাদ থেকে ঝোলানো আলোর নরম গোলাপী রঙে উদ্ভাসিত তার মুখের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, তারই মধ্যে নিহিত ছিল এ দৃশ্যের ঔজ্জ্বল্য। এ ছাড়াও তার ভঙ্গীতে এবং মুখভাবে ছিল একটা বালকসুলভ একাগ্রতা, যেটা গভীরভাবে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল এবং তাঁর মনের উপর এই দৃশ্যটিকে চিরতরে মুদ্রিত ক'রে দিয়ে গেল। মাত্র একটি মুহূর্তের ব্যাপার—অথচ কোনদিন এটা ভোলা যাবে না।

পর মুহূর্তে নোরা এবং যুবকটি তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে তাঁর দিকে তাকাল—নোরার চোখে বিরত দৃষ্টি, আর ওর ধূসর চোখ দুটিতে ধীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। তারপর তিনি যে কে, এটা অনুমান করতে পেরে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

"ওঃ, গুড্ আফ্টারনুন" মিসেস মসন বল্লেন; তিনি ভিতরে ভিতরে কাঁপছিলেন—অথচ বাইরে উদাসীন। "নোরা, আমি তোমাকে পার্শ্বেলগুলো দিতে এসেছিলুম।"

সে ঝুড়িটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখ্ল। কিন্তু নোরার মনে হ'ল যে, অবস্থাটা বুঝিয়ে বলা দরকার। তখনও তার হাতে সেই ছোট ফোটো-গ্রাফটা ছিল; সে মিসেস মসনকে ফোটোটা দিয়ে বল্ল ঃ "ম্যাডাম্, ও আমাকে ট্যাংকের ছবি দেখাচ্ছিল!"

মিসেস্ মসন্ ফোটোটা নিয়ে সেই ভীষণ যন্ত্রটার দিকে তাকালেন; তার উপরে এবং পাশে সৈন্যদের দেহ সাজানো। "কি ভয়ংকর দেখ্তে" তিনি মন্তব্য করলেন।

একটু মৃদু হেসে যুবকটি বল্ল ঃ "বুঝতে পারলে ওসব যন্ত্র একেবারেই নিরীহ—অবশ্য, আপনি যদি শত্রু হ'ন, তবে এসব যন্ত্র ভয়ংকর।"

মিসেস্ মসন্ ফোটোটা ফিরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে ফিরলেন। মুহূর্তের ঘটনাটি তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তিনি পালিয়ে যাবার একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুভব কর্লেন। বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি মেয়েটির দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বল্লেন ঃ "আশা করি নোরা, ওকে ভাল ক'রে চা খাওয়াচ্ছ!"

তাঁর ধারণা এবং তার আসল স্বরূপের মধ্যে যে আশ্চর্য তফাৎ, সেইটাই তাঁকে বিস্মিত এবং অভিভূত ক'রেছিল। সেদিন বাকী সময়টা এই প্রথম দর্শনই তাঁর মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল—তার চকচকে কালো চুল, বিকৃত কাদা-রঙের খাকীর উপরে ফুটন্ত ফুলের মত তার মুখের মৃদু গোলাপী আভা! আশ্চর্য সুস্পষ্টতার সঙ্গে তিনি তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে তার মূর্তি দেখ্তে পাচ্ছিলেন—তার কপাল, গাল এবং ঘাড়ের সূক্ষ্ম গড়ন, সুন্দররূপে আঁচ্ড়ানো কালো চুলের ঢেউয়ে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোর সোনালী রেখা।

তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে পরিহাস ক'রে তিনি তখনও সৈন্যটিকে দেখেছেন কি না জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ", স্ত্রী উদাসীনভাবে জবাব দিলেন, "আমি রান্নাঘরে তাকে দেখেছিলাম। দেখে তো বেশ ভালই মনে হ'ল।"

"তবে তুমি আর এখন ভীত নও?"

"না, না, আমি আর ভীত নই।" অথচ যে মুহূর্তে তিনি একথা বল্লেন, সেই মুহূর্তে বুঝ্লেন যে, একথা সত্য নয়। তখনও তাঁর ভয় ছিল, তবে আগের মত নয়। সেই অতর্কিত প্রথম পরিচয়ের ধাক্কাই তাঁকে এখন ভীত ক'রে তুলেছিল।—এই পরিচয় তাঁকে এতটা মুগ্ধ ক'রেছিল ব'লেই তিনি এত ভয় পেয়েছিলেন। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেও তিনি আগের দিনের মতই অনুভব করলেন—পীড়াদায়ক স্বপ্নের মত তিনি এই ধাক্কাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। অথচ সে এই বাড়িতেই আছে, এ চিন্তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে পুলকিত ক'রে তুল্লো। তিনি বিস্মিত হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, ও কখন সামরিক শিক্ষা নিতে যায়। ওর যাবার আগে তিনি কি একবার তার দেখা পাবেন না?

প্রাতরাশের পর জর্জ যখন ট্রেন ধরতে চ'লে গেলেন এবং নোরা যখন বাসনপত্র ধোবার ঘরে ব্যস্ত ছিল, তখন তিনি একবার খালি ঘরটায় গেলেন। সে একটি পুরাণো কম্বল পরিপাটি-রূপে গদির উপর বিছিয়ে নিয়েছিল, বাকী কম্বলগুলো সুন্দর-রূপে ভাঁজ ক'রে রেখে দিয়েছিল বিছানার নীচে।। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে, সরিয়ে রাখা চাদর এবং কম্বলগুলো বের করলেন এবং ভাল ক'রে বিছানাটা করলেন। সেদিন খৃীস্টমাসের সন্ধ্যা; মসন্ দুপুরের ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন—

তারপর মধ্যাহ্নভোজের পর তাঁরা দীর্ঘ-ভ্রমণের জন্য বেরুলেন। আকাশে সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণ, বাতাস আশ্চর্যরকম মৃদু—তাঁর মুখে বাতাসের মৃদু মানবীয় স্পর্শ; পাহাড়, মাঠ এবং আকাশের সূক্ষ্ম কোমল রঙ, বেড়ার ফুলের ক্ষীণ সুরভি, খাল এবং সোঁদা পথ—এইসব মিলে তাঁর মনে হ'ল এ যেন বসন্তের পূর্বাভাষ। তিনি স্বামীর পাশে নীরব ঔদাসীন্যে হাঁটতে লাগলেন বটে—তাঁর সারা মন জুড়ে রইল একটা কল্পিত নতুন চেতনা। তিনি বৃথাই এটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করলেন। এটা কি কোন অর্ধ-বিস্মৃত ছুটির দিনের স্মৃতি না কোন স্বপ্নের স্মৃতি যার সবই হারিয়ে গেছে—বেঁচে আছে শুধু অনুভূতি? তিনি বুঝতে পারছিলেন না। যতবার তিনি জবাবের জন্য নিজের মন হাতড়াতে লাগলেন, ততবারই সেই সৈন্যটির মূর্তি, তার দেহভঙ্গী এবং তার মুখের অপরিহার্য আবেদন তাঁর সামনে ভাসতে লাগল এবং তাঁর চিন্তাধারাকে বিশৃঙ্খল ক'রে দিল।

তাঁরা যখন বাসায় ফিরে এলেন, তখন সূর্য ডুবছিল—কালো এবং স্টীল ধূসর গরাদের পিছনে কমলা রঙের শিখা। সামনের দরজা দিয়ে তাঁরা একটা অন্ধ গুহায় ঢুকলেন যেন, কিন্তু হলের মধ্যেও ছড়িয়ে প'ড়েছিল আলোর তীর। ড্রয়িং রুম্ থেকে এই আলোর তীর এসে প'ড়েছিল; ওঘরে কি যেন নড়ানোর শব্দ—নিশ্চয়ই নোরা চায়ের টেবিল ঠিক করছিল। দোতালায় যাবার পথে নোরাকে কিছু আদেশ করার জন্য মিসেস্ মসন্ ঘরের ভিতরে তাকালেন—আবার সেই সৈন্যটির সঙ্গে দেখা, তার সার্টের হাতা গুটানো—তাঁর দিকে পিছন ফিরে সে চুল্লীর পাশে অবনত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দরজার হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন; তাঁর পদশব্দে মুখ ঘুরিয়ে সৈন্যটি লজ্জিতভাবে মৃদু হাস্‌ল। "আমি এই কয়লার আধারটি পূর্ণ করছিলাম" সে বলল।

তিনি ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর কথা বলারও শক্তি ছিল না, নড়বারও ক্ষমতা ছিল না। অবশেষে তিনি সচেষ্ট ব্যগ্রতায় জোর ক'রে জবাব দিলেন—নিজের গলার কঠিন ঔদাসীন্যে নিজেই নিরাশ হ'য়ে গেলেন। "সত্যি, এটা তোমার খুব দয়া। কিন্তু তুমি কষ্ট করবে কেন?" তিনি পিছনে সিঁড়িতে তাঁর স্বামীর পদশব্দ শুনতে পেলেন—তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে হল ঘরে গিয়ে ঢুকলেন; সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তিনি নীচে দুটি পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনতে পেলেন।

তিনি বৈঠকখানায় ফিরে এলে তাঁর স্বামী রহস্যজনক হাসি হেসে তাঁকে অভিনন্দিত করলেনঃ "সত্যি হিলডা, বৈঠকখানায় ওর দেখা পাওয়া তোমার পক্ষে কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু ছেলেটি যে নিরীহ ভাল মানুষ একথা তুমি স্বীকার করতে বাধ্য!"

তিনি সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন। "হাঁ, ও কয়লার পাত্রে কয়লা বোঝাই ক'রে নোরাকে সাহায্য করছিল!"

রাত্রিতে খাবারের টেবিলে তিনি নীরবে চিন্তিত মনে খেতে লাগলেন—একবার চোখ তুলে তিনি দেখলেন যে, জর্জ তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। "হিলডা, তুমি কি ভাবছ?"

"আমি ভাবছি যে এই শীতকালটা যেন বসন্তকালের মত মনে হ'চ্ছে!" সৈন্যটিকে বৈঠকখানা ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে তাকে এক গ্লাস পোর্ট খেতে দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর মত কি এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যই যে তিনি এতক্ষণ মনে মনে আন্দোলন করছিলেন একথা তিনি তাঁকে বলতে পারলেন না। কিন্তু না, এমন কথা বলার সাহস তাঁর নেই। তাঁর গলার স্বর মুখের ভাবই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু পরে তাঁরা যখন বৈঠকখানায় ব'সেছিলেন, তখন তাঁর মনে পড়ল যে কালকের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কাল খ্রীস্ট মাসের উৎসব ব'লে নোরা সকালের কাজ সেরেই বাড়ি চ'লে যাবে এবং বিকালের চা-খাওয়া শেষ হবার পূর্বে আর ফিরবে না। হয়ত সৈন্যটিরও কাল ছুটি—কাজেই তার দুপুরের খাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

"জর্জ, তোমার কি মনে হয় কাল সৈন্যটির ছুটি?"

"কাল খ্রীস্ট মাস উৎসব ত? ওঃ নিশ্চয়ই, কাল তার ছুটি!"

"তবে ত সে এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আসবে।"

তাত আসবেই—কিন্তু নোরা ত থাকবে না! তুমি কি কোন প্রকারে মুখ বন্ধ ক'রে আমাদের সঙ্গে তার খাবার ব্যবস্থাটা ক'রে দিতে পার না? বেচারী ছেলেটি একা রান্না ঘরে খৃস্ট মাস ভোজ খাবে এ শাস্তি তুমি বোধ হয় তাকে দিতে পার না!"

আঃ কি আরাম! তিনি নিজেই তাঁর হ'য়ে কথাটা ব'লেছেন!

"জর্জ, তুমি এখনই গিয়ে তাকে এ কথা ব'লে রাখবে না?"

"হাঁ, তাই বোধ হয় ভাল হবে!"

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিসেস্ মসন্ কোলের উপর হাত দুটি জড় ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষা চেয়ারে হেলান দিয়ে প'ড়ে রইলেন। নিশ্চয়ই তারা খ্রীস্ট মাস উৎসবের দিন সৈন্যদের দিয়ে কাজ করায় না। টেবিলে জর্জ এবং তাঁর মধ্যের আসনটিতে সৈন্যটি ব'সে আছে—তিনি মনে মনে এই ছবি কল্পনা করলেন; তার সেই অপ্রতি-রোধ্য ভঙ্গী এবং মুখের ভাব নিয়ে এবার সে আর নোরার দিকে ঝুঁকে নেই—ঝুঁকে আছে তাঁরই দিকে। তারপরে হয়ত সে তাঁকে টেবিল পরিষ্কার করা এবং ধোয়ার কাজে সাহায্য করবে। বাসন-পত্র ধোয়ার ঘরে জর্জও থাকবে না, নোরাও থাকবে না—সেখানে বাসন ধুতে ধুতে তার সঙ্গে কথা বলা সহজ হবে। তিনি মনে মনে তাঁদের কথা বলার ছবিও আঁকলেন—প্রথমে তাঁদের আলাপে থাকবে সলজ্জ ভাব—পরে আসবে পরিচয়ের গাঢ়তা। তিনি তাকে তার বাড়ি এবং বাপমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন! হয়ত তিনি সাহস ক'রে তার নামও জিজ্ঞাসা ক'রে বসবেন। তাঁর চিন্তায় তিনি এত গভীরভাবে নিমগ্ন হ'য়ে গেছলেন যে, তিনি যে বৈঠকখানায় ব'সেছিলেন, এ চেতনাও তাঁর ছিল না। হঠাৎ জর্জের প্রত্যাগমনে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

"হাঁ, কাল তার ছুটি বটে। তবে তুমি শুনে খুসী হবে যে, কাল হেল্‌স্টনদের খ্রীস্ট মাস ভোজে সে যোগ দিচ্ছে।

থাক্ ভালই হ'য়েছে—আমাদের সঙ্গে খেতে সে হয়ত বিব্রত বোধ করত!"

একখণ্ড পাথরের মত তাঁর হৃদয়টা যেন ধপ্ ক'রে নীচে প'ড়ে গেল ; তিনি আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মর্মর পাথরে গড়া মূর্তির মত ব'সে রইলেন। তারপর তাঁর ঠোঁট দুটির মাঝের ফাঁক সংকীর্ণ হ'য়ে এল—রাগে মুখটা হ'য়ে উঠল লাল। "সে যখন আমাদের বাড়িতে আছে, তখন মিসেস্ হেল্স্টনের তাকে নিমন্ত্রণ করার কি অধিকার আছে আমি ত বুঝতে পার্ছি না!" "শোন হিল্ডা। তাতে কি হ'য়েছে? সে ত আর আমাদের বন্ধু নয়। আর তা ছাড়া তুমি ত পরশুদিন তাকে চিরদিনের জন্য হেল্স্টনদের ওখানেই পাঠানোর ব্যবস্থা ক'রেছ—করনি কি?"

তিনি ভীত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। "পরশুদিন? তাই ক'রেছি কি?" তিনি সে কথা ভুলেই গেছিলেন।

দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি অস্পষ্টভাবে কি যেন বল্লেন।

"প্রিয়তমে, তুমি কি বল্ছ?"

"আমার মনে হয় তার যাওয়ার দরকার নেই। তোমার কি মনে হয়?"

"তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর হিল্ডা! জানোইত আমার ইচ্ছা ছিল যে ও আমাদের বাড়িতেই থাকে!"

"ওর যাবার দরকার নেই, একথা ওকে বল্ব?"

"তুমি যদি ভাল বোঝ নিশ্চয়ই বল্বে। কাল সকালে তাকে একথা বল্তে পার!"

"জর্জ, তুমি বল্বে না?"

তিনি কিছুটা কৌতুক এবং কিছুটা অধৈর্যে চেয়ারে ঘুরে বস্লেন।

"দেখ, তুমি যদি এখনও ভয় পাও, তবে ও হেল্স্টনদের ওখানেই যাক্; আর যদি ভয় ভেঙে থাকে, তবে ওকে থাক্তে বল। এটা তোমার কাজ—তোমাদের দু'জনের মধ্যে সর্বদা আমি কেন যে দৌত্য-কার্য কর্ব সে কথা ত আমি ভেবে পাই না।"

তিনি কোন উত্তর দিলেন না—কিছুক্ষণ পরে টেবিলে তাঁর কনুইয়ের কাছ থেকে একখানা বই নিয়ে খুল্লেন। কিন্তু তিনি বই পড়ছিলেন না। তিনি নিজের মনে মনে বল্লেন, যাই হোক্ না কেন তাকে থাক্তেই হবে ; কাল সকালে তাঁকে তাঁর নিজেরই একথা বল্তে হবে যে, তার যাওয়া হবে না। এই অগ্নি পরীক্ষার কথা ভেবে তিনি ভয় পেলেন। বিছানায় শুয়ে এই কথা ভেবে ভেবে তাঁর ঘুম হ'ল না ; পরদিন সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠে দেখ্লেন যে, তাঁর মনে সেই একমাত্র চিন্তা। তিনি তাকে কি বল্বেন, কেমন ক'রে কথা বল্বেন যাতে সে থাকতে বাধ্য হবে? নোরাকে ভোজনালয়ে ব্যস্ত দেখে তিনি যখন রান্নাঘরে গেলেন, তখন তাঁর মন শূন্য। তাঁর মনে হ'ল তিনি যেন ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

প্রথম দর্শনের মত এবারও সে রান্নাঘরের টেবিলে এক কাপ চা সামনে নিয়ে ব'সেছিল। তাঁকে দেখে সে চকিতে চট্পট্ উঠে দাঁড়াল। "গুড মর্নিং, আপনার শুভ খৃষ্ট মাস কামনা করি!"

তার স্মৃতির সঙ্গে তুলনায় উজ্জ্বলতর এই বাস্তব দর্শন তাঁকে অভিভূত ক'রেছিল। নিজেকে স্থির রাখার জন্য তিনি টেবিলে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে চোখ নামালেন—তার চোখের সোজা নির্মল দৃষ্টি সহ্য কর্বার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। "ধন্যবাদ", তিনি মৃদুস্বরে বল্লেন, "তোমার বিষয়েও আমি এই কামনাই করি!"

তিনি থাম্লেন—পরে আগে বার বার এমনই ঘটেছে এই কথা ভেবে তিনি সুরু কর্লেনঃ "আমি বল্তে এসেছি যে...... যে তুমি কাল চ'লে যাও এটা আমরা চাই না। আমরা তোমাকে এখানেই থাক্তে বলি!"

তার চোখ অন্ধকার হ'য়ে এল—তার কালো ভ্রূদুটোও কিছুটা কুঞ্চিত হ'ল। "ওঃ আপনাদের বহু ধন্যবাদ......কিন্তু ......কিন্তু......মিসেস্ হেল্স্টনের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা ঠিক হ'য়ে গেছে!"

"তাতে কিছু যাবে আস্বে না," তিনি বল্লেন, "আমি মিসেস হেল্স্টনকে চিঠি লিখ্ব......তবেই......"

সে একটা হাত কিঞ্চিৎ নাড়ল। "আমার চ'লে যাওয়াই ভাল। এতে সবারই সুবিধা হবে। এখানে আমি আপনাদের অসুবিধার কারণ হবো না—তা ছাড়া ওখানে মিসেস্ হেল্স্টনের অনেক কাজ আমি কর্তে পার্ব। জানেন ত, কাল তাঁর ছেলেটি চ'লে যাচ্ছে!"

"কিন্তু তুমি ত আমাদের কোন অসুবিধাই কর্ছ না" তিনি কম্পিত স্বরে বল্লেন, "এমন কথা তুমি ভেবো না!"

দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল—তার মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি।

তিনি তার আরও কথা শোনার জন্য অপেক্ষা কর্ছিলেন, কিন্তু তার কথা শেষ হ'য়ে গিয়েছিল।

"তবে তুমি থাক্বে?" তিনি শুকনো ঠোঁটে মৃদু স্বরে বল্লেন।

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে তবে আমার যাওয়াই ভাল।"

"তোমার কি যেতেই হবে? তুমি চ'লে যেতেই চাও?"

"আজ্ঞে হাঁ!"

তার মুখে রক্তিমাভা—তার চোখ দুটি টেবিলের দিকে নিবদ্ধ। নীরবে দু'জন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। "হয়ত......" তিনি বল্তে সুরু কর্লেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল এবং তিনি তাড়াতাড়ি ক'রে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হল্ঘরে তিনি দেখ্লেন যে, নোরা এক বোঝা ডিস্ পেয়ালা নিয়ে যাচ্ছিল খাজারের ঘর থেকে। তিনি তাড়াতাড়ি ক'রে পাশ কাটিয়ে দোতালায় শোবার ঘরে গেলেন। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তিনি দৌড়িয়ে গিয়ে বিছানায় আছ্ড়ে পড়লেন ; তারপর বিছানায় মুখ গুঁজে নীরবে কাঁদিতে লাগলেন।*

---

* প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক মার্টিন আর্মস্ট্রং-এর The Soldier গল্পের অনুবাদ।

পশুপালিত মানুষ

ভবানী পাঠক

রোমনগরীর প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাসের জীবন সম্বন্ধে এক বিচিত্র উপাখ্যান আছে। রোমুলাস এবং রেমাস—এই দুই যমজ ভ্রাতা যখন নিতান্ত শিশু তখন তাদের টাইবার নদীতে একটি ডোঙ্গায় ভাসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ডোঙ্গা ভেসে ভেসে একটা জলা জায়গায় এসে ঠেকে। এই শিশু দুটিকে এক নেকড়ে বাঘিনী নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করতে থাকে। তারপর কিছু বড় হ'লে এক মেষপালকের পত্নী ছেলে দুটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে পালন করতে থাকে। এই রোমুলাস বড় হয়ে একটি রাজ্যের পত্তন করে এবং রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করে।

> Come, O poor Babe
> Some powerful spirits
> Instruct the Kites
> To be thy nurses,
> Wolves, and Bears they say



> Casting their Savageness
> Aside have done
> Like offices of pity.

পশুপালিত মানুষের কথা প্রত্যেক উপকথায় কিছু না কিছু পাওয়া যায়। উপকথা এবং বাস্তবে অবশ্য অনেক তফাৎ, তবে সত্যিকারের এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে যা থেকে ঐ উপকথার মূল প্রেরণা তৈরী হয়েছে।

জরথুস্ত্রের জীবনেও এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। একটি দুষ্ট লোক শিশু জরথুস্ত্রকে তার বাপ-মার অজ্ঞাতসারে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই লোকটির কেমন ধারণা ও বিশ্বাস হয়েছিল যে, ঐ শিশু বড় হয়ে তাদের দুষ্কর্ম সাধনায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এই দুষ্ট ব্যক্তি ও তার অন্যান্য সাথীরা সকলে মিলে শিশুটিকে একটি নেকড়ে বাঘের গুহার কাছে ফেলে রেখে আসে। সে সময় গুহাতে নেকড়ে বা নেকড়েনী কেউ ছিল না। শুধু ছিল তাদের বাচ্চা কয়টি। লোকগুলি বাচ্চাগুলিকে মেরে ফেলে। তারা মনে করেছিল মৃত বাচ্চা দেখতে পেয়ে নেকড়ে দম্পতি এমনই ক্রুদ্ধ হবে যে প্রতিহিংসার বশে শিশু জরথুস্ত্রকে মেরে ফেলবে। উপকথার ধরণ অবশ্য এই রকম। শিশুটিকে গলা টিপে না মেরে ফেলে তারা এতটা ঝঞ্ঝাট কেন করতে গেল, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। যাই হোক, নেকড়েনী কিন্তু শিশু জরথুস্ত্রকে মেরে খেয়ে ফেলে নি। বরং তাকে পোষ্যপুত্র হিসাবেই গ্রহণ করে এবং নিজের স্তন্যদানে লালন পালন করতে থাকে। এর অনেকদিন পর জরথুস্ত্রের মাতা পুনরায় তার শিশুর সন্ধান পেয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

মানুষের শিশুর ওপর নেকড়েদের একটা সহজ অপত্যস্নেহ আছে, অনেকের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত। কবি সেক্সপীয়াব তাঁর উইণ্টার্স টেলস্ (Winter's Tales) নামক নাটকে অ্যান্টিগোনাসের মুখে বলিয়েছেন ঃ—

আমাদের পুরাণে শকুন্তলার কথা প্রায় সকলেই পড়েছেন। মা মেনকা সদ্যোজাত শিশু কন্যা শকুন্তলাকে এক জায়গায় ফেলে রেখে দেয়। সেই অসহায় শিশুকে পক্ষিণী-মাতার দল তাকে লালন পালন করে।

উপাখ্যানের কথা বাদ দিলেও ভারতবর্ষের কোন জায়গায় বন্য পশু পালিত মানুষের সন্তানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্যাপ্টেন ইগার্টনের লিখিত দিনপঞ্জী থেকে একটি ঘটনা Annals and Magezine of Natural History নামক পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে জানা যায় ঃ—"অযোধ্যার রাজার দু'জন ঘোড়-সওয়ার গোমতী নদীর ধার দিয়ে যাবার সময় তিনটি বুনো জন্তুকে স্রোতে জল খেতে দেখতে পায়। দুটি জন্তুকে দেখেই বোঝা গেল তারা নেকড়ে। কিন্তু অপরটি যে কোন্ জন্তু তা ঠিক বোঝা গেল না। ঘোড় সওয়ার দু'জন জন্তু তিনটিকে আটক করে ধরে ফেলে। তারা বিস্মিত হয়ে দেখে তাদের মধ্যে তৃতীয়টি জন্তু নয়, একটি মানুষ। এই জানোয়ারের মত বালকটিকে তারা লক্ষ্ণৌয়ে নিয়ে আসে। ধরবার সময় বালকটি তাদের কামড়ে খিমচে বাধা দেবার চেষ্টা

করেছিল। বালকটি চতুষ্পদ জন্তুর মত হাঁটতো আর মানুষের মত কোন বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের মিঃ বল 'Jungle Life in India' নামে ১৮৮০ সনে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে বন্য পশুর স্নেহে যত্নে ও অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত কতগুলি মানুষের কথা পাওয়া যায়। একজন তশীলদার কোন এক গ্রামে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে ফিরবার পথে দেখতে পায়, এক নেকড়েনী সঙ্গে তিনটে বাচ্চা ও একটি মানুষের বাচ্চা নিয়ে সদলে যাচ্ছে। সেপাইটিকে দেখে নেকড়েনী তার সন্তানদল নিয়ে একটি গর্তে ঢুকে পড়ে। গ্রামের লোকজনের সাহায্যে ঐ সেপাই মানুষের



বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে। এই বাচ্চাটিও কামড়ে খিমচে যথেষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু তাকে মানুষের ছেলের মত কাঁদতে দেখা যায় নি। লোকালয়ে নিয়ে আসার পর এই ছেলেটির আচরণে পশুত্ব বদলে যায় নি। সে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। ছোট ছেলে মেয়ে দেখলে লাফিয়ে থাবা তুলে আক্রমণ করতে যেত। বয়স্ক মানুষকে দেখে অবশ্য খুব ভয় করতো। রান্না খাবার সে খেত না। কাঁচা মাংস খাওয়া এবং হাড় চিবানো তার বড় প্রিয় ছিল। ছেলেটিকে কাপড় পরিয়ে দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিত। কথা শেখাবার ও বলাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু চাপা গর্জন আর হুঙ্কার ছাড়া সে অন্য কোন আওয়াজ করে নি। এই সভ্য আবহাওয়া ছেলেটির ধাতে সইল না। কিছুদিন পরেই মারা যায়।

ঐ পুস্তকে আর একটি ঘটনা পাওয়া যায়। এক চাষী দম্পতি ক্ষেতের গম কাটছিল। তাদের শিশু ছেলেটিকে নিকটেই আলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল। এক নেকড়েনী ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ছয় বছর পরে ছেলেটির আবার হদিস পাওয়া যায়—এক নেকড়েনীর সঙ্গে জঙ্গলের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটির মা হাঁটুতে পোড়া ঘায়ের দাগ দেখে নিজের ছেলে বলে চিনতে পারে।

সেকেন্দ্রার অনাথাশ্রমে দুইটি নেকড়ে পালিত বালককে উদ্ধার করে এনে রাখা হয়েছিল। এরা কিন্তু কিছুতেই মানুষের মত স্বভাব আয়ত্ত করতে পারে নি। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে একেবারেই মিশতে চাইতো না। বরং তাদের ভিন্ন জীব মনে করে ভয়ে ঘরের কোণে আড়ালে লুকিয়ে পড়তো। রাগ করলে কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে গেঙাতো। এরা বেশী দিন বাঁচে নি।

আর একটি ছেলের কথা জানা যায়—সেও নেকড়ের দ্বারা পালিত হয়েছিল। এর বয়স ১৩।১৪ বছর। একেও কথা বলতে শেখাতে পারা যায় নি। কিছু কিছু কাজকর্ম করানো যেত মাত্র।

পুরাতাত্ত্বিক স্যার জীবনজী মোদী সেকেন্দ্রা মিশন অনাথালয়ে একটি নেকড়ে পালিত মানুষ দেখেছিলেন। একে ছেলে বেলায় এক গুহা থেকে বুলন্দসরের ম্যাজিস্ট্রেট উদ্ধার করেছিলেন। ছেলেটি প্রথমে একেবারে জানোয়ারের মত ছিল। কিছু দিন পরে অভ্যাস পরিবর্তন করতে থাকে এবং যুবক বয়সে উন্নীত হয়। কথা ও ভাষা শিক্ষা তার দ্বারা হয় নি। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী করে সে তার মনোভাব প্রকাশ করতো। চুরুট খেতেও শিখেছিল এবং পয়সা পেলে খাবার কিনে খাবার অভ্যাস অর্জন করেছিল।

সিনেমাতে টার্জানের জীবন আখ্যায়িকা অনেকে দেখেছেন। গরিলা পালিত শ্বেতাঙ্গ শিশু টার্জান আবার একেবারে পুরো সুসভ্য সাহেব হয়ে গেল, ছবিতে এইরকম দেখানো হয়েছে। এটা সম্ভব কি না, তাই প্রশ্নের বিষয়। নেকড়ে পালিত মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে তাদের পক্ষে পুরোদস্তুর মানুষ হওয়া আর সম্ভব হয় নি।

ভারতবর্ষেই নেকড়ে পালিত মানুষের কাহিনী বেশী শোনা যায়। আফ্রিকা প্রভৃতি অরণ্যসঙ্কুল দেশে নানা বিচিত্র রকমের জীবজন্তুর আশ্রয়। সেখানেও জন্তুপালিত মানুষ পাওয়া গেছে। আফ্রিকার অন্তরীপ প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একবার একদল শিকারী একটি বেবুনের দলের সন্ধান পায়। গুলী চালানো মাত্র বেবুনগুলি দ্রুত পালিয়ে যায়, শুধু একটি বেবুন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুব আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে; তার পায়ে গুলী লেগেছিল। শিকারীরা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে এবং আশ্চর্য হয়ে দেখে যে সেটি একটি মানুষ।

এই মানুষবেবুনটিকে বন্দী করা সহজে হয় নি। শিকারীদের সঙ্গে সে অনেকক্ষণ লড়াই করে। তারপর তাকে শহরে নিয়ে আসা হয়। শৈশব অবস্থাতেই এক কাফ্রী গৃহস্থের

(শেষাংশ ৪৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুপ্রভাত

শ্রীভুপেন্দ্র মজুমদার

আর আর দশজনের বেলায় যা হয়ে আসছে, অতীশ সান্যালের ভাগ্যেও তাই হলো। অর্থাৎ নূতন কিছু নয়। প্রথম চোখের দেখা, তারপর মুখের কথা—তারি মাঝে মাঝে অনুপ্রাসের ভিত্ গাঁথা। এর পর সামান্য একটু বিরাম ঃ বিরামের পরই মনের সাড়া—মানে প্রেম। বয়সের যা ধর্ম, অতীশ একেবারে গভীরভাবে গীতা ঘোষকে ভালবেসে ফেললে। গীতাও কার্পণ্য করেনি। অতীশকে সে ভালবাসার হাড়িকাঠে ফেলে ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ করে তুলতে লাগল। পরিণামে বেচারা অতীশ মনের ওজন হারিয়ে ফেলে সরাসরি গীতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে। গীতা উত্তর জানালে, বাবার কাছে জিজ্ঞাসা কর।

—কিন্তু তোমার বাবা যদি রাজী না হন?

কৃত্রিম চিন্তিত মুখে বললে গীতা, তবে তো মুস্কিলই হবে দেখতে পাচ্ছি!

অতীশ অল্পেতেই সমাধানের সূত্র হারিয়ে ফেলে বললে, ব্যস্ তবে এখানেই ইতি?

—তাই তো দেখছি!

অতীশ ক্ষেপে উঠে বললে, এখন তো তুমি তাই দেখবে। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া! প্রেম করবার বেলায় বাবার মত নিয়েছিলে?

গীতা চোখ পাকিয়ে বললে, তোমাকে দেখে মত নেওয়ার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তবে কলেজে যখন পড়তে গিয়েছিলাম, বাবা তো আর ডেকে বলে দেননি—'ওরে দেখিস্ মা, কক্ষণো ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিসনি, ওরা কিন্তু আলাপ করলেই প্রেম করে ফেলে।' বলেন নি যখন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, ওতে বাবার আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে—বাপ্স্, আমি একেবারে নির্মাল্য তুলে ছুঁড়ে দোব কি দুচোখ বন্ধ করে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বো দেবতার পায়ে।

অতীশ রহস্যটা উপভোগ করলে না। বললে, তবে মনে হচ্ছে যেন এটা একা আমারই দায়! একটু আগে বললেই হ'ত।

—বারে, একটু কেন ঢের আগেই তো বললাম। বিয়ের পর সংসার গুছিয়ে উঠতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে—জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময় হবে তখন? ও সব আগে সেরে নেওয়াই ভাল। আচ্ছা বেশ, নাক ফুলোতে হবে না, আমার বাবাকে বলবার ভার আমিই নিচ্ছি। কিন্তু বাপু, তোমার বাবাকে তুমিই বলবে। হতাশ হয়ে অতীশ বললে, অর্থাৎ যমদোয়ারে হাজিরা দিয়ে আপীল পেশ করা!

ন্যাকামীর সুরে গীতা বললে, বালাই ষাট্ যমদোয়ারে যাবে কেন! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে শতজীবতুঃ এই অভাগিনীর ভবিষ্যৎ শাঁখা-সিন্দুর অক্ষয় হোক।"

এবার দুজনেই হেসে উঠলে। গীতা পরে সামান্য গম্ভীর হয়ে বললে, না, ঠাট্টা নয়—তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সে খেয়াল আছে তো? একবার গিয়ে বাপ-মায়ের মতামত জানা উচিত। সমস্ত শুনেও রাজী না হন্—পথ তো আমাদের খোলাই রইলো।

—মত তাঁদের হবে নাঃ মিছিমিছি মন খরাপ করা।

—তা নয়। তোমার কর্তব্য তুমি করলে, তারপর ওঁরা যুগ-ধর্ম স্বীকার না করেন ত একদিন না হয় আমরা উপোস থেকে পাঁচটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে ওদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো। কি বল, এ ছাড়া আমরা আর বেশী কি করতে পারি।

প্রস্তাবের ভূমিকা মাত্র শুনেই অতীশের বাবা একেবারে সপ্তমে চড়ে বসলেন। শেষে দুধাপ নেমে এসে বললেন, ওসব বকামী ছাড় বাপু। বেরাহ্ম-জ্ঞান আমার বাড়িতে সচল হবে না। আলোকের ভিতর বেশী যাওয়ার দরকার নেই, ও পথে একটু অন্ধকারে হাঁটাই ভাল। বিয়ে তোমার একমত ঠিক হয়েই আছে। মেয়ে দেখতে কাল বিকেলে আমরা যাব।—

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি—

—ফিরিয়ে আন। এমন কিছু ভয়ঙ্কর কথা দাওনি, নতুন কিছুও নয়। আর তোমার বিয়ে হচ্ছে সাতদিনের ভেতরেই। মন স্থির করা বল আর প্রস্তুত হয়ে নেওয়াই বল—সাতদিনই যথেষ্ট।

পিতৃদেবের কাছ থেকে সরে এসে অতীশ আহত হিংস্র জানোয়ারের মত অনেকক্ষণ নিজের মনে গর্জন করলে। তারপর ঠিক করলে এর একটা উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হবে। নিজের ক্ষতি যা হবার তা তো হলোই, কিন্তু যাদের জন্য হলো তাদেরে অক্ষত থাকতে সে দেবে না। কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলবেই সে।......গীতাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে, বিয়ে তাদের হলো না। বাবাকে গিয়ে বললে, "এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি বাবা, তুমি এখন যেখানেই বিয়ে ঠিক কর না কেন আমার সামান্যও আপত্তি নেই।" তারপর দিনই অতীশ ওয়ার সার্ভিসের চাকুরীর জন্য গভর্নমেন্টের ছাপানো ফরমে আবেদনপত্র পাঠালে। তার ইচ্ছা, যুদ্ধের চাকুরীর কথা গোপন রেখে পিতা-মাতার ইচ্ছে মত ও খেয়াল মত বিয়ের হাঙ্গামা শান্ত সুবোধ ছেলের ন্যায় সম্পন্ন করে বাধ্যতামূলক চির-বিদায় জানানো। তারপর......তারপরের ঘটনার কথা ভাবতে গিয়ে অতীশ আরো হিংস্র হয়ে ওঠে।

অতি স্বাভাবিকভাবেই মেয়ে দেখে আসবার প্রস্তাবে অতীশ রাজী হয়ে গেল। সঙ্গে গেলেন তার মামা। মামার এক বিশেষ বন্ধুর মেয়ে। মেয়েটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, নাম দীপিকা।

দীপিকার জীবনে একটা য়্যাডভাঞ্চার ছিল। সেটা তার

বিবাহিতা বড় তিন বোন—মণিকা, কণিকা আর যূথিকার পক্ষে ছিল অনেকটা মানহানিকর। কারণ তাদের বিয়ে হয়েছিল বারোর কোঠায় শুভ পদার্পণ করবার শুভ মুহূর্তে। আর এখন তারা যথাক্রমে সাত, পাঁচ ও চারটি সন্তানের ভাগ্যবতী জননী। স্কুল-কলেজে তারা কেউ যায়নি, বাড়িতেও মাস্টার রেখে ইংরেজি বিদ্যা অর্জন করেনি। তবে স্বামীর কাছে কোন্ ভাষায় পত্রালাপ করে উদাসী মনের গোপন কথা ব্যক্ত করা যায় তা ওরা জানে। (অবিশ্যি এ বিষয়ে শিক্ষিতা আর অশিক্ষিতার মধ্যে ভাবগত বিশেষ কোন তফাৎ আছে তা' নয় ঃ যা একটু আছে, সেটা রয়েছে নিছক বলার ভঙ্গিতে)। কিন্তু দীপিকা গৃহের পরদা পেরিয়ে গেল স্কুলে। বারো ত গেলই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষোলও বুঝি যায়, অথচ যাকে বলে 'বিয়ের ফুল ফোটা' তা তার ফুটলো না। তার দিদিরা এতখানি সহ্য করতে পারে না। মাও দিদিদের দলে। কিন্তু দীপিকার সহায় ছিলেন তার বাবা পরেশবাবু। তিনি সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাকে পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে লাগলেন। মেয়েকে নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা। স্বামী যদি বই কিনে আনেন, স্ত্রী নিয়ে আস্যে পাক-প্রণালী। দীপিকাকে পড়তে দেখলেই মা এসে পাশে বসে বলেন, সালগমের পায়েস রাঁধতে জানিস দীপা?

দীপা জোর করে খোলা বইয়ের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দেয়, 'না'।

মা বলেন, তা আর জানবি কেন! লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টে যাবি—স্বামীর ঘরতো আর করতে হবে না।

অধৈর্য হয়ে শেষে দীপা বলে, এখন একটু যাও—কাল আমার অঙ্ক পরীক্ষা।

মা রুখে উঠেন—রাখ বাপু তোর পরীক্ষা। নে খাতায় লিখে নে—সালগমের পায়েস খেতে খুব ভাল হয়। মুখে মুখে বলে দিলে সব ভুলে যাবি......খাতায় টুকে নে—

"একপো সালগম কুচি, ঘি এক ছটাক, তেজপাতা দু'টি, কিস্‌মিস্ আধপো—

দীপিকা মনে মনে ভগবানকে ডাকে। বাবার কাছে নালিশ করে চোখের জলে। এমনিভাবেই তার পড়াশুনা চলছিল। অনেকটা তার গা সওয়ার মতই হয়ে গিয়েছিল এ সব অত্যাচার। কিন্তু এরপর এল একদিন এক নূতন ধরণের অত্যাচার। তারি হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করবার জন্য পরেশবাবু বাধ্য হয়েই পাত্রের সন্ধান করলেন। ছেলেটি ভাল ও উচ্চ শিক্ষিত। পরেশবাবু সেই ভরসাতেই দীপিকাকে বিয়ে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, উচ্চশিক্ষিত ছেলের হাতে পড়ে নিশ্চয়ই তার মেয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। পড়াশুনার মধ্যেই সে সময় কাটাতে পারবে ঃ দীপিকার জীবনের ওটাই পরম কাম্য ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

......কিন্তু বিয়ের নামে দীপিকা ভাবলে এই হয়তো বেশ হ'লো। তার মনের ভিতর যেন এক নূতন সুর গুঞ্জরিয়া উঠতে লাগল বারে বারে। কে যেন তাকে কানে কানে শুনিয়ে দিল, এই তোমার ভাল। দীপিকা আপন মনে হাসে।

দীপিকাকে দেখতে এসে অতীশ এক অদ্ভুত আচরণ করলে যা তার উচ্ছ্বাসকে অনেকখানি দমিয়ে দিলে। অতীশ ঘরে ঢুকে একটা আসনে বসে সারাক্ষণ বাইরের দিকে চেয়েছিল।

দীপিকাকে এনে হাজির করা হ'লো তার সামনে। পরেশবাবু অতি মাত্রায় বিনয় ও কুণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন,। বন্ধুকে, নরেন, নিজের মেয়ে বলেই মুখ আমার বন্ধ রাখতে হচ্ছে, তা না হ'লে হয়তো.........

নরেনবাবু হেসে বন্ধুর কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তোমার মেয়ে যে সত্যিই লক্ষ্মী তার দু' চারটে প্রমাণ উত্থাপন করতে—এই তো তোমার বক্তব্য? কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মুখই মনের দর্পণ ভায়া, মনে হয় এর চেয়ে বড় প্রমাণ তোমার স্টকে নেই।

দীপিকা এগিয়ে এসে নরেনবাবুকে প্রণাম করলে। হাত তুলে অতীশকে নমস্কার করতে গিয়ে দেখলে সে পূর্ববৎ বাইরের দিকেই চেয়ে রয়েছে। হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।........দেনাপাওনার কথা পূর্বেই শেষ হয়েছিল, এখন হয়ে গেল আশীর্বাদ। অতীশ শেষ পর্যন্ত নির্বাক অভিনয় করেই বাড়ি ফিরে এল।

বিয়ের দু'দিন আগে অতীশ চাকুরীর পাকাপাকি চিঠি পেল। পাঁচদিন পরেই তাকে গিয়ে ক্যাম্পে হাজির হতে হবে। চিঠিটা পেয়ে সমস্তটা দিন তার কেটে গেল একটা দারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে।. পাঁচদিন পরেই সে চলে যাবে—এ যাত্রা তার হবে অগস্ত্য যাত্রা। আর ফিরে আসবার আশা নেই—সহস্রজনের চোখের জলেও তার ফিরে আসবার পথ ভিজে উঠবে না।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান সে, বেশ হবে ঃ দিনের পর দিন এ'রা শুধু কাঁদবেন ঘরে পড়ে—অথচ আর চোখে দেখতে পাবেন না। এই চির-বিচ্ছেদের জ্বালা প্রতি মুহূর্তে জানাবে—কত বড় ভুলে তাঁরা জীবনে করেছেন। চোখের সামনে সর্বক্ষণ পড়ে থাকবে একটি অসহায় মেয়ে—বিধবার মত........ মতই বা বলি কেন, মেয়াদ আর এ পথের জীবনযাত্রার ক'টা দিন! তারপর সারা যৌবনভার শূন্যে বিছানা হাতড়িয়ে ডুকরিয়ে কাঁদবে......কিছুই সে পায় নি, পেল শুধু জ্বালা......দুষ্ট যক্ষ্মা ব্যাধির মত বুকের নীচে বসে পলে পলে তাকে নিঃশেষ করে দিবে। তারি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস এসে লাগবে বাবার গায়ে। অন্ধকারে চলার সুখ টের পাবেন তখন। ......অতীশ ভাবতে ভাবতে এক সময় থমকে যায় নিজেরই অজ্ঞাতে।

শুভদৃষ্টির সময়ও অতীশ চোখ দুটিকে উপরের দিকে তুলে রাখলে ঃ শুভদৃষ্টি-বিনিময় তাদের হলোনা। দীপিকা বারবার শুধু ব্যর্থ শর হানলে। তারপর অনেক রাত্রে যখন বাসর ঘরে এল, দেখলে অতীশ শয্যার একপ্রান্তে সরে গিয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। কোনরূপে সাড়া তার নেই—যেন একটি প্রস্তর মূর্তি পড়ে আছে শয্যার পাশে। দীপিকার বড় অভিমান হলো। এত কল্পনা সে করেছিল—সবই তার মুহূর্তের দোলায় মিলিয়ে গেল শূন্যে। অনেকক্ষণ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শেষটায় ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসলে। বসে থেকেই হাতের

উপর মাথাটা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল, রাত আর তখন নেই। কাকজ্যোৎস্নার শেষ আলোটুকু এখনও আবছা ভাসে চোখে। বসন্ত-সকালের স্নিগ্ধ বাতাস ঝির ঝির করে ঘরের কোণের কামিনী ফুলের গাছটার ছোট পাতায় এসে মৃদু আঘাত করছিল যেন। পূবের ঐ খোলা জানালা বেয়ে রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধ আসছিল ঘরে......কি একটা সুরের গুঞ্জন যেন জেগে উঠছিল। তারি ছোঁয়ায় দীপিকার সারাটা মন ভরে উঠল ব্যথায়—ব্যর্থতায়। সামান্য একটি মুহূর্তের মধ্যে সে যেন একেবারে রিক্ত হয়ে গেল। নিজের মনের কাছে নিজের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলে কোথায় কোন্ সুদূর দিগন্তে গেল সরে। সেখানে আর কেউ নেই—শুধু সে একা আর রয়েছে সহস্র প্রদীপ জ্বালা। ......দীপিকার দু চোখ জলে ভরে উঠল। ঝরণা ধারার মত চোখের কোণ বেয়ে ঝরতে লাগল তার ব্যথা-অশ্রুধারা।

অতীশ সামান্য কিছুক্ষণ আগেই জেগেছিল। চোখ মেলেই প্রথম দেখলে সে দীপিকার অশ্রুসিক্ত করুণ মুখখানি। দীপিকাকে এই প্রথম দেখলে সে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে আর ওর মুখের উপর থেকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি, এত সুন্দর লাগছিল তার চোখে। যেন শিশির জলে ভেজা একটি রক্ত গোলাপ। চেয়ে থেকে থেকে অতীশের আত্মবিস্মৃতি এল ঃ সমস্ত দেহমন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। কামনার ভাঁজে ভাঁজে প্রতি মুহূর্তে জেগে উঠল সাড়া।

দীপিকা হঠাৎ ফিরে চাইলে অতীশের দিকে ঃ চোখে চোখে হ'লো দৃষ্টির বিনিময়। কিন্তু দীপিকা তক্ষুণি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল অতীশের কাছে। অতীশ দু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল, কিন্তু দীপিকা ধরা না দিয়ে সরে গেল তার পায়ের কাছে। তারপর মাথা নামিয়ে স্বামীর পায়ের উপর একটা প্রণাম করে প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতীশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

* * * *

শুভ রাত্রি। শয্যায় ছড়ান হয়েছে ফুল। শিয়রের কাছে জানালাটা খোলা—তারি ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে শয্যার উপর। নব-বসন্তের এলো বাতাস হঠাৎ যেন এক একবার ভিতরে ঢুকে সারা ঘরময় লুকোচুরি খেলা আবার মিলিয়ে যায়। অতীশ শয্যার একপ্রান্তে পড়ে থেকে অনেকক্ষণ ধরে দীপিকাকে আশা করছিল অতি কাছে। দীপিকা কাছে এল না। তবে ঘরে অন্য কোন বসবার আসন না পেয়েই শুধু স্বামীর শয্যার এক কোণে গিয়ে বসলে। বসে থেকে থেকে অনেকক্ষণ পার হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দেহ তার অবশ হয়ে পড়েছিল, তাই কখন যে বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তারঁ সে কিছুই টের পায়নি। যখন জেগে উঠল তখন নিজের দেহের দিকে চেয়ে লজ্জায় যেন মরে যেতে লাগল। স্বামীর বুকের একেবারে কাছটিতে মুখগুঁজে পড়েছিল সে। তাড়াতাড়িতে উঠতে গিয়ে অতীশের গায়ে হাত লেগে গেল। জেগে উঠল সে। দীপিকা বিছানার উপর থেকে নেমে গিয়ে পূর্ব রাত্রির মত স্বামীকে প্রণাম করলে পায়ের উপর মাথা রেখে। তারপর নেহাৎ লজ্জা ঢাকবার জন্যই যেন বললে, "সকাল হ'লো, আমি যাই—।"

অতীশের বুকের ভিতর কি যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। অথচ মুখে একটা কথাও সে বলতে পারলে না, শুধু ব্যাকুলভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। দীপিকার সারা মুখখানি ঝলসিয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ কোমল হাসিতে। তার সজল চোখের কোণে যেন অসীম মায়া। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অতীশ, বললে, আজ আমার সুপ্রভাত দীপিকা.........।

দীপিকা মুখ তুলে আবার হাসলে—বড় করুণ হয়ে ফুটে উঠল সে হাসি। অতীশ দু'হাত বাড়িয়ে দিলে, দীপিকা সে হাতে ধরা দিলে না। বিছানার নীচ থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে এনে স্বামীর সেই বাড়ানো হাতের মধ্যে ফেলে দিয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

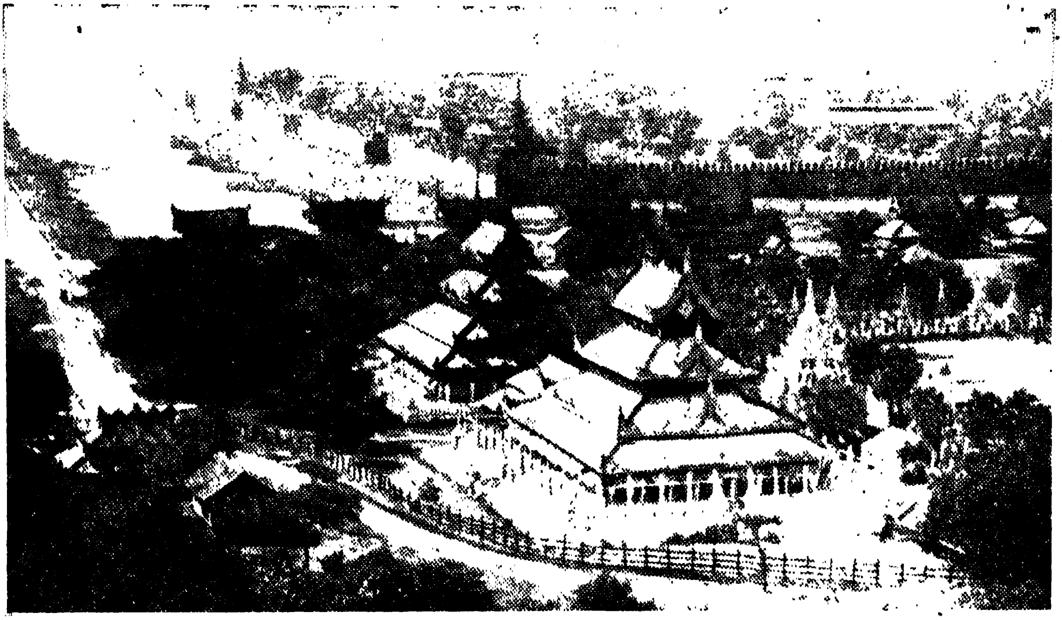
কাগজটা অতীশের নূতন চাকুরীর নিয়োগ-পত্র। আজ তার শুভ-যাত্রার দিন।

পশুপালিত মানুষ

(৪৫৮ পৃষ্ঠার পর)

ঘর থেকে বেবুনেরা কাফ্রীর শিশু ছেলেটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। এক বেবুন মাতা তাকে বিশেষ যত্নে পালন করে। কিছু দিন পরে এই মানুষ বেবুনটির কাছেই তার বন্য জীবনের অনেক কথা জানা যায়। রাত্রিবেলা ঠান্ডায় এই আদুরে ছেলেটির অসুখ করতে পারে, সেই জন্যে বেবুন-মা তাকে শুকনো ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখতো।

এই ছেলেটিকে একটি মানসিক হাসপাতালে এনে চিকিৎসার জন্য রাখা হয়। তার নাম দেওয়া হয় লুকাস। প্রথম প্রথম লুকাস খুবই বন্য আর বেবুনের মত ব্যবহার করতো। রান্না করা খাবার খেতে চাইতো না। কাঁচা ফলই তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। কিন্তু সদয় ব্যবহারের পর ক্রমশ সে তার স্বভাব বদলাতে থাকে। তারপর একটি সদাগর আফিসে চাকরী পায়। তাকে পিওনের কাজ দেওয়া হয়। পিওনের কাজে তার মত দক্ষতা পৃথিবীর কোন পিওন দেখাতে পারবে না। দশ মাইল দূরবর্তী কোন স্থানে একটি চিঠি নিয়ে লুকাস একদমে দৌড়ে যেত আর ফিরে আসতো। কোথাও বিশ্রাম নিত না।



জাপ আক্রমণে বিধ্বস্ত বার্মার প্রাচীন রাজধানী মান্দালয় শহরের দৃশ্য



সিংহলের ত্রিনকোমালী পোতাশ্রয়

উদ্ভট সাহিত্য

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদান্ত সাহিত্য বিশারদ

বৈদিক যুগের সাহিত্য ধর্ম-সাহিত্য। বৈদিক ঋষি ও সাধকদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি সেই সাহিত্যের ভিতর মূর্ত হইয়া উঠায় অধিকাংশের নিকট তাহা দুর্বোধ্য ছিল। তারপর পৌরাণিক যুগে ভারতের ঋষিদের অশরীরী চিন্তাধারা পুরাণের অসংখ্য দেবতাদের আকারে রূপায়িত হওয়ায় সাহিত্য পুরাণরূপে বাহির হইতে জনসাধারণের বহির্বাটিতে প্রবেশ করিল। ভাব অনেক সহজ ও সরল হওয়ায় সাধনমার্গে সমাসীন তপস্বীদের গন্ডী ছাড়াইয়া ইহা সাধারণের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল। যদিও বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগে এবং পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে সাহিত্যে ধর্মের অক্টোপাশ ক্রমশই শিথিলতর হইয়া আসিয়াছে, তবুও এখন পর্যন্ত উহা ধর্মের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হয় নাই। 'Art for Art's sake' পশ্চিমের এই যুক্তির সারবত্তা ভারতের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যেকেরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন নাই। যে সময় ধর্ম সম্মুখ থেকে পশ্চাতের পটভূমিকার স্থান গ্রহণ করিল সে সময় থেকেই ঋষিদের সাহিত্য রচনায় একচেটিয়া অধিকার লোপ পাইয়া বিশিষ্ট পন্ডিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য পুষ্ট ও নব নব মাধুর্যে ভরপুর হইতে লাগিল। উদ্ভট সাহিত্যের সৃষ্টিও প্রায় সেই সময় থেকেই।

এই সময়ে জটিল ভগবৎতত্ত্ব, দুরূহ আধ্যাত্মিক সমস্যা, গভীর পরমার্থ বিষয়ক অনুভূতি প্রভৃতি যেসব দেহাতীত জটিলতা সংস্কৃত সাহিত্যকে মন্থর ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা থেকে বিমুক্ত করিবার জন্য অদ্ভুত প্রতিভাশালী কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়। তাঁরা অসূর্যম্পশ্যা সংস্কৃত ভাষাকে অন্তঃপুরের গর্বিত নির্জনতা থেকে উন্মুক্ত আলোবাতাসের স্বাস্থ্যময় প্রাচুর্যের সন্ধান দিলেন। শিক্ষিত সাধারণ মায়ের এই রাজরাজেশ্বরী মূর্তির দিকে অবাকবিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, অপূর্ব সম্ভ্রমে, পরম প্রীতিতে, বিমুগ্ধ ভক্তিতে তাদের সারাদেহ রোমাঞ্চিত, হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তারা প্রাণ খুলিয়া সেই সব অদ্ভুত মনীষা ও বিস্ময়কর প্রতিভাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিল। কালিদাস, ভারবী, ভবভূতি,মাঘ, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট প্রভৃতি দেবভাষাকে শিক্ষিত সাধারণের শিরোদেশ থেকে অন্তরের মণিকোঠায় স্থাপিত করিলেন। আপন ভান্ডারের এইসব মহামূল্যে মণিমাণিক্যের সন্ধান পাইয়া নিজেদের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার কথা নূতন করিয়া মনে হওয়ায় সম্পদশালীর গৌরবে, নূতন আবিষ্কারের চমকিত আনন্দে দেশে এক অপূর্ব ভাবোন্মেষের সৃষ্টি হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগে নূতন নূতন কাব্য, নাটক প্রভৃতি ভাষা ও শব্দের ঝঙ্কারে, ছন্দের সাবলীলতায় ও মাধুর্যে, ভাবের গভীর স্বচ্ছতায় রচনা পারিপাট্যে সাহিত্যকে অপূর্ব সম্পদশালী করিয়া তুলিল। নব নব কোবিদগণের কাব্যকাকলীতে বাণীর কমলতা কুহরিত, বিদগ্ধজনের হৃদয়মুগ্ধ। কিন্তু তাঁদের দূরপ্রসারিণী প্রতিভা ঐসব রচনাতেই ক্ষান্ত হইল না। কেউ কেউ বা খন্ড খন্ড রচনা দ্বারা যে নব নব রসের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বহু রস পিপাসু রসিকের মনোরঞ্জন করিল। ঐগুলি কোথায়ও-বা দৈনন্দিন জীবনের কোন সাধারণ ঘটনা নিয়া সংক্ষিপ্ত রচনা, কোথায়ও-বা কোন সমস্যা শ্লোকাকারে পূরণ করা, কোথায়ও-বা কোন সরস উক্তি অধিকতর সরসভাবে প্রকাশ করিবার জন্য রচনা-নৈপুণ্যের প্রশংসাকর অভিব্যক্তি। এই সমস্ত রচনাই কালক্রমে উদ্ভট শ্লোক নামে পরিচিত হইল। এইখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত সাহিত্যে পূর্বে এত শ্রেণী বিভাগ ছিল না। তখন রচয়িতা কাব্যই লিখুন, নাটকই লিখুন আর আখ্যায়িকাই লিখুন, তার সাধারণ অভিধান ছিল কবি। এই উদ্ভট শ্লোকের রচয়িতারাও তাই কবি নামেই অভিহিত ছিলেন।

উদ্ভট শ্লোক বলিতে আমরা কি বুঝি? অভিধান চিন্তামণিতে উদ্ভট শব্দের অর্থ পাওয়া যায়—

"মহেচ্ছেতুদ্ভটোদারোদাত্তোত্তীর্ণ মহাশয়াঃ"

উৎপলমালাতে পাওয়া যায়—

উদ্ভটং কচ্ছপে সূর্যে প্রকৃষ্টেতু ত্রিলিঙ্কর। আবার কেউ কেউ বলেন, কাশ্মীর দেশে উদ্ভট নামে এক কবি ছিলেন; তার তিন নাম ছিল (১) উদ্ভট ভট্ট, (২) ভট্টোদ্ভট্ট, (৩) উদ্ভটাচার্য।

কন্থনের রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায় যে, ৭৭৯-৮১৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর দেশে জয়াপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজে একজন সুকবি ছিলেন এবং তাঁর সভায় ভট্টোদ্ভট্ট, দামোদর গুপ্ত, মনোরথ শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান, বামন ও ক্ষীর নামক আটজন মহাকবি ছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার সর্বপ্রধান ছিলেন উদ্ভট কবি। তিনি প্রতিদিন জয়াপীড়কে স্বরচিত সুন্দর সুন্দর কবিতা শুনাইতেন এবং তজ্জন্য তাঁর কাছ থেকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাইতেন। কাশ্মীর রিপোর্টে আছে, উদ্ভটভট্টকিল জয়াপীড়স্য রাজ্ঞঃ স্বকশোৎ প্রতিদিনং লক্ষ সংখ্যকান্ দীনারাণ্ লভতেস্মঃ। জয়াপীড়ের রাজসভা এইরূপে নানাবিধ বুধসমাবেশে সমলঙ্কৃত থাকিত বলিয়া কন্থন বলিয়াছেন,—

"সমগ্রহীৎ তথা রাজা সোহন্বিষৎ নিখিলান বুধান্
বিদ্বদ্দুর্ভিক্ষমভবৎ যথাহন্যান্নৃপমন্ডলে।"

এই উদ্ভটভট্ট কুমার সম্ভব, কাব্যালঙ্কার সংগ্রহ ও ভামহালঙ্কার বিবরণ—এই গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। প্রতীহারেন্দুরাজ নামে কোন ব্যক্তি কাব্যাল্কার সংগ্রহের লঘুবৃত্তি নামক এক টীকা প্রণয়ন করেন এবং তাহাতে উদ্ভটভট্টের উপরোক্ত গ্রন্থত্রয় প্রণয়নের বার্তা পাওয়া যায়। "স চ কবি র্ণ কশ্চিত বৃহৎগ্রন্থং প্রণিনায়। তস্য স্বপ্রণীতে কাব্যালঙ্কার সংগ্রহ নামকেহলঙ্কার

[illegible] যান্‌দাহ[illegible] তামি অবরচিত্ত কুমার সম্ভবা দেবাজহারে।"

রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়—

বিদ্বান্‌ দীনারলক্ষেন প্রত্যহং কৃতবেতনঃ
ভট্টোঽভূদ্‌ উদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতি।

এই উদ্ভট শ্লোকের রচনা নৈপুণ্য ও কবিত্ব এত উচ্চ শ্রেণীর যে ভিনিস্‌, টনি, থিব, পিটারসন্‌ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বহু ভাষাবিদ্‌ স্বর্গীয় হরিনাথ দে মহোদয় বলিয়াছেন, "অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাঃ যথা সকৌশলং মধুরভাব সন্নিবেশনেন সংস্কৃতোদ্ভট শ্লোকান্‌ রচয়া মাসুস্তয়া রীত্বা শ্লোকান্‌ রচয়িতং সংস্কৃত ভাষাবিদন্যঃ কোঽপি পার্থিব কবি র্ণ শশাক। ইয়ঞ্চ দৈবী ভাষা স্বগুণালঙ্কারা সতী যথা রসভাবাদিকং পুষ্ণাতিকাপন্যা মাগধী ভাষ্য ন তথে।"

উদ্ভট শ্লোক সাধারণত রাজসভায় বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা মুখে মুখে রচিত হইত—রাজার মনোরঞ্জনের জন্য, কোন সমস্যা পূরণের জন্য অথবা কোন পাদপূরণের জন্য। কখনো কখনো কোন বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া রসসৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, কখনো বা অনুপ্রাসের রচনা চাতুর্য দেখাইবার জন্যও উহার সৃষ্টি হইত। আমি বিভিন্ন কার্যকারণে বিভিন্ন বুধমণ্ডলী কর্তৃক বিরচিত উদ্ভট শ্লোক কিছু কিছু আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া দেখাইব যে কি রসসৃষ্টিতে, কি শব্দালঙ্কারে, কি ভাবনৈপুণ্যে যে কোন ভাষার যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সঙ্গে ইহাকে এক পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

পাদ পূরণের জন্য যেসব উদ্ভট শ্লোক রচিত হইত তাহার ২।১টি নমুনা নিম্নে দিলাম—

বিষস্য বিষমৌষধম্‌
দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে হরিনায়ত লোচনে
শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্‌।

অস্যার্থঃ—কোন সুন্দরী রমণী এক পথিকের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আবার চোখ ফিরাইয়া নেওয়ায় পথিক বলিতেছে, হে মৃগনয়না, তুমি একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার সমস্ত মন বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছ। আর একবার দৃষ্টিপাত কর, কারণ আমি শুনিয়াছি বিষের মহৌষধ বিষ।

ঠটটং ঠটং ঠং ঠটঠং ঠটং বা
রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ
কক্ষচ্যুতঃ হেমঘটস্তরুণ্যাঃ
সোপান মা সাদ্য চকার শব্দং
ঠটটং ঠটং ঠং ঠটঠং ঠটং বা

অস্যার্থঃ—রামের রাজ্যাভিষেক সময় মদবিহ্বলা তরুণীদের কক্ষচ্যুত স্বর্ণঘট সোপান দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে পূর্বোক্তরূপ শব্দ করিল।

ধিক্‌ তান্‌ ধিক্‌ তান্‌ ধিগেতান কলয়তি সততং কীর্তনস্থো
মৃদঙ্গঃ
যেষাং শ্রীমদ্‌ যশোদা সুত পদকমলে নাস্তি ভক্তির্ণরানাং
যেষাং আভীর কন্যা প্রিয়গুণকথনে নানুরক্তাঃ রসজ্ঞাঃ
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলালালিত নিশমনে সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্‌ তান্‌ ধিক্‌ তান্‌ ধিগেতান কথয়তি সততং কীর্তনস্থো
মৃদঙ্গঃ

অস্যার্থঃ—যাদের শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তি নাই, যাদের রসনা শ্রীরাধা গুণে কথনে অনুরক্তা নয়, যাদের কান শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত পানে তৎপর নয়, সেই সমস্ত লোকদের ধিক কীর্তনস্থো মৃদঙ্গ শুধু এই কথাই বলে।

ললাটলেখা নঃপুনঃ প্রয়াতি

সীমন্তিণী যস্য গৃহেঽন্নপূর্ণা
ত্রিলোকরক্ষাং কুরুতেঽন্নদানৈঃ।
ভিক্ষাচর সোঽপি কপালপাণি
ললাট লেখা ন পুনঃ প্রয়াতি।
নিখিল বিশ্বের অন্ন অন্নপূর্ণারূপে যিনি
দানেন প্রীতিতে।
তাহাকে গৃহিণী পেয়ে মহেশ্বর ভিক্ষাচর
অদৃষ্টলিপিতে॥

দারুভূতো মুরারি

একা ভার্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোপ্যেকো ভুবন বিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা সদনমুদধির্বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।
একটি বণিতা প্রকৃতি মুখর
দ্বিতীয় ভুবন পাচক
অতীব প্রখর খরস্মর হর
পুত্র ভুবন দাহক।
জলধিগুহায় শেষোপরি পাতা শীতল শয্যা পরম সুখে।
সর্পখাদক গরুড়বাহন তাই দারুময় মনের দুঃখে।

অনুপ্রাসের জন্য যেসব উদ্ভটশ্লোক রচিত হইয়াছে তাহাদের নমুনা—

(১) বন্দেঽহং বিশ্বকর্তারং বিশ্বপং বিশ্বনাশকম্‌
বিশ্বদেশ কানজ্ঞং বিশ্বেগং বিশ্ববন্দিতম্‌।

(২) দীর্ঘাক্ষী দীপ্রদন্তা দনুজদলদলা দেবতাদুঃখদাত্রী
দিব্যাস্ত্রৈর্দিব্যকান্তি র্দরদবদমনা দীপ্তদেহা দুকূলৈঃ।
দৃপ্তানাং দর্পদান্তৈ দশদিশি দশকং দৃপ্তদোষাং দধানা
দেবী দুর্গা দুরন্তং নিয়তু দুরিতং দুর্গতিদ্রাবদক্ষা

(৩) কল্পান্ত ক্রূরকেলিঃ ক্রতুদনকবঃ কুন্দ কর্পূর কান্তিঃ
ক্রীড়ন্‌ কৈলাসকূটে কলিতকুমুদিনী কামকল্পিতকায়ঃ
কঙ্কাল ক্রীড়নোৎক কলিতকলকলঃ কাল কাল কলত্রঃ
কালিন্দী কলকণ্ঠঃ কলয়তু কুশলং কোঽপি কাপালিকঃকৌ।

(৪) পৃথ্বী পাতকীপাপ পর্বতপরী পাপ্রাজি পায়প্লাবৌ
পাপ প্রান্তর পাংশু পঙ্ক পথিক প্রাণপ্রদৌ পাদপৌ।
পাপ প্রাজ্য পয়োদ্‌ পালি পবনৌ পাপেভ পঞ্চাননৌ
পাদৌ পশুপতৌ প্রপশ্য পরমৌ প্রাক্‌ পূর্ণচন্দ্র প্রগে।

(৫) সজল জলদজাল্‌ প্রেমবাপী মরালং
অভিনব বনমালং ক্ষোমবল্লী প্রবালম্‌
ভুবন নলিনলালং দানবানাং করালং
নিখিল মনুজ নৌমি তং নন্দবালং।

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদেবকে নিয়া যত রঙ্গরসের সৃষ্টি, হইয়াছে এমন বোধ হয় হিন্দুদের আর কোন দেবতাকে নিয়া হয় নাই। মহাযোগীশ্বর সেই মহাপুরুষ ষাঁড়ে চড়িয়া ধুবুনী গন্ধুায় ভিক্ষা করিতে পর্যন্ত গিয়াছেন। দু'একটি নমুনা নিম্নে দিলাম,—

(১) বৃদ্ধোক্ষঃ প্রপ্লায়তে প্রতিদিনং সিংহাবলোক্য ভীয়া
পশ্যান্ মত্তময়ূরমন্তিকচরং ভূষাভুজঙ্গব্রজ।
কৃত্তিং কৃন্ততি মূষিকোহপি রজনী ভিক্ষান্নমাভক্ষায়ন্
দুঃখেনাতি দিগম্বরঃ স্মরহরো হালাহলং পীতবান্।
সিংহকে দেখিয়া ষণ্ড ভয়েতে পলায়।
ময়ূর ভূষণ সর্প ধরে ধরে খায়,—
মূষিক শার্দুল চর্ম কেটে করে খণ্ড খণ্ড
ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করে দিনের সম্বল!
মনোদুঃখে দিগম্বর খায় হলাহল!

(২) একা ভার্যা সমররসিকা নিম্ন গা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোপ্যেকো দ্বিরদবদনঃ ষম্মুখশ্চ দ্বিতীয়ঃ
নন্দী ভৃঙ্গী চ কপিবদনো বাহনং পুবেশঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহে চরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ
সমর নিপুণা প্রথমা ভার্যা দ্বিতীয়া নিম্নগমনপ্রিয়া
একটি তনয় গজেন্দ্রবদন দ্বিতীয় কুমার ছয়টি আনন
সহচর দুটি মর্কট বদন, বাহন ষণ্ড কাঁপয়ে হিয়া
বিভূতি ভূষণ তাই ভোলানাথ শ্মশানেমশানে থাকেন গিয়া।

উদ্ভট সাহিত্যের আর একটি রসের দিক আছে তাহা মার্জিত, সুশোভন হাস্যরসোদ্দীপক। তাহাতে শ্রোতা বা পাঠক উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়ে না, অথচ অন্তরে অজস্র হাস্য-রসের সঞ্চার করে। কি সূক্ষ্ম রসজ্ঞান তাহাতে রূপায়িত হইয়া উঠে, অনুভূতি কত তীব্র এবং প্রত্যক্ষ অথচ অনাবিল হাস্যধারার অফুরন্ত প্রবাহে অভিসিঞ্চিত।

(১) কালীঘট্টে কলৌ কালে কিলিষৌম নিকৃন্তনে
সপত্নী বিভবং দৃষ্টা গঙ্গাহভূৎ মলিনা কৃশা।
সপত্নী বৈভব দেখে কালীঘাটে কলিতে,
বিশীর্ণা কৃশানু গঙ্গা ভুলে গেছে চলিতে।

(২) আঘাতো ভৃগুনাকৃতো নিজপতেঃ পাদেন বিক্ষোরুরঃ
স্যম্ভোধিং কুম্ভসম্ভবমুনিস্তাতং নিজং পীতবান্
উচ্ছিন্দন্তিনিজং প্রিয়ং শত্যদলং বাগস্থলং ব্রাহ্মণা
ইত্থং দুর্ণয়তো ভবত্যকরুণা পদ্মালয়া তান্ প্রতি।
বিপ্রের চরণাঘত,
পতিকে দানিল ব্যথা
ব্রাহ্মণে পিইল পিতা
পদ্মবন করিল নিপাত,
অব্রাহ্মণে তাই মম এত পক্ষপাত।

৩) ভিক্ষুঃ ক্বান্তি বলের্মখে পশুপাতি কিং নাস্ত্যসৌ গোকুলে
মুগ্ধে পন্নগভূষণ সখি সদা শেতে স শেষোপরি
দুর্গে মুগ্ধে বিষামাশু কমলেনাহং প্রকৃত্যা চলা
চেত্থং শ্রী গিরিজা সমুদ্রসুতয়োর্বাক চাতুরী পাতুবঃ।
এই উদ্ভট শ্লোকে আপনারা দেখিবেন যে কমলা মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া যা কিছু প্রশ্ন করিয়াছেন গিরিজায়া সেই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রয়োগ করিয়া উত্তর দিয়াছেন।

কমলা শুধাল কোথায় ভিখারী
গিরিজায়া বলে বলির যজ্ঞে
লক্ষ্মী শুধায় পশুপতি কোথা
গোধন চরায় কহিল দুর্গে।
সর্পভূষণ কোথায় লুকাল
কহে নারায়ণী ব্যঙ্গভরে।
অনন্তশয়ানে কহেন শৈলজা
দোঁহারে প্রণমি যুক্তকরে।

লঙ্কা অভিযানের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র একটি শিবমূর্তি স্থাপিত করিয়া তার নাম রাখেন রামেশ্বর। এই রামেশ্বর শব্দের অর্থ নিয়া ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের মধ্যে খুব মতদ্বৈধ হইল।

(৪) ষষ্ঠীতৎ পুরুষং রামো বহুব্রীহি মহেশ্বরঃ।
রামেশ্বর পদে ব্রহ্মা কর্ম ধারয়ামব্রবীৎ।

রামচন্দ্র নিজে বলিলেন, ইহা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ রামস্য ঈশ্বর—রামেশ্বর (রামের ঈশ্বর)। মহাদের বলিলেন, ইহা বহুবীহি সমাস অর্থাৎ রামঃ ঈশ্বরঃ যস্য সঃ রামেশ্বর (রাম যাহার ঈশ্বর)। ব্রহ্মা বলিলেন যে, ইহা কর্মধারায় যঃ রামঃ সঃ ঈশ্বর (যেই রাম সেই ঈশ্বর)।

আর একটি উদ্ভট শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি যাহাতে ৬টি সমাসের নাম দিয়া শ্লোকটি গ্রথিত। রচনা এবং অর্থ-নৈপুণ্যের এরূপ সুন্দর সমবেশ খুবই দুর্লভ। শ্লোকটি এই—

(৫) দ্বিগুরূপি দ্বন্দ্বোঽহং
গৃহে চ মে সততমব্যয়ী ভাবঃ।
তৎপুরুষ কর্মধারায়
যেনাহং স্যাম্ বহুব্রীহি।
অন্নাভাবে মৃতপ্রায় স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন,—
গোধনযুগল যদিও গৃহেতে
ঝগড়া সদাই লাগিয়া আছে।
অন্ন অভাবে বিকল শরীর
পরাণ কেবলি মৃত্যু যাচে।
পুরুষপ্রবর কর্ম করহ
দুটি খেয়ে যাতে পরাণ বাঁচে।

(৬) সাধু সাধু রঘুনাথ যৎত্বয়া
পর্যনায়ি জনকস্য কন্যকা
কার্যমেতদ পরেন দুষ্করং
যুক্ত মেতদজবংশ জন্মনঃ।

বিদ্রূপার্থ

জনকতনয়া বিবাহ করিতে
রঘুনাথ তুমি পেলে না লাজ।
অজের বংশে জনম বলিয়া
তোমাকেই সাজে এরূপ কাজ।

সরলার্থ

রাজর্ষি জনক তার প্রিয়তমা দুহিতায়
দিলেন রামের করে পরম হরষে।

ছিল না দ্বিতীয় কেউ বীরত্বে ও যোগ্যতায়
উপযুক্ত জানকীর সূর্যবংশধর সে।

আর এক জাতীয় উদ্ভটশ্লোক আমরা পাই যাহার অর্থ শ্লোক রচয়িতার রচনা চাতুর্যে এরূপভাবে শব্দালংকারে লুক্কায়িত থাকে যে গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত সূক্ষ্ম রসবোধ ও বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ ছাড়া তার অর্থ বাহির করা অসম্ভব। এইগুলিকে কূটকবিতা বলা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে ২।১টা নমুনা দিলাম—

বিহগ পুঙ্গব পুঙ্গব বাহনং
মকরকুণ্ডলি কুণ্ডলি কুণ্ডলি।
বপুরিদং কমলেশ মহেশয়ো
জয়তি চন্দ্রকি চন্দ্রকি চন্দ্রকি।

হরি এবং হর যখন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন তখনকার বর্ণনা—

গরুড় বাহন বৃষভবাহনে মিলিত।
মকরকুণ্ডল ফণীকুণ্ডলে জড়িত॥
রমাপতি আর উমাপতি দোঁহে একাঙ্গ।
শিখি পাখা আর চন্দ্রমা শিরে কৃশাঙ্গ॥

সায়ং সন্ধিমহোৎসবে বলিঘটারক্তোৎকটা স্বাদনাৎ
সৌহিত্যেন ধরাধরাঙ্গভুবি সোদ্গারং ক্ষিপন্ত্যাং শিরঃ।
চূড়চন্দ্রনভঃ স্থলেন্দুমিলনে নীরন্ধ্রতা সংঘটাং
অষ্টম্যাঃ পরস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল।

সন্ধ্যাকালে সন্ধিপূজার উৎসবে।
খড়্গাঘাতে রক্তপাতে মত্ত সবে॥
বলির মাংসে পরিস্ফীত পিণাকী।
উদ্গারেতে সর্বদেহে দেয় ঝাঁকি॥
অর্ধচন্দ্র ললাট থেকে খসিয়া।
অষ্টমীর চন্দ্রেতে যায় মিশিয়া॥
অর্ধে অর্ধে মিশে গেল চন্দ্রমা।
অষ্টমীর পরেতে তাই পূর্ণিমা॥

সর্বস্বাপহরো ন তস্করবরো রক্ষো ন রক্তাশনঃ
সর্পো নৈব বিলেশয়োঽখিল নিশাচারী ভূতোঽপি চ।
অন্তর্ধান পটুর্ন সিদ্ধপুরুষো নাপ্যাশুগো মারুত
স্তীক্ষ্মাস্যো ন তু সায়কস্তমিহ যে জানন্তি তে পণ্ডিতা।

সর্বস্ব হরণ করে সকলের অগোচরে
চোর কভু নয়।
রক্তপ্রিয় সে রসনা কিন্তু সে রাক্ষস না
জানি অসংশয়॥
বিসর্পিল সে গমন নহে সে ভূজঙ্গম।
নিশাচারী ভূত,
প্রেত কি প্রমথ নয় মানবে দেখাতে ভয়
সতত প্রস্তুত।
অন্তর্ধান পরায়ন নহে সে সিদ্ধজন।
তবু দ্রুতগামী
নহে সে দুরন্ত বা মানবদেহের যা
কল্যাণকামী।
দংষ্ট্রা যদি ও তীক্ষ্ম নহে সে সায়কতীক্ষ্ম
করে যাহে ভীত
সার্বশেষ পরিচয় যে জানে সে নর হয়
অতি সুপণ্ডিত।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিম্নোক্ত উদ্ভট শ্লোকের মানুষের আয়ু যে ১২০ বৎসর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

ইষ্টং কার্তিক দর্শনৈশ্চ গুণিতং রুদ্রেন যুক্তং তথা
ব্রহ্মাস্য প্রহতং জলাধিপতিনা যচ্ছেষিতং তৎপুনঃ
বেদাঙ্গৈশ্চ হৃতং তদর্দ্ধনিচয়ং বিশ্বেশ ভক্তিব্রতা
স্তিষ্ঠেয়ুর্ভুবি পাঠকা ইতি সদা বিপ্রাশু তোষার্থনা।

ষড়ানন আঁখিসাথে
রুদ্রেকে জুড়িয়া
বিধাতার বদনেতে
লও তাকে গুণিয়া॥
বরুণের অঙ্গসহ
সযতনে হরিবে।
অবশেষে বেদাঙ্গের
সংখ্যা দ্বারা গুণিবে॥

উপসংহারে আমি উদ্ভট শ্লোকটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম তা থেকে আপনারা দেখিবেন যে শব্দের ঝঙ্কার ও সুমিষ্টতায়ও এরা কত মধুর।

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে
মূকা কোকিল সংহতি শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্বে তদ্বিরহেল হন্ত নিতরাং গোবিন্দ দৈন্যং গতাঃ
কিন্ত্বেকা যমুনাকুরঙ্গ নয়না নেত্রাম্বুধির্বর্ধতে।

অস্ট্রেলিয়া

শ্রীসঞ্জীব রায়

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ এই অস্ট্রেলিয়া। ১৬০৬ সালে কয়েকজন ডাচ নাবিক এই অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। এদের পূর্বে পৃথিবীর আর কোন লোক এই দ্বীপে পদার্পণ করেছিল কিনা তা জানা যায়নি। এই ডাচ নাবিকদেরই পৃথিবীর প্রথম লোক বলা যায় যারা অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের গৌরব লাভ করতে পারে। তবে এরা সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে উপস্থিত ছিল। ১৬০৬ সালের পর থেকেই ডাচেরা রীতিমত এই দ্বীপে যাওয়া আসা করতে আরম্ভ করে এবং ১৬৪২ সালে এই দ্বীপটিকে অধিকার করে দ্বীপটির নাম দেয় হল্যান্ড। কিন্তু উপকূলের প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তারা বেশী দিন সেখানে থাকতে না পেরে বাধ্য হয়ে দ্বীপটি ত্যাগ করে আসে।

হয়েছিল তাঁর এই অধিকারের অনেক পরে। আর্থার ফিলিপ ছিলেন জাতি গঠনের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা। ১৭৮৮ সালে এগারখানা জাহাজে ভর্তি ১,০০০ হাজার সৈন্য এবং আসামী নিয়ে বোটানী উপসাগরের মধ্যে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দিকে তিনি অগ্রসর হন। তাঁর চেষ্টাতেই টাসমানিয়া, কুইন্সল্যান্ড, ভিক্টোরিয়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উপর উপনিবেশ আরম্ভ হ'ল। এই স্থানগুলির মাটিতে পৃথিবীর মানুষ প্রথম নীড় রচনা করে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখময় স্বপ্ন যেদিন দেখেছিল তা মানুষের মন থেকে কবে মুছে গেছে. পৃথিবীর পাতায় সে কথাও লেখা নেই। অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম উপনিবেশ কয়েদীদের ক্যাম্প, সৈন্যদের ছাউনি এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের অফিস। কদাচিত দু' একজন পরিব্রাজক ভ্রমণের



অস্ট্রেলিয়ার মেষপাল

এরপর বহু বৎসর কেটে গেল, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও দ্বীপের উপর চোখ পড়ল না। ১৬৪৮ সালে ডাম্পিয়ার নামে একজন ইংরেজ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে পদার্পণ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজ। তাঁর পর বিখ্যাত আবিষ্কারক ক্যাপটেন কুক ১৭৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়াতে আসেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বনজ সম্পদ, খনিজ রত্নরাজি তাঁকে মুগ্ধ করে; তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য দ্বীপটি অধিকার করেন। অস্ট্রেলিয়ায় জাতি গঠন এবং লোকের উপনিবেশ আরম্ভ

নেশাতে অস্ট্রেলিয়াতে সে সময় পদার্পণ ক'রে সেখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জল-বাতাসের প্রশংসা ক'রে গেছে। ইংলণ্ডের শ্রমিক বিপ্লব সেখান থেকে বহু অধিবাসীকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করলে অস্ট্রেলিয়ার মাটি তাদের প্রথম আকর্ষণ করে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ১৮৩৯ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়াতে কয়েদীদের পাঠানো বন্ধ করে দেয়। এদিকে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলস্থ সমতল মাটিতে,

পাহাড়ের চূড়ায় এবং মধ্যভাগস্থ ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের কাজ খুব দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান পর্বত-শৃঙ্খল 'গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ'। উত্তর কুন্সল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্ক পেনুনসুলা থেকে আরম্ভ করে নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ভিক্টোরিয়ার মধ্য দিয়ে টাসমানিয়াতে এসে শেষ হয়েছে। কোসিয়াসকো পর্বতের শেষ চূড়ার উচ্চতা ৭৩০০ ফিট, ইহারই উচ্চতা সর্বাপেক্ষা বেশী। শৃঙ্গের এক দিকটা 'অস্ট্রেলিয়ান আলস' নামে পরিচিত। সারা বছরের কয়েক মাসই এই স্থান-গুলি তুষারে ডুবে থাকে। মুরের এবং ডারলিং এই দুইটি নদী ছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে উল্লেখযোগ্য নদী নেই। দেশের মধ্যভাগে প্রাকৃতিক জল সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। দেশের কৃষি-কার্য চলে জল সেচনের ব্যবস্থায়। এ ছাড়া বৃহৎ লবণাক্ত হ্রদ দেশের মধ্যে রয়েছে। কৃষির পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মাটি খুবই উর্বর। গম অস্ট্রেলিয়ার প্রধান শস্য। প্রায় দুই কোটি একর জমিতে গম চাষের আবাদ আছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটি নানা জাতীয় ফলের পক্ষেও খুব উপযোগী। গমের পর অস্ট্রেলিয়ার ফলের স্থান। ইক্ষু এবং তামাকের চাষও চলে। গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজের উপযোগী অস্ট্রেলিয়ার উৎকৃষ্ট কাঠ বনজ সম্পদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। অস্ট্রেলিয়াতে প্রচুর পরিমানে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদের মধ্যে সোনা, কয়লা সীসা, লোহা, টিন, তামা এবং জিঙ্কের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বেশী এবং বর্তমান যুদ্ধে এদের প্রয়োজনীয়তা সব থেকে কাজে লেগেছে।

অস্ট্রেলিয়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে উৎপন্ন কাঁচা মালের স্থান প্রথম। গুণানুসারে এরপর কৃষিকার্য এবং খনিজ সম্পদের নাম উল্লেখ করা যায়। মেষ পালন অস্ট্রেলিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা। পৃথিবীর ১/৬ ভাগ ভেড়া অস্ট্রেলিয়া দেশই ধরে রেখেছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ পশম প্রয়োজন হয় তার ½ ভাগেরও বেশী অস্ট্রেলিয়াতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। গৃহপালিত পশুপালন অস্ট্রেলিয়াবাসীদের আর এক ব্যবসা। এই স্থান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পশুর মাংস রপ্তানী হচ্ছে। দেশের সর্বত্রই পশুপালন করা হয়। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ১১০০০ বর্গ মাইল স্থানে ব্যাপকভাবে পশুপালনের কাজ চলছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় পশুর খাদ্যও এই অস্ট্রেলিয়া থেকে সরবরাহ করা হয়। ইহাও ব্যবসায়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বছরে অস্ট্রেলিয়া থেকে ১৮ কোটি পাউন্ড মাটন এবং ২০ কোটি পাউন্ড গোমাংস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। 'ডেয়ারিং'ও ব্যবসায়ের একটি অন্যতম শাখা। অস্ট্রেলিয়ার বনস্পতি রাজ্যে কত অদ্ভুত গাছপালা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ইউকালিপটাস গাছের দেশ এই অস্ট্রে-লিয়ার মাটিতে। তিন শতেরও অধিক বিভিন্ন জাতীয় গাছ এই দ্বীপের উপর জন্মে থাকে। ইউকালিপটাস ছাড়া গাম, জারাহ আর পাম গাছ উল্লেখযোগ্য। সারা অস্ট্রেলিয়া জুড়ে অসংখ্য ফার্ন গাছ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে শতগুণ বৃদ্ধি করে রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার কয়েক জাতীয় ফার্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজ লোপ পেয়েছে। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার মাটিকে আজও তারা সবুজ

স্থলপথ ছেড়ে জলপথে নেমে আসা যাক। সমুদ্রের নীচের উদ্ভিদ রাজ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র আছে। সামুদ্রিক জগতের এই সৌন্দর্য শুধু মানুষের চোখের তৃষ্ণায়ই মেটায়নি, অস্ট্রেলিয়াবাসী আর্থিক ব্যাপারেও যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। ২,৯৭০০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে অস্ট্রেলিয়া দেশের সীমানা। লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষের বেশী নয়। এই লোক সংখ্যার বেশীর ভাগই পূর্ব উপকূলের বড় বড় সহরগুলিতে বাস করে। দেশের অভ্যন্তরে লোকের বসতি কম। মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৯৮ জন বৃটিশ জাত। আদিম বর্বর জাতির সংখ্যা ৬০,০০০। এরা ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে। এই বর্বর জাতির অর্ধেক যাযাবর, দেশের গভীর জঙ্গলে পর্বতগুহার মধ্যে তাদের বাস। তারা এখনও প্রস্তর যুগ ছেড়ে বর্তমান সভ্যতার আলোতে আসতে পারেনি, চকমকির পাথরে আগুন জ্বালা, পাথরের ছুরি দিয়ে শীকার করা এমনি সব আদিম যুগের ব্যবহার এদের দৈনন্দিন জীবনে আজও প্রাধান্য লাভ করে রয়েছে।

কুখ্যাত 'White Australia Policy' অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোন এশিয়াবাসীকে উপনিবেশ স্থাপনের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রায় ৭৫ বছর পূর্বে বহু এশিয়াবাসীকে এই দেশে বাস করবার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। এইসব এশিয়া-বাসীদের মধ্যে কয়েকজন জাপানী, চীনা এবং প্রায় এক সহস্র ভারতীয় পাঠান ছিল। অস্ট্রেলিয়ার শহরে জনসংখ্যা কি রকম অল্প তার একটি মাত্র উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অঞ্চল ৫২৩,৬২০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে আছে। এই অঞ্চলে ৩,৩০০ শ্বেতাঙ্গের এবং ১৮০০০ আদিম অধিবাসীর বাস। লোকের একান্ত অভাবে এই অঞ্চলের বিশাল উর্বর ভূমিখণ্ড পড়ে আছে। অস্ট্রেলিয়াবাসীরা অধিকাংশ বড় শহরে বাস করে। সিডনী অস্ট্রেলিয়ার প্রধান শহর; এই শহরে ১,২৬০,০০০ লোকের বাস। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহৎ নগর হিসাবে সিডনীর স্থানও দ্বিতীয়। মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ নগর। লোক সংখ্যা ১,০০০,০০০।

অস্ট্রেলিয়ার মাটি ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত। খেলাধুলোয় অস্ট্রেলিয়াবাসীদের সুনাম আছে। পৃথিবীর ক্রিকেট মহলে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সুনাম যথেষ্ট। ক্রিকেটের যা কিছু আকর্ষণ তা ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্টম্যাচ। উভয় দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় ১৮৮২ সাল থেকে। ঐ বছর অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে ক্রিকেট বিজয়ের গৌরব লাভ করে। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে খেলার পরিসমাপ্তি হয়। এই পরাজয়ের গ্লানিমা ইংলণ্ডবাসী ভুলতে পারেনি। ইংলণ্ডের বিখ্যাত The Sporting Times পত্রিকার ১৮৮২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সংখ্যার খেলার খবরের সঙ্গে কাল বর্ডার দিয়ে নিম্নলিখিত খেদ উক্তিটিও ছাপা হয়েছিল—In affectionate rememberance of Cricket...... The body will be cremated and the ashes taken to Austalia. ক্রিকেট খেলায় Ashes কথার উৎপত্তি এর পর থেকেই। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ড এই দুই দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা Ashes লাভের জন্য আজও ক্রিকেট খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে।

আজ-কাল

ক্রিপসের ব্যর্থতা

কংগ্রেস-ক্রিপস আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তাঁর ব্যর্থতা জানিয়ে সদলবলে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছেন এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন।

বৃটিশ প্রস্তাব কেন অগ্রাহ্য হ'ল এবং আলোচনা কেন বিফল হ'ল তার পূর্ণ তথ্য এখন প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাব এবং কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পরবর্তী পত্রাবলী তো প্রকাশিত হয়েছেই, উপরন্তু এ বিষয়ে মৌলানা সাহেব, স্যার স্ট্যাফোর্ড এবং পণ্ডিত জওহরলালের একাধিক বিবৃতিও বার হয়েছে।

কংগ্রেস তার প্রথম সিদ্ধান্তে বৃটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং কেন যে ঐ প্রস্তাব গ্রহণীয় নয় তার কারণ দেখায়। ভারত সম্পর্কে প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আপত্তিকর যা যা আছে তার উল্লেখ করেন (শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদে দেশীয় নৃপতিদের ইচ্ছে মতো প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষমতা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে কোনো প্রদেশের বাইরে থাকবার অধিকার ইত্যাদি)। কিন্তু বর্তমানই ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবে বলে' কংগ্রেস ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চেয়ে বর্তমান ক্ষমতার কথাই বড় মনে করে এবং দেশরক্ষার প্রশ্নকেই প্রধান করে।

এর পর আলোচনা এবং পত্র-বিনিময় আরম্ভ হয়। কারণ কংগ্রেস স্বদেশের বর্তমান বিপদের কথা স্মরণ করে' দেশকে রক্ষা করবার একটা কার্যকরী ব্যবস্থার জন্যে আগ্রহান্বিত হয় এবং একটা সমাধানের পথ একেবারে রুদ্ধ করতে ইচ্ছুক হয় নি। স্যার স্ট্যাফোর্ডও বাহ্যত সেই রকম মনোভাব দেখান। কিন্তু পরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কার্যত তিনি তথা বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কোনো প্রকৃত ক্ষমতা ভারতবাসীকে দিতে প্রস্তুত নন। পরবর্তী পরিবর্তিত প্রস্তাবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট একজন ভারতীয় দেশরক্ষা সচিব করতে রাজী হন; কিন্তু সমর-পরিচালনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের হাতে রাখবার ব্যবস্থা করেন। দেশরক্ষা-সম্পর্কিত কতকগুলো বিষয় ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে দেওয়ার কথা হয়; কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁর কতখানি ক্ষমতা থাকবে তা স্যার স্ট্যাফোর্ড স্পষ্ট করে বলতে চাননি। দ্বিতীয়ত, স্যার স্ট্যাফোর্ড প্রথম প্রথম 'জাতীয় গভর্নমেণ্ট', 'মন্ত্রিসভা', 'মন্ত্রী' কথাগুলো ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু শেষ সাক্ষাতে তিনি সে কথাগুলোও সাবধানে বাদ দিয়ে বড়লাটের শাসন-পরিষদেরই উল্লেখ করতে থাকেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও লীগও আপত্তি করেন নি; তাঁরা শুধু বড়লাটের 'ভিটো' ক্ষমতা (সচিবদের মত অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা) সঙ্কুচিত করতে চান, তাও আইন দ্বারা নয়, প্রথা দ্বারা। তাঁরা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের হস্তক্ষেপও ছাঁটাই করতে চান। অর্থাৎ তাঁরা ভারতবাসীর তরফ থেকে কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব চান। কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড তাতেও রাজী হন নি। তিনি যেসব যুক্তিতে কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তা মিঃ এমেরীর পুরনো বুলির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

জওহরলালের বিবৃতি

স্যার স্ট্যাফোর্ড প্রথম দিকে শ্রুতিমধুর কথা বলে' শেষের দিকে বেয়াড়া কথা বলতে লাগলেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জওহরলাল বলেছেন যে, স্যার স্ট্যাফোর্ডের 'সিনিয়র পার্টনার'রা অর্থাৎ বৃটিশ রক্ষণশীলরা বোধ হয় তাঁকে শাসানি দিয়েছে। পণ্ডিত নেহরু তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় জনসাধারণকে যদি এই যুদ্ধে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেওয়াতে হয় তাহলে ভারতবাসীর ক্ষমতা পাওয়া চাই, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই তাদের লড়াই করা দরকার। এই সঙ্গে এ কথাও তিনি বলেছেন যে, জাপান আমাদের স্বাধীনতা দেবে এ মনে করা বাতুলতা; ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ভারতবাসীকে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ সমর-প্রচেষ্টায় বাধা দেবে না; কিন্তু সে সমর-প্রচেষ্টায় সে যোগও দিতে পারে না; সুতরাং আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে সে সমরপ্রচেষ্টায় যোগ না দিয়ে এবং তা ব্যাহত না করে' আমরা কিভাবে স্বাধীন ভারতের ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের সমর-প্রচেষ্টা সংগঠন করতে পারি। তিনি আশা করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি আগামী বৈঠকে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন। প্রয়োজন দেখা দিলে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে গরিলা-যুদ্ধ চালাতে হবে, এমন কথাও তিনি বলেন। জাতীয় গভর্নমেণ্টের (বিদেশী নয়) পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করা উচিত, এই অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই গান্ধীজীর সঙ্গে ভিন্নমত। আর এক বিবৃতিতে জওহরলাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিন সংবাদপত্রের মাতব্বরি করার প্রতিবাদ করেন।

দমন-নীতির কথা

স্যার স্ট্যাফোর্ড বিদায় নেবার আগে বলে যান যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরিবর্তনে এবার বৃটিশ গভর্নমেণ্ট উদ্যোগী হবেন না। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এখন গভর্নমেণ্ট দমন-নীতি চালাবেন কিনা, তখন তিনি উত্তর দেন যে, না, সমর-প্রচেষ্টায় বাধা না দিলে কিছু করা হবে না; তবে "সুভাষ বসুর মতো লোকদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।"

কলকাতার হিন্দী দৈনিক পত্র "বীর ভারত"-এ আপত্তিকর লেখা প্রকাশ করা হয়েছে ব'লে বাঙলার গভর্নর ঐ পত্রিকার প্রকাশ ভারতরক্ষা বিধানে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ গত শনিবার "জয়শ্রী" পত্রিকার কার্যালয় খানাতল্লাস করে এবং শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে গ্রেপ্তার করে। ভারতরক্ষা বিধানে কলকাতার আরও কয়েকজন ফরওয়ার্ড ব্লক-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সিংহলে সম-সমাজ দলের চারজন বন্দী সদস্য কারাগার থেকে পালিয়েছেন; এ'দের মধ্যে দুজন স্টেট কাউন্সিলের সদস্য। গভর্নমেণ্ট ঐ দলকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন এবং দলের বিশিষ্ট সদস্যদের গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়েছেন। প্রকাশ, দলটি ট্রট্স্কি-পন্থী।

বঙ্গোপসাগরে জাপ নৌবহর

বঙ্গোপসাগরে ভারতবর্ষের উপকূলভাগে এবং সিংহলে জাপানীদের সামরিক তৎপরতার আরও বিস্তারিত খবর পাওয়া গেছে। মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় বলেছেন যে, এক শক্তিশালী জাপ নৌবহর বঙ্গোপসাগরে বিচরণ করছে; ঐ নৌবহরে ৩টা ব্যাট্‌ল্‌সিপ, ৫টা বিমানবাহী রণতরী, কতকগুলি বড় ও ছোট ক্রুজার এবং আরও অনেক ক্ষুদ্রতর রণতরী আছে। এই নৌবহর থেকেই জাপানীরা আক্রমণ চালাচ্ছে। ৯ই এপ্রিল সকালে জাপ বিমান বহর পূর্ব সিংহলের নৌঘাঁটি ত্রিঙ্কোমালীর পোতাশ্রয় আক্রমণ করে; এবং ঐ সময়ই কিছুদূরে সমুদ্রে বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ 'হার্মিস' জাপানীরা বোমা মেরে ডুবিয়ে দেয়। তার আগে সিংহলের কাছে সমুদ্রে তারা বৃটিশ ক্রুজার 'ডর্সেন্টশায়ার' ও 'কর্নওয়াল'কেও বোমা মেরে ডুবিয়ে দেয়। এ দুটো ক্রুজার কবে ডোবে তা বলা হয়নি। স্থলভাগের প্রতিপক্ষ বিমানকে ব্যাপৃত রেখে প্রতিপক্ষের রণতরীর উপর আক্রমণ চালায়। কলোম্বোর উপর যে সময় হানা হয় সেই সময়ই বৃটিশ ক্রুজার দুটি আক্রান্ত হয় কি না কিংবা ত্রিঙ্কোমালী আক্রমণের দিনই আক্রান্ত হয় কি না জানা যায় নি। নিমজ্জিত তিনটি রণতরীর ঘাঁটি ছিল কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালী। মিঃ চার্চিল আরও বলেন, ত্রিঙ্কোমালীতে হানার সময় বৃটিশ টর্পেডো-বোমারু ও জঙ্গী-বোমারু বিমান জাপ বিমানবাহী জাহাজ আক্রমণ করে; কিন্তু প্রায় সমস্ত বৃটিশ বিমানই ধ্বংস বা ঘায়েল হয়। কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালীর উপর মোট ৭৫টি জাপ বিমান বিনষ্ট হয়।

গত ৬ই এপ্রিল সকালে উড়িষ্যার উপকূলের কাছে জাপানীদের দুটো বড় ক্রুজার ও একটা ডেস্ট্রয়ার একটা কনভয় আক্রমণ করে ৬টা বাণিজ্য জহাজ ডুবিয়ে দেয়। চার্চিল উল্লিখিত জাপানী নৌবহরটিকে দিন দশেক আগে সিংহলের দিকে আসতে দেখা গিয়েছিল; কিন্তু আর তার খবর নেই। সুতরাং সে তার গতি পরিবর্তন করেছে বলে' মনে হয়। কিন্তু গেল কোন্ দিকে?

মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে, মাদ্রাজের বিপদ এখন আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে; সুতরাং মাদ্রাজ শহর থেকে সরকারী দপ্তর ও বিভাগীয় কর্তারা ভিতর দিকে সরে যাচ্ছেন। শুধু গভর্নর ও তাঁর পরামর্শদাতারা মাদ্রাজে থাকবেন। যারা অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিযুক্ত নয় তাদের সকলকে মাদ্রাজ শহর থেকে চলে' যেতে গভর্নমেন্ট আদেশ দিয়েছেন।

ব্রহ্মের যুদ্ধ

ব্রহ্মে ইরাবতী ও সিতাং রণাঙ্গনে অবস্থা কয়েকদিন অনেকটা শান্ত থাকার পর জাপানীরা আবার আক্রমণ আরম্ভ করেছে। টুঙ্গুর উত্তরে ইয়োদাশের উত্তর-পূর্ব দিকে খুব লড়াই চলছে। কিন্তু চীনারা সোয়া নদীর এলাকায় থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করছে। জাপনীরা চীনা সৈন্যদের ঘিরে ফেল্‌বার চেষ্টা করছে; কিন্তু এখনো সফলকাম হতে পারে নি। ইরাবতী রণাঙ্গনে খুব লড়াই চলছে। থাইয়েতমিওর ১৫ মাইল উত্তরে প্রোম ও ইয়েনাঙ্গিউন তৈলখনির মধ্যপথে জপানীদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যের একটা সংঘর্ষ হয়েছে। জপানীরা তাউদ্‌ইঙ্গি দখল করবার জন্যে প্রবল চাপ দিচ্ছে। বৃটিশ পক্ষ বর্তমানে কিছু বিমানের সাহায্য ব্রহ্মে সৈন্যদের দিতে পারছেন সেখানে বৃটিশ বিমান বহর জাপানী সৈন্য সমাবেশের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

এক বৃটিশ বিমন বহর আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে হানা দিয়ে জাপানীদের একটি ফ্লাইংবোট ডুবিয়ে দেয় এবং বাকী দশটাকে জখম করে।

জাপানীদের বোমা বর্ষণে ব্রহ্মের মান্দালয় শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

বাতানের পতন

বাতান যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছে। জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণে শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা সংখ্যাল্প মার্কিন ও ফিলিপিনো সৈন্য বাতান উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। জেনারেল ওয়েলরাইট এবং কিছু সৈন্য দ্বীপ দুর্গ করেজিডরে চলে আসতে পেরেছেন। সেখান থেকে তাঁরা লড়াই চালাচ্ছেন। বারো হাজার জাপ সৈন্য ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত সেবু দ্বীপে অবতরণ করেছে মার্কিন সৈন্যেরা বাধা দিচ্ছে। বাতানের পতনে জাপ নৌ-বহরের পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ আরও সুগম হলো।

সোভিয়েট রণাঙ্গন

ইওরোপের রণাঙ্গনে সোভিয়েট-জার্মান সংঘর্ষ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রেখেছে। মধ্য অংশে লাল ফৌজ শ্বেত রুশিয়ার সীমা কয়েক স্থানে অতিক্রম করেছে। এ অঞ্চলে জার্মানরা যে পাল্টা আক্রমণ করেছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। ক্রাইমিয়াতেও সোভিয়েট সৈন্য প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছে।

সোভিয়েট মুখপাত্র মঃ লজোভ্স্কি সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, ১৯৪২ সালে হিটলারী জার্মানী জার্মান বাহিনীর পরাজয় অবধারিত। কোনো কোনো সোভিয়েট প্রচারক বল্‌ছেন যে জার্মানী খুব সম্ভব বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভই করতে পারবে না।

১৪-৪-৪২ —ওয়াকিবহাল



বোম্বের চিঠি

ভায়া,

কলম্বো বোম্বড, ভিজাগ্ বোম্বড্। বোম্বে ঃ—নামের মাঝেই বোম্ব। বৃষ্টির অভাবে শহর শুকিয়ে বারুদের স্তূপ। এ'হেন বোম্বাই শহরে বাস করছি—হাঁ করে শুধু ভাবছি কবে রসালো বোম্বাই আম খেতে পাব। এখনো পাচ্ছি শুধু বোম্বাই গুঁতো। পড়ছি বোম্বাইয়া ভাষা—নমুনা শুনবে—'বোম্বাইয়ের বাবুরাও' Film India'তে 'আপনা ঘর' ছবির সমালোচনায় লিখছে—Chandra Mohan is a great artist. He is the best actor in India—not only in India but in the world: ঠিক এই ইংরেজী নয়। তবে এ-রকম, কাগজটা পড়ে দেখো ভায়া, আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়েছে, Babu Rao Patel is the best Bomb of Bombay—not only of Bombay, but of India—why of India of the whole world.



'খিলাওনা' চিত্রে স্নেহপ্রভা ও পি জয়রাজ

*　　*　　*　　*

'ডাক্তার' হিন্দী, বোম্বে শহরের 'Blackout'কে সুসম্পন্ন হতে দিচ্ছে না। 'ডাক্তার' হয়েও এমনভাবে চলা কি যুক্তিসংগত? Black-out-এর রাতে রাস্তায় এত ভীড় কি উচিত? পরিচালক সুবোধ মিত্র নিশ্চয়ই এজন্য দায়ী।

*　　*　　*　　*

Cinema Advisory Board-এ বাঙালী আছে কিনা খবরটা দিতে পারো কি ভায়া? বাঙালীরা বুঝি ঐ Board-এ যোগ দেবার উপযুক্ত এখনো হয়নি! খোঁজ করে দেখতো! Cripps সাহেব যখন শত বৎসর পরে আবির্ভূত হয়ে আজ বলছেন—এতদিনে ভারত Dominion Status এমনকি Free India হবার উপযুক্ত হয়ত হয়েছে—তখন, হয়তো পোড়া বাঙলা Cinema Advisory Board-এর member না হোক অন্তত পিওন হবার উপযুক্ত হলেও হতে পারে।

*　　*　　*　　*

চিমনলাল ত্রিবেদী, মিঃ কৃপারাম, শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় ওঁদের 'মেরা গাঁও'য়ের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে লেগেছেন দেখছি। তিন ঝানুমাথা প্রায় সময়ই একত্র। গাঁয়ের উন্নতি শক্ত কাজ। তবু, ছবির এই তিন করিৎকর্মার সম্মিলিত হাসির অট্টরোলে মনে হচ্ছে এই শক্ত কাজ তাঁরা হয়ত সম্পন্ন করতে পারবেন। ভাবনা ছিল—ছায়া-ছবির জন্য ছায়া দেবীকে। তিনি এসে গিয়েছেন।



'হলিডে ইন বম্বে' ছবিতে শোভনা সমর্থ

*　　*　　*　　*

বোম্বের এক কাগজ লিখছেন, যার অনুবাদিত মর্ম হচ্ছে—'রাশিয়া যখন এখন আমাদের দোস্ত, তখন আমেরিকান raw film-এর জন্য হাপিত্যেশ করে না থেকে, রাশিয়ান্ raw film আনা যায় না কি?' বেচারা কাগজ প্রশ্নই করেছে—জবাব আজও পায়নি।

—বোম্বাইওয়ালা

লক্ষ্মী—'অনজান'—বম্বে টকীজের নূতন ছবি 'অনজান' এখানে আগামী শনিবার থেকে তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করবে। বহুদিন পরে যশস্বী চিত্রাভিনেত্রী দেবিকারাণী আবার এই ছবিতে অশোককুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন দেশাই, পিঠাওয়ালা, সুরেশ প্রভৃতি। আগামী সপ্তাহে এই ছবি সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাবো।

প্যারাডাইস ও গণেশ—'খিলাওনা'—অমর পিকচার্সের হিন্দী সামাজিক ছবি 'খিলাওনা' একযোগে এই দুই ছায়াচিত্র-গৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন স্নেহপ্রভা; নাচে ও গানে ছবিটিকে ইনি সমৃদ্ধিদান করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় জয়রাজ, প্রভা, সতীশ মুখার্জি, ডি গোস্বামী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।



'অপরাধ' চিত্রের নায়িকা—মনিকা দেশাই

রূপবাণী—'অপরাধ'

মুভি টেকনিক সোসাইটির নূতন ছবি 'অপরাধ' গত সপ্তাহ হ'তে রূপবাণী চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রীযুত মণীন্দ্রকুমার দত্তর লেখা কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তোলা এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীযুত ফণী মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুমধুর ও জনপ্রিয় গান এ-ছবির বিশেষ সম্পদ। হিন্দু সমাজের বহুবিবাহ রীতির প্রতি তীব্র কষাঘাত ক'রে ছবিটি তোলা। তিনজন নূতন অভিনেতার পরিচয় এ-ছবিতে পাওয়া যাবে—তাঁরা হচ্ছেন শ্রীযুত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শঙ্করলাল, ও ধ্রুব চক্রবর্তী। মণিকা দেশাই অভিনয় করেছেন নায়িকার ভূমিকায়। আগামী সপ্তাহে আমরা এ-ছবির বিস্তারিত আলোচনা করব।

জ্যোতি—'হলি-ডে ইন বম্বে'

সুদামা প্রডাকসন্সের হাল্কা রসের এই ছবিটি গত সপ্তাহ থেকে জ্যোতি সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় শোভনা সমর্থ, সবিতা, অরুণ প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

আগামী চিত্রকথা

এম্ পি প্রডাকসন্সের হিন্দী ছবি 'জবাব' ও বাঙলা 'শেষ উত্তরে'র কাজ পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন কমল দাশগুপ্ত।

* * * *

শ্রীমতী শ্রীলেখা মুখার্জি সম্প্রতি বম্বে গিয়েছিলেন, এ সংবাদ পূর্বে আমাদের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। বম্বের যে



'হলিডে ইন বম্বে' ছবিতে সবিতা দেবী

চিত্র প্রতিষ্ঠানে তাঁর যোগ দেবার কথা ছিল, কোন কারণবশত তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি সম্প্রতি বম্বে থেকে ফিরে এসেছেন। আপাতত তিনি কলকাতাতেই আছেন এবং নিউ থিয়েটার্সের দোভাষী চিত্র 'কাশীনাথ'এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন। 'কাশীনাথ' শরৎচন্দ্রের গল্প এবং তা পরিচালনা করছেন নীতিন বসু। বহুকাল পরে অমর মল্লিককে এ-ছবির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * * *

চিত্রবাণী লিমিটেডের দ্বিতীয় ছবি 'গরমিল'এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নীরেন লাহিড়ী ছবির পরিচালনা করছেন।

* * * * *

অজয় ভট্টাচার্যর পরিচালনায় মডার্ন টকীর 'অশোক' চিত্রটি আগামী মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ছবিটি 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।



বাঙলায় নববর্ষ উৎসবে ব্যায়াম প্রদর্শনী

বাঙলার নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এই নববর্ষের প্রথম দিনে বাঙলার উৎসাহী ব্যায়ামবীরগণ প্রতি বৎসর সম্মিলিত ব্যায়াম ও কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া থাকেন। এইবারেও কয়েকটি স্থানে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তবে সেই সকল অনুষ্ঠান অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিছুই নহে। বাঙলার দ্বারে আজ পৃথিবীগ্রাসী সমরানল। বাঙালী আজ আতঙ্কগ্রস্ত, অসহায়, উপায়হীন। প্রাণরক্ষার জন্য অসহায় জীবের ন্যায় বাঙলার এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ক্লাব, সংঘ, ব্যায়ামাগার সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। স্কুল, কলেজ প্রভৃতিরও অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে। এইরূপ সময় নববর্ষের প্রথম দিনে যাঁহারা ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ১৯৩১ সালে যে অনুষ্ঠান বাঙলায় প্রথম প্রচলিত হয় তাহার অস্তিত্ব যে একেবারেই লোপ পায় নাই এবং পাইতে যে পারে না, ইঁহারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

১৯৩১ সালে ৫০টি যুবক যে ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সারা বাঙলার যুবক যুবতী, বালকবালিকাকে উৎসাহিত করি[illegible]ন। দৈহিক শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তির বিকাশ এবং এই দইুটি শক্তির একত্র সমাবেশ মানুষের জীবনযাত্রা যে কতখানি সুগম করে তাহা যাহারা এই পথের পথিক তাহারা খুব ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান যুবক-যুবতীর একত্র সমাবেশ জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত করে ইহাও আজ নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। বৈদেশিক শক্তিশালী জাতিসমূহ সেই আদর্শ বহুদিন সারা জগতের মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। বাঙলার যুবকযুবতীগণ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর দিকে দৃষ্টি দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় প্রথম কয়েক বৎসর তাহারা কার্যক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে না। বাঙলাদেশে, এমন কি ভারতের কোন অঞ্চলে এইরূপ ব্যায়াম পদ্ধতি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তাহাদের বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৩৩ সালে



নববর্ষ উৎসবে বালিকাদের ব্যায়াম

এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দ উপভোগের উপায় নহে, ব্যায়াম উৎসাহীদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের কৌশল নহে। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনাহারক্লিষ্ট, বৈচিত্র্যহীন, পরাধীন বাঙালীর প্রাণে নব উদ্দীপনা, নব প্রেরণা জাগ্রত করা। সংঘবদ্ধ ও কর্ম্মক্ষমতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। হয়তো এই উদ্দেশ্য এখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কিন্তু একদিন যে হইবে সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। বাঙালী চিরকাল নির্জীব, কর্ম্মক্ষমতাহীন থাকিতে পারে না। অকর্মণ্যতার প্রভাব বাঙলার উপর ছড়াইয়া পড়ার ফলেই যে বাঙালীর এই দুর্দশা তাহা প্রত্যেক বাঙালী আজ অনুভব করিতেছে। দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা আর বাঙালীকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তাহা যদি হইত তবে বাঙলা সরকার একটি ব্যায়ামকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাহার নিয়মকানুন এইরূপভাবে বাঁধিয়া দেন যে, তাহাতে সাধারণের প্রবেশ একরূপ নিষিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র সরকারের পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকগণ যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী তাঁহারাই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেন। সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী প্রচলনের যাঁহারা উদ্যোক্তা তাঁহারা হতাশ না হইয়া নিজেরাই বিভিন্ন স্থানে ব্যায়ামকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ব্যায়াম উৎসাহীদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম-ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মাবলী বুঝাইয়া দেন। সেই সাধারণ নিয়মাবলী হইতে যে জ্ঞান লাভ করিল ঐ সকল যুবকগণ তাহা নিজ প্রচেষ্টায় পূর্ণতালাভ করিল। প্রদর্শনী বিভিন্ন স্থানে অতি সহজেই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। নববর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ করিয়া যে ব্যবস্থা হইয়া-

ছিল তাহা এতই জনপ্রিয়তা লাভ করিল যে, উহা সমগ্র ব্যায়াম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল অনুষ্ঠানের কর্মতালিকার এক অবশ্য অঙ্গরূপে দেখা দিল। এই জন্যই গত কয়েক বৎসর নববর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সহস্র সহস্র বালক, বালিকা, যুবক, যুবতীকে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছে। এই বৎসর জাপান-যুদ্ধ বাঙালীর ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়াছে। বাঙালী কোনরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। সেইজন্য এই বৎসরের নববর্ষ অনুষ্ঠানের সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীসমূহ ভাল হয় নাই এবং যোগদানকারীদের সংখ্যাও খুবই কম হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। যে শিক্ষা বাঙলার ব্যায়াম-উৎসাহিগণ একবার লাভ করিয়াছে তাহা দুই এক বৎসরে নষ্ট হইবে না। যুদ্ধের অবসান হইলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই পুনরায় তাহাদিগকে দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিতে দেখা যাইবে। বৈদেশিক জাতিসমূহ যেরূপভাবে বিরাট আকারে এই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এদেশেও সেইরূপেই করিতে দেখা যাইবে। সাময়িক বিপদ বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু আদর্শ ধ্বংস করিতে পারে না।

সাংবাদিকগণের এ্যাথলেটিক স্পোর্টস

বাঙলার সাংবাদিকগণ সংবাদ সরবরাহ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ করিবার মত স্থান তাঁহাদের নাই। সংবাদপত্রের পরিচালকগণকে পর্যন্ত এই বিষয় বলিয়া তাঁহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। শেষে কয়েকজন সংবাদপত্রসেবী একত্র হইয়া স্থির করেন যে, তাঁহারা অবসর সময় বিভিন্ন খেলাধুলায় যোগদান করিবেন। বিশিষ্ট খেলাধুলা প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের সহিত খেলিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। এই ব্যবস্থামত তাঁহারা কয়েক বৎসর চলিতে থাকেন। তখন ঐ ক্লাবের নাম হয় "প্রেস ক্লাব"। ঐ প্রেস ক্লাব ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় যোগদান করেন। তিন চারি বৎসরের অভিজ্ঞতার পর তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সকল খেলাধুলা ও স্পোর্টস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাঁহারা যোগদান করিতে পারেন। কলিকাতার সকল সংবাদপত্রের খেলাধুলা বিভাগের প্রতিনিধিদের একত্র করিয়া তাঁহারা একটি স্থায়ী ক্লাব গঠনের পরিকল্পনা করেন। এই আলোচনার ফলে "প্রেস ক্লাবের" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "পেন এণ্ড ইঙ্ক ক্লাব" রাখা হয়। এই পেন এণ্ড ইঙ্ক ক্লাবের প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতার বিষয় অধিক না হইলেও সকলগুলি বেশ দর্শনযোগ্য হয়। সকল বিভাগেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রবীণ সাংবাদিকগণ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে যোগদান করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা দল' ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেন। প্রথম অনুষ্ঠান যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠান যে বাঙলার ক্রীড়াজগতে এক বিরাট স্থান অধিকার করিবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

ফুটবল কিকিং

১ম মুকুল দত্ত (আনন্দবাজার), ২য় খগেন সেন (আনন্দবাজার), ৩য় সৌরেন ঘোষ (অমৃতবাজার)।

১০০ গজ দৌড়

১ম এস পালসাই (আনন্দবাজার), ২য় মুকুল দত্ত (আনন্দবাজার), ৩য় বিভূতি চ্যাটার্জি (আনন্দবাজার)।

স্লো সাইকেল রেস

১ম শঙ্কর মিত্র (যুগান্তর), ২য় পঙ্কজ গুপ্ত (অমৃতবাজার), ৩য় অনু রায় (অমৃতবাজার)।

ক্যাঙ্গারু দৌড়

১ম বিভূতি চ্যাটার্জি (আনন্দবাজার), ২য় মুকুল দত্ত (আনন্দবাজার), ৩য় অজিত সিংহ (অমৃতবাজার)।

হকি ড্রিবলিং

১ম আর রিগ্যাল (ষ্টেটসম্যান), ২য় পি মিশ্র (আনন্দবাজার), ৩য় পঙ্কজ গুপ্ত (অমৃতবাজার)।

দড়ি টানাটানি

বিজয়ী—আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার দল সেমিফাইন্যালে স্টেটসম্যান ও ফাইন্যালে অমৃতবাজার পত্রিকাকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছে।

বিজয়ী দলে ছিলেনঃ—ব্রজরঞ্জন রায়, বিভূতি চ্যাটার্জি, পি মিশ্র, সি বি চ্যাটার্জি, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং কুশল ভট্টাচার্য।

৪×১০০ গজ রীলে দৌড়

বিজয়ী—আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার দল স্টেটসম্যান ও এডভান্স দলকে পরাজিত করিয়াছে।

বিজয়ী দলে ছিলেনঃ—বিভূতি চ্যাটার্জি, মুকুল দত্ত, জে সেন এবং এস পালসাই।

এক মাইল সাইকেল রেস্

১ম এস ঘোষ (স্টেটসম্যান), ২য় শঙ্কর মিত্র (যুগান্তর), ৩য় অনু রায় (স্টেটসম্যান)।

নিজস্ব চ্যাম্পিয়নসিপ

বিজয়ী—মুকুল দত্ত (আনন্দবাজার)—২৬ পয়েণ্ট।

দলগত চ্যাম্পিয়নসিপ

বিজয়ী—আনন্দবাজার পত্রিকা—৮০ পয়েণ্ট।

সমরবার্তা

৮ই এপ্রিল—

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ৬ই এপ্রিল তারিখের বিমান আক্রমণে ভিজাগাপটমে ৫ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হইয়াছে এবং কোকনদে একজন নিহত এবং ৫ জন আহত হইয়াছে।

ব্রহ্ম ইস্তাহারে প্রকাশ, ইরাবতী রণাঙ্গনের কোন পরিবর্তনের খবর পাওয়া যায় নাই। উত্তর ব্রহ্মের একটি শহরের উপর বোমা বর্ষণ হয়।

ফিলিপাইন—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে বাতান রক্ষাকারী মার্কিন ও ফিলিপিনো সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিয়া পূর্বে প্রস্তুত একটি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

রুশিয়া—মস্কো বেতারে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী গতকল্য দক্ষিণ-পশ্চিম (খারকভ) রণাঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে।

৯ই এপ্রিল—

ভারত মহাসাগরে জাপ বিমান আক্রমণের ফলে বৃটিশ ক্রুজার "ডর্সেটসায়ার" (৯,৯৭৫ টন) এবং "কর্নওয়াল" (১০,০০০ টন) জলমগ্ন হইয়াছে। এগার শতের অধিক নাবিক ও নৌ-সৈনিক রক্ষা পাইয়াছে ; তাঁহাদের মধ্যে দুইজন কম্যান্ডিং অফিসার।

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে জাহাজসমূহের উপর শত্রুপক্ষের নৌ ও বিমান আক্রমণের ফলে কয়েকটি পণ্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জাহাজ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত চারি পাঁচশত লোক উড়িষ্যা উপকূলে বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করিয়াছে।

সিংহল—অদ্য সকালে জাপ বিমান সিংহলের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ত্রিঙ্কোমালি পোতাশ্রয়ের উপর হানা দেয়। বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। একই সময়ে কলম্বোর উপর দুইটি শত্রুপক্ষীয় বিমান দেখা যায়। কোন বোমা নিক্ষিপ্ত হয় নাই।

ব্রহ্ম—গত ৩রা এপ্রিল জাপানের বেপরোয়া বিমান আক্রমণের ফলে মান্দালয় নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। হাসপাতাল, গীর্জা, বাসগৃহ নির্বিশেষে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা হয়। অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্মিত বলিয়া সহজেই আগুন ধরিয়া যায়। হতাহতের সংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হয়। আক্রমণের অনতিকাল পরেই দলে দলে লোক শহর ত্যাগ করে।

১০ই এপ্রিল—

বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ "হার্মিজ" সিংহলের উপকূলের নিকটে জাপ বিমান আক্রমণের ফলে জলমগ্ন হইয়াছে। সম্ভবত উহার বহু লোক তীরে পৌঁছিয়াছে ; কারণ উহা তীর হইতে মাত্র দশ মাইল দূরে নিমজ্জিত হইয়াছে। হার্মিজ ১০৯৫০ টনের জাহাজ ছিল।

কলম্বোর এক সরকারী ইস্তহারে প্রকাশ যে, গতকল্য ত্রিঙ্কোমালিতে বিমান হানার সময় ২১খানি জাপ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ১২খানা সম্ভবত ধ্বংস হইয়াছে এবং ২খানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গতকল্য ত্রিঙ্কোমালিতে জাপ বিমান আক্রমণ সম্পর্কে কলম্বোর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হয় যে, গতকল্য প্রাতে বহু জাপ বোমারু ও জঙ্গী বিমান ত্রিঙ্কোমালি আক্রমণ করে। পোতাশ্রয় ও বিমান ঘাঁটির ক্ষতি হইয়াছে। পোতাশ্রয়ে নৌ-বিভাগীয় ও অসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

ফিলিপাইন—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, করিজিডর এবং বাতানের মধ্যেকার সংযোগসূত্র প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল পূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং অনুমান হয় যে, বাতানে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার বলেন যে, গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও বাতান রক্ষিবাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়িবার অটুট সঙ্কল্প লইয়া বাহির হয়। এত সামান্য সাজসরঞ্জাম লইয়া কোন সেনাদল আজ পর্যন্ত এমন সৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

১১ই এপ্রিল—

ব্রহ্মের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, গত ৮ই এপ্রিল নায়াউং-বিনথা অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় টহলদারী সৈন্যদের সহিত প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদের যে সংঘর্ষ হয়, তারপর এ যাবৎ ইরাবতী রণাঙ্গন হইতে আর কোন সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, টঙ্গুর উত্তর দিকস্থ চীনা বাহিনীকে বেষ্টন করার জন্য জাপানীগণ উত্তরাভিমুখে তিন দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে।

ফিলিপাইন—প্রায় ১২ হাজার জাপ সৈন্য সেবু দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। অবতরণ করিবার সময় তাহারা প্রচণ্ড বাধা পাইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

১২ই এপ্রিল—

ব্রহ্ম ইস্তাহারে প্রকাশ, প্রতিপক্ষের টহলদার বাহিনী মাগুইয়ের দক্ষিণে এক ব্যাপক রণাঙ্গন জুড়িয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ফিলিপাইন—করিজিডর ও ম্যানিলা উপসাগরের ফোর্ট হিউজেসের উপর বিমান আক্রমণ হয়।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মঃ কালিনিন 'ইজভেস্তিয়ায়' এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনে হিমক্লিষ্ট হইয়া দুই লক্ষ হইতে তিন লক্ষের মত জার্মান সৈন্য অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই এপ্রিল—

ইস্টারের অবকাশের পর পার্লামেন্টের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে অদ্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ভারত মহাসাগরের সাম্প্রতিক নৌযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং 'ডর্সেটসায়ার' ও 'কর্নওয়াল' নামক দুইখানি ক্রুজার এবং 'হার্মিজ' নামক বিমানবাহী জাহাজের নিমজ্জন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। মিঃ চার্চিল প্রকাশ করেন যে, কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালি আক্রমণের পূর্বে একটি জাপ নৌবহরকে সিংহল অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছিল। উক্ত নৌবহরে তিনখানি যুদ্ধ জাহাজ, পাঁচখানি বিমানবাহী জাহাজ এবং কয়েকখানি ভারী ও লঘু ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার ছিল। মালয় ও সিঙ্গাপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে মিঃ চার্চিল জানান যে, মেজর জেনারেল গর্ডন বেনেটের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে।

ভাইস এডমিরাল স্যার জিওফ্রে লেটনের স্থলে প্রাচ্যের বৃটিশ নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে স্যার জেমস এফ সমারভিলের নিয়োগ সংবাদ এক্ষণে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম—চুংকিংয়ের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা টঙ্গু হইতে উত্তর দিকে অভিযান সুরু করিয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—

ইরাণ জাপানের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিয়াছে এবং তেহরাণ স্থিত জাপ দূতকে সাত দিনের মধ্যে তেহরাণ পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

৮ই এপ্রিল—

দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সারাদিনব্যাপী অধিবেশন হয়। পণ্ডিত নেহরু পুনরায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দূত কর্নেল লুই জনসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৭ই এপ্রিল হইতে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল তৎসমুদয়ই পুনরাদেশ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

মিশরের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী আলি মাহের পাশাকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৯ই এপ্রিল

মারকারা হইতে "হিন্দু" পত্রে প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী তাঁহার পুত্র ও কন্যাসহ মারকারায় পৌঁছিয়াছেন। গত রবিবার এবং সোমবার তিনি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

১০ই এপ্রিল

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার প্রস্তাব গ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিসগয়ার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের আপীল মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন। গত ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় প্রদত্ত এক বক্তৃতা সম্পর্কে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কে এই আপীল করা হয়। ১৯৪১ সালের ২১শে জুলাই তারিখে কলিকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত দত্ত মজুমদারকে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

১১ই এপ্রিল

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে চূড়ান্তভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব কংগ্রেসের নিকট গ্রহণীয় নহে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসও জানাইয়া দিয়াছেন যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের নিকট যে প্রস্তাব তিনি লইয়া আসিয়াছিলেন, সে প্রস্তাব বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রত্যাহার করিয়া লইতেছেন।

অদ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাবটি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সমর মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ কমিটি গ্রহণ করিতে অক্ষম। কমিটি ঘোষণা করিতেছেন যে, বর্তমান সময়ে দেশরক্ষার কর্তৃত্বভার হইতে ভারতীয় সদস্যদিগকে বঞ্চিত রাখিলে ভারতীয়দের উপর কর্তৃত্বদান একটা প্রহসনস্বরূপ হইবে ও সেই কর্তৃত্ব কর্তৃত্বই হইবে না। উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যুদ্ধ বর্তমান থাকাকালে ভারতবর্ষ কোনও দিক দিয়াই স্বাধীন হইতেছে না এবং ভারতের গভর্নমেণ্ট ও স্বাধীন গভর্নমেণ্টরূপে কার্য পরিচালনা করিবার অধিকারী হইতেছেন না।

দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দীর্ঘতম অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কর্মচারিগণ "জয়শ্রী" অফিসে হানা দিয়া ফরোয়ার্ড ব্লকের নেত্রী এবং বি পি সি সি'র জাতীয় মহিলা সেবাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী এ পর্যন্ত কলিকাতায় আসিয়াছে।

বাঙলা সরকারের এক ইস্তাহারে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলি হইতে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকারের মোটর ইত্যাদি যান অন্যত্র অপসারণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

১২ই এপ্রিল

দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সাংবাদিকদের নিকট তিন ঘণ্টাকালব্যাপী এক বৈঠকে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা আক্রমণকারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিব না। আমরা গত ২২ বৎসর যাবৎ যেমন বৃটিশের নিকট পরাজয় স্বীকার করি নাই, তেমনই আমরা বৈদেশিক আক্রমণকারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিব না। এমনও হইতে পারে যে, আমাদিগকে গরিলা যুদ্ধ করিতে হইবে। আমরা ভারতে বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সঞ্চার করিব না।"

মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট মাদ্রাজের সমস্ত অ-প্রয়োজনীয় লোককে শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতগুলির গ্রীষ্মকালীন অবকাশ ১৩ই এপ্রিল হইতে সুরু হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ যে, উড়িষ্যা প্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থান হইতে চতুর্দিকে ২০ মাইলের মধ্যে বাইসাইকেল, মোটর গাড়ি, বাস, সাইকেল-রিক্সা ও ফেরী নৌকা প্রভৃতি সকল প্রকার যানবাহন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হয় ঐ সকল এলাকা হইতে অপসারিত করিতে অথবা পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

ওয়ার্ধায় স্বরাজ্য ভাণ্ডারের উদ্বোধন করিয়া মহাত্মা গান্ধী এক বক্তৃতায় বলেন, "গভর্নমেণ্টের মুদ্রার ন্যায় আমরা সুতার মুদ্রা প্রচলন করিতে পারি না কেন, বহুদিন ধরিয়া আমি তাহা চিন্তা করিতেছি।" তিনি আরও বলেন যে, শ্রীবিনোদ ভাবে তাঁহার সম্মতিক্রমে অদ্য হইতে এক পয়সা হইতে ৫৲ টাকা মূল্যে সুতার মুদ্রা প্রচলন করিতেছেন—এই মুদ্রা দ্বারা চর্মনির্মিত দ্রব্যাদি, চরখা প্রভৃতি দ্রব্য ওয়ার্ধার গ্রাম সেবামণ্ডলের দোকান হইতে কেনা যাইতে পারে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস সদলবলে করাচী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় ব্রহ্মদেশ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে কমিটি আছে, সেই কমিটির হস্তে বাঙলা সরকার ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৪ই এপ্রিল—

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সরকারী দপ্তরখানার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ চিত্তুর জেলার মদনপল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাজের গবর্ণর ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ মাদ্রাজেই অবস্থান করিবেন।

কলিকাতায় দুর্বৃত্তগণ কি করিয়া এ-আর-পি কর্মীর ছদ্মবেশে নগরিকদের উপর রাহজানি করার এক নূতন ফন্দী উদ্ভাবন করিয়াছে, গত কল্য জোড়াসাঁকো এলাকায় অনুষ্ঠিত এক ঘটনা হইতে তাহার একটা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ঐদিন শেষরাত্রে একদল দুর্বৃত্ত উপরোক্তরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ৪নং কৃষ্ণবিহারী সেন স্ট্রীটের বাসিন্দা শ্রীযুত ললিতমোহন পাল নামক জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হইতে প্রায় সাড়ে চারিশত টাকা আত্মসাৎ করিয়া নির্বিঘ্নে চম্পট দিয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

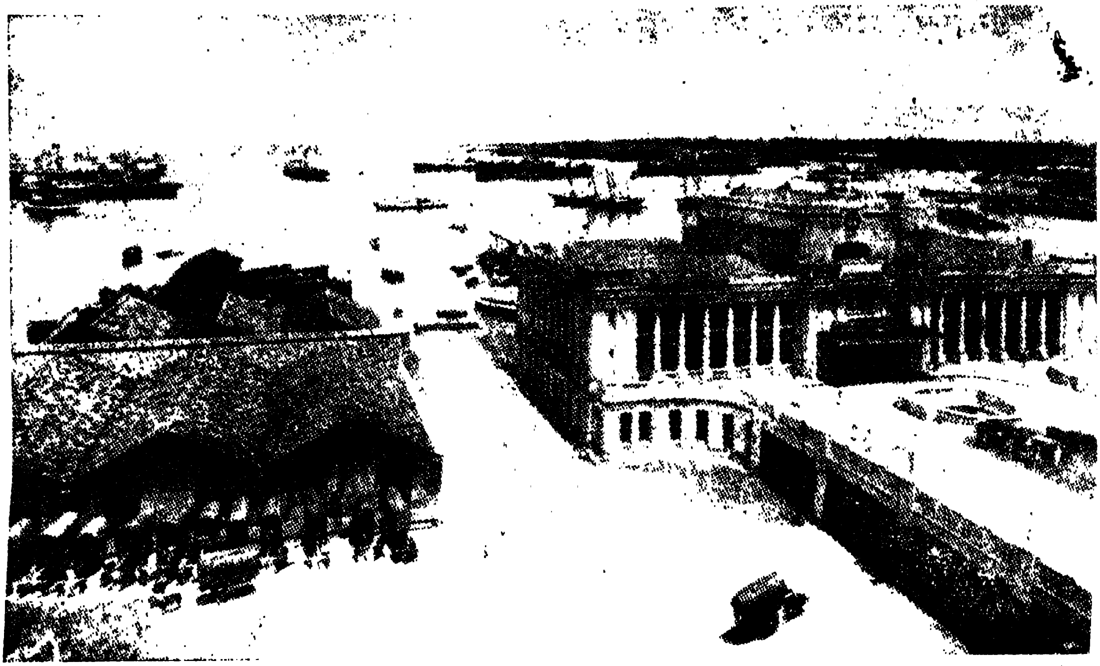
বাঙ্গলার নববর্ষে কুচকাওয়াজ—



নাজিম ড্রিল



ব্যান্ডবাদ্যসহ নববর্ষের কুচকাওয়াজের দৃশ্য



কলম্বোর বৃহৎ কৃত্রিম বন্দর



বার্মার ইরাবতী নদীর পার্বত্য খাল

নববর্ষ ও হিন্দুপঞ্জী

শ্রীসু বসু

ধর্মানুষ্ঠান কিংবা বৈষয়িক ব্যাপারে সময় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা মানুষ বহুকাল যাবতই অনুভব করে আসছে। কোন্ দিন কোন্ সময়ে কোন্ বিশেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে, প্রাচীন ধর্মযাজকগণ সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন; সুতরাং উৎসবের দিনগুলি ঠিকভাবে চিহ্নিত করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথম হতেই সময় পরিমাপের ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হন। রোম, গ্রীস, মিশর, চীন, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে ও হিন্দু, মুসলমান এবং হিব্রু প্রভৃতি জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যাজক শ্রেণীর লোকদের চেষ্টা ও যত্নে সময় পরিমাপের কতগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে গড়ে উঠে এবং ইহাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে এ সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব 'বর্ষপঞ্জী' রচিত হয়। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দিন, মাস, বছর, সপ্তাহ প্রভৃতি সময়ের 'একক'গুলিকে প্রায় সকল দেশের ও সকল জাতির বর্ষপঞ্জীতেই স্বীকার করা হয়েছে। তবে, কতদিনে মাস হবে, কোন্ মাসেই বা কতদিন থাকবে, বছর কতদিনে হবে, দিনের আরম্ভ সূর্যোদয় হ'তে কি মধ্যাহ্ন বা মধ্যরাত্রি হতে ধরা হবে—এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন বর্ষপঞ্জীতে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নববর্ষ আরম্ভের সময় সম্পর্কে তো কথাই নাই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের পঞ্জীতে মতভেদ বেশ চোখে পড়ে। এই কারণেই বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে নববর্ষের অনুষ্ঠান করে থাকে। নববর্ষের উৎসবও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রতিপালিত হয়।

ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হতেই সময় পরিমাপের নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ভারতে যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণের বিশেষ প্রচলন ছিল। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, প্রাচীন হিন্দুদের বর্ষপঞ্জী এইরূপ ধর্মানুষ্ঠানের নির্দেশ প্রসঙ্গেই প্রথম রচিত হয়। বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠেয় উৎসবগুলির দিন সুদূর অতীতেও এমনি নিখুঁতভাবে ধার্য করা হয়েছিল যে, সমস্ত উৎসব পর্ব সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি বৎসরেরও অবসান হত। নূতন বছরে নির্দিষ্ট সময়ে আবার ঐ সমস্ত পর্বদিন ঘুরে আসত। খৃস্টপূর্ব ৩০০০ বছরেরও পূর্বে রচিত ঋগবেদে বহু যাগযজ্ঞ বিধানের উল্লেখ আছে। মাস, ঋতু, দিন প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে এ সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি-পালন করা সম্ভবপর ছিল না। ইহা হতে ধারণা করা যায় যে, এদেশে সময় পরিমাপের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই সুরচিত বর্ষপঞ্জী দ্বারা হিন্দুগণ পরিচালিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল। বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্ত্র ও শ্লোকাদি পাঠ করলে ইহা বেশ প্রতিভাত হয় যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য-গ্রহণ, ঋতু পরিবর্তন, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ইহাদের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রেখে তদনুযায়ী নিজেদের বর্ষপঞ্জীকেও তাঁহারা বহুবার সংস্কার ও সংশোধন করছেন। প্রসঙ্গক্রমে চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। চাঁদ প্রথমাবধিই প্রাচীনদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং শুধু ইহার গতিবিধির উপর ভিত্তি করেই এক সময়ে বিভিন্ন দেশে বর্ষপঞ্জী রচনার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু শুধু চাঁদের গতিবিধি দিয়া বছর নিরূপণে কতকগুলির অসুবিধার উদ্ভব ঘটে। চান্দ্রমাস ২৯·৬ দিনে হয়, সুতরাং ইহাকে ভিত্তি করে ১২ মাসে বছর ধরলে ৩৫৫ দিন মাত্র পাওয়া যায়, অথচ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর ঘুরে আসতে যে সময় অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ সূর্যের আপাত পরিভ্রমণ কালের পরিমাণ ৩৬৫¼ দিন। সুতরাং বর্ষপঞ্জী রচনায় বিশেষভাবে ঋতুগুলিকে বছরের নির্দিষ্ট মাসের মধ্যে ঠিক রাখতে হলে, মাঝে মাঝে মাসগুলির দিনসংখ্যা বৃদ্ধি করে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়। রোমসম্রাট জুলিয়াস সিজার এবং পরবর্তী-কালে পোপ গ্রিগোরীর উদ্যোগে পাশ্চাত্য বর্ষপঞ্জীর যে সংস্কার সাধিত হয়, তাতে এরূপ সামঞ্জস্য বিধানের নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের নৈসর্গিক অবস্থান, আবর্তন, গতিপথ প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রহদের নামানুযায়ী সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণের প্রথাও এদেশে প্রাচীনকালেই গৃহীত হয়। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে প্রাচীন হিন্দুগণ যে তথ্য সংগ্রহ করেন তাতে মনে হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন। সময় নির্ণয়ের বিবিধ ব্যবস্থাও তাহাদের ছিল। সূর্যঘড়ি নির্মাণ করে সূর্যের ছায়া দেখে সময় নিরূপণ পদ্ধতি হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকালেই উদ্ভাবন করেন। 'জল ঘড়ি' প্রভৃতির ব্যবহারও তাঁরা জানতেন; সুতরাং দিবাভাগে কিংবা রাত্রিবেলা কোন্ সময়েই সময় নিরূপণের জন্য তাঁদের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন মাসের দিন সংখ্যা এবং দিবারম্ভ কোন সময় হতে ধরা হবে—এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ষপঞ্জীর মধ্যে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইংরেজী বর্ষপঞ্জীর বিভিন্ন মাস ও আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যা এক নহে। প্রাচীন ইহুদীগণ সূর্যাস্ত হতে দিন আরম্ভ বলে মনে করত। তাদের সপ্তাহও শনিবার রাত্রি হতে আরম্ভ বলে ধরা হত। নববর্ষ আরম্ভের সময় সম্পর্কেও তেমনি বিভিন্ন দেশের বর্ষপঞ্জীতে বিভিন্ন ব্যবস্থা পরি-লক্ষিত হয়। বছর কোন সময়ে আরম্ভ ধরা হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বহু গবেষণা হয়েছে। বর্ষপঞ্জীর এ সমস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদেশেও কম গবেষণা ও আলোচনা হয় নাই। দিনের আরম্ভকাল কখন হতে ধরা হবে তা নিয়েও প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীগণ বহু আলোচনা করেছেন বলে জানা যায়। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিবারম্ভ বলে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তবু এ সম্পর্কে বহু জ্যোতির্বিদ ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। আর্যভট্টের মতে লঙ্কাদ্বীপে যে সময়ে সূর্যোদয় হয় সেই সময় হতেই এদেশে দিন আরম্ভ বলে ধরা উচিত। বরাহমিহির আবার মধ্যরাত্রি হতে দিন আরম্ভের পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ বহু মতবাদের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের বর্ষপঞ্জী গড়ে উঠেছে। সে আলোচনার ধারা হতে দেখা যায়, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্রি এই চারি সময়ের কোনটাই দিবারম্ভকালের গৌরব হতে বঞ্চিত হয়নি।

অন্যান্য দেশের বর্ষপঞ্জীর মত বছর কোন্ সময় হতে সুরু করা হবে, তৎসম্পর্কে প্রাচীন পঞ্জীতেও কয়েকটি পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায় সূর্যদেব যখন বিষুব সংক্রান্তি (Vernal equinox)এ

আসেন বৈদিক যুগের প্রথমভাগে সে সময় হতেই নববর্ষ-আরম্ভ বলে ধরা হত। কিন্তু পরে আবার বিষুব সংক্রান্তি হতে মকরক্রান্তিতে সূর্যদেব এলে তখন নববর্ষ গণনা করার প্রচলন হয়। ঠিক কোন সময়ে যে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় তা বলা কঠিন। তবে ইহা বোঝা যায় যে, যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ঋতুর আবর্তন হয় এবং বর্ষ-পঞ্জীতে তাহা দেখান যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি দুই হাজার বছর পর পর বর্ষ আরম্ভের সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজন ঘটে। কারণ এক বিষুব সংক্রান্তি হইতে অপর বিষুব সংক্রান্তিতে পৌঁছিতে সূর্যের যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা ঠিক ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা নহে, বরং কিছু কম। অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ ৪ সেকেণ্ড সুতরাং দুই হাজার বৎসরে বিষুব সংক্রান্তি প্রায় একচান্দ্রমাসের সম-পরিমাণ সময় পূর্বে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ঋতুগুলিকে বছরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট রাখার জন্য তাই বর্ষ-আরম্ভের সময় পরিবর্তন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। হিন্দুদের বর্ষপঞ্জীতে আর একবারও বর্ষ-আরম্ভের সময়ের পরিবর্তন হয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষীর সময়ে প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দে। তারপর ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরও বছর আরম্ভের সময় পবিবর্তন করে দিয়ে যান। আজও মোটামুটিভাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই বর্ষ আরম্ভ করা হয়।

বর্ষ-আরম্ভ কোন সময় হতে হবে স্থির হলে পরেও কাল-গণনার আর এক সমস্যা আঁছে। সেইটি হল—কোন সময় বা তারিখ হতে বছরগুলি গণনা করা হবে। পাশ্চাত্য দেশে যীশুখৃষ্টের জন্ম বা মৃত্যুর পর হতে বর্ষগণনার রেওয়াজ দেখা যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের হিজিরা সাল তাঁদের পয়গম্বর মহম্মদের মক্কা পরিত্যাগের সময় হতে গণনা করা হয়। এদেশে বিদ্যোৎসাহী ও প্রতিপত্তিশালী রাজা মহারাজাদের সিংহাসন আরোহণ বা অপর কোন বিশেষ ঘটনার তারিখ হতেই সাধারণত বছর গণনা করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। তদনুযায়ী ভারতবর্ষে কয়েকটি অব্দই প্রচলিত হয়। শক বংশের মহারাজ কণিষ্ক কর্তৃক যে অব্দের প্রবর্তন হয় তার নাম শকাব্দ। ভারতের সর্বত্র প্রায় ইহার প্রচলন দেখা যায়। বিক্রম সম্বৎ নামে অপর একটি সাল পশ্চিম ভারতে প্রচলিত আছে। উহা বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রবর্তন করেন। গুপ্ত রাজগণের সময়ও এরূপ একটি অব্দ প্রচলিত হয়।

বাঙলাদেশে বঙ্গাব্দ প্রচলিত। ১লা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ সালকে বিদায় দিয়ে আমরা ১৩৪৯ সালকে বরণ করছি। পুরাতন বছরের জীর্ণক্লান্ত রাতের অবসানে নববর্ষে আমরা নূতন আশার আলোকে জাগতে পারবো কিনা জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা ঠিক করে বলা বড় সহজ নয়।



দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 25th April, 1942 [২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাব সম্বন্ধে মহাত্মাজী—

মহাত্মা গান্ধী এতদিন পর্যন্ত স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। সম্প্রতি তিনি উক্ত প্রস্তাবকে 'দুর্ভাগ্য প্রস্তাব'—এই আখ্যা দিয়া 'হরিজন' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ডের ব্রত কি এবং সেই ব্রতের ফল যে কি দাঁড়াইতে পারে, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না এবং আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম, স্যার স্ট্যাফোর্ড ভারতের সম্বন্ধে যতই উদারচেতা ব্যক্তি হউন না কেন, সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরের মধ্যে তিনি যখন একবার গিয়া পড়িয়াছেন, তখন ভারতের সম্পর্কে সাম্রাজ্যসুলভ বদ্ধমূল সংস্কারেও তিনি নিশ্চয়ই অভিভূত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর মতের পরিবর্তন ঘটে নাই, ঘটিলে ভারত-সচিব আমেরীর সুর অন্য রকম হইত, প্রকৃতপক্ষে মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে স্যার স্ট্যাফোর্ডের নিজের। অবশ্য গূঢ়ভাবে মনের এই পরিবর্তনের গতির পথে স্বার্থের প্রভাবটা অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে, সহজে তাহা ধরা যায় না। স্যার স্ট্যাফোর্ডের অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে মনের অবচেতন স্তরে স্বার্থের সেই সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত লাগিলে স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। নিজেকে নিজে বুঝা না গেলেও অপরে বুঝিতে পারে। এইরূপ ভ্রান্ত আত্মবিশ্বস্তির ভাব লইয়াই স্যার স্ট্যাফোর্ড এদেশে আসিয়াছিলেন এবং এই জন্যই ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্বে তাঁহার ভারতীয় উদারপন্থী বন্ধুগণের সঙ্গে পরামর্শ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের প্রতি স্যার স্ট্যাফোর্ড যে শুভেচ্ছা পোষণ করেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।' আমরাও সে কথা স্বীকার করি; কিন্তু এই শুভেচ্ছার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদসুলভ মুরুব্বিয়ানার ভাব যখন মিশ্রিত হয়, তখনই উহা অনর্থকর হইয়া দাঁড়ায়, এক্ষেত্রেও সেই ত্রুটির জন্যই স্যার স্ট্যাফোর্ডের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড যে ভাষায় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা মোলায়েম হইলেও উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদসুলভ মুরুব্বিয়ানার ভাব হইতে মুক্ত ছিল না। স্বাধীনতার অনুপ্রেরণালব্ধ চিত্ত ঐরূপ প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারে না। ভাষার কারসাজীতে ভাবকে চাপা দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না।



অন্তরায় কোথায়—

আমাদের নিজেদের ত্রুটির দিকে মহাত্মাজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিজেদের যে ত্রুটি আছে, একথা আমরাও অস্বীকার করিতেছি না; আমাদের নিজেদের যদি ত্রুটি না থাকিবে, তবে আমরা ৩৬ কোটি লোক এমন সুদীর্ঘ কাল বিদেশীর পদানত হইয়া থাকিব কেন? আমাদের ত্রুটি আছে; কিন্তু সেজন্য অপরের দোষও গুণ হইয়া দাঁড়ায় না। আমাদের ত্রুটি যতই ধরা পড়িবে, অপরে আমাদের সেই সব ত্রুটির যে সব সুযোগ লইতেছে, সেগুলির স্বরূপও আমাদের নিকট ততই উন্মুক্ত হইবে এবং অপরের সহিত সম্প্রীতির সূত্র ততই ছিন্ন হইবার কারণ ঘটিবে; কথার কারসাজী সেক্ষেত্রে আর টিকিবে না। আমাদের ত্রুটি আছে এবং সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে তাহার মধ্যে মুখ্য বলা যাইতে পারে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—"যতদিন পর্যন্ত আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করিতে পারিব, ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব হইয়া থাকিবে।" ইহা আমরা বুঝি এবং বুঝি বলিয়াই সাম্প্রদায়িক অনৈক্য সৃষ্টির মূলীভূত নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যখন অনুসরণ করিতে যান, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতার অভাব আমাদের মধ্যে একান্ত হইয়া উঠিবার কারণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে। আমরা সাম্প্রদায়িক ঐক্য নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইলেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যতদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে

তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তন না করিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতাপ্রয়াসী জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতি সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। বর্তমানের সমস্যার মূল হইল ইহাই।

দেশরক্ষা ও দেশবাসী—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সম্বর্ধনা সভার বক্তৃতায় বলেন,—"দেশরক্ষার জন্য আমরা কি করিতে পারি, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। একদিকে আমরা ইচ্ছাপূর্বকই রাস্ট্র-ব্যবস্থা হইতে নিজেদিগকে বিমুক্ত করিয়াছি। বহু কারণে আমরা উহাতে যোগ দিতে পারি নাই। এইভাবে রাস্ট্র হইতে বিমুক্ত থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে সামরিক ক্ষেত্রে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। সে ক্ষেত্রে সমর-বিভাগের লোকদেরই কর্তৃত্ব। কিন্তু প্রকৃত সামরিক কার্যের ক্ষেত্রসমূহেরও একটা সীমা আছে। প্রকৃত সংগ্রাম



ক্ষেত্রের বাহিরে জনসাধারণ অনেক কিছুই করিতে পারে।" ভারতবাসীরা তাহাদের দেশের স্বাধীনতা চায়। তাহারা বিদেশীর অধীনতা কামনা করে না। ভারতবাসীরা জানে যে, জাপান তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে আসিতেছে না, পরাধীন রাখিতেই আসিতেছে; সুতরাং জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেই ভারতবাসীরা সঙ্কল্পবদ্ধ; কিন্তু কোন্ পথে তাহা সম্ভব? কয়েকদিন পূর্বে পণ্ডিতজী দেশবাসীর পক্ষ হইতে গরিলা যুদ্ধ চালাইবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার সভায়, তিনি স্বীকার করেন যে, বর্তমান অবস্থায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে গরিলা যুদ্ধ চালান সম্ভব নয়। গরিলা যুদ্ধ চালাইতে হইলে অস্ত্র চাই, শস্ত্র চাই, তদুপযোগী শিক্ষা চাই এবং দেশবাসীর সঙ্গে সেনা-বিভাগের সহযোগিতা সেক্ষেত্রে প্রয়োজন। ডাক্তার মুঞ্জে গরিলা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন; কিন্তু ভারত সরকার তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কারণ গরিলা বাহিনী গঠন করিতে হইলে দেশবাসীকে অস্ত্রধারণের অধিকারই দান করিতে হয়। ভারত সরকার সে অধিকার যে দেশের লোককে দিবেন, এমন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র জনসাধারণের পক্ষে কর্তব্য কি? পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, কংগ্রেস এ সম্বন্ধে সত্বরই নির্দেশ দান করিবেন, বর্তমানের এই সঙ্কটকালে কংগ্রেসের সেই নির্দেশ কিরূপ হইবে, তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিবে।

লোক অপসারণের ব্যবস্থা—

ব্রহ্ম-প্রত্যাগতদের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়। আমাদের আশেপাশেও সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে। বাঙলা এবং উড়িষ্যার উপকূলবর্তী কতক অঞ্চল হইতে লোক অপসারণ করা হইতেছে। কোন কোন স্থানে এজন্য মাত্র অতি অল্প সময়ের নোটিশ দেওয়া হইতেছে। এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া অনিশ্চিত পথের যাত্রী হওয়া যে কি ভীষণ ব্যাপার সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিন কলিকাতার সাংবাদিক সম্মেলনে লোক অপসারণ করিবার এইরূপ ত্বরিৎ ব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধের অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয় এবং সামরিক প্রয়োজনের অনুরোধে কর্তৃপক্ষের পক্ষে অনেক কিছুই বাধ্য হইয়া করিতে হয়, ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ সমীচীনতার সহিত অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। বাঙলা গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের নিজেদের পন্থায় ইহাদের সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু দেশবাসীদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং নিজেদের অসুবিধা স্বীকার করিয়াও এই সব বিপন্ন জনগণের সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকা উচিত।

বাঙলা ও আসামের অবস্থা—

ব্রহ্ম-প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা বর্তমানের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসামের পথে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় পণ্ডিতজী বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, কলিকাতা এবং সেই সঙ্গে বাঙলা ও আসামের অবস্থা যথার্থই গুরুতর। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাঙলা এবং আসামের অবস্থা যেরূপ গুরুতর, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যার অবস্থার গুরুত্বও তাহার চেয়ে কম নয়। কলিকাতা হইতে জাপানীদের উড়োজাহাজের ঘাঁটির দূরত্ব এখনও ছয় শত মাইলের উপর বলা চলে এবং জাপানীরা এ পর্যন্ত তাঁহাদের উড়োজাহাজের ঘাঁটি হইতে চারশত মাইলের অধিক দূরবর্তী কোন স্থান আক্রমণ করে নাই; কিন্তু এজন্য নিরুদ্বিগ্ন থাকা চলে না; কারণ, জাপানীদের উড়োজাহাজের আক্রমণের পাল্লার মধ্যে কলিকাতা শহর পড়ে এবং আক্রান্ত হইবার ভয় শহরবাসীর পক্ষে রহিয়াছে। উড়োজাহাজযোগে আক্রমণ ছাড়া জলপথে বাঙলার উপকূলভাগে অথবা উড়িষ্যা কিংবা মাদ্রাজে জাপানীদের আক্রমণের আতঙ্ক কিছুদিন খুবই দেখা দিয়াছিল। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে কিছু আশার কারণ দেখা দিয়াছে। কিছুদিন আগে জাপানীদের রণতরী বহর সিংহল আক্রমণ করিয়াছিল, কলম্বো ও ত্রিনকোমালীতে বোমা বর্ষণ এবং মাদ্রাজে, কোকনদ ও ভিজগাপটমে কয়েকটা বোমা ফেলে। সেই রণতরী বহরের আর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। জাপানীদের এই রণতরী বহরের শক্তি কম ছিল না। ইহাতে তিনখানা বৃহৎ রণতরী ছিল এবং কতকগুলি ক্রুজার ছিল। এই নৌবহর গেল কোথায় এবং কেনই বা এইভাবে সরিয়া পড়িল? এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক অনুমান

করিতেছেন। কেহ কেহ এই কথা বলিতেছেন যে, রণতরী বহরকে পাহারা দিতে হইলে যে পরিমাণ উড়োজাহাজ থাকা দরকার, জাপানীদের তাহা নাই। কলম্বোতে হানা দিতে গিয়া জাপানীদের বিমানবহরের যথেষ্ট ক্ষতি ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং সে দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিবার জন্য তাহাদের অধিকৃত কোন পোতাশ্রয়ে রণতরী বহরকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই রণতরী বহর সুসজ্জিত হইয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিবে কি না এবং যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে কোন্ স্থানে প্রথমে হানা দিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। তবে অস্ট্রেলিয়ার দিকে জাপানীদের আক্রমণের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, সেদিকে তাহাদের গতি রুদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবত তাহারা মার্কিনের বিমানবলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় ভারত মহাসাগরের আশেপাশে তাহাদের সংগ্রাম-নীতি সম্প্রসারিত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবত এখন আর পূর্বের মত সহজ হইবে না।

ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের সমস্যা—

ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের সমস্যা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। আমরা এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি ইতিপূর্বেই আকৃষ্ট করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের মত এই যে, গভর্নমেণ্ট যাহাই করুন, দেশবাসীরও বসিয়া থাকা চলে না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, কংগ্রেস এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম-প্রত্যাগতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কংগ্রেস হইতে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণের প্রস্তাব হইয়াছে। আমরা আশা করি, দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহ এই কার্যে কংগ্রেসকে সাহায্য করিবেন এবং দেশের যুবকগণ এই সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিবেন। জননায়ক হিসাবে পণ্ডিত জওহরলালের এই সম্পর্কে আসাম পরিদর্শনে যাত্রা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসী-দের দুঃখ-কষ্ট কিরূপ নিদারুণ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। পথের কষ্টে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ব্যাধিতে লোক মরিতেছে, খাদ্য এবং উপযুক্ত পানীয়ের অভাবে মানুষ মারা যাইতেছে। পূর্ব হইতে সুব্যবস্থা করিলে এই অবস্থার অনেকটা প্রতিকার করা সম্ভব হইত বলিয়া আমরা মনে করি; কিন্তু এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আণে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য এক রাস্তা, আর শ্বেতাঙ্গদের জন্য অন্য রাস্তার বৈষম্যের ভিতর দিয়া উক্ত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের সমতা রক্ষার অসামান্য কৃতিত্বের কথাই এতদিন আমরা শুনিতেছিলাম। অবশেষে শ্রীযুত আণে জনমতের চাপে পড়িয়া ঘটনাস্থল স্বয়ং পরিদর্শনে গমন করিতে বাধ্য হন। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি বিবরণ দেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হইল সবচেয়ে বড় বিষয় এবং এ সম্বন্ধে কালবিলম্ব করিবার অবসর নাই।

নৌকা নিয়ন্ত্রণের বিধান—

উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি এই মর্মে একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, গভর্নমেণ্ট হইতে যদি সব নৌকা অপসারিত করা হয়, তবে দেশের কোন কোন অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইবে এবং জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। তাঁহারা অবস্থার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ন্যূনপক্ষে যে পরিমাণ নৌকা লোকের হাতে না রাখিলে চলিবে না, তাঁহারা সেই পরিমাণ নৌকা লোকের হাতে থাকিতে দিবেন। উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট এই ব্যাপারে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের স্বরূপ—

সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য না হইলে স্বাধীনতা আসিবে না, এই কথা এখন একঘেয়ে হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য হইলে স্বাধীনতা সুগম হয়, ইহা সত্য, কিন্তু সে ঐক্য বলিতে ভারতের ৪০ কোটি লোক ঐক্যমত হইবে, যদি ইহাই বুঝিতে হয়, তবে স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীদিগকে কল্পান্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কোন দেশ বা কোন জাতির মধ্যেই এমন ঐক্য সম্ভব হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গত স্বার্থের সমাভিত্তিতে জাতির বৃহত্তম অংশই শাসনকার্য পরিচালনার অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। কংগ্রেস সে ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের সে দাবীকে স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা অনৈক্যের কথাটা একান্তই অবান্তর রকমে টানিয়া আনিবেন এবং জাতীয়তাবাদীদের দাবীকে চাপিয়া যাহারা অনৈক্যপন্থী, তাঁহারা তাঁহাদিগকেই প্রশ্রয় দিবেন। স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবের মধ্যেও ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ জাতির এই নীতিই বিদ্যমান ছিল। মহাত্মাজী নিজেও সে কথা বলিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সৌহার্দ এবং সম্প্রীতির পক্ষে প্রকৃত অন্তরায় ইহাই। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "ইংরেজরা যে সমস্ত ভুল করিয়াছে, সেকথা চিন্তা করিয়া লাভ নাই, দৃষ্টিকে অন্তর্মুখীন করাই অধিকতর লাভজনক—একথা এক হিসাবে সত্য; কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতার প্রশ্ন যেখানে দেখা দেয়, সেইখানে সে কথার চিন্তা মনস্তাত্ত্বিক সত্য স্বরূপেই সে পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে; ইহা অস্বীকার করা চলে না।

সেকেন্দারী ভাষ্য—

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব ভারতের কোন সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই—কিন্তু পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাবে ভারতের নেতারা যাহা কিছু চাহিয়াছিলেন—ছিল সবই। এই প্রস্তাবে যুদ্ধের পর ভারতবাসীদের স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি ছিল, নিজেদের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র নির্ধারণের অধিকারের স্বীকৃতি ছিল এবং প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমরাও বলি,

ছিল সবই; কিন্তু সবই ছিল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে, বর্তমানের জন্য বাস্তব কোন অধিকার ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াটাই শুধু সে প্রস্তাবে ছিল না। স্যার সেকেন্দার ভবিষ্যতের এমন প্রতিশ্রুতি লইয়া খুসী হইতে পারেন; কিন্তু তিনি তুষ্ট হইলেই গোটা ভারতের সন্তুষ্টি ঘটে না। বর্তমান সমরোদ্যমে ভারতবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে অবিলম্বে ভারতবাসীদের হাতে রাষ্ট্রীয় প্রকৃত অধিকার প্রদান করা কর্তব্য, তাহাতেই সমগ্র ভারতের দেশরক্ষার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পের সাড়া জাগিতে পারে। স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবে এই বস্তু ছিল না এবং সেইজন্য নেতারা উহা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। দায়িত্ব যেখানে কার্যত দেওয়া হয় নাই, সেখানে নেতাদের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছার যে অজুহাত স্যার সেকেন্দার তুলিয়াছেন, তাহার কোন অর্থই থাকে না এবং কথায় তেমন দায়িত্ব স্বীকার করিলেও কাজে তাহার কোন সার্থকতা বর্তে না। বর্তমানে প্রয়োজন কাজের, কথার নয়। স্যার সেকেন্দার কথা ও কাজের এই পার্থক্যটা এতদিন প্রধান মন্ত্রিগিরি করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য।

শহরের খাদ্য সমস্যা—

সম্প্রতি বাঙলা সরকার কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী কলকারখানাপ্রধান অঞ্চলে, অর্থাৎ কলিকাতা শহর, ব্যারাকপুর মহকুমা, হাওড়া সদর এবং শ্রীরামপুর মহকুমা ও হুগলী জেলার লোকের জীবনযাত্রা বর্তমান জরুরী অবস্থায় যাহাতে অব্যাহত থাকে, বিশেষ করিয়া বিমান আক্রমণ হইলেও যাহাতে লোকে চাউল, ডাল, লবণ, তেল, কয়লা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনটি আইন জারি করিয়াছেন। এই সব অঞ্চল হইতে মাল বাহিরে যাহাতে চালান না যাইতে পারে, তৎপ্রতিই এই আদেশে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব সেদিক দিয়া ততটা নয়। এই সব অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে সব দ্রব্যের আবশ্যক হয়, এখানে সে সব উৎপন্ন হয় না; সুতরাং সমস্যা কাটাইতে হইলে বাহির হইতে মাল সরবরাহ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎসম্বন্ধে সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমধিক প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আটা এবং কয়লার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, বাহির হইতে এগুলির আমদানী বন্ধ হইলে কিরূপ অসুবিধা ঘটে, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এমন অবস্থায় কলিকাতা কিংবা ব্যবসায়প্রধান শহরতলী অঞ্চল হইতে আটা বা কয়লা অপসারণ নিষিদ্ধ করিলেই সংকটকালে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইবে না, যে সব স্থানে ঐ সব মাল প্রচুর রহিয়াছে, সেই সব অঞ্চল হইতে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা পাকা করিতে হইবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা যথোচিতভাবে হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, এ পক্ষে একদিকে মালগাড়ির অভাব ঘটিতেছে, অন্য পক্ষে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণবিধির ফলে মোটরলরীযোগে মফঃস্বল হইতে শহরে মাল আমদানীর পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে; এজন্য কলিকাতার বাজারে নিত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য দিন দিন মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। এই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার গুধুতাও এক্ষেত্রে সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। অনেকে নিজের বুঝটাই শুধু বুঝিতেছেন, আড়তদারদের কেহ কেহ বেশী লাভ করিবার লোভে মাল গোপনে মজুত রাখিতেছে এবং বাজারে ছাড়িতেছে না, এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সরকার সমীচীন কাজই করিয়াছেন; যাহারা ব্যবসায়ী নহেন অথচ বিত্তবান, নিজেদের টাকা-পয়সা আছে, সুতরাং ভবিষ্যতের নির্বিঘ্নতার জন্য খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, ইহাদেরও তেমন চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত কারণ পরোক্ষভাবে উহাতে অপরকে নিত্যাবশ্যক দ্রব্য হইতে বঞ্চিত করা হয়। কলিকাতা হইতে যাঁহারা মফস্বলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ আমরা শুনিতেছি। ইহারা অনেকে গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের চেয়ে বিত্তশালী। ইঁহারা টাকা দিয়া আটা, ময়দা প্রভৃতি গৃহে মজুত করেন, ইহার ফলে মফঃস্বলে বাজারে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটে। যাহারা দিন আনে দিন খায়, তাহাদের কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহারা হয় জিনিস পায় না, নতুবা সেজন্য তাহাদিগকে অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। বর্তমানের এই সঙ্কটকালে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে মাল সরবরাহ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, কর্তৃপক্ষের তৎপ্রতি সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য এবং প্রত্যেকেরই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় না বুঝিয়া দেশবাসীর সকলের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, তেমন বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।

ফ্রান্সে জার্মান প্রভাব—

ষোল মাসকাল একরূপ অজ্ঞাতবাসে থাকিবার পর মঁশিয়ে লাভাল পুনরায় ফ্রান্সের রাজনীতিক ক্ষেত্রে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছেন। লাভাল বরাবরই জার্মান পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত। ফ্রান্সের রাজনীতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ধ্বনি তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যে নূতন চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে ফ্রান্সের রণতরীর কতকটা অংশ জার্মানীর হাতে দিবার কথা হইয়াছে। এই রণতরীগুলি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ ফরাসী অধিকৃত ডাকার বন্দরে কয়েকখানা জাহাজ আছে, কয়েকখানা রহিয়াছে আফ্রিকার ক্যাসাব্লাঙ্কা এবং জিব্রাল্টারের নিকটবর্তী বির্জাতা বন্দরে। মিত্রপক্ষ এই আশঙ্কা করিতেছেন যে, এই রণতরীগুলির সাহায্যে জার্মানী ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে নিজেদের জোর বাড়াইবে, এমন কি, এইগুলির সাহায্য লইয়া হিটলার ইংলণ্ডও আক্রমণ করিয়া বসিতে পারেন। মোটের উপর, জার্মানীর বসন্তকালীন আক্রমণের আনুসঙ্গিক হিসাবেই ফ্রান্সের উপর জার্মানীর এই রাজনীতিক চাপ গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। মার্শাল পেতাঁ পরাজিত ফ্রান্সের আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রবল জার্মানীর সামরিক প্রয়োজনের কাছে তাহা কার্যকর হইল না—ফ্রান্সকে প্রকৃতপক্ষে হিটলারের পদানত হইতে হইল। স্বাধীনতাপ্রিয় ফরাসী জাতিকে এই অবমাননার আঘাত কতদিন এমনভাবে সহ্য করিতে হইবে কে বলিবে?

রবীন্দ্রনাথের উত্তেজক সংগীত

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

বাঙলাদেশে সমালোচক মহলে একটি মতবাদ চলিত আছে দ্বিজেন্দ্রলাল "দেশী সুরে accent ও movement অর্থাৎ টি নতুন ঝোঁক এবং দ্রুত গতি এনে বাঙলা গানে দেশী সুরের রে একটা নতুন চাঞ্চল্য ও স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন;" তাঁরা ন এর জন্য তিনি বিলেতি সংগীতের কাছে ঋণী, "আমাদের -রাগিনী বিলেতি চাল এত সহজভাবে অঙ্গীকার করেছে যে, সুরের এই বিলেতি ভঙ্গী আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা গ না।।" এবং এ বিষয়ে এ যুগের বাঙলা গানে দ্বিজেন্দ্রলাল "একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন" ও "এই গানে একটি গণ্ড ওজস্বিতা আছে যা সচরাচর অন্য গানে মেলে না।" সম্প্রতি ুদিন থেকে আর একদল বলেছেন বাঙলা গানে একটি বলিষ্ঠ রুষকে গানের আসরে প্রথম এনেছেন, কাজি নজরুল ইসলাম। রকমের দুই মতবাদই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে, কেন করেছে, সে বিষয়ে নিয়ে আগে আলোচনা করবো।

বিলিতি গানের সুরে বাঙলা গান রচনার ইতিহাস কিছু লাচনা করে জানতে পেরেছি যে, রবীন্দ্রনাথের দাদা সংগীতজ্ঞ ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক কাজে হাত । আনুমানিক ১৮৭৮ খৃঃ যখন তিনি 'সরোজিনী' নাটক া করেন, সেই নাটকে বিলেতি গানের সুর নিয়ে একটি বাঙলা রচনার উদাহরণ আছে। গানটি হোলো 'দ্যাখরে জগত ময়া নয়ন।' এ গানটি একটি উত্তেজক জাতীয় সংগীত। এ া আরও দুটি গীতনাট্যে তিনি বিলেতি সুর ব্যবহার করেছিলেন কথাও আমরা জানি। তাছাড়া পিয়ানো যন্ত্রের সাহায্যে দেশী গনীর গৎগুলিকে বিলেতি কায়দায় কাটা কাটা করে সাজিয়ে ন রূপ ফোটাবার চেষ্টা করতেন। শোনা যায়, তার ভিতর দি'য়ে লতি জোরালো সংগীতের আবহাওয়া তৈরী করতো। এই দুই াতিতে পরীক্ষার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের ১৩ র বয়সের রচিত একটি জাতীয় সংগীতে ও ১৮৮১ খৃঃ রচিত মীকি প্রতিভার কতগুলি গানে। এই নাটকটি রচনার সময় ন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে কিভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি" থেকে ও জ্যোতি-দ্রনাথের আত্মচরিত থেকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর র কাছে বিশেষ ঋণী বাল্মীকি প্রতিভার "এনেছি মোরা মছি মোরা" ও "কালী কালী বলরে আজ" গান ট হুবহু বিলেতি সুরে ও ঢংয়ে রচিত। কেবলমাত্র লা ভাষা ছাড়া গানের সঙ্গে মূলে বিলেতি গানের কোন অমিল । ঐ বাল্মীকি প্রতিভার রচনার পূর্বে বিলাত প্রবাসকালে ন বহু প্রকারে সে দেশী গান কণ্ঠে আয়ত্ত করেছিলেন। শ্রীযুক্তা দরা দেবী তাঁর 'বাল্য স্মৃতি' থেকে কয়েকটি ইংরেজী গানের নাম ন্থ করেছেন, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের মুখে তিনি অল্প বয়সে াই শুনতেন এবং অনেক সময়ে তাঁকে সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো াতে হোতো। গানগুলির নাম হোলো—

"Won't you tell me, Mollie darling"
"Darling, you are growing old,"
"Come into the garden, Mand."
"Goodnight goodnight, beloved."
"Good-bye, sweatheart, goodbye."

রকমের অনেক বিদেশী গান বহুদিন পর্যন্ত গাইবার অভ্যাস ন্দ্রনাথের ছিলো। এর থেকেই আমরা অনায়াসে অনুমান করে ত পারি যে, বিলেতি কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠ যোগ তিনি রেখেছিলেন। এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে, বাল্মীকি প্রতিভার মত গীতনাট্যে রচনার কল্পনার পিছনে বিলেতি operaর প্রভাব আছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র রচনার বহু বৎসর পরেও তাঁকে মাঝে মাঝে বিদেশী অনুকরণে কয়েকটি গান রচনা করতে দেখি; তার মধ্যে—

"তোমার হোলো সুরু, আমার হোলো সারা"
"সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি।"
"আমার সকল রসের ধারা।"
"মোর মরণে তোমার হবে জয়"
"আমাদের শান্তিনিকেতন,"
"হারে রেরে রেরে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।"

"জন গন মন অধিনায়ক জয় হে।" প্রভৃতি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ১৩২১ সাল থেকে ১৩২৬ সালের মধ্যে রচিত। এর একটি গানকে কোন স্বরলিপিকার রাগিনীর পর্যায়ে ফেলে নাম করণ করেছেন। বলেছেন "সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি" গানটি 'ইমন কল্যাণ' রাগিনীতে তৈরী। ইমনের ঠাটে যে সারগম্ ব্যবহার হয় সে দিক দিয়ে এ গানের সারগম্এ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু এই সুরের চলন বা রূপের সঙ্গে কোনো প্রাচীন ইমন কল্যাণ গানের মিল আছে বলে মনে হয় না। "তোমার হোলো সুরু, আমার হোলো সারা।" ও "আমার সকল রসের ধারা" গান দুটির সঙ্গে অন্য গানগুলির কিছু তফাৎ আছে, এ দুটি গানে বিলেতি চার্চ সংগীতের প্রভাব লক্ষ্য করি। অর্থাৎ চার্চ সংগীতের ধীর গাম্ভীর্য এতে প্রকাশ পেয়েছে। সংখ্যা হিসাবে বিচার করে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, তাঁর কাছে এভাবে গান রচনা করা বিশেষ আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠেনি। একথা সত্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশী সুরের সাহায্যে যে পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন তার মূলে উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা গানে একটা নতুন তেজ বা বীর্য সৃষ্টি করা। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনাকালে এই প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ আরো সফল করে তুলেছিলেন। আমরা লক্ষ্য কোরলে দেখতে পাবো বাল্মীকি প্রতিভার বিলেতি সুরের গানগুলি কেবল-মাত্র দস্যুদলের উল্লাস বা উত্তেজনার গান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য ভাবের গানে বিলেতি সুর তিনি ব্যবহার করেন নি। বিলেতি এ ধরণের কাটা কাটা লাফিয়ে চলা সুরের সঙ্গে দেশী গানের তফাৎ কোথায় এবং কেন এত পার্থক্য সৃষ্টি করে সে কথার উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে বিলেতি গানের সঙ্গে দেশী সুরের প্রধান তফাৎ অতি সুক্ষ্ম সুর বা শ্রুতিগুলি নিয়ে। "এরি যোগে এক সুর কেবল যে আর এক সুরের পাশা-পাশি থাকে তা নয় তার মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন কোরলে রাগ রাগিনী যদিইবা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পূর্বে যে কন্সার্টএর প্রচলন ছিল, তাতে গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের কাটা কাটা সুরগুলি নিয়ে নানাপ্রকারে খেলানো যায়। উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। .. কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিনী আপনার সম্পূর্ণতার গাম্ভীর্যে নির্বিকার সেখানে এরা লজ্জিত।"

এই মতবাদ রবীন্দ্রনাথের মনে বদ্ধমূল হবার আরেকটা কারণ আছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার পূর্বে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩, তখন হিন্দুমেলা উপলক্ষে একটি গান রচনা করেছিলেন, গানটির

প্রথম পংক্তি হোলো "এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি প্রাণ।" বীর্যসূচক গানের দিক থেকে এ গানটি খুব সুন্দর রচনা। খাঁটি খাম্বাজ রাগিনীর গতের মত এর সুরের গঠন। সেই সুরটিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে নানা প্রকার ওঠানামার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়াতে, পাশ্চাত্য জোরালো গানের ভাব তাতে ফুটে উঠেছে এবং ভাষা ও ছন্দের যোগে গানটি এমন প্রাণবান হয়ে উঠেছে যে, শুনে সকলেরই প্রাণে উত্তেজনা আনবে। পরে বাল্মীকি প্রতিভায় এই প্রথায় আরো দুয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। এই নাটকের "একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে" গানটি "এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি প্রাণ" গানটির অনুকরণে রচিত। "গহনে গহনে যারে তোরা নিশি বহে যায়রে" গানটি বাহার রাগিনীতে রচনা এবং এর সুরের গঠনে উপরের গানের মত তেজ বা ওজস্বিতা ফুটে উঠেছে।

আমরা যদি বলি উল্লাসের গান কেবলমাত্র বিলেতি সংগীতের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধিত করেছে, তাহলে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হবে না। প্রাচীন ধ্রুব পদ্ধতির গান থেকেও তিনি এর শক্তি আহরণ করেছেন। ভারতীয় মার্গ সংগীত, ধ্রুপদের প্রভাব তাঁর ভিতরে যত প্রবল সে রকম প্রভাব বিস্তার করা আর কোন সংগীতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই জোরালো গান রচনায় বিদেশী সংগীত তাঁর অন্তরে ধাক্কা মারলেও ভারতীয় সংগীতকেও তিনি উপেক্ষা করেননি।

শোনা যায়, ভারতীয় নওহর বাণীচালের ধ্রুপদ গানের স্বর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। খাণ্ডারবাণী চালের ধ্রুপদ গানে কাটা কাটা সুরের প্রকাশ দেখা যায়; কিন্তু নওহরবাণীর মত এতটা জোরালো নয়। এই ধ্রুপদ সংগীতের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রকাশ পেতো। কিন্তু এ সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না; কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেশে একমাত্র নওহর বাণী ধ্রুপদ ছাড়া অন্য চালের ধ্রুপদ গানের চলন ছিল না, সে কথা প্রমাণ হয় তৎকালীন সংগীতানুরাগীদের মন্তব্য থেকে। কিন্তু তিনি দ্রুত লয়ের কিছু খান্ডারবাণী ধ্রপদ সংগীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তা ভেঙ্গে গানও এক সময় রচনা কোরেছেন। আমরা জানি ঝাঁপতাল; সুরফাক্তা, তেওড়া তাল দ্রুত ধ্রুপদ গানে ব্যবহার করা হয় এবং গানে এই বিষম তালের ছন্দের সাহায্যেই উল্লাসের ভাব প্রকাশ পায়। এখানে তাঁর হিন্দী ধ্রুপদ ভাঙ্গা ভৈরবী রাগিনীর "আনন্দ তুমি স্বামি মঙ্গল তুমি" গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর তাল হোলো সুরফাক্তা। এ রকম ঢংএর ভৈরবী রাগিনীর গান আজকাল বাঙলা ভাষায় তৈরী হয় না। এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদের মুখেও আজ এ গান শুনতে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানি ভৈরব রাগিনী বেদনা ও করুণতা প্রকাশের জন্যই ভারতীয় সংগীতে বিখ্যাত, অথচ উপরোক্ত গানটিতে সে সুর বিপরীত ভাবের অর্থাৎ উল্লাসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধ্রুপদী গানে সুর পাশ্চাত্য সংগীতের মত ব্যবধান সৃষ্টি করে না—এক সুর থেকে আরেক সুরের মধ্যে; এবং রাগ-রাগিনীকে অবরোহণ আরোহণের বাঁধা নিয়ম মেনে চলতে হয়। ভূপালী জাতীয় পাঁচটি স্বরের রাগিনীতে তবুও স্বরের ওঠা-নামায় অনেকখানি ব্যবধান আছে, কিন্তু যেগুলি সম্পূর্ণ রাগ সেগুলিতে রাগিনীর বৈশিষ্ট্য রেখে স্বরের ব্যবধানে গান রচনা করা খুবই কঠিন। এই গান দ্রুত লয়ে গাওয়ার দরুণ দুগুণ, চৌগুণ বা অন্যান্য দুরূহ ছন্দের কাজে একটা জোরালো বেগ প্রকাশ পায়, কিন্তু সেখানে গানের কথার দিকে গায়কের কোন দৃষ্টি থাকে না। কথার মৃত্যু ঘটে। অনেক সময় তার অর্থবোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাঙলা গানে তা কোন রকমেই চলে না। সেই কারণে হিন্দী গানের রচয়িতারা জোরালো গানে ঝাঁপতাল, তেওড়া সুরফাস্তা ইত্যাদি বিষম মাত্রার তাল ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন। দ্রুত লয়ের তেতালা ছন্দে জোরালো গান সেই তুলনায় খুবই অল্প আছে, দাদরা ছন্দের জোরালো হিন্দী গান কোন ওস্তাদের মুখে শুনবার সৌভাগ্য এখনো হয়নি। এইখানে খাঁটি হিন্দী গানের সাহায্যে জোরালো উত্তেজক গান রচনার প্রয়াসের আর একটি উদাহরণ দেওয়া চলে। গানটি হোলো—"এই বেলা সবে মিলে চল হো" বাল্মীকি প্রতিভায় ভূপালী রাগিনীতে ও দ্রুত তেতালা ছন্দে রচিত। ভাষায়, সুরে ও ছন্দে দস্যুদের উত্তেজক গানের এটি একটি ভাল নিদর্শন। এ রকমের হিন্দী ভাঙ্গা বাঙলা গান আরো আছে, কিছু পূর্বেই তার একটির কথা উল্লেখ করেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন বীর্যের গানে, সুরফাকতাল, ঝাঁপতাল, তেওড়াতাল, দুই চারের ছন্দ সহজ চতুর্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি নানা ছন্দ ব্যবহার ক'রে। হিন্দী গান এতদূর পর্যন্ত সাহস করেনি, এবং বিলেতি জোর বা উল্লাসের গানে আমরা পাবো কেবলমাত্র সমমাত্রার ছন্দ। হিন্দী গান ও বিলেতি গান, কথাকে ততখানি মর্যাদা দেয় না। রবীন্দ্রনাথের গানের অপর বিশেষত্ব হোলো, সুরের ও ছন্দের চাপে পড়ে কথা একটুও খর্ব হয়নি।

তাঁর সব জোরালো গানই যে দ্রুত লয়ে তৈরী তাও নয়। মধ্য লয়েও বহু গান আছে। এবং এই রচনার মধ্যে খাঁটি বা মিশ্র ভৈরবী, ইমন ভূপালী, খাম্বাজ, বাহার রাগিনীই বেশী, তারপর মিশ্র ভৈরোঁ, শঙ্করা। এবং বাঙলার সুরের মধ্যে বাউল ও কীর্তনাঙ্গ সুরের গানও আছে অনেক। উপরের এই বিভিন্ন রাগিনীতে জোরালো গানের একটি করে উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল।

ভৈরোঁতে—"ঐ মহামানব আসে।"
ভৈরবীতে—"ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়।"
ইমন ভূপালী—"খর বায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে।"
খাম্বাজ—"আমরা নতুন যৌবনেরই দূত।"
শঙ্করা—"আর নহে আর নয় আমি করি না আর ভয়।"
বাহার—"ওরে আয়রে তোরা মাতরে।"
বাউল ও কীর্তন—"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী।"

এ রকমের জোরালো গান তিনি বহু রচনা করেছেন। এগুলো হুবহু বিলেতি বা দেশী কোন সংগীতের নকল করে রচিত নয়। এতে পাবো উভয় পদ্ধতির একটা অপূর্ব সংমিশ্রণের রূপ।

ধ্রুপদী গানের তাল ও সুরটাকেই বড় করে দেখার দরুণ কথার সহজ ছন্দোবন্ধ গতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সেখানে কথার ছন্দ ভেঙ্গে চুরে যায়। তাই গানে যে ঝোঁকটি আসে, তালের ও সুরের উপর নির্ভর করে, তাকে কথার ঝোঁকের সঙ্গে ওস্তাদেরা মেলাবার দরকার বোধ করেনি। রবীন্দ্রনাথের উপরের গান কটি বা জাতীয় যাবতীয় গানে সে অভাব পূরণ করেছে। গাইবার সময় কথার ছন্দে ঝোঁক দিয়ে গাইলেই এই সব গানের রূপ সুন্দর ফুটে ওঠে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের গান কেবল স্বরলিপির সাহায্যে শিখতে গিয়ে বহু গাইয়ে জোরালো গানের প্রকৃত রূপটি তাতে ফোটাতে পারে না। তাকে নিজেদের পছন্দমত কোমলভাবের গানে পরিণত করে তোলে। কীর্তন বা বাউল সুরে এই জোর প্রকাশ করাও তাঁর রচনার একটি বিশেষ গুণ। আমাদের দেশে কীর্তনাঙ্গ সুরে জোরালো গান পূর্বে হয়েছে বলে শুনিনি। এখন পর্যন্ত কোন রচয়িতার কোন উল্লেখযোগ্য গানেরও পরিচয় পাইনি।

উপরের এই ছয়টি রাগিণীতে জোরালো গানগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিকে অথবা বলা যেতে পারে এ ধরণের বেশীরভাগ গানই শান্তিনিকেতনের জীবনেই রচিত। ধ্রুপদের নকলে বা বিলেতি ধরণের আগের জীবনের গানগুলিতে এই সব গানের মত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের গানে বিদেশী সংগীতের প্রভাব, দেশী রাগিণীর

সংগে মিশে কিভাবে কাজ করেছে এতক্ষণ আমরা সংক্ষেপে সে দিকটা যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। লেখার আরম্ভে যে প্রশ্ন তুলেছিলাম, এখন আবার সে দিকে ফিরে আসা যাক্। দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাঙলা গানে বিলেতি ঢং প্রচারে প্রথম উদ্যোগী নন, আশা করি সকলের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি ১৮৮৭ খৃঃএর পূর্বে বাঙলা গানে ইংরেজী সুর ব্যবহারের কাজে হাত দেননি সেকথা আমরা তাঁর জীবনী থেকেই জানতে পারি। দেশী ও বিলেতীর সংমিশ্রণে বাঙলা গানে জোরের দিক থেকে নতুন ঢংএর আমদানি করেছিলেন বলে যে কথা বলা হয় তাও ঠিক নয়, কারণ গত স্বদেশী যুগের পূর্বে তিনি এ ধরণের গান রচনায় হাত দেননি। স্বদেশীর যুগেই প্রথম তিনি জোরালো গান রচনা সুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ যে সে কাজ সুরু করেছিলেন ১৩ বৎসর বয়স থেকেই আগেই সে বিষয়ে আলোচনা করে নিয়েছি। কাজি নজরুলের জোরালো গানের সূচনা আমরা দেখলাম গত মহাযুদ্ধের পর। এই সময়ের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ উত্তেজক বা বীর্যসূচক গান যতগুলি রচনা করেছিলেন তার খবর না রাখার দরুন এরকম ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ ছোট গন্ডির মধ্যেই কেবল নিবন্ধ রাখেন নি, এ পথেও তাঁর দানের বিশেষ মূল্য আছে। সে বিষয়েও আলোচনা করেছি।

আজকাল যারা সিনেমা ও রেকর্ড সংগীতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিদেশী গানের আদর্শে দেশী গান রচনা করছেন তাদের মধ্যে একদল করেছেন পাশ্চাত্য সংগীতের অনুকরণ, অপর দল করছেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উল্লাস বা তেজের গান রচনা। কিন্তু বহু রচয়িতা যে উল্লাস বা উত্তেজনার গান রচনার পক্ষপাতী সে কথা মনে হয় না তাঁদের রচনা শুনে। তাঁদের চেষ্টা বিলেতী Melodyকে ভারতীয় সংগীতে স্থান দিতে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে Melodyর জন্য ভারতীয় সংগীতকে ইউরোপের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? আমাদের আজ বিশেষ প্রয়োজন তেজ ও বীর্য প্রকাশক গানের সে তেজ বা উল্লাস যে কেবল জাতীয়তাবোধ উদ্দীপক গানের সঙ্গেই থাকবে তাতো হতে পারে না। প্রতিদিনের জীবনে মানুষ কত রকম মানসিক অবসাদের মধ্যে ইচ্ছা করে গানের সাহায্যে তার সেই মানসিক দুর্বলতা কেটে যাক। কিন্তু প্রাচীন হিন্দী গানের ভিতর থেকে সে সুযোগ বা সুবিধা আহরণ করা আমাদের সাধারণের জীবনে অসম্ভব ছিলো নানা কারণে। প্রথমে আমাদের সংগীত যে আদর্শে উদ্ভূত সে আদর্শচ্যুত সে হতে চায় নি। দ্বিতীয়ত প্রাচীন সংগীতে উত্তেজনার প্রকাশ যা দেখি, তা কঠোর সাধনা ব্যতীত অসম্ভব। সাধারণের সেই অভাব পূরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে। কেবল জাতীয় উত্তেজক গান ছাড়া, নানা ঋতুর ও প্রেমের সংগীতে, পৌরুষের উত্তেজনা কি রকম ফুটেছে, নিম্নলিখিত এই কয়টি গান উদাহরণস্বরূপে তুলে দিলাম। যেমন,—"ঐ বুঝি কাল বৈশাখী", "আজ বারি ঝরে ঝর ঝর," "শীতের হাওয়ায় লাগাল নাচন," ও "বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা" বিভিন্ন ঋতু সংগীতগুলি ও "আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে" "মহুয়া" কাব্যের প্রেম সংগীতটির উল্লেখ করে একথা বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ এ যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা সংখ্যার দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ আর কেউ নেই। আজকালকার রচয়িতাদের মধ্যে মিষ্টি, ব্যথা বা কান্নাভরা দরদী প্রাণের গান রচনার প্লাবন বয়ে চলেছে। বিগত স্বদেশী যুগে রচয়িতাদের গানের ভিতরে যে তেজ প্রকাশ পেতো আজকাল রাজনৈতিক আবহাওয়া বা আদর্শ অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে নেওয়ার দরুণ সে ভাবের গানের আর বেশী আমদানি নেই। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উৎসব দিনে হিন্দী ভাষায় রচিত পতাকা উত্তোলনের গানটি যখন গাইতে শুনি তখন স্বদেশের স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাবার পক্ষে এত বড় দুর্বল রচনা কি করে নেতারা গাইতে মত দিলেন সেই প্রশ্ন মনে জাগে। কথা বাদে এ গানের সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়ে যে নির্জীব ভাব প্রকাশ পায় স্বাধীনতাবোধ উদ্দীপনার পক্ষে তা অচল। বাঙালী রচয়িতাদের মধ্যে এতটা দৈন্য না এলেও তাঁদের মধ্যে ঠুংরী, গজল, কীর্তন ও পল্লী-গীতির কারুণ্যের জয় জয়কার। ধ্রুপদ সংগীতের সাহায্যে ভারতীয় সংগীতের যে দিকটা ফুটে উঠেছিলো আজকালকার যুবক-যুবতীরা দুচোখে তাকে দেখতে পারে না। এর দ্বারা জাতীয় চিত্তের দৌর্বল্যই কি প্রকাশ পাচ্ছে না? এই কথা ভেবেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রাচীন ক্লাসিকেল অর্থাৎ ধ্রুব পদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রস-মুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে।"



কবিতা

নীলপরী

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুমেলী পাহাড়ে নেমেছে সন্ধ্যা নীলপরী
শেষ-রবি-আলো এখনো এপাশে মৃদু হাসে
ধূলার কণায় সোনালী কুসুম ওই ভাসে
আমার নিকট এসো না এখন চুপ করি।

দূরের দেউলে ঘণ্টা বাজিছে দিক ভরি
সবুজ আঁচল উড়াইয়া এসো মোর পাশে
সারাটি অঙ্গ ভরিয়া আজিকে যূঁই বাসে
শীতের আবছা সান্ধ্য কুহেলি সন্তরি।

আমি জেগে আছি তোমার লাগিয়া, আজ এসো;
কুসুম ঝরিয়া করিয়াছে পথ সুরভিত,
গাহিয়া আসিও তোমার কণ্ঠে সুললিত
আমার কপালে হস্ত রাখিয়া মধু হেসো।
তোমার চরণ আমার দুয়ার ভোলে নিত?
নূপুর বাজায়ে ওড়না উড়ায়ে আজ এসো।

সময়

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে হোল চিনিয়াছি তারে!

এই পৃথিবীর কোন্ কোণে একদিন এসেছিলো নিমন্ত্রণ,
ভোরের আলোকে,
শঙ্খরবে মুখরিত ধরণীর সেই প্রান্ত থেকে
অতি ক্ষীণ সৌরভের মতো
সেই ধ্বনি মিশে ছিলো সেদিনের পৃথিবীর ঈথারের গায়ে,
রমণীরা ভীড় ক'রে এসেছিলো লাজাঞ্জলি নিয়ে
(আসিবে না? রাজ্যপাটে ব'সেছে যে নূতন সম্রাট!)

তারপর পার হোল কুসুমের মাস—
(কুসুমেরি মাস বটে, শরতের নীলে ঘেরা আকাশের
ছিঁড়ে যাওয়া মেঘেদের মতো!)
সম্মুখে চাহিয়া দেখি, বিস্তীর্ণ পৃথিবী,
শুভা, বিভা, অনিতার শান্ত বাহুলতা,
তাহাদের চেয়ে-থাকা ক্লান্ত চোখগুলি; রক্তিম কপোলতল!
দেখিলাম, আমার সোনার ক্ষেতে সবুজের উদ্দাম বন্যাকে
অকৃপণ হাতে
ছড়াইয়া দিয়াছেন বিধাতা আমার!
সেই সব বাহুলতা ঘিরিল আমাকে। তাহারা গাহিল গান।
(গাহিবে না?—এসেছে যে তরুণ সম্রাট!)

হঠাৎ কি যেন হোল কি যেন ভাঙিয়া গেল
সাহারার হা হা করা ঝড়ে
কাহার বেদনা যেন অদূরের মরুগর্ভ থেকে
উঠিল আকাশে!
—ধূলি ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন ধরণীর দেহ! একী হেরি?
চলেছে সম্রাট!
রাজপথে ছিন্ন কন্থা লুটিছে তাহার,
ধূলিজালে সমাকীর্ণ সব দেহ তার;
ঝটিকায় বিপর্যস্ত পথ-প্রান্তে প'ড়ে থাকা শবের মতন!
ফুট্‌পাথে মড়ার খুলিতে মাথা রেখে
নিদাঘ-মধ্যাহ্নতাপে ব্যর্থ কোন জ্যোতিষীর ঘুমোবার আরামের মতো
বসিল সম্রাট,
বীণাপাণি হোটেলের পাশে!

ক্লান্ত হাত রাখিনু কপালে,
দেখিলাম, আরো কতো দূরে প্রসারিত যাত্রা-সীমা মোর!
হাত দিনু ধূলিম্লান দীর্ঘ কেশজালে,
(যে অলক 'অনিতা'রা ভালো বেসেছিলো)
জটা তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে!
(কি আশ্চর্য! হাস্যকর কথা, তখনো বুঝি নি)
আমার সোনার ক্ষেত পুড়ে গেছে শ্রাবণের রোদে!

এইবার চিনিলাম; করিনু প্রণাম,
আর হাসিলাম!
(হাসিব না?—আজিকে যে সময়ের এসেছে সময়।)

মেঘ ও ঝরা

—জ্যোতি সেন

N. MUTSUDDI

১৪

চুণারে আসিয়া প্রতিমা সদলবলে দিন কয়েক খুবই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সকাল বেলা গঙ্গার ধারে ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে চুণারগড় অবধি, আবার বৈকালের দিকে নিকটবর্তী অনুচ্চ পাহাড়ের ক্রমোন্নত চূড়া পর্যন্ত। এমনি ঘুরিয়া বেড়াইয়া প্রতিমার মন শান্ত ও সমাহিত হইয়া আসিয়াছে।

জায়গাটা চমৎকার। সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছে। তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরিবার আগ্রহ কাহারো নাই। সকলেরই ইচ্ছা আরও দিন কতক এখানে কাটাইয়া যায়। নাগরিক জীবন-যাত্রার কোন রকম সুখসুবিধা এখানে না থাকিলেও তাহাদের কষ্ট হয় না। বেড়াইবার নেশা যেন তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইলেও বেড়াইবার উৎসাহ তাহাদের ফুরায় না। শহর হইতে টাঙ্গায় চড়িয়া বড়পাহাড়ের পথে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়া তাহারা হাঁটাপথ ধরে, তারপর হাঁটিতে হাঁটিতে পাহাড়ের উঁচু জায়গায় অরণ্যের ধারে সবুজ তৃণের উপর দেহ এলাইয়া দেয়। কখনো ময়ূর ময়ূরী সেখানে উড়িয়া আসে, কখনো বা হরিণহরিণী ছুটিয়া চলিয়া যায়। রাণু আপন মনে গুন্ গুন্ করিতে করিতে গলা ছাড়িয়া গাহিতে সুরু করে। তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া দূর অরণ্যের পাখীরা উতলা হইয়া কলরব করিতে থাকে, গান থামিলে সকলে গল্প করে, ক্লান্তি দূর হইলে উঠিয়া পড়ে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে কত রঙ-বেরঙের ফুল, কত অচেনা লতাপাতা, কত নাম-না-জানা গাছ!

পাহাড়ের দেশে তাহারা আরও অনেকবার গিয়াছে। দার্জিলিঙ, শিমলা, শিলঙ তাহাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু বড়-পাহাড়ে এমন একটি শান্ত ও মধুর ভাব আছে যা' আর কোথাও নাই, এ জায়গাটি যেন একটি তপোবন। এখানে আসিলে তাই এত ভাল লাগে।

সেদিন ভোর না হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। বৃষ্টির আর বিরাম নাই। আকাশ উজাড় করিয়া বৃষ্টিধারা ঝরঝর শব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে। এই বৃষ্টিতে বাহির হয় কার সাধ্য! কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজিবার আনন্দে হিন্দুস্থানী তরুণীরা বৃষ্টি মাথায় করিয়া কাজরী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে বহু দূরে নির্ঝরিণী তীরে দুর্গাজীর মন্দিরে।

তাহাদের দেখাদেখি প্রতিমার দলও ছুটিল বর্ষাতি ও রবারের জুতা পরিয়া। হিন্দুস্থানী তরুণীরা আগে আগে চলিয়াছে আর পিছনে পিছনে চলিয়াছে প্রতিমা, রাণু, দিলীপ ও ইন্দুমতী। শহর ছাড়াইয়া প্রান্তরের পথে পৌঁছিলে রাণু হিন্দুস্থানী তরুণীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া কাজরী গান গাহিতে লাগিল। সভ্য জগত হইতে দূরে আসিয়া ভব্যতার আবরণখানি সে ছাড়িয়া ফেলিয়াছে। বর্ষার মাতনে তাহার মন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাঙ্গে একটা নৃত্য ছন্দ দেখা দিয়াছে। সে যেন নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে।

কিছু দূর যাইতে না যাইতেই বৃষ্টির বেগ কমিয়া গেল। একটু বাদে বর্ষণও থামিল। প্রান্তর ছাড়িয়া তাহারা পাহাড়ের পথে উঠিল। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল, আর ডান দিকে শস্য ক্ষেত। পাহাড়ের পথে আরও খানিক দূর হাঁটিয়া তাহারা ঝর্ণার ধারে উপস্থিত হইল।

দূর হইতে গর্জন করিতে করিতে ঝর্ণার জল সহস্র পাক খাইয়া ক্ষিপ্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কত যে পাথর, কত যে গাছপালা জলের সঙ্গে গড়াইয়া যাইতেছে তার ইয়ত্তা নাই। কার সাধ্য মুহূর্তকাল ঐ ক্ষিপ্র জলধারার সমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইন্দ্রের ঐরাবতও হয়ত জলের ধাক্কায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে।

ঝর্ণাটার পাশ দিয়া একটা সংকীর্ণ রাস্তা পাহাড়ের মোড় ঘুরিয়া মন্দিরের দিকে গিয়াছে। প্রবল বারিপাতে রাস্তাটা জলে ডুবিয়া ঝর্ণাধারার সঙ্গে একেবারে একাকার হইয়াছে। পথের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই জল ভাঙ্গিয়া রাস্তাটা পার হইয়া যাইতে হইবে।

হিন্দুস্থানী তরুণীরা অবলীলাক্রমে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রতিমা ও তাহার সঙ্গীরা দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দুমতী বলিলেন—'চল ফিরে যাই।'

রাণু প্রতিবাদ করিয়া বলিল—'না মা, এতদূর এসে এভাবে ফিরে যাওয়া যায় না।'

প্রতিমার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। প্রতিমা কহিল—'ভয় কি পিসিমা, এতগুলো মেয়ে পার হ'য়ে গেল আর আমরা পারব না! তুমি সাহস না পাও আমরা তোমাকে ধরে' ধরে' নিয়ে যাব।'

ইন্দুমতী হাসিয়া কহিলেন—'আমার নিজের জন্যে'ত আমি ভয় পাই না, ভয় তোমাদের জন্যেই।'

দিলীপ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—'কোন ভয় নেই। গাছের ডালপালা ধরে' ধরে' অনায়াসে পার হ'য়ে যাওয়া যাবে। তা' ছাড়া আমিও ত সঙ্গে রয়েছি—আমি help করব!'

অবশেষে দিলীপের কথামত পাশের গাছপালা ধরিয়া ধরিয়া অতি সন্তর্পণে তাহারা চলিল, কিন্তু মাঝখানে গিয়া এক

বিপদে পড়িল। প্রকান্ড একটা সাপ স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কোন রকমে কূল পাইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সাপটাকে সম্মুখে দেখিয়া রাণু ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। দিলীপ একটা মোটা ডাল ভাঙিয়া ডালটার সাহায্যে সাপটাকে তুলিয়া জঙ্গলের ভিতরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাণু তথাপি নড়ে না দেখিয়া দিলীপ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া রাস্তাটা সাবধানে পার হইয়া গেল। প্রতিমা ইন্দুমতীকে লইয়া দিলীপের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

মোড়টা পার হইয়া বনের ধার দিয়া আরও কিছু দূরে গেলে দুর্গাজীর মন্দিরটি দেখা যায়। অরণ্যের মাঝখানে নির্ঝরিণীর বাঁকে প্রাচীন এক পাষাণপুরী, এ যেন তপোবন সভ্যতার কথাই মনে করাইয়া দেয়।

এপার হইতে ওপারে যাইবার জন্য ঝর্ণার উপর যে সেতুটি আছে সেই সেতু পার হইয়া প্রতিমারা মন্দির প্রাঙ্গণের এক পাশে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। মন্দির প্রাঙ্গণে হিন্দুস্থানী তরুণীরা মনের আনন্দে গান করিতেছে। ঝর্ণার উচ্ছ্বসিত কলরোলের সঙ্গে তরুণীদের সংগীত অরণ্যের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি আকুতির মত আকাশপথে চলিয়াছে। প্রতিমার মন ঐ আকাশচারী সুরের সঙ্গে দূরে বহুদূরে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

রাণু এক জায়গায় স্থির হইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। ক্লান্তি দূর হইতে না হইতেই সে অদূরের সদ্য ফোটা কদম ফুলের গাছটা দেখিয়া সেদিকে ছুটিল। রাণুকে একা যাইতে দেখিয়া ইন্দুমতীও নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাণুর পিছনে পিছনে তিনিও চলিলেন।

একটু বাদে দিলীপ প্রতিমাকে বলিল—'চল প্রতিমা, আমরাও ঘুরে আসি।'

দিলীপের কথায় প্রতিমার সম্বিৎ ফিরিল। প্রতিমা বলিল—'চলুন!'

ঝর্ণার ধারে দুইটি বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর মুখোমুখী বসিয়া দুইজনে গল্প করিতে লাগিল।

রাণু দুই হাত ভরিয়া কতকগুলি কদম ফুল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। দিলীপ ও প্রতিমাকে তন্ময় হইয়া কথা বলিতে দেখিয়া রাণু জিজ্ঞাসা করিল—'কি কথা হচ্ছে? আমি এসে disturb করলাম নাকি?'

দিলীপ হাসিয়া বলিল—'না।'

—'কিন্তু বসতে বলছেন না ত!'

—'বস!'

'না, বসব না। আপনি আমার ফুলগুলি রাখুন, আমি একটু ঘুরে আসি'—বলিয়া রাণু ফুলগুলি দিলীপের হাতে দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ইন্দুমতী আবার সেদিকে ছুটিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দিলীপ কহিল—'দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছে! কাজেরও তাড়া নেই, সময়েরও হিসেব করে' চলতে হয় না, জীবনটা যদি এম্‌নিভাবেই কাটিয়ে দেওয়া যেত!'

প্রতিমা কহিল—'সারা জীবন কেউ এভাবে কাটাতে পারে!'

দিলীপ বলিল—'আমি পারি। তুমি কাছে থাকলে আমি এভাবে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দিতে পারি।'

কথাটা বলিয়া দিলীপ প্রতিমার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু প্রতিমার মুখে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা দিল না।

'হ্যাঁ, ভাল কথা'—বলিয়া দিলীপ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। জিজ্ঞাসা করিল—'জয়ন্তবাবুর খবর কি বলতে পার!'

নিজের কথা বলিতে বলিতে দিলীপ জয়ন্তের কথা উত্থাপন করায় তাহার প্রশ্নটা প্রতিমার নিকট বিসদৃশ মনে হইল। প্রতিমা দিলীপের এই প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়া বলিল—'জয়ন্তবাবুকে আপনি ভোলেন নি দেখ্‌ছি! তিনি ভালই আছেন খবর পেয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

দিলীপ হাসিয়া কহিল—'তাঁর সম্বন্ধে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, যদি কিছু মনে না কর তা' হলে জিজ্ঞাসা করি।'

প্রতিমাও হাসিল। হাসিয়া বলিল—'অসংগত প্রশ্ন করবেন না।'

—তাঁর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু বলছে, তাদের কথা শুনে ত কিছু বুঝবার যো নেই। তুমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কর, তাই তাঁর সম্বন্ধে তোমার মুখে কিছু শুনতে চাই।'

—'আমি যে তাঁর admirer তা ত আপনি জানেন! আমার মুখে আপনি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই শুনতে পাবেন। হয়ত তাঁর প্রশংসা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। কিন্তু যত প্রশংসাই করি না কেন—কোন প্রশংসাই তাঁর মহত্ত্বের তুলনায় কিছু নয়।'

প্রতিমার কথা শুনিয়া দিলীপের চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া সে বলিল—'জয়ন্তবাবু সম্বন্ধে তোমার ধারণা তা হ'লে একটুও বদলায়নি?'

'না। বদলায়নি। আরো বদ্ধমূল হ'য়েছে।'—বলিয়া প্রতিমা দিলীপের বিস্ফারিত চক্ষু দুইটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

একে অপরের পানে তাকাইয়া ক্ষণকালের জন্য উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিল। কোথা হইতে একটা অপ্রসন্নতা ও অবসাদ আসিয়া যেন তাহাদের কথা বলিবার উৎসাহ কাড়িয়া লইল। চুপ করিয়া থাকাও যায় না—অথচ বলিবারও কিছু নাই—এমনি একটা অবস্থায় পড়িয়া তাহারা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দুমতী রাণুকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া তিনি বলিলেন—'বড় ভুল হয়ে গেছে! বাড়ি থেকে ত খাবার আনা হয়নি। এখন খাবে কি?'

'তাইত!'—বলিয়া দিলীপ মাথা চুলকাইতে লাগিল। একটু বাদে বলিল—'এখানে ত' কিছু পাওয়া যাবে না।'

ইন্দুমতী বলিলেন—'সকলেই যার যার খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমাদেরও আনা উচিত ছিল। সে থাক্‌গে এখন আর এখানে দেরী করা চলবে না। বাড়ি চল।'

কিন্তু এইমাত্র এত দূর হাঁটিয়া আসিয়া আবার এখনই এতদূর হাঁটিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তখনই ফিরিতে হইল। ইহার পর দিলীপের চুণারে থাকিবার উৎসাহও আর রহিল না। ক্রমশ

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

[১]

কৈশোর স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই। তবে জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে মহৎ লোকের কথা শুনিলে মনে আনন্দ হয়। আমি পুরাতন কথাই বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অনেক কথাই মনে উদিত হয়। কারণ জীবিতকালে তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। একটি প্রবন্ধে তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে চেষ্টা আমি করিব না। আমি শুধু তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে তাঁহার মহৎ দানের দিগদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে আধুনিক বাঙলার "সুবর্ণ যুগ" বলা যায়। এই রকম সময় বাঙলা দেশে খুব কমই দেখা গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশে নব-জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যে সময় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তখন সমস্ত দিক দিয়াই বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনে একটা বিশাল সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। সাহিত্যের বিকাশ, জাতীয়তার আন্দোলন, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন—জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকেই তখন জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে বাঙলা দেশ সমস্ত ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং সকল দিকেই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। একথা আমরা গর্ব করিয়া বলিতেছি না। ইহা খাঁটী সত্য কথা এবং কিছুদিন পূর্বেও সকলেই স্বীকার করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে কেহ কেহ ইহাকে আমাদের বৃথা গর্ব বলিয়া মনে করেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সিমলা-শৈলে একটা সভায় অন্যতম কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, '১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর হইতে ভারতবর্ষে সত্যকার স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্ভব হয়' তৎপূর্বে বাঙলা দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন হইয়াছে অথবা বাঙলা সাহিত্যে কেহ যে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইএর মত একজন ভারতবিখ্যাত নেতার যে এইরূপ অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বন্যার প্রবল প্রবাহের মত বাঙলা সাহিত্যকে প্লাবিত করিয়াছিল। তখনকার অনেক বিশ্রুত কীর্তি কবি, মনীষী ও সাহিত্যিক বাঙলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

সিপাহী যুদ্ধের পর দেশে যে একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, বাঙলা দেশের কবি ও সাহিত্যিকদের মনেই তাহা সর্বপ্রথম প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' কেবল মিত্রাক্ষর ছন্দের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহের পরিচয় দেয় নাই, ঐ কাব্যের আগাগোড়া স্বাধীনতার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই সময়েই কবি রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনী' কাব্যে তূর্যধ্বনি করিয়াছেন,—

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
> কে বাঁচিতে চায়,
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
> কে পরিবে পায়।
>
> * * * *
>
> দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় রে,
> স্বর্গসুখ তায়।

কবি গোবিন্দলাল রায় দেশের পরাধীনতা স্মরণ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

> কত কাল পরে বল ভারত রে
> দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে,
> অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
> এ কি শেষ নিবেশ রসাতলে রে।
> নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
> পর দাসখতে সমুদায় দিলে
> পর দীপশিখা নগরে নগরে
> তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এই সময়েই বিদেশী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে বিদ্রোহধ্বনি তুলিয়াছিল।

এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে বলিয়াছেন,—তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারে পূর্ব হইতে স্বদেশী ও জাতীয় ভাব প্রবল ছিল। তাঁহার পিতা ও সহোদরগণ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্রুত কীর্তি পুরুষদের দানে জাতীয় জীবনের নানা দিক পুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পরিবারের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে "হিন্দু মেলার" সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের জন্মের ১৭ বৎসর পূর্বে ১৮৬৮ সালে 'হিন্দু মেলা'র সূচনা। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর এই মেলা হইত। তখনকার দিনে দেশের যত জ্ঞানীগুণী, চিন্তানায়ক, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই 'হিন্দু মেলা'য় যোগ দিয়াছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি মনমোহন বসু, শিশির-কুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি।

জাতীয় ভাবের বক্তৃতা, জাতীয় সংগীত প্রভৃতির

দ্বারা এই হিন্দু মেলায় দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধন করিবার চেষ্টা হইত। স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারের আয়োজনও এই মেলাতেই সর্বপ্রথম হইয়াছিল। *হিন্দু মেলায় যে জাতীয় -আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই।* *প্রথমত, হিন্দু মেলার উদ্যোক্তারা অখণ্ড ভারত ও এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন, কেবল বাঙলা ও* বাঙালীর কথা ভাবেন নাই। ইহার পূর্বে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কেহ অখণ্ড ভারত ও ভারতীয় মহাজাতির কথা বলেন নাই। এ গৌরব বাঙলারই প্রাপ্য এবং হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের নিকটই সমগ্র দেশ এজন্য ঋণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতিতে' এবং অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়াতে' একথা স্পষ্ট-ভাবেই বলিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, কংগ্রেসই 'ভারতীয় মহাজাতির' কথা প্রথম বলিয়াছেন, তাঁহারা ভুল বলেন, কংগ্রেসের পূর্ববর্তী বাঙলার আর একটি প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনও এই ভাব প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও 'হিন্দু মেলা'র পরে এবং 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' যে হিন্দু মেলার নিকট হইতেই এই ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'হিন্দু মেলার' ৮ বৎসর পরে ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের প্রতিষ্ঠা হয়। (শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' দ্রষ্টব্য।)

হিন্দু মেলার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার অনুষ্ঠাতারা 'আত্মশক্তির' বলেই দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, আবেদন নিবেদনের দ্বারা নয়।

তৃতীয়ত, দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে যে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়োজন, 'হিন্দু মেলায়' এই ভাবও সর্বাগ্রে হাতে কলমে প্রচার করা হইয়াছিল।

'হিন্দু মেলাতেই' সর্বপ্রথম 'জাতীয় সংগীত' রচিত ও গীত হইয়াছিল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে", দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারই', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান' ও 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না', কবি মনমোহন বসুর—'দিনের দিন সবে দীন' প্রভৃতি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত এই হিন্দু মেলাতেই গীত হইয়াছিল। কবি মনমোহনের গানে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধারের বার্তা ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছিল—

দিনের দিন সবে দীন
ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অনশনে তনু ক্ষীণ।

* * *

সুচসুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে;
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে নেতে
কিছুতে নয় লোক স্বাধীন।
আজ যদি এ দেশ ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনে কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোকে তবে দিগম্বরের সাজ
পরণে তোর কোপীন
ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথের রচিত 'জাতীয় সংগীত' জাতীয় জীবনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' ব্যতীত এমন বীর্যস্কর জাতীয় সংগীত বাঙলা ভাষায় আর রচিত হয় নাই ঃ—

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃপ্রাণ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধনে,
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

* * *

"কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এই মহান জাতীয় সংগীতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক! হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব-পশ্চিমে সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!" (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯)।

'হিন্দু মেলার' উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য—রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র। রাজ-নারায়ণ বসুর কল্পনা এবং নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ ও কার্যকরী শক্তিই এই হিন্দু মেলার সাফল্যের প্রধান কারণস্বরূপ হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসুর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের তুলনা মিলে না। হিন্দু মেলায় জাতীয় ভাব সঞ্চারের মূলে ছিলেন তিনি। তাঁহার 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'সেকাল ও একাল' প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা তিনি হিন্দু মেলাতেই দিয়াছিলেন।

নবগোপাল মিত্র ছিলেন আগাগোড়া জাতীয়ভাবে ভরপুর, লোকে তাঁহার নামই দিয়াছেন 'ন্যাশনাল নবগোপাল'। জাতীয়-ভাব প্রচারের জন্য 'ন্যাশনাল পেপার' নামে তিনি একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'হিন্দু মেলা'র জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। তিনি তখনকার দিনে একজন ধনীলোক ছিলেন, কিন্তু এই হিন্দু মেলা ও 'ন্যাশনাল পেপার' প্রভৃতির জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া অবশেষে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকুল্যে ও উৎসাহে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা হইলেন মেলার পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষ ও মনমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী হইলেন। এই হিন্দু মেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে নাও হয়, সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পত্তন হইল। ঐ মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য, স্ত্রীলোকদের সূচী ও কারুকার্য, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক, ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলা উপলক্ষে কবিতা প্রবন্ধাদিও পঠিত হইত।"

নবগোপাল মিত্রের কথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তিনি দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে অনুরোধ পালনও করিয়াছিলেন। 'হিন্দু মেলা' বন্ধ হইবার পর বৃদ্ধকালে নবগোপালবাবু "কতকগুলি মড়াখেগো" ঘোড়া লইয়া একটি দেশী সার্কাসের দলও গঠন করিয়াছিলেন। ইহাই বাঙালীর প্রথম সার্কাস। মোট কথা, সর্ববিধ জাতীয় অনুষ্ঠানে নবগোপালবাবুর মহা উৎসাহ ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জাতীয় ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে বাঙালী জাতি স্মরণ করিয়া রাখে নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন,—"তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এদেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও এই হিন্দু মেলার একজন প্রধান উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার প্রাণে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। দেশবাসীর মধ্যে নানা-ভাবে জাতীয় ভাব প্রচারের তিনি চেষ্টা করিতেন এবং সেজন্য লোকলজ্জা, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি উপেক্ষা করিতেও তিনি দ্বিধা করিতেন না। সমগ্র ভারতের জন্য একটা অদ্ভুত "সার্বজনীন জাতীয় পরিচ্ছদের" পরিকল্পনা তিনিই প্রথম করেন এবং সেই অদ্ভুত পোষাক পরিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে রাস্তায় বাহির হইতেও তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই। (রবীন্দ্রনাথ—"জীবনস্মৃতি")। স্ত্রী-স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য সেই সনাতনী রক্ষণশীল যুগে লোক নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সস্ত্রীক ঘোড়ায় চড়িয়া জোঁড়াসাকোর বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত বেড়াইতে যাইতেন। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—জীবন স্মৃতি) স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বাঙলা ভাষায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক 'পুরু বিক্রম' ও 'সরোজিনী' তিনিই প্রথম রচনা করেন। এই দুই নাটক তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। ('জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা'—এই বিখ্যাত গানটি 'সরোজিনী' নাটকে তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—'জীবন স্মৃতি'।) বস্তুত গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগমনের পূর্বে নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সংগীতকলাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও সংগীত রচনায় তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নিকটই হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে ও দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথের মনে জাতীয়ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের মত বাঙলা সাহিত্যের এমন অক্লান্ত সেবক বিরল। শেষ বয়স পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই বহু-মুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি বাঙলার জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ অগ্রজদের সঙ্গে 'হিন্দু-মেলায়' যান। ১৮৭৫ সালে (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৪ বৎসর), হিন্দু-মেলায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা ('ভারতী বন্দনা') পঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে 'হিন্দু-মেলায়' তিনি আর একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লী দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গভর্নমেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ-পনের বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। ....সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দু-মেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।"

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে একটি 'প্রাদেশিক সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ইহার একজন সভ্য ছিলেন। হিন্দু-মেলার ন্যায় এই 'প্রাদেশিক সভা'ও রবীন্দ্রনাথের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছু ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কি করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়েরাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের

অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতে সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশী কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতে পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্ না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি।"

এই সভার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী ছিল না। দল বাঁধিয়া শিকারে যাওয়া, বাগান বাড়িতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে চড়ুইভাতি করা, ঝড়ের মধ্যে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া জাতীয় সংগীত গান করা প্রভৃতি যখন যাহা খেয়াল হইত, তাহাই সদস্যেরা করিতেন। স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা, কাপড়ের কল তৈরী প্রভৃতিও তাঁহাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সভার সভাপতি রাজনারায়ণ বাবু সদস্যদের পিতামহের বয়সী হইলেও, তাঁহার মনটা শিশুর মতই সরল ছিল, আনন্দে ও উৎসাহে তিনি কিশোর সদস্যের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতিতে' অমর তুলিকায় রাজনারায়ণ বসুর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তখনকার দিনে বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতার স্বপ্ন রাজনারায়ণ বসুর লেখনীমুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল,—"আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশা-পূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ * * * করিতেছি।"

এইরূপে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবন আরম্ভ হইল। ঘরে-বাহিরে সর্বত্র জাতীয় ভাবের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ তিনি লাভ করিলেন। বাঙলার আকাশে-বাতাসে তখন যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছিল, কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহারই মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা মুকুলিত হইয়া উঠিল।

ক্রমশ

২৫শে বৈশাখ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের এই দিনটি দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়। কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য আগামী ২৫শে বৈশাখ (ইং ৮ই মে) 'দেশ' পত্রিকা 'রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যায় থাকিবে রবীন্দ্রনাথের বারোখানি মূল্যবান্ অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও শেষ জীবনের নানা ঘটনা সম্পর্কে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও অনুরাগীদের নানা প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ফটোচিত্র এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

প্রশ্ন

শ্রীস্মরজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

রাত তখন কত জানি না। হঠাৎ নার্স আসিয়া ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, ডাক্তারবাবু, রুম নং ৪৭-এর 'পেসেণ্ট' আপনাকে ডাকছেন।

লোকালয় হইতে অনেক দূরে একটি নির্জন স্থানে এই টি বি হাসপাতালের আমি ডাক্তার এবং ইহারই একটি অংশে থাকি।

এই রোগিনী নূতন আসিয়া ভর্তি হইয়াছে। অবস্থা বিশেষ ভাল না হইলেও এমন কিছু গুরুতর নয়, যে জন্য মধ্যরাত্রে ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইতে পারে। গত অপরাহ্ণেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। তাই একটু চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। হঠাৎ এই অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থার এমন কি পরিবর্তন হইতে পারে যাহার জন্যে...

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ প্রভৃতি লইয়া অতি দ্রুত রোগিনীর গৃহে উপস্থিত হই। পশ্চাতে নার্স।

ঘরে প্রবেশ করিতেই রোগিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয়, আমার আগমনে সে যেন বিশেষ ভরসা পাইয়াছে। বলে, ডাক্তারবাবু, হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল......

অত্যন্ত সাবধানে বুক পরীক্ষা করি। উপস্থিত নূতন কোন দুর্লক্ষণ দেখা গেল না। তাই আশ্বাস দিয়া বলি, কই, কিছু ত হয়নি, বুক ত খুব ভাল...

রোগিনী যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের আঘাত পায়। বলে, খুব ভাল? তবে আপনি কিছু জানেন না ডাক্তারবাবু, আমার মনে হচ্ছে...

—কি মনে হচ্ছে বলুন, খুব ব্যথা?

—না।

—বিশেষ যন্ত্রণা?

না, তাও না।

—তবে? আমি বিশেষ উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করি। ব্যথা বা যন্ত্রণা ভিন্ন এই রাত্রে আর কি উপসর্গ হইতে পারে?

ডাক্তারবাবু! রোগিনীর কণ্ঠে কাতর আহ্বান, চক্ষে সঙ্কোচভরা দৃষ্টি।

কি কষ্ট হচ্ছে বলুন, দ্বিধা কচ্ছেন কেন?

—ডাক্তারবাবু আমার একটা কথা শুনবেন? বেশী কিছু বলব না, কেবল একটা কথা, শুনবেন দয়া করে?

—নিশ্চয়ই শুনব, আপনি যখন রোগশয্যায় আর আমি যখন ডাক্তার, তখন আপনার প্রত্যেক কথাই যে আমাকে শুনতে হবে।

রোগিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, বোধ হয় কিছু চিন্তা করে। তারপর অতি ধীরে ধীরে বলিতে থাকে, ডাক্তার-বাবু, আলো নিভিয়ে শুয়েছিলুম, কিন্তু ঘুম এলো না। জানলা খোলা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলুম...

খোলা জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি চলিয়া যায়। শুক্লা একাদশী রাত। দূরে ছোট ছোট পাহাড় আর তাহার চারিপাশে অন্তহীন প্রান্তর অপরূপ চন্দ্রালোকে ভরিয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী এত বিরাট, এত রহস্যময়, এত শান্ত, এত সুন্দর!..

...শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। বাইরের সুন্দর পৃথিবী তার স্বপ্নময় দুই চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললুম, ওগো, আমি কি তোমার কাছে ফিরে যেতে পারি না? এই চারটে দেয়াল-ঘেরা ঘরখানি ছেড়ে তোমার কাছে চলে যাবার শক্তি আমার কি কোনদিন হবে না?...কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। শুধু সেই রকমভাবে আমার চোখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইল।...

...কত কি যে এলোমেলো কথা মনে আসে। কিন্তু বলি বলি করে বলা হয় না। এক একটা মুহূর্ত গুণি, ভাবি, এ কতটুকু? আবার মনে হয়, এই ত আমার অসম্পূর্ণ জীবনে সবচেয়ে বড়...তাই ভয় হয়, তাড়াতাড়ি বলতে যাই ভাবি, এই বুঝি শুভ মুহূর্তটি চলে গেল...কিন্তু বলা আর কিছুতেই হয়ে ওঠে না...

—ডাক্তারবাবু, আপনি চলে যাবেন না, এখনও আমার শেষ কথাটি বলা হয়নি...

রোগিনীর দীপ্তিহীন দুই চক্ষুর অর্থহীন দৃষ্টি বাহিরের জ্যোতির্ময় সীমাহারা গগনে কি যেন খুঁজিতে থাকে। মনে হয়, সে যেন আপনার বর্তমান অবস্থার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে। সে যে একটি হাসপাতালে আছে, পাশে ডাক্তার ও নার্স, ডাক্তার যে তাহারই কথার অপেক্ষায় আছে, এ সব যেন বিস্মৃত দিনের একটা কাহিনী মাত্র...

বাহিরের আলোকময় অনন্ত বিশ্ব হইতে সহসা তাহার শ্রান্ত দৃষ্টি যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সহসা এই দুর্বল রোগিনী এক মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। যন্ত্রপাতি সমেত আমার হাত দুখানি ধরিয়া প্রশ্ন করে, ডাক্তারবাবু আমি কি বাঁচব? বলুন ডাক্তারবাবু, সত্যি করে বলুন...

তাহার চক্ষে ব্যাকুল দৃষ্টি, কণ্ঠে আকুল প্রশ্ন এবং তাহার সমস্ত মিলিয়া মৃত্যুর অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ...

আমি ত এ জগতে আর কিছু চাইনা, আমি শুধু বাঁচতে চাই। ডাক্তারবাবু, শুধু বাঁচতেও কি আমি পারব না?

আমি তাহাকে শান্ত করিতে উদ্যত হই। বলি, কে বলল আপনি বাঁচবেন না? আমি ঠিক বলছি, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন। অনর্থক মিথ্যে আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার অবস্থা সত্যি খুব ভাল, কোন ভয় নেই, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন...

রোগিনীর চক্ষু ছল ছল, মুখে অপরিসীম তৃপ্তির ভাব।

—পারবেন ডাক্তারবাবু? আমাকে বাঁচাতে? সত্যি পারবেন তো?

—কিন্তু আমার মত এক ক্ষুদ্র মানুষের উপর জীবনমৃত্যু

সম্বন্ধে দেবতার মত অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করায় যে বিরাট ভুলের সৃষ্টি হয়, সে ভুল যে প্রকৃতই ভুল, কঠোর সত্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়।

এবং ইহার ফলে রুম নং ৪৭-এ পরিবর্তন আসে। পুরাতন চলিয়া যায়। নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে।

ঠিক তেমনি এক রাত্রে নার্স আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। সেই ঘর, সেই খাট, সেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, কেবল রোগিনী ভিন্ন।

এই রোগিনীর অবস্থা প্রকৃতই বিশেষ ভাল নয়। গত রাত্রে ও এই হাসপাতালের মায়া চিরতরে কাটাইবার মত অবস্থা তাহার হইয়াছিল। সুতরাং এই অসময়ে আমাকে ডাকিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ভাবিয়া দ্রুত তাহার গৃহে উপস্থিত হই।

ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে বুক পরীক্ষা করি। পাল্স দেখি। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু আশ্চর্য, এখনও তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে।

গত অপরাহ্নে এক ঝলক রক্ত উঠিয়া রোগিনী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন সেই ভাব অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। নিভিয়া যাইবার ক্ষণেক পূর্বে প্রদীপের দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠার উপমাটি এখানে প্রয়োগ করা চলিতে পারে।

আমার যাহা দেখিবার তাহা শেষ করি। পরে প্রশ্ন করি, আপনার আর কি কষ্ট হচ্ছে বলুন...

আমার কথা শুনিয়া রোগিনী অতি ধীরে তাহার দুই চক্ষুর নমিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরে। সেই সঙ্কোচভরা দৃষ্টি, সেই কাতর মিনতি।...

—ডাক্তারবাবু, শুনবেন আমার কথা? একটা কথা মাত্র... দয়া করে যদি...

তাহার ভগ্ন কণ্ঠের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সমতা রক্ষা করিয়া আমি বলি, আপনি ইতস্তত করবেন না, আপনার যা বলবার আছে বলুন...

আমার অভয় পাইয়া রোগিনী কতকটা স্থির হয়। তারপর অতি ধীরে ধীরে বলিতে থাকে, ডাক্তারবাবু, আলো নিভিয়ে শুয়েছিলুম, কিন্তু ঘুম এলো না। জানলা খোলা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলুম...

খোলা জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি চলিয়া যায়। দূরে ছোট ছোট পাহাড় আর তাহার চারিপাশে অন্তহীন প্রান্তর আজ গাঢ় আঁধারে ভরিয়া গিয়াছে। সীমাহীন আকাশে ঘন কালো মেঘ, আর পাহাড়ের ওপারে দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল আজ মিলিয়া মিশিয়া একাকার। সমস্ত প্রকৃতি আজ এত অশান্ত, এত ভয়াবহ, এত নিষ্ঠুর.........

......বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলুম না। বাইরের দুর্যোগ যেন ভীষণ হয়ে আমার দিকে ছুটে এলো, আমার দিকে চেয়ে রইল, আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল.........

আমার উপস্থিতিতে ভরসা পাইয়া রোগিণী বারেক সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়াই চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া বলিয়া ওঠে, আমার বড় ভয় করছে, আমি কি বাঁচব? বলুন ডাক্তারবাবু, সত্যি করে বলুন, আমি কি.........

অকস্মাৎ অন্তরে একটা প্রচণ্ড আঘাত পাই। ভাবি, এই প্রশ্নটি কাহার? ঠিক এই প্রশ্নই ত সেই মধ্যরাত্রে আমাকে আর একজন করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে যাহাদের জন্য এই ঘরটি নির্দিষ্ট হইয়া আছে, আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া ভীতব্যাকুল চিত্তে ক্ষমতাহীন নিরুপায় দুর্বল এক ডাক্তারের কাছ হইতে চিরচলিত একটিমাত্র সান্ত্বনার কথা শুনিবার আশায় তাহারাও কি এই প্রশ্নই করিবে না?

সেদিন তাহাকে ভুল উত্তর দিয়াছিলাম, আজ কি আবার সেই মিথ্যারই পুনরাবৃত্তি করিব?

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া আপনার চরম অবস্থা সে বুঝিতে পারে। তাই নিতান্ত অবুঝের মত এক অস্ফুট অথচ আকুল আর্তনাদ করিয়া বলে, আমি ত মরতে চাই না, আমি যে বাঁচতে চাই, তবু কি আমি বাঁচতে পারব না?

আমি একটি সান্ত্বনার কথা খুঁজিতেছিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ আমার চক্ষে ঘরের সমস্তই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। চক্ষে পড়িল, মাস তিনেক পূর্বের সেই রোগিনী, যাহাকে জীবনের আশা দিয়েছিলাম, কারণ সেই রাত্রে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, আমার কর্মদক্ষতায় অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং আমার চিকিৎসক জীবনের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে সেই ছিল ফার্স্ট পেসেণ্ট।

কিন্তু আজ রাত্রে মুক্ত ঝটিকা যখন দূর প্রান্তরের সন্ধান পাইয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্যুৎ শিখার ভ্রূকুটি যখন কালনাগিণীর কুটিলতাকেও অতিক্রম করিয়াছে, মনে হইল বহুদিন পূর্বের সেই যক্ষ্মারোগী সহসা মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। শুইয়া থাকাটাই যাহার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা আমার চক্ষে বীভৎস হইয়া উঠিল। জানু দুটি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। কোমরে আর বুকে শক্তি নাই। সমস্ত দেহ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কণ্ঠদেশের অস্থি বাহির হইয়া আসিতে চায়। সর্বদেহ যেন প্রাণহীন, ইহার মধ্যে কেবল চক্ষু দুইটি জীবন্ত হইয়া অস্বাভাবিকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দু'হাতে খাটের একটি কোণ ধরিয়া সে আমার দিকে ফিরিয়া তাকায়। আমার সান্ত্বনা দিবার সমস্ত প্রয়াসের উপর তীক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলে, এটা কি প্রবঞ্চনা নয়? তোমার একটি কথায় যার এত বিশ্বাস, তার মৃত্যু যখন এত কাছে, তার সঙ্গে জীবন নিয়ে চাতুরী? ছলনা?

প্রাণের যে তুচ্ছ দাবী সে জানায়, সারারাত ধরিয়া তাহা এই ছোট ঘরে গুমরিয়া ফিরিতে থাকে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা সমর্থন করা সম্ভব হয় না।

পুরুষ ও রমণী

(বড় গল্প)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৩

আনন্দর সেই যে প্রতিষ্ঠা হইল এই বাড়িতে, তাহা আর নষ্ট হইল না। সে না থাকিলে এই নব-বিবাহিত তরুণ দম্পতীর দিন কি করিয়া কাটিত বলা কঠিন, নির্জনস্থানে তাহাদের এই ব্যবধান হয়ত অসহ হইয়াই উঠিত। কিন্তু আনন্দর প্রগল্‌ভ মুখরতা তাহাদের সমস্ত গ্লানিকে ঢাকিয়া জীবনযাত্রাকে চলনসই করিয়া তুলিল। সে-ই জোর করিয়া তাহাদের ঠেলিয়া বাহির করে বিকাল বেলা, সকালে লইয়া যায় হাটে, নয়ত এমনি বেড়াইতে লইয়া যায়। আহারের আয়োজন তাহার সহস্র রকমের, আবদারও কম নয়। কিন্তু ইন্দিরা প্রসন্ন কেন, প্রফুল্ল মনেই তাহার সমস্ত রকম আবদার সহ্য করে। সে যেন ইহাকে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

তাহার আর সুকুমারের মধ্যেকার সম্পর্কটা আছে সেই রকমই। প্রয়োজন মত ইন্দিরা সহজভাবেই কথা বলে, কিন্তু শুধু প্রয়োজন মতই। রাত্রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মধ্যে, পাগলকরা দক্ষিণা বাতাসের সমারোহের মধ্যে দুজনে শুইয়া থাকে দুইটি পৃথক শয্যায়, নিঃশব্দে, নীরবে। সুকুমার কিছুই বলে না, বৃথা টানা হেঁচড়াতে আর তাহার প্রবৃত্তি নাই, একতরফা প্রেম নিবেদন করিতে যেন তাহার ঘৃণা বোধ হয়! সে সঙ্গে থাকে, বেড়াইতেও যায়, কথাবার্তাতেও যোগ দেয় তবু যেন কিছুতেই তাহার উৎসাহ নাই। শীতল-স্নিগ্ধ সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়াও অসহ্য তৃষ্ণায় সে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্ণে সে বসিয়া বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছে এমন সময় অত্যন্ত লঘুপদে ইন্দিরা ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, আনন্দ ঠাকুরপো বলছেন আজ পাথরোল যাবার কথা, তিনি গাড়িও ঠিক করেছেন,—

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে চিত্তদমন করিয়া কহিল, বেশ ত, যাও না—

সহজকথা, কিন্তু কন্ঠস্বরে কোথায় একটা গোলমাল ঠেকিল। ইন্দিরা একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার কাপড়-জামা এইখানে এনে দেব?

সুকুমার তাহার মুখের উপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, কেন আমাকে এমন টানাটানি করো ইন্দিরা, আমাকে দুঃখ দিয়ে কি তোমার সাধ মিটছে না? এখানে এইভাবে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া এ যে কি প্রাণান্ত দুঃখ তা কি বোঝ না? এতে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তুমিই যাও, তুমি সুখে থাকো আনন্দ পাও, যা খুশী তাই করো—আমায় শুধু রেহাই দাও!

অব্যক্ত যন্ত্রণার এমনই একটা আকুতি ফুটিয়া উঠিল সুকুমারের কণ্ঠে যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ইন্দিরার মুখে বেদনার ছায়া দেখা দিল। সে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সুকুমার চুপ করিল না, তেমনি একটা চাপা অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া চলিল, এই বিদেশে আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে রয়েছি, তবু আমি তোমার কাছে ঐ মালীর চেয়েও বোধ হয় পর। অথচ বাইরে সব সময়ে সেই কথাটাই ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। ঢাকাও থাকে না শুধু শুধু এই টানাটানি, এই উঞ্ছবৃত্তি—এ আর আমি পারছি না। আমি অপরাধ যতই করে থাকি, তোমার কাছে ত করিনি আমাকে তুমি ছেড়ে দাও—

আরও কি বলিতে যাইতেছিল সে, কিন্তু সহসা ইন্দিরার বিবর্ণ নতমুখের দিকে নজর পড়িয়া থামিয়া গেল। ইন্দিরা স্তব্ধ হইয়া ঘরের ঠিক মাঝখানে তেমনিভাবেই দাঁড়াইয় রহিল, সুকুমার রহিল নিঃশব্দে দূর আকাশের দিকে চাহিয়া। এইভাবে মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল, আরও কতক্ষণ এইভাবে কাটিত কে জানে, হঠাৎ দমকা বাতাসের মত প্রবেশ করিল আনন্দ।

কি বৌদি, এখনও তৈরী হয়ে নেননি? ফিরতে দেরী হবে যে!

প্রাণপণে কন্ঠস্বর স্বাভাবিক করিয়া লইয়া ইন্দিরা জবাব দিল, ওঁর বড্ড মাথা ধরেছে ঠাকুরপো, আজ থাক্—

আনন্দের কন্ঠে পরিষ্কার হতাশা ফুটিয়া উঠিল, মাথা ধরেছে নাকি রে? কখন ধরল একটু বাইরের হাওয়ায় গেলে বোধ হয় ভালই হতো—

চলিয়া যাইতে যাইতে দ্বারপথ হইতে ইন্দিরাই জবাব দিয়া গেল, না, সে হয় না। শরীর খারাপ থাকলে কিছু ভাল লাগে না বরং সামনের মাঠে একটু পায়চারী করেন ত করুন!

ইন্দিরা চলিয়া গেল, আনন্দও 'তাই ত, গাড়িও'লাটা আবার'—বলিয়া শীষ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ইন্দিরার এই সামান্য কথাতেই সুকুমারের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দিরা তাহার মানসিক অবস্থাকে সম্মান করিয়াছে, তাহার জন্য মিথ্যা বলিয়া তাহার দৈন্যকে ঢাকিয়া লইয়াছে, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাও দেখাইয়াছে—এই সব তুচ্ছ ছোট ছোট কথাতেই তহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল, ইন্দিরার ইচ্ছাকে এমনভাবে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য অনুতাপেরও সীমা রহিল না।...

একটুখানি ইতস্তত করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ভিতরের বারান্দায় বসিয়া ইন্দিরা তখন অপরাহ্ণের জলখাবারের ফল কাটিতেছিল, দাসী-চাকর কাছে কেহ নাই দেখিয়া সুকুমার তাহার

পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমার মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলে ফেলেছি, তুমি কিছু মনে ক'রো না। চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি—

বোধ হয় অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ইন্দিরার ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, আজ থাক্—

সুকুমার মিনতি করিয়া বলিল, চলো না লক্ষ্মীটি, অন্তত নদীর ধারেই একটু যাওয়া যাক্।

মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা কহিল, সে হয় না। ঠাকুরপো কি ভাববেন তা হ'লে। জল খেয়ে তুমিই একটু ঘুরে এসো।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। সুকুমার হয়ত আশা করিয়াছিল ইন্দিরাই রাত্রে আর কিছু বলিবে, হয়ত বা অনুতাপের সুর তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে কিন্তু সে সব কিছুই হইল না, ইন্দিরা প্রতিদিনের মতই নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পৃথক শয্যাতে শুইয়া পড়িল।...

পরের দিন সুকুমারই উপযাচক হইয়া পাথরোল যাত্রার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু এইভাবে বেড়াইতে যাওয়া সত্যই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। আনন্দ তাহার সঙ্গ ঠিক চায়ও না, ইন্দিরার দিকেই তাহার মনোযোগ, বেড়াইতে বাহির হইয়া সে তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অনর্গল বকিয়া হাস্য-পরিহাসে-ইতিহাসে কল্পনায় সে ইন্দিরাকে মাতাইয়া তুলিতে চায়। ইন্দিরাও প্রথম হইতেই এই বন্ধুটিকে প্রীতির চোখে দেখিয়াছিল, এখানকার এই প্রায়-নিঃসঙ্গ, নির্জন জীবনযাত্রায় এই ছেলেটিকে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল।

পাথরোল যাত্রাও সুতরাং সুকুমারের কাছে ব্যর্থ হইয়া গেল। সে গাড়িতে সমস্তক্ষণই চুপ করিয়া রহিল, কারণ কথা বলার ভূমিকা আনন্দ এবং সায় দেওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ইন্দিরা—তাহার মধ্যে সুকুমার যেন অতিরিক্ত। কালীবাড়িতে পূজা দিবার সময় দু-একটা কি পরিহাস করিবার চেষ্টা করিয়া সে আবার নিঃশব্দেই উহাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরিল। যে সুন্দরী কিশোরীর উপস্থিতি আনন্দকে অত মুখর করিয়া তুলিয়াছিল সেই মেয়েটির পাশে বসিয়া তাহার উষ্ণ কোমল দেহের সংস্পর্শ প্রতিনিয়ত পাইয়াও তাহার স্বামীর কণ্ঠে যেন কোন প্রকার কথা ফুটিল না। সে যেন ইহাদের অপরিচিত পর।

সেই দিনই বাড়ি ফিরিয়া সুকুমার প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর নয়, এ অভিনয়ের এইখানেই শেষ করিতে হইবে, আর সে এমন করিয়া নিঃশব্দে পুড়িতে পারিবে না—

সেদিন সারারাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না, শুধু এই কুৎসিত অবস্থা হইতে প্রাণপণে মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। উপায় একটা পাইলও—

পরের দিন অপরাহ্নে আনন্দ আসিবার আগেই সে ইন্দিরাকে ডাকিয়া কহিল, ওগো শুনছ, আমার আজ একটা জরুরী লেখা আছে, একটা মাসিকপত্রে আগে আমি লেখা দিতুম, তারা অনেক ক'রে একটা লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে—আজকে শেষ না করলেই নয়। তোমরা দুজনেই আজ বেড়িয়ে এসো, আমি আজ আর যেতে পারবো না।

ইন্দিরা বিস্মিত হইয়া সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সে মুখে রাগ বা অভিমানের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাইল না। তবু সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, বেশ ত, আজ না হয় বেড়ান নাই হ'ল—

ব্যস্ত হইয়া সুকুমার কহিল, না, না, সে হয় না। তাহ'লে আবার আমার মনটায় খচ খচ করতে থাকবে, মনে হবে, আমার জন্যে তোমাদের বেড়ান হচ্ছে না—ফলে বেড়ানও হবে না, লেখাও হবে না। তোমরাই যাও, লক্ষ্মীটি, আমি যখন বলছি, তখন কোন দোষ হবে না। না হয় অল্প একটু ঘুরে এস—

ইন্দিরার যেটুকু সন্দেহ ছিল, এই শেষের পাঁচ-ছয়টি শব্দে তাহা দূর হইয়া গেল। তাহা ছাড়া এখানে আসিয়া পর্যন্ত এই বেড়াইতে যাওয়া যেন নেশার মতই পাইয়া বসিয়াছিল তাহাকে, না গেলে তাহার কষ্টই হইত। তাই আনন্দ আসিতে সুকুমার যখন আবার এই অনুরোধই করিল, তখন সে দু-একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া শেষ পর্যন্ত রাজীই হইয়া গেল।

কিন্তু রাজী হইলেও ঠিক বাহির হইবার সময় আর একা বাহির হইতে পারিল না, ঝিকে ডাকিয়া সঙ্গে লইল। ফলে সেদিন আর ভ্রমণটা জমিল না। বয়স্থা দাসীর সঙ্গটা আনন্দকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতে লাগিল, সে আর বেশী কথা কহিল না। অধিকাংশ সময়ে চুপ করিয়াই রহিল। আর ইন্দিরারও কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হইতে লাগিল, সে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়াই 'চলুন ফেরা যাক'—বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

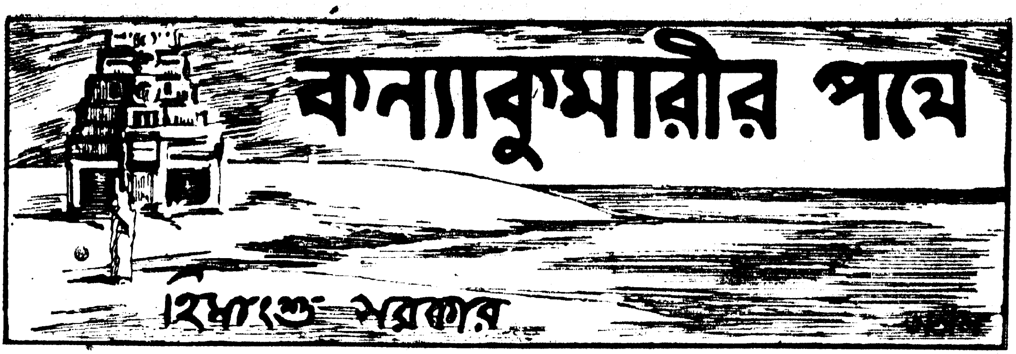
সুকুমার সত্যই কি একটি লিখিতেছিল। ইন্দিরাদের অত সকালে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তবু সে সহজ কণ্ঠেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তোরা এরি মধ্যে ফিরে এলি যে, কতটুকু বেড়ালি!

আনন্দ ভাল করিয়া সে কথার উত্তর দিল না। গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুকুমার ব্যাপারটাকে আস্তে আস্তে সওয়াইয়া লইতেছিল। পরের দিন সে উহাদের সঙ্গে বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহার পরের দিন আবার একটা ছুতা করিল। অথচ ইন্দিরাকে যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। ইন্দিরাও এ ব্যবস্থায় অসুবিধা বোধ করা সত্ত্বেও, একেবারে 'না' বলিতে পারিল না। ঝিকে সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিতে, সে স্পষ্টই মুখের উপর বলিয়া দিল, না বৌদি, সে আমি পারব না। এ পাহাড়ে দেশে হাঁটা আমার কর্ম নয়—সেদিন হেঁটেই আমার গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

অগত্যা ইন্দিরা একাই বেড়াইতে গেল আনন্দর সঙ্গে। কিন্তু সেদিন সে ইচ্ছা করিয়াই বাহিরের নির্জন প্রান্তরের দিক না গিয়া অপেক্ষাকৃত জনবহুল পল্লীতে বেড়াইতে গেল এবং সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিল। সুকুমার যদিও নীরবে থাকে, তবু তাহার সঙ্গে থাকিলে ইন্দিরা যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে না থাকিলে যেন কিছুতেই জমে না।

(আগামীবারে সমাপ্য)



[৪]

নারকেল গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে আমাদের চায়ের আসর বসল। মিঃ চাকো (Mr. Chacko)কে নিয়ে আমরা সকলে বসলাম। এমন সময় মাস্টারমশাই প্রবোধকে বললেন,— "ওহে, হিমাংশুকে Surpriseটা এনে দেখাও তো।" প্রবোধ একটা কাগজ-মোড়া মাঝারি গোছের গোল টিন নিয়ে এল। টিনটা দেখে মনে করলাম যে, বোধ হয় কোন একটা অদ্ভুত প্রাণী সংগ্রহ করে এটার মধ্যে রাখা হয়েছে। কৌতূহলের সঙ্গে টিনের ওপর জড়ান কাগজটা খুলে দেখি যে, টিনের ওপরটা বন্ধ করা, আর গায়ে কলকাতার এক নামকরা মিষ্টির দোকানের লেবেল মারা। তখনও ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না যে, কি থাকতে পারে এর মধ্যে। যাই হোক, টিনের ওপরটা খুলে দেখি যে, কড়াপাকের সন্দেশে টিনটা ভর্তি। আমার মিষ্টি জাতীয় খাবারের ওপর দুর্বলতার কথা মাস্টারমশাইয়ের জানা ছিল। সন্দেশ, পাউরুটি, কলা, ডিম ভাজা ইত্যাদি দিয়ে সেদিন চায়ের আসর বেশ ভালই জমল। মিঃ চাকো সন্দেশ বেশ তারিফ করেই খেলেন, কারণ এর কাছে এটা একেবারে নতুন। আমাদের চায়ের আসর ভাঙল সন্ধ্যা হবার পর।

সন্ধ্যাবেলা, প্রবোধ, জিতেন আর আমি ঠিক করলাম যে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর চাঁদনী রাতে দ্বীপের পাড়ে ঘুরে ঘুরে কিছু প্রাণী সংগ্রহের চেষ্টা করব। কৃষ্ণপিল্লাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে, রাত্রে ভাঁটার সময় সংগ্রহে বের হলে নতুন রকমের প্রাণী পাওয়া যেতে পারে—কারণ অনেক প্রাণী রাত ছাড়া জলের ওপর অথবা পাড়ের দিকে আসে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে আকাশ মেঘে ছেয়ে গিয়ে চাঁদ ঢেকে ফেলল। আমরা একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। যাই হোক, আশায় রইলাম যে, বেশী রাত্রে মেঘ কেটে যেতে পারে।

ল্যাবরেটারীর হল ঘরটায় রান্নার দল ছাড়া বাকিরা সব জমা হয়ে বড় টেবিলটার ওপর একটা পেট্রোমাক্স আলো রেখে ঘিরে বসলাম। তারপর বাড়িতে চিঠি লেখা, সংগ্রহ সম্বন্ধে নোট করা, তাস, গল্প, গান—এই সব চলতে লাগল।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে খবর এলো যে, স্টোভের গোলযোগের জন্য রান্না করা যাচ্ছে না। শুনলাম যে, স্টোভটা কিছুক্ষণ করে জ্বলবার পরই নিভে যাচ্ছে। তাহলে বোধ হয় আজ রাত্রে খাওয়ার আশা ত্যাগই করতে হল। যাক, বিকালের চা-টা বেশ যুতসই হওয়ার দরুণ কিছুক্ষণ যে পেটের ভেতরের লড়াইকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব এই যা ভরসা। সকলে রান্না ঘরে গিয়ে যত রকম এবং যতদূর সম্ভব ইঞ্জিনিয়ারীং খাটিয়েও স্টোভের কোন রকম উন্নতি হ'ল না। কিন্তু এখন আর অন্য কোনরকম বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। সেইজন্য স্টোভটা প্রত্যেকবার নিভে যাবার পর আবার জ্বালিয়ে নিয়ে, তবে রান্না শেষ করতে হবে।

আমরা তিনজনে রান্নার দেরী আছে দেখে এবং মেঘ কেটে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে, দুটো টর্চ আর একটা থলি নিয়ে সমুদ্রের পাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছা যে, দেখা যাক সংগ্রহ করা যায় কিনা। একটা টর্চ জেলে আমরা প্রায়



দ্বীপপথে একটি পরিবার

ধরে এগিয়ে চলেছি। চারদিকে অন্ধকার—তার মাঝখানে শুধু অন্ধকারের বুক চিরে টর্চের আলোটা সামনে গিয়ে পড়ছে। মেঘলা থাকার দরুণ হাওয়াও বেশ এলোমেল এবং ঠাণ্ডা। কোন দিকে কোন জনপ্রাণী নেই। খানিকটা চলবার পর আমাদের টর্চটা হঠাৎ নিভে গেল। অনেক রকম চেষ্টার পরও সেটার আর জ্বলবার কোন লক্ষণ না দেখে দ্বিতীয় টর্চটা জেলে আবার আমরা চলতে লাগলাম। চলার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহের কাজও কিছু কিছু চলতে লাগল। বেশ খানিকটা পথ আসার পর একটা উঁচু পরিষ্কার বালির ঢিবি দেখে তার ওপরে আমরা

তিনজন বসলাম। কিছুক্ষণ বসবার পর টর্চ জেবলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, প্রায় ঘণ্টা দুই হ'ল আমরা আস্তানা ছেড়ে বের হয়েছি। এখন ফেরা দরকার, কারণ আসার সময় কাউকে কিছু বলে আসিনি। উঠে ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে টর্চ জবালতে গিয়ে দেখি, এটাও আর জবলছে না। প্রত্যেকেই একবার করে জবালবার চেষ্টা করে আশা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এখন কি করা যায় এই অন্ধকারের মধ্যে? সঙ্গে আলো থাকার দরুণ মনে একটা সাহস ছিল। এমন অসহায়ের মত চারদিকে তাকাতে লাগলাম। অন্ধকার যেন আরও বেশী মনে হতে লাগল—চারদিক থেকে তারা যেন আমাদের গ্রাস করে ফেলবার জন্য এগিয়ে আসছে। দূরের আবছা জলরাশিকে দেখলে একটা ভয়াবহ বিরাট জানোয়ার বলে মনে হয়—মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাড়ের ওপর ভাল নারকেলের গাছগুলো মনে হ'ল যেন এতক্ষণ ওৎ পেতে ছিল—এবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কোন্ দিকে এবং কতদূর চলে এসেছি এখন আর সেটা ঠিক করতে পারছি না। কোন্ দিকে যে আমাদের ফিরতে হবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। কোন দিকে কোন আলোর চিহ্ন নেই যে, সেটা লক্ষ্য করে চলব। এখান থেকে তিনজনে মিলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না, সমুদ্রের গর্জন আর হাওয়াতে আমাদের চিৎকার চাপা পড়ে যাবে। ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক করলাম যে, যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিক ফিরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করা যাক, দেখি কোথায় গিয়ে পেঁছিই। কয়েক পা



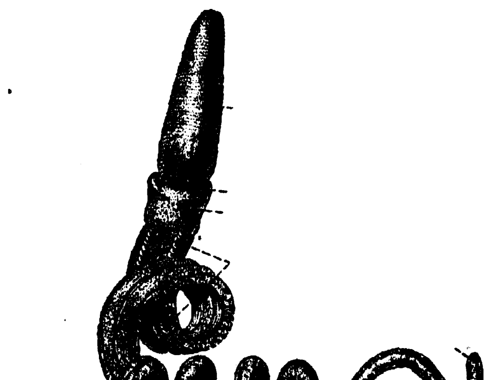
ছোট ছোট প্রাণি সংগ্রহের জন্য প্রবাল জল থেকে তুলে পরীক্ষা করা হচ্ছে

এগিয়ে দেখলাম যে, এতেও বিপদ, বালির ওপরের এবড়ো থেবড়ো প্রবালের টুকরোগুলোতে হোঁচট লাগতে লাগল। আমি বললাম যে, পাড় ছেড়ে দ্বীপের ভেতরের দিকে গেলে কেমন হয়। কিন্তু তাতেও সুবিধা হবে না, কারণ ছোট ছোট কাটা গাছ, বালির ওপর ছড়ান লতা গাছের ওপর দিয়ে চলা সম্ভব হবে না, তার ওপর যদি কোন রকম সাপ থাকে? অবশ্য পরে শুনলাম যে, এক জাতীয় নির্বিষ সাপই শুধু দ্বীপে আছে। ভেবে আর লাভ নেই; ঠিক করলাম যে, এই রকম হোঁচট খেতে খেতে পাড় ধরে চলাই ভাল; কারণ, অন্ধকারে পাড়ের ধারের সমুদ্রের জলের একটা আবছা আভাষ পাওয়া যাবে। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে দেখলাম যে, দুচার জন লোক একটা পেট্রোম্যাক্স আলো নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথম মনে করলাম যে, খুব সম্ভব আমাদের এইরকম হঠাৎ কোন কিছু না জানিয়ে চলে আসার দরুণ এবং দেরী দেখে অন্যরা বোধ হয় আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

আলো কাছে আসতে দেখলাম যে, তা নয়—সেদিন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ শাখার যে ছেলেরা আমাদের মতই সংগ্রহ করতে এসেছে, এটা তাদেরই দল। কাছে আসতে আমাদের এইরকম ভাবে অন্ধকারে দেখে তারা একটু অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা বলে, তাদের সঙ্গেই আমাদের আস্তানায় ফিরলাম।

এসে দেখলাম যে, প্রায় সকলেই খিদের তাড়নায় আর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শয্যা নিয়েছে। তখন পর্যন্ত আমাদের যে কোন খোঁজ পড়েনি এটাই রক্ষে। প্রায় ১২টার সময় রান্না শেষ হ'ল। সকলে খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়া গেল।

ভোরেই ঘুম ভাঙ্গল। সকালের চায়ের পর মাস্টারমশাই ঠিক করলেন যে, সকালের দিকে পার্ল হেচারী না দেখে বিকালে এটা দেখা যাবে। সকাল বেলায় আগের দিনের মত নমুনা সংগ্রহে যাওয়া হবে। দ্বীপের যে সব দিকে সংগ্রহ করা হয়নি আজ আমরা সেই দিকেই যাব। আগের দিনের মতই সব জোগাড়যন্ত্র নিয়ে আমরা রওনা দিলাম।



ব্যালানোগ্লসাস্

প্রথমে আমরা স্যান্ডি পয়েন্টের দিকে চললাম। পাড় ছেড়ে দূরের একটা ছোট বালির চরায় গিয়ে পেঁছিলাম।

কৃষ্ণপিল্লাই এখানকার একটা জায়গার ভিজে বালি কোদাল দিয়ে তুলে, উল্টে ফেলল। তারপর হাত দিয়ে বালিগুলো ছড়াতেই তার মধ্যে থেকে কতকগুলো কেঁচোর মত সরু এবং লম্বা প্রাণী বেরিয়ে এল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, এগুলো কেঁচো তো নয়, এমন কি কেঁচোর কোন জাত ভাইও নয়। একেবারে ভিন্ন। এগুলো হচ্ছে ব্যালানো গ্লসাস্ (Balanoglossus) নামে একরকম প্রাণী। কেঁচো হচ্ছে অ-মেরু

দণ্ডী (invertebrate) প্রাণী আর ব্যালানোগ্লসাস হচ্ছে মেরুদণ্ডী (vertebrate) প্রাণী।

ক্রমবিবর্তনবাদের (evolution) মতে এরাই হচ্ছে সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্ব পুরুষ (ancestor)—অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর যোগসূত্র। কোন এক যুগে যখন অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয়, তখন এরাই এসেছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এরা এদের আভিজাত্যের গর্ব বয়ে আসছে।

প্রথমটা দেখলে এদের কেঁচো অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রাণী বলেই ভুল হয়, কিন্তু একটু ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এদের শরীরে তিনটা অংশ আছে। সামনের দিকের অংশটা কড়ে আঙ্গুলের সামনের দিকের মত দেখতে। এটাই এদের মাথা বলা যেতে পারে, তবে চোখ, মুখ ইত্যাদি কিছুই এই অংশে নেই। তার পরের অংশটা সমস্ত শরীর ঘিরে একটা কলারের মত জিনিস। এই অংশটার নীচের দিকে এদের মুখ। তার পরের শেষ অংশটা, এদের বাকি শরীরটা, সেইজন্যই বেশ লম্বা। এই শেষের অংশটার প্রায় সমস্তটা জুড়ে দু পাশ থেকে পাখনার মত খানিকটা করে মাংস বের হয়ে আছে।

আমরা আমাদের দরকার মত এই ব্যালানোগ্লসাস সংগ্রহ করে আবার এগিয়ে চল্‌লাম। কৃষ্ণপিল্লাই আমাদের পথ দেখাতে লাগল।

বালির চর ছেড়ে আবার জলে নামলাম। জলের তলায়ও বালি, প্রবালের কোন চিহ্ন নেই। জলের দিকে চোখ রেখে সামনে এগিয়ে চলেছি,—কারণ, যা কিছু সংগ্রহ করতে হবে, তা এই বালি অথবা জল থেকেই।

এমন সময় চোখে পড়ল যে, জলের ভেতর এলোমেলোভাবে লম্বা কালো কালো কি সব পড়ে রয়েছে। লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পারলাম যে, এগুলো হলোথুরয়েড (Holothuroide)। ইংরেজিতে এদের 'সি কিউকুমবার' (Sea cucumber) অর্থাৎ "সমুদ্রের শসা" বলা হয়। এরা অমেরুদণ্ডীর মধ্যে একাইনোডারমাটা (Echinodermata) পর্বে (Phylum)-র অন্তর্ভুক্ত। এদের 'সমুদ্রের শসা' বলার কারণ—এরা দেখতে অনেকটা শসারই মত। এদের রং সাধারণত কালো হয় এবং গায়ে সাদা লম্বা লম্বা দাগ থাকে। কালো রং ছাড়া সাদাটে রংএরও হলোথুরয়েড পাওয়া যায়। এই সাদা রংওয়ালাগুলোর গা কুনো ব্যাঙয়ের গায়ের মত। এই কারণে কালো রংয়ের চেয়ে সাদা রংয়ের হলোথুরয়েডের গা বেশী খসখসে হয়। এই সাদা জাতীয় হলোথুরয়েড আমরা এই দ্বীপে সংগ্রহ করতে পারিনি। এগুলো আমরা রামেশ্বরমে সংগ্রহ করবার সময় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে কয়েকটা পেয়েছিলাম। এদের একটাকে জল থেকে হাতে তুলে নেওয়ার পর উহার শরীর বেশ শক্ত হয়ে উঠল এবং শরীরের এক প্রান্ত দিক দিয়ে পিচকারীর মত খানিকটা জল সামনে ছড়িয়ে দিল। এই ধরণের জল ছড়ান এদের শত্রুকে তাড়াবার একটা উপায়।



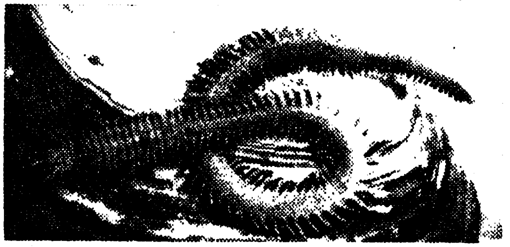
হলোথুরয়েড

কতকগুলো সংগ্রহ করবার পর আমরা কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের সঙ্গে এগোতে লাগলাম। এবার জল একটু একটু করে বাড়তে লাগল। কৃষ্ণ পিল্লাই বল্‌ল যে জল পেরিয়ে আমাদের দূরে, জলের ওপর যে কোরাল রিফ দেখা যাচ্ছে ঐখানে যেতে হবে। জল হাঁটু ছাড়িয়ে গেল। আমাদের অবস্থা দেখে কৃষ্ণ পিল্লাই বলল যে সামনে এর চেয়ে আরো বেশী জল হবে, সেই জন্য আর ওখানে গিয়ে দরকার নেই। আমাদের উৎসাহ বেশী। আমরা বল্‌লাম যে কোমর অবধি জল হলেও ক্ষতি নেই। কাপড় ভেজা না ভেজার দিকে আমরা কেউ ভ্রূক্ষেপ করব না। সকলেই কাপড় ভিজিয়ে কোরালের রিফের ওপর উঠলাম।

কৃষ্ণ পিল্লাই ছোট ছোট পাথরের আর প্রবালের টুকরো সরিয়ে সরিয়ে দেখতে লাগল। কয়েকবার এ রকম করার পর সে একটা নেরিস (Nereis) ধরে আমাদের সংগ্রহের টিউবে পুরলো।

নেরিস প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগে (classification)-এ অমেরুদণ্ডীর মধ্যে এনিলিডা (Annelida) পর্বে এ পড়ে। এই পর্বের সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে কেঁচো, জোঁক, ইত্যাদি। তবে এই সব কেঁচো, জোঁক আমরা ভিজে মাটি, পুকুর, খাল বিল ইত্যাদিতে পাই। কিন্তু নেরিস সমুদ্র ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। প্রথমে দেখলে এদের বড় তেতুলে বিছের মত মনে হয়। তবে রংটা সাধারণত ফিকে সবুজ অথবা সাদা ধরণের হয়। লম্বায় ৭।৮ ইঞ্চি পর্যন্ত পাওয়া যায় আমরা প্রায় ৭ ইঞ্চি মাপের কয়েকটা সংগ্রহ করেছিলাম। এদের শরীর বিছের মত ওপর নীচে চ্যাপ্টা এবং অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত। তা ছাড়া শরীরের প্রত্যেক ভাগের দু' পাশ থেকে খানিকটা করে অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে। এগুলো প্রাণীর চলার জন্য পায়ের কাজ করে অথবা জলে সাঁতরাবার জন্য সাহায্য করে। প্রত্যেক বাইরের অংশ থেকে সরু সরু চুলের মত জিনিস বের হয়ে থাকে। এগুলো সূঁচের মত কাজ করে। জীবন্ত অবস্থায় সাবধান হয়ে না ধরলে এগুলো হাতের ওপর একসঙ্গে শুয়োপোকার মত অনেকগুলো সূঁচ ফুটিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে যারাই একটু অসাবধান হয়ে হাত দিয়েছিল তাদের হাতেই এগুলো ফুটে গিয়েছিল।

এখানকার সংগ্রহ শেষ করে আমরা দ্বীপের বুসি পয়েন্টের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ আমাদের মধ্যে থেকে একজন খুব অল্প জলে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের সকলকে ডাকতে আরম্ভ করল। কাছে গিয়ে দেখি একটা মাঝারি গোছের



নেরিস্

সবুজ রংয়ের পদ্মপাতা বালি থেকে উঠে অল্প ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে। তোলবার জন্যে জলের ভেতর হাত বাড়িয়ে ছোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাতার সবটা গুটিয়ে বালির মধ্যে ঢুকে গেল। বাইরে থেকে কোনই চিহ্ন রইল না। অবাক হয়ে সকলে মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগলাম—এটা কি রকম হল। মাস্টার মশাই এমন সময় এসে পড়লেন। ব্যাপারটা বললাম। তিনি হেসে বললেন আরে ওটা সি-এনিমন (sea anemone) অর্থাৎ সাগর-কুসুম যাকে বলে।

পুঁথিগত বিদ্যায় এর সম্বন্ধে অনেককিছু জানা ছিল—কিন্তু ছবি আর কলেজের শিশির মধ্যে কোঁকড়ান অবস্থায় ছাড়া কোন দিন যে এদের জীবন্ত দেখব তা ভাবিনি। শ্রেণী বিভাগে এটা অমেরুদন্ডীর সিলেনটারেটা (Coelentorata) পর্বে পড়ে।

যাই হোক কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের কাছে শুনলাম যে এই সি-এনিমন দুচার রকমের দ্বীপটার চারদিক ঘুরলে পাওয়া যায়। তবে এগুলো সংগ্রহের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

সি-এনিমনের জলের ওপর ছড়ান পাতার মত জিনিসটার তলায় একটা লম্বা মাংসাল ডাঁটা (stalk) থাকে। বালির প্রায় একফুট নীচে এই ডাঁটার গোড়াটা কোন পাথর বা প্রবালের ওপর আটকান থাকে। কোন রকম শত্রু আক্রমণের ওপরে পাতার মত ছড়ান অংশটাকেও সঙ্কুচিত করে বালির মধ্যে ঢুকে যায়। জলের ওপর ছড়ান অংশটার ওপর অসংখ্য ছোট ছোট শুঁড়ের মত থাকে। কোন ছোট প্রাণী এর ওপর এসে পড়লে এগুলো শুঁড় দিয়ে প্রাণীটাকে আটক করে ফেলে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। জলের মধ্যে যে এরা কতটা শক্তিশালী হয় তা আমরা একটু পরেই বুঝতে পারলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর এক সঙ্গে দুটো সি-এনিমন আমাদেরই চোখে পড়ল। ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দুজনে দুদিক থেকে আস্তে আস্তে গিয়ে তলার দিকে ডাঁটাটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। কিন্তু কোথায় কি আমাদের ভাল করে ধরবার আগেই সেটা বালির তলায় মিলিয়ে গেল। পরেরটা কৃষ্ণ পিল্লাইকে ধরবার জন্য



সি-এনিমন

বললাম। সে আস্তে আস্তে পাশের বালি সরিয়ে ডাঁটার খানিকটা অংশ বালি থেকে বার করে নিল। তারপর খুব সন্তর্পণে সেখানটাতে জোরে চেপে ধরল, এবং আমরা কয়েকজন তার সঙ্গে ডাঁটাটাকে খুব শক্ত করে চেপে ধরে ওপরের দিকে অনেক কষ্টে টেনে তুললাম। পরে আরো কয়েকটা বড় বড় সি-এনিমন পেয়েছিলাম, কিন্তু ধরতে গিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় সেগুলো জোর করে বালি থেকে তুলতেই পারলাম না আর না হয় ডাঁটার মাঝামাঝি থেকে ছিঁড়ে ওপরের অংশটাই আমাদের হাতে চলে এলো।

বেলা বেড়ে যাওয়াতে সংগ্রহের কাজ শেষ করে আমরা ফিরলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রামের পর আমরা প্রায় ৪টার সময় পার্ল হেচারী দেখতে মিঃ চাকোর সঙ্গে রওনা দিলাম। **ক্রমশ**

সহযাত্রী

শ্রীকণ্ঠ

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পদস্থ কর্মী জনৈক বন্ধুর সৌজন্যে শ্রীপতি এই প্রথম দিবারাত্রির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় রেলওয়ে ভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিল।

সুদীর্ঘ শীতের রাত ঠেলিয়া দেরাদুন এক্সপ্রেস বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে.........

কামরায় তৃতীয় পুরুষ নাইঃ কূর্মাকৃতি দ্বিতীয় সহযাত্রীর চক্ষে ভ্রূকুটি, বক্ষে গলাবন্ধ কোট এবং হস্তে চর্মপেটিকা দেখিয়া শ্রীপতির নৈয়ায়িক মন ইতিপূর্বেই স্থির করিয়াছিল যে, ইনি দূর দুর্গম দীর্ঘ পথের সঙ্গী নহেন,...লাহোর স্টেশনে গাড়ি থামতেই শ্রীপতির দিকে একটা বৃথা কটাক্ষ হানিয়া ভদ্রলোক দ্রুত চম্পট দিলেন!

শ্রীপতি তাহার জীবনে প্রথম একটা বৃহৎ প্রশ্নের সম্মুখীন হইল......

একখানা বৃহৎ গাড়িতে একাকী ভ্রমণ! হায়, তৃতীয় শ্রেণীর জন্মযাত্রীর প্রতি অদৃষ্টের একি কঠোর পরীক্ষা;...শ্রীপতি ভাবিতেছিল; এমন সময় লাহোর স্টেশন হইতে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কামরার দ্বারদেশে দ্বিধাভিন্ন রাজভাষায় এক অদ্ভুত হট্টগোল সুরু হইল।

শ্রীপতি চক্ষু ও কর্ণের সমবেত চেষ্টায় ঠাহর করিয়া লইল, যে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুত চালিত রসনা এক তন্বী এবং মালগাড়ির মত মন্থর এক প্রৌঢ় স্টেশন মাস্টারের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে...রাজভাষায় সংঘর্ষ! যথাসাধ্য বাঙলায় তর্জমা করিয়া দিতেছি......

—'না, আমি স্লিপিং কারের জন্য জানিয়েছিলাম, তাই আমাকে দিতে হবে।'

—'কিন্তু বলেছি তো আপনাকে, স্লিপিং কার এখন পাওয়া যাচ্ছে না!'

—'কিন্তু আমার চিঠি পেয়েও কি আগে থেকে তার ব্যবস্থা আপনার করা উচিত ছিল না!'

—'চিঠি পেলে, নিশ্চয় উচিত হত, কিন্তু না পেলে......'

—'তা হ'লে, আর একখানা বগী জুড়ে দিন!'

—'আর বগী নেই। এইবার উঠে পড়ুন, গাড়ি ছাড়বে।'

—'কিন্তু কোথায় উঠবো, সেটাও তো দয়া করে বলবেন!'

—'এর আগের বগীটা কেন ছেড়ে এলেন?'

—'তবে কি ঐ দঙ্গল মর্কটের মধ্যে উঠে যেতে বলেন নাকি?'

—'তাহলে এই গাড়িটা দেখুন'ঃ—এই বলিয়া ভদ্রলোক শ্রীপতির কামরাটার দিকে হাত বাড়াইলেন।

যুবতী একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া শ্রীপতিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টির অঙ্কুশ আঘাত করিয়া বলিলেন, 'এখানেও তো দেখছি একটা......',

মর্কট! শ্রীপতির মনে ধিক্কার জন্মিল। ধৈর্যচ্যুত স্টেশন মাস্টার রুদ্ধস্বরে যেন গোঙরাইয়া উঠিলেন! 'আর আপনার একার জন্য একটা গাড়ি কোথায় পাবো বলুন।'

যুবতী ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন, 'না হলে যাবই না!'

—'বেশ, যাবেন না। তবে আমি গাড়ি ছাড়তে বলছি!'

—'না আমাকে যেতেই হবে।' এই বলিয়া যুবতী ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত শ্রীপতির কামরায় উঠিয়া আসিলেন এবং দরজায় গলা বাহির করিয়া প্রৌঢ় স্টেশন মস্টারকে পুনরায় তাড়া দিয়া বলিলেন, 'কিন্তু পরের জংসনেই যেন স্লিপিং কারের ব্যবস্থা করতে ভুলবেন না, জানলেন!'

ভদ্রলোকের মুখে এতক্ষণে একটা সর্পিল হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, বলিলেন, 'ওঃ নিশ্চয়!'

—'এখনি তার করে দেবেন তো!'

—'এই মুহূর্তে!'

—'কথা দিচ্ছেন!' যুবতী মালপত্র গোছাইতে গোছাইতে হঠাৎ আবার দরজায় মাথা গলাইয়া ব্যগ্রসুরে প্রশ্ন করিলেন।

গাড়ির কক্ষ হইতে হুইসেলের তীব্র শব্দ শুনিয়া ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়!'

ইহার পর যুবতী ক্রোধ রক্তিম নয়নে কামরার সুদূর প্রান্তে সরিয়া গিয়া তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিছাইলেন এবং কাশ্মীরী সালে অঙ্গ জড়াইয়া, তাহার উপর মোটা ফারের রাগ চাপাইয়া যেন মুহূর্তের মধ্যে আধা-ঘুমে মগ্ন হইয়া গেলেন।

ভদ্রমহিলা সম্ভবত ভাবিলেন, পার্শ্বযাত্রীর সপ্রশ্ন কৌতূহল দৃষ্টির উপর যবনিকা টানিয়া দেওয়ার ইহাই সহজতম পন্থা ঃ কিন্তু কার্যত তাহা ঘটিল না!

অর্থাৎ ইতিপূর্বে শ্রীপতি অপরাধীর মত খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া মনে মনে শুধু যুবতীর অগণিত মালপত্রের হিসাব-নিকাশ করিতেছিল, এইবার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তাঁহার ক্রোধ রক্তিম চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইবা মাত্র, সে চোখ তুলিয়া তীর্যক দৃষ্টিতে তাঁহাকে সুচারুরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল......

যুবতীর ঢোল করা নিদ্রা ঠিক পরবর্তী জংসন স্টেশনে গাড়ি পৌঁছিবা মাত্র টুটিয়া গেল এবং তিনি বন্দুকের গোলার মত ছুটিয়া দ্বারপ্রান্তে লগ্ন হইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তরুণী কণ্ঠের উচ্চ আহ্বানে সচকিত হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান স্টেশন মাস্টার শশব্যস্তে দৌড়িয়া আসিয়া রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কি বলুন!

—'লাহোর থেকে স্লিপিং কারের জন্য তার করা হয়েছিল, পেয়েছেন?'

ভদ্রলোক দ্রুত উচ্চারিত বিনীত কণ্ঠে জানাইলেন, তার যথাকালে পাওয়া গেছে, কিন্তু এ স্টেশনে—

যুবতী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'তবে কোন স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে মনে করেন?'

—'বোধ হয় মোগলসরাই......'

—'আঃ রাত কটায় বলুন!'

—'ভোর পাঁচটায়......'

যুবতী প্রায় ভদ্রলোকের মুখের উপরেই দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া কী যেন একটা অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলেন; এবং শ্রীপতির দিকে আর একটা নৈরাশ্য কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত শয্যায় বাঁকানো ইস্পাতের মত তীর্যক হইয়া বসিলেন। শ্রীপতি সাপ্তাহিক কাগজখানার তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্দশবার মনোসংযোগের চেষ্টা করিতে লাগিল!

কিন্তু নিশীথ যাত্রার একমাত্র সঙ্গিনী যুবতী রমণীর প্রতি পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শনের মত নৈতিক দৃঢ়তা শ্রীপতির ছিল না; সুতরাং ইহার পর হইতেই সে তাঁহার সহিত কথা বলিবার কোন একটা ছল খুঁজিতে লাগিল; এবং যুবতীর মৌন কঠোর মুখের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া অবশেষে শীতের রাত্রে গলদঘর্ম হইয়া স্থির করিল যে, সহসা ট্রেন সংঘর্ষ বা অপর কোনও দৈব দুর্যোগ ছাড়া ইহা তাহার সাধ্যাতীত।

এমন সময় গাড়ি দিল্লী স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রেলওয়ে পোর্টার চীৎকার করিয়া জানাইল, যাত্রীরা এখানে রাত্রির জন্য আহার-বিহার করিয়া লইতে পারেন। কারণ গাড়ি এখানে অর্ধঘণ্টার বেশী দাঁড়াইবে.........

উঠিয়া যুবতী হঠাৎ স্টার্ট নেওয়া মোটর গাড়ির মত ছিটকাইয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পড়িলেন এবং সবেগে দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইয়া অদূরবর্তী বুকস্টলে বোধ হয় তাঁহার দূর নিশীথ যাত্রার উপায়ন খুঁজিতে লাগিলেন.........

শ্রীপতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ জানালা হইতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং তাহার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে ডাইনিং কারের দিকে অগ্রসর হইল!

বলা বাহুল্য, ইহার পর ডাইনিং কারে ভোজনরত নরনারী শ্রীপতির চোখে আর নয়নাভিরাম মনে হইতেছিল না ঃ সে অতি দ্রুত কিছু খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া সহসা চমকিত হইয়া দেখিল, তাঁহার সহযাত্রিনীও ইতিমধ্যে ডাইনিং কারেই আসিয়া বসিয়াছেন; এবং তাঁহার সম্বন্ধে এই দৃশ্যে শুধু এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে তিনি খাদ্যগুলি গলাধঃকরণ না করিয়া কুন্দদন্তে চর্বণ করিতেছেন মাত্র!

কিন্তু তাঁহার চক্ষে ভ্রূকুটি লাগিয়াই আছে......

সুতরাং শ্রীপতি তাঁহার প্রসন্নতা অর্জনের জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ করিল। অর্থাৎ তাঁহার ভোজন শেষ না হইতেই সে ডাইনিং কার পরিত্যাগ করিল এবং ডাইনিং কারের পাশ দিয়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মে পাইচারী না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কামরায় প্রত্যাবর্তন করিল!

কিন্তু হায়! তথাপি, ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত, যুবতী তাঁহার কামরায় ফিরিলেন না।

তাহার পর, গাড়ি স্টেশন ছাড়িবার পূর্বমুহূর্তে শ্রীপতি সহসা চমকিত হইয়া দেখিল, যুবতী স্টেশনের বুকস্টলে তখনও নিবিষ্ট মনে পুস্তক নির্বাচন করিতেছেন......

শ্রীপতি আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ভাবিল, বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতেই স্লিপিং কারের জন্য প্রতীক্ষা করা সমীচীন মনে করিয়াছেন! এমন সময় হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল, কামরার সুদূর প্রান্তে তাঁহার পরিত্যক্ত দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে......

ইহার পর মুহূর্তের মধ্যে শ্রীপতির মনোরাজ্যে তাহার কঠোরহৃদয়া সহযাত্রিনীর প্রতি অহেতুক করুণা একটা বিপর্যয়-কান্ড বাধাইয়া তুলিল! কিংকর্তব্যমূঢ়ের মত সে যুবতীর শাল ও র‍্যাগটি বিছানা হইতে তুলিয়া লইয়া চলন্ত ট্রেন হইতে তাহা পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক রেল-কর্মচারীর হস্তে নিক্ষেপ করিল এবং অর্ধেক ইঙ্গিতে এবং অর্ধেক বাক্যচ্ছটায় তাহাকে বুঝাইয়া দিল, বুকস্টলে দণ্ডায়মান যুবতীটি এইগুলি ভ্রমক্রমে ট্রেনে ফেলিয়া রাখিয়াই নামিয়া গিয়াছেন, সেগুলি যেন অবিলম্বে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

দ্রুত চিন্তায় শ্রীপতির মনে হাঁফ ধরিয়াছিল; অতঃপর সে আত্মপ্রসাদের নিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, যাক্, না হলে হয়ত ভদ্রমহিলা অযথা শীতে কষ্ট পেতেন!

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার আত্মপ্রসাদের তাসের ঘর হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া তাহার সহযাত্রিনী ডাইনিং কারের স্লিপ দিয়া কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং সহসা তাঁহার সজ্জারিক্ত শয্যার দিকে চাহিয়া এই প্রথম শ্রীপতির দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন। তাহার পর ভীতবিমূঢ় কণ্ঠে প্রাকৃত বাঙলায় প্রশ্ন করিলেন, একি ব্যাপার, আমার শাল আর র‍্যাগ কোথায় গেল?

শ্রীপতির বুকের ভিতর যেন যুগপৎ সতেরোটি ঢেঁকী ওঠাপড়া করিতে লাগিল। সে বিড়ম্বিত মুখে, বিমূঢ় কণ্ঠে বলিল, সেগুলো আমি একজন রেল কর্মচারীর হাতে দিয়েছি...

যুবতী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া শুধু বলিলেন, কেন?

তাহার পর শ্রীপতির বিলম্বিত প্রত্যুত্তর শেষ হইলে, তিনি আর একবার শ্রীপতির দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহার দৃষ্টিতে শুধু প্রশ্ন নহে, একখানা আস্ত চাবুক উদ্যত হইয়া উঠিল; তাহার পর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত ভুল আপনার হল কি করে, চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে, শুধু আমি আর আপনি এই ঘরে আছি!

শ্রীপতি কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছিল, হ্যাঁ ভুলই হয়েছে, কিন্তু.........

যুবতী বিদ্রূপের সুরে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, ওঃ, সেটা স্বীকার করছেন তা হলে; মানে আমিই যে আর কেউ নই, বা মিথ্যে করে ওগুলো দাবী করছি না, এটা অন্তত বুঝতে পেরেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু কি বলছিলেন?

শ্রীপতি কষাহত পাঠশালার পড়ুয়ার মত আর্তস্বরে বলল, না! কিছু বলিনি!

যুবতী তাহার দিকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দৃষ্টি হানিয়া, জানালার সার্সী তুলিয়া দিয়া তাঁহার রিক্তশয্যার উপরে বসিলেন এবং বোধ হয় শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরেই বিছানার চাদরটা তুলিয়া গা পা জড়াইয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন!

চাহিয়া দেখিয়া, শীতার্ত নাগরিকার প্রতি করুণার দ্বন্দ্ব আবার শ্রীপতির মনোরাজ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফোরণ ঘটাইতে লাগিল!

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতি উসখুস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তপ্ত লোহে হাত বুলাইয়া ঠাণ্ডা করার মত একটা অদ্ভুত চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, আপনার জিনিসগুলো একজন রেল

কর্মচারীর হাতেই জমা দেওয়া হয়েছে, বোধ হয় হারাবে না; পরের স্টেশনে নেমে ওগুলোর জন্য একটা তার করে দিলে......

যুবতী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ জানি। কিন্তু সেটা দয়া করে আমাকেই করতে দেবেন আশা করি, তা না হলে আবার......

তাহা না হইলে আবার কি অচিন্তানীয় অনর্থ ঘটিবে তাহা যেন ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, এইভাবে যুবতী সহসা থামিলেন......

শ্রীপতি করুণার উদ্ভিন্ন হৃদয় ঝড়েপড়া সোপবাবুল-এর মত ফাটিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে বিকীর্ণ হৃদয়খণ্ডগুলি আবার সদিচ্ছার বায়ুতে কাঁপাইয়া লইয়া শ্রীপতি তাহার নিজের রাগটা বিছানা হইতে তুলিয়া লইল এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিল, দেখুন! আমার দোষেই আপনি অযথা শীতে কষ্ট পাচ্ছেন, সুতরাং দয়া করে এই রাগটা নিয়ে আমাকে কিছুক্ষণের জন্য এই অদ্ভুত লজ্জা থেকে অব্যাহতি দেবেন?

যুবতী যেন চিড়িয়াখানার কোনও নবাগত জন্তুর বিচিত্র আদবকায়দায় ক্রমশ মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছেন, মুখে চোখে এইরকম একটা কৌতূহল মিশ্রিত হাসির ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া পর্যায়ক্রমে বার কয়েক শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, ওটা হয়ত কেড়ে নেয়াই উচিত হত, কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই; সুতরাং আপনি বৃথা উদ্ব্যস্ত হবেন না!

এই রমণীর কটুভাষণের যোগ্য প্রত্যুত্তর না দিতে পারিয়া, শ্রীপতি শুধু তিরস্কৃত শিশুর মত ওষ্ঠে দন্ত চাপিয়া ভাবিতে লাগিল......

......এমন সময় সহসা দূরের কোন বগী হইতে কে যেন, বোধ হয় তাহারই মত এক বিপন্ন যাত্রী, এলার্মের ঘণ্টা বাজাইতেই, দ্রুতচালিত ট্রেন ভ্যাকুয়মব্রেকে ঘটাং-খস্‌স্‌ করিয়া থামিল।

শ্রীপতি অদৃষ্ট চালিতের মত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেশ, আমি অন্য গাড়িতে চলে যাচ্ছি; রাগখানা থাকলো, কখনো প্রয়োজন হলে গায়ে দেবেন......এবং তাহার পর নতমুখে দরজার দিকে অগ্রসর হইল!

যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, আঃ, কোথায় যাচ্ছেন!

শ্রীপতির বুদ্ধি তখন সহজ স্থানে থাকিলে সে বুঝিতে পারিত, যে কোনপ্রকার এলার্মের ঘণ্টা বাজার পর কোনও বঙ্গ মহিলাই নির্জন রেলওয়ে কক্ষে একমাত্র পুরুষ সহযাত্রীর কক্ষ ত্যাগের প্রস্তাব সমর্থন করেন না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি সহজ স্থানে ছিল না......

সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল, অন্য গাড়িতে।

যুবতী দুর্বার ক্রোধ গোপন করিবার চেষ্টায় বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না; না হয় রাগটাই দিন!

নির্বোধ শ্রীপতি আনন্দে আত্মহারা হইয়া রাগটি যুবতীর শ্রীহস্তে তুলিয়া দিয়া স্বয়ং শীতে কাঁপিতে লাগিল!

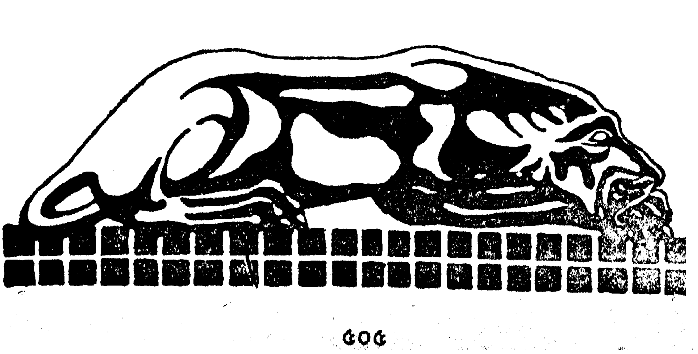
এইবার বোধ হয় যুবতী তাঁহার পুরুষ সহযাত্রীকে কথঞ্চিৎ গরম করিয়া দেওয়ার জন্য একটা নৈতিক দায় বোধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং দীর্ঘ মৌন ভাঙ্গিয়া কথা কহিতে সুরু করিলেন...মৃদু কিঙ্কিণীর মত তীব্র মধুর একটানা সুরে......

*   *   *   *

অতঃপর যাহারা মনে করিতেছেন, শ্রীপতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইবার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করিবে, সেই সব শিশুপ্রাণ পাঠকদের বলিয়া দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি যে, মোগলসরাই স্টেশনে ভদ্রমহিলা কক্ষ পরিত্যাগ করিবা মাত্র শ্রীপতিও মাথায় হাত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়া বসিল। তাহার পর উপর্যুপরি ৪ পেয়ালা চা খাইয়া অস্ফুট স্বরে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে আর কখনো সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবে না, বরং পয়সা খরচ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতেই চলাচল করিবে......

তাহার পর ধীরে ধীরে পূর্ব রাত্রিতে সহযাত্রিনীর মৌন-ভঙ্গের পর হইতে এ পর্যন্ত তাহাদের কি কথাবার্তা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিয়া সে শুধু ইহাই ধারণা করিতে পারিল যে, তাহার সহযাত্রিনী অবাধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কুলজী ও করোকোষ্ঠী এবং ব্যক্তিগত জীবনের বহু গোপন তথ্য পর্যন্ত খুঁচাইয়া জানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু......

কিন্তু শ্রীপতি তাঁহার অন্য খবর দূরে থাকুক, নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবারও ফুরসৎ পায় নাই।



ডায়নামিক ডিফেন্স

লিডেল হার্ট

(পূর্বানুবৃত্তি)

[৮]

সমগ্রের অনুপাতে অংশসমূহের বিচার করিলে বিমানবল ও বিমানধ্বংসী ব্যবস্থাকেই বহু পূর্বে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল; কেননা, এখন ইহা দিব্যি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, বিমান-জগতে আমরা প্রাধান্য অর্জন করিলে এই যুদ্ধই হয়ত হইত না। জার্মানী যখন অতি দ্রুতগতিতে বিমানবল বৃদ্ধি করিতেছিল, তখন আমরা সেই ব্যাপারে উদাসীন থাকায় আজ জগতের এই বিপদ। আমাদিগকে এখন তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হইতেছে।

আমাদের সমক্ষে আশু সমস্যা দুইটি—প্রতিপক্ষীয় স্থলসেনার অভিযান ব্যর্থ করা এবং সাবমেরিণ ও বিমানবলের সাহায্যে আমাদের সরবরাহ বন্ধের যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহা রোধ করা।

১. নৌবিভাগ কর্তৃক দ্রুতগামী ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজসমূহের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়াইয়া এই সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। আমাদের উপকূলভাগে শত্রুর অভিযান ঠেকাইবার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অদ্যাবধি নৌবাহিনীর উপর আমরা নির্ভরশীল হইলেও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে—যেখানে ইংলিশ চ্যানেল সঙ্কীর্ণ—সেখানে বিমানবলের প্রশ্নই প্রাধান্য লাভ করে। সেখানে যদি জার্মানদেরই বিমানে আধিপত্য থাকে, তবে তাহাদের অভিযান ঠেকাইয়া রাখা কঠিন। পক্ষান্তরে জার্মান বিমানাস্ত্রের ধার যদি বর্তমান অবস্থায়ই মজাইয়া দেওয়া যায়, তবে ঐরূপ অভিযানের আয়োজন অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, জার্মানরা হয়ত আদৌ আর সেই চেষ্টা করিবে না।

এইরূপ নিশ্চিত ফল যদি নাও পাওয়া যায় এবং জার্মানরা যদি ইংলণ্ডে আসিয়া অবতরণ করেই, তবে একথা ঠিক যে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার কালে তাহারা যে সুবিধা পাইয়াছিল, এখানে আসিয়া 'আকাশের অবস্থায়' তাহারা সেই সুবিধা পাইবে না। তাহাদিগকে ঢের বেশী অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইবে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে যে, রণকৌশলের দিক দিয়া আমাদের ফাইটার বিমানগুলি প্রতিপক্ষের ফাইটারগুলির তুলনায় যথেষ্ট বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। ফাইটার বিমানের সাহায্যে এক সঙ্গে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দুই-ই চলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, আমাদের ফাইটার বিমানগুলি যেখানেই উপস্থিত হইয়াছে, সেখানেই প্রতিপক্ষের ডাইভ-বোমারু বিমানগুলি পলাইয়া গিয়াছে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, যেখানে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভাল, সেখানে দিনের বেলায় বোমা ফেলিতে আসিয়া প্রতিপক্ষের বিমানগুলিকে অসম্ভব ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে; অথচ হানা দিয়া ফল মিলিয়াছে কম। রাত্রির হানাদার বিমানগুলিকে ঠেকান অবশ্য অপেক্ষাকৃত শক্ত, তবে স্বভাবতই রাত্রির অন্ধকারে সেইগুলির লক্ষ্যনির্ণয়ে ভুল হয় বেশী এবং নৈশ হানাদার বিমানকে ঠেকাইবার ব্যবস্থা আরও উন্নত হইবার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে।

এই অভিজ্ঞতা লাভের ফলে আমরা দুঃখের সহিত না বলিয়া পারি না যে, এই সেদিনও পর্যন্ত প্রতি দুইখানি বোমারু বিমানের অনুপাতে একখানি ফাইটার বিমান নির্মাণের উপর জোর দিয়া আমরা কি ভুলই না করিয়াছি। আমরা এই যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম, তাহাতে প্রশ্ন না তুলিয়া পারা যায় না। কেননা, ফাইটার বিমানগুলি তাড়াতাড়ি এবং অল্প খরচে তৈয়ার করা যায় এবং তাহাদের চালকগণের শিক্ষাও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সমাপ্ত হয়। সময় আমাদের বেশী ছিল না। এই গ্রীষ্মকালে (১৯৪১ সাল) যত ফাইটার বিমান আমাদের আছে, যদি তাহার দ্বিগুণসংখ্যক ফাইটার বিমান থাকিত এবং বিমানধ্বংসী অস্ত্রগুলিও যদি তদনুরূপ হইত, তবে জার্মানরা এদেশে বিমান-হানার চেষ্টা আদৌ করিত কি না সন্দেহ এবং এদেশে তাহাদের অভিযানের সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইত। কার্যত আমাদের ঐ বিমানশক্তি থাকিলে, তদ্দ্বারা আমরা আমাদের মিত্রশক্তিবর্গকে তাহাদের বিপৎকালে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিতাম এবং তাহার ফলে ফ্রান্সে জার্মান আক্রমণ ব্যর্থ করা সম্ভব হইত। সময় থাকিতে এই সমস্যার কথা আমাদের মগজে ঢুকিলে অনায়াসেই ঐরূপ শক্তি আমরা অর্জন করিতে পারিতাম। যে-কোন দিক দিয়া দেখিলেই বলিতে হয় যে, আমাদের একমাত্র আশু কর্তব্য হইল, ফাইটার বিমান ও বিমানধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ উৎপাদনে জোর দেওয়া।

বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের যুদ্ধ হইতে আমাদের এই শিক্ষাও লাভ হইয়াছে যে, বিমান বাহিনী ও স্থলসেনার মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রব থাকা একান্ত আবশ্যক। অনেক সময়ই দেখা গিয়াছে যে, প্রতিপক্ষের বিমান বাহিনীকে ঠেকাইবার জন্য মিত্রপক্ষের বিমান বাহিনী যথাসময়ে আসিয়া উপনীত হইতে না পারায়ই স্থলসেনা আক্রমণের মুখে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

স্থলসৈন্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, প্রতিপক্ষের ইংলণ্ড অভিযান সম্ভাবনাকে যদি অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হয়, তবে আমাদের বাহিনীকে অধিকতর গতিশীল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে এবং যত সত্বর সম্ভব আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী বাড়ানো দরকার। যান্ত্রিক যুদ্ধের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহার সহিত আমাদের তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে। সবচেয়ে মুস্কিল হইল এই যে, আমাদের যত সব সিনিয়র অফিসার আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এতদিন এমন সব বাহিনী পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন, যেগুলির গতি ঘণ্টায় তিন মাইলের বেশী নয়। তাঁহাদের পক্ষে এখন ঘণ্টায় ৩০ মাইল গতিসম্পন্ন বাহিনী পরিচালনার অভ্যাস করা একটু কঠিন। কাজেই যাঁহারা

যন্ত্রসজ্জার আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত, তাঁহাদের উপরই যান্ত্রিক যুদ্ধ পরিচালনার ভার অর্পিত হওয়া উচিত। লঘু গুরুর কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন আমাদের কর্তব্য, এই সকল কর্মতৎপর অল্পবয়সী লোকদিগকে যথাসম্ভব কার্যে নিয়োগ করা এবং যতদূর সম্ভব যুদ্ধচালনায় তাঁহাদিগকে সুযোগ দেওয়া। এছাড়া, সমগ্র সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য একজন প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হওয়া খুবই আবশ্যক, সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার এবং একই নীতিতে সাঁজোয়া বাহিনীর সংগঠন ও শিক্ষা চলিবে। অভিজ্ঞতার ফলে প্রতি ক্ষেত্রে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাহাতে বলা যায়, নূতন বাহিনী গঠনে দ্রুত ও যথার্থ ভাবে অগ্রসর হইবার ইহাই একমাত্র পথ।

আক্রমণকারী প্রথম দিকে সুবিধা করিতে পারে ইহা জানা কথা, কিন্তু প্রতিপক্ষের বাহিনী মন্থর গতিসম্পন্ন না হইলে সে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। আত্মরক্ষাকারী রণক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী আমদানী করিতে পারিলে আক্রমণকারীর গোড়ার সুবিধা স্বল্পস্থায়ী হইবারই সম্ভাবনা। আত্মরক্ষাকারীদের সাঁজোয়া বাহিনীর জানাশুনা পথে যতটা দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব, আক্রমণকারীদের সাঁজোয়া বাহিনীর পক্ষে প্রতিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া অজানা পথে ততটা দ্রুত অগ্রসর হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী যখন আক্রমণের জন্য আগাইয়া আসে, তখন খানিকটা বিশৃংখল অবস্থায় ঐগুলিকে আত্মরক্ষাকারীদের সাঁজোয়া বাহিনী আক্রমণ করিতে পারে। এ ছাড়া ঘুরিয়া গিয়া আক্রমণকারীদের পার্শ্বদেশে বা পশ্চাতেও হানা দিতে পারে। তাহাতে আত্মরক্ষাকারীদের স্থাপিত কামানগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে, নির্দিষ্ট স্থানে বসানো কামানগুলি হইতে গোলা দাগিবার যে সুবিধা পাওয়া যায়, আক্রমণকারীরা চলন্ত যান হইতে কামান দাগিবার সেই সুবিধা পায় না।

আমরা যথাযোগ্যভাবে এই আধুনিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে না পারায় এবং তজ্জন্য যথেষ্ট যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী সৃষ্টি না করায় এখন আমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। এই ব্যাপারে ফরাসীরা ছিল আমাদের চেয়েও অধিক উদাসীন। মান্ধাতার আমলের পাল্টা আক্রমণ নীতি আকড়াইয়া থাকায় ক্ষতি এবং বিপদ বাড়িয়াছে। শত্রু-অধিকৃত স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বিচারে পাল্টা—আক্রমণের পদ্ধতি এ যুগে অচল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতিও হয় যথেষ্ট। এইরূপ ব্যর্থ চেষ্টার ফলে কোন বাহিনীর প্রতিরোধশক্তি হ্রাস পাইতে বাধ্য। তার চেয়ে বরও প্রতিপক্ষ আসিয়া কোন স্থানে ঘাঁটি গাড়িবার আগে যখন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়, তখন পাল্টা—আক্রমণ চালাইলেই সুফল বেশী মিলে। চলন্ত অবস্থায় তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করা বা তাহাদের মধ্যে বিশৃংখলা আনা অধিকতর সহজ এই পাল্টা আক্রমণের পশ্চাতে সকল প্রকার রিজার্ভ বাহিনী নিয়োজিত হওয়া উচিত। দ্রুত গতিশীল সাঁজোয়া বাহিনীর সাহায্যেই এই নূতন ধরণের পাল্টা—আক্রমণ চালান সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ এখন জার্মান করতলগত। আমাদের সীমাবদ্ধ জনবলের দ্বারা প্রাচীন পন্থায় উহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিব আমাদের এমন ধারণা করা ভুল। তার চেয়ে আরও বড় ভুল হইবে আমাদের অত্যাবশ্যক শিল্পগুলি হইতে লোক সরাইয়া এবং আমাদের অর্থনৈতিক শক্তিকে পঙ্গু করিয়া আমরা যদি তদুদ্দেশ্যে এক বিরাট বাহিনী গড়িয়া তুলিতে যাই। প্রতিপক্ষের সহিত লড়িবার জন্য আমাদিগকে নূতন পথ দেখিতে হইবে। সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় অন্তরীক্ষে ও সমুদ্রে আমাদের প্রাধান্য লাভ। তদ্দ্বারা আমাদের স্বদেশের নিরাপত্তা বিধানও হইবে। অতএব আমাদের একমাত্র কর্তব্য হইল উক্ত প্রাধান্য লাভের জন্য বিমানবল ও নৌবল বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেওয়া। স্থলসেনায় যন্ত্রসজ্জিত বাহিনীর উন্নতি সাধন করিতেই হইবে। দুর্জয় বিমান বাহিনীর সাহায্যে শক্তিশালী যন্ত্রসজ্জিত স্থলসেনা যুদ্ধ করিলেই একমাত্র বিজয়লাভের আশা করা যাইতে পারে। সামরিক অবস্থার চাপে ঐরূপ আয়োজনের দ্বারা ইউরোপ পুনরুদ্ধার যদি আশু সম্ভব নাও হয়, তথাপি একথা ঠিক যে সেই প্রস্তুতি বিদেশী আক্রমণ ঠেকাইতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে। সেইভাবে প্রস্তুত হইয়া আমরা ফাসিস্ত চক্রের দুর্বল স্থান আফ্রিকায় ইতালীয় সাম্রাজ্যের উপরও আক্রমণ চালাইতে পারিব।

অপরিমেয় শক্তির তুলনায় যন্ত্রসজ্জিত বাহিনীতে লোকের প্রয়োজন হয় খুবই কম। কাজেই দেশের সকল লোককেই সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আহ্বান না করিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হইল যন্ত্রসজ্জিত বাহিনী গঠন করা। তাহা না করিয়া পাইকারী হারে দেশের লোককে সৈন্যদলে আহ্বান করিলে দুইটি ভয়ের কারণ আছেঃ প্রথমত লোকের অভাবে কলকারখানার কাজ বন্ধ হইতে পারে এবং তাহাতে সমরশিল্প ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়ত—দুর্বলচেতা ও পঙ্গু ব্যক্তিরা সৈন্যদলে যোগ দিলে তাহারা উপকারে না আসিয়া আরও বোঝাস্বরূপ হইতে পারে। দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়া যে কতটা সুফল পাওয়া যায়, আমাদের বিমান বাহিনী তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কেবল পদাতিক বাহিনীতে ভীড় বাড়াইয়া এই যুদ্ধের সময় অন্য কাজের ক্ষতি করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। *

সমাপ্ত

* শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

টিনের খনি

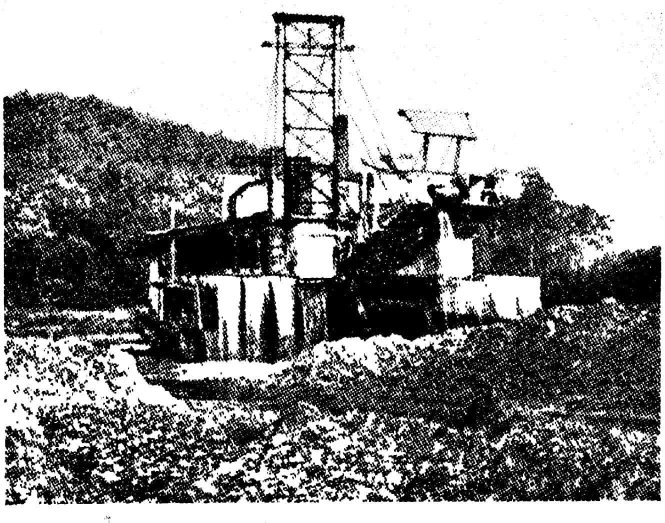
সঞ্জীব রায়

অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতুর মধ্যে টিন অন্যতম। বর্তমান যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টিনের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। টিনের ব্যাপক ব্যবহার বেশী দিনের না হলেও লৌহ ধাতুর পূর্ব্বেও টিনের ব্যবহার চলেছিল। তামার খাদ হিসাবে টিনের প্রয়োজনীয়তা মানুষ বহুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কার করে। যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের পক্ষে তামা খুবই নরম—বিশেষ ঘাতসহ নয়। সেই কারণে টিনকে খাদ হিসাবে ব্যবহার করে তামাকে শক্ত করা হ'ত। এই মিশ্রিত ধাতু মানুষের প্রভূত উপকারে এসেছিল।

তিন হাজার এমনকি তারও বহু পূর্ব্বে পৃথিবীর টিনের চাহিদার বেশীর ভাগই একা বৃটেন পূরণ করত। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অতি পুরাতন প্রামাণ্য লিপিতে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম ছিল টিন দ্বীপপুঞ্জ। এক সময়ে Phoenicianরা নাবিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করে। এরাই কোন উপায়ে কর্ণওয়েলের টিন খনির সন্ধান পেয়ে ভূমধ্যসাগরস্থ দেশসমূহ থেকে মালপত্র বোঝাই জাহাজ নিয়ে বৃটেনে বাণিজ্য করতে আসত এবং টিনের বিনিময়ে তারা বিদেশী মাল এখানে দিয়ে যেত। অন্য দেশের ব্যবসায়ী মহল কিন্তু বৃটেনের টিন খনির সন্ধান পায়নি। Phoenicianরা কোথা থেকে টিন আমদানী করে এ গুপ্ত খবর বহুদিন অন্য দেশের কাছে অজ্ঞাত ছিল। অনেক প্রকার চেষ্টা করেও টিন আমদানীর এই রহস্যকে কেউ অনুসন্ধান করতে পারেনি। একদিন একখানি রোমান জাহাজ Phoenician জাহাজের পশ্চাদ অনুসরণ করে টিনের গুপ্ত খনির সন্ধান সংগ্রহের চেষ্টা করে। Phoenician জাহাজের ক্যাপটেন এই খবর পেয়ে জাহাজ নোঙ্গর করে বহুদিন পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে রইলেন। রোমান জাহাজটিও বেশীদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হ'ল। ব্রিটেনে কাইজারের আগমনের পর রোমানরা টিন খনির সন্ধান পেয়ে নিজেদের খরচায় টিন সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। টিন সম্বন্ধে জনসাধারণের একটা বহুদিনের ভ্রান্ত ধারণা ছিল। টিনকে সীসারই সগোত্র শ্রেণীর ধাতু হিসাবে তারা বহুদিন পরিচয় দিয়ে এসেছিল। টিনকে সাদা সীসা বলা হ'ত এবং সীসার রং কাল থাকায় লোকে কাল সীসা বলত। এই উভয়ের মধ্যে যখন ধাতুগত পার্থক্য আবিষ্কৃত হ'ল, তখন থেকে টিনের নাম হ'ল 'Stannum' টিনের এই নূতন নামকরণ আজও রাসায়নিক বিজ্ঞান থেকে



মালয়ের টিনের খনিতে চীনে-কুলী কাজ করছে



মালয়ের টিনের খনিতে বৃহৎ ড্রেজ মেসিন

লুপ্ত হয়নি। রাসায়নিক বিজ্ঞানে টিনের রাসায়নিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'Sn' আজও রয়ে গেছে। পুরাতন 'Stannum কথা থেকেই এই 'Sn' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা টিনের যৌগিক পদার্থকেও 'Stannic and Stannous Compound' এই নামে অভিহিত করেন। কর্ণওয়েল এবং ডিভোনের টিনের খনি অঞ্চলগুলি Stanneries নামে পরিচিত। এই টিনের খনিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বহুশত বৎসর ধরে তাদের নিজস্ব আইন, সামাজিক রীতিনীতি এবং সরকারী ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। খনির নিজস্ব

পার্লামেন্টে খনিগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা এবং খনির কাজের জন্য আইন পাশ করা হ'ত। ১৭৫২ সালে Truroতে খনির নিজস্ব পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন হয়ে গেছে। তবে এর পরও খনির নিজস্ব আদালতগুলি অনেকদিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। মাত্র ১৮৯৬ সালে এই আদালতের সমস্ত কার্যভার দেশীয় আদালতের উপর অর্পণ করা হয়। কোথাও কোথাও সেই পুরাতন আদালত-গুলিকে খনির কাজের সুবিধার জন্য এখন পর্যন্ত রাখা হয়েছে। কয়েক শ' বছর ধরে সারা পৃথিবীর টিনের প্রয়োজনীয়তা একা ইংলণ্ডই প্রধানত জুগিয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংলণ্ডের টিন খনিগুলি থেকে বাৎসরিক ১০,০০০ টন টিন উৎপাদন করা হয়েছিল। এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাকি শেষদিকে মালয়ের টিন খনি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিন প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়।

মালয়ের টিন সহজলভ্য এবং ঐ অঞ্চলের শ্রমিকের মূল্য বহুল পরিমাণে কম হওয়ায় ইংলণ্ডের তুলনায় মালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিন প্রস্তুত সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে কর্ণওয়েল এবং ডিভোনের সমৃদ্ধিশালী টিন শিল্পগুলিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দিল। ঐ অঞ্চলের খনিগুলিতে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, পরে কোন কোন খনিতে কাজ চলতে সুরু হলেও প্রতিযোগিতায় মালয়ের টিনের কাছে কোন দেশ দাঁড়াতে পারে নি। টিনের মূল্য যাতে একেবারে কম না হয়ে যায়, সেজন্যে পৃথিবীর টিন উৎপাদনকে আইন দ্বারা সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। এই অবস্থায় কয়েক বছর পূর্বেও পৃথিবীর বাৎসরিক টিনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২০,০০০ টন। এই পরিমাণের মধ্যে ব্রিটিশ-মালয় একাই ৩৭,০০০ টন টিন উৎপাদন করে; বোলিভিয়া ২৩,০০০ টন, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ ১৯,০০০ টন, শ্যাম ১০,০০০ টন, নিগেরিয়া ৬০.০০ টন, বেলজিয়ান কঙ্গো ৬,০০০ টন এবং এক সময়ে পৃথিবীর টিনের চাহিদা যে প্রধানত পূরণ করত, সেই ব্রিটেন মাত্র ৩,০০০ টন টিন উৎপাদন করেছিল। ১৯২৯ সালে পৃথিবীতে উৎপন্ন টিনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯২,০০০ টন। এই উৎপাদনই পৃথিবীর রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

সোনা এবং প্ল্যাটিনামের মত টিনও নিরেট পাষাণের স্তরে অথবা মাটির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশীর ভাগ টিনই মাটির থেকে আবিষ্কার করা হয়। বোলিভিয়ায় ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন করে টিনের খনির সন্ধান লওয়া হয়। টিনমিশ্রিত মাটির উপরে সাধারণত কয়েক ফিট মাটির স্তর থাকে। ঐ মাটি সরিয়ে দিয়ে মূল্যবান টিন মিশ্রিত মাটি খুঁড়ে পরে জল মিশিয়ে 'Sluice Box'-এর উপরের অংশে পাম্পকল সাহায্যে তুলে এনে বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে জল কাদা এবং টিন ধাতুকে পৃথক করা হয়। সমৃদ্ধশালী ইউরোপীয় টিনের খনিগুলিতে ড্রেজ মেশিনের সাহায্যে টিন ধাতুকে উদ্ধার করবার পদ্ধতি আছে। মাত্র গত মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই নূতন পদ্ধতি টিনের খনিতে প্রচলিত হয়েছে। যে বৎসর টিন সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়েছিল সেই বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ উৎপন্নজাত টিন ড্রেজ মেসিনের সাহায্যে মালয়ে টিনের খনিগুলি থেকে উৎপন্ন করা হয়। টিন রূপালী দানাযুক্ত ধাতু, সম্প্রসারণ ক্ষমতা টিনের খুবই কম। সেই কারণে শক্তিশালী আকর্ষণ গ্রহণ করবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ঘাতসহন শক্তি টিনের অদ্ভুত। পাত হিসাবে টিনের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। টিন জল অপেক্ষা ৭.৩ গুণ ভারী; টিনের মেল্টিং পয়েণ্ট ২২৩° সেণ্টিগ্রেড এবং ২,২৭০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে টিন বাষ্পাকার ধারণ করে। টিনকে বরং ভঙ্গুর বলা যায়। টিনের বার ভেঙ্গে গেলে একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। এই অদ্ভুত শব্দকে 'Tin cry' নামে বর্ণিত করা হয়েছে। টিন ধাতুর মধ্যে সূক্ষ্ম দানা ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান থাকায় এই শ্রেণীর শব্দের সৃষ্টি করে। সাদা এবং পাঁশুটে এই দুই শ্রেণীতে টিনকে ভাগ করা হয়েছে। টিনের সাধারণ রং সাদা। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর তাপের মধ্যে এদের বর্ণ পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। এই অবস্থায় যে কোন সময়ে টিন পাঁশুটে রংয়ের চূর্ণ পদার্থে পরিণত হয়। টিনের এই পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিকেরা 'টিনপেস্ট' বলেন। এই টিনপেস্ট ধ্বংসের দূত হিসাবে গণ্য হওয়ায় এদের রোগের বীজাণু বলা যেতে পারে। টিনের স্বাভাবিক বর্ণ স্থায়ী রাখতে হলে টিনকে ১৮° সেণ্টিগ্রেডের বেশী উত্তাপে রাখা প্রয়োজন। এই উত্তাপের নীচের যে কোন অবস্থায় টিনের বর্ণ পরিবর্তনের সর্বদা সম্ভাবনা রয়েছে। জোলো হাওয়া অথবা ফলের রসের এ্যাসিড টিনের উপর কোন প্রতিক্রিয়া আনতে পারে না। এই বিশেষ গুণের জন্য টিনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। মাংস এবং ফলকে টিনের মধ্যে সংরক্ষিত করে বহু দূর দেশে পাঠানো হয়। এই অবস্থায় ভিতরের খাদ্যদ্রব্য নষ্ট না হয়ে দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। যে সব আধারে এইভাবে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষিত করা হয় তাদের আমরা টিন বলে ভুল করি। প্রকৃতপক্ষে এই আধারগুলি টিনের নয়, পাতলা স্টিলের চাদর থেকে তৈরী। তবে স্টিলের উপর তরল টিনের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে জন-সাধারণ এইগুলিকে টিনের তৈরী বলে ধরে নেয়। স্টিলের চাদরের দুদিকে তরল টিনের প্রলেপ থাকায় ফলের রস অথবা খাদ্যসামগ্রীর জলীয় পদার্থ টিনের কোনরূপ অনিষ্ট না করে বরং সতেজ থাকে। বর্তমান সময়ে দীর্ঘদিন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য টিনের এই ব্যবহার যে বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সভ্য দেশ থেকে টিনের আধারে পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় ভোজ্যদ্রব্য আজ দেশ-বিদেশে আমদানী হচ্ছে। প্রবাসে বাস করেও স্বদেশের রুচিসম্পন্নখাদ্য ভোজনে রসনা পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ সকলেই কিছু কিছু পেয়েছেন। ফল, শাকসবজি, মাংস, মাছ প্রভৃতি টিনের বায়ুশূন্য আধারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে টিনের সংমিশ্রণে যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ব্রোঞ্জ, বেলমেটেল, গানমেটেল, পিউ-টার, ব্রিটানিয়ামেটেল এবং সলডরের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মিশ্রিত ধাতু আমাদের প্রভূত উপকারে এসেছে। কোন্ কোন্ ধাতুতে কি পরিমাণে টিনের খাদ আছে তা দেখা যাক। শতকরা ৭৫ ভাগ টিন এবং ২৫ ভাগ সীসার সংমিশ্রণে পিউটার ধাতুর

(শেষাংশ ৫১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অভিনয় ও অভিনেতা

শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক

সংসারের সত্যবস্তুকে ভাবে ও কল্পনায় আনন্দময় রূপ দেওয়ার নাম আর্ট—কলা। চিত্রকর ভাস্কর, কবি, গায়ক, বাদক এবং অভিনেতা ইঁহারা সকলেই কলাবিদ্যার উপাসক।

চিত্রকর তাঁহার কল্পনায় যে সত্য উপলব্ধি করেন, সেই সত্যের রূপ, রং ও তুলিকার সাহায্যে ক্যান্‌ভাস বা কাগজের উপর ফুটাইয়া তোলেন। ভাস্কর সেই জিনিসই নানাপ্রকার বাটালির সাহায্যে পাথর কাটিয়া বা কাদায় গড়িয়া রূপ প্রদান করেন। অভিনেতা নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্র কল্পনায় উপলব্ধি করেন, কিন্তু তাঁহার ক্যানভাস, পাথর বা কাদা কিছুই নাই, তাঁহার কল্পনার মূর্তি বা চরিত্রকে তাঁহার দেহের উপরই ফুটাইয়া তুলিতে হয়,—এক্ষেত্রে অভিনেতার দেহই তার ক্যানভাস্ পাথর, কাদা—সব। দেহের গতি, ভঙ্গী, মুখচোখের হাবভাব, কণ্ঠস্বরের আবশ্যক বিন্যাস এবং নানাপ্রকার অভিব্যক্তির দ্বারা অভিনেতাকে নিজের দেহে নাট্যকারের কল্পিত চরিত্রটির সজীব মূর্তি প্রদান করিতে হয়।

এইজন্য অভিনেতার কার্য চিত্রকর বা ভাস্করের কার্যের তুলনায় অতি কঠিন। চিত্রকর বা ভাস্কর চোখের সামনে তাঁহাদের কার্যের ফলাফল দেখিতে পান—তাঁহাদের কল্পিত মূর্তি ফুটিল কিনা; কিন্তু অভিনেতা অভিনয়কালে নিজের উপলব্ধি করা চিত্রটি পরিস্ফুট হইল কিনা তাহা দেখিবার সুবিধা পান না। অভিনয়কালে তাঁহার চিত্র দেখেন শুধু দর্শকগণ, তিনি নিজে কেবল অনুভব করেন মাত্র। এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, অভিনয় কার্য কিরূপ কঠিন।

পরচুলা, দাড়ি, গোঁফ ও রং-তুলির সাহায্য লইয়া অভিনেতা তাঁহার মস্তক ও মুখমণ্ডলের অনেক পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন,—ইহার দ্বারা অভিনেতা দেহের এক অংশের মাত্র বাহ্যিক পরিবর্তনেরই সুবিধা পান; কিন্তু অভিনয়ে রূপ পরিবর্তন সাধন পক্ষে ইহা অকিঞ্চিৎকর। যে কোন যুবক এই রূপ পরিবর্তনের সাহায্যে বৃদ্ধের মত আকৃতি ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু হাবভাবে, চালচলনে এবং কথাবার্তার কণ্ঠস্বরে বৃদ্ধের রূপটি যদি হুবহু ফুটাইয়া তুলিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বৃদ্ধ সাজিয়া অভিনয় করা বৃথা। ভিতরের জিনিসটাকে বাহিরে সব দিক দিয়া ফুটাইতে না পারিলে অভিনয় নিষ্ফল।

এই হিসাবে অভিনেতার দুইটি সত্ত্বা আছে—তাহাকে আমরা "এক নম্বর" এবং "দুই নম্বর" নামে অভিহিত করিবঃ—অভিনেতার এক নম্বর সত্ত্বা তাঁহার কল্পনা, যাহাতে নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্র উপলব্ধি করে; আর দুই নম্বর সত্ত্বা তাঁহার দেহ—যে দেহে কল্পনার রূপ চাক্ষুষ অর্থাৎ বাহিরে ফুটাইতে হয়। প্রথম নম্বরটি অভিনেতার ভিতরের, আর দ্বিতীয় নম্বরটি তাঁহার বাহিরের,—একটি আত্মা অপরটি দেহ অথবা একটি যন্ত্রী অপরটি যন্ত্র। এই যন্ত্রী আর যন্ত্র দুইটিই যদি শক্তিশালী হয় এবং একসঙ্গে সমানভাবে কাজ করে তবেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। গ্যারিক্, রোমিও এবং রিচার্ড দি থার্ড—এই বিভিন্ন রকমের দুই অংশই অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছেন,—একজন সুন্দর যুবা আর একজন কুৎসিত ও কর্কশ পুরুষ; শুধু এইটুকু দেহগত পার্থক্য নয়, দুইটি চরিত্রও একেবারে একে অপরের বিপরীত।

অনেক অভিনেতা, দেখিয়াছি, যাঁহাদের জ্ঞান ও কল্পনা খুব ঠিক, কিন্তু দেহে তাঁহাদের সেই কল্পনার রূপ ফুটাইতে সক্ষম নহেন। এই কারণে তাঁহাদের অভিনয় ব্যর্থ হইয়া থাকে। অভিনেতার এক নম্বর সত্ত্বার আদেশ তাহার দুই নম্বর সত্ত্বা ঠিক ভৃত্যের মত পালন করিতে সমর্থ না হইলে অভিনয় করা খুবই বিড়ম্বনা। ইহা ছাড়া অনেক অভিনেতা আছেন, যাঁহারা কোন একপ্রকার চরিত্রের অভিনয় বেশ ভাল করিতে পারেন, কিন্তু অন্য ধরণের চরিত্রের অভিনয়ে তাঁহারা একেবারেই অসমর্থ,—এই যেমন বৃদ্ধের অংশ কেহ, মাতালের অংশ কেহ বেশ পারেন, অন্য অংশে তাঁহারা একবারে অক্ষম। ইহাদিগের নাম One-part-actor.

আবার এক নম্বরটি যদি অভিনেতার ঠিক না থাকে, এই ভিতরের সত্ত্বা যদি একান্ত অক্ষম হয়, অর্থাৎ যে ভূমিকাটি অভিনেতা গ্রহণ করিবেন সেই ভূমিকার বৈশিষ্ট্য যদি উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে অভিনেতার দুই নম্বর সত্ত্বা যতই উপযুক্ত হউক অর্থাৎ তাঁহার চেহারা যতই সুযোগ্য হউক, অভিনয় করা তাঁহার পক্ষেও বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব অভিনেতার কল্পনা ও দেহ এই দুইটি সত্ত্বাই সক্ষম হওয়া চাই। অভিনেতা নিয়মিত সাধনার ফলে একদিকে নিজের ধারণা, কল্পনা ও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা, অন্যদিকে নিজের চলাফেরা, হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের উপরে প্রভুত্ব অর্জন করিতে পারেন।

সৃষ্টি কার্যের পূর্বে স্রষ্টাকে দ্রষ্টা হইতে হয়। দ্রষ্টা না হইলে স্রষ্টা হওয়া যায় না। অভিনেতাকে নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রটি লোকচক্ষুর সম্মুখে নিজের দেহে ও মনে সৃষ্টি করিতে হয়, সুতরাং অভিনেতার মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাট্যকারের চেয়েও বেশী থাকা প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্যই অভিনেতাকে মানব চরিত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে হইবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য অনেক,—দুইটি মানুষ কখনও হুবহু একরকম হয় না। মানুষ প্রাণী হিসাবে এক হইলেও প্রকৃতিগত পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। তবে মোটামুটিভাবে মানব

প্রাণীকে কয়েকটি শ্রেণীতে (types) বিভক্ত করা যায়। এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ চালচলনে, হাবভাবে কথাবার্তায় বিভিন্ন। অভিনেতাকে মানব জগতের এই রহস্য আয়ত্ব করিতে হইবে। ভূয়োদর্শনের ফলেই অভিজ্ঞতা জন্মে এবং নিয়মিত চিন্তার ফলেই ধারণা, কল্পনা প্রভৃতি প্রখর হয়।

নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করেন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া, প্রত্যেক চরিত্রের নিজের কথা ও কার্যের দ্বারা। বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও ফুটিয়া ওঠে। তাই অভিনেতার কণ্ঠের সেই কথাগুলি যখন বাহির হয়, তখন চরিত্রানুযায়ী স্বরবিন্যাসও (infection of voice) থাকা চাই। অভিনেতা যে চরিত্র যখন অভিনয় করিবেন সেই চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার কণ্ঠের বিচিত্র বিন্যাসেই যেন স্পষ্ট হইয়া ওঠে। সংলাপের উচ্চারণ-ভঙ্গীতে যে অংশ বা চরিত্র তিনি অভিনয় করিতেছেন সে অংশের বৈচিত্র্য অন্ধ শ্রোতারও হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। হেনরী আর্ভিং একদিন সাইলকের (Shylock) ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন,— " Three thousand ducats! Oh! three thousand ducats!" তখন দর্শকের ভিতর হইতে একজন অন্ধ বোদ্ধা শ্রোতা বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"I detect no tones of usery in it"—অর্থাৎ সুদখোর কৃপণের মত ত কণ্ঠস্বরে বোধ হইতেছে না! এই সমালোচনার জন্য আরভিংকে পরবর্তী অভিনয়ে Shylock-এর কণ্ঠস্বর প্রয়োজন মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল।

অভিনেতাকে নানা প্রকার ভূমিকা অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের নানা প্রকার পরিবর্তন করিতে হয়, এইজন্য স্বর সাধনার দরকার। প্রথমত উচ্চারণ সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এক কথার গায়ে অন্য কথা জড়াইয়া না যায়, তাহা হইলে সে শব্দ শ্রোতার কানে স্পষ্টভাবে পৌঁছায় না। স্পষ্ট উচ্চারণ শ্রোতার কানে ঠিক বাজে এবং ভাবের সহিত উচ্চারিত হইলে "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে। ইহা ভিন্নও ধ্বন্যৎক্ষেপ শিক্ষারও (projection of the Voice) প্রয়োজন। রঙ্গালয়ের মঞ্চে দাঁড়াইয়া কতখানি জোরে কথা বলিলে সে কথা দর্শকগণ সকলেই শুনিতে পান, সেই প্রণালীটি শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রোতাগণ যদি না শুনিতে পান, তাহা হইলে অভিনেতাকে "louder please" এর ধাক্কা সামলাইতে অস্থির হইতে হয়। চিত্রকরের পক্ষে যেমন কাগজ ও ক্যানভাস চিত্র অঙ্কনের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, অভিনেতার পক্ষেও তাঁহার দেহ অভিনয়ের ভূমিকার উপযোগী হওয়া সেই প্রকার দরকার। এইজন্য নানাপ্রকার ব্যায়াম দ্বারা শরীরের স্থিতি স্থাপকতা (Elasticity) বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ ছায়া-চিত্র অভিনেতা লন্‌চেনীর কুব্জের অংশ অভিনয় নটারডাম চিত্রে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা উপরের নীতির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন—ছয় ফুটের উপর লম্বা একজন সবল পুরুষ নিজের দেহকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া তিন ফুটে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, দেহের এই স্থিতিস্থাপকতার জন্য।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন বয়সের যথা—স্ত্রী-পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ, বিভিন্ন অবস্থার যথা—সুস্থ, মাতাল, রোগগ্রস্থ, অন্ধ, খঞ্জ—মানুষের চলনভঙ্গী বিভিন্ন প্রকারের। অভিনেতাকে এই সব চলনভঙ্গী স্বাভাবিকভাবে অনুকরণ করিয়া নিজের বিভিন্ন ভূমিকায় তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। রঙ্গমঞ্চের এই চলনপ্রণালীকে ইংরেজীতে বলে stage walking.

অভিনয়ে চোখমুখের ভাব, হাতের ইঙ্গিত এবং দেহের ভঙ্গীতে ভূমিকার কল্পনা মূর্তি সজীব হইয়া দর্শকের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। অভিনয় কার্যে হাত দুইখানি অনেক সাহায্য করে। হাতের ভঙ্গীতে অনেক ভাব সুস্পষ্ট হয়। গ্যারিক্ যখন King leader-এর ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তখন তাঁহার হাতের যষ্ঠিখানি পর্যন্ত অভিনয় করিত। গ্যারিকের হস্ত-চালিত যষ্ঠিতে বৃদ্ধ লীয়ারের চরিত্র যেন জীবন্ত হইয়া উঠিত। অভিনয়কালে হাত দুইখানি নিষ্ক্রিয় থাকিলে অভিনয়ের কার্য অসম্পূর্ণ থাকে, আবার হাত দুইখানি অকারণ অর্থহীনভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলেও অভিনয়কার্য পণ্ড হয়। নাটকের নানা ঘটনায় নাটকীয় চরিত্রের যখন যে ভাবটি প্রবল হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক সেটি চোখে মুখে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। আকৃতির সঙ্গে অন্তর নিহিত ভাবের যোগাযোগ থাকিলেই নাটকীয় চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় চরিত্রের ভিতর যে ভাবের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, তাহার অভিব্যক্তি যদি চোখেমুখে ফুটিয়া না ওঠে, তাহা হইলে দর্শকের মনে মোহ জন্মে না, বরং এই কথাই দর্শকের মনে জাগিয়া ওঠে যে, ঘটনা ত ঘটনা নয়, চরিত্র ও পুঁথির পুতুল মাত্র। যে ঘটনার যে ভাবটি চরিত্রকে অভিভূত করিতে পারে, সেই ভাবের বাহ্যিক লক্ষণগুলি কলাকৌশলের সহিত নিজ দেহে অভিনেতা প্রকাশ করিবেন,—তাহার ফলে দর্শকের চক্ষু হইতে অভিনেতার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব অপসারিত হইয়া নাটকীয় চরিত্রের অস্তিত্বটি স্ফুট হইয়া উঠিবে।

অভিনয়কালে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে এমন স্থান লইবেন যে, স্থান হইতে দর্শকগণ তাঁহার চোখ মুখের ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার সুবিধা পান। এইজন্য সংলাপে মুখের এক পার্শ্ব দেখাইয়া অভিনয় (Profile acting) সফল হয় না। এই Profile acting মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইলেও ইহা সব সময় স্বাভাবিক নহে; কেননা, আমরা যখন কাহারও সহিত কথাবার্তা বলি, তখন সকল সময়েই এক দৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকি না, যখন বক্তব্য বিষয়ে শ্রোতার মনের ভাব কিংবা তাঁহার মতামত জানিবার প্রয়োজন হয়, তখন মাঝে মাঝে শ্রোতার দিকে দৃষ্টিপাত করি মাত্র। বেশীর ভাগ কথোপকথন এইভাবেই চলে এবং ইহাই স্বাভাবিক। দর্শকগণ যদি অভিনেতার মুখ চোখ ভাল করিয়া দেখিতে না পান, তাহা হইলে অভিনয়ের ভাব গ্রহণে তাঁহারা অসমর্থ হন, ফলে অভিনয় নিষ্ফল হয়।

স্বর বিন্যাস, ভাব ব্যঞ্জনা ও গতিভঙ্গীর একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার—সামঞ্জস্যের ফলেই অভিনীত চরিত্র বিশদভাবে ফুটিয়া উঠে।

অভিনেতা চরিত্র সৃষ্টিকালে নাট্যকারকেই অনুসরণ করিবেন। নাট্যকার যেভাবে যেটি গড়িয়াছেন, অভিনেতাকে সেটি অবিকৃতরূপে প্রকাশ করতে হইবে। নাট্যকারের কল্পিত

চরিত্রের উপর কারিগরি করিয়া চরিত্রটি বিকৃত ও বিভিন্নরূপে দাঁড় করিবার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা অভিনেতার নাই। নাট্যকারের মনে নাটকীয় চরিত্রের যে রূপটি সৃষ্টি কালে জাগিয়া থাকে, তাহারই অবিকল ছবি সৃষ্টি করা অভিনেতার কর্তব্য। শক্তিশালী অভিনেতা নাট্যকারের কল্পনাকে জীবন্ত রূপ দিয়া নাটকীয় চরিত্রের ভাষ্যকার বলিয়া পরিচিত হন।

অভিনেতাকে নাটকের লিখিত ভাষাই অভিনয়কালে ব্যবহার করিতে হইবে—নিজের রচা যা-তা ভাষা তাঁহার ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। ইহা করিলে নাটকীয় চরিত্রের নিজস্ব কথার ধরণটি বদলাইয়া যায়, চরিত্রটিও সময় সময় অন্য মূর্তি ধারণ করে। শুধু ইহাই নয়, এমনও হয় যে এইরূপ শব্দের পরিবর্তনের ফলে সহযোগী অভিনেতার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কথার সঙ্গে মিল থাকে না, তিনি তাঁহার Cue (ইঙ্গিত-বাক্য) হারাইয়া বিপদে পতিত হন।

অভিনেতার নিজ অংশ মুখস্থ হওয়া অতিশয় আবশ্যক, এমন কি সমস্ত নাটকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া নাটকের সমস্ত চরিত্র ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে "ওয়াকিবহাল" থাকা ভাল। হেনরি আরভিং কোন নাটক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব না করিয়া কোন ভূমিকা অভিনয় করিতে নামিতেন না। কথা ঠিক না থাকিলে কাজ ঠিক হইতে পারে না। প্রম্‌টার মহাশয়ের দিকে সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিলে, অর্থাৎ নিজের অংশ মুখস্থ না থাকিলে কখনও অভিনয়ে ভাব প্রকাশ হয় না—"If you are fishing for the words you cannot act."

শক্তিশালী অভিনেতা নিজের ভূমিকার চরিত্রের রূপ নিজেই সৃষ্টি করেন—তিনি অন্য কোন নামজাদা পেশাদারী অভিনেতার অনুকরণ করেন না। আবার অনেক অভিনেতা কোন নামজাদা অভিনেতার অনুকরণে অভিনয় করিবার চেষ্টা করেন। এই অনুকরণের বিপদ হইতেছে এই যে, এই সমস্ত অনুকরণকারীরা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের গুণের চেয়ে তাঁহাদের দোষগুলিই বেশী পরিমাণে অনুকরণ করিয়া থাকেন—যেহেতু গুণের অনুকরণ করা অতি কঠিন, কিন্তু দোষের অনুকরণ করা অতি সহজ। একজন গেলেন গোয়ালিয়ারে কোন খ্যাতনামা ওস্তাদের নিকট গান শিখিতে, কয়েক বৎসর সাক্‌রেদি করিয়া গান শিখিলেন অল্পই, শিখিয়া আসিলেন ওস্তাদের মুখভঙ্গীর মুদ্রাদোষ পুরা মাত্রায়। পূর্বে দানীবাবুর, অধুনা শিশিরবাবুর অভিনয় রীতির অনুকরণ করার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এইসব খ্যাতনামা অভিনেতাদের উচ্চারণ দোষগুলির এবং দুই-একটি হাতনাড়ার ভঙ্গী ছাড়া এইসব "হনুকরণকারী"রা তাঁহাদের ভিতরের জিনিস, যাহার জন্য তাঁহাদের অভিনয় সফল,—তাহার কিছুই আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। এইসব নকলের প্রচেষ্টার নাম অনুকরণ নহে "হনুকরণ"—ইংরেজীতে যাহার নাম aping. ভিতরের জিনিস ধরিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহিরের দুই চারিটা বাঁকাচোরা ভঙ্গীর নকল করিয়া অনুকরণকারীরা নিজেদের উপহাসের পাত্র করেন মাত্র। এলেন টেরি (Ellen Terry) হেন্‌রি আরভিং-এর অনুকরণকারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"Every renowned actor has got some eccentricities of manners, the lessers actors who imitate them give us the crooked body without the sublime soul in it."

ক্ষমতা থাকিলে অনুকরণের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। যাঁহাদের ক্ষমতার অভাব তাঁহারাই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। Carricature এবং acting এক জিনিস নহে।

টিনের খনি

(৫০৯ পৃষ্ঠার পর)

জন্ম। ব্রিটানিয়া ধাতুতে শতকরা ৯০ ভাগ টিন, ৮ ভাগ এন্টিমোনি এবং ২ ভাগ তামার খাদ রয়েছে।

লোহ এবং স্টিলের ব্যবহারের পূর্বে যখন গান মেটেল থেকে বন্দুক তৈরী হ'ত সেই সময়ে ঐ ধাতুতে শতকরা ৯½ ভাগ টিন এবং বাকি তামা থাকত। বর্তমানে গান মেটেলে শতকরা ৮ থেকে ১৪ ভাগ টিন থাকে, বেলমেটেলে ১৫ থেকে ২৫ ভাগ টিন আছে। গ্রেট বৃটেনে যে ব্রোঞ্জের মুদ্রা ছিল তাতে শতকরা ৭৫ ভাগ তামা এবং ৪ ভাগ টিন ও ১ ভাগ জিঙ্ক থাকত। ব্রোঞ্জ-মেটেলেও ঐ পরিমাণ খাদ মিশান হ'ত। পূর্বেই বলা হয়েছে টিন খুবই ঘাতসহ ধাতু। এক পাউন্ড টিনকে ১৩,০০০ বর্গ ইঞ্চি স্থান অধিকারের মত টিনের পাতে পরিণত করা যেতে পারে। সোনা ছাড়া একমাত্র টিনকেই সব থেকে পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। পূর্বে ব্রোঞ্জে বিশুদ্ধ তামা এবং টিনের খাদ থাকত। রোমানদের সময়ে সীসার খাদ সংমিশ্রণের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে টিনের প্রয়োজনীয়তা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ধাতু-জগতে টিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

আজ•কাল

জাপানে বোমা বর্ষণ

এ সপ্তাহে যুদ্ধের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর জাপানের উপর বিমান আক্রমণ। টোকিও থেকে এবং অন্যান্য এক্সিস সূত্রে জানা গেছে যে, গত শনিবার দুপুরে টোকিও, ইওকোহামা, কোবে এবং নাগোয়া শহরের উপর মার্কিন বিমান হানা দিয়ে বোমা বর্ষণ করে। টোকিওতে হানার সংকেতধ্বনি সাত ঘণ্টা ছিল। এতে মনে হয়, আক্রমণকারী বিমানগুলো এলোপাথাড়ি বোমা মেরেই পালিয়ে আসে নি; তারা অনেকক্ষণ ধরে' স্থিরতার সঙ্গে আক্রমণ চালায়। ৬০খানি বিমান নাকি টোকিওতে বোমা বর্ষণ করে।

আমেরিকা বা মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিন্তু কোন খবর দেওয়া হয় নি। শুধু চুংকিংএর এক খবরে বলা হয়েছে যে, আক্রমণকারী বিমান চীনের এক ঘাঁটিতে এসে নেমেছে। আক্রমণকারীর পক্ষ থেকে খবর গোপন করার কারণ রহস্যাবৃত। তবে কতকগুলো কারণ অনুমান করা যায়। স্পষ্টতই এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল বিমানবাহী জাহাজ থেকে। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ ঘোষণা করলে বিমানবাহী জাহাজগুলো কাদের জানা যাবে, সুতরাং তাদের অবস্থান কোন্ দিকে তা সহজে ধরা পড়বে। উপরন্তু আক্রমণের উৎসকে সম্পূর্ণ গোপন রেখে প্রতিপক্ষের মনে অনিশ্চয়তা-জনিত বিহ্বলতা সৃষ্টি করাও একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। বিমান-বাহী জাহাজগুলো সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্ব অবস্থান থেকে নিশ্চয়ই সরে' গেছে; কারণ আক্রমণকারী বিমানগুলো আর জাহাজে ফেরে নি; তারা চীনদেশে গিয়ে নেমেছে।

খাস জাপানের উপর বিমান আক্রমণ এই প্রথম। সুতরাং এতে জাপানীদের মনে বেশ প্রতিক্রিয়া হবে। আর যদি বার বার এ রকম আক্রমণ চলতে থাকে, তাহলে জাপানীদের স্বদেশের ফ্রণ্ট যে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়বে, তাতে সন্দহ নেই। প্রথম আক্রমণে জাপানীদের কতটা যে ক্ষতি হয়, তা জানা যায় নি; তবে আক্রমণ চলেছিল জাপানের শিল্পপ্রধান অঞ্চলে। জাপানীরা এই আক্রমণকে 'বর্বর ও অমানুষিক' বলে' বর্ণনা করেছে; বেশী লোক হতাহত হওয়ার জন্যে তারা এই অভিযোগ করেছে কি না বোঝা যায় না। প্রথম আক্রমণেই জাপানে যে খানিকটা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা লক্ষণে জানা যায়। কারণ এই বিমান আক্রমণ সম্পর্কে জাপানী দেশরক্ষী দলের অধিনায়কদের বিচার হবে সামরিক আদালতে এবং সমর-দপ্তরে রদবদল হবে। শনিবার বিকেলে ও রাত্রে জাপানে কয়েক জায়গায় বিমান হানার সংকেতধ্বনি হয়; তবে কোন আক্রমণ হয় নি।

ব্রহ্মের যুদ্ধ

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে লড়াই বেশ জোর চলছে। জাপানীরা তিন দিকে অভিযান চালাচ্ছে; ইরাবতী অঞ্চলে, সিতাংএ মান্দালয়ের দিকে এবং সালুইন এলাকায় মান্দালয়-লাশিও রাস্তা অভিমুখে। ইরাবতী এবং সিতাং বা মধ্যবর্তী লাইনে বৃটিশ ও চীনা সৈন্যেরা আরো হটে' গেছে। তবে চীনারা একটা অসাধারণ কৃতিত্বও দেখিয়েছে। জাপানীদের চাপে ইরাবতী রণাঙ্গনে বৃটিশ সৈন্যেরা মাগোয়ে ছাড়িয়ে আরো উত্তরে হটে গিয়েছিল এবং জাপ অগ্রবর্তী সৈন্যেরা পশ্চিম ব্রহ্মের তৈলকেন্দ্র ইয়েনানজ্যাং দখল করে' নিয়েছিল; তবে তার আগে বৃটিশ সৈন্যেরা ইয়েনানজ্যাংএর তৈলখনিগুলো ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এর দক্ষিণে কয়েক হাজার বৃটিশ সৈন্য জাপানীদের এই অগ্রগতির ফলে ঘেরাও হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মধ্য রণাঙ্গনের চীনা সৈন্যেরা ইরাবতী রণাঙ্গনের বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারা উত্তর দিক থেকে এবং বৃটিশ পক্ষ দক্ষিণ দিক থেকে জাপানীদের উপর আক্রমণ চালায়। চীনাদের আক্রমণ সাফল্য-মণ্ডিত হয় এবং তারা ইয়েনানজ্যাং আবার দখল করে ও পরিবেষ্টিত বৃটিশ সৈন্যদের উদ্ধার করে। মধ্য রণাঙ্গনে চীনারা মান্দালয়ের দিকে সরে' যাচ্ছে এবং তাদের সামনের সৈন্যেরা রিয়ারগার্ড লড়াই করছে। এখন এ অঞ্চলে খুব যুদ্ধ চলছে পিইনমানায়। পূবে সালুইন এলাকায় কারেনি প্রদেশের রাজধানী লোইক দখলের জন্যে জাপানীরা চেষ্টা করছে; একবার চীনারা জাপানীদের এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছে। বর্তমানে লোইকের দক্ষিণে জোর যুদ্ধ হচ্ছে।

ফিলিপিন-অস্ট্রেলিয়া

গত ১৬ই এপ্রিল অস্ট্রেলিয়া থেকে এক মার্কিন বিমানবহর জেনারেল ব্রেটের চীফ অফ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল র‍্যালফ্ রয়েসের পরিচালনায় ফিলিপিনে হানা দেয় এবং বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে' ৪টি জাহাজ জলমগ্ন করে, ৪টিকে জখম করে, কতকগুলো বিমান ধ্বংস করে এবং বন্দরের সাজ-সরঞ্জাম নষ্ট করে দেয়।

ফিলিপিনে সেবুর পশ্চিম দিকে প্যানে দ্বীপে জাপানীরা দুই জায়গায় অবতরণ করেছে। মার্কিন সৈন্যেরা এখনও তাদের বাধা দিচ্ছে। করেগিডরের উপর জাপানীরা ক্রমাগত বোমা ও গোলা বর্ষণ করছে। করেগিডর থেকেও বাতানের উপর মাঝে মাঝে গোলা বর্ষণ করা হচ্ছে।

মিত্রপক্ষ যে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যোগী হয়েছে, তা জাপান ও ফিলিপিনের উপর হানা থেকে বোঝা যায়। এ ছাড়া জেনারেল ম্যাকার্থারের অধিনায়কত্বে মার্কিন ও অস্ট্রেলিয়ান বিমান-বহর জাপ ঘাঁটি রাবাউল (নিউ গিনি), কোয়েপাং (টিমর) ও সালামাউয়া (নিউ গিনি) আক্রমণ করে। জাপানীরা পোর্ট মোর্সবিতে হানা দেয়।

ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন ?

পশ্চিম ইওরোপে শীগ্গিরই জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হবে কি না, তা নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চলছে। এ জল্পনা-কল্পনা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কয়েকদিন আগে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ জেনারেল মার্শাল মিঃ হ্যারি হপকিন্স ও অন্যান্য ব্যক্তি সমভিব্যাহারে লণ্ডনে যান এবং সেখানে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন সলাপরামর্শ করেন; তাঁরা যখন ফিরে যান, তখন তাঁদের সঙ্গে বৃটিশ নৌ-অধিনায়ক এডমিরাল স্যার ডাড্লি পাউণ্ড এবং আরো তিনজন বিশিষ্ট বৃটিশ প্রতিনিধি আমেরিকায় গেছেন। বৃটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের সর্বত্র মার্কিন বিমান ও সৈন্য রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত পশ্চিমে ইওরোপে বৃটিশ বিমান আক্রমণ বারে বারে চলছে ও তীব্রতায় বাড়ছে। উত্তর ফ্রান্সে ও হল্যাণ্ডে তো প্রায় অবিরাম বিমান হানা চলছে। মাঝে একদিন বৃটিশ বিমানবহর দিনের বেলায় জার্মানীর আউগ্সবুর্গএ ব্যাপকভাবে হানা দিয়ে বিখ্যাত ডীজেল ইঞ্জিন কারখানায় আক্রমণ চালায়। তৃতীয়ত, জার্মানী পশ্চিম দিকে বেশ একটা আত্মরক্ষার তোড়জোড় করছে। সোভিয়েট রণাঙ্গন থেকে

জেনারেল রুনস্টেটকে এনে ফ্রান্সে জার্মান সৈন্যদের অধিনায়ক করা হয়েছে। নরওয়ের উপকূলে জার্মান গোলা বর্ষণের ব্যাপক মহড়া হয়েছে এবং জার্মান সেনাপতিরা বিভিন্ন স্থানে রক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শন করেছেন।

লাভালের ক্ষমতা লাভ

এর সঙ্গে ফ্রান্সে মঃ লাভালের ক্ষমতালাভ নিঃসম্পর্কিত নয়। মঃ লাভাল কার্যত নাৎসী জার্মানীর এজেন্ট। প্রথমবার ভিসি গভর্নমেণ্ট উচ্চ পদাধিকারী হওয়ার পর মার্শাল পেত্যাঁই তাঁকে তাড়িয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভিতরে ভিতরে নাৎসী-কর্তাদের চাপে মার্শাল পেত্যাঁ আবার তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে বাধ্য হলেন। মঃ লাভাল প্রকৃতপক্ষে অনধিকৃত ফ্রান্সের সর্বময় কর্তা হলেন। তিনি হলেন প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগ তাঁর হাতে থাকবে। পেত্যাঁ নামে রাষ্ট্রনায়ক থাকলেন এবং এডমিরাল দারলাঁ ফরাসী বাহিনীর নায়ক। লাভাল তাঁর প্রথম বক্তৃতায় নাৎসী নায়কদের উদারতার প্রশংসা করে' স্পষ্টই বলেছেন যে, জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু ফরাসী জনসাধারণ যে তাঁকে বাধা দেবে, এ আশঙ্কা জার্মানরাও করছে। সুতরাং ফ্রান্সে তাদের চণ্ড নীতি এখনো নরম হয় নি। ফ্রান্সে জার্মান সৈন্যবাহী ট্রেন ধ্বংস, জার্মান সৈন্যদের উপর আক্রমণ, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি চলছে এবং তার প্রতিশোধে জার্মান কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি বহু আটক ফরাসীর প্রাণ হরণ করেছেন এবং আরো লোককে মারবেন বলে' হুমকি দিয়েছেন।

নাৎসীদের লড়াই

সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয় নি। আক্রমণের উদ্যম এখনো লালফৌজের হাতে রয়েছে। জার্মানরা জায়গায় জায়গায় আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। লাল-পল্টন স্মলেনস্কের ১৮ মাইল উত্তর-পূবে এসে গেছে ব'লে জানা যায়। লেনিনগ্রাদের ৬০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত তারা অগ্রসর হয়েছে। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে জার্মান সেনাপতি মার্শাল ফন লেবকে অপসারিত করে' জেনারেল কুয়েকলকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণসাগরীয় সোভিয়েট নৌবহর কার্চ উপদ্বীপে এবং আজভ সাগর তীরে জার্মান সৈন্যদের উপর প্রবল গোলা বর্ষণ করেছে।

মাল্টার উপর জার্মানদের বিমান আক্রমণ অবিরামভাবে চলছে। তারা ভূমধ্যসাগরে এই দৃঢ় বৃটিশ ঘাঁটিকে ঘায়েল করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ যেভাবে প্রতিরোধ করছে, তা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

ভারতবর্ষের পরিস্থিতি

জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা এখন ভারতবর্ষের সমস্ত আবহাওয়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জনসাধারণকে সম্বোধন করে' যে সব কংগ্রেস-নেতা বর্তমানে কথা বলছেন, তাঁরা—যেমন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীরাজাগোপালাচারী—জাপানকে প্রতিরোধ করবার কথাই বিশেষভাবে বলছেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মনোভাব ও ক্রিপস্ আলোচনার ব্যাপারকে তাঁরা ততটা প্রধান করছেন না, যতটা করছেন বহিরাক্রমণের বিপদকে। তাঁদের মতে সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় আমরা জানি এবং সে অন্যায় প্রমাণিতও হয়েছে; কিন্তু এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, কি করে নতুন শত্রুকে ঠেকানো যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল বর্তমানে বাঙলা ও আসাম পরিদর্শনে এসেছেন। আসাম যাত্রার প্রাক্কালে তিনি কলকাতায় ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির এক সম্বর্ধনা-সভায় বলেন যে, কোনো আক্রমণকারী বা অভিযানকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করব না, এই মনোভাব সকলের অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার; বৃটিশের সঙ্গে আমরা অসহযোগ করতে পারি; কিন্তু আজ সে অর্থে অসহযোগের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আজ বৃটিশের সঙ্গে অসহযোগের অনিবার্য তাৎপর্য হচ্ছে জাপানকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ করে' আনা হবে। সেই জন্যে কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ সমর-প্রচেষ্টায় বাধা দিতে চান না।

কিন্তু কিভাবে দেশ রক্ষার জন্যে আমাদের সংগঠন করা উচিত, তা পণ্ডিত নেহরু পরিষ্কার কিছু বলতে পারেন নি; গ্রাম ও শহরকে স্বনির্ভর ও আত্মরক্ষণক্ষম করে' সংগঠন করার কথা আর আক্রমণকারীর সঙ্গে অসহযোগের কথা শুধু তিনি বলেন।

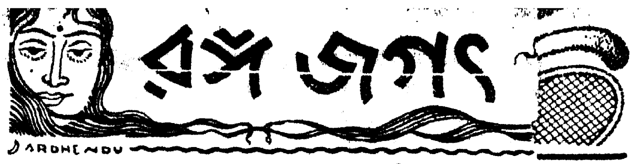
মাদ্রাজে শ্রীরাজাগোপালাচারীও ঐ ধরণের এক বক্তৃতা করেছেন। তিনি আবার জওহরলালের চেয়েও এগিয়ে গেছেন। তিনি এমন কথা বলেছেন যে, কংগ্রেস যদি রাজনীতি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে জনসাধারণের উচিত জাপানীদের প্রতিরোধে উদ্যোগী হ'য়ে কংগ্রেসের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং কংগ্রেসকে লজ্জিত করে কর্মতৎপর করে' তোলা।

এ দুই বক্তার সুর কংগ্রেসের সাধারণ সুর থেকে এখন যেন কিছু পৃথক বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক্, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নূতন কোনো আলোকপাত হয় কিনা।

জাপানী নৌ-বহর কোথায়?

বঙ্গোপসাগরে যে জাপানী নৌবহর বিচরণ করছিল, তার আর কোনো সংবাদ নেই। কাছাকাছি থাকলে ঐ নৌ-বহর নিশ্চয়ই কর্মতৎপর থাকত। মনে হয়, নৌবহরটি বঙ্গোপসাগর থেকে সরে গেছে। কারণ কি? প্রশান্ত মহাসাগরে বিমানবাহী জাহাজ নিয়ে মার্কিণ নৌ-বাহিনীর আবির্ভাব? জাপানের নিজস্ব এলাকা এবং পার্শ্বভাগ যদি বাস্তবিক প্রতিপক্ষের নৌবাহিনীর দ্বারা বিপদাপন্ন হয় তাহলে তার পক্ষে নিজের নৌ-বাহিনীকে পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিধা-বিভক্ত করে দুর্বল করা মারাত্মক।

২১-৪-৪২ —ওয়াকিবহাল



'রূপবাণী'—'অপরাধ'

মুভিটেকনিক সোসাইটির বাঙলা সামাজিক চিত্র; পরিচালক—ফণী মজুমদার; কাহিনী—মণীন্দ্রকুমার দত্ত; সংগীত পরিচালক—হরিপ্রসন্ন দাশ; ভূমিকায়—মণিকা দেশাই, ব্রতীন ঠাকুর, ধ্রুব চক্রবর্তী, শংকর ব্যানার্জি, ইন্দু, সত্য, নৃপতি প্রভৃতি।

'অপরাধ' কাহিনীটি উদ্দেশ্যমূলক, অর্থাৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙলার পল্লী সমাজের বহুবিবাহ রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের যে সকল দুর্বৃত্ত বিবাহবিশারদ অসহায় অবলা হিন্দু নারীকে প্রতারণা ও সর্বনাশ করিয়া গা ঢাকা দিয়া ফেরে, তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া তীব্র কষাঘাত করা হইয়াছে। কাহিনীর উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু যে সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা বিশ বৎসর পূর্বে বাঙলা সমাজের ছবি, বর্তমান জীবনধারার সহিত ইহার যোগ সামান্যই।

কাহিনীর মূলগত মর্ম এইরূপঃ—পৃথিবীর মানব চরিত্রের মাঝখানে কতকগুলি অনুভূতি অবস্থান করিতেছে সত্য, কিন্তু সকল মানুষের অভিজ্ঞতা ও জীবন সমান হয় না। অলকা আরও দশজন মেয়ের মতই স্বামী সোহাগিনী হইয়া নারী জীবন ধন্য করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার বেলায় বিধাতা কোথায় যেন হিসাবের ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন। জীবনে তাহাকে যে নির্মম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল তাহার সহিত আরও দশজনের তুলনা চলে না। অলকাকে পরে নার্স মাধবীরূপে জানা যায় এবং সেই সূত্রে মাতাল জ্যোতিষ, চপলমতি যুবক অরুণ এবং মাধবীর পূর্ব স্বামী 'বিবাহবিশারদ' মথুরামোহন দে ওরফে অনাদি চক্রবর্তীর স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

অরুণ নার্স অলকাকে ভালবাসে এবং বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন্তু অলকার ছিল ভিতরে ভিতরে এই শিল্পী, গুণী সংস্কারমুক্ত মাতাল জ্যোতিষবাবুর প্রতি প্রচ্ছন্ন টান। জ্যোতিষ চেষ্টা করিয়াছিল তাহার ভাই ভালছেলে অরুণের সহিত অলকার বিবাহ দিয়া অলকাকে সুখী করে। ইতিমধ্যে অলকার পূর্বস্বামী বিবাহবিশারদ মথুরামোহনের আবির্ভাবে অলকার পূর্ব ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় অরুণ পিছাইয়া পড়ে, তখন জ্যোতিষই অলকাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়।

কাহিনীর ব্যাকগ্রাউন্ড যদিও বাঙলা সমাজ, তথাপি পশ্চিমের কোন একটি পার্বত্যময় দেশ, সেখানকার অভ্র খনির সাঁওতাল কুলীমজুর ও তাহাদের পল্লী, ম্যানেজারের বাংলো, পাহাড়ী নদী ইত্যাদি ছবির বারো আনা অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। পরিচালক এই বহির্দৃশ্যের ছবি তোলায় বেশী মনোযোগ দেওয়ার গল্পটিকে সেইভাবে ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। গল্পের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও টেম্পো কাহিনীর গতি ও Sequence রক্ষা করিতে পারে নাই—কেবল পশ্চিম দেশের রাস্তাঘাট পার্বত্য নদী, পাহাড়ের শোভা, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি দৃশ্যগুলি অযথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

ছবিটির মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু অবান্তর দৃশ্যের প্রতি বেশী ঝোঁক দেওয়ায় এবং নূতন ও অনভিজ্ঞ অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে লইয়া ছবি তুলিতে গিয়া পরিচালক ফণী মজুমদার ব্যর্থ হইয়াছেন। 'ডাক্তার'নী হকি খেলা
কয়েকটি স্থান ছাড়া এ ছবি এক বিশেষ প্রদর্শনী হকি খেলা
ইহাই আমাদের বিস্মিত ক বাঙলা দলের সহিত বি এন আর দল
ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথেোয় বিশেষ দর্শক সমাগম হয় না।
সর্বজনপ্রিয় এবং তা গাওয়



শেষ উত্তর (এবং জবাব হিন্দী) স্পোর্টস: পরিচালনা করিতেছেন গ্রন্থকার প্রতিনিধিগণ

মাধুর্যকে সম্পূর্ণ বজায় রাখিরলিয়া আশা করা গিয়াছিল সেইরূপ গানটি পিয়ানোর বাজনা ও ঝড়ের দৃশ্যের সহিত অপূর্ব আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। সাঁওতাল রমণীদের গান ও কুলীদের গান দুটিও উল্লেখযোগ্য। সংগীতের দিক দিয়া ছবিটি সমৃদ্ধ, তবে গানের Situation অত্যন্ত খেলো হইয়াছে।

অভিনয়ের দিক দিয়া মণিকা দেশাই প্রশংসা পাইবার যোগ্য; স্বল্পভাষী ব্যথাতুর চিত্তের একটি কোমল নারী চরিত্রকে তিনি ভালই ফুটাইয়াছেন। ব্রতীন ঠাকুরের অভিনয় আগাগোড়া মঞ্চ-ঘেঁষা এবং আতিশয্য দোষে দুষ্ট। ধ্রুব চক্রবর্তী এই প্রথম অভিনয় করিয়াছেন। চেহারা ছায়াচিত্রের উপযোগী, কিন্তু আড়ষ্টতা কিছুমাত্র কাটে নাই। শংকর ব্যানার্জির অভিনয় আমাদের মন্দ লাগে নাই। ইন্দু মুখোপাধ্যায়কে যে কেন এ ছবিতে নামানো হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার এই রকম ব্যর্থ অভিনয় আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে একটা কমিক পাঠ দিলেই ভাল হইত। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

এ ছবির সম্পাদনার ত্রুটি উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। এডিটিং-এর দোষে সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য পদে পদে ব্যাহত হওয়ায় ছবিটিকে একেবারে ভোঁতা করিয়া ছাড়া হইয়াছে।

* * * *

বম্বে টকীজ-'অনজন'ঃ—বম্বে টকীজের চিত্র। পরিচালক—অমিয় চক্রবর্তী; সংগীত পরিচালক—পান্নালাল; ভূমিকায়—দেবীকারাণী, অশোককুমার, দেশাই, সুরেশ প্রভৃতি।

ঠামো লইয়া বম্বে টকীজ
য়াছে, 'অনজন' তাহাদেরই
দেখিয়াছেন, গল্পের দিক দিয়া
কছু পাইবেন না। একমাত্র
পরে তিনি পর্দায় অশোক-
ছবিটিতে চিত্তবিনোদনের
তে ভালই লাগিবে, নাচও
নীয় ক্যামেরার কাজ। যেমন

* *

মিকায় স্নেহপ্রভা ও জয়রাজ।
রিচয়ের অন্ধকারে পড়িয়া
ই সময় এক বন্ধু তাহাকে
সে অপরিচিতা এক তরুণীর
দের পরিচয় হয়। আশার
ক জীবনের আভাস—শিল্পীর
হ আশার পিছনেই নিরাশা—
পর্দায় প্রতিফলিত হইয়াছে।
াভিনয়ে উজ্জ্বল। গল্পের
entertainment-এর প্রচুর
।
ঠ

া মনে হয় জানো—এদের সখ
ছে সৌন্দর্যবোধ নেই। কী
বার্তায়, কী গানে, কী সুরে,
ধিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত।
ত্য-সৃষ্টি এখানে নেই। সেই
এদের কোথাও নেই। বারে
র বাঙলা আমি তোমায়
তোমার বাতাস আমার প্রাণে

এদেশে এসেছি চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্য নয়। ব্যবসা বুদ্ধি থেকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়। তাই বাঙলায় থাকতে তোমরা যা' আমাদের কাছ থেকে আশা করতে, তা' এখন আশা করো না।

শুধু তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করো, শতচ্ছিদ্র বিদ্যমান সত্ত্বেও 'নিউ থিয়েটার্স' যেন টিকে থাকে। শত দোষ-গুণ নিয়েও ঐ স্টুডিওটা বাঙলার। ওখানেই একমাত্র রুচি মাফিক কাজ করা সম্ভব। ওখানেই একমাত্র মালিক ও কর্মীদল অন্তত চেষ্টা করে ভালো কিছু দেবার জন্য। অভাব ভুলচুক সেখানে আছে। তবু উন্নততর চলচ্চিত্র দেবার সাহস ও চেষ্টা সেখানে করা চলে।

এদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নিম্নস্তরের। বাঙলার নগণ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদিও পয়সার দিক হতে নয়। জানি—আমার একথা লেখায় অনেক বাঙালী চিত্রামোদী চ'টে উঠবেন। তবু আমি যা লিখছি, তা ধ্রুব সত্য। অভিজ্ঞতালব্ধ।

এদের কাছ থেকে যেন বাঙালী কোনো দিন রুচি ধার না করে; তার চেয়ে বড়ো মরণ আর কিছুই নেই। এদের ঢাকের বাদ্যিতে যেন বাঙলার রসবোধ না বদলায়। সোনার বাঙলার রাখালিয়া যেন তার বাঁশিকে এদের জয়ঢাকের হুকুমে 'পাচনবাড়ি' না বানায়। আজ সৌরচৈত্রের শেষ তারিখে বাঙলার পুরাতন বর্ষকে বিদায়ের দিনে এই আমার প্রার্থনা। ইতি—

বম্বাইওয়ালা।

সাধনা বোস নৃত্যসম্প্রদায়

সাধনা বোস ললিত নৃত্যকলায় তাঁহার নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এই দুঃসময়ে নৃত্য প্রদর্শনীর সুচিন্তিত পরিকল্পনায়। তিনি বলেন,—"দেশের ও দশের এই দুর্দিনে শঙ্কিত, অব্যবস্থিত চিত্ত-বিভ্রমের অপরিসীম অশান্তির মুহূর্তেই আমাদের কর্তব্য ভারতীয় নৃত্যের সম্মোহন মর্মবাণী প্রচারে মানসিক দুশ্চিন্তার গুরুভার লাঘব করা।" এইবারের নৃত্য-পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত হরেন্দ্র ঘোষ মহাশয়, সাধনা বোস ও তাঁহার নৃত্য সম্প্রদায়ের নৃত্য-সফরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২৫শে এপ্রিল হইতে ইঁহাদের নৃত্য-কলা প্রদর্শনী মেদিনীপুরস্থ বিদ্যাসাগর হলে আরম্ভ হইবে। তথা হইতে ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিমিরবরণ স্বয়ং তাঁহার বাদক-সঙ্ঘ সমেত ইঁহাদের সহিত থাকিবেন। এই নৃত্য-অনুষ্ঠানের সমস্ত সুরসঙ্গতি তিমিরবরণই করিয়াছেন।

সাহিত্য সংবাদ

গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

"শতদল সমিতি" পরিচালিত "বৈশাখী" মাসিকের ৪র্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে।

বিষয়ঃ—(১) যে কোন ছোট গল্প (ফুলস্কেপ ১৬ পাতার অনধিক)।
(২) যে কোন কবিতা (নূতনত্বপূর্ণ গদ্য-কবিতাও চলিবে)।

নিয়মাবলীঃ—যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। কোন প্রবেশমূল্য নাই। ছোট গল্প ও কবিতার বিচারের ভার লইয়াছেন যথাক্রমে শ্রীকামাক্ষীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ও শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যতীত যে সকল লেখা ভালো হইবে সেগুলিও আমাদের মাসিকে প্রকাশ করা হইবে। সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ১৪ই মে, ১৯৪২, বাঙলা ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪৯-এর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ফলাফল এক মাসের মধ্যে 'দেশে' প্রকাশ করা হইবে।

পুরস্কারঃ—গল্প ও কবিতা প্রত্যেক বিষয়েই দুইটি করিয়া পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার—নগদ ৫৲ পাঁচ টাকা; দ্বিতীয়—রৌপ্য পদক। নিম্নলিখিত ঠিকানায় রচনাদি পাঠাইবেন। —শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—"বৈশাখী", তেলমাড়ুই রোড, পোঃ বর্ধমান।

সমুদ্রমন্থন সমিতির প্রতিযোগিতা

কলিকাতা হইতে যে প্রতিযোগিতা হইবার কথা ছিল তাহা জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন লেখক লেখিকারা যোগদান করিতে পারেন।

প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ—
(১) প্রবন্ধ—দুই পৃষ্ঠার অধিক হওয়া চাই।
(২) গল্প—যে কোন প্রকারের।
(৩) কবিতা—সম্পূর্ণ দেড় পৃষ্ঠা হওয়া চাই।
(৪) উপন্যাস—যে কোন প্রকারের উপন্যাস হইলে চলিবে।

(১) প্রবন্ধে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে রৌপ্যাধার ও দুইখানি ভাল গল্পের বই পুরস্কার দেওয়া হইবে। যিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের রৌপ্য মেডেল পুরস্কৃত করা হইবে।

(২) গল্পে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের রৌপ্যাধার পুরস্কৃত করা হইবে।

(৩) কবিতা ও উপন্যাসে যাঁহারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে রৌপ্য মেডেল ও গল্পের বই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের কোন প্রবেশমূল্য দিতে হইবে না। ১০ই মে প্রবন্ধাদি পাঠাইবার শেষ তারিখ।

(স্বাঃ) রঞ্জিৎ মুখার্জি, সম্পাদক—"সমুদ্রমন্থন সমিতি"। সহ-সম্পাদিকা—শোভনা মিত্র (এম-এ), ১০নং কালাং রোড, জামসেদপুর।



বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা

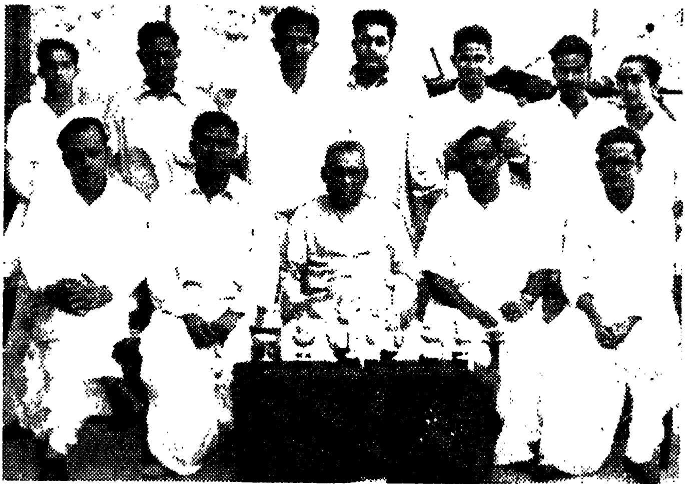
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেটন হকি কাপ প্রতিযোগতা শেষ হইতে চলিয়াছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে। কোন্ দল কাপ বিজয়ী হইবে তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। বাঙলার বাহিরের কোন দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই। কেবলমাত্র স্থানীয় দল-সমূহই বিজয়ীর সম্মান লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। সেই জন্য এই প্রতিযোগিতা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাহা হইলেও কয়েকটি খেলা দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। রেঞ্জার্স ও কাস্টমস দল সেমি ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এই সেমি-ফাইন্যাল খেলা উচ্চাঙ্গের না হইলেও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হইবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। অপর সেমি-ফাইন্যালে বি এন আর ও পোর্টকমিশনার্স দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সম্ভাবনা অছে। এই সেমি-ফাইন্যাল খেলাও দর্শনযোগ্য হইবে। ফাইন্যালে এই চারিটি দলের মধ্যে দুইটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া মনে হয়। তবে দুঃখের বিষয় যে, কোন স্থানীয় ভারতীয় দল ফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা পাইল না। হকি খেলায় উচ্চাঙ্গ নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার জন্য বাঙালী খেলোয়াড়গণ যে চেষ্টা করিতেছে না, এই খেলার ফলাফল হইতেই প্রমাণিত হইল। বাঙলার মাঠে হকি খেলায় এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রাধান্যই অক্ষুন্ন রহিল। উৎসাহী বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণ কিরূপে এই অসম্মানজনক অবস্থা নীরবে সহ্য করিতেছেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। দীর্ঘ ১২ বৎসর ধরিয়া আমরা এই দিকে বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সফলকাম হই নাই। শীঘ্র যে হইব তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ভারতীয় হকি ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হউক ইহা কি তাঁহাদের কাম্য নহে?

লক্ষ্মীবিলাস হকি কাপ প্রতিযোগিতা

লক্ষ্মীবিলাস হকি কাপ প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় মোহন-বাগান দল বিজয়ী হইয়াছে। মোহনবাগান দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়। তিন জন নিয়মিত খেলোয়াড় দলে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা বিজয়ী হইয়াছে। লক্ষ্মীবিলাস হকি কাপ প্রতি-যোগিতার খেলায় মোহনবাগান দল সর্বপ্রথম বিজয়ীর সম্মান লাভ করিল। ১৯২৩ সালে বিজয়ী হইবার সম্ভাবনা হয়। মোহন-বাগান দল ফাইন্যালে উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী ঝান্সি হিরোজ দলের নিকট পরাজয় বরণ করে। ঝান্সি হিরোজ দলের অধিনায়কত্ব করেন সেই বৎসর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ। মোহনবাগান দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজয় বরণ করে। ফুটবল খেলায় মোহনবাগান যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, হকি খেলায় সেইরূপ খ্যাতি অর্জন করিলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

প্রদর্শনী হকি খেলা

সম্প্রতি কলিকাতা মাঠে এক বিশেষ প্রদর্শনী হকি খেলা হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় বাঙলা দলের সহিত বি এন আর দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলায় বিশেষ দর্শক সমাগম হয় না।



পেন এণ্ড ইঙ্ক ক্লাব স্পোর্টস:
দলগত চ্যাম্পিয়ান আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিগণ

খেলাটি যেরূপ উচ্চাঙ্গের হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সেইরূপ হয় নাই। সমগ্র খেলার মধ্যে শেষ দশ মিনিট উভয় দলকে তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যায়। খেলার সূচনায় বাঙলা দলের চরঞ্জিৎ রায় প্রথম গোল করেন। প্রথমার্ধে আর কোন গোল হয় না। দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটের সময় বি, এন, আর, দলের সি ট্যাপসেল ঐ গোলটি পরিশোধ করেন। খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। একেবারে শেষ সময় চরঞ্জিৎ রায় বাঙলা দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করিয়া দলকে বিজয়ী করেন। বি এন আর দল পরাজিত হইলেও খেলার অধিকাংশ সময়েই বাঙলা দলকে চাপিয়া ছিল। এই দলের পরাজয় একরূপ দুর্ভাগ্যবশত হইয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। খেলার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, এই খেলা অবলোকন করিয়া বাঙলার বর্তমান হকি স্ট্যাণ্ডার্ড কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই পরিচয় উৎসাহদায়ক নহে। বাঙলা দল আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলায় যোগদান করিয়া সুবিধা করিতে পারিত না, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। বাঙলার হকি স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে প্রয়োজন নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া। হকি পরিচালকগণ সেই ব্যবস্থা চেষ্টা করিলেই করিতে পারেন। কিন্তু করিবেন কি না সেই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

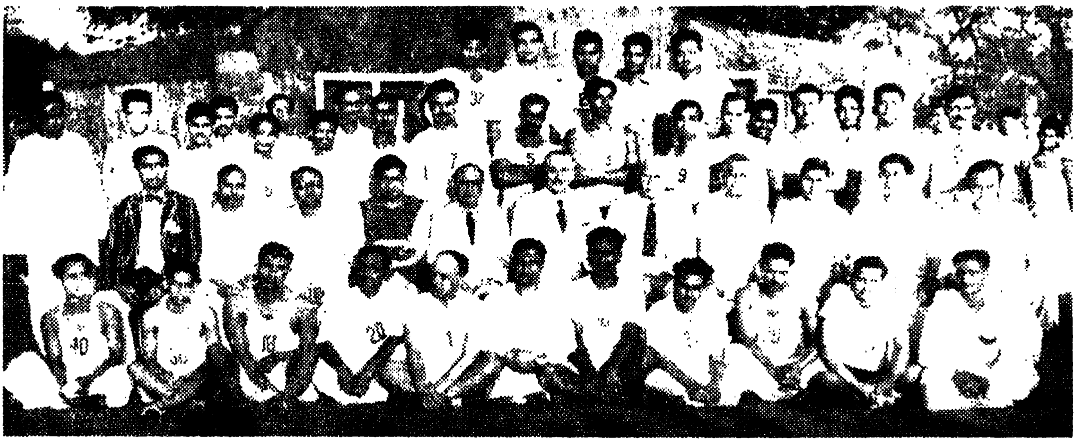
বাঙলার বাছাই দলে একটি মাত্র বাঙালী খেলোয়াড় স্থান পাইয়াছিলেন। এই খেলোয়াড়টি যেরূপ নৈরাশ্যজনক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অনেকেই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "এইরূপ

লোয়াড়কে নির্বাচন করিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ বিশেষ চক্ষণতার পরিচয় দেন নাই। হকি খেলা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ান নাই বলিয়াই মনে হয়। বাঙলার দল যখন অধিকাংশ এ্যাংলো-ণ্ডিয়ান ও অবাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হইয়াছিল তখন অনর্থক একজন বাঙালী খেলেয়াড়কে দলভুক্ত না করিলেও চলিত।" এই সকল উক্তি খুবই দুঃখের।

কলিকাতার ফুটবল খেলা

কলিকাতার মাঠে ফুটবল খেলার তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। তবে সেই তোড়জোড় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিছুই নহে। তবে অধিকাংশ বিশিষ্ট দলই নিজ নিজ দলের খেলোয়াড়গণকে অনুশীলন খেলায় যোগদান করিবার জন্য বাধ্য করিতেছেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিন মাঠে হকি খেলার ভীড় থাকে বলিয়া অধিকাংশ অনুশীলন খেলা রবিবারে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া কলিকাতার ফুটবল মরসুম খুব আকর্ষণীয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও এরিয়ান্স এই চারিটি ভারতীয় দলের খেলাই ক্রীড়ামোদীদের বিশেষ আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং দলের নিয়মিত খেলোয়াড়গণের অধিকাংশকেই এখনও পর্যন্ত মাঠে অবতীর্ণ হইতে দেখা গেল না। শীঘ্রই তাঁহারা কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, 'আসিবেন না। এই যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে বাঙলার বাহিরের কোন খেলোয়াড়ই কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন না।' এই উক্তি সত্য কি না আমরা জানি না। তবে সত্য হইলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বাঙলার বাহিরের। ফুটবল মরসুমের কয়েক মাস পূর্বেই কলিকাতায় আসিয়া সমবেত হন। এই সকল খেলোয়াড় দলে যোগদান না করিলে দলের খেলার আকর্ষণও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন মাত্র দল ত্যাগ করিয়াছেন। এই জন্য দলের শক্তি কমিয়াছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দল ক্রীড়াক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এরিয়ান্স দলের অনেকগুলি নামজাদা খেলোয়াড় দলত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দলের শক্তি কমিয়াছে। তবু তাঁদের খেলা দর্শন-যোগ্য বা আকর্ষণীয় হইবে না ইহা বলা যায় না।



'পেন এণ্ড ইংক' ক্লাবের প্রথম বার্ষিক এ্যাথেলেটিক স্পোর্টসে সম্মিলিত প্রতিযোগী ও কর্মকর্তাগণ...

এই দলের বিশেষত্ব হইতেছে—নবাগত খেলোয়াড় লইয়া সুনাম অর্জন করা। মোহনবাগান দলের নিয়মিত খেলোয়াড়গণের মধ্যে কেহই দলত্যাগ করেন নাই। উপরন্তু অন্যান্য দলের কয়েকজন নামজাদা খেলোয়াড় এই দলভুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে সকলের ধারণা মোহনবাগান দলই এই বৎসর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল এবং এই দলের খেলাই কলিকাতার মাঠে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইবে। মোহনবাগান দলের পরেই অপর একটি দলের নাম শোনা যাইতেছে—ভবানীপুর। এই দলে বিভিন্ন দলের কতকগুলি নামজাদা খেলোয়াড় একত্র হইয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ব্যতীত সকল দলই নিজ নিজ খ্যাতি অনুযায়ী নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত। সুতরাং কলিকাতার ফুটবল খেলার আকর্ষণ কোনরূপেই নষ্ট হইবে না, যদি ইতিমধ্যে অভাবনীয় কোন ঘটনা না ঘটে।

সমর বার্তা

১৫ই এপ্রিল—

ব্রহ্ম—গতকল্য সমগ্র ইরাবতী রণাঙ্গনে তীব্র লড়াই হয় এবং বৃটিশ সৈন্যেরা ঐ এলাকা হইতে সরিয়া আসে। সিতাং রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যেরা সিতাং নদীর কয়েক মাইল উত্তরে একটি স্থলে সরিয়া আসে। টঙ্গুর উত্তরে রেঙ্গুন-মান্দালয় রোড এলাকায় অবস্থিত চীনাদের বিরুদ্ধে জাপানীরা এক সাঁড়াশী অভিযানে তিনটি বাহিনীকে নিযুক্ত করিয়াছে। আমেরিকান ভলান্টিয়ার গ্রুপের জঙ্গী বিমান শত্রুর বিমান ঘাঁটিসমূহের উপর সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ চালায়।

১৬ই এপ্রিল—

ভারতীয় নৌবহরের 'ইণ্ডাস' নামক জাহাজ (১১ শত টন—২টা কামান ছিল) গত ৬ই এপ্রিল বোমা বর্ষণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম—গত সপ্তাহের যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে চীনা সামরিক মুখপাত্র জানান যে, ৭ই হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত সোয়া নদীর উভয় তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাপানীরা থাগায়ার দক্ষিণে এক স্থানে পেঁৗছিতে সক্ষম হয়। সোয়া নদীর তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এক চীনা সৈন্য দল একটি জাপানী সৈন্য দলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

ফিলিপাইন—অস্ট্রেলিয়া হইতে যাইয়া মার্কিন বোমাবর্ষী বিমান বহর ফিলিপাইনে জাপানীদের কল-কারখানা ও জাহাজ-সমূহের উপর বোমা বর্ষণ করে। মার্কিন বিমান আক্রমণে চারিটি জাপ জাহাজ জলমগ্ন হয়।

বৃটিশ বিমান বহর উত্তর ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

রুশিয়া—লালফৌজের মুখপত্র 'রেড স্টার' হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম নয় মাসে ৩৮ হাজার জার্মান বৈমানিক নিহত হইয়াছে।

জার্মান-সমর্থক মঃ লাভাল তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তালিকা মার্শাল পেতাঁর নিকট পেশ করেন। এডমিরাল দারলাঁ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর অধিনায়ক হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রকাশ যে, ফ্রান্সে জার্মান বাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য জেনারেল রুনস্টেডট প্যারিসে পেঁৗছিয়াছেন।

১৭ই এপ্রিল—

ফিলিপাইন—জাপানী সৈন্যদল অদ্য প্যানে দ্বীপের ইলয়লো ও কাপিজ নামক স্থানে অবতরণ করে। বাতানে সর্বশুদ্ধ অনুমান ৬০ হাজার সামরিক ও বে-সামরিক জাপানীদের হস্তে বন্দী হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে একটি বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে একটি বৃহদাকার ইতালীয়ান সৈন্যবাহী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

মাল্টার উপর প্রবল জার্মান বিমান আক্রমণ হয়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অনুমান পাঁচশত এক্সিস বিমান ৯২ স্কোয়ার মাইল স্থান ব্যাপিয়া মাল্টার উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করে।

ব্রহ্মের তিনটি রণাঙ্গনে—ইরাবতী তীরে মাগুইয়ের নিকট, মাইহলার নিকট ব্রহ্ম রেলপথের ধারে এবং সালুইন রণাঙ্গনে মাউচির নিকট প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। ইরাবতী রণাঙ্গনে মিত্র পক্ষীয় সৈন্যেরা মাগুইয়ের উত্তরে সরিয়া আসিয়াছে। ইয়েনাং-ইয়ং-এর তৈলখনি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১১ই এপ্রিল তারিখে টঙ্গু হইতে ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ইয়াডো নামক স্থানটি জাপানীরা অধিকার করিয়াছে।

ভিসির মার্কিন রাষ্ট্রদূতে এডমিরাল লিহীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৮ই এপ্রিল—

অদ্য অপরাহ্নে টোকিও, ইয়াকোহামা ও ওসাকা অঞ্চলে প্রথম বিমান হানা হয়। টোকিও হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, আক্রমণকারীরা বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়াছিল। জার্মান নিউজ এজেন্সী প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে, অনুমান সাড়ে ঘণ্টা পর টোকিওতে নিরাপত্তার সঙ্কেতধ্বনি হয়। জাপানের দেশরক্ষা বিভাগের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয় যে, টোকিওতে অল্পসংখ্যক বোমা বর্ষিত হইয়াছে ও সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী হইতে ঐ সব বিমান প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই রণতরীখানি মূলে জাপানী ভূখণ্ডের নিকটবর্তী দরিয়ায় তৎপর ছিল।

ব্রহ্ম—সিতাং রণাঙ্গনে থাগায়ার ১২ মাইল দূরে এক স্থানে দিবারাত্রিব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। চীনারা দৃঢ়ভাবে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করে। এই যুদ্ধে এক সহস্র জাপ সৈন্য হতাহত হয়। সালুইন রণাঙ্গনে জাপ অগ্রগতি প্রতিহত হয়।

ফিলিপাইন—জাপ বাহিনী সেবু শহর অধিকার করিয়াছে। প্যানে দ্বীপে অবতরণকারী জাপানীদিগকে প্রচণ্ডভাবে বাধাদান করা হইতেছে।

মঃ লাভাল নূতন ভিত্তিতে ভিসি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। এডমিরাল দারলা স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মার্শাল পেতাঁ নামে মাত্র রাষ্ট্রনায়ক থাকিবেন।

১৯শে এপ্রিল—

রুশিয়া—মস্কো রেডিওর সংবাদে প্রকাশ যে, রুশেরা অবরুদ্ধ নগরীর (লেনিনগ্রাদ) ৬০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে। ফিনিশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী সাফল্যের সহিত সংগ্রাম চালাইতেছে।

প্রকাশ যে, রুশ রণাঙ্গনের উত্তর বিভাগীয় জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক ফন লেপকে অপসারিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার স্থলে জেনারেল ফন কুয়েখলেরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অদ্য টোকিওতে পুনরায় বিমান আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি হয় এবং গতকল্য রাত্রিতে দুইঘণ্টাব্যাপী সঙ্কেতধ্বনি হয়। ভিসিতে প্রাপ্ত ওসাকার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, অদ্য মধ্য জাপানের বিভিন্ন স্থানে বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হয়।

জেনেভা হইতে সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৪ই এপ্রিল হইতে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে এক চুক্তি বলবৎ হইয়াছে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী ফরাসীদের তিনটি ব্যাটল-শিপসহ কয়েকখানি জাহাজ জার্মান নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

২০শে এপ্রিল—

ব্রহ্ম—চীনাবাহিনী ইয়েনাংইয়ং পুনরধিকার করিয়াছে।

মঃ লাভাল তাঁহার পুনরায় ক্ষমতা প্রাপ্তি সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ইহা হইল ফ্রান্স ও জার্মাণীর মধ্যে পুনরায় মৈত্রী প্রতিষ্ঠা।

২১শে এপ্রিল—

ব্রহ্ম—চীনাবাহিনী জাপানীদিগকে ইয়েনাংইয়ং হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। তাউংদইঙ্গি এখনও মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর হাতে আছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৫ই এপ্রিল—

২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের ২০শে এপ্রিল হইতে দমদম গ্রামোফোন ফ্যাক্টরীর ধার হইতে গৌরীপুরে বেলঘরিয়া রোড ও যশোহর রোডের জংশন পর্যন্ত যশোহর রোডের যে অংশ বিস্তৃত তাহাতে সামরিক, এ আর পি সংক্রান্ত এবং জনরক্ষা সম্বন্ধীয় ও পুলিশের গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি চলাচল করিতে পারিবে না।

বাঙলার কৃষকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বৎসর বাঙলা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাঙলা দেশের লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে। সেইজন্য এ বৎসর প্রত্যেক কৃষকের ধানের চাষ খুবই বাড়ানো দরকার।

নিঃ ভাঃ ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার, দিল্লী ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী সর্দার প্রীতম সিংহ এবং এই দলের অপর দুইজন কর্মী ভারতরক্ষা বিধানবলে প্রায় ২০ দিন আটক থাকার পর দিল্লীতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৬ই এপ্রিল—

বাধ্যতামূলকভাবে লোকাপসরণ সম্পর্কে বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর গতকল্য এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে স্থানত্যাগকারী অধিবাসীদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পূর্বে কতকগুলি এলাকায় যেরূপ অল্প সময়ের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে তাহার চেয়ে দীর্ঘ সময়ের নোটিশ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

লোকাপসারণ সম্পর্কে জনসাধারণের দুর্গতি লাঘবের নিমিত্ত গভর্নমেণ্ট যে সব ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছেঃ—যে সকল ব্যক্তি স্থানত্যাগ করিবেন, তাঁহাদিগকে সামরিক সাহায্য দিবার নিমিত্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। যেখানে সম্ভব অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেখানে থাকিয়া তাঁহারা স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের সুযোগ পাইবেন। খাসমহালে, জমিদারীতে অথবা অন্য কোথায়ও জমি সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত স্থানত্যাগকারীদিগকে নিম্নোক্তভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবেঃ—স্থানান্তরে যাইবার ব্যয়, নূতন গৃহ নির্মাণের ব্যয়, সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত জমিতে বার্ষিক উৎপন্ন শস্যের অর্ধপরিমাণ মূল্য প্রতি মাসে দেওয়ার ব্যবস্থা। যথাসম্ভব সত্বর ক্ষতিপূরণ দিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জমি সামরিক বিভাগের হাতে থাকার সময় উহার খাজনা গভর্নমেণ্ট দিবেন।

মাদ্রাজের অধিকাংশ বাজারাদি বন্ধ হইয়া যাইবার পরেও যাঁহারা এখনও মাদ্রাজ শহরে রহিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য যথোচিত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মাদ্রাজের মেয়র এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মাদ্রাজের অধিবাসীদের খাদ্যাভাব দেখা দিবে।

১৭ই এপ্রিল—

নয়াদিল্লীর একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন বন্দর হইতে ৪০ হাজার ভারতীয়কে লইয়া আসা হইয়াছে।

গতকল্য শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এবং নিঃ ভাঃ ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুত দেবেন দে'র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক অদেশ জারী করা হইয়াছে।

যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কোচিন গভর্নমেণ্ট ত্রিচুড় সরকারী দপ্তরখানা স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৮ই এপ্রিল—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মণিপুর যাইবার পথে অদ্য প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছেন। পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় অবস্থানকালে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা ও নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্য শ্রীযুত অচ্যুত পট্টবর্ধন যারবেদা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৯শে এপ্রিল—

কলিকাতায় "অমৃতবাজার পত্রিকার" কার্যালয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসঙ্ঘ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এক প্রীতি-সম্মেলনে সম্বর্ধিত করেন। "আনন্দবাজার পত্রিকার" সম্পাদক ও সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কর্তব্য নির্দেশ করেন।

'ইউনাইটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গত ৯ই এপ্রিল হইতে মারকায় জ্বরে ভুগিতেছেন।

২০শে এপ্রিল—

বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী এই মর্মে আদেশ জারি করিয়াছেন যে, কলিকাতায় ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলসমূহের যে সমস্ত দোকানে চাউল, গম, আটা, ময়দা, ডাল, সরিষা তৈল, লবণ, কয়লা এবং দিয়াশলাই পাইকারী বা খুচরা বিক্রয় হয়, অথবা যে সমস্ত দোকানে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মালজাত হইয়া থাকে সেই সমস্ত দোকান বা গুদাম বিমানাক্রমণের পর নিরাপত্তাসূচক ধ্বনি করা হইলে, তাহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুলিতে হইবে। নতুবা পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণকর্তা অথবা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোন কর্মচারী বলপূর্বক এই সমস্ত দোকান বা গুদাম খুলিয়া দিতে পারেন। অপর এক আদেশে বলা হইয়াছে যে, কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন এইরূপ কোন অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কলিকাতা এবং উল্লিখিত শিল্পাঞ্চল হইতে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার যানবাহনযোগে অন্যত্র সরাইতে পারিবে না।

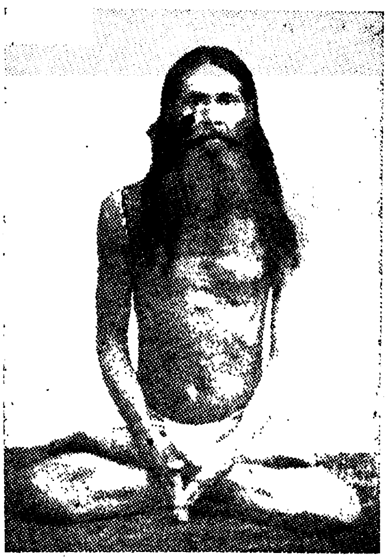
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতা হইতে আসাম মেলে গৌহাটী যাত্রা করেন।

২১শে এপ্রিল—

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ডাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মজুদ রাখিবার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উহাতে ২৫ কোটি টাকারও অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বরিশাল ও খুলনা হইতে এইরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি চালান দিবার বিধি-ব্যবস্থা করার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসারও নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমাদের প্রয়োজন কিসের

আপনারা, আপনাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন পাণ্ডে মহাশয় আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু ব'লেছেন। বাস্তবিক কথা বলতে গেলে, আমি ঐ সব প্রশংসাবাদ পাবার সম্পূর্ণই অযোগ্য। দোষ আপনাদের নেই। প্রধানত স্নেহের লক্ষণই এই যে দোষকে ঢেকে ফেলে গুণকেই সে দেখায় এবং মহতের অনেকগুণ সত্ত্বেও এই একটি দোষ তাঁহাদের সকলের মধ্যেই থাকে যে তাঁরা দোষ দেখেন না, কেবল গুণই দেখেন। তারপর খবরের কাগজের কল্যাণে এখন অনেকেই অনেক কিছু হ'তে পারেন, খবরের কাগজের সঙ্গে যাঁদের সংস্রব আছে তাঁদের তো কথাই নেই। আমার অযোগ্যতা আমি নিজে বুঝতে পাচ্ছি এবং তা বোঝার ফলে আপনাদের স্নেহের প্রগাঢ়তাও উপলব্ধি হচ্ছে, এতে আমি অভিভূত হ'য়েছি। কিন্তু এ সব প্রশংসা স্তুতির মূল্য কি, অন্তরে যদি বল'ই না পাওয়া গেল, দুর্বলতায় যদি আচ্ছন্নই থাকি, গাছের পাতা পড়লে জাপানীদের বোমা পড়লো মনে ক'রে বুক যদি কাঁপেই, তবে এমন শঙ্কাময় জীবনে এই সব প্রশংসাবাদে প্রাণ তো আস্বস্তি পায় না। অথচ চাই সেই একান্ত আস্বস্তি, চাই নির্ভয়তা—চাই মনুষ্যত্ব। সেই পথে আমরা কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি সেইটিই আজ ভাবনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সত্যই কি মানুষের মত জীবন ধারণ করে থাকি? না পোকা মাকড়ের মত আমাদের জীবন? আপনাদের কি সুন্দর এই দেশ, কত আনন্দ হয়, এ দেশ দেখলে। প্রকৃতির অসম্ভূত সৌন্দর্য এখানে উন্মুক্ত; কিন্তু প্রকৃতির সেই মধুময় ছন্দের সঙ্গে মানুষের চেতনার সংযোগ ঘটবার অবসর এদেশে আছে কতটুকু? এক বেলা পেট ভরিয়া অন্ন জুটে, এমন লোকের সংখ্যা এখানে আঙুলে গুণে দেওয়া শক্ত হবে না। অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে এরা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু তবুও এদের মুখে হাসি ধরে না, কিন্তু সে হাসির জড়তার গভীরতা কতই মর্মন্তুদ। আমরা মানুষ হ'য়েও মানবাত্মার এই পীড়নে পরিতপ্ত হচ্ছি কতখানি। কত রূপ,—পথে আসতে আসতে দেখি কত ছবি, সাঁওতাল মেয়েরা হাত ধ'রে ধ'রে নাচছে, আর সাঁওতাল যুবকেরা দল বেঁধে বেঁধে বাজাচ্ছে বাঁশের বাঁশী, এদের সারা দেহে সরলতার ছন্দ যেন বেজে উঠছে, তাতে প্রাণে জাগে সরসতা। কিন্তু বাইরের এমন ব্যঞ্জনায় মন তো বল পায় না, বস্তুর ক্লিষ্ট রূপ তো চাপা পড়ে না—অনুধ্যানে বেদনায় অন্তরে একেবারে গুমরে উঠে। এদের আমর আপনার ক'রে নিতে পেরেছি কতটুকু? যদি তাই পারতুম, তবে এদের সেবাও আমাদের মধ্যে সত্য হ'ত—এদের জন্যে ব্যথাও আমাদের মধ্যে নিত্য হ'ত। আমরা খেয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম না ওদের নিরন্ন রেখে। কাঁদতুম এদের জন্যে, জ্বলতুম এদের জন্যে। মনুষ্যত্বের সেই তো নিরিখ, মানুষের সুখের সংস্থিতি তো পরের সেবায় আত্মনিবেদনে সেই একান্ততারই উপর। যার ভিতর এ জন্য তাপ জাগে নাই, যজ্ঞের প্রবৃত্তি উন্মেষ হয় নাই, সে পশু এবং সহস্র প্রশংসাস্তুতিতেও সে একান্ত পরাভবকে অতিক্রম করে উঠতে পারে না। সেবার ভিতর দিয়েই মানুষ তার আত্মাকে পায় এবং আত্মাকে পাওয়ার মধ্যেই তার সত্যকার শক্তি এবং আস্বস্তি। এদেশের আধ্যাত্মিকতার ইহাই মুখ্য কথা। আজ আমরা যাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষ্য ক'রে এখানে সমবেত হয়েছি, তিনি আত্মনিষ্ঠিত সেই অকুতোভয়তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন। তিনি লাভ করেছিলেন অনপেক্ষতা; দৈন্যকে অতিক্রম করে তিনি কাম রাগ বিবর্জিত যে বল, সেই বলের পরিচয় দিয়েছিলেন; পশু শক্তিকে পরাভব মানতে হয়েছিল তাঁর সেই বলের কাছে। কেশবানন্দ মহাভারতীর জীবন বল এবং বীর্যময় জীবন। তিনি যোগী ছিলেন, কিন্তু যোগ সাধনার জন্য তাঁকে জঙ্গলে যেতে হয়নি, স্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতার বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে এদেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং লাঞ্ছিতের সেবার ভিতর দিয়ে তিনি অখণ্ডিত আনন্দ সত্তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছিলেন। তাঁর নিগূঢ় আধ্যাত্ম জীবনের কথা বলবার শক্তি আমার নেই। রাজনীতিক এবং সমাজ সংস্কারক কর্মী স্বরূপেই তাঁহার মহিমায় আমরা আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম। এখন বুঝতে পাচ্ছি, তার সেই কর্মময় জীবনের পিছনে ছিল কত বড় ধর্মবল, কতটা নিস্পৃহতা এবং অনাসক্তি। অনাসক্ত সেই চিত্তের সত্ত্ব-সংশুদ্ধির বলে তিনি কতটা দূরদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, আজ তা কিছু অনুমান করতে পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আজকাল আমরা রাজনীতিক এবং সমাজ-সংস্কারমূলক যত রকমের আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি, স্বামী কেশবানন্দ এবং তাঁর সহকর্মিগণ বহুদিন পূর্বেই বাঙলার এক নিভৃত পল্লীতে বসে সে সবের উদ্বোধন করেছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য তাঁর প্রচারকার্য দেখেছি, দেখেছি হিন্দু সংগঠনের জন্য তাঁর সাধনার শক্তি, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষার প্রচার, জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ গঠন—কোন দিকই তাঁরা পরিত্যাগ করেননি। এদেশের ধর্ম বলতে এই জিনিসটাকেই বুঝায়, ধর্ম কেবল স্বর্গে গিয়ে উপভোগ করবার বস্তু নয়; সে ভরসা অন্তরে নিয়ে ধর্ম যদি আমরা করতে বসি আমরা প্রতারিত এবং বিড়ম্বিতই হব বেশি। এ দেশের ঋষিদের বাণী হ'ল এই যে, ধর্ম জিনিস 'প্রেত্য চ ইহ'। এই পৃথিবীতে এখানকার সংসার এবং



স্বামী কেশবানন্দ

সমাজ জীবনে সে বস্তু যদি বাস্তব না হয়, তবে কোনদিনই তা বাস্তব হতে পারে না। স্বামী কেশবানন্দের জীবনে ভারতের ঋষি-প্রদর্শিত সেই বাণী-ই মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। তিনি ধর্মকে শুধু মানসিক বিলাসিতার মধ্যে নিবদ্ধ রাখেন নি। বাস্তব জীবনে সেই আশ্রয়কে সত্য করে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধি শুধু ভাবাদ্বৈতের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, ক্রিয়াদ্বৈত এবং দ্রব্যাদ্বৈতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সুন্দরকে দেখেছিলেন সকলের মধ্যে এবং সর্বত্র। ভবিষ্যতের বরাতে স্বর্গে গিয়ে উর্বশী, মেনকা রম্ভার নৃত্য দেখবার লোভে যে ধর্ম বিড়ম্বিত করে, তেমন ধর্ম স্বামী কেশবানন্দের ছিল না। তিনি সনাতন ধর্মকে সর্বাঙ্গীনভাবে জীবনের অবলম্বন করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। অনেকেরই মুখে শুনতে পাই—রেখে দিন মশায় ধর্ম, এখন আর ধর্মের দরকার নেই, ধর্ম ঢের হ'য়ে গেছে। এদের

আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নেই; কিন্তু এরা ধর্ম জিনিসটাকে শুধু পরকালের বস্তু বলেই ধরে নিয়েছেন। এদের হয়েছে ভুল। বৈষ্ণব ধর্ম—যে ধর্ম সাধনায় বাঙলার দানের তুলনা নেই, সে ধর্ম তো পরকালকে এক রকম উড়িয়েই দিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম এখানেই উপলব্ধি করতে চেয়েছে ভাগবতী লীলাকে; স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্র সে ধর্ম দেখতে চেয়েছে মধুরকে—সুন্দরের অদীন-লীলার হাস্যকে। এতো অনেক উপরের কথা, 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা'—মানুষের মধ্যেই যারা সে দেবতাকে দেখতে পায় নেই, বিশ্বরূপে পরিব্যাপ্ত, তাঁর আনন্দঘন সত্তাকে উপলব্ধি করবার সামর্থ্য তাঁদের কোথায়? মানুষকে আমরা দ্বেষ করছি, অথচ কথায় কথায় ধর্মের নামে হাপুশ নয়নে কাঁদি, এ আমাদের নিছক ভণ্ডামি; এ মিথ্যাচারের পাপে দেশ জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। মহর্ষি কপিল এ কথাটা ভেঙ্গে বলেছেন। তিনি বলেন, 'সর্বভূতে আত্মারূপে যিনি অবস্থান কোরছেন, তাঁকেই যারা দ্বেষ করে, তারা ধর্মের নামে কাঁদতে পারে, কিন্তু তেমন কেঁদে জয়ী হওয়া যায় না। বাইরে পসার জমানো যায় বটে; কিন্তু ভিতরে ভীরুতা এবং দুর্বলতাই বাড়ে। আমরা পদাবলী কীর্তন শুনলাম, এ শুনে আমরা অনেকেই কাঁদি, কিন্তু আমাদের কান্নার মধ্যে আনন্দপূর্ণ প্রত্যক্ষতার যে অনুভূতি বৈষ্ণব মহাত্মারা পেয়েছিলেন, তা কতটুকু আছে জানি না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে আছে কাম বাসনারই বিকৃতি। সেবার প্রবৃত্তি চিত্তে যেখানে সত্য নয়, সেখানে নিত্য রসের অনুভূতিও আসতে পারে না, লীলার ও স্ফুরণ হওয়া সম্ভব নয়। কাম পরোক্ষ, কাম দুর্বল, প্রেমই প্রত্যক্ষ এবং সেজন্যই বল। যেখানে ভেদ দৃষ্টি, সেখানেই রয়েছে ব্যষ্টি-অহঙ্কারের বিজৃম্ভন বা অপ্রত্যক্ষতার অসহায়ত্ব। মনুষ্যত্ব পেতে হলে আগে সহায়বান্ হতে হবে। যিনি নিত্যসহায়, দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবচ্ছেদের স্তরকে অতিক্রম করে আত্মলগ্ন সেই পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে; তবেই রস, তবেই জীবন, নইলে সব আভাস মাত্র। এখন আছে, তখন নেই; তবেই অস্থির এবং অভাবের অবস্থা। এ অবস্থায় আত্যন্তিক লাভ নেই, কেবল গ্লানিরই ব্যাপার। মৃত্যুর দিকেই জীবনের গতি। বাইরে ঢাকে ঢোলে বাতির বড়াই করলে কি হবে, ভেতরে জুড়ে রইল যদি অহংকার, কেবল ভয় আর সংশয়। নিরাপত্তা কোথায় বাইরে এমন উপচারে এবং আশ্রয়ের পাকা কোঠায় আশ্রয় নেই, ক্যাশ বাক্সে আশ্রয় নেই, তাড়াধরা নোটেও আশ্রয় নেই। অখণ্ডিত সত্যের সঙ্গে সংযোগই শক্তি। এ শক্তি জীবনে পেয়েছি কি খুঁজে? আজ সেই হিসেব নিকেশটা করতে হবে। আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে নিজেদের এই দিককার ত্রুটিকে স্বীকার করতে হবে এবং ধর্মের নামে আমাদের কথায় কথায় কাঁদাকাটির প্রকৃত মূল্যও নিরূপণ করতে হবে। রূপ গোস্বামী পাদের উক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে যে, আমাদের কাঁদা কাটিতে স্বত্ত্বের আভাসও নাই। এ সব কম্প, অশ্রু, পুলক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কারজনিত দুর্বলতার জন্যে। বাঙলার বৈষ্ণব সাধক বলেছেন,—"সেই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি, সেই ধর্ম ধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।"

এই যে বৈষ্ণব মহাজনোক্ত সবারে প্রণতি, এর রীতি কি, কি এর তাৎপর্য স্বামী কেশবানন্দের জীবনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এ দেশের দীন দরিদ্রের ভিতর, দেহ প্রাণ, মন যাঁকে দেখলে প্রণতির ছন্দ লাভে স্পন্দিত হয়ে উঠে, তিনি তাঁকে দেখে-ছিলেন; এবং প্রত্যক্ষ প্রণতির সেই শক্তিতে তিনি নীলকরদের অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের তিনি জয় ঘোষণা করেছিলেন সেই প্রণতিরই বলে। এই প্রণতিই সকল প্রগতির পথ। প্রগতি আমিও চাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, বিদেশীর রাজনীতিক সূত্র মন্ত্র করার মধ্যে প্রগতি নেই, প্রগতির সকল শক্তি নিহিত রয়েছে, এ দেশের নরনারীর চরণে প্রণতির ছন্দটি প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে তোলার মধ্যে। প্রেম সংশয় বা সন্দেহকে স্বীকার করে না, এই জন্যই প্রেমের বল সকল বলের উপরে; কিন্তু সন্দেহ বা সংশয় কখনই দূর হ'তে পারে না, আত্মোপলব্ধি ছাড়া। প্রেম কর বললেই প্রেম করা যায় না, ভালবাসা তখনই সত্য হয়, যখন আপনার প্রিয়কে দর্শন করি এবং সেই প্রত্যক্ষতাই কর্মের প্রেরণার মূলে থাকে। জাতি বর্ণ, ধর্ম এই সব উপাধিকে অতিক্রম করে, এ দেশের নরনারীর মধ্যে যদি আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তবেই আমাদের পার্থিব জীবনের যত দৈন্য দূর হ'তে পারে, পরের অনুগ্রহে আমরা কিছুতেই নিগ্রহ থেকে নিস্তার পাবো না। সকল দিক হইতে নিরপেক্ষ এই শক্তি লাভই এই দেশের আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য; অন্য সবই কথার কচকচি মাত্র। স্বামী কেশবানন্দের স্মৃতিপূজার ভিতর দিয়ে ত্যাগময় জীবনের এই অনপেক্ষতাই আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে উঠুক। দেশের জন্য, জাতির জন্য আমাদের মধ্যে তাপ জাগুক। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব হ'ল এদিকের। বৈষ্ণব মনে ক'রে আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝবেন না; দেশের স্বাধীনতা এবং জাতির স্বাধীনতা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কাম্য। কারণ, আমি জানি, এ দেশের অধীনতার মূলে মানবাত্মার যে নিপীড়ন এবং গ্লানি রয়েছে, যদি তা' থেকে মুক্ত হবার জন্য বেদনা-বোধই আমার অন্তরে না জাগে, যদি সেদিকে থাকে আমার উপেক্ষা, তবে আমার পক্ষে বৈষ্ণব সাধনার কথা বলা বৃথা। দেশের লোকের জন্যেই যার প্রেম নেই, তার আবার বিশ্বপ্রেম—সে চায় আবার শুদ্ধ প্রেম, যার এক বিন্দু জগৎ ডুবায়? স্বামী কেশবানন্দ যোগী ছিলেন। যোগী বলতে অখিলাত্মার সঙ্গেই যোগ বুঝায় এবং আত্মনিবেদনের সেই ঊর্ধ স্তরে সাধকের নিজের পক্ষে সত্য হয় শুধু ভক্তি এবং সেই ভক্তিই জ্ঞান ও কর্মের ধারা অবলম্বন করে পার্থিব সেবার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হ'য়ে থাকে। ভক্তি যেখানে থাকবে, জ্ঞান এবং কর্ম সেখানে থাকবেই। অনুপলব্ধির ক্ষেত্রে একই সত্য তিন ধারায় বিচ্ছিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। অহংকারকে আশ্রয় ক'রে কর্ম বেশী দূরে এগুতে পারে না—প্রতিকূলতার প্রথম আঘাতেই তা ভেঙ্গে পড়ে এবং যে পথে এই ব্যক্তি-অহংকারের গণ্ডি অতিক্রম করে চিত্ত সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়, তা-ই আধ্যাত্মিকতা। আমাদের সব উন্নতি নির্ভর করছে এর উপর। ধর্ম, এই কথায় কাহারো আপত্তি থাকে তিনি সে কথাটা ব্যবহার না করিতে পারেন, কিন্তু চাই এই জিনিসটি। স্বামী কেশবানন্দের আদর্শ আমাদের স্ব-প্রতিষ্ঠার সেই পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ইই জীবনও আমাদের সুন্দর হবে তাতে। আপনাদের কাছে এই শুধু আমার নিবেদন, আপনারা আমার প্রতি যে স্নেহ দেখালেন, এতে আমার আশা হচ্ছে—আমার মত অন্য যারা সামান্য ব্যক্তি, তাদের মধ্যেও আপনাদের এই স্নেহ সম্প্রসারিত হ'বে। বাঙলার প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের অবদানের পরম আপ্যায়নে অবসন্ন জাতির মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার হোক। মূর্খের মধ্যে, অবজ্ঞাতের মধ্যে, দরিদ্রের মধ্যে, উপেক্ষিতের মধ্যে আমাদের আত্মবোধ বিস্তৃত হোক, তবেই আমরা বলিষ্ঠ হ'তে পারবো। এ জগতে দুর্বলের কোন স্থান নেই, দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় পাপ, এই দুর্বলতা কেটে আমাদের উঠতে হবে এবং সেজন্য প্রথম প্রয়োজন প্রেমের। সেই প্রেমের ঠাকুরের পায়ে আমাদের প্রণতি সার্থক হোক। *

---

*সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত নুনিহাটে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

৯ম বর্ষ—'দেশ'

১৩শ সংখ্যা হইতে ২৪শ সংখ্যা পর্যন্ত



দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 2nd. May, 1942 [২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শেষ কোথায়—

ভারত সচিব আমেরী সাহেব সেদিন বারমিংহামের এক সভায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, অতীতে আমরা ভারতের জন্য যাহা করিয়াছি, সেজন্য গর্ববোধ করিতে পারি; কিন্তু সেখানেই ভারত সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্যের শেষ হয় নাই। আমাদের কার্যগুলিকে আমরা ভারতবাসীদের স্বায়ত্তশাসন লাভের পথে অগ্রসর হইবার সোপান মাত্র মনে করি। বহুদিন হইতে ভারত সেই সোপানমার্গ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিকতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যেই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস সেখানে গমন করেন। ভারতের শাসনতন্ত্র বর্তমানে যেভাবে গঠিত, সেই গঠনানুরূপ শাসনতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি ভারতের রাজনীতিক নেতাদিগকে নিজেদের ভিতরকার ভেদ বিভেদ বিস্মৃত হইয়া অগ্রসর হইতে আমন্ত্রণ করেন। ভারত সচিবের উক্তির ভিতর প্যাঁচ কোথায় রহিয়াছে, সকলেরই দৃষ্টিতে পড়িবে। 'বর্তমান গঠনানুরূপ' শাসনতন্ত্র এই কথার আড়াল দিয়া, তিনি ভারতের জাতীয়বাদীদের দাবীকে প্রতিহত করিবার পক্ষে একটা যৌক্তিকতা খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসও এখানে আসিয়া এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইতে হইলে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে হয়; কিন্তু বর্তমান সময়ে উহা সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। যুদ্ধের যে জরুরী অবস্থার যুক্তি দেখাইয়া ইঁহারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংস্কারসাধন অসম্ভব বলিতেছেন, যুদ্ধের সেই জরুরী প্রয়োজনের জন্যই ইচ্ছা থাকিলে ভারতবাসীর হাতে দেশরক্ষার অধিকার প্রদান করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। ইঁহাদের মতলব হইল যে, ইঁহারা ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতির পথে বৎসরের পর বৎসর কেবল সিঁড়িই গড়িতে থাকিবেন; কিন্তু সে সিঁড়ি গঠনের কাজ কবে শেষ হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এমন অক্লান্ত উদ্যম দেখিয়া আমরা ভারতবাসী আমাদের মনেও ক্লেশ হয়। আমরা অযোগ্য, যোগ্যতা আমাদের কতদিনে জন্মিবে জানি না। যোগ্যতা জন্মিবার মত বস্তু যদি আমাদের ভিতর থাকিত, তবে দেড়শত বৎসরকাল এমন উপযুক্ত অভিভাবকদের শিক্ষানবীশীতে থাকিয়া নিশ্চয়ই আমাদের অযোগ্যতা দূর হইত এবং অসহায়ত্ব ঘুচিত। তাহা যখন ঘটিল না তখন অহেতুক আমরা ইঁহাদিগকে আর কতদিন খাটাইব?

আত্মঘাতী নীতি—

কথায় আছে—"মিন মিন করে, কাণসাড়া নাড়ে, সেই বাঘেতেই মানুষ মারে।" শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর কূটবুদ্ধি রাজনীতিক বলিয়া খ্যাতি আছে। তাঁহার বুদ্ধি পাকে পাকে ঘুরে। এতদিন তাঁহার কূটবুদ্ধির প্রক্রিয়া চাপা আকারে চলিতেছিল। সম্প্রতি মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের দ্বারা পরিগৃহীত প্রস্তাবের আকারে উহা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রস্তাবের মর্ম এই যে, মোসলেম লীগ যখন পাকিস্থানী দাবী স্বীকার করিয়া না লইলে 'ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টে' যোগদান করিবে না, তখন আর বাদানুবাদ না করিয়া সরাসরি পাকিস্থানী দাবী কংগ্রেসের তরফ হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী স্বয়ং, সুতরাং অনুপ্রেরণা তাঁহারই বুঝিতে হইবে। কোথায় ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট, কে দিতেছে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট তাহার হদিস নাই; অথচ আচারী মহাশয় মোসলেম লীগের মনস্তুষ্টির জন্য পাকিস্থানী প্রস্তাবের সঙ্গে প্রেমবন্ধন বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহাকেই বলে বিপরীত বুদ্ধি। আমরা জানি, কংগ্রেস এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মহাশয় যতই মহাত্মা গান্ধীর মনের মানুষ হউন, সমগ্র হিন্দু ভারত এমন প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিবে; শুধু হিন্দু কেন, অখণ্ড ভারতের জাতীয়তার জন্য যাঁহারা সাধনা করিতেছেন তাঁহারা এমন আত্মঘাতী প্রস্তাবের কিছুতেই প্রশ্রয়

দান করিবেন না। এমন প্রস্তাব কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী—ভারতের জাতীয়তার বিরোধী এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতের চিরন্তন পরাধীনতারই সহায়ক। ভ্রান্ত ন্যাশন্যাল গভর্নমেণ্টের মোহে—সস্তায় নিজেদের সুবিধা করিবার উৎকট আগ্রহে যাঁহারা এমন উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নিঃসংশয়িতভাবে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করাই কংগ্রেসের আদর্শের দিক হইতে সর্বপ্রথমে কর্তব্য হইবে। আমরা আশা করি, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে জাতির প্রতিনিধিগণ এমন বুদ্ধি বিপর্যয় হইতে দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করিবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একজন সভ্য হইয়া যে আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টস্বরূপে তিনি এ সম্বন্ধে যথাকর্তব্য দৃঢ়তার সহিত পালন করিবেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী সুস্পষ্টভাবেই কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। ব্যক্তি যতই বড় হউক না কেন, জাতির আদর্শকে লঙ্ঘন করিবার অধিকার তাহার নাই। এমন দুর্বুদ্ধি দমিত হওয়াই দরকার।

রাজাজীর প্রস্তাবে জওহরলাল—

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মাদ্রাজ পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের সভায় যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষুন্ন করিবার জন্য কূটচক্রই অবলম্বিত হইয়াছে, কংগ্রেসের নির্দেশিত কোন বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ এক কথা এবং কংগ্রেসেরই একজন দায়িত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা হইয়া তাহার মৌলিক আদর্শকে হীন করিবার উদ্যম অন্য কথা। আদর্শ বিরোধী এত বড় অনিষ্টকর উদ্যম কংগ্রেসের নাম লইয়া ইতিপূর্বে অন্য কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। কংগ্রেসের আদর্শ যাহাতে ক্ষুন্ন না হয়, তৎসম্পর্কিত কর্তব্য পালনের ভার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের উপর রহিয়াছে এবং ইহা বলাই বাহুল্য যে, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর কার্য প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার দিক হইতেও দণ্ডার্হ। রাজাজীর উদ্যমের দৌড় কতদূর পর্যন্ত গড়াইবে আমরা জানি না; তবে তিনি সূক্ষ্মভাবে চলেন, সহজে নিরস্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার উদ্যম এখনকার আকারে না চলিলেও তিনি অন্যভাবে উহা খাটাইতে চেষ্টা করিবেন; সুতরাং তাঁহার উদ্যম সমূলে উৎখাত করাই কর্তব্য। শুনিতেছি, এই ব্যাপার লইয়া তিনি নাকি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন; আমাদের মতে কংগ্রেসের মূল আদর্শের ক্ষেত্রে যখন তাঁহার মতভেদ, তখন কংগ্রেসের সম্পর্ক ছাড়িয়া কাজটা করাই তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও রাজাজীর কার্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে কোন সময়েই এরূপ কাজ নিন্দনীয় হউক; কিন্তু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের প্রাক্কালে এমন কাজ অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছে। আমরা আশা করি, রাজাজী যে অপরাধ করিয়াছেন, মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুতার জন্য তিনি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের কৈফিয়ৎ—

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতে তাঁহার দৌত্যের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তথাকার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তাঁহার তিনটি উক্তি বিশেষভাবে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমত, তিনি বলিয়াছেন, ভারতের সমস্যাটা সহজ নয়। তিনি বাস্তবভাবে উহার সমাধান করিতে চান, তিনি বুঝিতে পারেন যে, সমস্যাটি কত কঠিন। তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি হইল এই যে, বর্তমান সময়টা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে শুভ সময় নহে। তাঁহার তৃতীয় উক্তির সুর সেই চিরপুরাতন, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মামুলি সুর। তিনি বলেন, এবার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে ভারতবাসীদের নিজেদের। স্যার স্ট্যাফোর্ডের এই তিন উক্তির কোনটির যুক্তিবত্তাই আমরা সরলভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। স্যার স্ট্যাফোর্ড ভারতীয় সমস্যার সমাধান যেরূপ কঠিন বলিয়া তাঁহার সাম্প্রতিক দৌত্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন, আমরা সে সমস্যা তেমন কঠিন মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদীসুলভ স্বার্থসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দোষেই উহা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; তখন যুক্তিবুদ্ধি নানা পাকচক্রের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থকে ব্যাহত করে। ইহার ফলে যে পথ সর্ব দেশ এবং জাতির পক্ষে সোজা, ভারতের পক্ষে সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিবার প্রচেষ্টার মধ্যে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের ধুয়া এবং ভারতের বিভিন্ন দলের সর্বজনীনভাবে মতের ঐক্য—এইসব অছিলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের ব্যাপারে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিতে চাহেন, ভারতীয় সমস্যার জটিলতার মূলে ইহাই সর্বপ্রধান কারণ। স্যার স্ট্যাফোর্ডের দ্বিতীয় যুক্তি আরও দুর্বল। বর্তমান সময় ভারতীয় সমস্যা সমাধানের প্রতিকূল তো নহেই, বরং এই সময়ই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ভারতের সকল দলের স্বার্থ আজ বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কায় এক পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলের পক্ষে এই যে সঙ্কটকাল, এমন সঙ্কটকালেই জাতীয়তার শক্তি সংহত হইয়া উঠিয়া থাকে এবং সেই ভাবই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক হইতে পারে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের তৃতীয় উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার যে উদার ধারণা ছিল, এখন আর তাহা নাই। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি স্পষ্টভাষাতেই এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের, ভারতীয় নেতাদের নয় এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ

গভর্নমেণ্টকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। আজ তিনি ঠিক ইহার উল্‌টা সুর ধরিয়াছেন। এই ধরণের উক্তিতে সমস্যার কোনই সমাধান হয় না। কংগ্রেস এবং মুশ্‌লীম লীগ যতদিন পর্যন্ত নিজেদের ভিতরকার অনৈক্যের মীমাংসা করিতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিছুতেই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আগস্ট মাসের ঘোষণাকে অতিক্রম করিয়া এক চুলও আগাইবে না,—তাঁহাদের মুখে এই কথাই আমরা শুনিতেছিলাম; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকেই উদ্যোগী হইয়া স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে দৌত্যের ভার দিয়া ভারতে পাঠাইতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই উদ্যোগের পক্ষে তাঁহাদের এতাবৎকালের অবলম্বিত নীতি হইতে একটা বিশিষ্টতা ছিল এবং সে বৈশিষ্ট্য ভারতবাসীদের মনের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার না করিয়াছিল, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মতিগতির জন্যই তাহা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। অতীতের ভ্রান্তিকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা যদি ভারতবাসীদের উপর দেশ শাসনের অধিকার ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে এখনও সুফল ফলিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা যদি সাম্রাজ্যবাদসুলভ সংস্কার বশে চালিত হন, তবে স্যার স্ট্যাফোর্ড তাঁহার দৌত্যের যেটুকু ফল ফলিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও নষ্ট হইবে এবং তাহার ফল ব্রিটিশ জাতির স্বার্থেরও অনুকূল হইবে না।

বৈষম্য নীতির উৎকর্ষতা—

ভারতবাসীদের সম্পর্কে সিভিলিয়ানী মতিগতি অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনও যে তাহার পরিবর্তন ঘটে নাই, ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতি হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন,—ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের ভারতে আসিবার পথের ব্যাপারে সাদা পথ এবং কালা পথ বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সাদা পথ এই নামটি বোধ হয় ঠিক নয়; কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতীক প্যাণ্টুলান পরা থাকিলে যাঁহাদের গায়ের চামড়া কালো তাহাদিগকেও এই পথ দিয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি। প্যাণ্টুলান পরা একজন ভদ্রলোককে মোটর বাসে যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়; কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাঁহার স্ত্রী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি মহা অসুবিধায় পড়েন। পণ্ডিতজী জানাইয়াছেন যে, আজকাল ধুতি এবং শাড়ী পরা ভারতবাসীদিগকেও এই পথ দিয়া আসিতে দেওয়া হইতেছে। পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে আমরা আস্বস্তি লাভ করিলেও আমাদের জাতীয় পোষাকের প্রতি মর্যাদাহীনতার বুদ্ধি যে এখনও শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানী মহলে কার্য করিতেছে, সে পরিচয় আমরা পাইতেছি এবং ইহাই বুঝিতেছি যে, জনমতের চাপ না পড়িলে এই বুদ্ধি এখনও শাসন কার্যে প্রাধান্য লাভই করিয়া থাকে। আমাদের অন্তরে ইহা বিক্ষোভেরই কারণ সৃষ্টি করিবে। শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের মনের এই সংস্কার এতদিনে ঘুচিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। ভারতবাসীদের জাতীয় পরিচ্ছদের সম্বন্ধে তাঁহারা মর্যাদাবুদ্ধিহীন হন, আমরা ইহা দেখিতে চাই না। সাহেবী পোষাকের জোরে নিজেদের মর্যাদা বাড়াইবার দৈন্য আমাদের মধ্যে এখনও রহিয়াছে ইহাও লজ্জার বিষয়। এমনভাবে সভ্য বনিবার বাতিকে আমাদের অসহায়ত্বই বৃদ্ধি পায়। জাতির বিপুল জনসাধারণের প্রতি মমত্বহীন হইয়া আমরা মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বের স্তরেই নিজদিগকে অবনমিত করিতেছি।

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি—

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন কয়েকদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইবে। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রতি ভারতবর্ষের যেরূপ মনোভাব ধারণ করা কর্তব্য আগামী অধিবেশনে ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমাদের মতে এ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহ বা সংশয়ের কোন অবসর নাই। ভারতবাসীরা নিজেদের দেশের স্বাধীনতাই কামনা করে। সুতরাং ভারতবর্ষ দখল করিবার জন্য কোন শক্তি চেষ্টা করিলে তাহাকে বাধাদান করাই ভারতবাসীদের কর্তব্য হইবে; কিন্তু সমস্যা হইতেছে সেই কর্তব্য কোন্ উপায়ে পালন করা সম্ভব, ইহা লইয়া। ভারতবাসীরা যদি স্বাধীন থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে কোন সমস্যা থাকিত না; কিন্তু ভারতের সমর বিভাগে ভারতবাসীদের কর্তৃত্ব নাই; অধিকন্তু ভারতবাসীরা নিরস্ত্র; সুতরাং রুশিয়া এবং চীনের মত গরিলা বাহিনী গঠন করিয়া ভারতের বিপুল জনসাধারণ—নরনারী সকলে যে আক্রমণকারীদিগের সম্মুখীন হইবে, এমন সুযোগও তাহাদের পক্ষে নাই। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্যের পথে ভারতবাসীদের পক্ষে সর্বজনীনভাবে দেশরক্ষা পন্থা আবিষ্কৃত হইবে, অনেকে এমন আশা করিতেছিলেন এবং অনেকের ধারণা এই ছিল যে, দেশরক্ষা করিবার কর্তৃত্ব ভারতবাসীদিগকে দেওয়া হইবে; কিন্তু সে আশা সার্থক হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা চলে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের উপস্থাপিত সে প্রস্তাবে—'আমাদের দেশরক্ষা সচিবকে মনোহারী দোকান, সৈন্যদের জন্য খাবারের দোকান প্রভৃতি চালাইবার গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করিবার কথা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।' কিন্তু ভারতের নেতারা বুঝিয়াছেন যে, সমস্যা ইহাতে মিটে না। ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষার দায়িত্ব পূর্ণভাবে দিলেই সমগ্র ভারতের সমরোদ্যমে আন্তরিক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে, নতুবা নিজেরা কিছু নরম হইয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেও কার্যকরভাবে বাস্তব উদ্যম বা উৎসাহ দেশে জাগে না। কিন্তু অবস্থা এরূপ হইলেও আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার উপায় নাই। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি এ বিষয়ে দেশবাসীকে কি নির্দেশ দান করেন, তাহা সকলেরই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া আছে।

ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের সমস্যা—

ভারত গভর্নমেণ্টের বহির্ভারতীয় ব্যাপারের কর্তা হিসাবে বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত আনে আসাম এবং মণিপুর পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তিনি ভারতে আসিয়া ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের সমস্যা সম্বন্ধে একটি বিবৃতিও প্রদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতি সরকারী পরিভাষাগত সঙ্কোচে খুব সুস্পষ্ট নহে। তিনি ইম্ফল বা মণিপুর হইতে মাত্র ১৩ মাইল আগাইয়া যান, আরও কিছুদূর আগাইয়া যাইবার পক্ষে তাঁহার কি বাধা ছিল, আমরা জানি না, অথচ তাহাই প্রয়োজন ছিল; কারণ ব্রহ্মের ভিতর এবং ব্রহ্মের কাছাকাছি অঞ্চলে ব্রহ্ম প্রত্যাগতদিগকে দুঃখ দুর্দশা অধিক ভোগ করিতে হইয়াছে এবং এখনও হয়ত হইতেছে। এ সবন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি অধিক সুস্পষ্ট। তিনি ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের মধ্যে ব্রহ্মের নিকটবর্তী অঞ্চলে জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য বিক্ষোভের ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম হইতে ভারতে প্রত্যাগমনের পথের উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন ; কিন্তু এই পথের যে অংশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সেই অংশেরই উন্নতি সাধন করা হইয়াছে এবং এই পথের যে অংশ ব্রহ্মদেশের মধ্যে পড়িয়াছে, সে অংশের অবস্থা এখনও খারাপই আছে। পণ্ডিতজীর এই বিবৃতি হইতে এতৎ-সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ রহিয়াই যাইতেছে এবং শ্রীযুত আনের আশ্বাসে আমরা উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মদেশ হইতে মণিপুর পর্যন্ত পথ কম নয় এবং এই অংশের জন্যই সমস্যা বেশী। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না বরং ব্রহ্মের সঙ্কটে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব বৃদ্ধিই পায়। শুধু ভারত গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত অঞ্চলেই নয়, ব্রহ্মের ভিতরকার পথেও ব্রহ্ম প্রত্যাগত ভারতবাসীদের দুঃখ দুর্দশার যাহাতে লাঘব হয় এবং তাঁহারা নিরুদ্বেগে স্বদেশের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতে পারেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্বতোভাবে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

আমেরিকা ও ভারত—

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দূত কর্ণেল জনসন সেদিন দিল্লী হইতে ভারতবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় ভারতের প্রতি তিনি মার্কিনবাসীদের সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের উদ্দেশ্য ভারতবাসীদের আত্মরক্ষা উদ্যমে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা সাহায্য করা। ভারতে মার্কিনদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিবার কোন মতলব উক্ত মিশনের নাই। মার্কিন টেকনিক্যাল মিশনের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে, ইহা স্বাভাবিক। রজার্স কমিশনের অভিজ্ঞতা এই আশঙ্কাকে বর্ধিত করিয়াছে। কর্ণেল জনসন তাঁহার বক্তৃতায় সে সন্দেহের নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, চীন এবং ভারত-সভ্যতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়, মার্কিনেরা উহাই দেখিতে চায় ; কিন্তু এই যে সদিচ্ছা, ইহা কথার গণ্ডী ছাড়িয়া কাজের পথে কতটা অগ্রসর হইবে, ভারতবাসীদের এই বিষয়ে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং মিঃ চার্চিল উভয়ে মিলিয়া আটলাণ্টিক চুক্তি করিলেন। ভারত আশা করিল, এই চুক্তিগত অধিকার ভারতের পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হইবে ; কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, সে চুক্তি ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ভারতের অভিভাবক হইল ব্রিটিশ জাতি। প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেল্টের ভারতের প্রতি তথাকথিত সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না ; কর্ণেল জনসনও আট-লাণ্টিক চুক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই এবং স্যার স্ট্যাফোর্ডের দৌত্য সম্বন্ধেও তিনি নীরবতা রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। শুধু এই ধরণের সদিচ্ছায় ভারতবাসীরা আর সন্তুষ্ট নয়। ভারতবাসীরা চায় স্বাধীনতা। ভারত-বাসীদের সহযোগিতায় জগতে সভ্যতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই যদি মার্কিন জাতির কাম্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্বাগ্রে ভারতের স্বাধীনতাকে তাঁহাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ; কারণ, তেমন স্বীকৃতির ফলেই অখণ্ড ভারতের আন্তরিক সহানুভূতিশীল সাম্রাজ্যবাদকে সার্থক করিবার পথে সম্যকরূপে জড়িত হওয়া সম্ভব।

সেবাকার্যে জনসাধারণ—

এদেশের বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম-প্রত্যাগতদের জন্য সেবাকার্যের প্রচেষ্টা হওয়া আবশ্যক, আমরা একথা পূর্বেই বলিয়াছিলাম। পণ্ডিত জওহরলালও দেখিতেছি আমাদের সেই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ এই সকল হতভাগ্য আশ্রয়প্রার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য নানাপ্রকার সাহায্য করিতে-ছেন। গভর্নমেণ্ট সুযোগ সুবিধা দিলে এই স্বেচ্ছাকৃত কার্য সহজেই সম্প্রসারিত করা যাইতে পারিত। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান যাহাতে মণিপুর রোড হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের মূল আশ্রয় শিবির পর্যন্ত সর্বত্র সেবাকার্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইহাতে গভর্নমেণ্টের আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বোধগম্য হয় না। ঐরূপ ব্যবস্থায় গভর্নমেণ্টের ভার অনেক লাঘব হইতে পারে। আশ্রয়প্রার্থী স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্যের জন্য ডিব্রুগড়ে দুই একজন বা ততোধিক মহিলা কর্মী থাকা উচিত। ভারতীয়দিগের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য মির্টাকিনায় কতিপয় ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। ভারত গভর্নমেণ্ট ইতিপূর্বে তাঁহাদের একটি বিবৃতিতে শ্বেতাঙ্গ আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবাসীদের সাহায্যের জন্যও এরূপ স্বেচ্ছাকৃত দান যথেষ্টই পাওয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গভর্নমেণ্ট সেরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ঘটনাস্থলে গিয়া সেবাকার্য পরিচালনার ভার তাঁহারা কতটা দিতে প্রস্তুত আছেন, আমরা তাহাও জানি না। শ্রীযুক্ত আনে তাঁহার বিবৃতিতে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। আমাদের মতে গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও দেশবাসীর পক্ষ হইতে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত সেবাকার্য সম্প্রসারিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। এমন কার্যে ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টেরও সাহায্য হইবে; সুতরাং তাঁহাদেরও ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করা উচিত নয়।

গ্রীষ্মকালীন সমরোদ্যম

হিটলারের গ্রীষ্মকালীন সমরোদ্যমের যে হুমকী আমরা তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতা হইতে শুনিতেছিলাম, তাহা কতটা সত্যে পরিণত হইবে এবং সেই উদ্যম কোন্ পথে এবং কি আকারে সম্প্রসারিত হইবে বা হইতে পারে, এই সম্বন্ধে বিভিন্ন সামরিকগণ আলোচনা ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন, এই সমরোদ্যম রুশিয়াকে দখল করিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইবে। রুশিয়ার ভিতর দিয়া ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পরিকল্পনা লইয়া হিটলার কার্য করিতেছিলেন, স্ট্যালিনের রণচাতুর্যে তাহা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ককেশাসের প্রবেশপথে জার্মানবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়। রুশ সেনানী টিমোসিঙ্কো বিপুল জার্মান বাহিনীকে যেভাবে প্রতিহত করেন, থার্মোপলীতে গ্রীক সেনাদের সমর-নৈপুণ্যের চেয়েও তাহা সমধিক ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে তাহার অগ্রগামী বাহিনী সেক্ষেত্রে শত্রু কর্তৃক অর্ধবৃত্ত ব্যূহের আকারে বেষ্টিত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। জার্মানদের লক্ষ্য ককেশাসের তৈলপূর্ণ অঞ্চলের দিকে যে বিশেষভাবে রহিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য; তেলের খাঁকতি বর্তমান যুদ্ধে সব চেয়ে বেশী। তাহা ছাড়া মধ্য প্রাচী দেশের রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির উপর আঘাত করিতে না পারিলে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার সুবিধা নাই। পূর্ব দিকে মিত্রপক্ষের কেন্দ্র ঘাঁটিগুলি বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর সাফল্যও সুনিশ্চিত হইতে পারে না। জার্মানী ইহা বুঝে। জার্মানী জানে যে, রুশিয়াই তাহার পক্ষে প্রধান অন্তরায়; রুশিয়াকে কাবু করিতে না পারিলে অচিরে বলকান এবং পোলাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও রুশপ্রভাব সম্প্রসারিত হইয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে পারে। ইরানের পথে

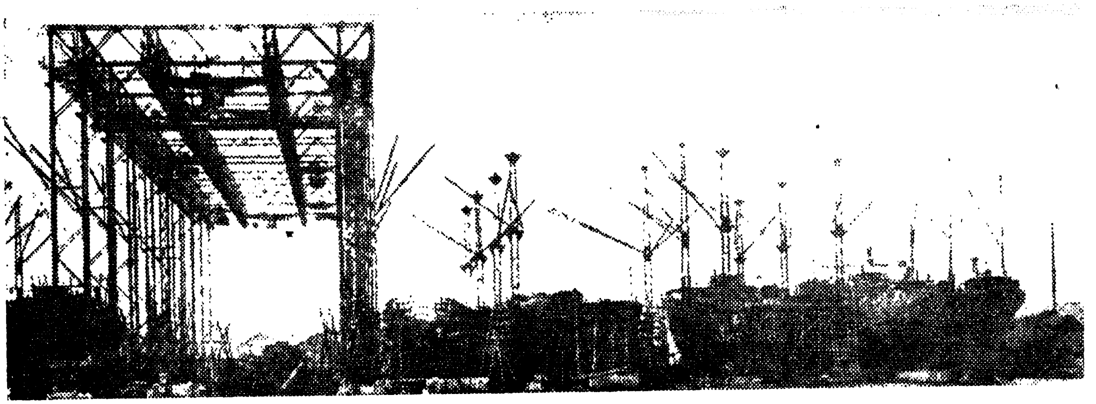


শত্রুপক্ষকে বাধা দানের জন্য করিজেডোরে আমেরিকা বাহিনীর গুপ্ত ঘাঁটি

রুশিয়া জার্মানীকে ঠেকাইয়াছে; শীত পড়িবার মুখে রুশ সেনাদের এই বাধায় জার্মান সেনাদের গতি রুদ্ধ হয়, শীত থাকিতে হিটলার সে বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। রুশিয়ার রণাঙ্গনে বরফ এখনও জমিয়া আছে; ভূমধ্যসাগরের সব দিকে গ্রীষ্ম এখনও পড়ে নাই, তবে গ্রীষ্ম সমাগতপ্রায়। জার্মানী এবার কোন্ দিকে চাপ দিবে—রুশিয়ার উত্তরে না দক্ষিণ দিকে। সুইডেন হইতে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায়, জার্মানেরা রুশিয়ার উত্তর সীমান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করিতেছে এবং ট্যাঙ্ক আনিয়া সমবেত করিতেছে। এই নূতন অভিযানে যে সব ট্যাঙ্ক নিযুক্ত করা হইবে, সেগুলি হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে। রুশিয়ার উত্তর রণাঙ্গনের গুরুত্ব কম নয়; কারণ এই দিকে মুরমানস্ক এবং আর্চেঞ্জেলের পথে বাহির হইতে মিত্রপক্ষ এখনও সাহায্য পাঠাইতে পারেন। জার্মানেরা এই লাইন এখনও ছিন্ন করিতে পারে নাই। এই লাইন ছিন্ন করিতে পারিলে মস্কোর সহিত পেট্রোগ্রাদের সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। মস্কোকে দুর্বল করিতে না পারিলে জার্মানীর পক্ষে রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষভাবে ককেশাসের দিকে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক; কারণ আমেরিকা এবং ইংরেজ রুশিয়াকে সাহায্য করিতেছে, উত্তর মুরমানস্ক এবং আর্চেঞ্জেলের পথের গুরুত্ব যতটা না আছে, দক্ষিণের এই পথের গুরুত্ব আছে তাহার চেয়ে বেশী। এই পথে প্রাচ্যের সমরসম্পদ এবং খাদ্যাদির সাহায্য রুশিয়া পাইতেছে। রুশিয়াকে জব্দ করিতে হইলে এই পথ তাহার পক্ষে বন্ধ করা দরকার। এই নীতিকে কার্যকরী করিবার আনুষঙ্গিক উপায় হইল উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ পক্ষের উপর চাপ দেওয়া এবং যদি সেইভাবে সম্ভব হয় সুয়েজের দিকে আগাইয়া আসা। এই সঙ্গে তুরস্কের নিরপেক্ষতা এক্ষেত্রে একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তুরস্ক নিরপেক্ষ থাকাতে জার্মানীর পক্ষে সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই আছে।. অবস্থার যেরূপ আকার ধারণ করিয়া আছে, তাহাতে এখন তুরস্কের এই নিরপেক্ষতা তাহার পক্ষে অসুবিধাই সৃষ্টি করিতেছে। তুরস্কের নিরপেক্ষতা সে যদি ভঙ্গ করিতে সক্ষম হয়, তবে কাস্পিয়ানের পথে সোজা ইরানের সীমানার দিকে এবং সিরিয়ার উত্তরে আসিয়া পড়িতে পারে। উত্তর আফ্রিকার দিক হইতে জার্মানী যদি অবস্থা গোছাইয়া লইতে পারে এবং অবস্থা তাহার অনুকূল করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তুরস্কের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে সে ইতস্তত করিবে বলিয়া মনে হয় না।

জেনারেল রোমেল যাহাতে আফ্রিকায় সুবিধা করিতে পারেন, সেজন্য জার্মানীর চাতুর্য বহুভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। জেনারেল রোমেল পাকা যোদ্ধা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে; কিন্তু তিনি সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার সৈন্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানী মাল্টার উপর ক্রমাগত বিমান আক্রমণ চালাইতেছে। বর্তমান সংগ্রামে মাল্টা দ্বীপে যত বেশীসংখ্যক বিমান আক্রমণ হইয়াছে, তেমন আর কোন স্থানে হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দিকে জোর দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই হিটলার ভিসি গভর্নমেন্টের ঘাড়ে ভর করিয়াছেন এবং হিটলারের সেই নীতির পরিণতিই ম'সিয়ে লাভালকে ফ্রান্সে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ফ্রান্সে ধ্বংসাবশিষ্ট নৌবহরের সাহায্য তিনি লইতে চাহেন এবং সেই পথে আফ্রিকা এবং স্পেনের দিকে নিজের সুবিধা করিতে চাহেন। ভিসি যদি হিটলারের মুঠার মধ্যে পড়ে, তবে স্পেনও আর দ্বিধার মধ্যে থাকিতে পারিবে না, হিটলারের এই বিশ্বাস এবং উত্তর আফ্রিকার পথে পশ্চিম এসিয়ার দিকে হিটলার যদি সুবিধা করিতে পারেন, তবে তুরস্কও চতুর্দিক

সক্ষম হইবে। জাপানের এই উদ্দেশ্য, প্রাথমিক স্তরে কতকটা সিদ্ধ না হইয়াছিল, এমন কথা বলা চলে না; কিন্তু মার্কিনের সাহায্যশক্তি ততটা সে দুর্বল করিতে সক্ষম হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ার উপর জাপানীদের আক্রমণের বেগ মার্কিনের প্রতিকূলতায় সুস্পষ্টভাবেই প্রতিহত হইয়াছে। জাপানীরা খাস অস্ট্রেলিয়ায় অবতরণ করিতে সক্ষম হয় নাই; নিউগিনি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা এখনও আত্মরক্ষা করিতেছে। ফিলিপাইনেও লড়াই চলিতেছে। মার্কিনদের বিমানবহর ফিলিপাইনস্থ জাপানীদের ঘাঁটিগুলির উপর এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে জাপানীদের অধিকৃত টিমর দ্বীপে প্রবলবেগে হানা দিয়া জাপানীদের শক্তিপ্রতিষ্ঠাকে বিপর্যস্ত করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং ইন্দোনিসিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিনদের এই প্রভাব ভারত মহাসাগরের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, এমন কথা বলা চলে। কিছুদিন পূর্বে ভারত মহাসাগরে জাপানীদের নৌবহরের সাড়া পাওয়া যায়। তাহারা সিংহল আক্রমণ করে এবং মাদ্রাজ ও কোকনদের উপর হানা দেয়; উড়িষ্যার উপকূলে



জাপানীদের বিখ্যাত পোতাশ্রয় কোবে কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা বিমানবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল

হইতে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার ক্রীড়নকে পরিণত হইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। হিটলারী এই নীতির পরিণতির উপর পূর্ব এসিয়ার সামরিক পরিস্থিতি নির্ভর করিতেছে, একথা বলা যায়; সেইরূপ পূর্ব এসিয়ার পরিস্থিতির উপর হিটলারী ঐ নীতির সাফল্য নির্ভর করিতেছে, অন্য হিসাবে একথাও বলা চলে। জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর আটলান্টিকের পথে ইংরেজের সাহায্য মার্কিন যেভাবে করিয়া আসিতেছিল, তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। এসিয়ার সমস্যায় মার্কিনদের উপর চাপ পড়িবে; সুতরাং ব্রিটিশ পক্ষের দুর্বলতা বাড়িবে, হিটলারের ইহা ছিল আশা; কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা সার্থক হয় নাই। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এখনও মার্কিনের সেনা এবং সমরসম্পদ সম্পর্কিত সাহায্যে সুরক্ষিত; শুধু তাহাই নহে, ইরানের পথে এবং উত্তর সমুদ্রের পথে মার্কিনেরা রুশিয়াকেও সাহায্য করিতেছে; সম্প্রতি আটলান্টিক সমুদ্রের পথে ভারতেও মার্কিনদের সেনা এবং সমরসম্ভারের সাহায্য আসিয়া পৌঁছিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান আচমকা আক্রমণ করিয়া মার্কিনকে কিছু অসুবিধায় ফেলিয়াছিল, কিন্তু এখন সে অবস্থা কাটিয়া যাইতেছে। জাপান মনে করিয়াছিল যে, মার্কিনের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিয়া সে অস্ট্রেলিয়াকে সহজেই কাবু করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইবে এবং অস্ট্রেলিয়ার সবটা না হউক, অন্তত উত্তর অঞ্চলের নৌবহর এবং বিমানবহরের ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের অভিমুখে সে নিরঙ্কুশভাবে এবং অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইতে

আগাইয়া আসিয়া ইংরেজের কয়েকখানা মালবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। জাপানীদের এই উদ্যম ভারত মহাসাগরে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু জাপানীদের এদিককার উদ্যম প্রতিহত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। সিঙ্গাপুরে এবং মালয়ে জাপানীরা মিত্রপক্ষের বিমান শক্তির দুর্বলতাবশত যে সুবিধা করে, সিংহলে তাহা পারে নাই। ভারতের উপকূলের উপর লাগোয়াভাবে জাপানীরা বিমান আক্রমণের কোন উদ্যোগ এ পর্যন্ত করে নাই; যদি তাহারা তাহা করে, তবে সে সুবিধা পাইবে না; সিংহলেই এ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের জঙ্গীলাটস্বরূপে জেনারেল ওয়াভেল সে কথা সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন। জলপথে জাপানীদের পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার এই নীতি যদি ব্যর্থ হয়, তবে স্থলপথে তাহাদের লড়াইয়ের পরিস্থিতিও ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। জাপানীরা মনে করিয়াছিল, স্থলপথে ভারত মহাসাগরে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যদি তাহারা পায়, তবে আফ্রিকার পথে ভারতে এবং আরও পশ্চিম দিকে আগাইয়া ইরানে মার্কিন এবং ইংরেজের যে সাহায্য আসিতেছে, তাহারা সে সূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে এবং যদি তাহারা ইহাই করিতে সক্ষম হয়, তবে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া তাহারা পূর্বদিকে দ্রুতবেগে আগাইতে পারিবে। সেইভাবে আগাইয়া তাহারা ব্রহ্মের সহিত এবং ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ব্রহ্মে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে ইহা সত্য এবং এই সংগ্রামের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, ইহা এখনও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে না। তবে

ইহা সত্য যে, চীনা সেনাদল ইউনানের পথে দলে দলে উত্তর ব্রহ্মে প্রবেশ করিতেছে এবং থাইল্যান্ড হইতে জাপানীদের অগ্রগামী বাহিনীকে রুদ্ধ করিতেছে। জাপানীরা মান্দালয় শহর দখল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মান্দালয় তাহাদের বোমা-বৃষ্টিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু এখনও জাপানীরা মান্দালয় দখল করিতে পারে নাই। তাহারা যদি মান্দালয় দখল করিতে পারে, তাহা হইলে চীনা এবং ইংরেজের এই দুই বাহিনীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং চীনা সেনা-দের সংযোগসূত্র উত্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার শঙ্কা ঘটাইবে। কিন্তু লাসিও এখনও তাহাদের লাইন হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়; কিছু দিন আগে জাপানীরা উত্তর ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ তেলের ঘাঁটি ইউয়ান ইউরেয়া নামক স্থানটি দখল করিয়াছিল। এই স্থানটির গুরুত্ব বিশেষ রকম আছে। স্থানটি জাপানীদের হাতে পড়িবার পূর্বেই সেখানকার তেলের খনিগুলি সব নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়া-ছিল। কিন্তু জাপানীরা সেগুলি কিছু দিনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করিতেও পারিত। এই স্থানের খনি হইতে মাসে দশ লক্ষ গ্যালন তেল উঠে। স্থানটি ব্রিটিশ বাহিনী জাপানীদিগকে তাড়াইয়া পুনরায় দখল করিয়াছে। বিমান বহরের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে ব্রহ্মের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। জাপানীদের পূর্বাভিমুখী গতি যদি এইভাবে প্রতিরুদ্ধ থাকে, তবে হিটলারী পরিকল্পনাও যে প্রতিরুদ্ধ হইবে এরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হিটলারের গ্রীষ্মকালীন পরিকল্পনা নির্ভর করিতেছে রুশিয়ার সামরিক অবস্থার উপর। রুশিয়ার সেনাধ্যক্ষগণ বিশেষভাবেই এ কথা শুনাইয়াছেন যে, তাহারা আত্মরক্ষার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রস্তুত রহিয়াছেন; কিন্তু সে সঙ্গে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, শুধু লোকবল এবং সামরিক চাতুর্যই বর্তমান সংগ্রামে জয়লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়—উপযুক্ত সমর সঙ্গতিও আবশ্যক। রুশিয়ার পক্ষে ট্যাঙ্কের এবং বিমানবহরের এখনও প্রয়োজন রহিয়াছে। এদিক দিয়া তাহার সাহায্যের প্রয়োজন। রুশিয়ার শক্তিকে অপ্রতিহত রাখিবার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষের তরফ হইতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবার কথাটা এতদিন পরে আবার নূতন করিয়া শুনা যাইতেছে। লর্ড বীভারব্রুক নিজেও এই দিককার প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ নরওয়েতে মিত্রপক্ষের বাহিনী পাঠাইয়া এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পরামর্শ দিতেছেন। সামরিক দিক হইতে বর্তমানে বিশেষভাবে রুশিয়াকে সাহায্যের দিক দিয়া নরওয়ের গুরুত্ব খুবই বেশী, ইহা আমরা স্বীকার করি এবং নরওয়ের জন-সাধারণের উপর মার্কিন জাতির প্রভাব এখনও রহিয়াছে; সুতরাং এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতাকে আমরাও স্বীকার করি। মোটের উপর এই কথা বলা চলে যে, হিটলারের গ্রীষ্মকালীন নীতিকে ব্যাহত করিতে হইলে মিত্রপক্ষ হইতে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং মার্কিন এই নীতি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

পঁচিশে বৈশাখ

আগামী পঁচিশে বৈশাখ ইংরাজী ৮ই মে 'দেশ' পত্রিকা 'রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতি-কৃতিসহ অপ্রকাশিত কবিতা ও শেষ বয়সের কয়েকটি ফটোচিত্র এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

কবির প্রথম জীবনের সাহিত্যানুরাগী অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺প্রিয়নাথ সেন, ৺মোহিত সেন ও ৺সতীশচন্দ্র রায় লিখিত রবীন্দ্র-নাথের কাব্য পরিচায়ক তিনটি দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। ইহা ছাড়া শান্তিনিকেতনে যাঁহারা কবির শেষ জীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের একাধিক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় থাকিবে।

'রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যায়' ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প ও অন্যান্য বিভাগীয় বিষয়গুলি প্রকাশিত হইবে না।

—সম্পাদক 'দেশ'

কবিতা

সত্যভাষণ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

কহিব নূতন কথা—কেহ যাহা বলে নি তোমায়,
বলিব বন্ধুর মত অকপট মর্মের বারতা;
হয়ত অপ্রিয় হবে—ভাবিবে এ কেমন শোনায়,
তবু জেনো যা বলিব—কিছু তাহে রবে অপূর্বতা।

যে কথা বলিব তায়—চিত্তে তব লাগিবে চমক,
ব্যথায় ভরিবে বুক—নয়নে ঝরিবে ঝর ঝর,
বারেক উঠিবে কেঁপে প্রতিবাদে অধর কোরক;
ক্ষোভে, দুঃখে ছোট বুক কাঁপিয়া উঠিবে থর থর।

আজিকে বলিতে চাই—আর ভাল লাগে না তোমায়;
যত কাছে আসিয়াছি ভালবাসা গেছে তত দূরে;
আজিকে কুণ্ঠিত প্রাণে চাহিতেছি তাই ত বিদায়,
ভুলে ভালবেসেছিনু বলে ক্ষমা করিও বন্ধুরে।

সত্যের আলোক দীপ্ত আমার এ নিষ্ঠুর স্বীকৃতি;
ফুরাইল প্রেম, সাথে ফুরাইল প্রেমের বিকৃতি।

একটি রাত্রি

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

হঠাৎ নিঝুম ঘুম ভাঙ্গা রাত, ফাগুনের শেষ রাত,
হাল্‌কা হাওয়া ফুলের গন্ধে ভিজে ওঠে বারে বারে।
প্রবাসী বাতাসে কেঁপে ওঠে কার বিরহের হাহাকার,
জোছনা সায়রে একটি তারকা নীলিম ছন্দে কাঁপে।

খোলা জানালায় বোসে আছি একা, দখিনা বাতাস দোলে।
নিঃসীম নভে 'সুর-সঞ্চারী অশরীরি মোনালিসা।
নীবি-বন্ধন—রূপালী নীবির বন্ধন গেছে খুলি'—
এক ফালি চাঁদ জোছনা জোয়ারে সাপের জিবের মতো।

মনের গহনে মাথা নাড়া দেয় আদিম সরীসৃপ।
অনেক দিনের অলস যমুনা—আজি তার হাহাকার।

ভুলে যাওয়া রাত—পেলব মধুর, নীল নয়নের ভাষা,
মনের অতলে কেন ফিরে আসে, জাগায় অনেক ঢেউ।

নির্জন দ্বীপে আমি যে প্রবাসী হৃদয়ে বালুর চড়া।
কাকলীমুখর ফাল্গুন রাতে আয়োজন কাঁপে মোর।
বহ্নিবলয়ে জ্যোৎস্নাময়ী শাড়ীর আঁচল কার,
কাজল-গভীর ভীরু নয়নের এ কী বিদ্যুৎ খেলা!

হঠাৎ নিঝুম ঘুম ভাঙ্গা রাত, ফাগুনের শেষ রাত,
বহ্নি-বলয়ে যেন সে হেলেন ছড়ায় অনুপ মায়া!

পুরুষ ও রমণী

(বড় গল্প)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১৪]

ইহার পরের দিন-দুই সুকুমার যথারীতি উহাদের সাহচর্যে কাটাইল, কিন্তু তাহার পরই আবার এক ছুতায় ডুব মারিল। আনন্দ কোথা হইতে একখানা মোটর গাড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল, কথা ছিল তাহারা ঐ গাড়িতে করিয়া সেদিন গিরিডির দিকে বেড়াইতে যাইবে। অমন প্ল্যানটা মাটি হইয়া যায় দেখিয়া আনন্দর মুখ শুকাইয়া উঠিল, কিন্তু সুকুমার কিছুতেই যাত্রাটা নাকচ করিতে দিল না, একরকম জোর করিয়াই ইন্দিরাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল।. কহিল, লাহিড়ী মশাই বুড়ো মানুষ, ধরেছেন আজ আমাকে তাঁর নাটক শোনাবেনই। না গেলে বড্ড মনক্ষুণ্ণ হবেন। তোরা যা, যদি কোনমতে বুড়োকে ঠাণ্ডা করতে পারি ত এই সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে চেপে বসব। আসবার সময়ে একবার স্টেশনটা হয়ে আসিস্ বরং—যদি যাই ত ঐখানেই থাকব।

ইহার পর আর অন্য কোন সন্দেহ থাকে না। ইন্দিরা নিশ্চিন্ত হইয়াই মোটরে উঠিল, যদিও এতটা পথ আনন্দর সহিত একা যাওয়াতে কেমন যেন তাহার সংস্কারে বাধিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত মনকে সে প্রবোধ দিল, ড্রাইভার ত আছে!...

অবারিত মাঠ, দূরে পাহাড়ের নীল রেখা। মোটর চলিয়াছে হু হু করিয়া যেন শূন্য দিগন্তেরই দিকে। অপূর্ব দৃশ্য। এমন সোনার দেশ যে হয় তাহা ইন্দিরা কখনও কল্পনা করে নাই। সে প্রাণপণে দুই চক্ষু ভরিয়া এই দৃশ্যটিকে যেন পান করিতেছিল, ইহার শালবন, উঁচুনীচু মাঠ, ঢেউ খেলানো রাস্তা, শুষ্ক বাতাস, দূরে পাহাড়ের ছবি সবই তাহার ভাল লাগে। হয়ত নূতন বলিয়াই—তবু লাগে।

আনন্দও যেন আজ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এম্‌নিতেই তাহার কথাবার্তা অত্যন্ত সরস, এ ধরণের কথা-বার্তা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কাছে বিস্ময়—তাহার উপর সেদিন সে যেন তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতাকেও লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। সে বিলাত ফেরৎ, ইউরোপটা ভাল করিয়াই দেখিয়াছে, তাহারই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে গল্প করিতেছিল। বিলাত, ফ্রান্স, সুইৎসার্লাণ্ড—কত দেশ, কত মানুষ, কত ঘটনার মজাদার গল্প। ইন্দিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া যাইতেছিল; চক্ষু ও কর্ণ দুই তাহার ব্যস্ত তাই সে বুঝিতেও পারে নাই যে গাড়িটার গতি কখন মন্থর হইয়া আসিয়াছে; যাওয়া-আসার এই পথকে দীর্ঘতর করিবার যে কোন ইঙ্গিত থাকিতে পারে তাহার মধ্যে, তাহাও সে কল্পনা করে নাই।

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল গিরিডি স্টেশনে পৌঁছিয়া। আনন্দ নীচে নামিয়া ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, না, সে ছোঁড়া আসেনি। জানি সে আসবে না, আমাদের এড়িয়ে যাবারই মতলব ছিল তার।

হঠাৎ যেন একটা রূঢ় আঘাত লাগিল ইন্দিরার। সুকুমার ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়াছে—? কিন্তু কেন?...

সে মুখ বাড়াইয়া অনুযোগের সুরে কহিল, ইস্ এ যে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেল ঠাকুরপো, বাড়ি ফিরবো কখন।

আনন্দ কি যেন একটা গোলমাল করিয়া জবাব দিল, তাহার পর কহিল, একটু চা খাবেন বৌদি?

ব্যাকুলভাবে ইন্দিরা কহিল, না না কিচ্ছু দরকার নেই। আমি ত চা খাই না, জানেনই। এখন একটু তাড়াতাড়ি গাড়িটা ছাড়ুন—

হ্যাঁ, এই যে—

তাড়াতাড়ি একথা ইন্দিরার মনে হইল না যে, সে না খাইলেও আনন্দর খাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। আনন্দরও সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে কে জানে কেন সঙ্কোচ বাধিল।

আবার গাড়ি ছাড়িল। অন্ধকার পথ, বাহিরে দেখিবার কিছু নাই, ইন্দিরা গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল সুকুমারেরই কথা। তাহার এ আচরণের অর্থ কি, সে কোন্ মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু সে যে ইচ্ছাপূর্বকই তাহাদের বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকে সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এ কি শুধু অভিমান?...

ইন্দিরার মনে তাহার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিনের ইতিহাস যেন ভীড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। লেখাপড়া সে শিখুক না শিখুক সুকুমারের ভালবাসার তীব্রতা বুঝিবার মত জ্ঞান তাহার হইয়াছে, সেই মানুষ এমন করিয়া আর এক-জনের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকে কি করিয়া! হউক না কেন সে বন্ধু, তবু পর ত!...

আনন্দরও ফিরতি বেলায় কথোপকথনের উৎস যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে চুপ করিয়াই বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়াই বসিয়াছিল, খানিকটা পরেই যেন একরকম মরিয়া হইয়াই, অতি সন্তর্পণে ইন্দিরার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিল। বিলাতে সে অনেক মেয়ের সহিতই ফ্লার্ট করিয়াছে, এবিষয়ে তাহার নামই ছিল, কিন্তু এই সরলা, পল্লীগ্রামের মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার যেন সঙ্কোচের অবধি নাই।

আজও সে কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া আসে নাই। এখনও সে কতকটা অভিভূতের মতই ইন্দিরার হাতখানা টানিয়া লইল—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই।

ইন্দিরার ব্যাপারটা ভাল লাগিল না। তবু সে হাতখানা তখনই জোর করিয়া টানিয়া লইতে পারিল না, কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। তা ছাড়া ইহার মধ্যে যে দোষাবহ কিছু থাকিতে পারে তাহা ইন্দিরার পক্ষে জানা সম্ভবও নহে—

সে ভাবিতেছিল সুকুমারেরই কথা। বয়স তাহার অল্প হইলেও সে পাড়াগাঁয়ে ঈর্ষার অনেক কুৎসিত রূপই দেখিয়াছে, পুরুষের এমন নির্বিকার চেহারা তাহার কল্পনারও বাহিরে। সুকুমার কি চায়, সে এমন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে কেন?

তবে কি...তবে কি... সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া এই সন্দেহটাই ইন্দিরার মনে আত্মপ্রকাশ করিল, তবে কি সুকুমারের আর তাহার সম্বন্ধে কোন মোহ নাই? সে আর তাহার সঙ্গ, তাহার সাহচর্য কামনা করে না, বরং বিরক্তই হয়, তাই এ অবহেলা? তাই সে এত নির্বিকার?

ইন্দিরার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। এইবার সে মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, এতদিন সে আত্ম-প্রবঞ্চনাই করিয়া আসিয়াছে, সুকুমারের কাছে তাহারই বহুদিন আগে পরাজয় ঘটিয়াছে—। আজ সে-ই সুকুমারের ভালবাসার ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র, যেমন ব্যগ্র একদিন ছিল সুকুমার নিজে—

সহসা আনন্দর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে ইন্দিরার চমক ভাঙিগল। তাহার হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে আনন্দ কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বৌদি, সত্যি জবাব দেবেন?

তাহার প্রশ্নে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেও ইন্দিরা কোন কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। আনন্দ তবু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবে স্থির থাকতে পারছি না বলেই জিজ্ঞাসা করছি, সুকুমার কি আপনাকে সুখী করতে পারেনি?...না না, আপনি যতই গোপন করার চেষ্টা করুন, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আপনি এখানে সুখে নেই—

ইন্দিরা বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার কথার মর্মোদ্ধার করিতে পারিল না। তাহার পর যখন বুঝিল তখন হাতখানা সজোরে আনন্দর মুঠা হইতে টানিয়া লইয়া কহিল, এ সব কি বলছেন ঠাকুরপো? আমি ওঁর কাছে সুখে নেই এমন কথা কে আপনাকে বললে? ওঁর মত স্বামীর কাছে যে সুখে থাকতে না পারে সে আর কোথায় সুখ পাবে।...ছি, ছি, এ সব কথা আর বলবেন না কখনো, শুনলেও পাপ হয়!

হয়ত এতটা উত্তেজনার কারণ ছিল না, কিন্তু এটা কতকটা ইন্দিরার আত্মগ্লানিরই তাপ। আনন্দ অপ্রতিভ হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, মাপ করবেন, আমি অতটা বুঝতে পারিনি।

গাড়ি যখন মধুপুরে তাহাদের বাড়ির সামনে পৌঁছিল তখন দশটা বাজে। সুকুমার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিমুখেই বলিল, এসো। আমার আর যাওয়া হলো না, লাহিড়ী মশাই যা পাকড়াও করলেন, কার সাধ্যি নাটক শেষ হবার আগে ওঠে!

ইন্দিরা আশা করিয়াছিল যে অন্তত এতখানি রাত করার জন্য সামান্য কিছু অনুযোগও সুকুমার করিবে কিন্তু সে ওদিক দিয়াই গেল না। বরং ক্লান্তমুখে আনন্দকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া কহিল, আমায় খুব খোঁজাখুঁজি করেছিলি নাকি? আমি আবার ভাবছিলুম যে মিছিমিছি তোরা হয়রাণ না হোস্‌—

ইন্দিরা আর শুনিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু কাপড় ছাড়ার নাম করিয়া ঘরে ঢুকিলেও তখনই সে কাপড় ছাড়িতে পারিল না, সেই অবস্থাতেই মিনিট দশেক স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ঝি আসিয়া—রান্না শেষ হইয়াছে, এই সংবাদ দিতে তবে তাহার চমক ভাঙিগল, সে তাড়াতাড়ি কাপড় জামা বদলাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

সুকুমার বেশ সহজভাবেই আসিয়া আহারে বসিল। বলিল, আনন্দটার কি হলো আজ? ভয়ানক শরীর খারাপ বলে বাড়ি চলে গেল। কিছুতেই খেতে রাজী হলো না।...

ইন্দিরার মনে হইল ইহার চেয়ে তিরস্কার করাও ভাল ছিল। এমন অনিশ্চয়তা অসহ্য। তিরস্কার করিলে, রাগ করিলে তবু তাহার অর্থ পাওয়া যাইত—কিন্তু এই নির্বিকার অবস্থায় যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। সে কিছুতেই সেদিন মুখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না। সে যেন কি একটা কঠিন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে—দাসী চাকরদের সহিত চোখা-চোখি হইলেও পাছে সেখানে নীরব তিরস্কারের ভাষা দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সেদিন সে সাধ্যমত সকলকারই দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। আহারের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তবু আনন্দর না খাওয়ার সহিত তাহার না খাওয়ার কোন অর্থ হইতে পারে এই ভয়ে নিয়মমত আহারে বসিল কিন্তু কোন্‌ এক অজ্ঞাত অভিমান ও বেদনায় তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রাণপণে চোখের জল চাপিয়া কোনমতে দুই-এক গ্রাস খাদ্য মুখে পুরিয়াই উঠিয়া পড়িল।...

রাত্রে বিছানায় শুইয়া কিছুতেই চোখে ঘুম আসিল না। স্বামীকে সে এ পর্যন্ত যত দুঃখ দিয়াছে আজ তাহার সবগুলিই যেন ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—এ অবস্থা অসহ্য। আজ সে বুঝিতে পারিল যে এতদিন সে স্বামীর ভালবাসাকে অবহেলা করিতে পারিয়াছে তাঁহার প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল বলিয়াই—তাহার দম্ভ, অভিমান সব কিছু নির্ভর করিতেছে তাঁহারই উপর। কিন্তু সেই ভাল-বাসার দম্ভে উন্মত্ত হইয়া আজ বুঝি সে মূলধনই হারাইতে বসিয়াছে। আসল মুহূর্তটিকে চিনিতে পারে নাই—যে মুহূর্তে তাহার আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। আজ যদি উনিই অবহেলা করিতে সুরু করেন?...

তাহার সমস্ত বুক ভাঙিগয়া যেন কান্না বাহির হইতে চাহিতেছে অথচ সে কাঁদিবেই বা কাহার কাছে? কোন সহানুভূতির দরজাই ত সে খোলা রাখে নাই—। তখন যদি শাশুড়ীর কথা সে শুনিত।...

সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। বহুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া সুকুমারের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের উপর হাত রাখিল।

সুকুমারও জাগিয়াছিল। বাহিরে সে যতই নির্বিকার থাক, অন্তরটা তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে-ও মানুষ, অত রাত্রে স্ত্রী ও বন্ধুকে বেড়াইয়া ফিরিতে দেখিলে বিশেষত তাহারা যদি অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে ফেরে, কোন মানুষই স্থির থাকিতে পারে না। এই কয়দিন ধরিয়াই সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আজিকার ত কথাই নাই; তবু সে মনকে প্রাণপণে বুঝাইতেছে, যে ইহাই তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। সতীশের প্রতি যে অন্যায় সে করিয়াছে, এ দাহন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত—কঠিন পাপের কঠিন শাস্তি—এ ভোগ করিতেই হইবে। আর তাহাতে, তাহাতে যদি ইন্দিরা সুখী হয়ত হোক্‌—

কিন্তু মনকে প্রবোধ দেওয়া এক বস্তু আর প্রবোধ পাওয়া আর এক বস্তু। তাই সে অত রাত্রেও ঘুমাইতে পারে নাই। ওপাশে যে ইন্দিরাও জাগিয়া আছে তাহাও সে বুঝিয়াছিল কিন্তু অন্য কারণ অনুমান করিয়াছিল, তাহাতে তাহার অন্তর্দাহ বাড়া বই কমে নাই। এখন ইন্দিরাকে তাহারই শয্যায় আসিয়া তাহার পায়ে হাত দিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

এ কি ইন্দু! কি হয়েছে রাণী, ভয় পেয়েছো—?

সে উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কাছে টানিয়া লইল।

অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে ইন্দিরা চুপি চুপি কহিল, আমি অত রাত করে ফিরলুম, বকলে না কেন?

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! বিস্ময়ে সুকুমারের মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথাই বাহির হইল না। তাহার পর কহিল, বকব কেন? ওখান থেকে ফিরতে দেরী হবে তাত আমি জানতুমই—

তবে পাঠালে কেন? কেন তুমি অমন করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ?

তা বটে!

গভীর দুঃখের মধ্যেও সুকুমারের হাসি আসিল। এ অনুযোগ তাহারই প্রাপ্য বটে!

সে অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, তা নইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না যে রাণু! যে পাপে তোমাকে পেলুম না, সে পাপের শেষ হওয়া চাই ত!

অকস্মাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ইন্দিরা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুকুমারের বুক দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। একি সত্য, না সে স্বপ্ন দেখিতেছে?

কী হয়েছে রাণী, কেন অমন করছ। বলো আমাকে কি হয়েছে, লক্ষ্মীটি—

ইন্দিরা প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, আর কখনও অমন করব না, তুমি এই বারটি আমাকে মাপ করো—

কিন্তু তোমার কোন অপরাধই হয়নি যে। অপরাধ যে আমারই, তাই আমি এত শাস্তি পেলুম। তুমি শান্ত হও, অমন করো না।

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া ইন্দিরা কহিল, না, না তোমার কোন অন্যায় নেই। আমার কাছে তোমার কোন পাপ থাকতে পারে না। তুমি আমাকে এইবারটি শুধু কাছে টেনে নাও, আর কখনও আমি ভুল করব না।

কঠিন বাহুবন্ধনে তাহাকে প্রায় নিষ্পেষিত করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি সুকুমার কহিল, আমি ত টেনে নিতেই চাই গো, তুমিই যে এতদিন কঠিন হয়ে ছিলে! কি ক'রে যে আমার দিন কেটেছে, তা তুমি কোনদিন বুঝবে না!

ইন্দিরার বক্ষ তখনও কান্নার বেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে শুধু মুখ তুলিয়া নিজেই সুকুমারের মুখে গালটা চাপিয়া দিয়া কহিল, আমি অহঙ্কারে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় তখন শাস্তি দাওনি কেন!

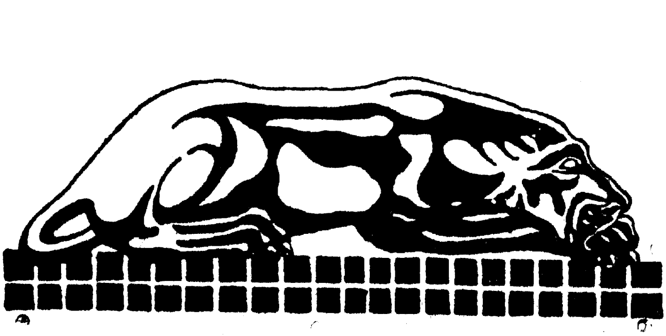
সুকুমার কহিল, ও সব কথা এখন থাক্‌—।

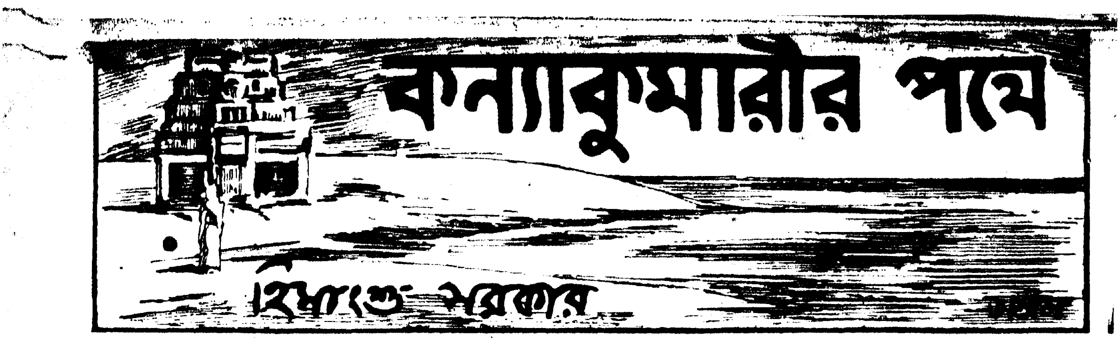
তাহার পর ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল, চলো আমরা কাল বাড়ি ফিরে যাই—। যাবে?

ইন্দিরা কহিল, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যাবো। আমি আর কিছু জানি না।

—শেষ—

['দেশ' পত্রিকার ২৭ সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস 'সাঁঝের প্রদীপ' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।]





৫

মিঃ চাকোর সঙ্গে আমরা সকলে সমুদ্রের পাড়ে যে দিকটায় পার্ল হেচারী, সেখানে পৌঁছলাম। মিঃ চাকো দুজন লোককে জলে নামতে বলল—একটা ঝিনুক শুদ্ধ বাক্স জলের ওপরে তুলে আনবার জন্য।

এখানে সংক্ষেপে এই পার্ল হেচারী সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করি।

এই পার্ল হেচারিটি (Pearl Haethery)-টি অল্পদিন হোল আরম্ভ করা হয়েছে।

আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, মুক্তা এক রকম সামুদ্রিক ঝিনুকের (Pearl oyster) শরীরের ভেতর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পর আমাদের মনে এই মুক্তার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জাগে। তার মধ্যে এইটেই প্রথমে মনে হয় মুক্তা কি রকম করে তৈয়ারী হয়।

কোন ঝিনুকের শরীরের ভেতর ছোট বালির কণা বা ঐ জাতীয় কিছু ঢুকে যায়। তারপর ঝিনুকের শরীর থেকে নির্গত একপ্রকার লালা জাতীয় রসের প্রলেপ জমতে থাকে। প্রলেপের স্তরটি খুব পাতলা হয় এবং পরে শক্ত হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে এই রকমভাবে স্তরের পর স্তর জমতে থাকে এবং পরে মানুষের কাছে এগুলো মুক্তা বলে সমাদৃত হয়।

মুক্তা-বণিকেরা খোঁজ রাখে যে, সমুদ্রের কোথায় এই মুক্তা বহনকারী ঝিনুক পাওয়া যায়। এরা ডুবুরী দিয়ে ঐ সব জায়গা থেকে অসংখ্য ঝিনুক সংগ্রহ করে। ডুবুরীর কাজ দেশীয় লোকরাই করে। তাদের পোষাক বলতে কোন কিছু থাকে না। খালি গায়ে ছোট একটা কাপড় শক্ত করে পরে এরা জলে নামে। গলার সঙ্গে অথবা কোমরের সঙ্গে সামনে করে একটা ছোট টুপরী জাতীয় জিনিস বেধে নেয়। প্রত্যেক ডুবুরীর সঙ্গে আর একজন করে লোক থাকে। এর কাজ জলের নীচে ডুবুরীর কাজ শেষ হওয়ার পর তার কাছ থেকে সংকেত পাওয়া মাত্রই একে জলের নীচে থেকে ওপরে টেনে তোলা।

জলের নীচে নামবার আগে প্রত্যেক ডুবুরীর নৌকা থেকে একটা ভারী জিনিসকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হয়। ডুবুরী জলে নামবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এই দড়ির সাহায্য নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে জলের নীচে মাটিতে পৌঁছবার চেষ্টা করে। দড়ি ধরে নামা অথবা এর সাহায্য নেবার কারণ এই যে, জলের যত তলার দিকে যাওয়া যায় ততই জল ঠেলতে কষ্ট হয় এবং জল মানুষকে ওপরের দিকে তুলে দেয়। তাড়াতাড়ি যাওয়ার কারণ এই যে, দম বন্ধ করে থাকার জন্য যতটা কম সময় এই জলের তলায় যেতে নষ্ট হয় ততই সুবিধা। তাহলে আরও বেশী ঝিনুক সংগ্রহ করা যাবে। সাধারণত এক একজন ডুবুরী ২।৩ মিনিট জলের তলায় থাকতে পারে। এই সময়ের মধ্যে যতগুলো ঝিনুক সে সংগ্রহ করতে পারে, করে তার টুপরীতে রাখে। দম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দড়ি নাড়া দিয়ে ওপরের সাথীকে ডেকে দড়িশুদ্ধ টেনে তুলে নিতে বলে। তখন তার আর সমুদ্রের ভারী নোনা জল ঠেলে ওপরে ওঠার মত শক্তি থাকে না। এক একজন ভাল ডুবুরী দিনের মধ্যে ১০০ থেকে ১৫০ বার জলে নামতে পারে।

সংগ্রহ করা ঝিনুকগুলো তারপর দুভাগ করে খুলে দেখা হয় যে, তার মধ্যে কোন মুক্তা আছে কিনা। থাকলে সেগুলো সংগ্রহ করা হয়। তবে খুব কম সংখ্যক ঝিনুকের মধ্যেই মুক্তা পাওয়া যায়।

সাধারণত সংগৃহীত মুক্তাগুলোর আকার গোল অথবা ডিম্বাকৃতি হয়। বড় বড় মুক্তা খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।



কতকগুলি ঝিনুক

সাধারণ ধরণের মুক্তা একটি বড় মটর দানা অথবা এর চেয়ে কিছু বড় হয়। মুক্তা বিভিন্নবর্ণের হয়। সংগ্রহের পর মুক্তা-বণিকেরা এগুলোকে পরিষ্কার এবং দরকার মত ছেঁদা করবার জন্য কৃতি কারিকরদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সারা পৃথিবীর মধ্যে এই কাজ একমাত্র ভারতবর্ষের কারিগররাই করে।

ওপরে যে মুক্তার কথা বল্‌লাম এগুলো স্বাভাবিক মুক্তা (natural pearl)। এই স্বাভাবিক মুক্তা ছাড়াও আর এক রকম মুক্তা আছে যেগুলোকে কৃত্রিম মুক্তা (**cultured**

pearl) বলা যেতে পারে। অবশ্য এই কৃত্রিম মুক্তাকেও খানিকটা স্বাভাবিক মুক্তার মধ্যে ফেলা যেতে পারে—কারণ স্বাভাবিক মুক্তার মত এই কৃত্রিম মুক্তাও জলের নীচে ঝিনুকের ভেতরই তৈয়ারী হয়। শুধু এই দুই জাতীয় মুক্তার মধ্যে এইটুকু



ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা

তফাৎ যে, স্বাভাবিক মুক্তা প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী আর কৃত্রিম মুক্তা খানিকটা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী তৈয়ারী হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পার্ল হেচারীর উদ্ভব এই কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুতের জন্যই। মানুষ পরীক্ষা করে দেখেছে যে, যদি ঝিনুকের মধ্যে কোনরূপ ছোট কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলোকে জলের তলায় রেখে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেওয়া হয়, তা'হলে এগুলোর মধ্যে মুক্তা তৈয়ারী হতে পারে। তারপর থেকে মানুষ এই কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা তৈয়ারীর জন্য সমুদ্রের উপকূলে পার্ল হেচারী গঠনে মনোযোগী হ'ল। এই কৃত্রিম মুক্তার একটা সুবিধা এই যে, এগুলো প্রায় স্বাভাবিক মুক্তার মতই হয়। ঝিনুকগুলোকে বালুকণা শুদ্ধ এলোমেলোভাবে সমুদ্রের তলায় রেখে দিলে অনেক অসুবিধা দেখা দেয় বলে ঝিনুকগুলোকে ছোট ছোট খোপওয়ালা একটা কাঠের চৌক ছাকনীর মত বাক্স করে জলের নীচে রাখা হয়। বাক্সটার ওপরও একটা জালের ঢাকা দিয়ে বন্ধ করা থাকে। বাক্সটার প্রত্যেকটা ছোট ছোট খুপরীর মধ্যে একটা করে ঝিনুক ডুবিয়ে রাখা হয়। তার পর সবশুদ্ধ বাক্সটা সমুদ্রের জলের মধ্যে রাখা হয়। এক একটি বাক্সে সাধারণত লম্বার দিকে ৮টা খুপরী থাকে এবং চওড়ার দিকে ৫টা খুপরী থাকে। এক একটা ছোট খুপরীর খাপ লম্বায় ৫, চওড়ায় ৪ এবং উচ্চে ৪ ইঞ্চি।

একটা নির্ধারিত সময়ের পর, প্রায় ১ মাস বাদে বাদে বাক্সগুলোকে জল থেকে ডাঙ্গায় তুলে প্রত্যেকটা বাক্সর ঢাকা খুলে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক ঝিনুকের ওজন এবং মাপ নেওয়া হয়। এই ওজন এবং মাপ থেকে পরে ঝিনুকের বয়স ঠিক করার সম্বন্ধে গবেষণা করে মানুষ অনেকটা কৃতকার্য হয়েছে। ওজন, মাপ নেওয়া ছাড়াও ঝিনুকগুলোর খোলগুলো ওপর থেকে পরিষ্কার করে এবং প্রত্যেকটা খুপরী পরিষ্কার করে আবার জলের নীচে বাক্সগুলো রেখে দেওয়া হয়। কয়েক বছর বাদে এইসব ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়।

দ্বীপের পার্ল হেচারী খুব ছোট রকমে এবং অল্পদিন হ'ল আরম্ভ করা হয়েছে। যদিও নিয়ম মত বাক্সগুলো ডাঙ্গায় তোলার সময় হয়নি, তবুও মিঃ চাকো আমাদের দেখাবার জন্য একটা বাক্স তুলে কি রকমভাবে মাপ, ওজন এবং পরিষ্কার ইত্যাদি করা হয় সবই যতদূর সম্ভব দেখিয়ে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলেন।

পার্ল হেচারী দেখা শেষ করে ফেরার পথে আমি মাস্টার মশাইকে এই দ্বীপের কাছে সিংগল্ দ্বীপটি পরের দিন সকালে দেখতে যাওয়ার জন্য বললাম। প্রথমে তিনি রাজি হলেন না—কারণ, তার পর দিন বিকেল বেলা আমরা ক্রুশাডাই দ্বীপ থেকে রামেশ্বরমের দিকে যাব। তিনি বললেন যে, এর জন্যে সমস্ত জিনিসপত্র গোছগাছ করে আর সিংগল্ দ্বীপটা দেখতে যাওয়ার সময় হবে না। আমরা ক'জন জিনিসপত্র গোছগাছ করে নেবার ভার নেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীপটা দেখে ফিরে আসবার মত দিলেন। আমরা সকলেই শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপটাও দেখা হবে বলে খুসী হলাম।

সন্ধ্যার পরই রান্নার দল রান্নার জোগাড়ে লাগল। ইচ্ছা যে, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুতে পারলে পরদিন খুব ভোরের দিকে সিংগলের দিকে রওনা দিতে পারব। অনেকে এর মধ্যে নিজেদের সুটকেস এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল। পরদিন তাড়াহুড়োর মধ্যে করার চেয়ে আজ ধীরেসুস্থে গুছিয়ে রাখাই ভাল। তখন রান্নার কিছু দেরি থাকায় আমরা কৃষ্ণপিল্লাইকে প্রাণী সংগ্রহ সংক্রান্ত সব প্রশ্ন করতে লাগলাম। এর মধ্যে আমি এদের ভাষায় এটা কি, ওটা কি বলে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। সে সব তাদের ভাষায় বলতে লাগল। কোন একটা কিছু কথা শোনবার পরই মনে হচ্ছিল যে, আরে এটা তো বেশ সোজা। দু'চারবার সংগে সংগে আউড়ে নিচ্ছিলাম, পরে মনে করে রাখবার জন্য, কিন্তু এই রকমভাবে কয়েকটা কথার পর আবার



দ্বীপের একটি মেয়ের কর্ণাভরণ

পুরান কথাগুলো মনে করতে গিয়ে দেখি, হয় সেগুলো ভুলে গেছি, আর না হয় কথাগুলোর মানে ওলটপালট করে ফেলেছি। তখন খাতা-পেনসিল বার করে লিখে রাখতে লাগলাম। যাই হোক, এখানে আমার সেই সংগ্রহ থেকে কিছু কিছু উল্লেখ করছি। নারকেল—উরুলি; নারকেলগাছ—এরেলি; তালগাছ—পানাগ; তাল—পানাগুটা; দেশলাই—থিপট্টী; মাথার বালিশ—থালামণি; কাপড়—পেটি; নাক—মুকা; কান—কাদি; চোখ—খান্ন; মুখ—কাল্লু; জিব—নাক; মাথা—থালা; চুল—থুড্ডি; আঙ্গুল—ডেরেল; বুক—নিণ্ডি; ইত্যাদি।

এমন সময় খাওয়ার ডাক এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে শুয়ে পড়ল।

ভোরের দিকে তাড়াতাড়ী বন্ধুবর এবং আমি ঘুম থেকে উঠে, রুটিতে মাখন লাগিয়ে, ডিম ভেজে, চায়ের জল চড়িয়ে সকলকে বিছানা থেকে ঠেলে তুললাম। চা-পর্ব শেষ করে আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে জেটি থেকে লঞ্চে গিয়ে উঠলাম। প্রায় সকাল সাতটায় লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চটা প্রথমে জেটি থেকে বের হয়ে কয়েক ফারলং পাম্বন জংসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পর ডানদিকে ঘুরে পূব মুখে চলতে লাগল।

সিংগুল দ্বীপটা ক্রুশাডাই দ্বীপের দক্ষিণ-পূব কোণায়। ক্রুশোডাই দ্বীপের স্যান্ডি পয়েন্ট থেকে দাঁড়িয়ে সিংহল দ্বীপটা বেশ ভাল রকম দেখা যায়। এই পয়েন্ট থেকে সিংগুলের দূরত্ব প্রায় আধ মাইলের মত। তাছাড়া এই দ্বীপটা ক্রুশাডাইয়ের সঙ্গে এক সারিতে অবস্থিত।

সিংগুল দ্বীপ, ক্রুশাডাই এবং এখানকার অন্যান্য দ্বীপের মতই প্রবালের দ্বীপ। প্রায় ১৮৭৮ সালের জরীপের মানচিত্র থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, এখানে একটা দ্বীপের বদলে ছোট দুটো আলাদা আলাদা দ্বীপ ছিল। তার পর প্রায় ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে এই দুটো দ্বীপের মাঝখানের জলের ভেতরের কোরাল রীফ্ বেড়ে গিয়ে দুটো সম্পূর্ণভাবে জুড়ে একটা দ্বীপ হয়। দ্বীপটি লম্বায় আড়াই ফারলং এবং চওড়ায় দেড় ফারলংয়ের মত।

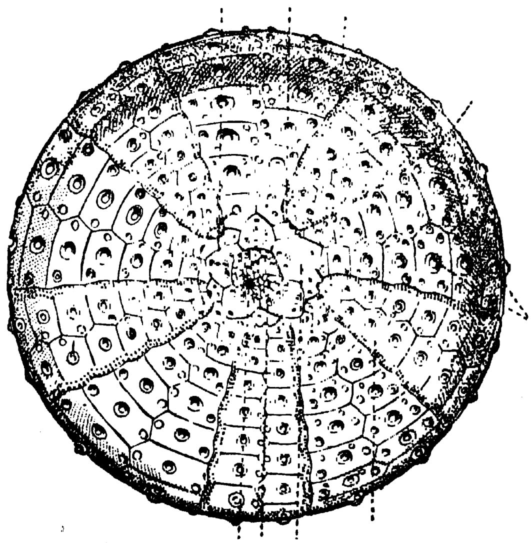
দ্বীপের সামনের দিক থেকে অর্থাৎ উত্তরদিক থেকে আমরা দ্বীপের দিকে এগোতে লাগলাম। সমুদ্রে বেশ ঢেউ থাকার দরুণ লঞ্চটা দুলছিল। দ্বীপের কোথায় গিয়ে যে আমরা নামব, সেটা ঠিক করতে পারছিলাম না—কারণ, ক্রুশোডাইয়ের মত এখানে পাড়ে নামবার জন্য কোন জেটি নেই।

"দুলিয়া চলেছে তরী
কোথায় পৌঁছিব ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।"

প্রায় ৩৫ মিনিট একখানা লঞ্চে করে আসার পর লঞ্চটা তার গতি কমাতে কমাতে, দ্বীপটা থেকে প্রায় দু' ফারলং দূরে থেমে গিয়ে জলে নোঙ্গর ফেলল। চালকের কাছে শুনলাম যে, দ্বীপটা প্রায় সবটাই কোরাল রীফ্ দিয়ে ঘেরা, শুধু পেছন দিকটা অর্থাৎ দক্ষিণ দিকটায় কোন রকম কোরাল রীফ্ নেই, একদম খোলা সমুদ্র। কোরাল রীফ্ থাকার দরুণ লঞ্চ এর চেয়ে বেশী সামনে এগোতে পারবে না। এখান থেকে আমাদের লঞ্চের পেছনে বাঁধা জীবনরক্ষী নৌকায় করে দ্বীপটায় যেতে হবে। একসঙ্গে এত জন একবারে যেতে পারবে না বলে প্রথমবারে কয়েকজন গেল। তাদের পৌঁছে দিয়ে দ্বিতীয়বারে আমাদের বাকি কয়েকজনকে নিয়ে গেল।

দ্বীপটায় কোন রকম লোকজনের বাস নেই। সমস্ত দ্বীপটা বালুকাময়। কোন রকম তাল, নারকেল, অথবা বড় গাছ এ দ্বীপটায় নেই। ছোট ছোট বালির ওপর জন্মান গাছ, আর ক্রুশাডাইয়ের মত বালির ওপর লতান গাছই চোখে পড়ল। দ্বীপটার পূব কোণায় প্রায় ৪০ ফিট উঁচু মোচার কোণের মত দেখতে ইটের তৈরী একটা স্তম্ভ চোখে পড়ল। শুনলাম যে, এটাকে আলোক স্তম্ভ (Light house) বলা হয়। অবশ্য এতে কোন রকম আলোর বন্দোবস্ত নেই। তাছাড়া, এদিক দিয়ে কোন জাহাজ যাতায়াত করে কি না, সেটাও জানতে পারলাম না।

সমস্ত দ্বীপটার পাড় অসংখ্য ছোট-বড় ঝিনুক এবং শামুক জাতীয় প্রাণীর খোলে ভর্তি হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটাই হাতে তুলে নিয়ে দেখি যে, একটা অন্যটার চেয়ে হয় রংয়ে, আকারে, আর না হয় খোলের ওপরের কারুকার্যে বিভিন্ন। সকলে সংগ্রহ করে এগুলো ব্যাগের মধ্যে পুরতে লাগল। এখানে ঝিনুক কুড়তে কুড়তে পুরীর সমুদ্রের ধারের ঝিনুক কুড়নোর কথা মনে পড়ল। সেখানে ঝিনুক কুড়তে গিয়ে ঝিনুক খুঁজতে খুঁজতেই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নই উঠতো না। আর এখানে শুধু ঝিনুক কুড়তে কুড়তেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আর পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটাও এখানে তোলা চলে দেখলাম।

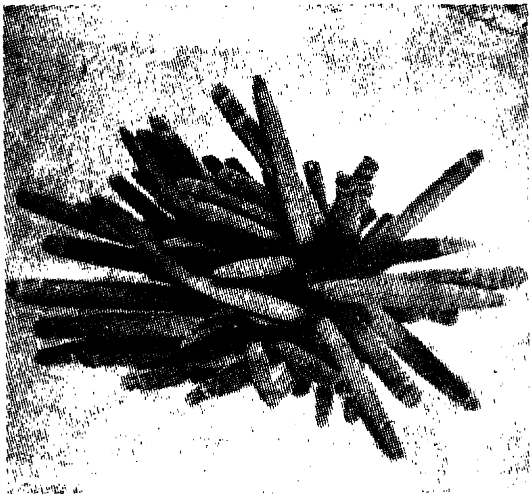


মরা সি-আরচিনের খোল

কৃষ্ণপিল্লাই বলল যে, একটু লক্ষ্য করে চললে অনেক সি-আরচিনের (sea-archin) খোল (Shell) পাওয়া যাবে। সি-আরচিন অমেরুদণ্ডীয় একাইনোডারমেটা (Echinodermata) পর্বে পড়ে। এগুলো দেখতে অনেকটা কমলালেবুর মত। কমলালেবুর খোসার ভেতর যেমন কোয়া থাকে, এগুলোর খোলের ভেতরও সেই রকম প্রাণীর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। খোলের ওপর দিকটা একটু ছুঁচলো এবং একটু কম চাপা। মাঝখানে একটা গোল ছেঁদা আছে—এইটাই প্রাণীটার পেছনদিক।

খোলের তলার দিকটা থ্যাবড়া। আর মাঝখানটা ঠিক কমলা-লেবুর মতই চাপা। এদিকেও ওপর দিকের মত একটা গোল ছেঁদা আছে—এইটাই প্রাণীর মুখ।

খোলটা দেখতে সুন্দর হলেও জীবন্ত প্রাণীটার চেহারা দেখলে কিন্তু একটু ভয়ই করে। জীবন্ত অবস্থায় প্রাণীটার



কাঁটা শুদ্ধ জীবন্ত সি-আরচিন

খোলটার ওপর থেকে আরম্ভ করে নীচ পর্যন্ত সজারুর মত কালো কালো লম্বা শক্ত কাঁটা দিয়ে বর্মের মত করে মোড়া থাকে। অবশ্য কাঁটাগুলো খুব ছুঁচলো না হলেও হাত দিয়ে ধরবার সময় একটু সাবধান হতে হয়। তাছাড়া অন্য কোন প্রাণী এদের কাছে এগোবার আগে একটু ভেবেচিন্তেই এগোয়। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলবার সময় এর শরীরের ভেতর থেকে খোলের গায়ে ছোট ছোট সুন্দরভাবে সাজান ছেঁদা দিয়ে অসংখ্য পায়ের মত বের হয়। প্রাণীটা মরে যাওয়ার পর খোলের ওপরের কাঁটাগুলো খসে যায়। খোলগুলোর ওপর পায়ের গর্ত এবং কাঁটাগুলোর চিহ্ন এমনভাবে সাজান থাকে যে, দেখলে মনে হয়, যেন কোন শিল্পী বসে বসে এর ওপর কারুকার্য করেছে।

আমরা এই সিংগল দ্বীপ থেকে অসংখ্য ছোট, বড়, সি-আরচিনের খোল সংগ্রহ করেছিলাম। পরে রামেশ্বরমের সংগ্রহের সময় কয়েকটা কাঁটা শুদ্ধ জীবন্ত সি-আরচিন সংগ্রহ করেছিলাম।

এছাড়া, আর একটা প্রাণীর খোলস চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে সামুদ্রিক চিংড়ী মাছের। আমরা সকলেই চিংড়ী মাছ দেখেছি। অনেকেরই ধারণা আছে যে, চিংড়ী মাছের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। মাছ হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণী, আর চিংড়ী মাছ হচ্ছে অমেরুদণ্ডীর মধ্যে আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত। কেন যে আমরা চিংড়ীকে মাছ নামে অভিহিত করে থাকি, সেটা বলতে পারি না। এটা যে সম্পূর্ণ ভুল, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই রকম ভুল নামে প্রাণীর পরিচয় দেওয়া ইংরেজীতেও পাওয়া যায়। যেমন Star fish (তারা মাছ)। এটা চিংড়ীর মতই অমেরুদণ্ডী এবং মাছের শ্রেণীভুক্ত নয়। আর একটা উদাহরণ আমরা এইখানে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে তিমি মাছ। তিমি মাছ অবশ্য মেরুদণ্ডী, কিন্তু মাছের শ্রেণীভুক্ত না হয়ে এটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রেণীভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আসামে দেখেছি যে, অসমীয়া ভাষীরা চিংড়ী মাছকে 'মিচা মাচ' বলে। এখানে 'মিচা' কথার অর্থ—'মিথ্যা', আর 'মাচ' কথার অর্থ—'মাছ'। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, চিংড়ীটা যে একটা মাছ নয়, সেটা তারা নিজেদের ভাষায় এমনভাবে বলে যে, তাতেই প্রকাশ পায়।

(শেষাংশ ৫৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



ক্রুশাডাই দ্বীপে পাড়ের ওপর কেয়া গাছ

নিশির ডাক

শ্রীসুজিতরঞ্জন রায়

বীরেন ঘুমাইতে পারে না।

এত ভীরু হইলে ঘুমান সত্যই অসম্ভব। পাশ-বালিশ ছাড়া বীরেনের ঘুম হয় না অথচ রাত্রির গোড়া হইতে সেই যে ছায়া পাশ বালিশটাকে আকড়াইয়া ধরিয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে আর এপাশ ফিরিবার বা বালিশটাকে বেহাত করিবার নামটি পর্যন্ত নাই।

—ও ছায়া, দেখ দেখ ওই যে, মাঠের ধারের গাছটার নীচে—দেখনা, আ' চোখ বুজলে কেন?—কিন্তু ছায়া চোখ খুলিবার মেয়েই নয় বরং এই কথায় আরও জড়সড় হইয়া শুইয়া থাকে। —আঃ! চিমটি কাটো কেন? কি বলেছি আমি, বারে!—বাঁ হাতে একটু ধাক্কা দিয়া কৃত্রিম অভিমানভরে বীরেন বলে,—দেখতো কতখানি চামড়া উঠে গেল!—

কিন্তু আর কিছু বলিবার পূর্বেই ছায়া এবার উঠিয়া পড়ে বিছানা ছাড়িয়া। বীরেন বুঝিতে পারে না ছায়া এতক্ষণ ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল না সত্যই ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু ভাণ করিবার মেয়ে ছায়া নয়। ছায়া যে সত্যিই ভীতু তা' বীরেন জানে। গত বৎসরের একটা ঘটনা মনে পড়ে বীরেনের, যখন চাকরী পাইতেই মা কাঁদিয়া কাটিয়া দূরের একটা গ্রামে ছেলের বিবাহ দেন। ঘটনাটা বিবাহের পরের—নববধূকে লইয়া নৌকায় করিয়া বাড়ি ফিরিবার পথের ঘটনা।—

সেই বিকাল হইতে নৌকা চলিয়াছে আর এখন সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি গভীর হইতে চলিল। ছইয়ের নীচে এক কোণে বীরেনের একটা হাতভাংগা সুটকেস একটা বিছানা আর নতুন পাওয়া কয়েকটা জিনিসপত্র। এপাশের কোণে লণ্ঠন জ্বালিয়া বীরেন বই পড়িতেছে। একটু দূরে জানালার ধারে মুখ বাড়াইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে ছায়া। হঠাৎ দুষ্ট-বুদ্ধি জাগে বীরেনের মাথায়। বইটা বন্ধ করিয়া ফস করিয়া বাতিটা নিবাইয়া দেয়। খানিক সব চুপ— শুধু বধূর নতুন কাপড়ের খস খস শব্দে বীরেন বুঝিতে পারে বধূ ভয় পাইয়া জড়সড় হইয়া বসিতেছে।—ও খুকি—একটু অগ্রসর হইয়া ঘোমটাটাকে সরাইয়া দিতে দিতে বলে বীরেন—তোমার নাম তো বল্লে না?—কিন্তু খুকি ডাকাতেই হয়তো খুকির অভিমান হয়; মাথাটা সরাইয়া লইয়া আবার জানালার ধারে সরিয়া বসে।—আমাকে বুঝি তোমার ভাল লাগে না, হ্যাঁ খুকি?—বধূ এইবার মৃদু ভর্ৎসনায় উত্তর দেয়—যান আপনি ভারি ইয়ে। আমাকে খুকি বলেন কেন? কথা বলিবার পথ পাইয়া এইবার বীরেন বলে—ওঃহো, আচ্ছা আচ্ছা আর না হয় বলব না, কিন্তু তোমার নাম তো বল্লে না।—একটু নরম হইয়া খুকি এইবার জবাব দেয়—ছায়া।

খানিক বাপের এবং শ্বশুরে বাড়ির খবর বলিয়া আর কথা বলিবার পথ না পাইয়া বীরেন বলে—একটা গল্প বলব ছায়া শুনবে? গল্প ঠিক নয়— তাহাদেরই পিতৃপিতামহ আমলের বংশের ইতিকথা—তবে একটু রহস্যময়।

সেবার কি একটা পার্বণ উপলক্ষে রতনপুর গ্রামের কয়েক-জন প্রবীণের দলে মিলিয়া শম্ভু দত্ত তীর্থভ্রমণে বাহির হইল। তীর্থ ভ্রমণের বয়স শম্ভুর তখনও হয় নাই—সেটা ছিল তাহার ভ্রমণের একটা নেশা।

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধের দল ছইয়ের নীচে পাশা খেলায় ব্যস্ত, কেবল শম্ভু ছইয়ের বাহিরে বসিয়া সময় কাটাইতেছে।

পাশার আড্ডা ভাঙ্গিবার খানিক পরে হঠাৎ দেখা গেল শম্ভু নাই। ছইয়ের ভিতরে বাহিরে এমন কি পাটাতনের নীচে পর্যন্ত কোথাও শম্ভুর খোঁজ মিলিল না। নৌকা তখন বড় নদী ছাড়িয়া একটা দামপচা খলের মধ্যে ঢুকিয়াছে—আজিকার মত এইখানেই নৌকা বাঁধিবে।

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন—দাও দেখি চক্কোত্তি তামাকে দুটো টান দিয়ে শরীলটাকে একটু গরম করে নেই। ওরে বাবা! যে সব কথা কইছ তোমরা—এই ছিল শম্বেটা এখেনে বসে। এরি মধ্যে এমন কপ্‌্‌র মেরে গেল কোথায়?—

প্রবীণ ভূধর চক্রবর্তী বলিলেন—এই বুড়োর কথা তো তোমরা বিশ্বেস করবে না ভায়া—শম্ভুকে নিশ্চয়ই নিশিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। বলিয়াই তাঁহার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাইকে একবার কেমন করিয়া নিশিতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহারই সালংকার বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

মুখুজ্যে মশাই কলিকাটাতে একটা গভীর দম দিয়া বলিলেন—কিন্তু যাই বল ভূধরদা, আমার কেন যেন তোমার কথায় পেত্যয় যায় না। আমার চালটাকে তুমি যখন উল্টে দেবার মৎলব করছিলে, বাইরে সেই সময় যেন "ঝপ" করে একটা ভারী আওয়াজ শুনেছিলুম—যা কুমীরের জায়গা। আমার তো মনে হয়—

এই রকম জলজ্যান্তো প্রমাণের পর আর অবিশ্বাস করা চলে না। শেষ পর্যন্ত সব্যস্ত হইল যে শম্ভুকে কুমীরেই টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু শম্ভুকে কুমীরে টানিয়া লইয়া যায় নাই। নৌকার বাহিরে পা ঝুলাইয়া শম্ভু তখন নন্দীপুর গ্রামের ঘর বাড়িগুলি হইতে একটি বিশেষ বাড়িকে লক্ষ করিয়া দেখিবার জন্য চোখ টান করিয়া বসিয়াছিল।

কুলীন দেখিয়া হরিদাস নন্দী শম্ভুর সহিত তাহার একমাত্র আদরের কন্যা বিজনের বিবাহ দেন—সে অনেকদিনের কথা। একবার কি দুইবার মাত্র সে এ পথে আসিয়া গিয়াছে। একটি ছেলেও হইয়াছিল। তারপর হঠাৎ একদিন চিঠি আসিল মাত্র দুইদিনের জ্বরে বিজনের মৃত্যু হইয়াছে।

—পাতলা ছিপছিপে গড়ন, গ্রামের মেয়েদের পক্ষে গায়ের রং ফর্সাই। বেশ সুন্দর দুটি স্নেহমাখানো টানা চোখ। ঠোঁটের নীচে ছোট্ট একটি তিল—এর বেশী শম্ভুর আর কিছুই মনে আসে না বিজনের চেহারা সম্বন্ধে। আর মনে পড়ে প্রথম

দেখা দিনের কয়েকটি টুকরা কথা—ওগো শুনছো, এরকম ঘুরে ঘুরে তুমি চেহারাটাকে এমন কালি করছ কেন বলতো?—

'ওগো শুনছো' সেই নূতন সম্বোধনটি শম্ভুর ভারি ভালো লাগে—কেমন একটা মোহ আছে যেন ওই আহ্বানের পিছনে—কিসের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ।—

—কালই চলে যাচ্ছো তবে, আবার কবে আসবে বলনা! আচ্ছা শোনো, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই?—ও, বলবে না বুঝি কি করবে তখন? তাতো বলবেই না। ভুলে যাবে কিনা, তাই!—শুনছ, ওগো বল না, ভুলে যাবে আমাকে সত্যিই?—

গলার স্বর শুনিয়া শম্ভু বুঝিতে পারে বিজন কাঁদিতেছে। আহা কাঁদছ কেন, কি বোকা মেয়ে, নিজের মনগড়া কথায় এমন করে কাঁদে—ও বিজন—কে বল্লে তোমায় ভুলে যাবো—ছিঃ! অনেক কষ্টে সেদিন বিজনকে থামাইয়া তবে শম্ভু বাঁচে।...

নৌকা তখন নন্দীপুর গ্রামের শেষ প্রান্ত—শ্মশানঘাটের ধার বাহিয়া চলিয়াছে।

—ওগো শুনছো—কান পাতিয়া শম্ভু শোনে। নৌকার গলুইয়ে জলের আঘাত লাগিয়া ছল ছল শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে আর মাঝে মঝে ছইয়ের ভিতর হইতে পাশা খেলার উৎকট চীৎকার—এছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

স্বপ্ন নয়—স্পষ্ট শম্ভু শুনিতে পায় বিজনের সেই পুরানো গলার স্বর—ওগো শুনছো।—চমৎকারভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া ডাকিবার সেই অনুপম ভঙ্গিটি শম্ভুর চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে।—

প্রথম দিনের সেই লাল আটপৌরে কাপড়টা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বিজন—তাহাকে যেন ডাকিতেছে হাতছানি দিয়া— কানে বাজিতেছে তখনও—ওগো শুনছো।—

শম্ভুর কেমন যেন একটা নেশা লাগে। সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ করিয়া ওঠে একটা অপূর্ব অনুভূতিতে। কখন যেন নিজের অজ্ঞাতেই নামিয়া পড়ে জলের মধ্যে।

বিজন! —

হ্যাঁ চিনতে পারছ দেখছি। ভুলে যাও নি সত্যিই—বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সমস্ত শ্মশানভূমিকে মুখরিত করিয়া তোলে।

বিমূঢ়ের মত শম্ভু স্তব্ধ হইয়া শুধু দাঁড়াইয়া থাকে। গা বহিয়া তখনও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। ভিজা কাপড় হাওয়ায় উড়িয়া একটা বিশ্রী পত্‌পত্ শব্দ করিতেছে। শম্ভুর মাথাটা কেমন যেন করিয়া ওঠে।

বিজন বলিতে থাকে—উঃ, কতদিন পরে এলে বলতো? এতদিন আসনি কেন—আমি সেইদিন থেকে চেয়ে আছি তোমার পথের দিকে! আমি না হয় তোমার কেউ নই কিন্তু তোমার খোকনকেও তো দেখতে এলে না একটি বারের জন্যে। উঃ, খোকনকে কতদিন দেখি না। আনলে না কেন সঙ্গে? একবার আনবে ওকে—বলনা, শুনছ?—শম্ভু ঘাড় নাড়ে কোন-প্রকারে।—আজ কিন্তু আর তোমাকে ছেড়ে দেবো না যতই তোমার কাজ থাক না কেন—বলিয়া বিজন আগলাইয়া শম্ভুকে ধরিতে আসে।

কি যেন একটা কথা বলিতে যায় শম্ভু, কিন্তু শব্দে তালুতে আসিয়া কথাগুলি সব জড়াইয়া যায়। তারপর আর কিছু মনে নাই।

পরদিন লোকের মুখে খবর পাইয়া হরিদাস নন্দীর ছেলে আসিয়া দেখিল তাহাদের জামাই শম্ভু দত্ত বিজনের চিতাটার পাশে পড়িয়া আছে—নাড়ী নাই।—

একটানা গল্পটা বলিয়া এতক্ষণে বীরেন থামে।

বধূ দূর হইতে ক্রমে ক্রমেই সরিয়া আসিতে থাকে বীরেনের কাছে।

—দেখতো,—ও ছায়া—ঐ-ই যে—বলিয়া ছায়ার মুখটা ধরিয়া জানালার দিকে করিতে চেষ্টা করে বীরেন।—ঐদেখ সেই শ্মশানঘাট—ঐ যে ভাঙ্গা মন্দিরটার গায়ে—ও ছায়া—

হাতের উপর তপ্ত কয়েক ফোঁটা জল পড়ে হঠাৎ।

—আরে! ও ছায়া, কাঁদছো?—

যান্। আপনি ভারি ইয়ে,—ইচ্ছে করেই সেই সন্ধ্যে থেকে কেবলি ভয় দেখাচ্ছেন—বলিতে বলিতে ছায়া এবার প্রকাশ্যেই কাঁদিয়া ফেলে।

সান্ত্বনা দিবার কোন ভাষা পায় না বীরেন—ভয় পাইয়া যায়। ওদিকে বাহিরে শ্বশুরবাড়ির বৃদ্ধ চাকর বৃন্দাবন বসিয়া আছে—ছিঃ ছিঃ যদি শুনিতে পায়!—

বিছানায় শুইয়া বীরেনের মনে পড়িয়া যায়—সেদিন ছায়াকে শান্ত করিতে বীরেন কি-না করিয়াছিল—মায় লজঞ্চুস পর্যন্ত সাধিয়াছিল—ছেলেমানুষ ছায়া!—

আলমারি খুলিয়া তুলা লইয়া ছায়া ফিরিয়া আসিল—কিন্তু কোথায় কাটা! একটু দাগ পর্যন্ত নাই।

—আজ আবার সেই গল্পটা বলব ছায়া, শুনবে?—হঠাৎ কোথা থেকে এত সাহস এল তোমার বলত? মেয়েদের স্বামী-ভক্তিটা বুঝি এমনিই একগুঁয়ে?—বলিয়া তাকাইতেই দুজনের মিলিত চোখ হাসিয়া উঠিল।

সেই গল্পের নাম শুনিয়া ছায়া ভয়ে কাছে সরিয়া বসে—না, তুমি বলো না ওসব—শুনছো!—

ঘুমাইবার ভাণ করিয়া বীরেন পড়িয়া থাকে।

আলো নিবাইয়া দেওয়াতে ঘরটা ভয়ানক অন্ধকার লাগিতেছিল। ভয়ে ছায়ার চোখে ঘুম আসে না।

মৃদুভাবে বীরেনকে ঠেলা দিয়া ডাকে ছায়া—ওগো শুনছ?—

বীরেন ঘুমের মধ্য হইতে জবাব দেয়—উঁ—

—আমার ঘুম পাচ্ছে না যে। কেন তুমি গল্পের কথাটা মনে করিয়ে দিলে বলত? উঠে জানালাটা একটু বন্ধ করে দেবে?—

বীরেন তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে—উঁহু, গরম লাগবে।—

—তবে আমায় ভয় দেখিয়ে দিলে কেন, বারে!—

হাতটা বাড়াইয়া বীরেন বলে—আচ্ছা বন্ধ করছি, কিন্তু পাশবালিশ—

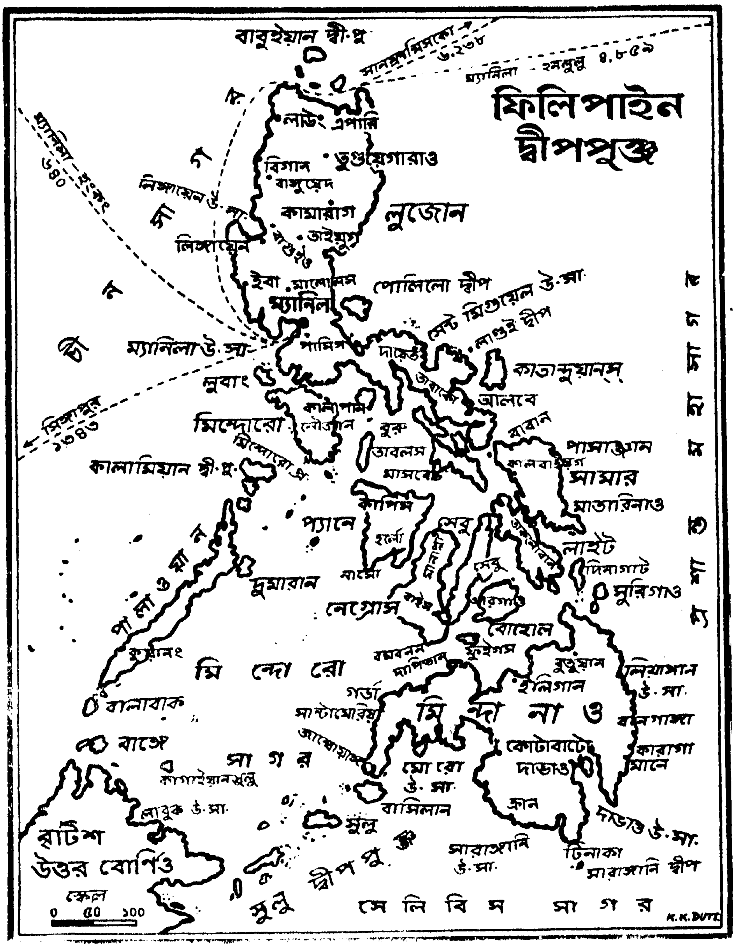
পাশবালিশটা তৎক্ষণাৎ স্থান পরিবর্তন করিয়া বীরেনের কুক্ষিগত হয়। জানালা বন্ধ করিয়া বীরেন শুইয়া পড়ে।

ফিলিপাইনের কথা

বসুবন্ধু শর্মা

যুদ্ধের সংঘাতে কত অজানা এবং অল্পজানা দেশই যে হঠাৎ আশ্চর্যরকম প্রসিদ্ধিলাভ করে, তার ইয়ত্তা নেই। হঠাৎ খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে তাদের নাম বেরোয়—কয়েকদিন ধ'রে তাদের ভাগ্য-নির্ণয় চলে—আবার বিস্মরণের অন্ধকারে তারা ডুবে যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে ইংরেজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও আজ এমনি প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করবার পর চারমাস অতীত হ'য়েছে; ফিলিপাইনের যুদ্ধ কিন্তু আজও শেষ হয়নি। ফিলিপাইনের প্রধান বন্দর এবং ঘাঁটিগুলি জাপানের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও ফিলিপাইনবাসীরা আজও জাপানের বশ্যতা স্বীকার করেনি। বাটান্ উপদ্বীপে সেনাপতি ম্যাকআর্থারের অধীনে ফিলিপিনো সৈন্যেরা অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন ক'রছে। এই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং তার অধিবাসীদের নিয়েই আমি বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব।

সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। সস্তা চুরুট এবং ম্যানিলার দড়ির জন্মস্থানরূপেই বাহিরের জগৎ ফিলিপাইনকে চেনে, কিন্তু এই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। প্রাকৃতিক সম্পদেও ফিলিপাইন বেশ সমৃদ্ধ। ফিলিপাইনে দ্বীপের সংখ্যা খুব বেশী; ছোট বড় মিলে দ্বীপের সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। এই সব দ্বীপের তিন ভাগের দুই ভাগে মাত্র লোকের বসতি আছে; এদের মধ্যে সব চেয়ে বড় দ্বীপ হচ্ছে লুজন এবং মিণ্ডানো। লুজন আয়তনে প্রায় ওহিওর সমান। বাকী প্রায় ২৭৭৫টি দ্বীপের প্রত্যেকটির আয়তন এক বর্গ মাইলের বেশী নয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অর্ধচন্দ্রাকারে এসিয়ার উপকূলভাগকে আলিঙ্গন ক'রে আছে বললেও চলে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আবহাওয়ার বিভিন্নতা দেখা যায়। লুজনের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ওক্, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মায়; এখানে রাত্রে জলের ওপর পাতলা বরফের পর্দাও পড়ে। কিন্তু মিণ্ডানোর আবহাওয়া আবার সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে সুন্দর সমুদ্রবায়ু প্রবাহ সত্ত্বেও দিন এবং রাত্রে বেশ গরম পড়ে—গা' থেকে অনবরত ঘাম ঝরে। মাঝে মাঝে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং মাঝে মাঝে মোটেই বৃষ্টি হয় না। এখানে খুব টাইফুন ওঠে। কতকগুলো দ্বীপ জ্বরের রাজ্য বললেও চলে—আবার কতকগুলো দ্বীপের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। বেশীর ভাগ দ্বীপই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ—আগ্নেয়গিরিশৃঙ্গ, বনভূমি, হ্রদ, উন্মুক্ত প্রান্তর এবং পর্বতশ্রেণী সত্যই মনোমুগ্ধকর। এই দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, চিনি, গাঁজা, তামাক, রবার প্রভৃতি খুব প্রসিদ্ধ।



১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উড্‌ফর্সের রিপোর্ট অনুসারে এই দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ: আদি অধিবাসী এক কোটি দশ লক্ষ, চীনা ৫৫২১২, জাপানী প্রায় ১৫০০০, আমেরিকান্ ৬৯৩১, ইংরেজ ১২০২ এবং স্প্যানিস ৪২৭১। দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪০জন শিক্ষিত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮৭ রকমের কথ্যভাষা প্রচলিত। জাপ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ৬৬ মাইল দূরে, বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ২০ মাইল এবং ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ৪৩ মাইল দূরে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা থেকে হংকংয়ের দূরত্ব হ'চ্ছে ৬৩০ মাইল।

আমেরিকার অধীনস্থ এই দ্বীপপুঞ্জটির দিকে বহুদিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার্ত জাপানের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ

ছিল। ফিলিপাইনের প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও, সামরিক ঘাঁটি হিসাবেও এর গুরুত্ব খুব বেশী। জাপানের সঙ্গে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্ত হ'লে এসিয়ার সমস্ত পূর্ব উপকূলে জাপানী প্রভাব বিস্তৃত হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার নৌশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ফিলিপাইন যে অপরিহার্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক থেকেও ফিলিপাইনের গুরুত্ব যে কম নয় সে তার উৎপন্ন দ্রব্যের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মধ্যে তিনটি প্রধান বিভাগ পরিলক্ষিত হয়—যথা লুজন দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী, এদের বলা হয় ইগরট্ (Igorot); দ্বিতীয় দক্ষিণ অঞ্চলের দ্বীপগুলির মুসলমান ধর্মাবলম্বী মরস্ (Moros) এবং তৃতীয় খৃস্টধর্মাবলম্বী ফিলিপিনো সম্প্রদায়। এরা সবাই প্রায় মালয় জাতি থেকে উদ্ভূত। ফিলিপিনোদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী—শতকরা নব্বই জন অধিবাসীই ফিলিপিনো সম্প্রদায়ভুক্ত।

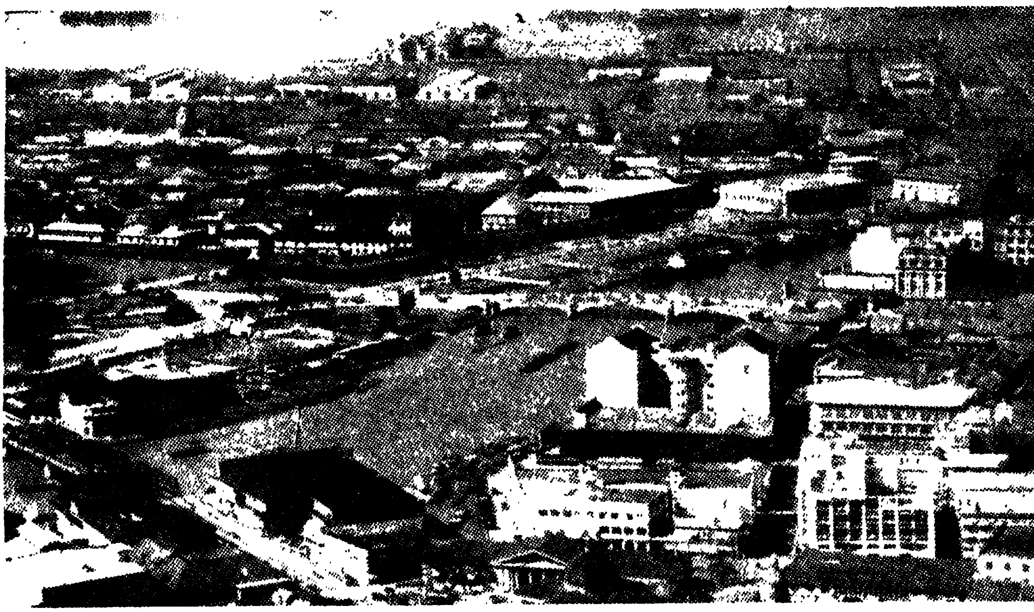
মালয়বংশসম্ভূত ব'লেই ফিলিপিনোদের মধ্যে জাতি-বিভাগ নেই। এরা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ বিত্তবান্ শ্রেণী এবং দরিদ্র কৃষক শ্রেণী। বিত্তবান্ শ্রেণীকে বলা হয় ক্যাসিকে (Cacique) এবং কৃষকদের বলা হয় টাও (Tao)। দেশের রাজনীতিক কিংবা শাসন বিষয়ে টাওদের কিছুমাত্র প্রতিপত্তি নেই বললেই চলে। রাজনীতি ধনী ক্যাসিকেদেরই একচেটিয়া জিনিস। টাও শ্রেণীকে শোষণ এবং নিষ্পেষণ ক'রেই ক্যাসিকেরা দাঁড়িয়ে আছে। এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের সুবিধানুযায়ী দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত করে। ফলে দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় ভীষণভাবে অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হয়। অথচ মুষ্টিমেয় ক্যাসিকেদের বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে পারে না—কারণ এদের কাছে ঋণের দায়ে তাদের হাত পা' বাঁধা কৃষক সম্প্রদায় অত্যন্ত দরিদ্র ব'লেই অতিরিক্ত চড়া সুদে ক্যাসিকেদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। প্রায় সমস্ত জমির মালিক ঐ ক্যাসিকে সম্প্রদায়, কাজেই হতভাগ্য কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা অতি সহজেই অনুমেয়। সহজভাবে বল্‌তে গেলে ক্যাসিকেদের জীবন তিনটি মাত্র কাজ আছে—তাদের কাজ হ'চ্ছে রাজনীতি, ব্যবসা হ'চ্ছে সুদ নেওয়া এবং আমোদ প্রমোদের মধ্যে জুয়া খেলা। ফিলিপাইনে কৃষিকার্যের উন্নতির প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, সেটা সম্ভব হয়নি—শুধু এই ক্যাসিকেদের জন্য। যা' কিছু জমি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য তা সবই এই ক্যাসিকেদের হাতে। এই অভিজাত ধনী সম্প্রদায় ম্যানিলাতে বিরাট বিরাট ভোজ দেয়—তার খরচ জোগায় দরিদ্র কৃষকেরা। কৃষকেরা যে না খেয়ে মরে সেদিকে নজর দেবার অবসর নেই কারও। মধ্য লুজনের একটি অঞ্চলের শতকরা নব্বই ভাগ জমি হ'চ্ছে সমগ্র অধিবাসীদের শতকরা দুই জনের হাতে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ফিলিপাইনে এখন পর্যন্ত মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রই পুরো দমে চল্‌ছে। শাসক সম্প্রদায় ছাড়া খৃস্টীয় ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবও এখানে খুব বেশী। এখানকার প্রধান খাদ্য-শস্য ধান। ফিলিপাইনের লুয়েসা একিজা প্রদেশই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ধান্য উৎপাদন কেন্দ্র।

বর্তমানে ফিলিপিনোদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রেই এ প্রসঙ্গের শেষ করব। ফিলিপাইনের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে দুটি লোকের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ তাঁদের একজনের নাম অ্যাগুননালডো (Aguinaldo), আর একজনের নাম ম্যানুয়েল কোয়েজন্ (Manuel Quezon)। ১৫২১ খৃস্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ম্যাগেলান্ সর্বপ্রথম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে বহুদিন পর্যন্ত ফিলিপাইন স্পেন সাম্রাজ্যের একটা অনাদৃত এবং বিস্মৃত অংশ হিসাবেই ছিল। সুদূর ম্যাড্রিড থেকে স্থানীয় ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায় এবং কয়েকজন অভিজাত স্পেনীয় ভূম্যধিকারীর মারফতেই শাসন-কার্য চল্‌ত। স্পেনদেশবাসীদের মারফতেই এখানে খৃস্টধর্ম প্রচারিত হয় এবং আদিম অধিবাসীদের স্পেনীয়দের রক্তের সংমিশ্রণও ঘটে। এর ফলেই ফিলিপিনোদের সৃষ্টি। হঠাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফিলিপিনোদের মধ্যে দেশাত্ম-বোধ জেগে ওঠে। স্পেনীয় অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যাচারিত ফিলিপিনোরা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। নিজেদের দেশ থেকে বিদেশী শাসন সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগে যায়। এর ফলেই ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের প্রসিদ্ধ ফিলিপিনো বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। অ্যাগুইনালডো নামক একজন স্বদেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতার নেতৃত্বে ফিলি-পিনোরা স্পেনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ ঘোষণার পরে বিপ্লবী পক্ষই জিত্‌তে থাকে। এই সময়ে হঠাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বেধে যায়। স্পেনকে ঘায়েল করার জন্য আমেরিকা ফিলিপাইন্ আক্রমণ করে; বিপ্লবীদের আমেরিকা ভরসা দেয় তাদের সে সাহায্য করবে। তারপর বিজয়ী আমেরিকা নিঃশব্দে নিজেই ফিলিপাইন গ্রাস ক'রে ব'সে। এমনই করে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রের অধীনে আসে। বিদ্রোহী নেতা অ্যাগুইনালডো কিন্তু যুক্তরাস্ট্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ক'রে চলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁর পক্ষে এই যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়নি। ১৯০১ খৃস্টাব্দে তিনি ধরা পড়েন এবং ফিলিপাইনের স্বাধীনতার যুদ্ধও এখানেই শেষ হয়।

অ্যাগুইনালডো বিদ্রোহী দলে একটি তরুণ যুবক যোগ দিয়েছিলেন; তাঁর নাম ম্যানুয়েল্ কোয়েজন্। তিনি নিজের দক্ষতার গুণে এক বছরের মধ্যেই সাধারণ সৈনিক থেকে মেজরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। অ্যাগুইনালডো ধরা পড়লে, তিনিও ধরা পড়েন এবং রাজদ্রোহের জন্য ছয়মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগের পর ম্যানিলা জেলের যে গেটটি দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসেন, পনরবছর পরে তিনি যখন ওয়াশিংটন থেকে 'জোন্‌সল' (এই আইনই ফিলিপাইনের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল) পকেটে নিয়ে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সম্মানার্থ সেই গেটটির নামকরণ করা হয়েছিল কোয়েজন্ গেট।

কারাদণ্ড ভোগের পর থেকে কোয়েজনের একমাত্র চিন্তা হ'ল কি ক'রে ফিলিপাইনকে স্বাধীন করা যায়। একাগ্রচিত্তে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন চালাতে

লাগ্‌লেন। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের মূলে ছিল দুটি জিনিস। প্রথমত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি জাতির মত পাকা সাম্রাজ্যবাদী নয়—কোনদিনই সাম্রাজ্যের দিকে তার নজর প্রবল ছিল না। তদুপরি ১৯১৩ খৃস্টাব্দে বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতার বড় সমর্থক উইলসন্ যখন যুক্তরাস্ট্রের সভাপতি হ'লেন, তখন স্বাধীনতাকামী ফিলিপিনোদের মনে কিঞ্চিত আশার সঞ্চার হ'ল। দ্বিতীয়ত চিনির ব্যবসাও এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ফিলিপাইন আমেরিকার অধীন থাকায় এই দ্বীপপুঞ্জের চিনি বিনা শুল্কে আমেরিকার বাজারে ঢুকবার সুবিধা পায়। ফিলিপাইনের ফিলিপাইনের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ফ্রান্সিস্ বার্টন্ হ্যারিসনকে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে ফিলিপাইনের গভর্নর পদে মনোনীত করালেন। ১৯১৬ খৃস্টাব্দের জোনস্ বিল-এর পিছনেও যে তাঁরই আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯১৯ খৃস্টাব্দের দিকে কোয়েজন বুঝতে পারলেন যে ওয়াশিংটনের চেয়ে ম্যানিলায় থেকে যুক্তরাস্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান সুবিধা হবে; তাই তিনি ফিলিপাইন সেনেটের সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। এই সময় গভর্নর ছিলেন সেনাপতি উড্—তিনি হ্যারিসনের অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করছিলেন। উডের সঙ্গে কোয়েজনের অবিশ্রাম বিরোধিতা চ'লেছিল।



ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা শহরের দৃশ্য।

শতকরা ৭২ ভাগ ব্যবসাই হ'চ্ছে আমেরিকার যুক্তরাস্ট্রের সাথে—তার আবার ৬০ ভাগই হ'চ্ছে চিনির ব্যবসায়। ফিলিপাইনের চিনি আমেরিকার বাজারে এই সুবিধা পায়, আমেরিকার ব্যবসায়ীরা এটা চায় না। তার কারণ আমেরিকার নিজস্ব চিনির ব্যবসায় আছে—আরও আছে কিউবার চিনি। কিউবার চিনির ব্যবসায়ে আমেরিকার ব্যবসায়ীরা অনেক অর্থ ঢেলেছে। তাই ফিলিপাইন স্বাধীন হ'লে আমেরিকার বাজারে তার চিনির উপর শুল্ক বসবে—এতে ব্যবসায়ীদের খুব সুবিধা হবে। তাই আমেরিকার চিনির ব্যবসায়ীরা ছিল ফিলিপাইনের স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী।

কোয়েজন্ দেখতে পেয়েছিলেন যে, যুক্তরাস্ট্রের ওয়াশিংটনই সব কিছুর মূলে। সেখান থেকেই ফিলিপাইনের ভাগ্যানিয়ন্ত্রিত হয়—তাই তিনি চেষ্টা ক'রে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ওয়াশিংটনে রেসিডেন্ট কমিশনারের পদ গ্রহণ কর্‌লেন। তিনি ১৯১৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে অবশেষে ধীরে ধীরে ওয়াশিংটনের চৈতন্যোদয় হ'ল। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে ওয়াশিংটন থেকে টাইডিংস্ ম্যাক্‌ডাফি বিল (Tydings-McDuffie Bill)—এতে সম্পূর্ণভাবে ফিলিপাইনের স্বাধীনতা স্বীকৃত না হ'লেও, পরীক্ষামূলক স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল। সাময়িকভাবে ফিলিপাইনকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হ'ল এবং ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'লো। সাধারণ নির্বাচনে কোয়েজন ফিলিপাইনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হ'লেন। এই নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর বিপ্লবী গুরু বৃদ্ধ সেনাপতি অ্যাগুইনালডো। সেনাপতি অ্যাগুইনালডো আশু পূর্ণ স্বাধীনতা চান। গভর্নরের পদ উঠে গিয়ে একটি হাই-কমিশনারের পদ সৃষ্টি হ'ল। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জের আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকা দায়ী থাকবে—১৯৪৬ খৃস্টাব্দে আমেরিকা তার সমস্ত সামরিক ঘাঁটি উঠিয়ে নেবে। তবে টাইডিংস ম্যাক্ ডাফি বিলে নৌঘাঁটি সম্বন্ধে কোন কথা

নেই। শুল্ক ব্যবস্থা, উপনিবেশ স্থাপন, ঋণ, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আপাতত আমেরিকার আইনই বলবৎ থাকবে—তবে ১৯৪৬'খৃস্টাব্দে এ সব আইনই উঠিয়ে নেওয়া হবে। ফিলিপাইন তখন স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে পরিণত হবে—আমেরিকার কোন কর্তৃত্বই থাকবে না তার উপরে। মাঝের এই দশটি বছর ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা এবং আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হবে। ফিলিপাইনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ফিলিপিনোদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে এবং থাকা খুব স্বাভাবিক। অ্যাগুইনালডোর মত চরমপন্থী বিপ্লবী চান পূর্ণ স্বাধীনতা। আবার আর একদল আছেন যাঁরা যুক্তরাস্ট্রের অধীনে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ পেলেই সন্তুষ্ট। এই প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে আছে চিনির ব্যবসায়ী এবং যাজক সম্প্রদায়। ফিলিপাইন স্বাধীন হ'লে আমেরিকায় ফিলিপাইনের চিনির বাজার বন্ধ হয়ে যাবে—তাই তারা চায় ডোমিনিয়ন্ স্টেটাস্। আর যাজক সম্প্রদায় ভয় করে যে ফিলিপাইন স্বাধীন হ'লে সামাজিক বিপ্লব দেখা দেবে—ফলে তাদের কর্তৃত্ব ব্যাহত হবে। তবে সংখ্যার দিক থেকে বেশীর ভাগ ফিলিপিনোই যে স্বাধীনতা চায় সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ইতিমধ্যেই সভাপতি কোয়েজন্ ফিলিপাইন থেকে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও যাজকশক্তি দূর করবার জন্য চেষ্টা ক'রেছেন। তিনি প্রধানত তাঁর স্ত্রীর প্ররোচনায় ফিলিপিনো মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার আগেই এই স্বাধীনতাকামী জাতির ভাগ্যে আবার দুর্দিন এসেছে। ফ্যাসিস্ত জাপান ফিলিপাইন আক্রমণ ক'রেছে এবং বহু স্থান দখল করেছে। নবলব্ধ স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ফিলিপিনোরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছে। চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ সাধনায় ফিলিপিনোরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছে, আজ তাই তারা হারাতে ব'সেছে। জাপানের কাছে হেরে গেলে আবার কতদিনে তারা যে সেই স্বাধীনতা ফিরে পাবে—কে জানে।

কন্যাকুমারীর পথে

(৫৩৭ পৃষ্ঠার পর)

আমরা সাধারণত যে সব চিংড়ী দেখতে পাই, এগুলো সব অ-লবণাক্ত জলে পাওয়া যায়। সেই জন্য এগুলো এক জাতের। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অন্য আর এক জাতের চিংড়ী পাওয়া যায়। তবে সমুদ্রের চিংড়ীগুলোর মধ্যে অ-লবণাক্ত জলের চিংড়ীর চেয়ে জাতের ভাগটা আরও বেশী। সেই জন্য এদের সমুদ্রের জলে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন রংয়ের দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এই দ্বীপে যে সব চিংড়ীর খোলা পেলাম, সেগুলোর মধ্যে কোন কোনটা দুই ফিট থেকে আড়াই ফিট পর্যন্ত লম্বা। এগুলোর মাথার সামনের দিকের খড়্গের মত ছুঁচলো জিনিসটাই প্রায় ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা। তাছাড়া, সমস্ত খোলসটা বেশ সুন্দর রংচংয়ে।

সিংগল্ দ্বীপটা বেশ ভাল করে ঘুরে আমরা কুশাডাই ফেরবার জন্য আবার লঞ্চে উঠলাম। বেলা প্রায় বারোটায় আমরা কুশাডাই ফিরলাম। লঞ্চ থেকে নেমে সকলে বাকি কাজ, যেমন রান্না, প্রাণী সংগ্রহের বাক্স গোছান ইত্যাদি—কাজে লাগল। আমাদের এখান থেকে বেলা তিনটার সময় রওনা হতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জিনিসপত্রগুলো লঞ্চে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে লেবরেটরীর মাঝের হলঘরে জমা হলাম। মিঃ চাকোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে লঞ্চে চড়লাম।

লঞ্চ জেটি থেকে ছাড়ল। খানিকটা এগিয়ে এসে লঞ্চটা খোলা সমুদ্রে পড়ল। সমুদ্র ভয়ানক অশান্ত। বড় বড় ঢেউগুলো লঞ্চের গায়ে এসে লেগে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। লঞ্চটা একটা ছোট মোচার খোলার মত একবার একপাশে কাত হয়ে জল ছুঁয়ে আবার আর একদিকে কাত হয়ে পড়ছে। লঞ্চটার সামনের দিকটার ওপর দিয়ে কয়েকটা ঢেউও চলে গেল। আমরা বেশ শক্ত করে ধরে বসে রইলাম। জামা-কাপড় জলের ছাটে ভিজে উঠল।

কবিগুরুর কয়েকটা লাইন মনে পড়ল।

"তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী
টানিয়া রাখিতে হবে পাল
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল"

কিছুক্ষণ বাদে লঞ্চ এসে এপাড়ে লাগল। যেখান থেকে প্রথম দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করেছিলাম, আবার সেইখানেই যাত্রা শেষ করলাম। এখান থেকে রওনা হবার দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন মনে ছিল নতুনকে জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহ। আজ সেই নতুন পুরাতন, অচেনা চেনা হয়ে গেছে। সেদিন পড়ন্ত বেলায় ঐ দূরের আবছা স্থলরেখার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম—আর আজও তাকিয়ে দেখছি। সেদিন ছিল চোখে কৌতূহল—আর আজ চোখে জল।

কিন্তু উপায় নেই, আমাদের আবার নতুনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য এগিয়েই যেতে হবে।

"আগে চল, আগে চল, ভাই"

জিনিসপত্র নিয়ে আবার পাম্বন স্টেশনে এলাম। এবার আমরা রামেশ্বরমের দিকে যাব। সেখানেও কিছু সংগ্রহ করব। এখানকার সমুদ্রে সংগ্রহের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণপিল্লাইকে নিয়ে যাচ্ছি।

(ক্রমশ)

নদীচরে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

'—এবার ছুটি। তোর দেনাপাওনা তো সব চুকিয়ে দিয়েছি—'

নিশানাথের কথাগুলি মর্মভেদী। রাখালি কোন কথা বলতে পারল না, ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে—বলবার অনেক কথাই ছিল। রাখালির জলভরা দুটি চোখ নিশানাথের ব্যথাতুর চোখের সঙ্গে বিনিময় হ'ল। অশ্রুভারাক্রান্ত রাখালি।

নিশানাথ লগি টানে আর বলে—'যে উপকার তুই করেছিস্ রাখালি—'

কথায় বাধা দিয়া রাখালি উত্তর দেয়—'রোজ ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়া, আর হাটে-বাজারে মাছ বেঁচে পেট চালানো—'

নিশানাথ মৃদু হেসে বলে—'মুহুরি হইনি বলে তোর বুঝি দুঃখু এত!'

সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে, ওপারের কূলে কূলে কালো ছায়া নিবিড় হয়।

নিশানাথ বইঠা ঠিক করে নেয়, তার পর বলে—'না হয় মামুলি মতটা বদলে দিলাম—'

'—কিন্তু এই হাড়ভাঙা খাটুনি—'

'—তাতে দুঃখু কেন রাখালি! লেখাপড়া শেখা মানেই তো মুহুরি হওয়া—'

দূর গাঁয়ের পথ হ'তে মেঠো বাঁশীর সুর সকরুণ পূরবীতে ভেসে আসে।

লগি টেনে টেনে নিশানাথ খানিক দূর গিয়ে বললে—'বাড়ি যা, কেউ আবার দেখতে পাবে—'

ষোড়শী বধূ পাষাণীর মত শূন্যঘাটে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশানাথের ডিঙি অন্তর্হিত হ'য়ে যায়।

সন্ধ্যার আঁধার ভেদ ক'রে আবার শব্দ আসে—'রাখালি তুই বাড়ি যা—'

রাখালির চমক ভাঙে। ও-ভাবে—সত্যি তো, কেউ জানতে পারলে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দেবে, তার ওপর আছে প্রহার। কি একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ওর মন ভারাক্রান্ত হয়! বাড়ি ফিরে যেতে মন সরে না।

আপন মনে বলে—'তিন বছর বয়েসে জেলের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়ে শেষে জেলের ঘরে সংসার পেতে বসলাম। সুখী হ'তে পারলাম না—একদিনের জন্যেও নয়। আমার কি মরণ হবে না!'

আর ভাবতে পারে না, চোখের জল মুছতে মুছতে ষোড়শী বধূ জল ভরে' নিয়ে কলসী কাঁখে বাড়ি ফিরে যায়—অন্ধকার পথে জোনাকিরা ঝিক্‌মিক্ করতে থাকে।

নদীর আশেপাশে জঙ্গল থেকে শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে। রাখালির মনে হচ্ছিল, ওর বুঝি জীবনের কালরাত্রি আগতপ্রায়।

নিস্তব্ধ নদীর মাঝখান দিয়ে চলেছে' নিশানাথ।...

কত কথাই না তার মনে পড়ছে' আপন মনে বল্‌তে থাকে—'এতদিন পরে' মুক্তি পেলাম। রাখালির টাকাগুলো শোধ হোলো, ও যদি আমার দুঃসময়ে টাকা না দিত, তা হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতাম! না খেয়েই মর্‌তে হোতো। ওর বাবার দেওয়া লুকিয়ে রাখা টাকা—সেই টাকা যে শোধ কর্‌তে পেরেছি এই আমার মুক্তি—'

ডিঙি চল্‌তে থাকে—আজ সে কোথায় চলেছে, তা নিজেও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছেনা। সংসারের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন বিধবা মা, তিনিও মারা গেছেন। আকর্ষণ একমাত্র রাখালির ওপর কিন্তু ওর প্রতি চলেছে নির্মম অত্যাচার। নিশানাথ ভাবে আর আপন মনে বলে—'আমার জন্যে রাখালি কেন এত কষ্ট পায়! আমি তো ওর কোন কষ্টেরই লাঘব কর্‌তে পার্‌লাম না, তবে কেন আর কষ্ট দিয়ে ওর জীবনটাকে বিষাক্ত করে তুলি—'

সেই রাখলি—আজ ষোড়শী বধূ। নদীর চর থেকে কুড়িয়ে এনে কুড়োন ওকে মানুষ কর্‌লে, বিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেল—সেও যদি আজ বেঁচে থাক্‌তো! দশ বছর বয়সে স্বামীর ঘর কর্‌তে এসে একদিনও শান্তি পে'ল না, স্বামীর আদর পে'ল না—কেবল নির্যাতন। ওর অপরাধ এমন কিছুই নয়, অথচ ওর ওপর রয়েছে মিথ্যা অপবাদের দারুণ বোঝা। ছেলেবেলাকার ছবি নিশানাথের মনে পড়ে—রাখালি ওর গলায় বনফুলের মালা গাঁথা দিয়ে কত সোহাগই না দেখিয়েছে! অসুখ হয়েছে,—রাখালি মুখখানি ম্লান করে বসে আছে, খাওয়া নাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেছে—এম্নি কত স্মৃতি!

নিশানাথ বল্‌তে থাকে—'কুড়োনের ছেলেরাও ওকে জায়গা দিলে না! ওকি তবে জগতের কাছে কোন দিন আদর পাবে না—কি এমন ওর অপরাধ!' পরক্ষণে মনে হয়,—রাখালিকে তো কিছু বলে আসা হোলো না,—ফির্‌বো না, এর আভাস ওতো একটুও পেলো না!

বহুদিনের পরিচয়, ভালবাসা আর হৃদি বিনিময় একদিনেই মুছে যাবে! নিশানাথ একমনে এই সব কথা ভাবে আর ডিঙি বেয়ে চল্‌তে থাকে। বাতাসে অরণ্যের মর্মরধ্বনি নদী-পথে ভেসে আসে।

'—নিশু তোকে নদীরধারে কি বল্‌ছিল রে!—'

সহায়রাম বেশ একটু চড়া পর্দায় বল্‌তেই রাখালি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। ওর রক্তিমাভ মুখখানি পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ তখনো জ্বালা হয়নি, তুলসীতলা নিষ্প্রদীপ। রাখালি নিরুত্তর। স্বামী যে হঠাৎ এদিন হাট থেকে এত আগেই ফিরবে, তা ছিল রাখালির স্বপ্নের অগোচর। প্রাত্যহিক জীবনের অত্যাচার আর অপমানের প্রাচুর্য নিয়ে যে সংসারে অসহায়া ষোড়শীবধূ রাখালি মাথানত করে' এতদিন ঘরকন্না করছিল, সে সংসারে আজ যেন থাক্‌তে ওর মন কোন-মতেই চাইছে না।

সহায়রামের কণ্ঠস্বর ক্রমেই সপ্তমে উঠ্‌লো। বল্‌লে—

'ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস্, ভাবছিস বুঝি শিবের বাবাও টের পাবে না—কেমন? এইবার তোর—' পৌনঃপুনিক প্রহার চল্‌তে থাকে, সহায়রাম খুব রেগেছে বলে' সব কথা প্রকাশ করতে পারে না।' কলসী মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে। পশ্বাচার ওঠে চরমে—পশুর মত গর্জন বনপ্রান্তর কাঁপিয়ে তোলে। রাখালির খোঁপা খুলে যায়—পরণের কাপড় এলোমেলো হয়ে পড়ে।

'—ওমা, মাগো—' আর্তকণ্ঠস্বর শোনা যায়, শেষে রাখালি আঙিনায় মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

সহায়রাম ভ্রূক্ষেপ করে না,—বলে—'আসি আগে বিপুনে খুড়োর কাছ থেকে, তারপর দেখাচ্ছি—'

আর বেশী বল্‌তে পারে না, রাগে সর্বশরীর কাঁপতে থাকে, শেষে বিপিন জেলের গাঁজার আড্‌ডায় চলে যায়।

রাখালির কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য হোলো। উঠে বস্‌লো—ভাবলো এ জীবনের প্রয়োজন কি! বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে—বহুকাল সেখানকার সংস্রব চুকিয়ে দিয়েছে, কেউ তো খোঁজ করে না! অভিমানিনীর অন্তর বিষিয়ে ওঠে।

ওর জীবনের ইতিহাস কেউ খুঁজ্‌লো না, ওর দুঃখের পাঁচালী কেউ শুন্‌লো না। ও যেন জগতে গৃহপালিত মূক পশু—ও যে মানুষ, ওর যে প্রাণ আছে, স্নেহ-মমতা আছে, মাধুর্য আছে—কেউ কি ভেবেছে! নিশানাথ—হ্যাঁ নিশানাথই ওর নারীত্বের মর্যাদা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছে, ওর হৃদয়ের পাথেয় জুগিয়েছে, ওর মরুজীবনকে শ্যামল করবার জন্য নিজের জীবনকে বহুবার বিপন্ন করেছে।

—তাই নিশানাথের কথাই ওর মনে পড়ে। জীবনকে বিপন্ন করেও যে ভালবাসতে পারে, তার ভালবাসার মূল্য আছে বৈকি!

এই নিশানাথ ছেলেবেলা থেকেই ওকে ভালবেসেছে—আম কুড়ানো, কানামাছি খেলা, সাঁতার কাটা, গাছে উঠে দোল খাওয়া—এম্নিধারা কত কি-ই না ওর সঙ্গে করেছে। আজ হারানো দিনের কথাগুলি যেন ব্যথাবেদনার মাঝে ফুটে উঠতে চায়। মনে পড়ে সেই কথা—'বিয়ে হয়ে গেলে কার সঙ্গে খেলা-ঘর বাঁধবো—' চোখ জলে ভরে ওঠে—সত্যি তো! নিশানাথের খেলাঘর আর বাঁধা হোলে না। পথে পথে কাটিয়ে দিল জীবন। মনে পড়ে—কৈশোরের পথ বেয়ে যৌবন দেখা দিল। যৌবনশ্রী বুকে করে নিয়ে রাখালি নিশানাথের কাছে এসে দাঁড়ালো—ও বল্‌লো,—'কে বল্‌বে তোরে জেলের মেয়ে—স্বর্গের পরী'—অমন করে প্রশংসা তো কেউ কোনদিন করেনি!

কত না অসতর্ক মুহূর্তে রাখালির আঁচল ধরে টেনে এনে নিশানাথ কোলের কাছে বসিয়ে গল্প, রংতামাসা করেছে! দুঃসাহসের ভেতর দিয়ে কতদিন না সে সাহসের জয়যাত্রা করেছে! কিছুদিন আগেও নিশানাথ ছুটে এসে ওকে বাঁচালো—সহায়রামের সঙ্গে বচসা ও মারপিট হয়ে গেল। সেদিন প্রহারের মাত্রা এত বেশী হয়েছিল যে, রাখালি উচ্চৈঃস্বরে—'বাবাগো, মেরে ফেল্‌লে গো—' বলে' ভীষণ চীৎকার করে উঠেছিল, নিশানাথ নদীতট থেকে ছুটে এসে বাঁচিয়েছিল, তারপর চলেছিল সহায়রামের সঙ্গে মারপিট।

'—আমার জন্যেই তো এইসব! আমি তো মরেছি, তার সঙ্গে আর একটা প্রাণ কেন নষ্ট হয়!—' রাখালি আপন মনে বলে।

আকাশের তারাগুলো ওর দিকে সজল নয়নে চেয়ে থাকে। ভাবতে থাকে অতীত দিনের কথা, চোখ দিয়ে জল পড়ে। বর্তমানের বেদনা এতই তীব্র যে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। ও কেবল মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে হারানো দিনের স্মৃতিগুলো নিয়ে—শেষে আর পারলো না। বলে উঠ্‌লো—'না, আর নয়, এখানে আমার ঠাঁই নেই—' গভীর দীর্ঘশ্বাসের ভেতর ধুলো আর রক্তমাখা কাপড়খানি গুছিয়ে পর্‌লো, তারপর তুলসীতলায় প্রণাম করে' কুঁড়ের ভেতর চলে গেল, থম্‌কে দাঁড়ালো—এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে প্রদীপ জেব্‌লে মেঝে খুঁড়লো—কুড়োনের দেওয়া টাকার বাক্সটা বের করলো, আর কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে পোঁট্‌লা বাঁধলো। শেষে আপন মনে বল্‌লো—'না, আর কাপড় ছাড়বো না—এই রক্তের দাগ, এই মারের দাগ থাক আমার সাথী হয়ে—'

বাহিরে এলো—সমস্ত পৃথিবীটাকে একবার ভালো করে দেখে নিল। মনে হোলো গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও পৃথিবী যেন তাকে গিলে ফেলতে চায়। ভয় হয়—মনটাকে দৃঢ় করবার চেষ্টা করে—যদি সহায়রাম ফিরে আসে এখুনি! না, আর থাকা চলে না, কোনমতেই না। বিদ্রোহী মন ক্ষেপে ওঠে। শেষে তুলসীতলায় প্রণাম করে বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যাবার সময় আপন মনে বলে উঠ্‌লো—'এই যে ভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর যেন ফিরতে না হয়—' নদীর ঘাটের দিকে রাখালি চলে গেল, মনে কি ভাব পোষণ করে চল্‌লো—সে-ই জানে! হয়তো নিশানাথের ফেরার আশায়, হয়তো ওর এ আশা না-ও থাক্‌তে পারে! খানিকক্ষণ পথ চলার পর ওকে বল্‌তে শোনা গেল—'কেন বলে গেল এবার ছুটি! তবে কি সে নেই!'

গভীর অন্ধকার। অমা রাত্রি। কোলের মানুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। সংসারের উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা ষোড়শী বধূ অভিমান করে' ঘর ছেড়ে চলে গেল। নদীতে তখন বোধ হয় জোয়ার আস্‌ছিল, তারই শব্দে নদীতট মুখর হয়ে উঠেছিল। দূরে জেলেদের মাছধরার ডিঙ্গি থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। নদীর ধার দিয়ে রাখালি পথ চল্‌তে লাগলো আর নিশানাথের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো।

নিশানাথ রাখালির সমস্ত অন্তরটা জুড়ে বসে আছে। সে চলেছে—যেদিকে তার দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বলে ওঠে সেদিকেই সে যেন দেখতে পায় নিশানাথ। ছুট্‌তে থাকে—পাগলিণীর মত ছুট্‌তে থাকে,—ওর মনে হয় ঐ বুঝি নিশানাথ আস্‌ছে—ওকে ডাক্‌ছে—আঁধারের মাঝেও যেন নিশানাথের ছায়া দোলে, তার পায়ে চলার শব্দ কানে বাজে।

ভয় নেই—ভরসা নেই। তবুও চলেছে রাখালি উদগ্র ব্যাকুলতা নিয়ে নিশানাথের উদ্দেশে—কোথায় তার যাত্রা শেষ, তা কে জানে!

হাঁসখালির বাঁকটা পেরিয়ে গিয়ে নিশানাথ আর পারলো না। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাতের পর সে ঠিক করলো, যেমন করে হোক্ চারঘাটে ফিরতেই হবে। রাখালিকে ভালো ক'রে

বলে আসা হয় নি—'রাখালি কি ভাবছে! ওর মনে কত কষ্ট হচ্ছে! এতকাল ধরে যে সমস্ত হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে ভালবেসে এসেছে, তার প্রাণে আঘাত দেওয়া চলে না।

ঐটুকু মেয়ে এ আঘাত সহ্য করতে কেমনে পারবে! সে জানে—শুধু আমাকেই জানে এ জগতের ভেতর আপন জন—আর আমি!

নিশানাথ অশ্রুসংবরণ করতে পারলো না। শেষে চোখ মুছতে মুছতে বললে—'না, এখনও আমার ছুটি হয় নি—মুক্তির দিন আসে নি—'ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গাঁয়ের দিকে পাড়ি দিল—জোরে ডিঙি চারঘাটের দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। নিশানাথ রাখালির জন্য এমনই আকুল হয়ে উঠেছে যে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন ওর কাছে গণ্ডী দিয়ে চলেছে—আর সেই গণ্ডী কাটিয়ে কাটিয়ে আস্‌ছে। সে কি অসহ্য বেদনা—কি ব্যাকুলতা! ঘাটে এসে ডিঙি পেঁছুলো, সহায়রামের বাড়ির দিকে গভীর অন্ধকার ভেদ করে নিশানাথ চল্‌তে লাগলো। বনোপথে ওর পায়ের ধ্বনি ওঠে; গাছপালাগুলো যেন চম্‌কে ওঠে! হঠাৎ মনে পড়ে—যদি ওরা খুন করে এই অন্ধকারের ভেতর, তবে তো রাখালির সঙ্গে দেখা হবে না।

সে ভাববার সময় আর নেই—রাখালিকে দেখা দিতেই হবে, যেমন করেই হোক্‌—সহায়রামের কুঁড়ের আঙিনায় এসে নিশানাথ জোর গলায় ডাক্‌লো—'রাখালি! রাখালি!' কোন সাড়া পায় না, কুঁড়ের দাওয়ার কাছে এসে দেখে সহায়রাম একেলা বসে আছে। ঘরের ভেতর প্রদীপ জ্বলছে মাত্র।

নিশানাথ বল্‌লে—'রাখালিকে একবার ডেকে দে তো!'

গম্ভীরস্বরে সহায়রাম বলে—'কেন?—'

'—শিগ্‌গির ডেকে দে, দরকার আছে—'

সহায়রাম কোন কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে, কোনমতেই উঠ্‌লো না—দাওয়ার ওপর উঠে নিশানাথ ঘরের ভেতর চলে গেল। দুঃসাহসের ওপর ভর করে' ক্রমাগত ডাকতে থাকে—রাখালি! রাখালি!—' কোথাও কোন শব্দ পাওয়া যায় না। কুঁড়ের ভিতরে বাহিরে খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শেষে সহায়রামকে জিজ্ঞাসা করে।

সহায়রাম বলে—'দেখ্‌তে তো পাচ্ছি না, কোথায় তা কি করে বল্‌বো—'

নিশানাথ কেঁদে ফেল্‌বার মত অবস্থায় এসে বল্‌লো—বল্‌ না, লক্ষ্মীটি! কোথায় সে!'

গাঁজার নেশায় ভরপুর হয়েছিল সহায়রাম, বেশী কিছু বল্‌তে পারছিল না। শুধু সে বলে—'তুমিই জানো!'

নিশানাথের মনে একটা আশঙ্কা জাগ্‌লো—তবে কি রাখালি নেই, এরা খুন করে নি তো! নিশানাথ বলে—'তাকে খুন করেছিস বুঝি—'

সহায়রাম কোন কথা বলে না। শেষে নিশানাথ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে—'তাকে খুন করেছিস বুঝি—'

সহায়রাম কোন কথা বলে না। শেষে নিশানাথ বলে—'দাঁড়াও যদি রাখালিকে আজ রাত্রে না পাওয়া যায় তো তোমার হাতে হাতকড়ি পরাবো—মনে থাকে যেন—'

সহায়রাম গম্ভীরভাবে নেশার ঝোঁকে বলে—'আচ্ছা—'

'—শুধু তোমাকে নয়, আড্‌ডা সুদ্দু লোককে—'

'—আচ্ছা—'

নিশানাথ বিব্রত হয়ে পড়লো। কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছিল না, নদীর দিকে ছুটে চলে গেল—নিস্তব্ধ নদী-তটের ভেতর ক্রমাগত শব্দ শোনা যাচ্ছিল—'রাখালি! রাখালি!'

কোথাও কোন উত্তর মিল্‌ল না, হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠ্‌লো, নদীতে তুফান দেখা দিল, গাছপালা সব দুল্‌তে লাগলো, সেই ঝড়ের ভেতর উন্মাদের মত ছুটে চলেছিল নিশানাথ নদীর পথ বেয়ে তিমির রাত্রের দুর্যোগটাকে বুকে করে নিয়ে। মাঝে মাঝে পায়ে ভীষণ আঘাত লাগ্‌ছিল, ঝড়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। পথের সন্ধান না মিল্‌লেও তবু তার চেষ্টার অবধি ছিল না।

ওদিকে রাখালি কোথায় অন্ধকারে ওরই সন্ধানে চলেছে, কেমন করে নিশানাথ জান্‌বে! ঝড়ের বেগ থামে না, ভীষণ হ'তে ভীষণতর হয়। সমস্ত রাত্রি ধরে' ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিশানাথ প্রভাতে দেখলো হাঁসখালির বাঁকের কাছে যে চরটা দেখা যায়, সেখানেই তার প্রাণের রাখালি প্রাণ হারিয়েছে'—মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

উন্মত্ত নিশানাথ রাখালিকে বুকে করে নিয়ে দেখলো ওর সর্ব অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, ওর মুখ দিয়ে অজস্রধারায় রক্ত ঝরেছে, তারই চিহ্ন—ওর পিঠে প্রহারের সব দাগ—আর পারলো না! আর্তনাদ করতে লাগলো সেই চরের ওপর বসে রাখালিকে বুকে নিয়ে—সে আর্তনাদে নদীর জল ফুলে ফুলে উঠ্‌লো। বল্‌লে—'একদিনও তোকে সুখী করতে পারলাম না, আমার আগে তুই ছুটি নিলি, তোরই যে মুক্তি হোলো রাখালি!' চরের ওপর প্রভাতের পাখী ডেকে ডেকে চল্‌তে লাগ্‌লো—রাখালির প্রাণ-পাখীর উদ্দেশে কি না, তা কে জানে!

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

[২]

যৌবনের সাধনা

রবীন্দ্রনাথ যখন নবীন যুবক তখন বাঙলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ'। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য স্রষ্টা ছিলেন না, বাঙলার চিন্তা ও ভাব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন তিনিই। যাঁহারা মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাঙলা সাহিত্যকে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিয়া, সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর চিত্তে মাতৃ-ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি অতীব সংকীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একটা নবযুগের স্রষ্টা—নবীন বাঙালী জাতির পথ প্রদর্শক। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি যে প্রবল ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার তরঙ্গ রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে সর্বত্র আঘাত করিয়া জাতির সম্মুখে নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল। এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে তিনিই ছিলেন যুগ নায়ক। কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃপৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ। বাঙলার নবযুগের আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধেও ঠিক এই বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের বিদ্যুৎ ঝলকে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই,—

যে বিদ্যুৎ শিখা রমে আঁখি
মরে নর তাহারই পরশে।

তাই তাঁহারা তাল সামলাইতে পারেন নাই; পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় তাঁহারা নিজেদের সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব বিষয়ে পশ্চিমেরই অনু-করণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্য দিয়া এই বিজাতীয় ভাবটা খুব বেশী পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। বাঙলার নবীনযুগের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন এই বিপর্যয়ের ট্রাজেডির একটা বড় দৃষ্টান্ত। এই সর্বনাশা স্রোতের বিপরীত গতি হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করেন পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তৎপূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুও এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ই'হারা সকলেই জাতির পূর্ব গৌরবের স্মৃতি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বাঙালী জাতিকে নূতন ভিত্তির উপরে গঠন করিবার কার্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অসামান্য। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা, তাহার প্রত্যক্ষবাদ ও কার্যকরী শক্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, বরং উহার মধ্যে যে নবশক্তির রসায়ন আছে, তাহা স্বজাতির চিত্তে সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্য দিকে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরব ও মহত্ত্বও তিনি জাতির সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম ও সমাজকে প্রাচীন জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া একটা নব রূপান্তরের প্রেরণা দিয়াছিলেন। যাহাকে ইংরেজী ভাষায় বলে জাতি ও সমাজের Re-construction বা পুনর্সংগঠন—তাহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মহাব্রত এবং সমস্ত জীবন সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া তিনি এই মহাব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার যুগকে বুঝিতে হইলে এই মূল সূত্রটি ধরিতে ও বুঝিতে হইবে।

বাঙলার জাতীয় আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার উপর এই বঙ্কিম প্রতিভার প্রভাব অপরিসীম। তাঁহার জাতীয় আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল আত্মশক্তির সাধনা ও ভিক্ষা নীতি বর্জন। প্রভু জাতির নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া যে কোন জাতি স্বাধীন হইতে পারে না, রাজনীতিতে ভিক্ষুকের যে কোন স্থান নাই, নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কঠোর সাধনার পথেই যে জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে নানাদিক দিয়া এই নিষ্ঠুর সত্যই দেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। একদিকে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া তিনি জাতির ত্রুটি ও দৌর্বল্য প্রদর্শন করিতে যেমন দ্বিধা করেন নাই, অন্যদিকে স্বজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আশার বাণীও শুনাইয়া-ছিলেন। জননী জন্মভূমি তাঁহার নিকট কেবল আকাশ, জল, মাটি ও লোক সমষ্টিমাত্র ছিল না,—তিনি ইহার মধ্যে চিন্ময়ী দেবী রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" সংগীতে মায়ের এই চিন্ময়ী রূপেই ধ্যান করা হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশ প্রেম ছিল ভক্তিরই নামান্তর। সর্বস্ব ত্যাগ—এই প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি লাভের উপায়। স্বদেশ প্রেমের 'গীতা' আনন্দ মঠে এই সর্বস্ব ত্যাগের সাধনারই পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সন্তানেরা' বলিতেছেন,—জননী জন্ম-ভূমিই আমাদের মা, আমাদের অন্য মা নাই। আমাদের গৃহ নাই, পত্নী নাই, পুত্র পরিজন নাই, আছেন কেবল জননী জন্মভূমি, তাঁহার সেবাতেই আমরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

'বঙ্গ দর্শনের' মধ্য দিয়াই প্রথমে তিনি স্বদেশ যজ্ঞের হোমানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য যাঁহারা সহকর্মীরূপে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন এক একজন দিকপাল, শক্তিমান পুরুষ। স্বদেশ প্রেমের অনির্বাণ অগ্নি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছিল এবং সেই অগ্নি চারিদিকে তাঁহারা ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর, দীনবন্ধু মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চণ্ডীচরণ সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজন[illegible]প্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি

...কে নিজকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।'

...মণ্ডলের

সময় হয়ত পদ্মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষ...

অন্তর্ভুক্ত। এই সৌরমণ্ডলের বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সূর্য, আর অন্য সকলে জ্যোতিষ্মান গ্রহ। বাঙলার স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তার উদ্বোধনে ইঁহাদের দানের তুলনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ইঁহারা সকলেই ছিলেন আত্মশক্তির সাধক—ভিক্ষা নীতির ঘোর বিরোধী।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলায় একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ব্রিটিশ প্রভুদের নিকট আবেদন নিবেদন, তাঁহাদের প্রসাদ ভিক্ষাই ছিল এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র। রাজা রামমোহনের পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যেরা এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' এই উদ্দেশ্য লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগে রামগোপাল ঘোষ, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক) প্রভৃতি ছিলেন ঐ আন্দোলনের মুখপাত্র। তারপর আসিল 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' ও 'ইণ্ডিয়ান লীগ'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, শিশিরকুমার ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন ইহার নেতা। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেস ঐ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেরই উত্তরাধিকারীরূপে দেখা দেয় এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় পর্যন্ত এই নিয়মতান্ত্রিক পন্থা বা ভিক্ষানীতিই ছিল তাহার প্রধান পন্থা। এই কারণেই আত্মশক্তির সাধক ও স্বাধীনতার আদর্শবাদী বাঙলার কবি ও সাহিত্যিকেরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান, কংগ্রেস প্রভৃতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহারা ঐ ভিক্ষানীতিকে বরং নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপই করিতেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙলা সাহিত্যের সূতিকাগারেই স্বাধীনতা আন্দোলন তথা খাঁটি জাতীয় আন্দোলনের জন্ম এবং বাঙলার কবি ও সাহিত্যিকেরাই ধাত্রীর ন্যায় ইহাকে পালন করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য কেবল বাঙলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই ইঁহাদের নিকট ঋণী।

কবি রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামী বাঙলা সাহিত্যিকদের নিকট হইতেই আত্মশক্তির সাধনার এই ধারা লাভ করিয়াছিলেন,—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই যোগ্য শিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-শিষ্য হিসাবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কেবল তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথকে আত্মশক্তির সাধনাতেও তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে, স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয় ভাবের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৮৯২ সালে 'সাধনা' পত্র প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। [illegible] সামাজিক [illegible] গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' এই "সাধনাতেই" প্রকাশিত হয়।

"কী গাহিবে কী শুনাবে।
বল মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ,
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা,
মস্তকে পড়িবে ঝরি তারি মাঝে
যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি
যারে জন্ম জন্ম ধ'রে।

* * * * *

শুধু জানি
সে বিশ্ব প্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, উন্নত মস্তক
উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা,
দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।

* * * * *

এই সমস্ত লেখারই মূল নীতি ছিল,—আত্মশক্তির দ্বারাই জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। বস্তুত 'সাধনা'কে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সাধনার যুগও বলা যাইতে পারে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জনসভায় যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহারও মূল সুর ছিল ঐরূপ। ১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতার এক জনসভায় (চৈতন্য লাইব্রেরীতে) তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "ইংরাজ ও ভারতবাসী" পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই সভার সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন,—"সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে, তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্ম নাম, ছদ্ম ব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

"সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজা প্রজার বিদ্বেষ ভাব শাসিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে—ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্য সকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়াই কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি, ইংরেজের নিকট কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষা স্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব, তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি, ততদিন [illegible] সান্ত্বনাটুকু ছিল, সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না।...ইংরেজের

পদ্মা কহিল—'তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি কি করব! মেয়েদের কাজ ঘরে, আমি ত তাই জানি। ঘর সংসারের কাজই আমি শিখেছি।'

—'তুমি যা' জান,—যা' শিখেছ, তাই আমি তোমাকে করতে বলি। তোমার ঘর-সংসারটা একটু বড় বলে' যদি ভাবতে পার, তা হলেই হয়।'

—'ভাবতে চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা করলেই পারবে।'—বলিয়া জয়ন্ত পদ্মার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু বাদে বলিল—'তোমাকে কোন কঠিন কাজ করতে হবে না। কঠিন কাজ আমিই করব। কিন্তু যে কাজ মেয়েদের পক্ষে সহজ—মানুষের সেবা করা, তাই আমি তোমাকে করতে বলছি, করবে?'

পদ্মা বলিল—'করব।'

জয়ন্ত পদ্মাকে আদর করিয়া বলিল—'এই ত চাই। কাল থেকে দু'জনেই আমরা কাজ করব। দেশের কাজ—দশের সেবা, ধর্মে ও কর্মে দু'জনেই আমরা এক হব।'

পদ্মা কোন কথা বলিল না। ধর্মে ও কর্মে স্বামী-স্ত্রীতে এক হওয়া যে কি, তাহা না বুঝিয়া সে কি বলিবে! জয়ন্তের অনেক কথাই পদ্মার নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়। বুঝিতে না পারিলে তার জন্য সে মাথাও ঘামায় না। এখনো সে মাথা না ঘামাইয়া নিঃশব্দে জয়ন্তের আদর অনুভব করিতে লাগিল।

পদ্মাকে নীরব দেখিয়া জয়ন্ত কহিল—'কথা বলছ না যে!'

পদ্মা নিম্নকণ্ঠে বলিল—'কি বলব! তোমার বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না, না বুঝে কথা বলার চেয়ে চুপ ক'রে থাকাই ভাল।'

—'আমার কথা তুমি বুঝতে পার না!'

—'অনেক কথাই বুঝতে পারি না।'

'ও!'—বলিয়া জয়ন্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

জয়ন্তের মনে হইল সব কথা না বুঝিলেও কিছু আসে যায় না। এখন না বুঝুক পরে বুঝিবে। কিছুদিন তাহার সাহচর্য পাইলে সে আর পদ্মার নিকট দুর্বোধ্য থাকিবে না।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতের ভরসায় পদ্মাকে ছাড়িয়া দেওয়াও জয়ন্তের মনঃপূত হইল না। শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। লেখাপড়া পদ্মা বেশী করে নাই। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া তৈরী করিতে হইবে। প্রতিমাকে বলিলে সে নিশ্চয়ই আগ্রহের সহিত পদ্মাকে পড়াইবে।

জয়ন্ত পদ্মাকে বলিল—'এক কাজ করবে পদ্মা? তুমি একটু একটু পড়াশোনা করবে? যদি পড় ত সে ব্যবস্থা করি।'

পদ্মা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল-'কি হবে পড়াশোনা করে?'

—'শিক্ষার একটা সার্থকতা আছেই পদ্মা, এটা ত অস্বীকার করা চলে না। আমার ইচ্ছা তুমি একটু একটু পড়াশোনা কর। এতে আনন্দও পাবে, সময়ও কাটবে।'

—'তুমি যদি পড়াও, পড়ব।'

জয়ন্ত একটু চিন্তা করিয়া কহিল—'আমি তোমাকে মাঝে মাঝে পড়াতে পারি, কিন্তু নিয়মিত পড়াবার সময় হয়ত হবে না। পড়াশোনাটা নিয়ম মত না হ'লে পড়াশোনা করাই বৃথা, কোন লাভ হয় না। প্রতিমাকে বরং বলে দেব, সে রোজ তোমাকে পড়িয়ে যাবে।'

পদ্মা রুষ্ট হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—'না, প্রতিমার কাছে আমি পড়ব না। কিছুতেই না, তা' আমি তোমাকে বলে' দিচ্ছি।'

জয়ন্ত অবাক হইয়া গেল পদ্মার প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখিয়া। এমনভাবে কথা বলিতে পদ্মাকে সে আর কোনদিনও দেখে নাই। ইহার কারণটা সে অনুমান করিতে না, পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেন, প্রতিমার কাছে পড়তে তোমার এত আপত্তি কি জন্যে?'

প্রতিমার সম্বন্ধে পদ্মা কোন আলোচনা করিতেও ইচ্ছুক নয়। সে চুপ করিয়া রহিল।

পদ্মার ভাবগতিক দেখিয়া জয়ন্ত জবাবের প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—'প্রতিমার বাবা তোমার ওপর অবিচার করেছেন বলে' প্রতিমার ওপর রাগ করাটা কিন্তু তোমার উচিত নয়।'

পদ্মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। পদ্মা উচ্চকণ্ঠে কহিল—'তোমারই বা প্রতিমার ওপর এত টান কি জন্যে শুনি?'

পদ্মার কথা শুনিয়া জয়ন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিল। কহিল—'প্রতিমা আমার সহকর্মিণী—এক সঙ্গে আমরা কাজ করি'—

—'আমার চেয়েও তার ওপর তোমার টান বেশী।'

—'কি করে বুঝলে?'

—'তার হ'য়ে এত ওকালতী করছ না হলে কি জন্যে?'

—'ও! উচিত অনুচিত সম্বন্ধে কথা বলেছি,—তাই?'

কথাটা বলিয়াই জয়ন্ত তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টিতে পদ্মার পানে তাকাইল। তাহার চোখ দুইটি হইতে যেন দপ্ করিয়া আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া জয়ন্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিল—'ভুল ক'রো না পদ্মা, ওটা তোমার ভুল ধারণা, প্রতিমাকে আমি খুবই স্নেহ করি, কিন্তু তার মধ্যে তুমি আর কিছু খুঁজতে যেও না। তা'তে লাভ ত হবেই না, লোকসানের সম্ভাবনা প্রচুর।'

জয়ন্তের এই রুদ্রমূর্তি পদ্মা আর কখনো দেখে নাই। পদ্মা ভয় পাইল। ভয়ে ও দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া বলিল—'তোমার হাতে যখন পড়েছি—তুমি যা খুসী বলতে পার, যা খুসী করতে পার। কিন্তু আমার যদি কোন কিছুতে খট্‌কা লাগে, তা' হলেও আমি বলতে পারব না? গরীবের মেয়ে বলে' কি আমি স্ত্রীর অধিকারও পাব না?'

পদ্মাকে কাঁদিতে দেখিয়া জয়ন্ত জল হইয়া গেল। শান্ত কণ্ঠে কহিল—'এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক পদ্মা। যেদিন তোমাকে স্ত্রী বলে' গ্রহণ করেছি, সেদিনই স্ত্রীর সমস্ত অধিকার তোমাকে দিয়ে রেখেছি। কিন্তু অধিকার পেয়েছ বলে যে তার অপব্যবহার করবে, তা' ক'রো না। তা হলে নিজেই নিজকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।'

পদ্মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া

সে বোধ করি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিল। হঠাৎ সে জয়ন্তের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।'

পদ্মার এই আকস্মিক পায়ে পড়া জয়ন্তকে বিস্মিত ও সচকিত করিয়া তুলিল। মুহূর্তের জন্য সে অভিভূত হইয়া পড়িল।

'ও কি করছ?' বলিয়া জয়ন্ত পদ্মাকে মেঝে হইতে উঠাইয়া পাশে বসাইল।

পদ্মার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জয়ন্ত বলিতে লাগিল—'কেন এত কান্নাকাটি করছ পদ্মা, আমি ত তোমার ওপর তেমন রাগ করিনি। ভুল করে' তুমি আমাকে যা' বলেছ, তার জন্যে আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাইবারও কিছু নেই। ভুল ত' হতেই পারে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। ভুল যখন বুঝতে পেরেছ, তখন নিজের মনেই ক্ষমা পাবে, আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না।'

—'তুমি ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না, বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?'

—'তোমার কোন অপরাধই আমার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। চিরকাল তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করব।'

পদ্মা চোখ মুছিয়া বলিল—'তুমি যে কত বড়, তা' আমি জানি, বহু জন্মের তপস্যার ফলে তোমার মত স্বামী পাওয়া যায়, কিন্তু আমি তোমার অযোগ্য। আমাকে তুমি যোগ্য ক'রে নাও।'

জয়ন্ত সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—'সে জন্যে তুমি ভেব না পদ্মা। আমার স্ত্রী আমার যোগ্য হবে বৈকি। আমরা ধর্মেকর্মে দু'জনে এক হব।'

জয়ন্তের বুকে মাথা রাখিয়া পদ্মা চোখ বুজিল। আবেশে তাহার সমস্ত শরীর যেন বিবশ হইয়া আসিল। অসহ্য আনন্দে সে দেহ এলাইয়া দিল।

(ক্রমশ)

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

(৫৪৯ পৃষ্ঠার পর)

পারিবে না। রুদ্ধ বাক, সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা।"

৪৪ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে 'ভয়ঙ্কর অবস্থার' কথা লিখিয়াছিলেন, এখনও তাহার পরিবর্তন হয় নাই, বরং নানাদিক দিয়া পূর্বাপেক্ষা উহা আরও বাড়িয়াছে।

এক সময়ে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, কল্পনা বিলাসী কবি, বাস্তব জগতের সঙ্গে, সাধারণ লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয় নাই, দেশের জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ নাই। এই ধারণা যে কিরূপ ভ্রান্ত, উত্তর কালে নিজের কার্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের যে সময়ের কথা আমরা এখন বলিতেছি, সেই সময়ে তিনি দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য কঠোর সাধনা করিতেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কেবল বুদ্ধির যোগ নয়, হৃদয়ের যোগও স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিভিন্ন, আবেদন নিবেদনের পথ তিনি ঘৃণা করিতেন, বঙ্কিমের যোগ্য শিষ্যরূপে আত্মশক্তির সাধনাতেই তিনি দেশের মুক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছিলেন—

"রাজ দ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবল মাত্র কাঁদুনীর সুরে "কিছু দাও কিছু দাও" করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহু বলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।"

উত্তর কালে স্বদেশী আন্দোলন তথা নবজাতীয়তা আন্দোলনের উপর রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পরে তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

(ক্রমশ)

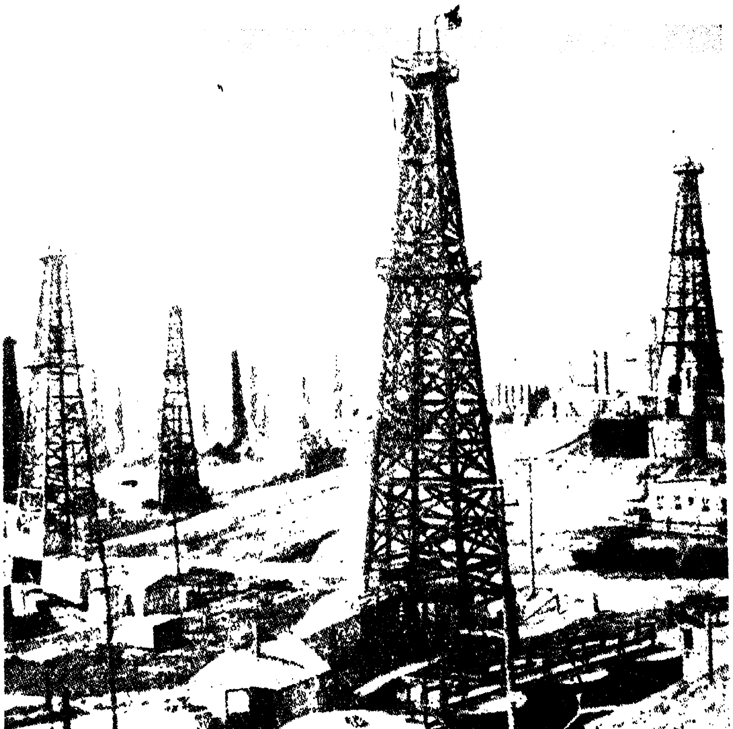
পেট্রোল

সঞ্জীব রায়

মানুষের দৈহিক শক্তির একটা সীমা আছে। শক্তিশালী যন্ত্রচালনা এই দৈহিক শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু ভূগর্ভ থেকে মানুষের আবিষ্কৃত কয়লা যন্ত্রদানবকে শক্তিমান করে তুলেছে। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ১৩৫ কোটি টনেরও উপর কয়লার প্রয়োজন। কয়লা ছাড়া পেট্রোলও শক্তি সঞ্চারের অপর আর একটি অন্যতম অবলম্বন। মাটির নীচ থেকে প্রতি বৎসর ২০ কোটি টনেরও উপর পেট্রোল সংগৃহীত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কয়লাই শক্তিশালী কাজের প্রধান অবলম্বন হিসাবে এ পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। এর পর পেট্রোলকে নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় স্থানে দেওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম থেকেই পেট্রোলের উৎপত্তি। পেট্রোলিয়ামের জন্যই আজ আকাশ পথে ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য ইঞ্জিন অপেক্ষা পেট্রোল চালিত ইঞ্জিন ওজনে হাল্কা এবং বাতাসে বহনের পক্ষে খুবই উপযোগী। এইখানেই পেট্রোলের বৃহত্তম সাফল্য। এ ছাড়া পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্নজাত বহু জিনিষ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কত যে উপকারে এসেছে তার কথা নেই।

উৎপন্নজাত দ্রব্যের এক প্রান্তে আমরা রাস্তা পাকা করার উপযোগী যেমন কৃত্রিম ভারী Asphalt পেয়েছি তেমনি অপর দিকে পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন হয়েছে হালকা Ether. এই ইথার অস্ত্র চিকিৎসায় আজ যুগান্তর এনেছে। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে পেট্রোলিয়াম থেকে আরও বহু দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে। সেই সব উৎপন্নজাত দ্রব্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রভূত উপকারে এসেছে। সুগন্ধ দ্রব্য এবং মুখ-সৌন্দর্য বর্ধক প্রসাধনও আজ এই পেট্রোলিয়ামের উপজাত (By Product). ছাপার উপযোগী স্থায়ী কালি পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরী হয়েছে। পেট্রোলিয়াম ছাড়া রবার টায়ার এবং অন্য সকল প্রকার রবার দ্রব্য প্রস্তুত আজ সম্ভব হ'ত না। এলুমিনিয়ামের উৎপত্তির মূলে পেট্রোলিয়াম। পৃথিবীর শিল্প জগতে পেট্রোলিয়ামের খনি আজ একটি অন্যতম স্থান অধিকার করেছে। যে সব অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম তৈলের খনি আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি অল্পদিনের মধ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্নজাত দ্রব্য আজ আমরা নানাভাবে ব্যবহার করছি সত্য, কিন্তু বহু বৎসর পূর্বেও পেট্রোলিয়ামের এরূপ ব্যাপক ব্যবহার না থাকলেও লোকে এর সঙ্গে পরিচিত ছিল। শীত প্রধান দেশে মেষ পালকের দল তাদের গৃহপালিত জন্তুদের নিয়ে পেট্রোলিয়াম তৈলের ডোবার ধারে পেট্রোলিয়াম জ্বালিয়ে শরীর গরম করত। ককেসাসের এক জায়গায় একটি পারসী মন্দিরের কাছে যিশু খৃস্টের জন্মের পূর্বে পর্যন্ত নাকি আগুনের শিখা প্রজ্জ্বলিত থেকে ঐ পবিত্র স্থানকে আলোকিত করে রেখেছিল। লোকের বিশ্বাস পেট্রোলিয়াম তৈল থেকেই এই অগ্নিশিখা দীর্ঘদিন জ্বলেছিল। অগ্নি পূজারীদের এই স্থানটি তীর্থভূমি ছিল। গ্যালিসিয়া এবং রুমানিয়ার পুরাতন পুস্তকে শত শত বৎসর ধরে কোন কোন দেশের মাটি থেকে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেত তার উল্লেখ আছে। বর্তমান জগতের একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ তরল পদার্থ মানুষ বহুদিন পূর্বেও সংগ্রহ করে যেত, কিন্তু এই তৈলের বিবিধ শক্তির কথা তাদের কতটুকুই বা জানা ছিল।

রোম সাম্রাজ্যের পূর্বে ঈজিপ্টের লোকেরা পেট্রোল তৈল যে ব্যবহার করত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মেক্সিকোর aztecs এবং পেরুর Incas এই দুই দেশের লোকও পেট্রোলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল। শরীরের কোন স্থানের বেদনা নিরাময় করা পেট্রোলের আর এক ধর্ম। ভারতীয়রা এবং পারস্যবাসীরা পেট্রোলের এই বিশেষ গুণের জন্য



পেট্রোলের খনি অঞ্চল

পেট্রোলকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করত।

অতি প্রাচীন কালেও চীন এবং জাপানে এই খনিজ তৈলের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে যে সব দেশের পেট্রোলিয়াম খনিগুলি পেট্রোল উৎপন্ন করে পৃথিবীর লোককে উপকৃত করেছে, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ, রাশিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ইস্ট ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড এবং ব্রহ্মদেশ। এ ছাড়া মেক্সিকো, পেরু, আসাম, জাপান, জার্মানী, পারশ্য এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেট্রোলিয়াম খনিগুলির নামও উল্লেখ করা যায়। কালিফোরনিয়ার পেট্রোল খনিগুলি থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। Peunylrauniaর পেট্রোল সকল প্রকার দোষ থেকে মুক্ত বলে বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ১৮৫৯ সালে প্রথম পেট্রোল খনি খনন করা হয়। কলোনেক ড্রেক ছিলেন এই পেট্রোল খনির আবিষ্কারক। তাঁর সময় পর্যন্ত খনিজ তৈল কখনও কখনও সংগ্রহ করা হ'ত, কিন্তু পেট্রোল খনি স্থাপন তাঁর পূর্বে কেউ করেনি। তাঁর পর থেকেই পেট্রোল খনি বিজ্ঞানের পর্যায়ে এসে পড়েছে। অস্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ এবং রাশিয়ার পেট্রোল খনি প্রায় সমপরিমাণ তৈল উৎপন্ন করে চলেছিল। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকার সমৃদ্ধশালী পেট্রোল খনিগুলি রাশিয়ার খনিগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। এদিকে রুমানিয়া এবং গালিসিয়ার তৈলখনিগুলিও অল্পদিনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈল উৎপন্ন করে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে পেট্রোলিয়াম তৈল থেকেই পেট্রোলের উৎপত্তি। কয়লার মতই পেট্রোলিয়াম তৈলের ভাণ্ডার মাটির তলায়। কিভাবে মাটির তলায় পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্ভব হ'ল এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও সঠিকভাবে দিতে পারেননি। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আজও মত বিরোধের অবসান হয়নি। একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন, ভূগর্ভস্থ প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ থেকেই এই তৈলের জন্ম। অপর দল প্রাণী জগৎ ছেড়ে উদ্ভিদ জগতে নেমে এসেছেন। তাঁরা বলছেন, পেট্রোলিয়ামের জন্ম প্রাণীর দেহ থেকে নয়, সম্পূর্ণ উদ্ভিদের দেহ থেকে। পেট্রোলিয়াম যে algae নামক সামুদ্রিক জাতীয় উদ্ভিদের দেহ থেকেই জন্ম লাভ করেছে এ বিষয়ে তাঁরা একেবারে স্থির নিশ্চিত। এই জাতীয় উদ্ভিদের দেহ থেকে নিঃসৃত তৈল যে পেট্রোলিয়ামই তা তাঁরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে পেট্রোলিয়ামের জন্মসূত্র উদ্ঘাটনের জন্য কয়েকজন খ্যাতনামা রাসায়নিক দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছিলেন। ঐ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মেনডেলিফ, স্যার বোভারটন রেড উড়, লিসেনকো ইংলার এবং বেইন্সটিইনের নাম উল্লেখযোগ্য।.

দীর্ঘদিন গবেষণার পরেও কিন্তু এঁরা কেউ একমত হ'তে পারেন নি। মেনডেলিফের মতে ভূগর্ভের উত্তপ্ত অথবা তরল ধাতুর উপরি ভাগস্থ জল রাশির প্রতিক্রিয়া থেকেই এই পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি। ইংলারের গবেষণার ফল কিন্তু অন্য ধরণের। তিনি বলেছেন, মাটির নীচে জীবের ধ্বংসাবশেষের বিগলন থেকেই এই তৈলের জন্ম হয়েছে। তাঁর গবেষণা প্রাণী দেহের তৈল পেট্রোলিয়াম বলেই প্রমাণিত হয়েছে। এম ওয়ারনেন নামে অপরএকজন রাসায়নিকও মাছ এবং অপ কয়েকটি জীব বিশেষের দেহকে ডিস্‌টিলেসন দ্বারা পেট্রোলো সিনথেটিক অর্থাৎ সংযোগাত্মক তৈল আবিষ্কার করেছিলেন কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, জীব এবং উদ্ভিদ এই দুই প্রাণ জগৎ থেকেই পেট্রোলিয়ামের জন্ম। কিন্তু এর পরও আর এ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মত রয়েছে। তাঁদের মতে উদ্ভিদ এব জীব জগতের কোনটি থেকেই পেট্রোলিয়ামের জন্ম হয়নি প্রবল উত্তাপের প্রভাবে পাথরের মধ্যস্থ খনিজ পদার্থ থেকে এই তৈলের উৎপত্তি। তাঁদের মতে পেট্রোলিয়াম সম্পূর্ণ খনিজ জাতীয় তৈল।

মাটির তলায় কিভাবে পেট্রোলিয়াম তৈল অবস্থান করে এ বিষয়ে প্রাচীন মত ছিল—পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভে অসংখ্য গর্তে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। স্পঞ্জের মধ্যে জল যেভাবে আত্মগোপন করে, ঠিক সেইভাবেই স্যান্ডস্টোনের মত একজাতীয় স্বচ্ছিদ্র পাথর এবং বালির মধ্যে পেট্রোলিয়াম অবস্থান করে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করেছেন পেট্রোলিয়াম স্বচ্ছিদ্র পাথরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে সত্য, তবে পাথরের নিম্নভাগের কোন না কোন স্থানে যে অসংখ্য বৃহৎ গর্তে পেট্রোলিয়াম প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, তা' আজ বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বলছেন।

কখনও কখনও তৈলের নিম্নভাগে লবণাক্ত জলাধার থাকে। এছাড়া তৈলের সঙ্গে অতিদাহ্য গ্যাসের প্রাচুর্য আছে। এই গ্যাস তৈলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে। তৈল এবং গ্যাসের উপরিভাগে দুর্ভেদ্য পাথরের আচ্ছাদন। এত করেও কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হাত থেকে এই গুপ্ত ভাণ্ডার রক্ষা করেত পারেনি। কবে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে প্রকৃতির অন্তস্থল থেকে এই মূল্যবান বস্তুর উদ্গার হতে দেখে অনুসন্ধিৎসু মানুষ আবিষ্কারের নেশাতে পৃথিবীর বুকে পাথরের পাঁজরা কেটে এর সন্ধান নিয়েছিল। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন সহস্র সহস্র গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সন্ধান কিভাবে করা হয়, তার কথা বলছি। ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর উপরিভাগের মাটি পরীক্ষা করে কোথায় পেট্রোলিয়াম তৈল পাওয়া যেতে পারে, তার একটা নির্দেশ দিলে ডেরিক মেসিনের সাহায্যে দুর্ভেদ্য পাথর কেটে তৈলের সন্ধানের জন্য কাজ আরম্ভ করা হয়। কখনও কখনও এক মাইলের উপর দুর্ভেদ্য পাথরের মধ্যে বোরিংয়ের কাজ চলে। ৫০০ থেকে ৪০০০ ফিট নীচের থেকে বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীর উপরে পেট্রোলিয়াম তৈল উত্তোলন করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ তৈলখনিগুলিতে পাম্পিং মেসিন সাহায্যে তৈল উত্তোলন করার ব্যবস্থা আছে। যেখানে ঐভাবের পদ্ধতি সম্ভব, সেখানে খুব অল্প খরচায় এবং সহজভাবে কাজ হয়। কোন কোন খনিতে তৈলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বালি উঠতে দেখা যায়, এই সমস্ত খনিতে পাম্পের সাহায্যে কাজ চলে না। পেট্রোলিয়ামের সন্ধানে পাথর কাটতে গিয়ে সাধারণত গ্যাস প্রথমে উত্থিত হয়। কোন কোন স্থানে গ্যাসের পরিমাণ এত

বৃদ্ধি পায় যে, তার চাপে পড়ে ডেরিক মেসিন এবং অন্যান্য সমস্ত যন্ত্রপাতি শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে পর্যাপ্ত পেট্রো-লিয়াম তেলের অপচয় হয়। জ্বালানি হিসাবে এই গ্যাসের প্রয়োজন আছে। গ্যাসকে একসঙ্গে সংগ্রহ করে পেট্রোলিয়াম খনির সন্নিকটস্থ সহরগুলিতে ব্যবহারের জন্য পাইপের মধ্যে পাঠান হয়।

প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উত্থিত হলে পৃথক Gas Derrick মেসিন বসিয়ে গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। পেট্রোলিয়ামকে এইভাবে মাটির নীচ থেকে তুলে উপরের তৈলাধারে (Storage Tank) সংগ্রহ করা হয়। এই তৈলাধার থেকে পাইপের লাইন বহুদূরে চলে গেছে। পাইপ থেকে তৈলকে রেলওয়ে ট্যাঙ্ক-ওয়াগন অথবা স্টিমার ওয়াগন করে তৈল শোধনাগারে পাঠান হয়। ভূগর্ভস্থ কাঁচা পেট্রোলিয়াম দুর্বল হরিদ্রাবর্ণযুক্ত এবং বহু পদার্থের সমন্বয়ে সংগঠিত। এই সকল পদার্থের প্রত্যেকটিতেই প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেনের প্রভাব বিদ্যমান। পেট্রোলিয়ামের মধ্যে এই মিশ্রিত পদার্থগুলিকে বিভিন্ন উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত করা হয় এবং এই বিভিন্ন বস্তুগুলিকে উদ্ধারের জন্য তৈলকে ডিস্‌টিলেশন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। প্রথমে অতিদাহ্য তৈল, তারপর আলোক প্রদায়ক তৈল এবং সর্বশেষ ভারী লুব্রিকেটিং তৈল পাওয়া যায়। এই দুইটি ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পেট্রো-লিয়াম তৈলকে উত্তপ্ত করবার সময় যে পরমাণু দ্বারা পেট্রো-লিয়াম তৈল সংগঠিত সেগুলির গতি দ্রুতবেগ ধারণ করে। এই অবস্থায় হালকা পরমাণুগুলি প্রথমেই মুক্তিলাভ করে। এই হালকা পরমাণুগুলি থেকেই পেট্রোল তৈলের উৎপত্তি। পেট্রোল-বাষ্প শীতল জলের পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তরল পেট্রোলে পরিণত হয়। এর পর আরও কয়েকটি অবস্থার মধ্যে পেট্রোলকে শোধন করে ব্যবহারের উপযোগী পেট্রোলে পরিণত করা হয়। ১০০ গ্যালন কাঁচা পেট্রোলিয়াম থেকে মোটরযান এবং বিমানপোত চালনার উপযোগী ৩৫ গ্যালন পেট্রোল, ডিসেল ইঞ্জিন চালাবার জন্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, প্যারাফিন ওয়াক্স এবং এ্যাসফাল্টের উপযোগী ৩৮ গ্যালন ভারী জ্বালানী তৈল পাওয়া যায়। এছাড়া বাতি জ্বালাবার ১০ গ্যালন প্যারাফিন এবং গ্যাসের কাজের উপযোগী ১৫ গ্যালন গ্যাস তৈলও পাওয়া যায়।

পেট্রোল এমন একটি পণ্য, যা খনি থেকে পাঠাবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। ব্যারেলের মধ্যে করে খারাপ রাস্তার উপর দিয়ে পেট্রোল প্রেরণ করা ব্যয়সাধ্য এবং অসুবিধাজনক বলে আমেরিকার খনির মালিকরা নলের মধ্যে পেট্রোল পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। পেট্রোলের এই পাইপ-লাইন প্রথম তৈরী হয় ১৮৬৫ সালে। এর দশ বৎসর অতীত হবার পর Pennsylvenia খনি অঞ্চলে Tank Line-এর প্রচলন হয়। বর্তমানে পাইপ লাইন সর্বত্রই চলেছে। পেট্রোল তেলের খনি অঞ্চল পরিদর্শনের একটা আগ্রহ অনেকেরই আছে। কিন্তু খনি অঞ্চল বিশেষ মনোরম স্থান নয়। বাকুর বৃহৎ পেট্রোলখনি এবং শোধনাগারগুলিকে 'Black Town' এই নামে অভিহিত করা হয়। এর থেকে একটা পছন্দসই নাম নাকি পাওয়া অসম্ভব। বাকুর রাস্তা, ঘরের দেওয়াল, চিমনী সবই কাল—এমন কি চিমনী থেকে উদ্‌গীর্ণ ধূমরাশিও আকাশকে কাল করে রেখেছে।

গত চার বৎসরে আমেরিকা এবং পৃথিবীর সমস্ত পেট্রোল খনি অঞ্চল দেশগুলিতে মোট কি পরিমাণ পেট্রোল উৎপন্ন হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
	কোটি টন	কোটি টন	কোটি টন	কোটি টন
আমেরিকা ...	১৭·৩০	১৬·৫০	১৭·৩৩	১৯·২৯
পৃথিবীর মোট উৎপন্ন পেট্রোল	২৪·০০	২৭·১৩	২৯·৬৫	৩০·৭৩

জগতের খনিজ পদার্থের মধ্যে পেট্রোলিয়াম তৈল যে খুবই মূল্যবান, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পেট্রোলের অভাবে পেট্রোলচালিত মোটরযান, বিমানপোত, কল-কারখানা প্রভৃতি চালনার উপযোগী সিনথেটিক অর্থাৎ সংযোগাত্মক তৈলও বৈজ্ঞানিক-সমাজ আবিষ্কার করেছেন। বর্তমান যুদ্ধের দরুণ পেট্রোলের সরবরাহ (Supply) নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ফলে পেট্রোলের অভাব আজ আমরা বেশী করে অনুভব করছি।



আজ•কাল

কংগ্রেস

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আসন্ন। এবার এই অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের কর্তব্য কি তার একটা পথ ঠিক করে' দেবার দায়িত্ব কংগ্রেসের সামনে রয়েছে; কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রকাশ্যে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করায় কংগ্রেসের সমস্যা আরো সমূহ হয়ে উঠেছে। তারপর আছে ব্রহ্ম ও মালয় থেকে আগত ভারতীয় আশ্রয় প্রার্থীদের সমস্যা। ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম-দিনের অধিবেশনের সংগে সংগে প্রস্তাব প্রকাশে ভারত গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপে এই অধিবেশনের তাৎপর্য বেড়ে গেছে।

শ্রীরাজাগোপাল যে কংগ্রেসের সাধারণ নীতি থেকে অন্য দিকে যাচ্ছেন তার লক্ষণ গত সপ্তাহেই উল্লেখ করেছিলাম। এর পর তিনি স্পষ্টভাবেই ভিন্ন পথ নিয়েছেন। গত ২২শে এপ্রিল মাদ্রাজে তাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেস আইন সভা দলের এক সভা হয়। এই সভায় সভাপতির উত্থাপিত এক প্রস্তাবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে অনুরোধ করা হয় যে, ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার সময়ও যদি মুসলিম লীগ পৃথকীকরণের দাবী না ছাড়ে তাহলে সে দাবী যেন মেনে নেওয়া হয়। বর্তমান জরুরী অবস্থার কারণে মিটমাট করে একটা জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে পরামর্শের জন্যে মুসলিম লীগকে আমন্ত্রণ করতেও ঐ প্রস্তাবে বলা হয়।

সভায় আর এক প্রস্তাবে বলা হয় মাদ্রাজ প্রদেশের জনসাধারণের মনোভাব এই যে, এই সঙ্কট সময়ে সেখানে একটা জনপ্রিয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সেজন্যে আইনসভার কংগ্রেস দল যাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তার অনুমতি দিন।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর এই কাজে কংগ্রেসে ও কংগ্রেসের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। লীগের পাকিস্তান দাবী ভারতের জাতীয়তাবাদী কেউ মেনে নিতে রাজী নয়। তা ছাড়া বর্তমানে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরোধী। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতিতে রাজাজীর কাজের কড়া প্রতিবাদ করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করা হবে বলেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে এ সম্বন্ধে এখন আলোচনা চলছে। তবে শোনা যায়, রাজাজী তাঁর মতে অটল রয়েছেন। মাদ্রাজ প্রস্তাব অনুযায়ী একটা প্রস্তাবও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের জন্যে পেশ করা হয়েছে।

যে সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কংগ্রেস যদি কোনো স্পষ্ট সক্রিয় নীতি শীগ্‌গির অবলম্বন না করে তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে হয় তো ভাঙন ধরে' যাবে।

ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থী

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসামে ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীকেন্দ্র পরিদর্শন করে যে বিবরণ দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্ম ও মালয় থেকে যে সব ভারতীয় চলে এসেছে তারা যে কর্তৃপক্ষের বৈষম্য-নীতির জন্যে এবং অব্যবস্থার জন্যে কি মর্মান্তিক দুঃখক্লেশ, এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছে, প্রস্তাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে ভালো ব্যবস্থা এবং ভারতীয়দের জন্যে খারাপ ব্যবস্থা করায় কংগ্রেস তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে স্বীকার করে' ওয়ার্কিং কমিটি বলেছেন যে, তবুও এখনও ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নি।

দেশের কোনো কোনো জায়গায় বিনা ক্ষতিপূরণে বা স্বল্প ক্ষতিপূরণে কিংবা যথেষ্ট সময়ের নোটিশ না দিয়ে কিংবা যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা না করে যেভাবে লোক অপসারিত করা হয়েছে, ওয়ার্কিং কমিটি তার প্রতিবাদ করেছেন।

গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা

ভারত গভর্নমেণ্ট এক অতিরিক্ত গেজেটে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কোনো কোনো প্রস্তাবের প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এক প্রেস নোটে বলা হয়েছে যে, রেংগুনের ঘটনাবলী এবং ভারতে অনুরূপ ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করেছেন তা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। আর এক প্রেস নোটে বলা হয়েছে যে, ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় প্রস্তাবের (লোক অপসারণ সম্পর্কে) যে অংশে স্ত্রীলোকদের উপর সৈন্যদের অত্যাচারের অভিযোগ করা হয়েছে সে অংশও প্রকাশ করা চলবে না। গভর্নমেণ্টের এই নতুন মনোভাব সম্বন্ধে কংগ্রেস বিবেচনা করবেন।

গান্ধীজীর বিবৃতি

জওহরলাল তাঁর বাঙলা ও আসাম পরিদর্শনের সময় সব জায়গায় বক্তৃতায় আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্যে সকলকে কৃতসংকল্প হতে বলেছেন। তিনি ইতিপূর্বে গরিলা যুদ্ধের কথাও বলেছিলেন। আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁর এবং রাজাজীর বর্তমান মনোভাব সম্পর্কে গান্ধীজী প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, "জওহরলাল বা রাজাজীর 'ধর্মত্যাগে' আমি বিচলিত হই নি। তাঁরা তাঁদের চেষ্টার ব্যর্থতায় আরো শক্তিশালী হ'য়ে নবোদ্যমে আবার অহিংসার পথে ফিরে আস্‌বেন।"

জাপানীরা যে ভারতের মিত্র নয়, এই কথা গান্ধীজী আর এক প্রশ্নের উত্তরে এই প্রথম স্পষ্টভাবে বল্‌লেন। তিনি বল্‌ছেন, "আক্রমণকারীরা কখনও উপকারী হ'তে পারে, এ রকম ধারণা করা মূর্খতা। জাপানীরা বৃটিশ শৃংখল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারে; কিন্তু তার বদলে তারা নিজেদের শৃংখল পরিয়ে দেবে। ......জাপানীদের বিরুদ্ধে আমার কোন শত্রুতা নেই; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের মতলব আমি নিরুদ্বেগে চিন্তা করতে পারি না। তারা এ কথা কেন বোঝে না যে, তাদের সংগে স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই? তারা ভারতকে ছেড়ে দিক। তাদের অভিপ্রায় যদি ভালোই হয়, তাহলে চীন কি করল যে, তার উপর তারা এমন ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করল।"

সংবাদপত্র দমন

২৯শে এপ্রিলের "যুগান্তর" পত্রিকায় "শত্রুর সাহায্য হ'তে পারে" এমন রচনা প্রকাশিত হওয়ার অভিযোগে বাঙলা গভর্নমেণ্ট ঐ দিনের "যুগান্তর" বাজেয়াপ্ত করেন এবং পরে অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে "যুগান্তরের" প্রকাশ নিষিদ্ধ করে' দেন। এ নিয়ে সাংবাদিক মহলে খুব বিক্ষোভ দেখা দেয়। বোম্বাইতে "বম্বে সেণ্টিনেল" কাগজের প্রকাশ এক মাসের জন্যে বন্ধ করে' দেওয়া হয়। সর্তাধীনে পত্রিকা প্রকাশের প্রতিবাদে লাহোরে "প্রতাপ" তার প্রকাশ বন্ধ করে' দেয়। যাক্ তিন দিন পরে গভর্নমেণ্ট "যুগান্তরের" উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন। "বম্বে সেণ্টিনেল"-এর নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর পর "স্টার অফ ইণ্ডিয়া"র প্রকাশ সাত দিনের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি সংবাদপত্র সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের এই নীতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

জনসনের বিবৃতি

ভারতে আগত প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টের খাস প্রতিনিধি কর্ণেল লুই জনসন তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে সম্মিলিত জাতিদের জয়লাভ করতে হলে সব রণাঙ্গনেই এক্সিসকে প্রতিহত করতে হবে; সেদিক থেকে ভারত-রক্ষা একটা প্রধান ব্যাপার; সুতরাং মার্কিন সৈন্য লড়াই করবার জন্যে ভারতবর্ষে এসেছে। ভারতে ভূমি দখলের কোনো অভিপ্রায় আমেরিকার নেই।

মার্কিন টেক্‌নিকাল মিশনের ভারতে আগমন সম্বন্ধে কর্ণেল জনসন বলেছেন যে, ভারতবর্ষে মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা কিংবা মার্কিন মূলধন নিয়োজিত করা মিশনের উদ্দেশ্য নয়; যাতে ভারতের শ্রমশিল্প সমরোপকরণ উৎপাদন বাড়াতে পারে, সেজন্যে সাহায্য করাই মিশনের উদ্দেশ্য।

কর্ণেল জনসন এই আশ্বাস দেওয়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ব্রহ্মের যুদ্ধ

ব্রহ্মে যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সালুইন রণাঙ্গনেই জাপানীদের আক্রমণ সবচেয়ে বিপজ্জনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জাপানীরা শ্যাম-সংলগ্ন কারেনি প্রদেশের রাজধানী লোইক দখল করার পর উত্তরে এগিয়ে চলেছে। চীনা সৈন্যেরা অবশ্য পাল্টা আক্রমণ করে তাউঙ্গি শহর পুনরধিকার করেছে; কিন্তু তাতে বিপদ কাটে নি। বরং তাউঙ্গিতে চীনারা ঘেরাও হ'য়ে পড়বার নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে। জাপানীরা এ অঞ্চলে তিনটে বাহিনীতে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য মান্দালয়-লাশিও রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে' দেওয়া। একটি বাহিনী পূবে সালুইনের পশ্চিম তীরে কুনহিং-এর দিকে যাচ্ছে। আর একটা বাহিনী উত্তরে কংহাইপিং অভিমুখে চলেছে। এখানে জাপানীরা লাশিও থেকে ১১০ মাইল এবং মান্দালয় থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত মানসন-এ পেণছে গেছে। তৃতীয় জাপ বাহিনী পূবে দিকে যাচ্ছে; এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ শান রাজ্যে অবস্থিত চীনা সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে' ফেলা। তাউঙ্গি দখলের পর চীনা সৈন্যেরা জাপানীদের পশ্চাৎভাগ বিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে পূবে লোইলেম-এর দিকে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। ইরাবতী ও সিতাং রণাঙ্গনেও জাপানীরা অগ্রসর হচ্ছে বলে'ই মনে হয়। ইরাবতী রণাঙ্গনে ইয়েনানজ্যং-এর উত্তরে লড়াই হচ্ছে। সিতাং রণাঙ্গনে চীনারা মান্দালয়ের দিকে সরে' যাচ্ছে। কিন্তু সমস্তই নির্ভর করছে মান্দালয়-লাশিও রাস্তার উপর। এই রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে ব্রহ্মে মিত্র বাহিনীর কোনো সরবরাহ বা নতুন সৈন্য পাওয়া কঠিন হবে। মান্দালয় ও লাশিওর উপর জাপ বিমান বহর প্রবল বোমা বর্ষণ করেছে।

ফিলিপিন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির লড়াই আগের মতোই চলছে। জাপানীরা আবার ডারুইনে বিমান হানা দিতে আরম্ভ করেছে। ফিলিপিনে তারা ভিসোয়স দ্বীপে সৈন্য নামিয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ফরাসী দ্বীপ নিউ ক্যালিডোনিয়ায় মার্কিন সৈন্য অবতরণ করেছে। ভিশি গভর্নমেণ্ট এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বৃটিশ বিমান-অভিযান

বৃটিশ বিমানবহর জার্মানীতে ও জার্মান অধিকৃত রাজ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ক্রমাগত প্রবলভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। জার্মান 'হাইনকেল' বিমান নির্মাণের কেন্দ্র বল্টিক তীরবর্তী রস্টক শহরে উপর্যুপরি চার রাত আক্রমণের ফলে শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, এ ছাড়া ট্রণ্ডহাইম, [illegible]শং এবং উত্তর ফ্রান্সে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলছে। জার্মানরা রস্টক-এ বোমা বর্ষণের প্রতিরোধে ইংলণ্ডের নরউইচের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। সুইডেনের এক পত্রিকা পশ্চিম রণাঙ্গনে বৃটিশ বিমান আক্রমণকে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হল" বলে বর্ণনা করেছে।

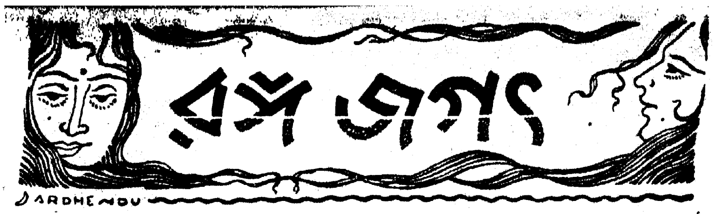
হিটলারের বক্তৃতা

হিটলার দ্রুত আহূত রাইখস্টাগের এক সভায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে যে কোনো লোক সম্বন্ধে যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের অনন্যনির্ভর ক্ষমতা এখন তাঁকে দিয়ে দেওয়া হোক। এতে বোঝা যায় যে, জার্মানীর অভ্যন্তরে তিনি কঠোর দমননীতি অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, যেসব বিচারক নরম শাস্তি দিচ্ছেন তাঁদের বরখাস্ত করা হবে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি অবশ্য জয়লাভের সংকল্প প্রকাশ করেছেন এবং রুশিয়ার বিরুদ্ধে আবার প্রচণ্ড আক্রমণের হুমকি দেখিয়েছেন কিন্তু যুদ্ধ যে কবে শেষ হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত নন কারণ তিনি আগামী শীতকালে রুশিয়াতে লড়াই চালাবার কথা উল্লেখ করেছেন।

সোভিয়েট রণাঙ্গনে নতুন কোনো বড় পরিবর্তন হয় নি। তবে এখনও এখানকার যুদ্ধে আক্রমণোদ্যম লালফৌজের হাতে রয়েছে।

২৮-৪-৪২ —ওয়াকিবহাল



হলিউডের ধৃষ্টতা

ভারতবর্ষের সহিত আজ আমেরিকার বন্ধুত্ব স্থাপনের উৎসাহ দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। 'আমেরিকান টুরিস্ট'দের ডায়েরী পড়িয়া সাপ ও বাঘের দেশ এই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহারা বংশপরম্পরায় যে ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা এতদিন এই দেশকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার কতভাবে কত চেষ্টাই না করিয়াছেন। আজ হঠাৎ তাঁহাদের বন্ধুপ্রীতির আগ্রহ দেখিয়া মনে হয়, মা'র চেয়ে মাসির দরদটা যেন বেশী দেখা যাইতেছে।



এস পি প্রডাকসন্সের 'শেষ উত্তর' চিত্রে কানন



মডার্ন টকীজের 'অশোক' চিত্রে শ্রীমতী পদ্মা

বেশী দিনের কথা নহে, মাত্র দুই বৎসর পূর্বে হলিউড নির্মিত 'গঙ্গা দিন' ছবিটি লইয়া ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই 'গঙ্গা দিন' চিত্রে ভারতবর্ষকে যেভাবে অপমান করা হইয়াছিল, তাহার বেদনা আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই। সম্প্রতি হলিউডের খ্যাতনামা সংবাদ-প্রতিনিধি রাম বাগাই মাদ্রাজের 'ফ্রি ইণ্ডিয়া' কাগজে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, আলেকজান্দার কোর্ডা ভারত-বিদ্বেষী আরও একটি ছবি তোলার কাজ সমাপ্ত করিয়াছেন। মিঃ বাগাই জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীর কাছে ভারত সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার চালাইবার জন্য আমেরিকান চিত্রপ্রযোজকরা 'জাঙ্গল বুক' নামে আরেকটি ছবিতে ভারতে পশুপালিত মানুষদের অদ্ভুত ও উদ্ভট জীবন লইয়া ছবি তুলিয়াছেন। সভ্যজগতের কাছে ভারতকে অসভ্যরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ইহাই প্রথম ও একমাত্র নহে; 'ইণ্ডিয়া স্পিকস্' চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া হলিউড এই ধরণের বহু ছবি তুলিয়া ভারত-বিদ্বেষী কাজ করিয়া আসিয়াছে।

অতীতের ইতিহাস না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী আজ রণবিক্ষুব্ধ, এক দেশের সহিত আরেক দেশের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রয়োজন আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছে। ইহা নিতান্তই অনুশোচনার বিষয় যে, ১৯৪২ সালে আজ যখন আমেরিকা গণতান্ত্রিক যুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করিতেছে, সেই সময় আমেরিকার চিত্র-ব্যবসায়ীরা তাহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন না করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্য চালাইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আর কতকাল ভারতবর্ষ এই অপমান সহ্য করিবে? ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স কংগ্রেস ১৯৩৯ সালে এক প্রস্তাবে এই সব বিদেশী প্রডিউসার্সদের হীন চক্রান্ত ও জঘন্য কার্যে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লেখালিখি হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

ভারতীয় সেন্সর বোর্ডএর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ যে, যেহেতু এই বোর্ড ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত না হওয়ায় ভারতের প্রতি অপমানজনক এই সব ছবি বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা বোধ করেন না। আমাদের কর্তব্য, জাতীয় সেন্সর বোর্ড গঠন করিয়া এই সব ছবির প্রদর্শনে বাধা দেওয়া এবং দর্শকদের মধ্যেও এই সকল ছবির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো।

প্রমথেশ বড়ুয়া

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া 'শেষ উত্তর' ও হিন্দি 'জবাব' ছবি তোলা হইয়া গেলে চিত্রজগৎ হইতে অবসর লইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এম পি প্রডাকসন্স

• পরিচালক সুশীল মজুমদার এম-পি প্রডাকসন্স-এর হইয়া মে মাস হইতেই একটি নূতন ছবি তোলার কাজে হাত দিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ছবির গল্প নির্বাচন ও অন্যান্য প্রাথমিক কাজ পরিচালক প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। অহীন্দ্র ও কাননকে প্রধান ভূমিকায় লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ইহাই হইবে কাননের প্রথম ছবি।



বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কলিকাতার বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতি অনুষ্ঠানে নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে বলিয়া যাহা আশঙ্কা করা গিয়াছিল ফলত তাহা হয় নাই। স্থানীয় দলসমূহ প্রতিযোগিতার শেষভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সত্ত্বেও বিভিন্ন খেলায় আশানুরূপ দর্শক সমাগত হয়। শেষ খেলায় রেঞ্জার্স দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। এই দলের সহিত ফাইনালে বি এন আর দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুই গোলে পরাজিত হয়। সেমি ফাইনালে বি এন আর দল মিলিটারী মেডিক্যালস দলকে পরাজিত করিয়া যে অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তাহাতে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন বি এন আর ফাইনালে সহজেই রেঞ্জার্স দলকে পরাজিত করিবে। কিন্তু সেই আশায় বি এন আর দল নিরাশ করিয়াছে। ফাইনাল খেলায় বি এন আর দল আশানুরূপ খেলিতে পারে নাই। কি আক্রমণভাগে কি রক্ষণভাগে খেলোয়াড়গণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। খেলার প্রথমার্ধে রেঞ্জার্স দল এক গোলে অগ্রগামী হইবার পরও বি এন আর দলকে তীব্র আক্রমণ করিতে দেখা যায় নাই। এই দলের খেলোয়াড়গণকে এই সময় অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হইতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ সময় ৪।৫ মিনিটের জন্য এই দল তীব্র আক্রমণ করে। কিন্তু ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন না থাকায় গোলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঠিক এই সময়ে রেঞ্জার্স দলের একটি খেলোয়াড় ফাঁকায় বল পাইয়া দলের দ্বিতীয় গোল করিতে সক্ষম হয়। ফলে বি এন আর দল দুই গোলে পরাজিত হয়।

রেঞ্জার্স দল এইবার লইয়া সাতবার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মানলাভ করিল। ইতিপূর্বে ১৮৯৯, ১৯১১, ১৯১৩, ১৯১৫, ১৯১৭ ও ১৯৩৪ সালে বিজয়ী হয়। ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালেও রেঞ্জার্স দল বেটন হকি কাপ বিজয়ী হইয়াছিল; কিন্তু তখন রেঞ্জার্স দলের নাম ছিল ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স।

বি এন আর দল ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালে এই কাপ বিজয়ী হয়। ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে রাণার্স আপ হয়।

ফাইনাল খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। খেলার কৌশল অপেক্ষা দৈহিক শক্তি প্রয়োগের দিকে খেলোয়াড়গণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ফরোয়ার্ডগণকে আক্রমণ করিতে কোন সময়েই দেখা যায় নাই। বাঙলার হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যে দিন দিন নিম্ন স্তরের হইতেছে ইহা তাহারই নিদর্শন। আমরা আশা করি, আগামী বৎসরে এইরূপ অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। নিম্নে পূর্ববর্তী বিজয়ী দলসমূহের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

১৮৯৫-৯৬ ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স, ১৮৯৭-৯৮ রাঁচী এম পি জি মিশন, ১৮৯৯ রেঞ্জার্স ক্লাব, ১৯০০ সেণ্ট জেমস স্কুল, ১৯০১-২ রয়াল আইরিস রাইফলস, ১৯০৩ রাঁচী এম পি জি মিশন, ১৯০৪ শিবপুর হর্নেটস, ১৯০৫ শিবপুর বি ই কলেজ, ১৯০৬-৭ রাঁচী এম পি জি মিশন, ১৯০৮-১০ কাস্টমস এ সি, ১৯১১ রেঞ্জার্স, ১৯১২ কাস্টমস এ সি, ১৯১৩ রেঞ্জার্স, ১৯১৪ আলীগড় এম এ ও কলেজ, ১৯১৫ রেঞ্জার্স, ১৯১৬ লক্ষ্মৌ বি ওয়াই এসো, ১৯১৭ রেঞ্জার্স, ১৯১৮ লক্ষ্মৌ বি ওয়াই এসো, ১৯১৯ জেভেরিয়ান্স, ১৯২০ আসানসোল রিক্রিয়েশন, ১৯২১ শিবপুর বি ই কলেজ, ১৯২২ ই বি রেলওয়ে, ১৯২৩ লক্ষ্মৌ ওয়াই এম এ, ১৯২৪-২৬ কাস্টমস এ সি, ১৯২৭ জেভেরিয়ান্স, ১৯২৮ টেলিগ্রাফ রিক্রিবেশন, ১৯২৯ ই আই রেলওয়ে, ১৯৩০-৩২ কাস্টমস, ১৯৩৩ ঝান্সি হিরোজ, ১৯৩৪ রেঞ্জার্স, ১৯৩৫ কাস্টমস, ১৯৩৬ বোম্বাই পাইমস, ১৯৩৭ বি এন আর, ১৯৩৮ কাস্টমস, ১৯৩৯ বি এন আর, ১৯৪০ ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স, ১৯৪১ ভগবন্ত ক্লাব ও ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স।

ডি এন গুই স্মৃতি কাপ

মোহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ সভ্য পরলোকগত ডি এন গুইর স্মৃতি রক্ষাকল্পে মোহনবাগান ক্লাব একটি কাপ প্রদান করিয়াছেন। এই কাপটি বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালের বিজিত দুইটি দলের মধ্যে যে খেলা হইবে তাহার বিজয়ীকে প্রদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই ব্যবস্থা মত এই বৎসরের বিজিত কাস্টমস ও মিলিটারী মেডিক্যালস দলকে এই কাপ লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। কাস্টমস দল ৩—১ গোলে মিলিটারী মেডিক্যালস দলকে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হইয়াছে। খেলাটি দর্শনযোগ্যও হইয়াছিল।

স্বর্গীয় ডি এন গুইর স্মৃতি রক্ষাকল্পে যে খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা খুবই সুখের বিষয়। তবে যেভাবে এই ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁহার খ্যাতি অনুযায়ী হইয়াছে বলিয়া আমরা অন্ততপক্ষে মনে করি না। একটি বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইলেই ভাল হইত।

কলিকাতার ফুটবল খেলা

কলিকাতার ময়দানে ফুটবল খেলা আরম্ভ হইয়াছে। অনুশীলন খেলা ও পাওয়ার লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। আগামী ৪ঠা মে তারিখ হইতে কলিকাতা ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠানের যখন ব্যবস্থা হইয়াছে তখন আশা করা উচিত আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থা ইতিপূর্বে শেষ হইয়াছে। বিমান আক্রমণকালে খেলোয়াড়গণ ও দর্শকগণ যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহার ববস্থা করিয়া তবেই লীগের খেলা আরম্ভ করা হইবে ইহাই ছিল আই এফ এর সভার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত যাহাতে দ্রুত কার্যকরী হয় তাহার জন্য একটি সাব-কমিটিও গঠন করা হইয়াছিল। এই সাব-কমিটি উক্ত কার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাহায্যে এই সকল ব্যবস্থা করিবেন স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা যে হয় নাই এবং কবে হইবে কেহই বলিতে পারে না। প্রচেষ্টা হইতেছে শোনা যায়। ববস্থা না করিয়া যখন খেলা আরম্ভ হইতেছে, তখন আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ পূর্বের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পরিবর্তন করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, "যতদিন খেলা চলে চলুক দরকার হইলে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে" এই ভাব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইল? দর্শকগণ কি নিশ্চিন্ত মনে খেলা দেখিতে যাইবেন? দর্শক সমাগম কি ইহাতে বিশেষ কম হইবে না? প্রতিযোগিতার খেলাসমূহ কি ক্রীড়ামোদীদের মনে সেইরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারিবে? এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে?

রেফারী সমস্যা

ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা পরিচালনা করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর হইতে উপযুক্ত সংখ্যক ভাল রেফারীর অভাব অনুভূত হইয়াছে। এই অভাব দূর কি করিয়া হইবে তাহা স্থির না করিয়া হঠাৎ আই, এফ, এ কমিটি রেফারীদের যাতায়াতের ভাড়া কর্তনের জন্য ব্যস্ত কেন হইলেন, বুঝিতে পারা গেল না। পূর্বে প্রতি খেলা পরিচালনার জন্য দুই টাকা করিয়া দেওয়া হইত। এই বৎসর এক টাকা করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির দিনে যানবাহনাদির ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেফারীকে পূর্বে যে ব্যয় করিয়া মাঠে আসিতে হইত, তাহা অপেক্ষা অধিক পয়সা ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, আই, এফ, এ এই বৎসর যাতায়াত ভাড়ার হার বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে কমাইয়া দেওয়া হইল। ফল হইবে যে, পূর্বে যে সংখ্যক রেফারী খেলা পরিচালনার জন্য উপস্থিত হইতেন তাহাও হ্রাস পাইবে। প্রতিযোগিতার সকল খেলা পরিচালনা করিবার জন্য রেফারী পাওয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া এই "ছাটাই" ব্যবস্থা অনেক রেফারীর আত্মসম্মানে আঘাত দিবে। ইহা অপেক্ষা আই ,এফ, এর কর্তৃপক্ষগণ যদি বর্তমান আর্থিক দুরবস্তার কথা উল্লেখ করিয়া রেফারী এসোসিয়েশনের নিকট কোন অভিমত দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন খুবই ভাল হইত। হয়তো তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে অনেক রেফারীই এই যাতায়াতের ভাড়া ছাড়িয়া দিতেন। নিজ পয়সা ব্যয় করিয়া খেলা পরিচালনা করিবার জন্য মাঠে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইতেন। বর্তমান অবস্থায় এই ব্যবস্থাও সম্ভব নহে। কারণ আই, এফ, এর কর্তৃপক্ষগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রেফারী এসোসিয়েশনের কোন অভিমতই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা এই এসোসিয়েশনকে উপেক্ষা করিয়াছেন। রেফারী এসোসিয়েশন যে ইহা নীরবে সহ্য করিবেন তাহাও মনে হয় না। তাঁহারা লীগের কোন খেলা পরিচালনা করিতে পারিবেন না বলিয়া যদি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে খুব আশ্চর্যের কিছুই হইবে না। ফলে ফুটবল রেফারী সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। এইভাবে আই, এফ, এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়াছেন। সকল বিষয় চিন্তা না করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইর ত্যাগ

পৃথিবীর হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইর ত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তিনি এই পর্যন্ত যত অর্থ অর্জন করিয়াছেন, তাহার গড়পড়তা হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচশত পাউণ্ড হয়। কিন্তু তিনি বর্তমানে আমেরিকার সৈনিক দলে যোগদান করয়া মাসে মাত্র ২১ ডলার পাইতেছেন। ১৯৩৭ সালে জেমস ব্রাডককে পরাজিত করিয়া তিনি পৃথিবীর হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। সেই হইতে এই পর্যন্ত তিনি মোট ২১ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ২১বারই বিজয়ী হইয়াছেন। পৃথিবীর কোন মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া এবং এত অধিকবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি এই পর্যন্ত মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া ৩০০০০০ পাউণ্ডের অধিক অর্জন করিয়াছেন। ম্যাক্স স্মেলিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁহাকে মাত্র দুই মিনিট ৪ সেকেণ্ড লড়িতে হইয়াছিল এবং ঐ প্রতি-যোগিতায় ৬৪,২৪৯ পাউণ্ড অর্জন করেন। অর্থাৎ তিনি প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ পাউণ্ডের অধিক অর্জন করেন। সেইরূপ একটি লোক মাসে ২১ ডলার পাইবেন এইরূপ চাকুরী গ্রহণ খুবই ত্যাগের পরিচয়। অর্থের প্রতি তাঁহার যে লোভ নাই, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ধনীর ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলাবামা কটন মিলে পাঁচ ডলারের মাহিয়ানায় প্রথম চাকুরী গ্রহণ করেন। এই চাকুরীর পরেই মুষ্টিযুদ্ধ জগতে সুনাম লাভ করেন এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। সেই অর্থ উপেক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় সামান্য মাহিয়ানার চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে, তিনি মুষ্টিযুদ্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ মুষ্টিযুদ্ধ জগতের বিশেষ ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার কৃতিত্ব ক্রীড়া জগতে আদর্শ-রূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।

সমর বার্তা

২২শে এপ্রিল—

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন ঘোষণা করেন যে, বঙ্গোপসাগরে শত্রুপক্ষের কর্মতৎপরতার ফলে অস্ট্রেলিয়ান রণতরী "ভ্যাম্পেয়ার" নিমজ্জিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-চুংকিং-এর এক সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, সালুইন রণাঙ্গনে জাপানীরা ঘাঁটিগুলির উপর নূতন করিয়া আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং তাহারা লোইকের দক্ষিণে অবস্থিত বাওলেকে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃটিশ নৌ-বাহিনীর আশু লক্ষ্য হইতেছে মধ্য প্রাচ্যে জাপ বাহিনীর বিস্তৃতি নিবারণের জন্য ভারত ও সিংহলকে কেন্দ্র করিয়া একটি ব্যূহ রচনা করা।

মার্কিণ রাজনীতিজ্ঞ 'মি কার্ল হিল স' প্রতিনিধি পরিষদে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিসমূহ কর্তৃক মাদাগাস্কার দখল করার দাবী করে।

ফিলিপাইন-প্যানে দ্বীপ রক্ষাকারিগণ জাপ বাহিনীর প্রচণ্ড চাপে লাম্বানাও হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

২৩শে এপ্রিল—

ব্রহ্মের পিনমানা রণাঙ্গনে এক শক্তিশালী জাপ বাহিনী চীনাদের পার্শ্বভাগে আক্রমণ চালায়। চীনারা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে এবং বহু জাপানীকে নিহত করে। ইরাবতী রণাঙ্গনে তাউং দুইঙ্গি অঞ্চল হইতে বৃটিশ বাহিনীকে সরাইয়া আনা হইতেছে।

রুশিয়া—ভিসি নিউজ এজেন্সীর নিকট ষ্টকহলম হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, উভয়পক্ষ রুশ রণাঙ্গনে অবিরাম প্রচুর রণসম্ভার আমদানী করিতেছে এবং আক্রমণের জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ করিতেছে।

লণ্ডনে কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাপানীরা সুদূর প্রাচ্যের দরিয়ায় ফরাসীদের মোট ৫০ হাজার টনের জাহাজ হস্তগত করিয়াছে।

২৪শে এপ্রিল—

ব্রহ্ম—সালুইন রণাঙ্গনে জাপানীরা লোইক শহরের উত্তরাংশ দখল করে। ইরাবতী রণাঙ্গনে চীনাগণ কর্তৃক ইয়েনাংইয়ং পুনরধিকারের পর জাপানীরা নূতন সৈন্য আমদানী করে এবং পুনরায় আক্রমণ সুরু করে। পিনমানার উত্তরে বর্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে।

গত রাত্রে বৃটিশ বোমারু বিমানবহর বাল্টিক তীরবর্তী রস্টক বন্দরের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়।

"বাসলের ন্যাশনাল জাইটুং" পত্রিকার স্টকহলমস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, নরওয়েতে দলে দলে নূতন জার্মান সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, নরওয়ের উপকূলভাগে বৃটিশ টহলদারী বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

লর্ড বীভারব্রুক নিউইয়র্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে বৃটেন কর্তৃক একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

ভারত সচিব মিঃ আমেরী বার্মিংহামে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ডানকার্কের পর আগামী কয়েক সপ্তাহই পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

২৫শে এপ্রিল—

ব্রহ্ম—মান্দালয়ের উপর পুনরায় বিমান হানার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইরাবতী রণাঙ্গনে চীনারা ইয়েনাংইয়ংকের উত্তরে পিনচাং নদী আয়ত্তে রাখিয়াছে। বৃটিশ বাহিনী বর্তমানে আরও কিছু উত্তরে আছে।

গতকল্য বৃটিশ বিমানবহর পুনরায় বল্টিক তীরবর্তী রস্টকের বিমান ও জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা এবং ফ্লাসিং-এ (হল্যাণ্ড) জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা ও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফলে প্রভূত ক্ষতি হয়। অদ্য প্রাতে বৃটিশ জঙ্গী বিমানবহর শেরবুর্গ, ডানকার্ক এবং ক্যালে এলাকায় বোমা বর্ষণ করে।

২৬শে এপ্রিল—

পূর্ব ব্রহ্মের সালুইন রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া চীনারা তাউঙ্গি শহর পুনরধিকার করিয়াছে।

গত রাত্রিতে রস্টকের উপর পুনরায় প্রবল বিমান হানা হয়। বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ চেকোশ্লাভিকিয়ার পিলসেন-এ স্কোডা কারখানার উপরও বোমা বর্ষণ করে।

বৃটিশ সাবমেরিণসমূহের আক্রমণ ভূমধ্যসাগরে প্রতিপক্ষের চারিটি মালবোঝাই জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

গতকল্য জার্মান বিমানসমূহ মাল্টার হাসপাতালসমূহের উপর তিনবার বোমা বর্ষণ করে।

মার্কিণ সৈন্যেরা নিউ ক্যালিডোনিয়ায় অবতরণ করিয়াছে। নিউ ক্যালিডোনিয়া পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ফরাসী দ্বীপ।

হের হিটলার রাইখস্ট্যাগে এক বক্তৃতা করেন।

২৭শে এপ্রিল

জাপ বিমানবহর ডারউইন, মোরেসবি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে বোমা বর্ষণ করে।

বৃটিশ বিমানবহর গত রাত্রে পুনরায় রস্টকের উপর হানা দেয়।

২৮শে এপ্রিল

ব্রহ্ম—কুনসিং-এর ২৮শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ যে, লাসিও শহরে প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে এবং শহরে আগুন জ্বলিতেছে। জাপানী অগ্রগামী বাহিনী লাসিও হইতে একশত মাইল দূরবর্তী ম্যানসনে পৌঁছিয়াছে। লাসিওর বিপদাশঙ্কায় চীনারা জাপানীদিগকে বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইতেছে। লাসিং ব্রহ্ম রোডের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর সরবরাহ এই পথেই আসিয়া থাকে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২২শে এপ্রিল—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক গতকল্য ঢাকায় করোনেশন পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙলার সীমান্তে আসন্ন বিপদের বিষয় সকলকে অবহিত করাইয়া দেন এবং বাঙলার হিন্দুমুসলমানকে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া দেশের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

ঢাকায় প্রধান মন্ত্রী, ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সমক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দায়ের মামলাগুলি সমেত সকল সাম্প্রদায়িক মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২১শে এপ্রিল তারিখের "যুগান্তর" (কলিকাতা সংস্করণ) বাঙলার গভর্নরের মতে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে "যুগান্তরের" উক্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

বোম্বাই সরকার ২২শে এপ্রিল হইতে ৩০ দিনের জন্য "বোম্বে সেণ্টিনেল" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি কর্ণেল লুই জনসন দিল্লীতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে বলেন, "আমাদের সাধারণ শত্রু কর্তৃক যদি ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার রক্ষার দায়িত্ব হইবে সম্মিলিত জাতিসমূহের; সম্মিলিত জাতিসমূহের সম্পদ আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করিবার জন্য যথাসম্ভব ব্যবহার করা হইবে। এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিক ইতিমধ্যেই ভারতে আসিয়াছে এবং আরও ভারতে আসিবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ দলের অভিজ্ঞতা ভারতের সমস্যায় প্রয়োগ করা হইবে।"

২৩শে এপ্রিল—

ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র রচনার সময় যদি মুসেলিম লীগ তাঁহাদের পাকিস্থানের দাবী লইয়া পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে ঐ দাবী স্বীকার করিয়া লইবার নিমিত্ত ও বর্তমান জরুরী অবস্থা বিবেচনায় জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও আপোষ করার উদ্দেশ্যে মুসলীম লীগকে আমন্ত্রণ করার নিমিত্ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট সুপারিস্ করিয়া দলের নেতা শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভাপতিই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

বাঙলা গভর্নমেণ্ট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র "যুগান্তরের" প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন।

২৪শে এপ্রিল—

ভারত সরকারের বহির্ভারত সচিব শ্রীযুত আণে ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য রাস্তায় যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আসাম সফরে গিয়াছিলেন। গতকল্য আসাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীযুত আণে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 'বর্তমানে শ্বেতাঙ্গদের জন্য কোন পথ নির্দিষ্ট নাই; সেইরূপ শ্বেতাঙ্গ ও ফিরিঙ্গীদের জন্য বিশেষভাবে কোন শিবির নির্দিষ্ট নাই।"

২৫শে এপ্রিল—

মাদ্রাজ আইন সভার কংগ্রেসী দলের প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুত রাজাজীর সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে তাঁহার কর্তব্য পালনে কোন বিচ্যুতিই ঘটিবে না।

ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং আশ্রয়স্থলগুলি পরিভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার আসাম সফর শেষ করিয়াছেন এবং কলিকাতায় আসিয়া পেণছিয়াছেন।

২৬শে এপ্রিল—

বাঙলা সরকার "যুগান্তর" নামক দৈনিক সংবাদপত্র পুনঃপ্রকাশের আদেশ দিয়াছেন।

২৭শে এপ্রিল—

কলিকাতার "স্টার অব ইণ্ডিয়া" নামক ইংরেজী মুসলিম সান্ধ্য দৈনিক সংবাদপত্রের উপর ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া অদ্য হইতে এক সপ্তাহের জন্য উহার প্রকাশ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ২০শে এপ্রিল সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত হেমচন্দ্র নাগের অভিযোগক্রমে "স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ উইলিয়াম আর্থার মুর ও মুদ্রাকর মিঃ নারায়ণচন্দ্র পাত্রের বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলা খারিজ করা বা স্থগিত রাখার জন্য আসামীপক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আগামী ৪ঠা মে মূলে মামলার শুনানীর দিন ধার্য করা হইয়াছে।

"বোম্বে সেণ্টিনেলের" পত্রিকার প্রকাশ ১ মাস যাবৎ বন্ধ রাখিবার জন্য যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

এলাহাবাদের আনন্দ ভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়।

২৮শে এপ্রিল

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং মালয় ও ব্রহ্ম প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অদ্য এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি সমগ্র অথবা আংশিকভাবে মুদ্রণ কিংবা প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

নিউগিনি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

বিষুবরেখার তলায় নিউগিনি দ্বীপটির প্রতি সম্প্রতি জাপানের দৃষ্টি পড়েছে। এই দ্বীপটির প্রতি এতদিন আমাদের একটা কৌতুহল ছিল, কারণ এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা নরখাদক। চিরতুষারমণ্ডিত শুভ্র পর্বতশৃঙ্গ ও গিরিগহ্বার অভ্যন্তরস্থ বিচিত্র স্বাভাবিক ভাস্কর্য এই দ্বীপের অন্যতম আকর্ষণ। নিউগিনি বৃহত্তম অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডগুলির মধ্যে অন্যতম। অতি অল্পদিন হলো 'নিদারল্যাণ্ড গভর্নমেণ্ট' কর্তৃক বিমানযোগে দ্বীপটির পশ্চিমভাগের ৩৬,০০০ বর্গ মাইল ভূভাগের মানচিত্র করা হয়েছে।

'পর্তুগীজ' ও 'স্প্যানিস'দের দ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বীপটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের পর প্রায় তিন শত বৎসর ধরে দ্বীপটি উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকে। উপর উপর দেখা ভিন্ন কেউ এর সঠিক বিবরণ জানবার চেষ্টা করেনি। এই দ্বীপের নরখাদক অধিবাসীদের জন্যেই বোধ হয় দ্বীপটিকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করা হয়।



নিউগিনির একজন নরখাদক

১৯০৬ সালে 'নিদারল্যাণ্ডের' প্রধান মন্ত্রী ক্যাপ্টেন এইচ কলিনের উদ্যোগে এক অভিযান হয় এবং এই অভিযানেরই ফলে জনসাধারণ দ্বীপটির সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ পেতে সক্ষম হয়েছে। এর বিচিত্র গিরিগহ্বা, চিরতুষারমণ্ডিত ধবল শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্বত শ্রেণী, এর বিচিত্র অধিবাসীদের বিচিত্রতর "Totem ও Taboo" সভ্য জগতের কাছে এখনও সম্পূর্ণরূপেই রহস্যময় হয়ে আছে।

পূর্বোক্ত অভিযানের ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন মিস্টার নিজেম; তিনি দ্বীপটিতে ভ্রমণ করে বেড়িয়ে এদেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাদের শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপে অনেক শিল্প সামগ্রীও সংগ্রহ করেছেন।

নিউগিনির অধিবাসীরা নিতান্ত বর্বর প্রকৃতির। খুব লম্বা চওড়া, বলিষ্ঠ চেহারা, এবং মেজাজও খারাপ, অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'পাপুয়ান' ও 'আইকা'দের নাক চ্যাপ্টা ও ঠোঁট পুরু; কিন্তু 'ফাফা-ই-ওয়া' (Fafaiwa)দের নাক বেশ উঁচু ও লম্বা। এদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই গহনা পরে; অধিকাংশ দেশের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই বেশী গহনা পরে, এখানে কিন্তু উল্টো, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেই বেশী গহনা পরে ও সাজসজ্জা করে। 'পাপুয়ান' 'ওয়ারওপেন' প্রভৃতির মাথার চুল খুব ঘন ও কাফ্রিদের মত কোঁকড়া। ফাফা-ই-ওয়া'দের চুল অপেক্ষাকৃত মসৃণ। এদের দেহের আকার, অবয়ব ও রঙে অস্ট্রেলিয় ও নিগ্রোদের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

পুরুষেরা নাকের পাটায় ফুটো করে বড় বড় হাড় পুরে দিয়ে নাকের শোভা বাড়ায়। গলায় প্রচুর শাঁক, হাড় ও পাথরের মালা পরে এই মালাগুলি ইংরেজী অক্ষর 'X'-য়ের মত করে পরা হয়। কপালে তিলক কাটে, মাথায় বিচিত্র আকারের বেতের শিরোভূষণ পরে, তাতে বুনো পাখীর বড় বড় পালক গুঁজে দেয়। উত্তর নিউগিনির 'ফাফা-ই-ওয়া'রা কোমর হতে বুক পর্যন্ত বেত জড়িয়ে আবৃত করে রাখে এবং সামনে এক টুকরা বল্কল বা কাপড়ের টুকরা কৌপিনের মত ঝুলিয়ে দেয়। হাতে শাঁখের বালা ও বুকের মধ্যভাগে হাতি দাঁতের চওড়া পেটি পরে। সময় সময় পুরুষেরা আমাদের দেশের ছোট ছোট মেয়েদের মত নাকে মাকড়ী-জাতীয় একরকম গহনা পরে। পায়েতেও কোন কোন অংশের লোকেরা (পুরুষেরা) একরকম বালার মত গহনা পরে।

মেয়েরা নাক বিঁধোয় না! কান বিঁধিয়ে তাতে মাকড়ী জাতীয় গহনা পরে। গলায় পুঁতি, হাড় বা শাঁখের একগাছি দুগাছি বা ততোধিক মালা পরে। একগাছি মালা হলে দুফের দিয়ে পরা হয়—একটি ফের গলার সঙ্গে লেগে থাকে অপর ফেরটি অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে বুকের উপর ঝুলে থাকে। আর গাছাটি সাধারণভাবে (যেমন আসামের দেশের মেয়েরা পরে থাকে) গোল করে পরা হয় এবং তৃতীয় গাছাটি বুকের সামনে 'X'-য়ের মত করে পরা হয়। মেয়েরা হাতে খুব চওড়া চওড়া হাতি দাঁতের ও শাঁখের পেটি পরে; সময় সময় সমস্ত হাতই এই গহনায় ভরে যায়। উপর হাতের পেটি বা বালার মধ্যে তারা অনেক পাতা ও পালকের তোড়া গুঁজে দিয়ে হাতের শোভা আরও বাড়ায়; হাতের আঙুলে আংটি পরে।

নিউগিনির অধিকাংশ অঞ্চলের মেয়েদের দেহের খু

সামান্য অংশই আবৃত থাকে। তারা সামান্য কৌপিনের মত এক টুকরা কাপড় সামনে ঝুলিয়ে দেয়, তবে উৎসবের সময় তারা লুঙ্গির মত নানা রঙের কারুকার্য করা কাপড় পরে। এ দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল, সুগঠিত চেহারা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিতান্ত মন্দ বলা যায় না। মেয়েরা সমস্ত গায়ে বিচিত্র নক্সা করে উল্কি পরে 'ওয়ারওপেন' উপকূলের পাপুয়ান মেয়েরা নিজেদের পিঠে বড় বড় ক্ষত উৎপাদন করে দেহের সৌন্দর্য বাড়ায়। ক্ষতগুলি এত বড় যে মাংস ডেলা ডেলা হয়ে ক্ষতের ভেতর হতে বাহির হয়ে আসে। তরুণীরা প্রেমাস্পদের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ ক্ষতগুলি দেখিয়ে বেড়াতে বিশেষ গর্ব বোধ করে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে কেটে এই ক্ষত উৎপাদন করা হয় কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা সদ্যজাত ক্ষতের মধ্যে রং ভরে দেয়। মেয়েরা ঘন কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি প্রথমে তালপাতা বা নারকলপাতা দিয়ে ওপর মুখো আঁটি বেঁধে দু' তিন দিন ছেড়ে দেয়; তারপর বাঁশের চিরুণী দিয়ে চুলগুলি 'ঝুপো' (bushy) করে আঁচড়ায়।

শিকার ও দস্যুবৃত্তি হলো নির্উগিনির অধিবাসীদের প্রধান উপজিবীকা। দ্বীপের চারপাশের লোনা জলে প্রচুর বড় বড় মাছ ও হাঙগর থাকে। তারা অতি সূক্ষ্ম আগাযুক্ত বিষাক্ত বল্লম দিয়ে মাছ শিকার করে। নৌকায় করে একরকম বেতের তৈরি জাল দিয়েও তারা মাছ ধরে। পূর্বে দ্বীপের কাছে-পিঠে স্টিমার' বা জাহাজ দেখলে তারা অতি দ্রুতগামী ডিঙ্গিতে করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বড় বড় দল বেঁধে তাতে গিয়ে উঠতো, বং তার লোকেদের জিনিসপত্র সব লুঠ করে আনতো মানুষদের র এনে খেত। এখন অবশ্য সেটা কমে গেছে। 'Flower iver' (ফ্লাওয়ার নদী)-য়ের অধিবাসীরা নর-খাদক বলে খ্যাত। ারা অত্যন্ত বর্বর প্রকৃতির। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ডিঙ্গিতে রে সর্বদা জলের উপর টহল দিয়ে বেড়ায়। সামান্য উত্তেজনাতেই ারা নরহত্যা করে। বিজেতা পরাজিতের মাংস খায়। ইহাদের ৃদ্ধেরা অকর্মণ্য হয়ে পড়লে তাদেয় বিক্রী করে ফেলা হয়। ক্রতারা তাদের মেরে ফেলে ভক্ষণ করে। একজন ফ্রেঞ্চ মিসনারী াহেবের কাছে শুনা যায়—একবার নিদারল্যান্ড গভর্নমেণ্টের াটজন লোক তাদের কাছে কর আদায় করতে আসে। কর নওয়ার পর তাদের জন কয়েক, এদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কটু কৌতুক করে। তারপর তারা ফিরে এসে রাত্রে তাঁবুর াহিরে যখন ঘুমোয়,—অতর্কিতে, স্থানীয় লোকেরা তাদের াক্রমণ করে সকলকে হত্যা করে। কেবল হত্যা করেই ছাড়েনি তাদের মাংস ভক্ষণ করে। পরে অনুসন্ধানকারীরা খোঁজ করে কর আদায়ীদের কেবল হাড়গুলি পায়।

নিউগিনির পুরুষেরা কখনও গুরুভার বহন করে না—ভার বহনের কাজ সর্বদাই মেয়েদের করতে হয়, স্ত্রী-পুরুষ পাশা-পাশি যেতে পুরুষ কখনও কোন ভার বহন করে না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরা অলস প্রকৃতির।

এদেশে প্রচুর পরিমাণে সাবু, নারকল ও কলা জন্মায়। য্যাম (Yam), তারো (Taro) ও রাঙ্গাআলু হলো এদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। নির্উগিনির অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হলো সাবু। সাবুকে বহুক্ষণ ধরে জাল দিয়ে রবারের মত করে ফেলা হয়; তারপর তাতে শুষ্ক মাছ দিয়ে খাওয়া হয়। অনেক স্থানে বন্য শুকর ও এক প্রকার বন্য ক্যাঙ্গারুর মাংস খাওয়া হয়। সখ করে আমাদের অনেকে 'Guinea-pig' (গিনি-পিগ) পুষে থাকেন। 'গিনি-পিগ' হলো এই নির্উগিনিরই জীব।

দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 'ইন্ডনেসিয়' প্রভাব পড়ায় এই অঞ্চলের লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য হয়েছে। মেয়েরা লুঙ্গি ও জামা পরে, পুরুষেরা 'হাফ-প্যাণ্ট' ও 'গেঞ্জী' জাতিয় জামা পরে; বাজারে কেনাবেচা করে। হাটে বা বাজারে বদল (exchange) প্রথায় ক্রয় বিক্রয় চলে।

এদের বিয়ে হয় খুব ধুমধামের সঙ্গে। পাত্র কয়েকটি শুকর দিলেই পাত্রীপক্ষ কন্যা দেয়। যার যা ভাল ভাল বেশভূষা আছে তাতে সজ্জিত হয়ে বিবাহের জায়গায় এসে জড় হয়। নারী ও পুরুষেরা সেখান থেকে বিরাট শোভাযাত্রা করে বেরোয়। নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ। নিতান্ত বর্বর হলেও তাদের কারুকলায় বেশ একটি রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের অস্ত্রশস্ত্রের বাঁট নৌকার দাঁড়, ডিঙ্গির গা, কাপড়, গহণা ও গায়ের উল্কিতে অনেক সময় বেশ সুক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্য জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকায় এরা এখনও নগ্ন-স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। রীতিনীতি, নিয়ম-কানুনের বিশেষ কোন বালাই নেই। বাধা-মুক্ত উদ্দাম প্রকৃতি তাদের যে দিকে চালায় তারা সেই দিকেই চলে। দেশে খাদ্য প্রচুর। জীবন ধারণের জন্য তাদের বেশী মাথা ঘামাতে না হওয়ায় এবং দৈহিক বলের যথেষ্ট সদ্যবহারে তাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও দৈহিক বল বার্ধক্যেও বেশ অটুট থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য অসভ্য জাতিদের মত, এদেরও অনেক কুসংস্কার আছে,—ভূত, প্রেত, অপদেবতা প্রভৃতি তারা অনেক কিছুই মানে। সভ্যতার আলোক পেলেও প্রকৃত সভ্য হতে এদের অনেক সময় লাগবে।



ব্রহ্মদেশের সালউইন নদীর মনোরম দৃশ্য।



রাশিয়ার একদল সৈন্য জলাশয় অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বিচিত্রা বার্তা

সনাক্তের জন্য আঙ্গুলের ছাপ খুবই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে বহুদিন থেকে আসামীদের আঙুলের ছাপ লওয়ার ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের পুলিশ অফিসগুলিতে চলে আসছে। নিরক্ষর লোকের কাছ থেকে প্রমাণস্বরূপ বুড়ো আঙুলের ছাপের বিনিময়ে দেনা পাওনার কাজ আমাদের দেশেও চলে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরাও পরীক্ষা করে এই আঙুলের ছাপকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। দেহের কোন বিশেষ চিহ্নিত দাগও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে একেবারে বিলুপ্ত হ'তে পারে অথবা স্থান পরিবর্তন করে অনেক সময় প্রমাণের সমস্ত যুক্তিকে খন্ডন করে দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণে দেখা গেছে আঙুলে যে বলয়াকারে রেখা অঙ্কিত আছে তা দীর্ঘদিনেও পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলেও মত বিরোধের আর অন্ত নেই। যে যুক্তিকে আজ দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিক এবং জনসাধারণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে পালন করে আসছিল তা বর্তমানের একাধিক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণে মিথ্যা হতে চলেছে। তাঁরা বলেন, আঙুলের ছাপে কৃত্রিমতা আনা অস্বাভাবিক নয়। ডাঃ বার্কার নামে একজন প্রতিষ্ঠাবান চক্ষু চিকিৎসক বলেন, 'আঙ্গুলের ছাপের অপেক্ষা চক্ষুর গোলক এবং চারিপাশের শিরা-উপশিরাগুলির অবস্থান থেকে কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা খুবই সহজ এবং একমাত্র নির্ভর যোগ্য প্রমাণ। উক্ত চক্ষু চিকিৎসকের মতে কোন ব্যক্তির বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর গোলক এবং শিরা-উপশিরার স্থান পরিবর্তন করার কোন সম্ভাবনা নেই এবং সামান্য পরিবর্তন হলেও কোন একজনকে সনাক্ত করা শক্ত ব্যাপার নয়। চক্ষুর মত একটি অমূল্য রত্নের চারিপাশে কৃত্রিমতা আনার চেষ্টা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মগোপনের জন্য এইরূপ বিপদের ঝুঁকি নিতে বোধ হয় খুব অল্পসংখ্যক আসামীর পক্ষেই সম্ভব হবে বলে চক্ষুর গোলক, শিরা-উপশিরাগুলির ছাপ সনাক্তের পক্ষে যে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আঙ্গুলের ছাপের ফটো নেওয়ার মত চোখের ছাপের ফটো নেওয়া খুব বেশী শক্ত ব্যাপার নয়। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বৈজ্ঞানিকদের এই আবিষ্কার কাজে লাগতে পারে।

* * * * * *

সংবাদপত্র থেকে চোখ তুলে চাঁদুভায়া ফেটে পড়ল। গরম খবর অনুমানে ছুটে এলাম। প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই ভায়া বললে, সেই ধরণের আইনটা আমাদের দেশে আজ থেকেই চালু দরকার। এই ঘটনার পূর্ব রাত্রে ভায়াকে একটা বিচিত্র আইনের খবর দিয়েছিলাম। সুতরাং বর্তমান ব্যাপারটা উপলব্ধি করবার জন্যে তাকে আর প্রশ্ন না করে কাগজের উপর বিদ্ধমান আঙ্গুলটিকে অনুসরণ করলাম। বড় টাইপে কোন এক ব্যক্তির উচ্চপদলাভের সংবাদ ছাপা হয়েছে। দেশে এত উপযুক্ত লোক থাকতে এই ব্যক্তির উচ্চপদ লাভের উপর কটাক্ষ দেখলাম কেবল ভায়ারই নয়। কাগজের সম্পাদকেরাও দীর্ঘস্থান জুড়ে [illegible] পত্রাধিষ্ঠিত করেছেন। কোন একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানে উক্ত ব্যক্তির উচ্চপদলাভের একমাত্র যোগ্যতা যে, তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের কোন এক পদস্থ কর্মচারীর শ্যালক।

সকাল বেলায় খবরের কাগজের উপর অনেকেই হামাগুড়ি দিতে হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের সকলেরই উৎসুক নেত্র দেখলাম আমার উপর বিস্তারিত, আইনটার খবর সংগ্রহের জন্যে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের নারবোন শহরের মিউনিসিপ্যালিটি। ১৮৮৪ সালে সেখানে একটি নূতন আইন পাশ হ'ল। আইনে বলা হয়েছিল, এই মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের একই টেবলে কোন কর্মচারীর আত্মীয় যেমন শ্যালক, ভায়রাভাই অথবা ভগ্নিপতি একসঙ্গে বসে চাকরী করতে পারবে না। উক্ত অফিসের একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন মঃ রুঁ। তিনি অনেকদিন ধরে মেয়রের সহকারী হিসাবে কাজ করে এসেছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি তাঁর একই টেবলের সহকর্মীর ভগ্নিকে বিবাহ করে এই আইনের কবল থেকে রক্ষা পান নি। অফিসের বড়কর্তাদের কানে তাঁর বিবাহের এই খবর পৌঁছলে তাঁকে পদত্যাগপত্র দাখিল করে কাজে চিরদিনের জন্যে ইস্তফা দিয়ে যেতে হয়। এই আইন আমাদের দেশে পাশ হলে কি হবে এই ভেবে অনেকেই শঙ্কিত হবেন। তবে মঃ রুঁই জেনেশুনেই এই আইনের কবলে পড়েছিলেন।

* * * * * *

গ্রেট বৃটেনের বৃটানিয়া ব্রিজ, সেখান থেকে আরও এক মাইল দূরে এ্যাংলেসি। এ্যাংলেসি শহরের অন্তর্গত একটা ছোট্ট শহরের রেলওয়ে স্টেশন ট্রেনের যাত্রিদের কাছে আজও পুরোনো হয়ে যায়নি। এই ছোট্ট স্টেশনটিতে গাড়ী এসে থামতেই যাত্রীদের মধ্যে একটা কলোচ্ছ্বাস উঠে, সকলেই স্টেশনের নামটা পড়তে আরম্ভ করে দেয়। প্ল্যাটফর্মের এ কোণ থেকে আরম্ভ করে একেবারে স্টেশনের শেষ পর্যন্ত এতখানি স্থান জুড়ে স্টেশনের নাম—L L A N F A I R P W L L G W Y N G Y L L G O G E R Y C H W Y R N D R O B W L L. L L A N T Y S I L I O G O G O G O C H—সর্বসমেত এই ৫৮টি অক্ষর নিয়ে L M S রেলওয়ের এই স্টেশনটির নাম। এই নামের অর্থ 'The Church of St. Mery, in a hallow of white hazel, near to the rapid whirlepool and to St. Tysillio Church, near to a red cave.' বৃটেনে এই ধরণের আরও কয়েকটা অনেক অক্ষরযুক্ত স্থানের নাম আছে। একটার নাম যেমন DRIMTAID HVRICKHILLICHATTAN. কোন এক ইংরেজ ভদ্রলোকের নামের বহর একবার দেখুন,—FEATHERSTONE HAUGH.এর থেকেও বড় বড় অন্য বহু দেশের লোকের নাম আছে। খবর পেলেই তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছা রইল।



[এই চিঠিগুলি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। ইনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরে শান্তিনিকেতনে বহুকাল অধ্যাপকতাও করিয়াছিলেন, এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শে কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রের সহযোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা কালেই তরুণ মনের নানা প্রশ্ন অনেক সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট চিঠিতে উপস্থিত করিয়াছেন, এই পত্রাবলীর প্রথম অংশ তাহারই উত্তর। ছাত্রদশা অতিবাহিত হইলে তিনি যখন উৎসাহী শিক্ষক ও উদ্যোগী কর্মীরূপে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন, তৎকালে বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উত্তর পত্রাবলীর দ্বিতীয় অংশে আছে—সম্পাদক, দেশ]

ওঁ

শিলাইদা (নদিয়া)

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পাইয়া খুসী হইলাম। মিথ্যাচরণ করিলে অন্য লোকের নিকট বিশ্বাস হারাইতে হয় এবং তাহাতে নিজের এবং পরের অনেক সময় অনেক অসুবিধা ও অনিষ্ট ঘটে একথা সত্য—কিন্তু এইটেই আসল কথা নয়! পাপের বাহ্য ফল দুঃখ ও অনিষ্ট—কিন্তু তাহার চেয়ে গুরুতর পরিণাম নিজের মনটাকে নষ্ট করা। আমরা অন্যকে বঞ্চনা করিতে গিয়া নিজেকে যেমন বঞ্চনা করি এমন আর কাহাকেও নহে। আমাদের চরিত্র সত্য হইতে যতই ভ্রষ্ট হইতে থাকে, ততই বলহীন হইয়া পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, বলহীন কখনো ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। অসত্য ও অন্যান্য পাপ মনের চারিদিকে কেবলি আবরণ তৈরি করিয়া দেয়—আমরা সেই জালে জড়াইয়া মলিন ও নিজ্জীব হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া অত্যন্ত দীনভাবে জীবন কাটাইতে থাকি। যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, কখনো সত্যকে ছাড়িব না, মিথ্যাকে আশ্রয় করিব না এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে যথাসাধ্য চলিতে পারি—যতই দুঃখ পাই, যতই ক্ষতি ঘটে লোকে যতই নিন্দা করে বা পীড়া দেয় প্রাণপণে যদি সত্যকে রক্ষা করিয়া চলি, তবে সমস্ত জীবনমন সত্যের জ্যোতিতে তেজস্বী হইয়া উঠে—সত্যের বলে বলিষ্ঠ হইয়া পরম গৌরব লাভ করে। তোমার অন্তরে যে অন্তর্যামী আছেন তিনিই সমস্ত ভালমন্দ বিচার করেন—তাঁহার বিচারই শিরোধার্য্য করিতে হইবে—লোকের বিচারকে ভয় করিয়া চলিবে না।

উপনিষদে এই উপদেশ আছে সত্যান্ন প্রমাদিতব্যং, কুশলান্ন প্রমাদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমাদিতব্যং—সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি এই অনুশাসনটি স্বীকার করিয়া তোমার জীবন দিনে দিনে পবিত্র উন্নত উজ্জ্বল ও বলশালী হইয়া উঠুক্। ইতি
১২ই কার্ত্তিক ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

ধীমু, তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হলুম। এতদিনে নিশ্চয়ই তোমাদের শেষ পরীক্ষাও হয়ে গেছে এবং তাতেও তোমরা সফল হয়েছ, এই আশা করি।

জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং কি করলে হৃদয়ের শুষ্কতা দূর হয়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ। মোটামুটি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, কিন্তু উত্তর পেলেই যে সেটা কাজে লাগানো সহজ, এমন কথা বলতে পারি নে।

আমরা যে কোন কাজ এবং যে কোন অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন নিজেকে যেন সত্য করে উপলব্ধি করতে পারি এই লক্ষ্যই মনে স্থির রাখতে হবে। সত্য আমি খুব মস্ত জিনিষ—যে আমি টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তির মধ্যে বদ্ধ, সে আমি আজ আছে কাল নেই, সে আমি বাইরের জিনিষের দ্বারা ফেঁপে ওঠে এবং বাইরের জিনিষের অভাবে ছোট হয়ে যায়—কিন্তু আমার মধ্যে যে সত্য আছে, বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যোগ, অনন্ত আনন্দস্বরূপের সঙ্গে তার চিরদিনের অন্তরতম সম্বন্ধ—মৃত্যু তাকে বিনাশ করে না, ক্ষতি তাকে ক্ষুদ্র করে না, তার সম্পদ তার অন্তরের মধ্যে—নিজের সেই চিরসত্যের প্রতি যদি দৃঢ় আস্থা রাখি, তাহ'লে অন্তরে বাহিরে আর কোন ভয় থাকে না। তোমরা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা করে বহির্বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের সমস্ত বাধা যেমন কাটিয়ে উঠে শক্তি লাভ করচ, তেমনি জীবনকে সৎপথে চালনা করে প্রবৃত্তির কলুষ কাটিয়ে উঠে নিজের চরম সত্যকে ক্রমশই বাধামুক্তভাবে উপলব্ধি করে ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে সর্ব্বদা অভয়ে আনন্দে এবং অপরিমেয় কল্যাণের মধ্যে বিরাজ করবে এই হচ্ছে লক্ষ্য! এই লক্ষ্য সাধন করতে হলে অত্যন্ত সাবধানে জীবনকে নির্ম্মল রেখে প্রত্যহ মনকে তাঁর মধ্যে নিবিষ্ট করতে হবে যিনি অন্তর বাহিরকে পূর্ণ করে রয়েছেন, যিনি বিশ্বচরাচরকে সত্য করে বিরাজ করচেন, যিনি পরিপূর্ণ সত্য, পরিপূর্ণ জ্ঞান, যিনি অমৃতময় আনন্দময় অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম।

কিন্তু এ সব কথা যদি কেবল মুখের কথামাত্র হয়, তবে তেমন দুর্গতি মানুষের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। জীবনের ভিতর দিয়ে তাঁকে নিজের আত্মার মধ্যে পেতে হবে কথার ভিতর দিয়ে নয়। অতএব তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্চে, নিজের জীবনকে প্রশস্ত করে স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্বের সেবার দ্বারা নিজের শক্তিকে সার্থক করে প্রতিদিন অনন্ত পথের পাথেয় সঞ্চয় করে চলা। বড় বড় কথা শোনবার এবং বড় বড় কথা আবৃত্তি করবার লোভ যদি পেয়ে বসে, তাহলে পথ হারাবে। জানতে চাও বলতে চেও না, পেতে চাও লোকের কাছে ফলাতে চেয়ো না। মিতাচারী মিতভাষী হয়ে নম্র হয়ে শ্রদ্ধাবান হয়ে অন্তর্যামীর প্রতি নির্ভর স্থির রেখে গোপনে আপনার সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকো। অনেক বাধাবিঘ্ন শোক দুঃখের ভিতর দিয়ে চল্‌তে হবে—অনেক উঠবে এবং পড়বে, সন্দেহ মনকে আবৃত করবে এবং অবসাদে জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলবে—সেই সমস্ত কাটিয়ে উঠে যখন অবিচলিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখন ধন্য হবে। মনে কোরো না এ জিনিষ বক্তৃতা শুনে পাওয়া যায়, কিম্বা এ সমস্ত তোমাদের কাগজে প্রবন্ধ লেখবার বিষয়—অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপ্রগলভ বিনয়ের সঙ্গে সমস্ত জীবন দিয়ে৷ তবে এই অচল প্রতিষ্ঠা মানুষ লাভ করে—এ সব জিনিষ লঘুভাবে কথায়বার্ত্তায় ব্যবহার করবার নয়। মানুষের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাকে আনন্দের মধ্যে কতক পরিমাণে উপলব্ধি করবার পূর্ব্বেই যদি সে সম্বন্ধে চাপল্য ও প্রগল্ভতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করি, তাহলে তাতে আমাদের শক্তিকে নষ্ট করে দেয়—রন্ধনের আয়োজন নেই অথচ চুলা ধরাতে বসলে তাতে ফল হয় এই যে, যখন রন্ধনের সময় উপস্থিত হবে, তখন দেখবে আগুন নেই, কেবল রাশীকৃত ছাই জমে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা (নদীয়া),

কল্যাণীয়েষু,

"পিতানোঽসি" অথবা "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" অথবা ঈশ্বরের কোনো একটি নাম মনের মধ্যে সর্ব্বদাই ধরিয়া রাখা চাই। যখনি মন বিক্ষিপ্ত হইতে চাহিবে, তখনি মনে মনে বারম্বার সেই নাম, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মনকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। অবশেষে এমন হইবে, সেই মন্ত্র মনে জপ করিলেই ভয় চলিয়া যাইবে, দুঃখ থাকিবে না, কুচিন্তা লোপ পাইবে। পিতানোঽসি মন্ত্র যখন তখন মনে মনে আবৃত্তি করিবার অভ্যাস করিবে। আবৃত্তি করিবার সময় যাহাতে তাহার অর্থটিও মনে আসে, তাহা করিবে—নতুবা বিশেষ ফল হইবে না।

উপেন, সুজিত ও অরবিন্দ B.Sc পাস করিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দীর্ঘকালের জন্য আমি দূরদেশে যাইবার সংকল্প করিয়াছি। এতদিন আমি কাছে কাছে থাকিয়া তোমাদের তরুণ জীবনের প্রতি দৃষ্টি মেলিয়া ছিলাম—আমার হৃদয়ের মঙ্গল কামনা তোমাদের দিকে প্রসারিত করিয়া বসিয়াছিলাম। আজ দূরে যাইবার সময় আমি একান্ত মনে তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি—যে, তোমরা আপনার সাধনায় আপনারা বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইয়া উঠ—আপনার অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে নিকটতম করিয়া তাঁহাকে পাও যিনি তোমাদের অন্তর্য্যামী—সেই উপলব্ধির দ্বারা তোমরা কেবলি বড় হইয়া উঠিতে থাক—আপনার স্বার্থের উপরে বড় হও, সুখদুঃখের উপরে বড় হও, প্রবল প্রবৃত্তির উপরে বড় হও, চারিদিকের সংকীর্ণ সংস্কারের উপরে বড় হও—সত্যের মধ্যে বড় হও, মঙ্গলের মধ্যে বড় হও, অম্লান আনন্দের মধ্যে বড় হও। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বড়। যে পরিমাণে বড় হইবে সেই পরিমাণেই তাঁহাকে পাইতে থাকিবে—যে পরিমাণে তাঁহাকে পাইবে সেই পরিমাণেই তোমাদের জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া উঠিবে। এই তোমাদের মন্ত্র হউক, "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ"—যিনি সকলের বড় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন সেই সকলের বড়কে পরিত্যাগ না করি। ইতি ২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮

তোমাদের চিরশুভানুধ্যায়ী,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[য়ুরোপযাত্রার পূর্বে উপদেশ প্রার্থনার উত্তরে লিখিত। এখানি ঠিক চিঠি নহে।]

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের সাধনা সম্বন্ধে দূরে হইতে ভাল করিয়া তোমাদিগকে চালনা করা অসম্ভব। এক একদিন এক এক প্রকার বাধা আসিয়া পড়ে সে সম্বন্ধে চিঠিতে ভাল করিয়া আলোচনা করা যায় না। এই জন্যই তোমাদের যে কয়জন সাধনা গ্রহণ করিয়াছ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটি গভীর সম্বন্ধ হয় এই আমি ইচ্ছা করি। তোমাদের যে দুইজন অধ্যাপকও তোমাদের সহিত যোগ দিয়াছেন তাঁহারা নিষ্ঠাবান ভক্ত লোক—যদি সরলভাবে তাঁহাদের নিকটে যাইতে পার তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাছ হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পাইতে পারিবে। তাঁহাদের সহিত তোমাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে একথা নিশ্চয় জানিয়া তোমাদের সমস্ত বাধা ও সংশয় তাঁহাদের নিকটে অকপটে উপস্থিত করিবে। এখন দীর্ঘকাল তোমাদের আশ্রমজীবনের প্রতিদিনের সঙ্গে আমার যোগ থাকিবে না—আমি ছুটি লইতেছি—এখন আমি তোমাদের সকল খুঁটিনাটিতে মন দিবার সময়ও পাইব না। ভারতবর্ষে আর অল্প কয়দিন আছি—এ কয়দিন ব্যস্ত থাকিতে হইবে—তাহার পরে য়ুরোপে বাসকালে আমার সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা তোমাদিগকে জানাইবার চেষ্টা করিব—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে চিঠিপত্রে আলাপ করিবার অবকাশ পাইব না।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি তোমার মনে কখনো কোনো সংশয় উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের ঘরেই অজিত থাকেন তাঁহার সঙ্গে আলাপ কর না কেন? এ সম্বন্ধে অনেক জানিবার ও তর্ক করিবার আছে—আলাপ করিতে করিতে ক্রমশ সমস্ত তোমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অজিতের কাছে তোমাদের প্রশ্ন লইয়া গেলে তিনি নিশ্চয়ই খুসি হইয়া তাহার উত্তর দিবেন।

ঈশ্বর তোমাদের সকলের চিত্তকে সত্যে বিকশিত করিয়া তুলুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রামগড়, কুমায়ুন

নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করা কঠিন তাহা জানি সেইজন্যই জয়ী হইলে এত আনন্দ এবং এত গৌরব। আসল কথা যদি নিজেকে সংকীর্ণ করিয়া দেখ তাহা হইলেই নিজের সমস্ত রিপুগুলি বড় হইয়া উঠে। কিন্তু যদি মনে রাখ তোমার জীবন মহৎ এবং সেই জীবন বিশ্বহিতে উৎসর্গ করা, যদি মনে রাখ জগতে যাঁহারা কল্যাণ বিতরণ করিয়াছেন তাঁহারা নিজের শরীরের, নিজের ভোগসুখের কথা ভাবেন নাই—তাঁহারা সমস্ত ক্ষুদ্র সুখ হইতে আপনাকে অকাতরে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহা হইলে রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম সহজ হইবে। তোমার লক্ষ্যকে যেমনি বড় করিবে অমনি তোমার শক্তি বাড়িয়া যাইবে। তোমার চারিদিকে যাহারা আছে তাহাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই—তাহারা সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া লজ্জাও পায় না, দুঃখও পায় না—পৃথিবীতে তাহারা পশুলীলা যাপন করিতে চায়—এইজন্য তাহাদের সংসর্গ মানুষকে নীচের দিকে টানে। তুমি তোমার অন্তরের মধ্যে মহাপুরুষদের সঙ্গ করিবে—তাহা হইলেই নিজের আত্মার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তুমি জয়ী হও, তুমি মহৎ হও, তুমি অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়া আলোক বিতরণ করিতে থাক এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোর চিঠিতে দামোদরের বিদ্যালয়ের [১] সংবাদ পড়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েচি। এই রকম বিদ্যালয় যত হয় ততই ভালো। কোনো এক সময়ে সেখানে গিয়ে আমার দেখে আসবার ইচ্ছা রইল। বহুদিন পূর্ব্বে ঐখানে বিদ্যালয় খোলবার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব এসেছিল। পাছে আমার স্বাধীনতা নষ্ট হয়, এই ভয়ে আমি রাজি হইনি। যাই হোক, এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে, যোগ রাখবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই—কারণ সকল প্রণালীরই পরীক্ষা হওয়া ভালো। কিন্তু মূলে ঐক্য নিশ্চয়ই থাকবে। যোগানন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'লে খুব খুসী হ'ব। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার-~~তকন~~ যে ব্যাঘাত হ'ল, তা ত বুঝতে পারচি নে। আমি ত কখনই কাউকে আমার কাছে আসতে বাধা দিই নে। ইতি, ৭ই ভাদ্র, ১৩২৪।

শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতন

আর তোর টাকা সংগ্রহ চেষ্টায় [২] লাঞ্ছনা সংগ্রহ করে বেড়াতে হবে না। তুই চলে আয়। টাকা যখন আসবে তখন আপনি আসবে—না আসে ত ভাবনা নেই। যা সত্য তাকেই মানতে হবে। যা মিথ্যা তাকে জোর করে ঢাকবার দরকার নেই। টাকার দ্বারা মিথ্যাকে সত্য করা যায় না। যাদের সত্যই শ্রদ্ধা আছে তারা টাকা না দিলেও সে বহুমূল্য। যাদের নেই তাদের হাতের টাকা স্পর্শ করা পাপ।

অঙ্ক শিক্ষকটিকে এখানে পাঠিয়ে দিস—জ্যোতিষ তার কথা জানে। কত বেতন তাঁর চাই তাও জেনে নিস—কতদূর পর্য্যন্ত তিনি শেখাতে পারবেন তাও খবর নিস্। পূর্ব্বে আশ্বাস পেয়েছিলুম

১ বর্ত্তমান রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রথমে দামোদরে স্থাপিত হইয়াছিল।
২ শান্তিনিকেতনে প্রাক্তন ছাত্রদের নিজস্ব গৃহপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা উপলক্ষে

যে একজন খুব বড় আঙ্কিককে পাওয়া যাবে তাই কালিদাসকে ত্যাগ করেছিলুম। উচিত এমন লোককে রাখা, যিনি দরকার হলে উপর পর্য্যন্ত অনায়াসে এবং ভাল করে শেখাতে পারেন—জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েচে। বিশু তার চিঠিতে মণি বলে একজনের কথা অল্পদিন হল লিখেছিল তারও বিদ্যা বেশী নয়। এক একবার মনে হচ্চে আবার একবার অনিলকে দিল্লী থেকে আনিয়ে নেব। সে অঙ্ক বেশ ভালই পারে। আর আশ্রমের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান। ইতি ২১ কার্ত্তিক ১৩২৫।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতীনের সেই লেখা ভারতীতে ছাপানো হবে চিঠি পেয়েচি।

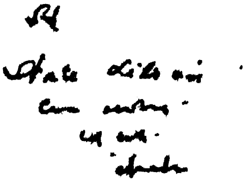
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোর লেখা পেয়েচি—সময়মত দেখে শুনে দেব। আশ্রম এখন নিস্তব্ধ। আমি সেইরকম চুপচাপ পড়ে আছি। মাঝে মাঝে বৃষ্টিবাদল হয়, আর যা-কিছু কলরব সে কেবল শালিখ এবং চড়ুয়ের দলের। তোর দাদাকে জিজ্ঞা করিস দক্ষিণের দিকে যে মাঠকোটা তৈরী হচ্চে সেটা কি তিনি খরচ দিয়ে কিনে নিয়ে তৈরী শেষ করতে চান? ১৮ মে ১৯১৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ওঁ 

কল্যাণীয়েষু

ধীমু, তোমার চিঠিতে সব খবর পেয়ে খুসি হলুম। প্যারিস থেকে আর দুই একদিন পরেই হল্যাণ্ডে যাচ্চি। সেখানে অনেকগুলি নিমন্ত্রণ আছে। তার জন্যে একটা বক্তৃতা লিখ্‌তে হচ্চে। Lyden Universityতে বল্‌তে হবে। আর মাসখানেক পরেই আমেরিকায় পাড়ি দেব। আশা করচি আমার এবারকার পশ্চিম ভ্রমণ নানা প্রকারে সফল হবে। আমাদের আশ্রমে এখন অনেক নতুন ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন—ফিরে গিয়ে অনেক পরিবর্ত্তন দেখতে পাব। কিন্তু বিশ্বভারতীর ক্লাসে তোমাদের যে শিক্ষা চলছিল তাতে যেন শৈথিল্য না ঘটে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আশ্রমের যোগ ঘট্‌বে—যাতে তোমরা সবাইকে অভ্যর্থনা করে নিতে পার সেজন্যে তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে। জ্ঞানের পথে তোমরা সকলেই পথিক, তোমরা সকলেই সাধক, এই কথাটি আমাদের অতিথিরা যেন সকলেই অনুভব করে। আমাদের বাঙালীদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব আছে, সেই জন্যেই আমরা অল্প শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি—জ্ঞানলাভ সম্বন্ধেও একথা অত্যন্ত সত্য। ইংরেজী পড়তে শুন্‌তে শেখা কোনো শেখাই নয়। যে-কোনো একটা বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করে তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। এইজন্যেই আমি তোমাদের প্রত্যেককেই সংস্কৃত ভাষায় বা পালিতে পারদর্শিতা লাভ করতে বলি। বিভূতি তোমাদের কাজে যোগ দিয়েচে, তাকেও বোলো যেন বিশ্বভারতীর ক্লাসে সে নিযুক্ত হয়। আমাদের আশ্রমে জ্ঞানের তপস্যা পূর্ণ তেজে জাগ্রত হয়ে উঠেচে আমি ফিরে গিয়ে যেন এইটে দেখ্‌তে পাই। আশ্রমে একটা বড় হাওয়া আস্‌চে, কিন্তু তোমাদের নৌকোর পাল তৈরি থাকে যেন,

অনুকূল অবসর যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। বিশ্বভারতীতে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের চিত্তের যে যোগসাধন করতে হবে তোমরা তার সাধক একথা এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলো না। আপনাকে দান করতে হবে কিন্তু আপনাকে পূর্ণ না করলে দান করা যায় না। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

[১৯২০]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

এতদিন পর্য্যন্ত একলা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বিদ্যালয়কে বহন করে এসেছি। এখন এমন একটা সঙ্কটে পড়েছি যে এই ভার একলা বহন করা কঠিন হয়েচে। তাই ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে সাহায্য দাবী করতে যেতে হবে। কিন্তু বাংলা দেশের কাছে দাবী করতে সাহসই হয় না—করলেও কোনো ফল হবে বলে আশাই করিনে। সেইজন্যেই মনের খেদে বোধ হয় আমার কথাগুলি কিছু অত্যুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হলে এই রকমই ঘটে থাকে। আমার পূর্ব্বতন ছাত্রদের সম্বন্ধে মনে কিছু যদি-বা খট্‌কা থাকে তোর সম্বন্ধে নেই—এবং সকলের সম্বন্ধেই যে আছে তাও নয়। আমার ত মনে আশা আছে আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব তোদেরই বহন করতে হবে। এইজন্যই আশা করচি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটলে আমার বিদ্যালয় একদিন আমাদের ছাত্রদের যোগে সমস্ত ভারতবর্ষের চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যান্য প্রদেশের লোকের...নিষ্ঠার দৃঢ়তা আমাদের চেয়ে বেশি সেই নিষ্ঠার ভিত্তি যেদিন পাকা হয়ে উঠ্‌বে—আমাদের ছাত্রদের ভক্তি ও আত্মোৎসর্গের উপর যেদিন আশ্রম সম্পূর্ণ ভর দিতে পারবে সেদিন আমার কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং বিদায় নেবার বেলায় নিশ্চিন্ত হতে পারব। ইতি শনিবার। [১৩২৯?]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Srabasti
Colombo

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শশধরকে অনিলের পরিবর্ত্তে অধ্যাপনায় নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আমার সম্মতি আছে। এণ্ড্রুজেরও তাতে আপত্তি নেই।

ঘুরতে ঘুরতে সিংহল দ্বীপে এসে পৌঁচেছি। আবার ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে ফিরব। ছুটির সময় আমাদের আশ্রম থেকে এক ভিক্ষুসম্প্রদায় যদি ভিক্ষায় বেরতে পারত তাহলে ভাল হত। কেবল, অর্থসংগ্রহ হতে পারত, বলে' নয়, আশ্রমের সকলেই আশ্রমের জন্য সাধনায় নিযুক্ত, ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত এই ইচ্ছাটি পরিস্ফুট হ'ত। ইতি ১২ অক্টোবর, ১৯২২

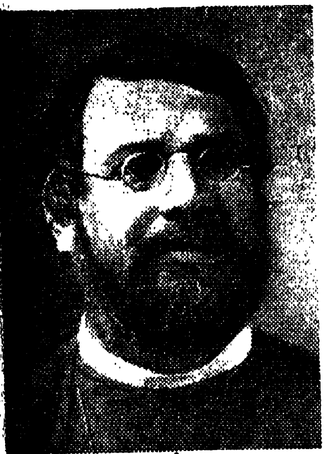
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধীমু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
উপেন—উপেন্দ্রনাথ দাস, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র
সুজিত—সুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র
অরবিন্দ—শ্রীঅরবিন্দ বসু, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র
অজিত—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
জ্যোতিষ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র
বিশু—শ্রীবিশ্বনাথ বসু, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র
যতীন, "তোমার দাদা"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক
অনিল—অনিলকুমার মিত্র, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক
কালিদাস—কালিদাস বসু, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন অধ্যাপক
বিভূতি—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র ও অধ্যাপক

রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকা

মোহিতচন্দ্র সেন এম, এ

[illegible] লক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বর্ণনা করা [illegible]লেও এরূপ কবিতা চিনিয়া লওয়া যে খুব [illegible] না। যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা [illegible] অকৃত্রিম ছন্দসৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে [illegible]



মোহিতচন্দ্র সেন

[illegible]তের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় [illegible] প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, [illegible] যিনি কথার সাহায্যে একটি [illegible] করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি [illegible]কণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের [illegible] অপূর্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে [illegible] একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও [illegible] পারেন তিনি কবি. কিন্তু উচ্চতর কবি [illegible] সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি [illegible] ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ [illegible] কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার [illegible] স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র [illegible]তে পারেন, আমি আগন্তুক মাত্র, আমার [illegible]তে অধিক সমাকীর্ণ, আমার অপেক্ষা [illegible] অধিকতর উদ্ভাসিত।

[illegible]বাবুর কৃতিত্ব। ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্যে [illegible] রচনা করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশ তাঁহার [illegible] এই সকল কবিতা তাঁহার পাঠকদিগের [illegible] প্রাতে, চৈত্র রজনীতে অথবা 'ঘনঘোর [illegible]সনে, ইহাদের লইয়া অনেকেই আনন্দ [illegible] 'কখনও সুখে কখনও দুঃখে' কখনও [illegible]নায়, সংকল্পে, ব্যথায়, উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের [illegible] আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে। তবু শঙ্কা [illegible] নিকট গানের দ্বারা যত পরিচিত, কবিতার দ্বারা তত নন্। এ আশঙ্কা সত্যমূলক হইলে বাস্তবিক দুঃখের কারণ। যাঁহার কবিতা এই দেশের ও সময়ের উপযোগী একটি সুমহান সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সর্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ দিব্য কল্পনা যাঁহার কবিতাকে বরণ করিয়াছে, যিনি আমাদের আধুনিক জটিল, কর্মক্লিষ্ট জীবন সমস্যার উপর নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের দেশ শুধু নিজের হতভাগ্যতারই পরিচয় দিয়াছে।

কবিতার শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। সকলেই জানেন কবিতা শ্রেণীভুক্ত করা কত কঠিন। সুন্দর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মনে হয় যে ভাব-বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তাহা সান্ধ্য গগনে বিকসিত বর্ণবৈচিত্র্যের ন্যায়; কোন্ ভাব বা কোন্ বর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ভাবের ছন্দোময় প্রকাশ অর্থাৎ কবিতা সম্বন্ধে একথা বলা চলে। বিশেষত রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে একথা বড় খাটে। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, তাঁহার ভিতর বানানো কিছুই নাই, কোন একটি ভাবকে খাড়া করিয়া তাহার চতুর্দিকে রঙ ফলানো নাই, কোন একটি মর‍্যাল বা নৈতিকবিধি শিক্ষা দিবার সজ্ঞান চেষ্টাও নাই। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা দেবনিশ্বসিতের ন্যায় অহেতুকী, "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" উঠিয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। সোনার তরীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে? হৃদয়-যমুনায় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। এসব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি, অথচ এই দুইটি কবিতাতে হৃদয়ের যে ভাবটি প্রকাশিত তাহা কত পরিষ্কার, যে বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা কত সুস্পষ্ট! কবি যে ভাবময়ী মূর্তিটি সৃজন করিয়াছেন আমরা বিস্মিত ব্যথিত হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি এবং তাহার ভাষার সহিত আমাদের হৃদয়ের ভাষা মিশিয়া যায়। কিন্তু তাহার কি নাম দিব? কোন্ শ্রেণীতে তাহাকে রাখিব? সহজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি না।

এইরূপ কতিপয় কবিতাকে একত্র করিয়া 'সোনার তরী' নাম দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির সাধারণ লক্ষণ দুই চারিটি কথায় বলিতে চেষ্টা করিব। রবীন্দ্রবাবুর পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁহার প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ কত গভীর, তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে কিরূপ মুগ্ধ। এ সম্বন্ধে তিনি একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে* লিখিয়াছেন—"আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে'—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণ-লতা তরু গুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত

* ২৩শে আগস্ট, ১৮৯১

ছায়ালোকের আবর্তন,—এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবাহমান স্রোত পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী পর্যায়, এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত চলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো ; এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে যেখানে ঝঙ্কার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অনুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্য এবং নিগূঢ় একটি আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান না থাকত, তাহলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটি আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়-পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটি যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটি অনিবার্য ভালবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, সেইজন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি, নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগত সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না, আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি; আমার আর কোন যুক্তি নাই।"

প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগ কত গভীর এবং তাহার আত্মীয়তাসুখে তিনি কত সুখী, তাঁহার কাব্য হইতে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করিয়াছেন। আমরা 'বিশ্ব' খণ্ডের কবিতাগুলিতে কোনও কোনও সুন্দর বস্তু বর্ণনায় এই সার্থকতা দেখিতে পাই। কিন্তু অনির্বচনীয়কে কে বর্ণনা করিবে? এই আলো-আঁধারের স্পন্দনের সহিত কত ভাব কত সঙ্কেতই হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, তাহাদিগকে কে ধরিয়া রাখিবে? তাহাদিগের ধর্ম কিসে পরিস্ফুট হইবে? আমাদের হাতে শুধু একটিমাত্র জাল আছে, যাহাতে প্রকৃতির এই অনির্বচনীয় ক্ষিপ্রগতি ক্ষণিক ভাবগুলিকে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা সংগীত। বাস্তবিক ভাষাহীন সংগীতের সুরের ভিতরে কি একটি বেদনা, আনন্দ, আকুলতা বা শান্তি নিহিত থাকে, যাহার কাছে বিশ্বের চঞ্চল শোভা ও সৌন্দর্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া যায় এবং সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই নির্বাক সংগীতকে ভাষায় যিনি ব্যক্ত করিতে পারেন, তাঁহাকেই প্রকৃত কবি বলিয়া স্বীকার করি এবং সোণার তরী প্রভৃতি কবিতার যদি কোন অর্থ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা এই যে, ঘন বর্ষা, ভরা নদী, সঞ্চিত ধান, দ্রুতবহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে, তাহার সহিত মানব হৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব রাগিণী সৃজন করিয়াছে, যে রাগিণীকে একটি চিত্রে অথবা অবস্থাবিন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে। 'সোণার তরী' শীর্ষক কবিতাগুলির ইহাই

"লীলা" খণ্ডের কবিতাগুলির ভিতর পাঠক একটি বিশেষ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রেমের যে সুখ বা দুঃখ, তাহার এমন একটি গাম্ভীর্য আছে যে, তাহা লইয়া লীলা কৌতুক চলে না। কিন্তু লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়া মাত্র। কল্পনা করিতে পারি যে, এই অবাস্তব ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কারভাজন না হইয়া কৌতুকভাজন হইয়াছে এবং তাহার কৌতুকমিশ্রিত কটাক্ষ দ্বারা লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুকহাস্যেই লীলার কবিতাগুলি দীপ্তিমান। তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই,
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে, অলীককে, সংগতকে নহে, অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর একটি জিনিস আছে, তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না—বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলা মাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না—একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"

আর একটি শ্রেণী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেটির নাম 'জীবন দেবতা', এই জীবন দেবতা কে? কাহাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন ঃ—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল পিয়াষ
আসি অন্তরে মম!

কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন— 'মিলায়ে আপন সুরে?' ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবন দেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন, কিন্তু ইঁহাকে বিশ্বদেব বলিলে

কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, ফুলফলভারে অবনত কোনও তরু নিজের অন্তর্যামী প্রাণকে সম্বোধন করিয়া কবির ন্যায় প্রশ্ন করিতে পারে—"আমাতে কি এখন তুমি সার্থক হইয়াছ?" এই প্রাণ অনন্ত প্রাণ নহে, ইহা শুধু এই বৃক্ষটিতেই আবদ্ধ। কিন্তু প্রথম হইতে ইহাই বৃক্ষকে অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমশ পত্রপুষ্প পর্যায়ের ভিতর দিয়া তাহাকে নৈপুণ্যসহকারে গঠিত করিয়া সার্থকতা দিয়াছে। মানবজীবনও এইরূপ দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করা যায়। রবীন্দ্রবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া একটি বৃদ্ধি অনুভব করিতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চীর জীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখদুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।" ১

এই যে দুইটি জীবন, ইহার ভিতর কবি প্রণয়-কল্পনা করিয়াছেন। একজন সুনিপুণা গৃহিণীর ন্যায় অন্তঃপুর-বাসিণী, আর একজন তাঁহার যত কিছু দৈনিক সুখ দুঃখ, সত্য মিথ্যা, ধারণা চিন্তা ও ভাব জড় করিয়া আনিতেছেন, অন্তর্যামী প্রকৃতি তাহারি ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট এবং অনির্বচনীয় আনন্দের উপাদান সকল গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যদিও ইনি গৃহিণী, তবু ইহার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় এখনও হয় নাই। তিনি কতকটা মূঢ়ভাবে ইঁহার অধীন। তাই যখন ইঁহার রাগিণী তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হয়, তিনি অবাক্ হইয়া শুনিতে থাকেন। ২

সে পরিচয় যে আছে, তাহা কি করিয়া বলা যায়। ইনি কত সুন্দর, তাহা কি কবি জানেন? ইঁহার বাণীর গভীর অর্থ তিনি কি পরিমাণ করিয়াছেন? ইঁহার আনন্দের উচ্চশিখরে তিনি কি আরোহণ করিয়াছেন? কত যুগ-যুগান্তর, লোক-লোকান্তর হইতে ইনি কত বর্ণ ও শব্দ, ভাব ও ভাষা, সংগীত ও সৌন্দর্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, এবং কত বস্তুর সহিত কি প্রগাঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, কবি তাহা ত বলিতে পারেন না। ৩

তিনি শুধু জানেন যে, সময়ে সময়ে আশাতীত সৌভাগ্যের ন্যায় তাঁহার চিত্তে তাঁহার জীবনদেবতার সৌন্দর্য প্লাবিত হয় এবং তিনিই বিচিত্ররূপিণী হইয়া তাঁহাকে 'সুখের ব্যথায়' উদ্‌ভ্রান্ত করেন। তাঁহাকে তিনি "শত জনমের চিরসফলতা' বলিয়াছেন এবং তাঁহারই সহিত অচ্ছেদ্য মিলন কামনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেটি তাঁহার সমুদয় কবিতার অন্তরের কথা এবং সেটি ভারতবর্ষেরও কথা। ভারতাবর্ষের সাধনা কি? শান্তং শিবমদ্বৈতং। ভারতবর্ষই বলিয়াছেন,—যোবৈভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রবাবু যে বিষয়েরই অবতারণা করেন, তাঁহার প্রয়োগ-কৌশলে তাহা আপনার সামান্যতা পরিহার করিয়া সেই ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা সামান্য কথা নহে। কারণ দেখিতে পাই আনন্দকে আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখকে উচ্চতর সুখের বিদ্রোহী করিয়া চিত্রিত করা, প্রতিযোগিতা বিষে কলুষিত করিয়া আনন্দকে কেবলমাত্র একটি জাতি বা দেশের উপভোগ্য করা, সৌন্দর্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সৌখীন ক্ষুদ্রতা সৃজন করা, ইত্যাদি আজকালকার অবনতশীল (বিশেষত ইউরোপীয়) আর্টের একটা খেয়াল দাঁড়াইয়া গেছে। আমাদের কবি তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের শিক্ষা আমরা শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, মঙ্গল এবং যে আনন্দ চিরন্তন, গভীর ও সর্বজনীন, তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না। এমন কেহই নাই, যিনি তাঁহার কবিতায় মর্ম বুঝিতে পারিয়া আর্দ্রচিত্ত, শন্ত, শ্রদ্ধান্বিত ও আনন্দিত হন নাই।

এই যে অদ্বৈতানন্দ স্পৃহা তাঁহার কবিতাতে দেখিতে পাই, ইহা তাঁহাকে বারম্বার এক আদর্শলোকে উন্নত করিয়াছে এবং তথাকার সংবাদ দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "প্রতিধ্বনি" ও "উর্বশী" দুইটি কবিতার উল্লেখ করি। প্রথমটিতে দেখিতে পাই সমুদয় সুন্দর বস্তু অনন্ত আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব বলিয়া সুন্দর হইয়াছে। দ্বিতীয়টি নারী প্রকৃতিকে তাহার সমুদয় মানবীয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপটি দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

['কাব্য-গ্রন্থ' প্রথম ভাগের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত]

১। অপ্রকাশিত চিঠি ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

২। আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সে রকম একটা পুলক সঞ্চার হয় না। আসল তার কারণ যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করছে, সেই-আমিই যে কবিতা লিখে থাকি, এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি যে সমস্ত ভাল কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছা করলেই লিখতে পারিনে—তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কি না সন্দেহ।—অপ্রকাশিত চিঠি, ২৯শে সেপ্টেম্বর,, ১৮৯৫।

৩। এই যে যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে বহমান অনুভূতি ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে, সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, যদি স্থান ও কালের ধারণা আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিত, তা' হ'লে আমরা কি তাহাদের বিশালত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম। জানি না কোন্ ভূমা প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া এই ক্ষুদ্র পুষ্পের চারিদিকে অসীম স্থান দেখিতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, অনাদি অতীত তাহার সমস্ত শুশ্রূষা দ্বারা পুষ্পটিকে বিকশিত করিয়াছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহাকে কোনও না কোনও আকারে রক্ষা করিবে। সৌন্দর্য অনুভবও এইরূপেই হয়। শুক্ তারার জ্যোতি আমাদের মনে ক্ষণিক সুখসঞ্চার করে বলিয়া তাহাকে সুন্দর বলি না, কিন্তু যুগযুগান্তরব্যাপী চিরন্তন মানবহৃদয়কে উহা সংক্ষুব্ধ, আকুলিত বা আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর, আমরা যখন উহার সৌন্দর্য অনুভব করি, বিশাল গভীর মানবহৃদয় আমাদের সহিত সায় দেয় এবং তাহার স্পন্দনগুলি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

ক্ষণিকা

সতীশচন্দ্র রায়

আজ অনেকদিন হইল রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'ক্ষণিকা' আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন বোধ হয় এই কাব্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বেশ জোর করিয়া স্থির করিয়া বলিতে পারিব।

প্রথম উদয়ের চক্ষু ঝাপসানো এখন আর নাই, তাই আশা করি এতদিনে দ্বিধা না করিয়া 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে মন্তব্য বলিতে পারি।



সতীশচন্দ্র রায়

ক্ষণিকার কথা প্রসঙ্গে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি একদিন আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মুখে একটু মৃদু হাস্যের নুড়ি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হাঁ সুন্দর বটে, কিন্তু সমস্ত কবিতাকে কবি গভীর অর্থযুক্ত করিতে পারেন নাই।" অনেকেরই হয়ত এইরূপ মত। আমাদেরও এ বিশ্বাস নয় যে, ক্ষণিকার যে কোন একটি কবিতা তুলিয়া লইয়া পড়িলেই যথেষ্ট গভীর কবিত্ব আস্বাদন করা যায়। যে কোন একটি তুলিলে ত হইবে না-ই—যে-কোন-একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতাও পৃথক করিয়া লইয়া পড়িলে, তাহার সমস্তটা সৌন্দর্য জানা যাইবে কিনা সন্দেহ। কদম্ব ফুলের কেশরগুলি যেমন একটা শরীরে বাণবিদ্ধ থাকাতে, সৌন্দর্য সৌগন্ধপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ, কদম্ব ফুল—একটিমাত্র কেশরে অসম্পূর্ণ, ক্ষণিকাও তেমনি সবগুলি কবিতা লইয়া একটি ভাবসুরভি কবিত্বমণ্ডল ;—একত্র দেখিলেই ইহার সৌন্দর্য, —প্রকৃতি যেমন চিরকালের সহচর, কখনও যায় না, ইহাও তেমনি যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা এই একত্ব সূত্রটির ঠাহর না পাইবেন, তাঁহারাই গভীর অর্থের অভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাঁহারাও অবশ্য—যদি বাহ্যজগতের কোনো সৌন্দর্য-প্রেরণা ধরিবার শক্তি তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও ক্ষণিকার ভাষা পড়িয়াই কাঁপিয়া উঠিবেন। একি চমৎকার। এযে স্টাইল!—ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছন্দ বাঁধিয়া অক্লেশ উপমায়, অনায়াস সাজসজ্জা ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

আমরা যতদিন সংস্কৃত দিয়া শিখিব, ততদিন আমাদের স্টাইল হইবে না। আমরা লিখিবার সময়ে সংস্কৃতের স্থূল ঢাকনীতে আমাদের মনের গতিভঙ্গী আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই আমাদের স্টাইল এত অল্প।

কবিতা মনের কথা, বিশেষত লিরিক কবিতা। তাই তাহার ভাষা নিতান্ত সোজা হওয়া দরকার। 'ক্ষণিকা' লিরিকের চরম, উহার ভাষাও তাই একেবারে নিখুঁত সোজা। এই সোজার কত গুণ তাহা দেখা যাইবে।

যে সময়ে আর শিল্পীর কুঁদানো চক্ষে পড়ে না, গঠনটি ঠিক প্রকৃতির ছবির মত প্রাণ ছুঁইয়া দেয়, 'ক্ষণিকা' সেই সময়ের। ভাবে এবং ভাষায় অভেদ। ভাষা কানে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরর্থ তৌর্যত্রিকে এক মিনিটও দেরী করে না। ঠিক প্রাণে ভাব ও চিত্র নাচাইয়া দেয়—যতটুকু তৌর্যত্রিক ভাষাতে রহিয়াছে, ততটুকু ভাব-উদ্বোধনের জন্য আবশ্যক। ইহা হইতে ভাবও যেমন সম্যক্ উদ্বোধিত হয়, তেমনি প্রতি ভাবের সঙ্গে যে একটি মাত্র সুর আছে (যাহা কবিরাই আয়ত্ত করিতে পারেন) সেটিও ধরা পড়িয়া যায়।

> "সূর্য গেল অস্তপারে
> লাগল গ্রামের ঘাটে
> আমার জীর্ণ তরী
> শেষ-বসন্তের সন্ধ্যা হাওয়া
> শস্য শূন্য মাঠে
> উঠল হাহা করি—"

এই লাইন ক'টি পড়িবামাত্র বুক ছাঁৎ করিয়া উঠে। শব্দ বুঝিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করিতে হয় না, ঠিক সেই উদার মাঠের উদাস হাওয়াটা আসিয়া বুকের উপর হা হা করিয়া উঠিয়া, দূরে ঘুরিয়া চলিয়া যায়।

তারপরে সাজসজ্জা। প্রকৃতি রূপে এবং বর্ণে ভরা। তাহার সুরের সঙ্গে সঙ্গে রূপ অনন্ত। কবিরও যখন সম্পূর্ণতা লাভ হয় তখন তাহার সুরগুলি জমাইয়া রূপের বৈচিত্র্য এবং বর্ণের হিল্লোল চারিদিকে ঘিরিয়া আসে। প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগণ যে রূপ ও বর্ণ ফুটান, এখানে তাহার কথা হইতেছে না। এখানে রূপ ধরিয়া ভাব প্রকাশের কথা বলিতেছি। ইহাই কাব্যের অলঙ্কার।

যেমন ঃ—

> "জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
> রংটি থাকে লেগে
> প্রিয়জনের মনের কোণে
> শরৎ সন্ধ্যা মেঘে—"

এই পংক্তি ক'টিতে দূর স্মৃতির ভাবটি শরৎ-সন্ধ্যামেঘে একটি নিবিড় করুণ রূপ পাইয়াছে বলিতে পারি। এইরূপে অলঙ্কার কবিতার প্রতি পৃষ্ঠায়। এইরূপে অলঙ্কার যেমন ভাষাটিকে ঝুমকা ফুলের ন্যায় বিচিত্র রঙে সাজাইয়া দিয়াছে, সেইরূপে ভাষাটিও কিন্তু আপনাকে নিতান্ত সোজা করিয়া ফেলিয়া অলঙ্কারগুলিকে সহজেই জীবন্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছে। ছন্দ সম্বন্ধেও সেই কথা। ভাষা অত সহজ, এক একটি পদ অত অল্পাক্ষর বলিয়াই ছন্দগুলি এত বিচিত্র ভঙ্গীপূর্ণ। এমন সহজ ভাবানুসারিণী। অমরকোষ হইতে স্থূল স্থবির শব্দ বাছিয়া অত নানা ভঙ্গীর ছন্দ কে রচিতে পারিত, আমি জানি না।

ছন্দ চাই, সহজ ভাষা চাই, অলঙ্কার চাই—এ সমস্তই লিরিকের বাহ্যিক উপাদান। কিন্তু এই যে কামিনীফুলদলের মত অলঙ্কারগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, ইহার নিগূঢ় কারণ একটি

মুক্ত প্রাণের হাওয়া বই ত আর কিছুই নহে। ক্ষণিকার আদ্যোপান্ত সেই প্রাণটির সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব।

কাব্যটির নাম 'ক্ষণিকা'। কিন্তু নাম দিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। মুখবন্ধ স্বরূপে একটি কবিতায় আবার নামটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ—"

"ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যখন।"

এই ঝলমল প্রাণটিই যে ক্ষণিকার আগাগোড়া চলিয়া গিয়াছে—কিরূপে গুরুভার বর্জিত হইয়া প্রথমে যাত্রা করিয়াছে, কিরূপে ক্রমে মুক্তপ্রাণ নানা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া গিয়া মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে সুখে বিচরণ করিয়াছে এবং অবশেষে কি একটি গম্ভীর পরম পরিণতি পাইয়াছে, তাহারই অনুধাবণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

ক্ষণিকা লিরিক। তাই যত কিছু ছবি, সমস্তের মধ্যেই কবির প্রাণটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। কালিদাসের কালে লোধ্র-কুরবক, অশোক-দোহদ শৌরসেনী জল্পনা আপনা আপনি আমাদের কতকটা মোহিত করে বটে, কিন্তু কবির চিত্ত যে সহজেই সেই দূরকালের মধ্যে ঢুকিয়া সে কালের সমস্ত সৌন্দর্য মালার মত গাঁথিয়া তুলিতেছে, এই চলৎ কল্পনার লঘু গমনই আরও অধিক চিত্তহারী। ক্ষণিকার গ্রাম্য চিত্রগুলির যে স্বতন্ত্র আনন্দ, তাহা তো আছেই তাহা ছাড়া সেগুলি যে এক রকমে চিত্ত ভাবের বাস্তবায়িত ছায়া-বই আর কিছুই নহে—ইহাই আমাদের প্রধানত দেখিবার বিষয়। ক্ষণিকার সেই মূল ধারা অর্থাৎ এই কাব্যের আদ্যন্ত মধ্যে প্রবাহিত কবি জীবনটির একটি সন্ধি ও পরিণতি দেখা যায়। একটি প্রাণ ভোগক্ষুব্ধ যৌবন ছাড়াইয়া ব্যপ্ত শান্তির স্থির জলে নামিয়া আসিতেছে। ক্ষণিকার যে মোটামুটি দুটি ভাগ আছে, তাহার প্রথম ভাগে প্রাণ কেবল জল্পনা করিতেছে—'আর এ সব বড় কাজ, বড় কথা। সংসারের শূন্যে গাম্ভীর্য ভালো লাগে না,—সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠি—কাজ আর নহে, কেবল আনন্দ—দুর্দিন পড়িলে ঘরে খিল লাগাইয়া ছন্দ গাঁথা কিন্তু আনন্দ পাইলে অগ্নিমুখে পতঙ্গের মত তাহাতে গিয়া ছুটিয়া পড়া। সুখ ও দুঃখ—যত বুক ভাঙা বোঝা সব ঠেলিয়া ফেলিব; মোটামুটি প্রথম ভাগে মনের সঙ্গে একটা বোঝা পড়ার ভাব আর শেষ ভাগে প্রকৃতই সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠা—সেই অনলস আনন্দের জীবন যাপন। সাপের খোলসের মত যেন প্রথম ভাগে, শেষ ভাগের আনন্দ চঞ্চল চিত্তের নির্মোক দুলিতেছে। প্রথম ভাগে সংকল্প হইতেছে—'তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি' আর শেষ ভাগে 'চতুর রাঙা ঠোঁটে মধুর হাসি' দেখিয়া

'কথাই নাহি জোটে
কণ্ঠ নাহি ফোটে।'

প্রথম ভাগে সংকল্প হইতেছে—কথার ওজন রাখিব না, আর শেষ ভাগে

'প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে।'

প্রথম হইতে 'কবির বয়স' পর্যন্ত প্রথম ভাগ; বিদায় হইতে দ্বিতীয় ভাগ। কবি বিদায় লইতেছেন। অনেকক্ষণ জল্পনা করিয়া মনটাকে বুঝাইতেছেন। 'আঁধার আলোয় শাদা কালোয় দিনটা ভালই গেছে কাটি'—কবি বিশ্রামে যাইতেছেন। যুবা-দলের আমোদ প্রমোদে আজ তাঁহার যৌবনান্ত কালের বিমনস্কতা উপস্থিত। প্রাণটি আজ আর ভোগে বদ্ধ নাই, আজ তাহার কোন তীব্র লোভ নাই; কিন্তু সৌন্দর্যের কণামাত্র আভাসেই বিফল হইয়া উঠিতেছে—'পড়ল খসে খসে'। প্রাণ বিশ্বে ছড়াইয়া গিয়াছে—সে আজ উদাসীন। একদিন যৌবনের মত্ততায় অনুকূলে যাত্রা হইত, রশারশি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যাইতে হইত, কিন্তু এখন আর সে তীব্র আবেগ নাই; সে তীব্র যৌবন,—'জীবনের সেই পরম অধ্যায়' চম্পক বকুল চামেলী ভাবে নিজেকে মণ্ডিত করিয়া মুহুর্মুহু উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে আপনাকে মাধবীর গূঢ় সত্ত্বার সঙ্গে অনন্ত-আবর্তন-মুখে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছে—

"অমর বেদনা মোর হে বসন্ত রহি গেল তব
মর্ম্মর নিশ্বাসে
উত্তপ্ত যৌবন-মোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে।" (কল্পনা)

এবার আর যৌবনের সেই তীব্র বেদনা সহিবে না—

'এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়া তলে
ঘাটের পাশে কুটি।
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।'
'যাস রে খেয়া বেয়ে
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলেমেয়ে।'

কবি আসিয়া যেন নিতান্ত সরল সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রামের প্রান্তে ঘর পাতিয়াছেন।

"আজ শান্ত তীরে তীরে
তোমায় বাইব ধীরে ধীরে।"

খঞ্জনা নদীর তীরে—অঞ্জনা গ্রামখানি। সে গ্রামে শরৎ ও বর্ষা ঋতুতে কবির বাস। কবি সেখানে অকাজে—যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, লক্ষ্য কিছু নাই বলিয়াই প্রতি মুহূর্তে তাহার সৌন্দর্য সম্পদ কবির প্রাণে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে—

দীঘির জলে ঝলক ঝলে
মাণিক্ হীরা
সর্ষে ক্ষেতে উঠ্ছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে
আমি শুধু হেথায় এলাম
অকারণে।

কখনও মাঠে, কখনও ঘাটে—রাস্তা যেখানে গিয়াছে, কবি সেখানেই যাইতেছেন। কখনো কখনো মনটিকে একটু ঘুরাইয়া সেই দূর বৃন্দাবনের দিকে ফেলিয়া, হৃদয়ের জালে সেকালের সখাদের সমস্ত মধুর লীলা তুলিয়া আনিতেছেন, প্রতি শব্দে পাঠককে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান কোন

সৌন্দর্যকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হৃদয় এত লঘুতর যে, সে 'রিমি ঝিমি বাদল বরিষণে' রাতে স্বপ্নের সঙ্গেও সত্যের মত করিয়া সম্ভাষণ করিতে চায়। কবির কাছে সত্য এত গুরুত্ববর্জিত হইয়াছে যে, স্বপ্ন হইতে যেন তাহার কিছু তফাৎ নাই। এমনি তরল প্রাণ বলিয়া তাহার প্রসারও অনেক—অনেক দূর—একটুখানি উত্তেজনা হইলেই সে বাণিজ্যে ছুটিয়া যায়—

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে।

এইরূপ ভারশূন্য প্রাণে কবি আসিয়া গ্রামে বাসা করিয়াছেন। যেখানে সেখানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সন্ধ্যায় বধূর দ্বারে অতিথি হইয়া রিণিঠিনি শিকলটি নাড়িয়া দিতেছেন,—মাঠের মেঘ-ত্রস্তা হরিণ-চোখ মেয়েটিকে কৃষ্ণকলি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—জলার্থিণী দুটি বোনের গুঞ্জন-ধ্বনি দূর হইতে শুনিতেছেন,—'ভাঙনধরা কূলে' আপনারি অন্তরের সৌন্দর্য-তৃপ্তিকে মূর্তিমতী দেখিতেছেন,

"আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই?
সে কহিল ভাই,
নাই নাই নাই গো আমার
কারেও খোঁজ নাই।"

কখনো 'সজলনীল জলদবরণ বসনাবৃতা'র জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইতেছে, মোটকথা 'শরৎকালের বালুচরে নির্জন ঘর' হইতে, কখনো স্থলপথে, কখনো জলপথে বাহির হইয়া কবি বাংলা গ্রামের সমস্ত সৌন্দর্যের সম্মুখেই আপনাকে আনিয়া ফেলিতেছেন—এ কেবল স্বচ্ছ হৃদয়ে সৌন্দর্যের ছাপ ধরা। হৃদয়ে আলোড়ন থাকিলে এই কোমল সৌন্দর্যগুলি এমন যথাযথ বেশে উঠিয়া আসিতই না।

সৌন্দর্যের সঙ্গে কেবলমাত্র দেখা এবং স্পর্শ বিনাই তাহার আভাটি হৃদয়ে লওয়া। তাই যাত্রীকে কেবলমাত্র পার করিয়াই সুখ—কোন পীড়াপীড়ি, কোন নাছোড় জিজ্ঞাসাবাদ নাই—

বলতে যদি না চাও তবে,
শুনে আমার কি ফল হবে।

কোন ব্যস্ততা নাই। দুজনে একটি গাঁয়ে থাকিয়াই সুখ। প্রাণ সৌন্দর্যের উপর আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া প্রতি ক্ষুদ্র কণায় বৃহৎ সুখকে, দূরের সুখকে অধিকার করিতেছে—

"তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা
মোদের বনে কুসুম ফুটে উঠে।"

একটি যে দূরবিস্তারী 'গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে' —প্রকৃতির কবি আজ প্রাণে প্রকৃতির সেই মিলনাধার ঔদার্যটি লাভ করিয়াছেন। যেখানে 'বিরহ', সেখানেও আবেগ ব্যাপ্ততায় শান্ত হইয়া গিয়াছে। দুপুরে ঝাউয়ের অবিরাম শব্দে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত আকাশ বিরহ বাঁশীর সুরে কাতর—আবেগ আর হৃদয়ের সংকীর্ণ কোটরে জ্বলিয়া মানুষটিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না। শুভ্র অলস মেঘজড়ানো আকাশ, নিস্তরঙ্গ নদী—সমস্ত প্রকৃতিকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে।

মিলনে আহ্বান—
—সেও কি অতীত সুরে।

এস তোমার চরণ দুটি
তৃণের পরে ফেলে।

আর মিলন তো নিতান্তই সোজাসুজি। সোজাসুজি বলিয়াই ছোট নহে, পরন্তু অতি বৃহৎ, মনোরম উচ্ছ্বাস—

দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নব রাগের বাঁশী
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বাসিয়া
উঠবে হাসি রাশি।

অতর্কিতে কোন কোন দুর্দিনে সুন্দরী ফুল নিতে আসিয়া পড়িলেও কোন সসব্যস্ততা নাই। মনে পড়ে বটে একদিন ছিল,

বন আলো করি ফুটে ছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি—

কিন্তু অচিরেই সে খেদ পরিহার করিয়া 'ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন ধুয়ে ধুয়ে' দেওয়া হয়। এক একদিন 'মনের কথা জাগানে' বাতাস বহিলে আগের কথা মনে পড়িয়া প্রাণের তল হইতে বেদনা মর্মরিত হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু 'আজকে কিছুই গাব না'—কবি সহজেই আপনাকে সংবরণ করিয়া ফেলেন।

তাই দেখিতেছি শান্তি, ব্যাপ্তি—দেখিতেছি অসীমে প্রসার। প্রথমভাগে কবি তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া আসিয়াছেন,—ক্রমে দেখিতে পাই, মিলন, বিরহ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রাণটিকে আদৌ ধরিতে পারিতেছে না, তাহাদের মধ্য হইতে 'সূত্রং মৃণালাদিব' সৌন্দর্যটুকু লইয়া, আনন্দরসটুকু লইয়া প্রাণ কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে। সুখ দুঃখ ত পাতার ভেলার খেলার মত, প্রেমও নিতান্ত সহজ—এসব ছাড়াইয়াও কবি কোথায় যাইতেছেন? তাঁহার উদার প্রাণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া দিতে পারে? উত্তর—প্রকৃতিকে। পূর্বে যে সুর শুনিয়াছিলাম 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি' এখন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। মাধুর্যে কবি আজ ধনী, তিনি আজ কৃতার্থ, তিনি আজ দাতা, সকলকেই তাঁহার কিছু দিবার আছে—'আছে আছে কিছু রয়েছে বাকী'। প্রকৃতির বুকেই যে তাঁহার স্থির শান্তির ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। কবিও তাহা এক সিধা কথায়ও বলিয়া দিতে বাকী রাখেন নাই। "ভৎর্সনা কবিতায় কবি বলিতেছেন—"আমাকে তিরস্কার করিও না আমি বিনা স্পর্শে তোমার সৌন্দর্য লইয়াছি, আমি কাহারো জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই—আমার গৃহ আছে—সেখানে—

"জ্বলে প্রদীপ ধ্রুব তারার মত।

আবার সিধা কথাতেই বলিতেছেন,—

"দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি"—
"তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমার পিছুতে।"

স্থির শান্তির ঘর রচিত হইয়া গিয়াছে। তাই যতই শেষে দিকে যাই ততই প্রাণ মেঘমুক্ত, ততই প্রাণ আপনার ঔদার্য-পরিমা বিহারভূমিতে আসিয়া পড়িতেছে,—শেষের দিকে যত যাই, ততই সেই 'বিপুল বিরতি', সেই 'অকূল শান্তির' সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছি। প্রভাতে কবির প্রাণটি বর্ষাধৌত প্রকৃতির উপর পড়িয়া ঝিকিমিকি করিয়া কাঁপিতেছে, সংসারের আচারকে অবহেলা করিয়া বর্ষার ঝর্ঝরের সঙ্গে মাতিয়া উঠিতেছে—নববর্ষায় নানা রঙের অনুকারে নানা রঙীন ভাবের জাল প্রাণের চারিদিকে ময়ূরের পাখার মত খুলিয়া যাইতেছে, বিশ্বের সৌন্দর্য

র মধ্যে আসিতেছে, আবার প্রাণের বিশ্বে বাস্তবায়িত হইয়া র হইয়া যাইতেছে। যেমন ঃ—

"নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে।
নব তৃণ দলে ঘন নব ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।"

* * * * *

প্রকৃতিও নদীকূলে, কেতকীতটে, মেঘপ্রাসাদে, বকুলশাখার ারে, অনতিস্ফুট বিভাসে নিজের মূর্তিখানি দেখাইয়া তেছে। একজন চিত্রকর যদি এই ছায়াভাসগুলিকে ব্যজনের বর্ণে ফুটাইতে পারিতেন। এত তন্ময়তা, এত র্য, এত বিস্তার, এত সুসঙ্গত সংগীত যদি সর্বোৎকৃষ্ট ক্ সৃষ্টি না করিতে পারে, তবে জগতে আর পূর্ণ লিরিক্

এইরূপে সংগীতের মাতালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে য়া আমরা বহির্ভুবনের উপর গলিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু যে আরও একটি নিবিড়তর স্পর্শে আমরা অতলের অতলে া গিয়াছি। প্রকৃতির মধ্যে এতকালের আরাধ্যা আবির্ভূতা েন, প্রাণ আনন্দে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসিয়া গেল, কোনদিকে তীরের সন্ধান পাইল না।

"আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়
আজি জলভরা বরষায়।"
"যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তব গান তব আপনি ধ্বনিছে।"

বীণা নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষণিকায় সৌন্দর্যের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষণিকা নি সাধনার ইতিহাস, সৌন্দর্য সাধনা ও মাধুর্য সাধনার াস অর্থাৎ পরম কবিতা, কবিদের আপনাদের জিনিস। সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সৌন্দর্যের সন্ন্যাসী ছিলেন, সাধনা সফল হইয়াছে। তাই কবি সংসারের ও র্যের আদর্শস্বরূপা এই কল্যাণী,—কবির 'সর্বশেষের সিদ্ধকাম কবিকে আবার সংসারের সহিত মিলাইয়া ছে।

ক্ষণিকায় আরও দুইটি কবিতা আছে। সুগম্ভীর দুটি া, সেই দুটি পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারিব, তুমুল কাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইখানেই আমরা অতলের ল ডুবিয়া যাই। চঞ্চল হইতে গভীর সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া র প্রকৃতির বনপথ দিয়া একটি কবির প্রাণ আসিয়া অবশেষে 'স্তব্ধ উদার আলয়ে নীরব নিভৃত ভবনে' উপস্থিত ছে। এখনো

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?"

াও ধন্য, আমরাও ধন্য। যতই সংসারের ভার বাড়িবে, ৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে আমাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে, তই এই পরিপূর্ণ কোমল মাধুর্যের বিবরণ সর্বদাই আমাদিগকে অসীম এবং সুন্দরের সহিত অনন্ত কণাতেও সংশ্লিষ্ট রাখিবে। যাহারা এইরূপ সুন্দর হইতে জানে এবং মানুষের জীবনের নিগূঢ় মধুর রস নিজের প্রাণে পাইয়াছে, তাহারাই যেন আপনার কথা গান করে, তাহারাই যেন লিরিক কবিতা লেখে। কারণ, ঐ একটি হৃদয়ের জ্যোতিঃসম্পদে সমস্ত মনুষ্য জাতির গৌরব। ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম। আসল কাব্যপাঠের যে আনন্দ, তাহার শতাংশের একাংশও বলা হইল না। যাঁহারা ক্ষণিকা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই একথা বুঝিবেন। ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম সত্য, কিন্তু প্রসঙ্গত একটু এদিক ওদিকে একটু আগে পাছে দৃষ্টি দেওয়া অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন , ধারাবাহিক। স্তরে স্তরে তাঁহার কাব্যের বিকাশ—কোনোখানে একটি উড়িয়া আসা উদ্ভট কবিতা পাওয়া দুষ্কর। তাই একখানি কাব্যের সূত্রেই স্বভাবত আমরা তাঁহার অন্যান্য কাব্যে গিয়া উপস্থিত হই। ক্ষণিকা হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—কি আলোড়ন, কি বেদনা, কি একটা অশান্ত অন্বেষণ। সেই 'তলতল ছলছল' ইত্যাদি আহ্বানের গভীর আবেগ ; —সেই 'ভীষণ রঙ্গে তব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা রাত্রিবেলা' ইত্যাদি অতি মাধুর্যের অবসাদান্তে উন্মত্ত মিলন ; —সেই ধরণী গগনের সৌন্দর্যকে ব্যথিত হৃদয়ের বেষ্টনে মানসী প্রেয়সীর রূপে আহরণ করিয়া লইবার চেষ্টা, যেমন 'মানসসুন্দরীতে' আবার সেই রমণীকে সমস্ত সম্বন্ধ, কর্তব্য-বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া বিশ্বভুবনের অঙ্গে তাহাকে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া—যেমন উর্বশীতে ; সেই 'যেতে নাহি দিব' স্বরে বুক চিড়িয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রন্দন ; সেই চিত্রাঙ্গদার পার্বতীয় অরণ্যচ্ছায়ে দীর্ঘায়িত প্রেমলীলা—আরও সেই কত ঢেউয়ের টলমলানি, কত স্রোতের টান যে দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কি একটি কৃচ্ছ্র আলোড়নই দেখিতে পাই! তাহার পরে ক্ষণিকায় আজ সৌন্দর্য সহজ হইয়া আসিয়াছে 'নাগাল পেয়েছি নীচুতে'! চৈতালীতে যে একটি শান্তি আছে, সেটি গভীর শান্তি নহে, সে বিকালবেলার শান্তির মত—তখনো সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাণ একেবারে নিবিড় মাখামাখিভাবে মিশিয়া যায় নাই। কিন্তু ক্ষণিকায় একেবারে মিলন, 'অকুল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি।'—ক্ষণিকায় যে শান্তি তাহা নিতান্ত নিবিড় রহস্যময় মধ্যরজনীর শান্তি।

ক্ষণিকা হইতে এখন আবার আমরা কোথায় যাইব? রবীন্দ্রনাথ যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার জন্য তো আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু আরো কি সম্মুখে চাহিতে পারি না! ওয়াল্ট্ হুইটম্যান Passage to India বা 'ভারত যাত্রা' নামক কবিতায় আত্মার সঙ্গে সমুদ্রে বাহির হইয়া ভারতের তীরে উপস্থিত হইয়া যেমন বলিতেছেন,—

Passage to more than India, O Soul! আরো দূর, ওরে প্রাণ ভারত ছাড়িয়া—তেমনি ক্ষণিকায় দাঁড়াইয়া আমরা কি আরো দূরের সংগীতের আরো বৃহৎ গভীর গুহার প্রত্যাশা করিব না?

[সতীশ গ্রন্থাবলী হইতে]

দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অপর কোনও ভাষায় এরূপ সুন্দর ছন্দ রচিত হইতে পারে না, অপর কোনও ভাষায় ইহার উপযুক্ত উপাদান নাই। আমাদের এই বাঙলা ভাষাতেই কেবল ইহা সম্ভবপর। জানি না, অপর কোন্ ভাষাতে এমন কোন্ কবিতা আছে, যাহাতে সমগ্র বর্ষার ঘন ঘোর জীবনের সমস্ত বুকভরা ব্যথা এমন অনির্বচনীয় মনোহরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষার মেঘরুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাবৃটের চিরসন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং মানব-জীবনের অনিবার্য বিষাদ, সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে। এদিকে কি সুন্দর অথচ সহজ ভাব ইহার প্রাণের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। যে সকল কবি বা কল্পনাব্যবসায়ী মানবজীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভাবর্ণনে পটু—Peo, Baudelair বা Hawthorne—তাঁহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপার্থিব বিষাদ দেখি নাই। ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মন্থরগতিতে সন্ধ্যার হৃদয়ধ্বনি অনুভূত হয় এবং তাহার আলুলায়িত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

মানসীর উত্তরার্ধে মিত্রাক্ষর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়) তাহাদেরও ঠিক এইরূপই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই সকল কবিতায় রবীন্দ্রবাবু বাঙলা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্বে কোন বঙ্গীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব জীবন্ত দর্পিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটি চরণ কেমন আর একটির উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে। চরণের উপর চরণের এইরূপ উচ্ছ্বাসকে ফরাসী ভাষায় আঁজাবমাঁ (enjambement) বলে। বাঙলায় যেমন এই চতুর্দশ মাত্রাত্মক পয়ার, ইংরেজীতে সেইরূপ আয়াম্বিক পেণ্টামিটার (Iambic Pentameter) এবং ফরাসী ভাষায় আলেকজাঁদ্রিন (Alexandrine)। এই তিন ভাষাতে এই তিন অতি প্রাচীন এবং সাধারণ ছন্দ এবং তিন ভাষাতেই এই তিন ছন্দের প্রতি চরণের অন্তে যতি স্থাপিত হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। আধুনিক কালে ভিক্টর হুগো আলেকজাঁদ্রিনএর এই নিয়মের নিগড় খুলিয়া দিয়া সাহিত্য সমাজে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ না থাকিলেও এই শৃঙ্খলমুক্ত আলেকজাঁদ্রিন সর্বতোভাবে ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য এবং বাকপটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ভিক্টর হুগোর বহু পূর্বে এই আঁজাবমাঁ কখন কখন ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রবাবুই কিন্তু এই প্রথমে বাঙলা মিত্রপয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন এবং তাহাতে যে বাঙলা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য কত দূর বর্ধিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বিক্রম। ইঁহার এই মিত্রাক্ষর পয়ার পড়িয়া ইংরেজী পেণ্টামিটার-এর শীর্ষ-স্থানীয় শেলির এপিসাইকিডিয়ন (Epipsychidion) মনে পড়ে। ইংরেজী সাহিত্যেও উচ্চ শ্রেণীর কবি ভিন্ন মধ্য বা নিকৃষ্ট কবিদিগের লেখায় এরূপ পয়ার দেখিতে পাইবে না। পোপ (Pope) বা ড্রাইডেন (Dryden) এ ইহা নাই, কিন্তু শেলি এবং কীটস-এ ইহা বহুল পরিমানে দেখিবে। বাঙলা যদি ফ্রান্স হইত, তাহা হইলে আজ রবীন্দ্রবাবু সাহিত্য জগতে ভিক্টর হুগোর ন্যায় পূজা পাইতেন—তাহা হইলে তাঁহার এই অভিনব দৃপ্ত সুন্দর আবিষ্ক্রিয়ার জন্য দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে কচিৎ আমাদের ন্যায় দুই একজন পাঠকের মৃদু কোমল প্রশংসার পরিবর্তে সহস্র রসজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ কণ্ঠের উচ্চ জয়রোলে বাঙলা ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

আমি দেখিতেছি ভারি বিপদে পড়িলাম। এত দিক হইতে মানসীর কবিতাসমূহের এত প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, একদিকের কথা বলিতে গেলে অপর সহস্র দিক পড়িয়া থাকে। এই এক ছন্দের কথা বলিতে গিয়া আমি অন্যান্য নানা কথা ভুলিয়া যাইতেছি। উপরিউক্ত অহল্যা নামক কবিতা এমন বিশালভাবে পরিপূর্ণ—ইহার ভিতর জড় জগতের সহিত এমন একটি অসীম ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে, বোধ হয় যেন, Walt Whitman (ওয়াল্ট হুইটম্যান)-এর সৃষ্টি বিশাল প্রাণ শেলি (Shelly)র অমর বীণা লইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। যে সকল অন্ধ এবং বধির পাঠক রবিবাবুকে তাঁহার সেই অপোগণ্ড কালের কবিতাসমূহের মধ্যেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই অহল্যার প্রকাণ্ড কল্পনার পরিচয় লইতে বলি। তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয়ে অহল্যার সেই "নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণের" বিশাল চিত্র কি স্থান পাইবে? তাঁহার কি উদার মহত্ত্ব এবং মাধুর্য-পূর্ণ ভাষা। কি স্নেহ প্রীতিময়ী কল্পনা—ঊষার ন্যায় সরল শুভ্র আলোকময়ী দৃষ্টি। তাঁহার কবি হৃদয়ের বিশ্বব্যাপিনী করুণা—এ সকলের আদর না দেখিলে মর্মে মরিয়া যাইতে হয়।

মানসীর 'বিদায়' নামক কবিতার পূর্বার্ধে বিদায়মান দিবসের বিষণ্ণ আলোক জড়িত রহিয়াছে। অপরার্ধে সন্ধ্যার শিথিল হৃদয়ের আকুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। শেষ কয়েকটি চরণে আকাশ, সাগর এবং সাগর-তীরের উল্লেখে বোধ হয় যেন কোন সুদূর অপরিচিত দেশে কোন সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের ভিতর সন্ধ্যার বিশাল বিজনতার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ভাসিতেছি,—মাথার উপর সন্ধ্যা তারা কেবল তাহার শুভ্র বিমল দীপ্তি বর্ষণ করিতেছে। জীবনের একটি ক্ষণিক বিদায়ের বিরহ-বিষাদে থাকিয়া, কবি প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে মহা-বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। এ বিরহ প্রেমিকের বিরহ এবং কবির বিরহ। ইহারই অধীনে প্রেমিক কবি দেখিয়াছিলেন, "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।" তাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া কবি বলিতেছেন,—

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্
দূর পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর
পুষ্প গন্ধ, কত সুখ স্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষা হীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারা সম; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে!

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিষণ্ণ পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায় গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড় জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগর বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণমান ক্লান্ত ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছি, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহারাজ্য খুলিয়া গিয়া কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্য আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি আমার কাজ ভারি কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। কিন্তু আমার দরিদ্র ভাষায় তাহাদের উপযুক্ত প্রশংসা অসম্ভব। আমি নিজেই বুঝিতেছি, আমার সেরূপ বাক্য-বিভব নাই, যাহাতে তাহাদের সহস্র

গুণের এক অংশও প্রকাশ করিতে পারি। তাহাদের ভাব যেমন গভীর, অকপট ও মধুর, তাহাদের ভাষা ও ছন্দ সেইরূপ সরল, মধুর এবং গভীর রাগিণীতে বাঁধা। মানব-প্রেমের অসীমতা এবং অনন্ত গভীরতা মানসীর কবি যেমন অনুভব করিয়াছেন এবং ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর খুব অল্প কবিই তাহা পারিয়াছেন। সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশে তো কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সরল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কয়টি কবিতা আছে। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণ মাত্রায় থাকিলেও তাঁহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভব শক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই. সেই-জন্য একঘেয়ে হইলেও তাহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বর্ধিত দেহ। তাহাদের ভিতর 'ছিনিমিনি', চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানব-হৃদয়ের মর্মোচ্ছ্বাস আছে। মানব জীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত উন্মত্ত আকুল। বাস্তবিক মানুষের সমুদয় হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেম কবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই ইহার চরম সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে একা Shakespearই (সেক্সপিয়র) যেমন অপরাপর সকল বিষয়ে, সেইরূপ এ বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তারপর এই বর্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চ দরের প্রেম-কবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রবাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রেম-কবিতায় গুলিই সর্বতোভাবে সুন্দর, সেই ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপবালা" হইতে আজিকার এই মানসীর "আমার সুখ" পর্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই। রবিবাবুর কবিতাসমূহের ভিতর তাহারা বসন্ত প্রস্ফুটিত পুষ্প-স্তবকের ন্যায় বা বিমল নৈশ আকাশে প্রস্ফুট-শ্রী তারকাপুঞ্জের ন্যায় "উজ্জ্বল মধুর" শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। আবার তাহাদের মধ্যে দু একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—"আজু সখি মুহু মুহু"।* বাঙলা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সংগীত কেহ কখনও শুনে নাই। ইহার উপযুক্ত প্রশংসা আমার ক্ষমতার বাহিরে। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুষমা শারদ জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয় সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্তমান। ইহা পাঠে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর একটি অতি সুন্দর প্রেম-কবিতা মনে পড়ে। Maud-এর ভিতর বিরহ-বিধুর প্রেমের সেই মধুর অপেক্ষাও আকাঙ্ক্ষাময় আহ্বান সংগীত, এই মিলন সংগীতের যথার্থ দোসর।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং জ্বালা—উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি সুন্দর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় সুমধুর,—বাঙলা ভাষায় তাহাদের তুলনা কোথায়? "বিরহানন্দ", "ক্ষণিক মিলন" প্রভৃতির ছন্দ, কবি দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট ঝঙ্কার—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্লোকের শেষভাগে মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব ছটা। কিন্তু এ সকল কবিতারও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিনিমিনি বা ন্যাকামি নাই—প্রেমহীন বিরহের হা-হুতাশ নাই, "আনছুরি", "খাই বিষ" নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্বাসনের ভয় না রাখিয়া তাহার আনন্দ-বিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকাশক্তি অর্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চির সুস্থতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলেই প্রকৃতিস্থ আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byron (বায়রন) দিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকে কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক স্ফূর্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেম জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচ্ছেদ নয়—সমস্ত মানব জীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানব জীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্যালোকে যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে এ প্রেমও সেইরূপ মানব হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সংকীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায় ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েরই মুক্তিসাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্ব দিকের কবিতাগুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্যে মদিরতামিশ্রিত, তাই পাঠককে ক্রমশ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্ধে কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য-উপভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। প্রথমার্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ব্যস্ত, অপরার্ধ সাগরোর্মির মধুর, উদার নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কলা-কৌশলে ইউরোপীয় প্রধান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু ভাবের ঔদার্যে এবং রসের গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদূর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, সুতরাং ইউরোপে এরূপ কবিতা এখনও জন্মে নাই। কই আমি ত ইংরেজি বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর "পূর্বকালে" বা "অনন্ত প্রেম" প্রভৃতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই। এই দুইটি কবিতারই মর্মকথা—যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহাকে কি সবে এইমাত্র এই জন্মে ভালবাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ়, দুরন্ত, নিবিড় অনুভব,—ইহা কি আজিকার? এই বিশ্ব-বিলোপী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে, না অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার কি পূর্বাপর নাই? সুদূর অতীতে আমাদের মত যাহারা ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান অনুভব নিবিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম, আছি এবং থাকিব। বর্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুইজনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।" ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman)এ এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman) মার্কিন দেশীয় এবং অনেকটা প্রাচ্যভাবে দীক্ষিত।

"ধ্যান" নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই

(শেষাংশ ৫৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* ভানুসিংহের কবিতা দেখ

শেষ জন্মোৎসব

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর

১৩৪৭ সনের ফাল্গুন মাস চলে গেল, দেখতে দেখতে এসে পড়ল ১লা বৈশাখ। সুরু হোলো ১৩৪৮ সন, ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই নববর্ষের তাৎপর্য তখন কেউ বুঝিনি, কিন্তু কবির মনে ভবিষ্যতের একটি নিবিড় স্পর্শ এসে পৌঁছেছিল, তাই লিখেছিলেনঃ--

দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

* * *

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে। —জন্মদিনে, ১

এই দিনে তিনি দিয়ে গেলেন মানুষকে 'সভ্যতার সংকট' অভিভাষণ, তার জোরালো ভাষা তখন আমাদের দেশবাসীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর জন্মদিনে বই-খানি বেরল, সকালে তাঁর হাতে দেওয়া হোলো। তিনি এই শুভ জন্মতিথিতে দেশকে ও মানুষকে শেষ উপহার দিলেন, এই কবিতাগুলি তাঁর জীবনযজ্ঞের আহুতির শিখা, অনেক দুঃখের তপস্যার ফল। এর পাতায় পাতায় রয়েছে তাঁর শেষ বর্ষের ইতিহাস।

এই 'জন্মদিনে' থেকে একটি কবিতার উল্লেখ না ক'রে পারলুম নাঃ

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
—জন্মদিনে, ১০

মনের মধ্যে আনন্দের মধুচক্র ছিল ব'লেই কবির প্রাণের বাঁশিতে লেগেছিল সকল ভাবের আঘাত, তারি প্রকাশ জেগে উঠেছিল 'নব নব' রূপে, তবু অতৃপ্ত মন তাঁর ব'লে উঠলঃ

এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক। —জন্মদিনে, ১০

প্রকৃতির এমন একটি কোণও ছিল না যার গোপন রহস্য এই আশ্চর্য জাদুকরের চোখ এড়িয়ে যেত, তাঁর দৃষ্টিশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। এত প্যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মরণী মন তৃপ্ত হয়নি, সেই অতৃপ্তিই স্রষ্টার অন্তর্নিহিত গৌরবময় সৃষ্টিশক্তিকে পিছনে থেকে প্রেরণার খোরাক জোগাত বারংবার। যাত্রা-বেলায়ও তিনি ডেকে ব'লে গেলেন,—মানুষকে জানা তাঁর শেষ হোলো নাঃ

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার। —জন্মদিনে, ১০



রবীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী

[শ্রীবিনায়ক মাসোজী কর্তৃক মৃত্যুর চৌদ্দদিন পূর্বে গৃহীত ফটো]

বিচিত্র সম্পদপূর্ণ কীর্তিও তাঁর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না, 'নির্বাক মনের' 'অখ্যাত জন'-সাধারণের জন্য প্রাণ রইল তাঁর ফাঁকা। সাধারণ মানুষের পার্থিব সুখদুঃখময় জীবনযাত্রার মধ্যে না পেঁছিতে পারার সন্দেহ তাঁকে কেবলি পীড়া দিয়েছে। তাঁর যুগ প্রান্তিক থেকে যে গুণীর আবির্ভাব হবে তুলে নিতে তাঁর কণ্ঠের "না-বলা-বাণীর" সুর, সেই সূত্রধারের উদ্দেশে তিনি রেখে গেলেন এই শেষ প্রশস্তিঃ

সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়,
মূক যাঁরা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,

কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি,
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥ —জন্মদিনে, ১০

বইখানি তাঁর রোগশয্যার মানসিক দর্পণ। তিনি তাঁর জয়যাত্রার আয়োজন যেন ভরে নিয়েছেন গভীর অনুভূতির চরম দেখায়। যে জীবন দেবতার ধ্যান প্রথম বয়সে তাঁর মনে নিবিড় হয়েছিল, কালে কালে তাই মহামানবের বিরাট অনুভবে এসে মিলিত হোলো।

তাঁকে সামনে বসিয়ে জন্মদিনের উৎসব যে আর হবে না তখন তা কে জানত, কিন্তু এবারকার আয়োজনটি হয়েছিল সুন্দর, কত বন্ধু তাঁর কত জিনিস পাঠালেন, ফলে ফুলে ঘর ভরতি হয়ে গেল, বিশেষ ক'রে আমের সাজিতে; এই ফলটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। গত বৎসরেও দিনে ছ-সাতটা ক'রে আম খেতেন, এবার এত ভক্ত তাঁকে আম পাঠাচ্ছেন কত দেশদেশান্তর থেকে, কিন্তু খাবার স্পৃহা চলে গেছে, অনেক অনুরোধ করলে তবে চামচে করে একটু মুখে দিতেন। সন্ধ্যা-বেলায় তাঁর নাতনী নন্দিতা তাঁকে জন্ম-দিনের সাজে সাজিয়ে দিল শুভ্র গরদের ধুতি উত্তরীয় মাল্যচন্দনে। ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হোলো উত্তরায়ণের বারান্ডায়, যেখানে জন্মতিথির অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রস্তুত ছিল। তিনি রুগী, কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্যোতি সমস্ত রোগ-ক্লিষ্টতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মনে হোলো কোন্ ধ্যানলোকের দেবতা এসেছেন আজ বিশেষ পূজা নিতে।

মেয়েরা এল বিচিত্র উপহার নিয়ে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন থেকে, সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবার সাজিয়ে দিয়েছে তাদের নানাপ্রকারের উৎপন্ন বস্তু নূতন নূতন রচনায়। হৃদয় দিয়ে শিল্পীরা গড়েছে তাঁর শেষ জন্মদিনের উপহার। সার বেঁধে বাসন্তী কাপড় পরে মেয়েরা যখন নিয়ে এল তাঁর পায়ের কাছে নিবেদনের ডালা, তখন অজানা ছিল যে, এ ডালা তাঁর সামনে আর সাজানো হবে না, তাঁকে নিয়ে এই তাঁর শেষ জন্মদিন। কিন্তু তিনি মনে যেন এই অনাগত ঘটনার আভাস পেয়ে লিখেছেন:

জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে-মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান॥ —জন্মদিনে, ২৬

নববর্ষে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, আশ্রমবাসীদের প্রতি এই তাঁর শেষ আশীর্বাদ:

"আশ্রমবাসী কল্যাণীয়গণ, তোমরা আজ আমাকে অভি-নন্দন করে উপহার বহন ক'রে এনেছ, পরিবর্তে আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের প্রার্থনা জানিয়েছ। প্রত্যহ নীরবে আমার আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি ধাবিত প্রবাহিত হয়েছে, দীর্ঘকাল নিরন্তর তোমাদের অভিষিক্ত করেছে। আমার আশীর্বাদ আজ নূতন বেশে তোমাদের কাছে উপস্থিত হোক, সুন্দর বেশে তাকে তোমরা গ্রহণ করো।

জন্মকালে আমরা যে আত্মীয়লাভ করি, তার মধ্যে কোনো চেষ্টা নেই, জীবনলক্ষ্মীর সে অযাচিত দান, তার মধ্যে আমাদের কোনো গৌরব নেই। তারপর জীবনযাত্রার পথে-পথে যদি আত্মীয় সংগ্রহ করতে পারি, তবে সেই তো আশ্চর্য, সেই তো গৌরবের বিষয়, সেই আত্মীয়তা আরো গভীর, অকৃত্রিম, মূল্যে তার অনেক



১৩৪৮ সালের জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ

বেশি—আশীর্বাদ সেই তো বহন করে আনে। আজ যে তোমাদের সকলের হৃদয়ের দান বিধাতার আশীর্বাদ রূপে আমার কাছে উপস্থিত এ এক আশ্চর্য ঘটনা। কোন্ দূরে পরিবারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমার বাল্যলীলা আরম্ভ, আমি কাউকে জানতুম না, দু' চারজন আত্মীয়ের মধ্যে আমার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবি, বিধাতা

আমার জীবনে কী খেলা খেল্‌লেন, সেদিন তো এ-কথা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রচলিত ভাষায় যাকে আত্মীয় বলে তোমরা তা নও, তাই তোমাদের প্রীতি এত মূল্যবান। এই নব বৈশাখের উৎসবে তোমরা যে উপহার পুঞ্জীভূত করে এনেছ কৃতজ্ঞ অন্তরে তা গ্রহণ করি। আমার মতন সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে, শুধু যে আমার স্বদেশীয়েরাই আমাকে ভালো বেসেছেন তা নয়, সুদূর দেশেরও অনেক মনস্বী তপস্বী রসিক আমাকে অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন। জানি না আমার চরিত্রে কর্মে কী লক্ষ্য করেছেন। সকলের এই স্নেহ মমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে, প্রণাম করে যাই তাঁকে, যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।*

* শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর প্রণীত 'নির্বাণ' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। ১৩৪৯ সালের ১লা বৈশাখ বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মানসী

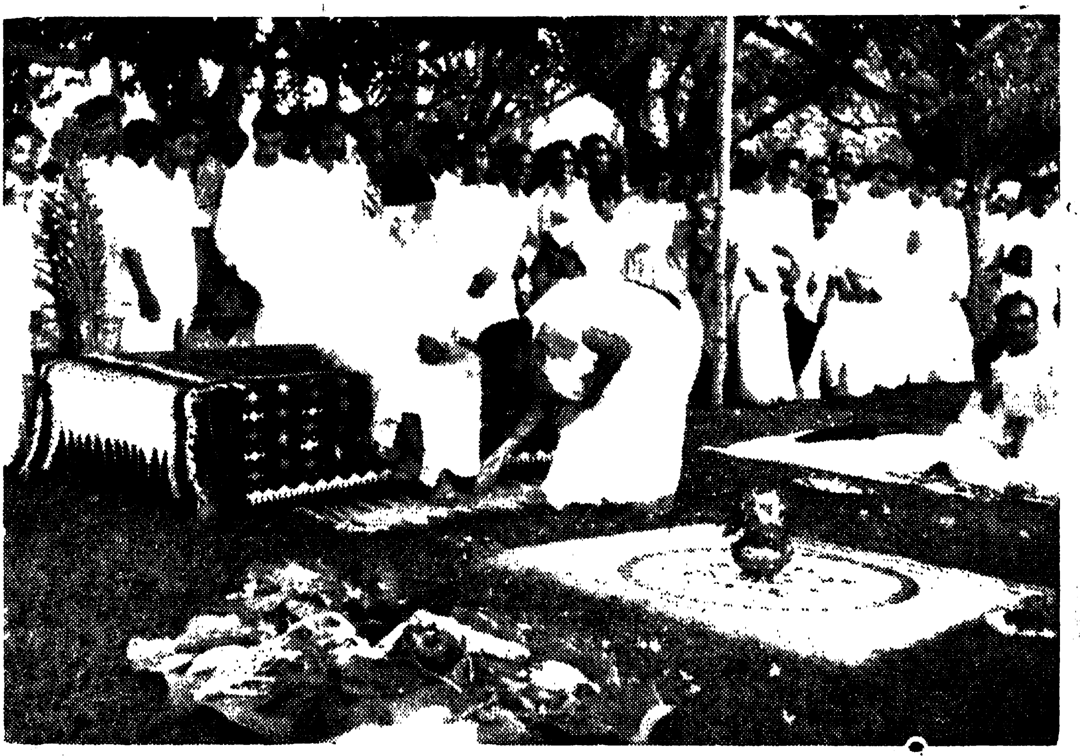
(৫৮৭ পৃষ্ঠার পর)

দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও অনুভবের গভীরতায় হুগো (Hugo) বা শেলি (Shelley)র শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান।

"তোমার পাইনে কুল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
উদয় শিখরে সূর্যের মত
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন সম;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার;
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যত দূরে হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার!"

কৈ হুগো (Hugo) বা শেলি (Shelley)র ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই।

[শ্রীপ্রমোদনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।]



শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান



গান।

রাগিনী পিলু। তাল খেমটা।

বল্ গোলাপ, মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু-শ্বাস,
পাখী গাহিছে মধু রবে।
তুই ফুটিবি সখি কবে?
প্রাতে পড়েছে শিশিরকণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তারা শুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি সখি কবে॥

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ ১২৯২) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি : কবির হস্তাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩১৭ সালের পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ যখন ঊনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়লেন, সেদিন শান্তিনিকেতনের নিরালায় আশ্রমবাসীরা তাঁকে নিয়ে যে প্রথম জন্মোৎসব করে তা আত্মীয়দের আনন্দ উৎসবেরই সমান। বাইরে তার প্রচার তখনো ঘটেনি। ক্রমে সেই উৎসব দেশব্যাপী হয়ে একটি জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হ'ল আমাদেরই প্রাণের উৎসাহে। আজ পঁচিশে বৈশাখ বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ দিন। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহামানবদের জন্মদিনের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনটিও চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে রইল।

পঁচিশে বৈশাখের এই উৎসব তথ্যের হিসাবে আজ একদিকে স্মৃতির উৎসবে পরিণত হ'য়ে থাকলেও গভীরতর বিচারে চিরন্তন কালের নিকষে সোণার অক্ষরে সমুজ্জ্বলরূপে সত্য হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে বৎসরে বৎসরে ক্ষণকালের দেহী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে আনন্দ উৎসবের সূচনা আমরা করেছিলাম, তাঁর দেহাবসানের পরে চিরকালের রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অন্তরে গ্রহণ করতে করতে এবার আমাদের সেই উৎসব জাতীয় সমগ্র জীবনে সার্থক করে তুলতে হবে।

জন্মদিনের মূল বাণীটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রতি বৎসর বৈশাখের এই শুভ দিনটিতে কবিতায়, পত্রে, অভিভাষণে—নানাভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। জন্মদিন উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন বৎসরে লেখা কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কবির স্বরূপ বোঝবার পক্ষে এই কবিতাগুলি অপরিহার্য।

জননীর গর্ভের অন্ধকার থেকে সন্তান জন্মলাভ করে জ্যোতির্ময় বিশ্বলোকে। তাই—'প্রত্যেক জন্মের মূল মন্ত্র হচ্ছে মুক্তির মন্ত্র, অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তি।' সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার সেই সদ্য আবির্ভাবকে সংসারে যাঁরা একটি পরম লাভ বলে মনে করেন, সে দিনের উৎসব সেই নিকট আত্মীয়দেরই, কারণ সেদিন 'তাঁরা তাঁদের আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে' বড় করে উপলব্ধি করেন নবাগত শিশুটির মধ্যে। 'জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কাণের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই।' সন্তান বৎসরের পর বৎসর যদি তার এই আবির্ভাবের পরম রহস্যময় নবীনতা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অক্ষর রাখতে সমর্থ না হয়, তবে এই



উৎসব সংসারে অন্যের কাছে চিরন্তন হবে কেমন করে। নবীনতার উপলব্ধিতেই উৎসবের সূচনা।

ক্রমে শিশুর বয়স বাড়তে থাকে। কাজের বিচিত্র দায় চাপে তার মাথায়। শৈশবের প্রতিটি দিনের তার যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, নবীনতা ছিল, কাজের ভিড়ে সে মর্যাদা ক্রমাগত ম্লান হতে

থাকে। একদিনের চিন্তা আর একদিনে প্রসারিত হয়ে তার জীবনে একাকার ঘটাতে থাকেঃ

'সেই একাকার—করা সময়
বিস্তৃত হোতে থাকে
নতুন হোতে থাকে না,
একটানা বয়েস কেবলি বেড়ে ওঠে।
ক্ষণে ক্ষণে শমে এসে
চিরদিনের ধুয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে।'
(শেষ সপ্তক—৪৬)

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর জন্মদিনটি ছিল বৎসরান্তে সেই শমে পেঁাছবার দিন। অসংখ্যের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া নির্বিশেষ 'আমি' সেদিন খুঁজে পেত তার বিশিষ্ট একক 'আমিটিকে'। তাঁর বাল্যের জন্মদিনগুলির একটি সুন্দর স্মৃতি-চিত্র আমরা পাই তাঁর প্রথম জন্মোৎসবের (১৩১৭) অভিভাষণেঃ

"তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়-জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ তোমার জন্মদিন। আজ তোমরা (আশ্রম বালকেরা) যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ সেই রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজন মাত্র সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।' (শান্তিনিকেতন: একাদশ খণ্ড)

প্রতি বৎসর এই দিনটিতে তাঁর প্রতি দিনকার ছোট 'আমি', যে আমি 'জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে', সেই বড় 'আমির' পায়ে আপনার প্রণাম নিবেদন করে আপনাকেই সার্থকভাবে ফিরে পেত। এইভাবে বৎসরে বৎসরে প্রতি জন্মদিনে তিনি যেন নবজন্ম লাভ করতেন, নবীন হয়ে উঠতেন। তাঁর এই চিরনবীনতার গুণেই তাঁকে নিয়ে জন্মোৎসব আমাদের জীবনে কখনও ম্লান হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে অল্পবিস্তর যাঁদেরই পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন একদিকে তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। অনেক সময় বৃহৎ কর্মলোকে নিত্য নিবিষ্ট এই কর্মীটি আচ্ছন্ন করে ফেলত তাঁর অন্তরের নিত্যনবীন কবিটিকে। আমাদের কাছে এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও এরই বেদনায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সত্ত্বাটি নিয়ত বিদ্ধ হত। যে কর্মক্ষেত্রে একদিন তিনি পরম আগ্রহে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানের অন্ধ কর্ম ব্যস্ততায় শেষ জীবনে মাঝে মাঝে কী পরিমাণ গ্লানিই না জমে উঠেছে তাঁর কবিচিত্তে।

' যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি, আমার ইচ্ছা আমার আশা, আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত ক'রে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানা ঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট ক'রে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হ'ল প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুরিপেটা।'

ফলে 'যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শালবীথিকায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ। মাঝখানে পড়ে শুকিয়ে এল কবির যৌবন, বৈশাখে অজয় নদীর মতো। নইলে আমি শেষ দিন পর্যন্তই বলতে পারতুম আমার পাকবে না চুল, মরব না বুড়ো হয়ে। জিৎ হোলো কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার সীমানা সুস্পষ্ট, অন্য বাজারের সঙ্গে তার বাজার দর খতিয়ে হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হোলে।"

(পত্রধারা ঃ পথে ও পথের প্রান্তে, ৫৪নং পত্র)।

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের প্রাণে চিরদিন তাই বহন করেছে মুক্তির বাণী—কাজের মানুষের কবল থেকে কবির মুক্তি। জন্মদিনের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে আর একটি পত্রে তিনি লিখেছেনঃ—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পঙক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়। * * * আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে, যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যে ছোট হচ্ছে, যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়।' তাঁর অন্তরের কবিটি ছিল সেই 'দ্রষ্টা', আর যেখানে তিনি অন্য পাঁচজনের মত সংসারের সীমার মধ্যে কাজের লোক ছিলেন, সেখানেই তিনি ছিলেন সেই ছোট 'ভোক্তা'। তাঁর অন্তরের নিভৃত নিকেতনের এই দ্রষ্টাটি কবির জীবনের প্রথম দিনের শিশুটির সঙ্গে আপনার যোগ কখনও ছিন্ন হতে দেয়নি। জন্মদিনের অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকালের বা বালক বয়সের যে সব চিত্র এঁকেছেন তার মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শৈশবকে স্মরণ করাই নয় শিশুত্বকে অন্তরে বরণ করা। জীবনের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত এই শিশুটিকেই উদ্দেশ করে তিনি কখনো বলেছেন 'নবীন' কখনো বলেছেন 'নবজাতক'ঃ—

'ঋষি কবি বলেছেন,—
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।
কে এই প্রথমজাত অমৃত
কী নাম দেব তাকে?
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।'
(শেষসপ্তক, ৪০)

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে 'শিশুতীর্থের' যাত্রীদল তাদের সুদীর্ঘ যাত্রা-অবসানে এরই উদ্দেশে—'উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে,—জয় হোক মানুষের ঐ নবজাতকের, ঐ চির-জীবিতের।'

পূরবীর সুপরিচিত 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি সম্ভবত নিজের জন্মদিন উপলক্ষে কবির প্রথম কবিতা (২৫শে বৈশাখ, ১৩২৯)। সেই কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠক মাত্রেরই এই সূত্রে সর্বাগ্রে মনে পড়বে; সেখানে জন্মদিনের মূল বাণীই হ'ল:—

'মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন,—'

'শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি'—সারা বছর যা আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল তাঁর কবি সত্তাটিকে নিমেষে উন্মোচিত হ'ল সেই আবরণ জীবনের জয়গানে:—

"হে নূতন,
হোক তব জাগরণ
ভস্ম হ'তে দীপ্ত হুতাশন।
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন।"

এই আত্মগত চিরনবীনতার উপলব্ধি ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর কাব্যে সৃষ্টির বিচিত্র রূপলোকে এবং বিরাট মানবলোকে আপনার ব্যাপকতর অস্তিত্ব অনুভব করে এবং শেষ জীবনে 'জন্মদিন' কাব্য-গ্রন্থে চরম পরিণতি লাভ করেছে আদিঅন্তহীন বিপুল কালের মধ্যে আপনাকে একান্ত করে মিশিয়ে দিয়ে।

পরিশেষের 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে তাই কবির কণ্ঠে মৃত্যুর পূর্ণতার বাণী যখন শুনি তখন তাঁর জন্মদিনের বাণী-গুলির গভীরতম অর্থ অনুভব করতে পারি:—

'বর্ণ—সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।
*　*　*　*　*
আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
*　*　*　*　*
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্ব্বাদ;
ঊষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে॥　(১৩৩৩)

এই 'পরিশেষ' বইটিরই 'প্রণাম', 'বিচিত্রা', 'জন্মদিন', 'আমি', 'আছি', 'বালক' প্রভৃতি প্রথম দিকের অনেকগুলি কবিতায় 'আমার অতীত আমি'টিকে—তার সীমাহীনতায় কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর অন্তরের গভীরে। জীবন সায়াহ্নের বর্ণে ঈষৎ গৈরিকাভ হ'লেও আত্মোপলব্ধির এই নিভৃত লগ্নগুলি মানবের প্রতি ভালবাসার অমৃতরসে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। রবি-প্রদক্ষিণ পথে জন্মদিবসের পর জন্মদিবসের আবর্তনে কবি তাঁর সারা জীবন ব্যেপে জপ করেছেন:—

'আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের।'

অবশেষে তাঁর প্রাণদেবতা সেই বৈশাখী রুদ্রের পায়ে প্রণাম নিবেদন করে তিনি তাঁর গভীরতম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়েছেন 'পরিশেষের' 'জন্মদিন' কবিতাটিতে:—

'এই বিশ্ব-সত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্ব্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে,
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, "আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালবাসা॥"

জলে, স্থলে পরিব্যাপ্ত এই গভীরতম 'আমি'র পরিচয় কবি অন্যত্রও দিয়েছেন। সেখানে সে কেবলমাত্র স্থানের অতীত নয়, কালেরও অতীত:—

'জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
*　*　*　*　*
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্ব্বত্রগামীরে॥

(পরিশেষ:—'আমি')

আমাদের মত ক্ষুদ্র সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাকর হ'লেও একথা মানতেই হয় যে, আত্মোপলব্ধির এই গভীরতম লগ্নে জন্মোৎসবের বাহ্য আয়োজন কবির জীবনে ক্রমশই যেন অর্থহীন হয়ে পড়ছিল। অনুভূতি যেখানে গভীর, সংসারের স্থূল অনুষ্ঠান সেখানে প্রবেশ লাভ করে না। উৎসব-আয়োজনের অন্তঃসারশূন্য দেশজোড়া ঘনঘটাও যে কতকাংশে কবির এই মনোভাবের জন্যে দায়ী নয়, তাই বা বলি কেমন করে।—

"দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
*　*　*　*　*
সবার মাঝে পৃথক ও যে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকারে।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙিন করছে ওরে
নিলাজমঞ্চে রাখছে তুলে ধ'রে,
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দিনরাত,
লুকোয় কোথা ভেবে না পায়, আড়াল ভূমিসাৎ।'

(সেঁজুতি : জন্মদিন, পৃষ্ঠা ৪৬)

'নবজাতকের' 'জন্মদিন' কবিতাটি সেঁজুতির কবিতার বছর দুই পরে (১৩৪৬) লেখা হ'লেও সেই বেদনারই ইঙ্গিত বহন করছে:—

'তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনিনে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।'

১৩৪৮ সালের 'জন্মদিনে' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের যে জন্মোৎসব, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে উৎসব। ইতিপূর্বে ১৩৪৫ সালে কালিম্পং-এ লেখা বিখ্যাত 'জন্মদিন' কবিতাটিতে আমরা এই সুর আর একবার শুনেছিলাম:—

'আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।'

(সেঁজুতি, জন্মদিন, পৃ: ১)

বিশ্ব-সৃষ্টির ছন্দের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের ছন্দের ঐক্য-বোধ নিহিত আছে মানবের চেতনার যে গভীরতম তলদেশে মৃত্যুর যবনিকা উন্মোচনের পূর্ব মুহূর্তে সেই রহস্য কবির অন্তর্লোকে যেন ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়েছেঃ—

'প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে॥'

(জন্মদিনে, নং ২)

অনাদি ভূতকাল থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের দিকে নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে যে জীবনস্রোত, অতি নিকট থেকে মহাসুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে যে রূপলোক, অশীতিবর্ষের কূলে এসে কবির দৃষ্টি এবং অনুভূতি যুগপৎ গভীর এবং উদার হয়ে দেশ ও কালের সেই ব্যাপকতম অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাই কখনো পরম বিস্ময়ে অনুভব করেছেন সেই দূরত্বকে—'যে মহা-দূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে'—

'আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে,
অলক্ষ্য পথের যাত্রী আজানা তাহার পরিণাম।'

(জন্মদিনে, নং ১)

কখনো অনুভব করেছেন আপন সত্ত্বাকে অসীম পথের পান্থরূপেঃ—

'সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরামাঝে
মর্ত্য জীবনের কাজে।'

(জন্মদিনে : ১২)

তারই সঙ্গে অনুভব করেছেন দেশবিদেশের দূরেরমানুষের সঙ্গে নিকটতম আত্মীয়তা।

'একথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই, সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্ব্বতা

(জন্মদিনে, নং ৩)

আর অনুভব করেছেনঃ—

'কালের বেড়া ভেঙে আত্মীয়তা
সেই সব মহামানবদের সঙ্গে
যাঁরা যুগে যুগে সার্থক
করেছেন সমগ্র মানবজাতীর
জন্ম

(জন্মদিনে ৬; পরিশেষ, বর্ষশেষ)

সৃষ্টির ক্রমবিকাশের শত শতাব্দীব্যাপী ধারায় কবির ক্ষণকালের জীবন এক হয়ে মিশে রয়েছে, বিশ্বজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের এই অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে কবি অতি সূক্ষ্ম এক চেতনা লাভ করেছেনঃ—

'অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা,
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে
এ আমার পরম বিস্ময়।'

(জন্মদিনে ; নং ৫)

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রায় সব কবিতাই আমরা যাকে ইতিপূর্বে জন্মদিনের বাণী বলেছি, তারই ইঙ্গিতে পূর্ণ। কাজের মানুষ যে রবীন্দ্রনাথ সেই ছোট রবীন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলে কবি-রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইহজীবনের শেষ কয়েক বছর বহুদূরে অথবা বলা চলে নিজের অন্তরের গভীরতম-লোকে প্রয়াণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ সংগীত যেন শমে' পেঁছে শেষ ক'টি বছর তাঁকে নিবিড়তম আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছিল। তাঁর এই গভীর ধ্যানলব্ধ আত্মোপলব্ধি তিনি 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা' প্রভৃতি তাঁর শেষ কাব্য-গুলিতে যতটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সুস্পষ্ট অর্থ হয়ত সাধারণ পাঠক সর্বদা ধরতে পারে না, কিন্তু তার সুগভীর রহস্য পাঠকের সমগ্র চেতনাকে অভিভূত করে। যিনি যুগে যুগেই নূতন, যুগে যুগেই প্রথম, সেই বিরাট অজানার আভাষ আমাদের সংকীর্ণ জীবনে কোন এক রন্ধ্রপথে যেন কবিতাগুলি এনে দেয়।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কী বিস্ময়, কী অনন্ত রহস্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের দিকে চেয়েছিলেন—তাই ভাবি আর বার বার আবৃত্তি করিঃ—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

(শেষ লেখা, ১৩)

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসর

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতনের সেই সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমিও একজন যার জীবন সুরু হয়েছিল এখানে এবং শিক্ষা দীক্ষা রুচিবোধ সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠেছে এখানকার আবহাওয়ায়। এই আশ্রমই হয়েছে আমার জীবন গড়ে তোলবার একমাত্র অবলম্বন, যে আশ্রম সম্পূর্ণরূপে গুরুদেবের হাতে তৈরী। জীবনের আরম্ভে গুরুদেবকে আমরা পেয়েছি সব সময় আমাদের মধ্যে। কিন্তু তখন খুব নিকট থেকে তাঁকে জানবার বুদ্ধি হয়নি, তত সুবিধাও ছিল না। যখন বড় হয়ে উঠলাম, তিনি নিজের হাতে আমাকে তৈরী করতে লাগলেন, তাঁর বহুবিধ কর্ম্মজীবনের একদিকে আমাকে চালনা করার ইচ্ছায়। তাঁর সৃষ্টি, নাচগান, অভিনয়-উৎসবের কাজে তিনি আমাকে লাগিয়েছেন। সেই সূত্রে তখন থেকেই তাঁর নিকট সাহচর্য পেয়ে এসেছিলাম। কত রকমে তাঁকে এদিক থেকে দেখেছি, সব কথা আজ স্মরণেও আসে না। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ বৎসরটি আমার কাছে ভুলবার নয়।

গুরুদেবের এই বৎসরটিকে নানাজনে নানাভাবে দেখেছেন, এবং লোক সমক্ষে তাঁর এই দিনগুলির কথা প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। এই রোগক্লান্ত দিনে দেহে শ্রান্তি এলেও মনোজগতে তাঁর ক্লান্তি এসেছিলো সামান্য। সেই জন্যে কাজ করে যেতে পেরেছেন তিনি নানাদিক থেকে। সৃষ্টির উৎস যে বন্ধ হয়নি তারতো পরিচয় আমরা পেলাম তাঁর এই এক বৎসরের নানাপ্রকার লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁর পাশে যাঁরা দিন রাত সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা গুরুদেবকে নানাভাবে দেখেছেন। এবং তখনকার তাঁর কর্ম্মজীবনের অনেক কিছু খবরও রাখেন। আমার সঙ্গে তাঁর যে যোগ-সৃষ্টি হয়েছিল গানে অভিনয়ে নৃত্য উৎসবের ভিতর দিয়ে তা বরাবরই অবিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। এ পথে তাঁর জীবনের শেষ বৎসরটি কিভাবে কেটেছিল সেদিক থেকে একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। এই বৎসরের সঙ্গে তাঁর জীবনের আনন্দ বেদনার অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে আমিও জড়িত ছিলাম। আনন্দও তাঁকে দিয়েছি, আবার আমিই তাঁর কাছে দুঃখের কারণও হয়েছি। সে সব কথা বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর এই জীবনের যে দিকটা সকলের কাছেই আনন্দের হবে, সে দিক থেকে কিছু বলা হয়তো চলে।

এই বৎসরটি রবীন্দ্রনাথের কাছে একদিক থেকে বড়ই দুঃখের ছিল বলে মনে করি। ১৩৪৭ সালে পুজোর সময় অসুখের প্রথম ধাক্কা সামলে নেওয়ার পর দেখা গেল তাঁর শারীরিক শক্তি প্রায় শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হোলো, মন ও বুদ্ধিতে একটুও জড়তা দেখা দেয়নি। উভয়ই ছিল সজাগ ও সতেজ। শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল; বাঁ কানে শুনতে পেতেন, ডান কানে পেতেন খুব কম, তাই সকলে চেঁচিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতো। হাতের শক্তি কমে এসেছিল তাই অপরকে দিয়ে লেখাতেন। এ জন্যে অসুবিধাও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। নিজের গৃহে সেবক সেবিকাদের হাত ছাড়া হয়ে একটুক্ষণ তাঁর পক্ষে কাটানো সম্ভব ছিলো না, কারণ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিয়মাবদ্ধ।

তিনি ছিলেন চিরকাল গানে পাগল। গান গেয়েছেন, রচনা করেছেন, সকলকেই গাইয়েছেন, কিন্তু এই অসুস্থতার সময় তাঁর শ্রবণ শক্তি কমে আসায় গান শুনতেও অনেক বাধা পেতেন। গান রচনা করার উৎসাহ পেতেন না, কিন্তু শোনবার



জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতেন। ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে প্রায়ই সন্ধ্যার অবসরে তাঁকে গান শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিজেও গেয়েছি। সব সময় আনন্দ দিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ হয়। গান শোনাতে গিয়ে বাঁ পাশের কানের কাছে বসতাম কারণ তা না করলে ভালোকরে শুনতে পেতেন না।

নিজে থেকে গান শোনাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করতেন। তাঁর চিরকালেরই স্বভাব ছিল নিজের আনন্দ বা সুবিধার জন্যে অপরের সাহায্য না নেওয়া। নিজের দেহের সেবার জন্যে সুস্থ শরীরে, অপরের সাহায্য গ্রহণ করা গুরুদেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমাদের শিশু বয়সে তাঁকে দেখেছি নিজের কাজ প্রায় সবই নিজে করেছেন। তখন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতো মাত্র একটি ভৃত্য। পাছে নিয়মিত গান

শোনাবার দায়িত্বে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এ আশংকায় • তিনি বলতেন—"তোদের যখন সুবিধা হয় আসিস্"। আমরা নিয়মিত তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি, নানাপ্রকার বাধা পড়েছে তাতে। তাঁর ইচ্ছার প্রতি তখন গুরুত্ব দিইনি। মৃত্যুর পরে সে ভুল বুঝেছি, তখন মনে হয়েছে এটাই ছিল আমাদের বড় কর্তব্য। শত বাধা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে গান শোনানো আমাদের উচিৎ ছিল। তাই মৃত্যুর পর যখন নিয়মিত তাঁর পুণ্য স্মৃতি স্মরণার্থে প্রতিদিন আমরা অতি ক্ষুদ্র একদল জড়ো হতাম তাঁর বাসস্থানে, তখন মনে করেছি হাজার বাধা থাক্লেও গান আমাকে গাইতেই হবে যতদিন স্মরণের আয়োজন চলবে। প্রাণপণে তা পালনের চেষ্টা করেছি।

তাঁর কাছে গাইবার জন্যে ফরমাস পেতুম যৌবনে রচিত গানগুলি থেকে। সেগুলিই ছিল তাঁর জীবনের খুব প্রিয় গান। নমুনা স্বরূপ তাঁরই কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করি।

(১) আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে। (২) মরিলো মরি আমায় (৩) তোমার গোপন কথাটি। (৪) কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ। (৫) হেলা ফেলা সারা বেলা। (৬) আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলিবে। (৭) বড়বেদনার মত বেজেছো তুমি হে। (৮) আমার মন মানে না ইত্যাদি। প্রায়ই বলেছেন এই সময়ের গান-গুলি মনে যে ভাবে স্থান পেয়েছে এমন পরজীবনের গানে আর হয়নি। এ জীবনের গান আমাদের মুখে শুনে তাঁর অনেক সময় নতুন ঠেক্তো, পরিহাস করে বলতেন, "একি আমারই রচনা? আমি তো মনেই করতে পারি না যে কবে আমি এ গান রচনা করেছি। তবে শুনে মনে হচ্ছে আমারি, কারণ এ ধরণের রচনা বোধ হয় আমার সঙ্গেই মিলবে।" উপরের গানগুলি লক্ষ করে সেই সব দিনের বর্ণনা করতেন। একটি রাত্রির বর্ণনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলতেন কি রকম পাগলের মত এ সব গান গেয়ে তাঁর সময় কাটতো। সেদিনের কলকাতা এত শব্দ-মুখর ছিল না, বিজলী বাতীর রোস্নাইও তখন দেখা দেয়নি। শহরে সে দিনের পূর্ণিমা রাতের সঙ্গে আজকালকার পূর্ণিমা রাতের ছিল অনেক তফাৎ। পূর্ণিমার চাঁদের আলো তখনকার সেই শহরে বহু গুণে সার্থক হোতো। শহরে থেকেও তার মাধুর্য উপভোগ করার খুব ব্যাঘাত হোতো না। এই রকমের পূর্ণিমা রাত্রে, খালি গায়ে, পাতলা একখানি উড়নি কাঁধে ফেলে, গ্রীষ্মের দক্ষিণ বাতাসে তেতালার ছাদে পায়চারী করেছেন একলা অনেক রাত পর্যন্ত। চারিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নার মাধুর্যে ভরে থাকতো। চাদরের এক কোণে বাঁধা থাকতো বেল ফুলের কুঁড়ি। সেই গন্ধে চারিদিক ভরে যেতো। তখন গান গেয়েছেন প্রাণ খুলে, সমস্ত পাড়া সেই গানে গমগম করে উঠতো। তিনি বলতেন, সেই গলা একবার পেয়ে আবার হারানোর মত দুঃখ আর কিছু হতে পারে না।

রোগ শয্যায় গান শোনাতে গিয়ে গানের নানা বিষয়ে প্রায়ই কিছু না কিছু আলাপ আলোচনা হোতো তাঁর সঙ্গে। ছোটকালের কত রকমের গান গেয়ে শোনাতেন—তাঁর গুরু বিষ্ণুর শেখানো গ্রাম্য ছড়ার গান, তারই দুয়েকটি তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর ছেলেবেলায় পুস্তকে। আলোচনা প্রসঙ্গে এটুকু বুঝেছি যে, তিনিও মনে করতেন তাঁর সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি নিয়ে যতখানি আলোচনা হয়েছে তাঁর গান নিয়ে সে রকমের আলোচনা এখনো হয়নি। তাঁর গানে আলোচনা করবার যে অনেক কিছু আছে সেটা তিনি অনুভব করতেন, কিন্তু নিজের রচনার প্রতি নিজের স্বাভাবিক একটা সংকোচ ছিল। সেই কারণে নিজের গানের বিষয় নিয়ে খুলে আলোচনা করেন নি একেবারেই। তাঁর গান ভারতীয় সংগীতে কতখানি নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য দান করেছে খুঁটিয়ে তিনি ভাবেননি, কিন্তু এটুকু জানতেন যে, সমগ্রভাবে এমন কিছু তৈরী হয়েছে যার থেকে বর্তমান রচয়িতারা যেভাবে সাহায্য পাচ্ছে ভবিষ্যৎ যুগেও তা পাবে। আলোচনা হলে এর শক্তি কতদূর সে কথা বোঝা যাবে, এই জন্যেই তিনি আলোচনা হোক তাই চাইতেন। দুঃখের বিষয়, অন্য সংগীত ত দূরের কথা কেবল ভারতীয় সংগীত নিয়ে সমগ্রভাবে আমাদের দেশে কতটুকুই বা আলোচনা হয়েছে এ পর্যন্ত। উচ্চ শ্রেণীর মার্গ সংগীতে যদিও বা কিছু হয়েছে; কিন্তু দেশী বা লোক-সংগীত যে আলোচনার বস্তু এখনো পর্যন্ত সে সুবুদ্ধি আমাদের দেশের কোন সমা-লোচকের মধ্যে সত্যি কি জেগেছে? সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গানের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য শীঘ্র না ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই অসুস্থ অবস্থায় প্রথম আমি দেখলাম গ্রামোফোনের সাহায্যে অন্যের গলায় গাওয়া নিজের রচিত বাঙলা গান শোনবার ব্যবস্থা তাঁর জন্যে করা হয়েছে। পূর্বে রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ডগুলি অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্যে রেকর্ড কোম্পানী তাঁকে গান শুনিয়েছে। কিন্তু এভাবে গান শোনার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার ব্যবস্থা আগে হয়নি। যদিও ভালো লাগতো না এবং বলতেন, গানগুলি কানে বড় কর্কশ লাগে। কিছুক্ষণ শুনে বন্ধ করে দিয়েছেন।

যে কারণেই হোক তাঁর মনে ধারণা হয়েছিলো যে, গান বাজনায় আগেকার মত মাথা তাঁর খোলে না। গান রচনার কথা উঠলেই বলতেন "তুইতো বলিস্, কিন্তু সে সামর্থ্য বা বুদ্ধি কি আমার আছে, গলা দিয়ে সুর বেরুতে চায় না।" এই রকম মানসিক অবসাদের ভিতরেও গান রচনার বেগ চেপে রাখ্তে পারেন নি। কয়েকটি গান রচিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্বের ন্যায় সে রকম গানের প্রবাহ আর দেখা দেয়নি। তাঁর একটা প্রধান কারণ মানসিক পরিশ্রম। সুর যোজনা করা, সেই সুর মনে করে শেখানোতে যে পরিশ্রম হয় তার অর্ধেক পরিশ্রম কবিতা রচনায় তাঁর হোতো না। শুনেছি রোগশয্যায় কবিতা অনর্গল ধারে আপনা হতে বের হোতো, ভাষা ও ছন্দ এক যোগে। রুগ্নদেহে যখন লিখ্তে পারতেন না তখন প্রায়ই অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙতে তাঁর সদ্য প্রকাশিত কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে, সেবক সেবিকারা প্রস্তুত হয়ে থাক্তেন সে কবিতা লিখে রাখবার জন্যে। মনের গহনে চিন্তার যে উৎস ফোয়ারার মত হঠাৎ উৎ-সারিত হোতো তার প্রকাশ বরাবরই কবিতা ও গানে বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে। গান অনেকখানি বাধা পেয়েছিল, কিন্তু কবিতা বাধা পায়নি শেষ পর্যন্ত। কত বড় স্বভাবজাত কবি ছিলেন বলে এ রকমের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। সেই জন্যে

তাঁর কবিতায় গানে আমরা পাই সহজ একটি আন্তরিকতার ছাপ, যা কেবল বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশ পায় না।

যদিও তিনি বলতেন তাঁর গানের বুদ্ধি হারিয়েছে, কিন্তু সেই বৎসরে পৌষ মাসে যে কয়টি গান রচনা করেছিলেন, তার ভিতরে সুর যোজনায় বুদ্ধির অভাব কিছু ঘটেছিল বলে অন্তত আমি মনে করি না। বলেছেন গলায় সুর খেলে না, অথচ গানে সুর যে পর্যন্ত ওঠানামা করেছে তাঁর আগের দিনের গানের তুলনায় অকৃতকার্যতার পরিচয় নেই। "উর্বশী" কবিতাটি অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে একটি সুন্দর গানে পরিণত হোলো। গানে সুর যোজনা করতে কষ্ট হোতো সেটি বুঝতাম যখন দেখতাম উঁচুতে সুর তুলে মাঝে মাঝে দুর্বলতার জন্য তাঁর কণ্ঠ অকৃতকার্য হোতো। জানি না আমারি ভ্রম কিনা। মনে হোতো যেন সেই না পারার বেদনা তিনি বিশেষভাবে চাপতে চাইছেন। কখনো বলে উঠতেন, "সুরটা বুঝতে পেরেছিস্ তো? ঠিক করে নিস্।" তখন নিজেও মনে বেদনা বোধ করেছি। ভেবেছি, যিনি সমগ্র জীবন এত গাইলেন এত রচনা করলেন, যাঁর গলার গান শোনার জন্যে এক সময় কত লোকেই না পাগল হয়েছে, আজ সেই মহাপুরুষের একি বিড়ম্বনা; অন্তরে গানের প্রেরণা সতেজ, কিন্তু কণ্ঠে নেই সেই স্বর সেই সামর্থ। এবং প্রতিদিন তিনি নিজে সেই অসমর্থতাকে বিশেষভাবে অনুভব করে তাকে মেনে নিয়েছেন। এই কারণেই আগের মত গান রচনা করার কথা বলে তাঁকে দুঃখ দিতে কষ্ট বোধ হোতো। তাঁকে গান শোনাতে গিয়ে বিশেষ ভাবনা হোতো যখন তিনি গানের আনন্দে নিজেই গান গেয়ে উঠতেন। অল্পক্ষণ গেয়ে বার্ধক্য-কম্পিত, রোগ-দুর্বল কণ্ঠ শ্রান্ত হয়ে পড়তো। যেদিন শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত সবল থাক্‌তো সেদিন হয়তো আরো বেশীক্ষণ আপন মনে সেই সব আগের দিনের গান গেয়েছেন। কখনো ব্রহ্ম সংগীত, কখনো হিন্দি গানের কয়েক লাইন, কখনো বিনা কথায় কেবল সুর ভেঁজেছেন, আবার কখনো নিজের রচিত পুরানো গান গেয়েছেন। শুনে বোঝা যেতো আজকে তাঁর শরীর ও মন সুস্থ আছে। পরিহাসচ্ছলে দৌহিত্রী নন্দিতা দেবীকে দেখিয়ে বলতেন—"গাইতে লজ্জা হয়, পাছে এরা সব আড়ালে হাসে, আমার বেসুরো গলার গান শুনে।"

অসুস্থ শরীরে অভিনয় ও নাচ গানের মহলায় তিনি যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু মন তার সব সময় থাক্‌তো সেই দিকে। পৌষ মাসে (১৩৪৭ সাল) "শাপমোচন" হোলো, সেই অসুস্থতার মধ্যে নাটকের অদল বদল ক'রে, নতুন কথা বসিয়ে, গান রচনা করে, তবে নিশ্চিন্ত হলেন। মহলার সময় পাশের ঘর থেকে শুনতে চেষ্টা করতেন কি রকম হচ্ছে গান বাজনা। সেখানে এসে আমাদের মধ্যে বসে সেই মহলায় যোগ দিতে না পারায় তাঁর মনে অসোয়াস্তি ছিল খুব। অভিনয়ের চেয়ে প্রতিদিনকার মহলাতেই তিনি বেশী আনন্দ পেতেন। কারণ ধীরে ধীরে একটা সৃষ্টি কেমন করে চোখের সামনে গড়ে উঠছে তা দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। কোনদিন হয়তো নিজেই এসে উপস্থিত হতেন রিহার্সালের আসরে। অভিনয়ের দিন তাঁকে আগেই বলে রাখা হোতো শরীরে এতটুকু ক্লান্তি বোধ করলেই যেন বলেন তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে। কিন্তু সম্ভব হোতো না। দেহের শক্তিতে না কুলালেও জোর করে বসে থাক্‌তে চাইতেন শেষ পর্যন্ত।

এই বৎসরেই বসন্তোৎসবের সময় "নটীর পূজা"য় সে ঘটনা ঘটেছিল। অভিনয়ের দিন আমরা আগেই আশংকা করেছিলাম সব কথা হয় তো কানে শুনতে পাবেন না ক্লান্তি বোধ করবেন অথচ শেষ না হলে উঠেও যাবেন না। হোলোও তাই, সব কথা তাঁর কানে পেঁছয় না, এবং অসুস্থ শরীরে অতক্ষণ সেখানে বসে থাকাও বিপদজনক। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠে আমাকে ডেকে বললেন—"এত গান এ নাটকে কেন দিয়েছিস্, খুব ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে, সব বাদ দিয়ে দে"। তখনি অনুমান করলুম ব্যাপারটা কি। সেদিন সম্পূর্ণ নাটকটি অভিনীত হোলো না। অনেক বাদ দিয়ে শেষ করলাম। পরে তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লাম গানের সংখ্যা প্রথম বারের অভিনয়ের চেয়ে অনেক কমিয়েছি। এর চেয়ে কমালে দর্শকের কাছে ভালো লাগবে না। পরের দিনের অভিনয়ে আর সংক্ষেপ করতে বলেন নি, সম্পূর্ণ নাটকটিই অভিনীত হয়েছিল।

গত বৎসর নববর্ষে আমরা নাচ গান ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত, কারণ নববর্ষকেই আমরা গত কয় বৎসর ধরে গুরুদেবের জন্মদিনরূপে পালন করে উৎসবের আয়োজন করতাম। দিন তিন চার পূর্বে সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গেছি। বারান্দায় বসে তাঁকে কিছু গান শোনানোর পর, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এলেন। তাঁকে দেখে নববর্ষের অভিভাষণ "সভ্যতার সংকট"-এর বিষয়বস্তুটি মুখে বর্ণনা করে গেলেন। অমিয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানবার জন্যে। লেখাটি কয়দিন আগেই শেষ হয়েছিল। বক্তব্য আরম্ভের পূর্বে বললেন যে, হয়তো আর বেশী দিন তাঁর এ বলার সামর্থ থাক্‌বে না এমন কি আর হয়তো বলবার সুযোগও হবে না, সুতরাং এবারেই তাঁর শেষ বক্তব্য দেশের কাছে বলে চুকিয়ে দেবেন। সেই হবে তাঁর পয়লা বৈশাখের বাণী। সমস্ত বক্তব্য বিষয়টি ধীরে ধীরে বলে গেলেন, আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনলাম শেষ পর্যন্ত। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাস্তায় কেবল এই চিন্তাই করলাম যে, শুনেছি গুরুদেবের অন্তরে অনেক সময় ভবিষ্যত জীবনে কি আসবে সেই অনুভূতি জাগত। তিনি বুঝতে পারতেন অদূর ভবিষ্যাতে কি ঘটবে। এ বিষয়ে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের* ১৯১৩ সালে লেখা একখানি চিঠিতে বিদেশের সমুদ্রে গুরুদেবের নববর্ষ পালনের কথা উল্লেখযোগ্য। গুরুদেব তখন বিলেতে, আমার পিতৃদেবও সেই সময় সেখানে এক কলেজের ছাত্র। তিনি সেই ঘটনাটি এইভাবে লিখেছিলেন।

"গুরুদেব সমুদ্রের উপর নববর্ষের উৎসব করেছেন। খুব ভাল হয়েছিল। তিনি খুব অনুপ্রাণিত হয়ে সে কথা বলেছিলেন। বললেন, 'আমার মনে হচ্ছিল একটা সীমাহীন উদার পথে বের হয়েছি। প্রতি নববর্ষে আমি সমগ্র বৎসরের একটা আভাষ পাই। রথীর মার যে বৎসরা মৃত্যু হয়, সেবার নববর্ষে উৎসব

* কালীমোহন ঘোষ

† ১৯০২ সাল, ৭ই অগ্রহায়ণ

জন্মেছিল। উপাধ্যায় * প্রভৃতি নববিধানের সব উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার মনে কেমন একটা ভাব হল। আমি বুঝলুম যেন এ বৎসরে একটা মৃত্যু আছে। আমি রথীর মাকে ঘরে নিয়ে বললুম যে, এ বৎসর একটা মৃত্যু আসছে। একটা মৃত্যুর চেহারা সম্মুখে রেখে আমাদের চলতে হবে, প্রস্তুত হতে হবে। তারপর তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে শিলাইদহ থেকে তাঁকে যে পত্র লিখেছিলুম, পড়ে দেখি সেই পত্রেও মৃত্যুর আভাস তাঁকে জানিয়েছিলুম। আমি নববর্ষটাকে বিশেষ ভাবে দেখি। এবার সমুদ্রে দেখলুম—সম্মুখের নববর্ষে আমার সেই বিশালের মধ্যে যাত্রা, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়ে।"

গত নববর্ষের বাণীর ভিতর দিয়ে দেশের প্রতি যে আশার বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন, আমার মনে হয় তিনি তাঁর অন্তরের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, অদূরে ভবিষ্যতে দেশে কি আসছে। তখনি মনে মনে ঠিক করলাম গুরুদেব লিখে নববর্ষের দিন দেশের কছে বাণী পাঠাচ্ছেন অথচ গানের কোন বাণী দেবেন না তা হতে পারেন না। পরের দিন গিয়ে বললাম, "নববর্ষের প্রভাতের বৈতালিকের জন্য একটি নতুন গান রচনা করতে কি আপনার কষ্ট হবে?" প্রথমে আপত্তি হোলো, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে তা বন্ধ রাখতে পারলেন না। বললেন, "সৌম্য † আমাকে বলেছে মানবের জয় গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে। সে বললো আমি যন্ত্রের জয় গান গেয়েছি, মানুষের জয় গান করিনি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি সেটাই হবে নববর্ষের গান।" সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী, তিনি গুরুদেবের কথা মত খাতা খুলে কবিতাটি আমায় কপি করে দিলেন। কবিতাটি একটু বড় ছিল। তাই দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম এত বড় কবিতায় সুর যোজনা করতে দেওয়া মানে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। একটু সুর দেবার চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না, বললেন "কালকে হবে"। পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষ পর্যন্ত বর্তমানে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি যে আকারে আমরা দেখছি সেইটুকু আকার সে গ্রহণ করলো।

গত ২৫শে বৈশাখ গুরুদেবের জন্মোৎসব নিয়ে সমস্ত বাঙলাদেশ যখন মেতে উঠলো, সেই উপলক্ষে কলকাতার একটি কর্তব্য সেরে এসে চট্টগ্রামে আর একটি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রওনা হবার কথা। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। তিনি বললেন ২৫শে বৈশাখের দিন এখানে কি হবে? কথাবার্তায় বুঝলাম সেই জন্মদিন উপলক্ষ করে কিছু নাচ গান ইত্যাদির আয়োজন হোক, এই তাঁর ইচ্ছা। কারণ নাচ গানের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি জানতেন যে, এই একটা উপলক্ষ করে নাচ গানের আয়োজনে আমরা মন দেবো।

জন্মদিনের আগে একদিন সন্ধ্যায় প্রশ্ন করি "উৎসবের সময় 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে' গানটি কি গাইবো?" তাঁর জন্মদিনের গানের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে আপত্তি করে বললেন "তুই বেছে নে, আমার জন্মদিনের গান আমি বেছে দেব কেন।" একটু পরে উপরের গানটি উল্লেখ করে কিছুক্ষণ অনেক কথা বলে গেলেন। কথার ভাবে সংক্ষেপে একথা বুঝেছিলেম যে, দেশ তাঁকে সম্পূর্ণ চিনল না এই অভিমান তখনো তাঁর মনে বেশ রয়েছে। বলেছিলেন, "আমি যখন চলে যাবো তখন বুঝবে দেশের জন্যে কি করেছি।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" গানটি প্রাণের আবেগে গেয়ে উঠলেন, কিছুক্ষণ গেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বুঝলাম দেশ তাঁকে না বোঝার অভিমানে যতই রাগ করুন না কেন, দেশের প্রতি ভালবাসা তাঁর একটুও কমেনি। আমরাও ত জানি দেশকে তিনি কতখানি ভালবাসতেন এবং দেশবাসীর উন্নতি ও তাঁর সম্মানের জন্যে কতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যদিও দেশের একদল বরাবরই তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে চলতে না পেরে তাঁকে অবজ্ঞা করেছে, কিন্তু আর একদল তাঁর চিন্তায় পাগল ছিল প্রথম থেকেই। শুনতে পাই দেশের প্রতি এই অভিমান করার কতগুলি গুরুতর কারণ তাঁর মধ্য জীবনে ঘটেছিল; যার দ্বারা তিনি অত্যন্ত গভীর আঘাত পেয়েছিলেন মনে। প্রকৃত কারণ দেশের কাছে প্রকাশ করেন নি, বরাবর চেপে এসেছেন।

পরের দিন সকালে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি নিজের জন্মদিন উপলক্ষে কবিতা লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ একটা গান রচনা করলেন না এটা আমার কাছে ঠিক মনে হয় না। এবারের ২৫শে বৈশাখে সমস্ত দেশ আপনার জন্মোৎসব করবে, এই দিনকে উপলক্ষ করে একটি গান রচনা না হলে জন্মদিনের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না।"

শুনে বললেন, "তুই আবার এক অদ্ভুত ফরমাস নিয়ে হাজির করলি। আমি নিজের জন্মদিনের গান নিজে রচনা করবো, লোকে আমাকে বলবে কি! দেশের লোক এত নির্বোধ নয়, ঠিক ধরে ফেলবে যে, আমি নিজেকে নিজেই প্রচার করছি। তুই চেষ্টা কর এখানে যাঁরা আমার পরেই বড় কবি আছেন, তাঁদের দিয়ে গান লেখাতে।" বলেই তাঁদের নাম বলতে সুরু করলেন। আমি হাসতে লাগলাম, হাসি শুনে বললেন, "কেন তাঁরা কি কবিতা লিখতে পারেন না মনে করিস?" উত্তরে বললাম, "আপনি থাকতে অন্যদের কাছে চাইবার কি প্রয়োজন, যখন জন্মদিনের কবিতা লিখেছিলেন, তখন কি কেউ আপনাকে মন্দ বলেছিলো?" রাজী হয়ে জন্মদিনের কবিতাগুলি সব খুঁজে আনতে বললেন দপ্তর থেকে। "হে নূতন দেখা দিক আর বার"—কবিতাটির কয়েকটি অংশ একটু অদলবদল ক'রে সুর যোজনা করলেন, সে দিনটি ছিল ২৩শে বৈশাখ। পরের দিন সকালে পুনরায় গানটি আমার গলায় শুনে বললেন, "হ্যাঁ এবার হয়েছে।"

সেদিন একথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি এইটিই হবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান। এই বৎসরের যে কয়টি গান সব সমেত রচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছাড়া সব কটিতেই তিনি ভৈরবী রাগিণীকে ব্যবহার করেছেন। এমন কেন হোলো এই প্রশ্নই মনে এখন জাগে বার বার।

এই জন্মোৎসব রাত্রে সর্বক্ষণ তিনি নাচ গান অভিনয়ে

(শেষাংশ ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
† সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাময়িক প্রসঙ্গ

উপযুক্ত উত্তর—

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজাজীর প্রস্তাবের পক্ষে হইয়াছিল মাত্র ১৫ ভোট এবং বিপক্ষে হয় ১২০ ভোট। সুতরাং রাজাজীর অনিষ্টকর উদ্যমের জন্য তাঁহাকে আক্কেল সেলামী বেশ উপযুক্ত-ভাবেই পাইতে হইয়াছে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি শুধু রাজাজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্যই করেন নাই; ঐরূপ উদ্যমকে সুস্পষ্টভাবে এবং অভ্রান্ত ভাষায় তিরস্কৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল রাজাজীর প্রস্তাবের পাল্টা হিসাবে আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার আদর্শই কংগ্রেসের আদর্শ, সে আদর্শ যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়, কংগ্রেস তেমন উদ্যম কিছুতেই সমর্থন করিবেন না। রাজাজী তর্কের কূট-কৌশল খাটাইয়া কংগ্রেস কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু সে উদ্যমের ফলে তিনি উপহাসাস্পদই হইয়াছেন। তাঁহার তর্কের মূলে কোন যুক্তি ছিল না কেবল ছিল ক্যাংলামি। তাঁহার প্রধান যুক্তি হইল এই যে, কংগ্রেস এ পর্যন্ত মুসলিম লীগের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে নাই; এ জন্য কংগ্রেসের যত উদ্যম সব নিষ্ফল হইয়াছে, সুতরাং উদ্যমে সাফল্য লাভ করিবার জন্য এবারে পাকিস্থানী প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হউক। অর্থাৎ কংগ্রেসের আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে জিন্না সাহেবের বুট জড়াইয়া ধরাই কর্তব্য। মানসিক কতটা অধোগতি ঘটিলে মানুষ এমন নিলর্জভাবে আদর্শহীনতা স্বীকারে উদ্যত হয় ভাবিলেও মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কংগ্রেস যে আদর্শহীনতার এমন দীনতাকে উৎখাত করিতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

প্রতিপক্ষের পুষ্টিসাধন—

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর আত্মঘাতী উদ্যম যে অঙ্কুরেই কংগ্রেস দ্বারা কঠোর আঘাতে পিষ্ট হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়; কারণ, এই উদ্যমের ফলে ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেসের মধ্যে ভেদবুদ্ধি প্রসারলাভ করিয়া ইহা কংগ্রেসের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবে এই আশায় ব্রিটিশ রাজনীতিক মহলে আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারত সচিব আমেরী সাহেব উল্লসিত হইয়া উচ্ছাসভরে ইতি-মধ্যে বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্যের দেখ কেরামতি! ভূতপূর্ব শ্রমিক মন্ত্রিসভায় ভারত সচিব লর্ড ওয়েজউডও রাজাজীর উদ্যমের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, এতদিন পরে ভারতীয়দের মধ্যে একজন নেতার মত নেতা মিলিয়াছে বটে! যদি নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি রাজাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কিংবা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতার মর্যাদা অনুভবে এ সম্বন্ধে অবিলম্বে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন, তবে এ উদ্যমের বিষক্রিয়া বিভিন্ন ধারা ধরিয়া জাতীর রাষ্ট্রজীবনকে অভিভূত করিবার আতঙ্ক ঘটাইত। ভারতে নিজেদের স্বার্থকে কায়েম করিতে আগ্রহশীল ব্রিটিশ রাজনীতিক কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত হইতে এ সত্যকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে, কথার কারসাজীতে ভারতবাসীদিগকে ভুলাইবার দিন আর নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শের যিনি পরিপন্থী হইবেন, ভারতের জাগ্রত জনমত তাহার চক্রান্ত জাল ছিন্ন করিয়াই অগ্রসর হইবে এবং সে ক্ষেত্রে কোনরকম দৈন্য বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষীদের স্থান নাই। অন্তরে বল লইয়া যিনি এ পথে আগাইতে না পারিবেন, তাঁহাকে সরিয়া যাইতেই হইবে।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের কৈফিয়ৎ—

স্যার স্ট্যাফোর্ড তাঁহার দৌত্যের ব্যর্থতার সম্বন্ধে কিছু-দিন আগে পার্লামেন্টে এক বিবৃতি প্রদান করেন। সে বিবৃতিতে ভারতের নেতাদের উপরই তিনি দৌত্যের ব্যর্থতার দায়িত্ব আরোপ করেন। সেদিন বেতারযোগে তিনি এ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, এ বক্তৃতাতেও যথারীতি ভারতীয় নেতাদের উপরই দোষারোপ করা হইয়াছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড বলেন, ভারত রক্ষার দায়িত্ব এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের নিকট আমাদের প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেশরক্ষার যতটুকু অধিকার দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব, ভারতের কয়েক-জন বিশিষ্ট জননায়ক ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তদপেক্ষা অধিক এমন কি সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট দাবী করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধাপ্পাবাজী ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে এতাবৎকাল সমানভাবে খাটাইয়া আসিতেছেন, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদসুলভ সেই মনো-বৃত্তিতেই এখন অভিভূত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড এই বক্তৃতায় 'ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়' বলিয়া যাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন সম্প্রদায় নয়; ভারতের সকল সম্প্রদায়ের দাবী কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইলেই যদি তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা সম্প্রদায়ের দাবী হইয়া দাঁড়ায় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির বিরোধী

হয় আর সেই ব্রুটির অছিলায় সে দাবী স্বীকার করিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট রাজী না থাকেন, তবে সোজা কথায় ভারতবাসীদিগকে ইহা বলিয়া দেওয়াই ভাল যে, ভারতের জনমতের মূল্য দেওয়া কোনদিনই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কারণ ঐক্যবদ্ধ জনমত যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হউক না কেন, দীর্ঘ পরাধীনতার সংস্কারবদ্ধ এ দেশে অন্তত কিছু লোকের সঙ্গে মতে বিরোধ তাহাতে ঘটিবেই। ভারতবাসীদের হাতে ভারতরক্ষার কর্তৃত্বদান করিলে ব্রিটিশ জাতির পক্ষে ভারতরক্ষার দায়িত্ব লঙ্ঘন করা হয়, স্যার স্ট্যাফোর্ডের উক্তির অপরাংশের মর্ম ইহাই। এ যুক্তিও বড় অপূর্ব। ভারতরক্ষার দায়িত্ব প্রতিপালন করিবার জন্যই ভারতবাসীদের হাতে বর্তমানের এই সংকটে দেশরক্ষার অধিকার দান করা কর্তব্য; কারণ দেশরক্ষা করিতে হইলে সমগ্র ভারতবাসীর আন্তরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন এবং ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষার অধিকার দিলেই তেমন আন্তরিক সহযোগিতার উপযোগী আবহাওয়া দেশে সৃষ্টি হইতে পারে। ভারতরক্ষা বলিতে ভারতবাসীদিগকে চিরন্তনভাবে ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে অসহায় অবস্থায় রাখা নিশ্চয়ই নয় এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করিবার উপযুক্ত শক্তি যাহাতে ভারতে না জাগে এমন অবস্থায় ভারতবর্ষকে রাখাও হইতে পারে না। অথচ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের উক্তির তাৎপর্য তেমনই বুঝা যায়।

সাম্রাজ্যবাদের ভ্রান্তপথ—

পার্ল বাকের নাম অনেকে অবগত আছেন। সংবাদপত্রসেবী এবং সাহিত্যিক মহলে ইনি সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি চীন এবং ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'জাপানীদের যদি বুদ্ধি বিবেচনা থাকিত, তবে বিজিত চীনাদের প্রতি তাহারা সদ্ব্যবহার করিত। তাহারা চীনাদিগকে লুণ্ঠন না করিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থানেরই ব্যবস্থা করিত এবং সেই পথে জাপানীদের বৃহত্তর স্বার্থই সুরক্ষিত হইত; কিন্তু তাহারা যে পথে চলিতেছে তাহাতে জাপানীদের আচরণ সম্বন্ধে চীনা জাতি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে এবং জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিতে তাহারা মৃত্যুঞ্জয় সংকল্পশীলতা অবলম্বন করিয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভন এমনই যে, বৃহত্তর স্বার্থহানির পরিণামভয়াবহতা সেই প্রলোভনে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। জগতের সাম্রাজ্যবাদীরা যতদিন সেই প্রলোভনকে অতিক্রম করিতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত জগতে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেই থাকিবে এবং ইহাও সত্য যে, উদার এবং বলিষ্ঠ আদর্শে জগতের পদদলিত জাতিসমূহ যতদিন অনুপ্রাণিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের আত্মচৈতন্য লাভের পর্যাপ্ত অবসর সৃষ্টি হইবারও সম্ভাবনা নাই। জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চীনাদের দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী সংগ্রাম সে সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করিয়াছে। চীনের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণের আত্মদান সমগ্র জগতে মানবমহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের পশুবল আত্মদাতাদের সেই শক্তিকে কিছুতেই পিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না; প্রতিকূলতার চাপে সে শক্তি অধিকতর দুর্নিবার হইয়াই উঠিবে।

জীবন-যাত্রার সমস্যা—

বাঙলাদেশের সর্বত্র জীবনযাত্রার সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। লবণ এবং কেরোসিন তেল শহরে ও মফঃস্বলে সর্বত্র দুষ্প্রাপ্য বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। দিনের পরদিন যেভাবে নিত্য আবশ্যকীয় এই দুইটি জিনিসের দর চড়িতেছে তাহাতে অনেকের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে যে, কিছুদিন পরে বাঙলার গরীবের ভাগ্যে নুন-ভাত জোটা তো দূরের কথা ধনীর ভাগ্যেও তাহা দুর্ঘট হইবে। সরকার দর বাঁধিয়া দিতেছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারী সেই মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ইস্তাহার সংবাদপত্রের অঙ্গশোভা বাড়াইতেছে মাত্র। সে নির্দেশ গরীবের লবণ পাইবার সুবিধা কিংবা ভাঙ্গা ঘরে সাঁজের সময় বাতিটি দিবারও সুযোগ বাড়াইতে বিশেষ সাহায্য করিতেছে না। নির্ধারিত সরকারী মূল্যে বাজারে জিনিস মিলে না। যাহার আড়তে মাল আছে, তাহারা মনে করিতেছে মাল আটকাইয়া কিছুদিন রাখিতে পারিলে সুবিধা আরও বেশী হইবে। মোটা লাভের লোভে আড়তওয়ালারা গোপনে গোপনে মাল মজুত করিতেছে, ফলে বাজারে আমদানীতে টান পড়িতেছে, জিনিসই মিলিতেছে না। সম্প্রতি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ সমস্যার প্রতিকারের জন্য এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে, দোকানীকে মাল বিক্রয়কালে ক্রেতাকে ক্যাশ মেমো দিতে হইবে। সেই ক্যাশ মেমোতে সরকারী নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য লওয়া হইয়াছে, ইহা ধরা পড়িলে মাল বিক্রেতাকে কঠিন সাজা দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় খুচরা দোকানীদের অতিরিক্ত লাভের লোভকে সংযত করা কতকটা সম্ভব হইবে; কিন্তু মাল যাহারা গুদামজাত করিয়া বাজারে টান চড়াইতেছে, তাহাদের গায়ে কুশের আঁচড়ও লাগিবে না। যাহাতে বাজারে মাল সরবরাহ রুদ্ধ না হয়, তেমন ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত মূল্যে জিনিস বিক্রয়ের প্রতি কড়াকড়ি রাখা প্রয়োজন; শুধু একদিকে জোর দিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। লবণ এবং কেরোসিনের অভাব সমস্যার সঙ্গে বাঙলাদেশের মফঃস্বলে অনেক স্থানে এক নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলের অনেক জায়গাতে তামার পয়সা মেলা কঠিন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে রাজসাহী শহরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে কার্যত সর্বনিম্ন মুদ্রা দাঁড়াইয়াছে এক আনীতে। সমগ্র শহর ঘুরিয়া এক পয়সা দুই পয়সার জিনিস কেনা কঠিন ব্যাপার। আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি। সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এ সমস্যার সঙ্গে দেশের শান্তি ও স্বস্তি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

পরলোকে শরৎচন্দ্র রায়—

প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় পরলোকেগমন করিয়াছেন। ভারতীয় নৃতত্ত্বের সাধনায় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের দান উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে তিনি

একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির রীতি নীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতির সম্বন্ধে তিনি বহু মূল্যেবান তথ্যের আবিষ্কার করিয়া এদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের এই দিকটাই তাঁহার জীবনে প্রধান ছিল না, তাঁহার মধ্যে ছিল আর একটি জিনিস; প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসের আমাদের খুবই অভাব। আরণ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের এইসব আদিম অধিবাসীদের প্রতি তাঁহার অন্তরে একটি প্রীতির ভাব সর্বদা বিদ্যমান ছিল। ইহাদের কোথায়ও মান নাই, মর্যাদা নাই, ইহারা উপেক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই অত্যাচারিত হইয়া থাকে। রায় মহাশয় অন্যায় এবং অবিচার হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা একাধারে একজন পণ্ডিত এবং প্রেমিক পুরুষকে হারাইয়াছি। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মান্দালয়ের পর—

ব্রহ্মের দ্বিতীয় শহর মান্দালয়ের পতন হইয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে জাপানী সেনারা আগাইয়া গিয়া পশ্চিম দিকে লাসিও দখল করে। ইহার ফলে লাসিও হইতে মান্দালয়ের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়; তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, মান্দালয় রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। লাসিওর পতন, তৎপরে মান্দালয় শহরে জাপানীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে উত্তর ব্রহ্মের রণাঙ্গনে সম্পূর্ণ একটা নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। জাপানী সেনারা লাসিও হইতে আরও উত্তর দিকে আগাইয়া যাইতেছে। চীন ও ব্রহ্মের সীমান্তদেশ জুড়িয়া বসাই হয়ত তাহাদের অভিপ্রায়; কিন্তু এ উদ্যমে তাহাদের অনেকটা ঝুঁকি লইতে হইয়াছে; কারণ মান্দালয়ের দক্ষিণ দিকে চীনা সেনারা এখনও রহিয়াছে। ইহারা অগ্রগামী জাপ সেনাদের সংযোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে; ইহাতে জাপানীদিগের বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু জাপানীরা এ ঝুঁকি লইয়া উত্তর ব্রহ্মে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের বোধ হয় এই অভিপ্রায় যে, তাহারা পশ্চিম দিকে আগাইয়া গিয়া ইরাবতীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীকে ঘুরিয়া পার্শ্বদেশ দিয়া আক্রমণ করিবে। বর্তমানে তিন দিক দিয়া জাপানী সেনারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতে পারে। প্রথমত, মান্দালয় হইতে ভামো হইয়া মণিপুরের অভিমুখে, দ্বিতীয়ত, আরাকানের দিকে, তৃতীয়ত, মির্টকিয়ানী হইয়া উত্তর আসামের দিকে। জাপানীরা সেদিন আকিয়াবে বোমা বৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, চীনা সেনাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইয়া তাহারা কোনক্রমেই বর্তমানে ভারত আক্রমণে উদ্যোগী হইবে না। ভামো হইয়া মণিপুরের পথ ছাড়া, অন্য সব পথই দুর্গম; বিশেষত সম্মুখে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল। বর্ষা আসিয়া পড়িতে যে সময়টুকু আছে, সেই সময়ের মধ্যে জাপানীরা ভারতের সীমান্তভাগে অগ্রসর হইবে এবং শুধু তাহাই নহে, পশ্চাৎভাগে সংযোগসূত্র সুদৃঢ় করিয়া সমগ্র বাহিনীকে আগাইয়া আনিবার মত সুবিধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয় না এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় করা সম্ভব হইবে।

এলাহাবাদের সিদ্ধান্ত ও মহাত্মাজী—

অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। শুনা যাইতেছে এলাহাবাদের নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে অনুষ্ঠিত ব্যাপারে মহাত্মাজী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষের কারণ কোথায় খোঁজ লইতে গেলে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর পাকিস্থানী প্রস্তাবের কথাই সাধারণের মনে উঠিবে। মহাত্মাজী অবশ্য এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা এখনও ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মহাত্মাজীর একজন অন্তরঙ্গ পুরুষ এবং নেতাদের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত মহাত্মাজীকেই সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়া থাকেন। সর্দারজীও শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব সম্বন্ধে এখনও নীরবতা রক্ষা করিতেছেন। মহাত্মাজীর মতামতের অপেক্ষাই সর্দারজী এবং মাদ্রাজী নেতা সত্যমূর্তির এ সম্বন্ধে নীরবতা রক্ষার প্রধান কারণ বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। মহাত্মাজী আগাগোড়াই বিনাসর্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলনের পক্ষপাতী। তাঁহার সাদা চেকে সহি দিবার কথা সকলেরই স্মরণ আছে। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে জন্য মিলন, সেই স্বাধীনতার আদর্শকে উৎখাত করার জন্যই জিন্না সাহেব এবং তাঁহার চেলার দল বায়না ধরিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তের ক্রীড়নক-স্বরূপেই কাজ করিতেছেন। জিন্না সাহেবের দাবীকে সমর্থন করা আর ভারতবর্ষের চিরপরাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া একই কথা। মহাত্মাজী আধ্যাত্মিক উর্ধ স্তরে উঠিয়া স্বাধীনতার আদর্শের বিনিময়েও মোস্লেম লীগের সঙ্গে মৈত্রীকে বড় বলিয়া বুঝিয়া ফেলিতে পারেন; কারণ ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত থাকে। কিন্তু আমরা সাধারণ জীব। অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় এবং সেই আদর্শ বজায় রাখিতে গেলে জনকয়েক প্রতিক্রিয়া-শীল ব্যক্তির সঙ্গে প্রেম যদি পাকা না হয় এবং ঐক্য যদি শিথিল হইয়াও পড়ে, আমরা তেমন ঝুঁকি লইতেও শঙ্কিত নহি। সর্বান্তঃকরণে সে ঝুঁকি লইয়াই স্বাধীনতার সঙ্কটসঙ্কুল পথে আমরা অগ্রসর হইব। স্বাধীনতার পথ কুসুমে আবৃত থাকে না এবং সকলের সঙ্গে প্রেম বজায় রাখিবার ভাব লইয়াও সে পথে চলা সম্ভব নহে।

গ্রামরক্ষী বাহিনী—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠনের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করিয়াছেন। আমরা এইরূপ

রক্ষীদল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা অনেক দিন হইতেই বলিতেছি। অস্ত্রের অধিকার আমাদের নাই; লাঠিকেই আমাদের প্রধান অস্ত্রস্বরূপে এই রক্ষা কার্যে অবলম্বন করিতে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। গত্যন্তর নাই, ইহা বুঝি। তবে রক্ষী বাহিনীতে যাঁহারা যোগদান করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা হারে কয়েকজনকে বন্দুকের লাইসেন্স হয়ত দেওয়া চলিতে পারে। এদেশের পল্লী-অঞ্চলে যাঁহাদের বন্দুক আছে, তাঁহারা অনেকেই শুধু পাখী শিকারের সখ মিটাইবার জন্য বন্দুক রাখিয়া থাকেন, পাশের বাড়িতে চোর-ডাকাত পড়িলে এই সব বন্দুকধারী বীরেরা বিছানার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ধরণের ভীরুদের নিকট হইতে বন্দুকের পাশ কাড়িয়া লইয়া যাঁহারা রক্ষী বাহিনীতে যোগদান করিবেন, তাঁহাদিগকেই উহা দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যেকটি গ্রামকে লোকসংখ্যানুপাতে কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া এই-ভাবে বন্দুকের পাশ উৎসাহশীল কর্মীদিগকে দিতে পারিলে গ্রামের রক্ষা-ব্যবস্থা অনেকটা উন্নত হইতে পারে। ধন রক্ষার জন্য বড়লোকদের বন্দুকের প্রয়োজন আছে, আমরা এ কথা অস্বীকার করি না; কিন্তু যাঁহারা তেমন ধনী নহেন, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে উৎসাহী কর্মীদের হাতে বন্দুক দিবার ততোধিক প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ভয়-কাতুরে কয়েকজন বড়লোকের বাড়িতে বন্দুক থাকিলে গ্রামবাসীদের প্রাণের ভয় দূর হয় না। এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। গ্রাম অঞ্চলে চুরি-ডাকাতি ইতিমধ্যেই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা আশা করি, বাঙলা সরকার এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন।

সস্তায় কিস্তিমাৎ—

ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের দরকার আর দরকার ন্যাশনাল ফ্রণ্টের, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী নয়া দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে জলের মত করিয়া এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টও তৈয়ার, ন্যাশনাল ফ্রণ্টও প্রস্তুত, কেবল কংগ্রেসের নীতির দোষেই দেশের লোকে উহা পাইতেছে না। ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টই বা কাহাকে বলে এবং ন্যাশনাল ফ্রণ্টই হয় কোন বস্তুতে শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীর সে সম্বন্ধে জ্ঞান না আছে এমন মনে করা চলে না। তবু দেশের লোকের হাতে দেশরক্ষার ভার দিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পুরাপুরি অস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও রাজাজী এই দুই বস্তু মোসলেম লীগের দাবী মিটাইলেই কি হিসাবে মিলিবে মনে করিতেছেন, ইহা বুঝা কিছু দুষ্কর। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ তো স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতের সকল দল এক হইয়া দাবী করিলেও দেশরক্ষার কর্তৃত্ব আমরা দেশের লোকের হাতে দিব না। রাজাজী মাদ্রাজের বিশেষ অবস্থার কথা তুলিয়াছেন এবং বাঙলা, উড়িষ্যা ও আসামের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সে গুরুত্ব আমরাও অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু এই সব প্রদেশেও দেশরক্ষার কর্তৃত্ব কার্যকরভাবে দেশের লোকের পাইবার সম্ভাবনা তিনি দেখিলেন কোথা হইতে? আসামের অবস্থা তো তাঁহার চোখের উপর রহিয়াছে। সেখানকার আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থহীন মন্ত্রিমণ্ডল পরিচালিত হইবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জনমতানু-মোদিত শাসনতন্ত্র তথায় প্রত্যাহৃত রাখা হইয়াছে। ইহা কি সত্য নয় যে প্রয়োজন হইলে অন্যত্রও তেমনই রাখা সম্ভব হইবে? প্রাদেশিক কর্তৃত্ব ভারতবাসীদের হাতে নাই, কেন্দ্রের কর্তৃত্বও নাই। ঢাল নাই তলোয়ার নাই তবু সর্দারী করিবার সাধ! রাজাজী মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী হইয়া নিধিরামগিরি করিবেন এই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছেন না ইহাই হইল সোজা কথা। তাঁহার এই শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া কষ্ট হয়।

মাদাগাস্কারে ব্রিটিশ—

গত ৫ই মে ব্রিটিশ সেনা নৌবহরের সহযোগে মাদাগাস্কার দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। ভারত মহাসাগরে প্রবেশে দক্ষিণ দ্বার হিসাবে মাদাগাস্কার দ্বীপের বিশেষ মূল্য আছে। বহুদিন হইতেই এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছিল যে, জাপানীরা ভারত মহাসাগরের ভিতর দিয়া আগাইয়া গিয়া এই দ্বীপটি দখল করিবে এবং যদি তাহারা তাহাই করিতে সক্ষম হয়, তবে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারত মহাসাগরের মিত্রপক্ষের জাহাজের গতিবিধি বিপন্ন হইবে, পারস্য উপসাগর, ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ায় আটলাণ্টিক ঘুরিয়া ইংরেজ ও মার্কিনের সাহায্য পৌঁছিবার পথ থাকিবে না। দ্বীপটির এইদিক হইতে গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই ব্রিটিশ পক্ষ হইতে জাপানীদের পরি-কল্পনাকে ব্যর্থ করিবার নীতি হিসাবে দ্বীপটি অধিকার করা হইয়াছে। মাদাগাস্কার বর্তমানে ভিসি সরকারের অধীনে। মাদাগাস্কার দখলের ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারেরও যোগ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভিসি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এতদিন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের রাজনীতিক সম্পর্ক যেরকম ছিল, মঁসিয়ে লাভাল ফ্রান্সে কর্তৃত্ব লাভ করিবার পর তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে ভিসি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ইংরেজ ও মার্কিনের প্রতি-পক্ষতা স্পষ্ট আকার ধারণ করিতেছে। ব্রিটিশ পক্ষ হইতে মাদাগাস্কার অধিকারের এই নীতি ভারত মহাসাগরের নিরা-পত্তাকে বৃদ্ধি করিবে এবং ইহার ফল এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ও আফ্রিকার সামরিক পরিস্থিতির উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া মনে হয়।

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৩)

স্বদেশী যুগের ঊষা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আন্দোলন সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল কোন ঐতিহাসিকই এমন কথা বলিবেন না। কোন জাতির জীবনেই কোন বৃহৎ ঘটনা, কোন প্রচণ্ড যুগান্তকারী আন্দোলন অকস্মাৎ হয় না, তাহার পশ্চাতে দীর্ঘকালব্যাপী একটা সাধনার ইতিহাস নিশ্চয়ই থাকে। বাঙলার যুগান্তকারী স্বদেশী আন্দোলনের পশ্চাতেও যে এমনই একটা ইতিহাস আছে, তাহার পরিচয় ইতিপূর্বেই আমরা কিছু দিয়াছি। এইবার স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বের কথা—বিশেষভাবে ১৯০০—১৯০৫ এই কয়েক বৎসরের কথা বলিব। এই যুগের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'স্বদেশী যুগের ঊষা।' সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষার আগমন, তখনও রাত্রির অন্ধকার ভাল করিয়া কাটে নাই, লোক কোলাহল ভাল করিয়া জাগে নাই। তবে উদ্যোগ পর্বের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, পাখীর কাকলী শোনা যাইতেছে, পূর্বাকাশে অরুণের রেখা কেবল দেখা দিতেছে। বাঙলাদেশেও স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে এমনই একটা উদ্যোগ পর্বের যুগ আসিয়াছিল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন আরও কয়েকজন শক্তিমান পুরুষ।

কিন্তু ইঁহাদের কথা বলিবার পূর্বে আর একজন লোকোত্তর মহাপুরুষ—যুগনায়কের কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-মাতৃকার আদর্শ, আত্মত্যাগ ও কর্মযোগের সাধনা—যাঁহাদের মনের উপর অপারিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজয়ী ধর্ম-প্রচারক, হিন্দু সভ্যতার বার্তা তিনি পাশ্চাত্য জগতকে শুনাইয়াছিলেন, বেদান্তের ভেরী নির্ঘোষে ভারতবাসীর বহির্মুখী মন তিনি অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন, কর্মযোগ ও সেবাধর্মের মহিমা জাতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, এসব কথা সুবিদিত। কিন্তু স্বামীজীর জীবনের আর একটা দিক তাঁহার স্বদেশবাসীরা এখনও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার উপাসক—বীর্যবান স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহার ভিতরে যে তীব্র স্বদেশ প্রেম ছিল তাহার তুলনা নাই। যেন অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি। বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়া সেই আগুন তিনি সংযত করিয়া রাখিতেন, কিন্তু তবুও নানাভাবে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীতে—বিশেষত "পত্রাবলীতে" ইহার নিদর্শন ভূরি ভূরি রহিয়াছে। নবীন ভারতকে প্রধানত তিন দিক দিয়া তিনি স্বদেশ সেবার দীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথমত কর্মযোগ; তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, রজোগুণ ও কর্মযোগ না হইলে এই জীবন্মৃত জাতি বাঁচিবে না। দ্বিতীয়ত, ত্যাগ ও সেবার সাধনা। তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন নারায়ণ-জ্ঞানে দেশের জনসাধারণকে দীন, দরিদ্র,মূর্খকে সেবা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, "ছুঁৎমার্গের" পরিহার। যাহাদিগকে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয়,—অনুন্নত ও অবনত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিতে হইবে, নহিলে জাতির মুক্তি নাই। স্বামীজীর এই বিরাট আহ্বানে ঘুমন্ত জাতি সাড়া দিয়াছিল, কঙ্কালে প্রাণের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা আজ জোর করিয়াই বলিব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে স্বামীজীই জাতিকে নবজীবনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আনন্দমঠের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে সর্বক্ষেত্রে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই, যে হোমানল তিনি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহারই সঞ্জীবনী শক্তি উত্তর-কালে স্বদেশী আন্দোলনে অশেষ প্রেরণা দিয়াছিল। এক কথায় স্বামী বিবেকানন্দও স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অগ্রদূত। স্বদেশী যুগের ঊষার আবাহন যাঁহারা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার নাম সর্বাগ্রগণ্য।

১৯০০ সালে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে "বঙ্গদর্শন" পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই নব পর্যায়ের "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকত্বে একদিন "বঙ্গদর্শন" যেমন নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নব পর্যায়ের "বঙ্গদর্শন"ও তেমনি স্বদেশী যুগের আবাহনে অশেষ কার্য করিয়াছিল। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণোদ্যমে তাঁহার 'আত্মশক্তি'র মূলমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি যে পল্লী হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাও তিনি পাশ্চাত্য রাজনীতির মোহগ্রস্ত শিক্ষিত দেশবাসীকে শুনাইতে লাগিলেন। ভারতের অতীত গৌরব, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এই "বঙ্গদর্শনের" মধ্য দিয়াই প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তিনি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে যুবক ছাত্র সম্প্রদায়ের রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাহারা সর্বপ্রকারে তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহার কথায় উঠিত বসিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সেই সময়ে বাঙলার ভাব ও চিন্তা জগতের নেতৃত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই সভায় প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিতেন। সেই সমস্ত সভায় এত ভীড় হইত যে, বহু লোককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে এক একটি প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা ২।৩ বার সভা করিয়া করিতে হইত। তখনও বঙ্গভঙ্গ হয় নাই, স্বদেশী আন্দোলনও আরম্ভ হয় নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধের দ্বারা সেই সব ভাব-বিপ্লবের. বীজ পূর্ব হইতেই যুবকগণের চিত্তে বপন করিতে-ছিলেন।

এই সময়ে আর যে কয়জন শক্তিমান পুরুষ রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে যুবকগণের চিত্তে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিতে-ছিলেন, তন্মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হইবে। ই'হারা দুইজনেই "বঙ্গদর্শনের" লেখক ছিলেন। গৈরিকধারী তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবকে প্রথম যখন আলবার্ট হলের একটি সভায় দেখি* তখন মনে হইয়াছিল—এ যেন মূর্তিমান অগ্নিশিখা। স্বামী বিবেকানন্দের মত তাঁহারও দেহমনপ্রাণ স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল,—দেশের জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখিতেন ও বক্তৃতা করিতেন, তাহার এক একটি ছিল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ: দেশের চারিদিকে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং উভয়ে উভয়ের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে আত্মশক্তির সাধনা রবীন্দ্র-নাথের মূল মন্ত্র ছিল—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও ছিলেন তাহারই সাধক। তিনিও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা ভিক্ষার রাজনীতিকে ঘৃণা করিতেন। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায় ব্রহ্মবান্ধবের অশেষ দান, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের সহায়তা পাইয়াছিলেন, ব্রহ্ম-বান্ধবের নাম তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। স্বদেশী যুগের ঊষার আবাহনে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যে কত বড় কাজ করিয়া-ছিলেন, তাহার পরিমাপ করা কঠিন।

পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল ও বাঙলার চিন্তা ও ভাব জগতে এই সময়েই নেতৃত্ব করিতে আরম্ভ করেন। উপা-ধ্যায়ের মত তিনিও প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া যুবকগণের চিত্তে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতেছিলেন। কি ইংরেজীতে কি বাঙলায় তাঁহার মত বাগ্মী আমি আর দেখি নাই। শ্রোতৃ-বর্গের মন লইয়া তিনি যেন ইচ্ছামত খেলা করিতেন, ভাষার ঐশ্বর্যে ও ভাবের সম্পদে তাঁহার বক্তৃতার এমন একটা সম্মোহিনী শক্তি থাকিত যে, সকলে তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িত। বিপিনচন্দ্র "নিউ ইণ্ডিয়া" নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যুবক দলের মনের উপর এই পত্রিকাখানি যে কি অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র নূতন নূতন চিন্তা ও ভাবের অবতারণা করিয়া যুবক বাঙলাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন।

স্বদেশী যুগের এই ঊষায় আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটির" নাম বাঙলার জাতীয় জীবনে অমর হইয়া থাকিবে। এই "ডন সোসাইটি" ছিল স্বদেশসেবার পাঠশালা। দেশকে কি করিয়া সেবা করিতে হয়, স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার কোন পথে হইতে পারে আচার্য সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে ডন সোসাইটির সদস্যেরা সেই সব কথা লইয়া আলোচনা ও গবেষণা করিতেন এবং হাতে কলমে কাজ করিতেন। ১৯০২—০৩ সাল, তখনও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ডন সোসাইটির সদস্যেরা নিজেরা মোটা স্বদেশী কাপড় পরিতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। ডন সোসাইটির গৃহে তাঁত বসাইয়া গামছা, চাদর প্রভৃতি বোনা হইত, দেশলাই তৈরী করিবার চেষ্টাও হইত। ডন সোসাইটির "দি ডন" নামক একখানি মুখপত্র প্রকাশিত হইত এবং সদস্যেরাই উহা পরিচালনা করিতেন। ঐ পত্রে স্বদেশী শিল্প গঠন, পল্লী সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। আজ বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব প্রসিদ্ধ কর্মীকে দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তখনকার দিনে 'ডন সোসাইটির' সদস্য এবং আচার্য সতীশচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। 'ডন সোসাইটির' সঙ্গে আর্যা নিবেদিতা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যোগ ছিল এবং তাঁহারা সোসাইটির সভায় আসিয়া বক্তৃতা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ডন সোসাইটির হিতৈষী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। অনেক সময় সোসাইটির গৃহে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের সঙ্গে জাতি গঠনের নানা পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেন। সোসাইটির তরুণ সদস্যদের রবীন্দ্রনাথ দেশসেবার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, বক্তৃতা করিতেন। আমি সোসাইটির একজন নগণ্য সদস্য ছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার কথা আমার বেশ মনে আছে। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ধরিয়া পড়িলাম যে, তাঁহাকে একটি গান গাহিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুতেই রাজী হন না, পরে যুবকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পকেট হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া নূতন রচিত একটি গান করিলেন। যতদূর মনে পড়ে উহা রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান—

তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে।
একলা চল একলা চল
একলা চল রে।
যদি কেউ কথা না কয়,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
সবাই করে ভয়,
তবে মুখ ফুটে তোর মনের কথা
আপনি বল রে।

* * *

যদি কেউ না চায় ফিরে,
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে।
তবে বজ্রানলে,
তোর, বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
আপনি চল রে।

* সে সময়ে দারকোহার নামক ওয়াই. এম. সি-এর একজন পাদরী সাহেব হিন্দুধর্ম ও গীতার নিন্দা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তিকার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এলবার্ট হলের সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি ছিলেন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম বক্তা ছিলেন। প্রধান বক্তারূপে ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুধর্ম ও গীতার গৌরব কীর্তন করিয়া যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই।

* * * *

স্বদেশী আন্দোলনে আচার্য সতীশচন্দ্রের দান অপরিমেয়। শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলিয়াছিলেন, "সতীশবাবু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে সকলের আগে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছেন।" এই নীরব সাধক ও কর্মযোগীর কথা মনে হইলে শ্রদ্ধায় শির নত হইয়া পড়ে। তিনি ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী, দেশ ও সমাজের সেবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ও হাই-কোর্টের এডভোকেট হইয়াও নিজের জন্য কোন দিন অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন নাই। দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বদেশের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশভূষা, পোষাকপরিচ্ছদ দেখিলে মনে হইত, বাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সর্বদা আত্মসমাহিত, প্রসন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। প্রথম যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়, তখন সতীশবাবুই তাঁহার শিষ্যদের লইয়া জাতীয় বিদ্যা-লয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি নিজে কোন পারিশ্রমিক লইতেন না, বরং দুই এক স্থানে গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া যে অর্থ পাইতেন, তাহাও এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে দান করিতেন।*

এই সময়ে আর যে কয়েকজন চিন্তানায়ক বাঙলায় আত্ম-শক্তির আন্দোলন তথা স্বদেশীভাবের উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আর্যা নিবেদিতার নাম উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী এবং বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক যে অন্তরালে থাকিয়া স্বদেশী-ভাবের উদ্বোধনে সহায়তা করিতেন, তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। সে সময়ে "সাবিত্রী লাইব্রেরী" নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহার উদ্যোগে মাঝে মাঝে সভা হইত। রামেন্দ্রসুন্দর, দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষী ঐ সমস্ত সভায় বক্তৃতা করিতেন। যুবকগণের চিত্তে জাতির আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত করাই ঐ সমস্ত বক্তৃতার লক্ষ্য ছিল। যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দুই একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেবল সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইত না—জাতিগঠনের ব্যাপার লইয়াও তাঁহারা আলোচনা করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'রাখীবন্ধন' উৎসবের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'বঙ্গ-লক্ষ্মীর ব্রতকথা' তিনিই রচনা করিয়াছিলেন। এই সন্ধিক্ষণে আর্যা নিবেদিতার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীও যুবকগণের চিত্তে জাতীয় আত্মমর্যাদার উদ্বোধন করিয়াছিল। আর্যা নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। ডন সোসাইটির সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিল এবং মাঝে মাঝে সোসাইটির সভায় যে তিনি বক্তৃতা করিতেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" নামে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তখনকার শিক্ষিত সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়া-ছিল। এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং উহার হাজার হাজার কাপি প্রচারিত হইয়াছিল। এই "স্বদেশী সমাজেই" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতি গঠনের নিজস্ব পরিকল্পনা সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করেন। দেশ ও জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। বাহিরে বিদেশী গভর্নমেণ্ট থাকুক, তাহার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টির প্রয়োজন নাই, দেশবাসীর নিজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেরাই মিটাইবার চেষ্টা করিবে। নিজেদের শিল্প-বাণিজ্য নিজেরাই গড়িয়া তুলিবে। সালিশী প্রথার দ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শান্তি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের ব্যবস্থাও ইহার মধ্যে ছিল, স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও করা হইয়াছিল। অর্থাৎ বৃহত্তর বিদেশী গভর্নমেণ্টের অভ্যন্তরে আর একটি স্বতন্ত্র স্বসম্পূর্ণ 'স্বদেশী সমাজ' গড়িয়া তুলিতে হইবে ইহাই ছিল মূল কল্পনা। আয়র্লণ্ডের জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজ গভর্নমেণ্টের পাশাপাশি যেমন একটি স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাও অনেকটা সেই-রূপেই ছিল।

এই "স্বদেশী সমাজ" স্থায়ীভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার সদস্যদের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের খসড়া পর্যন্ত তিনি রচনা করিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রের ভূমিকা ছিল এইরূপঃ—

"আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কয়েকজন মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব। আমাদের নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্তব্য সাধন আমরা নিজেরা করিব। আমাদের শাসন ভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়দের সাধ্য, তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজ-বিহিত দণ্ড স্বীকার করিব। সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজনির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব। বাঙালী মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।"

এই 'স্বদেশী সমাজের' পরিকল্পনা পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। অসহযোগ আন্দোলনের উপরও ইহার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

১৯০৪ সালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা কলিকাতার 'শিবাজী উৎসব'। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নব জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে এই শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র নেতা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য পুনা হইতে কলিকাতায় আসেন। এই শিবাজী উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। ছত্রপতি শিবাজী মোগলের দাসত্বমুক্ত যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিবার জন্য এই শিবাজী উৎসবের পরিকল্পনা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, জাতীয় জীবনে যে নূতন শক্তি সঞ্চবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা জাতির চিত্তে প্রেরণা যোগাইতেছিল, 'শিবাজী উৎসব' তাহারই বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীকালে যিনি ভারতে নব জাতীয়তা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই উৎসবের পৌরোহিত্য করিয়া জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে যোগদান করেন এবং কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, তাহাতে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "শিবাজী উৎসব" পাঠ করেন। শিবাজীর আদর্শই যে স্বাধীনতা-কামী ভারতকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই কবিতায় স্পষ্টভাবেই কবি তাহা বলেনঃ—

কোন্ দূরে শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি।
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি,—
"এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

* * * * * * *

হে রাজতপস্বি বীর, তোমায় সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজা ঘরে
সে সত্য সাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চির যুগ যুগান্তর তরে
ভারতের ধন।

* * * * *

মরে না মরে না তাহা সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারা ভেবেছিল মনে কোন কালে হয়েছে নিঃশেষ
কম পরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে।

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ন
ভবিষ্যের পানে,
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ;
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ।

* * * * *

সে-দিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যান মন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।
"এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।

* * * * *

এই স্বদেশী যুগের ঊষাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কথা" ও "কাহিনী"র প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রাচীন ভারত এবং মারাঠা, রাজপুত ও শিখ ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতি মন্থন করিয়া এইসব কবিতা রচিত হইয়াছিল। বাঙলার তরুণগণের চিত্তে স্বদেশের বীর্য ও গৌরব কাহিনী জাগ্রত করাই ছিল ঐ সব কবিতার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলার তরুণ ও যুবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে এইসব কবিতা এখনও ধ্বনিত হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা "ভাণ্ডার" পত্রিকা প্রকাশ। শ্রীযুত কেদারনাথ দাশগুপ্তের অর্থে ও উদ্যোগে এই "ভাণ্ডার" পত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। "ভাণ্ডারে" জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা হইত, বিশেষভাবে আলোচনা হইত স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসারের সমস্যা। দেশের নেতারা যে সব চিন্তা করিতেন, জনসাধারণের মধ্যে সহজ ভাষায় তাহা প্রচার করা "ভাণ্ডারের" অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি "ভাণ্ডার"-এর আলোচনায় যোগদান করিতেন। কেবল স্বদেশী শিল্পের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই "ভাণ্ডারের" কর্তব্য শেষ হয় নাই। শ্রীযুত কেদারনাথ দাশগুপ্তের* উদ্যোগে "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামক স্বদেশী শিল্প-জাতের একটি বিপণীও খোলা হয়। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী উহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী যে 'বীরাষ্টমী উৎসবের প্রবর্তন করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব যে তখনকার দিনে যুবকদের চিত্তে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর সম্পাদিত "ভারতী" পত্রিকাও জাতীয় ভাব প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছুকাল "ভারতীর" সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০০-১৯০৫—এই পাঁচ বৎসর বাঙলার জাতীয় জীবনে মহাসন্ধিক্ষণ। এই পাঁচ বৎসরে বাঙলা দেশ এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, এই 'স্বদেশী যুগের ঊষায়' জাতির ভাব ও চিন্তা পরিচালনার কার্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ক্রমশ)

* আচার্য্য সতীশচন্দ্র আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এখনও জীবিত আছেন এবং কাশীবাস করিতেছেন।

কবি ও দুষ্টু ছেলে

ভবানী পাঠক

অম্বিকে মাস্টার কবির কাছে এসে দুষ্টুছেলেদের নামে অনেক দুঃখ অভিযোগ করে গেলেন ঃ—

"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই, এমন নিরেট বুদ্ধি।

পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়, বলে ইঁদুরে কেটেছে, এত বড় বাঁদর।"

এই অভিযোগ শুনে কবি কী উত্তর দিলেন? কবির উত্তরটা শেষে জানানো হবে, তার আগে বিষয়টা একবার আলোচনা করে নেওয়া যাক্।

পৃথিবীর সব বড় কবিই অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেক বড় বিষয় ও তত্ত্বকে তাঁরা চিন্তায়, ধ্যানে ও কল্পনায় ধরেছেন। জীবন মৃত্যু সৃষ্টি প্রকৃতি—এই সবার রহস্য নিয়ে কবিরা কত মন্ত্র স্তোত্র গান ও কবিতা রচনা করেছেন। কেউ সব চেয়ে বেশী ভালবেসেছেন আকাশকে, কেউ নদীকে, কেউ গাছের ফুলকে। মেঘ রৌদ্র জ্যোৎস্না—পৃথিবীর বর্ণ গন্ধ ও শব্দকে কত কবি মুগ্ধমধুর ছন্দে ও ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কবিরা নিজেরা দরদী বলে মানুষের হৃদয়ের পরিচয় ভাল করে জানেন।

একটি বিষয়ে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যান্য সকল কবির চেয়ে অনেক বেশী দরদী মনের প্রমাণ দিয়েছেন। সেই বিষয়টি হলো ছোটে ছেলে। ছোট ছেলের জীবন, কচি অশথপাতার মত তার মনের রূপ। এই ছোট ছেলের হৃদয়কে কবি যেভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তেমন আর কেউ পারে নি। কবির কল্পনায় যেন নিত্যকালের একটি ছোট ছেলে বসে বসে তাঁকে তার মনের সাধ আনন্দ ও অভিমানের কথা শুনিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে কবির একটি 'ছড়া'র কথা মনে পড়ে—

কদমাগঞ্জ উজাড় করে...
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় পড়ে নৌকোডুবি
হোলো যখন কালদহে,......

তখন কী হলো? বস্তা বস্তা কদমা ব্রহ্মপুত্রের জলে তলিয়ে গেল। ফলে হাংলু ফিড়াঙ পর্বতের তলায় ক-দিন ধরে সরবতের ধারা বয়ে চললো। মাছগুলি সব মিঠাই গজার মত মিষ্টি হয়ে গেল। আরও নানা অদ্ভুত কান্ডকারখানা আরম্ভ হ'লো। আমাদের ভেবে বিস্মিত হতে হয়, অশীতিপর এক বৃদ্ধ দার্শনিক কবির কলম থেকে পৃথিবীর যত পিপাসী ছোট ছেলের জন্য এই মিষ্টি সরবতের স্রোত কী করে বেরিয়ে এল। কবির লেখার মধ্যে তাই আমরা দেখতে পাই, তত্ত্বকথা ও ছোট ছেলের আবোল তাবোল উভয়ে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। এমনও দেখা গেছে যে, ছোট ছেলের মিঠে আবোল তাবোল কবির তত্ত্বকথাকে ছাপিয়ে সময় সময় বড় হয়ে উঠেছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের লেখায় ছোট ছেলেদের রূপ বরাবর একই রকম থাকে নি। ছোট ছেলেদের চরিত্রে কবি বিরাট এক বৈচিত্র্য দেখেছিলেন। তার মধ্যে কাকে তিনি সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন বলা শক্ত। তবে আমরা নিজেরাই তা আলোচনা ও বিচার করে বুঝে নিতে পারি।

কবির 'শিশু ভোলানাথকে' আমাদের মনে পড়ে। এ ছোট ছেলেকে ভাললাগে সবারই। কিন্তু একেও যেন ঠিক ঘনিষ্ঠভাবে বুঝে উঠতে পারি না। একটু পর পর মনে হয়। এ শিশুর গায়ে নটরাজের মত কেমন দেবতা দেবতা গন্ধ। যা পায় ভাঙে আর লন্ডভন্ড করে, সে উৎপাতের আনন্দেই বিভোর। সংসারের প্রতি তার যেন একটা পরম অবহেলার ভাব। কিন্তু সারা পৃথিবী তাকে তোয়াজ করুক, এই রকম তার মনের ইচ্ছা। সুতরাং শিশু ভোলানাথকে একটু ভয় করতে হয়।

'বীর পুরুষ' খোকার কথা আমরা শুনেছি। খোকার মা চলেছেন পাল্কীতে চড়ে—তার পাশে পাশে রাঙা ঘোড়ার ওপর চড়ে টগবগিয়ে খোকা চলছে। সন্ধ্যে হয়ে এল, হঠাৎ দীঘির ধারে বিকট শব্দ—হারে—রে-রে-রে-রে। ডাকাতের দল এসেছে—"হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবাফুল।" তারপর খোকার সঙ্গে তাদের কী বিষম লড়াই—। কতগুলো যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়লো কাটা।

বীরপুরুষ খোকার এই ইচ্ছে নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু এরকম ছোট ছেলের মধ্যে যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি রয়েছে। এ ঠিক সাধারণ ছোট ছেলে নয়। পক্ষিরাজে চড়া রূপকথার রাজপুত্তুরের মত এই ছোট ছেলেকে আপন ভাবতে একটু দেরী লাগে। বীরপুরুষ খোকা বড় বেশী কল্পনাপ্রিয়।

কবির খাতা থেকে আর একটি ছেলের কথা ধরা যাক্। এই ছেলেটি বলেছে—

আমি যদি দুষ্টুমি করে,
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
...তবে তুমি আমার কাছে হারো
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো?

ছোট ছেলের এ দুষ্টুমির ইচ্ছে শুনতে খুবই ভাল লাগে। তবে এ ছোট ছেলে নিশ্চয় একজন কবি। তাই মিষ্টি হলেও, তার দুষ্টুমিটা বড় ভদ্রগোছের মনে হয়। কিন্তু আমরা খুঁজছিলাম একটি সত্যিকারের দুষ্টু ছেলেকে, যার হাতের স্পর্শে সমস্ত পৃথিবীই দুষ্টু হয়ে যায়। কবির খাতা হাতড়ে শেষে এই সত্যিকারের ছোট ছেলে ও দুষ্টু ছেলের পরিচয় পাওয়া গেল। অম্বিকে মাস্টার তারই নামে অভিযোগ করে গেছেন।

এ দুষ্টু ছেলে কেমন? এ ছেলে কুল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়, বুনো বিষফল খেয়ে ভীর্মি লাগে, রথ দেখতে গিয়ে কোথা যেতে কোথায় যায়। হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে।

কাদা মাখে, কাপড় ছেঁড়ে। মার খায় দমাদম, গাল খায় অজস্র।

বাঙলার লক্ষ লক্ষ ছোট ছেলের এই রূপ। এরাই সত্যিকারের সাধারণ ছোট ছেলে। দুপুরবেলা ময়ানদীর বাঁকে পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে। ছোট ছেলের লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে। ইচ্ছে করে এই সবুজ স্বচ্ছ জলে ডুব দিতে। কী আছে দেখাই যাক্ না, এই তার লোভ। করলোও তাই। দামে পা জড়িয়ে গেল। খাবি খেয়ে তলিয়ে যেতে লাগলো। রাখালেরা দৌড়ে এসে ওকে তুললো টানাটানি করে। বেঁচে গেল দুষ্টু ছেলে।

বক্সীদের ফলের বাগানে সে লুকিয়ে গিয়েছে চোরের মত। 'মার খেয়েছে বিস্তর—জাম খেয়েছে আরও অনেক বেশী।' বাড়ীর লোকে বলে—লজ্জা করে না বাঁদর? দুষ্টু ছেলে ভাবে, কিসের লজ্জা?

এই দুষ্টু ছেলের শরীরে ঘেন্না বলে কিছু নেই। কোলা ব্যাঙ খপ করে তুলে নিয়ে বাগানে একটা গর্তে পুষে রাখে। পোকা-মাকড় খেতে দেয়। গুবুরে পোকা এনে কাগজের বাক্সে রাখে। ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালী।

সমস্ত পৃথিবীকে নিয়ে এ দুষ্টু ছেলের কারবার। সে সব কিছু পেতে চায়, জানতে চায়, করতে চায় ও ধরতে চায়। তাই সে কোন শাসন বরদাস্ত করে না। একদিন পথ থেকে এক নেড়ী কুকুরের বাচ্চাকে নিয়ে এসে সে পুষতে লাগলো। দুষ্টু ছেলে মনিব হয়েছে। কিন্তু সে তার পালিত জীবকে শুধু শাসন ও শিক্ষা দেয় না। বাচ্চা মনিবের স্নেহ সমাদরের তুলনা মেলে না—"মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হতো না রাতে, তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।" 'একদিন প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করে খেতে ঢুকেছিল কুকুরটা। প্রতিবেশীর লাঠির মার সে ক্ষুদ্র জীবটার শরীরে সহ্য আর হ'লো না। নেড়ী কুকুরের বাচ্চা মারা গেল।

এতদিনে দুষ্টু ছেলের চোখে দেখা দিল অভিমানের জল। দুদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো, মুখে অন্নজল রুচলো না। দুষ্টু ছেলে তাই বিদ্রোহী। তার ইচ্ছের পৃথিবীকে যখন কেউ সম্মান করে না, সে কেন বুড়োদের পৃথিবীকে সম্মান করবে? তাই সে শিশুপাঠ বই থেকে কবির কবিতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর অম্বিকে মাস্টার এসে অভিযোগ করেছেন।

কিন্তু কবি কী উত্তর দিলেন? কবি বল্‌লেন ঃ—

"সে ত্রুটি আমারই,
থাকতো ওর নিজের জগতের কবি
তাহোলে গুবুরে পোকা এত স্পষ্ট
হতো তার ছন্দে,
ও ছাড়তে পারত না।
কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি
লিখতে পেরেছি
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি।"

সত্যিকারের দুষ্টু ছেলেকে আর ছোট ছেলেকে কবি শুধু যে সব চেয়ে বেশী ভালবেসেছেন তা নয়, তাকে সম্মানও করেছেন।

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসর

(৫৯৯ পৃষ্ঠার পর)

আনন্দের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বসেছিলেন।

এখানকার জন্মোৎসব শেষ করে পূর্ববঙ্গের নানা স্থান ঘুরে এসে শুনলাম গুরুদেব আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি চান যত তাড়াতাড়ি হোক সংক্ষেপে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করি। কারণ বর্ষা এ বছর আগেই বিপুল সমারোহে এদেশে দেখা দিয়েছিল। তাঁরও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সেই কারণে। শান্তিনিকেতনে সকলে জড়ো হবার আগেই এভাবে বর্ষামঙ্গল করার অসুবিধা ছিল, তাই মনে করেছি কয়েকদিন অপেক্ষা করে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করা যাবে। এর মধ্যেই একদিন সন্ধ্যায় বর্ষার ঘনঘটায় গুরুদেবের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই কিছু বর্ষার গান তাঁকে শোনালাম। বর্ষার সঙ্গে তাঁর মনের যে কি যোগ ছিল জানি না, কিন্তু বার বার দেখেছি, বর্ষার দিনে তিনি যেভাবে চঞ্চল হয়ে উঠতেন সে চঞ্চলতা সাধারণ মানুষের জগতে বিরল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বর্ষার গান রচনা করতে তাঁর ইচ্ছা করে কি না। বলেছিলেন, "ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠবো না, গলায় সে সামর্থ নেই, ভাবতেও পারি না।" এই সময় থেকে তাঁর অসুস্থতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল, কমবার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। অনেক দুর্বল তিনি হয়ে পড়েছিলেন। এর পরেই এত তাড়াতাড়ি তিনি যে লোকান্তরিত হবেন আমরা অনেকেই তা' কল্পনাও করিনি। ভেবেছি বর্ষামঙ্গল সুরু করবো। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোলো কলকাতায়, আর ফিরলেন না। তখন বুঝলাম কেন তিনি বর্ষামঙ্গল করবার জন্যে এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। মহাপুরুষ তিনি, অন্তরে মৃত্যুর ডাক শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, বুঝেছিলেন এমন বর্ষার ঋতুটা এবার তাঁর কাছে বৃথাই যাবে যদি না তাড়াতাড়ি আয়োজন হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাঁর সে ইঙ্গিত ধরতে পারিনি। তাঁর তিরোধানের মাস খানেক পরে যখন বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করলাম তখন কেবল এই কথাই মনে করেছি, তিনি যে লোকেই থাকুন যে ইচ্ছা তাঁর তখন পূরণ করতে পারিনি সেদিন যেন তিনি আমাদের মধ্যে এসে এই বর্ষামঙ্গলের আনন্দে যোগ দেন, এ উৎসব আমরা তাঁর উদ্দেশ্যেই করছি। যদি সুন্দর হয় বুঝবো তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে এবং আমাদের অর্ঘ্য তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপঃ--

সাধারণ পৃষ্ঠা .

	১ বৎসর টাকা	৬ মাস টাকা	৩ মাস টাকা	১ মাস টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনি-অর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 16th May, 1942 [২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চট্টগ্রাম—

গত শুক্রবার অপরাহ্নে এবং শনিবার সকালে জাপানী বিমান চট্টগ্রাম এলাকার উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। বাঙলা দেশে শত্রুর আক্রমণ সাক্ষাৎ সম্পর্কে এই প্রথম। শুক্রবার অপরাহ্নে এই আক্রমণে কিছু অ-সামরিক লোক হতাহত হইয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। শনিবারের আক্রমণেও ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা সামান্যই। পরবর্তী খবর এই যে, আসামের পূর্ব অঞ্চলের একটি ছোট শহরেও জাপানীরা বোমা ফেলিয়াছে। জানি না, শত্রুর উদ্দেশ্য কি। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, জাপান অবিলম্বে না হউক, কিছুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের পথে ভারতের উপর আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের পক্ষে সে ক্ষেত্রে কর্তব্য কি? সশস্ত্রভাবে দেশরক্ষার দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই। আমাদের এই চরম সঙ্কটের সময়ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দেশরক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপর দিতে পারেন নাই। বড়লাট সেদিন বেতার-যোগে এ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, কোন দেশেই জনসাধারণের সকলের হাতে সরকার অস্ত্র দেন না এবং দিতেও পারেন না; আমরা ইহা বেশই বুঝি। কিন্তু একটা সত্য এই যে, নিজেদের দেশ এবং জাতিকে রক্ষার কর্তৃত্ব দেশবাসীর আছে, এই ধারণাও জনসাধারণের মনের উপর ব্যাপকভাবে কাজ করে এবং শত্রুকে প্রতিহত করিবার একটা মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি তাহাদের অন্তরে উদ্বুদ্ধ করে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এ সত্যকে এখনও স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন, ইহা তাঁহাদের অদূরদর্শিতার পরিচয় ছাড়া অন্য কি বলিব? কিন্তু তাঁহারা অদূরদর্শী হইলেও আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলেও আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না। দেশবাসীর মনে সাহস, বিশ্বাস ও ধৈর্য সঞ্চারিত করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তা ছাড়িয়া সমগ্র দেশের জন্য আজ আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। দেশের লোককে সকল রকমে আশ্বস্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন রাখিবার জন্য যেটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব, সেইটুকু আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। জানি, স্বাধীনতার প্রেরণা যে জাতির মধ্যে জাগে, সে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সে তাহার অভীষ্ট সাধনার উদ্দেশ্যে নিঃশেষে আপনাকে দান করিবার জন্যই প্রস্তুত হইতে চাহে। সে সুবিধা আমাদের এখনও নাই; কিন্তু সেবার ভিতর দিয়া আমাদের শক্তি সার্থক হইয়া উঠুক। এই সঙ্কটের মধ্যে বাঙালী জাতি যেন আপনার বীর্যবত্তাকে অপরিম্লান রাখিতেই সক্ষম হয়।

আসামের মন্ত্রিমণ্ডল—

স্যার রবার্ট রীড আসামের গভর্নমেণ্টগিরি ছাড়িয়া এখন ভারত ও চীনের মধ্যে প্রীতিসূত্র স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্যার এণ্ডরু ক্লো আসামের গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে, স্যার এণ্ডরু আসামে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আসামে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পক্ষে বাধা কিছুই ছিল না, এ ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল শুধু স্যার রবার্ট রীডের মতিগতি। তিনি স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে ছাড়া অন্য কাহারও নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল আসামে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু স্যার মহম্মদ সাদুল্লার পশ্চাতে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ছিল না। স্যার মহম্মদ সাদুল্লা অবশ্য স্যার রবার্টের আনুকূল্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু মোস্লেম লীগের সাম্প্রদায়িক ভেদমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী সমর্থনের পক্ষে আসামের ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের শুভবুদ্ধি সাড়া দেয় নাই। আসামের ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদিগকে তাঁহাদের এই আদর্শনিষ্ঠার জন্য আমরা প্রশংসাই করি। স্যার এণ্ডরু ক্লো আসামের জনমতকে মর্যাদা দান করিয়া যদি শ্রীযুত রোহিণীকুমার

চৌধুরীর নেতৃত্বে সেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সত্যই উদ্যোগী হন, তাহা হইলে তিনি যে শুধু নিজের কর্তব্য প্রতিপালন করিবেন ইহা নহে, বর্তমানের এই সংকটকালে আসামের জনমতকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের দায়িত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাজনীতির দিক হইতেও তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

বাঙলায় লবণ সংকট—

বাঙলা দেশে লবণ আর কেরোসিন—এই দুইটি জিনিসের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কেরোসিনের অভাবজনিত সমস্যাও কম নয়; কিন্তু লবণের সমস্যা তার চেয়েও বেশী। এদেশের গরীবের লবণই দুই মুঠা ভাত খাইবার পক্ষে প্রধান সম্বল। আমাদের মনে আছে শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় একবার কেন্দ্রীয় আইনসভায় লবণ শুল্কের প্রতিবাদকালে বলিয়াছিলেন —এদেশের গরীবের পক্ষে লবণ যে কত বড় মূল্যবান বস্তু, আপনারা তাহা উপলব্ধি করিবেন না। আমার শৈশবে, আমি একদিন আম খাইবার সময় কিছু বেশী লবণ ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেজন্য আমার মার নিকট আমাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল, সে কথা এখনও আমি ভুলি নাই।' লবণের দর চড়াতে গরীবের বিশেষ কষ্ট দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিদেশের লবণের জন্য বাঙলা দেশকে তাকাইয়া থাকিতে হয়; অথচ লবণের জন্য বাঙালীকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙলা দেশে লবণ প্রস্তুতের উপাদানের অভাব নাই; কিন্তু এই শিল্পের দিক হইতে বাঙালীকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বাঙলা গভর্নমেণ্ট এজন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙলার লবণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মন্ত্রীদের সম্প্রতি একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। লবণ ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের পক্ষে অসুবিধার বিষয়গুলি সরকারের নিকট উপস্থিত করেন; অসুবিধার মধ্যে প্রধান অসুবিধাই হইল বোধ হয় মাল সরবরাহের এবং জল জ্বাল দিয়া লবণ করিবার পক্ষে জ্বালানীর অভাব। আমরা আশা করি, বাঙলা সরকার এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য চেষ্টা করিবেন। যুদ্ধের এই হিড়িকের বাজারে বাঙলায় লবণ-শিল্প যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে দেশের একটি স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে।

বন্দীমুক্তির ট্রাইবিউনাল—

ভারতরক্ষা আইন অনুসারে যাঁহারা রাজবন্দীস্বরূপে আটক রহিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বিচারপতি প্যাংক্রিজকে সভাপতি করিয়া বাঙলা সরকার একটি স্পেশাল ট্রাইবিউনাল গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি বাঙলা সরকার একটি বিবৃতিতে এই ট্রাইবিউনাল কোন্ ধারা ধরিয়া বন্দীদের সম্বন্ধে তাঁহাদের বিবেচনা কার্য চালাইবেন, তৎসম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই সরকারী বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে যে প্রথমত, দেখিতে হইবে যে, যে ধারা অনুসারে ইহাদিগকে আটক করা হইয়াছে, সেই ধারানুযায়ী ইহাদের বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে অপরাধজনক কোন প্রমাণ আছে কি না, দ্বিতীয়ত, যদি সেরূপ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলেও কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া বন্দীদের মুক্তিদান যুক্তিযুক্ত কি না। এই বিষয়গুলির মধ্যে দেখিতে হইবে, বন্দীদের পূর্ব মতিগতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না। গ্রেট ব্রিটেন রুশিয়ার পক্ষে যোগদান করার ফলে কিংবা জাপানীদের আক্রমণ, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের উপর জাপানীদের আক্রমণ আসন্ন হওয়ার জন্য এইরূপ মতিগতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে। আমাদের মতে প্রত্যেক বন্দীর সম্বন্ধে এই সব বিচার করিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন; কিন্তু বাঙলা দেশের পক্ষে জাপানীদের আক্রমণের আতঙ্ক আজ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সব বন্দী সাধারণ শ্রেণীর বন্দী নহেন। ইঁহাদের রাজনীতিক মনোভাবের জন্যই ইঁহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, দেশের স্বাধীনতা ইঁহারা সকলেই কামনা করেন এবং বর্তমান সময়ে এই সব কর্মী যুবককে মুক্তিদান করিলে সরকার দেশরক্ষা সম্পর্কিত কার্যে, বিশেষভাবে রক্ষী বাহিনী প্রভৃতি গঠন ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুকূলতাই লাভ করিবেন। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে সাহসিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ নীতিই সমধিক ফলপ্রসূ হয়; কারণ একটা উদার আদর্শ তাহার মূলে থাকে; এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙলার সকল রাজনীতিক বন্দীকে ব্যাপকভাবে মুক্তিদানের নীতি অবলম্বন করাই সরকারের পক্ষে এক্ষেত্রে সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

স্বাধীন ভারতের আদর্শ—

স্বাধীন ভারতের অর্থই অখণ্ড ভারত, ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। যাঁহারা ভরতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা কামনা করেন, পাকিস্থানী প্রস্তাবকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারও পক্ষে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না। বাঙলা দেশে সম্প্রতি পাকিস্থানবিরোধী দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া গেল; ঐ দিবসে বাঙালী জাতি সুস্পষ্টভাবে অখণ্ড ভারতের আদর্শে তাহার সাধনার নিষ্ঠাকেই বিঘোষিত করিয়াছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারকে টানিয়া আনিয়া অখণ্ড ভারতের এই আদর্শ নষ্ট করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছে, আমরা বলিব, তাহারা ভারতের শত্রু। ভারতবাসীরা চিরকাল ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে—ইহাই তাহারা চায়। সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হইল এই যে, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীও শেষকালে এই দলে যোগ দিয়াছেন। স্বাধীনতার জন্য প্রেরণা যেখানে বলিষ্ঠ, সেখানে অতিবুদ্ধির পাক থাকে না। শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর

অতিবুদ্ধিই তাঁহার মনে এই দুর্বুদ্ধির পাক সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আমাদের আশা আছে, মহত্তর আদর্শের প্রেরণা এই অতি-বুদ্ধির অনিষ্টকারিতাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সুখের বিষয় এই যে, মাদ্রাজের কংগ্রেসকর্মীরা রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই; রাজাজীর যিনি অন্তরঙ্গ, মন্ত্রিগিরির যিনি অনুরাগী পুরুষ, সেই শ্রীযুত সত্যমূর্তি পর্যন্ত রাজাজীর প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার নিন্দা করিয়াছেন। ভারতবাসীরা চায় মনুষ্যত্ব, ভারতবাসীরা চায় স্বাধীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে—সেই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যাঁহারা সাময়িক সুবিধাকে বড় বলিয়া বুঝে, তাঁহাদের অতি-বুদ্ধি জাতির ধিক্কারই অর্জন করিবে।

দাঙ্গার মামলা প্রত্যাহার—

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে যে সমস্ত মামলা উদ্ভূত হইয়াছিল, সেগুলি প্রায় সমস্তই প্রত্যাহৃত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা শান্তিতে এবং সদ্ভাবে বসবাস করিবেন। তাঁহারা বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করিবেন। নূতন কিছু নয়। এদেশের হিন্দু এবং মুসলমান, জনসাধারণের দিক হইতে উভয়ের স্বার্থ এক এবং শান্তি সদ্ভাবে বসবাস করিবার প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়কে লইয়া বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এদেশের সরলচিত্ত জনসাধারণের মনে এ সম্বন্ধে স্থায়ী কোন প্রতিকূল বদ্ধধারণা নাই; কিন্তু মাঝে মাঝে গোল ঘটায়, কতিপয় দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি। ইহারা সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি ভাঙ্গাইয়া নিজেদের ইতর স্বার্থ সিদ্ধ করে। চতুর ইহারা, নিজেদের কাজ বাগাইয়া ইহারা গা ঢাকা দেয়, দুর্ভোগ ভোগ করে সরলচিত্ত জনসাধারণ। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল এই সব হীনচেতা ফন্দীবাজদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পশীলতা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। যাহারা মিথ্যা মোহে পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিয়া বাঙলা সরকার ঐক্যের আবহাওয়া গড়িবার পক্ষেই অনুকূলতা করিলেন বলিয়া আমরা মনে করি।

সত্য ও অসত্যের বিচার—

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সেনাদের আচরণ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারত গভর্নমেন্ট উহার প্রচার নিষিদ্ধ করেন। এই সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ভারতসচিব নিষেধ ব্যবস্থা সম্পর্কে এই কৈফিয়ৎ প্রদান করেন যে, প্রস্তাব দুইটি গুজব বা বিকৃত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতে দিলে সামরিক ব্যবস্থা ও গভর্নমেণ্টের উপর লোকের আস্থা নষ্ট হইত। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ ভারতসচিবের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রস্তাব দুইটি যে গুজব বা বিকৃত বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্ষিত, যদি কেহ ইহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে তিনি প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহার করিবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে তিনি সে জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছেন; কিন্তু প্রস্তাবদ্বয় যে, গুজব বা বিকৃত বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ভারত সচিব আমেরী সাহেব কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টের এই প্রতিবাদের খণ্ডন করিতে পারিবেন কি? সাত সমুদ্র তের নদীর পারে থাকিয়া এবং জন কয়েক সরকারী কর্মচারীর মারফতে খবর পাইয়া তিনি এদেশের সব ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পুরুষ বলিয়া গর্ব করিয়া থাকেন। সেজন্য আমাদের আপত্তি কিছু নাই, কিন্তু কংগ্রেসের ন্যায় দায়িত্ব-সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে তিনি প্রকারান্তরে ভিত্তিহীন বলিয়াছেন, এখন তিনি প্রমাণ সহকারে নিজের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করুন, আমরা ইহাই চাই।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ—

শহরে এবং মফঃস্বলে সর্বত্র আটা, লবণ, কয়লা, কেরোসিন, দিয়াশলাই, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, চাউল প্রভৃতি জিনিসের দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকার এই সব নিত্যাবশ্যক জিনিসের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে অতিরিক্ত লাভখোর দোকানদারদের সাজাও হইতেছে; কিন্তু তাহাতেও সমস্যা মিটিতেছে না। জিনিসের দর বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না, জিনিসপত্র যাহাতে পাওয়া যায়, এই ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙলা দেশের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার দোকানদারদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং জন-সাধারণকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, কর্তৃপক্ষের সতর্কতাই এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন। তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে আগাইয়া গেলে নিজেদের স্বার্থরক্ষার দায়ে দেশের লোকে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেই; কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে এতদিন পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। লাভখোরদের বিরুদ্ধে শহর অঞ্চলে দুই-একটি মামলা হইয়াছে এবং কয়েকজনের সাজা হইয়াছে বটে; কিন্তু মফঃস্বলের হাটে-বাজারে জিনিসপত্রের দর দোকানীরা এখনও যদৃচ্ছভাবে হুজুগের জোরে চড়াইতেছে। দোকানীরা যাহাতে সরকারী নির্দিষ্ট মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, সরকার যদি এমন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে শহরে এবং মফঃস্বলের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে কিংবা সরকারের পাশ যাঁহারা লইবে, এমন লোকদের দ্বারা দোকান খোলা উচিত।

খাদ্য শস্য উৎপাদন—

কিছু দিন হইল বাঙলা সরকার খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। পাটের বদলে ধান বেশী করিয়া আবাদ কর, এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং এই বিভাগের কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে একজন স্পেশাল অফিসারও নিযুক্ত হইয়াছেন। বাণিজ্য-শস্য বপণের পরিবর্তে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা যে বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল করিতে হইলে কেবল প্রচার-কার্য চালাইলেই চলিবে না। যাহারা কৃষক, তাহারা সাধারণত গতানুগতিক ধারা ধরিয়াই চলে, নিজেদের কাজের ধারা তাহারা সহজে বদলায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি সত্যই তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে দেশব্যাপী একটা কর্মপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রথমত প্রয়োজন জমির উৎপন্ন শক্তি বৃদ্ধি করা; তারপর যে সব জমি পতিত আছে, সেই সব জমি আবাদী জমিতে পরিণত করা, তৃতীয়ত, খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া। ইহার পরে দরকার বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা অটুট রাখা। বাঙলা সরকার কেবল প্রচারই করিতেছেন; কিন্তু এ বিষয়ে কোন কর্মপ্রণালী তাঁহারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন বলিয়া আমরা জানি না; কিন্তু যেখানে এ সব দিকে কাজ হয়, সরকার পক্ষ হইতে নিজেরা কর্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুধু উপদেশ দিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন না। সরকার কথার সঙ্গে কাজের পথও নিজেরা ধরুন।

মোড়লীর মনোবৃত্তি—

স্যার আজিজুল হক ভারতের হাই কমিশনারস্বরূপে লণ্ডনে গিয়া সাংবাদিকদের সভায় যে বক্তৃতা করেন, সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার আজিজুল হক সরকারের নিয়োগপত্র পাইয়া ভারত সরকারের কর্মচারী হিসাবেই লণ্ডনে গিয়াছেন। স্বাধীন জাতির তিনি প্রতিনিধি নহেন; সুতরাং ভারতের স্বাধীনতাসেবীদের মনের কথাও তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইবার পুরাপুরি সুবিধা নাই। তথাপি স্যার আজিজুলের বক্তৃতার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি লণ্ডনওয়ালাদিগকে এই সত্যটা অন্তত ভাল রকমেই সমঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের উপর মাতব্বরী করিবার দিন আর নাই এবং হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার ধাপ্পা দিয়া ভারতবাসীদিগকে চিরদিন অধীনে রাখিবার ফন্দীবাজীও এখন আর চলিবে না। স্যার আজিজুল বলেন, এমন কেহ কেহ হয়ত এখনও এদেশে আছেন, যাঁহারা ভারতবাসীদিগকে চিরদিন ইংরেজ জাতির অধীনে রাখিতে চাহেন। ইঁহারা অতীত যুগের লোক, শতাব্দী কালের পূর্ববর্তী মনোভাব লইয়া ইঁহারা চলেন। ইঁহাদের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। ইঁহাদের কাছেই আপনারা এই ধরণের কথা শুনিতে পান যে, ভারতের লোকেরা তাহাদের দেশের লোকের হাতে দেশ শাসনের কর্তৃত্ব যাওয়াকে ভয়ের চোখে দেখে এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা অনবরতই স্ব সম্প্রদায়ের অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব করে; সুতরাং তৃতীয়পক্ষের পক্ষপুটের আশ্রয় ছাড়া তাহারা মারা যাইবে। ইঁহারা যাহাই বলুন, আমি আমার দেশকে অনেকের চেয়ে ভালভাবে জানি। আমি আপনাদিগকে আমার দেশের প্রকৃত কথা বলিতেছি। ভারতের সকল দলই আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায়, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। ইহা সত্ত্বেও আমার দেশের স্বাধীনতার পথে যদি কেহ পরিপন্থিতা করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে শুধু একটা প্রশ্ন করিব এবং সে প্রশ্ন এই যে, আপনারা আজ আমাদের বিচার করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু আপনারা যখন আপনাদের দেশের স্বাধীনতা আপনাদের জাতির স্বাধীনতা লাভ করেন, তখন আপনাদের অবস্থা কেমন ছিল?" আমরা আশা করি, হিতৈষীর এই উক্তি ব্রিটিশ সরকারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করিবে।

গ্রামের অসুবিধা—

শহর ছাড়িয়া গ্রামে যাওয়া উচিত হইবে কি না, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া এক ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীর নিকট একখানা চিঠি লিখেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে জানাইতেছেন,—"আরামের জন্য গ্রামে যাইতে বলি না, ভয়ে পলায়ন করিবার জন্যও নয়। গ্রামে যাঁহারা যাইবেন, গ্রামের লোকদের মধ্যে বসবাস করিয়া গ্রামের কল্যাণ সাধনের জন্যই যেন তাঁহারা গ্রামে যান। গ্রামের লোকেরা অধিকতর অজ্ঞ—সুতরাং শহরের অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাদের আতঙ্ক দূর করিবেন, চোর-ডাকাত হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন।" আমাদের কথাও ইহাই। যাঁহারা গ্রামে যাইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই অবশ্য গ্রামের লোকদের সেবা করিবার মুখ্যভাব অন্তরে লইয়াই যে গ্রামে যাইতেছেন, ইহা নয়। তাঁহারা শান্তি এবং স্বস্তির জন্যই গ্রামে যাইতেছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি গ্রাম-বাসীদের সেবার ভাব অন্তরে লইয়া গ্রামে থাকেন এবং সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাহাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী হন, তবেই তাঁহারা শান্তি এবং স্বস্তি পাইবেন, নহিলে গ্রামে বাস তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি এবং উদ্বেগের কারণ হইবে।

বাংলার উপর প্রথম আক্রমণ

জাপানীরা চট্টগ্রামের উপর বোমা ফেলিয়াছে। বাঙলা দেশের উপর এই তাহাদের প্রথম আক্রমণ। আকিয়াব বন্দর জাপানীদের হাতে যাওয়ার পর এমন আক্রমণ বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আকিয়াব হইতে চট্টগ্রামের দূরত্ব দেড় শত মাইলের একটু উপরে। জাপানীরা এ পর্যন্ত চার শত মাইলের গন্ডী ছাড়াইয়া বোমা ফেলে নাই। চার শত মাইলের মধ্যে পাকা বিমান ঘাঁটি পাইবার পর তবে তাহারা রেঙ্গুন প্রভৃতি শহরের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়াছিল। চট্টগ্রামের উপর এ আক্রমণ আকস্মিক আক্রমণ কি ভারত আক্রমণের ইহা উদ্বোধন পর্ব, ইহা এখনও বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। একদিকে আকিয়াব, অন্য দিকে ভারত-ব্রহ্মের উত্তর সীমানা ঘেঁসিয়া জাপানীদের কর্মতৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকে জাপানীরা সোজা ভারত সীমান্তের দিকে মোড় না ঘুরিয়া ক্রমাগত আগাইয়া চীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—এই পথ ধরিয়া চীনা জাতীয় দলের রাজধানী চুংকিং দখল করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহারা এইভাবে চীনা জাতীয় দলের দক্ষিণাভিমুখী উদ্যমকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চায়। অন্য কেহ কেহ আবার এরূপ মনে করেন না। তাঁহাদের ধারণা এই যে, ভারত এবং ব্রহ্মদেশের সহিত চীনা সেনাদের সংযোগসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া পশ্চিম দিকে একটু আগাইয়া পুনরায় দক্ষিণ দিকে মোড় ঘুরাই তাহাদের মতলব; এবং এইভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীকে বিপন্ন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। জাপানীদের বর্তমান রণনীতি প্রাচ্যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। জাপানীদের পিছনে থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী শান রাজ্যের ধারে চীনা সেনারা এখনও রহিয়াছে এবং তাহারা লড়াই চালাইতেছে। অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে থাকিয়া তাহারা গরিলা যুদ্ধ চালাইবে এবং থাইল্যান্ডে অবস্থিত জাপানীদের প্রধান ঘাঁটি চেংমিয়াং হইতে জাপানীদের অগ্রগামী বাহিনীকে চোরাগোপ্তা লড়াইতে যথাসম্ভব বিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইবে বলিয়া মনে হয়। চীনাদের এই চেষ্টা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। তাহারা মান্দালয়-লাসিও রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং মেমিও শহর পুনরধিকার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু বিনা সাহায্যে দীর্ঘদিনের জন্য এমন লড়াই চলিবে না। ইহার মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা আছে কি? যদি তাহা না থাকে এবং জাপানীরা সমগ্র ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াই লয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ প্রণালীবদ্ধভাবে অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা তাহাদের পক্ষে আছে কি? আমাদের মনে হয়, জাপানীদের সে চেষ্টা এখন আর তেমন সহজ হইবে না। মালয়, যবদ্বীপ এবং ব্রহ্মের দক্ষিণ অঞ্চলে তাহারা আকস্মিক উদ্যমে যতটা সুবিধা লাভ করিয়াছিল, ভারত আক্রমণের ব্যাপারে তাহা লাভ করিবে না। কেন, সেই কথাটাই বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রণালীবদ্ধভাবে ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে শুধু স্থলসৈন্য দ্বারা তাহা সম্ভব নয়; সঙ্গে সঙ্গে বিমান বহর আবশ্যক এবং জাপান হইতে এই সুদূর অঞ্চলে বিমান এবং সমরসম্ভার পাইতে হইলে শক্তিশালী নৌবহরের দরকার। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং ভারত মহাসাগরে জলপথে সাময়িকভাবে এবং অনেকটা অপ্রত্যাশিত রকমে জাপানীরা প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়াই এত সহজে তাহারা ফিলিপাইন, হংকং, মালয়, যবদ্বীপ এবং ব্রহ্মের দক্ষিণ অঞ্চলটা দখলে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। জলপথে জাপানীরা যদি তাহাদের এই প্রভুত্ব স্থায়ী রাখিতে পারিত তবে তাহাদের পশ্চিমাভিমুখী সমর পরিকল্পনাও অনেকটা নিরাপত্তার সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারিত। এদিকে প্রধান অন্তরায় তাহার পক্ষে ছিল অস্ট্রেলিয়া। তাহারা এই জন্য তাড়াতাড়ি নিউগিনী এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকটা দখল করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। পার্ল বন্দর নষ্ট করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অঞ্চলে মার্কিন নৌবহরের অগ্রগতি তাহারা বন্ধ করে এবং তাহার ফলে ফিলিপাইন সমগ্রভাবে দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাতান অধিকৃত হইবার পর কোরিজিডরে মার্কিন সেনারা বীরবিক্রমে লড়াই চালায়; কিন্তু আমেরিকা হইতে সাহায্য পেঁছিতে পারে নাই, সুতরাং কোরিজিডরের রক্ষীদলকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলেও আগাইয়া গিয়া এই অবস্থা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং এ জন্য সে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রপথে অবস্থিত জাপগণের তেল সরবরাহ পাইবার ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত দ্বীপগুলি অধিকার করিতে চেষ্টা করে এবং মার্কিনের ঐ দিককার উপকূলভাগে নৌবহরের ঘাঁটিগুলি নষ্ট করিবার জন্য কিছু প্রয়াস পায়; কিন্তু সে চেষ্টায় সে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য জাপানীরা ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে শক্তিশালী নৌবহর লইয়া আগাইয়া আসিয়া নিরুদ্বিগ্ন ছিল না।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, কিছুদিন পূর্বে জাপানীরা সিংহল ও মাদ্রাজ উপকূলে বোমাবর্ষণ করে। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, জাপানের উহা বোধ হয় পশ্চিমাভিমুখী অগ্রসর হইবার উদ্যমেরই অঙ্গীভূত ব্যাপার, গতি সে দিকে পরিবর্তিত হইতে না পারিত এমন নয়। আন্দামান দখল করিবার পর জাপানীরা হয়ত সিংহল অধিকারের চেষ্টা করিত এবং মাদ্রাজ উপকূল হস্তগত করিয়া ভারত মহাসাগরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টা কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষ বিপন্ন হইত; কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা দেখিয়া মাদ্রাজ নেতা শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী আশঙ্কা করিতেছেন বটে যে, জাপানীরা এখনও সিংহল অধিকারের জন্য চেষ্টা করিবে এবং মাদ্রাজ উপকূল ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উদ্যমে পুনরায় প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু আপাতত সে আশঙ্কা নাই। জাপানীদের শক্তিশালী নৌবহরের কর্মতৎপরতা বঙ্গোপসাগরে বন্ধ হইয়াছে। কেন বন্ধ হইল, জাপানীদের জাহাজগুলি কোন্ দিকে, কোন্ অভিপ্রায়ে গেল, এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা অনেক হইয়াছে; কিন্তু এখন বুঝা গিয়াছে ব্যাপার কি? অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে একটি ভীষণ রকমের নৌযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ এ সংবাদ পাইয়াছেন। এই নৌযুদ্ধ যে এখনই শেষ হইয়াছে, এরূপ কথা বলা যায় না, ইহার প্রথম পর্ব হইয়া গিয়াছে, ইহা বলা যায়। জাপানীদের নৌবহরের সঙ্গে মার্কিন নৌবহরেরই এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছে, ইংরেজেরও রণতরী ইহাতে যোগ দিয়াছিল। মার্কিন রণতরীবহর অস্ট্রেলিয়ার অভিমুখে আসিতেছে—এই সংবাদ পাইয়াই ভারত মহাসাগর অঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগর হইতে জাপানীদের নৌবহর সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সেদিন তাঁহার বক্তৃতায় এই লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা অন্য দিকে ব্যস্ত থাকাতে জাপানীরা সুযোগ লাভ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি স্থাপনের জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবসরে জাপানীরা অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে লুণ্ঠন চালাইতে সক্ষম হইয়াছে। অতঃপর জাপানীদের ব্যাপক সমর সীমান্তভাগে প্রতিরোধ উত্তরোত্তর প্রবল আকার ধারণ

করিবে। কোরাল সাগরের নৌযুদ্ধে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। এ পর্যন্ত আমরা এই নৌযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। কিন্তু জাপানীরা যে ধরণের মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা হইতেই বোঝা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া খুব প্রবলভাবে ও সাফল্যের সংগে সংগ্রাম করিয়াছে। বিভিন্ন রণাংগনে জাপানীদের বিমান-বহরের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন থাকিতে পারে না, বিশেষভাবে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে এবং কলম্বো ও ত্রিংকোমালী হইতে বিতাড়িত হইবার সময় তাহাদের এই দিক হইতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অসামান্য। মার্কিণ যুক্তরাজ্য যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এবং যে শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা তাহার রহিয়াছে, শুধু তাহাই জাপানের শক্তির অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার সঙ্গে আমাদেরও শক্তির মিলন ঘটিবে। তার ফলে লোভী জাপানীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিবে এবং তাহারা সাজা পাইবে। ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার অভ্যাস নয়। আজ আমার কোন সন্দেহ নাই যে, ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌশক্তি জাপানীদের টুঁটি চাপিয়া ধরিবে এবং কেবল বিমানবল ও তৎসহ সৈন্যবাহিনীর কর্মতৎপরতায় জাপানীদিগকে বিধ্বস্ত করিবে। ইউরোপে হিটলার যদি সুবিধা করেন, তবে এই ব্যাপার আরও তাড়াতাড়ি ঘটিবে।" দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কোন পক্ষের জয়-পরাজয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে এইটুকু বেশই বোঝা যাইতেছে যে, জাপ আক্রমণের প্রথমভাগে মার্কিন নৌবহর নিশ্চেষ্ট ছিল। পার্ল বন্দরের বিপর্যয়ের পর সে নৌবহরের বিশেষ কোন খোঁজখবরই পাওয়া যায় নাই। তৎকালীন জল যুদ্ধের পুরা চোটটা প্রধানত ওলন্দাজ নৌবহর এবং ইংরেজের সিঙ্গাপুরের আকস্মিক বিপর্যয়ে হতবল নৌবহরের উপর দিয়াই যায়। এবার মার্কিন নৌবহর সাড়া দিয়াছে এবং আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের উপর যখন বোমাবৃষ্টি হয়, তখন জাপানীরা মার্কিন নৌবহরের এই কর্মতৎপরতার পরিচয় পায় এবং তাহারা সতর্কতা অবলম্বনচ্ছলে তাহাদের সমস্ত নৌশক্তি প্রশান্ত মহাসাগরে সন্নিবিষ্ট করে। মার্কিনের এই আক্রমণাত্মক নীতির ফলে জাপানী নৌবহরকে পশ্চিমাভিমুখী উদ্যম গুটাইয়া লইতে হইয়াছে। জাপানীদের এই উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই পূর্বাহ্নে ব্রিটিশপক্ষ মার্কিনের সম্মতিক্রমে ভারত মহাসাগরের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত মাদাগাস্কার দ্বীপ দখল করিয়া লইয়াছে। একদিকে ফিলিপাইনকে হারান, অন্যদিকে মাদাগাস্কার অধিকার, খতিয়ানে মিত্রপক্ষের লাভ হইয়াছে কি লোকসান হইয়াছে, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। আপাতত মিত্রপক্ষের এই নীতি হইতে বোঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা জার্মানী এবং জাপানের গ্রীষ্মকালীন সমরোদ্যমকে সংযত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন। জাপানীদের নৌবহরকে বঙ্গোপসাগর ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে মাদ্রাজ এবং সিংহল আপাতত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ভারতের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার সুযোগ মিলিয়াছে। হিটলারের গ্রীষ্মকালীন সমর আয়োজন এখনও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। তিনি ডোনেৎস অববাহিকা অঞ্চলে, অর্থাৎ ককেশাস প্রদেশের প্রবেশ পথে একেবারে কুড়ি লক্ষ সৈন্য সমাবেত করিয়াছেন শুনা যাইতেছে, ইহার পরিণতি কি ঘটিবে জানি না। তিনি যদি ককেশাসের দিকে আগাইতে পারিতেন, মধ্য-প্রাচী এবং ইরাণে সুবিধা করিতে সক্ষম হইতেন, তবে জাপানের কিছু সুবিধা হইতে পারিত; কিন্তু রুশিয়া এখন জার্মানীর পথ জুড়িয়া রহিয়াছে। একদিকে পশ্চিম দিক হইতে বন্ধুশক্তি জার্মানদের পরিপোষকতার অভাব অন্য দিকে পশ্চাদ্ভাগেই শত্রু আক্রমণ হইতে অক্ষত দেহ অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিন নৌবহরের সমরোদ্যমের আতঙ্ক—এমন অবস্থায় জাপানীদের পক্ষে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে হইলে জাপানীদের পক্ষে নৌবল এবং সেই সঙ্গে বিমানবলের সর্বাপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। এই দুইয়ের কোনটির দিক হইতে দুর্বলতা থাকিতে ভারত আক্রমণ করা জাপানীদের পক্ষে সহজ হইবে না। মিত্রপক্ষের সমরোদ্যম এই দিক হইতে তাহাকে যথেষ্ট রকম কাবু করিবার মত শক্তিশালী হইয়াছে কি না, এখনও বলা যায় না। তবে আপাতত দেখা যাইতেছে যে, জাপানীরা মিত্রপক্ষের সমরোদ্যমের চাপে—সে চাপ যে দিক দিয়া এবং যেমনভাবেই হউক, ভারত মহাসাগর হইতে নৌবহর সরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নৌবহরের সাহায্যবিহীন অবস্থায়, শুধু কয়েকখানা ডুবো-জাহাজ এবং রেঙ্গুন বন্দরে অবস্থিত কয়েকখানা মালবাহী জাহাজের সাহায্যে তাহারা ভারতবর্ষের উপর প্রণালীবদ্ধভাবে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে ব্যর্থকাম হইবে। তবে ইহা সত্য যে, জাপানীরা ভারতের সন্নিহিত হইয়াছে এবং এমন অবস্থায় শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চল নহে, কলিকাতা এবং আসাম ও বাঙলা দেশের কোন কোন অঞ্চলের উপর তাহারা বোমা বৃষ্টি করিতে পারে। চট্টগ্রামে বোমা বৃষ্টি করিবার পর আসামের পূর্বাঞ্চলে একটি শহরেও তাহারা বোমা বৃষ্টি করিয়াছে। জাপানীরা স্থলপথে বা জল-পথে ভারত আক্রমণ করিতে সক্ষম না হইলেও বিমানপথে তাহাদের এই আক্রমণের আতঙ্কও উপেক্ষা করিবার নয়। দেশবাসীকে আজ ধীর এবং স্থিরভাবে এই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে; আতঙ্কিত হইলে চলিবে না। নিজেদের আত্মরক্ষার শক্তিকে সংহত করিতে হইবে। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সকলকে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমানে বাঙলা দেশের যেরূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে, বাঙালী জাতি বহুদিন এমন সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু বিপদের ভিতর দিয়াই আত্মশক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে এবং আত্মশক্তির উন্মেষের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিবার সূত্র রহিয়াছে। বর্তমানের এই সংকটে বাঙালী জাতির মধ্যে নূতন জীবনের উদ্বোধন ঘটে, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। এই দিক হইতে বিপদকে আমরা শঙ্কা করি না, বরং বিপদের মধ্য দিয়া সত্যকার শক্তিই লাভ করিতে চাই।

বাঙালীর সাহিত্য সাধনা *

ভদ্রমহোদয়গণ,

অনেকটা সংকোচের সংগে আপনাদের এই আমন্ত্রণ আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। বাণীর মন্দিরের যাঁরা প্রখ্যাত-নামা পূজোরী, তাঁরাই অনেকে আপনাদের এই সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেছেন। তাঁদের সে সাধন-ভজন আমার কিছুই নেই, আমি সর্বাংশে অযোগ্য ব্যক্তি; কিন্তু তবু আপনাদের এ স্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করতে আমার সাহসে কুলোয় নি। নিজের অযোগ্যতা ষোল আনা জেনেও আজ আপনাদের এখানে আসতে হয়েছে। কিছু বলব ব'লে আসি নি, এসেছি, আপনারা মায়ের যেভাবে পূজো চালিয়ে আসছেন, তার জন্যে আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে। আপনাদের অনুগ্রহে এই সুযোগ যে আমি পেয়েছি, এজন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা বাঙালী ব'লে নিজেরা গর্ব অনুভব ক'রে থাকি। আজকাল গর্বের সবচেয়ে বড় বিষয় হ'ল ধন। কিন্তু আমরা বাঙালীরা বলতে গেলে নির্ধন, তবে কিসের গর্ব আমাদের? এর উত্তরে বলব, সাহিত্যই আমাদের বড় ধন এবং সাহিত্য সাধনাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। বাঙালীর গর্ব করবার যদি কিছু থাকে, তবে তার এই সাহিত্য সাধনা। তার যতদিকে যত কিছু প্রভাব বা প্রতিপত্তি, এই সাহিত্য সাধনাকেই আশ্রয় করে। বাঙালীর মনীষা, বাঙালীর জাতীয়তা, বাঙালীর স্বদেশপ্রেম সবই গড়ে উঠেছে তার এক সাহিত্য সাধনাকে ভিত্তি করে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, যজ্ঞের বলে বড় হও, যজ্ঞই ইষ্টকামধুক্। বাঙলা দেশের বড় সৌভাগ্য হ'ল এই যে, প্রকৃত যাজ্ঞিকেরা বাঙলা দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের কথায়, যজ্ঞই সাহিত্য সাধনার পথ, হোমানলের ভিতর দিয়ে বাণী মূর্তি ধরে উঠেন এবং বাঙলা দেশের যজ্ঞশিষ্টাশিন সন্তগণ নিজেদের সুদীর্ঘ সাধনার যে সম্পদ জাতিকে দিয়ে গেছেন, তার মর্যাদা যদি আমরা বজায় রাখতে পারি, আমরা যদি সেই হোমানল জ্বালিয়ে রাখতে পারি, তবে আমাদের দুর্দিন কেটে যাবে, শুধু বাঙলায় নয়, সমগ্র ভারতে জাগবে নূতন শক্তি। এ আমাদের আত্মপ্রশংসার কিছু নয়, কিংবা অতিরঞ্জিত ক'রেও আমি কোন কথা বলছি না। ভারতে আজ যে নূতন যুগের আভাস আমরা পাচ্ছি, পরাধীন ভারতের মর্যাদা আজ যে প্রবলের কাছেও স্বীকার্য হ'য়ে উঠেছে, এর কারণ যদি খুঁজতে যাই, তবে দেখতে পাব, এ জাগরণ প্রাণশক্তি পেয়েছে বাঙলা দেশেরই সাহিত্য সাধকদের সাধনার ভিতর থেকে। যে মনুষ্যত্ব আজ ভারত-ভূমিতে জেগে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে বাঙলার মধুচ্ছন্দা সাহিত্যিকদেরই প্রেরণা। বৈদেশিক প্রভাবে গোটা ভারত যখন পিষ্ট হয়ে পড়েছিল, চারদিকে জমে উঠেছিল আঁধার, ভারতের সেই সংকটকালে, দুর্যোগময়ী সেই অমাবস্যার রাতে বাঙলার সাধক বাণী সাধনার ভিতর দিয়ে শক্তির উদ্বোধন করেছিল। বলবই একথা যে, ভারতের আত্মা পিষ্ট হ'তে বসেছিল, বাঙালীর সাহিত্য সাধনাই তাকে অনাহত রেখেছে।

আজ এই সত্যকে প্রাদেশিকতার বশে উড়িয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা হচ্ছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সভার উদ্বোধন করতে গিয়ে শ্রীযুত অন্নদাকুমার চক্রবর্তী মহাশয় সে কথাটা বলেছেন। কিছুদিন হ'ল আমি সাঁওতাল পরগণায় গিয়েছিলাম, সেখানে এর পরিচয় পেয়েছি। বাঙলার বাইরে বাঙলা ভাষাকে চেপে মারবার জন্যে চেষ্টা চলছে। বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁরা ভারতের জাতীয়তার দোহাই দিয়ে থাকেন, তাঁরাই হ'লেন এ কার্যের উদ্যোক্তা। বাঙলা ভাষার নিকট থেকে তাঁরা কি পেয়েছেন, তা তাঁরা বুঝছেন না এবং বাঙলা ভাষাকে পিষ্ট করবার চেষ্টার ফলে গোটা ভারতের কি ক্ষতি হবে, তাঁরা তাও তলিয়ে দেখছেন না। তাঁরা বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলে জোর ক'রে হিন্দী চালাবেন, এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের সংকল্প। তা হোক, এতে আমরা বাঙালী, আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ আছে ব'লে আমি মনে করি নে। কোন ভাষাকে জোর করে চালান যায় না; ভাষার বিস্তার ঘটে তার নিজের সম্পদে। সাহিত্য সাধনায় যজ্ঞানল যতদিন আমাদের প্রজ্বলিত থাকবে, ততদিন বাঙলা ভাষা নিজের জোরেই সম্প্রসারিত হবে। প্রাদেশিকতার কোনরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থাই তার গতিকে রোধ করতে পারবে না। পেতলকে সোনা ব'লে চালানোর চেষ্টা কিছুদিন চলতে পারে, কিন্তু তাতে স্বর্ণ তার স্বদীপ্তি হারায় না এবং স্বমহিমাতেই সে মর্যাদা লাভ করে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে এ সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতেও বলছি না, বাঙলা সাহিত্য যদি সত্যই আমাদের গর্বের বিষয় হয়, তবে তার মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টাও আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক হবে এবং তার সম্বন্ধে লঘুতাকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারব না।

যজ্ঞের এই যে প্রবৃত্তি সাহিত্য সাধনার যা মূলে, সে জিনিস জাগে কিসে?—আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সুন্দরকে দেখলে এ জিনিস জাগে, এ জিনিস জাগে প্রেমের দৃষ্টিতে। বাঙালী সুন্দরকে দেখেছিল। প্রেমের দৃষ্টি সে পেয়েছিল। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত মানবাত্মার অনাহত মহিমা বাঙালী জাতি যাতে উপলব্ধি করতে পারে, তাই দিয়েছিলেন এদেশে সাধকের দল। সর্বত্র যিনি মধু-স্বরূপে রয়েছেন, তাঁর লীলার সংগে বাঙালীর অন্তরের ছন্দকে এঁরা যোগ করে গিয়েছেন। বাঙালী আমরা, আমাদের যা কিছু গর্ব এঁদের নিয়ে। বাঙলার এই সব কাঁথা-করঙ্গধারী বাউল এবং বৈষ্ণবের দল আমাদের চিরদিন বন্দনীয় হ'য়ে থাকবেন। অমর তাঁদের অন্তরের অবদান, বাঙলা দেশকে আত্মরসে অনুপ্লাবিত ক'রে রেখেছে। পুষ্পিত এবং পল্লবিত হয়েছে এদেশের মাটি এঁদেরই প্রাণরসে সিঞ্চিত হয়ে। এঁরাই বসন্ত এনেছিলেন বাঙলায় এবং এঁদেরই গানে বাঙলার কুঞ্জে কুঞ্জে সেদিন কোকিল ডেকে উঠেছিল। এঁদের কাছ থেকে জাতি পেয়েছিল আত্ম-পরিচয়, জেনেছিল আপনার মহিমাকে, চিনেছিল আপনার জনকে। জাতির অসহায়ত্ব এতে কেটে গিয়েছিল, জাতি পেয়েছিল আক্ষেপিকতার ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অন্তরাত্মায় অনপেক্ষ মহিমা। পারি-ভাষিক হিসাবে রাজনীতি এঁদের সাধনার মধ্যে ছিল না, কিন্তু রাজনীতিক কাজটা হয়েছিল এতে। দেশের জন-জাগরণের সূত্র এঁরা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সেবার ভিতর দিয়ে জন-মর্যাদা জাতির অন্তরে এঁরা জাগিয়েছিলেন। বাঙলার সাহিত্যের বিশিষ্ট দান যে জাতীয়তা তার বীজ উপ্ত হয় সেই থেকে। এর পরও কিছু সময়ের জন্য পরকীয় সভ্যতার প্রভাব এদেশে এসে পড়েছিল এবং জাতির সংস্কৃতিকে অনেকটা অভিভূত করেছিল; কিন্তু বাঙলার অকিঞ্চন সাধকদের অবদানকে তা নষ্ট করতে পারে নি। পরকীয় প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে সে সত্য আবার ব্যক্ত হ'ল আপনার মহিমায়। স্যার সুরেন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শিষ্যগণের প্রসাদে বাঙলা দেশে জাতীয়তার যে সঞ্জীবনী প্লাবন এসেছিল, তা নষ্ট হ'য়ে যায়; কিন্তু আমি বলব, নষ্ট হয়নি তা এবং আত্মলগ্ন সে দান, সে দান নিত্য দান, তা নষ্ট হ'তে পারে না; কিছুদিনের জন্য বৈদেশিকতার মোহে সে জিনিসটা গোপন ছিল মাত্র, আবার নবীনরূপে তা জেগে উঠে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সাধনার যুগের কথা বলেছেন। জাতিকে পরমুখাপেক্ষিতার পথ থেকে ঘরের দিকে ফেরানোর কাজে ব্রাহ্ম-সাধকবর্গের অবদান অসামান্য, ইহা কে অস্বীকার করবে? কে অস্বীকার করতে পারে, তাঁদের ভগবন্নিষ্ঠা, সদাচার এবং পবিত্র জীবনের শুভ্র সত্ত্বময় প্রভাবকে। কিন্তু আমি এই কথা বলব যে, এর মূলেও বাঙলার অকিঞ্চন সাহিত্য সাধকদের প্রভাব ছিল। সেই বস্তুই বৈদেশিক

অনুকরণের পথ থেকে বলিষ্ঠ প্রেরণা দিয়ে জাতিকে ঘরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং শ্রোত্ত আভিজাত্যের স্তর থেকে জাতির চিত্তকে, জাতিকে জনসেবার মাধুর্যে নিষ্ঠিত ক'রে তোলে। সংস্কারের নামে জাতিকে সেই জিনিসই পরানুকরণের স্রোতে শেওলার মত ভাসতে দেয় নি; জনগণের চিত্তে প্রাণধারায় তাকে সংযুক্ত করে বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতির শতদলকে সে জিনিসই নবীন সৌন্দর্যে এবং সৌরভে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে। বিজয়কৃষ্ণ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙলার সাহিত্যে একটা যুগবিপর্যয়কর ব্যাপার। উপরভাসা রকমে দেখতে গেলে জিনিসটা হয়ত ধরা পড়বে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বাঙলার অকিঞ্চন এই বৈষ্ণব সাধকদের প্রভাব বিশেষভাবেই পড়েছিল। উপরে উপরে দেখলে মনে হবে, 'মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী, শ্যাম-বিলাসিনীদের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের মানুষ-লীলার সঙ্গে, কুরুক্ষেত্রর সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের বেশী পরিচয়, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয়টা ঘটেছিল যে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়েই একথা স্বীকার করতেই হবে এবং বাঙলার অকিঞ্চন সেই বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের সাধনাই স্বদেশপ্রেমের অগ্নিময়ী প্রেরণায় তাঁর লেখাকে শক্তিশালী করেছিল। বঙ্কিমের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ জেগেছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যকদের অবদানের মারফতেই, তবে মোড়টা একটু ভিন্ন দিকে ঘুরেছিল মাত্র। সেখানে কৃষ্ণ অনুধ্যানের অন্তর্নিহিত মাধুর্য বা সৌম্যতা জাতির দুর্দশার অনুভূতির উত্তাপে উগ্র আকার ধরেছিল, এই কথাই বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মায়ের মূর্তি শুধু বিদেশীর রাজনীতির চশমা পরে দেখেন নি, দেখেছিলেন এ দেশের জনগণের সেবারসে চিত্তকে নিষিক্ত করে। এদেশের নরনারীর মধ্যে সুন্দরকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি জাতির কাছে এমন মধুর হয়েছিলেন। জাতির প্রতি আত্যন্তিক সেবার রসশূন্য যদি বিদেশী মক্স করা জিনিস হ'ত তাঁর সৃষ্টি, তবে তা টিকত না। মানুষের মন পরোক্ষতাকে একান্তভাবে স্বীকার করে নিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের অবদান—সর্বাত্মস্নপন সেই সেবারই অবদান। এ জাতির নীচ, দরিদ্র, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত এদের মধ্যে কে আর এমন করে সুন্দরকে দেখেছে বা দেখতে পেরেছে? বাঙলার আকাশে বাতাসে মধুর স্পর্শ এমন করে কে আর পেয়েছে, আর জাতিকে বিতরণ করেছে, আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে সেই মধু—সেই সোমসুধা—বেদের ভাষায় "বীরায় শূরায়"? সাহিত্য সাধনার মূলীভূত রস, নিত্য সত্য ও সনাতন এবং সনাতন বলেই সমগ্র বিপর্যয় এবং পরিবর্তনকে স্বীকার ক'রেই তা আত্মমহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ। সে রসের সাধনায় ভীরুতা থাকতে পারে না, সংকীর্ণ হয়ে টিকে থাকবার দুর্বলতা নেই তার মধ্যে, আছে সজীবতা, আছে প্রতিকূলতাকে আনুকূল্যে পরিণত করবার মত তা'তে প্রচুর বল, আছে স্বাচ্ছন্দ্য। পরিবর্তনের গতিকে রঙ্গময় বিভঙ্গীতে পরিণত করে যে জিনিস জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, সে জিনিস সাহিত্যে টিকে থাকবার যোগ্য নয়। এই হিসেবে সাহিত্যের রীতিই হ'ল গতি, এবং সাহিত্য হ'ল প্রগতিশীল। সুতরাং সাহিত্যকে যাঁরা অচলায়তনে রুদ্ধ রাখতে চান, পাছে আধুনিক আলো-বাতাস গায়ে লাগলে তার অসূর্যম্পশ্য পবিত্রতা নষ্ট—এই আশঙ্কা করেন, আমি তাঁদের মত সমর্থন করতে পারিনে। যুগের গতির ছন্দ জাতির অন্তরে বাজিয়ে সাহিত্য তাকে দেবে স্ফূর্তি, ইহাই সত্য; কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, আমার তরুণ বন্ধুদের আমি সে কথাটা বিশেষভাবে বলতে চাই। সে কথাটা হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের এই প্রগতির ছন্দটি পেতে হবে দেশের এবং জাতির আত্মায় নিজেকে লগ্ন করে, বিদেশীর সূত্র মক্স করে নয়। এ যুগের বাণী—সাম্যের বাণী, আভিজাত্যকে ভেঙ্গে ফেলবার বাণী, অন্য কথায় বিপ্লবের বাণী। কিন্তু এই রসকে যদি বিগাঢ় করে এ দেশের সাহিত্যকে তাঁরা সঞ্জীবিত করতে চান তবে বাঙলার সাধনার বিশিষ্ট সেবার প্রবৃত্তিকে তাঁদের অন্তরে সত্য করতে হবে; দেখতে হবে এ দেশের নরনারীর মধ্যে আত্মাকে, মধুরকে—তবেই তাদের বেদনা বিপ্লব জাগাবার মন্ত্রে বিগাঢ় ছন্দে জাতির চিত্তকে নাচিয়ে তুলবে; এই জন্যেই বাঙলার অকিঞ্চন বৈষ্ণব সাধকদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি একটু রাখতে বলি। যতই তাঁদের বুঝবেন, ততই জাতির প্রাণধারার সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম হবেন। ফরমাইস মত কৃত্যের স্তর সাহিত্যের স্তর নয়, অহঙ্কারের স্তর সাহিত্যের স্তর নয়; অনহঙ্কৃত আত্মনিবেদন যেখানে, সেখানেই রস এবং সাহিত্যের সাধনা—এই রসেরই সাধনা।

আমি জাতীয়তার কথা এনে ফেলছি। কিন্তু না এনেও উপায় নেই; সাহিত্য সর্বজনীন, তা সার্বভৌম, এ কথা কে না বলবে; কিন্তু এই সর্বজনীনতার সূত্র রয়েছে আপনজনের মধ্যে। সর্বজনীন যে সত্য, সে সত্যকে আন্দাজ অনুমানের ভেতরে একান্ত করে পাওয়া যায় না, প্রতিবেশের মধ্যেই আগে তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং সেই প্রত্যক্ষতার রস সেবামাধুর্যে অহঙ্কারকে যখন ডুবিয়ে দেয়, ব্যষ্টি বিচারের গণ্ডীকে যখন ফেলে ছাপিয়ে, সে রস তখন বাঙলার বৈষ্ণব-সাধক মহামনীষী শ্রীজীব গোস্বামী মহারাজের ভাষায় তা "প্রবলতর উচ্ছলৈ মমজ্জু দিশো দশঃ"। প্রবলতর উচ্ছ্বাসে দশ দিক ডুবিয়ে ফেলে এবং ব্যক্তি পায় ব্যাপ্তিকে; বিশ্বের সঙ্গে এই পথেই সাহিত্যের যোগ বজায় থাকে এবং সে বস্তু সত্যতা ও নিত্যতা লাভ করে। বাঙলা সাহিত্যের ও প্রগতির এই রীতি এবং এই রীতি বজায় রেখেই বাঙলা সাহিত্য প্রাদেশিকতার ব্যবধানকে অতিক্রম করে সমগ্র ভারতে নব জীবনের উদ্বোধন করেছে। প্রাদেশিকতার বিরোধকে মানে নি বাঙলা সাহিত্য, মানবেও না। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই বছর দুই আগে বলেছিলেন, মহাত্মাজীই সমগ্র ভারতে জাতীয়তার উদ্বোধন করেছেন, তাঁর আগে বাঙলা সাহিত্যে এ বস্তু ছিল না। তাঁর এ কথা সত্য নয়। মহাত্মাজীর প্রতি সমগ্র শ্রদ্ধা বজায় রেখেও এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। বাঙলা ভাষাই ভারতে নব জাতীয়তার উদ্বোধন করেছে এবং সেজন্য বাঙালীকে জাতীয়তা বিসর্জন দিতে হয়নি। বাঙলা দেশকে সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা—এ দৃষ্টির বলেই সমগ্র ভারতের প্রাণধারার সঙ্গে বাঙালী যুক্ত হয়েছে এবং সমগ্র ভারতকেও সে নাচিয়েছে, মাতিয়েছে। এখনও বাঙলা সাহিত্যের প্রসার এবং উন্নতি সমগ্র ভারতের উন্নতি ও প্রগতিরই সহায়ক হবে। বিশ্বসভ্যতার অবদানও সমৃদ্ধ হবে বাঙলার এই সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়ে বাঙলার নর-নারীর প্রতি সাহিত্যের সেবা নিষ্ঠাকে আশ্রয় করেই। আপনাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আপনারা দেশের কথা ভাবুন, ভাবুন—এ জাতির দুঃখকষ্ট, দৈন্য ও বেদনার কথা, সেই পথে সাহিত্য সৃষ্টির পরম বল পাবেন। যে বল প্রত্যক্ষতার বল, আপনারা সে বস্তু সত্য করে একান্ত করে লাভ করতে সমর্থ হবেন এবং প্রত্যক্ষতার সেই বলে আপনাদের সৃষ্টির মধ্যে জাতি, আপনার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করবে। আপনাদের সাধনা সত্য হবে, নিত্য হবে এবং সার্থকতা লাভ করবে। জাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আপনাদেরই উপর; রাজনীতিকদের সাধনা অনেকটা সাময়িক; কিন্তু আপনাদের যোগ হ'ল আত্মার সঙ্গে, সত্যের সঙ্গে, এজন্য তা অমোঘ। বাইরের প্রতিকূলতা সে সাধনার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। এ সাধনার অভিক্রমের নাশ নেই, এ ব্যাপারে লাভ ছাড়া লোকসানের ভয় নেই। একান্ত লাভের সেই আস্বাদন আপনারা জাতিকে দান করুন। আপনাদের সাধনা জয়যুক্ত হউক।

---

*বারণপুরের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে 'দেশ' সম্পাদকের অভিভাষণ হইতে অনুলিখিত।

দেহ ও মন

—জ্যোতি সেন

N. MUTSUDDI

১৬

ইট-কাঠ, লোহালক্কর, চূণ, সুরকি, সিমেণ্ট, বালি সব লরী বোঝাই করিয়া এক জায়গায় আনিয়া জড় করা হইয়াছে। কুলী মজুর, ইটমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, জমাদার, ঠিকাদার, সবাই আসিয়া যথাস্থানে জুটিয়া গিয়াছে। কারখানার বাড়ি তৈরী হইতেছে।

যত শীঘ্র সম্ভব কারখানার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সুতরাং অনতিবিলম্বে বাড়ি তৈরী হওয়া চাই। এজন্য দিন রাত কাজ চলিয়াছে। একদল লোক দিনে কাজ করে, আর এক-দল কাজ করে রাত্রিকালে। প্রশান্ত ও বরেণের বিশ্রাম নাই। তাহারা দিনরাত খাটে।

সুরু হইতেই আপিস বসিয়াছে। কেরাণী, চাপরাসী, দারোয়ান, সকলেই যার যার কাজ করিতেছে। বড় বড় হিসাবের খাতা, ভাউচারের ফাইল, চিঠিপত্র এবং আনুসঙ্গিক কাগজ ক্রমে ক্রমে জমিয়া উঠিয়াছে।

জয়ন্ত পদ্মাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে কাজের তত্ত্বাবধান করিতে আসে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সমস্ত কাজ দেখে। প্রতিদিন কি পরিমাণ কাজ হইতেছে তাহার হিসাব করে।

কাজ খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কোথাও কোন ত্রুটি নাই। জয়ন্তের ধারণা লোকগুলিকে বেশি খাটাইয়া লওয়া হইতেছে। মিস্ত্রি ও মজুরদের সে জিজ্ঞাসা করে। তাহারা আশ্বাস দিলে সে আশ্বস্ত হয়।

দিন কয়েক অন্য কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় জয়ন্ত এদিকে আর আসিতে পারে নাই। রোজই সে খবর পায় কাজ নিয়মিত চলিয়াছে। টাকার প্রয়োজন হইলে সে চেক্ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু প্রশান্ত ও বরেণ দিনরাত খাটিতেছে অথচ সে একবারও যাইতে পারে না, ইহা যেন অন্যায় বলিয়াই তাহার মনে হয়।

সেদিন বৈকালে একটা সভায় বক্তৃতা দিয়া সন্ধ্যার আগেই জয়ন্ত বাড়ি ফিরিল। পরদিন তাহাকে কৃষক অন্দোলনের কাজে কলিকতার বাহিরে যাইতে হইবে। যাওয়ার আগে কারখানা বাড়ির কাজ একবার পরিদর্শন করা উচিত। এই মনে করিয়া সে পদ্মাকে বলিল—'চল পদ্মা, কারখানা বাড়িটা একবার দেখে আসি, অনেক দিন দেখতে যাইনি।'

পদ্মা এই প্রস্তাবে একটু বিরক্ত হইল।

'যেতে বলছ যাব',—বলিয়া পদ্মা তাহার আপত্তিও জানাইল—কিন্তু ট্রামবাসে আমি যেতে পারব না। ট্রামবাসে গিয়ে আবার হাঁটতে হয় অনেক দূর। অত হাঁটাহাঁটি আমার ভাল লাগে না।'

—'তুমি যদি না যাও আমি একাই যাব।'

'যাব না, এমন কথা ত আমি বলিনি।'

পদ্মা পুনরায় বলিল—'যদি গাড়ি করে' আমাকে নিয়ে যাও আবার গাড়িতেই নিয়ে এস তা হলে আমার আপত্তি নেই।'

ঐশ্বর্যের দিকে পদ্মার দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া জয়ন্ত বিস্ময়ে ও সংশয়ে পদ্মার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার প্রশান্ত কপালে ছোট ছোট ঢেউ দেখা দিল। আবার মুহূর্তেই তাহা মিলাইয়া গেল।

দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া জয়ন্ত প্রফুল্ল হইয়া বলিল—'আচ্ছা, একদিনের জন্য আমরা না-হয় বে-পরোয়াই হ'ব। একদিনের এতটুকু আনন্দ পয়সা দিয়ে কিনতে বল—তাই কিনব। কিন্তু একদিনের জন্য মাত্র। অপব্যয় আর অপচয় আমি বরদাস্ত করতে পারি না।'

পদ্মার মুখখানা যেন মেঘভারে আরও ভারি হইয়া উঠিল।

পদ্মা বলিল—'প্রতিমা যে গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায় তাত তোমার সহ্য হয়!'

'প্রতিমার কথা আলাদা',—বলিয়া জয়ন্ত হাসিল। তারপর পুনরায় কহিল—'কাজের জন্য তার গাড়ির দরকার হয়। কিন্তু গাড়ি ছাড়াও ত আমার চলে। আমার যা' দরকার তার অতিরিক্ত কিছু আমি চাই না।'

পদ্মা আর ইহার উপর কথা বলিতে ভরসা পাইল না।

কিছুক্ষণ বাদে পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল—'খাওয়াদাওয়া সেরে বেরুলে হয় না?'

জয়ন্ত একটু ভাবিয়া বলিল—'বেশত! অনেক রাত্রে আলো জ্বালিয়ে কিভাবে কাজ হয় দেখা যাবে।'

পদ্মা খাওয়ার জোগাড় করিতে চলিয়া গেল, আর জয়ন্ত প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখিতে বসিল।

অনেক রাত্রে ট্যাক্সি করিয়া তাহারা বাহির হইল।

ক্লান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন নগরীর এক প্রান্তে অন্ধকার কোণে বড় বড় আলো জ্বালাইয়া বিরাট কর্মব্যস্ততা একটা অতিকায় জানোয়ারের মত গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে। যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভয়াবহ।

উঁচু উঁচু লোহার থামে বাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পেট্রোল ল্যাম্প নিরবচ্ছিন্ন শোঁ শোঁ শব্দে আলো উদ্গীরণ করিতেছে, সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে অসংখ্য বাঁশের ভারায় ঘেরা কারখানা বাড়ি, বাড়ি নির্মাণের স্তূপীকৃত মালমসলা,

মিস্ত্রিদের অস্থায়ী কর্মশালা, আর সরল রেখার মত আশপাশেই রাস্তাঘাট। অনেক উ'চুতে বাঁশের ভারায় দাঁড়াইয়া ইট-মিস্ত্রিরা ইটের পর ইট বসাইয়া দেওয়াল তুলিতেছে, নীচ হইতে মজুরেরা তাহাদের মালমসলা জোগাইতেছে। নীচ হইতে উপরে আবার উপর হইতে নীচে ক্রমাগত লোকজন উঠানামা ও ছুটাছুটি করিতেছে। কারখানা বাড়ির আশপাশে কর্মশালায় নানা রকমের কাজ চলিয়াছে। বিভিন্ন কাজের জায়গা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি উঠিয়াছে। বড় বড় হাতুড়ি দিয়া পাথর ভাঙ্গার শব্দ, বাষ্পচালিত যন্ত্রের গম্ গম্ আওয়াজ, গাড়ির চাকার কাতর আর্তনাদ, বড় বড় গাদাম কাঠ ফেলিবার চাপা বজ্রনির্ঘোষ, সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একটা ঐক্য নিনাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

গভীর ঘন অন্ধকারের মাঝখানে তীব্র আলোক ঝলসিত কর্মকোলাহল মুখর এই জায়গাটি একটা ব্যস্তবাগীশ দ্বীপের মত দেখাইতেছে। মনে হয় ক্ষিপ্রতার তাগিদে কর্মতৎপরতা যেন অন্ধবেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে।

জয়ন্ত ও পদ্মা আপিস ঘরের সমুখে দাঁড়াইল।

সেখানে জনকয়েক কর্মচারী বস্তা বোঝাই কি কি সব মাল-পত্র গণিয়া বাছিয়া লইতেছে, খাতায় জমা করিতেছে, তারপর গুদামে পাঠাইয়া দিতেছে। অন্ধকার হইতে কোন লোক আসিতেছে কাজের জায়গায় মাল লইয়া যাইবার জন্য, আবার মাল লইয়া অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে। এক জায়গায় একটা আলোর নীচে একজন কেরাণী বসিয়া আছে। সমুখে হাজিরা বই। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে হাজিরা মিলাইতে গিয়া গরমিল হওয়ায় সে মাথা চুলকাইতেছে।

কোথা হইতে বরেণ হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিল। জয়ন্ত ও পদ্মাকে অসময়ে সেখানে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এত রাত্তিরে?'

জয়ন্ত বলিল—'দেখতে এলাম।'

—'চলুন দেখিয়ে নিয়ে আসি—প্রশান্তবাবু ওদিকেই রয়েছেন।'

—'প্রশান্তকে ডাক, কথা আছে।'

প্রশান্তকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়া বরেণ জয়ন্ত ও পদ্মার সম্মানার্থ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কারখানা বাড়ির কাজ কি পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে এবং কত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, বরেণ সবিস্তারে তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল।

জয়ন্ত নিঃশব্দে শুনিতেছিল। বরেণের কথা শেষ হইলে জয়ন্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'সম্পূর্ণ কাজ শেষ হ'তে আর কতদিন লাগবে?'

বরেণ কহিল—'সে কথা প্রশান্তবাবু বলতে পারেন।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্য কথা উত্থাপন করিল। কহিল—'আমাকে যে একজন লোক দেবে বলেছিলে সেক্রেটারীর কাজ করবার জন্যে, তার কি হল? তোমার কোন এক বন্ধুকে আমার কাছে পাঠাবে কথা ছিল, কিন্তু কোথায় সে—আমি ত আর দেরী করতে পারি না।'

বরেণ একটু হাসিয়া বলিল—'সে গিয়েছিল আপনার কাছে, কিন্তু আপনার দেখা পায়নি। আপনি বাড়ি ছিলেন না।'

—'তা' হবে! কাজকর্মে ঘুরে বেড়াই—ফিরতে রোজই দেরী হয়ে যায়। সে হয়ত অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে গেছে, তাই আর যায়নি।'

—'কাল সকালে তাকে পাঠিয়ে দেব?'

জয়ন্ত একটু ভাবিয়া বলিল—'সকাল আটটার মধ্যে যদি পার তা' হ'লে দিও। আটটার পর আমি বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু তুমিই কি আটটার মধ্যে তাকে খবর দিতে পারবে? কত রাত্রে বাড়ি ফিরবে তারও কিছু ঠিক নেই,—তোমার পক্ষেই হয়ত সম্ভব হ'য়ে উঠবে না।'

বরেণ বলিল—'আমি খুব ভোরবেলা গিয়ে তাকে ধরব। তাকে দিয়ে আপনার কাজ খুব ভাল হবে একথা আমি জোর করে বলতে পারি। যেমন সে বিদ্বান তেমনি বুদ্ধিমান—আর খুব অধ্যবসায়ী।'

জয়ন্ত পদ্মাকে বলিল—'সে হয়ত তার অবসর মত তোমাকে একটু একটু পড়াতেও পারবে।'

পদ্মা কহিল—'তোমার কাজ করেই সে কুল পাবে না—আমাকে কখন পড়াবে?'

কথাটা মিথ্যা নয়। জয়ন্তের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে একজনের পক্ষে তাহা করিয়া কূল পাওয়া কঠিন।

জয়ন্ত বলিল—'তুমি যদি তার কাছে পড়াশোনা করই তা' হলে যেমন করে পারি তাকে আমি অবসর করে দেব।'

প্রশান্ত আসিয়া কহিল—'আমি ত' বাড়ি যাব যাব ভাবছিলাম, এখনো খাওয়া হয়নি।'

জয়ন্ত দেখিল প্রশান্ত এ কয়দিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। সে যে অতিরিক্ত খাটুনী খাটিতেছে তাহা তার চোখমুখ দেখিলেই বুঝা যায়। জয়ন্ত চিন্তিত হইয়া কহিল—'এভাবে আর কতদিন চলবে প্রশান্ত! আমার কিন্তু ভাল মনে হ'চ্ছে না।'

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল—'যতদিন চলে চলুক না।'

'অচল হয়ে পড়বার আগেই সাবধান হওয়া ভাল নয় কি?' বলিয়া জয়ন্ত বরেণের দিকেও তাকাইল। সে পুনরায় বলিল—'তাড়াহুড়ো করবার কোন দরকার নেই। রাত্রির কাজ বন্ধ করে দাও।'

প্রশান্ত কাতরকণ্ঠে কহিল—'কেন? কি হয়েছে?'

ইহার উত্তরে জয়ন্ত যে আশঙ্কার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাই ঘটিয়া গেল। হঠাৎ কারখানা বাড়ির উপর হইতে মাটিতে পড়িয়া যাইবার মত দুপ্‌দাপ্ শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ও আর্তনাদ উঠিল। প্রশান্ত, বরেণ ও জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটিল, গিয়া দেখিল একটি মিস্ত্রি ও দুটি জোগানদার রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া আছে। তাহাদের আর্তনাদে ও সকলের কোলাহলে রাত্রির আকাশ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে।

জয়ন্ত সেই মুহূর্তে তখনকার কাজ বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়া প্রশান্তকে বলিল—'পদ্মাকে পে'ৗছে দিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও প্রশান্ত। আর বরেণ, তুমি মিস্ত্রি ও মজুরদের বাড়ি গিয়ে খবরটা দিও। পরের ব্যবস্থা আমি পরে করব। আপাতত এদের নিয়ে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।'

আর বিলম্ব না করিয়া জয়ন্ত মিস্ত্রি ও মজুর দুটিকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া হাসপাতালে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

সারমেয় সন্দর্ভ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

হিন্দী কবি তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে—

"পহিলে কুত্তা কুত্তা পালে—।" †

দোঁহার বাকীটুকু ফুটনোটে দেওয়াই ভাল। ইহাতে চার রকম কুকুরের তালিকা দেওয়া হইতেছে; তারমধ্যে প্রথম নম্বরই, যে কুকুর পালে। অত্যন্ত মানহানিকর উক্তি, সন্দেহ নাই। বাকীটুকু যাহা ফুটনোটে দেওয়া হইল, তাতে আরও তিনজনের মানহানি করা হইয়াছে। তুলসীদাসের এই উক্তি শুধু কুকুরের নয়, কুকুরের প্রতিপালকের প্রতিও অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

বর্তমান জগতে তুলসীদাসের কথাই শেষ কথা নয়। সুতরাং অন্যে কুকুর সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা দরকার। একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

"সেবাং লাঘব-কারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে স্ববৃত্তিং বিদুঃ।"

—অর্থাৎ অন্যের সেবা অথবা মনোরঞ্জন অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ—কুকুরের কাজ। এখানেও কুকুরের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা—এমন কি, একটু স্নেহও দেখান হইতেছে না। তারপর একটি ইংরেজী কবিতা আছে—

"A woman, a dog and a walnut tree,
The more you beat them,
the better they be!"

এখানেও অন্যান্যের সঙ্গে কুকুরকে ভালো করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অপমানকর। এই কবির কাছেও কুকুরের কোন সম্মান নাই।

গীতা ধর্মশাস্ত্র। সেখানে কি পাই?

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী কুকুর ও শ্বপাককে যিনি সমান দেখিতে পারেন তিনিই পণ্ডিত। তার মানে গরু-হাতীরও অনেক নীচে কুকুর। কুকুরকে ইহাদের সমান করিয়া দেখা আধ্যাত্মিকতার অত্যন্ত বিকাশ বুঝিতে হইবে। এখানেও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কুকুরের স্থান অতি নিম্নে।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের সময় একটি কুকুর তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। তিনি উহার গলায় বক্‌লস্ ও গায়ে সার্টিনের জামা পরাইয়া উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যান নাই; শুধু তাড়াইয়া না দিয়া অনুকম্পাবশত সঙ্গে যাইতে দিয়াছিলেন মাত্র; তাইতে তিনি কত প্রশংসা পাইয়াছেন! তখনকার দিনে কুকুরকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইত।

সুতরাং এপর্যন্ত সাহিত্যে কুকুরের ত তেমন সম্মান দেখা যাইতেছে না।

হোমারের ইউলিসেস্ যখন কুড়ি বৎসর পর বাড়ি ফিরেন তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু কুকুরটি পারিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। কুকুর কি এত কাল বাঁচে? তাহা জানা দরকার নাই। কিন্তু এখানে কুকুরের প্রভুভক্তি ও স্মরণশক্তির প্রশংসা পাওয়া যাইতেছে।

চাণক্য একজন অতি চতুর এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি লোক ছিলেন। তিনি কুকুরের ছয়টি গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যথা—

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ—।"

অর্থাৎ কুকুর বেশ খাইতে পারে, কিন্তু যাহা পারে তার চেয়ে কম দিলেও সন্তুষ্ট হয়; সহজে বেশ ঘুমাইতে পারে কিন্তু জাগিতেও বেশী দেরী হয় না; আর সে প্রভুভক্ত এবং বীর। চাণক্যের উপদেশ, কুকুরের নিকট হইতে আমাদের এই কয়টি গুণ শিক্ষা করা উচিত।

কতকগুলি শিক্ষণীয় এবং অনুকরণীয় গুণের অধিকারী হইলেও কুকুর সম্মানীয়, আদরণীয় এবং আহারে, ভ্রমণে ও শয়নে সঙ্গী হইবার উপযুক্ত, এ কথা চাণক্য বলেন নাই। বরং প্রাচীনদের মতে কুকুর অনাদরণীয়, অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য। সে বংশে নীচ, আচারে হেয়, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

কিন্তু বর্তমানে কুকুরের পদোন্নতি হইয়াছে। কুলজীগ্রন্থে যেমন বিভিন্ন কুলীন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়, ঘটকেরা যেমন তাহা কন্ঠস্থ করিয়া রাখে এবং প্রয়োজনমত সেই সযত্নে রক্ষিত জ্ঞান ব্যবহার করে, তেমনই কুকুরদেরও কুলপঞ্জিকা আছে—তাদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ বংশ আছে এবং এমন মানুষও আছে যারা তাদের সেসব বংশপরিচয় জানিয়া রাখে এবং এই জ্ঞানকে একটি উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান মনে করে। এমন লোকও আছে যারা যে-কোনও একটি দামী কুকুরের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্ধতন তিন পুরুষের পরিচয় বলিয়া দিতে পারে।

বাঙালীদের মধ্যে যেমন দেশী ও বিলাত ফেরত বিভাগ আছে, তেমনই কুকুরেরাও এদেশে দেশী বিলাতী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দেশীর মধ্যে শ্রেণীভেদ অতি সামান্যই, কিন্তু বিলাতীদের খেতাব ও বংশের এবং চেহারা ও গুণের প্রভেদের অন্ত নাই। এদের সকলের নাম করিতে গেলে নিজের অজ্ঞতা ধরা পড়িয়া যাইবে; অতএব 'অলমতি বিস্তারেণ'।

বিলাতের সঙ্গে প্রায় দুই শত বৎসর যাবৎ আমাদের কুটুম্বিতা ঘটিয়াছে। সুতরাং সে দেশের লোকের কাছ হইতে অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে কুকুর-পোষা বিদ্যাটিও আমরা লাভ করিয়াছি। এখন শহরে এবং কখনও কখনও গ্রামেও প্রায় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ঘরেই কোন না কোন জাতীয় কুকুর দেখা যায়। এমন কি, তরুণীরাও অনেক সময় অন্য সঙ্গীর অভাবে মুক্ত অথবা শৃঙ্খলিত একটি সারমেয় সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন।

আমাদের এক প্রতিবেশী একটি কুকুর পোষেন। তাঁহার কুকুরটির জাতি কি, বলিতে পারিব না। তবে, ইহার স্বভাব বর্ণনা করিতে পারি। ভোরে উঠিয়া গৃহস্বামী ইহাকে একটি শিকল দিয়া বারান্দায় বাঁধিয়া রাখেন; আর সেটি অবিরাম ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। সুহৃদ-অসুহৃদের তফাৎ নাই। রাস্তায় মানুষ, বিড়াল, গরু, অন্য কুকুর, যা-ই দেখুক না কেন, সে ঘেউ ঘেউ করিবেই। শহরের রাস্তায় প্রায় সর্বদাই জন-প্রাণী

রা ... সুতরাং উহার চীৎকারের আর বিরাম নাই। ... রাত্রিতে আলো-আঁধারের খেলা। কুকুরটি আলো...ও চেঁচায়—অন্ধকারেও তাই। সুতরাং চন্দ্র-সূর্যের গতির মত তাহার গলার আওয়াজ আর ক্ষান্ত হয় না! ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই সংগীতজ্ঞ। ইহার ভিতর কি মধুর সংগীতই যে তিনি উপভোগ করেন, জানি না। গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস্ (Pythagoras) আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির ভিতর এক প্রকার সূক্ষ্ম সংগীত শুনিতে পাইতেন এবং তাহাতে বিভোর হইয়া থাকিতেন। আমাদের উক্ত প্রতিবেশীও নিশ্চয়ই সারমেয় সংগীতে বিশেষজ্ঞ—উহা উপভোগ করিতে জানেন। কিন্তু পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া আর যে জগতের কি উপকার ইহা দ্বারা হয়, তাহা ত জানি না। যে ভদ্র অভদ্র চিনে না, পুলিশ দেখিলে চেঁচায় আর চোর দেখিলে চুপ করে, সে আর কি করিতে পারে?

সেদিন দেখিলাম, এক ভৃত্য গুটিকয়েক প্রকাণ্ড কুকুরকে হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া চলিয়াছে। হঠাৎ কুকুরগুলি এক সংগে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি, তাহারা দূরে তাদের প্রভুকে দেখিয়াছে; তাঁহাকে আদর জানাইবার জন্য এই নিনাদ! প্রভু অগত্যা কাছে আসিলেন। কুকুর কয়টি তাঁহাকে ঘিরিয়া কাঁধে হাত রাখিয়া মুখের উপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহাকে আদর জানাইল। এক সংগে একাধিক কুকুর একটা মানুষকে এমনভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—হঠাৎ দেখিলে ভয় হওয়ার কথা। আদর সমাপ্ত হইলে প্রভুও ভ্রমণে গেলেন, কুকুরেরাও ভৃত্যের সংগে অন্য পথে গেল; একটি বীভৎস নাটিকার যবনিকাপাত হইল। কুকুরের প্রভুপ্রীতি দেখা গেল।

কুকুর আমাদের শহরের সামাজিক জীবনে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, আশা করি ইহার সম্বন্ধে এই দীর্ঘ আলোচনা দেখিয়া কেহ অসন্তুষ্ট হইতেছেন না।

সেদিন এক বিজ্ঞাপন দেখিলাম—তাতে একটি কুকুরের ছবি; কুকুরকে খাবার দেওয়া হইয়াছে—সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে, খাইতেছে না। অগ্নিমান্দ্য! বিজ্ঞাপনদাতা লিখিতেছেন "আপনার কুকুর যদি খাইতে না চায়, মনে স্ফূর্তি না পায়, কর্মে আলস্য বোধ করে, ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহাকে এই বিজ্ঞাপিত ঔষধটি ব্যবহার করাইবেন।" সুতরাং কুকুর যে শুধু খায়, পরে, থাকে, চোর তাড়ায়, সংগে বেড়ায়, তা নয়; উহার রোগও হয় এবং ভেষজেরও প্রয়োজন হয়!

জীব জগতের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তৃত হওয়ার পর হইতে বহু দ্বিপদ-চতুষ্পদ জন্তু তাহার বশ হইয়া কাজে লাগিতেছে। পাখীরা আহার্য হয়, গান শোনায় এবং মানুষের বুলি কপচাইয়া আনন্দ দেয়। পশুরাও খাদ্য হয় এবং খাদ্য দেয়, গাড়িটানে, মোট বয়, হালটানে—আরও কত কি কাজ করে। যেসব পশু প্রত্যক্ষ উপকারে আসে, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলার নাই। যেসব পাখী খাঁচায় থাকিয়া পালকের ও সুস্বরের সৌন্দর্য উপভোগ করায়, তার জন্য ব্যয় কম, তাকেও উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু কুকুর? অপরিচিত আগন্তুক বাড়িতে ঢুকিলে ঘেউ ঘেউ করা—হয়ত বা তাকে কামড়াইয়া দেওয়া—ইহা ছাড়া, প্রভুর পদলেহন করা, কাঁধের উপর ভর করিয়া মুখে নিঃশ্বাস ফেলা—ইহার বেশী কুকুর কিছু করে কি? অপরিচিতের মধ্যে চোরও পড়ে; সুতরাং কুকুর পাহারার কাজ করে। সত্য; কিন্তু যে পুলিশ দেখিলেও চীৎকার করে, সে যে খুব বুদ্ধিমান ও বিবেচক পাহারা, এমন ত বলা চলে না। তা ছাড়া, যে সারাদিন-রাত ঘেউ ঘেউ করে সে ত চোরের উপস্থিতি বুঝাইবার জন্য নূতন কোন সঙ্কেত ব্যবহার করে না। কুকুরের জন্য চুরি হয় নাই, এরূপ ঘটনা খুব বেশী ঘটে না। খুব উচ্চজাতীয় কুকুর হয় ত বা কখনও কখনও খুব উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধির পরিচয় দেয়। কিন্তু সেরূপ কুকুর খুব বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা তরুণ-তরুণীর ভ্রমণের সংগী যে সব কুকুর, তারা ত শুধু খায়, পরে, বেড়ায় ও আদর পায়।

কিন্তু একটা কুকুরের জন্য খরচ হয় কত? আদরের কুকুরের দৈনিক আহার, স্নানের সাবান ও শীতের জামা এবং গা-টিপিবার চাকরের মাহিনা ইত্যাদি বাবত মাসে পনেরো বিশ টাকার কম কিছুতেই হয় না। রোগের ঔষধ ধরিলে আরও বেশী হইবে। তার উপর বড় শহরে উহার ট্যাক্স আছে। যে সকল কুকুরের খাওয়ার মেজাজ আছে, তাদের খরচ যে আরও বেশী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এক বন্ধু দুঃখ করিতেছিলেন, তাঁর কুকুরের মাছ ছাড়া খাওয়া হয় না। নিজেরা মাছ না খাইলেও উহার জন্য একপোয়া মাছ রোজই আনিতে হয়। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

যখন কুকুর ক্ষেপে, তখন একটি নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়। তাঁর চিকিৎসার সংগে সংগে তিনি দয়া করিয়া যাহাদিগকে দংশন করেন সেই বেচারাদের জন্যও কিছু ব্যয় করিতে হয়। কুকুরের কামড়েও লোক মরে। কতজন মরে গুনিয়া বলিতে না পারিলেও কিছু যে মরে তাহা ত অস্বীকার করা চলে না।

একটা কুকুরের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয় তাতে একটা দারোয়ান ত রাখা যায়-ই, হয়ত বা বেশীও সম্ভব। একটা দারোয়ান রাখার অর্থ একটি মনুষ্য-পরিবার পোষণ করা। বিলাসীরা একটি কুকুর পালনের জন্য যে খরচ করেন তার ফলে হয় ত বা একটি মানব পরিবার তার আহার্য হইতে বঞ্চিত হয়। এই দরিদ্র দেশে সেটা কি কিছু নয়? কুকুর যে কাজ করে, তাহা মানুষেও করিতে পারে—তার বেশীই মানুষ করিতে পারে এবং ভালভাবে, ভদ্রভাবে, চীৎকার না করিয়া, পাড়া-পড়শীকে জ্বালাতন না করিয়া, সে কাজ মানুষ করিতে পারে। কিন্তু কুকুরের ন্যাজ-নাড়া ও গা-চাটার মোহে যদি মানুষকে সে কাজ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে একটি মানুষ পরিবারের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হয়।

চিড়িয়াখানায় সাপ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে পর্যন্ত খোরাক দিয়া রাখা হয়। তার জন্য দেশের বহু অর্থ ব্যয়িত হয় জানি। কিন্তু ইহার একটা বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। বনে গিয়া যাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা কঠিন, অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে জানিবার চেষ্টাই চিড়িয়াখানার সার্থকতা। কিন্তু ঘরে ঘরে কুকুর না রাখিয়াও কুকুরের সম্বন্ধে জ্ঞান উপার্জন

(শেষাংশ ৬৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গীতু দিদির গল্প

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্টুদার বিয়েতে সেবারে আমরা সকলে মিলে একসংগে আসানসোলে গিয়েছিলাম। গীতুদিদি তখন সবে বি-এ পাশ করেছেন, বাড়ির মধ্যে তার খুব আদর। আমার বয়েস বারো কি তেরো হবে, অনেকদিন পরে গীতুদিদির সংগে দেখা হোল। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, বললেন, আরে, নন্তুবাবু যে! আমাকে চিনতে পারছিস তো?

গীতুদিদিকে আবার চিনতে পারবো না? কয়েক বছর আগে আমাকে নিয়ে কী ক্ষেপানোটাই না ক্ষেপিয়েছেন, সেই গীতুদিদিকে কি সহজে ভোলা যায়? তবে তাঁর চেহারার একটু আধটু যা পরিবর্তন দেখেছিলাম সেবারে, এই যেমন একটু মোটা হয়েছেন, আর চশমা নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি চশমা-পরা গীতুদিদিকে আমার এতো ভালো লাগছিলো যে বলবার নয়, দু-তিন দিনের মধ্যেই গীতুদিদি সম্বন্ধে আমার যে একটা অমূলক ভয় ছিলো, সেটা কেটে গেলো।

বুঝলাম গীতুদিদি সত্যিই আমাকে খুব ভালবাসেন। রোজ সকালে ওঁর কাছে পড়তে যেতাম। অবশ্য এ পড়তে যাওয়ার মধ্যে আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিলো—সেটা হচ্ছে একটি করে গল্পের বই। পড়তে গেলেই গীতুদিদি আমাকে পড়ার শেষে একটি করে গল্পের বই দিতেন পড়তে। সত্যি, আমাদের মাসতুতো বোনদের মধ্যে গীতুদিদিকে আমার সব থেকে ভালো লাগতো!

বিয়ের হ্যাংগাম তখন চুকে গেছে। অনেক আত্মীয়-স্বজন চলে গেছেন। বিরাট বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, কেবল আমরাই তখনো রয়েছি—মার শরীরটা তখন বিশেষ ভালো ছিলো না—মাসীমা আমাদের আরো কিছুদিন আটকে রেখে দিলেন।

রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা কয়েকজনে গিয়ে গীতুদিদিকে ঘিরে বসতাম গোল হয়ে, আর গীতুদিদি গল্প বলতেন। ছোটবেলায় গল্প শুনতে আমি এতো ভালো বাসতুম যে বলবার নয়। এমন কি না খেয়েদেয়েও বোধ হয় সারাদিন বসে গল্প শুনতে পারতাম। মা বলতেন, নন্তুটা একটা গল্পের পোকা, লেখাপড়া আর ওর কিছু হবে না—ওই গল্প শুনেই জীবন কাটাবে।

গীতুদিদি হাসতেন মুখ টিপে, কিছু বলতেন না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে আমরা গীতুদিদিকে ঘিরে বসলাম, বললাম, আজকে একটা খু-উ-ব ভালো গল্প বলতে হবে গীতুদি'—আর অনেক বড়ো!

গীতুদিদি হাসলেন, বললেন, খু-উ-ব বড়ো গল্প তো আমি রোজই তোদের বলি, তোরা একটা শোনানা আজকে আমাকে!

এইবারে মহামুস্কিলে পড়লাম। গল্প শুনতেই চিরকাল শিখে এসেছি, কিন্তু কী করে যে বলতে হয় তা শিখিনি, বললাম, আমরা কী বলবো, আপনি বলুন, আমরা আবার গল্প জানি নাকি?

আমার ছোট মাসতুতো ভাই সোনা হাত দুটো মেলে বললে, এই এত্তো বলো গপ্পো বড়দি—ছেই লাক্কোচের গপ্পো!

'লাক্কোচ' মানে রাক্ষস। আর গীতুদিদিকে ও ডাকতো 'বড়দি' বলে। গীতুদিদি ওর দিকে চেয়ে হাসলেন, বললেন, আচ্ছা শোন, এতদিন রাজা মহারাজা রাজকন্যা আর রাক্ষস খোক্কসের গল্পই তো শুনেছিস, আজ আমারি জীবনের একটা ঘটনা বলছি, সেটা খুব ভালো। তোদের খুব ভালো লাগবে।

আমরা সব গুছিয়ে ঠিক হয়ে বসলাম। গৌরী একেবারে আমার কাছে এগিয়ে এলো, ওদিকে বসলো দীপু আর তার পাশে সোনা একেবারে গীতুদিদির গায়ের কাছে।

গীতুদিদি একটু কেশে নিয়ে বললেন, আমরা তখন কাশীতে—বাবা সেবারে কাশীতে বদলী হয়েছেন। মস্ত বড়ো একটা দোতালা বাড়ি আমরা ভাড়া নিলাম।

দিন চারেক পরে বাবা 'থানেশ্বর' বলে একটা নেপালী চাকরকে কোথা থেকে নিয়ে এলেন, বললেন, এই সমস্ত বাজার-হাটের কাজটাজ করবে আজ থেকে!

অল্প বয়েস, বছর পনেরো হবে। গায়ের রঙটা বেশ পরিষ্কার, ভাঙা ভাঙা বাঙলায় কথা বলতে পারে—হিন্দী বেশ ভালোই পারে।

আমাদের নিচের তলায় দক্ষিণ দিকের রকের পাশে একটা ছোট ঘর খালি ছিলো। বাবা ওই ঘরটা থানেশ্বরের জন্যে ঠিক করে দিলেন।

থানেশ্বর তার দুটো পুঁটলি একটা ভাঙা ট্রাঙ্ক আর গোটা দুয়েক বাঁশের লাঠি নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে উঠলো।

আমাদের বাড়িতে 'পারবতীয়া' বলে একটা হিন্দুস্থানী বুড়ি ঝি কাজ করতো। কয়েকদিন পরে আমার লক্ষ্য পড়লো, পারবতীয়ার সংগে আমাদের থানেশ্বরের খুব ভাব হয়ে গেছে। বাড়ির কাজটাজ সারা হয়ে গেলে দুপুরের দিকে পারবতীয়ার সংগে খুব গল্প চলতো। থানেশ্বর তার দেশের কথা বলতো ওকে, সেখানে ওর মা, বাবা আর একটি ছোট বোন আছে। তবে ওরা বড়ো গরীব। দিন চলে না, তাই খান্না বলে ওর গ্রামেরই একটি লোকের সংগে বাঙলা দেশে চলে আসে। তারপরে এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে চাকরী পায়, সেখানে চার বছর ও চাকরী করেছিলো, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রিটায়ার্ড করে হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়াতে ওর চাকরী গেলো, তারপরে একটা ব্যাঙ্কে ও মাস চারেক দরোয়ানের কাজ করেছিলো, তারপরেই বাবা ওকে এখানে নিয়ে আসেন।

আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনতে পেতাম, থানেশ্বর খুব মনের আনন্দে ওর জীবনের পুরোনো গল্প করতো পারবতীয়ার কাছে। একদিন ওর মনের কথা খুলে বললে পারবতীয়াকে। সেদিন তখন দুপুর, বাবা খুব ভোরেই ডিউটিতে চলে গেছেন, আসতে রাত হয়ে যাবে। সমস্ত বাড়িটা নির্জন। আমি আমার ঘরে বসে একটা অঙ্ক কষছি এমন সময় থানেশ্বরের কয়েকটা

মি... ...য় গেলো। ও পারবতীয়াকে বলছে যে ও একদিন ... ...য় চলে যাবে—সাধু হওয়ার মতোন ভাল ...কিছু নেই। ওর বাবা আর মা মরে গেলে ...নটার বিয়ে হয়ে গেলেই ও সাধু হবে। ধুনি ...য়ে পাহাড়ের মধ্যে বসে বসে ভগবানের আরাধনা করবে। আরো সব কতো কী!

একটু থেমে গীতুদিদি বললেন, আমি তো পাশের ঘরে বসে ওর কথা শুনছি আর হাসছি খুব, ওই টুকুতো একটুখানি ছেলে তার আবার আশা কী রকম দেখো, কী রকম পাকামী!

এই সমস্ত কথা শুনে পারবতীয়া থানেশ্বরকে কী যেন বললে, তারপরে দুজনের আরো অনেক রকম গল্প হোল। আমি আবার অঙ্কে মন দিলাম।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, থানেশ্বর আমাকে রীতিমত সমীহ করে চলতো। আর আমি বরাবরই খুব গম্ভীর ছিলাম কিনা—থানেশ্বর মনে মনে আমাকে রীতিমত ভয়ই করতো!

একদিন দশাশ্বমেধ থেকে মা আর আমি স্নান করে ফিরছি, দেখি থানেশ্বর এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর কাছে বসে খুব আনন্দে হাত পা নেড়ে কি যেন বলছে. আমি ডেকে মাকে দেখালাম, বললাম, দেখছো তো, ছেলেটা এক নম্বর ফাঁকীবাজ, আর খালি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবার ফন্দীতে দিনরাত ব্যস্ত।

মা কিছু বললেন না, একটু হাসলেন খালি। তারপরে আমরা বাড়ি চলে এলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে থানেশ্বরও এসে হাজির। আমি তখন আমার পড়বার ঘরে বসে কি একটা গল্পের বই পড়ছিলাম। ডাকলাম, থানেশ্বর, এদিকে আয়!

থানেশ্বর মাথা নীচু করে এসে আমার ঘরের সামনে দাঁড়ালো। আমি লক্ষ্য করেছি ওকে কেউ যদি কখনো ধমক দিয়ে কথা বলে, তা হলে ও আর মুখ তোলে না। মাথা নীচু করেই চুপ করে থাকে, একান্ত বিপদে না পড়লে কথা বলে না।

বললাম, সকালবেলা ওই কালীতলায় সাধুটার কাছে বসে কী হচ্ছিলো?

থানেশ্বর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো, পায়ের বুড়ো আঙুলটা কেবল চৌকাঠের ওপরে ঘসতে লাগলো।

ওর এই চুপ করে থাকা দেখে রাগে আমার গা জ্বলে উঠলো, বললাম, রোজ সকালে ওর কাছেই বুঝি যাওয়া হয়? না হ'লে গাঁজা খাবার সুবিধে হবে কোথা থেকে? বদমাইস গাঁজাখোর কোথাকার!

এবারে থানেশ্বর একটু মুখ তুললে, বললে, না দিদিজী!

না দিদিজী? আমি ওর মুখের ওপরে ধমক দিয়ে উঠলুম, মিথ্যুক কোথাকার! গাঁজাখোর বদমাইস দূর হ আমার সামনে থেকে!

থানেশ্বর আর কথা বললে না। মাথা নিচু করেই সেখান থেকে চলে গেলো।

হাঁক ডাকে মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, বললেন, চেঁচাচ্ছিস কেন অত?

বললাম, এই তোমার আদরের থানেশ্বরের গুণের কথাই বলছিলাম। তুমি তো কিছু চেয়ে দ্যাখোনা—ওযে আজকাল রোজ গাঁজা খেয়ে মরছে!

তুই দেখেছিস খেতে ওকে, যে বলছিস?

না, তা দেখবো কেন, ওর চোখ দুটো দেখলেই তো বোঝা যায়, রাগে তখনো আমি কথা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না যেন।

মা বললেন, তোর রাগটাকে একটু কমা গীতু—মেয়ে মানুষের অতো রাগ ভালো নয়!

না ভালো নয়! আমি মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলাম, আসুন বাবা, সব বলে দেবো তাঁকে; মা খুব ভাল মানুষ কিনা, তাই ওকে কিচ্ছু বলেন না।

কি জানি কেন প্রথম দিন থেকেই থানেশ্বরকে আমার মোটেই ভাল লাগতো না, ভারী বোকা মনে হোত ওকে! যেমন লাজুক তেমন বোকা. এমন ছেলে সত্যিই আমি আর কখনো দেখিনি।

আবার একটু থেমে গীতুদিদি বললেন, ওর ওপরে শেষে একদিন রাগ আমার চরমে উঠলো।

আমার সংগে একটি মেয়ে পড়তো। তার নাম চামেলী। খুব ভাব হয়েছিলো আমার সংগে। চামেলী পড়াশুনোয় বেশ ভালো ছিলো, কিন্তু ভালো হলে কি হবে ওর একটা ভারী খারাপ অভ্যেস ছিলো, সেটা হচ্ছে পরের বই নিয়ে একেবারে আত্মসাৎ করা! আমার এ পর্যন্ত তিনখানা বই নিয়ে ও আর উপুড়্-হস্ত করেনি।

সেবারে কলকাতা থেকে বাবাকে বলে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' আনিয়েছিলাম। চামেলীকে আর এ কথা জানাইনি। ইচ্ছে করেই বলিনি, বললেই সে পড়বার জন্যে নেবে, আর তা ফেরৎ পাবার আশা আমাকে একেবারেই ছাড়তে হবে।

সেদিন বিকেলবেলা আমি বারান্দায় একটা মোড়ার ওপরে বসে 'কথা ও কাহিনী'টা পড়ছিলাম, এমন সময় দেখি সদর দরজা খুলে নিচের থেকে চামেলী আমাকে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে আসছে।

সর্বনাশ! আমি যে কী করবো ভেবে পেলাম না। করলাম কি, তাড়াতাড়ি মোড়াটা তুলে তার তলায় বইটা রেখে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলাম, তারপরে চামেলীকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে গল্প করতে লাগলাম।

সেবারে ক্লাসে একটি নতুন মেয়ে ভর্তি হয়েছিল। তার রিডিং পড়া নিয়ে আমাদের গল্প জমে উঠল। চামেলীটা ভারী হাসাতে পারতো। আর এমন ও পরের ভংগী নকল করতে পারতো যে কী বল্‌বো! একেবারে হুবহু সেই মেয়েটির নকল ক'রে ও রিডিং পড়তে আরম্ভ করলো। হাস্‌তে হাস্‌তে আমার তো পেটে ব্যথা হবার উপক্রম। চামেলী এক লাইন ক'রে পড়ে আর সেই মেয়েটির মতো হঠাৎ থেমে গিয়ে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে, আর আমি হেসে গড়িয়ে পড়ি। এইভাবে আমাদের আড্ডা যখন খুব জমে উঠেছে, সেই সময়ে মূর্তিমান ছন্দপতনের মতো থানেশ্বর দরজা খুলে হাজির।

হাতে তার আমার সেই 'কথা ও কাহিনী'—বারান্দা ঝাঁট দিতে গিয়ে মোড়া তুলে সে সেটা পেয়েছে এবং তার দিদিজীকে দিতে এসেছে!

রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু কিছু বল্‌তে পারলাম না, থানেশ্বর টেবিলের ওপরে বইটা রেখে চলে গেলো। চামেলী একেবারে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো বইটার ওপরে। তারপরে উল্‌টে পাল্‌টে বল্‌লে, আরে, কবে আনলি বইটা, আমাকে তো একদম জানাসনি।

বাধ্য হ'য়ে মিথ্যে কথা বল্‌লাম। বল্‌লাম, এই তো সবে আজকের ডাকে এসেছে, তোকে আর জানাবো কি ক'রে?

তারপরে যা ভেবেছিলাম তাই হোল, চামেলী সোজা বইটা নিয়ে বাড়ী চ'লে গেলো। আমি কিছুতে না দিয়ে পারলাম না। আমার কেমন 'দেব না' বল্‌তে বাধতো। তবে শেষ পর্যন্ত বইটা ফেরৎ পেয়েছিলাম ; মলাট দুটো ছিঁড়ে একেবারে উড়ে গিয়েছিলো আর মাঝখানের 'বন্দীবীর'এর একখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিলো চামেলীর ছোট ভাই আর একটা পাতাতে দোয়াত উপুড় ক'রে দিয়েছিলো নাকি সেজো ভাইটা!

যাই হোক চামেলী বই নিয়ে চ'লে যাবার পর আমি রাগে একেবারে জ্বলতে লাগ্‌লাম। একটু পরে পারবতীয়াকে দিয়ে ডাকালাম থানেশ্বরকে।

দরজার সাম্‌নে আস্‌তেই আমি একেবারে দাঁত কিড়মিড় ক'রে ধম্‌কে উঠলাম, বল্‌লাম, হারামজাদা, লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! বই দেবার আর সময় হ'ল না তোমার? বেরো—বেরো মুখপোড়া আমাদের বাড়ী থেকে!

থানেশ্বর বুঝ্‌তে পারলো না, আমি হঠাৎ ওর ওপরে অতো চটে গেলাম কেন। সে তো বইটা আমার ঘরে পোঁছে দিয়ে ভালো কাজই ক'রেছিলো।

থানেশ্বর আর দাঁড়ালো না, মুখটা কালো করে সেখান থেকে আস্তে চলে গেল।

এই পর্যন্ত ব'লে গীতুদিদি আবার থাম্‌লেন। আমরা সব চুপ ক'রে বসে শুন্‌ছিলাম, গৌরী বল্‌লে, তারপরে?

আগের রাত্তিরে আমার একটু ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিলো। হঠাৎ আমি 'হ্যাঁচ্চো' করে' হেঁচে ফেল্‌লাম। সোনা (আগে বল্‌তে ভুলে গেছি, ওর নাম সনৎকুমার) এতক্ষণ চুপ ক'রে শুন্‌ছিলো, আমার হাঁচি শুনে বল্‌লে, 'বাবালে বাবা, যেন লাক্কোচের হাঁচি!'—সকলেই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো—রাক্ষসের মতোই আমার হাঁচির শব্দ বটে! গীতুদিদি হাস্‌লেন, তারপরে বল্‌লেন, হ্যাঁ, শোন্ তারপরে, বলে এক মিনিট একটু থেমে কী যেন ভাবলেন, তারপরে বললেন, সেইদিন থেকে থানেশ্বর আমাকে খুব এড়িয়ে চল্‌তে লাগ্‌লে। আমিও ওর সংগে আর সহজে কথা বল্‌তাম না।

লক্ষ্য করলাম পারবতীয়ার সংগে গল্প করবার আগ্রহও ওর অনেক কমে এসেছে!

একদিন দুপুর বেলার ঘটনা। কি কারণে হঠাৎ আমাদের স্কুলের ছুটি হ'য়ে গিয়েছিলো। রকের ওপর দিয়ে দোতালায় উঠ্‌বার জন্যে এগিয়ে আস্‌ছি, সাম্‌নেই থানেশ্বরের ঘর। দরজাটা ভেজানো। কেমন যেন সন্দেহ হোল, চুপ ক'রে এক মিনিট দরজার সাম্‌নে দাঁড়ালুম। ভিতর থেকে চাপা গলার অস্পষ্ট কথা ভেসে আস্‌ছে মনে হোল। চারদিক নিস্তব্ধ। সকলের খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে, মা ওপরের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন, বাবা ডিউটিতে বেরিয়ে গেছেন কলেজে। মহা-সুবিধে, থানেশ্বর বোধ হয়, তার গাঁজা খাবার সংগী জুটিয়ে নিয়ে এসে মহা আরাম করে গাঁজা টানছে। পা টিপে টিপে বাঁদিকের ছোট জান্‌লার কাছে এগিয়ে গেলাম, দেখ্‌লাম, যা ভেবেছিলাম তাই—একটা জটা ও মড়াখেকো সন্ন্যাসী কোথা থেকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছে হতভাগা, তবে গাঁজা টানছে না। দুটোতেই মাটীর ওপরে উবুড় হয়ে পড়ে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে কী যেন দেখছে। আর সন্ন্যাসীটা মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কী যেন বকছে।

রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্ধা তো কম নয়! একেবারে লোক ধরে এনে আমাদের ঘরের মধ্যে বসিয়ে গাঁজার আড্ডা গড়ে তুললো দেখছি!

কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। রাগে আমার সমস্ত শরীর যেন রি রি করছে। মা ঘুমোচ্ছিলেন, আমি তাঁকে ডেকে তুললাম। বললাম, দেখবে এসো তোমার আদরের থানেশ্বরের কীর্তি, দেখে যাও!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতে মা প্রথমে ঠিক কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপরে আমার কাছ থেকে সব শুনে আমার সংগে নীচে নেমে এলেন।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে জানলার মধ্যে দিয়ে মাকে সব দেখালাম। সন্ন্যাসীটা তখন সেই চক্রটার সামনে আসন হয়ে বসে চোখ বুজে বিড় বিড় করে কী যেন বকছে, আর থানেশ্বর অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বসে আছে!

আস্তে আস্তে আমরা সেই ভাবেই দোতালার ঘরে চলে এলাম। মা থানেশ্বরকে একটু ভালবাসতেন, কিন্তু আজকের এই ঘটনায় তিনিও একটু চটলেন।

বিকেলে দাদা (মানে পলটুদা) কলেজ থেকে আসতেই মা সব বুঝিয়ে বললেন। একটু পরেই বাবা এলেন। সব শুনে তিনি থানেশ্বরকে ডাকলেন, আসতেই বললেন, তুই ভেবেছিস কি আজকাল? ঘরের মধ্যে লোক এনে গাঁজার আড্ডা! এবারে শুনলে দূর করে দেবো বাড়ি থেকে।

মাথা নীচু করে থানেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলো। দাদা বললেন, এই মেঝের ওপরে গোল গোল চক্কোর এ'কে কোন্ গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিলে তুমি? স্টুপিড্! এক চড়ে তোমার দাঁতের পাটি উড়িয়ে দেবো, জানো?

থানেশ্বর আগের মতোই মাথা নীচু করে রইলো—কোন উত্তর দিলো না।

বাবা খুব ধমক দিয়ে চলে যেতে বললেন। থানেশ্বর একবার আমাদের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

দাদা বললেন, ওটা একটা লক্ষ্মীছাড়া লোক জুটেছে আমাদের সংসারে—হতভাগা কোন্ দিন কী করে বসবে ঠিক নেই, ও রকম লোক না রাখাই উচিত আমাদের!

দেখলাম, দাদাও খুব চটেছেন ও মুখপোড়াটার ওপরে

একটা নতুন উপসর্গ এবার আমার চোখে পড়তে লাগলো। দিন নেই, রাত নেই, একটু সময় পেলেই থানেশ্বর ঘরের মধ্যে বসে বসে সেই চক্র চিহ্ন আঁকে আর বিড় বিড় করে মন্তর না ওর শ্রাদ্ধ কি তাই পড়ে। তবে সেই ঘটনার পর থেকে আর লোক নিয়ে আসে না ঘরে, একলা একলাই ওর গাঁজার সাধনা চালায়।

কাজেকর্মে ওর মন আর আগের মতো নেই বুঝতে পারলাম। একেবারে না করলে নয়, তাই ও বাড়ির কাজগুলো করে, কথা বলাও আশ্চর্য রকম কমিয়ে দিয়েছে।

একটা জিনিস দেখতাম, কোন দিকেই ওর যেন লক্ষ্য নেই। বসে আছে তো বসেই আছে, খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে।

মাকে বললাম, এ একেবারে অচল মা, আর চলবে না ওকে দিয়ে, তাড়াও শীগ্গির।

দাদা আমার কথার ওপরে জোর দিলেন, বললেন—ও একটা আসল হারামজাদা, কবে কোন্ ফেসাদ বাধাবে তার ঠিক নেই—দূর করো ওকে!

মা অবশ্য কোন কথা বলতেন না, চুপ করে থাকতেন, বোধ হয় একটু দুঃখও হোত তাঁর থানেশ্বরের জন্যে।

দাদা যা বললেন, একদিন তা সত্যি সত্যি হাতে হাতে ফল্‌লো। সেদিন বাবার ছিল দুপুরের ডিউটী—!

একটু থেমে কেশে নিয়ে গীতুদিদি আবার আরম্ভ করলেন। অফিসে বের হবার সময়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে দুখানা দশ টাকার নোট রেখে গেলেন ; বললেন, আমার এখন সময় নেই, তুই রাখ, কাল তোর কাছ থেকে নেবো এখন। বলে বাবা চলে গেলেন।

সেদিন আবার আমি সখ করে মাংস রাঁধছিলুম। মাংসটা হয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি নামানো দরকার, না হলে একেবারে গলে যাবে। নোট দুটো আলমারীর তাকের ওপরে একটা ছোট কাগজের বাক্সের মধ্যে ভ'রে রেখে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে গেলাম, পরে এসে আমার ক্যাস বাক্সে রেখে দেবো।

কিন্তু এমন মনের ভুল, তারপরে সমস্ত দিন আর রাত্তিরের মধ্যে মোটে মনেই হোল না। পরদিন সকালে বাবা টাকা চাইতেই আলমারীর কাছে গিয়ে দেখি সর্বনাশ! সে কাগজের বাক্স একেবারে উধাও!

গৌরী এবারে বকের মত গলাটা লম্বা করে বললেন,—ওঃ কী হারামজাদা লোক বড়দি—আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি—ওই থানেশ্বরটাই নিয়েছে!

গীতুদিদি একটু হাসলেন, বললেন—শোন তারপরে। আমি তো প্রথমত চোখে একেবারে অন্ধকার দেখলাম, তারপরে আস্তে আস্তে বাবাকে গিয়ে বললাম, কোথায় রেখেছি পাচ্ছি না। আমি একটু খুঁজে দেখবো। বাবার তাড়াতাড়ি ছিলো। আমাকে একটু বকলেন, বললেন—তোর যদি কোন হুঁস থাকে, ভালো করে খুঁজে দ্যাখ্! বলে অফিসে চলে গেলেন।

মাকে গিয়ে আমি সব বললাম, আমার সন্দেহের কথাও বললাম।

একটু পরেই থানেশ্বর বাজার করে ফিরলো। সামনে আসতেই বললাম, আমার কাগজের বাক্স থেকে কোন টাকা চুরি করেছিস? মুখপোড়া তোমার আদিখ্যেতা দিন দিন বাড়ছে?

থানেশ্বর একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে, না দিদিজী! আমি তো দেখিনি আপনার টাকা!

না দিদিজী! দাদা ভেংচে উঠলেন। রান্নাঘরে বসে ভাত খাচ্ছিলেন এতক্ষণ, একটু আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। এঁটো হাতেই উঠে এসে একেবারে থানেশ্বরের একটা কান চেপে ধরলেন, বললেন, না দিদিজী! ন্যাকামি পেয়েছিস্ শুয়ার কোথাকার! বের কর আগে টাকা, তারপরে অন্য কথাবার্তা রাস্কেল! আমি তোমাকে আগেই বলেছি মা, ও এক নম্বরের একটা স্কাউণ্ড্রেল! বলেই ঠাস্ করে একটা চড় লাগিয়ে দিলেন তার গালে।

তাড়াতাড়ি মা ছুটে এলেন, বললেন—আঃ করছিস্ কি পলটু—থাম, তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?

থানেশ্বরের গালের ওপরে দেখতে দেখতে দাদার পাঁচটা আঙুলের দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।

দাদা গজ্‌গজ্ করতে করতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

রকের পাশে মাথা নিচু করে থানেশ্বর তখনো সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।

বিকেলে সব শুনে বাবা থানেশ্বরকে ডাকলেন, তারপরে জেরার ওপরে জেরা করতে লাগলেন। কিন্তু থানেশ্বরের ওই এক কথা—আমি নিইনি বাবুজী ও টাকা!

শেষ পর্যন্ত অনেক ধমক দিয়ে আর সাবধান করে দিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়া হোল।

সেই দিন থেকে সকলে ওকে মনে মনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো। এতো আস্পর্ধা, সংগীদের গাঁজার জন্যে কিনা আমার টাকায় হাত দেয়!

দিন দুয়েক পরে অফিসের কাজেই একদিন বাবাকে ভোরবেলা উঠে এলাহাবাদে চলে যেতে হোল।

কিন্তু খাট থেকে নেমে সেই ভোরেই আমি আবার দু চোখে অন্ধকার দেখলাম।

ভালো করে সমস্ত বিছানাটা খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কই? আমার কানের নতুন সোনার দুলটা কোথায় গেল? এ-পাশ ও-পাশ খাটের তলা চারদিক ভালো করে দেখলাম। সমস্তটা সকাল আমার খোঁজাখুঁজিতেই কেটে গেলো। তারপরে গিয়ে মাকে আমার এ দুঃসংবাদ জানালাম।

সমস্তটা দিন আমাদের এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজিই চললো। তারপরে আর না পেরে হতভাগাটাকে ডাকলাম। বললাম, আমার কানের দুল তুই পেয়েছিস্ থানেশ্বর?

থানেশ্বর আবার সেই আকাশ থেকে পড়বার মতো ভঙ্গী করলো।

রাগে আমার পিত্তি শুদ্ধ জ্বলে উঠলো, চিৎকার করে বললাম—নিয়েছিস্ কিনা বল না মুখপোড়া?

থানেশ্বর সেইভাবেই মাটীর দিকেই চেয়ে বললে, না

দিদিজী, আমি তো নিইনি। তারপরে আস্তে আস্তে সে ওখান থেকে চলে গেলো, আর দাঁড়ালো না।

বেশ বুঝতে পারলাম, ও ডাহা মিথ্যে কথাগুলো আমার সামনে অম্লান বদনে বলে গেলো। মা এবারে আমাকে একটু ধমক দিলেন, বললেন—ও তো নাও নিতে পারে, হয়তো কোথায় তুই-ই ফেলেছিস্।

মার কথায় আমার ভারী রাগ হলো. বললাম—তুমি আজো লোক চিনতে পারলে না মা,. তাইজন্যেই তো সকলে তোমায় ঠকায়!

মা কিছু বললেন না, চলে গেলেন।

যাই হোক্ শেষ পর্যন্ত সেদিন আর ও নিয়ে বেশী হাঙ্গাম করলাম না। দাদার কাছে এ কথাটা সেদিনের মতো চেপে গেলাম।

কিন্তু পরদিন সকালে উঠে আর চেপে থাকতে পারলাম না। একেবারে সোজা দাদার ঘরে গিয়ে উঠলাম, বললাম—দাদা, আর পারা যায় না; মুখপোড়া আমার কানের দুলটা পর্যন্ত চুরি করেছে।

কী কারণে সেদিন সকাল থেকেই দাদার মেজাজটা বিশেষ ভালো ছিল না। এ কথাটা শুনে একেবারে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'থানেশ্বর' বলে একটা বিকট চিৎকার করে দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

থানেশ্বর তখন বাজার যাবে বলে মার কাছ থেকে পয়সা হিসেব করে নিচ্ছিলো। দাদার রাগটা বেশ কিছু বেয়াড়া রকমের, একেবারে ছুটে গিয়ে ঠাস্ করে তার ডান গালের ওপরে অতর্কিতে একটা বিরাট চড় বসিয়ে দিলেন। থানেশ্বর প্রস্তুত ছিলো না, একেবারে ঘুরে দু তিন পাক খেয়ে উঠোনের এক কোণে জড়ো করা টুকরো কয়লার ওপরে গিয়ে পড়লো। দাদার যেন সেদিন খুন চেপে গিয়েছিল। তার ওপরেই একেবারে দুম্‌দাম্ করে কিল, চড় আর লাথি চালাতে লাগলেন, শেষকালে একটা ভাঙা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলেন।

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে তখন থরথর করে কাঁপছি। দাদার এ-রুদ্রমূর্তি আমিও আশা করিনি কখনো। তারপরে আমরা দুজনেই দৌড়ে গিয়ে দাদার হাত থেকে বাঁশটা কেড়ে নিলাম। তারপরে দাদাকে কোনরকমে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

অসহায় একটা মূক পশুর মতো থানেশ্বর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো, সমস্ত দেহটা ওর কয়লার কালিতে মাখামাখি। মুখেও অনেকটা কালি লেগেছে, চোখের ওপরটা ঘুসির চোটে ফুলে উঠেছে, কপালের ডান দিক থেকে দর্‌দর্ করে একটা রক্তের ধারা নেমে এসেছে।

এক মুহূর্ত থানেশ্বর মার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। ঠোঁট দুটো তার ঈষৎ দু একবার কাঁপলো, তারপরে চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো ওর গালে—তারপরে আস্তে আস্তে সেই অসহায় পশুর মতোই কাঁপতে কাঁপতে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলো।

রকের এক কোণে দাঁড়িয়ে তখনো দাদা রাগে ফুলছেন। সমস্ত দিনের মধ্যে থানেশ্বর আর ফিরলো না। সকলের মনের ওপরে সেদিন ভারী একটা বিমর্ষ ছায়া নামলো। কোনো কাজেই মন বসাতে পারলাম না।

এক মিনিটের জন্যে গীতুদিদি একটু থামলেন। চারদিক নিস্তব্ধ। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম রাত হয়ে গেছে। সামনের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে হুস্ করে একটা মোটর তীব্র আলো ফেলে মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেলো।

গৌরী বললে, তারপরে বড়দি?

গীতুদিদি বললেন, সেদিন আবার সকাল থেকে পারবতীয়াটা কাজ করতে আসেনি। বিকেলের দিকে আমি আমার ঘরটা ঝাঁট দিতে বসলাম—অনেক দিন আলমারীর তলাটা ঝাঁট দেওয়া হয়নি, আজকে কোমর বেঁধে তাই লেগে গেলাম। আলমারীর তলা থেকে ঝাঁট দিয়ে অনেকগুলো ধুলোবালি টেনে বের করলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি তার মধ্যে আমার সেই ছোট কাগজের বাক্সটা, যার মধ্যে বাবার দেওয়া সেই দুখানা দশ টাকার নোট রেখেছিলাম। একটা কোণা তার কাটা—বেশ বুঝলাম, ইঁদুরের দাঁতের দাগ, কয়েক বছর থেকে আমাদের ঘরে ইঁদুরের যা উৎপাত বেড়েছে, তা বলবার নয়। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে দেখি, নোট দুটো ঠিকই আছে, একটুও নষ্ট হয়নি। ইঁদুরেই তা'হলে বাক্সটা টেনে নিয়ে গিয়েছিলো সে রাত্তিরে!

স্তূপীকৃত জঞ্জালের সামনে আমি অভিভূতের মতো বসে রইলাম, কি যে করবো কয়েক মিনিট ভেবে পেলাম না, তারপরে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে নোটটা দেখালাম। মার তখনো খাওয়া হয়নি। ভাত নিয়ে চুপ করে বসেছিলেন, চমকে গিয়ে বললেন—অ্যাঁ! তারপরে থেমে বললেন—দেখেছিস্, দেখলি তো? তারপরে মা চুপ করে গেলেন।

একটু পরেই বাবা এলেন। আমার সমস্ত শরীর যে কী রকম দুর্বল মনে হচ্ছিল, সে আর আজ তোদের বোঝাতে পারবো না। বাবাকে সব ঘটনা এবারে বলতে হবে। মাকে গিয়ে বললাম, কাল সকালে যে কে আবার আমার কানের দুলটা—

বাবার এবারে যেন একটা কথা মনে পড়ে গেলো, বললেন, এই যা! তোকে সেদিন সকালে বলে যেতেই ভুলে গেছি—পরশু রাত্তিরে তোর খাটের পাশে দুলটা দেখতে পেলাম, তারপর আমার ড্রয়ারে ওটা রেখে দিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিলো ভোরবেলা তোকে বলে যাবো—তা না হতচ্ছাড়া চাকরি হয়েছে আমার! এর জ্বালায় কি কিছু মনে রাখতে পারি। ভোরে উঠেই ছুটতে হোল—তুই তখনো ঘুমোচ্ছিস্, তোকে বলবার কথা একেবারেই মনে হোল না। দাঁড়া—বলে বাবা উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলে দুলটা নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে রাখলেন।

ঝক্‌ঝক্ করে সোনার দুলটা জ্বলছে। দুলটার দিকে চাইতে পারলাম না।

মনে হোল আমার গলাটা দু পা দিয়ে কে যেন ভীষণ জোরে চেপে ধরেছে, আর আমার যেন কথা বলবার শক্তি নেই, কথা বলতে গেলাম, কেবলি আটকে যেতে লাগলো।

বাবা পা থেকে মোজা খুলছিলেন মুখ নীচু করে। বললেন, তারপর কি বলছিলি, থামলি কেন?

তারপরে আমার মুখের দিকে চেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, কি হয়েছে?

কোন রকমে সব ঘটনা বাবাকে বললাম। বাবা শুনে একেবারে চমকে উঠলেন, বললেন, সর্বনাশ! পলটুটা করেছে কি? তাড়াতাড়ি উঠে দাদার ঘরে গেলেন। খুব বকলেন দাদাকে, পাশের ঘর থেকে দাদা সবই শুনেছিলেন, লজ্জায় তিনি মাটীতে মিশে গেলেন যেন!

বাবা দেরী করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে থানেশ্বরকে খোঁজবার জন্যে লোক পাঠালেন চারদিকে। দাদাও বেরুলেন তার খোঁজে।

ঘরের মধ্যে মা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত বাবাও বেরিয়ে পড়লেন।

রাত বাড়তে লাগলো। একে একে সকলেই ফিরে এলো, কিন্তু থানেশ্বর ফিরলো না।

জানালার ধারে আমি অসীম আগ্রহে বসে রইলাম, কিন্তু না, থানেশ্বরের দেখা নেই!

সকলের শেষে আমাদের প্রতিবেশী বুধন গয়লা যখন ফিরে এলো, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। বললে, ওর সেই সন্ন্যাসীর আড্ডাতেও সে খোঁজ নিয়েছে, তারা কেউ থানেশ্বরের খবর বলতে পারলে না।

পরের দিন সেই সন্ন্যাসীকে বাবা কালীতলা থেকে ডাকিয়ে আনালেন। থানেশ্বরের সম্বন্ধে অনেক সম্ভব অসম্ভব কথা জিগ্যেস করলেন, কিন্তু থানেশ্বরের কোন ঠিকানা পাওয়া গেলো না।

গাঁজা খাওয়ার কথা জিগ্যেস করতে সন্ন্যাসীটা মাথা নাড়লো, বললে, না বাবু ও কোনো দিন আমাদের ওখানে গিয়ে গাঁজা খায়নি। তবে ওর একটা ঝোঁক ছিলো, সেটা হচ্ছে ভগবানকে দেখা। আমাদের এখানে একজন সাধু এসেছিলো, সে ওকে বলেছিলো—খড়ি দিয়ে চক্র এঁকে ওকে ভগবান দেখাবে। তাই দিনকতক সেই লোকটার পিছনে খুব ঘুরেছিলো। তা সে লোকটা ভারী বদ্‌মাইস্‌ আর ভণ্ড লোক ছিলো বাবু। থানেশ্বরের চারটে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বাবা সন্ন্যাসীকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় করে দিলেন।

তারপরের দিন বাবা খবরের কাগজে ওর দেহের বর্ণনা করে নিরুদ্দেশ হওয়ার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়, থানেশ্বর আর ফিরলো না।

একটু থেমে গীতুদিদি বললেন, সেই থেকে দাদা কেমন যেন হয়ে গেছেন। একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। আর কাউকে জোরে ধমক পর্যন্ত দেন না—কাউকে মারা তো দূরের কথা।

মা কতোদিন পর্যন্ত যে রান্নাঘরে বসে কেঁদেছেন, তা বলবার নয়, আর আমার—গীতুদিদির গলাটা আটকে গেলো। হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। গল্প শুনতে শুনতে সোনা আর দীপু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে লক্ষ্যই করিনি। অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ জানলার মধ্যে দিয়ে সামনের অন্ধকারে দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে গীতুদিদি কথা কইলেন। বললেন, আজো চোখ বুজলে আমি থানেশ্বরের সেই ক্লান্ত উৎপীড়িত মূর্তিটা চোখের সামনে দেখতে পাই—সমস্ত মুখে তার কয়লার কালি, চারদিক ফুলে গেছে, অসহায় পশুর মতো সে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে, কপালের ডান দিক থেকে নেমে এসেছে একটা রক্তের ধারা, আর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে এসে ওর গালে জমছে—অভিমানের অশ্রু ওর—আমাদের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যর্থ-অভিযোগের অশ্রু ওর!

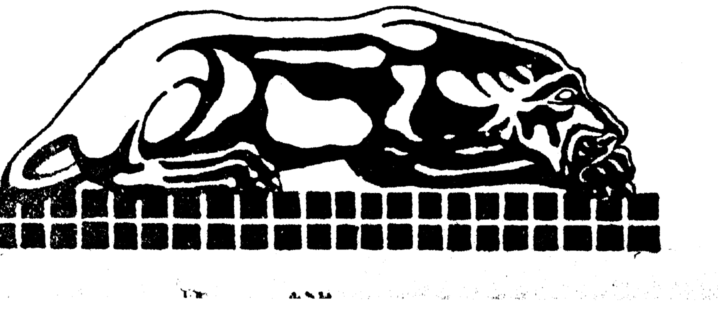
গীতুদিদি আবার চুপ করলেন। ভারী অস্বস্তি লাগছিলো, আমি মাথা নীচু করলাম।

একটু পরে আবার গীতুদিদি বলতে আরম্ভ করলেনঃ বললেন, আজো যদি আমি থানেশ্বরকে একবার কাছে পাই, তা'হলে ওর হাত ধরে আমি ক্ষমা চাইবো—বলবো, তুই আমার ভাই, আমি ভুল করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর থানেশ্বর। কিন্তু আমি জানি, সে আর আসবে না, সে আর ফিরবে না। হিমালয়ের কোনো দুর্গম অরণ্যে হয়তো সে তার ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে — তাঁর সঙ্গে দেখা হোলেই সে এ অভিযোগ করবে—এর শাস্তি আমি পাবোই একদিন!

গীতুদিদি চুপ করলেন। ভারী করুণ আর ম্লান দেখাচ্ছিল তাঁকে। লক্ষ্য করলাম, চশমার নীচে চোখদুটো তাঁর ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে!

জানলা দিয়ে আবার বাইরের অন্ধকারের দিকে চাইলাম। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একঘেয়ে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ ভেসে আসছে। দূরের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে আর লোক নেই—ক্বচিৎ একখানা মোটর হুস্‌ করে চলে যায়। চারদিক নিস্তব্ধ।

চুপ করে বসে রইলাম। থানেশ্বরের জন্যে ভারী কষ্ট হচ্ছিল আমার!





(১)

এককালে কেবল এই গ্রামখানাই নহে, আশপাশের পাঁচ-শোখানা গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও বর্তমানে রায়-বংশের কিছুই নাই, আছে শুধু অতীতের অহঙ্কার,—সোজা কথায় পূর্বপুরুষের নাম ভাঙ্গাইয়া খাওয়া।

পাঁচজনে কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, ভাগ্য-লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সকলেই তৎপর, কিন্তু তিনি যে পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে পদ-রেখার উপরে বিপরীত-গামী পদরেখা পড়ে নাই। দেবীর সন্ধান না মিলিলেও খুঁজিবার চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু সে চেষ্টাও চলে অতি গোপনে।

দুই ভাগিদার মহেশ রায় ও সুমন্ত রায় গ্রামেই আছেন, বৃদ্ধ প্রমন্ত ও পরেশ মারা গিয়াছেন, কিন্তু অহঙ্কারের মাত্রা মাপিয়া ছেলেদের দিয়া গিয়াছেন।

সুমন্ত ভাঙ্গা বৈঠকখানা সংস্কার করিতে না পারিলেও ভাঙ্গা চেয়ার-টেবলগুলোতে নিজেই কাঠের বুঁদা বসাইয়া এক-রকমে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে বসিলে বা ভর দিলে যা হোক ভর সহিবে, পড়িয়া যাইবে না।

এক দিনকার কথা সুমন্তের মনে পড়ে। বিরাট বাড়ির নাম শুনিয়া ও চোখে বিশাল বাড়ির বিশালত্ব দেখিয়া কলি-কাতাবাসী এক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন; ভাঙ্গা চেয়ারে বসিতে গিয়া কেবলমাত্র কায়দা জানা না থাকায় তিনি যে কি বিপর্যস্ত, কি নির্যাতীত হইয়াছিলেন, তাহা সেদিনকার বালক সুমন্তের আজও মনে আছে। সেইজন্যই একটু বড় হইয়াই সে আগে মিস্ত্রীর কাজটা শিখিয়া লইয়া টেবল-চেয়ারগুলো মেরামত করিয়াছে।

রং চটা ছবিগুলা ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিলেও বুঝা যায় না সেগুলা কি। তবু পিতৃপুরুষের গৌরব রক্ষা করার জন্য সুমন্ত এতটুকু জিনিস নষ্ট করে নাই।

ঘরে আছে একটা হার্মোনিয়াম, বাঁয়া তবলা, একটা এস্রাজ, একটা পাখোয়াজ এবং সেতার। আর খঞ্জনি প্রভৃতিও দুই একটা আছে। এগুলি সুমন্তের ঠাকুরদাদার স্মৃতিচিহ্ন। তাহার গান বাজনার ছিল প্রবল ঝোঁক, কলিকাতা হইতে ওস্তাদ আসিয়া তাঁহাকে গান শিখাইত। শুনা যায় বাঁয়া তবলায় তাঁহার হাত বড় মিষ্ট ছিল, লোকে দুদণ্ড বসিয়া তাঁহার বাঁয়া তবলা শুনিত।

ঠিক এই গুণটি পাইয়াছে সুমন্ত।

পিতা প্রমন্ত এ সব বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, গান-বাজনা, তাস, পাশা, খেলা তিনি সযত্নে তাঁহার জীবনে পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন। সদর্পে তিনি বলিতেন—গান বাজনা কোন ভদ্রলোকের পেশা নয়, উহাতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাধা হয় না। অতএব উহা পরিহার করাই কর্তব্য। তাস পাশা দেখিলে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত,—পিতার এই সব বিলাসের জিনিসগুলি কেবল স্মৃতিরক্ষাকল্পেই তিনি একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মনের একান্ত ঝোঁক থাকিলেও পিতার জীবদ্দশায় সুমন্ত এ সব দিকে দৃষ্টিপাতও করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পর সে নিজে কর্তা হইয়া ঠাকুরদার সব জিনিস বাহির করিয়াছে, ঝাড়িয়া মুছিয়া রং করিয়া সবগুলি নিজের কাজে লাগাইয়াছে। তাম্র-নির্মিত বাঁয়া-তবলায় আবার নূতন চামড়া লাগানোয় নূতন হইয়াছে, দামী হারমোনিয়ামটা মেরামত করাইতে কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছে। এস্রাজ, তানপুরা প্রভৃতি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র মেরামত হওয়ার পর একেবারে নূতন রূপ ধরিয়াছে।

দিন তাহার বেশ যায়।

একলা মানুষ,—পিতা বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি সব ঠিকঠাকও হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক আশীর্বাদের দিনই প্রমন্ত রায় অসুস্থ হন এবং তাহারই আট দশদিন পরে তিনি মারা যান। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা।

গ্রামেরই মেয়ে রাজলক্ষ্মী, তাহার পিতা রাম বোস—প্রমন্তের বন্ধু স্থানীয় লোক। প্রমন্তের মৃত্যুতে তিনি কতকটা ঘাবড়াইয়া গেলেও আবার সামলাইয়া লইলেন এবং সুমন্তকে ধরিলেন—।

গ্রামের লোক বলিল এক বৎসর না গেলে বিবাহ হইতে পারে না।

সুমন্ত কি জবাব দিবে ঠিক করিতে পারে নাই; এই একটা অজুহাত পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল এবং এই কথা বলিয়াই রাম বোসকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

এক বৎসর পরে রাম বসু আবার বিবাহের প্রস্তাব করায় সে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—রাজলক্ষ্মীকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না, অথবা কেবল রাজলক্ষ্মী কেন, সে কাহাকেও বিবাহ করিবে না। কারণও সে অনেকগুলি দর্শাইল। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে—বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার কোন দিনই নাই, নেহাৎ কেবল পিতার জন্যই তাহাকে বিবাহে রাজি হইতে হইয়াছিল, পিতা মারা যাওয়ায় তাহার বাধ্য হইবার আর কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ সে জীবনে এই প্রথম স্বীকার করিতেছে,—এককালে তাহাদের অনেক কিছু থাকিলেও আজ কিছু নাই—আছে কেবল পূর্বপুরুষের ভাঙ্গাচোরা কতকগুলো জিনিসপত্র মাত্র। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিবাহ করা চলে না, সংসার পাতানোও চলে না।

রাম বসু তথাপি উৎসাহ ভরে বলিয়াছিলেন, "তা হোক না বাবাজি, আমার মেয়ে সব কাজ জানে, একটা সংসার পাতিলে চালিয়ে নিতে সে পারবে।"

তবলায় চাঁটি দিতে দিতে সুমন্ত কেবল বলিয়াছিল—"আর হতে পারে না।"

এ কথার ইস্তফা এইখানেই হইয়া যায় এবং ইহার পরই রাম বসু অন্যত্র কন্যার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন।

আর পাঁচজনের মত সুমন্তও নিমন্ত্রণ খাইয়া রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া উদ্গার তুলিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাড়ি ফিরিয়াছিল, একবারও হয়তো তাহার মনে হয় নাই—বৃদ্ধ জগন্নাথ মিত্র যে বরাসনে বসিয়াছিলেন, সেই আসন তাহারই জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল।

পাঁচ বৎসর এমনইভাবে কাটিয়া গিয়াছে—সুমন্তের মোটে মনেই হয় না—রাজলক্ষ্মী নামে একজন কেহ ছিল, যে তাহার জন্য বরণডালা সাজাইয়া বসিয়াছিল, সে আজ নাই। কাহারও জন্য তাহার কিছু আসিয়া যায় না, নিজের খুসীতে সে বাঁয়া তবলায় চাঁটি মারিয়া তবলার বোল মুখস্থ করে—

তা ধিন ধিন তাক—
তাক ধিন ধিন তা—
ওস্তাদ মোহন বাগদী—

কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া সে বিখ্যাত একজন গায়ক ও বাদকের সাগরেদি করিয়াছে, তবলার বোল সব তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। তাহার গগনবিদারী কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায় পাড়ার লোকের কানে তালা ধরে, ঘুমাইবার জন্য দুই কানে তুলো গুঁজিবার আবশ্যক হয় সময় সময়।

বড় বিরক্ত হইয়াই প্রতিবেশী গৌরগোপাল সেদিন মোহনকে তাড়াইয়া গিয়াছিল, খড়ম দেখাইয়া শাসাইয়াছিল—"ফের যদি অমনি করে চেঁচাবি মোহন, তোর একদিন কি আমারই একদিন—বুঝবি।"

মোহন বিশাল বুক ফুলাইয়া বিরাট গোঁফে তা দিয়া নিতান্ত অবহেলার চোখে ক্ষীণকায় গৌরগোপালের পানে এমনভাবে তাকাইয়াছিল যাহাতে তাহার আর বাকস্ফূর্তি হয় নাই, সে তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল।

এ দিক দিয়া সুমন্ত নিশ্চিন্ত ছিল। গান সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে সে মোহনকে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িত।

রাম বসু কিছু বেশী রকম আস্ফালন করিয়াছিলেন—তাহার পর হঠাৎ একদিন স্তব্ধ হইয়া গেলেন—হয়তো মূলে কোন কিছু ছিল, কিন্তু সে কথা প্রকাশ হয় নাই।

(২)

মহেশ রায়ের অংশ বামদিকে হইলেও প্রবেশপথ একটাই।

এই পথে বাহির হইবার সময় হঠাৎ মহেশ রায়ের মাথা ঠুকিল সবেগে প্রবেশোন্মুখ সুমন্তের মাথার সঙ্গে—।

যেন দুইখানি প্রবল শক্তিশালী দ্রুতগামী ট্রেনের ধাক্কা।

প্রৌঢ় মহেশের মাথায় যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে তাঁহার দুই চোখের সামনে বিশ্বের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, হাতে দুধ আনিতে যাইবার জন্য বড় ঘটিটা যে ছিল, সেটা সশব্দে পড়িয়া গেল। তিনি দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া কতক্ষণ স্থিরভাবে চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুমন্তও থতমত খাইয়াছিল বড় কম নয়,—তবু তাহার মনে হইল অনেক সৌভাগ্য যে মাথায় লাগিয়াছে, হাতের সেতারে ধাক্কাটা লাগে নাই, লাগিলে তারের যন্ত্র গুঁড়া হইয়া যাইত।

যদিও ধাক্কা লাগে নাই তবু সে সেতারটাকে বার বার দেখিল, নাড়াচাড়া করিল, দুই একবার টুং টুং শব্দ করিল।

এতটুকু সময়ের মধ্যে মহেশ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিলেন, মাথা হইতে হাত নামাইয়া দুইবার শূন্যে আন্দোলন করিয়া গর্জন করিলেন, "রাসকেল—স্টুপিড, ননসেন্স, ড্যাম—সেনসেনালিজ—"

সুমন্ত পরম নির্বিকারভাবে বলিল, "ডিক্সনারীতে ওই শেষ কথাটা লেখা নেই কাকামশাই, ওটা অপভ্রংশ হ'ল কাজেই আমি রাগলুম না, উদারতার সঙ্গে আপনাকে ক্ষমা করে গেলুম।"

মহেশ তাহার নির্বিকারভাবে একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন, দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিলেন, "ননসেন্স—

সুমন্ত বিনীতভাবে বলিল "ওটা বাঙলা করে বললেই চলে, বলুন—কম বুদ্ধি বা একেবারেই বুদ্ধিহীন। ইংরেজী ক্যাচম্যাচ শব্দগুলো আপনার কাছে বেশ ভালো লাগলেও আমার মোটে ভালো লাগে না। বাঙালী মানুষ, খাই তো ডাল-ভাত, না হয় মাছের ঝোল, ভাত; আমাদের মুখে সর্বদা ওই কিচির মিচির শব্দ কি মানায়? বাঙলায় বলুন—শুয়ার, গরু, হতচ্ছাড়া, বাঁদর,—সেগুলোর অর্থও বুঝব, উত্তরও ঠিক দেব।"

মহেশ মুখ ভঙ্গী করিলেন, "আমাকে অপমান করছিস সুমন্ত?" ক্রোধে বেশী কথা বলা হইল না।

সুমন্ত ত্রস্তভাবে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"রাম কহো, ও অপবাদটি দেবেন না, আপনাকে অপমান করব আমি—আমার বাপের বয়সী কাকামশাই আপনি, আপনাকে কোন কথা আমি বলতে পারি—রাম কহো, রাম কহো—।"

মহেশ বিস্ফারিত চোখে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া

হিলেন, দুই চোখে যে আগুন জ্বলিল, এককালে হইলে তাহা সুমন্তকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত, নেহাৎ কলিকাল বলিয়াই কিছু হইল না,—সুমন্ত অক্ষত শরীরে দাঁড়াইয়া রহিল, আগুনে পুড়িলেন মহেশ নিজেই।

আস্তে আস্তে সুমন্ত নিজের সেতার সামলাইয়া ঘটিটা তুলিয়া মহেশের হাতে দিতে গেল—

মহেশ বলিলেন, 'থাক, ঘটিটা তুলে নিতে আমিও পারি, এটুকু দয়া আর নাই বা করলে—'

বলিতে বলিতে ঘটি লইয়া সেটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন, এঃ একেবারে টোল খেয়ে গেছে, একেবারে গেছে ঘটিটা; একি আর টিকবে? দুদিনেই ফুটো হয়ে যাবে যে—

সুমন্ত বিনীতভাবে বলিল, "হ্যা টোল একটু খেয়েছে বটে, কিন্তু ওতে ফুটো হবে না কাকামশাই, আমি আপনাকে পাকা কথা দিয়ে রাখছি।

প্রস্থানোদ্যত মহেশ বলিলেন, "এ্যাঁ,—রেখে দাও তোমার পাকা কথা, ও সব আমার বিলক্ষণ জানা আছে।"

মনুষটা দরজার আড়াল হইতেই সুমন্তের সে কি হাসি,— হো হো, হা হা,—হাসির বেগে সে যেন ভাঙিয়া পড়িল—।

ও পাশের দরজার পাশে একখানা মুখ দেখা গেল, বিস্ময়পূর্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি সুমন্তের উপর পড়িয়াই স্থির হইয়া গেল।

সুমন্ত থতমত খাইয়া হঠাৎ হাসি থামাইয়া ফেলিল, সে বিস্ময়ে সেই মুখখানার পানে চাহিল,—মহেশের বাড়ির দরজায় এ মুখ দেখিবার আশা সে মোটেই করে নাই। এ বাড়িতে থাকিবার মধ্যে আছেন থাকমণি—মহেশের স্ত্রী, আর আছে তাঁহার সবেধন নীলমণি ব্রজসুন্দর, আর কেহ নাই। কোন তরুণীকে সে বাড়িতে দেখা আশ্চর্যের ব্যাপার বই কি।

হঠাৎ যেন সুমন্তের লজ্জা বোধ হইল, সেইজন্য সে ঝাঁ করিয়া এক পাশে সরিয়া গেল।

কানে একটা কোমল কন্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—'ও কে—মোহিনী, পাগল নাকি?'

দাসী মোহিনী এক গোছা বাসন লইয়া ঘাটের পথে চলিয়াছিল, থামিয়া একটু অবহেলার সঙ্গে বলিল—"পাগল না মাথা গোল; হয়তো ছিট আছে—সেই রকমই যেন মনে হয়।"

"ছিট—"

মেয়েটি যেন আঁতকাইয়া উঠিল—"ও বাবা, এই পাগলের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে হবে নাকি,—তা হলেই তো গেছি; নাঃ, মেশোমশাইকে একথা বলতে হবে তো—।"

'পাগল—'

সুমন্ত পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া তিনবার ঘুরিল, তাহার পর মনের আনন্দে গান ধরিল—

তাইরে নারে তাইরে না—

গোটা মানুষের মুণ্ড দে না।

ও পাশের দরজাটা ঝপাৎ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল—। বন্ধ হইলেও খোলা জানালার ফাঁক দিয়া কথা ভাসিয়া আসিল—"বাবাঃ, তোমাদের এখানে আমার আর একদিনও থাকা চলবে না মাসিমা, আমি বাপু আজ বিকেলেই চলে যাব। এ রকম পাগল যে বাড়িতে—সেখানে কখনও থাকতে আছে? কে জানে কখন গলাই টিপে দেবে, কি লাঠিই বসিয়ে দেবে—"

থাকমণির কন্ঠস্বর শুনা গেল—পাগল আবার কোথায় দেখলে মা শাশ্বতী—তোমার সবই কি অনাছিষ্টি বাপু? এই তো কাল রাত্রে মাত্র এসোছো, দুদিন থাক, তা নয়,—এসেই শুধু যাই যাই করছো?

শাশ্বতী—

সুমন্তের হাসি পায়।

জগতে কত নাম আছে, কাদম্বরী, নিতম্বিনী, লীলাবতী, মনোরমা প্রভৃতি হাজার নাম মনে পড়ে; এত সব গালভরা নাম থাকিতে নাম রাখিয়াছে শাশ্বতী, বাপ্—এ নাম আবার মানুষে রাখে।

শাশ্বতী বলিল—"দুদিন বেড়িয়ে যাব বলেই তো এসেছিলুম মাসিমা, কিন্তু বাপু, তোমার বাড়িতে পাগলের কাণ্ড দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেছে—মেসোমশাইকে কিনা এমন ধাক্কা মারলে যে তিনি একেবারে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। আবার মানুষের মুণ্ড খাওয়ার জন্যে গান ধরেছে, ঘরের মধ্যে ধিন ধিন করে নাচছে।"

বলছো কি মা শাশ্বতী, তোমার মেসোকে ধাক্কা মেরেছে? কি রকম পাগলের চেহারাটা বল দেখি, একবার তাকে দেখে নেই—"

শাশ্বতী চেহারার বর্ণনা যাহা দিল, তাহাতে সুমন্ত রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিল—রণরঙ্গিনী কাকিমাকে সে চিনে; তাই বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইল।

অদৃষ্ট বিরূপ—

সামনের দরজাটা হঠাৎ খুলিয়া আভির্ভূতা হইলেন স্বয়ং কাকিমা। বিশাল শরীর নয়-হাতি কাপড়ে সম্পূর্ণ আবৃত হয় না, অঞ্চল মাথা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিলেও ঢাকা পড়ে না, তাই তিনি বাম হস্তে কাপড়ের এক প্রান্ত মাথা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া ধরিয়া আছেন।, অপর হস্তে একখানি জাঁদরেল খুন্তি—সম্ভব সেইখানি দিয়া তিনি তরকারী নাড়িতে-ছিলেন।

এ মূর্তি দেখিলে সকলকেই ভীত হইতে হয়। সুমন্ত একবার চোখ তুলিয়াই সরিয়া যাইতেছিল। থাকমণি বাধা দিলেন—"দাঁড়াও সুমন্ত, তোমার কাছেই আমার দরকার। বলি—জোর রাখবার জায়গা কি আর পাচ্ছো না, তাই বুড়ো মানুষ কাকাকে ধাক্কা দিয়ে—"

চটপট সুমন্ত উত্তর দিল—হুঁ, ও কথাটা ঠিক হ'লো না কাকিমা, আমি ধাক্কা দেই নি, বরং কাকামশাই আমায় ধাক্কা দিয়েছেন—একথা বলতে পারো।"

পিছন হইতে শাশ্বতী বলিয়া উঠিল, "না কাকিমা, সে যা ধাক্কা, মেসোমশাই সামলাতে পারেন নি, একেবারে হুমড়ি খেয়ে ওইখানে এমনি করে—"

সুমন্ত আর সহিতে পারিল না, ত্বরিত পদে কাকিমার পাশ কাটাইয়া শাশ্বতীর সামনে দাঁড়াইল এবং দৃঢ় কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেখেছো—ঠিক দেখেছো। আমি তোমার মেসোমশাইকে ধাক্কা দিয়েছি? মিথ্যে কথা যদি বল—"

এক হাতে সেতার, অপর হাত রিক্ত, সুমন্ত বীর দর্পে আস্ফালন করিতেই মেয়েটি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল মাত্র।

থাকমণি হাঁপাইয়া উঠিলেন—"ওকি সুমন্ত, তুমি ওকি করছো? দুদিনের জন্যে আমার এখানে বেড়াতে এসেছে, আর তুমি কিনা ওকে এ রকম করছো—ছিঃ—"

সুমন্ত একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল। ধীর কণ্ঠে বলিল, আমি গোঁয়ার হতে পারি, ছোট লোক নই। ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম—মিথ্যে কথা আমি বলি নি, উনিই বলছেন।"

সে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

পারিবারিক রেষারেষি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে; এ উহার নিন্দা করে, ও ইহার নিন্দা করে। কাহারও উন্নতি হইলে আর পাঁচজনের বুকে নিদারুণ জ্বালা ধরে, কাহারও ক্ষতি হইলে আর পাঁচজনের মুখে হাসি ধরে না।

পরিবারটি কম নয়,—চারিদিকে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, হয়তো কেহ কাহারও পরিচয়ও জানে না।

এত বড় বাড়িটা টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ হইয়াছে অনেক কাল, দুই তিন পুরুষ আগে। কোন পরিবার হয়তো কালে কস্মিনে বাড়ি আসে, কোন পরিবার আসে না, তাহাদের অংশ হয়তো পড়িয়া গিয়াছে কিম্বা পড়িয়া যাইতেছে।

থাকমণি বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া শাশ্বতীকে পরিচয় দেন—"এ কি আর ছোট্ট বাড়ি মা,—কত বড় পরিবার, কত বড় বংশ, নাম করলে না হোক দু শো খানা গাঁয়ের লোক চিনবে। এই আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, কতই বা বছর হবে—তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের কথা—বললে আজ পেত্যয় করবে না মা, মস্ত বড় চতুর্দোলা সাজায়ে আমায় এঁরা নিয়ে এলেন। বোঝ—তখনও হাঁক-ডাক কত,—নামই বা কত। সেই বাড়ির আজ এই দুর্দশা, এ কি সহ্যি হয়?"

থাকমণি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

শাশ্বতী বলে, "এঁদের এমন অবস্থা কি করে হ'ল মাসিমা?"

থাকমণি সদুঃখে বলেন, "ওই তো মা, লক্ষ্মী যখন আসেন সবাই জানতে পারে, কোন পথে কখন যান, কেউ জানতে পারে না। হাজার সরিক যখন হ'ল, মামলা মোকদ্দম ঢুকলো—মা লক্ষ্মীও কোন্ পথ দিয়ে অন্তর্ধান করলেন। এখন তো হাঁড়ির হাল, দিন চলে না গোছের অবস্থা।"

ক্রমশ

সারমেয় সন্দর্ভ

(৬২২ পৃষ্ঠার পর)

সম্ভব হইত; তাহাকে অন্যান্যের সঙ্গে চিড়িয়াখানার অধিবাসী করিলেই চলিত।

কুকুরপালন যে একটা বিলাসিতা সুতরাং অন্য সময়ে না হইলেও যুদ্ধকালীন অভাবের মধ্যে অন্তত নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়, একথা সেদিন বিলাতের একজন মন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই,—

"Such incidents as dog-racing and boxing displays amongst them are completely out of accord with the true spirit and determination of the people in this crisis etc."*

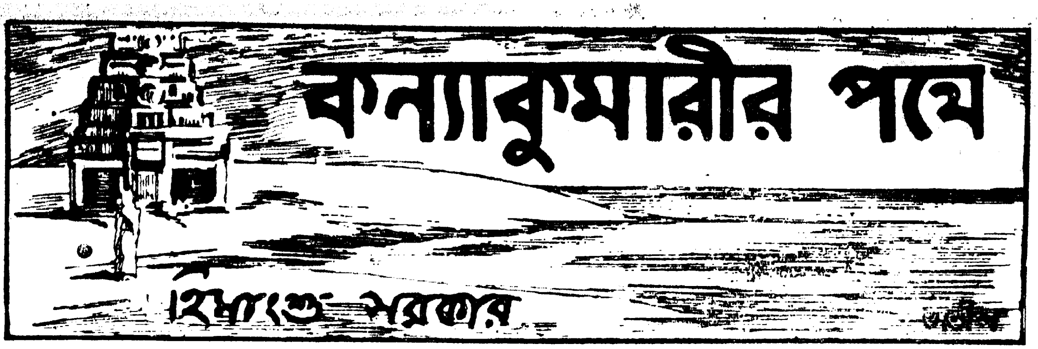
আমাদের এখানেও মাঝখানে বেহালায় কুকুর-দৌড়ের ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল। এখনও একেবারে বন্ধ হইয়াছে কিনা জানি না। পাশ্চাত্য পাপ অনুকরণের হিড়িকে আমরা যতগুলি গ্রহণ করিয়াছি, কুকুর-পোষা ও কুকুর-দৌড় তার মধ্যে অন্যতম। মনে রাখা ভাল যে, কথঞ্চিৎ নির্দোষ হইলেও উহা একটি বিলাস এবং ব্যসন; অতএব বর্জন করিতে পারিলেই ভাল।

প্রবন্ধ লিখিয়া ছেলেদের সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা যায় না, আর মানব-সমাজ হইতে কুকুরকে তাড়ান যাইবে? যাইবে না, জানি; কিন্তু কাঙালের ঘোড়া-রোগ যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে দরিদ্র দেশে কুকুর রোগেরও চিকিৎসার কথা ভাবা উচিত।

---

†"পহিলে কুত্তা কুত্তা পালে, দুস্‌রা কুত্তা পর ঘর রহে।
তিস্‌রা কুত্তা বহীনকো ভাই, চৌথা কুত্তা ঘর-জামাই।"

*Sir Stafford Cripps in Parliament, February 25, 1942.



(৬)

কৃষ্ণপিল্লাইকে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। বচেয়ে ভাল লাগত তার সদা হাস্যময় মুখ। মুখে তার ভোজপুরী রোয়ানের মত গোঁফ। লম্বায় এবং স্বাস্থ্যে মানানসই। পরনে র হাফ প্যান্ট, আর গায়ে আমরা যাকে ফতুয়া বলি তাই। াকটি থাকার দরুণ রামেশ্বরমে যাতায়াতের মধ্যে আমাদের লপত্রের জন্য কোন রকম হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি,—সেই সব খাশোনা করেছিল।

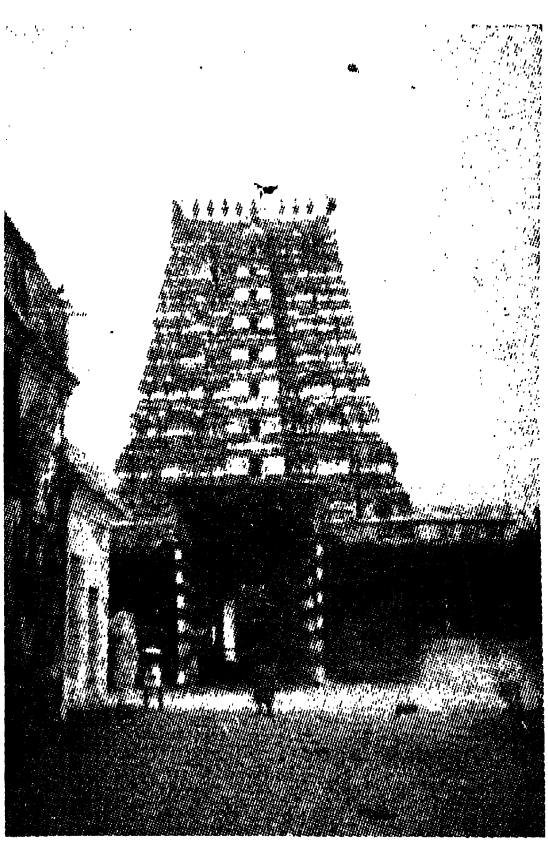
আমাদের মালপত্রও তো নেহাৎ কম ছিল না। প্রত্যেকরই কটা করে বড় সুটকেস; তারপর তোষক, বালিস, লেপ ত্যাদির সঙ্গে বিছানার নামে যতকিছু নেওয়া যায়, সেই রকম কটা হোল্ডঅল। তা'ছাড়া প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে াচ কেস্—তার মধ্যে সুশ্রী হবার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। বেশী নিস থাকায় আমাদের অনেক জায়গায় শুধু এর জন্যই কষ্ট াতে হয়েছিল। যেমন কোথাও ট্রেন থামে অল্প সময় আবার াথাও বা কুলিরা আমাদের মালের বহর দেখে এবং বোধ হয় ামাদের মাল বহনে অক্ষম ভেবে প্লাটফর্ম থেকে ওয়েটিংরুমে য়ে যেতেই ৩।৪ টাকা চেয়ে বসত। অবশ্য সেই সব ক্ষেত্রে খন কুলিরা দেখত যে আমরা তাদের সঙ্গে কোন রকম দরাদরি করে নিজেরাই কাঁধে হোল্ডঅল এবং সুটকেস্ নিয়ে রওনা চ্ছি, তখন তারা আমাদের কান্ড দেখে হয় অবাক হয়ে াকিয়ে থাকত আর না হয় একবারে ৩।৪ টাকা থেকে আট ানা কিম্বা এক টাকায় নেমে আসত। যাই হোক এই রকম ঝে মাঝে নিজেদের মাল বহনের জন্য দু'চার জনেরই বেশী ষ্ট স্বীকার করতে হ'ত—কারণ দলের সকলেরই এ ধরণের জ না পেরে ওঠায়, তাদের কাছ থেকে বিশেষ কোন রকম হায্য পাওয়া যেত না।

আগে থেকে এই ধরণের ভ্রমণের কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে নেক সুবিধা হয়—কারণ তা'হলে বোঝা যায় কি পরিমাণ সাজ-রঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে।

সমুদ্রের ধারের শহরগুলোর দিকে ভ্রমণে বের হলে শীত বং গ্রীষ্মে পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় এক ধরণের হলেই চলে। রা কোন কিছু বিজাতীয় পোষাক পরবার পক্ষপাতী নন থবা অসুবিধা বোধ করেন—তাঁরা ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদরে কতটা হিক সাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, তাঁরাই ভাল জানেন। শীতকালে ধারণ রকম গরম কাপড়চোপড় হলেই চলে যায়—কারণ খুব শী শীত সমুদ্রের ধারে পড়ে না।

বিছানাপত্রের বেলাও এরকম সংক্ষেপে সারলে কোন অসুবিধা হয় না। সতরঞ্চি, পাতলা একটা তোষক, বালিস আর একটা মশারী—তা'ছাড়া খুব বেশী নিলে গায়ে দেবার একটা চাদর।

বেশী বিছানাপত্র এবং সুটকেস্ অথবা ট্রাঙ্ক বোঝাই করে কাপড় জামা নিলে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। সমস্ত দিনের



রামেশ্বরম মন্দিরের প্রবেশ পথে গোপুরথ দেখা যাচ্ছে

পরিশ্রমের পর রাত্রে শোয়ার সময় বিছানা ভাল মন্দের দিকে লক্ষ্য করার সময় এবং ইচ্ছা কোনটাই থাকে না। তখন ভাল করে গুছিয়ে বিছানা পেতে শুতেই বিরক্তিকর বোধ হয়। তখন মনে হয় কতক্ষণে শুয়ে পড়ে গা এলাতে পারব। বেশী কাপড় জামার অসুবিধা এই যে, তাড়াতাড়িতে বেশী জিনিসের

মধ্য থেকে দরকারী জিনিসটাই খ‍ুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া দ‍ু'চারটে জিনিস হারানোর সম্ভাবনাও খ‍ুব বেশী। কুলী ভাড়ার কথাটাও ভাবা উচিত।

যদি দল বেঁধে কোথাও এই ধরণের ভ্রমণে বের হতে হয়, তাহলে সব সংগীরা মিলে এক জায়গায় নিজেদের জিনিসপত্র জড়ো করলে দেখা যায় যে, অনেক অদরকারী জিনিস কমে যায়। আর এতে সকলে এমনভাবে জিনিস নিতে পারে যাতে রাস্তায় কোন রকম কষ্টই কাউকে ভুগতে হয় না।

কৃষ্ণপিল্লাই আমাদের সব জিনিসগ‍ুলো স্টেশনের একদিকে জড়ো করে রাখল। জিনিসের স্ত‍ূপটা দ‍ূর থেকে একটা ছোট-খাট পাহাড় বলে মনে হচ্ছিল। জিনিসের বহর দেখে নিজেদের বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা করছিল না যে, আমরা মাত্র ন' জন প‍ুর‍ুষ মান‍ুষ প্রায় এক মাসের জন্য দেশ ভ্রমণে বের হয়েছি। আর এমন সব জায়গায় যাব যেখানে দরকারী কোন জিনিস কেনারই অস‍ুবিধা হবে না। যাক্‌ এখন আর ভেবে উপায় নেই—এই ছোট পাহাড়টিকে আমাদের বহন করে ভ্রমণ শেষ করতে হবে। লঙ্কার কাছে এসে গন্ধমাদন বহন করা আর কি। আর ভ্রমণের এই তো সবে স‍ুর‍ু।

ট্রেনের তখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী থাকায় আমরা সব এদিক ওদিক য‍ূথভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম। আমরা কজন রেল লাইন ধরে যেদিক থেকে ট্রেন পাম্বন জংশনে আসবে, সেই দিকে চল্‌তে লাগলাম। ইচ্ছাটা যে একবার Scherzer ব্রিজটায় যাব। পাম্বন জংশন থেকে ব্রিজটা আধ মাইলের ভিতরই। ক্র‍ুশডাই দ্বীপে যাওয়ার সময় এই ব্রিজটার ওপর দিয়ে এসেছি এবং দ‍ূরে থেকে এটাকে দেখেছি। এখন একবার কাছে গিয়ে ব্রিজটা দেখি। ব্রিজটা সাউথ ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী ১৯১৪ সালে তৈরী করে। এখন এই ব্রিজটা থাকায় সব দিক দিয়েই স‍ুবিধা হয়েছে। আগে সিংহলে যাওয়ার যাত্রীদের ঘোরাপথে টিউটি-কোরিন হয়ে যেতে হত। এখন সিংহলযাত্রীরা সোজা ট্রেনে উঠে ব্রিজ পেরিয়ে অল্প সময়ে এবং সাচ্ছন্দ্যের সংগে ধন‍ুষকোটী হয়ে সিংহল যায়।

ব্রিজটার ওপর দিয়ে একটা রেল লাইন পাতা আছে এবং পাশ দিয়ে লোকদের যাতায়াতের জন্য সর‍ু একটা চলবার পথও আছে। খানিক দ‍ূরে দ‍ূরে রেলিং দিয়ে ঘেরা চওড়া প্রশস্ত জায়গা এই চলবার রাস্তাটা থেকে জলের ওপর বেরিয়ে গেছে। এখানে এসে দাঁড়ান যায়। আমরা ব্রিজের ওপর উঠে এই সর‍ু চলবার রাস্তা দিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করলাম। ব্রিজটা জলের ভেতর থেকে পাথরের ইট দিয়ে গাঁথা পিলারের তৈরী। একটু লক্ষ্য করে দেখলাম যে, এই খানটার সম‍ুদ্রের জলের ভেতর খ‍ুব বড় বড় পাথর এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। দেখলে বোঝা যায় যে, ব্রিজ গাঁথবার জন্য এগ‍ুলো জলের মধ্যে এনে ফেলা হয়নি এবং সেটা সম্ভবও নয়। এগ‍ুলো আপনা থেকেই এখানে এসেছে বোধ হয়। ভাঁটার সময় এই সব পাথর-গ‍ুলো জল থেকে খানিকটা করে বের হয়ে থাকে। কালো পরিস্কার পাথরগ‍ুলোর ওপর দিয়ে যখন সম‍ুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগ‍ুলো চলে যায়, তখন মনে হয় যেন নানা প্রকারের অতিকায় জন্তুরা তাদের শরীরটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে শ‍ুধ‍ু পিঠের ওপর অংশটা একটু বার করে রয়েছে। ভাঁটার সময় জল থেকে ব্রিজের লাইন ১০ ফিটের মত উচু মনে হ'ল। আমরা আস্তে আস্তে পাশের রেলিং ধরে এগিয়ে চল্‌লাম। হাওয়া এত জোরে আর এলোমেলো যে, মনে হচ্ছিল একটু অসাবধান হলেই একটা দমকা হাওয়ায় আমাদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

প্রায় মাঝামাঝি আসার পর ব্রিজটা যেখান থেকে দ‍ু'ভাগে ভাগ করে তুলে রাখা হয়, সেখানে এসে পেঁ'ছলাম। দেখলাম যে, দ‍ুদিকে দ‍ুটো ছোট ছোট ঘর থেকে রেলওয়ের লোকেরা এটা দ‍ুভাগে ভাগ করার এবং জোড়ার কাজ করে। ট্রেনের সময় হয়ে আসায় আমরা এখানকার কলকৌশল ভাল করে পরীক্ষা করবার সময় পেলাম না। সকলে স্টেশনের দিকে ফিরলাম।



ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে 'এক দাখড়ী, এক দাখড়ী' বলে পয়সা চাচ্ছে

পাম্বন জংশন থেকে আমরা সন্ধ্যা সাতটায় রামেশ্বরমে যাওয়ার ট্রেন ধরলাম। এই জংশন থেকে রামেশ্বরমের দ‍ূরত্ব খ‍ুব বেশী নয়। প্রায় ৪০ মিনিট বাদে আমরা রামেশ্বরম স্টেশনে এসে থামলাম। এখানে তাড়াহ‍ুড়ো করে নামবার কোন দরকার নেই, কারণ এটা এদিককার শেষ রেলওয়ে স্টেশন।

পাম্বন জংশন থেকে দ‍ুটো লাইন এই দ্বীপটার দ‍ু' মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রামেশ্বরম স্টেশন আর একটা হচ্ছে ধন‍ুষকোটী স্টেশন। এই ধন‍ুষকোটী থেকেই সিংহল যাওয়ার জাহাজ ছাড়ে। রামেশ্বরমের সংগে ধন‍ুষকোটীর কোন রকম রেলওয়ে সংযোগ নেই। রামেশ্বরম থেকে ধন‍ুষকোটী যেতে হলে সেইজন্য আবার পাম্বন জংশনে ফিরে এসে ধন‍ুষকোটী যাওয়ার ট্রেন ধরতে হয়।

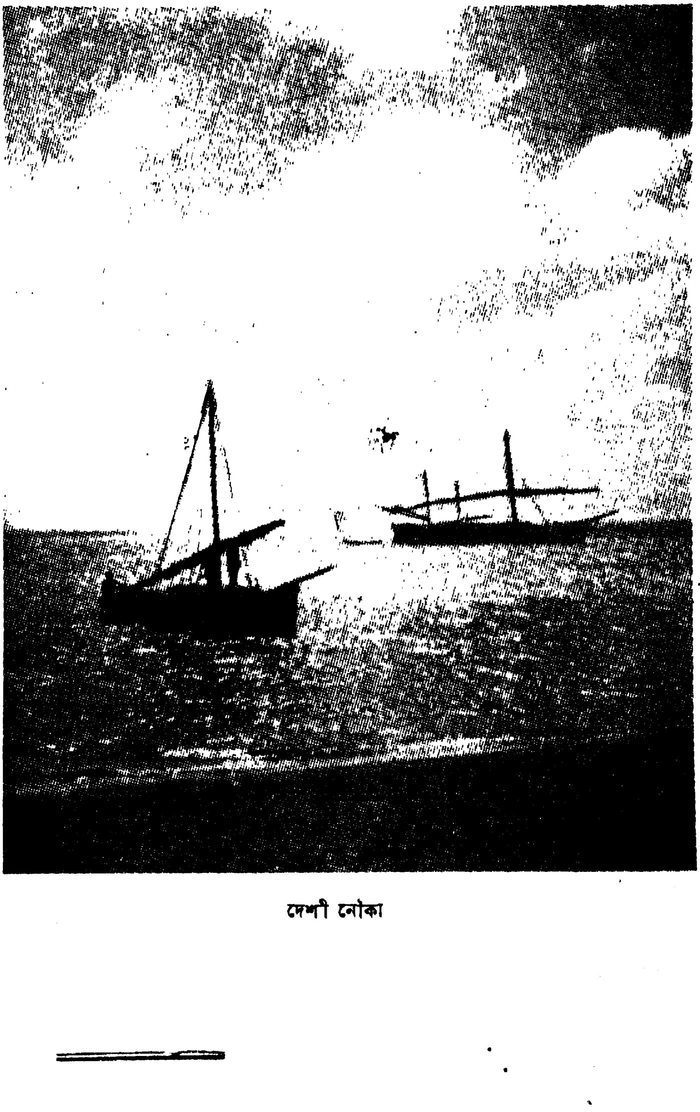
রামেশ্বরম, ধন‍ুষকোটী এবং পাম্বনের মতই একটা রেলওয়ে স্টেশনের নাম হলেও এই দ্বীপটা রামেশ্বরম দ্বীপ নামেই পরিচিত। কি করে এই দ্বীপটার নাম রামেশ্বরম হ'ল সেটা আমরা পরে বলবার চেষ্টা করব। এই রামেশ্বরমকে বেশ

বড় দ্বীপই বলা যায়। এটা লম্বায় প্রায় ২৫ মাইলের মত, আর চওড়ায় • কোথাও ৬ মাইল আবার কোথাও ৮ মাইলের মত। ভারতবর্ষের প্রধান স্থল থেকে এটা প্রায় ২ মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। বর্তমানে রামেশ্বরম Scherzor ব্রিজ দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতবর্ষের স্থলভাগের শেষ রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ যে স্টেশনের পর থেকে ব্রিজ আরম্ভ হয়েছে তার নাম আন্দাপথ ক্যাম্প। আর এদিকে রামেশ্বরম হয়েছে তার নাম আন্দাপম ক্যাম্প। আর এদিকে রামেশ্বরম দ্বীপের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন, অর্থাৎ ব্রিজ শেষ হবার পরই যে স্টেশন তার নাম হচ্ছে পাম্বন জংশন। এই দ্বীপটা পাক প্রণালী আর মান্নারের উপসাগর দিয়ে ঘেরা।

সমস্ত দ্বীপটার অনেক গাছের মধ্যে বাবলার গাছটা বেশী রকম দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কারণ প্রথমত, বাবলা গাছ এদিকটায় একটু বেশী বলেই মনে হল। তারপর দেখলাম যে, সমুদ্রের পাড়ের ওপর এবং কাছাকাছি সব বাবলা গাছগুলোর চেহারা এবং গঠন অন্য ধরণের। ডালপালা শুদ্ধ গাছের মাথাগুলো অস্বাভাবিক রকম সমুদ্রের পাড়ের দিক থেকে স্থলের দিকে বেঁকে রয়েছে। গাছগুলো দেখলে মনে হয় যেন, কোন এক অদৃশ্য শক্তি স্থলের দিক থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি গাছগুলো টেনে রেখেছে। এর কারণ আমার যতদূর মনে হয় যে, সমুদ্রের হাওয়া জলের উপর থেকে স্থলভাগের দিকে বইতে থাকার দরুণ গাছগুলো সব সময় এক ধরণের হাওয়ার চাপে পড়ে স্থলের দিকে সবশুদ্ধ বেঁকে গিয়ে বেড়ে চলে।

ব্যবসা ছাড়াও নারকেল এবং তাল-গাছের প্রাচুর্যও এখানে খুব বেশী। সমুদ্রের ধারের তাল, নারকেল গাছগুলোও খানিকটা করে বাবলা গাছের মত বেঁকে থাকে।

রামেশ্বরম স্টেশনে নামবার পর কৃষ্ণপিল্লাই বল্‌ল যে, স্টেশনের কাছেই একটা ভাল চোলট্রি (ধর্মশালা) আছে। আমরা সেটায় গেলে থাকবার জায়গা পাব। আমরা সকলে সেই-দিকে রওনা দিলাম। **ক্রমশঃ**



দেশী নৌকা

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৪)

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলন বাঙলার তথা ভারতের ইতিহাসে অপূর্ব ঘটনা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কলমের খোঁচায় বাঙলা দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ফলে তাহার বিরুদ্ধে বাঙালী-জাতির মধ্যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষে সে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, নচেৎ হইত না, একথা আমি মনে করি না; ইতিহাসও সেরূপ সাক্ষ্য দেয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী-জাতি স্বাধীনতার তপস্যায় হোমাগ্নির যে সমিধ সঞ্চয় করিয়াছিল, এই বঙ্গ ভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাই আজ পূর্ণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বহু-কালের জাতীয় অপমান ও নির্যাতনের ফলে জাতির চিত্তে যে রুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত হইতেছিল, বঙ্গ ভঙ্গের আঘাতে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মত তাহাই আজ প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিল এবং দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিল। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে জোয়ারের জল যেমন প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসে, এ যেন অনেকটা সেইরূপ। আমার বিশ্বাস লর্ড কার্জন যদি বঙ্গ ভঙ্গ নাও করিতেন, তথাপি অন্য কোন একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইত। মানুষের জীবনেও দেখা যায়, কোন একটা আকস্মিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই দীর্ঘকালের প্রতীক্ষিত বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাঙালী জাতি যখন দেখিল, তাহাদের জাতীয় সংহতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য সমস্তই বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে, তখন তাহাদের অবরুদ্ধ শক্তি প্রচণ্ড বিক্ষোভে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় সার্ভিয়ায় একজন লোক অস্ট্রিয়ার প্রিন্সকে হত্যা করিয়াছিল; এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার প্রিন্সকে হত্যা না করিলে সেই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইত না, এমন কথা কে বলিবে?



আমরা পূর্বেই বলিয়াছি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে জাতীয় আন্দোলনের দুইটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। একটি ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে কংগ্রেসের জন্ম পর্যন্ত এই ধারা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেস ইহারই উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। বাঙলা দেশের নেতারাই কংগ্রেসের জন্ম হইতে উহাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু,

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, আনন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। যখন বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন বাঙলার এই সব কংগ্রেস নেতারাই সর্বাগ্রে উহার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাঙলার সর্বত্র সভাসমিতি বক্তৃতা করিয়া জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ বাতিল করিবার জন্য তাঁহারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে আর একদল নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা নিয়মতান্ত্রিকতা বা ভিক্ষানীতির বিরোধী—আত্মশক্তির সাধক এবং বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রভৃতি বাঙলার সাহিত্যিক ও মনীষীদের ভাবধারার উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ধারার একজন অগ্রগামী পথিক। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিও ছিলেন তাঁহারই সহযাত্রী। যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন এই আত্মশক্তির সাধকেরাও সেই আন্দোলনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই নবীন দল বলিলেন, ও সব আবেদন নিবেদনে কিছু কাজ হইবে না, আমাদের জাতীয় শক্তির সাধনা করিতে হইবে ও তাহার পরিচয় দিতে হইবে, তবেই ইংরেজ কেবল বঙ্গ ভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য হইবে না, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালনাও এই নূতন দলের নেতাদেরই পরিকল্পনা। একদিকে আমাদের স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রচার, অন্যদিকে বিদেশী শিল্প বর্জন বা বয়কট—অর্থনৈতিক সংগ্রামের এই দুইটি উপায় তাঁহারা নির্দেশ করিলেন। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও এই নূতন রাজনৈতিক সংগ্রামের আর একটি অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইল।

নূতন দলের শক্তিশালী নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই সময়ে 'সন্ধ্যা' নামক বিখ্যাত দৈনিক পত্র প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক শক্তিমান ব্যক্তি আসিয়া যোগ দিলেন, যথা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি। বিপিনচন্দ্র পালও তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে জ্বালাময়ী ভাষায় নূতন দলের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। Passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি রাজনৈতিক সংগ্রামের পন্থা হিসাবে বিপিনচন্দ্রই প্রথমে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় 'সত্যাগ্রহ' নীতি অবলম্বন করেন। বিপিনচন্দ্রের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' যে মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ'-এর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রবাদীরা ভারতের জন্য তখন 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস বা 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' চাহিতেন। তাহার পরেও বহু বৎসর পর্যন্ত—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব আরম্ভ হইবার পরেও, কংগ্রেস এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বেশী দাবী করে নাই। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সেই স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই জাতির পক্ষ হইতে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে জোরের সঙ্গে Full autonomy বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রচার করিতে লাগিলেন। 'সন্ধ্যা'য় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও ইহার সঙ্গে সুর মিলাইলেন। নূতন দলের মতবাদ এইভাবে দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল, দেশের যুবকেরা তাহাতে সাড়া দিতে লাগিল।

এই সময়ের সর্বপ্রধান স্মরণীয় ঘটনা বাঙলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের যোগদান। এই অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ যেন যাদুমন্ত্রবলে বাঙলার রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে যে নূতন শক্তি দেশের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ অত্যন্ত সহজভাবেই তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নূতন দল প্রতিষ্ঠিত হইল—নব জাতীয়তা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় ইংরেজী দৈনিক পত্র 'বন্দে মাতরম্', নবীন দলের মুখপত্ররূপে এই নব জাতীয়তা আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিল। সে আন্দোলন আর বাঙলা দেশে সীমাবদ্ধ থাকিল না—দেখিতে দেখিতে উহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়, মধ্যপ্রদেশের ডাঃ মুঞ্জে এই জাতীয়তা আন্দোলনের পতাকা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বিপিনচন্দ্র দাবী করিয়াছিলেন Full autonomy বা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। শ্রীঅরবিন্দ আরও স্পষ্টভাবে জাতির পক্ষ হইতে দাবী করিলেন—Independence বা স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা যে ভিক্ষার পথে লাভ হইবে না, তাহার জন্য আত্মশক্তির সাধনা করিতে হইবে, ইহাও তিনি নির্ভীকভাবে জাতির নিকট প্রচার করিলেন। এই সম্পর্কে 'বন্দে মাতরম্'এর 'Crime of Nationalism' প্রবন্ধ বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-ব্রহ্মবান্ধবের প্রচারিত এই নব জাতীয়তাবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও ভাবধারার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রচারিত আদর্শ ও ভাবধারা এই আন্দোলনের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার যে চিন্ময়ী রূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দপ্রমুখ নব জাতীয়তাবাদীরা সেই রূপই যেন প্রত্যক্ষ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপদিষ্ট আত্মোৎসর্গ, কর্মযোগ ও শক্তির সাধনাকেই তাঁহারা স্বাধীনতা লাভের পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত জাতীয় সংগীত বলিয়া গৃহীত হইল, 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দেশ সেবক সন্তানদের 'মন্ত্র' বলিয়া গণ্য হইল। শ্রীঅরবিন্দ এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত ; তিনিই প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারত আজ সেইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া থাকে।

নব জাতীয়তাবাদীরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম—'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়'। স্বর্গীয় নন্দকিশোর মিত্রের উদ্যোগে উত্তর কলিকাতার

দেশভক্ত শিক্ষিত যুবকেরা এই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিয়া জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। তখনকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজপথে 'বন্দে মাতরম' গান গাহিয়া যাইতে দেখিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের সভাগৃহে জাতীয়ভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতিও হইত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উহাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন এবং স্বরচিত গান গাহিতেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনেই এই উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়' সদলবলে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং জাতীয় সংগীত গান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে কয়েক সহস্র লোক এই উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছিল। কাঁঠালপাড়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতেও বহু লোক আসিয়াছিল। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল জাতীয় মেলা। বঙ্কিমচন্দ্রের বাস-ভবনের সম্মুখের বিস্তৃত মাঠে এই মেলা বসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা তাহাদের নানা কৃষিজাত ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য মেলায় বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, কবির দল, পাঁচালীর দল, তীর ধনুকের খেলা প্রভৃতি গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। উপাধ্যায় বলিতেন যে, বিলাতী কায়দায় স্মৃতি সভা করা আমাদের জাতির ধাতের সঙ্গে খাপ খায় না, এই গ্রাম্য মেলার দ্বারাই আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও ভাল করিয়া স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি। সে যাহা হউক অপরাহ্নে আধুনিক রীতিতেও মেলাক্ষেত্রে একটি সভা হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিম-চন্দ্রের বন্ধু ও সাহিত্য-শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়। তিনি সঙ্গে দুইটি বালক গায়ককে লইয়া আসিয়া-ছিলেন। সভার প্রথমে তাহারা উঠিয়া জয়দেবের—'দশাবতার স্তোত্র' মধুরকণ্ঠে গান করিল। একটি বালিকা 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাজিয়ে যাব মল' কবিতাটি চমৎকার আবৃত্তি করিল। তারপর শ্বেতকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে করিয়া তাঁহার এমন ভাবাবেগ হইল যে, তিনি বক্তৃতা করিতে পারিলেন না, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভা শেষ করিলেন। সন্ধ্যার পর বঙ্কিমচন্দ্রের পূজার দালানে রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়া 'আনন্দমঠ' অভিনীত হইল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বয়ং সত্যানন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র প্রভৃতির ভূমিকা কাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে না। এইরূপে রাত্রি প্রায় ৯টার পর বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব শেষ হইল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশব্যাপী যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইল, তাহার সম্মুখে এইরূপে প্রাচীন ও নবীন দুই দলই আসিয়া দাঁড়াইলেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিকতার ধারা এবং নবীন আত্মশক্তির ধারা কর্মক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে মিলিত মিশ্রিত হইয়া গেল। গঙ্গা ও যমুনার দুই ধারা যেমন প্রয়াগ সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তেমনি করিয়া বাঙলার রাজনীতির এই প্রাচীন ও নবীন ধারা মিলিত হইয়া বিরাট স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হইল। স্বদেশী আন্দোলন যে এমন শক্তিশালী হইয়াছিল, দেশের চিত্তে সমস্ত দিক হইতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মূল কারণ ইহাই। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহাতে প্রাচীন ও নবীন দলের মিলিত শক্তির প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল। বলিতে গেলে কংগ্রেসের আর সে পূর্বের মূর্তি রহিল না, উহা নব রূপান্তরিত হইল। আর বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচারের পর দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশ তাহার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আন্দোলন চালাইয়া "settled fact"কে যে "unsettled" করিয়াছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিয়াছিল, তাহাও এই সম্মিলিত শক্তির জোরেই সম্ভব হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে প্রদীপ্ত ভাস্কর মূর্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ এই সময়েই হইয়াছিল; কৈশোর হইতে তিনি যে দেশপ্রেম ও সেবার সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল এই সময়েই জাতিকে তিনি পূর্ণরূপে দান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহা কেবল আমাদেরই অভিমত নহে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এইরূপ মনে করিতেন। শ্রীমতী রাণী চন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তখন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি নিঃশঙ্ক বেপরোয়াভাবে কাজ করেছি। যা মাথায় ঢুকেছে করে গেছি—কোনো ভয়-ডর ছিল না। আশ্চর্য রূপ দিয়েছে, ছবির পর ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ, আর তাদের রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। আজ অবনের গল্পে সে কালটা যেন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। আবার সে যুগে ফিরে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ঐখানেই পরিপূর্ণ আমি। পরিপূর্ণ আমাকে লোকে চেনে না—তারা আমাকে নানাদিক থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখেছে। তখন বেঁচে ছিলুম,—আর এখন আধমরা হয়ে ঘাটে এসে পোঁচেছি।"

(শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "ঘরোয়া" গ্রন্থের ভূমিকা)।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই রবীন্দ্রনাথ তাহার তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৯০৫ সালের ২৫শে আগস্ট বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" পাঠ করেন। ভীড় এত বেশী হইয়াছিল যে, বহু লোক টাউন হলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই কারণে এক সপ্তাহ পরে আর এক স্থানে সভা করিয়া পুনরায় ঐ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহার পর প্রায় প্রতিদিনই নানা স্থানে জনসভা হইতে লাগিল এবং রবীন্দ্রনাথ বহু সভাতেই যোগদান করিয়া প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে রচনা করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সভাতেই ঐ সমস্ত সংগীত গীত হইতে লাগিল। সমগ্র দেশ এই স্বদেশী আন্দোলনে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গ ভঙ্গ কার্যকরী হইবে বলিয়া গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেন। ঐ দিনই চিরস্মরণীয় রাখীবন্ধনের উৎসব ধার্য হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথই (মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহযোগিতায়) এই উৎসবের পরিকল্পনা করেন। সমগ্র বাঙালী জাতি অতি সহজেই এই উৎসব গ্রহণ করিয়াছিল এবং বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এবং তাহারও পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) তারিখে এই উৎসব পূর্ণোদ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া এই উৎসবের জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়াছিলেন—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান্।
বাঙলার ঘর বাঙলার হাট
বাঙলার বন বাঙলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক হে ভগবান্।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান্।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান্।

এই গান গাহিয়া অখণ্ড বাঙলা ও ভ্রাতৃত্বের চিহ্নস্বরূপ লোকে পরস্পরের হাতে রাখী বন্ধন করিত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব অনুভূতি—যাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

১৬ই অক্টোবর সকাল বেলায় রবীন্দ্রনাথ নিজে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া রাখীবন্ধন উৎসব করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া" গ্রন্থ হইতে তাহার অপূর্ব শব্দচিত্র পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না ঃ—

"ঠিক হলো সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরবে। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব। রবিকাকা বল্লেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম যে, সব কাপড় জামা নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চল্ল স্নানে—মনিব-চাকরে এক সঙ্গে স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে—গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চল্ল—

বাঙলার মাটি
বাঙলার জল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান্।

এই গানটি সে সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য। রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হলো—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল, একগাদা রাখী, এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল, তাদেরও হাতে রাখী পরানো হলো। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মল্ছে। হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী-পরানো—এইবার একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল হল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হোলো চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না।.........

......আমরা সব বসে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী কী হলো তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে,—বল্লে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতর, মৌলবী টৌলবী যাদের পেলুম, হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম—আর মারামারি। সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে, ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্ বাঁচা গেল। এখন হোলে—এখন যাও তো দিখিনি, মস্‌জিদের ভিতর গিয়ে রাখী পরাও তো—একটা মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।"

ক্রমশ

সাইরেন-সঙ্গিনী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সাইরেন বাজলো।

একটা সুতীব্র চাঞ্চল্যের তরঙ্গ! প্রায় শূন্য কলিকাতা নগরী বিলক্ষণ বিচলিত হয়ে উঠল অকস্মাৎ। প্রস্তুত ছিল না কেউ ; তাই এ ভীতিমুখর চাঞ্চল্যের ঢেউ।

প্রহর কয়েকে পথ জনহীন হয়ে এলো। দেখা গেলো মহানগরীর কোন নির্জন পথে শুধু একমাত্র পথিক। দৃষ্টি তার ভয়হীন। মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ সে নয়।

জীবনের সঙ্গে যারা জুয়ো খেলেছে সুবীর তাদের অন্যতম সুদীপ্ত ক্রীড়াবীর। ফলে জীবনের মূল্য তার কাছে খুব বেশী নয়। জীবন-জুয়ায় বহুবার তার হার হয়েছে। তাই গ্রাহ্য করে না আজকাল আর সে জয়-পরাজয়।

কিন্তু অকস্মাৎ সাইরেনের সুর বীভৎস হয়ে উঠলো। এ প্রস্তুত হবার সঙ্কেত। সাইরেন বুঝি ঘোষণা করল এ জুয়ায় মরণ প্রতিদ্বন্দ্বী সুবীরের। ওর পদক্ষেপ মন্থর।

আকাশের পানে চেয়ে সুবীর একবার হাসলো। কোন অদৃশ্যশক্তি অথবা আত্মার উদ্দেশ্যে এমনি হাসি ও ছুঁড়ে মারে মাঝে মাঝে। এ হাসি বিদ্রূপের। আর এ বিদ্রূপ যেন কার মৃত্যুবান।

সেই অন্ধকার-আচ্ছন্ন, সাইরেন-সঙ্কুল জনহীন পথের প্রান্তে সুবীর লক্ষ্য করলো অতি দ্রুত পদক্ষেপে কে এগিয়ে আসছে তার পানে। নারীমূর্তি যেন। সে কাছে এলো।

দেখুন—কণ্ঠস্বর কাঁপছে তপতীর।

বলুন—সপ্রতিভ সুবীর।

সাইরেন কি থামবে না?

এই তো সুরু—

কয়েকটা প্লেন নাকি আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে?

তাতো আসবেই।

তপতী অবাক হলো। লোকটা কি পাগল? একটু ভয়ও কি করে না ওর? কী ভয়ঙ্কর সাইরেনের তীব্র তীক্ষ্ণ কঠিন কঠোর কর্কশ আর্তনাদ।

আর কিছু বলবেন? সুবীর প্রশ্ন করলো।

আপনার কি ভয়ও করে না? বিস্মিত তপতী।

ভয়? সুবীর হাসলো সেই হাসি।

তপতী সুবীরকে ভাল করে দেখে নিলো। ওর সমস্ত কিছুই বড় অদ্ভুত লাগলো তার।

—কি দেখছেন?

—আপনাকে।

—আমাকে? সুবীর সত্যি সত্যি চমকালো। পলকবিহীন চোখে তপতীর পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো সুবীর এইবার। কি যেন মেশানো রয়েছে তার অঙ্গে অঙ্গে। ঔজ্জ্বল্যের তীব্র দীপ্তিতে দীপ্ত সে যেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

সাইরেনের সুরে বাজে কি সানাই?.........

ও কিছু নয়।

এ আর পি টেস্ট। সাইরেনের সুর শুনিয়ে কর্তৃপক্ষরা পরীক্ষা করলেন কর্মীদের। শত্রু আক্রমণ করেনি তা'হলে।

সুরু হলো জনতার কোলাহল। আতঙ্ক-আক্রান্ত নগরী সজীবতার সাড়ায় সমৃদ্ধ হোল পুনর্বার।

ওই থেমেছে—সুবীর কয়েক পা এগিয়ে গেল।

কোথায় চললেন? তার পাশে দাঁড়ালো তপতী।

দেখা যাক্—

আবার তো সাইরেন বাজতে পারে?

নিশ্চয়ই!

দেখুন, তপতী একটু থামলো। দয়া করে আমায় খানিকদূর পৌঁছে দেবেন?

ভয় লাগছে আপনার, না?

হ্যাঁ, ভয়ানক ভয়—

তবে চলুন, সুবীর আর একবার হাসলো।

নীরবে দু'জনে পথ চলতে লাগলো।

হয়তো সেই ওদের শেষ দেখা হ'ত। এ বিশাল বিশ্বে কে কার! কবে কোথায় কাকে দেখেছি প্রাণময় প্রভাতে, মন্থর মধ্যাহ্নে অথবা সুমধুর সন্ধ্যায়—রইলো তার ছাপ। দিন যায়, থাকে ছাপ। দিনে দিনে তাও মুছে যায়। মাঝে মাঝে শুনি স্মৃতির শঙ্কিত করাঘাত।

সুবীর তাও শুনতে পায়নি। দুদিনের ভঙ্গুর খেলাঘরে খেলা সে করেনি কোন দিন। কেন না, সে জানে খেলা শেষ হয়, খেলাঘর ভাঙে। সব দু'দিনের।

এ বিষাক্ত বিশ্বকে জ্বালিয়ে দিতে চায় সুবীর—সে চায় নতুন পৃথিবী, নতুন গান, নতুন প্রাণের স্পন্দন। এ পৃথিবী বৃদ্ধ জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক দীর্ণ। তাই তার চোখে আগুন—নেই স্বপ্নের সঙ্কেত।

কিন্তু আবার তাদের দেখা হোল।

শীতের মন্থর মধ্যাহ্ন। সুবীর ধীর পদক্ষেপে নগরী ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলো অনেক দূরে। এমনি চলে যায় বহুদূরে আপনার খেয়ালে সে আজকাল। ঐ মহানগরী যেন মৃত। তার চেয়ে ঢের ভাল নগরীর নিকটবর্তী গ্রামবিশেষ স্থানগুলি!

রোকো ড্রাইভার, দাঁড়ালো সুবীরের কাছে প্রকাণ্ড কার্।

চিনতে পারছেন? তপতী নামলো গাড়ি থেকে।

না, বিস্ময়ে নির্বাক সুবীর।

—আসুন গাড়িতে।

বেশ, নির্বিকার সুবীর বিনা দ্বিধায় উঠে বসল।

যে পথে চলেছিল তার বিপরীত পথে অগ্রসর হোল তপতীর বিপুল বুইক্।

এ অতি নাটকীয় ব্যাপার, মন্দ কি! সুবীর হাসলো মনে মনে। আজ বোমা বিক্ষুব্ধ মহানগরীতে মানুষমাত্রেই স্বার্থপর। কে চায় কার পানে। তাই সুবীর বিশ্বাস করতে পারছিলো না নিজের অবস্থার কথা। কিন্তু অকস্মাৎ সুবীর সচেতন হলো।

এ সেই অদৃশ্য শক্তি আত্মার কাজ।—যার উদ্দেশ্যে সুবীর বিদ্রূপের হাসি ছুড়ে মারে মাঝে মাঝে। সুবীরের কাছে বুঝি এবার হোল্লো তার হার। তাই কি সে পাঠালো উপহার। ধূর্ত সে—সুবীর ভাবলো ; তাই হেনেছে ফুলবাণ।

আমাকে কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত ছিল—তপতী চেয়ে রইলো সুবীরের পানে—

কেন বলুন তো ? কে আপনি ?

মাঝে একদিন সাইরেন বেজেছিলো, মনে আছে ?

হ্যাঁ—

সেদিন পথে—

বুঝতে পেরেছি, আপনিই তিনি ?

হ্যাঁ।

একটু চুপচাপ।

কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাকে ? সুবীর প্রশ্ন করলো।

কোন নির্দিষ্ট স্থানে নয়।

তবে ?

এমনি ইচ্ছে মত আমি ছুটে বেড়াই।—

গাড়ীকে ছুটিয়ে বেড়ান বলুন।

তপতী হাসলো। আর তার অস্বাভাবিক আন্তরিকতা এবং খেয়ালের কথা স্মরণ করে আশ্চর্য হোল সুবীর। তপতীর তুলনা তপতী।

সুবীরের জীবনধারা বেগবান। দুরন্ত দুর্বার তার মন। নির্মম পদাঘাতে খান্‌খান্ করে সে বাঁধন। আঘাত অথবা আনন্দ স্পর্শ করতে পারে না তার অঙ্গের একাংশও। সে চায় শুধু ঘোড়সওয়ারের মত সম্মুখে উত্তাল উন্মাদনায় অবিশ্রাম অগ্রসর হ'তে। সে উল্কাগ্নি। কি জানি কেন তবু আজ এই মন্থর মধ্যাহ্নে সুবীরের মনে হোল ক্ষণে ক্ষণে স্তিমিত হয়ে আসছে উল্কার ঔজ্জ্বল্য। জ্বালাময় দীপ্তি ম্লান হয়ে আসছে—কোথা থেকে আসে গম্ভীর ধ্যানের সুগম্ভীর সংকেত।

ওরা নামলো, আর নামলো অপরাহ্নের অপরূপ রূপ! চারপাশ স্বপন-সুনিবিড়।

চলুন বেড়াই, তপতীর কণ্ঠস্বর।

চলুন।

ওদের চঞ্চল পদক্ষেপে বনভূমি হোল মুখরিত। বহুদিন পরে সে যেন পেল প্রিয়তমের স্পর্শ—তাই তার অঙ্গে—অন্তরে আজ শিহরণের ঢেউ খেলে যায়।

এইবার অতীতের কয়েকটা প্রয়োজনীয় পাতা।

তপতী আপনার পরিচয় আপনি দেবে, কিন্তু সুবীর লজ্জাবোধ করে ব্যক্তিগত পরিচয় প্রকাশে। সুবীরেরই কথা এবার। সুবীরের পারিবারিক কথার উল্লেখ বর্তমান আসরে অবান্তর। শুধু এইটুকু বললেই চলে—আভিজাত্যের অলীক আবরণ ঠেলে ফেলে সত্যের আসল রূপ সে দেখতে চায়।

তাই বিংশ শতাব্দীর অলীক অহঙ্কার উপেক্ষা করেছে সুবীরকে। নির্মম নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর ব্যাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করেছে তাকে। কিন্তু সুবীর গ্রাহ্য করে না কিছু। সে তার জীবনকে রেখেছে বাজি। সত্যের সজীবতার সাড়ায় সে চায় জীবনকে করে তুলতে সুসমৃদ্ধ।

কিন্তু শূন্যকে পুঁজি করে চলতে গেলে ক্লান্তি আসে একদিন। সুবীর সেকথা ভাবেনি কখনো। কাউকে কিছু সে দেয়নি নেয়ওনি—ভাল সে বাসেনি কোনদিন।

তারপর ওদের দু'জনের কথা।

সুবীর কাসলো, একটু বসলে মন্দ হ'ত না—

ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন এর মধ্যে ?

হ্যাঁ, কিন্তু এত শীগ্‌গির এর আগে আমার ক্লান্তি কখনো আসে নি।

দু'জনে বসে পড়লো।

জীবনে সে কোনদিন কাউকে কামনা করেনি, কোন কিছু গ্রাহ্য করেনি—আজ কি জানি কেন তপতীকে তার ভালো লাগল। এই প্রথমবার বোধ হয় সুবীর ফেললো অভাবের দীর্ঘনিশ্বাস। যারা সুবীরের মত, তাদের জীবনে অকস্মাৎ এমনি ঝড়ই আসে।

আপনাকে চিনতে পারিনি—কি আশ্চর্য!

আশ্চর্যের কি আছে ? তপতী শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাইলো।

আবার ছেদ। সুবীর ভাবছিলো কেমন করে তপতীকে বলা যায় সমস্ত কথা। বলতে চায় সে অনেক কিছু তপতীকে—নিঃশেষে শেষ করে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে—জানাতে চায় যে তপতীই একমাত্র মেয়ে যাকে সুবীরের ভালো লেগেছে প্রথমবার। কিন্তু বলা যে হয় না কিছুই। মাঝখানে সঙ্কোচের সেতু। এত অল্প সময়ে এ কি হোল সুবীরের।

আপনি একেবারে চুপচাপ কেন ? তপতীর কণ্ঠস্বর।

আপনিও তো গম্ভীর হয়ে আছেন।

আবার চুপচাপ।

আপনার ক্লান্তি দূর হোলো কি? তপতী মৃদু হাসলো।

না।

আবার হাসলো তপতী, ক্লান্তি যাবে বলে মনে হচ্ছে না আপনার।

বোধ হয় না!

কেন বলুন তো ?

মানে, একটু হাসলো সুবীর, এ ক্লান্তিতে তৃপ্তির ভাগটাই বেশী।

বুঝতে পেরেছি, গাম্ভীর্য নামলো তপতীর মুখে।

কি বুঝতে পেরেছেন ? সুবীর তপতীর গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলো না।

আপনার—

বাধা দিয়ে সুবীর বললে, বোঝা কিছু কঠিন নয়; কিন্তু বড় অসময়ে আমাদের আলাপ—

—তার মানে ?

পৃথিবীর কোনখানে শান্তি নেই—চারপাশে আগুন—

(শেষাংশ ৬৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সূর্য ও তার প্রতিবেশী

শ্রীসঞ্জীব রায়

আদি প্রস্তর যুগের মানুষ আর বর্তমান বৈজ্ঞানিক মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে কত বিপ্লব বয়ে গেল। মানুষ আরণ্য সভ্যতার নাগপাশ অতিক্রম করে নূতন করে সভ্যতার সৌধ নির্মাণে মন দিল। যে মানুষের কাছে একদিন আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো, চন্দ্র, সূর্য কেবল ত্রাস এবং বিস্ময়ের বস্তু ছিল, তাদের স্বরূপও একে একে ধরা দিল মানুষেরই আবিষ্কৃত মানমন্দিরের যন্ত্রে। আকাশমায়ার রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য যাঁরা অভিযান আরম্ভ করলেন—তাঁরাই জ্যোতির্বিদ। আমরা খালি চোখে আকাশের বুকে কোটি কোটি নক্ষত্রের চুমকি দেখছি। দিনে সূর্যের রশ্মি এবং রাত্রে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকের সঙ্গে পরিচিত রয়েছি। কিন্তু এদের ছাড়াও নভোমণ্ডলে আরও অনেকে আত্মগোপন করে আছে। তাদের অনেকগুলিকে আজ জ্যোতির্বিদেরা আবিষ্কার করেছেন। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। এমনি নয়টি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। জ্যোতির্বিদগণের আবিষ্কৃত সৌরজগতের পরিবারভুক্ত হয়ে আছে—সূর্য, গ্রহ, গ্রহপুঞ্জ এবং উপগ্রহ। সূর্য একটি বিরাট জ্বলন্ত নক্ষত্র। আকাশের বুকে এমনি অসংখ্য নক্ষত্রের সৃষ্টি কি করে হ'ল এবং সৌরজগতের উৎপত্তির মূলেই বা কি কারণ — এ বিষয়ে একাধিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। এই মতবাদের কোন্ কোনটি এক এক যুগে বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করলে আকাশ রহস্যের তথ্য আমরা জানতে পারবো। ফরাসী দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের সমর্থিত এবং সংশোধিত 'নীহারিকাবাদ' বৈজ্ঞানিক সমাজে বহুদিন জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছিল। এই 'নীহারিকাবাদ' অনুসারে আমরা জানতে পেরেছি, নক্ষত্রের পূর্ব অবস্থাই নীহারিকা। নীহারিকার স্বরূপ কি? বহুস্থান বিস্তৃত উত্তপ্ত এবং তেজসম্পন্ন বায়বীয় পদার্থই বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত 'নীহারিকা'। নীহারিকা কোন না কোন সময়ে শীতল অবস্থা ধারণ করে সঙ্কুচিত হয়ে শেষে নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়। 'নীহারিকাবাদ' অনুসারে গ্রহদিগের উৎপত্তির উৎসও ধরা গেল। পূর্বেই বলা হয়েছে, নীহারিকা উত্তপ্ত এবং উত্তেজিত ঘূর্ণমান বায়ুপিণ্ড। শীতল অবস্থায় আসবার সময় এই বায়ুপিণ্ডের আবর্তন এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে পরিশেষে শীতল অবস্থায় গ্রহ এবং উপগ্রহে পরিণত হয়। এই মতবাদটির বিরুদ্ধ মতবাদও দেখা দিল। নীহারিকার বায়বীয় অবস্থায় আবর্তনের গতিবেগ এমন দ্রুত হয় না, যদ্দ্বারা উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরবর্তীকালের এই গ্রহ এবং উপগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। বিপক্ষ দল নীহারিকার বায়বীয় অবস্থায় এই প্রচণ্ড আবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলে 'নীহারিকাবাদ' অনুসারে সৌরজগতের জন্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলেও মতভেদের অন্ত নেই। এক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা যা প্রমাণ করলেন, পরবর্তীকালের কোন প্রতিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক আবার তা অনায়াসে খণ্ডন করে স্বীয় মতবাদকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করে জনসাধারণের জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। নীহারিকাবাদের সমর্থকেরা নিজেদের যুক্তিকে ত্যাগ করলেন না তাঁরা বললেন নীহারিকার বিভিন্ন অংশের বায়বীয় অবস্থা পৃথকভাবে ঘনীভূত হয়ে



নীহারিকা

নীহারিকার কেন্দ্রস্থলের কোনবিরাট নক্ষত্রের আকর্ষণে প্রতিরুদ্ধ হয়ে সৌরজগতে রূপান্তরিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় নীহারিকাবাদের সমর্থকদের এই যুক্তি দেশের বিদ্বৎসমাজ গ্রহণ করলেন না।

সৌরজগতের সৃষ্টি নিয়ে জ্যোতির্বিদেরা গবেষণায় মগ্ন রইলেন। 'নীহারিকাবাদের' যুক্তিকে অস্বীকার করে পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কেবলমাত্র দু'টি নক্ষত্রের সংঘর্ষেও সৌরজগতের সৃষ্টি সম্ভব। নক্ষত্রের এইরূপ সংঘর্ষও খুব স্বাভাবিক। অনেক বৈজ্ঞানিক আবার প্রচার করলেন, নক্ষত্রের সংঘর্ষ ব্যতিরকেও গ্রহসৃষ্টি অসম্ভব নয়। দু'টি নক্ষত্র অল্প ব্যবধানের মধ্যে উপস্থিত হলে যে শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হবে তা গ্রহরাজ্য সৃষ্টির পক্ষেই যথেষ্ট। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার জেমস জীনসের সৌরজগত সৃষ্টির যে মতবাদ তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মহলে সমাদৃত এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর মতে একটি বিরাট নক্ষত্র কোটি কোটি বৎসরের আগেও ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের সন্নিকটে এসে পড়ে। চাঁদের

আকর্ষণে সমুদ্রের জল যেভাবে স্ফীত হয় ঠিক সেইভাবে এই নক্ষত্রটির প্রবল আকর্ষণে সূর্যের উপরিভাগস্থ উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ স্ফীত হতে আরম্ভ করে এবং নক্ষত্রটি আরও অল্প ব্যবধানের মধ্যে এলে সূর্যের বিরাট স্ফীত উত্তপ্ত বায়বীয় পিণ্ডের অগ্রভাগ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরপর সূর্য এবং সেই নক্ষত্রটির ব্যবধান যতই অল্প হতে থাকে তত প্রচুর পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ মহাশূন্যে সঞ্চিত হতে থাকে। জীনস বলেন, এই নক্ষত্রটি কিন্তু খুব বেশী সময় সূর্যের কাছে থাকেনি। সূর্যকে অতিক্রম করে নিজের রাস্তায় চলে যায়। চলে যাবার সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও কমে যায় ফলে সূর্য থেকে বায়বীয় পদার্থ নির্গমের বেগও ক্রমশ মন্দিভূত হয়ে শেষে একেবারে স্থির হয়ে যায়। এই নক্ষত্রটির প্রথম আকর্ষণে সূর্য থেকে বায়বীয় পদার্থ নির্গমের হার কম থাকে, তার পর নক্ষত্রটি যখন সূর্যের খুব নিকটে আসে তখন বায়বীয় পদার্থ নির্গমের হার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নক্ষত্রটি নিজের পথে চলে গেলে শেষ দিকে ঐ হার একেবারে কমে যায়। এরূপ প্রথম অল্প তারপর বেশী এবং শেষে আবার অল্প পরিমাণে সূর্য থেকে বায়বীয় পিণ্ড নির্গমের ফলে সমস্ত বায়বীয় পিণ্ডটির আকার 'চুরুটের' আকারে পরিণত হয়। তারপর এই বায়বীয় পিণ্ডটির বিভিন্ন অংশ ঘনীভূত হয়ে গ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বায়বীয় পিণ্ডটির আকার চুরুটের মত হওয়ায় দুই মুখের দিকের অংশ ঘনীভূত হয়ে যে গ্রহগুলি সৃষ্টি হ'ল সেগুলি পিণ্ডটির মধ্যবর্তী অংশের গ্রহাদি অপেক্ষা আকারে ছোট। কারণ বায়বীয় পিণ্ডটির মধ্যবর্তী অংশে দুই দিক অপেক্ষা তুলনায় বেশী পদার্থ সঞ্চিত হয়েছিল। জীনসের মতে, অতিকায় নক্ষত্রটি গ্রহসৃষ্টির প্রথম অধ্যায়ে দূরে চলে না যাওয়ায় তার প্রভাব গ্রহগুলির উপর বিদ্যমান ছিল। সেই কারণেই প্রথমে গ্রহগুলির গতিবিধির কোন সহজ নিয়ম থাকেনি। কিন্তু পরবর্তী কালে গ্রহগুলির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এখন গ্রহদের উপগ্রহগুলির সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তাই জীনসের মতবাদ তুলে বলছি। জীনস বলেছেন, যেমন একটি বিরাট নক্ষত্র অন্ধ খেয়ালে সূর্যের অতি সন্নিকটে এসে গ্রহগুলির সৃষ্টি করেছে ঠিক তেমনি সূর্যও গ্রহগুলির সন্নিকটে এসে উপগ্রহগুলির জন্ম দিয়েছে। গ্রহদের মধ্যে সূর্য থেকে বুধ গ্রহের দূরত্ব কম। তারপর শুক্র। অন্যান্য গ্রহ থেকে সূর্যের নিকটে থেকেও এদের কেন যে উপগ্রহ নেই সে সম্বন্ধে জীনস্ বলেছেন, এরা যখন সূর্যের অতি নিকটে এসেছিল তখন এদের বায়বীয় অবস্থা আর ছিলো না। পূর্বেই বলেছি নয়টি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এরা বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন এবং প্লুটো। এদের মধ্যে প্লুটোই সূর্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। গ্রহ এবং উপগ্রহ ছাড়া মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে এ্যাস্টিরয়ডস গ্রহানুপুঞ্জ রয়েছে। জ্যোতির্বিদেরা অনুমান করেন, বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের মধ্যস্থিত কোন ভ্রাম্যমান গ্রহ দুর্ভাগ্যক্রমে বৃহস্পতির অতি নিকটে এসে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গ্রহানুপুঞ্জে পরিণত হয়েছে। সূর্যের এইসব প্রতিবেশী ছাড়াও মাঝে মাঝে আরও কয়েকটি জ্যোতিষ্মান অতিথি আবির্ভাব হয়। তারা ধূমকেতু এবং উল্কা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার স্থান আজকের নয়। আমরা বর্তমান কালে নবপর্যায়ে এর বিকাশ দেখছি। সৌরজগতের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করেছে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই ছয়টি গ্রহের কথা বহু প্রাচীনকালেও পৃথিবীর লোকের অজানা ছিল না। ইউরেনস্ গ্রহটিকে আবিষ্কার করলেন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হার্সেল সাহেব। এর একশত বৎসর পর্যন্ত সৌরজগতের এই ইউরেনসই জ্যোতির্বিদগণের মতে সূর্য থেকে দূরতম গ্রহ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে সি



শনিগ্রহের বলয়

এডামস এবং প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ জে লেভেরিয়ার অনুমিত কক্ষ পথের নিকটেই বৈজ্ঞানিকগণ নেপচুন গ্রহটিকে আবিষ্কার করলেন। বর্তমান সৌরজগতের দূরতম গ্রহ প্লুটোর সন্ধান পাওয়া গেল ১৯৩০ সালে।

এবার উপগ্রহের কথা বলি। গ্রহের আয়তনের উপর উপগ্রহের সংখ্যা অনেকখানি নির্ভর করছে। পৃথিবী এবং নেপচুনের প্রত্যেকের ১টি, মঙ্গলের ২টি, ইউরেনাসের ৪টি, শনি এবং বৃহস্পতির প্রত্যেকের ৯টি উপগ্রহের কথা আমরা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি। বুধ, শুক্র এবং প্লুটো এই তিনটি ক্ষুদ্র আকারের গ্রহদের কোন উপগ্রহ নেই।

সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে শনি গ্রহের অভিনবত্ব প্রথমেই চোখে পড়ে। শনিগ্রহের ৯টি উপগ্রহ; তা ছাড়া এই গ্রহটিকে ঘিরে রয়েছে তিনটি চক্র। শনির এই চক্র আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও ১৬১০ খৃস্টাব্দে। এই চক্রগুলি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত কি তাই বলছি। টমাস রাইট নামে একজন জ্যোতির্বিদ ১৭৫০ খৃস্টাব্দে মত প্রকাশ করেন যে, শনির এই চক্র অসংখ্য ক্ষুদ্র শীলাখণ্ডের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই অনুমান প্রমাণ সাপেক্ষ ছিল। অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরাও শনির বয়স নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। টমাস

রাইটের এই অনুমানকে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল এবং ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে কীলার সত্য বলে প্রমাণ করলেন।

আমরা পূর্বেই জেনেছি, কিভাবে একটি বিরাট নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণে সূর্যের কিছু অংশ ভেঙে গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং সূর্যের সন্নিকটে এসে পড়ে গ্রহের কিছু অংশ উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে। ঠিক এইভাবেই শনির নিকটবর্তী কোন উপগ্রহ তার নিকটে এসে শীলাখণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ে এই বলয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, শনির প্রভাবে তিনটি উপগ্রহকে এই অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। এই শীলাখণ্ডগুলি শনির প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে না পেরে তার প্রভাবান্বিত গণ্ডীর মধ্যেই রয়ে গেছে। জ্যোতির্বিদেরা বলেন, প্রত্যেক গ্রহের নিকটবর্তী একটি কাল্পনিক গণ্ডী রয়েছে। এই গণ্ডী অতিক্রম করলেই সেই উপগ্রহের আর পরিত্রাণ নেই। তবে গণ্ডীর বাইরে উপগ্রহরা স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারে। জ্যোতির্বিদেরা অনুসন্ধানে জেনেছেন, বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটি শনির উপগ্রহ তিনটির মত গ্রহের বিপদজনক গণ্ডীর অতি সন্নিকটে এসে পড়েছে। যদি সত্যিই একদিন ভবিষ্যতে এই উপগ্রহটি ঐ বিপদজনক গণ্ডী অতিক্রম করবার চেষ্টা করে তাহলে অসংখ্য শীলাখণ্ডে ভেঙে পড়ে শনির মত বৃহস্পতিও যে একটি বলয় ধারণ করবে—এ কথা জ্যোতির্বিদেরা আশা করছেন। সাধারণের প্রাথমিক ধারণার জন্য সৌরজগত সম্বন্ধে কিছু পূর্বাভাস দিলাম। বারান্তরে সূর্য, গ্রহ এবং সৌরজগতের পরিচিত অন্যান্য জ্যোতিষ্কের প্রত্যেকের পৃথকভাবে বিশদ আলোচনা করব। সাধারণের আগ্রহের জন্য প্রবন্ধে বিভিন্ন গ্রহের ছবি সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

সাইরেণ সঙ্গিনী

(৬৪১ পৃষ্ঠার পর)

বোমা, সাইরেন, হাহাকার। এমনি দুর্দৈবে আমাদের পরিচয়—বজ্রে আমাদের বাঁশী বাজলো—কি বলেন? সুবীরের ইঙ্গিতটা তপতী বুঝতে পারলো কি?

কি বলছেন আপনি? তপতীর মুখে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত জমা হ'ল।

আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমার গর্ব চুরমার করেছেন আপনি—এতদিন আমার ধারণা ছিল, কোন নারী আমার জীবনে ফুটবে না; কিন্তু আজ আপনার আলাপ আলোচনায় আমার সে ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে—

সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, নিমেষে তপতী উঠে দাঁড়ালো, একটা কথা আছে জানেন? কুকুরকে লাই দিলে—

এ কি বলছেন?

আমাকে অপমান করার কি অধিকার আছে আপনার?

অপমান! সুবীর বিস্মিত। আপনাকে অপমান করবো আমি—আপনি একমাত্র মেয়ে, যাকে আমি—

Shut up. তপতী কয়েক পা পেছিয়ে এল। Street-lunatic, এই নিন—তপতী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা দুআনি ছুড়ে মারলো সুবীরকে। কাছেই ট্রাম পাবেন—বুইকের উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল। বিমূঢ় বিস্মিত সুবীর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাইরেন বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো তপতী সুবীরের কাছে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে অকূল আতঙ্ক। ব্যক্তিত্ব তার নেই—সে যেন বড় অসহায়।

দেখুন—কণ্ঠস্বর কাঁপছে তপতীর।

বলুন—সপ্রতিভ সুবীর।

আমার ভয়ানক ভয় লাগছে—

আমি তার কি করবো? নির্বিকার সুবীর।

আপনি আমায় ছেড়ে যাবেন না এখন—

সুবীর তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসলো সেই হাসি — তার তরঙ্গ ঘোষণা করলো সুবীরের জয়োল্লাস। সেই অদৃশ্য আত্মা অথবা শক্তি ভয়নকভাবে যেন পরাজিত হলো সুবীরের কাছে।

এবারেও কর্তৃপক্ষরা পরীক্ষা করছেন কি না, ঠিক বোঝা গেল না। সাইরেনের সুর তীব্র তীক্ষ্ণ কঠিন কঠোর ভয়াল ভয়ঙ্কর।

আজ-কাল

বাঙলায় জাপানী আক্রমণ

বাঙলা দেশের উপর জাপান আঘাত করেছে। গত শুক্রবার বিকেলে জাপ বিমানবহর চট্টগ্রাম আক্রমণ করে এবং বোমা ফেলে ও মেশিনগানের গুলী চালায়। পরদিন শনিবার সকালেও জাপানী বিমান চট্টগ্রামে হানা দিয়ে বোমাবর্ষণ করে। ঘটনার কোনো বিস্তারিত বিবরণ সরকার দেন নি; শুধু বলেছেন যে, ক্ষতি ও লোক হতাহত অল্প হয়েছে। এর পর রবিবারে আসামের পূর্বাংশে এক ছোট শহরে জাপানী বিমান আক্রমণ হয়। কর্তৃপক্ষ শহরের নাম প্রকাশ করেন নি। সামরিক ও বেসামরিক লোক কিছু হতাহত হয়েছে।

কংগ্রেসের পন্থা

জাপানের এই আক্রমণ-মুখে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে ঠিক কি করবে, তা পরিষ্কার জানতে পারছে না। কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, সেটা প্রধানত সমালোচনামূলক। প্রকৃত জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনে এবং ভারতীয়দের হাতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে অনিচ্ছা দেখাচ্ছেন, প্রস্তাবে তা বিবৃত করা হয়েছে এবং গভর্নমেণ্টের মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে। বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে যে, গ্রাম ও শহরগুলোকে স্বনির্ভর করতে হবে ও যে এলাকায় যুদ্ধ হবে, সেখানে কংগ্রেস এমন কিছু করবে না, যাতে ব্রিটিশ সমর-পরিচালনায় বাধা হয়, কেন না সেটা প্রকারান্তরে শত্রুকেই সাহায্য করা হবে; যেখানে যুদ্ধ হবে না, সেখানে জনসাধারণ আক্রমণকারীর সঙ্গে অভিনব অসহযোগ করবে, কিন্তু জাপানীদের সঙ্গে বেপরোয়া শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ কতখানি কার্যকরী হবে সে সম্বন্ধে কংগ্রেস-নেতাদের মনেও সন্দেহ আছে (জওহরলালের কয়েকটি বক্তৃতায় তা প্রকাশ পায়)। সুতরাং এভাবে জাপানীদের ঠেকাতে জনসাধারণ কতদূর উৎসাহ বোধ করবে বলা শক্ত।

শ্রীরাজাগোপালাচারী আবার উল্টো মতাবলম্বী। তিনি মনে করেন যে, এখনই যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে জাপানীদের প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন যে, অহিংস অসহযোগ অসম্ভব; কারণ, সেই সব অসামরিক লোকই শত্রুর সঙ্গে অহিংস অসহযোগ করতে পারে, যাদের প্রিয়জন রণক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যায়। তাঁর মতে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা মিটমাট করে এখনই প্রদেশে ও কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করা হোক। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময় মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তানের দাবী না ছাড়ে, তা'হলে তার সে দাবী মেনে নেওয়া হবে—এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে লীগের সঙ্গে মিটমাট করা যায়। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সমস্ত সদস্য তাঁর এ প্রস্তাবের বিরোধী হওয়ায় তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে নিজে তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রাজাজীর প্রস্তাবের পাল্টা প্রস্তাব হিসাবে লালা জগৎনারায়ণ লাল এই মর্মে এক প্রস্তাব আনেন যে, কংগ্রেস যদিও হিন্দু-মুসলমান মিলনে আগ্রহান্বিত তবুও পাকিস্থান স্বীকারের ভিত্তিতে সে কখনও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা করবে না।

অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত বড় নেতাই রাজাজীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব ১২০—১৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। জগৎনারায়ণের প্রস্তাব ৯২—১৭ ভোটে গৃহীত হয়।

মাদ্রাজ জেলার কংগ্রেস কমিটিও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গৃহীত প্রস্তাব সমর্থন করেছেন এবং রাজাগোপালের প্রস্তাব বাতিল করেছেন।

গান্ধীজীর পরামর্শ

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিদ্বেষ বাড়ছে দেখে ব্যাকুল হয়ে একজন ইংরেজ গান্ধীজীর কাছে আবেদন করেন যে, তিনি এর একটা বিহিত করুন এবং ভারতবাসী ইংরেজের অতীত সব অন্যায় ভুলে যাক। গান্ধীজী উত্তরে বলেছেন যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ যে আছে এবং ক্রমশ তা যে বাড়ছে, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিজের স্বার্থ রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা—ভারতীয়দের এই ব্যাখ্যা গান্ধীজী সমর্থন করে বলেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান হচ্ছে, ইংরেজ ও ভারতীয়ের বিচ্ছেদ। তিনি ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে সুশৃঙ্খলভাবে অপসৃত হবার পরামর্শ দিয়েছেন।

গৃহরক্ষী দল

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এক সাংবাদিক বৈঠকে গৃহরক্ষী দল (হোম গার্ড) গঠনের এক পরিকল্পনা উপস্থিত করে সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন। গৃহরক্ষী দলগুলি প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় ও গ্রাম্য ইউনিয়নে গঠিত হবে। প্রত্যেক দলের একজন বেসরকারী ক্যাপ্টেন থাকবে। সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতায় এরা শান্তি রক্ষা করবে ও শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবে। এই রক্ষীদলের হাতে আপাতত লাঠি দেওয়া হবে; যাদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে, তাদের এই দলে যোগ দিতে উৎসাহিত করা হবে। লাইসেন্সধারী স্বয়ং অপারগ হলে তার প্রতিনিধি হিসেবে আর কেউ যোগদান করবে। প্রয়োজন হলে লাইসেন্স বাতিল করে বন্দুক ও কার্তুজ গৃহরক্ষীদের দেওয়া হবে। এই রক্ষিদল সুশিক্ষিত হয়ে উঠলে গভর্নমেণ্ট ক্রমে এদের হাতে বেশী সংখ্যায় রাইফেল দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

এই গৃহরক্ষী দল বড়লাটের 'ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট'-এর একটা অঙ্গ। বড়লাট 'ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট'-এর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঘোষণা করার পর প্রত্যেক প্রদেশে একজন সরকারী কর্মচারী প্রাদেশিক ফ্রণ্ট সংগঠনের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। 'ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাজনীতিক মত ও দল নির্বিশেষে আন্তরিক ফ্যাসিস্তবিরোধী মাত্রেই এতে যোগ দিতে পারবেন। এই 'ফ্রণ্ট'-এর কাজ হবে আক্রমণকারী বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের মনে প্রতিরোধের ভাব জাগ্রত করা, মিথ্যা ও কল্পিত গুজবের প্রতিবাদ করা এবং গৃহরক্ষী দল সংগঠনে সাহায্য করা।

গভর্নমেণ্ট বাঙলা দেশের ১১টি এলাকাকে 'অপারিবারিক অঞ্চল' বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এই সব অঞ্চল থেকে গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে সরকারী কর্মচারীরা তাদের পরিবার অন্যত্র সরিয়ে দিচ্ছেন এবং সেজন্যে তাঁদের একটা 'বিচ্ছেদ ভাতা'

দেওয়া হচ্ছে। ঐ অঞ্চলগুলি এই: চট্টগ্রাম জেলা, নোয়াখালি জেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়া ত্রিপুরা জেলা, বাখরগঞ্জ জেলা, খুলনা জেলা, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা বাদে মেদিনীপুর জেলা, ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকা বাদে ২৪ পরগণার সদর মহকুমা, ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও হারোয়া থানা।

প্যাকিস্তান-বিরোধ

গত রবিবার বাঙলার সর্বত্র প্যাকিস্তান-বিরোধী দিবস প্রতিপালিত হয়। কলকাতায় যে সভা হয়, বাঙলার অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার সভাপতিত্ব করেন এবং ডাঃ মুঞ্জে সভার উদ্বোধন করেন। সভায় অখণ্ড ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদের যে কোন পরিকল্পনার প্রতি অনমনীয় বিরোধিতা জ্ঞাপন করা হয়।

ব্রহ্ম যুদ্ধ

ব্রহ্মে জাপবাহিনী শ্যাম সীমান্তবর্তী কারেণি প্রদেশের দিক থেকে অগ্রসর হ'য়ে কোশিভ দখল করে এবং চীনের ইউনান প্রদেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং নানতিং নদী অতিক্রম করে' অগ্রসর হতে থাকে। এদিকে তারা মান্দালয়ও দখল করে' নেয় এবং পশ্চিম ব্রহ্মে অবস্থিত বৃটিশ বাহিনীকে বেড় করে ফেলবার জন্যে ব্যাপক জায়গা নিয়ে ঘুরে অগ্রসর হতে থাকে। ভামো শহরও তাদের দখল করার সংবাদ পাওয়া যায়।

চীনা সৈনাদের সঙ্গে জাপানীদের লড়াইয়ের খবর বিস্তারিতভাবেই পাওয়া যাচ্ছে এবং ব্রহ্ম-ইউনান ফ্রন্টের অবস্থা বেশ বোঝাও যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমে যে চিন্দুইন এলাকায় বৃটিশ সৈন্যের অবস্থান সেখানকার খবর বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না; শুধু জানা যায় যে, চিন্দুইন নদী ধরে' বৃটিশ সৈন্যেরা ভারতবর্ষের দিকে সরে' আসছে। বৃটিশ বাহিনী বেড়া জালে পড়ে' গেছে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য বলে জাপানীরা যে দাবী করেছিল, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তা সমর্থন করেন নি। পক্ষান্তরে চীনারা ইউনান-ব্রহ্ম ফ্রন্টে সফল পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা ইউনানে জাপানী অগ্রবর্তী সৈন্য দলকে ঘেরাও করে' ফেলেছে এবং বহু জাপ সৈন্য নিধন করেছে। একদল চীনা সৈন্য মান্দালয়ের কাছে মেমিও শহর আবার দখল করে' নিয়েছে এবং মান্দালয় শহরের দুই দিকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাউঙ্গিতে যে সব চীনা সৈন্য জাপানী বাহিনীর পিছনে রয়েছে, তারা গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে' দিয়েছে।

জাপানীরা স্থলপথে পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়ে আরাকানে আকিয়াব দখল করেছে। অদূরবর্তী চট্টগ্রামের উপর বোমা বর্ষণ বোধ হয় এই ঘাঁটি থেকেই হয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, জাপানীরা পশ্চিম ব্রহ্মে যে সব তৈলখনি দখল করেছে, সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে যে, দুই বছরের মধ্যে সেগুলো কাজে লাগানো যাবে না।

প্রবাল সাগরে লড়াই

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূবে প্রবাল সাগরে জাপানী নৌবহরের সঙ্গে মিত্রপক্ষের, প্রধানত মার্কিন নৌবহরের এক বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে। মার্কিন ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, এই জলযুদ্ধে ৯খানি জাপানী রণতরী ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে; তন্মধ্যে একখানা বড় ক্রুজার, একখানা হাল্কা ক্রুজার, একখানা বিমানবাহী জাহাজ ও চারখানি ডেস্ট্রয়ার আছে। জাপানীরা পাল্টা দাবী করে বলছে যে, এ যুদ্ধে জাপ নৌবহর চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু মিত্রপক্ষ জাপানীদের দাবী বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন; তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পরে জানানো হবে, যখন সে সংবাদ প্রকাশে জাপানীদের কোনো সুবিধে হবে না। এই জাপ নৌবহরে সৈন্যবাহী জাহাজ ছিল; এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় অথবা অন্য কোথাও অভিযান করবার মতলব তাদের ছিল। কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে আপাতত সে মতলব নিঃসন্দেহে বানচাল হয়ে গেল। জাপানীদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা সামলে নেওয়াও তাদের পক্ষে খুব সহজ নয়।

অস্ট্রেলিয়া ও ফিলিপিন

লায়ে, রাবাউল ও সালামাউয়ার উপর মার্কিন ও অস্ট্রেলিয়ান বিমানবহরের আক্রমণ জোর চলছে। সামরিক ঘাঁটি হিসেবে সালামাউয়া নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মার্কিন গভর্নমেণ্ট এতদিন পর প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিন বিমানবহরই গত ১৮ই এপ্রিল জাপানে বোমা বর্ষণ করে। টোকিও, ইওকোহামা, ওসাকা ও নাগোয়ায় শ্রম-শিল্প এলাকার প্রভূত ক্ষতির কথা তাঁদের ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। জাপানীদের হিসাবে প্রকাশ, তিন চার হাজার লোক ঐ বিমান আক্রমণে মারা যায়।

সমগ্র ফিলিপিন জাপানীদের করতলগত হয়েছে। প্রথমে তারা করেগিডরে সৈন্য নামায়; প্রতিরোধ ব্যর্থ বুঝে জেনারেল ওয়েনরাইট আত্মসমর্পণ করেন। করেগিডরের উপর বোমা ও গোলা বর্ষণ বন্ধ করা হবে না, এই হুমকি দেখিয়ে জাপ সেনাপতি ফিলিপিনের সর্বত্র সংঘর্ষ বিরতি দাবী করেন। জেনারেল ওয়েনরাইট তখন বাধ্য হয়ে সমস্ত মার্কিন ও ফিলিপিনো সৈন্যকে লড়াই থামাবার আদেশ দেন।

মাদাগাস্কার

আফ্রিকার দক্ষিণ-পূবে পাশে অবস্থিত মাদাগাস্কার দ্বীপ জাপানীদের হাতে চলে' যেতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বৃটিশ বাহিনী আগে থেকে মাদাগাস্কার অধিকার করেছে। ভিসি গভর্নমেণ্টের নির্দেশে ফরাসী সৈন্যেরা মাদাগাস্কারে প্রতিরোধ করেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। মার্কিন গভর্নমেণ্ট বৃটেনের এই কাজ সমর্থন করেন; তাঁরা ক্যারিবিয়ান সাগরে ফরাসী দ্বীপগুলো থেকে ভিসির কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করবার জন্যে মার্তিনিকে ফরাসী কমাণ্ডারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। এই সব ব্যাপার নিয়ে ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধবার কথা শোনা যাচ্ছে।

জার্মান বসন্ত অভিযান

রুশিয়ায় নাকি জার্মান বসন্ত-অভিযান আরম্ভ হয়েছে। ২০ লক্ষ জার্মান সৈন্য দক্ষিণ রণাঙ্গনে নীপ্রোপেট্রভস্ক থেকে কার্চ উপদ্বীপ পর্যন্ত আক্রমণ চালাচ্ছে। জার্মানরা একে বসন্ত অভিযান বলে' অভিহিত করে নি; তবে আক্রমণটা যে স্থানীয় আক্রমণ নয়, তা বোঝা যায়। মধ্য রণাঙ্গনেও জার্মান সৈন্য চলাচল করছে।

ক্রাইমিয়াতে জার্মানরা গ্যাস-মাইন ব্যবহার করেছে বলে' সোভিয়েট অভিযোগ করেছে। জার্মানরা মরিয়া হয়ে পড়লে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করবে, এই অনুমান করে' সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে তার পাল্টা ব্যবস্থার প্রশ্ন তোলেন; ফলে মিঃ চার্চিল গত রবিবার এক বক্তৃতায় জার্মানীকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, জার্মানী যদি রুশিয়ায় বিষবাষ্প ছড়ায়, তাহলে বৃটেন তার প্রতিশোধে জার্মানীতে বিষবাষ্প ফেলবে। জার্মানীতে এ বছর বৃটিশ বিমান হানা উত্তরোত্তর বাড়বে, এ কথাও তিনি বলেন।

মে দিবসে স্ট্যালিন এক বাণীতে সোভিয়েট সৈন্য ও নাগরিকদের ১৯৪২ সালের মধ্যে জার্মানীকে পরাজিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হতে বলেন। তিনি জার্মানী ও অধিকৃত দেশে বর্ধমান অন্তর্বিক্ষোভ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও ঐক্য দৃঢ়তর হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

১২-৫-৪২ ওয়াকিবহাল



বোম্বের চিঠি

বোম্বেতে মজুর-মজুরণীদের একটা কৃষ্টি সংঘ আছে। নাম হচ্ছে Indian People's Theatre Association. তাঁরা এ বছরের 'May' dayতে এমন একটা অনুষ্ঠান করেছেন—যা, তাঁদের মতে—ভারতে অভিনব। বোম্বের, কাগজওয়ালারা সগর্বে লিখছেন—ভারতে এ ধরণের প্রচেষ্টায় তাঁরাই প্রথম পথপ্রদর্শক।

অনুষ্ঠানটিতে সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় ছিল—দুটি নাটক। একটি "দরিদ্র চীন" (হিন্দি), অপরটি "দাদা" (মারাঠী)। "দাদা"র লেখক T. K. Sarmalker নিজে একজন মজুর। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বোম্বের ছাত্রছাত্রীগোষ্ঠী হ'তে নির্বাচিত। নাটকটায় Gorki'র 'Mother'-এর প্রভাব বর্তমান।

* * * * * *

বাঙলার মজদুর নেতারা এ ধরণের কোনো প্রচেষ্টা কখনো করেছেন কি না, জানি না। বোম্বের মজদুর আন্দোলন যে শুধু মজদুরদের আর্থিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা নিয়েই ব্যস্ত না, মজুরদের কৃষ্টির উন্নতির দিকেও এদের দৃষ্টি সজাগ, তারই প্রমাণ দেখতে পেলুম—এখানকার Indian People's Theatre Association-এর কাজে।

* * * * * *

আশা আছে—অচিরেই এমন দিন দেখবো, যেদিন মজুর-মজুরণীরাই নিজেদের গোষ্ঠী হতে সৃষ্ট নাটক, নিজেরাই অভিনয় করবে। মারাঠী মজুর-মজুরণীরা আজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে এ' আশা অচিরেই ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা।

* * * * * *

মজুরদের নাটকের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে—পঁচিশ বৎসর আগেকার বোম্বের মজুরদের হালৎ, আর এখনকার মজুরদের হালৎ। তখন শুকরের মত তারা জীবনযাপন করত। Mills-এর কুলীব্যারাকগুলো ছিল—নরককুণ্ড। আর আজ দেখতে পাচ্ছি, সামাজিক মর্যাদাবোধ এদের মধ্যে এসেছে। প্রত্যেক মজুর-মজুরানী লিখতে পড়তে পারে। খবরের কাগজ তারা কেনে। জগতের খবর তারা রাখে। তা নিয়ে চর্চা করে। মদের অভ্যাস অনেক কমে গিয়েছে। পারিবারিক জীবন সুনীতিপূর্ণ হচ্ছে। পুরুষ-নারী পরস্পরকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ভাবতে শিখেছে। উন্নততর মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা এদের মাঝে জেগেছে। ধনীদের কৃপার উপরে নির্ভর না করে নিজেদের কুলীব্যারাকগুলো এরা আজকাল যতদূর সম্ভব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করে। মিলের কুলী, বাসার চাকর-চাকরাণী, জেলে, মেছুনী—সকলের মধ্যে এই নবচেতনাবোধ আজ দেখতে পাচ্ছি। বাঙলা দেশ এ বিষয়ে অনেক পিছনে।

মজদুর আন্দোলন বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছে—মারাঠী মজুর-মজুরানীদের ভিতর। মহারাস্ট্রের অনুন্নত 'হরিজন' আর হরির মুখাপেক্ষী নয়। মানুষ! সর্বাঙ্গীন মানসিক উন্নতি হতে আর কেউ তাদের বঞ্চিত রাখতে পারবে না।

তবে যে সব মজুর কৃষ্টি স্রষ্টাকারী বোম্বের সাহিত্যিক আজ এদের কৃষ্টির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন, তাঁরা proleterian সাহিত্যের অভিনব প্রকাশভঙ্গী ও রস-ধারার গতি নির্দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন। এঁরা শুধু উদ্দেশ্য-বেত্তা। রুশীয় সমাজতান্ত্রিক লেখক-দের মতো রসবেত্তা নন। সে জন্যই মনে হল, রুশীয় নাটকের হুবহু নকল করা সত্ত্বেও কোথায় যেন গোঁজামিল রয়ে গিয়েছে। হয় তো, জাতিগত রসানুভূতির অভাবহেতু এঁরা মজদুরদের সাহিত্য পরিবেষণ করে উঠতে পারছেন না। মনে হয়, একাজে বাঙলার হাল-যুগের সাহিত্যিকরা ইচ্ছা করলে নিপুণতা দেখাতে পারেন। রসবোধ বাঙালীর মজ্জাগত। বর্তমান ভারতে নবযুগ সৃষ্টির ক্ষমতা কাল-বৈশাখীর দেশ বাঙলারই আছে।

—বোম্বাইওয়ালা

পুস্তক পরিচয়

গোধূলি:—উপন্যাস—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী প্রণীত। শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ নিয়োগী কর্তৃক সংহতি পাবলিশিং হাউস, ৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। ১৫৬ পৃষ্ঠা।

উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রুচি এবং কৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শবাদী দরিদ্র তরুণ নায়ককে কেন্দ্র করিয়া লেখক যে সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এবং চরিত্রাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন—তপনকুমার এবং শীলার আদর্শ প্রেমের যে সুমহান রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা উপন্যাসখানিকে রসঘন এবং সুখপাঠ্য করিয়াছে।

দরিদ্র তপনকুমার উচ্চশিক্ষিত। জীবনে তাহার আদর্শের স্বপ্ন আছে। ধনী-কন্যা শীলাকে তপনকুমার ভালবাসিলেও তাহার পিতৃদত্ত অনুগ্রহ দান অর্থে বিলাত যাইয়া নিজেকে উচ্চতর পাশ্চাত্য-শিক্ষিত করিয়া শীলাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার সর্তকে সে আত্ম-মর্যাদা হারাইয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। তপন তাহার জীবনের আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিতে গিয়া জীবনে বহু ত্যাগ এবং ক্ষতিকেই বরণ করিয়া লইল। অনেক দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনার মাঝেও তপনকুমারের দৃঢ়তা, চরিত্রের সতেজতা এতটুকুও অবনমিত হইল না। তাহার জীবনপথে যে দুইজন নায়িকা আসিল—প্রেম, ভালবাসার অর্ঘ লইয়া আদর্শবাদী দারিদ্র্য অপমানহত তপনকুমার তাহাদের গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি—গোধূলির আখ্যানভাগকে তাহাই কারুণ্যে ভরাইয়া তুলিয়াছে। ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি তপনের যে সংস্কারগত অশ্রদ্ধা; তাহার মাঝে যুক্তি নাই; কিন্তু দৃঢ়তা আছে এবং নায়ক চরিত্রের এই দৃঢ়তা বজায় রাখিতে গিয়া যে দ্বন্দ্ব—তাহার বিশ্লেষণ—উপন্যাসখানিতে চমৎকার রূপ পাইয়াছে। পরিশেষে তপনকুমারের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক এবং উপন্যাসখানির বৈশিষ্ট্য ইহাতে কিছুটা ক্ষুন্ন হইয়াছে—এখানে লেখকের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি এবং চমৎকার বর্ণনাভঙ্গীতে উপন্যাস-খানির ধারা কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

ছাপা এবং গেট্‌আপ্‌ সুরুচিসঙ্গত। পুস্তকের কলেবর এবং রচনাসমৃদ্ধির তুলনায় মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলি পাঠকপাঠিকাসমাজে আদৃত হইবে — এ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

বিচিত্রা বার্তা

কি ও কেন

জ্যোৎস্না নীলাভ কেন?

সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে। এই প্রতিফলিত আলোকেই আমরা জ্যোৎস্না বলি। চাঁদের জ্যোৎস্নায় সকল প্রকার রংই রয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রায় সমান ভাবেই এই সমস্ত রংগুলি বিদ্যমান। কিন্তু আমরা নীলাভ রংটিকেই কেন দেখিছি, তার কারণ আমাদের চোখ সকল অবস্থাতে সমানভাবে সমস্ত রংকে নিতে পারে না। আলো মৃদু হ'লে তার অন্য সমস্ত রংকে গ্রহণ না করে আমাদের চোখ সর্বপ্রথম নীল রংকেই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। সূর্যের আলো অনেক পথ ঘুরে চাঁদের উপর প্রতিফলিত হওয়ার জন্য আলোর প্রখরতা কমে গিয়ে মৃদু হয়ে পড়ে। এবং সেই কারণেই আমরা জ্যোৎস্নাকে নীলাভ দেখি।

চাঁদের দেশ

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের দেশের অনেক তথ্য জ্যোতির্বিদেরা আবিষ্কার করেছেন। একটি মজার খবর বলছি। পৃথিবীর যে লোকটি বিরাট বপু নিয়ে চলাফেরা করতে কায়িক পরিশ্রম বোধ করেন সেই লোকটি কিন্তু চাঁদের দেশে যাবার সৌভাগ্য লাভ করলে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন। সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে লোকটি সচ্ছন্দে ময়দানে ছুটে বেড়াচ্ছে। এখানে যে ২০ সের ভারী জিনিস তুলতে পারে চাঁদের দেশে গেলে সে অনায়াসে ২।৩ মণ ওজনের জিনিস তুলে দিবে। এতটুকু কষ্ট হবে না। পোলভল্টে পৃথিবীর রেকর্ড আছে আমেরিকার সেফটোনের। মিঃ সেফটোন ১৪ ফিট ১১ ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন। চাঁদের দেশে গেলে ইনি ২০।২২ তলা উঁচু বাড়ি অনায়াসে লাফিয়ে যেতে পারবেন। পৃথিবীর ওজন চাঁদের দেশের ওজনের ৮২ গুণ বেশী। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় ছয় ভাগের এক ভাগ। এই কারণেই চাঁদের দেশে এই সব অদ্ভুত বীরত্ব দেখান চলে। কিন্তু চাঁদের দেশে কে যাবে? সেখানে জল গাছপালা কিছুই নেই। তাছাড়া জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ বাতাস এবং অম্লজান ও দেশে নেই। মানুষ অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারী জিনিস তুলবার সময় না পেয়ে পটল তুলবে।

ঘাম কেন হয়?

আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দেহের মধ্যে physical ও chemicalএর কাজ চলছে। এই কাজ চালাবার জন্যে উত্তাপের প্রয়োজন। আমাদের দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ কাজের উপযোগী উত্তাপ রয়েছে। এই উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের মস্তিষ্কের একটি অংশ। এই অংশটিকে 'উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' বলা যায়। এই বিশেষ অংশটি আমাদের শরীরের মাংসপেশীগুলিকে পরিচালিত করে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করে চলেছে। কোন কারণে বাইরের উত্তাপ শরীরের রক্তের তাপ বৃদ্ধি করলে আমাদের ত্বকের তলদেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র sweat glandগুলিকে মস্তিষ্কের 'তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' উত্তেজিত করে দেয়। এই sweat glandগুলির কাজ রক্তের জলীয় ভাগকে পৃথক করে ত্বকের তলদেশে জমা করা। ঐ জলীয় অংশ ত্বকের অসংখ্য ছিদ্র পথ দিয়ে বের হ'তে থাকে। এই জলীয় অংশকেই আমরা ঘাম বলি।

পদ্মপাতা গোল কেন?

উদ্ভিদবিদগণ উদ্ভিদ জগতের বহু রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা বলেন, যে পরিবেশের মধ্যে গাছের জন্ম হয়, সেই পরিবেশের প্রভাব বহুল পরিমাণে গাছের দৈহিক আকার আচরণ এবং জীবন ধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পদ্মপাতার গোল আকারের মূলেও এই পারিপার্শ্বিক প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। পুকুরের বদ্ধ জলেতে পদ্ম জন্মায়। পুকুরের জলে স্রোত না থাকায় জলের গতিও কোন বিশেষ দিকে থাকে না। ফলে জলের উপরের পদ্মের পাতার কোন বিশেষ দিকে বৃদ্ধি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। পাতার চারিদিকে জলের সমান প্রভাব থাকায় পদ্মের পাতা ঠিক সমানভাবে বৃদ্ধি পায়। আমরা জানি চারিদিক সমানভাবে কোন জিনিস বিস্তার লাভ করলে শেষে গোলাকার ধারণ করে। এই কারণেই পদ্মপাতাও গোলাকার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে স্রোতহীন জলের উদ্ভিদের পাতা সাধারণত গোলাকার হয়, আর যেসব উদ্ভিদ স্রোতের জলে জন্মায় তাদের পাতার বিস্তার হয় বিশেষ কোন একদিকে অর্থাৎ ঐসব পাতা লম্বাটে আকার নেয়।



কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের সকল ডিভিসনের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম ডিভিসনে সৈনিক দল ব্যতীত সকল দলই যোগদান করিয়াছে। দ্বিতীয় ডিভিসনের খেলায় নূতন নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৬টি দল লইয়া এই বিভাগটি পরিচালিত হইবে। প্রতি দল একটিবার করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। তৃতীয় ডিভিসন হইতে গ্রীয়ার স্পোর্টিং, মড়োয়ারী ক্লাব, রবার্ট হাডসন ও বেনিয়াটোলা ক্লাব এই চারিটি দলকে দ্বিতীয় ডিভিসনে তুলিয়া ১৬টি দল করা হইয়াছে। ইহার ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসনেও দল তোলা ও অতিরিক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে। শ্যামবাজার ক্লাব, রোন্যাল্ডসে হাট, ইণ্টার ন্যাশনাল ক্লাব ও সিটি এ্যাথলেটিক এই চারিটি দলকে চতুর্থ ডিভিসন হইতে তৃতীয় ডিভিসনে খেলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ ডিভিসনে বেলিয়াঘাটা ক্লাব, দিল-খুসা ক্লাব, সাউথ লেক ক্লাব, মিলন সমিতি, আর্মেনিয়ান্স, দীপ্তি সঙ্ঘ, প্রমোদ মেমোরিয়াল,বড়বাজার ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি ৮টি দলকে খেলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসনে দল অদল বদল করায় এই তিনটি বিভাগের খেলা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কয়েকজন ক্লাব পরিচালক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রতিবাদ এই নব ব্যবস্থা রোধ করিতে পারেন নাই।

প্রথম ডিভিসনের বিভিন্ন খেলাই দর্শকগণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই বৎসর তাহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইতিমধ্যে যতগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ক্রীড়ামোদি-গণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। এই দুইটি দল এই পর্যন্ত কোন খেলাতেই পরাজিত হয় নাই। ইহাতে ক্রীড়ামোদিগণ অনেকেই আশা করিতেছেন, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এই দুইটি দলের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে। লীগ প্রতিযোগিতার যুগান্তর সৃষ্টিকারী মহমেডান স্পোর্টিং দল এই বৎসর প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে বিশেষ ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। নিয়মিত খেলোয়াড়গণ সকলেই খেলায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। তথাপিও ফল ভাল হইতেছে না, ইহাতে এই দলের সমর্থন-কারিগণ বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। তবে তাঁহাদের আশা আছে, ঐ সকল খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার শেষ ভাগে ভাল ফল প্রদর্শন করিবেন। এই আশা কতখানি ফলবতী হইবে, তাহা আরও দুই সপ্তাহ পরে বলা সম্ভব হইবে। অনুশীলনের অভাবেই খেলোয়াড়গণের খেলা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ধারণা।

ভবানীপুর ক্লাব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে বলিয়া পূর্বে অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তাহা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড় এই দলে যোগদান করা সত্ত্বেও এই দলের শক্তি বৃদ্ধি পায় নাই। লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

কালীঘাট দল সম্পূর্ণ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই দলের খেলা চ্যাম্পিয়ান দলের ন্যায় না হইলেও অনেক বিশিষ্ট দলকেই যে বেগ দিবে, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এরিয়ান্স ক্লাব দলের খেলায় প্রাণহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য বৎসর এই দল লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় যে খ্যাতি অর্জন করে, এই বৎসর তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। দল পরিচালকগণের এই বিষয় দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল গত কয়েক বৎসর লীগ প্রতিযোগিতায় যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। এই দল লীগ তালিকায় ঊর্দ্ধভাগে স্থানলাভ করিবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ক্যালকাটা, রেঞ্জার্স, ডালহৌসী প্রভৃতি ইউরোপীয় দলের খেলা খুবই নিম্নস্তরের হইতেছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি এই সকল দলের শক্তি হ্রাসের কারণ। কৃতি খেলোয়াড় সংগ্রহ করা ইঁহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কেবল খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিই এই সকল দলের পরিচালকগণকে প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেয় নাই। কাষ্টমস দলের অবস্থাও ভাল নহে। এই দলটি কতকগুলি প্রবীণ খেলোয়াড়কে লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই সকল প্রবীণ খেলোয়াড়গণের অনেকেরই খেলা হইতে অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে। দলের সুনামের জন্য পরিচালকগণের উচিত এই সকল প্রবীণ খেলোয়াড়গণের স্থানে তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে খেলিবার সুযোগ দান করা। উপরোক্ত দলসমূহের তুলনায় পুলিশ দলের অবস্থা অনেক ভাল। এই দল লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান না হইলেও ভাল ফল প্রদর্শন করিবে বলিয়া মনে হয়।

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না যে, কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া থাকে, এই বৎসর সেইরূপ হইবে না। ইহার কারণ যুদ্ধ-পরিস্থিতি, ইহা বলাই বাহুল্য।

রেফারী সমস্যা

কলিকাতার ফুটবল খেলায় রেফারী সমস্যা গত কয়েক বৎসরই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। এই কয়েক বৎসর ধরিয়াই আমরা শুনিতেছি যে, রেফারী এসোসিয়েশন এই সমস্যা দূরীকরণের সকল ব্যবস্থাই করিতেছেন। গত বৎসর মনে

হইয়াছিল, আগামী বৎসর ইহা থাকিবে না। কিন্তু ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইতেছে রেফারী এসোসিয়েশন এইদিকে বিশেষ অগ্রসর হন নাই। ভাল খেলা পরিচালনা করিতে পারেন, এইরূপ রেফারী এই পর্যন্ত একজনও দেখিতে পাওয়া গেল না। পূর্বের ন্যায় খেলা পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত রেফারীদের উপর বিশিষ্ট খেলা সকল পরিচালনার ভার দেওয়া হইতেছে। একেই দেশের বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতি খেলোয়াড়গণকে উপযুক্ত ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন হইতে বিরত করিয়াছে, তাহার উপর রেফারীর ত্রুটি-বিচ্যুতি খেলোয়াড়গণের অধিক নিরুৎসাহের কারণ হইতেছে। ফলে বিভিন্ন খেলা নিম্নস্তরের হইতেছে। দর্শকগণও খেলা দেখিয়া পূর্ণ আনন্দলাভ করিতেছেন না। রেফারী এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

রেফারীগণের যাতায়াতের ভাড়া বাবদ যে টাকা এতদিন বরাদ্দ ছিল, এই বৎসর তাহা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কমান ব্যবস্থা রেফারী এসোসিয়েশনের বিনানুমতিতেই আই এফ এর পরিচালকগণ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। শোনা যাইতেছে, রেফারী এসোসিয়েশন এই বিষয় আলোচনা করিবেন ও তাঁহাদের মতামত প্রদান করিবেন। কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বলা কঠিন। তবে আই এফ এর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলেই আমরা সুখী হইব।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত বৎসর হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত বৎসর এই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বিভাগীয় বা জোন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থায় আর্থিক সুবিধা না হওয়ায় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দ্বারা কার্য শেষ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এই অনুষ্ঠানের ভার বোম্বাই প্রাদেশিক ফুটবল এসোসিয়েশনকে দেওয়া হয়। ফেডারেশনের অনুরোধ বোম্বাই এসোসিয়েশন রক্ষা করিবেন বলিয়া সকলেই ধারণা করেন। কিন্তু সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাইর এসোসিয়েশন এই দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহারা ফেডারেশনকে জানাইয়াছেন যে, এই অনুষ্ঠানে টাকা ঘাটতি পড়িবে। ঐ ঘাটতি টাকা বোম্বাই এসোসিয়েশনের পক্ষে বহন করা সম্ভব নহে। যদি ফেডারেশন ঐ ঘাটতি টাকা দিতে সম্মত হন, তবেই তাঁহারা প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ফেডারেশন এই সংবাদ শ্রবণে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কোন প্রাদেশিক এসোসিয়েশনকে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। বাঙলা প্রদেশ এই দায়িত্ব লইতে পারিতেন, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহা গ্রহণ করা সম্ভব নহে। শোনা যায়, লাহোর এসোসিয়েশন এই ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবেই আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতার বাহিরে সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতার বাহিরে নিরাপদ স্থানে সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা কয়েক স্থানে কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গেল। এত শীঘ্র ইহা কার্যকরী হইবে বলিয়া ধারণা ছিল না। যে সকল সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই ব্যবস্থা বাঙলার ভবিষ্যৎ সাঁতারুদের মঙ্গলের জন্যই আমরা বলিয়াছিলাম। বাঙলার সকল বিশিষ্ট সন্তরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ এই দিকে দৃষ্টি দিলে সন্তরণ মরসুমের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে কোনই অসুবিধা হইবে না।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন

বাঙলার সন্তরণ পরিচালনামণ্ডলী হইতেছে বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ সন্দেহ হইতেছে। সন্দেহ হইবার কারণও বর্তমান। সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইবার পর হইতে এই এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে এই পর্যন্ত কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে সন্তরণ বিভাগটা পরিচালনা করা যাইতে পারে, সে বিষয় আলোচনা করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাও এই এসোসিয়েশনের সভ্যগণ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। যদি উপলব্ধি করিতেন, তবে নিশ্চয়ই আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু এই পর্যন্ত এইরূপ কোন আলোচনা-সভা হয় নাই, ইহা সকলেই জোর করিয়াই বলিতে পারে। এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক দুই জনেই বাঙলার সন্তরণের উন্নতির জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতেন। তাঁহারা হঠাৎ নীরব হওয়ায় সকলেই আশ্চর্য হইয়াছেন। এমন কি, তাঁহাদের বিরোধী দলের লোকেও তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা রটাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—"সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় পদের জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং পদ যখন পাইয়াছেন, তখন বাঙলার সন্তরণের উন্নতি হউক বা না হউক, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই যায় আসে না।" এইরূপ উক্তি আমরা সমর্থন করি না। সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের উচিত এই উক্তির প্রতিবাদ করা, তাঁহাদের কার্যের বাধা সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করা। সন্তরণ মরসুম দুই মাস আরম্ভ হইয়াছে। এই দীর্ঘ দুই মাস নীরব থাকার ফলেই বিরোধী দলের লোকে কটূক্তি করিতে সুবিধা পাইয়াছে ও পাইতেছে। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নীরব থাকা তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

সমর বার্তা

২৯শে এপ্রিল—

মার্কিন জাতির প্রতি বেতার বাণী প্রচার করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুদ্ধ জাহাজসমূহ বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ আটলাণ্টিক, উত্তরমেরু সাগর, ভূমধ্যসাগর এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা, গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নিকট প্রাচ্য মধ্য প্রাচ্য, সুদূর প্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বহু দ্বীপে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন হইয়াছে।

রুশিয়া—"এনালিস্ট" বলেনঃ রুশ রণাঙ্গনে বিশেষ করিয়া মধ্যাংশে বৃহত্তর সংগ্রামের যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। ওয়াশিংটনে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে ১৫ই মে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান আক্রমণের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে। জুলাই মাসে পুরাপুরি আক্রমণ সুরু হইতে না হইতেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রতিশ্রুত রণসম্ভার বহন করিয়া মার্কিন জাহাজগুলি রুশিয়ায় পেঁাছিবে—অনেকেই এরূপ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম—চীনারা লাসিওর দক্ষিণে সমস্ত রাস্তাই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে।

৩০শে এপ্রিল—

ব্রহ্ম—চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মান্দালয় ও লাসিওর মধ্যবর্তী রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সিপো দখলের জন্য জাপানীরা চীনা বাহিনীর পূর্বাংশের পাশ কাটাইয়া উত্তর অভিমুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

গত রাত্রে বৃটিশ বোমারু বিমানবহর প্যারিসের নিকটবর্তী বিমান কারখানা এবং রবার কারখানার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। অস্টেণ্ডের ডক অঞ্চল এবং হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের বিমান ঘাঁটি-সমূহের উপরও বোমা বর্ষিত হয়। অদ্য অপরাহ্নে বৃটিশ বিমানসমূহ উত্তর ফ্রান্সের উপর দ্বিতীয়বার হানা দেয়।

১লা মে—

ব্রহ্ম—এক চীনা ইস্তাহারে লাসিও'র পতন ঘোষণা করা হইয়াছে। চীনা সৈন্যেরা লাসিও ত্যাগ করিয়াছে। ব্রহ্মের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ইরাবতী রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনী সাফল্যের সহিত ইরাবতীর উত্তর তীরে সরিয়া আসিয়াছে। মান্দালয় রণাঙ্গনে এক গুর্খা বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে অনুমান পাঁচশত জাপানী হতাহত হইয়াছে। মার্কিন বিমান পুনরায় রেঙ্গুনের উপর বোমা বর্ষণ করে। ডক অঞ্চলের ক্ষতি হয়।

রুশিয়া—লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গন হইতে এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এপ্রিল মাসে লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে ৫৮ হাজার জার্মান হতাহত হইয়াছে এবং প্রচুর রণসম্ভার রুশদের হস্তগত হইয়াছে। ক্রিমিয়ায় কার্চ উপদ্বীপের উত্তর রণাঙ্গনের এক অংশে একদল সোভিয়েট সৈন্য মূল জার্মান ব্যূহে পেঁাছিয়াছে।

১লা মে দিবস প্রসঙ্গে মঃ স্ট্যালিন বলেন যে, দশমাস পূর্বে ফ্যাসিস্ট জার্মানী ও তাহার সৈন্য বাহিনী যেরূপ শক্তিশালী ছিল, বর্তমানে তাহা অপেক্ষা সুনিশ্চিতভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট রুশিয়া যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ শক্তিশালী ছিল, তদপেক্ষা বর্তমানে অভ্রান্তভাবে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। মঃ স্ট্যালিন লাল ফৌজের প্রতি এক নির্দেশ দেন যে, ১৯৪২ সালেই যাহাতে জার্মান ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের চূড়ান্ত পরাজয় এবং সোভিয়েট ভূমি শত্রু কবলমুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সালজবুর্গে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়।

২রা মে—

ব্রহ্ম—জাপ রেডিও কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের ভূতপূর্ব রাজধানী মান্দালয় তাহাদের হস্তে পতিত হইয়াছে। কোন বৃটিশ কিংবা চীনা সূত্র হইতে এই সংবাদ সমর্থিত হয় নাই। ব্রহ্মের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মান্দালয় রণাঙ্গনে ইরাবতীর উত্তর দিকের ঘাঁটিসমূহ হইতে সমস্ত বৃটিশ সৈন্যদলকে সরাইয়া আনা হইতেছে। এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্যেরা ভারত সীমান্তের দিকে সরিয়া যাইতেছে।

৩রা মে—

ব্রহ্ম—একটি চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনা বাহিনী শুক্রবার (১লা মে) প্রাতঃকালে মান্দালয় ত্যাগ করে। মান্দালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় যুদ্ধ চলিতেছে। মার্কিন স্বেচ্ছাবৈমানিক দল লাসিওর উপর বোমা বর্ষণ করে। তাউঙ্গি এখনও চীনাদের অধিকারে রহিয়াছে। বৃটিশ পক্ষের পোড়ামাটি নীতির ফলে পশ্চিম-মধ্য ব্রহ্মে ইয়েনানচুং তৈল খনি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

৪ঠা মে—

ব্রহ্ম—জাপ বিমান অদ্য আকিয়াবের উপর বোমা বর্ষণ করে এবং বন্দরস্থিত জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালায়। জাপ বাহিনী লাসিওর ৬০ মাইল উত্তরে যাইয়া পেঁাছিয়াছে।

নিউগিনিতে জাপানীরা পুনরায় মারখান উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইতেছে। জাপ বিমানবহর মোরেসবি বন্দরের উপর হানা দেয়।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরের ঘাঁটিসমূহ হইতে ভারতীয় বন্দরগুলির উপর আক্রমণ করার পর প্রতিপক্ষীয় নৌবহর হটিয়া গিয়াছে।

৫ই মে—

ব্রিটিশ সৈন্য মাদাগাস্করের কোরিয়া উপসাগরের কূলে অবতরণ করিয়াছে। তাঁহাদিগকে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সৈন্যগণ কর্তৃক মাদাগাস্কর অধিকৃত হইয়াছে। মাদাগাস্কর পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ; উহা ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণ করে। যদি জাপানীরা ঐ দ্বীপের দিগোসুয়ারেজস্থিত সুরক্ষিত ফরাসী ঘাঁটি অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে মিত্রপক্ষের জাহাজ চলাচল এবং সমরোপকরণ সরবরাহের পথ বিপন্ন হইবে। ইহার প্রতিকারের জন্য এবং প্রতীচ্যে এক্সিস শক্তিবর্গের সহিত জাপানের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিসমূহ বর্তমান ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম—ব্রিটিশ সমর-সমালোচক 'এনালিস্ট' লিখিতেছেনঃ—মান্দালয়ের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম লাইন ধরিয়া ব্রিটিশ ও চীনা সৈন্যেরা পিছু হটিতেছে। একদল চিন্দুইন নদীর উপত্যকা ধরিয়া ভারত সীমান্তের দিকে সরিয়া আসিতেছে; দ্বিতীয় দল মান্দালয়

হইতে রেলপথ ধরিয়া মিচিনাং যাইতেছে এবং তৃতীয় দল লাসিওর রাস্তা ধরিয়া সরিয়া আসিতেছে।

ফিলিপাইন—জাপানীরা প্রবল প্রতিরোধের মুখে মিন্দানাও দ্বীপের আর এক স্থানে অবতরণ করিয়াছে।

জাপ অগ্রগামী বাহিনী ব্রহ্মদেশ হইতে চীনা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চীনে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা ওয়ান্টিং-এর উপকণ্ঠে পেশীছিয়াছে বলিয়া জনৈক চীনা মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন।

৬ই মে—

ফিলিপাইন—করিজিডর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অস্ট্রেলিয়াস্থ মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টারের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লেঃ জেনারেল ওয়েন রাইট করিজিডর ও ম্যানিলা পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথে অবস্থিত অপরাপর দ্বীপদুর্গ জাপানীদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

৭ই মে—

চুংকিং-এর খবরে প্রকাশ, জাপানীরা ওয়ান্টিং নদী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরোড ধরিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে ইউনান প্রদেশের মধ্যে আগাইয়া চলিয়াছে।

মাদাগাস্কার—বৃটিশ বাহিনী দিগোসুয়ারেজ-এর নৌঘাঁটি অধিকার করিয়াছে এবং মাদাগাস্কারের উত্তর অংশে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়াছে। কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ফরাসী নৌ ও স্থলবাহিনীর সেনানায়কগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং দিগোসুয়ারেজ-এর প্রধান শহর অধিকৃত হইয়াছে।

ফিলিপাইন—টোকিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানী স্থলসেনা ও নৌবাহিনী ম্যানিলা উপসাগরে করিজিডর এবং অন্যান্য দ্বীপ দখলের কাজ সমাধা করিয়াছে।

বৃটিশ নৌবিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্মান হাল্কা নৌবহর, ইউবোট ও বিমানসমূহ কিছুদিন যাবৎ উত্তর মেরুসাগরে বৃটিশ কনভয়সমূহের উপর আক্রমণ চালায়। এই নৌযুদ্ধে বৃটিশ ক্রুজার এডিনবরা জলমগ্ন হয় এবং একটি জার্মান ডেস্ট্রয়ার খোয়া যায়।

৮ই মে—

ব্রহ্ম—আকিয়াব জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে জাপানী ও মার্কিন নৌবহরের মধ্যে এক বিরাট নৌ ও বিমান যুদ্ধ চলিতেছে। মার্কিন নৌবহরের ইস্তাহারে বলা হয় যে, ৪ঠা মে মার্কিন ও জাপানী নৌবহরের মধ্যে লড়াইতে জাপানের নয়টি রণতরী ও একটি জোগানদার জাহাজ নিমজ্জিত করে। সুদূর প্রাচ্যে টহলরত মার্কিন সাবমেরিন আরও তিনটি জাপ জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। জাপানীরা দাবী করিয়াছে যে, কোরাল সাগরের যুদ্ধে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ "সারাটোগা" (৩৩ হাজার টন) নিমজ্জিত হইয়াছে।

৯ই মে—

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, গত ৮ই মে অপরাহ্নে চট্টগ্রাম এলাকায় জাপানী বিমানবহর খুব উঁচু হইতে বোমা বর্ষণ করে এবং তাহার পর মেশিনগানের গুলী চালায়। সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং কিছুসংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে অদ্য সকালেও ঐ এলাকায় পুনরায় বিমান আক্রমণ হইয়াছে।

অস্ট্রেলিয়াস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলে বিরাট নৌ ও বিমান যুদ্ধের সামরিক অবসান ঘটিয়াছে। নিউগিনির দক্ষিণ দিকে নৌ যুদ্ধে জাপানীদের ১৮খানা জাহাজ নিমজ্জিত এবং চারিখানি ঘায়েল হইয়াছে।

১০ই মে—

ব্রহ্মের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মেমিও নগরী চীনারা অধিকার করিয়াছে। চীনা বাহিনী জাপ বাহিনীর পশ্চাৎবর্তী মান্দালয়-লাসিও রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে ২৫ মাইল দূরে ইউনান প্রদেশের চেফাং শহর চীনারা পুনরধিকার করিয়াছে। চীনারা টাইংজি পুনরধিকার করিয়াছে। চুংকিংএর সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা দক্ষিণ-পশ্চিম ইউনান প্রদেশে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

মিঃ চার্চিল বেতারযোগে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, জার্মানী রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিলে, ব্রিটেন জার্মানীর উপর বিষাক্ত বাষ্প নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবে।

১১ই মে—

ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৮ই এপ্রিল তারিখে আমেরিকান বোমারু বিমানই টোকিওতে বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। হতাহতের সংখ্যা তিন হইতে চার হাজারের মধ্যে।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য ১০ই মে পূর্ব আসামের মফঃস্বল অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র সহরে বিমান আক্রমণ হয়। সামরিক ও বেসামরিক হতাহতের পরিমাণ খুব বেশী নহে। ক্ষতির পরিমাণও সামান্য।

১২ই মে—

রুশ রণাঙ্গন—নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ২০ লক্ষ জার্মান বাহিনী রুশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ডোনেৎস্ রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। জার্মানরা ২৪টি সাঁজোয়া ডিভিসন, এক হাজার হইতে দুই হাজার ফার্স্ট লাইন বিমান এবং প্রচুর পদাতিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী উত্তরে নীপ্রোপেট্রোভস্ক হইতে দক্ষিণে কার্চ উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ২৫০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে নিয়োজিত করিয়াছে।

এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে ইউনান রণাঙ্গনে অতিরিক্ত সেনা ও সমরোপকরণ সাহায্য আসিয়া পড়িবার পর জাপানীরা পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। চীনা সৈন্যদের আক্রমণের ফলে জাপানীরা ভীষণভাবে হতাহত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে এপ্রিল—

এলাহাবাদে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন (উহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে); উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটিও নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে গৃহীত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর মেয়র এবং মুসলিম লীগের প্রার্থী হাজী আদম ওসমান ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে, বাঙলা সরকার এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের জন্য একটি বঙ্গীয় গৃহরক্ষী দল (বেঙ্গল হোম গার্ড) গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঘোষণা করেন যে, মণিপুর রোড হইয়া ব্রহ্মদেশে একটি মেডিকেল মিশন পাঠাইবার জন্য কংগ্রেস যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

৩০শে এপ্রিল—

এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। বৈদেশিক ভারতীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত সত্যমূর্তি মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী সংক্রান্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্তের সমালোচনা করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

১লা মে—

এলাহাবাদে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির তৃতীয় দিনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দেশবাসীকে আক্রমণকারী শক্তির সহিত পূর্ণ অহিংস অসহযোগিতা চালাইতে ও আক্রমণকারীকে কোনও প্রকার সাহায্য না করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ নিজের শক্তি দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অর্জন করিবে এবং নিজের শক্তির দ্বারাই উহা রক্ষা করিবে। কোনও বৈদেশিক জাতির হস্তক্ষেপের অথবা আক্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন হইতে পারে, কংগ্রেস এই ধারণার প্রতিবাদ করেন। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

বাঙলা সরকার রাজনৈতিক সিকিউরিটি বন্দীদের বিষয় পর্যালোচনার জন্য বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার শরৎকুমার ঘোষ এবং অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস এম মাসিকে লইয়া একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করিয়াছেন।

অদ্য রাত্রি ৭-৫৫ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে সিমুরালি স্টেশনের নিকট দণ্ডায়মান ডাউন সুরমা মেলের (চট্টগ্রাম মেল) সহিত ডাউন রাণাঘাট প্যাসেঞ্জারের এক সংঘর্ষ হয়। ফলে মেলের একখানি বগি লগেজভ্যান সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ হইয়া যায় এবং আরও ২।৩খানি ভ্যান উল্টাইয়া ট্রেনের গার্ড ও ফায়ারম্যান এবং ১৬ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় গতকল্য ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের দুইজন সদস্যসহ পাঞ্জাবের আটজন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্টকে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

২রা মে—

এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হয়। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবী সমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহার পক্ষে মাত্র ১৫টি ভোট এবং বিপক্ষে ১২০ ভোট প্রদত্ত হওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। অপর পক্ষে শ্রীযুত জগৎনারায়ণলালের পাকিস্থান বিরোধী পাল্টা প্রস্তাবটি ৯২—১৭ ভোটে গৃহীত হয়।

৩রা মে—

কলিকাতার পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ "আনন্দবাজার পত্রিকার"র সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি খানাতল্লাস করে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুত ভট্টাচার্যকে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পুলিশের কেন্দ্রীয় অফিসে হাজির করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৪ঠা মে—

স্যার এণ্ডরু ক্লো আসামের গভর্নররূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

কোচিন রাজ্যের এর্নাকুলাম ও মাটানচেরীর পুলিশ কনেস্টবলেরা ধর্মঘট করিয়াছে।

ভোলা মহকুমার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে ভারতরক্ষা আইনানুযায়ী ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৫ই মে—

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে গত ২রা মে হইতে এই ধর্মঘট সুরু হইয়াছিল।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য স্যার হেনরী গিড্নী পরলোকগমন করিয়াছেন।

কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন আশ্রয়প্রার্থীদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থার জন্য আসাম যাত্রা করিয়াছেন।

৬ই মে—

বাঙলা গভর্নমেণ্ট চট্টগ্রাম জিলাকে "অপারিবারিক অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীর এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে এ পর্যন্ত যাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা তিন লক্ষের কাছাকাছি হইবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ হ্যামিল্টন গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায় দিয়াছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে—একটি লোককে হত্যা

ও কয়েকজনকে আঘাত করার অভিযোগ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—তিনজন লোককে হত্যা ও কয়েকজন লোককে আঘাত করার অভিযোগ। প্রথম ক্ষেত্রে—চারিজন আসামীই দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা (মৃত্যু ঘটান) অনুসারে পাঁচ বৎসর করিয়া এবং ৩২৩ ধারা (সামান্য আঘাত) অনুসারে আরও এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—তিনজন আসামী ৩০৪ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৩২৩ ধারা অনুসারে আরও এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং একজন আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বাঙলা সরকার জরুরী প্রেস আইন অনুযায়ী দৈনিক পত্রিকা "আজাদের" মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা এবং মোহাম্মদী প্রেসের (এই প্রেস হইতে আজাদ মুদ্রিত হয়) রক্ষকের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা একুনে হাজার টাকা জামানত দাবী করিয়াছেন।

৭ই মে—

কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রার বিচারপতি মিঃ সেন মার্কুইস্ স্ট্রীটে গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রিতে অভিনেত্রী মিস ডোরা লেয়ার্ডের মৃত্যু সম্পর্কে ল্যান্স সার্জেণ্ট লিওনার্ড জনসনের প্রতি (বয়স ২৩ বৎসর) অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

৮ই মে—

বাঙলা সরকার আরও ১০টি অঞ্চলকে 'অপারিবারিক অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সমস্ত অঞ্চলের সরকারী কর্মচারিগণ গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে তাঁহাদের পরিবারবর্গ অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই ১০টি অঞ্চলের সরকারী কর্মচারিগণ এখন হইতে তাঁহাদের মাসিক বেতনের শতকরা ১০ হইতে ১২ ভাগ পর্যন্ত টাকা "বিচ্ছেদ ভাতা" হিসাবে পাইবেন। 'অপারিবারিক অঞ্চল' হইতে সরকারী কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র প্রেরণের জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইবে, তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে এই "বিচ্ছেদ ভাতা" দেওয়া হইতেছে। নিম্নলিখিত এলাকাগুলি 'অপারিবারিক এলাকা' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেঃ—নোয়াখালি জেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা ছাড়া ত্রিপুরা জেলা, বাখরগঞ্জ জেলা, খুলনা জেলা, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা বাদে মেদিনীপুর জেলা, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকা বাদে ২৪ পরগণা জেলার সদর মহকুমা, ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও হারোয়া থানা।

ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত যে সমস্ত মামলা দায়রায় বিচারাধীন ছিল, দায়রা জজ মিঃ জে দে তৎসমুদয় প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বাঙলা গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী গতকল্য পাবলিক প্রসিকিউটার মামলাসমূহ প্রত্যাহারের আবেদন পেশ করিয়াছিলেন। জজ ঐ সমস্ত মামলার সমস্ত আসামীদের ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

৯ই মে—

কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করা পর্যন্ত ১৯৪২ সালের ১৫ই মে হইতে বাঙলার সর্বত্র সকল সরকারী অফিসে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুসরণ করা হইবে।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় বঙ্গীয় সরকারের "গৃহরক্ষী দল" গঠন পরিকল্পনায় হিন্দু মহাসভা কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০ই মে—

পাকিস্থানবিরোধী দিবস উদ্‌যাপনকল্পে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে হিন্দু নাগরিকবৃন্দের এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বাঙলা সরকারের অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাদ্রাজে মিঃ এস সত্যমূর্তির সভাপতিত্বে মাদ্রাজ জেলা কংগ্রেস কমিটির এক সভায় এলাহাবাদে গৃহীত নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে সমর্থন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস দলের গৃহীত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সমর্থন করা হয়।

১১ই মে—

গত ২৮শে ডিসেম্বর "শরৎ দিবস" উপলক্ষে হাজরা পার্কে এক জনসভায় আপত্তিজনক বক্তৃতা করার অভিযোগে শ্রীযুত অনিলচন্দ্র রায়কে আলীপুরের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস কে দাশগুপ্ত ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছেন।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শেঠ শীতলদাস ফেরুমল গত রাত্রে তাঁহার পল্লীগ্রামে মাঠের ভিতর হুরগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। শেঠ শীতলদাসের বন্দুকের গুলীতে আততায়ীদের মধ্যে দুইজন নিহত হইয়াছে।

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এই মর্মে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, বাঙলার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্ট্রোলারের অথবা তাঁহার লিখিত আদেশানুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্মচারীর স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র ভিন্ন সালকিয়াস্থ নুনগোলা হইতে কাহাকেও লবণ বিক্রয় করা হইবে না।

১২ই মে—

যুক্তপ্রদেশের প্রাক্তন রাজস্বসচিব মিঃ রফী আমেদ কিদোয়াইকে ভারতরক্ষা বিধানানুসারে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর এক্সপ্রেসযোগে বেরিলী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আসানসোলের ২০ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে ঝড়ের সময় একখানি নবনির্মিত পাকা চালার ছাদ ধসিয়া পড়ায় ১৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪০ জন আহত হইয়াছে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 23rd May, 1942 [২৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পল্লীঅঞ্চলে দাঙ্গার কারণ—

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বচারপতি মিঃ ম্যাক নেয়ার এবং দায়রা জজ মিঃ ম্যাক সার্পকে ইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সম্প্রতি াঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকার দাঙ্গায় কি কি টিয়াছিল, কমিটির রিপোর্টের সে অংশের আমরা আলোচনা রিতে চাই না; কারণ অতীতের সে কথা আলোচনা করিয়া াভ নাই; কিন্তু দাঙ্গা কেন ঘটিয়াছিল, ইহা জানা বিশেষভাবেই য়োজন, কারণ ভবিষ্যতে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের ন্য সে কারণগুলি জানা দরকার। পল্লীঅঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা স্প্রসারণের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কমিটি বলেন— াঙ্গা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা গুজব প্রচারের জন্য ঢাকা ইতে লোক পাঠানো হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। ২৩শে র্চ 'আজাদ' পত্রিকায় ঢাকা শহরে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের ত্যাচার সংক্রান্ত মিথ্যা গুজব প্রচারিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে ান সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, কোরাণ ও সজিদ অপবিত্র করার এবং ঢাকা শহরে মুসলমানদের উপর ত্যাচার করার মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করাই পল্লী-ঞ্চলে দাঙ্গা বাধার প্রধান কারণ। মার্চ মাসের শেষভাগে েকগুলি বাহিরের লোক ঢাকা জেলার পল্লীঅঞ্চল পরিদর্শন রেন। ইঁহারা যে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কাহিনী চার করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ূর্বেই মন্তব্য করিয়াছি যে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে, যাহা ই দাঙ্গার জন্য দায়ী। এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, ঐ তিষ্ঠানের গঠনপ্রণালী যাহাই হউক না কেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানই ুসলমানদের উপর পীড়নের মিথ্যা গুজব প্রচার করিয়া এবং ুসলমান নেতারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিন্দুদিগকে পীড়ন রাও মঞ্জুর করিয়াছেন, এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়া স্থানীয় ুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল।"

কমিটির রিপোর্টের অনেক বিষয়ই আমরা সমর্থন করিতে ারি না; তবে দাঙ্গার মূল কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা যে কথা লয়াছেন, তাহা আমরাও সমর্থন করি। জনসাধারণ এজন্য শেষ দোষী নয়। কতকগুলি মতলববাজ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ রিবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার এই সুযোগ গ্রহণ করে। কমিটি লন,—মুসলিম গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মুসলমান রক্ষা হওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ফলে মুসলমান জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কোন অনিষ্টকর বেআইনী কাজ করিলেও মুসলমানেরা দণ্ডিত হইবে না। ঢাকা জেলায় অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির জনসাধারণের মনে এমন ধারণা জন্মে যে, গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের যে সমস্ত স্বধর্মী আছেন, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় যে সব অপরাধমূলক কাজ করা হইবে, তাঁহারা সেই সব অপরাধজনিত ফৌজদারী মামলার দায় হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবেন। এই সব কারণই সমষ্টি-গতভাবে দাঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছে।' কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের উপসংহারভাগে বলিয়াছেন,—'অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বসম্পন্ন রাজনীতিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং নেতৃবর্গের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। গভর্নমেণ্ট অগ্রণী না হইলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই।' বর্তমানে বাঙলা গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন, বাঙলা দেশের পক্ষে ইহা ভরসার কথা।

সংবাদের অস্পষ্টতা—

জেনারেল আলেকজেণ্ডারের বাহিনী ব্রহ্মদেশে খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করিতেছে বলিয়া আমরা শুনিতেছি। এটলী সাহেব সেদিন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মদেশে জেনারেল আলেকজেণ্ডার তাঁহার বাহিনী লইয়া চীনাদের সহযোগিতায় শৌর্যসহকারে সংগ্রাম করিতেছেন। অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে কৌশলপূর্ণভাবে এই লড়াই চালান হইতেছে। প্রধানত শত্রুর অগ্রগতিকে বিলম্বিত করাই ঐ সংগ্রামের লক্ষ্য; ঐ অবসরে আমরা বিমানপথে, নৌপথে এবং স্থলপথে আমাদের শক্তিকে সুসংহত করিতেছি।' দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মদেশের এই লড়াইয়ের সম্বন্ধে আমরা মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করিবার মত যথেষ্ট খবর পাইতেছি না, ইহার ফলে জল্পনাকল্পনাই শুধু বাড়িতেছে এবং কর্তৃপক্ষ যে জিনিসটা বন্ধ করিতে চাহিতেছেন, নানা ধরণের সেই শ্রেণীর গুজবই সৃষ্টি হইতেছে। শিলংয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অস্পষ্ট সংবাদের অনিষ্টকারিতা নানাদিক হইতে আছে। "পূর্ব আসামের একটি শহরে বোমা বৃষ্টি

হইয়াছে," এই ধরণের খবর দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই বরং ভাল মনে হয়। পূর্ব আসাম বলিতে একটা ব্যাপক অঞ্চল বুঝায়। আসামের পূর্ব অঞ্চলে যাঁহাদের আত্মীয়স্বজন আছেন, তাঁহারা এই ধরণের খবরে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক। তৎপরিবর্তে শহরের নাম স্পষ্টভাবে থাকিলে অনেকের উদ্বেগ দূর হইতে পারে। বিশাখাপত্তন এবং কোকনদ এবং চট্টগ্রামের বোমা বর্ষণের সম্বন্ধে সংবাদে এই ধরণের কোন অস্পষ্টতা ছিল না। সামরিক প্রয়োজনে অনেক কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু অনাবশ্যক সংবাদে এই ধরণের অস্পষ্টতা সৃষ্টি করা আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি না।

বাঙলা দেশের আশঙ্কা—

চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের পর জাপানীরা পূর্ব আসামের দুইটি স্থানেও বোমা ফেলিয়াছে। তাহারা কি বাঙলা দেশ আক্রমণ করিবে! এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, নৌশক্তি এবং বিমান বল এই দুই ক্ষেত্রে প্রবল না থাকিলে তাহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। কোরাল দ্বীপের লড়াইতে জাপানীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী সেদিন যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাতে বুঝা যায়, এই লড়াইতে জাপানীদের নৌবল এখনও একেবারে ধ্বংস হয় নাই। তাহারা পুনরায় নিজেদের নৌশক্তিকে সংহত করিয়া নূতন আক্রমণে উদ্যোগী হইতে পারে এবং সেই শক্তিকে তাহারা ভারত কি অস্ট্রেলিয়ার অভিমুখে, কোন্ দিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহা বুঝা যাইতেছে না।' সেদিন পার্লামেণ্টে মিঃ এট্‌লীও সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'জাপানীরা চীনের উপরই আক্রমণ চালাইতে থাকিবে, না তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, এখনও সুস্পষ্ট বুঝিবার উপায় নাই। ভারত মহাসাগরে আমরা আমাদের ঘাঁটি দৃঢ় করিতেছি, কিন্তু জাপানীরা অন্যদিকে—অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড আক্রমণ করিতে পারে।' বর্তমানের এই অবস্থা সংশয়মূলক, এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকাই আমাদের কর্তব্য। আমরা দেখিলাম, চট্টগ্রামের তরুণগণ অস্ত্রধারণের অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকেই বলিতেছেন; কিন্তু গরিলা যুদ্ধেও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজন সমরনীতি পরিচালনায় চাতুর্যের এবং শত্রুকে আক্রমণ করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্পশীলতার। কর্তৃপক্ষ যদি দেশের লোককে অস্ত্রধারণের অধিকার প্রদান করেন এবং শত্রুপক্ষকে প্রতিপদে বাধাদানের মত সঙ্কল্পশক্তির পরিপোষক প্রতিবেশ-প্রভাব দেশে সৃষ্টি করিতে সাহায্য করেন, তবেই ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু এ পর্যন্ত কেবল কথাই হইতেছে, এদিক দিয়া কাজ কিছুই হইতেছে না।

দায়িত্ব কাহার?—

টমসন্ সাহেব ভারতবাসীদের সুপরিচিত ব্যক্তি। ভারতের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি লইয়া ইনি আলোচনা করিয়া কিছু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারও ইনি আলোচনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতের 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' পত্রে ভারতের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, ক্রীপস্ সাহেব যে প্রস্তাব লইয়া ভারতে গিয়াছিলেন, সে প্রস্তাব বহুদিনের পুরানো হইয়া গিয়াছে। ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়া থাকে, সেগুলির কোন মূল্যই নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উপযোগী ব্যবস্থা মানিয়া লয়েন এবং ভারতে অবিলম্বে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতের জাতীয় দলের নেতারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমরোদ্যমে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখনও তাঁহাদের এই সব বন্ধুর পরামর্শ মানিয়া লইবার মত মতিগতি দেখাইতেছেন না। লণ্ডনে ফিরিবার পর ক্রীপস্ সাহেবের মনোভাব চার্চিল সাহেবের প্রকৃত অন্তরঙ্গেরই উপযুক্ত হইয়া এবং চার্চিলের ভাবেই প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন ব্রিস্টল শহরে স্যার স্ট্যাফোর্ড যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ভারতের কথা তিনি তুলিয়াছিলেন; কিন্তু নিজেদের খুঁটি ছাড়িয়া একচুলও আগাইয়া যান নাই। ক্রীপস্ সাহেব নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করা হইবে। কিন্তু আপাতত ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রদান করিবার প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি যে কথা ভারতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই শেষ-কথা। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতের প্রশ্নের চেয়ে বর্তমানের প্রশ্নই বড়। কারণ যুদ্ধোদ্যমে ভারতবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতাপূর্ণ উদ্যম তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে। স্বাধীন জাতিই অপরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সত্যকার উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লাভ করিতে পারে, কৃত্রিমভাবে সে উদ্যম গড়িয়া তোলা যায় না।

আমেরিকায় প্রচার কার্য—

চার্চিল গভর্নমেণ্ট স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতবর্ষে যখন প্রেরণ করেন, তখন ভারতীয় সমস্যা মীমাংসার চাইতেও ভারতীয় সমস্যা মীমাংসায় ব্রিটিশের আন্তরিকতা যাহাতে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট প্রমাণিত হয়, তাহারই জন্য তাঁহাদের আগ্রহ ছিল অধিক। তাই, যখন ক্রীপস্ দৌত্যের ব্যর্থতা দেখা দিল তখন বিলাতী রাজনৈতিক মহল ব্যর্থতার জন্য তত দুঃখ করেন নাই, যত খুসী হইয়াছিলেন এই কারণে যে, ভারতীয় সমস্যা মীমাংসায় ব্রিটিশের যে আন্তরিকতা আছে, তাহা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহা পারিয়াছেন বলিয়াই চার্চিল-আমেরি সবাই খুসী, দৌত্য সার্থক হইয়াছে! কিন্তু তাহাতেও সমস্যা মিটে না। কেন দৌত্য ব্যর্থ হইল, সে সম্পর্কে স্যার স্ট্যাফোর্ড যেমন স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি কংগ্রেস নেতৃবর্গও সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত একটা আপোষ করা যে সঙ্গত ছিল, সে সম্পর্কে আমেরিকার সংবাদপত্রেও আলোচনা হয়। এদিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি কর্ণেল লুই

জন্সন্ ক্রীপস্ দৌত্যের সময়ই কেবল উপস্থিত ছিলেন না, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতির সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনাও করিয়াছেন। সুতরাং দৌত্যের ব্যর্থতা সম্পর্কে স্যার স্ট্যাফোর্ড যাহা বলিয়াছেন, কর্ণেল জন্সন্ 'তাহার সমর্থন' না করিয়া স্বতন্ত্র কথাও বলিতে পারেন। যদি তেমনই কিছু বলেন, তাহা হইলে অত চেষ্টার পর যে "ব্রিটিশ আন্তরিকতা" সপ্রমাণ করা গিয়াছিল, তাহাই ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাই 'সাবধানতার মার নাই' হিসাবেই স্যার স্ট্যাফোর্ডের সহকারী মিঃ গ্র্যাহাম স্প্রাইকে পূর্বাহ্ণেই মিঃ রুজভেল্টের নিকট পাঠানো হইয়াছে। কর্ণেল লুই জন্সনও আমেরিকায় যাইতেছেন বটে; তবে মিঃ স্প্রাই প্রেসিডেন্টকে এই সম্পর্কে 'খাঁটি খবর' (first hand account) দিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য মিঃ রুজভেল্ট বেশী মাথা ঘামাইবেন, ইহা আমরা আশা করি না; তবে তাঁহাকে সমঝাইবার জন্য ব্রিটিশের প্রচেষ্টা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিতেছি।

আপোষের বাতিক—

কিছুদিন ধরিয়া কংগ্রেসের কোন কোন নেতার মধ্যে যে আপোষ করিবার প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, দেখা যাইতেছে রাজাগোপালকে তাহা দস্তুরমত পাইয়া বসিয়াছে। এই আপোষ-প্রবৃত্তি সুলক্ষণ নহে। পরাধীন দেশের স্বাধীনতাকামীদের এই ধরণের আপোষ করিয়া চলিবার মধ্যপন্থী প্রয়াস রাজনীতিক্ষেত্রে যে মূল্যহীন, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্য দিয়া আমরা তাহা দেখিয়াছি। জাতীয়তার আদর্শ সকলে মানে না, লীগপন্থী মুসলমানরা বলে—ভারতে এক নেশন নাই; ভাবিয়া বিরোধ অনাবশ্যক, কর আপোষ! স্বাধীনতার আদর্শ বড় উঁচু, সবাই মানিয়া লইবে না, ইংরেজ ত মানিবেই না, কর আপোষ। কিন্তু ইহা কখনও কোন দেশে সত্যের প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় নাই। কংগ্রেসের যদি সত্যই কোন আদর্শ থাকে, তাহার স্বাধীনতা ও জাতীয়তায় যদি আস্থা থাকে, তবে আপোষ চেষ্টা বিড়ম্বনা। বুদ্ধিমান হিসেবী লোক বলিবে, আপোষ না কর, বাধা-বিপত্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। তাহা পাইবে স্বীকার করি, কিন্তু সত্যের পথ দুর্গম, ইহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। এই পথে রফাহীন বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি লইয়াই যাত্রা করিতে হয়; আদর্শনিষ্ঠ যাত্রীর ত্যাগ দুঃখের মধ্য দিয়াই একদিন আদর্শ জয়ী হয়। কংগ্রেসের এতকাল এই বিশ্বাসই ছিল। রাজাজী কংগ্রেসকে আদর্শনিষ্ঠার পথ হইতে সহজ আপোষের পথেই টানিয়া নামাইতে চাহিতেছেন, তাঁহার এই প্রবৃত্তির স্বরূপ সম্পর্কে কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান কর্মিগণের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। বুদ্ধ-চৈতন্য-মহম্মদ-যীশুই শুধু নহেন, ফরাসী বিপ্লব হইতে আজিকার সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্র, দুই নৌকায় পা রাখিয়া কেহই শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারেন নাই। রাজাজীও অখণ্ড জাতীয়তা ও পাকিস্থান, এই দুই নৌকায় পা রাখিবার ভাঁওতায় শ্রেয়লাভে সমর্থ হইবেন না।

মহাত্মাজীর নূতন কর্মপন্থা—

বোম্বাইয়ের সাংবাদিকদের নিকট মহাত্মাজী ভারতের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট এবং তেজস্বিতাপূর্ণ। সোজা সত্য, তাঁহার এই উক্তির কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রীপস্ সাহেবের দৌত্যের ব্যর্থতার উপর ভারতের প্রতি বৃটেনের উদারতার সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহাত্মাজী মোটামুটিভাবে এই কথাই সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ভারতের প্রধান সমস্যা; কিন্তু ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যে পর্যন্ত ভারতবর্ষ তৃতীয় পক্ষের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত না হইতেছে, সে পর্যন্ত এই সমস্যার তিনি সমাধান হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দোহাই দিয়া শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়াছেন, মহাত্মাজী তাহার সমর্থন করেন না। মহাত্মাজীর মনের গতি রাজাজীর বিপরীত দিকেই বরং মোড় ঘুরিয়াছে। মহাত্মাজীর পূর্ববর্তী উক্তিকে যুক্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া রাজাজী পাকিস্থানী প্রস্তাবের স্বপক্ষে সুবিধা করিবার ফিকির খুঁজিতেছিলেন; অতঃপর তাহা আর চলিবে না। ভারত আজ রাজনীতিক একটা সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছে। শুনা যাইতেছে, মহাত্মাজী সত্বরই দেশের নিকট একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতাদের সঙ্গে তাঁহার আলোচনাও চলিতেছে। মহাত্মাজীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কিরূপ আকার পরিগ্রহ করে, সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট রহিয়াছে।

ঐক্যের উপায়—

মহাত্মাজীকে আজ বেদনার সঙ্গে বলিতে হইতেছে, সর্বাগ্রে স্বাধীনতাই আবশ্যক, যতদিন তৃতীয়পক্ষের প্রভাব ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বর্তমান, ততদিন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কোন আশা নাই। পণ্ডিত রাজাগোপাল আচারী মনে করেন, কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবী মানিলেই সমস্যা মিটিবে। তিনি একথা ভাবেন না, লীগের অবাঞ্ছিত দাবী কংগ্রেস মানিলেও (যদিও সে সম্ভাবনা নাই) ভারতবর্ষ মানিয়া লইবে না। রাজাজীর ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে কোন উপায়ে একটা ঐক্যের গোঁজামিল দিয়া ইংরেজকে দাবী পূরণের অনুরোধ করিলেই ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা দিবে, আর কোন অজুহাত তুলিতে পারিবে না, ইহা সত্য নহে। যে জাতীয় ঐক্যের দুর্জয় সংকল্প ও কর্মনিষ্ঠায় স্বাধীনতা অর্জিত হয়, রাজাজীর এই আদর্শহীন প্রচেষ্টায় তাহা কখনও দেখা দিবে না। ঐক্য বলিতে আমরা বুঝি একৈক লক্ষ্য, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঐক্য। বিপরীত মুখীন লক্ষ্য লইয়া বাঞ্ছিত ঐক্য কখনও সম্ভব নহে। কংগ্রেসের যাহা আদর্শ, লীগের আদর্শ তাহা নহে; একথা রাজাজী জানেন। সুতরাং স্বাধীনতার এক লক্ষ্যেই যদি কংগ্রেস ও লীগ মিলিতে না পারে, কেবলমাত্র বিলাতী রাজনীতিকদের দেখাইবার জন্য রাজাজীর এই যে তথাকথিত মিলনের প্রয়াস, তাহা কখনও শক্তিলাভে সমর্থ হইবে না। কংগ্রেসের যাত্রাপথে অকারণ দুর্বলতা ও সংশয় দেখা দিবে।

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৫) স্বদেশী আন্দোলন (শেষার্ধ)

১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) রাখীবন্ধন উৎসবের * পর 'ফেডারেশনের হল-গ্রাউণ্ডে' (বর্তমান ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের পার্শ্বে যে স্থানে গ্রীয়ার পার্ক হইয়াছে) বিরাট জনসভা আহূত হইল। প্রবীণ কংগ্রেসনেতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসু ঐ সভার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনবাবু তখন বৃদ্ধ—রোগে শয্যাশায়ী। তৎসত্ত্বেও সেই জাতীয় সঙ্কটের দিনে তিনি দেশমাতৃকার আহ্বানে রোগশয্যা হইতেই উঠিয়া আসিলেন। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তাঁহাকে 'ইজিচেয়ারে' করিয়া সভাস্থলে আনা হইল। আনন্দমোহন বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা বঙ্গ-বিভাগ কখনই মানিয়া লইবেন না এবং যতদিন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঐ আদেশ বাতিল না হয়, ততদিন জাতির সমস্ত শক্তি দিয়া আন্দোলন চালাইবেন। ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড বাঙলার প্রতীকস্বরূপ ফেডারেশন হল বা "মিলন মন্দিরের" ভিত্তিও ঐদিন আনন্দমোহন স্থাপন করিলেন। আনন্দমোহন নিজে তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতে পারিলেন না, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষ হইতে ঐ বক্তৃতা জলদ-গম্ভীর স্বরে পাঠ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং তিনিই আনন্দমোহনের বক্তৃতা বাঙলায় পাঠ করেন। তারপর বাঙলা ও ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য বা প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করা হইল। বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী নিরস্ত হইবে না এবং তাহারা কেবল স্বদেশী দ্রব্যই ব্যবহার করিবে, কোন বিদেশী পণ্য ক্রয় করিবে না, ইহাই ছিল ঐ সঙ্কল্পের সার মর্ম। বাঙলার সর্বত্র হাজার হাজার সভায় দিনের পর দিন সেই জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য পঠিত হইয়াছিল। সাধারণত ঐসব সভায় সভাপতি সঙ্কল্পবাক্য বা প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে সমস্বরে উহা আবৃত্তি করিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু সভায় জনসাধারণকে জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য আবৃত্তি করাইয়াছিলেন। ১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণেই বাগবাজারে পশুপতি বসুর বহির্বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে আর একটি বিরাট জনসভা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বক্তৃতা করেন। এই সভায় প্রধানত রবীন্দ্রনাথের আবেগময় আহ্বানে 'জাতীয় ভাণ্ডারের' জন্য ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্টপুর (হাওড়া) প্রভৃতি আরও কয়েকটি স্থানে সভা করিয়া জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পশুপতি বসুর সেই প্রাঙ্গণেই যে 'বিজয়া সম্মেলন' হয়, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন।



স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়



শ্রীঅরবিন্দ

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নবীন জাতীয়তা-বাদীদের নেতৃত্বে "বন্দে মাতরম্" শব্দটি 'জাতীয় মন্ত্র' হইয়া উঠে।† ঠিক এই কারণেই পুলিশ ও সিভিলিয়ান—সংক্ষেপে আমলাতন্ত্রের পক্ষে "বন্দেমাতরম্' শব্দটি বিষবৎ মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা উহাকে "বিদ্রোহ ধ্বনি" বলিয়াই গণ্য করিতে লাগিলেন। বাঙলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ এক সার্কুলার জারী করিয়া বসিলেন যে, কোন ছাত্র স্বদেশী সভায় যোগদান করিলে অথবা "বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করা হইবে। ইহাই কুখ্যাত "কার্লাইল সার্কুলার"। এই সার্কুলারের ফলে বাঙলার ছাত্র ও যুবক

---

*রাখী বন্ধন উৎসবের প্রসঙ্গে মৌলবী লিয়াকত হোসেনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই আত্মত্যাগী দারিদ্র্যব্রতী স্বদেশসেবক প্রতি বৎসর ৩০শে আশ্বিন ছাত্র ও যুবকদের লইয়া মহাসমারোহে রাখী বন্ধন উৎসব করিতেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হইবার পরও বহু বৎসর তিনি এই জাতীয় উৎসব রক্ষা করিয়াছিলেন।

†স্বদেশী আন্দোলনে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি কবে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, তৃম্রকুড়ু সলের ৭ই আগস্ট তারিখে টাউন হলে যে বিরাট 'বয়কট' সভা হইয়াছিল, তাহাতেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি প্রথম উচ্চারিত হয়।

সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। উহার প্রতিবাদ করিয়া বাঙলার সর্বত্র জনসভা হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা অঞ্চলে এইরূপ কয়েকটি সভায় সরকারী স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। 'কার্লাইল সার্কুলারের' ভয়ে যুবক ও ছাত্রেরা ভীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং



লোকমান্য তিলক

তাহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে স্বদেশী সভায় যোগ দিতে লাগিল এবং 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে লাগিল। ফলে পুলিশের লাঠি তাহাদের মাথায় পড়িল, বহু ছাত্র বিদ্যালয় হইতেও বিতাড়িত হইল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করাই রাজদ্রোহের তুল্য একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিল। বাঙলার নানাস্থানে, বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও আসামে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া বহু লোক পুলিশের লাঠী খাইল, অনেকে জেলেও গেল। এই সময়েই বরিশালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স' কিভাবে ম্যাজিস্ট্রেট ভাঙিয়া দেন এবং নেতারা কেহ কেহ গ্রেপ্তার হন, দেশবাসী নিশ্চয়ই তাহা বিস্মৃত হন নাই। এই কনফারেন্সেই মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন পুলিশের পুনঃপুন লাঠির আঘাত খাইয়াও অজ্ঞান হইয়া না পড়া পর্যন্ত কিছুতেই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ত্যাগ করেন নাই। "বন্দেমাতরম্" সেই দিন হইতে সত্যই "জাতীয় মন্ত্রে" পরিণত হইল। ইহার জন্য কতজন যে দুঃখবরণ করিয়াছে, নির্যাতন নিপীড়ণ সহ্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান নানাদিক দিয়া অসামান্য। সভাসমিতিতে বক্তৃতা, সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রভৃতির দ্বারা দেশবাসীর চিত্তে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তিনি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া আরও দুই দিক দিয়া স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার দানের প্রাচুর্য বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমত, জাতীয় সংগীত রচনা, দ্বিতীয়ত, জাতীয় শিক্ষা প্রচার। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে 'গানের রাজা' আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিক সংগীত রচনায় তিনি কেবল বাঙলা দেশে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত অধিকসংখ্যক এবং এত বিচিত্র ভাবপূর্ণ গান পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন কবি রচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই সংগীতাবলীর মধ্যে আবার জাতীয় সংগীত বা স্বদেশপ্রেমের সংগীতের সংখ্যা প্রচুর। স্বদেশী যুগে কয়েক সহস্র জাতীয় ভাবপূর্ণ সংগীত বাঙলা দেশের কবিগণ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথের দানই সর্বাধিক। দেশমাতৃকাকে তিনি যে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, জাতীয় আন্দোলনে যেভাবে নিজের মনপ্রাণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই প্রেম, সেই আত্মোৎসর্গই সহস্র ধারায় তাঁহার গানের মুখে উৎসারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গান একদিকে যেমন গভীর দেশপ্রেম, অন্যদিকে তেমনি অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলার সর্বত্র সহস্র সহস্র জনসভায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত গান গীত হইত। দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশী ভাবের সঞ্চারে উহা যে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার সমগ্র স্বদেশী সংগীতের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সামান্য কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব :

দেশমাতৃকা যে গাছপালা, মাটি, জল, আকাশ, গ্রাম-নগর লোকসংখ্যার সমষ্টিমাত্র নহেন, ইহার অন্তরালে তাঁহার যে



বিপিনচন্দ্র পাল

চিন্ময়ী রূপ আছে, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, হাজার হাজার বৎসরের সুখদুঃখ বেদনা, ইতিহাসের ভাঙাগড়া, উত্থানপতন—সমস্ত মিলিয়া সহস্রদল পদ্মে সেই চিন্ময়ী জননীর পাদপীঠ রচনা করিয়াছে, এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "বন্দেমাতরম্" সংগীত সেই চিন্ময়ী দেশ-জননীর ধ্যান। বঙ্কিম-শিষ্য রবীন্দ্রনাথও মাতৃভূমির এই চিন্ময়ী রূপকেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।—

অয়ি ভুবন মনমোহিনী
নির্মল সূর্যোকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী জননী,
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপ্রবাহ স্তন্যদায়িনী।......

বঙ্গজননীর এই ভুবনমোহিনী রূপ কবি যেন আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি যেন ধ্যাননেত্রে এই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অথবা—ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বমায়ের, তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা। ইত্যাদি।

এখানে দেশজননীর মূর্তিকে কবি বিশ্বজননীর মূর্তির মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছেন।

আবার,—

আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
কি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী?
ওগো মা, তোমায় দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন বরণ,
ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে॥
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোর আঁচল জ্বলে আকাশতলে রৌদ্র বসনী!...

স্বদেশী আন্দোলনে জাতির চিত্তে যে প্রলয়ের ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে এই ভীষণ মধুর রূপে বঙ্গমাতার আবির্ভাব! কবি সেই জ্যোতির্ময়ী কল্যাণময়ী মাকেই এই গানে ধ্যান করিয়াছেন।

দেশের প্রতি অণু-পরমাণু, তাহার আকাশ জল বাতাস, শ্যামল বনানী, আম্রবনঘেরা নদীকূল, নিভৃত পল্লী—সকলের সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যে নিগূঢ় যোগ, যে মমতার বন্ধন—কবি তাঁহার অমর সংগীত 'সোণার বাঙলায়' সেই ভাব অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত কয়িয়াছেন—

আমার সোনার বাঙলা
আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

* * * * *

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে (মরি হায়, হায়রে)—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কী দেখেছি মধুর হাসি।
কী শোভা কী ছায়া গো,
কী স্নেহ কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী, আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায়, হায়রে)
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়ন জলে ভাসি।

* * * * *

ধেনু চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে
সারা দিন পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায়, হায়রে)
ওমা, আমার যে ভাই, তারা সবাই
তোমার রাখাল, তোমার চাষী।

* * * * *

অথবা—
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। ইত্যাদি

ইহাতেও কবির সেই গভীর স্বদেশপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্য এক শ্রেণীর গানে কবি জাতিকে স্বাধীনতার তপস্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, অত্যাচারীর রক্তনেত্র, নির্যাতন, নিপীড়ন উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক উন্নত শিরে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেনঃ—

(১) একলা চল, একলা চল, একলা চলরে,
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে। ইত্যাদি

(২) তা' বলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
তা' বলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না—
তা' বলে ভাবনা করা চলবে না।
আসবে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না—
তা' বলে ভাবনা করা চলবে না। ইত্যাদি

(৩) এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে
জয় মা ব'লে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে
খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।

(৪) আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে॥

* * * * *

বাহির যদি হ'লি পথে
ফিরিস নে তুই কোনো মতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস্‌নে বারে বারে।

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোমার নিজের মনে,
অভয় চরণ স্মরণ করে
বাহির হ'য়ে যারে॥

(৫) আমি ভয় ক'রবো না, ভয় ক'রবো না,
দু-বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।
তরীখানা বাইতে গেলে, মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না। ইত্যাদি

(৬) যে তোমায় ছাড়ে, ছাড়ুক—
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা॥
আমি তোমার চরণ করবো শরণ
আর কারো ধার ধারবো না, মা। ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের যে দুইটি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত আজ সর্বত্র গীত হয়—

(১) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ, আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই। ইত্যাদি

(২) জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা—

এগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের অপূর্ব সৃষ্টি। এই সব সংগীতে ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে বিশ্বমানবের মুক্তি-সাধনার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" ব্যতীত আর কোন জাতীয় সংগীত এই সব সংগীতের মতো জাতির চিত্তের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় উহারই সঙ্গে সঙ্গে যে 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত বিজাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহরূপেই এই 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' দেখা দিয়াছিল। যে শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমির যোগ নাই, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন, সর্বোপরি যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নীতির করায়ত্ত, সে শিক্ষা কখনই জাতির মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন করিতে পারে না। অতএব সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজেদের আয়ত্তাধীনে, আমাদের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষানীতি প্রবর্তিত করিতে হইবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই ছিল সংক্ষেপে 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে'র মূল কথা। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, তারকনাথ পালিত, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ও ব্রজ-কিশোর রায় চৌধুরী এই আন্দোলনের জন্য প্রভূত অর্থ দান করেন এবং তাঁহাদেরই অর্থসাহায্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথমে যখন অপেক্ষাকৃত সামান্য সম্বল লইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন কয়েকজন ত্যাগী, নিস্বার্থব্রতী কর্মীই উহাকে ধাত্রীর ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীযুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে সন্ন্যাসী), ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দও কিছুকাল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। সেই সময় কলিকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে বাঙলার নানাস্থানেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে চাঁদপুরের জাতীয় বিদ্যালয় ব্যতীত আর সবগুলিই উঠিয়া গিয়াছে।) উত্তরকালে যখন এই আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস হয় এবং পূর্বেকার হিতৈষীদের অনেকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন, তখনও যাঁহারা অহিতাগ্নিকের মত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সর্বাগ্রগণ্য। প্রধানত তাঁহারই নীরব সাধনা ও অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এবং ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় যাদবপুরের বিরাট জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাঙলার, শুধু বাঙলার কেন, ভারতের অন্যতম গৌরবের বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হয়, তখন তিনি বিশেষ উৎসাহসহকারে ইহাতে যোগ দিতেন। এমন কি জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা নির্বাচন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা প্রভৃতি কার্যেও তিনি সাহায্য করিতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, কিছুদিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হ্রাস হয়। সম্ভবত জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁহার নিজের আদর্শ ও পরিকল্পনা উহাতে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠে নাই। এই সময়েই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের আদর্শ অনুসারে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন পরে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন আসিয়া তাঁহার কার্যে যোগদান করেন।

স্বদেশী যুগে যে নূতন জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভব হয়, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঙলার কবি ও মনীষীদের প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের ইঁহারাই ছিলেন উত্তর সাধক। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি স্বভাবতই এই নূতন দলের প্রতি ছিল এবং তিনি নিজেও এই দলের অন্যতম নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে এই দলের সঙ্গে যুক্ত হন নাই, দলগত রাজনীতির বাহিরে কতকটা নিরপেক্ষভাবেই থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসী দলের সঙ্গেও তিনি যোগ দিয়া কাজ করিতেন। অনেক বিষয়ে তিনি উভয় দলের মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রাচীন ও নবীন দল একযোগে কাজ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তাঁহার "দেশনায়ক" প্রবন্ধে এইভাবে

অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সুরেন্দ্রনাথকেই বাঙলার একমাত্র নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সমমতাবলম্বীদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে ভেদ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত কোন কোন দিক দিয়া উহা মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। দেশের লোক "নরমপন্থী" (মডারেট) ও "চরমপন্থী" (একস্ট্রিমিস্ট) বলিয়া দুই দলের নামকরণও করিয়া ফেলিল। কংগ্রেস কমিটির সভায়, নানাস্থানে জনসভায়, নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের কলহ ও বাগ্‌বিতন্ডা চলিল। চরমপন্থীরা দলে ভারী, দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁহাদের সমর্থক, সুতরাং নরমপন্থীরা তাঁহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল বাঙলা দেশে নয়, ভারতের সমস্ত প্রদেশেই—বিশেষত মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে এই দ্বন্দ্ব আত্যন্তিকরূপে দেখা দিল। প্রবীণ নরমপন্থীরা ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু নবীন চরমপন্থী দল তাহা মানিয়া লইলেন না, তাঁহারা তৎস্থলে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নাম প্রস্তাব করিলেন। ফলে সুরাট কংগ্রেসে "দক্ষযজ্ঞ" হইল, কংগ্রেসের অধিবেশন পন্ড হইয়া গেল। প্রবীণ নরমপন্থীরা এলাহাবাদে ফিরিয়া গিয়া বৈঠক করিলেন এবং নবীন দলকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহার ফল ভাল হইল না,—কয়েক বৎসরের মধ্যে নবীন দলই বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসে প্রাধান্য স্থাপন করিলেন এবং প্রবীণ দলই কংগ্রেস হইতে সরিয়া গিয়া "লিবারেল ফেডারেশন" গঠন করিতে বাধ্য হইলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই এই সব দ্বন্দ্ব-কোলাহল হইতে দূরে থাকিতেন। সুরাট কংগ্রেসের পর তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু নবীন দলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান হ্রাস হয় নাই। নবীন দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ একাধারে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, "অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্র" কবিতায় তাহার অক্ষয় নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯০৭ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয়স্বরূপ এই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না,—

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে, সর্ববাধাহীন,—
যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট যাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিতে শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়; সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।...........

* * * *

জয়, তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল?
মোছ হে দুর্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল।
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে বল কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্টরাহু
বিধাতার সূর্য পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তের পরে
ছায়ার মতন।...........

* * * * *

তিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা মিথ্যা সর্বভয়,
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়—তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ—সত্য আছে স্থির।"

১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে একটা মিলন প্রয়াসের নিদর্শনস্বরূপেই রবীন্দ্রনাথকে এই অধিবেশনের সভাপতি করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই, বলিতে গেলে, তাঁহার প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদানের শেষ দৃষ্টান্ত। ইহার পর তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, নানা কারণেই তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবনে "যুগ পরিবর্তনের" সূচনা করে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া গঠনমূলক স্বদেশসেবাতেই যে তিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহা এই অভিভাষণে সুস্পষ্টরূপেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। *

(ক্রমশ)

*এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে—"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না"—এই গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছি—গানটি প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত। প্রঃ সঃ।



(৩)

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া থাকমণি বলিলেন, "দেখছো তো এই বাড়ির দশা, কে কোথায় গেছে ঠিক নেই, ঘর-বাড়ি সব ভেঙ্গে পড়ছে। ওই যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো যাদের তারা আজ দু'তিন পুরুষ ভিটে ছাড়া, এ ধারের লোকেরা আমার বিয়ের পরই চলে গেছে, মাঝে মাঝে তাদের এক ছেলে এ সব দেখাশুনো করতে আসে। আর ওই ঘরগুলো—"

নিদারুণ বিরক্তির চিহ্ন তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "ওগুলোর মালিক আমাদের সুমন্ত—যাকে পাগল ভেবেছিলে। বাপ রে, ওই এক ছেলে, কাউকে স্থল জল পেতে দেয় না—ওর উৎপাতে সবাই অস্থির। বিশ্ব-বখাটে বাঁদর—"

শাশ্বতী কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ওই লোকটি তোমাদের কে হয় মাসীমা ? যেমন চোয়াড়ে চেহারা, তেমনি রাগী স্বভাব, কথা বলতে গেলে তেড়ে যেন মারতে আসে,—ঠিক যেন মিলিটারী মেজাজ।"

থাকমণি হাত উল্টাইয়া বলিলেন, "আর বলো না বাছা, ওই সুমন্তের জ্বালাতেই তো মরছি। খাজা গুন্ডা ধরণের লোক, ও নাকি আবার পাগল—হরিবোল হরি, ও যদি পাগল হয়, আমরা তার চেয়ে বেশী পাগল। ও তো কি দেখেছো মা—ওকে চিনতে অনেকদিন দেরী লাগবে। দেখলে না—তুমি কে একজন অন্য মেয়ে, কি রকমভাবে তোমায় রুখে গেল; তাই না বলি—ও ছেলে সব পারে—।"

একটা দম লইয়া তিনি আবার বলিলেন, "কি করতেই বা এই বাড়িতে পড়ে আছে তার ঠিক নেই। বিয়ের ঠিক হয়েছিল—বিয়ে করলে না, কোথায় মোহন বাগদী, কোথায় বিশু মালো, কোথায় ঘনশ্যাম মুচি, এই সব লোকেদের সঙ্গে মিলে মিশে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। ভদ্র ঘরে জন্মালে হবে কি, আচারে ব্যবহারে চাষা—একদম চাষা।"

তিনি থামিলেন।

শাশ্বতী বলিল, "খাওয়া দাওয়াও কি ওদের ওখানে চলে নাকি ?"

থাকমণি বলিলেন, "হয়তো চলে মাঝে মাঝে—কেই-বা তার খবর রাখে ? ওসব হাঁড়ির খবরে আমি নেই বাছা, ওসবে থাকতেও নেই। বাপ মারা যেতে দু'চারদিন নিজেই হাত পুড়িয়ে রেঁধেছিল শুনেছি, তবু একটিবার আমায় বলে নি—কাকিমা, আমার যে খরচ লাগে নাও—আমায় ভাত দিয়ো। আমি যদি এমনি খাওয়াতে পারতুম—দেখতে নুট নুট করে খেতে আসতো। সে সামর্থ্য তো আমার নেই বাছা, কিছু না দিলে অত বড় একজন জোয়ান মরদকে দুবেলা খেতে দেওয়া কি আমার পোষায় ?"

কি একটা কাজ মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া গেলেন; শাশ্বতী খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উপরে নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে চলিল।

সংসারের অনেক কিছুই তাহার নিকট অজানা অচেনা থাকিয়া গেছে। তাহার পিতা বালীগঞ্জ নিবাসী মিঃ বোসের নাম সকলেই জানে,—অতি আধুনিক ধরণের লোক—শিক্ষায় সভ্যতায় তিনি যথেষ্ট উন্নত। শাশ্বতীর মা কাত্যায়ণীর সহিত যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর আর কাত্যায়ণী নয় বৎসরের বালিকা। পিতৃ-মাতৃহীন কিশোর পরেশনাথের আশা ছিল অপর্যাপ্ত, উন্নতির দিকে দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ, যে-কোন রকমে বড় হইবার কামনা তিনি সর্বদা করিতেন। সতেরো বৎসরের পিতৃ-মাতৃহীন কিশোর লেখাপড়া বিশেষ করিতে পারেন নাই, তখন হইতে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বর্তমানে তাঁহার আশা সফল হইয়াছে। আজ তাঁহার ব্যবসাক্ষেত্র কেবল কলিকাতায় সীমাবদ্ধ নয়, বম্বে, মাদ্রাজ, সি পি, ইউ পি, উড়িষ্যা প্রভৃতি ছাড়াইয়া সুদূরে ইউরোপেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই ব্যবসা উপলক্ষে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে দু চারবার তিনি যাতায়াত করিয়াছেন।

বালীগঞ্জে তাঁহার বিরাট অট্টালিকা, মোটর প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল নাই। পত্নীর কাত্যায়ণী নাম কবে বদলাইয়া কেকটি নাম হইয়া গেছে, মনে প্রাণে তিনি এখন স্বামীর উপযুক্ত পত্নী-রূপে পরিগণিতা হইয়াছেন। তাঁহার পায়ে হাই-হিল জুতা, চোখে চশমা, হাতে ব্যাগ এবং দৈহিক নিত্যকার প্রসাধন ব্যাপার দেখিয়া—বাল্যে যাহারা দেখিয়াছে—তাহারা চিনিতে পারিবে না।

ইঁহারই কন্যা স্বাতি এবং শাশ্বতী।

দুই ভগিনীর আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতি একেবারে বিভিন্ন। স্বাতি এবং শাশ্বতীকে একই ধারায় শিক্ষা দেওয়া হইলেও দুইজনে কেমন তফাৎ রহিয়া গেছে। স্বাতি অত্যন্ত সামাজিক, বন্ধুবান্ধব লইয়া সে দিন কাটাইতে ভালো-

বসে; শাশ্বতী একেবারেই অসামাজিক, বেশীর ভাগ নির্জনতাই সে পচ্ছন্দ করে।

এই নির্জনপ্রিয়তাই তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে এখানে বাল্যে শ্রুত মাসীমার কাছে—অথচ তাহার আসার বার্তা তাহার পিতা-মাতার নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গেছে।

নির্জন গ্রামের বর্ণনা শাশ্বতী অনেক পড়িয়াছে—মানুষ কেমন করিয়া গ্রাম্যজীবন ভোগ করে, ইহা জানার ইচ্ছা তাহার বরাবরই ছিল। থাকমণি স্বপ্নেও ভাবেন নাই- তাঁহার ধনী ভগ্নীর ইংরেজীভাবাপন্না কন্যা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেই মোটর হাঁকাইয়া কলিকাতা হইতে এতদূর এই যুগীপুকুর গ্রামে আসিয়া পেঁছাইবে।

এই ভগ্নীটি এবং ইহার স্বামী, কন্যা ও ঐশ্বর্যের কথা তাঁহার মুখে কোন দিনই ফুরায় নাই। গ্রামের লোক প্রত্যেকে বোস পরিবারের প্রাচুর্যের, শিক্ষার ও সভ্যতার গল্প শুনিয়াছে, এমন কি কাহার কেমন চেহারা তাহারও হুবহু বর্ণনা পাইয়াছে। এই বোনঝি যখন মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজের পরিচয় দিয়া মাসীমার খোঁজ করিল, তখন থাকমণি স্নানান্তে এক কলসী জল লইয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকেই মাসীমা জানিয়া শাশ্বতী দুইহাত তুলিয়া একটি নমস্কার মাত্র করিয়াছিল।

প্রণাম বোস পরিবারে কেহ কাহাকে করে না, নমস্কার করিয়াই সারিয়া দেয়—কাজেই ইহাতে শাশ্বতীর অপরাধ ছিল না—কারণ প্রণাম-প্রথার সহিত সে একেবারেই অপরিচিত।

প্রায় খাস বিলাতী মেমসাহেব বোনঝিকে লইয়া কোথায় রাখিবেন তাহা থাকমণি ভাবিয়া ঠিক পান না।

দ্বিতলে যে ঘরখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইল, অবিলম্বে সেইখানা পরিষ্কার করিয়া তাহাতেই শাশ্বতীর স্থান নির্দেশ করা হইল, মোটরখানা গাড়ি বারান্দার নীচে কোনরকমে তুলিয়া রাখা হইল।

পরিবার শুদ্ধ সকলের ব্যবস্তা অত্যন্ত বেশী রকম বাড়িয়া গিয়াছে। মাসীমার চিরঅলস পুত্র ব্রজসুন্দর পর্যন্ত অসম্ভব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রীতিমত হাঁক ডাক সুরু করিয়া দিয়াছে। ইহারই মধ্যে জেলেনী মাছ আনিয়া দিয়াছে, পতিরাম তরকারী আনিয়া দিয়াছে, মহেশ রায় নিজে দুধ আনিয়াছেন।

কাল রাত্রে আসিয়া ঘুমাইয়া কাটিয়াছে, সকালেই সুমন্তের পরিচয় শাশ্বতী পাইয়াছে—কৌতূহল তাহার বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই। গল্পে উপন্যাসে এ রকম ধরণের নায়কের কথা সে অনেক পড়িয়াছে; এখানে এই লোকটিকে দুদিন দেখিয়া যাওয়া মন্দ কি? ইহার মধ্যে এই গ্রামখানা বেশ দেখা হইবে, মাসীমার ব্যক্তিগত জীবন হইতে গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে।

শাশ্বতী ব্রজসুন্দরকে ডাকিয়া বলিয়া দিল—মোটরখানা যেন সাবধানে রাখা হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেভাবে মোটরটিকে ঘিরিয়াছে তাহাতে গাড়িখানার ক্ষতি না হয়। কোন্ সময় কৌতূহলবশে তাহারা জানালাপথে গাড়িতে চড়িবে, কাঁচ ভাঙিয়া দিবে অথবা কোন যন্ত্র অচল করিয়া রাখিবে তাহার ঠিক নাই।

গাড়ী সম্বন্ধে ব্রজসুন্দরেরও গর্বের শেষ ছিল না। কাল রাত্রে যাহারা মোটরের আগমন বার্তা পায় নাই তাহাদেরও জানাইয়া দিয়াছে, তাহার মাসতুতো ভগিনী নিজে মোটর চালাইয়া আসিয়াছে, সে মোটর তাহাদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় রাখা হইয়াছে।

যুগীপুকুরের মত পল্লীগ্রামে মোটর আসা বিস্ময়জনক এবং সেই জন্যই সকাল হইতে কেবল শিশুরাই নয়, দলে দলে বড়রাও আসিয়া মোটর এবং সঙ্গে সঙ্গে উঁকি ঝুঁকি দিয়া শাশ্বতীকে দেখিয়া যাইতেছিল। সকলের কাছে শাশ্বতীর পরিচয় দিতে দিতে থাকমণির মুখ ব্যথা হইয়া যাইতেছিল তথাপি তাঁহার কথার বিরাম ছিল না।

শাশ্বতীর প্রথমে মনে হইয়াছিল, হয়তো সে বিরক্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল—সে বিরক্ত হইল না বরং তাহার বেশ আমোদ বোধ হইতেছিল।

(৪)

শাশ্বতী বেড়াইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল, সঙ্গে ছিল দাসী মোহিনীর কন্যা তারা। ব্রজসুন্দর সঙ্গে যাইবার কথা বলিয়াছিল,—শাশ্বতী কথাটা কানে তুলে নাই। সে কোন কথা না বলায় ব্রজসুন্দর সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারে নাই।

ছোট মেয়ে তারা,—অনর্গল বক্তা হিসাবে জুটিয়াছিল ভালো। গ্রামের সব পুষ্করিণীর নাম তাহার মুখস্ত; তালপুকুর, ঘোষেদের পুকুর, বাণীদিঘী,—কোনটার পরিচয় দিতে তাহার বাকি রহিল না।

বালিগঞ্জবাসিনীর চোখে গ্রামের দৃশ্য মন্দ লাগে নাই। গ্রামের মেয়েরা বৈকালিক কার্য সারিতেছে, ঘাটে মেয়েদের ভিড় লাগিয়াছে।

শাশ্বতীকে দেখিয়া সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া ছিল; কেহ কেহ পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

গ্রামের মাটির পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদূর গিয়াছে কে জানে। দু'পাশে গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল, তাহারই মাঝে মাঝে এক-একটা বাড়ি দেখা যায়। অধিকাংশ খড়ের ঘর, বাড়ির সামনে ধানের গোলা, ঢেঁকিশালা, মস্ত বড় উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এতটুকু সিঁদুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। কোন কোন ঘরের চালায় লাউ-কুমড়ার গাছ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, লতাইয়া লতাইয়া সে গাছ সমস্ত চালা ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একটা বাঁক ফিরিতেই সামনে পড়িল সুমন্ত, প্রকাণ্ড বড় একটা পুঁটলী লইয়া সে হন হন করিয়া চলিয়াছে।

"এই দেখুন, এখনই ধাক্কা লেগেছিল আর কি? এর পরে আবার বাড়িতে গিয়ে আপনার মাসীকে বলতেন, আমি ইচ্ছে করে আপনাকে ধাক্কা দিয়েছি, সে কথা শুনে তিনি এবার আর খুন্তি নয়—একখানা বঁটি বাগিয়ে যে নাক-কান কাটতে আসতেন, তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।"

শাশ্বতী তাহার পানে বিস্মিত নেত্রে তাকাইল। দীর্ঘ আকৃতি, চওড়া বুক, বলিষ্ঠ বাহু তাহার পর্যাপ্ত শক্তির পরিচয় দেয়। প্রকাণ্ড চওড়া কপাল, উন্নত নাসিকা, পুরু ওষ্ঠধর পরিচয় দেয় তাহার মনের দৃঢ়তার,—একজেদিত্বের।

শাশ্বতী চোখ নামাইল—কোন উত্তর দিল না। সুমন্ত হাতের পুঁটলীটা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তে লইল, বলিল, "আপনি আমাকে পাগল ঠিক করে নিয়েছেন, কিন্তু পাগল আমি মোটেই নই, আমি দিব্য ভালো মানুষ, আপনার চেয়েও আমি বেশী সুস্থ—পরীক্ষা করলেই দেখবেন। আমার কাকিমাটিও বোধ হয় আপনাকে জানিয়েছেন—আমি পাগল—"

শাশ্বতী মাথা নাড়িল—"মোটেই না, তিনি বলেছেন আপনি বেশ সুস্থ লোক—"

একটু হাসিয়া সুমন্ত বলিল, "সেই কথার সঙ্গে নিশ্চয় আমার বিশেষ পরিচয়টাও দিয়েছেন—আমি গুণ্ডা, আমি ছোট-লোকদের সঙ্গে মিশি—ইত্যাদি—

শাশ্বতী আশ্চর্য হইয়া তাহার পানে তাকাইল; বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে শুনেছেন।"

সুমন্ত সবেগে মাথা নাড়িল, "নাঃ, লুকিয়ে লোকে রাজার মাকে ডাইন বলে,—সে সব কথা শুনে লাভ কি? ছোটলোকদের সঙ্গে মিশলেও সত্যি মন এত ছোট হয়নি, যাতে লুকিয়ে লোকের কথা শুনব। বরাবর কাকিমা আর আমার কাকার স্বভাবটি জানি কি না, ওঁরা যা বলেন, তা বেশ একটু অতিরঞ্জিত করেই বলেন। অবিশ্যি সে সব কথা আমার কানে যে না আসে তা নয়; হেসে অনেক সময় উড়িয়ে দেই, আবার কখনও কখনও রাগও যে না হয় তা নয়।"

শাশ্বতী এ সম্পর্কে আর কোন কথা তুলিল না, বলিল, "অত বড় পুঁটলিটা বয়ে চলেছেন কোথায়?"

সুমন্ত বলিল, "চলছি আপনারা যাদের ঘৃণা করেন, তাদের কাছে। বন্যায় সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, বেচারারা খেতে পাচ্ছে না, ওদের কিছু না দিলে শুকিয়ে মরবে। সামান্য কিছু যা ঘরে ছিল, তাই নিয়ে যাচ্ছি—তবু দু'একদিন চলুক তো?

বলিয়াই সে হাসিল—

মুহূর্তে থামিয়া সে বলিল, "যাক্, আমি চলছি এখন—আপনার বেড়ানোর সময় নষ্ট করব না।"

সে হনহন করিয়াই চলিয়া গেল, আর একবারও ফিরিয়া চাহিল না।

শাশ্বতী নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল,—একটা বাঁকের মুখে সুমন্তের দীর্ঘদেহ মিলাইয়া গেল।

তারা ডাকিল, "আসুন দিদিমণি—"

শাশ্বতী সচেতন হইয়া উঠিল,—"হ্যাঁ চল।"

বিশেষ কিছুই আর চোখে পড়ে না, এই একটি মানুষই যেন বিশেষ করিয়া শাশ্বতীর সারা মনটা জুড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা লাগিবার খানিক আগেই সে ফিরিল।

বাড়ির দরজার কাছে তখন তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া গেছে।

বৃদ্ধ রামবসু চীৎকার করিয়া বাড়ি ফাটাইয়া দিতেছেন—আজ আসুক সুমন্ত, তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে, সহজে আজ তাকে ছাড়ছিনে। সে যে অন্য লোক পায় নি, আজ আমি ভালো করে তা বুঝিয়ে দেব।

মহেশ হুঁকার উপর কলিকাটা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বাহিরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিলেন,— সুমন্তের সম্বন্ধে জানিবার বিশেষ ঝোঁক না থাকিলেও যেন কতকটা গরজে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবু, সুমন্ত আপনার করলে কি?

ললাটের ঘাম বামহস্তে মুছিয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামবসু বলিলেন, "আর বলেন কেন রায়মশাই, আপনার ভাইপোটিকে সামলান বলছি, না হলে আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না, হয় এস্পার নয় ওস্পার, যা হয় একটা কিছু করব বলে রাখছি।

মহেশ তামাক টানিতে টানিতে কতকটা অবহেলার সঙ্গে বলিলেন, "হ্যাঁ,—ওই যে বইয়ে আছে না,—গোপাল বড় সুবোধ বালক, সে যাহা পায় তাহাই খায়, সুমন্তও ঠিক তেমনি ছেলে আর কি? জানেনই তো রামবাবু, ভিন্ন ভাতে বাপ পড়সী, তারপরে ওদের আর আমাদের বংশানুক্রমিক ঝগড়ার কথাটাও আপনার অজানা নেই। ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা আর আমার ঠাকুরদার বাবা সাক্ষাৎ সহোদর ভাই ছিলেন। সেই সময় হতে দুই ভাইয়ে ঝগড়া, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, সেই ধারাই চলছে এই দুই বংশের মধ্যে, চিরকাল ধরে। আমাকে আর ওসব ব্যাপারের মধ্যে জড়াবেন না রামবাবু, আমায় ছেড়ে দিন।

রামবসু নিকটে সরিয়া আসিলেন—"তাই তো বলছি, আসুক সুমন্ত, তাকে আমি আজ দেখে নেব, হয় এস্পার নয় ওস্পার, আমিও ছাড়বার পাত্র নই, দেখি দত্তমশাই—দেখি হুঁকোটা।"

মহেশ হুঁকাটা বাড়াইয়া দিতে রামবসু হুঁকার উপর হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইলেন,—দু'চারবার কলিকায় সজোরে টান দিয়া ধোঁওয়া ছাড়িয়া বলিলেন, কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার, একেবারে বংশের নাম ওড়ালে, প্রমন্ত রায়ের নাম হাসালে, যে প্রমন্ত পথ দিয়ে চলতে হাজার হাজার লোকে মাথা নোয়াতো, সেই প্রমন্তের ছেলে চালাচ্ছে কেবল অত্যাচার, অনিয়ম; যত ছোটলোকদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা। আজ ওই ছোটলোকেরা ভুলে গেছে ভদ্রলোকের পার্থক্য। আমাদের দেখে এককালে ওরা কি রকম শশব্যস্ত হয়ে উঠতো মনে করুন, আর এখন কিনা ওরা আমাদের দেখে পথ পর্যন্ত ছেড়ে দেয় না। মহেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো রামবাবু, সুমন্ত করেছে কি?

তিনি চাপাসুরে জিজ্ঞাসা করিলেও রামবাবু উত্তর দিলেন উচ্চকণ্ঠে—"করেছে কি? রাসকেল, ড্যাম, পাজি সুমন্ত,—গরীব লোক আমি, কোনক্রমে দুই একখানা ফলের বাগান নিয়েছি, বাড়ির বাগানটায় তরকারী পাতি লাগিয়ে তাতেই কোন রকমে দিন চালাই, আমার সেই বাগানে কিনা কুড়োনের এক কুড়ি গরু তাড়িয়ে এনে সব খাইয়ে ছেড়েছে।

শাশ্বতী পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার পানে তাকাইয়া রামবসু স্তব্ধ হইয়া গেলেন—বিস্মিতনেত্রে তাহার চলার পানে তাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি কে?"

মহেশ সগর্বে বলিলেন, "এইটিই তো আমার স্ত্রীর ভগ্নির মেয়ে, বালিগঞ্জে এদের বাড়ি,—মা লক্ষ্মী দুদিনের জন্যে গ্রামে বেড়াতে এসেছেন—কখনও গ্রাম দেখেন নি কিনা—"

কলিকাটা মহেশের হুঁকার উপর বসাইয়া দিয়া রামবসু

বলিলেন, "আচ্ছা, আমি এখন চললুম, সুমন্ত আসুক, কাল তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে।"

প্রস্থানের মুখেই সুমন্তের সঙ্গে দেখা—

"সুমন্ত—"

তিনি একটা বিরাট হুঙ্কার ছাড়িলেন,—"তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে সুমন্ত;—জেনো, আমি কখনই ভুলব না, যেমন করে পারি এর শোধ নেবই। এ মগের মুল্লুক পাও নি, রীতিমতভাবে এখনও ইংরেজ রাজত্বে বাস করছো, এ কথাটা মনে রেখো।"

ধীরকণ্ঠে সুমন্ত বলিল, "আজ্ঞে, তা বেশই জানা আছে বোস মশাই; আপনাকে এ কথাটা ঢাক-ঢোল ঘাড়ে করে বলে বেড়াতে হবে না, তবে আপনি যে বিলক্ষণ চেঁচামেচি করেছেন এই বিস্যুৎবারের সন্ধ্যেবেলায় গেরস্থের বাড়িতে, এটা কিন্তু একেবারে অন্যায় বিলক্ষণ। অশিষ্ট আচরণ এটা। এখন বাড়ি যান, কাল সকালে বরং এসে যা হয় কথা বলবেন, সেটা বরং সহ্য করা যাবে।"

রামবসু ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন, সন্ধার মৃদু অন্ধকারে সুমন্তের মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না, ঝাপসা মত দেখা গেল।

অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "না, আমার যা বলবার তা আজ এখনই বলব।"

শান্তকণ্ঠে সুমন্ত বলিল, "বলতে চান বলুন, আমি দাঁড়িয়ে শুনব না এ কথা ঠিক; আমি এখন ভয়ানক ক্লান্ত, কোন কথা শুনার অবকাশ আমার নেই। আচ্ছা আসুন এখন, আমি চললুম।

সে দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

রামবসু খানিকক্ষণ তাহার গমন পথের পানে তাকাইয়া রহিলেন, একটা অস্ফুট শব্দ মাত্র তাঁহার মুখে ফুটিল—"হুঁ—"

(৫)

সমস্ত রাত্রি প্রবল বৃষ্টি নামিয়াছিল, সকালে ঘুম ভাঙিয়া মাথার কাছে জানালাটা খুলিয়া দিয়া শাশ্বতী আশ্চর্য হইয়া গেল।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল আকাশের দিকে।

বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকিয়া নানা জাঁক-জমকের মধ্যে চক্ষু ও মন দুই-ই নিবিষ্ট হইয়াছিল, বাহিরের সৌন্দর্য দেখিবার অবকাশ জীবনে আসে নাই। আকাশের কালো মেঘের ঢেউ চোখে পড়িয়াছে, তাহাতে বৈশিষ্ট্য কোনদিন সে দেখিতে পায় নাই, বিদ্যুতের আলোয় অভ্যস্ত চক্ষু কোনদিন আকাশের বিদ্যুতের সৌন্দর্য অনুভব করে নাই।

আজ সে এই প্রথম দেখিল কালো মেঘের অসীম সৌন্দর্য, বিদ্যুতের মনোহারিত্ব সে প্রথম অনুভব করিল। কালো আকাশের বুকে চিড় খাইয়া বিদ্যুতের মুহুর্মুহু খেলা, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন, আজ শাশ্বতীর ভয় হয় নাই, সে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, কান পাতিয়া মেঘের গম্ভীর গুরু গুরু গর্জন শুনিল।

উপর হইতে দৃষ্টি নামিয়া আসিল ধরণীর পরে, সঙ্গে সঙ্গে কবির কবিতা মনে পড়িল—

জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে

শাশ্বতী আজ বুঝিল, নিজের চোখে না দেখিয়া কেহ এমন জ্বলন্ত সত্যকে লেখনীর মুখে ফুটাইতে পারে না। বাংলার এই পল্লীতে তালিবন নাই, তবু জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, আম, জাম, নারিকেলের তল দিয়া কুল কুল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিল।

পথের জল হাঁটুর উপর দাঁড়াইয়াছে, সেই জল ভাঙিয়া সুমন্ত কোথা হইতে বাড়ি ফিরিতেছে।

দেহে জামা নাই, সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহ তাহার, মালকোঁচা দিয়া কাপড়খানা সে আঁটিয়া পরিয়াছে, মাথা ও গা বহিয়া জলের ধারা গড়াইতেছে।

উজ্জ্বল বর্ণ তাহার আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে, পরিপুষ্ট উন্নত বক্ষ, পরিপুষ্ট শক্তিময় বাহু—সর্বোপরি তাহার বড় বড় চোখ, অবিন্যস্ত চুলগুলো মাথার উপর আসিয়া পড়িয়া দৃষ্টিশক্তির বাধা জন্মাইতেছে ও পরম বিরক্তভরে সে চুলগুলো সরাইয়া দিতেছে।

মুগ্ধনেত্রে শাশ্বতী চাহিয়া রহিল।

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে,—সুমন্ত একটা ছাতা লইলে পারিত, তাহা হইলে মাথা, গা ভিজিত না; পায়ে একজোড়া রবারের জুতা পরা উচিত ছিল; জলের মধ্যে কত কি ডুবিয়া আছে কে জানে, যদি পায়ে বিঁধিয়া যায়—

শাশ্বতীর ইচ্ছা হইল সুমন্তকে সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলে—এ কাজ তাহার মোটেই উচিত হয় নাই, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাহার উচিত ছিল।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুমন্তের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, এতটুকু একটু হাসির রেখা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল মাত্র।

শাশ্বতী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

পিছনে বড় আয়নাটায় তাহার মূর্তি প্রতিফলিত হইতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সে বদলাইয়া গেছে, দুদিন আগে তাহার যে মূর্তি কলিকাতায় থাকিতে আয়নার মধ্যে সে দেখিয়াছিল, সে মূর্তি কই?

ছিঃ—

শাশ্বতীর পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে কি এখানে এই করিতে আসিয়াছে? সামান্য একজন লোক সুমন্ত, হইলই বা সুপুরুষ, সে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোক, তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে কে,—শাশ্বতী? যে শাশ্বতী তাহার এই উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কোনও ছেলেকে আমোল দেয় নাই, সেই শাশ্বতী মুগ্ধ হইবে গ্রাম্য একটি লোককে দেখিয়া?

শাশ্বতী পাশের কৌচটার উপর বসিয়া পড়িল, সে করিতেছে কি—কেউ যদি শুনে, তাহার মুখ দেখাইবার পথ

একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, ছিঃ, সে নিজেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে —লোকে শুনিলে হাসিবে না কি?

চন্দনা; শীলা, রেবা, জয়ন্তী ইত্যাদি মেয়েরা—অর্থাৎ যাহারা তাহার নিকটে থাকিয়াও তাহার গম্ভীর স্বভাবের জন্য বন্ধুত্ব করিতে সাহস করে নাই, দূরে থাকিয়া অগোচরে তাহার সমালোচনা করিয়াছে, আজ তাহারাই পরম স্ফূর্তিতে টিট্‌কারী দিবে যে!

বাস্তবিকই এ মেয়ের চরিত্র বড় অদ্ভুত ছিল, তাহার মাতা এ পর্যন্ত মেয়েকে বুঝিতে পারেন নাই। পিতা এ মেয়েকে লইয়া কোনদিন মাথা ঘামান নাই, কাজেই তাঁহার কথা একেবারে স্বতন্ত্র।

ছোটবেলা হইতেই সে অত্যন্ত গম্ভীর, ভীষণ একজেদি,—একবার যাহাতে সে না বলে, তাহাতে আর কেউ হাঁ করাইতে পারে না। জীবনে সে কাহাকেও বন্ধুপদে বরণ করে নাই, নিজের মনে একাই পথ বাহিয়া চলিয়াছে।

সেই শাশ্বতী, সে যদি আজ সুমন্তের প্রতি অনুরক্ত হয়,—

ঠিক—

বিতৃষ্ণায় শাশ্বতীর সমস্ত মনটাই এই সকালবেলায় তিক্ত হইয়া উঠিল।

চোখে মুখে জল দিয়া আসিতেই মাসীমা তাড়াতাড়ি চা আনিয়া দিলেন। গম্ভীর মুখে চা পান করিয়া শাশ্বতী নীচে নামিয়া গেল। মোটরখানা চলার পক্ষে উপযুক্ত আছে কি না পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে সে যখন ফিরিতেছিল, তখন সামনে পড়িল ব্রজসুন্দর।

একটা মস্ত বড় মাছ লইয়া সে প্রবেশ করিতেছিল, শাশ্বতীকে দেখিয়াই দাঁত বাহির করিল, "এই দেখ শাশ্বতী কত বড় মাছটা আজ সকালেই পাওয়া গেল। কাল সারারাত খুব বৃষ্টি হয়েছে কি না, সকালেই জেলেরা অনেক মাছ পেয়েছে। যাই বল, তোমাদের কলকাতায় এমন জলজ্যান্ত মাছ পাওয়া যায় না—দেখ একবার, এখনও ধড়ফড় করে নড়ছে।"

শাশ্বতী কেবলমাত্র বলিল, "হ্যাঁ, খুব টাটকা—একেবারে জীবন্ত—"

সে ফিরিয়া চলিল—আর বেচারা ব্রজসুন্দর অত্যন্ত ক্ষুন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন মাছটা দেখাইয়া শাশ্বতীর নিকট হইতে বাহাদুরী লইবে, সে কি ভাবে—কত কষ্ট করিয়া জেলেপাড়ায় ঘুরিয়া এটি সংগ্রহ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত একটি গল্প সে যে তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেল।

থাকমণি তখন ভাতের ফেন ঝরাইতে দিয়াছিলেন। অন্যদিনে এতক্ষণে তিনি বাকি গৃহকর্ম সারিতেন, পরশ্ব রাত্রে শাশ্বতী আসার পর তাঁহার কর্মপটুতা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেছে। কাল এবং আজ দুইদিনই তিনি অন্ধকার থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম সারিয়া লইয়াছেন, ছয়টার সময় তাঁহার রন্ধন চাপিয়াছে, নয়টার মধ্যে দুই উনান জ্বালিয়া তিনি সকল রন্ধন সারিয়া দশটার মধ্যে শাশ্বতীকে ভাত দিয়েছেন।

শাশ্বতী প্রবল আপত্তি তুলিয়াছে—সে বাড়িতে বেলা বারোটার সময় ভাত খায়, এখানে এত সকাল সকাল খাওয়া তাহার বরদাস্ত হইবে না।

মাসীমা মিষ্টকথায় বুঝাইয়াছেন—কলিকাতায় যত খুসি অনিয়ম অত্যাচার চলে, এ সব গ্রামে সে সব চলিবে না। এখানে ঠিক নিয়ম মত থাকিতে হইবে, ঠিক সময়ে আহারাদি করিতে হইবে, নচেৎ অসুখ হইবার সম্ভাবনা।

শাশ্বতী দরজার উপর দাঁড়াইয়া কোন ভূমিকা না করিয়া একেবারেই বলিয়া বসিল, "আমি আজই কল্‌কাতায় ফিরব মাসীমা—"

"আজই—"

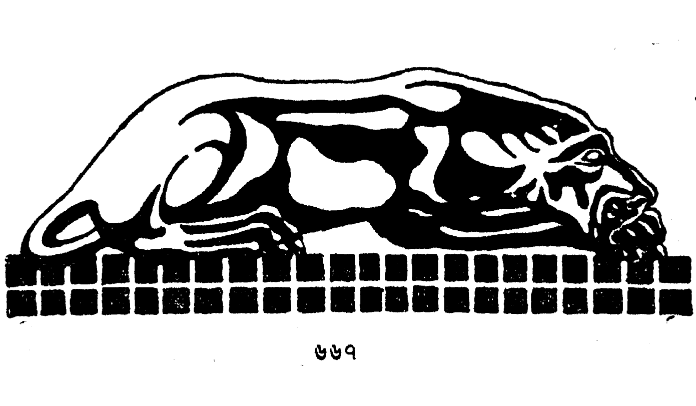
থাকমণির হাত হইতে খুন্তিখানা পড়িয়া গেল, বিস্মিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সে কি কথা মা? এসেছো যখন মাসীর কাছে পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে, দুদিন থাকো, সব দেখো শোন, তারপরে যেয়ো। এই তো এসেছো, আর যে কোনদিন আসবে, সে আশা তো নেই।"

শাশ্বতী প্রবলবেগে মাথা নাড়িল—"না, বাবা—তোমার পাড়াগাঁ দেখে আর আমার একটি দিন থাকার ইচ্ছে নেই মাসীমা। আর বেশীদিন থেকেই বা কি লাভ হবে—যা দেখবার তা তো দেখা হয়ে গেছে, নতুন তো আর কিছু নেই।"

নিত্য নূতনের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, দুদিনেই সব কিছু তাহার নিকট পুরাতন হইয়া যায়, আবার সে নূতন কিছুর প্রত্যাশায় অনির্দেশের পথে ছুটে।

পল্লীতে আসার নেশা তাহার ছুটিয়াছে, এখন ফিরিয়া যাইবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। যাওয়ার কথা ঠিক করিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে উপরে উঠিয়া গেল।

ক্রমশঃ



পাকিস্থান বিচার

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

পাকিস্থানের সমর্থকগণ প্রায় অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, এতৎসম্পর্কে সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত না হইয়াই ইহার বিরোধিগণ ইহাকে নিন্দা করেন এবং সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। পাকিস্থানের সমালোচকগণও ঠিক পাল্টা অভিযোগ করিয়া বলিতে পারেন যে, ইহার সমর্থকগণ এতৎসম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেরাই বিষয়টাকে ভাল করিয়া বুঝেন না, অথচ দেশবাসীকে উহা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন না। এবং এই লইয়া দেশময় অনর্থক একটা হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের এই অভিযোগের কোন সদুত্তর দিতে পারিবেন না। যাঁহারা পাকিস্থানের সমালোচনা করেন এবং অগ্রাহ্য করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারা পাকিস্থানপন্থীদের অস্পষ্ট, পরস্পর-বিরোধী ও হেঁয়ালীপূর্ণ আদর্শ হইতেই মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। ইহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া তবেই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বাধা দিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে বাধা দেন না। পাকিস্থান সম্পর্কে এতাবৎ কেহই কোন পরিষ্কার স্পষ্ট, অর্থবিহীন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যেসব স্কীম বা পরিকল্পনা আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাহার কতকগুলি পরস্পর বিরোধী, কতকগুলি স্ববিরোধী ও কতকগুলি অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। প্রথমেই মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের কথা ধরা যাক। ইহাতে পাকিস্থান কথাটার উল্লেখ নাই। ইহার ভাষা এরূপ কৌশলপূর্ণ দ্বিঅর্থসূচক ও অস্পষ্ট যে ইহাকে যে-কোন অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির পুনর্গঠন, কেন্দ্রীয় শাসনের স্বরূপ ও আকার, এক কেন্দ্রিক শাসন, বহু কেন্দ্রিক শাসন ও ভারত ব্যবচ্ছেদ—এই সবের যেটা সুবিধাজনক ও সম্ভবপর সেটাই লাহোর প্রস্তাব হইতে বাহির করা যাইতে পারে। তারপর উল্লেখ করা যাইতে পারে ডাঃ লতিফের স্কীম। এই স্কীমে সমগ্র ভারতকে সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ডাঃ লতিফ সমগ্র ভারতবর্ষকে চারিটি মুসলিম সাংস্কৃতিক অঞ্চল ও এগারটি হিন্দু সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে চান। ইহার পর আছে জনৈক "পাঞ্জাবী" ভদ্রলোকের "কনফেডারেসী স্কীম"। এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উক্ত স্কীম দ্বারা একটা আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইসলামী নীতিতে বিশ্ববিপ্লব ঘটাইতে চান। আর একটা স্কীম আছে তাহা "আলিগড় স্কীম" নামে পরিচিত। আলিগড়ের দুইজন অধ্যাপক এই স্কীমের রচয়িতা। ইঁহারাও নিজেদের খেয়াল ও মর্জি মত ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিতে চান। এই সব স্কীমের মধ্যে একটা বিষয়ে ঐক্য আছে, তাহা এই যে, ইংরেজের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য নানা বিষয়ে বহু অসামঞ্জস্য আছে। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ একটা স্কীম রচনা করিয়াছেন। তাহা উপরোক্ত স্কীম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। এইত গেল স্কীমের কথা। ইহা ব্যতীত পাকিস্থানের সমর্থনকারী নেতারা নিজেদের মত ও ধারণা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের কেহ চান অধিবাসী বিনিময়, কেহ চান অমুসলমানকে বিতাড়িত করিতে, কেহ চান বহির্ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে। জিন্না সাহেব অত ঘুরপ্যাঁচের দিকে না গিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি চান ভারতের এক-তৃতীয়াংশ, আর বাকী দ্বিতীয়াংশ তিনি সহাস্যবদনে হিন্দুদের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। আহা, কি তাঁহার দয়ার শরীর। তিনি তাঁহার নিজের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে কোনরূপ অধিবাসী বিনিময় করিতে চাহেন না। তাঁহার অংশের মাইনরিটিগণকে তিনি নিরাপত্তার পূর্ণ প্রতি-শ্রুতি দিয়া ফেলিয়াছেন!

এতগুলি স্কীমের মধ্যে কোন্‌টাকে মুসলিম ভারত শেষ পর্যন্ত ধরিয়া রাখিবে? বিভিন্ন মুসলমানের স্কীমকে না হয় মুসলমানগণ পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা বাছিয়া লইবে। কিন্তু অ-মুসলমানগণ, বিশেষত হিন্দুগণ কি করিবে? তাহারা কোন্‌টাকে গ্রহণ করিবে, আর কোন্‌টাকে বর্জন করিবে? তথাকথিত মুসলিম নেতাদেরকে বলি, তোমরাই আগে একটা সর্ববাদীসম্মত স্কীম উপস্থিত কর। তবেই ত তাহা অপরকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবে। তাহা না করিয়া পরস্পর বিরোধী, অস্পষ্ট কথা বলিয়া দেশের জনসাধারণকে মিথ্যা তর্ক বিতর্কের গোলকধাঁধায় ফেলিয়া হৈ চৈ করিয়া কি লাভ? সর্বাগ্রে চাই সকল শ্রেণীর মুসলমানের সম্মতিক্রমে একটা পরিপূর্ণ স্কীম। এই যে পাকিস্থানের দাবী করা হইয়াছে, ইহা কাহার দাবী? ভারতের কোন্ মুসলমান ইহা চাহে, আর কোন্ মুসলমান ইহা চাহে না সে হিসাব চাহিতে আমরা অধিকারী। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমান সমাজের অন্য কোন রাজনৈতিক দল পাকিস্থান চাহে না। তাহারা সমস্ত শক্তি দিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। এই সেদিন আজাদ মুসলিম কনফারেন্স কঠোর ভাষায় পাকিস্থানের নিন্দা করিয়াছে। আহ্‌রার দল, শিয়া দল, জমিয়তে-উলেমা দল, বাঙলার কৃষক-প্রজা দল এবং মোমেন দল—ইহারা কেহই পাকিস্থান স্কীম সমর্থন করে না। একটা দলের দাবীকে সমগ্র মুসলমানের দাবী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে—আর তদনুসারে কাজ করিতে হইবে—ইহা যেন কতকটা মামার বাড়ীর আব্দারের মত; নিছক গায়ের জোরের কথা। এখানে যুক্তির কোন বালাই নাই। তাহা হইলে দেখা গেল (১) পাকিস্থান সম্পর্কে লীগওয়ালাদের কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। এবং (২) ভারতের সমগ্র মুসলমান এ বিষয়ে একমত নহে। সুতরাং এই দাবীকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবার কোন কারণ নাই।

তারপর যদি স্বীকার করিয়া লই যে, পাকিস্থান ভারতের মুসলমান সমাজের সর্ববাদিসম্মত দাবী, তাহা হইলেও অমুসলমানের মতামতটাও ত লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহাকে যদি ভারতের অমুসলমান উপাদানগুলি স্বীকার না করে, তাহারা যদি ইহার বিরোধিতা করে, তবে কেমন করিয়া ইহা শাসনবিধিতে স্থান পাইবে? নিছক স্বার্থবুদ্ধি হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা যদি অপরের স্বার্থে আঘাত করে, তবে কেন সে তাহা গ্রহণ করিবে? কোটি কোটি মুসলমান লীগ-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও দাবী করা হয় যে, মুসলিম লীগই সমগ্র মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সেইরূপ কোটি কোটি হিন্দু পাকিস্থানের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বলা হয় যে, যেহেতু ডাঃ আম্বেদকর ও মিঃ এম এন রায় ইহার সমর্থনে দুএকটা কথা বলিয়াছেন, সেই হেতু ইহাতে হিন্দু সমাজেরও সম্মতি আছে; ইহা যুক্তির কথা নয়, গায়ের জোরের কথা। মুসলমান সমাজ চাহিলেই ত পাকিস্থান হইবে না। ইহাতে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। তদভাবে পাকিস্থান কার্যে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হিন্দু মহাসভা, মডারেট পার্টি, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান প্রভৃতি দল ভারতের ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাস করে। কোন প্রকার রাজনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে ইহারা এই ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইতে দিবে না। তারপর আছে কংগ্রেস। কংগ্রেস ভারতের ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাসী, সুতরাং সহজে পাকিস্থানে সম্মতি দিবে না। এই সব সম্প্রদায় ও দলের সহযোগিতা ব্যতীত কেমন করিয়া পাকিস্থান পরিকল্পনা বাস্তব রূপ ধারণ করিবে? ইহাদের সম্মতি পাইতে হইলে ইহার দাবীকে বিভিন্ন রূপ দিতে হইবে। সকল দলের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদেরকে লইয়া বিষয়টি

আলোচনা করিতে হইবে। আলোচনা, বাদ-প্রতিবাদ ও কাটছাঁটের পর যাহা দাঁড়াইবে তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে কেবল একটিমাত্র দলের আব্দার রক্ষা করিবার জন্য পাকিস্থান স্কীম কার্যে পরিণত হইবে না। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ বাধাইবার জন্যই এই পরিকল্পনার উৎপত্তি। কোন সদুদ্দেশ্য থাকিলে লীগওয়ালারা এমন স্কীম রচনা করিতেন যাহা গ্রহণ করিতে কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ আপত্তি থাকিত না, আর থাকিলেও শেষ পর্যন্ত টিকিত না।

পাকিস্থানওয়ালারা যেসব বিষয়কে ভিত্তি করিয়া এই দাবী তুলিয়াছেন এইবার সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। সম্প্রতি মৌলবী হবিবুল্লাহ সাহেব "পাকিস্থান" নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আর একখানা পুস্তক বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই পুস্তকে প্রতিপাদ্য বিষয় একই ধরণের।—আমি মোঃ হবিবুল্লাহ সাহেবের পুস্তকখানি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে লেখক বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে,—

(১) ভারতে কখনও এক জাতি ছিল না এবং কখনও এক জাতি হইবে না।

(২) ভারতে ইউরোপীয় গণতন্ত্র চলিতে পারে না।

(৩) হিন্দু মুসলিম ঐক্য হেঁয়ালী মাত্র; ইহা কখনও ছিল না এবং হইবে না। সুতরাং তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে দেশে শান্তি হইবে না।

(৪) হিন্দুরা ভারতে মুসলিম প্রভুত্ব নষ্ট করিয়াছে—ভবিষ্যতেও তাহাই করিবে।

(৫) সম্মিলিত ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনে হিন্দু প্রাধান্য হইবে, মুসলমান তাহা বরদাস্ত করিবে না; কারণ তাহা হইলে ম্যাজরিটি হিন্দুগণ মাইনরিটি মুসলমানকে পীড়ন করিবে।

(৬) সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের বহু চেষ্টা হইয়াছে—পাকিস্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান।

(৭) ভারতের মাইনরিটি সমস্যা অন্য দেশের মত নহে। কেবল রক্ষাকবচ দ্বারা ইহার সমাধান হইবে না।

অতএব 'পাকিস্থান' ও 'হিন্দুস্থান' প্রতিষ্ঠাই ভারতের মাইনরিটি সমস্যার একমাত্র সমাধান।

এখন এই প্রশ্নগুলি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব, ইহাদের মধ্যে কোন সারবত্তা আছে কি না।

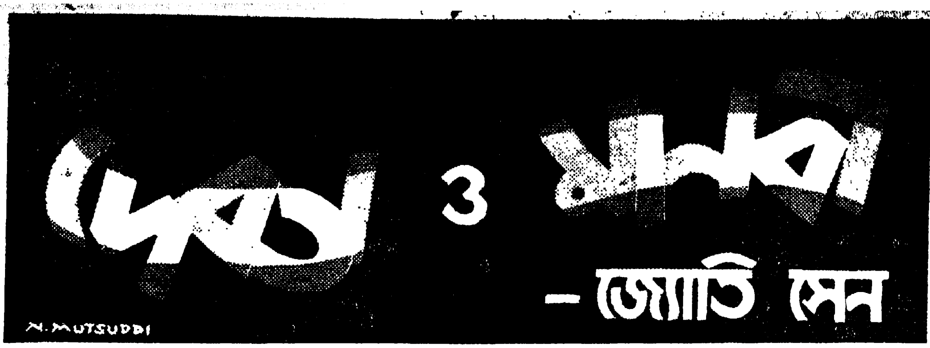
(১) জাতীয়তাবিরোধী প্রত্যেক দল ও উপদল এই কথা প্রায় বলিয়া থাকেন যে, ভারতে কখনও জাতীয়তা ছিল না। ব্রিটিশ সরকার আমাদের মধ্যে যেসব বিভেদ ও বিবাদ আছে তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে চান বলিয়া তাঁহারাও এই কথা সমর্থন করেন। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয়তাবিরোধিগণ প্রায় একই ধরণের মত পোষণ করেন। অতীতে ভারতে কোনওরূপ জাতীয়তা ছিল না—ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, এখানে কখনই এক জাতীয়তা গঠিত হইবে না। অতীতে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, ভবিষ্যতে কেন তাহা হইবে না? বহু যুগ পূর্বে পৃথিবীর খুব অল্প দেশেই জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল। সে যুগে এক দেশের লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর দলে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কোথাও ধর্মতন্ত্র প্রবল ছিল, কোথাও একটা বিশেষ শ্রেণী প্রবল ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহারা এক হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। রাজনীতির আদর্শ সকল সময় ক্রমবিকাশের পথে নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। ফলে এক যুগে যাহা থাকে না, পরবর্তী যুগে তাহা উৎপন্ন হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের কোথাও জাতীয়তা ছিল না। কিন্তু পরে নানা আদর্শের সংঘাতে সেখানে জাতীয়তা গঠিত হয়। ধর্মতন্ত্রই ছিল মধ্যযুগের প্রধান আদর্শ। তখন ইউরোপের রাজন্যবর্গ প্রজাদের ধর্ম নির্ধারণ করিতেন। অপুত্রক অবস্থায় রাজার মৃত্যু হইলে বিদেশ হইতে তাঁহার কন্যা, মাসী-পিসীর বংশের কাহাকেও আনিয়া রাজপাটে প্রতিষ্ঠিত করা হইত। কিন্তু এই ইউরোপেও ধীরে ধীরে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিল। "ওয়েস্ট ফেলিয়ার" সন্ধি এই পথ পরিষ্কার করিয়া দিল, তার পর আসিল ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লব পরিপূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহা হইলে দেখা গেল যে, ইউরোপের জাতীয়তার বয়স মাত্র দেড়শত বৎসর, কি তাহার কিছু ঊর্ধ্ব। এই জাতীয়তা পরে উগ্র মূর্তি ধারণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদ হইতে ধনতন্ত্রবাদ জন্মগ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের মোড় ফিরিয়া গেল। সমাজতন্ত্র মতবাদ আসিয়া পূর্বের সমস্ত রাজনীতিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে লাগিল। আজ জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তর্জাতীয়তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে এক-জাতীয়তা ছিল না। স্পার্টা, এথেন্স, করিন্থ, থিবস্ প্রভৃতি নগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া থাকিত। কিন্তু কালক্রমে সেখানে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা ছিল না, পরে তাহা হইতে পারে না, ইহা ইতিহাসের শিক্ষা নহে। ভারতের ইতিহাস অন্য দেশের ইতিহাস হইতে পৃথক নহে। অনার্য যুগ, আর্য যুগ, পাঠান যুগ, মোগল যুগ—এইভাবে কত যুগের কত প্রবাহ ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ইহারা ভারতের রাজনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কত আদর্শের সংঘাতে ভারতে রাজনৈতিক আদর্শ কত রূপে বিকশিত হইয়াছে। ইংলন্ড না আসিলে ভারতের রাজনীতি ক্রমবিবর্তনের স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হইত এবং নবযুগের যে প্রভাব জাপানকে এক-জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, ভারতকেও তাহাই করিত। যুগের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ এক-জাতিতে পরিণত হইত। ইংরেজদের আগমনের ফলেই যে ভারতে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সমগ্র জগতের উপর দিয়া একটা বিশ্ব-বিপ্লবের ধারা বহিয়া গিয়াছে। এই বিপ্লবের একটা আন্তর্জাতিক দিক ছিল। তাহাই ভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনিয়াছে। ব্রিটিশবিহীন ভারতেও রেল, মটর কলকারখানার মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তরঙ্গ আসিয়া লাগিত। ব্রিটেন আমাদের একটা মহাউপকার করিয়াছে, তাহা এই যে, পরাধীনতার একটা সাধারণ অনুভূতি, একটা বেদনা-বোধ আমাদিগকে অহরহ পীড়া দিতেছে। এই সাধারণ অনুভূতি আমাদের মধ্যে এক-জাতীয়তার অনুপ্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছে। সকলকে এক হইবার দিকে লইয়া যাইতেছে। তাই আজ ভারতবাসী শত বৈষম্যের মধ্যেও একথা বলিতে গর্ব অনুভব করিতেছে যে, তাহারা ভারতবাসী। স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত তাহাদের এই ঐক্যবোধ ও অনুভূতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের বাহিরে যাইলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের এই ঐক্যবোধ কত আন্তরিক ও কত সত্য। আজ বিদেশী শাসনের প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে একই নিয়মের অধীনঃ যথা—পরাধীনতা দূর করা, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ, রাজনৈতিক মুক্তি। এইগুলি পাইতে হইলে সকল সম্প্রদায়কে এক হইতে হইবে। এই বোধ ভারতবাসীর প্রত্যেকের হইয়াছে। বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমর দেশের অনৈক্য ও পার্থক্যের কু-ফল চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। মধ্যযুগে পাঠান ও মোগল আমলে যে ঐক্যভাব আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই, অথবা যাহা প্রয়োজন হয় নাই, আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে, প্রয়োজনও হইয়াছে। সুতরাং ধর্মের পার্থক্য ক্রমেই অপ্রধান বিষয় হইয়া পড়িতেছে। রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবাসীরা এক জাতি—একই তাদের আদর্শ ও একই তাদের পথ—এই মনোভাব সর্বত্র জাগিয়া উঠিতেছে। পরে এই মনোভাব আরও দৃঢ় হইবে। সাময়িক প্রয়োজনবশত যদি আমরা আজ "পাকিস্থান" পাইয়াও থাকি, তথাপি এই এক-জাতীয়তার মনোভাব দূর হইবে না। তখন

আমরা আবার সব ভাগ-বাঁটোয়ারাকে পাল্টাইয়া দিয়া এক-জাতীয়তার আদর্শেই ভারতে রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিব।

(২) যাহা গণতন্ত্র, তাহা চিরকালই গণতন্ত্র ও সর্বস্থলেই গণতন্ত্র। ভারতেই কি, আর ইউরোপেই কি। গণতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকল স্থলেই এক ও অভিন্ন—স্বৈরাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করা। জনসাধারণের নির্বাচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য দেশ-শাসন—ইহাই হইতেছে গণতন্ত্রের আদর্শ। ইহা যদি ইউরোপে চলে, তবে ভারতে কেন চলিবে না? গণতন্ত্রে মাইনরিটিদের জন্য রক্ষা-কবচের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে সেই ব্যবস্থাকে আরও উদার ও কার্যকরী করাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মাইনরিটি স্বার্থের নামে একেবারেই গণতন্ত্রকে বাতিল করিয়া দিলে যে কাহারও কোন কল্যাণ হইবে না। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে যে, ভারতবর্ষে যদি গণতন্ত্র না চলে, তবে কি চলিবে? কোন্ ধরণের শাসনতন্ত্র এখানে চালু করিতে চাও? রাজতন্ত্র? স্বৈরাচার তন্ত্র? অথবা এক-নায়কত্ব! (dictatorship)? রাজতন্ত্র যদি হয়, তবে কে রাজা হইবে, আর কেই-বা তাঁহাকে নির্বাচন করিবে। গণতন্ত্র অপেক্ষা কি স্বৈরাচার তন্ত্র ও এক-নায়কত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়? তাছাড়া এই তিনটাতেই কিছু না কিছু নির্বাচন পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হইবে। আর নির্বাচন হইলেই ত গণতন্ত্রের প্রয়োজন। লীগপন্থীরা কি ইহাই চান যে, ইংরেজ এদেশের এক-একটি রাষ্ট্রে রাজা মনোনীত করিয়া দিবেন, আর আমরা তাঁহাকে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইব। তার পর প্রশ্ন এই যে, ভারত-ব্যবচ্ছেদ হইয়া গেলে মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দু প্রজাগণ নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার পাইবে কি না! এবং হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমান প্রজাগণ তদনুরূপ ভোটাধিকার পাইবে কি না? ভোটাধিকার যদি পায়, তবে ত সেই মাইনরিটি সমস্যা আবার দেখা দিবে। যে মূল সমস্যার সমাধানের জন্য পাকিস্থান দাবী করা হয়, তাঁহার কোন কুলকিনারা হইবে না। এই সব প্রশ্ন গভীরভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, দোষ গণতন্ত্রের নহে, দোষ হইতেছে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির। আমাদের বিশ্বাস, ভারতে পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র গণতন্ত্র সুন্দরভাবে চলিবে, কোথাও কোনওরূপ বিপর্যয় ঘটিবে না। জনসাধারণের ভোটাধিকার যতই বাড়িবে, গণতন্ত্র ততই বিকাশ লাভ করিবে। আমাদের একদল ইসলাম প্রচারক গর্বের সহিত ঘোষণা করেন যে, ইসলাম গণতন্ত্রের ধর্ম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, সেই গণতান্ত্রিক ধর্মের অনুবর্তিগণ গণতন্ত্রকে সবচেয়ে ভয় করেন, ইহা যেন তেরশত বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইসলামকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে। আমরা কি তবে ইহাই বুঝিব যে, মুসলমান ও অ-মুসলমান একত্র মিলিত হইয়া গণতন্ত্র চালাইতে পারিবে না? ইহাই কি ইসলামের বিধান? তাহাই যদি হয়, তবে কোন মুসলিম রাষ্ট্র দিনেকের তরে টিকিতে পারিবে না। এই মনোভাবের জন্য বিরাট তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতে রাজত্ব করিয়াও মুসলমানগণ আজ দাসানুদাস হইয়া রহিয়াছে কোন্ অপরাধে? অপরাধ এই যে, ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ গণতান্ত্রিক নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। হিন্দুদেরকে লইয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিলে ভারতবর্ষ কোনও দিন পরাধীন হইত না। পাঠান অথবা মোগলদের কেহ হয়ত রাজপাটে বসিত। কিন্তু ইংলণ্ডের মত এমন একটা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইত, যাহা কোনও প্রকার বিদেশী আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হইত না। নবাবী আমলে মুসলমানগণ ছিল প্রভু, আর হিন্দুরা ছিল দাস। দাসগণ যদি স্বাধীনতার জন্য প্রভুদের বিরুদ্ধে কিছু করিয়াই থাকে, তবে তাহা ত নিন্দনীয় নহে। পরিকল্পিত পাকিস্থানে হিন্দুদেরকে ত সেই অবস্থায় থাকিতে হইবে। তখন এ তাসের ঘর কয়দিন টিকিবে? অতীতের কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। বর্তমানে এদেশে গণতন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই চলিবে না। অবাধ যুক্ত-নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভাগু[লি] গঠিত হইলে প্রথম প্রথম হয়ত কাহার কাহার কিছু অসুবিধা হইবে কিন্তু দু'চারবার সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেলেই সব ঠিক হই[য়া] যাইবে। ইংলণ্ডে রিফর্ম-এ্যাক্টের পূর্বে সত্যিকারের গণতন্ত্র ছি[ল] না। কিন্তু উক্ত আইনের পর ধীরে ধীরে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করি[য়া] করিতে আজ বহু পরিমাণে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতেও তাহ[াই] হইবে। ভয়ের কোন কারণ নাই। পাকিস্থান হইতে গণতন্ত্রকে ব[াদ] দেওয়া যাইবে না। তখন সম্মিলিত ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধী[নে] থাকিতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।

(৩।৪)। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে আমরা বাস্তব স[ত্য] বলিয়া বিশ্বাস করি। অল্পবিস্তর ঝগড়া-বিবাদ পূর্বে ছিল, এখন[ও] আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সেইরূপ ঐক্য ও সৌহৃদ্য পূর্বে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। হিন্দু-মুসলম[ান] ঐক্যের বাস্তব উদাহরণ—পাকিস্থানপন্থীদেরকে তাঁহাদের নিজেদে[র] গ্রামেই দেখিতে অনুরোধ করি। সেখানে দেখা যাইবে একই পল্লী[তে] পাশাপাশি দুই সম্প্রদায় ভায়ের মত যুগ যুগ হইতে বাস করি[য়া] আসিতেছে। সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রচারকার্যের ফলে কোথা[ও] কোথাও সে আদর্শ পদদলিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অধিক কা[ল] স্থায়ী হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুদ্রমূর্তি ধরিয়া যে অঞ্চলকে [বি]ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, কিছুদিন পরেই সে অঞ্চলে আবার শান্তি বিরা[জ] করে। যেন কিছুই হয় নাই, এইরূপভাবে হিন্দু-মুসলমান আবা[র] ভায়ের মতই একই সঙ্গে বসবাস করিতে থাকে। ভিতরের মর্মমূলে ঐক্যভাব না থাকিলে এরূপ ঘটনা কখনই সম্ভব হইত না। ভারতে গীত বাদ্য ও গো-বধের দাবী হইতে যে সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে, তাহ[া] সিয়া ও সুন্নি, শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং হানাফি ও ওহাবী সমস্যারই মত একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। ইহা অসমাধ্য নহে, অকল্পনীয়ও নহে। পুলিশ, গুপ্তচর ও ভাগ্যান্বেষী চতুর রাজনৈতিকদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া বহু গ্রামের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী পরস্পরের সহিত মামা, চাচা, পিসী, মাসী সম্বন্ধ পাতাইয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া পরম শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। 'তাহারা পৃথক ও তাহাদিগকে পৃথক ব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে হইবে'—এই আদর্শ তাহারা মানিতে সম্মত হইবে না। তাহারা একথা শুনিতে সম্মত হইবে না যে, তাহাদের এই ঐক্য আসল নহে, একেবারেই মেকী বস্তু। আজিকার এই অনৈক্য ও দলাদলিটাই সাময়িক ব্যাপার গুপ্ত অভিসন্ধির প্রয়োজনে ইহা হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে অভিসন্ধির প্রয়োজন শেষ হইলে এই অনৈক্য ও দলাদলিও শেষ হইয়া যাইবে। শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রভাবে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, কখন কখন ইহা পল্লীগ্রামেও সংক্রামিত হইয়া পড়ে। ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, ঘোরতর দাঙ্গার মধ্যে মুসলমানকে হিন্দু রক্ষা করে এবং হিন্দুকে মুসলমান রক্ষা করে! পল্লীগ্রামে বৈষয়িক ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের এবং মুসলমান হিন্দুর বিপদে সাহায্য করে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে হিন্দু সহধর্মী[র] বিরুদ্ধে একজন মুসলমানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে। মুসলমানও ঠিক সেইরূপ হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্য অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে যাইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। সমবেদনা বোধ, সমস্বার্থ রক্ষার অনুভূতি ও একই দেশে বাস করিবার অভ্যাস হিন্দু মুসলমানকে বহু যুগ পূর্ব হইতে এক জাতিতে পরিণত করিয়াছে। আর চিরকালই তাহারা এক হইয়া থাকিবে—ইহাই ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের শাশ্বত শিক্ষা। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন হইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের শান্তির জন্য নয়, মঙ্গলের জন্যও নয়। তাছাড়া পাকিস্থানের অধিকাংশ পরিকল্পনা অধিবাসী বিনিময় চাহে না। তবে ত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রে যদি মুসলমান থাকিয়া যায়

(শেষাংশ ৬৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



১৭

দুর্ঘটনার ফলে একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়া পদ্মা দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। উত্তেজিত জনতার ছুটাছুটি ও চীৎকারে তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকগুলি বোধ করি তাহাকেই আক্রমণ করিবে। ভয়ে জড়সড় হইয়া পদ্মা এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় হাজিরাবাবু আসিয়া বিনীতভাবে তাহাকে ঘরে গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলে সে ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিল।

হাজিরাবাবু হয়ত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত নয় মনে করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে যাইতে দেখিয়া পদ্মা রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় যাচ্ছেন ?'

প্রশ্নের সুরে আর দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন একটা ভর্ৎসনা প্রকাশ পাইল যে, হাজিরাবাবু সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না।

হাজিরাবাবু কিছু বলিবার পূর্বেই পদ্মা পুনরায় কহিল—'যাবেন না, আমার ভয় করছে।'

হাজিরাবাবু নিজেও ভয় পাইয়াছিল। কি জানি,—একটা দাঙ্গা বাধে বুঝি! কম্পিত কণ্ঠে সে পদ্মাকে সাহস দিয়া বলিল—'আজ্ঞে না। ভয়ের কিছু নেই।'—এই বলিয়া সে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

পদ্মাকে জয়ন্ত এই গোলমালের মধ্যে লইয়া আসায় পদ্মা জয়ন্তের উপর রাগে আগুন হইয়া উঠিল। জয়ন্তকে কাছে না পাইয়া তাহার রাগটা অপাত্রে পড়িল। হাজিরাবাবুই যেন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, রাগটা পড়িল তাহার উপর।

পদ্মা রূঢ় কণ্ঠে হাজিরাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—'লোকগুলো মোষের মত ছুটেছে কেন ?'

হাজিরাবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—'কি জানি! তা'ত বলতে পারিনে! তিন তিনটে লোক ওপর থেকে পড়ে জখম হ'য়েছে—তাই হয়ত ক্ষেপে গেছে।'

পদ্মার কান্না পাইল। জয়ন্ত তাহাকে ফেলিয়া কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। ফিরিবার আর নাম নাই। একা থাকিলে পদ্মা হয়ত কাঁদিয়াই ফেলিত।

অধৈর্য হইয়া পদ্মা হাজিরাবাবুকে বলিল—'যান ত' আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন—উনি কি করছেন ?'

হাজিরাবাবু এক পা বাড়াইয়া তিন পা পিছাইল। জিজ্ঞাসা করিল—'যাব ?'

'আমি আপনাকে কি করতে বলেছি ?'—বলিয়া পদ্মা কটমট করিয়া হাজিরাবাবুর দিকে তাকাইল।

হাজিরাবাবুর অবস্থাটা হইল—জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বলিল—'আপনি যে একটু আগেই যেতে মানা করলেন।'

পদ্মা ধমক দিয়া বলিল—'আপনি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন !'

'আজ্ঞে না'—বলিয়া হতভম্ব হাজিরাবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

এমন সময় প্রশান্ত আসিল।

প্রশান্তকে দেখিয়া পদ্মা যেন প্রকৃতিস্থ হইল। শান্ত ও সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'উনি কোথায় ?'

প্রশান্ত কহিল—'উনি ত হাসপাতালে চলে গেছেন ওদের নিয়ে !'

—'হাসপাতালে চলে গেছেন ? কখন ?'

—'এই কিছুক্ষণ আগে।'

পদ্মাকে না বলিয়া জয়ন্ত চলিয়া যাওয়ায় পদ্মার মনে হইল সে গরীবের মেয়ে বলিয়াই তাহাকে তুচ্ছ পদার্থের মত যেখানে সেখানে ফেলিয়া যাইতে পারে। ক্রোধে ও ক্ষোভে তাহার মুখ আরক্ত ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল—'আমি কি করে' বাড়ী যাব !'

প্রশান্ত কহিল—'আমাকে বলে গেছেন পৌঁছে দিয়ে যেতে।'

'ও! বলে গেছেন? চলুন তা' হলে !'—বলিয়া পদ্মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রশান্ত ও পদ্মা হাঁটিতে হাঁটিতে বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাস্ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সিও পথে নাই। দুই একখানা রিক্সা ঠংঠং ঠংঠং শব্দে চলিয়াছে।

বাধ্য হইয়া তাহারা রিক্সায় উঠিল।

যাইতে হইবে অনেক দূর। রিক্সা যে কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছিবে কোন ঠিক নাই। একটা মানুষ দুইজনকে লইয়া কত দ্রুতই বা ছুটিতে পারে! রিক্সা চলিয়াছে ত চলিয়াছে। পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না।

প্রশান্ত ও পদ্মা যে যার ভাবনায় ডুবিয়াছিল। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা বলিল না। কিন্তু এই নীরবতা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল।

রাত্রির নির্জন পথ এমনিই দীর্ঘ মনে হয়, তার উপর রিক্সার মন্থরতায় যেন দীর্ঘতর মনে হইতেছে।

পদ্মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রশান্তকে

জিজ্ঞাসা করিল—'বাড়ি পেঁাছতে আর কত দেরী হবে!'

প্রশান্ত কহিল—'ঘণ্টাখানেক কি তার কিছু বেশী দেরীও হ'তে পারে।'

—'আচ্ছা, আপনিই বলুন ত' আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবারই বা অর্থ কি, আর এই কষ্টটা দেবারই বা কি দরকার ছিল!'

—'একটা accident হ'য়ে গেল কিনা—তা' না হ'লে এসব কিছুই হত না।'

পদ্মা বলিল—'আজই না-হয় অ্যাক্সিডেণ্ট হ'য়েছে। কিন্তু আজ ছাড়াও অনেক দিন অনেক দুর্ভোগ ভুগেছি। শুনবেন সেসব?'

জয়ন্ত সম্বন্ধে পদ্মার অভিযোগ শুনিতে প্রশান্ত ইচ্ছুক ছিল না এবং উৎসাহও দেখাইল না।

পদ্মা তথাপি বলিল—'কোথায় কুলীবস্তি, কোথায় বা কারখানা,—দিনে দুপুরে রাতে বিরাতে আমাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে'। নিজে খুব হাঁটতে পারেন—আমাকেও দু'চার ক্রোশ রোজ হাঁটাবেন। যাঁর এত টাকা—তিনি একখানা গাড়ি রাখতে পারেন না?'

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল—'ইচ্ছে করলে উনি পাঁচখানা গাড়িও রাখতে পারেন, কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না বলেই রাখেন না।'

—'কিন্তু আমি যদি প্রয়োজন মনে করি?'

—'সত্যিকার প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই উনি গাড়ি কিনে দেবেন।'

প্রশান্ত অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল বিবাহের পর পদ্মার এ কি হইল? টাকা দেখিয়া বোধ করি তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। কিছুদিন আগেও যে ভাবিতে পারে নাই কোন দিন সে সসম্মানে খাইয়া পরিয়া থাকিতে পারিবে, আজ তার সেই দুর্ভাবনা ঘুচিয়া যাইতেই বড়লোকের ঘোড়া রোগে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? যার স্বামী লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইয়াও তার কর্মব্যস্ত জীবনে একখানা গাড়ি রাখার প্রয়োজন বোধ করে না, তার স্ত্রী হইয়া গাড়ি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পদ্মার লজ্জা করিবে না? পদ্মার ভাবগতিক প্রশান্তের নিকট বড় বিসদৃশ মনে হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ বাদে পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার গাড়ি আছে?'

প্রশান্ত মনে মনে বিরক্ত হইলেও একটু হাসিয়া মোলায়েম কণ্ঠে বলিল—'না! 'গাড়ি কেনবার টাকা কোথায় পাব?'

—'এত টাকা খরচ করে' কারখানা খুলেছেন আপনারা—আর গাড়ি কেনবার টাকা জোটে না?'

'কারখানা খুলবার টাকা দিয়েছেন জয়ন্তবাবু—আমি না, আমিও সামান্য একজন মজুর মাত্র!'

—'উনি ত বলেন আপনি একজন মস্ত ইঞ্জিনিয়ার!'

—'নিজের স্নেহগুণে বলেন।'

—'শুনেছি—আপনিই নাকি কারখানার হর্তাকর্তা হবেন?'

'হর্তাকর্তা বলতে যা' বোঝায় ঠিক তা' নয়। তবে প্রধান কর্মচারী হিসেবে কাজ করবার আদেশ পেয়েছি।'—এই বলিয়া প্রশান্ত আত্মতৃপ্তির হাসি হাসিল।

পদ্মা বিদ্রূপের সুরে বলিল—'আপনি দেখচি অত্যন্ত বিনয়ী লোক, বিনয়ের অবতার বললেও হয়!'—

প্রশান্ত মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না। জয়ন্তের প্রতি ভক্তি বশত তার স্ত্রীর এই বিদ্রূপ সে নীরবেই সহ্য করিল।

পদ্মাকে পেঁাছাইয়া দিয়া প্রশান্ত বাড়ি চলিয়া গেল।

জয়ন্তের প্রতীক্ষায় পদ্মা কিছুক্ষণ জাগিয়া রহিল। কিন্তু জয়ন্ত কখন ফিরিবে কিছু ঠিক নাই। ঘুমে চোখ দু'টি যেন জড়াইয়া আসিতেছে। বসিয়া থাকিতে না পারিয়া পদ্মা বিছানায় শুইয়া পড়িল।

জয়ন্ত যখন বাড়ি ফিরিল তখন প্রায় ভোর হইয়া গিয়াছে। পদ্মা ঘুমাইয়া আছে দেখিয়া তাহাকে আর ডাকিল না। পাছে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় এই আশঙ্কায় সে শুইলও না। অতি সন্তর্পণে তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া জয়ন্ত বাতি জ্বালাইয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল।

টেবিলে মাথা রাখিয়া জয়ন্ত চেয়ারেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সকাল বেলা পদ্মা তাহার ঘুম ভাঙাইল।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল—'বিছানায় না শুয়ে এখানে শোবার মানেটা কি? বিছানায় শোবারও দরকার নেই মনে কর নাকি?'

জয়ন্ত কথাটার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পদ্মার মুখের পানে তাকাইল। তারপর বলিল—'তোমার ঘুম ভাঙাবার প্রয়োজন মনে করিনি।'

'আমার ওপর তোমার অসীম দয়া তা' আমি জানি, কিন্তু তোমার অতি মহত্ত্বের জ্বালায় আমাকে এমন করে' দগ্ধে মের না।'—বলিয়া পদ্মা সবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পদ্মার মনে কেন যে এত উত্তাপ জমিয়া উঠিয়াছে তাহা জয়ন্ত জানিত না। তাহার মনে হইল গত রাত্রির ব্যাপারে পদ্মা বিশেষ ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়াছে। কিন্তু মনের ক্ষোভ সে যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া গেল তাহা যেন জয়ন্তের কানে করুণ ও রুদ্র সুরের মত শোনাইল—একাধারে ভৈরবী ও মালকোষ। গত রাত্রির দুর্ঘটনার জন্য জয়ন্তের মন ভাল ছিল না। সারা রাত্রি দুর্ভোগ ভুগিয়া শরীরটাও ভাল লাগিতেছিল না, দিনের যাত্রা সুরু হইতে না হইতেই বেসুরা কথা শুনিয়া সে বিরক্ত হইল।

আটটা বাজিবার একটু আগে বাহিরে যাইবার জন্য জয়ন্ত জামাকাপড় পরিতেছিল, এমন সময় পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

জয়ন্ত জিজ্ঞসা করিল—'কি হয়েছে বলত?'

পদ্মা সহজভাবে কহিল—'সে কথা এখন থাক। আজ আর বেরিও না। একটা দিন আমার কথা শোন।'

জয়ন্ত সস্নেহে বলিল—'তোমার কথা শুনতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়ি বসে' থাকলেও কাজ চলবে না। আমি বসে' থাকলে লোকে আমার কথা শুনবে কেন? তারাও বসে থাকবে যে!'

—'না। কেউ বসে' থাকবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

চাকর আসিয়া খবর দিল বরেন আসিয়াছে, সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক। জয়ন্ত বসিবার ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই জয়ন্তের চোখ পড়িল বরেণের বন্ধুটির উপর। যুবকটি দেখিতে সুশ্রী এবং সুচতুর। দুই হাত তুলিয়া সে জয়ন্তকে নমস্কার করিল। জয়ন্ত হাত জোড় করিয়া প্রতি-নমস্কার জানাইল।

বরেণ বলিল—'এর কথাই বলেছিলাম। নাম ননীমাধব।

ননীমাধব বোধ করি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, জয়ন্ত দেখিতে পাইয়া বলিল—'বরেণের মুখে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। সুতরাং আর সার্টিফিকেটের দরকার হবে না। কবে থেকে কাজে যোগ দেবে তাই বল।'

—'আজ থেকেই।'

—'তোমাকে ভাই আগেই কিন্তু বলে দিচ্ছি—তুমি তোমার কাজটিকে যেন চাকুরী বলে' মনে কোরো না, তা' হলে কাজ করতে পারবে না। নিজের কাজ বলে' সব করবে।'

ননীমাধব হাসিয়া বলিল—'এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে হবে না।'

বরেণ কহিল—'পদ্মাদেবীকে পড়াবার কথাও আমি বলেছি। ব্যস্ত থাকি, পড়াবার মত অবসর নেই।'

জয়ন্ত খুশী হইয়া ননীমাধবকে বলিল—'তোমার অবসর মত তুমি পদ্মাকে একটু একটু পড়িও। বেচারী বেশী লেখাপড়া করবার সুযোগ সুবিধে পায়নি। এটা তোমার ডিউটির মধ্যে নয়, তবে ওকে পড়ালে আমাকেই সাহায্য করা হবে, আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, পড়াবার অবসর আমার নেই।'

জয়ন্তের খোলাখুলি কথায় ননীমাধব আপ্যায়িত বোধ করিল। বলিল—'আমি খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়াব—এর জন্যে আপনি অমন করে বলছেন কেন! পড়াতে আমার ভালই লাগে।'

'তা' হ'লে পদ্মাকে আমি ডেকে নিয়ে আসি, পরিচয়টা হয়ে যাক'—এই বলিয়া জয়ন্ত চলিয়া গেল।

একটু বাদেই সে পদ্মাকে লইয়া ফিরিল।

জয়ন্ত একবার পদ্মাকে আর একবার ননীমাধবকে বলিল—'ইনিই পদ্মাদেবী—আর ইনি হচ্ছেন ননীমাধববাবু।'

পদ্মা ও ননীমাধব একে অপরকে অভিবাদন করিল।

জয়ন্ত বলিল—'তোমরা তা' হ'লে আলাপ কর, আমি আসি। আমার একটু কাজ আছে। বরেণ, তুমিও আমার সঙ্গে এস। কালকের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কি করা যাবে—আলোচনা করা দরকার।'

'চলুন'—বলিয়া বরেণ উঠিল।

জয়ন্ত ও বরেণ চলিয়া গেলে পদ্মা ও ননীমাধব বসিয়া আলাপ করিতে লাগিল।

ক্রমশ

পাকিস্থান বিচার

(৬৭০ পৃষ্ঠার পর)

আর স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দু থাকিয়া যায়, তবে এত স্কীম, এত দর্প-দম্ভের কি প্রয়োজন ছিল। দুই সম্প্রদায়কেই ত একই দেশে বাস করিতে হইবে। তবে পাকিস্থানের এই অবাস্তব ও নির্বোধ পরিকল্পনার সার্থকতা কোথায় রহিল? লীগওয়ালারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদেরকে বিশ্বাস নাই। তাহারা ভারতে মুসলিম রাজত্ব নষ্ট করিয়াছে। আর আজও মুসলমানের জীবন সর্বপ্রকারে বিপন্ন করিতেছে। সুতরাং ভারতে হিন্দু-নিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্র বা আবাসভূমি চাই। কে কাহাকে নষ্ট করিয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠেই জানা যাইবে। সস্তার প্রোপাগান্ডার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দায়িত্ব-হীন কথা বলা সোজা কাজ, কিন্তু একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে অন্য বিষয় পাওয়া যাইবে। মুসলমান শাসকগণ নিজেদের দোষেই দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। হিন্দুরা ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে দেয় নাই, একথা বলা মিথ্যার পর্বত রচনা করা মাত্র। এই উক্তির মধ্যে অনেক ধাঁধাঁ আছে। ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া দেখাইবার অনেক কৌশল আছে। তৎসত্ত্বেও তর্কস্থলে মানিয়া লইলাম যে, বেশ হিন্দুরা তাহাই করিয়াছে। কিন্তু কেন তাহা করিয়াছে? এই জন্য যে সেটা ছিল মুসলিম রাষ্ট্র। হিন্দুরা ছিল দাস, আর মুসলমান ছিল প্রভু। প্রভুর নিকট হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া ত দাসের স্বভাবজাত অধিকার। দাস চিরকালই স্বাধীন হইতে চাহিবে, ইহাই ত জগতের চিরন্তন নিয়ম। যদি সে যুগে মুসলিম সম্রাট ও শাসকগণ মুসলিম রাষ্ট্র না গড়িয়া জাতীয় রাষ্ট্র গড়িতেন, আর তাঁহারা তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ কখনও পরাধীন হইত না। বিদেশী শক্তি কখনও এক সম্প্রদায়কে হাত করিয়া অন্য সম্প্রদায়কে কবলিত করিতে পারিত না। অতীতের মুসলমানগণ যে ভুল করিয়াছেন, আমাদের পাকিস্থানপন্থিগণ আজ মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে গিয়া সেই ভ্রমেই পতিত হইতেছেন। অতীতের ঘটনা হইতে আমাদের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত যে, ভারতে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র টিকিবে না। আজ একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন কর, কাল তাহা ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যাইবে। ভারতের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা, তাহা হইলে বিদেশী শক্তি এখানে কোন সুবিধা পাইবে না। এবং দেশ দৃঢ় ও শক্তিশালী হইবে। ভারতের চল্লিশ কোটি অধিবাসীর সম্মিলিত রাষ্ট্র আমেরিকা, জাপান, জার্মানী ও রাশিয়ার সম্মিলিত শক্তিকে হেলায় বাধা দিতে পারিবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাকিস্থানের কতকগুলি পরিকল্পনাতে অধিবাসী বিনিময়ের দাবী নাই। তাহা হইলে ত কোথাও হিন্দু-নিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পাঞ্জাব, বাঙলা, সিন্ধু, সীমান্ত প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু থাকিবে। লীগওয়ালাদের মতে হিন্দুরা অতীতে মুসলমানকে ধ্বংস করিয়াছে, আর তাহারা আজিও মুসলমানের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে পাকিস্থানেও ত তাহারা তাহাই করিবে। বরং আরও বেশী করিয়া করিবে, কারণ তাহাদের ইচ্ছা ও সম্মতির বিরুদ্ধে পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইবে। তাহা হইলে দেখিতেছি, পাকিস্থান পাইয়াও মুসলমান নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হইতে পারিবে না। তবে এই মেকী মালের জন্য এত আবদার ও এত লম্ফঝম্ফ কেন? (ক্রমশঃ)

সীতুর সানাই

শ্রীসুধীরকুমার অধিকারী

গ্রামের নাম গোপীনাথপুর। রায়বাবুরা গ্রামের জমিদার। জমিদারী ছোট্ট হলেও প্রতাপে ও ঐশ্বর্যে কম ছিলেন না। তার সাক্ষী এখনও দুর্গোৎসব বাড়ি, দোলবাড়ি, প্রাচীন কাছারী বাড়ি, সদর দরজার নহবতখানা, আরও কত কি সমস্ত গ্রামময়ই আছে,—নাই কেবল সেই অতীতের শ্রী। কিরণ রায় এখন গ্রামের জমিদার, নামে মাত্র জমিদার, জমিদারী তাঁর পিতার সময়েই গিয়েছিল, এখন কয়েকখানা গ্রাম ও দু'একশ বিঘা খামার জমি নিয়ে তাঁর সম্পত্তি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধা মা, এক ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রী শশীমুখীকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট পরিবার। মেয়ের বিয়ে দিয়েন কলকাতায়। খরচ সংসারে বেশী নয় বলেই সব উৎসব বন্ধ করে দিয়ে এখনও তাঁদের কুলদেবতা গোপীনাথের দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী এগুলি চালিয়ে আসছেন।

সেবার ফাল্গুনের প্রথমেই দোল-পূর্ণিমা। শশিমুখী কিরণবাবুকে বললেন—"এবার ধীরেনকে দোলে আসতে লেখো, এ সময় এখানে আসলে তার ভালই লাগবে।"

ধীরেনবাবু চতুর্দশীর দিন রাত্রে শ্বশুর বাড়ি এসে পেঁাছেছেন। দোতালার যে-ঘরটা নদীর দিকে সেই ঘরে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। দক্ষিণের জানালা খোলাই ছিল। হঠাৎ ভোরের দিকে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। অর্ধ-চেতন অবস্থায় ধীরেনবাবু অনুভব করলেন, শীতল হাওয়া নীচের বাগানের বাদাম ফুলের খানিকটা মিঠে গন্ধ চুরি করে এনে জানালা দিয়ে তাঁর ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। অনুভূতি মনের গভীরে পৌঁছতে না যেতেই গন্ধ-চোর মৃদু মধুর গুঞ্জন নিয়ে এল তাঁর কানে। চেতনা তখনও তাঁর আসে নি, দেখলেন—কোন্ এক মোগল বাদসার দরবারে বিরাট সংগীতের জলসা বসেছে। কিনাম খাঁ সাহেব সেতার বাজাচ্ছেন, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। সম্পূর্ণ চেতন হয়ে দেখেন—কিছুই নয় সব স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন হলে কি হয়, সুরের রেশ তখনও বেশ কানে লেগে ছিল। ধীরেনবাবু ভাবছেন বহু সংগীত-জলসায় যোগ দিয়েছি, এমন কোমল মধুর সুর তো কানে বাজেনি! এবার সত্যি এক অপূর্ব মিষ্টি সুর তাঁর কানে এল; ভাবলেন এও কি স্বপ্ন! চোখ রগড়ে উৎকর্ণ আগ্রহে শুনতে লাগলেন,—সত্যিই কে যেন দূরে সানাইয়ে বসন্ত-রাগ আলাপ করছে এবং এমন সুনিপুণভাবে করছে যে, তার কোন যায়গায় এতটুকুও খুঁৎ নেই,—বরং তিনি যা না জানেন এমনও বহু সূক্ষ্ম সুরের কাজ তাতে রয়েছে; যতই শুনছেন ততই তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ কে যেন তাঁর মন থেকে ইঙ্গিত করলে, চল সেখানে যেখান থেকে এই সুর-ধারা ভেসে আসছে। ধীরেনবাবু আর থাকতে পারলেন না, উঠে বসলেন। আলনা থেকে শালখানা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মিনি হাত ধরে টান দিয়ে বললে—"এত ভোরে ঠান্ডার ভেতর কোথায় যাও? বাবা জানলে বকবেন কিন্তু।" ধীরেনবাবু বললেন—"শুনছ না কেমন সুন্দর সানাই বাজছে? আমি একবার কাছে গিয়ে শুনবো।" মিনি বললে—ওঃ এই কথা! শুয়ে পড়, কত দিন পরে এসেছ ভাল করে দুটো কথাও বলতে পারলেম না। ওতো সীতে সানাইদার; সকাল নাই, সাঁঝ নাই—ওর পোঁ পোঁ লেগেই আছে। ওর বাজনা কেউ শোনে না। তোমরা টকীতে এত ভাল ভাল বাজনা শোন তাও তোমাদের সখ মেটে না, বাপরে সখ!"

ধীরেনবাবু দেখলেন একে বোঝান যাবে না, অগত্যা শুয়ে পড়ি, একটু ফুরসৎ পেলেই উঠে যাব। মিনি দু একটি কথা বলতে বলতে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ধীরেনবাবুর কান কিন্তু ঠিক আছে, —এবার ভৈরব আলাপ হচ্ছে। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে চললেন যে দিক থেকে সেই মন ভুলানো সুর ভেসে আসছিল। পূবের আকাশে শুক তারা ম্লান হয়ে আসছিল, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় পথ চলা যায়, কিন্তু গাছের তলে তলে তখনও একটু অন্ধকার জড়িয়ে ছিল। ধীরেনবাবু গিয়ে দেখেন, এক প্রৌঢ় আমগাছের নীচে বাঁশের মাচার উপর বসে তন্ময় হয়ে সানাই বাজাচ্ছে। মাথার উপর সহস্র সহস্র মৌমাছি আমের মুকুলে বসে মধু আহরণ করছে আর তাদের গুঞ্জন থেকে উঠছে এক অপূর্ব ঝঙ্কার। ঝরা মুকুল সানাইদারের গায়ে মাথায় ঝরে পড়ছে, যেন সেই অচেতন গাছও সুর-ধারায় মোহিত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করছে। একটু দূরে একটা শিমুল গাছ ফাগের রঙে লাল করে নিয়েছে তার তলা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারই ডালে বসে একটা কোকিল কু—কু—করে থেমে গেল। বোধ হয় সানাই-এর সুরের কাছে হার মেনেই স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। তারই কাছে একটা ঝাঁকরাকুলের গাছ, চিকণসোনালি রঙের লতায় ঢাকা। আমের মুকুলের মিষ্টি গন্ধ, উতলা দখিন হাওয়া, কোকিলের কুহুতান, মৌমাছির গুঞ্জন, ভোর বেলাকার ভৈরব রাগিণীর প্রাণ মাতানো সুর,—সব কিছু এক সঙ্গে মিশে যেন সুরের এক স্বপ্নময় মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। ধীরেনবাবুর কণ্ঠ থেকে অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল, 'দিন যাবে আজ ভাল'।

সানাই অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে। কিন্তু ধীরেনবাবু তখনও সেই স্বপ্ন-লোকে। হঠাৎ তাঁর কানে এল 'কে—ও' ধীরেনবাবু বললেন আমায় চিনতে পারবে না,—আমার বাড়ি কলকাতায়, তোমার সানাই শুনছি।

সীতু বললে—এখানে আসেন বাবু, কোথায়ই বা বসতে দেব, বলেই যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। ধীরেনবাবু বললেন—থাক্ ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, আমি এখানেই বসছি, বলে মাচার উপর সীতুর কাছেই বসে পড়লেন।

সম্মুখে দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের এক প্রান্ত থেকে এঁকে বেঁকে কুমার নদী তার ক্ষীণ শরীর নিয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে চোখের অদেখা হয়ে গিয়েছে। নদীর দু'পাড় ঢালু হয়ে এসে জলে পড়েছে। জল-স্থলের সীমা নির্দেশ করছে মখমলের মত একজাতীয় ঘন সবুজ রঙের শেওলা,—দেখতে ভারী সুন্দর। ওপারে গ্রামের রেখা অতি দূরে। ফাগুনের মাঠ, সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই; কেবল চষা জমির ফ্যাকাসে রঙ। ওপারে মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ, বহু দিন থেকে যেন কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় গম্ভীর তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী। এপারে এই বাঁকের মাথায় নদীর ঠিক পাড়ের উপরেই পাঁচ সাতটি আমগাছের এক কুঞ্জ, দুই তিনখানা জীর্ণ খড়ের ঘর তারি মাঝে দাঁড়িয়ে সানাইদারের দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছে। ধীরেনবাবু দেখেন সর্বত্রই তার দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। কিন্তু তার চোখে মুখে সেই দীনতার ছায়া ভেদ করে শান্ত প্রতিভার জ্যোতি বেরিয়ে আসছে, দেখলে মনে হয় অন্তরটি যেন তার ঐশ্বর্যে ভরপুর। সানাইদার জিজ্ঞাসা করলে—বাবু কোন্ বাড়িতে এসেছেন? ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন—"আমি রায় বাড়ির জামাই।" শুনেই সীতু শশব্যস্তে উঠে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—"আজ আমার বড় ভাগ্যি যে, আপনার পায়ের ধুলো এ অধম মুচির বাড়ি পড়লো।" ধীরেনবাবু সীতুর হাত ধরে বললেন—"ভাই, কে অধম, আমরা সকলেই তো তাঁরই সন্তান, আমায় আর একটু বাজনা শোনাও। তোমার শিক্ষা কোথায় ভাই?—কাশীতে না গোয়ালিয়রে?"

সীতু সানাইটি কপালে ঠেকিয়ে মাথা একটু নত করে শ্রদ্ধা সহকারে বললে—"কাশীর মুস্তাক আলির নাম শুনেছেন? তাঁর পিতা জাফর আলি খাঁর কাছে আমার শিক্ষা, আমিও মুস্তাক একসঙ্গে শিখতাম, কপাল দোষে এই তেপান্তরে পড়ে আছি"—বলেই সীতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একটু চুপ করে থাকলো। মনে হল অতীতের কত কি স্মৃতি যেন তার মনের মধ্যে খেলে গেল। তারপর শ্যামলাল—

শ্যামলাল বলে গোটা তিনেক ডাক দিয়ে বললে—"টিকারা জোড়া নিয়ে আয় তো বাবা।" ডাক শুনে বার তের বছরের এক বালক টিকারা নিয়ে বেরিয়ে এল। সীতু বললে—"একটু ঠেকা দেতো বাবা! দেখ্ আমাদের আজ কি ভাগ্যি,—বাবুর জামাই এসেছেন এ অধমের বাড়ি।" সীতু ও শ্যামলাল বাজনা আরম্ভের প্রথম উদ্যোগ করতে লাগল। ধীরেনবাবু চুপ ক'রে বসে।

তখন পূবের আকাশে উষার অরুণ রাগ প্রকাশিত হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে গলান সোনার মত উজ্জ্বল কিরণ এসে পড়েছে সবার চোখে, মুখে। সুর দেবতার বন্দনার সূচনায় সে আম্রকুঞ্জ থেকে মধু আহরণে মত্ত অজস্র মধুকরের গুঞ্জন ধ্বনি শোনাচ্ছে ঠিক যেন আশীর্বচণের মত, আর দেবতার আশীর্বাদের মতই টুপ টাপ করে আমের মুকুল ঝরে পড়ছে সবার মাথার উপর। সীতু এবার ধীরেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"ভৈরবী ঠুংরী আরম্ভ করি, কেমন বাবু!" জহুরী জহর চেনে, সীতুও বেশ বুঝেছিল সমজদার লোক বটে।

আলাপ আরম্ভ হল, ধীর গম্ভীর নির্ঝর ধারার মত সুরধারা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল—যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটীর জটাজাল থেকে গঙ্গাধারা হিম-গিরি শিখরে ঝরে পড়ছে। সে যেন সুরের এক অপূর্ব তরঙ্গ-ভঙ্গী। ক্রমে আলাপ সহজ গতি পথ পার হয়ে তাললয়ের ঘরে এসে পৌঁছিল। টিকারায় কাঠি পড়লো। ভাষাহীন বাঁশ কত বিরহের কথা কত ভঙ্গীতে বলে চললো। ধীরেনবাবুর চোখ দুটি ছল ছলিয়ে উঠল। বাঁশী থামলে দেখেন সীতুর চোখেও জল। ধীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা সীতু, ভৈরবী শুনলে এমন হয়ে কেন?" সীতু উত্তর করলে—"কি জানি বাবু, মায়ের খেলা" বলে চোখ মুছে ফেললে।

সকলেই নিস্তব্ধ কিন্তু তবুও সে ধ্বনি আমের কুঞ্জ ও নদীর তরঙ্গে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মরূপে ব্যপ্ত হয়ে রইল।

বেলা প্রায় আটটা। এদিকে সীতুর আট দশ বছরের ছেলে ও মেয়ে কাঠের এক প্যাকিং বাক্সে রঙিন কাগজ লাগিয়ে আমের ডালে ঝুলিয়ে তাতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বসিয়ে ফুল-পাতা দিয়ে সাজিয়ে খানিকটা আবির এনে ঠাকুরের গায়ে দিয়ে বললে, "বাবা আমরা দোল করছি, ঠাকুরকে আবির দেবে না? দাদা তুমিও এস"—এই বলে শ্যামলালকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। সীতু অতি ভক্তি ভরে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আবির দিয়ে ধীরেনবাবুর দিকে হাত জোড় করে বললে—"বাবু ছেলেদের পাগলামো, কর্তাবাবুকে এ সব কথা বলবেন না যেন। ওরা বাবুর বাড়িতে দেখে কিনা—সবাই এমনি ক'রে আবির দেয়, তাই এ কান্ড করেছে। অশুচি আমরা, প্রাণে যে কত ইচ্ছা করে, কিন্তু কোন উপায় নাই, কান্না আসে, মনে মনে বলি—ভগবান তুমিই তো ছোট করেছ। আচ্ছা বাবু, ঠাকুর কি মুচির বাড়িতে আসেন?" ধীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—"ভাই, দেখ তোমার আহ্বানে ভগবান তোমার বাড়িতে কি কৌশলে এসেছেন। এমনিভাবেই তিনি চিরদিন ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে আসছেন। এই তো সত্যিকারের উৎসব।" এমন সময় সীতুর ছোট ছেলে খানিক আবির নিয়ে ধীরেনবাবুর গায়ে ছড়িয়ে দিলে। সীতুর চোখ দুটি ছল ছল করছে আর—বলছে "তিনি এসেছেন? বাবা শ্যাম, আমরা তো মন্ত্র জানি না, কি দিয়ে তাঁর আহবান করবো? শীগগির সানাই আর টিকারা এখানে নিয়ে আয়। আমার আজন্ম সাধনার ধন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জিনিস দিয়ে তাঁর আবাহন করি" বলে বাহারে তান ধরলো, আর চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ে তার বুক ভেসে যেতে লাগল। ধীরেনবাবু মুগ্ধ নেত্রে সীতুর দিকে চেয়ে রইলেন, দেখেন বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নাই, যেন তার অন্তরের নিভৃত-কন্দরে জীবন-দোলায় চির-সুন্দর দোলায়িত হচ্ছেন আর সেই লীলায়িত ছন্দ বাঁশীতে সুর হয়ে ফুটে উঠছে।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল তার ঠিক নাই। বাঁশী থামলে ধীরেনবাবু বললেন,—"ভাই সার্থক তোমার সুর-সাধনা; সেই তো গুণী, যে সুরের যাদুমন্ত্রে বাইরের জগত থেকে মনকে আকর্ষণ ক'রে অন্তর্মুখী করে দেয়। আজ তোমার বাঁশীতে আমি তা অনুভব করেছি।" এই বলে গোটা দশেক টাকা পকেট থেকে বার ক'রে সীতুর হাতে দিতে গেলেন। সীতু যেন এতক্ষণ আবিষ্টের মত কি ভাবছিল! টাকা দেখে হাত জোড় ক'রে অতি বিনীতভাবে বল্‌লেন—"বাবু আমায় মাপ করবেন, টাকা আমি নিতে পারবো না, টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু আপনাকে গান শুনিয়ে আজ যে আনন্দ পেয়েছি, জীবনে তা' কখনো ভুলতে পারবো না। এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার" বলে জোড় হাত ক'রে সেই ভাবেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ধীরেনবাবু বাধ্য হ'য়ে টাকা পকেটে রেখে বল্‌লেন,—"ভাই তোমার মত গুণীকে টাকা দিতে যাওয়া আমারই ভুল হয়েছে; আচ্ছা তাহ'লে আজকের মত যাই, বেলা হয়ে যাচ্ছে।" সীতু প্রণাম ক'রে বললে—"সময় পেলে দয়া করে আর একবার আসবেন।"

(২)

ধীরেনবাবু আবির মেখে ঘরে ঢুক্‌তেই মিনি আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, একি! দোল না হ'তেই আবির মাখ্‌লে কোত্থেকে? "সত্যিকার দোল যা তা হ'য়ে গিয়েছে, আজ আমার জীবন সার্থক"! গম্ভীরভাবে কথা কয়টি ব'লে ধীরেনবাবু আরাম কেদারায় গা ছড়িয়ে দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। সে মুখের দিকে চেয়ে মিনির আর কোন প্রশ্ন কর্‌তে সাহস হ'ল না, কিন্তু বিস্মিত হ'ল খুবই।

রায় বাড়ির দোল যথারীতি হ'য়ে গেল; প্রাণের উৎসব কম, প্রাঙ্গণের উৎসবই বেশী। সন্ধ্যার রক্তিম রাগে যখন পশ্চিম গগন হোলীর রঙে রঙিন হ'য়ে উঠ্‌ল, ধীরেনবাবু শুনলেন মুলতান বাজছে।

সন্ধ্যার পর ধীরেনবাবু শ্রান্ত দিনের অবসাদ দূর ক'রছেন চায়ের টেবিলে ব'সে। মিনি চা ঢেলে দিচ্ছে, এমন সময় কিরণবাবুর মা যোগেশ্বরী দেবী সেই ঘরে প্রবেশ ক'রলেন, বয়সের ভারে তাঁর দেহ কিছু নত, পরিধানে মট্‌কার কাপড়, হাতে খানিকটা পেঁজা তুলো, বোধ হয় ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পঞ্চ-প্রদীপ সাজাতে সাজাতেই চ'লে এসেছেন। মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয়, বয়সে তিনি যতটা বুড়ী হয়েছেন, তেজ ততখানি কমে নাই। ঘরে ঢুকেই ধীরেনবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন,—"এ সব কি অনাচ্ছিষ্টি কান্ড ভাই, জাত মানের দিক লক্ষ্য রেখে চল্‌তে হয়, মুচির বাড়ি গিয়ে আবির মেখে এলে! তোমাদের দেশের বামুনরা বোধ হয় মুচির মেয়েও বিয়ে করে।"

পরিহাসের ছলে বিষ ঢালাই বোধ হয় যোগেশ্বরী দেবীর ইচ্ছা ছিল। ধীরেনবাবুও তেমনি উত্তরই দিলেন। তিনিও একটু রহস্যের হাসি হেসে বল্‌লেন "তাইতেইতো আপনাদের ঘরে—"বলেই জিভ কেটে আল সামলিয়ে নিলেন।

যোগেশ্বরী দেবী খোঁচা খেয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—"আর কি সেদিন আছে ভাই, আমার শ্বশুরের সময় দেখেছি, ছোট জাতদের টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না, কথায় কথায় জুতো, আর আজ ছোট জাতের আস্পর্ধায় ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত রাখা দায় হ'য়ে উঠেছে। এখন মানে মানে গঙ্গায় গেলে বাঁচি।"

ধীরেনবাবু বল্‌লেন "দিদিমা,—ছোট জাতই তো জগতে বেশী, তাদের ছোট ক'রে রাখতে রাখতে এখন তারা চেতন হ'য়েছে। একটা কথা আছে 'যাতে জয় তাতেই ক্ষয়' যে ঘৃণা এবং হিংসা তাদের ছোট ক'রে রেখেছিল তাতেই তাদের বড় করেছে। এখনও যদি ভদ্র সমাজ তাদের ভাই বলে টেনে নেয় তাহ'লেই ভদ্রলোকেরা বাঁচবে; নচেৎ এদের কপালে যে কি আছে, ভগবানই জানেন। আচ্ছা দিদিমা,

আপনারাই তো বলেন, "মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" কিন্তু কাজে তো আপনাদের কিছু দেখি না। শুধু আপনারাই বা কেন যাঁরা বলেন, 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ' তাঁরাও তো এ দিকে কোনই লক্ষ্য করেন না—যদিও এ সব ছোট লোকেরাই সেই সব প্রভুপাদদের মুখের অন্ন জুগিয়ে থাকেন।" যোগেশ্বরী দেবী বললেন—"ভাই তোমাদের বোঝানোর বুদ্ধি আমাদের ঘটে নাই, এখন যাই", ব'লে বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর তিন চার দিন বেশ কেটে গেল। কেবল দোলের দিন রাত্রে মিনির মান ভাঙতে ধীরেনবাবুর একটু বেগ পেতে হ'য়েছিল। মিনিকে ফাঁকি দিয়ে সানাই শুন্‌তে যাওয়ার জন্যেই বোধ করি এই শাস্তি।

আজ ধীরেনবাবু ক'লকাতায় যাচ্ছেন। স্টেশনের পথে যেতে তাঁর মনের সব কিছু ছাপিয়ে সেদিনের সেই হোলির উৎসবই উপরে উঠ্‌লো।

(৩)

পনের বৎসর কেটে গেছে, পশ্চিমাঞ্চলে বদ্‌লি হওয়ায় ধীরেনবাবু আর শ্বশুর বাড়ি আস্‌তে পারেননি, এবার যোগেশ্বরী দেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে এসেছেন। গোপীনাথপুর এসে শত কাজের মধ্যেও সীতুর কথা ভোলেননি। রোজই ভোরে ঘুম ভাঙলে কান পেতে থাকেন, কিন্তু তিনি যা চান, কোথায় পাবেন? পাঁচ বৎসর আগেই তা' নীরব হয়েছে। কয়েকদিন ধীরেনবাবুর খুবই উৎকণ্ঠা চেপে থাক্‌তে হ'ল। একদিন বিকালে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আকুল আগ্রহে সীতুর বাড়ির পথে চললেন। দূর থেকে দেখেন সেই বাঁশের মাচাখানি ঠিকই আছে, নেই কেবল সেই যার জন্যে শত কাজের মধ্যে মন তার প'ড়ে থাক্‌তো সামান্য দরিদ্রের এই কুটীর প্রাঙ্গণে। তার যায়গায় দেখেন এক জোড়া বলদ বাঁধা রয়েছে। ধীরেনবাবুর মন খুবই দমে গেল। কেমন যেন একটা শ্রীহীন শুষ্ক আবহাওয়ায় মনে তার আশঙ্কার সৃষ্টি হ'ল। সেই খানে দাঁড়িয়েই ডাকলেন—"সীতু—সীতু।"

কে কথার উত্তর দেবে? বাড়ীর ভিতর থেকে শ্যামলাল বেরিয়ে এসে বললে,—"বাবু কাকে ডাকছেন? বাবা তো আজ পাঁচ সাত বৎসর মারা গেছেন।" ধীরেনবাবু মনে বড়ই আঘাত পেলেন সে কথা শুনে। মাচার উপর ব'সে জিজ্ঞেস করলেন, "শ্যাম আমাকে চিনতে পারিস?" শ্যাম উত্তর দিল বাবু, "বহুদিন হ'ল আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হ'চ্ছে।" ধীরেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা হবে। তারপর সীতুর কি হ'য়েছিল বল?" শ্যাম বলতে লাগলো—"বাবু আমাদের অবস্থা বরাবরই খারাপ, তারপর ক্রমেই আরও খারাপ হ'তে লাগলো, কারণ বাবা প্রায়ই ছোট খাট কাজে বাজাতে যেতেন না। বল্‌তেন—এদেশে সমজদার লোক নেই, কেবল 'ওরে বাজা বাজা' 'ওরে থাম্‌ থাম্‌' এ সব বিরক্তি সহ্য হয় না। বছরে যা দু' একটা বড় কাজ পেতেন তাই বাজিয়ে যা' পাওয়া যেত কোন রকমে তাই দিয়ে আমাদের জীবন বাঁচিয়ে দু'বেলা নিয়ম মত এই বাঁশের মাচায় ব'সে সানাই বাজাতেন আর চোখের জল ফেলতেন। তারপর এক বেলা ক'রে খেয়েও থাম্‌লেন না; শরীরে তা সইবে কেন? শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লেন, বিছানায় প'ড়েও ছিলেন দু' তিন মাস। না পেরেছি নিজেরা খেতে, না পেরেছি তাঁকে একটু যত্ন করতে। কিন্তু এত কষ্টেও তিনি যেন বেশ স্থির ছিলেন।

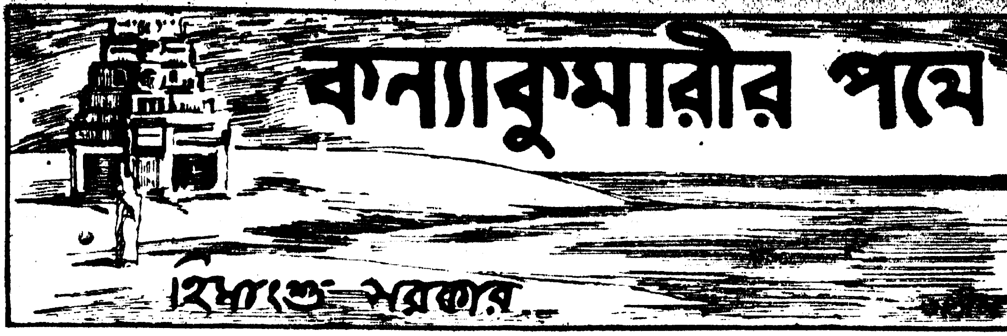
"মারা যাওয়ার সাত আট দিন আগে, একদিন সন্ধ্যা বেলা আমাকে বললেন,—'ওরে শ্যাম, বাবা এ দিকে আয়, আমার কাছে বস্‌'; আমি কাছে গিয়ে বসলাম, শিথিল হাত' দুখানি দিয়ে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বললেন—'বাবা আমায় একটু পূরবী শোনা তো, জীবনের দিন শেষ হ'য়ে আসছে। ওপারের ডাক আসছে আমার কানে, এপার থেকে এই পূরবীর সুরে আমায় বিদায় দে।'

"বাবার কথা শুনে আমার চোখ ফেটে জল আসতে লাগলো, তবুও তাঁর শেষ অনুরোধ রাখতেই হবে মনে ক'রে সানাই নিয়ে এসে পাশে বস্‌লাম। আলাপ আরম্ভ করলাম, বাবা স্থির হ'য়ে শুনতে লাগলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি যেন যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বেশ আরামে চোখ বুজে আছেন, মুখখানা হাসি হাসি, অথচ দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে বালিশ ভিজে যেতে লাগলো। বাজনা শেষ হ'লে আমার হাতখানা ধ'রে বললেন,—'বেশ বাবা জাকরালীর ঘরওয়ানা বাঙলাদেশে তোর কাছেই একটু থাকলো। কিন্তু বাবা থেকে কি হবে! ওতে আর পেট ভ'রবে না। গুণী লোকের কদর বোঝবার দিন এ নয়, আমি ম'লে লাঙ্গল ধরিস।' তাঁর কথা মত লাঙ্গল চালিয়ে তাই স্বচ্ছন্দে দুটো পেট ভ'রে খাচ্ছি।"

ধীরেনবাবু চেয়ে দেখেন,—শ্যামলালের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তার নিজের চোখও ছল্‌ ছল্‌ ক'রে উঠলো। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন,—তারপর কি হ'ল? শ্যাম উত্তর দিল—"তারপর আর একদিন মাত্র ছিলেন; মারা যাওয়ার দিন বেশ একটু যেন কথা বলতে পারলেন, আমায় ডেকে বললেন,—'শ্যাম আমার সদ্গতি কর। কৈ আমার সে রাধাকৃষ্ণ কৈ?' আমি সেই যুগল মূর্তি সামনে নিয়ে ধরলাম। বাবার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, বললেন,—'ঠাকুর দেখা দিয়েছ? শ্যাম, বাবা দেতো সানাইটা দেখি পারি কিনা?' বলে বার বার ছেলে মানুষের মত আব্‌দার করতে লাগলেন। আমার মা চোখ মুছতে মুছতে সানাই এনে হাতে দিলেন। সানাই হাতে নিয়ে হাত কাঁপতে লাগলো' তবুও নলি লাগিয়ে অতি কষ্টে উঠে বসে ফুঁ লাগালেন। হাত থেকে সানাই প'ড়ে গেল, বাবাও বিছানার উপর পড়ে গেলেন, ভাবলাম ফিট হ'য়েছে, কিন্তু সে ফিট আর ভাঙলো না।"

ধীরেনবাবু শ্যামলালকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—"কখনো যদি অভাব হয়, আমাকে জানাস। আর সানাই একেবারে ছেড়ে দিসনে। ঘরে খাবার হ'লে তোর ঘর থেকেই আর একজন সীতু জন্মাবে। এইনে" বলে পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে কয়েকখানা নোট তার হাতে গুঁজে দিতে গেলেন। শ্যামলাল টাকা নিতে আপত্তি করলে ধীরেনবাবু বললেন,—"একদিন সীতুকে টাকা দিতে গিয়েছিলাম, তার বাজনায় মুগ্ধ হ'য়ে, কিন্তু সে গ্রহণ করেনি; সেদিন ভেবেছিলাম তার মত গুণীকে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে যাওয়া আমারই ভুল হয়েছিল, কিন্তু আজ এ টাকা তোকে নিতেই হবে। আমি চাই তার বংশ থেকে এমন একটা বিদ্যে লোপ না পায়।" শ্যামলাল আর কোন বাদ প্রতিবাদ না ক'রে ধীরেনবাবুকে প্রণাম ক'রে টাকা গ্রহণ করলো।

ধীরেনবাবু অতি বিষন্ন চিত্তে বাড়ি ফিরছেন। সান্ধ্য গগনের রক্তিমচ্ছটায়, আম্র কাননের পল্লব মর্মরে, কুমারের কুলু তানে, বিহগের কল গানে অতীতের সে সব আবার যেন ভেসে এল তাঁর কানে। সীতুর শেষের দিনের কথাটাই বিশেষ ক'রে কাঁটার মত বিঁধ্‌তে লাগল তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর সকল চিন্তার মাঝে একটা কথাই ফিরে ফিরে বাজতে লাগল,—সীতু যা বলেছে তা ঠিকই—"গুণী লোকের কদর বোঝার দিন এ নয়।"



রামেশ্বরমের রাস্তায় এবং গৃহে ইলেকট্রিক আলোর বন্দবস্ত আছে। স্টেশনে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আলো নিয়ন্ত্রণ করবার বন্দবস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু রাস্তার বা গৃহে আলোর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের বন্দবস্ত চোখে পড়ল না।

খানিকটা পথ আসার পর একটা ছোট কম্পাউন্ডওয়ালা বড় দোতলা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম। শুনলাম যে, এটাই ধর্মশালা—নাম মহাবীর ধর্মশালা। একতলার ঘর বিনা ভাড়ায় থাকতে পাওয়া যায়। দোতলার প্রত্যেকটা ঘরের জন্য দৈনিক আট আনা করে ভাড়া। ঘরগুলো বেশ বড়, আলো-বাতাস আসার জন্য কয়েকটা বড় বড় জানালাও আছে। এক একটা ঘরে বাস করবার জন্য লোকের কোন সংখ্যা ঠিক করে দেওয়া নেই। আমরা আট আনা দিয়ে একটা ঘর নিয়ে তাতে আমাদের সব জিনিসগুলো রাখলাম।

ধর্মশালাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কলের জল সব সময় পাওয়া যায়। অবশ্য স্নান এবং কাপড়চোপড় ধুতে হলে ধর্মশালার বাইরে বাঁধান কূয়াতলায় যেতে হয়। মহিলাদের স্নানের জন্য কয়েকটা ছোট ছোট স্নানের ঘর আছে। সেখানে জল এনে মহিলাদের স্নান করতে হয়। কলের তলায় স্নান অথবা কাপড় পরিষ্কার করার নিয়ম না থাকায়—খুবই সুবিধা হয় দেখলাম। এতে লোকেরা প্রথমত অনাবশ্যকভাবে কলতলা আটক করে রাখবার সুবিধা পায় না। তাছাড়া শুধু কল থেকে খাওয়ার জল ইত্যাদি নিলে কলের তলা এবং কাছাকাছি জায়গাটাও বেশ পরিষ্কার থাকে। নীচের তলার এবং উপর তলার প্রত্যেকটা ঘরের জন্য আলাদা আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা আছে।

আমরা আমাদের ধরাচূড়া ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। রাত্রের খাওয়া সারতে হবে মাইল খানেক দূরে বাজারের ভেতর কোন হোটেল থেকে। বাজারে সবই মাদ্রাজী হোটেল। আমরা এর মধ্যে থেকে মীনাক্ষী হোটেলটা পছন্দ করে ভেতরে ঢুকলাম। বাইরে থেকে হোটেলটা দেখতে খুব ভাল না হলেও, ভেতরে খাওয়ার টেবিল এবং থালা-বাসন খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাথা পিছু চার আনা দিয়ে ভাত, ডাল এবং ওদেশীয় তরকারী দুধ ইত্যাদি দিয়ে খাওয়াটা বেশ ভালই লাগল।

খাওয়া শেষ করে ধর্মশালায় ফিরলাম। দোতলার বারান্দায় এবং খোলা ছাতে সকলে শুলাম। হাওয়ার জন্য মশার উপদ্রব বুঝতে পারলাম না।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে পায়খানার দিকে গিয়েই তো চক্ষুস্থির। লম্বা ব্যারাকের মত পায়খানা; এক সঙ্গে আট দশটা পর পর চলে গেছে। কোনটায় দরজার কোন বালাই নেই। শুধু পায়খানাগুলো থেকে একটু দূরে সামনের দিকে লম্বা একটা দেওয়াল আছে। এটাই যতটুকু সম্ভব আবরু রক্ষা করতে সাহায্য করছে। হরিদ্বারের ধর্মশালায় অনেকটা এই ধরণের পায়খানা দেখেছিলাম। কিন্তু সেগুলো প্রথমত একবারে বাড়ির সব ওপর তলায় এবং দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটার জন্য কোন রকম একটা অর্ধেক টিনের দরজা বা আড়ালের ব্যবস্থা ছিল।

সকালের চায়ের পালা শেষ করে ঠিক করা গেল যে, কৃষ্ণ পিল্লাই একটা নৌকা ভাড়া করে, এখানকার সমুদ্রের প্রাণী সংগ্রহের স্থান থেকে আমাদের জন্য কিছু সংগ্রহ করে আনবে। ইতিমধ্যে আমরা এখানকার মন্দির এবং বাজারটা দেখব, কারণ আজই সন্ধ্যাবেলার ট্রেন ধরে রামেশ্বরম থেকে মাদুরার দিকে রওনা দেব।

আমি জিতেন এবং প্রবোধ ঠিক করলাম যে আমরাও কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের সঙ্গে গিয়ে এখানকার প্রাণী সংগ্রহের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করব। অবশ্য এই জন্য আমাদের মন্দির এবং বাজার দেখা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে—কারণ সংগ্রহের কার্য থেকে ফিরে আমাদের মন্দির ইত্যাদি দেখার জন্য খুব বেশী সময় থাকবে না।

যাই হোক আমরা ক'জন সমুদ্রের ধারে যেখানে নৌকা রাখবার কথা ছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নৌকা দেখেই তো সংগ্রহ করতে যাওয়ার উৎসাহ মিটে আসবার মত হ'ল। ছোট ধরণের দেশী নৌকা—অনেকটা আমাদের ডিঙ্গির মত। এতে করে সমুদ্রের মধ্যে প্রায় ছ মাইল পথ গিয়ে সংগ্রহ করতে হবে! বেশ ভয়ই হ'ল। কি করা যায়—দুর্গা স্মরণ করে এতে চড়ে বসলাম। আমরা তিনজন ছাড়া নৌকায় চলেছে দুজন মাঝি, কৃষ্ণ পিল্লাই এবং আর একজন ডুবুরী। ডুবুরীর কাজ হচ্ছে গভীর জলের মধ্যে ডুবে ডুবে বিভিন্ন ধরণের শঙ্খ এবং ঐ জাতীয় সব প্রাণী সংগ্রহ করে দেওয়া।

নৌকা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি তার শত ছিন্ন পাল তুলে দিতেই নৌকাটা বেশ জোরে চলতে আরম্ভ করল। ঢেউতে নৌকাটা একবার এদিকে আর একবার ওদিকে কাত হতে লাগল। নৌকাটার ওপর বসার মধ্যে হচ্ছে সরু সরু কাঠ আড়া-আড়িভাবে নৌকার মাঝে মাঝে লাগান। আমরা ঠিক কাঠটার

মাঝখানে বসে দুহাত দিয়ে প্রাণপণে নৌকার দুপাশের কাঠ চেপে ধরে রইলাম। মনের ভাবটা যে, যদি কোনক্রমে নৌকা ডোবে তাহলেও নৌকা ছাড়ব না! আমরা নৌকার একদিকে কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে যতদূর সম্ভব বেঁকিয়ে ভারসাম্য রাখবার চেষ্টা করছিলাম। বন্ধুর দিকে চাইলাম, চোখের ভাবটা এই, যে হয়েছে! এরকমভাবে যদি যেতে আসতে হয় তা হলেই তো—যাক আর না বলাই ভাল।

কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম যে ঢেউয়ের দোলার সঙ্গে ক্রমশ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। প্রাণে ভরসা এল। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর নির্ভয়ে হাত ছেড়ে বসলাম। তখন মনে হ'ল যেন কতদিন ধরে এই রকমভাবে নৌকায় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি।

সংগ্রহের জায়গায় এসে নৌকা লাগল। কৃষ্ণ পিল্লাই বল্‌লে যে এখানে সি-পেন (Sea pen) পাওয়া যাবে। সি-পেনের বাঙলা করলে দাঁড়ায়—'সাগর লেখনী'। নামের সঙ্গে চেহারা কিছুটা মিল আছে বলেই এই ধরণের নাম। সি-পেন অমেরুদণ্ডীর মধ্যে সিলেনটারেটা পর্বে পড়ে। তা ছাড়া এগুলোকে সি-এনিমনের জ্ঞাতি ভাই বলা যায়।



সী-পেন

ছোট বেলায় আমাদের অনেকেই হাঁসের পালকের কলমে লিখেছি। সি-পেন অনেকটা সেই ধরণের দেখতে। পালকের কলমে যেমন তলার দিকে ডাটা থাকে, যেটা কেটে সরু করে নিয়ে লেখা হয়—সি-পেনেও সেই রকম একটা ডাটা আছে। এই ডাটার মত অংশটা বালির মধ্যে পোতা থাকে। তারপর পালকের কলমে ডাটার অংশের পরের অংশটায় দুপাশ থেকে ঝালরের মত পালক বের হয়ে থাকে। সি-পেনেও এই রকম ঝালরের মত দেখতে পাওয়া যায়। এই ঝালর শুদ্ধ অংশটা বালির ওপর জলের মধ্যে বের হয়ে থাকে। এই সি-পেনও ঠিক সি-এনিমনের মত কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই দেহ সংকুচিত করে সবশুদ্ধ বালির মধ্যে ঢুকে যায়। ঝালরের মত অংশটা বিভিন্ন রংয়ের হয়।

এটা হ'ল এক জাতের সি-পেন। তাছাড়া আর এক জাতের সি-পেন পাওয়া যায় যেটার বালির ওপরে বের হয়ে থাকার অংশে কোন রকম ঝালরের মত কিছু থাকে না। এই সি-পেনগুলো দেখলে মনে হয় যেন জলের মধ্যে সরু সরু কাঠির মত সব পোতা রয়েছে। আমরা এখানে এই জাতের সি-পেন সংগ্রহ করেছিলাম।

এখানকার সংগ্রহ শেষ করে আমাদের নৌকা সমুদ্রের গভীর জলের মধ্যে এগিয়ে চলল। এখান থেকে আমরা শঙ্খ সংগ্রহ করব। অবশ্য 'আমরা সংগ্রহ করব' একথাটা বলা ঠিক নয়—কারণ জলের মধ্যে ডুবে ডুবুরীই সংগ্রহ করবে, আমরা সেগুলো শুধু নৌকার ভেতর জমা করব।

ক্রুশাডাই, সিঙ্গল এবং এখানেও এ পর্যন্ত এই সব সংগ্রহের কার্যে আমরাও হাতে কলমে যোগ দিয়েছি—কিন্তু এখন আর সে উপায় নাই। আর তা না হ'লে ডুবুরীর মতই জলে নামতে হয়। ডুবুরী একটা ছোট নেংটি পরে জলে নামল। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে—জল সেখানে খুব কম করে তিন চার মানুষ সমান গভীর। ঢেউয়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে এক সময় সে টুপ করে জলের তলায় মিলিয়ে গেল। প্রায় মিনিটখানেক বাদে কিছুদূরে জলের তলা থেকে সে আবার উপরে ভেসে উঠল। সাঁতার দিয়ে কাছে আসতে দেখি, তার দু হাতে দুটো শাঁখ। এই রকম করে সে আরো কয়েকবার ডুবে ডুবে আমাদের জন্য বিভিন্ন রকমের শঙ্খ তুলে আনতে লাগল।

শঙ্খ আমাদের সকলের নিকটই আদরের বস্তু। গীতায় আমরা শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের উল্লেখ অনেক জায়গায় পাই। সেই কোন কাল থেকে আজও আমাদের কাছে শঙ্খের আদর সমানই আছে। আজও কোন শুভকার্য শঙ্খ না হ'লে সমাপনই হয় না। শঙ্খ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বস্তু হ'লেও, এর সম্বন্ধে আমাদের খুব ভাল ধারণা নেই।



শঙ্খ

শঙ্খ হচ্ছে শামুক জাতীয় প্রাণীর ওপরের খোল। প্রাণীটা খোলের ভেতরেই থাকে। এটা অমেরুদণ্ডীর মোলাস্কার পর্ব ভুক্ত। শঙ্খের যে দিকটা দিয়ে বাজান হয়, সেটা হচ্ছে প্রাণীটার পেছন দিক। প্রাণীটার সামনের দিক হচ্ছে যে দিকটা দিয়ে শব্দ বেরোয়। শঙ্খের ভেতরটা পেছন দিক থেকে আরম্ভ করে জিলিপীর প্যাঁচের মত ঘোরান। শঙ্খে ফুঁ দিলে শব্দ বের হবার কারণ হাওয়াটা শঙ্খটার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসে বলে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে সংগ্রহের কার্য শেষ করে আমরা ধর্মশালায় ফিরলাম। তখন প্রায় বেলা একটা। ইতিমধ্যে আমাদের দলের অন্যরা মন্দির দর্শন করে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিশ্রামের জোগাড় করছে। আমাদের এর পর স্নান খাওয়া শেষ করে মন্দির দেখতে বেরুব।

আমরা আমাদের সংগ্রহ করে আনা প্রাণীগুলো সংগ্রহের বাক্সে বন্দোবস্ত করে রাখবার জন্য দুজনের ওপর ভার দিয়ে



ওদেশীয় বুড়ী তকলীতে সুতা কাটছে

কুয়োতলায় স্নান করতে গেলাম। মাথায় কোন রকমে কয়েক বালতি জল ঢেলে স্নান শেষ করে খেতে বসলাম। যত তাড়াতাড়ি স্নান এবং খাওয়া সারতে পারব আমাদেরই সুবিধা—কারণ তাহলে মন্দির দেখবার জন্য আরো বেশী সময় পাব। তাছাড়া, বন্ধুদের কাছে শুনলাম, বাজারে এবং মন্দিরের ভেতরে নানান জাতের শঙ্খ, ঝিনুক, ইত্যাদি খুব সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। বাড়ির জন্য এদিককার কিছু নিদর্শন নিয়ে যেতে হলে এই সব কেনাই সুবিধা দেখলাম। অবশ্য বাড়ির বন্ধু, বন্ধুদের জন্য প্রায় প্রত্যেক তীর্থের জল, ভস্ম এবং দেবদেবীর পট এনেছিলাম। বাড়ি পৌঁছে এগুলো এঁদের হাতে দেওয়ায় এঁরা যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছিলেন।

খাওয়া কোন রকমে শেষ করেই আমরা তিনজন একটা ঝট্‌কা নিয়ে মন্দির দেখবার জন্য বেরুলাম। এক্কা এবং টাঙ্গা-জাতীয় ঘোড়ার গাড়িকে এদিকে ঝট্‌কা বলে।

ঝট্‌কায় উঠে মনে হ'ল তাহলে এই সুযোগে শেষ জীবনের পুণ্যের থলির জন্য কিছু পুণ্য সঞ্চয় করব দেখছি। আর নেহাৎ যদি এটা স্বীকার করতে এমন লজ্জাই করে, তা হ'লে না হয় বলাই যাক যে দাক্ষিণাত্যের এমন একটা মন্দির দেখতে যাচ্ছি, যার একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

রামেশ্বরম মন্দির সম্বন্ধে ফারগুসান (Fergusson) যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন সেটা এখানে উদ্ধৃত করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"If it were proposed to select one temple which should exhibit all the beauties of the Dravidian style in their greatest perfection and at the same time exemplify all the characteristic defects of design, the choice would almost inevitably fall on that of Rameswarm."

যদি দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যকলার নিদর্শনস্বরূপ এমন একটা মন্দির বাছতে হয় যেটায় এই স্থাপত্যকলার ভাল এবং মন্দ দুটো দিকই দেখতে পাওয়া যাবে, তাহলে রামেশ্বরমের মন্দিরকে বলতে হয়।

অবশ্য রামেশ্বরমের এবং মাদুরার মন্দির দেখবার পর এই প্রশ্নটা মনে জাগে যে মাদুরার মন্দির রামেশ্বরমের মন্দিরের চেয়ে কম কিসে। দুটোর তুলনামূলক আলোচনা বোধ হয় করা চলে; কিন্তু সাধারণ দর্শকদের এই আলোচনায় না নামাই ভাল। এই জাতীয় আলোচনা, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করেন তাদের জন্য তোলা থাক। তবে আমাদের মত সাধারণ দর্শক, যারা এই সব চুল চেরা আলোচনার অধিকারী নন তাঁরাও মাদুরার মন্দির রামেশ্বরমের মন্দিরের চেয়ে কিছু কম নয়, একথা স্বীকার করবেন। আবার অনেকে একথাও বলবেন যে মাদুরার মন্দির রামেশ্বরমের চেয়ে অনেক অংশে ভাল। কথাগুলো ঠিকই।

তবে আমার এই দুটো মন্দির দেখবার পর যে ধারণা হয়েছিল সেইটেই দু এক কথায় বলবার চেষ্টা করি। মাদুরার মন্দিরের ভাস্কর্য রামেশ্বরমের মন্দিরের চেয়ে অনেক ভাল, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু এগুলো দেখলেই মনে হয় যে, সব ভালগুলো এক জায়গায় জড়ো করে লোকের চোখে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে যে কোন রকম খুঁত থাকতে পারে সেটা যেন সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সবটার মধ্যেই ফুটিয়ে রাখা হয়েছে একটা আভিজাত্যের ছাপ। কোথাও যেন আন্তরিকতার ভাব প্রকাশ পায় না। দেবতা পড়ে রয়েছেন দূরে, আর জাঁকজমক সামনে এগিয়ে এসেছে।

এর পাশে রামেশ্বরমের মন্দিরটি দেখলেই ঠিক উল্টো রূপটি চোখে পড়ে। এখানে ভাল মন্দ মিশিয়ে রয়েছে। কোথাও বাজে আড়ম্বর দিয়ে দোষ, কিম্বা খুঁতকে ঢাকবার চেষ্টা নেই। দেবতার রূপটি আগে চোখে পড়ে; অন্য সব কিছু আসে এর পর। সব মিলে মন্দিরটার ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে যায়।

(শেষাংশ ৬৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঐতিহাসিক

শ্রীঋষি দাস

ডাক্তার হিরণ্ময় যখন প্রথমে এ পল্লীতে আসিয়াছিলেন, তখন অজ্ঞ গ্রাম্য লোকদিগের মুখে কতোই না কাহিনী কিম্বদন্তী রটিতেছিল! রটিবারই কথা। গ্রামের এক সুপ্রবীণ জমিদার বংশের পোড়ো ভিটা কিনিয়া তাহার উপর শাদা ধবধবে ময়ূরপক্ষ্মী প্যাটার্ণের এক পাকাবাড়ি হাঁকানো যে কী অলৌকিক ব্যাপার, তাহা গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই বোঝে। কেবল বোঝেন নাই ডাক্তার হিরণ্ময়ের ভাবী প্রতিবেশী সোমকান্ত সাহা।

তাই গ্রামের চাষাভূষোদের কেহ-বা তাঁহাকে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁগো বাবু, যে ডাক্তারবাবু আসতেছেন, তিনি কি খুব হাঁকডাক'ওলা ডাক্তার? নাকি পড়াশুনায় ঢের, হাতযশও খুব। আইলেই হয়, একবার মোর ময়নাটাকে দেখিয়ে লিব। বাবু মাগীটার ভারী ব্যামো, পেট কামড়ায়, পিত্তি উঠে, সেই সঙ্গে..."

সেই সঙ্গে আরও কী উপসর্গ আছে, সাহা মহাশয় শুনিতে চান না, হাসিয়া ফেলেন। এই হাসিটি নাকি সাহা মহাশয়ের পৈত্রিক উত্তরাধিকার। তাঁহার স্বর্গত পিতাঠাকুরও নাকি একদিন এই পৃথিবীতে এমনি করিয়াই হাসিতেন। তাঁহারও বদনমণ্ডলে সমাকীর্ণ ছিল এমনি জমকালো পাঠানী গোঁফ আর দাড়ি। ঠিক এমনিটি। রঙটিও ছিল একেবারে এই রকম, যাহাকে বলে দুধে আলতা। আবার কোনো কোনো মুরুব্বী বলেন, এই উত্তরাধিকার নাকি পৈতামহিক অর্থাৎ গজাইয়াছে দাদাঠাকুরের উত্তরাধিকারসূত্রে। ইহা অবশ্য বিলক্ষণ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। চাষাভুষো মানুষ, তাই সাহাবাবুর হাসি ও গোঁফদাড়ির বংশাবলীর কথা এতোটুকুও না ভাবিয়া বলে, "হাসলেন যে বাবু?"

বাবু বলিলেন, "ওরে পাগল, সে তো সে-ডাক্তার নয় যে তোর ময়নার পেট কামড়ানি দেখবে। ইতিহাসের ডাক্তার সে। ইতিহাসের ভুলচুক আর রোগব্যাধির চিকিৎসা করাই হোলো তার পেশা।"

মূর্খ চাষা ব্যাপারটির বিশেষ কিছুই বুঝিল না। তবে এইটুকু মাত্র বুঝিল, ডাক্তারটির কাজকর্ম সাহা মহাশয়ের হাসির অপেক্ষা অধিক প্রহেলিকাপূর্ণ। এইরূপে ডাক্তারবাবু এই গ্রামের অধিকাংশ লোকের কাছে একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু হইয়াই রহিলেন।

সাহাদের পুরাতন নোনাধরা পাঁজর বাহির হওয়া পাকাবাড়ির পাশেই উঠিয়াছে হলদে রঙের বাড়িখানির সুস্থ সবল মাথাটি। এ যেন পুরাতনের প্রতি নূতনের সনাতন একটা অবজ্ঞা, উদ্ধত্য আর আত্মগৌরবের প্রতীক।

কিন্তু ইহাতে সাহাবংশীয় সোমকান্ত প্রতিবেশীর উপর আদৌ বিরূপ হন নাই। নবাগতদিগকে আদরে আপ্যায়নে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার হিরণ্ময়ের বৃদ্ধ পিতার কর্মহীন জীবনের কাজ হইয়াছে এই সাহা পরিবারের অভ্যন্তরে আসিয়া প্রতিদিনের অর্দ্ধেক অংশ গল্পগুজবে কাটাইয়া দেওয়া। ডাক্তার-গৃহিণীও সাহা-গৃহিণীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং অচিরেই ঘোষণা করিয়া[illegible] তাঁহাদের কণির সহিত সোমপুত্র প্রীতিকুমারের বিবাহ দিয়া[illegible] বন্ধনটিকে বাচ্চাকাচ্চার অটুট গ্রন্থিতে বংশ পরম্পরায় দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দিবেন। এই পরিকল্পনাটি হিরণ্ময়বাবুর পিতা রাধারমণবাবুর ও উৎসাহপূর্ণ সমর্থনটি ডাক্তার-গৃহিণী অপর্ণার।

ও বাড়িতেও আপত্তি উঠে নাই আদবে, বরং অতিমাত্রায় উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছে। কণিকা লক্ষ্মী মেয়ে...... প্রীতিকুমারের সহিত মানাইবে যেন লক্ষ্মীনারায়ণ...আবার মা-মরা মেয়ে...অপর্ণা যতোই ভালোবাসুক, তথাপি সৎ মা তো!......

প্রীতিকুমারের প্রতি ডাক্তার হিরণ্ময়ের প্রীতিটাও নাকি স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতি আছে প্রীতিকুমারের মেধাবী ছাত্র হিসাবে। পিতার অর্থ সামর্থ্যও আছে প্রচুর। অর্থাৎ কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার পক্ষে যাহাকে বলে আশু পাকড়াওযোগ্য পাত্র।

কলিকাতা শহরের পূর্বপুরুষের বাড়ি হইতে হঠাৎ ইঁহারা কেন যে গ্রামে আসিলেন, তাহা অত্যন্ত জটিল; মনস্তত্ত্বের য়্যাকসন্, রিয়্যাকসন্, রিফ্লেক্সন্ ইত্যাদি অনেক প্রকার কচকচিতে পরিপূর্ণ। যাহাই হউক গ্রামে আসিয়া তাঁহারা খুবই খুশী হইয়াছেন। ডাক্তার হিরণ্ময় অবশ্য কলিকাতাতেই থাকেন, কলেজের কার্যব্যপদেশে। তবে ছুটিছাটা পাইলেই এই পল্লীনিবাসে চলিয়া আসেন ধরণীয় প্রথম ট্রেনেই।

এবার ইস্টারের ছুটিতেও আসিয়াছেন।

অর্পণা অবশ্য এখন আর স্বামীর সহিত স্যুটকেশ-সুলভ ঘোরাঘুরি করিতেছেন না। এই পল্লীর আবাসে গুটি তিনেক পুত্রকন্যা এবং ডিসপেপসিয়া লইয়া সদাসর্বদা নাক সিটকাইয়া ও ঠোঁট ফুলাইয়া ঘরকন্না করিতেছেন। দ্বিতীয় পত্নী বলিয়া যে অপর্ণার প্রতি হিরণ্ময়ের প্রেম এতটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রেম রহিয়াছে প্রগাঢ়। তবু পত্নীর ডিসপেপসিয়া এবং রুগ্ন শরীরটা কেমন একটু গোলযোগ বাধাইয়াছে।

হিরণ্ময় বলেন, ছুটি বলিয়া তো জীবনে কিছুই নাই। কাজই ছুটি, আবার ছুটিই কাজ। এই সূত্র অনুসারে সেদিন সকাল-সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি সুরু করিয়াছিলেন ইতিহাসের গবেষণা। পাশের ঘরেই অপর্ণা পুত্রকে ইতিহাস পড়াইতেছেন। হঠাৎ হিরণ্ময়ের কান দুটি খরগোসের কানের মতো সজাগ হইয়া উঠিল। শুনিলেন, পুত্র পড়িতেছে, ডেরিয়াস ...ডেরিয়াস...ডেরিয়াস খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পারস্যে রাজত্ব করিতেন।

এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ সম্রাটের নামটি কানে আসিতেই হিরণ্ময়ের চোখ দুটি আপসে বন্ধ হইয়া আসিল। এক একটি ঐতিহাসিক নাম নয় তো, আফিমের পিল! 'ডেরিয়াস'... 'ডেরিয়াস'...'ডেরিয়াস'...হিরণ্ময়ের মগজের মধ্যে নামটা

ক খাইয়া ঘুরিতে লাগিল আর তাঁহার দেহময় করিল এক পূর্ব রোমাঞ্চের সৃষ্টি। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শিক্ষিতা পত্নী ইতিহাস পড়াইতেছেন, আর ছাত্র পুত্র ইতিহাস পড়িতেছে। অথচ ইহারা কিছুই বুঝিতেছে না। এই ডেরিয়াস নামটির মাহাত্ম্য কতো! নামটাই তো ইতিহাস! হিরণ্ময় অধীর হইয়া উঠিলেন! মানুষের সব সহ্য করা যায়, কিন্তু অজ্ঞতা একেবারে অসহনীয়। হিরণ্ময় একবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন। তথাপি জ্ঞানদানের আনন্দের মূল্যস্বরূপ বেতো শরীরটাকে কষ্ট দিতে কেমন যেন বাধিল। অগত্যা চুপ-চাপ বসিয়া রহিলেন। অশ্রান্ত প্রতিধ্বনির মতো কানে বাজিতে লাগিল...ডেরিয়াস...ডেরিয়াস...

হিরণ্ময় সমুখের বইপত্তর পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ডেরিয়াস...অর্থাৎ ইরাণীয় ভাষায় দারয়বহুস ধারয়বসু বা ধারাব্দসু যাহার অর্থ। সোজা বাঙলায় যিনি বসু বা রত্ন ধারণ করেন। মুকুট হইতে রাজ-প্রাসাদের তোরণ পর্যন্ত সর্বত্রই তো ছিল মণিমাণিক্যের ছড়া-ছড়ি। কেবল নামটির অর্থ বুঝিলেই ডেরিয়াসের প্রতাপ আর ঐশ্বর্যের কথা নিমেষেই বোঝা যায়। অথচ ইহারা এই অর্থমাহাত্ম্যটুকুই ধরিতে পারিতেছে না। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? স্ত্রীর প্রতি বিরক্তিতে ও ঘৃণায় হিরণ্ময়ের মনটা অতর্কিতে পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি চমকিয়া থামিলেন, সামান্য ইতিহাসের জন্য তিনি প্রিয়তমার প্রতি কঠিন হইতেছেন!

বাস্তবিক, আজ পর্যন্ত তাঁহার কাছে ইহা অসমাহিত সমস্যারূপেই রহিয়াছে যে, তিনি কাহাকে বেশী ভালোবাসেন। অপর্ণাকে, না ইতিহাসকে? অপর্ণাকে নিশ্চয়! কিন্তু পলকে মনে পড়ে, ইতিহাস না হাতের পাশে থাকিলে অপর্ণাকে পাওয়াই যে তাঁহার কাছে ছিল একান্ত অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অতীতের কাহিনীগুলি...

সেই সবে প্রথমা স্ত্রী গতাসু হইয়াছেন মাসখানেক। শোকে-তাপে স্বামী হিরণ্ময় সাধ্যমত নিজেকে জর্জরিত করিতেছেন। তাঁহার কাছে জীবনটা যেন একটা বুদ্বুদ...রঙচটা চুপসানো একটা ফানুস। প্রথমা পত্নীর নিঃশ্বাসবায়ুই ছিল এই ফানুসের ভিতরের বাতাস।

হিরণ্ময়বাবুর পত্নীশোকের কৃচ্ছ্রসাধন চলিতেছে রীতি-মত। কাঁদিবার সুযোগ পাইলেই তিনি কাঁদেন, বালিশ জড়াইয়া কাঁদেন। সিনেমায় কান্নার ছবি আসিলেই ছোটেন, নাকি জগতে এই কান্না ছাড়া তাঁহার জন্য আর কিছুই নাই। অবশেষে তাঁহাকে সিনেমাও ছাড়িতে হইল। একদিন কান্নার ছবি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নায়িকার বেয়াড়া কথায় নায়ক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এ কি! নায়কের হাসি থামিয়া গিয়াছে, তবু হাসির শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে! বুঝিলেন, শব্দটা তাঁহার নিজের গলায়। প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসভঙ্গের এত বড় অন্যায়টা তিনি কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, অসমাপ্ত ছবি ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

এমনিভাবেই দিনগুলি কাটিতেছিল।

অকস্মাৎ একদিন বাসে দেখা নিজের কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অপর্ণার সহিত। অপর্ণা একটু হাসিয়া বলিল, 'বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি?'

হিরণ্ময় কি কহিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল একটু কাঁচুমাচু করিলেন। তাহার পর একটু-আধটু আলাপের পর প্রাথমিক সংকোচটা একেবারে ভাঙিল। এমনিভাবে বাসে প্রায়ই দেখা উভয়ের। একদিন অপর্ণা বলিল, 'ইতিহাসটা কী বিশ্রী সাবজেক্ট বলুন তো?'

এ যেন নারীর সুকোমল হাতের বিলক্ষণ একটা ঘুসি। ঘুসির জোর না থাকিলেও নখের ধার আছে। হিরণ্ময় নিজের রক্তাক্ত অন্তরটা লুকাইয়া কোনমতে ম্রিয়মানভাবে একটু হাসিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই অপর্ণা যাহা বলিল, তাহা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

'বাবা বলেছিলেন, ইতিহাসের একজন টিউটরের খোঁজ করতে। মানে...তাই...আপনি যদি...নইলে ফেল করবো একেবারে।'

'বেশ তো।'

তথাপি সেবার অপর্ণা সত্যই অকৃতকার্য হইল ইতিহাসের পরীক্ষায়। কিন্তু কৃতকার্য হইল আর একটি দিকে। কোন শুভক্ষণে ইতিহাসের ডাক্তার ইতিহাসের ফেলকরা ছাত্রীর কাছে দুরন্ত গ্রীষ্মের এক দুপুরে অনেক লজ্জাজনক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমে অপর্ণা রাগিয়া গেলেও, পরে রাগটা অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। হিরণ্ময়ের বয়সই বা আর কী? পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ...। সে-ও তো স্বয়ং কচিখুকী নয়? কথায় বলে, কুড়ি পার হইলেই বুড়ী। অতএব...

কিন্তু এদিকে অপর্ণাপ্রাপ্তির অন্তরায়রূপে আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে হিরণ্ময়ের কাছে। কন্যা কণিকার প্রতি বিমাতা অপর্ণার মনটা যদি কৈকেয়ীর মতো হইয়া উঠে! এই ভাবনায় বিবাহের দিন ক্রমশই পিছাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন লাভ হইল না, মনটা আরও তিক্ত এবং ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবারও তাঁহার পরিত্রাতারূপে দেখা দিল ইতিহাস।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের মনে পড়িল, কৈকেয়ী তো ছিলেন কেকয় দেশের রাজকন্যা। আর সুপ্রাচীন কেকয় দেশ হইতেছে বর্তমান পঞ্চনদ বা পাঞ্জাব প্রদেশ। কথাটা মনে পড়িতেই হিরণ্ময়ের স্বভাবসিদ্ধ সমস্ত বুদ্ধি ও কল্পনা একসঙ্গে ডানা বাঁধিয়া উঠিল। হিরণবাবু তাঁহার মানসচক্ষে দেখিতে পাইলেন, একটি রীতিমত লম্বাচওড়া, মোটাসোটা পাঞ্জাবী মেয়ে ছিলেন এই কৈকেয়ী। তিনি তো নিষ্ঠুর এবং কুটিল প্রকৃতির হইতেই পারেন!

আর অপু, মানে অপর্ণা? সে নিছক বাঙালী ঘরের মেয়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গতিভঙ্গী কিংবা কণ্ঠস্বর সমস্তই যেমন মিহি আর মৃদু, মনটাও তেমনি মার্জিত আর শাঁসালো। অর্পণা, অতএব, কোনদিন নিষ্ঠুর বিমাতা হইতেই পারে না। একটা জাতীয় ঐতিহ্য আর ইতিহাস যে অপর্ণার মনোবৃত্তির

পশ্চাতে রাত্রিদিন কাজ করিতেছে, একথা অস্বীকার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অপর্ণা গৃহিণী হইয়া উঠিলেন।

হিরণ্ময়বাবু কাজ করিতেছিলেন নিজের ঘরে। ইদানীং দক্ষিণপার্শ্বস্থ সাহাদের ভিটার পূর্ব অংশে অতি আধুনিক কায়দায় একটি সৌধ উঠিতেছে। তাই মাঝে মাঝে বাতাসের স্তর ভেদ করিয়া আসিতেছে লোহের শ্রুতিপীড়ক ঝন্ ঝন্ শব্দ। হিরণ্ময়ের স্নায়ুগুলি তাহাতে বিব্রত হইতেছে। কী বর্বর এই সভ্যতা......লোষ্ট্রকাষ্ঠময় এই নাগারিক সভ্যতা হইতে ভারতের সেই জঙ্গলবিলাসী মুনিঋষিদের সভ্যতা ছিল কতই না শান্তিময়! ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইহার একটা অতুলনীয় অপূর্বতা আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথাই হিরণবাবুর মনে পড়িতে লাগিল। তিনি ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া অনুভব করিতে সুরু করিলেন। একটু বাদেই ঘরের মধ্যে চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ পাইয়া হিরণ্ময় তাকাইলেন সেদিকে। সহধর্মিণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দোরের ঠিক চৌকাঠটির উপর। প্রশ্ন আসিল,

'কাল গেছ্লে ডাক্তারখানায়?'

হিরণ্ময় চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। যদিও এই সুযোগে স্ত্রীর সহিত প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদীয় ইতিহাসের দু'চার কথা আওড়াইয়া তাহার সহিত বর্তমান ডাক্তারির একটা তুলনামূলক সমালোচনা করা চলিত, কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হইতে হিরণ্ময় সাহস পাইলেন না। নিতান্ত অপরাধীর মত কোন রকমে ঈষৎ হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'একদম ভুলে গেছি।'

'তা তো যাবেই।'

অপর্ণার ঠোঁট দুইটা যথেষ্ট পরিমাণে স্ফীত হইল। হইবারই কথা। কয়েকদিন তাঁহার হাতের কব্জিতে একটি দাদ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আজকাল তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করিতেছেন, কারণে অকারণে স্বামী-স্ত্রীর শয্যার দুজনের মধ্যে একটা লম্বা উঁচু বালিশ প্রতিরাত্রেই হাজির হইতেছে এবং হাজির করিতেছেন ডাক্তার হিরণ্ময় স্বয়ং। ব্যাপারটি অপর্ণা কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিলেও কিছু বলেন নাই। স্বামী হইলেও মানুষ তো! রোগকে কে না ভয় করে? বিশেষত এই দদ্রুকে! অথচ দাদটা সত্বর সারাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা স্বামীর এতটুকুও নাই।

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া হিরণ্ময় ভীত হইয়া বলিলেন, 'বেশ, বেশ, আমি ডাক্তার আন্‌তে লোক পাঠাচ্ছি।'

'তার মানে?'

পত্নীর মুখে প্রশ্নাত্মক তীব্র তির্যক দৃষ্টি।

'ডাক্তার দেখে শুনে ওষুধ দেবে। ওটা যে দাদ, এ কথাই বা কে বললে?'

'আমি।'

তবু 'ডাক্তারকে—'

'কিন্তু ফী-টা যে দিতে হবে?'

আসল ব্যাপারটি কিন্তু অন্যরূপ। স্বামীর অর্থব্যয় হইবে ভাবিয়া তিনি স্বামীকে মোটেই নিরস্ত করিতেছেন না। তাঁহার লজ্জা করিতেছিল, অপরিচিত একজন পুরুষের কাছে এই লজ্জাজনক ব্যাধিটা কি প্রকাশ করা চলে? এই লজ্জাই তো তাঁহার জীবনের এক কোণে একটি কুমারীকে আজিও নিভৃতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং তাঁহার উপর এই কুমারীটিই প্রতিপত্তি করিতেছে রাত্রিদিন।

হিরণ্ময় স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। ফী-কথাটা তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে। ফী-এর আর্থিক অর্থ নয়, ঐতিহাসিক অর্থ। হিরণ্ময় পারিপার্শ্বিক সমস্ত জগৎ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া চিন্তার সাগরে ডুবিতেছেন,...ফী... ফী...। এই কথাটার মধ্যে একটা জাতির বিরাট ইতিহাস লুকাইয়া আছে। অধুনা-সভ্য একটি জাতি হাজার বছর আগে কেমন করিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগ মিটাইত, অপরের পরিশ্রমের মূল্য দিত, তাহার ইতিহাস।

স্ত্রী স্বামীর ধ্যানাত্মক অবস্থা দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ভাবছ কি?'

'ফী...ফী...' একটু তন্দ্রাজড়িত নেশাতুর হাসি ফুটিয়া উঠিল হিরণ্ময়ের মুখে। 'ফী-এর অর্থ কি জানো অপু?...ফী হচ্ছে গৃহপালিত পশু। পুরাকালে কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তাই পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হ'ত এই গৃহপালিত পশু। পরবর্তীকালে হ'ল মুদ্রার প্রচলন। কিন্তু ফী কথাটা তার অর্থ বদ্‌লে জাতির ইতিহাসে রয়ে গেল। তাই ফী-এর চলিত অর্থ এখন পারিশ্রমিক।'

হিরণ্ময় আত্মশ্রদ্ধার সহিত হাসিতে লাগিলেন।

স্ত্রী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না। সিঁড়িতে শ্বশুরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাথায় কাপড় দিয়া সরিয়া পড়িলেন। তিনি বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, 'রাতদিন তোমার ইতিহাস আর ইতিহাস। ইতিহাস অতীতের সত্যি-মিথ্যেকে নিয়ে জাবর কাটে মাত্র। জাবর কাটা তো ভক্ষণ নয়, ভক্ষণের বিলাস। ইতিহাস তেমনি সত্যিমিথ্যের উদ্ধার নয়, উদ্ধারের বিলাস। তা ছাড়া, ওর সঙ্গে বর্তমানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই বা কতটুকু? এই ধরো, তুমি যদি ইতিহাসের ডাক্তার না হ'য়ে দাদের ডাক্তার হ'তে, তাহ'লে জগতের একজনেরও হয়তো একটু উপকার হ'ত।'

রাধারমণবাবু পুত্রের পাঠাগারে ঢুকিয়া বলিলেন, দেখ তো বাবা হিরু, এই পাতটা কিসের। এটা পাওয়া গেছে মাটির তলায় খাদ খুঁড়তে গিয়ে। সোমকান্ত বললেন, দেখাতে তোকে। ওঁদের অনেক পুরোনো ভিটে কিনা! ইতিহাসের দিক দিয়ে এর যৎসামান্য মূল্যও থাকতে পারে। তামার পাত ব'লেই মনে হচ্ছে।'

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি খাপছাড়াভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, 'উঃ! আমাদের কর্ণটা যে কী! কোনমতে যদি বেরুবে প্রীতির কাছে। যেমনি না বলেছি বউমা, তোমার হবু জামাই এসেছে গো, ও কোথায় ছিল কে জানে, শুনেই পলাতক

আর কি! তারপর ঘরে ঢুকে একেবারে খিল। ব্যস্। আমিও ব'লে এসেছি, প্রীতির কাছে তুই কতদিন না বেরোস, দেখবো, হুঃ।'

পিতার এই সব কথায় এখন আর কান দেওয়ার সময় নাই হিরণ্ময়ের। বাস্তবিক, এই নোংরা বহু পুরাতন তামার পাতে যে কত শতাব্দীর ইতিহাস মূক হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই ক্ষুদ্র তাম্রফলকখানি বাঙলার ইতিহাসের বহুদিনের বহু গবেষণা ও জ্ঞানকে একেবারে নির্মূল করিয়া তাহাকে অভিনবরূপে গড়িবে না? এবং কে বলিতে পারে, সেই ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা হইবেন ডাক্তার হিরণ্ময়।...কে জানে!...

হিরণ্ময়ের মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ু ও সমগ্র দেহের ধমনীগুলিতে রক্তস্রোত প্রবল গতিতে বহিতেছে। আবিষ্কারের সম্ভাবনায় সারা মন উন্মাদ। হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি চশমা, অনুবীক্ষণী এবং রাসায়ণিক দ্রব্যাদি লইয়া বসিলেন।

রাধারমণ পুত্রকে ভালো করিয়াই চেনেন। তাঁহার প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ তাম্রফলক হইতে এমন কিছু আবিষ্কার করিবে, যাহা হইবে বিস্ময়কর। ইংরেজদের ভাষায়, রেভ্যু লুসন্।

তিনি পুত্রকে নির্জনে রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সত্য কথা বলিতে কি, এ সকল জ্ঞানানুশীলনের অপেক্ষা তরুণী নাতনীর সহিত একটু খুনসুটি করিতে তাঁহার ঢের বেশী ভালো লাগে। সেদিনের এতোটুকু কণি কোথায় দিয়া আজ নারী হইয়া উঠিল! দুদিন বাদে তাহার বিবাহ; আরো দু'দিন বাদে সে ছেলেমেয়ের মা। আশ্চর্য। রাধারমণ নাতনীকে ঠকাইবার নানা ফন্দী আঁটিতে আঁটিতে সোপান বাহিয়া নীচে নামিলেন।

বিকালে তিনি সোমকান্তবাবুদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া বলিলেন, বৌমা, আমার জন্য খাবার তৈরী ক'রো না। প্রীতির মা খইয়ের মোয়া পাঠিয়ে দেবে বলেছে। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা খাচ্ছিল। দেখেই ছোট বেলার কথা মনে পড়ল। বললুম, এককালে আমারো প্রিয় ছিল ও খাবারটা।'

কণিকা কোথায় ছিল, জুটিয়া গিয়া বলিল, 'তার মানে হ্যাংলার মতো চেয়ে এসেছ। ইস! বুড়ো বয়েসে কী লোভই না হয় মানুষগুলোর।'

ঠাকুরদা নাতনীর সহিত রীতিমত তর্কবিতর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে যাইতেছিলেন যে, প্রীতির মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মোয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তর্ক সুরু করিবার পূর্বেই পাশে ত্বরিত পায়ের চটির চটপট শব্দ শুনিয়া সেই দিকে তাকাইলেন। হিরণ্ময় হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চোখে চশমা, হাতে তাম্রফলক। হিরণ্ময়বাবু এক প্রকার চীৎকার করিয়াই বলিলেন! সত্যি, একটা আবিষ্কার! সাহারা যে কতো বড়ো সম্ভ্রান্ত বংশ; তা আজ বুঝলাম।'

'কেন? ব্যাপার কি?'

কণিকার কাণ দুটো বাবার প্রতিটি সূক্ষ্ম শব্দ রেখার পিছু পিছু ছুটিতেছে। বাবা বলিতে লাগিলেন, 'এই তাম্রফলকটা ভূমিদানের একটা দলিল। দান ক'রেছেন নবাব হোসেন শাহা। তিনি ছিলেন বাঙলার নবাব। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। সোমকান্তবাবুর পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন হোসেন শাহার আত্মীয়। সোমকান্তবাবুর সাহা পদবীটা তার পরি-চায়ক। সোমকান্ত সাহা যে হোসেন শাহার স্ববংশীয়, তা ধ্রুব সত্য। আরও একটা জিনিস লক্ষণীয়। সোমকান্তবাবুর গোঁফ দাড়ি। একেবারে নবাবী ধরণের! লোকে বলে, তাঁর বাবা আর ঠাকুরদা উভয়েরই নাকি এমনি চমৎকার গোঁফদাড়ি ছিল। আমি বলি, এ'র পূর্বপুরুষ সকলেরই ছিল এমনি গোঁফদাড়ি। খোদ নবাবের বংশ কিনা! সংবাদটা এক্ষুনি সোমকান্তবাবুকে দেওয়া উচিত। তিনি শুনলে খুবই খুশী হবেন সন্দেহ নেই।'

এতোক্ষণে রাধারমণবাবু কথা কহিলেন, 'মুসলমান?'

হিরণ্ময়ের চমক ভাঙিল। তথাপি তিনি নিজের তথ্যটির সপক্ষে বলিয়া চলিলেন, 'শতাব্দীর পর শতাব্দী চ'লে গেছে, সেই সঙ্গে কতো মুসলমান হ'য়ে গেছে হিন্দু আর হিন্দু হ'য়ে গেছে মুসলমান। আজ তারা যে জাতির দোহাই দিয়ে হানাহানি মারামারি করছে, সেটা হয়তো তাদের জাতিই নয়।'

কণিকা এতোক্ষণ ব্যাপারটার পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। সে আহত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। দাদামশায়ও আর কোনো কথা না কহিয়াই ধীর পদক্ষেপে একটা ছায়ার মত অন্যত্র সরিয়া গেলেন। হিরণ্ময়বাবু ফিরিয়া আসিলেন নিজের ঘরে। আবিষ্কারের সমস্ত উত্তেজনা ও উল্লাস নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গিয়া সমস্ত বুকখানা শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। আনন্দ যে মানুষের কাছে এতো তিক্ত হইতে পারে, সে ধারণাও তাঁহার ছিল না।

সারা বিকাল ঘরখানা থমথমে রহিল। সন্ধ্যার মুখো-মুখি রাধারমণবাবু বলিলেন, 'ওদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা চলবে না বউমা। কালই কলকাতা যাওয়া স্থির কর। ওখানে আমরা কণির বিয়ে না দিয়ে তারপর যদি ইচ্ছে হয় এখানে ফিরব।'

কেহ কোনো প্রতিবাদ করিল না।

পরদিন ঐতিহাসিক সপরিবারে কলিকাতা ফিরলেন।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি

শ্রীসঞ্জীব রায়

সূর্য, গ্রহ, গ্রহপুঞ্জ এবং উপগ্রহের সমন্বয়ে সৌরজগৎ গঠিত। সৌরজগতের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, সে সম্বন্ধে খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদগণের জনপ্রিয় মতবাদ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এপর্যন্ত জ্যোতির্বিদেরা নয়টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। বুধ থেকে শনি পর্যন্ত এই ছয়টি গ্রহের কথা পৃথিবীর অতি প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদেরাও জানতেন। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষেরা 'বৃহস্পতি'কে গ্রহরাজ বলেছেন। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু; বিদ্যা এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমকক্ষ নেই বলেই আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা মতপ্রকাশ করেছেন। এখন দেখা যাক্ প্রাচীন জ্যোতির্বিদের এই মতের উপর বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মতের কোন ঐক্য আছে কি না। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরাও বৃহস্পতিকে নয়টি গ্রহের মধ্যে আকারে বড় বলেছেন। পূর্বেকার প্রবন্ধে সৌরজগত সৃষ্টির কথা বলেছি। সেখানে আমরা পেয়েছি, সূর্য থেকে নির্গত বায়বীয় পিন্ডটির আকার 'চুরুটে'র মত হওয়ায় তার দুই দিকের মুখের অংশ ঘনীভূত হয়ে যে গ্রহগুলি সৃষ্টি হ'ল, সেগুলি পিন্ডটির মধ্যবর্তী অংশের গ্রহদের অপেক্ষা আকারে ছোট। কারণ, বায়বীয় পিন্ডটির মধ্যবর্তী অংশে দুই দিকের তুলনায় বেশী পদার্থ সঞ্চিত হয়ে গ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আমাদের গ্রহরাজ বৃহস্পতি সেই বায়বীয় পিন্ডটির মধ্যবর্তী স্থানের বায়বীয় পদার্থ থেকে জন্মলাভ করেছে। বৃহস্পতিকে একটি ছোট রকমের সূর্য বললেই চলে। বৃহস্পতির ব্যাস সূর্যের ব্যাসের দশভাগের একভাগ। এবং পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চাঁদের মধ্যে যে দূরত্ব তর থেকেও বেশী বৃহস্পতির পরিধি। সূর্য এবং বৃহস্পতির ঘনত্ব প্রায়ই একই প্রকারের, তবে আমাদের পৃথিবী থেকে ভিন্ন। বৃহস্পতির আকার বৃহৎ অথচ তার যে শ্রেণীর ঘনত্ব রয়েছে তাতে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, বৃহস্পতির কঠিন অবস্থায় (Solid State) আসতে এখনও অনেক দেরী। বৃহস্পতির ব্যাস প্রায় ৮৬,৭২০ মাইলের মত। অর্থাৎ পৃথিবীর থেকে ১০.৯৫ গুণ বেশী। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে বৃহস্পতির আকার বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন। গ্রহরাজের আকার গোলাকার নয়, দু'পাশের মেরুর দু'দিকে কিছু অংশ চাপা। জ্যোতির্বিদেরা অঙ্ক কষে বলেছেন, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর ব্যাসের মাপ ৮২,৭৮৯ মাইল এবং নিরক্ষবৃত্তের ব্যাসের মাপ ৮৬,৬৯৮ মাইল। বৃহস্পতির আয়তন ১৩১২টি পৃথিবীর সমান; কিন্তু ওজনে মাত্র ৩১৭টি পৃথিবীর মত। গ্রহরাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও পৃথিবীর তুলনায় ২.৬৪ গুণ বেশী। ১৯৪১ সালে পৃথিবীর বিখ্যাত এ্যাথলেট এল স্ট্রীটস ৬ ফিট ১০ ৫/৬ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চস্থান লম্ফনে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করেছেন। তাঁকে বৃহস্পতির দেশে পাঠিয়ে দিলে তাঁর এই রেকর্ড আর থাকবে না। মাত্র কয়েক ফিট লাফাতেই তাঁর দম ফুরিয়ে যাবে। পৃথিবীতে যে জিনিষটার ওজন এক পাউন্ড বৃহস্পতির দেশে সেটা নিয়ে গেলে দেখা যাবে সেটা দাঁড়িয়েছে ২ পাউন্ড ১০ আউন্স। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিষুব-রেখার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই দুইয়ের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুপাত ৬ : ৫। পৃথিবীর মেরু এবং বিষুবরেখার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যেও এই প্রকার তারতম্য দেখা যায়। গ্রহরাজের সর্ববিষয়েই একটু অভিনবত্ব আছে। নিজের দেহভারে এই বিরাট গ্রহটির গতিবেগ পৃথিবীর তুলনায় মন্থর। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে আসতে বৃহস্পতির ১১.৮৬ বৎসর অর্থাৎ বার বৎসর সময় লাগে। দেহের ভার রয়েছে তার উপর কক্ষপথের দূরত্ব অনেকখানি। আমাদের পৃথিবীর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৮.৫ মাইল আর গ্রহরাজ বৃহস্পতি মাত্র ৮.১ মাইল পথ প্রতি সেকেন্ড অতিক্রম করে। পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব সব সময়ে এক থাকে না। এই দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০,০০০,০০০ মাইল পর্যন্ত দাঁড়ায় এবং কমে গিয়ে বৃহস্পতি পৃথিবীর ৩৬৯,০০০,০০০ মাইল নিকটে আসে। এই সময়ে বৃহস্পতির জ্যোতি দূরত্ব থাকাকালীন অবস্থা থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। গ্রহরাজ সাধারণতঃ সূর্য থেকে ৪৮৩,০০০,০০০ মাইল দূরত্ব পথে থাকে। কিন্তু এই গ্রহের কক্ষপথটির অভিনবত্বের জন্যে কোন কোন সময় এই দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৪,০০০,০০০ মাইল দাঁড়ায় এবং হ্রাস পেয়ে বৃহস্পতি ৪৬২,০০০,০০০ মাইলে সূর্যের দূরত্বে আসে। বৃহস্পতি আনুমানিক প্রতি এক বছর এবং একমাস অন্তর তার কক্ষপথে ভ্রমণ করতে করতে স্থির হয়ে যায়। এমন কি পুনরায় পরিক্রমণ করবার পূর্বে পিছন দিকে কিছুদূর ফিরে যায়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে বলেই এইরূপ হয়। গ্রহরাজ প্রায় ঋজুভাবে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করায় বৃহস্পতির আবহাওয়ায় বহুঋতুর সমাগম হয় না। বৃহস্পতির দেশে ঋতুর পরিবর্তন নেই বল্লেই চলে। এই বিষয়ে পৃথিবী একেবারে অন্য রকম। আমরা পৃথিবীতে ছয়টি ঋতুর প্রভাব বুঝতে পারি। বৃহস্পতি নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে প্রচন্ডবেগে ঘুরে এবং একবার ঘুরে আসতে তার মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৪ মিঃ সময় লাগে; জ্যোতির্বিদেরা বলেন, এই গ্রহের দৃশ্যমান উপরিভাগ কঠিন পদার্থের মত এক সঙ্গে ঘুরে না। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিকে সূর্যের পন্থা নিতে দেখা গেছে। কটিবন্ধগুলিও একবার ঘুরতে বিভিন্ন সময় নেয়। বৃহস্পতির নিরক্ষবৃত্তের অঞ্চলগুলি (Equatorial regions) উচ্চতর লঘিমার (Higher Latitude) অঞ্চলগুলি অপেক্ষা খুব দ্রুতবেগে ঘুরে। প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলি দিবারাত্রির পরিধি শেষ করতে ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময় নেয়। কিন্তু মেরুদণ্ডের (Pole) নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি ঐ পরিধি শেষ করতে ৭ মিনিট আরও বেশী সময় নেয়। তাছাড়া দেখা যায়, একই লঘিমার উপরিভাগস্থ চিহ্নগুলি বিভিন্ন গতিতে ভ্রমণ করছে, এমনকি একই চিহ্নকে সময়ে সময়ে আবর্তনের গতি পরিবর্তন করতে

দেখা গেছে। এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি, পৃথিবীর মত বৃহস্পতির দেহ এক কঠিন পদার্থে তৈরী নয়। বাস্তবিকপক্ষে বৃহস্পতির কোন কঠিন দেহ আছে কি না, এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদগণের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শক্তিশালী দূরবীনের মধ্যে জ্যোতির্বিদেরা গ্রহরাজ বৃহস্পতির অদ্ভুত দৈহিক সৌন্দর্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। দৈহিক গঠন-সৌষ্ঠব এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যের যে সমাবেশ বৃহস্পতির মধ্যে জ্যোতির্বিদেরা লক্ষ্য করেছেন, সে সম্বন্ধে কারও আগ্রহ এতটুকু কম নয়। বৃহস্পতির দেহের উপরিভাগে বিভিন্ন বর্ণের দাগ দেখা যায়। কিন্তু এই দাগগুলি বেশী দিন দেখা যায় না। কখনও কখনও দাগ স্থান পরিবর্তন ক'রে ভিন্ন আকার ধারণ করে, আবার কখনও অদৃশ্য হয়ে যায়। জ্যোতির্বিদ-দিগের বিশ্বাস এই দাগগুলি বৃহস্পতির মেঘের চিহ্ন। এ ছাড়া বৃহস্পতির উপরিভাগে কটি বন্ধের আকারে (Belt) অনেকগুলি দাগ রয়েছে। এই দাগগুলিকে বিষুবরেখার (Equator) সঙ্গে সমান্তরলভাবে দেখা যায়। এইগুলি গ্রহের পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুতবেগে আমাদের চোখের সামনে ঘুরছে, সেই কারণে এদের আমরা স্থান পরিবর্তন এবং আকার পরিবর্তন করতে দেখি। প্রথম দর্শনেই এই সমস্ত পরিবেশটি বৃহস্পতির মেঘ বলে আমাদের কাছে পরিচয় দেয়। বিষুবরেখার দুই পাশের প্রত্যেক দিকে একটি গাঢ় রংয়ের চওড়া কটিবন্ধের দাগ রয়েছে। এই দুটি দাগই অপরিবর্তনশীল। বৃহস্পতির উপরিভাগের দাগ গুলির মধ্যে একটি দাগ বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এই দাগটির আকার বিমানপোতের (airship) মত। উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে দাগটি অবস্থান করছে। জ্যোতির্বিদেরা এই দাগটির নাম দিয়েছেন 'বৃহৎ রক্ত চিহ্ন' (Great red spot). ১৮৭৮ সালে এই চিহ্নটি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল, তখন বর্ণ ছিল ঈষৎ রক্তাভ এবং লম্বায় ৩০,০০০ মাইল এবং চওড়ায় ৭০০০ মাইল স্থান জুড়ে ছিল। এক বছর সময়ের মধ্যে দাগটি আরও বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল গাঢ় লোহিত বর্ণে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই দাগটি তার আবির্ভাবের চার বৎসর পরে ক্রমশ বিবর্ণ হ'তে আরম্ভ করে; পরবর্তী কয়েক বৎসরে আবার পূর্ব আকার এবং উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা ফিরে পেলেও ১৮৮০ সালে এই দাগটি যে আকার এবং বর্ণচ্ছটায় দীপ্তমান ছিল, তা আর কখনও ফিরে পাবে না বলেই জ্যোতির্বিদেরা অনুমান করেন। এই লাল দাগটির দক্ষিণে বহু মাইলব্যাপী একটি কালো দাগকে বিস্তার লাভ করতে দেখা যায়। ঐ কালো দাগটি প্রথমে ১৮৯১ সালে অতি ক্ষুদ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর ক্রমশ বৃহৎ স্থান জুড়ে বসে, কিন্তু পরি-শেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিদেরা বলেন, বৃহস্পতির নিজস্ব কোন আলোক নেই। তবে তাঁরা বৃহস্পতিকে উজ্জ্বল দেখাবার কারণ দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে বৃহস্পতির নিজস্ব কোন আলো না থাকলেও এই গ্রহের উপরিভাগ আলো প্রতিক্ষেপনের খুবই উপযোগী। সূর্য থেকে যে আলো পায় তার শতকরা ৬০ ভাগ প্রতিক্ষেপন করে। সূর্যের মত বৃহস্পতির মণ্ডলের (Disc) মধ্যস্থল উজ্জ্বল এবং প্রান্তভাগ অন্ধকার। জ্যোতির্বিদেরা বৃহস্পতির আলোকরশ্মির বর্ণচ্ছটা (spectrum) পরীক্ষা করে এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে একাধিক বায়বীয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের ধারণা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে এমোনিয়া, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন এবং আরগন গ্যাস বিদ্যমান আছে।

গ্রহের আয়তনের উপর উপগ্রহের সংখ্যা অনেকখানি নির্ভর করে। গ্রহরাজ বৃহস্পতি যেমন অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা আকারে বড় তেমনি বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যাও বেশী। বৃহস্পতির ৯টি উপগ্রহ। শনি গ্রহেরও ৯টি উপগ্রহ। এইবার বৃহস্পতির উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদগুলির কথা বলি। এই চাঁদগুলি বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরছে। এইগুলির মধ্যে ৫টি চাঁদের খবর খুব অল্পদিন আমরা পেয়েছি। কিন্তু বৃহস্পতির অপর চারটি বৃহৎ চাঁদ 'টেলিস্কোপ' যন্ত্রের আবিষ্কারের অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৬১০ সালের ৭ই জানুয়ারী খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও তাঁর নবআবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন চারটি ছোট ছোট নক্ষত্র এই গ্রহটির চারপাশে ঘুরছে। গ্যালিলিও তাঁর পৃষ্ঠপোষক Cosmo de Medici-র নাম অনুসারে এদের 'Medicean Stars' নামে অভিহিত করলেন। বৃহস্পতির নিকটতম দূরত্ব অনুসারে গ্যালিলিয়োর আবিষ্কৃত চারটি চাঁদের নামকরণ হ'ল—Io, Europa, Ganymede ও Callisto. বৃহস্পতির প্রথম দুটি চাঁদ আমাদের চাঁদের তুলনায় বড় নয়। কিন্তু শেষের দুটির আকার দ্বিগুণ। বৃহস্পতি থেকে এইগুলির দূরত্ব যথাক্রমে ২৬১,০০০ মাইল, ৪১৫,০০০ মাইল, ৬৬৪,০০০ মাইল এবং ১,১৬৭০০০ মাইল। পৃথিবীর চাঁদের মত বৃহস্পতির চাঁদগুলিরও গ্রহণ হয়। বৃহস্পতির মত এই চাঁদগুলির নিজস্ব কোন আলো নেই। পৃথিবীতে যে পরিমান সূর্যের আলো আসে তার ২৭ ভাগের মাত্র ১ ভাগ আলো বৃহস্পতি এবং তার চাঁদগুলি পেয়ে থাকে। সেইজন্যই এরা বিশেষভাবে আলোকিত নয়। তা নাহলে এরা পৃথিবীর চাঁদের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিক্ষেপণের কাজ করত। বৃহস্পতির Callisto চাঁদটি কিন্তু অদ্ভুত অন্ধকারে আবৃত। বৃহস্পতির এই চারটি চাঁদের প্রভার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাছাড়া প্রতিক্ষেপণ ব্যাপারেও সময়ে সময়ে তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট দেখা যায়। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ সাহায্যে বৃহস্পতির এই বৃহৎ চারটি চাঁদকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের উপরে কতকগুলি স্পষ্ট দাগ রয়েছে। Ganymede চাঁদের উপরিভাগস্থ দাগগুলি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এই দাগগুলি মঙ্গল গ্রহের উপরি-ভাগস্থ চিহ্নের মত। জ্যোতির্বিদেরা এইগুলিকে গভীর খাদের চিহ্ন বলে অনুমান করেন। এই চাঁদগুলি পৃথিবী থেকে এত দূরে আছে যে আমরা কেবল তাদের দেহের উপরিভাগস্থ বৃহৎ দাগগুলিকে পরীক্ষা করে কিছু অনুমান করতে পারি কিন্তু আমাদের অনুমান সত্য না হতেও পারে। ১৬১০ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গ্যালিলিয়োর আবিষ্কৃত এই চারিটি বৃহৎ উপগ্রহই জ্যোতির্বিদগণের পরিচিত ছিল। ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিক্ মানমন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যাপক বার্ণার্ড

(শেষাংশ ৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাল্টা ও সিংহল

বসুবন্ধু শর্মা

ভূমধ্যসাগরীয় রণক্ষেত্রে বর্তমানে নানা কারণে মাল্টা দ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। লিবিয়ার রণক্ষেত্রে জেনারেল রোমেল্‌কে সৈন্য ও রণসম্ভার প্রেরণ করতে হ'লে চক্রশক্তির পক্ষে মাল্টা দ্বীপের পথে জাহাজ পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। বর্তমানে মঃ লাভালের নেতৃত্বে নতুন জার্মান তাঁবেদার ফরাসী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মনে হয় যে, জার্মান গভর্নমেণ্ট আফ্রিকায় রণসম্ভার পাঠানোর জন্য স্ট্রাস্‌বোর্গ-মার্সাই রেল-পথের সুযোগ লাভ করবে। ইতিপূর্বেই ফরাসী অধীনস্থ ভূমধ্যসাগরীয় জলপথ দিয়ে রোমেল্‌ গোপনে অনেক সাহায্য লাভ ক'রেছেন ব'লে মনে হয়। এবার হয়ত খোলাখুলিভাবেই তাঁকে এই পথে সাহায্য পাঠানো হবে। এই সাহায্য প্রেরণে বাধা দিতে হ'লে মিত্রপক্ষের হাতে মাল্টা দ্বীপ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু বিমান আক্রমণে মাল্টাকে ঘায়েল করা যাবে ব'লে মনে হয় না। প্রায় গত দু' বৎসর ধ'রে অজস্র বিমানাক্রমণ সহ্য ক'রে যেরূপ সগর্বে মাল্টা আজও দাঁড়িয়ে আছে, সেটা সত্যই গৌরবের বিষয়। মাল্টার সামরিক কর্মচারীরা এবং অধিবাসীরা যেরূপ অনমনীয় দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা পাওয়া মুস্কিল। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত মাল্টায় দু' হাজারেরও অধিক বিমান আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হ'য়েছে—প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় গড়ে তিনবার এবং এই ছোট দ্বীপটির অধিবাসীদের প্রায় গড়ে চার হাজার বাড়ী ধ্বংস হ'য়ে গেছে। মাল্টা তবু নির্ভাবনায় অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজন হ'লে শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধ সে চালিয়ে যাবেই। এই অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী পৃথিবীর



সিংহলের ত্রিনকোমালী পোতাশ্রয়

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে শত্রু জাহাজকে বাধা দেবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মাল্টাই একমাত্র ঘাঁটি। বর্তমানে মাল্টার উপরে শত্রুপক্ষের ক্রমবর্ধমান বিমান আক্রমণ থেকে বোঝা যায় যে, হিট্‌লার মাল্টাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চান। এবার গ্রীষ্মকালে নাৎসী জার্মানী যে আফ্রিকায় ও রুশ রণাঙ্গণে সমবেতভাবে একটা বিরাট আক্রমণ চালানোর চেষ্টা কর্‌বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই আক্রমণে নাৎসীরা কতটা সুবিধা কর্‌তে পার্‌বে বলা যায় না—তবে তারা যে একটা শেষ চেষ্টা কর্‌বে তাতে সন্দেহ নেই। আফ্রিকায় ভালভাবে যুদ্ধ চালাতে হ'লে মাল্টাকে নীরব কর্‌তেই হবে। তাই মাল্টার বুকের উপরে প্রত্যহ অজস্র বোমা বর্ষিত হ'চ্ছে।

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে। এই অপূর্ব বীরত্বের জন্য সম্প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও এই দ্বীপটিকে সম্মানিত ক'রেছেন।

পাঁচশ জার্মান বিমান একমাত্র মাল্টা আক্রমণের জন্যই রেখে দেওয়া হ'য়েছে। এই বিমানগুলোর মধ্যে অন্তত অর্ধেক বোমারু বিমান। সম্প্রতি এমনও খবর পাওয়া গেছে যে, এই দ্বীপটি দিনে তিনবারও আক্রান্ত হ'য়েছে। এই ঘনীভূত বিমান আক্রমণ থেকে মনে হয় যে, শত্রুপক্ষ শীঘ্রই এই দ্বীপটিকে আক্রমণ ক'রে দখল করার চেষ্টা কর্‌বে। শুধু বিমান আক্রমণের দ্বারা এই দ্বীপবাসীদের যে পরাজিত করা চল্‌বে না একথা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে ; তবে শত্রুপক্ষ হয়ত মনে ক'রেছে যে, বিমান আক্রমণের

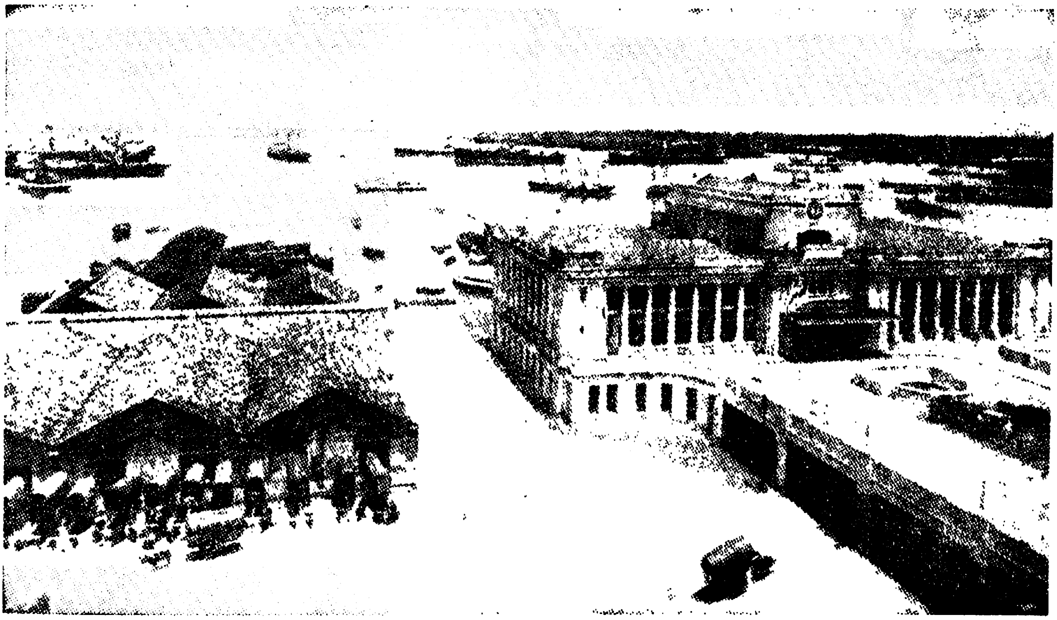
দ্বারা দ্বীপবাসীদের প্রথমে পরিশ্রান্ত ক'রে তুল্‌বে—শেষে একবারে স্থল, জল এবং আকাশ থেকে আক্রমণ ক'রে দ্বীপটি দখল ক'রে নেবে।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ডান্‌কার্কের দুর্ঘটনার পর ব্রিটেন যখন একেবারে কোণঠাসা হ'য়ে পড়েছিল, তখন মনে হ'য়েছিল যে, মাল্‌টা হয়ত অতি সহজেই শত্রুপক্ষের করতলগত হবে। মাল্‌টা থেকে ইটালীয় বিমানের ঘাঁটি মাত্র বিশ মিনিটের পথ। ইটালীয় বিমানের পক্ষে খুসীমত যখন তখন দ্বীপটিতে হানা দেবার সুবিধা ছিল। শত্রু বিমান ঘাঁটি এত নিকটে থাকার ফলেই সামরিক নৌঘাঁটি হিসাবে মাল্‌টার গুরুত্ব গেল কমে। প্রথম শ্রেণীর সামরিক নৌ ঘাঁটির মর্যাদা আর তার রইল না। মাল্‌টার পোতাশ্রয়ে জাহাজের অবস্থিতি কোনদিক থেকেই নিরাপদ নয়; তাই প্রায় সব জাহাজই শত্রুপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে এখানে এসে সামান্য মেরামত ক'রেই অন্য কোন নিরাপদ পোতাশ্রয়ে চ'লে যায়। যুদ্ধ ঘোষণা করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মুসোলিনী এই দ্বীপটি আক্রমণের জন্য তাঁর বোমারু বিমানবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এই দ্বীপে তখন শুধু তিনটি মাত্র পুরানো ধরণের গ্লস্টার গ্ল্যাডিয়েটর (Gloster Gladiator) বিমান ছিল; এই তিনটিই মুসোলিনীর বিমানের ঝাঁককে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এর পরে সুরু হ'ল প্রবলতর আক্রমণ। জার্মান জাঙ্কার, হেইন্‌কেল্‌ ও মেসারস্মিট্‌ এসে যোগ দিল ইটালীয়দের স্যাভোয়া, ফ্যাপ্রোনিস্‌ আর ম্যাকিসের সাথে। ২৭০ দিনে মাল্‌টার বুকের উপরে চারশ' বিমান আক্রমণ হ'ল।

এই দ্বীপের অনেক অধিবাসীই গৃহহারা হ'ল কিন্তু তাদের মধ্যে ভয় কিংবা হতাশার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। নতুন নতুন হারিকেন বিমানের আক্রমণে তারা উজ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌ল—বিমানবিধ্বংসী কামানের গর্জনের সঙ্গে শোনা গেল তাদের হাততালি আর আনন্দধ্বনি। যখনই খাদ্য এবং রণসম্ভার নিয়ে রাজকীয় নৌবহরের জাহাজ মাল্‌টার ভ্যালেট্টা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করে, তখনই সমাগত দর্শকবৃন্দ আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে—হাততালি দেয়।

তারপর মাল্‌টা প্রতিআক্রমণ শুরু কর্‌ল। চক্রশক্তির নৌবহরের উপর মাল্‌টা থেকে যে প্রথম আক্রমণ চলেছিল, তাতে রোমেলের সৈন্যদল প্রায় শেষ অবস্থায় এসে প'ড়েছিল। ব্যাপার কি জানার জন্য গোয়েরিংকে পাঠানো হ'ল ইটালীতে। তিনি ফিরে এসে হিট্‌লারকে বল্‌লেন যে, মাল্‌টা ধ্বংস করতে না পারলে, নাৎসী বাহিনীর পক্ষে সুয়েজ খাল পর্যন্ত পোঁছানো কোনো মতেই সম্ভব হবে না। তাই হিট্‌লার মাল্‌টাকে নিঃশেষ করার মতলব ক'রেছেন। তাই জার্মান বিমানবাহিনী অবিশ্রান্ত মাল্‌টার বুকে প্রবল বিমান আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। মাল্‌টার ভাগ্যে কি আছে, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই আমরা তা' জান্‌তে পারব ব'লে আশা করি। মাল্‌টার ভাগ্যে যাই থাক্‌, এ যুদ্ধে মাল্‌টার বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসে উচ্চস্থান পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘটনাচক্রে সিংহলের অবস্থাও আজ অনেকটা মাল্‌টার মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হিট্‌লার যে মুহূর্তে মাল্‌টার উপরে বিমান আক্রমণের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি ক'রেছেন, ঠিক তখনই জাপানীরাও সর্বপ্রথম সিংহলে বিমান আক্রমণ ক'রেছে। মাল্‌টার সঙ্গে সিংহলের তুলনা করলে কেউ যেন না মনে করেন যে, মাল্‌টার মত সিংহলেরও আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। তবে জাপানী বিমান আক্রমণের ব্যর্থতা দেখে মনে হয় যে, সিংহল বেশ কিছুদিন জাপানীদের ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে।



কলম্বোর বৃহৎ কৃত্রিম বন্দর

সিংহলের উপর জাপানী বিমান আক্রমণ থেকে বোঝা যায় যে, টোকিও ও বার্লিনের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ আছে। পৃথিবীকে সাঁড়াশীর মত আক্রমণের দ্বারা ঘিরে ফেলাই চক্রশক্তির প্রধান ইচ্ছা। তা যদি হয় তবে জাপানীরা যে সিংহলের গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি দখলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সিংহল দখল ক'রে জাপানীরা যে আফ্রিকার উপকূলস্থ মাডাগাস্কার দ্বীপ দখল করার চেষ্টা করবে এমন সন্দেহও অনেকে করেন—আর এই সন্দেহের পিছনে উপযুক্ত যুক্তিও অবশ্য রয়েছে। জাপানীরা ইতিপূর্বেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে যে অঞ্চল দখল ক'রেছে, সেসব অঞ্চল যাতে পুনরায় মিত্রপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে তাদের হস্তচ্যুত না হয়, সে ব্যবস্থা করার চেষ্টা তারা করবে। এইসব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে হ'লে মিত্রপক্ষের হাতে উপযুক্ত নৌঘাঁটি থাকা প্রয়োজন।

এদিক থেকে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ও সিংহল মিত্রপক্ষের এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। যতদিন এই দুটি ঘাঁটি মিত্রপক্ষের হাতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত জাপানের পক্ষে নির্বিঘ্নে প্রশান্ত মহাসাগরে বিচরণ করার সুবিধা হবে না। সিংহলের কলম্বো ও ট্রিঙ্কোমালিতে দুটি সুন্দর প্রথম শ্রেণীর নৌঘাঁটি বিদ্যমান। ভারত মহাসাগরে যদি জাপানী নৌবহরের একাধিপত্য স্থাপন করতে হয়, তবে সিংহল দখল করা জাপানীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানের অভিজ্ঞতা থেকে মিত্রপক্ষ নিশ্চয়ই জাপানীদের রণনীতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জন ক'রেছেন। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সিংহল রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হবে। কাজেই জাপানীদের পক্ষে সিংহল দখল করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না। ভারত মহাসাগরে যুদ্ধের জন্য বর্তমানে সিঙ্গাপুরই জাপানীদের হাতে একমাত্র নৌঘাঁটি। নৌঘাঁটি হিসাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের খুব বেশী গুরুত্ব নেই। এমন কি এই দ্বীপপুঞ্জ থেকেও কলম্বোর নৌঘাঁটি প্রায় নয়শ মাইল দূরে—কাজেই জাপানের পক্ষে বিমানবাহী জাহাজের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এই বিমানবাহী জাহাজ থেকেই সিংহলের উপর প্রথম বিমান আক্রমণ চালানো হ'য়েছিল। প্রথম বিমান আক্রমণে মিত্রপক্ষের হাতে জাপান যেরূপ বাধা পেয়েছে, তাতে বিমানবাহী জাহাজের সাহায্যে সিংহল আক্রমণ করা সুবিধে হবে ব'লে মনে হয় না। ভারত মহাসাগরের বুকে চার পাঁচটি বিমানবাহী জাহাজসহ একটি শক্তিশালী জাপানী নৌবহর ঘুরে গেছে এই বিমানবাহী জাহাজের সাহায্যেই কোকনদে, ভিজাগাপট্টমে কলম্বো এবং ট্রিঙ্কোমালিতে বিমান আক্রমণ চালানো হ'য়েছিল কিন্তু এর কোন একটি বিমান আক্রমণও খুব বেশী সাফল্য মণ্ডিত হয় নি'। তা' ছাড়া বর্তমানে আর এই জাপানী নৌবহরের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—তাতে অনেকেই মনে করছেন যে, সিংহলে জাপানী বিমানবহর খুব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই ক্ষতিপূরণের জন্য নৌবহরটি বর্তমানে সিঙ্গাপুরে ফিরে গেছে যদি মিত্রপক্ষ কোনক্রমে ভারত মহাসাগরস্থ এই জাপানী নৌবহরটিকে পর্যুদস্ত করতে পারেন, তবেই জাপানের আক্রমণ শক্তি নষ্ট হ'য়ে যাবে। মিত্রপক্ষের থেকে নিশ্চয়ই এ চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আগামী কিছুদিনের মধ্যে সিংহল রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। এই যুদ্ধে সিংহলবাসীরা মাল্টাবাসীদের মত অনমনীয় দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করতে পারবে কিনা, সেইটাই হবে দর্শনীয় বিষয়। সিংহলের বহুদিনের যুদ্ধের ঐতিহ্য আছে। বিজয় সিংহ যখন গিয়ে সিংহলে বসবাস সুরু করেন, তার পরে সিংহলের বুকের উপর দিয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে। সিংহলের জাতীয় বীর দুতুগেমুনু ও পরাক্রম বাহুর অধীনে সিংহলবাসীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বীরত্ব প্রদর্শন ক'রেছিল। বর্তমান যুদ্ধেও এই ঐতিহ্য তাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করবে ব'লে মনে হয়।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি

(৬৮৫ পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদটি আবিষ্কার করেন। এই চাঁদটি খুবই ছোট, ব্যাস মাত্র ১০০ মাইল। কয়েক বৎসর পরে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে ঐ মানমন্দিরের অধ্যাপক পেরীণ আলোক-চিত্রের সাহায্যে বার্ণার্ডের আবিষ্কৃত পঞ্চম চাঁদটি অপেক্ষা আরও ছোট বৃহস্পতির দুটি চাঁদ আবিষ্কার করেন। তিন বৎসর পরে গ্রীণউইচ মানমন্দিরের মিঃ মিলোটি ১৯০৮ সালে আলোক-চিত্রের সাহায্যে বৃহস্পতির অষ্টম চাঁদটিকে বৃহস্পতির বহুদূরে সন্ধান পান। এই চাঁদটির কক্ষপথের অভিনবত্ব আছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতির এই চাঁদটি পশ্চাদামনশীল। ১৯১৪ সালে মিঃ নিকলসন লিক মানবমন্দিরে বৃহস্পতির যে নবম চাঁদটি আলোক-চিত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করলেন সেটিও পশ্চাদগমনশীল। জীনস বলেন, যেমন একটি বিরাট শক্তিশালী নক্ষত্র অন্ধ খেয়ালে সূর্যের সন্নিকটে এসে গ্রহগুলির সৃষ্টির কারণ ঘটিয়েছিল, তেমনি সূর্য এবং গ্রহগুলির ব্যবধানের দূরত্ব অল্প হওয়ার ফলেই উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের নিকটে থেকেও বুধ এবং শুক্রের কোন উপগ্রহ নেই। এর কারণ এরা যখন সূর্যের নিকটে এসেছিল তখন এরা এদের বায়বীয় অবস্থা অতিক্রান্ত করে গিয়েছিল। জ্যোতির্বিদেরা গ্রহরাজ বৃহস্পতিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটি গ্রহের বিপদজনক গণ্ডীর অতি সন্নিকটবর্তী হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যেক গ্রহের নিকটবর্তী স্থানে একটি বিপদজনক গণ্ডীর কল্পনা করেন। এই বিপদজনক গণ্ডীটি অতিক্রম করবার চেষ্টা করলে উপগ্রহদের দেহ শতধা হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শনির তিনটি উপগ্রহ এই বিপদজনক গণ্ডী অতিক্রম করতে গিয়ে শাস্তিস্বরূপ অসংখ্য শীলাখণ্ডে ভেঙ্গে পড়েছিল। এই শীলাখণ্ডগুলিই শনির অভিনব চক্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বৃহস্পতির একটি চক্র বা বলয় সৃষ্টি হলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

আজ•কাল

মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যপন্থা

এণ্ডরুজ স্মৃতিরক্ষা তহবিলের জন্য যে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, সে কাজ এতদিন ভালভাবে অগ্রসর হয়নি। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী এই চাঁদা আদায়ে তৎপর হয়েছেন; কয়েক লক্ষ টাকা এরই মধ্যে আদায় হয়ে গেছে। এই সংবাদের মধ্যে অন্যদিক দিয়ে তেমন কিছু গুরুত্ব নেই, কিন্তু এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অনন্য সুলভ নির্মমদর্শিতা, প্রতিজ্ঞানিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে পরলোকগত দু'জন মনীষী—দীনবন্ধু এণ্ডরুজ এবং গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ) প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারপর প্রণিধানের বিষয় হলো, মহাত্মা গান্ধীর নতুন গঠনমূলক কর্মপন্থা সম্বন্ধে চিন্তাতৎপরতা, যুদ্ধের দরুণ যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অজস্র প্রশ্নের উত্তর দান ও আলোচনা করেছেন। বোম্বাই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে তিনি যেসব প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তার থেকে মহাত্মা গান্ধীর বিচারধারার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছেনঃ—যুযুধান দু'পক্ষের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে চীন এবং রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন। ভারতবর্ষের প্রতি বৃটেনের গৃহীত নীতি ও আচরণে তিনি দুঃখ বোধ করেছেন। তিনি বৃটেনের অবনতি বা পরাজয় কামনা করেন না, কিন্তু বৃটেনকে নৈতিক সাহায্য দিতে তিনি অসমর্থ। তিনি বলেন, আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান করা উচিত হয় নি, কারণ আমেরিকা চেষ্টা ও ইচ্ছা করলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। ভারতবর্ষ থেকে যতদিন না বৃটিশ শক্তি সম্পূর্ণভাবে সরে যাবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

শেষে তিনি তাঁর অহিংস নীতির ওপর অবিচল বিশ্বাসের কথা পুনরুল্লেখ করে বলেছেন যে, প্রকৃত অহিংস অসহযোগ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আরও দু' একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা থেকে স্বতই এই কথা মনে হবে যে, তিনি সমস্যার জটিলতাগুলি বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সমাধানের প্রশ্নে এসে যেন যুক্তির সূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। এ কথাগুলিতে যেন একটা নিরাশাবাদের আক্ষেপ রয়েছে। যথা,—তিনি বলেছেন—ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সবরকম চেষ্টাকে সমর্থন করি, যদিও আমি বেশ ভাল করে জানি যে, ঐ রকম সব চেষ্টাই নিষ্ফল হবে।' আরও বলেছেন যে, 'সত্যিকারের অহিংস অসহযোগ এর আগে চর্চা করা হয় নি ; সুতরাং জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে সে রকম সত্যিকারের অহিংস অসহযোগ করবার সম্ভাবনাও নেই।'

মহাত্মা গান্ধীর বিচার প্রণালী সমস্তখানি অনুধাবন করে শেষে মূল প্রশ্নেই ফিরে যেতে হয়, অর্থাৎ সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। দেশরক্ষা তথা জাপ আক্রমণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে, তার উত্তর এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্বন্ধে তিনি প্রকৃত অহিংস নীতির সেবক এবং আদর্শবাদীর মত অকপটভাবে যা বলেছেন তার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু জাপ আক্রমণ, নিছক বিদেশী শক্তির আক্রমণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দেশবাসী তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করে।

ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত

ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বিচারপতি মিঃ ম্যাকনেয়ার ও সেসন জজ মিঃ ম্যাকসার্পকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটিতে হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং সরকারী পক্ষে ২৭৪জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে,—প্রধান প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের মনোভাবের যদি আমূল পরিবর্তন না হয়, তবে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট উত্তেজনা বরাবর থাকবে। রাজনীতি ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার মনোভাবের সকল রকম চেষ্টা করতে হবে এবং একাজে গভর্নমেণ্ট অগ্রণী না হ'লে সাফল্যলাভ হবার আশা নেই।

কমিটির এই মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করার বিষয়। 'প্রথমে হিন্দুরাই আক্রমণ করে এবং হোলীর সময় যে সব ঘটনা ঘটে, তার ফলেই আক্রমণের সূত্রপাত হয়।'

—'পুলিশের কাছে জনসাধারণ যতখানি কাজ ও সাহায্য পাওয়া দাবী করেছিল, ততখানি করা পুলিশের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল।'

—'পাইকারী গ্রেপ্তারের ফলে অনেক নিরপরাধ লোককে নিয়ে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। তবুও এর ফল ভালই হয়েছিল।'

—সাক্ষীরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছে তা অস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

—'গাড়োয়ালী (হিন্দু) সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের ভিত্তি আছে। তাহাদের সম্বন্ধে বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত।'

—'অপরাধীদিগকে তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হয় নি। এ ছাড়া মিঃ জেঙ্কিংসের (পুলিশ সুপার) বিরুদ্ধে অন্য কোন দোষ পাওয়া যায় না।'

কমিটি আরও মন্তব্য করেন যে, এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পেছনে কারণ বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার থেকে সুরু করে, ১৯৩৭ সালের লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, সংবাদপত্রে ও জনসভায় মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার প্রচার, ঢাকা জেলা বোর্ড নির্বাচন ব্যাপার, লোক গণনার ব্যাপার নিয়ে চাঞ্চল্য, চাকুরী ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক অনুপাত প্রভৃতি অনেক কিছু পাওয়া যায়।

ব্রহ্মের যুদ্ধ

য়ুনান প্রদেশে চীনারা জাপানীদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করেছে। যে বৃটিশ বাহিনী কিছুদিন থেকে পিছু সরে আসবার কাজে ব্যাপৃত ছিল, সংবাদ পাওয়া গেছে যে, তারা অবশেষে নিরাপদ স্থানে সরে আসতে পেরেছে। এর পর জাপানীরা চিন্দুইন নদীর উভয় তীরে অবতরণ করতে সমর্থ হয়েছে। ব্রহ্মে জেনারেল আলেকজাণ্ডারের পরিচালনাধীন এই বৃটিশ বাহিনীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে 'টাইমস' পত্রিকা এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছে যে,—এই বাহিনী ব্রহ্মদেশে এতদিন ধরে যেভাবে শত্রুকে বিব্রত করেছে তার ফলে ভারতে দেশরক্ষার আয়োজন সুসংগঠিত করবার অবকাশ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে চীনাদের কৃতিত্ব রয়েছে।

আসামে আবার বোমা বর্ষণ

আবার খবর পাওয়া গেছে যে, পূর্ব আসামের মফঃস্বল অঞ্চলে কোন শহরে জাপানীরা বোমা বর্ষণ করে। হতাহত ও ক্ষতি সামান্য হয়েছে।

অরাজকতার প্রদেশ—সিন্ধু

সিন্ধুতে হুর দস্যুদের উপদ্রব ও দুঃসাহস চরমে উঠেছে। সিন্ধুতে কোন স্থায়ী শাসনব্যবস্থা আছে ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আছে—হুর দুর্বৃত্তরা যেন তার খবরই রাখে না। অবাধ হত্যাকাণ্ড, লুঠতরাজ প্রভৃতি যে সব অরাজকতাসুলভ কাণ্ডকারখানা সিন্ধুতে গত কয়েক বছর ধরে চলেছে, তার তুলনা রাস্ট্রহীন উপজাতীয় এলাকাতেও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি হুর দস্যুরা ট্রেন লাইনচ্যুত করবার জন্য লাইন খারাপ করে রেখেছিল। ফলে করাচী মেল ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। দস্যুরা যাত্রীদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ২৪ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। একদল সৈন্য দস্যুদের পিছু ধাওয়া করে এবং একটা সংঘর্ষ হয়। ফলে দু'জন দস্যু এবং দু'জন সৈন্য নিহত হয়েছে।

এর আগে শোনা গেছে যে, দুর্বৃত্ত দমনের জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টার ত্রুটী করিছেন না। কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার বীভৎসতায় এ কথাই মনে হয় যে, উপযুক্ত লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করে এই অরাজকতার মূলচ্ছেদে যেন আর বিলম্ব না করা হয়।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হ্রাস করা সম্পর্কে ভারত সরকার এক নির্দেশ জারী করেছেন। এই নির্দেশ অনুসারে 'এ' শ্রেণীর এক আনা মূল্যের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ মাত্র হবে।

রুশ রণাঙ্গনের অবস্থা

জার্মানেরা কার্চ উপদ্বীপ দখলের দাবী করেছে। কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যের প্রতিরোধ এখানে শান্ত হয় নি, কার্চ বন্দরটী সম্ভবত জার্মানীর হাতে গিয়েছে। মার্শাল টিমোসেঙ্কোর বাহিনী খারকোভের কাছে একশত মাইলব্যাপী ফ্রন্টে আক্রমণ আরম্ভ করে এগিয়ে চলেছে। জার্মানেরাও এখানে নতুন সৈন্য আমদানী করেছে। খুব বড় রকমের ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলেছে। লালফৌজ এখন জার্মানদের সরবরাহ পথ বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়েছে। কার্চের বন্দর ছাড়া শহরের অন্যান্য অংশ থেকে সোভিয়েট সৈন্যেরা জার্মান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলেও জার্মানদের কিছু হঠে যাবর সংবাদ পাওয়া গেছে।

পুস্তক পরিচয়

দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ:—ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য দশ আনা। *পর্যটন প্রকাশনা ভবন, ১৫৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।*

ভূপর্যটক হিসাবে শ্রীযুত রামনাথ বিশ্বাস বাঙলা দেশে সর্বত্র সুপরিচিত। রামনাথবাবু কেবল ভূপর্যটকই নহেন, তিনি ভাল লিখিতে জানেন, কারণ—ভাবিতে জানেন। তিনি স্বদেশপ্রেমিক এবং মানবতার উদার অনুভূতি তাঁহার অন্তরে আছে। স্বদেশপ্রেম এবং মানবতার সেই অনুভূতির আলোকে তিনি জগতকে দেখিয়া থাকেন; এজন্য তাঁহার লেখায় যুগোচিত প্রবল একটা প্রেরণা প্রাণে পাওয়া যায়। তাঁহার "দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ" পাঠ করিলে সকলেই নূতন চিন্তা এবং ভাবধারার স্পর্শ পাইবেন। সকলেই এই পুস্তকখানা পড়ুন।

গীতি শতক:—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম-এ, বি-টি। প্রাপ্তিস্থান—বি সরকার এণ্ড কোম্পানী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

লেখক পণ্ডিত ব্যক্তি। বইখানাতে একশতটি গান আছে। গানগুলির অধিকাংশই মধুর রসাশ্রিত এবং ভক্তিভাবপূর্ণ প্রার্থনা-সঙ্গীত। গানের রাজ্য অনুমান প্রমাণের রাজ্য নয়, সে রাজ্য পরোক্ষ বিচারের ঊর্ধ্বে প্রত্যক্ষ দর্শনের রাজ্য—সে দেশ ছন্দের দেশ। আত্মসমাহিত অবস্থায় সে সুরের দেশে যাইতে হয়। সেই দিককার বিচারে গানগুলির মধ্যে কয়টি কতটা উৎরাইবে, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অগ্নিশিখা:—শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়, *অষ্টগ্রাম, ময়মনসিংহ। মূল্য আট আনা।*

কবিতার বই। পাঁচমিশেলি কবিতা আছে। কাঁচা হাতের এই সব লেখা ছাপাইবার সার্থকতা আমরা বুঝি না। চিন্তার গাঢ়তা কম।

ঝরণা কলম:—শ্রীগোপীনাথ নন্দী। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছোট গল্পের বই। চারটি গল্প আছে। লেখক এ পথে নবীন বলিয়া মনে হইল। তাঁহার লেখা কয়েকটিতে ছোট গল্প রস আছে, দৃষ্টির বিগাঢ়তার অভাবে সে রস স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে নাই; কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিতে সে হিসাবে সার্থকতার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাজার চলতি মামুলী একঘেঁয়ে গল্পের চেয়ে বইখানার গল্প চারটি অনেক হিসাবে ভাল।

কচুরীপানা—রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্লোব নার্শারী, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কচুরীপানা সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে আছে। কচুরীপানার ইতিহাস কম রহস্যজনক নয়। লেখকের লেখার গুণে সে কাহিনী সরস হইয়া উঠিয়াছে। কচুরীপানার অনিষ্টকারিতার প্রতি লেখক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কয়েকখানা সুন্দর চিত্র থাকায় পুস্তকখানা অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। দুইখানা চিত্র ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।



কলিকাতা ফুটবল লীগ

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলা প্রায় দুই সপ্তাহের উপর আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ক্রীড়ামোদীগণের মধ্যে জল্পনাকল্পনা সুরু হইয়া গিয়াছে যে, এইবার কোন্ দল লীগ বিজয়ী হইতে পারিবে। অতি বড় দুঃসাহসীও এখন হইতে নিশ্চিত কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে পারেন না। তবে মনে হয় মহমেডান দল যদি তাহাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তাহা হইলে খেলায় তাহাদের প্রভূত উন্নতি প্রদর্শন করিতে হইবে। বর্তমানে তাহারা যেভাবে খেলিতেছে, ইহার উপর, অন্তত এইবার তাহাদের উপর তেমন ভরসা রাখা যায় না। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দল যে এইবার তাহাদের রীতিমত বেগ দিতে পারিবে, তাহা একরূপ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

মহমেডান দলের প্রধান অন্তরায়, রীতিমত অনুশীলনের অভাব। এইবার প্রথম হইতে ফুটবল লীগে তাহারা খেলিবে কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা করা গিয়াছিল। এইরূপ জনরব শুনা গিয়াছিল যে, মহমেডান দল বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য লীগের কোন খেলায় যোগদান করিবে না। কিন্তু তাহা শেষ পর্যন্ত অমূলক বলিয়াই পরিণত হইল। কিন্তু মহামেডান দলের টীম গঠনও একরূপ সমস্যা। বাঙালী খেলোয়াড় তাহাদের দলে দুই একজন আছে কিনা সন্দেহ। সুদূর দিল্লী, সীমান্ত প্রদেশ, কোয়েটা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি বিভিন্ন ফুটবল কেন্দ্রের খেলোয়াড়ের উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয়। তাহাদের খ্যাতি যেভাবে বর্ধিত হইয়াছে, এখন আর তাহারা স্থানীয় খেলোয়াড়ের দ্বারা টীম গঠন করিয়া ভরসা করিতে পারেন না। সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলিম খেলোয়াড়ের সমন্বয় করিতেই হইবে। এইবার একেবারে শেষ সময়ে মহামেডান দল বিভিন্ন খেলোয়াড়কে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠায়। তাহারা তাড়াহুড়া করিয়া যখন এখানে আসিয়া পেঁছিলেন, তখন লীগ খেলা একরূপ সুরু হইয়াছে। অবশ্য মহামেডান দলের কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের জন্য লীগ তালিকার খেলাও কিছু অদলবদল করিয়া দিতে হইল। ফুটবল খেলায় মহামেডান দল যখন এইরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, আই এফ এ নিশ্চয়ই তাহাদের আবদার (যদি কখন অন্যায় বলে মনে হয়) রক্ষা করিবে।

মহামেডন দল অবশ্য প্রথম খেলায় তত ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারে নাই, ভবানীপুর দলের সহিত তাহাদের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিতে হইয়াছে। পরবর্তী খেলায় কাষ্টমস ও রেল দলকে সহজেই পরাজিত করিয়াছে। কাষ্টমস দলকে মহামেডান দল আবার দশ গোলে পরাজিত করিয়াছে, অবশ্য কাষ্টমস দলকে এইবার কোনরূপে টীমই বলা যায় না, জোড়াতালি দিয়া কোনরকমে তাহারা এগারজন খেলোয়াড়কে মাঠে দাঁড় করায়। অন্যবার মহামেডান দল লীগ খেলার পূর্বে, রীতিমত অনুশীলন করিবার সুযোগ পায়, কিন্তু এইবার একেবারে শেষ সময়ে উপস্থিত হওয়ায় তেমন সুযোগ তাহারা পায় নাই। সুতরাং এখনও তাহাদের খেলায় সম্পূর্ণ আড়ষ্টের ভাব কাটিয়া যায় নাই। মহমেডান দলে সেণ্টার হাফে নুর মহম্মদকে (বড়) পুনরায় এইবার খেলার মাঠে দেখা যাইতেছে। পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে নুর মহম্মদ প্রায় দুই বৎসর কোন খেলায় যোগদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু এইবার তিনি পূর্বের ন্যায় 'বিক্রমেই' খেলিতেছেন।

ইষ্টবেঙ্গল দল যেন এইবার গোড়া হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এ পর্যন্ত তাহারা সর্বসমেত পাঁচটি ম্যাচ খেলিয়াছে এবং সকল খেলাতেই তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। লীগের গোড়ার দিকে ইষ্টবেঙ্গল দলকে এইরূপভাবে খেলিতে খুবই কম দেখা গিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দল ইতিপূর্বে বহুবার ভাল খেলিয়াও শেষ পর্যন্ত লীগ বিজয়ী হইতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ, এই দল প্রায় সকল খেলায় সমান নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে না। 'বড়' খেলায় তাহারা ভাল খেলে, আবার অন্য খেলায় হয়ত বা তাদের নিকৃষ্ট দলের নিকটও হার স্বীকার করিতে হয়। ইষ্টবেঙ্গল দলের আপ্পারাও ও রামালু এখনও আসিয়া পেঁছিতে পারেন নাই এবং শীঘ্রই তাহাদের এখানে পেঁছিবার সম্ভাবনা আছে।

মোহনবাগান দল এইবার লীগের সূচনা বেশ ভালভাবেই আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পর পর তিনটি খেলায় জয়ী হইবার পর কালীঘাট ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের সহিত তাহাদের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিতে হইয়াছে। কিন্তু খেলা অনুযায়ী এইভাবে পয়েণ্ট ভাগাভাগি করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, অথচ প্রকৃত খেলার মাঠে তাহারা জয়ী হইতে পারে নাই। অন্যবারের তুলনায় মোহনবাগান দলে এইবার অনেক খেলোয়াড় আছেন বটে, কিন্তু সেণ্টার হাফ ও সেণ্টার ফরোয়ার্ডের স্থান পূরণ লইয়া সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। সেণ্টার ফরোয়ার্ডে এস ঘোষ কিংবা সি মুখার্জি কেহই আশানুরূপ খেলিতে পারেন নাই। এইবারও কি পুনরায় এ রায় চৌধুরীর উপর নির্ভর করিতে হইবে?

এরিয়ান্স দলের খেলায় এইবার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, পর পর চারিটি খেলায় তাহারা জয়ী হইতে পারিয়াছে এবং পরবর্তী খেলায় যদি তাহারা সমান নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যে লীগ বিজয়ী হইতে পারিবে না, একথা কে জোর করিয়া বলিতে পারে। ১৯৪০ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হওয়ার পর এরিয়ান্স দলের ফুটবল ইতিহাসের নূতন অধ্যায় সূচনা হয় এবং এইবার লীগ বিজয়ী হইতে পারিলে সেই খ্যাতি তাহারা ভালভাবেই বজায় রাখিতে পারিবে।

ভবানীপুরে দলে বহু নামকরা খেলোয়াড় আছে এবং মহামেডান দলের বিরুদ্ধে তাহাদের নৈপুণ্যের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কালীঘাট ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলে অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড়, তাহারা যে, কোন্ ম্যাচে ভাল খেলিতে পারিবে এবং কোন্ ম্যাচে পারিবে না, তাহা পূর্বাহ্নে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

ইউরোপীয় দলের মধ্যে কোন দলকেই তেমন শক্তিশালী বলা যায় না। পুলিশ, রেঞ্জার্স, ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী কেহই খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারিতেছে না।

অফিস দল হিসাবে কাষ্টমস ও বি এণ্ড এ আর দলের কথা বলা যাইতে পারে। ভারতীয় ও ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে এই দল গঠিত হয়। কাষ্টমস দলের এইবার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহা পূর্বে কখন দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে রেঙ্গুন কাস্টমসের কয়েকজন খেলোয়াড় স্থানীয় কাস্টমস দলে খেলিতে পারে। ফুটবল খেলায় রেঙ্গুন কাস্টমস দলের বেশ খানিকটা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে এবং তাহাই খানিকটা ভরসার কথা। রেল দলের টীম খুব মন্দও নহে, বিশেষ ভালও নহে। লীগ কোঠায় মাঝামাঝি তাহারা নিজেদের স্থান দখল করিয়া লইতে পারিবে।

রেফারী নিয়োগ সমস্যা

আমাদের এখানে ফুটবল খেলায় যে ক্রমশ অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। খেলার পরিচালনা সম্পর্কে কি সেই একই কথা বলা যাইতে পারে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ দেখা যায়। পরিচালকের দোষ গুণের উপর খেলার ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে, সুতরাং কোন অনভিজ্ঞ রেফারীর উপর কোন ভাল খেলার পরিচালনার ভার যদি ন্যস্ত হয়, তাহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। সম্প্রতি লীগের একটি খেলায় এইরূপ দেখা গিয়াছে। মহামেডান ও রেল দলের খেলায় এমন একজন রেফারীকে দেখা গেল, যাহাকে ইতিপূর্বে কলিকাতার কোন মাঠে খেলা পরিচালনা করিতে দেখা যায় নাই। তাহার ভুলভ্রান্তি হইল বিস্তর, তিনি যে-কোন কারণেই যখন মনে করিয়াছেন, 'রামের অপরাধে শ্যামকে দণ্ড দিয়াছেন' এবং অনেক সময় কল্পিত অপরাধে 'সাজার' ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহা ছাড়াও সবচেয়ে বেশী, খেলার আইন সম্পর্কেও তিনি খুব অভিজ্ঞ নহেন। এই সকল আলোচনা সংবাদপত্রে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহারই পুনরায় আলোচনা আমরা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমাদের বলার উদ্দেশ্য রেফারীর পরিচালনা অপেক্ষা, তাঁহাকে যাঁহারা উক্ত খেলার পরিচালনার ভার দিয়াছেন, তাঁহাদের ত্রুটী অনেক বেশী। জানিয়া শুনিয়া এইরূপ অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা রেফারীকে বড় খেলায় নিয়োগ করিবার হেতু কি? কলিকাতায় রেফারীর দুর্লভ ঘটিয়াছে, এইরূপও শুনা যায় নাই। নূতন এবং তরুণ রেফারীর উপর খেলার ভার দেওয়া হউক এবং ইহা আমরা নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে আগে জানিতে হইবে। নিম্নে লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান দেওয়া হইলঃ—

নদকারণী ফুটবল ফাইন্যাল

বোম্বাইয়ে নদকারণী ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফাইন্যালে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমোবাইল দল (২-০) গোলে বি ই এস টি দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়।

উভয় দলের খেলার তুলনামূলক বিচার করিলে অটোমোবাইল দলের জয়লাভ একান্ত সঙ্গত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহাদের খেলার মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও জয়লাভের দৃঢ় বাসনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়গণের ক্রীড়া নৈপুণ্যে গোলরক্ষক কাদের ভেলু কোন সময়ই বিব্রত বোধ করেন নাই। আক্রমণভাগে ভীম রাও ও টমাস পরস্পর আদান প্রদান করিয়া খেলিয়া অধিকাংশ আক্রমণের সূচনা করেন। বিজিত বি ই এস টি দলের আলেকজাণ্ডারের খেলা খুবই প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিনি এরূপ বিচক্ষণতার সহিত না খেলিলে বি ই এস টি দলকে অধিক গোলে পরাজিত হইতে হইত। ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমোবাইল দলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন,—কাদের ভেলু; সোলমন ও রঙ্গম; নারায়ণ চন্দ্র ও গোবিন্দ; নাইডু, ভীম রাও, মূর্তি, টমাস ও ধাদুরাম। বি ই এস টি দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেনঃ—ওলিভেরা; রাজা ও আলেকজাণ্ডার; শ্রীপথ রাও, তেলঙ্গ ও মজুমদার; রায়, স্বামী, বালাম, শিবরাম ও মিচেন।

বোম্বাই হিন্দু জিমখানার সিদ্ধান্ত

বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির জন্য বোম্বাই সরকার মুসলীম ও পার্শী জিমখানার মাঠ ও প্যাভেলিয়ান দখল করিয়াছেন। ফলে উক্ত উভয় জিমখানার সভ্যবৃন্দ খেলিবার, এমন কি বসিবার স্থান হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন; এইভাবে দুইটি বিশিষ্ট জিমখানার সভ্যবৃন্দ বসিয়া থাকিলে ক্রীড়াস্পৃহা স্বভাবতই মন্দীভূত হইবার আশঙ্কায় হিন্দু জিমখানার সভ্যগণ উক্ত বিষয় আলোচনার জন্য এক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সভায় স্থির হইয়াছে যে, হিন্দু জিমখানা মুসলীম ও পার্শী জিমখানার সভ্যবৃন্দের নিকট হইতে কোনরূপ চাঁদা না লইয়া নিজেদের জিমখানায় তাঁহাদিগকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দান করিবেন। হিন্দু জিমখানার এই উদারতায় বোম্বাই তথা ভারতের ক্রীড়ামোদীবৃন্দ বিশেষ সুখী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরন্তু তাহাদের এই সিদ্ধান্ত বোম্বাইয়ের খেলাধুলা পরিচালনার বিশেষ সহায়ক হইবে।

সমরবার্তা

১৩ই মে—

ব্রহ্মের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১০ই মে জাপানীরা সুইগিনের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বৃটিশ সৈন্যদল এখন ইউ'এর উত্তরাংশের ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়াছে। জাপানীরা লুংলিং এলাকায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। লুংলিং চিফাং'এর ৪০ মাইল উত্তর-পূর্বে এবং ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল রোমেল লিবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হয়ত রুশ রণাঙ্গনের কোথাও সেনাপতি নিযুক্ত করা হইবে।

রুশ রণাঙ্গন—জার্মান হাইকম্যাণ্ড কর্তৃক ঘোষিত হয় যে, কার্চ উপদ্বীপ জার্মানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে বলিলেই চলে।

১৪ই মে—

ব্রহ্ম-চীন—চুংকিংয়ের ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীদের পশ্চাৎবর্তী চীনাবাহিনী মান্দালয় ও লাসিওর এবং ভামো ও মিচিনার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। জাপানীদের অগ্রগামী বাহিনী ইউনান সীমান্ত ভেদ করিয়া দুই শত মাইল দূরে ব্রহ্ম রোডের উপর অবস্থিত পাওশানে পৌঁছিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী খারকভের দিকে অভিযানে জার্মানদের প্রথম ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। জার্মানরা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

১৫ই মে—

ব্রহ্মের বৃটিশ বাহিনী বিপন্মুক্ত হইয়াছে। নয়াদিল্লীর এক সংবাদে উহা ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে, লাসিওর উপর জাপ আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সেনা সাহায্যে পুষ্ট জাপ বাহিনীর প্রবল চাপে ও চিন্দুইন নদী ধরিয়া উত্তর দিকে জাপানীদের অপর একটি বাহিনীর অগ্রগতির আশঙ্কায় ব্রহ্মের বৃটিশ বাহিনী যে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আটক পড়িয়াছিল, উহা হইতে তাহারা নিজদিগকে উদ্ধার করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে চলিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে। বৃটিশ বাহিনীর এই পশ্চাদপসরণে জেনারেল আলেকজেণ্ডারের অসামান্য সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

১৬ই মে—

রুশ রণাঙ্গন—বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, এক বিশেষ জার্মান ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, জার্মান বাহিনী গতকল্য কার্চে প্রবেশ করিয়াছে। জার্মানদের কার্চ নগরী দখল করার দাবী লণ্ডনে সমর্থিত হয় নাই। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী জার্মান রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া খারকভের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-চীন—চুংকিংয়ের সমর বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপ বাহিনী ব্রহ্ম-ইউনান পথে লুলিং হইতে উত্তরমুখী অভিযান চালাইয়া ১১ই মে তারিখে কুচেং দখল করিয়াছে। লণ্ডনে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, সোয়েগিনের উত্তরে ব্রহ্মে অবস্থিত বৃটিশ বাহিনীর সহিত জাপ সৈন্যদের সংঘর্ষ হইয়াছে। বৃটিশ বাহিনী তাড়াহুড়া করিয়া ভারতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল হইবে।

১৭ই মে—

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য প্রাতে শত্রুপক্ষের বিমানবহর পূর্ব আসামের একটি ছোট শহরে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য এবং ক্ষতির পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্ম-চীন—চুংকিংয়ের এক সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, চীনাদের আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউনান প্রদেশের অন্তর্গত হুংমুসুর নিকটে একটি জাপানী বাহিনীর অর্ধাংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। জাপানীরা প্রধান বার্মা রোডের দিকে হঠিয়া গিয়াছে। চীনের নানাস্থানে উভয়পক্ষের সংঘর্ষ হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—"রেড স্টার" পত্রিকায় প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী গতকল্য খারকভ রণাঙ্গনে বহু জনপদ শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। খারকভকে প্রধান ঘাঁটি করিয়া হিটলার বসন্ত অভিযানের জন্য যে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী এখন সেই জার্মান ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে ৭৫ হাজারের বেশী জার্মান নিহত হইয়াছে।

১৮ই মে

ব্রহ্ম-চীন—চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, লুইলিংয়ের উত্তর-পূর্বে সালুইন নদীর পশ্চিম তীর হইতে জাপানীরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে। জাপ সৈন্যেরা চিন্দুইন নদীর উভয় তীরে বিনা বাধায় দুই এক স্থানে অবতরণ করিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—লণ্ডনে কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, খারকভ অঞ্চলে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যগণ এক শত মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইতেছে। জার্মাণরা কার্চ শহর অধিকার করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১৯শে মে

ব্রহ্ম-চীন—চীনা ইস্তাহারে জাপানীগণ কর্তৃক চুকি অধিকারের কথা ঘোষিত হইয়াছে। চুকি শহরটি চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিনহোয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। চীনের একজন মুখপাত্র বলেন যে, বহু সংখ্যক নূতন জাপ সৈন্য ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দোচীন ও চীনের ইউনান প্রদেশের সীমায় জাপ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে।

মিয়েন ইয়াংয়ে জাপ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া হ্যাঙ্কাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত চেলু হইতে চীনারা জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। বৃটিশ বিমানবহর পুনরায় আকিয়াবে ও কালেওয়ার উত্তরে চিন্দুইন নদীর তীরস্থ অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

কমন্স সভায় যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে দুই দিনব্যাপী আলোচনার উদ্বোধনে সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলেন, "ভারতে আমাদের সৈন্যদের বল বৃদ্ধির জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। জাপান ভারত আক্রমণ করিবে কিনা তাহা এখনও সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রাসনোগাদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৩ই মে—

ভারত গভর্নমেণ্টের এক নূতন অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত অর্ডিন্যান্সে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার পরিপন্থী কয়েক শ্রেণীর অপরাধের জন্য যে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে পাইকারী জরিমানা করার ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বণিক সমিতির এক পত্রের উত্তরে বাঙলার গভর্নর এই মর্মে আশ্বাসদান করিয়াছেন যে, অধিবাসী স্থানান্তর সম্পর্কে বাঙলা সরকার কর্তৃক কোন পরিকল্পনা রচিত হইলে, তাহাতে কোনরূপ জাতি বা বর্ণ-বৈষম্যকে স্থান দেওয়া হইবে না।

১৪ই মে—

বাঙলার গভর্নর হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় ১৯৪২ সালের স্পেশ্যাল ক্রিমিন্যাল কোর্টস্ অর্ডিন্যান্স (১৯৪২ সালের ২নং অর্ডিন্যান্স) এবং পেনাল্টি অর্ডিন্যান্স (১৯৪২ সালের ৩নং অর্ডিন্যাস) জারী করিয়া কয়েকজন জজকে স্পেশ্যাল জজের এবং কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

১৫ই মে—

সংবাদপত্রসমূহের সর্বোচ্চ পৃষ্ঠাসংখ্যার পরিমাণ আরও হ্রাস করিয়া ভারত সরকার একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই সংশোধিত আদেশ অনুসারে 'এ' শ্রেণীর যে সমস্ত সংবাদপত্র একখানি এক আনা মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহার সর্বোচ্চ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ পর্যন্ত হইতে পারিবে। অর্থাৎ একখানি 'এ' শ্রেণীর সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠার সর্বনিম্ন মূল্য এক পয়সা বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১লা জুন হইতে উহা বলবৎ হইবে।

১৬ই মে—

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইয়ে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, চীন এবং রুশিয়ার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে। বৃটেন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, ভারতবর্ষের প্রতি বৃটেনের আচরণে তাঁহার মন গভীর দুঃখে পূর্ণ হইয়াছে। আমেরিকা সম্পর্কে গান্ধীজী এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, আমেরিকা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া এই যুদ্ধে যোগ দেওয়া তাহার নিজের পক্ষে অন্যায় এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে শোচনীয় হইয়াছে।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বিমানযোগে মাত্র সাড়ে ৪ দিন সময়ের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

দিল্লীতে নিঃ ভাঃ ছাত্র (কমিউনিস্ট) যুদ্ধ সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন হয়। সভার কার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দিল্লী প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ কে, পি, শঙ্করের নেতৃত্বে একদল ছাত্র (কংগ্রেস) উদ্যোক্তাদের ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে কথা বলার দাবীতে আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করিলে সম্মেলনে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি, বি, জেমসন গত ৮ই মে তারিখে শত্রুবিমান আক্রমণের ফলে যে সমস্ত লোক আহত হইয়াছে, তাহাদিগকে "সামরিক ভাতার" ও "কাজের অক্ষম হওয়ার দরূণ" পেন্সনের দরখাস্ত করিবার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি বাহির করিয়াছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রী-পরিবারগণকেও পারিবারিক পেন্সন ও শিশুদের ভাতার দরখাস্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

১৭ই মে—

সিন্ধুতে হুর দস্যুদের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত রাত্রে করাচী হইতে ১৫০ মাইল দূরে টান্দোয়াদাম ও উদারোলাল স্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটি সাঙ্ঘাতিক ট্রেন দুর্ঘটনা ও তাহার সহিত ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। করাচী ত্যাগ করিবার পর পাঞ্জাব মেল লাইনচ্যুত হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে ২২জন লোক নিহত ও ২৬জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, হুর দস্যুরা রেল লাইন অপসারিত করিবার ফলেই এই লাইনচ্যুতি ঘটিয়াছে। হুর দস্যুরা মেলভ্যান লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হইতে ওয়ার্ধা যাত্রা করিয়াছেন। গান্ধীজী এক সপ্তাহকাল বোম্বাই শহরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি এণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল ফণ্ডের জন্য ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

গতকল্য বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের দাবী পুনরুল্লেখ করেন।

১৮ই মে—

শিলং হইতে এ, পি'র এক সংবাদে প্রকাশ, প্রয়োজন হইলে আসাম যাহাতে নিজকে এবং ভারতের অবশিষ্টাংশকে রক্ষা করিতে পারে, তাহার জন্য আসাম প্রস্তুত হইতেছে। প্রাদেশিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। জরুরী অবস্থার জন্য সমস্ত কিছুই প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহে যে সমস্ত সমরোপকরণ আসামে আনা হইয়াছে, তাহর বিবরণ গোপন রাখা হইয়াছে। তবে দেখিয়া শুনিয়া ধারণা হয়, কোন শত্রু স্থলপথে বা বিমানপথে আক্রমণ করিলে তাহাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট।

খ্যাতনামা বাঙালী বৈমানিক ফ্লাইং অফিসার কে, আর, দাস গত ১০ই মে এলাহাবাদে এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন।

উদারোলালের ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারী বিবরণে জানা যায় যে, ট্রেন দুর্ঘটনায় ২৪জন মারা গিয়াছে এবং ৩০জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্য দায়ী হুর দস্যুগণ। দস্যুদলের পশ্চাদনুসরণকারী সৈন্যদের সহিত হুর দস্যুদের এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুইজন হুর দস্যু ও দুইজন সৈন্য নিহত হইয়াছে।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও বিশ্বভারতীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দেবী তাঁহার বেলঘরিয়াস্থিত বাস ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৯শে মে

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটির প্রধান সুপারিশে বলা হইয়াছে যে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং নেতৃবর্গের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। রাজনীতি ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে যাহাতে অধিক পরিমাণে সহনশীলতার সৃষ্টি হইতে পারে, তজ্জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। গভর্নমেণ্ট অগ্রণী না হইলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং এইরূপ অবস্থার উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত হোলী প্রভৃতি যে সমস্ত উৎসবে উত্তেজনা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত হয়, কর্তৃপক্ষকে সেই সমস্ত উৎসব আরও অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আদিম ভারতের সংস্কৃতি

হৃদয় বিশ্বাস

হিন্দু সংস্কৃতির আদি রূপ কি ছিল, তা ঐতিহাসিকের কাছে একটি বড় গবেষণার বিষয়। আজ আমরা যাকে হিন্দু সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে থাকি, তার প্রেরণা ও প্রকৃতির সবটাই নিশ্চয় ভারতের সৃষ্টি নয়। বর্তমান হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মহামানবের সংস্কৃতির সহস্র ধারা এসে ক্রমে ক্রমে মিশেছে এবং মিশছে। আজ কোন স্মৃতিকার এসে সমুদ্র যাত্রাকে গর্হিত বলে ভারতবাসীর ওপর বিধান দিতে আসে না। কালাপানি পার হওয়ার কথায় আজ কারো ধর্মবোধ বিদ্রোহ করে ওঠে না। রাজনীতি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমস্ত সভ্য জগতের ওপর দিয়ে সাংস্কৃতিক দান প্রতিদান ও বিনিময়ের এক প্রক্রিয়া চলেছে। ফলে দেশে দেশে সাংস্কৃতিক সাম্য ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করছে।

বর্তমান ভারত সম্পর্কে যেমন এ কথা বলা যায়, তেমনি বলা যায় প্রাচীন ভারত ও আদিম ভারত সম্বন্ধে। মানব সভ্যতা কোন কালেই Static ছিল না। যে মুহূর্তে যে কোন দেশের সভ্যতা তার এই বেগ ও শন্দ হারায়, সেই মুহূর্তে তার মৃত্যুও ঘনিয়ে আসে। প্রাচীন পৃথিবীর এক একটি সভ্যতার পতনের মধ্যে এই সত্যের প্রমাণ দেখতে পাই—সংকোচ, সঙ্কীর্ণতা, কমঠধর্ম ও নিরুৎসাহের জন্য প্রত্যেক সংস্কৃতির বিলোপ হয়েছে।

মানব সভ্যতার যখন আদিম অবস্থা তখনো এই ভাবে দেশে দেশে, পর্বত কান্তার ও সাগরের বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রবাহ বয়ে গেছে। রক্তের মিশ্রণও বর্ণসাঙ্কর্যের মত আচার আচরণ ধর্মবিশ্বাস ও অন্যান্য সকল রকম কর্ম ও চিন্তার রীতিনীতিরও সাঙ্কর্য পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ঘটেছে।

আর্য আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে, এ কথা প্রায় ঐতিহাসিক মেনে নিয়েছেন। সেই আর্য সভ্যতার রেশ এখনো ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতার মধ্যে মিশে রয়েছে। অবশ্য বৈদিক সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতা বলতে একই অর্থ বোঝায় না। তবে বৈদিক সভ্যতা থেকে হিন্দু সভ্যতা পর্যন্ত নানা সাংস্কৃতিক সংঘটন আন্দোলন ও পরিণতির একটা সুস্পষ্ট ক্রম আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আদিম ভারত বলতে প্রাগার্য ভারতই বোঝায়। সেই প্রাগার্য ভারতে বাইরে থেকে নানা বিভিন্ন জাতি ও সেই সঙ্গে নানাজাতীয় সংস্কৃতি প্রবেশ লাভ করেছিল। সেই সংস্কৃতির ওপর এসে পড়লো আর্য সভ্যতার চাপ ও সেই সংঘাতে ভারতীয় সভ্যতা এক বৃহৎ পরিনামের পথে পা বাড়িয়ে দিল। আজ বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও সেই সভ্যতা রূপান্তরের মুখে দাঁড়িয়েছে।

আদিম অর্থাৎ প্রাগার্য ভারতে যে সব জাতি ভারতের সীমার বাইরে থেকে এসে প্রবেশ করেছিল, তারা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে এনেছিল তাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি। ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়, সেই সংস্কৃতির রেশ এখনো নানা চিন্তা ও সমাজ বিপ্লবের ভেতর দিয়েও আর্য ও হিন্দু সভ্যতার মধ্যে বর্তে রয়েছে। তার সমগ্র রূপ হয়তো নেই, কিন্তু তার নানা বিক্ষিপ্ত চূর্ণাংশ এখনও বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুঁজে নিতে পাওয়া যায়। সে সব অভারতীয় অবদানকে আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে সহজ করে নিয়েছি।

ভারতে প্রথম বিদেশী আগন্তুক খুব সম্ভবত নেগ্রিটো জাতি। বট বৃক্ষের পূজা ও লিঙ্গ পূজার প্রথা নেগ্রিটো সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সেই আদিম মানুষের আরণ্য সভ্যতায় যা নিছক টোটেম হিসাবে সমাদৃত ছিল, তাই আজ নানা দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে জারিত হয়ে নতুন আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে। নেগ্রিটোদের পরে যে প্রোটো অস্ট্রেলয়েড জাতি ভারতে আসে তারা এই দুই টোটেমকে উপেক্ষা না করে গ্রহণ করেছিল। পরে এই প্রথা কয়েক শতাব্দী চর্চার পর লৌকিক আচরণের সঙ্গে সহজভাবে গ্রথিত হয়ে যায় ও পুরুষানুক্রমে তার জের চলতে থাকে। এর পরে বোধ হয় আসে মেডিটারেনিয়ান জাতি। এদের মধ্যেও এক ধরণের লিঙ্গ পূজার রেয়াজ ছিল। এদের মধ্যে তখন প্রস্তর সভ্যতার বিদ্যমান। আদিম জাতিদের মধ্যে যে 'জীবনসারাধান' (Life Essence Theory) মতবাদ বা বিশ্বাস প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়, মেডিটারেনিয়ান জাতিদের মধ্যে সেই বিশ্বাসের আধিক্য ছিল। অনেকে মনে করেন মুণ্ডা জাতিরাই (মুণ্ডাদের অনেকে প্রোটো অস্ট্রেলয়েড থেকে ভিন্ন জাতি মনে করেন) এসে 'জীবনসারাধান' বিশ্বাস ও রীতি প্রচার করে, যে বিশ্বাস কালক্রমে পুনর্জন্ম, পরজন্ম ও আত্মা প্রভৃতি নানা বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। এই সঙ্গে "মাতৃকা" পূজার (Mother cult) প্রথাও এসেছিল বলে মনে হয়, কিন্তু উর্বরতাবাদ (fertility cult) থেকেই 'মাতৃকাবাদে'র (Mother cult) উৎপত্তি বেশী যুক্তিসহ মনে হয়। এই উর্বরতাবাদ এবং তৎসঙ্গে মনুষ্যরূপী কোন অতিপ্রাকৃত কল্পেয় দেবতার পূজায় প্রথা আসে এসিয়ামাইনর থেকে আগত জাতিদের সঙ্গে। এসিয়ামাইনরের জাতিদের বিশ্বাস ও রীতিনীতির সঙ্গে পূর্বতন প্রচলিত প্রথার একটা সংমিশ্রণ হয়েছিল। 'মাতৃকাবাদ' মূর্তি পূজার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাকে তুষ্ট করা বা কোপ শান্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং বলিদান প্রথা ও নানাবিধ অর্ঘ্য নৈবেদ্য দেবার প্রথা প্রবর্তিত হলো। এসিয়া মাইনর থেকে আগত জাতিরা আর একটি জিনিষ নিয়ে আসে—তাদের আকাশতত্ত্ব। আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে তারা নানা উপাখ্যান ও কাহিনী রচনা করেছিল এবং সেগুলি ধর্মবিশ্বাসের মত প্রচলিত ছিল। যখন দেবতা এল, বলিদান ও পূজার প্রথা এল, তখন প্রয়োজন হলো পুরোহিতের। গোষ্ঠির মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও শক্তিমান ব্যক্তির উপর এই পবিত্র কর্তব্যের ভার অর্পিত হলো। পুরোহিততন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা এই ভাবেই সূচিত। এই

পুরোহিতেরাই পরে যুগ যুগ ধরে সভ্যতার ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। পুরোহিতের হাতেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের যাদুকাঠি থাকতো। যুদ্ধ প্রথাটা যখন বড় হয়ে উঠলো, তখন সমাজে মর্যাদা বাড়লো তাদের যারা যোদ্ধা বলে পরিচিত। যোদ্ধাদের ভেতর থেকেই একদিন রাজা নামক সমাজের ভাগ্যবিধাতা আবির্ভূত হলেন। কিন্তু পুরোহিতেরা অনেকদিন পর্যন্ত রাজাদের দমিয়ে রাখলেন তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির দাপটে। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের অধিকারের দ্বন্দ্ব ঐ আদিম দ্বন্দ্বের অন্তিম পরিণতি মাত্র। প্রাগার্য ভারতের ধর্মকর্মের এই একটি মামুলী পরিচয়।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সাহসের সঙ্গে আর বলবার অবকাশ নেই। কারণ মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে মহেঞ্জোদাড়ো। মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত প্রাগার্য ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুধী সমাজে যে মতবাদ ও ধারণা প্রচলিত ছিল, আজ তাকে আবার ঢেলে সাজতে হয়েছে।

মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বার করার পর 'সিন্ধু সভ্যতা' নামে এক সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। এই সিন্ধু সভ্যতার বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, অনেক এমন কিছু বিষয় আছে, যা এ যাবৎ 'আর্য সভ্যতা'র অঙ্গ বলে পরিচিত ছিল; কিন্তু মহেঞ্জোদাড়োর আলোকে তার প্রাগার্য পরিচয়টুকু ধরা পড়ে গেছে। কৌতুহলী মনকে আরও বিস্মিত করে তোলে, যখন দেখি এই 'সিন্ধু সভ্যতা' আবার নিছক সিন্ধুরই সভ্যতা নয়। সুদূরের সংস্কৃতির সঙ্গে এর অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য রয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর সংস্কৃতির মধ্যে বৃক্ষ পূজা ও সর্প পূজার পদ্ধতি দেখা যায়। ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ঐ দুই পূজার খুবই প্রচলন। লিঙ্গ পূজার প্রথাও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রচলিত ছিল। তা ছাড়া বৃত্তাকার পাথরের লিঙ্গ-পীঠের পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানে এসে উর্বরতাবাদের চরম প্রতীকের পূজার নিদর্শন পাওয়া গেল। ঋগ্বেদের আর্যদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র। কিন্তু 'হিন্দু সভ্যতা'র পরবর্তী অধ্যায়ে ইন্দ্রকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়নি। অন্যান্য অনেক অনার্য এবং অভারতীয় দেবতা 'হিন্দু সভ্যতা'র মধ্যে বড় বড় স্থান লাভ করেছে। বোঝা যায়, আর্যরা পাঞ্জাবের যে অংশে এসে প্রধানত বসতি স্থাপন করে, সেখান থেকে অনার্যদের হঠে যেতে হয়েছিল। সেই কারণে সেখানে আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণের কাজ হয় নি। এই মিলনের সাধনা সম্ভব হয়েছিল পাঞ্জাবের কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত দেশে অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি দেশে।

অনার্য ভারত আর্যদের চেয়ে সভ্যতাগুণে নিকৃষ্ট ছিল না। অনার্য ভারতে বড় বড় নগর ও জনপদের পত্তন হয়েছিল, স্থাপত্য কার্যে অনার্যরা আর্যদের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব ও শিল্পরসিকতার দাবী করতে পারে। প্রাগার্য ভারতীয় সভ্যতা গুণে, ধর্মে এশিয়ামাইনর ও মেডিটারেনিয়ানের সমগোত্র ছিল। অধ্যাপক চুঁচি বলেছেন যে, যদিও প্রাগার্য ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে চন্দ্র পূজার পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায় না; (এশিয়া মাইনরে এই পূজা প্রচলিত) তবুও অন্যভাবে নানা দেবী পূজার (দুর্গা, কালী, ত্রিপুরাসুন্দরী) ভেতর দিয়ে চন্দ্র পূজার পদ্ধতিটা গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজা দেবতাতুল্য—এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাগার্য বা অনার্য সভ্যতার দান। এদিক দিয়ে আদিম হিন্দু-সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য দেখা যায়। সেমিটিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে হিন্দু সভ্যতার বৈপরীত্যটাই বেশী। ঋগ্বেদে রাজাকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করার কোন মতবাদ প্রচারিত হয় নি। তা ছাড়া হিন্দু-সভ্যতার আর একটি বড় সংস্কার হলো মৃত পিতৃপুরুষের (পিতৃলোকের ও তৎসঙ্গে প্রেতপুরুষের) পূজো। আর্য সভ্যতার মধ্যে এ মতবাদের সায় পাওয়া যায় না। আর্যেরা প্রধানত যাযাবর জীবনযাপন করতো। যাযাবরের মনস্তত্ত্বে মৃত পূর্বপুরুষের পূজা ঠাঁই পেতে পারে না; কারণ, এ বিষয়ে তাদের একটা স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা ছিল। আর্যেরা শবদাহ প্রথা নিয়ে আসে এবং কালক্রমে সমস্ত হিন্দুভারত সেই প্রথা গ্রহণ করে। অনার্যেরা মৃতকে সমাধি দিত বা উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রেখে সৎকার করতো। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঋগ্বেদের কয়েকটি সূত্র উধৃত করে দেখিয়েছেন যে, ঋগ্বেদের আর্যদের মধ্যে সমাধি দেওয়ার প্রথা বর্তমান ছিল। মহেঞ্জোদাড়ো বা সিন্ধু সভ্যতায় শবদাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল।

কন্যাকুমারী

(৭৭৯ পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া আর দেখেছিলাম কন্যাকুমারীতে 'কন্যামূর্তি'। এর বর্ণনা করা চলে না—ঐ রকমটি বোধ হয় আর জীবনে দেখতে পাব না।

এরপর হিন্দুদের কাছে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম এক মহাতীর্থ। মাদুরাকে এই রকম একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে ফেলা চলে না।—তারপর এই রামেশ্বরম—এখানকার লিঙ্গ মূর্তির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের রামায়ণের কাহিনী।

প্রায় মাইলখানেক আসার পর ঝটকাওয়ালা এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে সামনে তাকিয়ে দেখি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সামনে এসে গেছি।

ক্রমশঃ

বিচিত্র বার্তা

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ 'গ্লাইডার' 'ম্যান-ও-ওয়ার' (Man-O-War) পাখী। কিন্তু এদের জলে কিম্বা স্থলে নামবার কোন উপায় নেই। যদি এরা সমুদ্রের উপর নামে তাহলে কখনও উড়তে পারে না; মাটিতে নামলে চিরদিনের জন্যে তাদের দেহ মাটিতে রেখে যেতে হয়। ম্যান-ও-ওয়ার পাখী তার সাত ফিট ডানা ছড়িয়ে জীবনের সর্বাপেক্ষা বেশী সময় আকাশে উড়ে বেড়ায়। পৃথিবীর অন্য কোন পাখী এদের মত এত দীর্ঘ-দিন ধরে আকাশে উড়তে পারে না। এরা বাতাসের স্রোতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত এবং কিভাবে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহে নিজেকে বাঁচিয়ে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তা তারা জানে। কোন কোন পক্ষী-বিশারদ বলেছেন, এরা আকাশে উড়ন্ত অবস্থাতেই ঘুম দেয়। এই পাখীর পা দু'টা অদ্ভুতভাবে গঠিত, সাধারণ পাখীর মত নয়। মাটির উপর নামবার কিম্বা মাটি থেকে উঠবার উপযোগী করে এদের পা দু'টা তৈরী হয়নি। এরা মাটিতে চলতেও পারে না। এদের দুটি বড় ডানা থাকা সত্ত্বেও মাটি থেকে উড়ে যাওয়া এদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। গাছের ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে এরা উড়ে যায়। সাধারণত শুকনো গাছের উপরের ডালের কোন সুবিধামত জায়গায় এরা বাসা তৈরী করে। বেশী ডাল-পাতা এদের উড়ে যাবার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে; সেই কারণে শুকনো গাছই এদের বাসা নির্মাণের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। গ্লাইডার হিসাবে 'মান-ও-ওয়ারে'র তুলনা নেই, কিন্তু জলে এবং স্থলে এরা একেবারে অসহায়।

* * *

জীব জগতের কত জীবকেই ত একবেলা খেয়ে থাকতে হয়। কোন কোন জীব আবার দীর্ঘদিন অনাহারে থাকে। উদাহরণের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। ছারপোকার অত্যাচারে যে চেয়ারটাকে দূরে ফেলে দিয়েছেন সেদিকে একবার চেয়ে দেখুন। পাঁচ ছ'মাস ওরা রক্তের কোন স্বাদ না পেয়েও বেঁচে আছে। কেউ ভুলেও হয়ত চেয়ারটার উপর বসেনি। কিন্তু ঐ অভুক্ত ছারপোকারা রক্তের জন্যে এখনও অপেক্ষা করে আছে। আর একটি জীব ছারপোকার মত শীকার না পেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। জোঁকের সঙ্গে পল্লীগ্রামের অনেকেরই পরিচয় আছে, তবে সে পরিচয় খুব বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। জোঁকের ভয়ে জলে কেউ নামে না; কিন্তু দীর্ঘদিন শীকার না পেয়ে তারা বেঁচে আছে। বছরে একটা শীকার পেলেই যথেষ্ট। শীকারের অগোচরে জোঁক প্রচুর পরিমাণে রক্ত শোষণ করে নেয়। শীকারের শরীর থেকে রক্ত শোষণের পূর্বে এরা একপ্রকার লালা শীকারের দেহে ঢেলে দিয়ে সেই স্থানটা অসাড় করে দেয়। ফলে রক্ত-শোষণের সময় শীকার কোন যন্ত্রণা অনুভব করে না। দ্রুতবেগে রক্তশোষণের পক্ষেও এই লালা যথেষ্ট সাহায্য করে। জোঁক নিজের শরীরের ওজনের প্রায় আড়াই গুণ বেশী রক্তশোষণ করে উদরে ভর্তি করে নেয়। এই পরিমাণ রক্ত হজম করতে তার এক বছর লেগে যায়। এক বছর কোন শীকার না হলেও তাদের কোন ক্ষতি নেই।

* * *

অস্ট্রেলিয়ার জীবজগতের তুলনা নেই। সেখানে যতসব অদ্ভূত জীবের সমাবেশ দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার মাটির পোকা-গুলোকে (Earth worm) লম্বায় বার ফিট হ'তে দেখা গেছে। এত বড় পোকাগুলোরও কিন্তু বিপদ কম নয়! এই বৃহৎ আকারের পোকাগুলি অস্ট্রেলিয়ার লাফিং জ্যাকেস পক্ষীর উপাদেয় খাদ্য। এই বার ফুট লম্বা কেঁচো মাটির তলায় অনেক দূর গর্ত করে এবং মাটির নীচে নামবার সময় এরা প্রচুর পরিমাণে মাটি খেয়ে নেয়। গর্তের উপরিভাগে পোকাগুলি যে পরিমাণ মাটি তুলে তা একটি ছোট রকমের আগ্নেয়গিরি বললেই চলে।

* * *

মানুষ ঘুমুবার সময় চোখেরপাতা বন্ধ করে। উদ্ভিদ জগতের অনেকেই তাদের পাতাগুলি জোড়া লাগিয়ে রাত্রে ঘুম দেয়। 'মিমোসা' নামে এক জাতীয় গাছও রাত্রে তাদের পাতা জোড়া দিয়ে বেশ ঘুমায়। এই সময় তাদের পাতা এবং ডাল-পালাগুলি খুব শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সূর্যের রশ্মি গাছের উপর লাগার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতাগুলি জেগে উঠে আর সেই সঙ্গে ঐ শক্তভাবটাও আর থাকে না।

আহতকে রক্তদানে সেবা

আঘাতের অব্যবহিত পরেই দেহে রক্ত সঞ্চালন করিতে না পারিলে বিমান আক্রমণে আহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা দশজনের মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাদিগের চিকিৎসার জন্য কি পরিমাণ রক্ত সঞ্চালন আবশ্যক তাহা সহজেই হিসাব করা যাইতে পারে। আহত সৈনিকগণের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। বিদেশে যুদ্ধরত সৈনিকদিগের মধ্যে প্রতিমাসে শতকরা ছয়জন আহত হইয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চালনের মূলনীতি কি?

রক্তই শরীরের কোটি কোটি জীবকোষে খাদ্য বহন ও সেগুলি হইতে আবর্জনা সরাইয়া ফেলিবার কাজ করে। রক্তে যে প্রোটিন আছে তাহার অন্তর্বাহ-ধর্মের (osmosis) সাহায্যেই এই পুষ্টি গ্রহণ ও আবর্জনা নিঃসারণ ক্রিয়া সাধিত হয়। সাধারণ লোকের শরীরে প্রায় চার সের পরিমাণ রক্ত থাকে। ইহার মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগ তরল পদার্থ। বিমান আক্রমণের ফলে চমক্—শক্ (shock) লাগিলে রক্ত-মধ্যস্থ প্রোটিনের অন্তর্বাহশক্তির যে ক্ষতি হয় তাহা প্রকৃত রক্তক্ষয় হইতেও বিপজ্জনক। রক্ত সঞ্চালন দ্বারা দেহে নূতন রক্ত-প্রোটিন জোগানর ফলে রক্তের অন্তর্বাহক্রিয়া পুনরায় সচল হইয়া উঠে। ইহাই হইল রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার সর্বপ্রধান উপযোগিতা। অধিক রক্তস্রাবের ফলে রক্তের যে তরল ভাগ নষ্ট হয় তাহাও নূতন রক্ত সঞ্চালন দ্বারা পূরণ হইয়া থাকে। বহু পূর্বকাল হইতেই চিকিৎসকেরা কোন কোন ব্যাধির চিকিৎসায় রক্ত মোক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু রোগ সারাইবার জন্য দেহে রক্ত সঞ্চালন করিবার প্রথার জন্ম হয় মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া করিতে গিয়া বহু ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু হওয়ায় সে যুগে ইহা তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ১৯০১ খৃস্টাব্দে Landsteiner সর্বপ্রথম এই প্রকার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্য জগদ্বিখ্যাত নোবেল প্রাইজ্ প্রাপ্ত হন। রক্তের লোহিতকণিকার মধ্যে [illegible] বলিয়া যে বিশেষ এক প্রকার পদার্থ বর্তমান আছে, তাহাই রক্তের শ্রেণীভেদের কারণ। সুতরাং লোহিতকণিকা সমেত সম্পূর্ণ রক্তের পরিবর্তে রোগীর দেহে কেবলমাত্র প্লাজ্মা (যাহাতে ঐ কণিকা অবর্তমান) সঞ্চালিত করিলে কোন অসুবিধা হয় না। রক্ত হইতে রক্তকণিকাগুলি আলাদা করিয়া ফেলিয়া যে তরল ভাগ পাওয়া যায় তাহাই প্লাজ্মা। চমকের (shock) চিকিৎসায় সম্পূর্ণ রক্ত (whole blood) হইতে প্লাজ্মা কোন অংশে কম ফলপ্রদ নয়। সম্পূর্ণ রক্ত সঞ্চালনের আর একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, রক্ত ২ সপ্তাহের বেশী অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করা কঠিন। কিন্তু তরল প্লাজ্মা ৪°— ৫° সেণ্টিগ্রেড্ উত্তাপে বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। যুদ্ধের সময়ে এই প্রকার তরল প্লাজ্মার ব্যবহার অসুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে এই প্লাজ্মা জমাইয়া গুঁড়া করিয়া রাখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই গুঁড়া প্লাজ্মা যে-কোন উত্তাপে যতদিন ইচ্ছা অবিকৃতভাবে রাখা যাইতে পারে।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণে আহতদের চিকিৎসার জন্য ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়ান্ রেড্ ক্রস্ সোসাইটির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা একযোগে কলিকাতা ব্লাড্ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম যে নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে ব্লাড্ব্যাঙ্কের পরিচালনা রীতিও তাহাই। রক্তদাতাগণ আপন ইচ্ছামত যে কোন সময়ে রক্ত জমা দিতে পারেন এবং প্রয়োজন মত পাইতে পারেন।

কোন কোন ভারতীয় রক্তদাতা এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রক্ত যেন কেবলমাত্র কলিকাতাতেই ব্যবহৃত হয়। ইহা যতদূর সম্ভব কার্যতঃ চেষ্টা করা হইবে।

রক্তদানের পরিমাণ রক্তদাতার শরীরের ওজনের উপর নির্ভর করে। যে পরিমাণ রক্ত লওয়া হইবে তাহাতে শরীরে হানিকর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে না। ৪।৫ দিনেই শরীরে ঐ পরিমাণ রক্ত স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হইয়া যায়। রক্তদানের মুখ্য উদ্দেশ্য—আত্মরক্ষা ও পরসেবা। কে কবে বিমান আক্রমণে আহত হইবেন, কাহার কোন্ দিন রক্তসঞ্চালনের প্রয়োজন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যিনি অপরের জন্য রক্তদানে অসম্মত, অন্যের প্রদত্ত রক্তের সুবিধাগ্রহণে তাঁহার কোন অধিকার থাকিতে পারে কি? যেদিন আপনার প্লাজ্মা প্রয়োজন হইবে—সেদিন কোন্ মুখে ইহা আশা করিবেন—যদি আপনি নিজে একজন রক্তদাতা না হন! অদ্যই আত্মরক্ষা ও পরসেবার জন্য রক্তদান করুন। মনে রাখিবেন—আপনার একদিনের রক্তে—একটি আহতের বা মৃতপ্রায় লোকের প্রাণরক্ষা হইবে!

রক্তদান করায় শরীরের কোনরূপ হানি হয় না অথবা ইহাতে কোন যন্ত্রণা অনুভব হয় না। সরু ছুঁচের সাহায্যে হাতের একটি শিরা হইতে রক্ত বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং সামান্য একটু আলপিনের খোঁচার মত আঘাত লাগে মাত্র। বহুক্ষেত্রেই, বিশেষত যাঁহাদের রক্তের চাপ বেশী তাঁহাদের, এইরূপ রক্তমোক্ষণে শরীরের উপকারই হইয়া থাকে। রক্তদান করিবার অব্যবহিত পরেই রক্তদাতা নিয়মিত কাজকর্ম করিতে পারেন।

রক্ত লইবার পূর্বে রক্তদাতার স্বাস্থ্য সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। যাঁহাদের রক্তের চাপ নেহাত কম অথবা যাঁহাদের হৃৎপিণ্ড কিংবা ফুস্ফুসের ব্যাধি আছে তাঁহারা রক্তদানে অনুপযোগী। সম্পূর্ণ রক্তমোক্ষণ প্রক্রিয়ায় ১৫ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। বাংলা দেশের বিখ্যাত লোকেরা রক্তদান করিতেছেন। ইঁহাদের আদর্শ দেশের যুবক ও কর্মিদিগকে আহত নগরবাসীদের সেবার জন্য সকল দ্বিধা দূর করিয়া রক্তদানে অনুপ্রাণিত করিবে এবং যুবকদিগের মধ্য হইতেই দলে দলে রক্তদাতা পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা আমারা করি।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 30th May, 1942 [২৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

"যদি" ও "তবে"—

শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী ভারত ব্যবচ্ছেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া এখনও প্রচারকার্য চালাইতেছেন। সেদিন লাহোরের একটি জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাজাজীর এই অনিষ্টকর উদ্যমের অভ্রান্ত ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার আদর্শই তিনি সমর্থন করিবেন এবং ভারত ব্যবচ্ছেদের উদ্যমে মনে প্রাণে বিরুদ্ধতা করিবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার আদর্শই ভারতের স্বাধীনতাকামীদের আদর্শ; ভারত ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করার অর্থ ভারতের পরাধীনতাকেই কামনা করা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না; দুঃখের বিষয় নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ এ বিষয়ে 'যদি'র প্রশ্ন এখনও অবতারণা করিতেছেন; পণ্ডিত জওহরলালজীর ন্যায় স্পষ্টবাদী এবং স্বচ্ছ চিন্তাশীলতাসম্পন্ন ব্যক্তির উক্তির মধ্যেও এই সংশয় রহিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ রকমে বিস্মিত হইয়াছি। সেদিন লাহোরে তিনি বলেন, 'যদি' ভারতের কোন অংশের বেশীর ভাগ লোক ভারত ব্যবচ্ছেদ কামনা করে, তবে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, কারণ কাহাকেও জোর করিয়া নিজের দলে আনা যায় না'। আমরা অবান্তরভাবে সব কথার মধ্যে এমন করিয়া 'যদি'র অবতারণার কোন মূল্য বুঝি না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, তবে অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্পে সুদৃঢ় হইতেই হইবে এবং সে ক্ষেত্রে 'যদি'র প্রশ্ন রাখিলে, ইহাই বুঝা যাইবে যে, ভারতের স্বাধীনতাই প্রকৃতপক্ষে সেখানে কাম্য হয় নাই, কাম্য রহিয়াছে অন্য জিনিস এবং ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ হইয়াছে পরোক্ষ। এমন সংশয়বাদের পথে কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না; স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সেই আদর্শকেই মুখ্য করিতে হয় এবং সেজন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে 'যদি'র কারবার যদি থাকে তবে স্বাধীনতা জাতির পক্ষে সুদূর পরাহত। এ সম্বন্ধে আমাদের সোজা বুঝ ইহাই।

ঐকান্তিকতাই শক্তি—

বাঙলার কবি গাহিয়া গিয়াছেন—সকল মহৎ কর্ম পরম প্রয়াসে। নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা ব্যতীত কোন বড় কাজ হয় না। স্বাধীনতা ত লাভ করা যাইতেই পারে না। শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারীর মনে আজ দুর্বলতা আসিয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতার সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে মনের যে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন তাহা তিনি হারাইয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁহার যুক্তিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তিনি হয়ত নিজে তাঁহার চিন্তার মধ্যে স্বার্থের সূক্ষ্ম গতিটা ধরিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনে করিতেছেন নিজেই ভাল বুঝিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিগিরির মোহই তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় নেতার চিন্তাশক্তিতে এ দুর্বলতা অত্যন্তই শোচনীয়; কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না; কিংবা মার্জনা করাও চলে না। জাতির বিরুদ্ধে যে অপরাধ তাহা অমার্জনীয়; সুতরাং রাজাজীর ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হউক না কেন, জাতির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ করিবার কঠোর কর্তব্যের দায়ে রাজাজীর অনিষ্টকর উদ্যমকে রুদ্ধ করা প্রয়োজন। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তৃগণ এবং সদস্যগণ রাজাজীর কোন সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না; আমাদের মতে রাজাজীর অনুষ্ঠিত অপরাধের গুরুত্বের তুলনায় এই ব্যবস্থাই পর্যাপ্ত নহে।

ব্রহ্মের পর—

যুদ্ধের বিস্তৃত কোন খবর কোনদিক হইতেই পাওয়া যাইতেছে না। ব্রিটিশ বাহিনী চিন্দুইন নদী পার হইয়া ভারতের সীমানায় পশ্চাদপসরণ করিয়া আসিয়াছে। কালিওয়া নামক স্থানে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণের সংবাদেই ইহা বুঝা যাইতেছে। কারণ, এই স্থানটি ব্রহ্ম সীমান্তের সংযোগ স্থলের

উ... বিস্থিত। এ পারে পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া মণিপুর রোড গিয়াছে। ব্রহ্ম হইতে ব্রিটিশ বাহিনীর এই পশ্চাদপসরণ সামরিক দিক হইতে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ হইয়াছে, পার্লামেণ্টের আলোচনা হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হইয়াছি। বাস্তবিক-পক্ষে রেঙ্গুনের পতনের পর সমুদ্র পথে ব্রহ্ম দেশের সঙ্গে ব্রিটিশ পক্ষের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, সেখানে সাহায্যার্থ নূতন কোন সৈন্য বা সমরোপকরণ প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। জাপানীদের পক্ষে জল এবং হিন্দু-চীনের ভিতর দিয়া স্থল পথ উভয়ই খোলা ছিল। তাহারা সেনা এবং সমরোপকরণ দুই-ই ব্রহ্মের রণাঙ্গনে একরূপ অবাধে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়। উত্তর ব্রহ্মে ব্রিটিশ পক্ষ হইতে জাপানীদিগকে প্রবলভাবেই বাধা দেওয়া হইয়াছিল; চীনা-বাহিনী খুব লড়াইও করিয়াছিল; কিন্তু যে পরিমাণ চীনা সৈন্য প্রেরণ করিলে সাফল্যের সঙ্গে বাধাদান সম্ভব হইত, ব্রহ্মে সে পরিমাণ চীনা সৈন্য প্রেরিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মে অবস্থিত সেনাদলকে সরাইয়া আনা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। এই পশ্চাদপসরণের সময় ব্রিটিশ বাহিনীকে নিজেদের ভারী ধরণের অনেক সমরোপকরণ নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইয়াছে, কারণ ঐগুলি শত্রুর হাতে পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। ব্রহ্মের সীমানা অতিক্রম করিয়া জাপানীরা বর্তমানে চীনের ইউনান প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। চীনাদিগের সঙ্গে বড় রকমের একটা বোঝাপড়া করিয়া ব্রহ্মে আপাতত নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করিবার দিকেই সম্ভবত জাপানীদের লক্ষ্য হইবে। সম্মুখে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল, ওদিকে অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিন সাহায্য এখনও আসিয়া পেশীছিতেছে, এমন অবস্থায় ভারতের দিকে আগাইয়া আসা জাপানীদের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মদেশে জাপানীদের অগ্রগতি বিলম্বিত করার ফলে ভারতবর্ষে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা পাকা করিবার সুযোগ মিলিয়াছে, এ লাভ কম নয়। ওদিকে জার্মানী ককেসাস অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা এ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে নাই। জার্মানী কার্চ দখল করিয়াছে, কার্চ্চ প্রণালীর পথের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী; কিন্তু রুশিয়া এখনও প্রবলভাবে বাধা দিতেছে। প্রকৃত পক্ষে রুশিয়ার এই বাধাদানের দৃঢ়তার উপরই পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় সীমান্তে মিত্র পক্ষের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। রুশিয়া যদি জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জাপানকেও ধীরে ধীরে সংগ্রাম ক্ষেত্রের গণ্ডী সংকীর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

ষষ্ঠ বাহিনীর আশঙ্কা—

পঞ্চম বাহিনীর কথা অনেকে জানেন, যদিও সে তত্ত্ব কম জটিল নয়; কিন্তু ষষ্ঠ বাহিনীর তত্ত্ব জটিলতর। সম্প্রতি ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ হুভার একটি বক্তৃতায় ষষ্ঠ বাহিনীর স্বরূপ-তত্ত্ব কিঞ্চিৎ বিশেলষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত কথাবার্তায় যাহারা যুদ্ধের আলোচনা করেন বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা করেন, এমন কি বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্যন্তও করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেই তিনি ষষ্ঠ বাহিনীর লোক মনে করেন। মিঃ হুভারের মতে দার্শনিকতার দিক হইতে এই সব লোককে হয়ত একটু বেশী স্বাধীনতা দেওয়া ভাল। মিঃ হুভার যে কথা বলিয়াছেন, আধুনিক রাষ্ট্র-নীতিকগণের মধ্যে অনেকে তাহা সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাহারা যুদ্ধকালে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সঙ্কোচ করিবারই সমধিক পক্ষপাতী। যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা এবং সমালোচনাও যাহাতে রাষ্ট্রের অনুকূল হয়, অর্থাৎ যুদ্ধ-প্রয়োজনে অবলম্বিত সামরিক নীতির পরিপোষক হয়, ইহারা তাহাই দেখিতে চান এবং সেজন্য আইন প্রণয়ন করাও উচিত মনে করিয়া থাকেন। আধুনিক যুদ্ধের এই বাহিনী বিভাগ বড় সূক্ষ্ম তত্ত্বের ব্যাপার। সমগ্র জগদ্ব্যাপী একটা লড়াই চলিতেছে এবং সে সংগ্রাম মানুষের চিন্তা-জগতে বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ চিন্তাশীল জীব এবং সে মূক জীবও নয়; সুতরাং এ যুদ্ধের সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা এবং এ ব্যাপারের সমালোচনা যে করিবে ইহাও স্বাভাবিক। মানুষের মনের এই স্বাভাবিক ধারাকে আইনের দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে গেলে অনিষ্ট ঘটিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তবে এ সম্বন্ধে তাহাদের লঘুতা না থাকে, ইহা দেখা দরকার। লঘুতা উদ্ভব হয়, যে ক্ষেত্রে প্রাণের যোগের অভাব, সেই ক্ষেত্রেই। সমরোদ্যমের সঙ্গে সর্বসাধারণের সহানুভূতি সৃষ্টি করাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি, নতুবা এইভাবে বাহিনী ভাগ করিতে গেলে সংশয় এবং সন্দেহের বশে নিজেদের মনকে দুর্বল করিয়াই ফেলা হইবে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অবিশ্বাস শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা—

সম্প্রতি দিল্লী শহরে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটি বাণী প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক দেশে এখনও জাতীয়তার অনুপ্রেরণাই যে প্রধান রূপে কাজ করিতেছে, বর্তমান সংগ্রামে তাহাই সপ্রমাণ হইয়া গেল। এই সত্যকে অস্বীকার করা চলে না এবং ভাবের বশে ইহাকে অস্বীকার করিলে বিপদ ঘটিবারই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু চিন্তার শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই এই কথা বলিবেন যে, জাতীয়তার ধারাটা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এবং তদ্দ্বারা বিশ্বজগতের সমস্যার সত্যকার কোন সমাধান হইতে পারে না। জাতীয়তাকে সফল করিতে হইলে আন্তর্জাতীয়তার সঙ্গে তাহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং জগতের ঘটনার গতির সঙ্গে তাহাকে খাপ খাওয়াইয়া চালাইতে হইবে। আন্তর্জাতীয়তার গুরুত্বকে এই দিক হইতে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের সঙ্গে যদি আন্তর্জাতীয়তার কোন যোগ না থাকে, তবে তেমন আন্তর্জাতীয়তার দ্বারা কোন ফল হয়

না। অন্য কথায় আন্তর্জাতীয়তার মূলে জাতীয়তার মধ্যে নিহিত থাকা দরকার। ভারতের মত পরাধীন দেশে জাতীয়তার এই গুরুত্ব এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্তরের আবেগের উগ্রতার সর্বাধিক প্রয়োজন রহিয়াছে। জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতীয়তা এই দুই আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবার কর্তব্য সাহিত্যিকদের উপর রহিয়াছে। এই পথে শুধু তাঁহারাই জাতীয়তার আবেগ এবং শক্তিকে আন্তর্জাতিক লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিতে পারেন।"

পণ্ডিত জওহরলালের উক্তিকে আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বপ্রেম মস্ত জিনিস; কিন্তু দেশ এবং জাতির অন্তরের সঙ্গে সাহিত্যিকের যদি প্রাণের যোগ না থাকে, অন্য কথায় জাতীয়তার ভাবে এই দিক হইতে তিনি অনুপ্রাণিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার অবদান বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না, তাহা ছিন্নমূল শৈবাল দলের মত দুই দিনের মধ্যে স্রোতে ভাসিয়া যায়। দেশের জন্য, জাতির জন্য বেদনাবোধ যেখানে নাই, সেখানে বিশ্বের জন্য সত্যকার বেদনাও থাকিতে পারে না। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা অন্তর-সাধনার উপর, অনুকরণের উপর নয়। পণ্ডিত জওহরলাল প্রগতি সাহিত্য সাধনার যে রীতির নির্দেশ করিয়াছেন, এদেশের তরুণ সাহিত্যিকগণ তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন, আমরা ইহাই আশা করি।

রক্ষী দলের অস্ত্রের অধিকার—

গ্রামরক্ষী দলের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট একটি ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহকে এই পরামর্শ দান করা হইয়াছে যে, দেশের লোকের মধ্যে যাহাতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, সেজন্য তাঁহারা যেন সকল রকমে চেষ্টা করেন। গ্রাম অঞ্চলে জমিদার এবং মোড়লদের অধীনে গ্রামরক্ষী দলসমূহ গঠনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হইয়াছে। পরামর্শটা মনে হইবে মন্দ নয়; কিন্তু উহা সেকেলে ধরণের। দেশরক্ষা এবং গ্রামরক্ষা করিতে হইলে যে মনোভাবের প্রয়োজন, জমিদার বা তথাকথিত মোড়লদের মধ্যে কয়জনের তাহা আছে, আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ হয়। এ কাজে দরকার রাজনীতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের; যাঁহারা স্বদেশপ্রেমিক, দেশের জন্য, জাতির জন্য জীবন দিবার মত মনের বল যাঁহাদের আছে, সশস্ত্র শত্রুর সম্মুখে তাঁহারাই আগাইয়া যাইতে পারেন। বপু বড় হইলেই মনের বল বড় হয় না। সরকার যদি সত্যই গ্রামরক্ষার কাজে আগাইয়া যাইতে চাহেন, তাহা হইলে এদেশের স্বদেশপ্রেমিক তরুণদের সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্তরে আমলাতন্ত্রসুলভ যে সংশয় এবং অবিশ্বাসের ভাব হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। দেশের স্বাধীনতা সাধনার বলিষ্ঠ প্রেরণায় যাঁহারা উদ্দীপ্ত, এই কাজে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। ভারত সরকারের ইস্তাহারে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে সব রক্ষী-দল গঠিত হইবে, সেই সব দলের কতক সদস্যকে তাঁহারা আগ্নেয়াস্ত্র দানের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং অন্য দলের সদস্যদের সম্বন্ধে অস্ত্র আইনের বিধি শিথিল করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ধারণের অধিকার দিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমাদের মতে অধিকতর উদার এবং ব্যাপকভাবে অস্ত্র ধারণের এই অধিকার দেশের লোককে প্রদান করা কর্তব্য। অস্ত্র ধারণের অধিকার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের বলের একটা সম্পর্ক রহিয়াছে এবং স্বাধীনভাবে অস্ত্র ধারণের অধিকার দেশবাসীকে স্বাধীনভাবে দেশরক্ষার কর্তব্য পালনের দায়িত্ব-বোধকেও প্ররোচিত করিবে।

আমেরিকার আমন্ত্রণ—

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নাকি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিতজীর সঙ্গে ভারতের রক্ষা ব্যবস্থা এবং সমরসম্ভার উৎপাদনের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন। ভারতবর্ষ জগতের সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কামধেনুস্বরূপ। সকলেই ইহাকে দোহন করিয়া লইতে চেষ্টায় থাকেন। আমেরিকা শুনিতেছি, এ ব্যাপারে একেবারে নিষ্কাম। এই নিষ্কাম প্রেমের মধ্যে আসন্ন সমর প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যটি নিহিত রহিয়াছে; অবশ্য সে উদ্দেশ্য মহৎ—বিশ্বের স্বাধীনতা ইহার উপর অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে জওহরলালের এই আলোচনায় ভারতের মুক্তির দিক হইতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না; কারণ ভারতের রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জওহরলালজীর যে মত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে কোনরূপ মূল্যদান করা যদি প্রয়োজন বোধ করিতেন, তবে ক্রীপস সাহেবের দৌত্য ব্যর্থ হইত না। ক্রীপস সাহেবের দৌত্যের মূলে যে প্রস্তাব আসিয়াছিল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেদিনও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে তদপেক্ষা ভাল প্রস্তাব তাঁহাদের আর কিছু নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত এই মতিগতির পরিবর্তন সাধনে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কোনরূপ ক্ষমতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; সুতরাং এ আলোচনা একান্তই নিরর্থক। পণ্ডিতজী এমন আমন্ত্রণ স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা। অপর কোন শক্তির অনুরোধে উপরোধে কিংবা সুপারিশিতে ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিবে, পণ্ডিতজী এমন বিশ্বাস কোনদিনই করেন না। ভারতের রাষ্ট্রতার অধিকারকে অস্বীকার করিয়া ভারতীয় নেতাদিগকে লইয়া এইভাবে টানাটানি না করাই ভাল। ইহাতে ভারতবাসীরা মর্যাদা বোধ করে না; পক্ষান্তরে অপমানই বোধ করিয়া থাকে।

রাজাজীর প্রস্তাবে মহাত্মাজী—

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী সহজে নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলালের সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের যুক্তিই ঠিক। তিনি বলেন, 'আমার প্রস্তাবে আপোষ করিবার এবং কতকগুলি প্রিয়-বস্তু ত্যাগ করিবার কথা আছে। কিন্তু উহার দ্বারা জাতির উৎসাহ উজ্জীবিত হইবে এবং যে বিপদ ও ধ্বংসের আমরা

আশঙ্কা করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ হইবে।' রাজাজীর যুক্তি জলের মত পরিষ্কার! আপোষ করাতে আর আপত্তি কি আছে? আর কতকগুলি প্রিয়বস্তু ত্যাগ, বিপদ ও ধ্বংস যদি এড়ান যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু কথা হইল এই যে, আপোষের নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং আপোষের অঙ্গীভূত সেই প্রিয়বস্তু যদি আপোষের দায়ে ত্যাগ করিতে হয়, তবে আপোষের সার্থকতা থাকে কোথায়? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আদর্শ নিশ্চয়ই অন্য দশটা প্রিয়বস্তুর সামিল নয়। জাতি তাহার সর্বপ্রিয়বস্তুকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অকাতরে ইন্ধন করিয়া এতদিন পর্যন্ত এই স্বাধীনতার জন্যই যজ্ঞের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। সেই যজ্ঞই যদি পণ্ড হয়, তবে জাতির পক্ষে তাহা আত্মহত্যার সমান হইবে। মহাত্মাজী সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে রাজাজীর যুক্তিকে এইদিক হইতেই খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ঐক্য ব্যতীত স্বাধীনতা সম্ভব নহে। আমি এ কথা অনেকবার বলিয়াছি, সুতরাং সে কথা আমাকে শুনাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ঐক্য কামনা করি; কিন্তু আমার ইচ্ছা সমস্ত বিবদমান দল ও স্বার্থ একযোগে ভারতবর্ষকে বিদেশীর প্রভাব মুক্ত করিতে চেষ্টা করুন। যদি সেই চেষ্টাই না হয়, তবে আপোষের কোন মূল্য নাই; তেমন আপোষ বালির উপর নির্মিত প্রাসাদের মত ক্ষণস্থায়ী হইবে।" মহাত্মাজী নিজের কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। রাজাজী বারংবার মহাত্মাজীর উক্তিকেই নিজের যুক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য সুকৌশলে প্রয়োগ করিতেছিলেন। মহাত্মাজী সে কৌশলজাল সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করাকে আমি পাপ বলিয়া মনে করি। আমি প্রতিবেশীকে পাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি না। প্রতিবেশীরা যদি পাপ করেন, তবে রাজাজী তাহাদের সাথী হইবেন। আমি ঐরূপ সাথী হইতে পারি না।' আমরা আশা করি, রাজাজীর তার্কিকতা অতঃপর সমুচিতভাবে সংযত হইবে।

সাম্রাজ্যবাদের মহিমা—

ভারত সচিব আমেরী সাহেব গত রবিবার যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে একটি বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় গতানুগতিক রকমে তিনি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন। হংকং, সিঙ্গাপুর এবং মালয়ের পতনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমরা সাময়িকভাবে এই সুন্দর দেশগুলিকে হারাইয়াছি। কিন্তু ঐসব স্থানের জনসাধারণের আনুগত্যের অভাব অথবা শাসকগণের সহানুভূতি ও যোগ্যতা অভাববশত আমরা ঐগুলি হারাই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমরা একটা ধারণা লইয়া চলিতেছিলাম, ঘটনাচক্রে ঐ ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ নৌবহরই সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। যুদ্ধের জন্য আমরা এইসব স্থানের অধিবাসীদিগকে শিক্ষাদান করি নাই অথবা সেজন্য তাহাদের উপর ট্যাক্সও ধার্য করি নাই। ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। ব্রহ্মদেশের সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছেন এবং তথাকার অধিকাংশ জনসাধারণই রাজভক্ত ছিল। কিন্তু আক্রমণের সময় তাহারা অসহায় ছিল।" আমেরী সাহেব স্বীকার করিতেছেন যে, যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষা করিতে হইলে যে শিক্ষা দরকার, হংকং, মালয় এবং ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কেন হয় নাই? সামরিক শিক্ষালাভ করিতে হইলে করভার বাড়িবে সেজন্য তত্রত্য অধিবাসীদের কষ্ট হইবে, এই জন্যই কি? আমেরী সাহেব সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভারতের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, ভারতের সামরিক ব্যয়ভার ভারতবাসীদের আয়ের অনুপাতে অন্য কোন দেশের তুলনায় কম ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রে অধিক ছিল। ভারতবাসীরা সামরিক ব্যয় বহন করিয়াছে, অথচ সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়াও সমর বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁহারা ভাল করিতে পারে নাই। সেদিক হইতে তাহারা অসহায় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। যদি সামরিক বিভাগে কর্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতির কাছে আজ এমন সংকট দেখা দিত না। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ সাম্রাজ্যবাদ সুলভ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে সমর বিভাগে কর্তৃত্ব দিয়া বিশ্বাস করেন নাই। বর্তমানের অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের অতীতের সে ভ্রান্তি দূর করিতে পারিতেছে না ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

হুরদের দৌরাত্ম্য—

সিন্ধু প্রদেশে হুরদের লুণ্ঠন, নরহত্যা এবং গৃহদাহ প্রভৃতি দৌরাত্ম্য এখনও চলিতেছে। তাহারা রেল গাড়ি লাইনচ্যুত করিয়াছে এবং যাত্রীদিগকে হতাহত করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি এই দৌরাত্ম্যের প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার যথার্থ প্রতিকার হইতেছে কংগ্রেসী সদস্যদিগের পরিষদ ত্যাগ এবং খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণের পদত্যাগ। ইঁহারা সকলে মিলিয়া শান্তি সেনাদল গঠন করিবেন এবং নির্ভয়ে হুরদের মধ্যে নিয়োজিত করিবেন। কংগ্রেসী সদস্যদের পরিষদ ত্যাগ এবং মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগের সঙ্গে হুরদের কার্যকলাপের কি সম্বন্ধ আছে আমরা জানি না। আমাদের মনে হয়, হুরদের দৌরাত্ম্যের ফলে শাসনকার্যে যদি এত বড় একটা পরিবর্তন ঘটে, তবে হুরেরা প্রশ্রয় পাইবে এবং অধিকতর দৌরাত্ম্যের দ্বারা নিজেদের মত জোর করিয়া শাসন বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে। প্রকৃতপক্ষে অহিংসার জয়ের মহিমা তাহারা উপলব্ধি করিবে না, বুঝিবে হিংসার জয় হইল। সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী খাঁন বাহাদুর আল্লাবক্স নিশ্চয়ই এমন ভুল করিবেন না। আমাদের মতে কঠোরহস্তে এইসব আততায়ীকে দলন করাই কর্তব্য। ইহাদের প্রতি এমন আদর্শ দণ্ড বিধান করা উচিত যাহাতে দণ্ডের কথা স্মরণ করিতে ইহাদের হৃদয় কম্পিত হয়। অহিংসার তত্ত্ব কথার উপদেশ এক্ষেত্রে অনিষ্টকরই হইবে।

বাঙলার ভবিষ্যৎ ও তরুণ

আজকের এই সভায় আমার তরুণ বন্ধুদের এত বেশী সংখ্যায় দেখতে পেয়ে আমার আনন্দ হচ্ছে। সভায় আলোচ্য বিষয় একটু জটিল রকমের এবং নিছক ধর্মসম্বন্ধীয়, একেবারে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা। আজকাল অনেকের কাছেই শুনতে পাই, তরুণদের ধর্ম বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, তারা আর্থিক জিনিসই বড় বলে বুঝে, পরকালের কথা শুনতে চায় না। যাহারা ধর্মকে শুধু পরকালের বিষয় মনে করে, তাহাদের সঙ্গে আমার মিল নাই। আমি ধর্মকে ইহকালের বিষয়ই মনে করে থাকি, আর পরকালের চেয়ে ইহকালই আমার কাছে বড়। সুতরাং ছেলেরা যদি ইহকাল নিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে আমারও যোগ রয়েছে। আমার তরুণ বন্ধুগণ হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, যদি ইহকালকেই আপনি বড় বলে বুঝে থাকেন, তবে এই ধরণের বৈষ্ণবতার উদ্ভট খেয়াল নিয়ে থাকবার দরকার কি, আর 'ধাম মাহাত্ম্যের' মত প্রকাণ্ড পারলৌকিক বিষয় নিয়েই বা এখানে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন কেন? এসব ছেড়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যেই আপনার চিন্তা করা উচিত। এ উক্তিকে আমি অস্বীকার করছি না। তরুণদের মত আমিও আমার দেশের স্বাধীনতাই চাই। আজ যদি স্বয়ং ভগবান এখানে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি স্বর্গ চাও, না দেশের স্বাধীনতা চাও, তবে আমি করযোড়ে এই কথাই বলবো যে, ঠাকুর স্বর্গ আমি বুঝি না, জানি না, হয়ত ও একটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়, আমি আমার দেশের স্বাধীনতাই চাই। দেশের স্বাধীনতা যে চায়, ধাম দিয়ে তার কাজ কি, এই প্রশ্নই এখানে থেকে যায় এবং আপনাদের কাছে, অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু পারি সেই প্রশ্নেরই আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করব। বন্ধুগণ, ধাম শব্দের প্রধানত দু'টি অর্থ আছে। বৈষ্ণব ধর্মের জটিল পরিভাষা এড়িয়েই আমি কথা বলতে চেষ্টা করব। প্রথমত ধাম বলতে বাড়ি বুঝা যায়, আর ধাম বলতে আমরা বুঝি রূপ, জ্যোতি। 'মানকরে মোর ধাম', এখানে ধাম বলতে বাড়ি বুঝাচ্ছে; আবার 'অগ্নি, যথা নিজ ধাম প্রকাশিয়া অভিরাম, পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে', এখানে ধাম বলতে জ্যোতি বুঝতে হয়। ধাম শব্দের এই দু'টি অর্থেরই এক জায়গায় গিয়ে মিল আছে, সেটি অনুভবের বস্তু। যেখানে আলো বা প্রকাশ, সেখানেই আশ্রয়; যেখানে অন্ধকার বা সংশয়, সেখানেই অসহায়ত্ব এবং উদ্বেগ। ধাম শব্দের দুটি অর্থের মিল হচ্ছে আত্মীয়তার মধ্যে গিয়ে। যেখানে আত্মীয়তার আবহাওয়া, সেখানেই আমাদের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ বা স্ফূর্তি—স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ যা কিছু বলেন। আমরা সেখানে ভাগবতের ভাষায় পান্থঃ স্বশরণং; যথা—নিজের সত্যকার আশ্রয় লাভ করি বাড়ী-ঘর পাই। সুতরাং ধামের যদি কিছু মহাত্ম্য থাকে, এই আত্মীয়তাই সে মহাত্ম্য এবং সে মাহাত্ম্য স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাধীনতাতেই স্ফূর্ত হয়ে থাকে। ধামে আত্মীয়তার ছন্দ পাওয়া যায়। এটি আসে কোথা থেকে? আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,—তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতাং" এ কথার অর্থ হ'ল এই যে, যাঁরা আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা ধামের আবহাওয়ায় আত্মীয়তার ছন্দটি ছড়িয়ে রেখে যান। মনস্তাত্ত্বিকতার দিককার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে, সহজ কথায় এই বলা চলে যে, যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা সকলের পক্ষে মধুর, সকলকে যাঁরা আত্মীয় করেছেন তাঁদের স্মৃতি ধামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এবং ধামে গেলে তাঁদের স্মৃতি আমাদের ভিতর উদ্দীপিত হয়, আমরা আত্মাকে একান্ত ক'রে উপলব্ধি করতে পারি। আপনাদের এই ফরিদপুরে এমন একজন মহাপুরুষ প্রকটিত হয়েছিলেন, যিনি এদেশের সকলকে আত্মীয় করে দেখেছিলেন। ফরিদপুরে এসে তাঁর স্মৃতি আমাদের মনে জাগে, আর আমরা ক্ষণিকের জন্যও নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার উদার ছন্দকে অনুভব করি, মনে বল পাই, শান্তি লাভ করি। আপনারা দেশের স্বাধীনতা চান, অবাস্তব কল্পনাকে আপনারা উপেক্ষা করেন, এতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা চাইলেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, সেজন্য মনের বলের প্রয়োজন এবং মনের বল নির্ভর করে আত্মার উপলব্ধির উপর। পরের জন্য মরব বললেই, আমরা মরতে পারি নে, পরের মধ্যে আপনাকে দেখলেই সেখানে আমাদের মনে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির বিকাশ হয়। গায়ের জোর—বাইরের জোরের মূল্য একেবারে না আছে আমি বলিনে, কিন্তু প্রকৃত শক্তির উৎস হ'ল আত্মায়। ধামের মহাত্ম্য উপলব্ধি করলে আমাদের সেই বল বাড়বে। আত্মীয়তার ব্যাপ্তি অনুভূতি আমাদের বাহুতে জাগবে শক্তি। এই কথাটাই বিশেষভাবে আপনাদের বলতে চাই। ধামের ছন্দটি যদি ধরতে পারেন, এ দেশের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে প্রাণের যোগ আপনাদের হবে, তখন স্বাধীনতার সাধনাও আপনাদের সার্থক হবে। ধামের প্রাণবস্তু হ'ল এই আত্মীয়তার ছন্দ। ধনী, দরিদ্র সকলের সঙ্গে মিলে মিশে নিজেকে মাধুর্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাবার একটা সুর। ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে এই ভাবটি অন্তরে পেয়েছিলাম। সেখানে পেয়েছিলাম অনহঙ্কৃত একটা একান্ত মাধুর্যের স্পর্শ। বহু দূর থেকে ছুটে শ্রীঅঙ্গনে যখন প্রবেশ করলাম, তখন মনে হ'ল এ যেন আমারই বাড়ী-ঘর। সেখানে আদর্শ—অকিঞ্চন বৈষ্ণবের আদর্শ। অভিমান কোন দিককার নাই,—অভিমান বলতে টাকা পয়সার অভিমানই একমাত্র অভিমান মনে করবেন না। পাণ্ডিত্যের অভিমান, সাধনার অভিমান, সেও সোজা জিনিষ নয়। আত্মীয়তার ছন্দ এতে যেমন ভেঙ্গে দেয়, অন্য কোন জিনিসে ততটা দিতে পারে না। সব জিনিসেরই আমরা এখন সংস্কার চাচ্ছি। সংস্কার মন্দ নয়, কিন্তু সংস্কার করতে গিয়ে সংহার না করে বসি, এই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। দালান কোঠা গড়ে, কিংবা পাণ্ডিত্যের অভিমান নিজেদের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়ে, আমার দেশের দরিদ্র, অবজ্ঞাত, মূর্খদের উপেক্ষা করবার অনাত্মীয়তা যেন আমরা ধামে আমদানী না করি। বন্ধুগণ, যে সব জিনিস আমরা ভাল বলে মনে করি, যেগুলো আমাদের আদর্শ, সেগুলো যে সব সময় আমরা লাভ করতে পারি, কিংবা সে আদর্শে পোঁছুতে পারি এমন নয়, কিন্তু ভাল জিনিসকে ভাল বলে বোঝারও একটা মূল্য আছে। বাঙলার অকিঞ্চন সাধকদের আদর্শ আমার কাছে বড়ই ভাল লাগে এবং সেই আদর্শটি যাতে বজায় থাকে, এই চাই। আমি অহঙ্কারকে চাই না। আমরা এ করবো, সে করবো, জীবনের এই দিকটা আমি বড় করে দেখতে চাই না। মনে করবেন না, স্বাধীনতার পথ অহঙ্কৃত কৃত্যেরই পথ; এ করবো, সে করবো, এই স্ফীতিরই পথ। বৈষ্ণবের বিনয়ের পথ বা নতির পথ, সে পথ নয়। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সাধনা করে গিয়েছেন, তাঁদের জীবনের আলোচনা করলে দেখতে পাবেন, নতির পথই তাঁদের কর্মের শক্তি দিয়েছে, আত্মীয়তার অনুভূতিকে আশ্রয় করেই তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় শক্তি লাভ করেছেন। ইটালীয় স্বাধীনতার সাধক ম্যাটসিনী কথাটা ভেঙ্গে বলেছেন, তাঁর 'মানবের কর্তব্য' নামক বিখ্যাত বইতে। তিনি বলেছন, স্বাধীনতার সাধকদর কর্মোদ্যমের মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা দীপ্তি দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করতে পারেন, এটা অহঙ্কার, কিন্তু এ জিনিসটা অহঙ্কার নয়। অহঙ্কার বেশী দূর এগোতে পারে না। যদি তার পিছনে বহুর কাছে আত্মনিবেদনের একটা শক্তি না থাকে, ব্যর্থতার প্রথম আঘাতে সেখানে ব্যক্তি ভেঙ্গে পড়ে। ম্যাটসিনী কথাটা খুলেই বলেছেন যে, হিসেবের দ্বারা কোন বড় কাজ হয় না, বড় কাজ হয় প্রেমের টানে। এ দেশের যাঁরা সাধক,

তাঁদের স্মৃতির অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে আমরা এ দেশের বহুর সঙ্গে যুক্ত করবার মত প্রাণের টানটা পেতে পারি। আর সে প্রাণের টান আমাদের মধ্যে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত জিনিস হবে; আমরা দেখতে পাব, এ দেশের জল-মাটির দিব্য রূপ; এ দেশের ভূমি তখন আমাদের কাছে চিন্তামণিময় হবে, সব তরু সেখানে হবে কল্পতরু। এই জন্যই ঋষিরা বলেছেন, গুণতত্ত্ব বুদ্ধির দ্বারা ধাম দেখা যায় না, ধাম দর্শন করতে হয় নতির সাহায্যে; অর্থাৎ অহঙ্কারকে বিকিয়ে দিয়ে। এদেশের মহাপুরুষগণের অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে—তাঁদের পদরেণু মস্তকে ধারণ ক'রে, আপনারা দেশের লোকের প্রতি প্রীতির প্রগাঢ় ছন্দটি অন্তরে গ্রহণ করুন, তবেই দেশসেবা সার্থকতা লাভ করবে, দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবার পথ আপনারা পাবেন। আমাদের দরকার এই প্রেমের দৃষ্টির। ম্যাটসিনির কথায় বলা যায়, দেশের লোককে কেমন করে ভালবাসতে হয়, আমরা ভুলে গিয়েছি। আমাদের দেশপ্রেম অনেকটা বিদেশীর মক্স করা রাজনীতিক সূত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, দেশের নর-নারীর মর্মের সঙ্গে আত্মীয়তার ধর্মে তা নিষ্ঠিত হয়নি, এবং এ কথাও সত্য যে, সেই নিষ্ঠা ছাড়া, আমাদের দেশের মুক্তি ঘটতে পারে না। মুক্তির মূলে থাকা দরকার শ্রদ্ধা;—লঘুতা মুক্তির পথ নয়। বৈষ্ণব সাধকদের মতে শ্রদ্ধার একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, অন্যের মধ্যে গুরুকে দেখা বা গুরুকে দেখবার লালসা জাগা। আমাদের প্রধান দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, আমরা নিজেরাই গুরু বনতে চাই—অপরের মধ্যে গুরু দেখবার মত বিদ্যা আমরা হারাতে বসেছি। এর ফলে দেশের নরনারীর অন্তরের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিন্ন হতে বসেছে। যদি তাই হয়, তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হবে, তথাকথিত বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য কিছুতেই আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা শক্তি পাব না—একান্ত যে শক্তি, যে শক্তি দশটা ঘা খেয়েও টিকে থাকতে পারে, সে শক্তি। ফলে কোন 'ইজমে'র বাঁধা বুলি বা আন্তর্জাতীয়তার ধূয়োই আমাদের দুর্দশা দূর করতে পারবে না; আমরা স্বাধীনতা পাব না। বাহ্য উপচারের মধ্যে ধাম নেই, ধাম আছে আত্মীয়তার উপলব্ধির মধ্যে—আপনাকে পাওয়ার মধ্যে, আপনার লোকজনের আশ্বাসকর প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যে। এ বস্তুটি অনেকটা বাহ্য বস্তু নিরপেক্ষ। বাইরের সাজসজ্জা এবং আড়ম্বরের মোহে আত্মীয়তার এই ছন্দকে ছিন্ন করবেন না—এই আমার অনুরোধ। আমার অনুরোধ এই যে, বাইরের উপচার এবং আড়ম্বর অন্তরের অভাবকে দূর করতে পারে না, আপনারা এ জিনিসটা উপলব্ধি করুন। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগ পড়েছে, তাকেও ডিঙিয়ে আসছে সাম্যবাদের যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভাল জিনিস না আছে, আমি এমন কথা কখনই বলব না। রুশিয়ার সাম্যবাদ মন্দ জিনিস কেউ বলবে না; কিন্তু আত্মাকে হারিয়ে এর কোন জিনিসই আমরা, আমাদের ভাল হয় যেভাবে গ্রহণ করলে, সেভাবে গ্রহণ করতে পারব না। যে জিনিস ভাল, তার প্রধান লক্ষণই হ'ল এই যে, সে জিনিস আত্মলগ্ন। দেশের আত্মা, জাতির আত্মার সঙ্গে আপনারা আগে যুক্ত হন, তবে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। আন্তর্জাতিকতার রীতি গতি ধরতে সমর্থ হবেন, নইলে সাম্যের বুলি আওড়ানই সার হবে। স্বাধীনতার কথা সব হবে নেহাৎই ফাঁকা। দু' ঘা খেলেই আপনাদের যত তপ্ততা এবং তারুণ্য এলিয়ে পড়বে। বৈষ্ণব ধর্ম তরুণেরই ধর্ম, এ ধর্ম পৃথিবীকেই বড় করে দেখেছে; সুতরাং বৈষ্ণব পরিভাষাগত এই ধাম-মহাত্ম্য উপলব্ধি করলে আপনাদের তরুণের দলেরই জয় হবে। দেশের সহস্রশীর্ষ নারায়ণ মাথা তুলে দাঁড়াবেন। সে পথে, আভিজাত্য থাকবে না, থাকবে না সাম্রাজ্যবাদ, থাকবে না ফ্যাসিস্টবাদ। দেশের আত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার পথটি ছেড়ে বিদেশীর অনুকরণ করতে ছুটবেন না। বাঙলা দেশের অকিঞ্চন সাধকদের আদর্শ আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। এদেশের নরনারী সকলের মধ্যে আপনারা সুন্দরকে দেখুন, দেখুন, সকলের মধ্যে গুরুকে। যে সত্যের জোরে ভগবান শঙ্করের জটার বাঁধন ছিঁড়ে যায় এবং বিপ্লবের রুদ্রতাল তাঁর অন্তরে বেজে উঠে, আজ সেই সত্যই আপনাদের শক্তি দান করুক। শঙ্করের সে শক্তির মূল কোথায়? "আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত যস্য মে গুরু সন্ততিঃ"—ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করে তৃণগুচ্ছের মধ্যে পর্যন্ত আমি গুরুকে দেখতে পাই, শঙ্কর বলেছেন, এই আমার শক্তি। যে দৃষ্টিতে এমন দর্শন লাভ হয়, তেমন ক্ষমতা একটু পেলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। বাঙলার অকিঞ্চন বৈষ্ণবদের এই আদর্শই ধামে রয়েছে। তাঁদের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধানত অন্তরই আজ আমাদের দরকার, তবেই আমরা সে আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি লাভ করতে পারব। আর অকুতোভয়তার সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে সমর্থ হব। আমাদের কৃত্য অনেক রয়েছে, ফর্দ ধরতে বসলে শেষ হবে না, কিন্তু সকল কৃত্য কৃত বা অনুষ্ঠিত হবে এক প্রেমের পথ ধরলেই; অর্থাৎ দেশের নরনারীকে আপনার করে দেখতে পারলেই। সেখানে কৃত্য হব ক্লেশ-শূন্য এবং জীবনে আমরা লাভ করব অভয়।*

---

*ফরিদপুরে অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে 'দেশ' সম্পাদকের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।



(৬)

বৈকালের মধ্যে পথের জল নামিয়া গিয়া পথ পরিষ্কার হইয়া গেল।

শাশ্বতী মোটরখানাকে ঠিক করিয়া লইতেছিল, দীর্ঘ দুই তিন ঘণ্টার পথ, এই পথের মাঝে কলকব্জা বিগড়াইলেই তো মুস্কিল।

সুমন্তের ভৃত্য দিবাকর দুইটি ঔষধের শিশি লইয়া দ্রুতপদে ফিরিতেছিল,—মুখ তাহার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

শাশ্বতীর কার্যে সাহায্যকারী ব্রজসুন্দর হাঁক দিল, "ওষুধ কার?"

শুষ্কমুখে দিবাকর বলিল, "খোকাবাবুর"।

ব্রজসুন্দর আশ্চর্য হইয়া বলিল, "এই যে ওবেলা তাকে দেখলুম—"হেঁইয়ো হেঁইয়ো" করে কোদাল নিয়ে জল যাওয়ার পথ করছে, এর মধ্যে এমন অসুখ হল যাতে ওষুধ লাগছে?"

দিবাকর বলিল, "ওই তো—ওই কথাই তো বলছিলুম ব্রেজোবাবু,—না হোক হাজারবার বারণ করলুম, যেয়ো না খোকাবাবু, পরের জন্যে অত খাটবার দরকার কি? ওই যে রামবোস—যার বাড়ির জল বের করে না দিলে ঘরে জল উঠছিল, বেড়া ভেঙে পড়ছিল, ওই রামবোসই না কাল সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি বয়ে মারতে এসেছিল; এই যে পড়ে গিয়ে পায়ে লাগলো, এর জন্যে কেউ কোনদিন সেবা করবে, মুখের কথাটি জিজ্ঞেস করবে?"

দিবাকরের কণ্ঠস্বর প্রথমটা রুদ্র ছিল, শেষের দিকটায় কান্নায় ভিজিয়া উঠিল।

শাশ্বতী কেবলমাত্র মোটরে স্টার্ট দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, থামিয়া গিয়া দিবাকরের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পড়লেন কি করে?"

দিবাকর উত্তর দিলে, "রামবোসের ঘরের ওপর একটা গাছ হেলে পড়ে চালাটা পড়বার মত হয়েছিল, খোকাবাবু সেটা সরিয়ে দিতে গেছলেন কি না, সেই সময়ে পড়ে গিয়ে পায়ে যা চোট লেগেছে"—

উদ্বিগ্নকণ্ঠে শাশ্বতী বলিল, "হাড় ভাঙে নি তো, ডাক্তার দেখালে ভালো হতো—"

দিবাকর বলিল, "ডাক্তার দেখে এই ওষুধ দিয়ে গেছেন, তাই দিতে যাচ্ছি। বড্ড লেগেছে কি না, একেবারে বেহুঁস অবস্থা—"

সে তাড়তাড়ি চলিয়া গেল।

শাশ্বতী হাতের যন্ত্রটা গাড়ির মধ্যে ফেলিয়া মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজসুন্দর দৃপ্তমুখে বলিল, "বোঝ ব্যাপারখানা; পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বসলেন। ওই যে বলে না, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—" এ ঠিক তাই। কেউ সুমন্তকে চায় না, তবু গায়ে পড়ে যাবে উপকার করতে, তেমনি হয়েছে কাণ্ড—এখন বিছানায় পড়ে ডাল-রুটি খাক্।"

শাশ্বতীর গম্ভীর মুখের পানে তাকাইয়া ব্রজসুন্দর একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহার কথাগুলো সে যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। নির্বাকে সে কেবল তাকাইয়া আছে, একটা প্রশ্নও করে না।

ব্রজসুন্দর ললাটের ঘাম মুছিয়া বলিল, "আর ডাল-রুটিই বা জুটবে কোথা হতে? একটি পয়সাও কাছে নেই, ওই তিন-কেলে বুড়ো চাকর কি করবে তাই ভাবি।"

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "এ অবস্থায় দেখতে ওঁকে কেউ নেই? ওঁর কোন আত্মীয়স্বজন—"

ব্রজসুন্দর কেবল মুখ বিকৃত করিল, কেবলমাত্র একটা শব্দ তাহার মুখে ফুটিল—"ঘেঁচু—"

শাশ্বতী বলিল, "কিন্তু আপনারাও তো আছেন?"

"আমরা—"

ব্রজসুন্দর এতখানি হাঁ করিয়া ফেলিল, "আমরা? আমরা কি করব?"

শাশ্বতী নির্বিকারভাবে বলিল, "আপনারা কি না পারবেন? টাকাকড়ির দিক দিয়ে না হোক, দেখাশোনা, সেবা-শুশ্রূষা তো করতে পারবেন!"

ব্রজসুন্দর বিকৃতমুখে বলিল, "করছে কে আগে তাই ভাবো। আমার মা তো ওই মানুষ, নড়তে চড়তেই দিন কাটে, কোনক্রমে দুটো ভাত-তরকারী তৈরী করে দেন। এর মধ্যে রোগীর সেবা করা কি বড় মুখের কথা?"

শাশ্বতী আর একটি কথা না বলিয়া অগ্রসর হইল।

ব্রজসুন্দর বাধা দিল, "কোথায় যাচ্ছো শ্বতি?"

শাশ্বতী চলিতে চলিতে বলিল, "একবার দেখে আসি—"

ব্রজসুন্দর যেন আকাশ হইতে পড়িল, "সে কি, তুমি যাবে সুমন্তকে দেখতে?"

শাশ্বতী ফিরিয়া দাঁড়াইল, ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তাতে দোষ আছে কি?"

ব্রজসুন্দর সবেগে মাথা নাড়িল, "না না তা হতে পারে না,

তুমি ওখানে যেতে পারো না। সুমন্ত—হ্যাঁ, সে নাকি একটা লোকের মত লোক তাই যাবে তুমি তাকে দেখতে? সে কি মানুষ—তোমার মান সে রাখতে জানবে তাই তুমি ওঘরে যাবে?"

শাশ্বতী স্থির কণ্ঠে বলিল, "মানুষ কি অমানুষ সে বিবেচনা পরে করা যাবে, এখন কেবল সে যে অন্ততঃপক্ষে আকৃতিতেও মানুষ সেই হিসেবে আমাকে দেখতে যেতে দেবে আশা করি।"

উত্তেজিত ব্রজসুন্দর বলিল, "কেবল দেহ নিয়েই মানুষ মানুষ হয় না, মনের সহায়তাও অনেকখানি থাকে তা জানো তো।

বিরক্তভাবে শাশ্বতী বলিল, "না, আমি এ মুহূর্তে তার মনের দিক বিচার করতে চাই নে। মনের দিক বিচার করতে গেলে হয় তো নিজেই নিজের ত্রুটিতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠব, কারণ ত্রুটিহীন মানুষ কেউই নেই। যাক, তুমি মোটরটার কাছে থেকো যে পর্যন্ত আমি না আসি।"

আহত ব্রজসুন্দর দাঁড়াইয়া গেল, শাশ্বতীর সঙ্গে চলা বা কথা বলার সাহস তাহার হইল না।

শাশ্বতী সুমন্তের গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

একখানা মাদুরের উপর পড়িয়া আছে সুমন্ত, মাথায় একটা ছিন্ন ময়লা উপাধান। বাম পা'খানা অচল অবস্থায় পড়িয়া আছে, দিবাকর আঙ্গুলে করিয়া সামান্য একটু মলম তুলিয়া সেই পায়ে মাখাইয়া দিতেছে।

চোখ মুদিয়া পড়িয়া আছে সুমন্ত—

দীর্ঘ দেহখানা তাহার দারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন, নড়িবার ক্ষমতাটুকুও তাহার নাই। দুঃসাহসের কাজ করিয়াই সে আজ বিপন্ন হইয়াছে। দুঃসাহস বই কি? যে রামবসু কাল তাহাকে বাড়ি বহিয়া গালাগালি দিয়া গেছেন—তাঁহাকে সে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে বিপন্ন হইয়াছে।

গাছ পড়িয়া যে ঘরখানা কাত হইয়া গিয়াছিল তাহারই মধ্যে ছিলেন রামবসু—

একার পক্ষে সে গাছ সরানো অসম্ভব ছিল, সুমন্ত সাহায্যের জন্য ব্রজসুন্দরকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে সাহায্য তো করেই নাই বরং দুষ্টুর কথা শুনাইয়াও দিয়াছিল—সমবয়স্ক সুমন্তকে বিদ্রূপ করিয়াছিল এবং সে বিদ্রূপও ছিল অত্যন্ত কদর্য ধরণের। যাহা সুমন্ত সহ্য করিতে পারে নাই এবং রুদ্ধরোষে গর্জন করিয়া সে দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। আবার কি ভাবিয়া সে পিছাইয়া গিয়াছিল—দুর্বল ব্রজসুন্দরকে তখনকার মত সে ক্ষমা করিয়াছিল।

নিজে সাংঘাতিক আহত হইয়াও সে বৃদ্ধ রাম বসুকে বাঁচাইয়াছে।

দিবাকর মূর্ছিতপ্রায় সুমন্তকে কোনরকমে তাহার ঘরে আনিয়া ফেলিয়াছে, ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছে, ঔষধ আনিয়া খাওয়াইয়াছে, নির্দেশমত মালিস করিতেছে।

শাশ্বতী মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইয়া দেখিল,—তাহার পানে তাকাইয়া দিবাকর আশ্চর্য হইয়া গেল—কি বলিবে, কোথায় বসিতে দিবে, ঠিক করিতে পারিল না, সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাশ্বতী সঙ্কেতে তাহাকে তাহার জন্য বিব্রত হইতে নিষেধ করিল।

দিবাকর সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—"আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন দিদি, বসতে দেওয়ার জায়গা ঘরে তো নেই। চেয়ার আছে ওদিককার ঘরে, এনে দেব কি?"

শাশ্বতী বলিল, "কোন দরকার নেই, আমি এমনই বসছি। কিন্তু মালিস করা তোমার তো হচ্ছে না দিবাকর, আর আমার মনে হয় মালিসে এর কিছুই হবে না। আমি এখানে বসছি, তুমি বরং ডাক্তারবাবুকে এখানে একবার ডেকে আনো, এখানে একবার দেখে যান আর পায়ে বরং একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিন। এ মালিসের কর্ম নয়, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে বরং উপকার হবে।

দিবাকর ইতঃস্তত করিতে লাগিল।

ডাক্তার আনিতে গেলেই ভিজিট লাগিবে—গ্রামের ডাক্তার হিসাবে তিনি এক টাকা লইবেন, গ্রামের বাহিরে দুই টাকা গ্রহণ করেন। এক টাকা ভিজিট দিয়া সে একবার ডাক্তার আনিয়াছে, ঔষধ কিনিতে দেড় টাকা খরচ হইয়াছে, বাক্সে পাঁচ আনা ছাড়া আর কিছু নাই।

শাশ্বতী তাহা বুঝিল না, বলিল, "দেরী করছো কেন, যাও।"

বড় দুঃখেই দিবাকর হাসিল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ডাক্তারবাবু তো শুধু আসবেন না, তাকে একবার এক টাকা দিয়ে ওখানেই দেখানো হয়েছিল—"

কথাটা সে সমাপ্ত করিতে পারে না, জানাইতে পারে না, এখন ডাক্তার ডাকিতে গেলে আবার একটি টাকার প্রয়োজন—সে টাকা ঘরে নাই।

সে কথাটা না বলিলেও শাশ্বতী বুঝিল, হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা সে একবার নাড়াচাড়া করিল, পাঁচখানা দশ টাকার করিয়া নোট ইহার মধ্যে আছে, কিন্তু দেওয়ার কথা বলা চলে না।

কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "তখন ডাক্তার বোধ হয় ভালো করে দেখতে পারেন নি, এখন রোগী শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন, এই সময় একবার ভালো করে দেখলে হতো। টাকা কোথাও ধার পাওয়া যাবে না?"

"ধার—"

দিবাকর বিকৃত হাসিল, "ধার পাড়াগাঁয়ে চট করে মেলে না, বিশেষ করে শুধু হাতে কেউ দেয় না।"

শাশ্বতী একটা অছিলা পাইল, চট করিয়া ব্যাগ খুলিয়া একখানা নোট বাহির করিয়া বলিল, "তবে আমার কাছ হতে ধার নাও, পরে যখন হবে তখন দিয়ো।"

দিবাকর যেন আকাশ হইতে পড়িল, সে বিশ্বাস করিতে পারে না শাশ্বতী তাহাকে দশ টাকার নোট দিতেছে।

শাশ্বতী বলিল, "ভাববার কোন কারণ নেই দিবাকর, আমার কাছে কিছু রাখারও দরকার নেই, সে জন্যেও তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। এই টাকাটা নিয়ে তুমি আগে ডাক্তার

ডেকে আনো, ওষুধপত্র দাও। তোমার খোকাবাবু ভালো হলে আমাকে বালিগঞ্জের ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে দিতে বলো।"

দিবাকরের হাতে দুখানা নোট দিয়া সে পিছন ফিরিল। দুই পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া বলিল, "আমি এখনই কলকাতায় চলে যাচ্ছি, পারো তো কাল তোমার খোকাবাবু কেমন রইলেন, সে খবরটা একখানা পোষ্টকার্ড লিখে আমায় একবার জানিয়ো।" সে চলিয়া গেল।

(৭)

সুমন্তের পায়ের হাড় ভাঙ্গে নাই, মচকাইয়া গিয়াছে মাত্র। কয়েকদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া একদিন সে উঠিয়া বসিল।

"দিবা—"

দিবাকর উনানে আগুন দিতেছিল, ডাক শুনিয়া এ ঘরে আসিল।

সুমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এ কয়দিন যন্ত্রণার চোটে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি, আজ জিজ্ঞাসা করছি। এই যে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এ সব খরচ চলছে কোথা হতে, টাকা পেলে কোথায়?"

দিবাকর উত্তর দিল, "ধার করেছি।"

"ধার?—"

সুমন্ত চমকাইয়া উঠিয়া ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইল, না, জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে, দিবা কিছু বন্ধক দেয় নাই।

তবু উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছ হতে কত টাকা নিয়েছ শুনি?"

দিবাকর একটু থামিয়া উত্তর দিল, "টাকা কুড়িই নিতে হল খোকাবাবু, না হলে কুলোয় না। কম খরচটি ত নয়, ডাক্তারের ভিজিটই দুদিনে ছ'টি টাকা লাগলো, তারপরে ওষুধপত্তর সবই তো আলাদা—"

আঁৎকাইয়া উঠিয়া সুমন্ত বলিল, "সর্বনাশ, ডাক্তারের ভিজিটই লাগলো ধার করে ছয়টি টাকা, তুমি বলছো কি দিবা?"

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

সুমন্ত বলিল, "তারপর, এ টাকা তুমি যোগাড় করলে কি করে? শুধু হাতে কেউ তোমায় কুড়ি টাকা ধার দেয় নি। এ গাঁয়ে কেউ কি তোমায় এ টাকা দিয়েছে? তা তো মনে হয় না; তবে যদি চুরি বা ডাকাতি করে এনে থাকো, কিন্তু তাও ত তোমার পক্ষে একেবারে, অসম্ভব, কি বল?"

দিবাকর কেবল হাসিল, শাশ্বতীর নামটা মনে আসিতেছিল, মুখে বাধিয়া যাইতেছিল।

সুমন্ত আবার বলিল, "যাই হোক, আমাকে তোমার সে কথাটা জানানো উচিত দিবা-দা, যে টাকা ধার নিয়েছো, সেটা আবার শুধতে হবে তো, না কি তারা একেবারে দান করেছে?"

দিবাকর ইতঃস্তত করিয়া বলিল, "টাকা দিয়েছে ওই মেয়েটি—কি কে ওর নামটা, অদ্ভুত গোছের নাম কিনা।"

"মেয়েটি—?"

সুমন্ত সোজা হইয়া বসিল, গায়ে ঝাঁকানি লাগিয়া চিড়িক দিয়া উঠিল, যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে সে বলিয়া উঠিল, "উঃ—"

দিবাকর তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া বালিশটাকে সরাইয়া দিল। তিরস্কারের সুরে বলিল, "বার বার যা বারণ করবো, তাইতো করবে খোকাবাবু। এই সেদিন না হোক পঞ্চাশ বার বারণ করেছিলুম, ও সব কাজ করতে যেয়ো না, তা তো শুনলে না। কি দরকার ছিল রামবোসের ঘর বাঁচাতে গিয়ে?"

বিকৃত মুখে সুমন্ত বলিল, "তুমি থামো বাপু, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না—ভালো লাগে না।"

"হুঁ, নুনের ছিটে—"

দিবাকর মুখভঙ্গী করিল।

বেদনাটা কতক সামলাইয়া লইয়া সুমন্ত বলিল, "বুঝেছি, ও-বাড়ির ঐ মেয়েটা—সেদিন যে আমাকে পাগল বলেছিল, ভেঙ্গচিয়েছিল, সেই বুঝি দয়া করে টাকাটা দিয়েছে? তুমি বুঝি আর লোক পাওনি দিবা, তাই ওর কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলে?"

মুহূর্ত থামিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ওই দয়ার দানে জীবন রাখার চেয়ে না রাখাই ভাল দিবাদা। জীবনে কখনও কাহারও কাছে ভিক্ষে চাইনি, আর তুমি আমার নাম করে সেই এক অচেনা অজানা মেয়ে—তারপরে যে আমায় অমনভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে, তার কাছে তুমি ভিক্ষে চাইলে, ছি—"

দিবাকর এতক্ষণ পরে কথা বলিবার অবকাশ পাইল—সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও কথাটি বলো না খোকাবাবু, সাতদিন না খেয়ে থাকব তবু কারও কাছে হাত পাতব না। এই যে কতদিন কত কষ্ট গেছে, তুমি গাঁয়ে খোঁজ নাও দেখি, কাউকে কোনদিন কিছু বলেছি কিনা।"

সুমন্ত একটু হাসিল, "বাবা, অমনি রাগ হয়ে গেল দিবাদা, সে কি আমি জানিনে যে, তুমি কারও কাছে কোনদিন কোন কথা বল না? কিন্তু একটা কথা—ওই মেয়েটা হঠাৎ আমাদের কুড়ি টাকা ধার দিলে কেন, এ কথাটা আমি বুঝছি নে।"

দিবাকর বলিল, "তোমাকে দেখতে এসেছিল কিনা, সেই সময় কুড়ি টাকা ধার দিয়েছে। কথা আছে, এর পরে তুমি ওদের টাকা হয় পাঠিয়ে দেবে ডাকে, না হয় নিজে গিয়ে দিয়ে আসবে।"

সুমন্ত ক্রোধ দমন করিতে পারে না, গর্জিয়া বলিল, "হুঁ আমি ওর চাকর কিনা তাই হুকুম করলেই বাড়ি বয়ে টাকা দিয়ে আসতে হবে। আমার অত সুখ পড়েনি দিবা-দা, তুমি নিয়েছ, তুমিই গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে, বলে দিচ্ছি।"

দিবাকর মাথা চুলকাইতেছিল, একটি উত্তরও দিল না।

সুমন্ত নিজের মনে বলিতেছিল, "যেচে এসে টাকা দিয়ে যায় এতখানি উদার মন তো বাপু কোথাও কারও দেখিনি। এর মূলে যে কি উদ্দেশ্য আছে সেইটাই ভেবে দেখার কথা। যাক, সব টাকা তো খরচ হয়নি দিবা-দা, তুমি আর যা আছে সেটা নিয়ে গিয়ে ফেরত দিয়ে এসো, দু-চার টাকা যা ধার থাকবে সেটা শোধ দিতে তা হলে বিশেষ গায়ে বাজবে না; দু-চার দিন পরেই দিতে পারব।"

দিবাকর মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, "বেশী তো বাকি নেই খোকাবাবু, গোটাচারেক টাকা মাত্র পড়ে আছে—"

সুমন্ত বলিল, "তবু চার টাকা দিলে থাকবে মাত্র ষোল টাকা—তুমি দিয়ে এসো দিবা-দা—"

দিবাকর হতাশভাবে বলিল, "দেব কাকে, সে তো টাকা দিয়ে তখনই চলে গেছে।"

আশ্চর্য হইয়া সুমন্ত বলিল, "দিয়েই চলে গেল?"

দিবাকর বলিল, "তখনই গেছে—"

সুমন্ত খানিক গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে পা খানা পাশ-বালিশের উপর তুলিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল—"হুঁ, বুঝেছি, কিন্তু ভারি জব্দ করে গেল তো।"

দিবাকর বাহির হইয়া গেল।

সুমন্ত চিৎ হইয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল কি করিয়া সেই অজ্ঞাত মেয়েটিকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়া যায়।

উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, নিষ্ফল রোষে সে নিজের হাতের আঙুলগুলো মোচড়াইতে লাগিল।

কি গর্বিত সেই মেয়েটি, একদিন না দুই দিন মাত্র তাহাকে সে দেখিয়াছিল, তাহাতেই তাহার সমস্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপযাচক হইয়া সুমন্ত কাহারও নিকটে তাহার পরিচয় চায় নাই; তথাপি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কথা তাহার কানে আসিয়া পেঁৗছিয়াছিল।

সুমন্ত ঠিক করিল এবার ভালো হইয়া সে যেমন করিয়াই হোক টাকাটা জোগাড় করিয়া আগে পাঠাইয়া দিবে,—নিজেকে ঋণমুক্ত করিবে।

অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল, "চা হয়েছে দিবা-দা?"

পাশের রন্ধন গৃহ হইতে দিবাকর উত্তর দিল, "হয়েছে, আনছি।"

সুমন্ত একটা আড়ামোড়া ছাড়িল, একটা হাই তুলিল।

(৮)

বালিগঞ্জে মিঃ বোসের প্রকান্ড বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা।

শাশ্বতী যখন বাড়িতে ফিরিল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। মোটরখানা থামিতেই দ্বারোয়ান ও ভৃত্য ছুটিয়া আসিল, তাহাদের হাতে মোটর ছাড়িয়া দিয়া শাশ্বতী লাফ দিতে দিতে ভিতরে প্রবেশ করিল, দিব্য গুণ গুণ করিয়া সে সুর ভাঁজিতেছিল "টা রা রা রা—টা রা—"

প্রকান্ড বড় হলঘরে তখন বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিল অনেক, —স্বজাতির 'বার্থ ডে'তে আজ সন্ধ্যায় অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মিঃ বোসের বন্ধুবান্ধব, মিসেস বোসের বান্ধবী ও বন্ধুর দল, স্বাতীর সম্পর্কে যে যেখানে ছিল সকলেই আসিয়াছে।

একপাশে পিয়ানো বাজাইয়া স্বাতীর এক বন্ধু মিস শিউলি সেন গান ধরিয়াছে—

এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলাম ফাল্গুনে।

সমস্ত ঘরখানা তাহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট মধুর সুরে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রবিবাবুর এই গানটির সুর ছাড়াইয়া ভাষার মাধুর্যে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ভাবাবেশে সদ্য বিলাত প্রত্যাগত আই-সি-এস মিঃ নাগের মাথা এদিক ওদিক দুলিয়া তাল রাখিতেছিল, ডাক্তার বিনয় সরকার একখানা মোটা বই টানিয়া লইয়া তাহার উপর আঙুলের ঠোকা দিতেছে—

অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে ঢুকিয়া পড়িল শাশ্বতী—

আঁটিয়া সাঁটিয়া কাপড়খানা পরা, হাতে লিকলিকে সরু একগাছি বেত—তাহার সর্বদার সাথী, কোন দিন কোন মুহূর্তে সে বেত ছাড়ে না।

তাহার দুর্দান্ত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে গানের শান্ত সুর যে নিস্তব্ধ ঘুমের জাল বুনিয়া দিতেছিল, অকস্মাৎ তাহা যেন ছিঁড়িয়া গেল। গায়িকার গান মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে সচকিত হইয়া সোজাভাবে উঠিয়া বসিল।

"বাঃ, বেশ—"

শাশ্বতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"টা টা টা রে টা—"

বড় বোন স্বাতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, "আঃ, কি ব্যাপার হচ্ছে শাশ্বতী, তুমি কি পাগল হয়েছো?"

মিসেস বোস উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "ও-ঘরে চল শাশ্বতী—"

শাশ্বতী বেতটা সামনের টেবলের উপর ফেলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া স্বাতীর পাশে বসিল—বলিল, "আজ ব্যাপারখানা কি স্বাতী, ভয়ানক সেজেছো দেখছি যে—ইস্, দেখে হিংসে হচ্ছে।"

কানের কাছে মুখ আনিয়া কথা বলায় আর কেহ শুনিতে পাইল না।

চাপা সুরে স্বাতী বলিল,—"ভদ্রভাবে কথা বল, শাশ্বতী। তুমি একটু বিশ্রাম করে এসো গিয়ে, এখন তোমাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে না।"

শাশ্বতী জোরে হাসিয়া উঠিল, তাহার হাসিতে কাছাকাছি সকলে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পানে চাহিল। যাহারা এই মেয়েটির পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা বিস্মিত হইল না, কারণ তাহারা বেশই জানে, সামাজিক নিয়মকানুন, বাধ্যবাধকতার ধার এ মেয়েটি ধারে না, নিজের খেয়ালেই সে চলে—।

যাহারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় পায় নাই, তাহারা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; বিস্মিত নেত্রে এই অদ্ভুত মেয়েটির পানে তাকাইয়া রহিল।

মিসেস চৌধুরী খানিকক্ষণ শাশ্বতীর পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনার ছোট মেয়ে না মিসেস বোস? সেই কতটুকুটি দেখেছিলুম সেবার দার্জিলিংয়ে, তখন বোধ হয় আট-দশ বছর বয়স হবে—না?"

আগুনজ্বালা নেত্রে অবাধ্য কন্যার পানে তাকাইয়া মিসেস বোস বলিলেন, "হ্যাঁ, আট-দশ বছর বয়সই হবে তখন—।"

মিসেস চৌধুরী হিসাব করিয়া বলিলেন, "বয়স তাহ'লে এখন বছর আঠারো-উনিশ হ'ল—নয়?"

মিসেস বোস সংক্ষেপে বলিলেন, "তা হ'ল।"

মিসেস চৌধুরী সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ও-মা, আমার কুয়াসার বয়সী হ'ল, কিন্তু আপনার মেয়ে বলে আমি মোটে বিশ্বাসই করতে পারতুম না মিসেস বোস—যদি পরিচয় না পেতুম। আপনি বা আপনার স্বাতী যে ধরণের মেয়ে, আপনার এ মেয়েটি কিন্তু সে ধরণের নয়, দেখেই বোঝা যায়।"

আহত হইয়া মিসেস বোস বলিলেন, "হ্যাঁ শাশ্বতী ওর বাপের অতিরিক্ত আদরে ওই রকমই হয়েছে বটে—"

বাধা দিয়া মিসেস চৌধুরী বলিলেন, "কিন্তু ওর ভবিষ্যৎটা তো ভাবা উচিত মিসেস বোস। দেখুন তো, ওরই বয়সী আমার

কুয়াসা, বলতে নেই—কি রকমভাবে ওকে গড়ে তুলেছি। পাত্রও তো আসছে বড় কম নয়—হিরণ দত্ত, মণিময় ঘোষাল, রঞ্জিৎ ব্যানার্জি—এরা প্রত্যেকেই যোগ্য ছেলে—বলুন যোগ্য কি না, এরা সবাই ওকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল। হবে না—আমার কুয়াসাকে গড়ে তুলেছি যে রকমভাবে, তাতে ওকে ঠিক আদর্শ বলাই চলে—।"

মিসেস বোসের অসহ্য মনে হয়, অবাধ্য দুরন্ত মেয়ের নিন্দায় মায়ের চোখে জল আসিয়া পড়ে।

ততক্ষণে মিস শিউলি সেন গানের শেষ স্ট্যান্‌জা গাহিতেছে—

গন্ধে উতল হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী—

শাশ্বতী মাথা দুলাচ্ছিল—"উ'হু ঠিক হচ্ছে না, ওই জায়গায় যে সুরের ভাবটা ফুটবে, তা ফুটলো না কেবল সুরের দোষে—"

শিউলি সেন একবার তাহার পানে চাহিল, কোন রকমে গানটাকে শেষ করিয়া সে রুমালে ঘাম মুছিয়া দাঁড়াইল—।

শাশ্বতী বসিয়া গেল শূন্যে চেয়ারে—নিজের মনে পিয়ানোর উপর হাত বুলাইতে লাগিল, প্রথমে একটা ইংরেজি গৎ বাজাইয়া একটা বাঙলা সুর ধরিল, গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া সে গলা ছাড়িয়া দিল—।

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া সে গাহিতে লাগিল—

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো.—

কান্নাঝরা গানের সুর—স্তরে স্তরে উঠিল, আবার স্তরে স্তরে নামিল।

একঘর লোক নিস্পন্দ হইয়া এই মেয়েটির পানে তাকাইয়াছিল।

বিস্ময়ে হতবাক্ জননী কন্যার পানে তাকাইয়াছিলেন ; শাশ্বতী এমন গান গাহিতে পারে, তাহা তিনি কোনদিনই জানিতে পারেন নাই। বিস্ফারিত চোখে শাশ্বতীর পানে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, এমন মিষ্ট মধুর কণ্ঠস্বর তাহার কোথায় ছিল, এমন গান সে শিখিল কোথায়—কাহার কাছে?

শাশ্বতী ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার আশেপাশে এতগুলি লোক আছে, এতগুলি লোক নির্বাকে তাহার পানে তাকাইয়া আছে। নিজের মনে সে গাহিতেছিল—

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীন হীন মন—
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ—
রাজ সমারোহে এসো—।

গান শেষ করিয়া শাশ্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল—

তরুণ আই-সি-এস হিরণ দত্ত মুগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"আর একখানা গান গাইবার অনুরোধ করছি মিস বোস—"

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে অনুরোধপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

বিনীতভাবে হাসিয়া দুই হাত যোড় করিয়া শাশ্বতী বলিল, "মাপ করবেন, আমি এখন ভারি ক্লান্ত, অনেক দূর হ'তে মোটর হাঁকিয়ে এসেছি কি না, খানিকটা বিশ্রাম না ক'রে পারছিনে—।"

একবার মাত্র মাথাটা এদিকে ওদিকে কাত করিয়া সে বেতটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

মিস বেলা চ্যাটার্জি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ভারি অহঙ্কার—"

মণিকা রায় চাপা সুরে বলিল, "কাউকে কেয়ারে আনে না, ভদ্রতার মর্যাদা ওর কাছে নেই।"

মিসেস চৌধুরী আশ্চর্যভাবে বলিলেন, "সত্যি আপনার এই ছোট মেয়েটি আপনাদের হ'তে একেবারে তফাৎ মিসেস বোস। এমন আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে কি রকম যেন—"

আহতা মিসেস বোস অদূরস্থ স্বামীকে দেখাইয়া বলিলেন, "যা বলবার ওঁকেই বলুন, ওই মেয়েটিকে উনিই গড়েছেন, ওর সম্বন্ধে যা কিছু উনিই জানেন।"

মিসেস চৌধুরী সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ বোঝা যাচ্ছে—শাশ্বতীকে নিয়ে আপনার শান্তি নেই—"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া মিসেস বোস বলিলেন, "মোটেই না মিসেস চৌধুরী—মোটেই না। হয়তো ভালোই হ'ত যদি ওকে গড়ার ভার আমি নিতুম। দেখেছেন তো—মেয়ে আমার কোন অংশে কারো চেয়ে খাটো নয়, তার রূপও আছে, গুণও অনেক, যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না—কিন্তু সে সব যে ওর এমগুয়েমির জন্যে নষ্ট হ'ল, এই আমার বড় দুঃখ—এই আমার দারুণ অশান্তি।"

মিসেস মজুমদার বলিলেন, "সত্যিই তাই। শাশ্বতী যে এত সুন্দর গান গাইতে পারে, তা আমরা জানতুম না, ওর মুখে ওই 'টা রা রা রা' ছাড়া আর কোন সুর শুনিনি, আজ ওর মুখে এই চমৎকার গান শুনে সত্যিই আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি, কিন্তু ওই যে ওর খেয়াল—একখানা নিজের খুসিতে গেয়ে চলে গেল, এত লোকের এত অনুরোধেও আর গাইলে না।"

বৃদ্ধা মিসেস দত্ত বলিলেন, "গাওয়া মানে সকলের মান রাখা ওর উচিত ছিল।"

মিসেস চৌধুরী বলিলেন, "শুধু উচিত—সম্পূর্ণ উচিত ছিল। অবাক কাণ্ড, এমন মায়ের কাছে থেকে সে সভ্যতা, ভদ্রতা শিখলে না?

মিসেস বোসের এ সম্বন্ধে আর কথা বলার ইচ্ছা ছিল না, অথচ অভদ্রতা হইবে ভাবিয়া উঠিতেও পারিতেছিলেন না—ঠিক এই সময়েই মিঃ বোস তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠানোয় তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

"একটু বসুন মিসেস চৌধুরী, আমি এখনি আসছি—"

তিনি উঠিয়া পড়িলেন। (ক্রমশ)

পাকিস্থান-বিচার

রেজাউল করিম এম-এ, বি-এল

(৫) পাকিস্থানের সমর্থনে লীগওয়ালাদের প্রধান যুক্তি এই যে, সম্মিলিত ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহাতে হিন্দু-প্রাধান্য হইবে। মুসলমান প্রাণ থাকিতে এই হিন্দু-প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিবে না। কারণ মেজরিটি হিন্দুগণ মাইনরিটি মুসলমানের উপর সব সময় অত্যাচার করিবে। এগারটা (আরও দু-একটা বেশীও হইতে পারে) প্রদেশের প্রত্যেকটিকে একটা 'ইউনিট' ধরিয়া তাহাদের সম্মিলিত প্রতিনিধি লইয়া যদি একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাহাতে যদি পার্টি-প্রথা অনুসারে ক্যাবিনেট গঠিত হয়, (আর তাহাই যে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই) তাহা হইলে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিগণ মাইনরিটি থাকিয়া যাইবে, কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারতে মুসলমান ⅓এর কিছু বেশী এবং ⅓এর কিছু কম। ওয়েটেজসহ তাহারা ⅓এর বেশী আসন পাইতে পারে না। সুতরাং মুসলমান মাইনরিটি হইয়া রহিবে। কিন্তু হিন্দুরা মেজরিটি হইলেই যে তাহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে মুসলমানের উপর পীড়ননীতি চালাইবে—একথা আমরা বিশ্বাস করি না বা স্বীকার করি না। দেশের প্রতিনিধিদের ⅓ অংশ যদি কোন ব্যাপারে সব সময় বাধা দেয়, তবে বক্রী ⅔ অংশ কখনও দেশ শাসন করিতে পারিবে না। তা'ছাড়া ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা সংক্রান্ত বিষয় কতকগুলি মৌলিক অধিকার (fundamental rights) দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, কোন দেশের আইনসভা সহজে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সুতরাং হিন্দু মেজরিটি হইলেও কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হইবে না। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু মেজরিটি হইলেও তাহা হইবে শুধু সংখ্যার দিক দিয়া। কারণ, সকল হিন্দু প্রতিনিধিগণই একই পার্টিতে থাকিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, দেশে নানারূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দল থাকিবে। তাঁহারা নিজ নিজ দলের পক্ষ হইয়া নির্বাচন চালাইবেন। তাঁহারা কখনই আইনসভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল গঠন করিবেন না। বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দুদের তিন চারিটি দল আছে। মেজরিটি আসন পাইয়াও তাঁহারা কোনও দিন এক দলভুক্ত হন নাই। পরেও হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সিন্ধুতে মুসলমানগণ মেজরিটি। কিন্তু আইনসভায় অধিকাংশ আসন পাইয়াও এক দলভুক্ত হন নাই। সুতরাং স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দুগণও এক দলভুক্ত হইবে না। মুসলমানও হইবে না। বিশেষ একটা হিন্দু দলের আদর্শের সহিত বিশেষ একটা মুসলিম দলের আদর্শের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য দেখা দিবে যে, এই দুই দল এক হইয়া যাইবে। অবস্থা এমন হইতে পারে যে, দু-চারজন মুসলমানের সহযোগিতার জন্য হিন্দুদের কোন কোন দল মুসলমানকে কল্পনাতীত সুবিধা দিয়া বসিবে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সব সময়ই এইরূপ হইবে। কেন্দ্রে কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক মেজরিটি কার্যকরী হইবে না। অবশ্য দলীয় মেজরিটি হইবে। আর সেই দলীয় মেজরিটিতে বহুসংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি স্থান পাইবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সকল হিন্দু এক হইয়া মাইনরিটি মুসলমানকে পীড়ন করিবে—ইহা অহেতুক ভয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, কেন্দ্রে সকল হিন্দু এক পতাকার তলে আশ্রয় লইবে না—সেইরূপ সকল মুসলমানও এক পতাকার তলে আশ্রয় লইবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া পার্টি গঠিত হইবে। সেখানে সাম্প্রদায়িক দলের প্রভাব হইবে অতি নগণ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সকল হিন্দু-সদস্যগণ যদি এক হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাহারা মুসলমানের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না। কারণ, (১) কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা মৌলিক অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে। (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে তাহার অন্যায় কার্যের বিচার হইবে। (৩) দেশে আইনের শাসন (Rule of law) থাকার জন্য কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। (৪) বিদ্রোহ ও বিপ্লব দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করা চলিবে। আর একটা প্রধান কথা এই যে, যে পাঁচটি প্রদেশে মুসলমান মেজরিটি হইয়া রহিবে, ইহারা যদি হিন্দুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তবে এই সব প্রদেশ হইতে যেসব হিন্দু সদস্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হইবে, তাহারা মুসলমানের বিরুদ্ধে যাইবে না, সেরূপ করিবার কারণও উপস্থিত হইবে না। বাঙলার হিন্দু প্রতিনিধিগণ বাঙালী পীড়নের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোন বিধিব্যবস্থাই সমর্থন করিবে না। সুতরাং কেন্দ্রে হিন্দু প্রাধান্য থাকিলেও মুসলমানের কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে না। সংযুক্ত ভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ব্যতীত অন্য পথ নাই। দুই বা ততোধিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে নানা অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। দেশরক্ষা, আর্থিক বিলিব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতকে নিরাপদ রাখিতে হইলে একটি কেন্দ্রীয় শাসনেরই প্রয়োজন। (৬) লীগওয়ালারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটি চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাই তাঁহারা বহু চিন্তার পর পাকিস্থান পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অন্য পথ নাই। কিন্তু আমি পূর্বে দেখাইয়াছি যে, ইহা কোন পন্থাই নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে কেন? কাহার দোষে? তাঁহারা বলিবেন যে, হিন্দুদের দোষেই উহা ব্যর্থ হইয়াছে। আর হিন্দুরা বলিবে, মুসলমানের দোষেই উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক কাহার দোষে উহা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে নিরপেক্ষ আলোচনার দরকার। হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু তৃতীয় পক্ষের কারসাজিটা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আগা খাঁর কুখ্যাত ডেপুটেশন, ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতি, পৃথক নির্বাচন, বড় বড় রাজপুরুষদের গোপন চিঠিপত্র (লর্ড মর্লি ও লর্ড মিণ্টোর ডায়েরী দ্রষ্টব্য) আলিগড় কলেজের গোপন প্রোপাগান্ডা—এই সব দলিলপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যের গোড়ার কথাটা কি? এইগুলির মধ্যেই উত্তর রহিয়াছে—কেন আমাদের নেতাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। গোপনে ভেদনীতি ক্রিয়া না করিলে আমাদের ঘরোয়া বিবাদ আমরা কোন্ দিন মিটাইয়া ফেলিতাম। আমাদের দোষত্রুটি, স্বার্থপরতা এবং অদূরদর্শিতা ছিল আর এখনও আছে, ইহা অতীব সত্য। কিন্তু গোপনে চলিতেছিল একটা অদৃশ্য হস্তের ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রই সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছে। আগা খাঁ যখন ডেপুটেশন লইয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন কেহই ভাবিতে পারে নাই যে, ইহার মধ্যে এক গভীর উদ্দেশ্য আছে। বহু যুগ পরে নথিপত্র অনুসন্ধান করিয়া সব বিষয় জানা গিয়াছে। পাকিস্থান পরিকল্পনা কোন্ মস্তিষ্ক হইতে এবং কি উদ্দেশ্য লইয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে কথা পরে জানা যাইবে। তখন বিশ্ববাসী বিস্মিত হইয়া দেখিবে, ইহার মধ্যে মুসলিম স্বার্থের নামগন্ধও নাই। কংগ্রেস বহু হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াও মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফার তের দফাই মানিয়া লইয়াছিল. কেবল পৃথক নির্বাচনই স্বীকার করিতে সম্মত হয় না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের "না গ্রহণ, না বর্জন নীতির" কথা কে

না জানে? মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরও গান্ধীজী কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া
জিন্নাজীর সহিত আপোষ করিতে গিয়াছিলেন। জিন্নাসাহেব
কংগ্রেসের মৌলিক নীতি অস্বীকার করায় আপোষ হয় নাই।
সুতরাং কাহার দোষে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় নাই, তাহা
একপক্ষের কথা শুনিয়া বলা যায় না। পাকিস্থান হইলেই যে
ইহার চিরসমাধান হইয়া যাইবে, তাহাও সত্য নহে। যদি বুঝিতাম
যে, দেশ বণ্টন হইয়া গেলে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল
চিরতরে মিটিয়া যাইবে, তাহা হইলে না হয় এ সম্পর্কে কিছু
বিবেচনা করা যাইত। কিন্তু তাহাতেও কোন মীমাংসাই হইবে
না। (৭) মুসলিম লীগ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, ভারতের
মাইনরিটি সমস্যা অন্য দেশের মত নহে। সুতরাং ইহার সমাধানও
বিভিন্ন ধরণের হইবে; কিন্তু আমার মতে ভারতে মূলত কোন
মাইনরিটি সমস্যা নাই। মাইনরিটি সমস্যা বলিয়া যাহা পরিচিত,
তাহা আসলে একটা রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সমস্যা। কংগ্রেস ও
মহাসভার মত মুসলিম লীগও একটা রাজনৈতিক দল মাত্র। লীগের
প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবকে গোপন করিবার জন্য ইহার নেতার
গালভরা কথায় মাইনরিটি স্বার্থের বিষয় উত্থাপন করেন। প্র
হইতেছে, মাইনরিটি কাহাকে বলে? এ সম্পর্কে রামগড় কংগ্রে
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির অভিভাষণে যে ম
করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌলানা সা
মতে ভারতের মুসলমানগণ মাইনরিটি নহে। তিনি ব
"কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়া যে দল সংখ্যালঘু,
মাইনরিটি বলা চলে না এবং সেই অজুহাতে সে দল বিশেষ স
ব্যবস্থা পাইবার অধিকারী নহে। মাইনরিটির সোজা অর্থ এ
যে দল খুব সংখ্যালঘু এবং এত সংখ্যালঘু যে, নিজদিগকে
করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কতকগুলি সংগুণ ও শক্তির
এই সংখ্যালঘু দল মেজরিটিদের মধ্যে থাকিয়া নিজদিগকে
অসহায় ও অপদার্থ মনে করে যে, তাহারা স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষ
জন্য নিজেদের শক্তির উপর কোন বিশ্বাস রাখিতে পারে ন
কোন দল হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেই কোন দল ম
হইয়া যাইবে না। মাইনরিটি হইতে গেলে সর্বাগ্রে ই
যে, এই সংখ্যালঘু দল এত অল্প ও অক্ষম হইবে যে
স্বার্থ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে। সুতরা
সমস্যা কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার সমস্যা নহে। অন্যান
চাই। যদি কোন দেশের মোট লোকসংখ্যার দশ ল
একদলে, আর বিশ লক্ষ লোক থাকে অন্য দলে, ত
স্বতঃসিদ্ধভাবে বুঝায় না যে, যেহেতু একদল অ
সংখ্যায় অর্ধেক, সেই হেতু এই সংখ্যাল্প
মাইনরিটি বলিয়া দাবী করিবে এবং সেই অজু
দুর্বল বলিয়া ধরিয়া লইবে।" মুসলিম লীগ য
রাজনৈতিক পরিভাষায় যাহাকে মাইনরিটি সমস্যা
সেরূপ কোন সমস্যা নাই। সুতরাং দেশ বণ্ট
সমস্যার সমাধানের কোন প্রশ্নই উঠিতে
হঠাৎ যুদ্ধের পরে সন্ধির ফলে একটা দেশ অ

ও রাষ্ট্রের অন্ত
কেন্দ্র করিয়া
দেশের সংস্কৃ
বাধিয়া থাকে
সুবিধা দাব
কিন্তু ভার
বিজিত দে
অন্বিত।
পাশাপাশি
মনেই এ
সমস্বাথ

বাহিরে তখন শ্রাবণের বর্ষণমুখর আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিতেছে। ঝড়ের দাপটে ঘরের একখানা কপাট বুঝি খুলিয়া গিয়াছিল। খোলা দরজা দিয়া আলোর একটা ক্ষীণ রেখা সমান্তরালভাবে বাগানে গিয়া পড়িয়াছিল। মুখ তুলিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, একখানা নীল শাড়ি পরিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে সান্ত্বনা চৌকাটের উপর। কাল চোখ দুটিতে তার এক বিহ্বল অপ্রকৃতস্থ দৃষ্টি। হাতছানি দিয়া সে তাঁহাকে ডাকিল ঃ 'এসো!'

সোমেশ্বরপ্রসাদের কেমন ধাঁধা লাগিল। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দুহাতে তিনি চোখ দুটি একবার কচলাইয়া লইলেন। না, সান্ত্বনাই। আর একদিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেদিন দুপুরে তাঁহাকে কেন বাড়ি ফিরিতে হইয়াছিল—হ্যাঁ, 'ক্রেডিটের' খসড়াখানা ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন টেবিলের উপর। ঘরে ঢুকিয়া কিন্তু তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। টেবলের উপর পা ঝুলাইয়া সান্ত্বনা বসিয়া আছে আর আপন মনে তাঁহার খাতাপত্তরগুলির মধ্যে কি যেন সে খুঁজিতেছে। ধরা পড়িয়া কি একটা যেন কৈফিয়ৎ দিয়া সান্ত্বনা মহাঅপরাধীর মত বাহির হইয়া গিয়াছিল।.........

সোমেশ্বরপ্রসাদ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'কোথায়?'

'চল বেড়িয়ে আসি বাগানে। দেখছো না, কেমন বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে? ঘরে থাকতে আর ইচ্ছে হোল না।'

'আচ্ছা পাগল! এখন জলে ভিজলে যে নিমোনিয়া হবে!'

'হোক গে নিমোনিয়া।'

তাঁহার হাতে সে একটা ঝাঁকুনি দিল। তারপর তাহারা দুজনে বাগানে গিয়া পাশাপাশি বসিল। কথা কহিয়া রাত্রির মৌন নীরবতা ভাঙিতে কাহারও বুঝি আর সাহস হইল না।

পরের দিনেও তিনি ভাবিয়াছিলেন, সে বুঝি আজকেও আসিবে। দরজাটা তাই খোলা রাখিলেন। কিন্তু সে আসিল না। পরের দিনও কাটিল ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সেদিন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। শাড়ির খস খস শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন—সতর্ক পা ফেলিয়া সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। আলোটি নিবাইয়া দিয়া কহিল ঃ

'চুপ, কথা কয়ো না যেন।'

তারপর সে তাঁহার একান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার বুকের উপর দিয়া সান্ত্বনার তপ্ত নিশ্বাসের ঝড় বহিতে লাগিল।

'জানো, দিদি সেদিন সব টের পেয়েছেন?'

সে একটু থামিল। সোমেশ্বরপ্রসাদের কাঁধের উপর বুঝি হাত দুটি রাখিতে যাইতেছিল। পরমুহূর্তে আবার কি মনে করিয়া টানিয়া লইল। কহিল ঃ

'চল, এখান থেকে আমরা চলে যাই। হাজারীবাগে তো আমাদের কেউ কিছু আর বলতে আসবে না?'

কি জবাব দিবেন তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার চাকরীর কি হইবে? চাকরীর? কহিলেন ঃ 'আমার চাকরীর যে—'

'তোমার আবার চাকরীর কি দরকার? বাবার তো টাকার অভাব নেই?'

তিনি উভয় সংকটে পড়িলেন। একদিকে সান্ত্বনা—তাহার পরিপূর্ণ যৌবন, অতুল সৌন্দর্য, বাপের বিপুল অর্থ, আর অন্যদিকে—তাঁহার প্রবল আত্মবিশ্বাস, জীবনের অটল প্রতিভা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন! তিনি কোন্‌টা চাহিবেন? সান্ত্বনা না কাজ? না, কাজকেই! সান্ত্বনাকে তাঁহার ছলনাময়ী বলিয়া মনে হইল। উন্নতির সোপান হইতে তাঁহাকে আসিয়াছে বিচ্যুত করিতে, আসিয়াছে ভুলাইতে। তিনি এক পা পিছু হটিয়া আসিলেন। কহিলেন ঃ 'না, তা হয় না।'

সান্ত্বনা ইহা প্রত্যাশা করে নাই। স্তব্ধ হইয়া রহিল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

হাত বাড়াইয়া তিনি আলো জ্বালিলেন। যাক, সান্ত্বনা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন ঃ সান্ত্বনা তাহার মাথার খোঁপাটি সামনে মুখের উপর চূর্ণ করিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। ঘন কেশারণ্যে তাহার মুখখানা একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। মুখের উপর হইতে তাহার চুলগুলি তিনি সরাইয়া দিতে গেলেন। সান্ত্বনা বাধা দিল।

'না—না, তুমি আমার অবগুণ্ঠন খুলো না—আমার আর মুখ দেখো না।' একটু থামিয়া সে আবার কহিল ঃ 'যা হবার নয়, তার ওপর আমি আর জোর দিতে চাই না।'

হাতের আংটিটি খুলিয়া তাঁহার আঙুলে সে তখন পরাইয়া দিয়াছে। তারপর যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমন করিয়া নিঃশব্দে আবার চলিয়া গিয়াছে।

অসুবিধার অজুহাত দেখাইয়া তিনি তা'র পর দিনই চলিয়া আসিয়াছিলেন ধীরেনবাবুদের বাড়ি হইতে। তারপর তাঁহার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত পাণি প্রার্থিনীর অভিভাবক ভীড় করিয়াছেন তাঁহার দ্বারে আসিয়া। তিনি বিদায় দিয়াছেন সকলকে। বিবাহ করিবার তাঁহার আর সময়ই হয় নাই।......

এই কি মানুষের জীবন? জীবনের অর্থ কি কেবল একটানা কাজ করিয়া যাওয়া? এতদিন যাহা হোক কাজকে অবলম্বন করিয়া কাটিল, এখন তাঁহার অবসর সময় কী করিয়া কাটিবে? শুধু টাকা লইয়া তিনি কী করিবেন? লোকে কি কেবল টাকার জন্য টাকা উপার্জন করিয়া থাকে? তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য এখন কে ভোগ করিবে?......

ঘরে পায়চারী করিতে করিতে সার সোমেশ্বরপ্রসাদ প্রশ্ন করিলেন নিজেকে।

......কেন? টাকা লইয়া লোকে আবার কি করে? আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া কী লাভ? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি সব ফুরাইয়া গেল তবে পরকালের জন্যে মাথা ঘামান বোকামী নয় কি?......

সার সোমেশ্বরপ্রসাদের নিকট তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য, বিরাট এই রাজপ্রাসাদ, কর্মমুখর নিজের এই জীবন আজ অত্যন্ত দুর্বিষহ বোধ হইল। আজ তাঁহার মনে হইল ঃ নিজেকে তিনি

(শেষাংশ ৭২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেশ ও মনা

—জ্যোতি সেন

M. MUTSUDDI

১৮

বৃষ্টিতে ভিজিয়া দুর্গাজীর মন্দিরে যাওয়ার আনন্দ সবচেয়ে উপভোগ করিয়াছিল রাণু এবং দুর্ভোগ যখন দেখা দিল, তখনও সবচেয়ে ভুগিতে হইল তাহাকেই। কাহারো হইল সর্দি, কাহারো গায়ে ব্যথা, কাহারো বা ফ্লু,—আর তাহার হইল নিউমোনিয়া। আর সকলেই দু'দিনে সুস্থ হইল, কিন্তু সে শয্যাগত রহিল একটি মাস।

এই একটি মাস চুণারে তাহাদের কিভাবে কাটিল, তাহা ধারণা করা কাহারো পক্ষে কঠিন হইবে না। রোগের দরুণ রোগী ও তাহার আত্মীয় পরিজনকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, ইহা সকলেই জানে। এ ক্ষেত্রে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এক মাস একত্র থাকার ফলে প্রতিমা ও দিলীপ একে অপরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে পারিয়াছে। প্রতিমার মন যে অচল অটল, তাহা বুঝিতে পারিয়া দিলীপ তাহার আশা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা হইলেও তাহাদের আন্তরিক প্রীতি আগের মতই আছে।

প্রতিমা যে একটা আদর্শের প্রতি অনুরাগী হইয়াই আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, ইহা দিলীপ কোন দিনও বিশ্বাস করে নাই, আজও বিশ্বাস করে না। জয়ন্তের প্রতি অনুরাগবশতই তাহার আদর্শকে প্রতিমা নিজের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,—এ বিষয়ে দিলীপ একেবারে নিঃসন্দেহ। অবশ্য দিলীপ আশা করিয়াছিল—জয়ন্তের বিবাহে প্রতিমার মন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই দেখিয়া দিলীপ হতাশ হইয়া উঠিয়াছে।

জয়ন্তের প্রতি প্রতিমার এই অচলা ভক্তি আগে তাহাকে পীড়া দিয়াছে, কিন্তু এখন আর পীড়া দেয় না, বিস্ময় সৃষ্টি করে।

কলিকাতায় ফিরিবার আগের দিন প্রতিমাকে দিলীপ ছলনাসাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা প্রতিমা, লোকে যে বলে, জয়ন্তবাবু নাকি একটি অতিমানব—ভগবানের একেবারে সাক্ষাৎ অবতার, কথাটা কি সত্যি? তুমিও কি তাই মনে কর?'

প্রতিমা হাসিয়া বলিল—'আমি ত কারুর মুখে কোনদিন ও রকম কিছু শুনিনি, নিজেও তা' মনে করি না। তবে তিনি যে মহৎ লোক, এ বিষয়ে কিন্তু আমার এক তিলও সন্দেহ নেই। মনেপ্রাণে কেউ যদি পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে, তা' হলে লোকে তাঁকে কি বলে জানি না, কিন্তু আমি বলি মহামানব। জয়ন্তবাবুও তাই। প্রয়োজন হ'লে পরের কল্যাণে তিনি প্রাণ দিতে পারেন। আপনি ত তাঁর কার্যকলাপ নিজের চোখে দেখেন নি—দেখলে আপনি ঠাট্টা করতে পারতেন না।'

প্রতিমার কথায় দিলীপ মনে মনে একটু লজ্জিত হইল। বলিল,—'জয়ন্তবাবুকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁর সম্বন্ধে আমারও উচ্চ ধারণাই আছে, কিন্তু—অসাধারণ পুরুষ মনে করবার কোন কারণ দেখি না।'

প্রতিমা অনুরোধ করিল—'আমার ইচ্ছা, আপনি একবার নিজের চোখে তাঁর কার্যকলাপ দেখুন।'

'বেশত! দেখব।'—বলিয়া দিলীপ হাসিল।

প্রতিমা পুনরায় কহিল—'আপনি ত জয়ন্তবাবু সম্বন্ধে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, কিন্তু জয়ন্তবাবুকে কোনদিন আপনার প্রশংসার কথা ছাড়া আর কিছু বলতে শুনিনি। তিনি এমন কথাও বলেছেন—দিলীপবাবুর মত উপযুক্ত লোক কমই আছে, তাঁকে পেলে শ্রমিকদের জন্য আমি একটা হাসপাতাল খুলতাম।'

'তাই নাকি! এ বিষয়ে তোমার মত কি?'—জিজ্ঞাসা করিয়া দিলীপ উত্তরের প্রতীক্ষায় প্রতিমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

প্রতিমা কহিল—'জয়ন্তবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত।'

দিলীপ হাসিয়া বলিল—'জয়ন্তবাবুর সঙ্গে তুমি সব বিষয়েই একমত। তোমার নিজস্ব মতামত বলে' আজ আর কিছু নেই।'

দিলীপের কথায় প্রতিমা রাগ করিল না, হাসিল। বিদ্রূপের হাসিও নয়, শিশুর হিংসা দেখিলে যেমন হাসি পায়, প্রতিমার হাসিও তাই।

প্রতিমা কহিল—'ওটা আপনার ভুল ধারণা দিলীপবাবু। আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার মতটা জয়ন্তবাবুর কাছ থেকে ধার করা নয়। তা'ছাড়া আপনাকে একাজে নামাবার আগ্রহ জয়ন্তবাবুর চেয়ে আমারই বেশী।'

—'কেন বলত?'

—'আপনাকে পেলে আমার কাজের সুবিধে হয়। আসুন না আমাদের সঙ্গে! আপনি চিকিৎসা করবেন—আমি সেবা করব।'

দিলীপ চুপ করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর কহিল—'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, তোমার কথাই শিরোধার্য। তোমাকে খুসী করবার জন্যে সবই আমি করতে প্রস্তুত আছি।'

দিলীপ কোনদিনও সোজাসুজি প্রতিমাকে প্রেম নিবেদন করে নাই। বরাবরই সে তাহার অনুরাগ জানাইয়াছে পাকে

প্রকারে, ভাবে ও ইঙ্গিতে। প্রতিমা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াও না বুঝিবার মত ঐ বিষয়ে নীরব রহিয়াছে। সাধারণ মেয়ের মত সে দূরে সরিয়াও যায় নাই, অথবা অযথা উৎসাহ দিয়া মন লইয়া ছিনিমিনিও খেলে নাই। গন্ধমাতাল মৃগের মতই দিলীপ নিজের প্রেমে মাতাল হইয়া প্রতিমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে, আবার প্রতিমার কাছে কোন রকম উৎসাহ না পাইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আজ আর দিলীপের রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিবার ধৈর্য বা অভিরুচি কোনটাই ছিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, মনের কথাটা একেবারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দেয়। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও পারিল না,—মুখে আটকাইয়া গেল। যতটুকু বলা হইয়াছে, তাই যথেষ্ট।

প্রতিমার কাছে ইহার চেয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। তাহার জন্যই দিলীপ তাহাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে রাজী হইয়াছে এবং তাহাকে খুসী করিবার জন্য সব কিছুই করিতে প্রস্তুত—ইহার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে সে অক্ষম নয়। বুঝিয়া শুনিয়াও প্রতিমা সে দিক দিয়া গেল না। প্রতিমা বলিল—'আপনি যে আমাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে রাজী হ'য়েছেন, এতে আমি খুবই খুসী হ'য়েছি। কলকাতায় গিয়েই আমি জয়ন্তবাবুকে সুসংবাদটা দেব—তিনিও খুসী হবেন।'

দিলীপ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—'কিন্তু তাঁর জন্যে ত আমার মাথা ব্যথা নেই প্রতিমা! আমি ত বলেছি, তোমাকে খুসী করবার জন্যেই আমি তোমাদের দলে যোগ দেব।'

—'তা ত বলেছেন। ও একই কথা।'

—'না, এক কথা নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দিলীপ পুনরায় বলিল, 'কথাটা তাহ'লে স্পষ্ট করেই বলি। আমার মনের কথাটা যদিও মুখে বলিনি, তবু তোমার বোঝা উচিত ছিল; কিংবা তুমি হয়তো বুঝেও চুপ করে' রয়েছ। কিন্তু তুমি চুপ করে' থাকলেও আমি চুপ করে' থাকতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, একান্ত একলার করে' আমি তোমাকে পেতে চাই।'

দিলীপের কথা শুনিয়া প্রতিমার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

দিলীপ প্রতিমার হাতখানি ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—'বল প্রতিমা, আমার ভালবাসা কি তুমি চাও না? কেন তুমি চুপ করে' রয়েছ? তুমি কি আমাকে ভালবাস না? ভালবাসতে পার না? আমার আবেদন তবে বৃথাই যাবে?'

প্রতিমা ধীরে ধীরে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—'দিলীপবাবু এ কথাগুলো আপনার না বলাই ভাল ছিল। আপনার সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, তার চেয়ে বেশী কিছু আর হ'তে পারে না। আমার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করেও কি এটা আপনি বুঝতে পারেন নি? কেন আপনি ও কথা বললেন?'—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রতিমার চোখের জল দেখিয়া দিলীপ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইয়া দিলীপ ভগ্নকণ্ঠে বলিল—'তোমাকে দুঃখ দিয়ে তার শতগুণ দুঃখ আমি পাচ্ছি। কিন্তু আমার কথাও তুমি ভেবে দ্যাখ। তোমার কাছে আমার সমস্ত কথা খুলে বলা উচিত—তাই বলেছি। এতে যে তুমি মর্মাহত হবে, তা' ভাবিনি, তা হ'লে বলতাম না।'

প্রতিমা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বলিল—'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না দিলীপবাবু! আপনার ভালবাসা আমি গ্রহণ করতে পারলুম না বলে' আপনি দুঃখিত হবেন না, গ্রহণ করতে না পারার জন্যে আমি নিজেই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত বোধ করছি। আর এ কথাও আপনাকে বলে' দিচ্ছি—যদি কোনদিন বিয়ের কথা ভাবি, তা' হলে আপনার কথাই আগে ভাবব। কিন্তু বিয়ে করবার ইচ্ছা আমার নেই। কেন, তা' আপনিও জানেন। যে কাজে জীবন উৎসর্গ করেছি, তার চেয়ে প্রিয় এ পৃথিবীতে আমার আর কিছু নেই।'

কথাটা শেষ করিয়া প্রতিমা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, দিলীপ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল।

—'শোন প্রতিমা, আমার কথাগুলোও তুমি শুনে যাও।'

—'বলুন।'

দিলীপ বলিল—'বিয়ের জন্য যদি কাজের ক্ষতি হ'ত তা হ'লে জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই বিয়ে করতেন না।'

প্রতিমা কহিল—'জয়ন্তবাবুর কথা আলাদা। তার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তা'ছাড়া বিবাহিত পুরুষ আর নারীতে ঢের তফাৎ। আজ আমার যেটুকু স্বাধীনতা আছে, বিয়ে হলে আর সেটুকু থাকবে না। তখন স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে।'

—'বিয়ের জন্য তোমার কাজে ব্যাঘাত হবে—এই যদি তোমার মনে হয়, তা' হলে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—কাজের স্বাধীনতা তোমার অক্ষুণ্ণই থাকবে—আমি তাতে বাধা দেব না। আমি ত' আগেই বলেছি—তোমাকে খুশী করবার জন্যে আমি নিজেও তোমাদের কাজে যোগ দেব। তুমিও যেমন দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছ, আমিও তাই করব।'

—'তা হলেও আপনাকে আমি আশা ভরসা দিতে পারি না। আমার নিজের মনই এর জন্যে প্রস্তুত নয়।'

'তবুও আমি তোমার আশায় থাকব। কোন না কোন দিন তোমার মন আমার জন্যে প্রস্তুত হবে। আমি সেদিনের প্রতীক্ষা করব।'—এই বলিয়া দিলীপও উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিমা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—'দিলীপবাবু, কেন আপনি আমার জন্যে সারা জীবন এমনিভাবে কাটাবেন! এতে নিজেও অহরহ কষ্ট পাবেন, আর আমাকেও কষ্ট দেবেন। আমরা যদি বন্ধুভাবে না থাকতে পারি, তা' হলে আমাদের কোন সম্বন্ধ না রাখাই বরং শ্রেয়।'

ইহার পর আর কোন কথাই চলে না। দিলীপ চুপ করিয়া রহিল। প্রতিমা ঘরে চলিয়া গেলে সে পুনরায় সেখানে বসিয়া পড়িল।

প্রতিমার শেষ কথাটায় দিলীপের মনে ঝড় উঠিল। প্রতিমাকে সে ভালবাসিয়াছে—তাহার জন্য সে সারাজীবন প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত—আর ইহারই জন্য প্রতিমা তাহাকে

(শেষাংশ ৭২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্মা ইতিহাসের এক অধ্যায়

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশ্চাত্যের সহিত বর্মার প্রথম পরিচয় হয় ১৫১৯ সালে। এই বৎসরে পেগুর রাজা পর্তুগীজদের সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মার্তাবান ও সিরিয়ামে ফ্যাক্টরী নির্মাণ করবার আদেশ দেন। তারপর ১৬০০ সালের মধ্যে ডাচদেরও দেখতে পাওয়া যায় বেসিন নদীর মুখবর্তী নেগ্রিস নামক দ্বীপে ব্যবসামূলক উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করছে। এর কিছু দিন পর ইংরেজরাও সুযোগ পায় সিরিয়াম, প্রোম, আভা ও ভামোতে ফ্যাক্টরী নির্মাণ করতে। পাশ্চাত্যের সহিত এই পরিচয় কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হ'লো না। ১৭ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক সময়ে ডাচদের সঙ্গে পেগুর তদানীন্তন শাসনকর্তার মনোমালিন্য দেখা দিলো এবং তার ফলে তিনি একযোগেই পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। এর পর পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরিচয়ের আহ্বান এলো বর্মার তরফ থেকেই। ১৬৮৮ সালে সিরিয়ামের শাসনকর্তা মাদ্রাজের শাসনকর্তাকে জানালেন যে, ইংরেজ বণিকদের পেগু অঞ্চলে প্রবেশ করতে দিতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই। এই কথা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হতে বেশী দেরী হ'লো না এবং তারপর ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ১৬৯৮ সালে একজন ইংরেজ বাণিজ্য-প্রতিনিধিকে সিরিয়ামে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এই সময়ে ফরাসী দেশেরও একটি উপনিবেশ সিরিয়ামে ছিল।

এর পর পেগুরাজ্যের টালায়িং প্রদেশ বৈপ্লবিক কারণে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পার্শ্ববর্তী আভা রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করে বসলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অবধি এই টালায়িং রাজত্বই বর্মার আর সব রাজত্বের মধ্যে পরাক্রমে অগ্রণী ছিল। কিন্তু উত্তর বর্মার আলোম্প্রারাজ যে তাঁর সমগ্র প্রদেশকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলে টালায়িংএর ধ্বংসের জন্য গোপনে চেষ্টা করছিলেন, সে-কথা বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এই গোপনে শক্তিসঞ্চয় শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হ'লো, টালায়িংরাজ পরাজিত হলেন। ১৭৫৫ সালে আলোম্প্রারাজ তাঁর এই সামর্থ্যের একটা স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য নজির হিসেবে রেঙ্গুণ নগর স্থাপন করে বিজয়োৎসব করলেন।

ক্রমে অনুসন্ধানে প্রকাশ পেলো যে, ফরাসী বণিকরা টালায়িং রাজকে তলে তলে যুদ্ধের উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছিল বলেই তাঁর পরাক্রম অতোটা বাড়তে পেরেছিল। আলোম্প্রারাজ বিদেশীয়দের এতটা স্পর্ধার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সমস্ত ফরাসী বণিকদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। ব্রিটিশ সম্প্রদায় আলোম্প্রাকে সাহায্য করেছিল ব'লে নেগ্রিস্ দ্বীপটি তাদের দিয়ে দেওয়া হ'লো এবং বেসিন শহরে ফ্যাক্টরী নির্মাণ করারও আদেশ দেওয়া হ'লো। কিন্তু ১৭৫৯ সালে ব্রিটিশদের ওপর আলোম্প্রারাজের সুনজর আর তেমন রইল না; কারণ, তাঁর যেন মনে হ'লো, ব্রিটিশ গোপনে বিরুদ্ধবাদিদের সাহায্য করছে। ব্রিটিশরা এর ফলে সব ফ্যাক্টরী তো হারালোই, ১০ জন ব্রিটিশ বণিকেরও সেই সঙ্গে প্রাণান্ত ঘটলো। ব্রিটিশের সঙ্গে লিপ্ত ১০০ জন ভারতীয়েরও ঐ একই দশা ঘটে। এই ঘটনার পরবর্তী বৎসরই আলোম্প্রারাজ শ্যামরাজ্যের তৎকালীন রাজধানী আয়ুথিয়া অধিকার করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী নাংদাওগির নিকট হতে ব্রিটিশরা আবার বেসিনে ফ্যাক্টরী নির্মাণ করবার অধিকার ফিরে পেয়ে ক্ষতির পরিমাণ মানিয়ে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে পেলো।

নাংদাওগির উত্তরাধিকারী সিনবুয়িং প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হয়ে উঠলেন এবং অতি অল্প চেষ্টাতেই মণিপুর ও শ্যাম-রাজ্য দখল করে বসলেন। ১৭৭৬ সালে সিনবুয়িংএর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বোদাওপায়া আরাকানে রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে চট্টগ্রামস্থিত ব্রিটিশদের সঙ্গে অযথা কলহে লিপ্ত হলেন। ঘটনাচক্রেই যে এ ব্যাপার হ'লো, তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, আরাকানে যখন বোদাওপায়া যুদ্ধে লিপ্ত, তখন দেখা গেলো দস্যু প্রকৃতির কতক আরাকানবাসী পাহাড় ডিঙিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে অবাধে চালাতে লাগলো তাদের অরাজকতা সৃষ্টির নানারকম কার্যকলাপ। এই ব্যাপারে বর্মার প্রাণ ক্ষুব্ধ হলো আরও বেশি এইজন্য যে, ইংরেজ আজ অবধি যে অধিকার বর্মার কাছ থেকে পেয়ে এসেছে, তার বিনিময়ে সে অরাজকতা সৃষ্টির সাহায্য কি হিসেবে করতে পারে! মনোমালিন্যের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই ভারতের তৎকালীন গভর্নর ১৭৯৫ সালে এক প্রতিনিধিকে বর্মায় প্রেরণ করলেন, যাতে এই দুই দেশের পরস্পর পরস্পরের ওপর বিশ্বাস অটুট থাকে।

১৮১৯ সালে বোদাওপায়ার মৃত্যুর পর যখন বাগিদাও বর্মার শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন পর্যন্তও সীমান্ত প্রদেশের উক্ত প্রকার উপদ্রব একেবারে কমে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বোধ হয় শুধু এই কারণেই ১৮২৪ সালে মণিপুর ও আসাম আক্রমণ করা হয় এবং বিখ্যাত বর্মি সেনাপতি মহা-বান্দুলা একদল সৈন্য নিয়ে আভা থেকে আরাকানে এসে তারপর বাঙলা জয়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

ব্রিটিশরাজ সংকট অবস্থা মনে করে ১৮২৪ সালের ৫ই মার্চ বর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। আসাম, কাছাড়, ও মণিপুর থেকে বর্মিদের বিতাড়িত হতে হ'ল এবং ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন, মার্গুই, ট্যাভয় ও মার্তাবান অধিকার করে নিল। কিন্তু কিছুদিন পর বর্ষাসমাগমে অধিকৃত অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে নানারকম অসুখবিসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্দশার আর তাদের সীমা রইল না। এইবার মহাবান্দুলার অধিনায়কত্বে বর্মিরা মতলব ক'রল যে, আর সব রকম পথ বন্ধ করে দিয়ে একমাত্র শুধু সমুদ্র-পথেই ইংরেজদের বিতাড়িত করতে হবে। রোগগ্রস্ত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়াতে ব্রিটিশদের তখন মাত্র ১৩০০ জন ইউরোপীয় ও ২৫০০ জন ভারতীয় সৈন্য বর্তমান, আর বর্মিদের প্রস্তুত ৬০,০০০ সৈন্য একেবারে সক্ষম অবস্থায়। কিন্তু বর্মিদের এই বিপুল সংখ্যাধিক্য শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্রে টে'কলো

হতে লাগল। আজকাল সে যে লতিকাকে পড়ায় সে কথাও মাধুরী জানল না। মাধুরী জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়,—"অপিসের কাজ বেড়েই যাচ্ছে। কাজেই কিছু খেয়ে দেয়ে অপিসের কোয়ার্টারেই শুয়ে থাকি।" মাধুরীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে নরম হয়ে বলে, "টাকা-পয়সার টানাটানি......।" মাধুরী উদাসভাবে বলে, "সারারাত অপিসে জেগে কাজ করলেই সেটা কমবে কিনা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারি না বাপু...।"

"পরের চাকুরী যখন করি মাধু, তখন নিজের সুখ সুবিধের দিকে তাকালে যে চলে না।" বলেই মাধুরীকে কাছে টেনে নেয়। ম্লান শুষ্ক হাসিতে মাধুরীর ব্যথাক্লিষ্ট মুখখানা হয়ত আরো বিকৃত কঠিন হয়ে ওঠে। পরিমল হয়ত লক্ষ্য করে কি করে না। "সে সুখের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে হয়...।" বাধা দিয়ে পরিমল স্নেহের সুরে বলে, "ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই মাধু; তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছ।" মাধুরী নিঃশব্দে স্বামীর বুকে মাথা লুকায়। ভাবে যেখানে তার আশ্রয়, সেখানে অভিমান করে লাভ কি?

লতিকা ও কয়েকজন বন্ধু মিলে ২।৩ দিনের জন্য বাইরে কাছাকাছি কোথা 'প্লেজ্যাণ্ট ট্রিপ'-এ গিয়েছিল। পরিমলও এর মধ্যে লতিকার প্রধান বন্ধু হিসাবে ছিল। মাধুরী টের পায়—টের পেয়েও স্বামীর এ অন্যায় অমার্জনীয় ব্যবহারে চুপ করে গেল। সে আর অভিমানও করে না এবং পরিমলকেও কোন প্রশ্ন করে না—আগের মতই সহজভাবে সংসারের কাজ করে যায়। স্বামীর অতৃপ্ত লুব্ধ মনকে তৃপ্ত করে দিতে চেষ্টিত হল না। কাজেই দুয়ের মাঝে ব্যবধান একটা অবার্থ পরিণামের মতই রয়ে গেল।

ছোট্ট জানালাটার পাশে শীতের রোদে চেয়ার পেতে বসে পরিমল ভাবছিল, নিজেরই কথা। কিসের ধাক্কায় তাদের জীবনটা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছে—এর মূলে কোথা? মূল খুঁজতে গিয়ে—মাধুরী, লতিকা এসে দাঁড়ায়। লতিকাকে ছেড়ে পরিমল যেন মূলও হারিয়ে ফেলে। চঞ্চল হয়ে উঠে তার মন। মনের এ নিপীড়ন ত সে চায়নি।...

আমাদের প্রভাসও তার কলম তুলে ভাবে এদেরই কথা। এসব কলকাকলীপূর্ণ পরিবার গোষ্ঠীর কথা, এদেরই মনের শ্রীহীন রুক্ষ্ম নগ্ন মনের অপূরিত আকাঙ্ক্ষার ধাক্কায় জীবনটা যেখানে এসে ঠেকেছে। এমন পরিবেশ'ত কখন প্রভাসও চায়নি।......

মাধুরীরও এ নীরবতা সহ্য হচ্ছিল না। সে চায় এটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে। কিন্তু ভয় হয় সহ্য করতে পারবে কি? কঠিন নীরবতা ভাঙার হঠাৎ শব্দটা সে সইতে পারবে কি? অনেক দিন থেকেই তার ভেতরে ভেতরে ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে, শরীর ও মন দুই-ই শ্রান্ত ক্লান্ত—হয়ত ভেঙেই পড়বে।...মনটা ভাল লাগছিল না তাই ভেতরের দরজা খুলে পেছনের ফ্ল্যাটে ঝরণাকে নিয়ে পারুলের কাছে বেড়াতে গেল। পারুল সমবয়সী বলে তার একমাত্র বন্ধু। অনেক কিছুই যা এখনো মাধুরীর বিশ্বাস হচ্ছিল না কিন্তু আজ স্বচক্ষে স্বামীকে লতিকার সঙ্গে একই গাড়ি হতে হাত ধরে হাসতে হাসতে নামতে দেখে মাধুরী লজ্জা, ক্ষোভ এবং দুঃখে অবশ হয়ে গেল। শরীরের ভেতর একটা কাঁপুনি সুরু হল। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঘরে শুয়ে অজস্রভাবে কাঁদতে লাগল। অবুঝ মেয়ে ঝরণা অবাক হয়ে মার কাছ ঘেঁসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকদিন থেকেই মাধুরী বা পরিমল দুজনই একটা খোলা-খুলি বোঝাপড়া চায়, কিন্তু কেউ-ই মুখফুটে বলতে পারে না। পরিমলকে বাধা দেয় তার মনের দুর্বলতা, আর অভিমান এসে গলা চেপে ধরে মাধুরীর। কাজেই আসল কথা রয়েই যায়; এটা ওটা বাজে কথা নিয়ে দুজনায় মন কষাকষি চলে শুধু।

মাধুরী পরিমলের সঙ্গে সেদিন থেকে মন খুলে যেন আর কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না। পরিমলের মেজাজও খিটখিটে হয়ে পড়েছে। একটু কিছুতেই ঠোকাঠুকি লাগে।

সেদিনও কি এক সামান্য কারণে পরিমলের মেজাজ চটে উঠেছিল। মাধুরী সে জন্যে অপমানও সহ্য করল যথেষ্ট। দু'একটা কথার জবাব দিতেই পরিমল চেঁচিয়ে উঠল, "বেরিয়ে যাও তুমি এ বাড়ি থেকে—।"

মাধুরীরও আর সহ্য হচ্ছিল না—"দোষ আমারই সব হতে পারে কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্য হিসাবে আমিও বলতে পারি, তোমারই কোন্ অধিকার আছে এরূপ ব্যবহারের......।"

"মেয়ে মানুষের খেয়াল মেনে চলা আমার কোন প্রয়োজন নেই।" উত্তেজনায় মাধুরীকে একটু ঠেলে দিতেই খাট থেকে গড়িয়ে সে পড়ে গেল আর অমনি নাক দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। দুর্বল শরীরে মাধুরী আর সহ্য করতে পারল না।

ঝরণা গণ্ডগোল শুনে ছুটে এল। এসেই ভয়ে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মার দিকে নজর যেতেই রক্ত দেখে আর মাকে নির্জীব দেখে চীৎকার করে উঠল। মেয়ের চীৎকারে পরিমলের জ্ঞান ফিরে এল—তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। নীচ থেকে বুড়ি ঝিও চীৎকারে ততক্ষণে উপরে এসেছে। অবস্থা দেখে সেও চেঁচিয়ে উঠল—"খোকাবাবু তুমি এ কি করলে......।" পরিমল তখন মাধুরীর মাথা কোলে নিয়ে বলছে, "ফিরে এস, মাধু ফিরে......।" গণ্ডগোলে পাশের ফ্ল্যাটগুলোতে যেন সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু সব চীৎকার ছাপিয়ে অবোধ বালিকা ঝরণার গলা শুনা যাচ্ছে—"মা......মাগো।"

* * * * *

আমাদের প্রভাসেরও হঠাৎ চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিছুই নয়, এ বাড়িটায় জাগরণ সুরু হচ্ছে। কোন্ ঘরের কচি মেয়ে কি ছেলেটা হয়ত অনাদরে পড়ে পড়ে কাঁদছে "মা...মা"। ধীরে ধীরে প্রভাস রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

দেবতা ও মানবী

(৭১৮ পৃষ্ঠার পর)

ভর্ৎসনা করিয়া গেল। তাহার অপরাধটা যে কি, দিলীপ ভাবিয়া পাইল না। প্রতিমার ভর্ৎসনা দিলীপের নিকট রহস্যময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কতক্ষণ দিলীপ এভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল, সে বিষয়ে তাহার চৈতন্য ছিল না। রাণু আসিয়া তাহাকে ডাকিলে সে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। শূন্য দৃষ্টিতে সে রাণুর মুখের পানে তাকাইল।

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—'প্রতিমাদিকে আপনি কিছু বলেছেন?

দিলীপ চমকিয়া কহিল—'কেন?'

রাণু বলিল—'আপনার সঙ্গে বসে এতক্ষণ ত গল্প করছিল, আর এখান থেকে গিয়েই বিছানায় পড়ে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে, কি হয়েছে—কোন জবাব দিল না।'

প্রতিমা আবার কেন কাঁদিতেছে—দিলীপ ভাবিয়া পাইল না।

রাণু প্রশ্ন করিল—'কি বলেছেন আপনি?'

প্রশ্নটা তাহার ভাল লাগিল না। বিরক্তির সহিত দিলীপ বলিল,—'প্রতিমাকেই জিজ্ঞাসা কোরো।'

'থাক। আপনারা কেউ যখন কিছু বলতে চান না—তখন আর জিজ্ঞাসা করে কি হবে!'—বলিয়া রাণু চলিয়া গেল।

দিলীপ নিজের দুর্বলতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

ক্রমশ

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৬) গঠনমূলক স্বদেশ সেবা

১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দেন, একাধিক কারণে তাহার বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে যাঁহারা ঐ সম্মিলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বাঙলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙালীর মাতৃভাষা তখনও 'জাতে উঠে নাই'। ইহা আজিকার দিনে অদ্ভুত শুনাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে ঐরূপই ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম রাষ্ট্র সম্মিলনে বাঙলা ভাষায় সভাপতির বক্তৃতা করেন। সেই হইতেই রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙলা ভাষা তাহার নিজস্ব স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয়ত, এই সময় হইতেই জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" নামক যে বক্তৃতা করেন, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বক্তৃতার মধ্যেই তাঁহার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল আলোড়নের সঙ্গে যোগ দিলেও কবি তাঁহার স্বদেশ সেবায় ঐ নিজস্ব ভাব ও আদর্শ কখনই বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সমুদ্রমন্থনে কেবল অমৃত ও লক্ষ্মীই উঠেন নাই, হলাহলও উত্থিত হইয়াছিল। কাহারা নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সেই হলাহল পান করিয়াছিল, সে কথা এখানে অলোচনা করিব না। কিন্তু ইহার পর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে অন্তরালে সরিয়া গেলেন এবং গঠনমূলক কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। তৎপূর্বে ১৯০৭ সালেই "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"দেশের যে সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে,—সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পার, খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোন দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে—সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও, তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।"

এই সময়েই "প্রবাসীতে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁহার প্রসিদ্ধ "গোরা" উপন্যাসেও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া এই গঠনমূলক স্বদেশসেবার আদর্শই তিনি ব্যক্ত করেন।

পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি সেই কথাটাই আরও স্পষ্টভাবে বলেন,—

"দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কার্যের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলটিকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই স্বায়ত্ত সম্মেলনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজেদের পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে। সেখানে কার্য ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা বিবাদ ও মামলা মিটাইবে।"

পুনশ্চ—

"অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহাতে একত্র মিলিয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিলেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে—কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই, তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।"

দেশের যুবকদিগকে এই গঠনমূলক কার্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। ....এই কার্যে খ্যাতির আশা করিবে না; এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা, অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকুমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

দুঃখের বিষয়, দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁহার সেই নীরব কর্মসাধনার আহ্বানে তখন সাড়া দেন নাই। দিলে বাঙলা দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইত, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাকে এইরূপ গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিলে জাতি শক্তিমান হইত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আমরা অধিকতর প্রস্তুত হইতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। ফলে জোয়ারের জল যখন কমিয়া গেল, সাময়িক উত্তেজনা যখন দূর হইল, তখন আমরা নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম। প্রতিক্রিয়া

স্বরূপ যে অবসাদ ও জড়তা দেখা দিল, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনকে এখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

আয়র্লণ্ডের জাতীয় আন্দোলনের নেতাগণ এই সত্যটি ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিকে যখন প্রবল 'সিনফিন' আন্দোলন চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আর একদল লোক জর্জ রাসেল, স্যার হোরেস প্লাঙ্কেট প্রভৃতির নেতৃত্বে আয়র্লণ্ডের গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কার্য করিতেছিলেন। ফলে আইরিশদের জাতীয় শক্তি কখনও দেউলিয়া হইয়া পড়ে নাই, পরবর্তীকালে স্বধীনতার সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা গান্ধীও এই সত্য তাঁহার স্বচ্ছ দূর-দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই অসহযোগ আন্দোলন এবং তাহার পরবর্তী আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঠনমূলক কার্য করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এমন কি, ঐজন্য তিনি কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিয়াছেন। * দেশের জনসাধারণের উপর তাঁহার অসীম প্রভাবের মূল উৎস ইহারই মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে সেই সব কথাই গঠনমূলক কর্মসাধনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। বর্তমানে যে জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী গঠনমূলক কার্যের কথা বিস্মৃত হন নাই, বরং উহাকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ পাবনা সম্মিলনীতে গঠনমূলক কার্যের ধারা নির্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু নিজে কয়েক বৎসর পর্যন্ত সে দিকে তেমন মনোনিবেশ করেন নাই। কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেই তিনি ডুবিয়া গেলেন, ইউরোপে গিয়া বিশ্বসাহিত্য সমাজের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিলেন এবং "নোবেল পুরস্কার" লাভ করিলেন। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার গঠনমূলক স্বদেশ সেবার আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯১৪ সালে এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি "শ্রীনিকেতন" স্থাপন করিলেন। "শান্তি-নিকেতন" পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টি হইতে লাগিল। বোধ হয় এই কারণে ১৯১৫ সালে 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী' (Bengal Social Service League) প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সভাপতিরূপে উহাতে যোগ দিলেন এবং নিজের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা করিলেন। 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর' কার্য-প্রণালী তিনি নিজে নির্ধারিত করিয়া দেন। উহাতে ছিল—

(১) নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখানো। (২) ছোট ছোট ক্লাস ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা, সেবা-শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। (৩) ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা। (৪) শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন। (৫) গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। (৬) গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোক-দিগকে উহার উপকারিতা প্রদর্শন। (৭) দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময়ে দুঃস্থদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গঠনমূলক স্বদেশ সেবাকে রূপ দিবার জন্য আর একটি যে মহৎ প্রচেষ্টা করেন, তাহার ইতিহাস দেশবাসীর নিকট বলিতে গেলে এতদিন অজ্ঞাতই ছিল। সম্প্রতি "শনিবারের চিঠি"র উৎসাহী পরিচালকেরা উহাকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এই মহৎ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন শ্রীযুত অতুল সেন এবং তিনিই এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র "শনিবারের চিঠিতে" প্রকাশ করিয়াছেন। অতুলবাবু পূর্বে ছিলেন বিপ্লবপন্থী এবং ঐ মতাবলম্বী একদল দৃঢ়চিত্ত কর্মী যুবকদের নেতা। কিন্তু এই সময়ে নানা কারণে তাঁহারা বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া কোনরূপে গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া স্বদেশসেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও এজন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যোগাযোগ ঘটিল, উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। অতুলবাবু স্বীয় দলবলসহ রবীন্দ্রনাথের কার্যপন্থা গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্র-নাথও সানন্দে তাঁহাদের হস্তে সেই ভার তুলিয়া দিলেন। "শনিবারের চিঠি" এই স্মরণীয় ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"কালিগ্রাম পরগণা ঠাকুরবাবুদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত—রাজসাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রাণীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদিঘী, নসরৎপুর ও তালোয়া—এই কয়টি রেল স্টেশনকে ঘিরিয়া এই পরগণা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেক শত মাইল ব্যাপিয়া। অতুল সেন হইলেন প্রধান কর্ম্মী, শ্রীযুত উপেন ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার সহকারী। সঙ্গে অতুলবাবুর কর্মিসঙ্ঘ। কবিনির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত পাঁচটি—(১) যথাযোগ্য চিকিৎসা বিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস অর্থাৎ কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা ও (৫) সালিশী বিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

"প্রথম কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে—পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে, হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি 'বেডেরও' ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সৎকার্যের ব্যয়ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও অংশত প্রজারা বহন করিতেন। খাজনার টাকা পিছু এক আনা তিনি দিতেন, প্রজারা এক আনা দিত।"

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অনুসারে দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরী-করণের কাজ আরম্ভ হয়; রাত্রির ও দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু ও বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাবলিক ওয়ার্কস সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের সজাগ করিয়া কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কার্যে ব্যয় অত্যন্ত অধিক। পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত, জঙ্গল সাফ প্রত্যেকটিই ব্যয়সাধ্য কাজ। কিন্তু অতুলবাবুর সুচিন্তিত স্কীম অনুসারে প্রজাদের নিকট হইতে কায়িক পরিশ্রম স্বরূপে চাঁদা লওয়া হইতে লাগিল,

অর্থাৎ এই সকল কাজে তাহারা 'জন' খাটিতে লাগিল। এইরূপে মাত্র সাত আট মাসের মধ্যেই কালিগ্রাম পরগণায় বহু সহস্র টাকার কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল।

চতুর্থ উদ্দেশ্য, ঋণদায় হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার স্কীমটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের। পঞ্চম উদ্দেশ্য—সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা অতুলবাবুর নিকট উপস্থিত করা হইত। তিনি বিচার বুদ্ধিমত সুরাহা করিয়া দিতেন। এই কার্যে প্রজারা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

"স্বদেশী সমাজে" রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছিলেন পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, অতুলবাবু ও তাঁহার কর্মীসঙ্ঘের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ কালিগ্রাম পরগণায় সেই সবই কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাজও বেশ ভাল চলিতেছিল। অতুলবাবু ও তাঁহার কর্মিসঙ্ঘের উৎসাহের অন্ত ছিল না। সর্বপ্রকার পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের জন্যই তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অতুলবাবুকে তিনি যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট। কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে বোধ হয় ক্রূর হাস্য করিতেছিলেন। এত বড় একটা মহৎ প্রচেষ্টা সফল হইতে চলিল, গ্রামবাসীরা শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে লাগিল, সরকারী গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের বোধ হয় কিছুতেই সে দৃশ্য সহ্য হইল না। অতুলবাবু ও তাঁহার দলবল পূর্ব হইতেই বিপ্লববাদী বলিয়া সন্দেহভাজন ছিলেন। এই সন্দেহের সুযোগ লইয়া গোয়েন্দা পুলিশ একদিন তাঁহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিল এবং সরকারী আদেশে তাঁহারা অন্তরীণ বা নজরবন্দী হইলেন। কালিগ্রাম পরগণায় প্রায় এক বৎসর কাজ চলিবার পর এই বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে ইহাতে প্রবল আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। মাত্র তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য ও সংযম বলেই তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই। অতুলবাবু প্রভৃতি অন্তরীণ হইবার পর অতুলবাবুর পত্নীকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন,—

কল্যাণীয়াষু,

তোমার স্বামীর অন্তরীণ সংবাদ আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। কি কারণে এই বিপত্তি ঘটিল তাহা কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তাহার কোন ফল হইবে কিনা বলা যায় না। তোমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ, ভগবান তোমাদের সেই দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করুন। এই কামনা করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করিবার নাই।"

এইরূপে কবির সকল উদ্যম অয়োজন ব্যর্থ হইল, কিন্তু ইহাতে তিনি নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। শান্তিনিকেতন, বিশেষ করিয়া শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার পল্লীসংগঠন ও নীরব কর্ম সাধনার আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিতে গেলে, ১৯১৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন লইয়াই ছিলেন। গ্রামের স্বাস্থ্য সংস্কার, পল্লীশিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসার, লোকশিক্ষা বিস্তার, সমবায় সমিতি গঠন—এই সবই ছিল শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য। আমার স্বর্গীয় বন্ধু কালিমোহন ঘোষ "শ্রীনিকেতনের" কর্ণধার এবং এই সব কাজে রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে এই পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে কত চিন্তা করিতেন, কালিমোহনবাবু বহুবার আমার নিকট তাহা বলিয়াছেন। কবির বন্ধু এমহার্ষ্ট সাহেব এই পল্লীসংগঠন কার্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এজন্য তিনি বার্ষিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও করেন। উহার ফলে 'শ্রীনিকেতনের' কাজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দশা কিরূপ গভীরভাবে অনুভব করিতেন এবং পল্লীসংগঠনের কাজ কত বড় মনে করিতেন, কয়েকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার নিজের মুখ হইতেই সে বিষয়ে শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। একবার তিনি আমাকে বলেন,—"দেশের সব চেয়ে বড় দুর্গতি গ্রামবাসীদের এই ঘোর দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য। তাহারা কুকুর বিড়ালের মতো না খেয়ে মরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, এমন কি চৈত্রের কাঠফাটা রোদ্রে ছাতিফাটা পানীয় জলও তাদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে উঠে। যদি এই গ্রামবাসীদেরই বাঁচান না গেল, তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করা না গেল, তবে আর দেশোদ্ধারের বড় বড় কথা বলে লাভ কি?"

আর একবার কয়েকজন সাংবাদিক মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের বলেন,—"তোমরা বড় বড় রাজনীতির কথা লেখ, কিন্তু ও সবে আমার মন ভরে না। এই যে প্রতিদিন গ্রামবাসীদের দুঃখ দারিদ্র্য চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি, এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে হয়। তোমাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র সংবাদপত্র আছে, তোমরা সেই অস্ত্র এদের জন্য প্রয়োগ কর। দেশের লোককে জানাও এদের দুঃখ দুর্দশা কিরূপ অপরিমেয়, কি ভাবে সেই দুঃখ মোচন করতে হবে তার পথ দেখিয়ে দাও। তবেই তোমাদের সংবাদপত্র সেবা সার্থক হবে।"

শেষ জীবনে তাঁহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া যে গঠনমূলক কাজ করিতেছেন, তাহার সম্যক পরিচয় দেশের লোক পায় নাই। উহা যাহাতে লোকে ভাল করিয়া জানিতে পারে, সেজন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি নিজে কালিমোহনবাবুকে বলিয়া বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া 'শ্রীনিকেতনে'র কাজ আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। আর একবার 'রবিবাসরের' সাহিত্যিকমণ্ডলীর সদস্যদিগকে তিনি শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করেন। সদস্য হিসাবে আমিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ন্যায় দরিদ্র সাহিত্যিকদিগকে যেরূপ রাজোচিত অভ্যর্থনা করেন, তাহা জীবনে ভুলিব না। যে দিন 'উত্তরায়ণে' আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, সেদিনের দৃশ্য এখনও

চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। বৃহৎ হলে আমরা সকলে খাইতে বসিয়াছি। মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ আতিথেয়তার প্রতিমূর্তি স্বরূপ বসিয়াছেন। পরিবেশন করিতেছেন কবির পুত্রবধূ, দৌহিত্রী ও পালিতা পৌত্রী। একদিকে রবীন্দ্রনাথের সরস গল্প ও হাস্য পরিহাস, অন্যদিকে নানাবিধ মনোরম খাদ্য—কোন্‌টি যে বেশী উপভোগ্য হইয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

কবি সে দিনও কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"লোকে মনে করে, আমি শুধু কল্পনাবিলাসী কবি। কিন্তু বাস্তব কার্যক্ষেত্রে আমি যে জিনিষ সারাজীবন ধরে গড়ে তুললাম, তার পরিচয় কেউ নিতে চায় না। তোমরা সব সাহিত্যিক, আমার এই গঠনমূলক কার্য যদি তোমরা নিজেরা দেখ এবং দেশের লোকের কাছে উহার কথা প্রচার কর, তা'হলে আমি আনন্দিত হব।"

কবি তাঁর এই অমরকীর্তি—শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতী দেশবাসীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এগুলিকে রক্ষা করিবার মহৎ দায়িত্ব এখন দেশবাসীর উপরেই পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সার সোমেশ্বরপ্রসাদ

(৭১৬ পৃষ্ঠার পর)

আগাগোড়া ফাঁকি দিয়া আসিয়াছেন, প্রতারণা করিয়া আসিয়াছেন নিজেকে নিজের কাছে—মনকে চোখ ঠারিয়া আসিয়াছেন এতদিন। জীবনের অর্থ শুধু টাকা নয়—টাকাই শুধু জীবনের অর্থ নয়!

ঘর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। সাহেবকে অসময়ে বাহির হইতে দেখিয়া তক্‌মা আঁটা চাপরাসীর দল মহা বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু সার সোমেশ্বরপ্রসাদ তাহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া লাল সুরকি পাতা রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। পথের দু'পাশেই অর্কিড্ আর টবে নানা শ্রেণীর পাম গাছের সারি। তারপর কিছুদূরে পাশাপাশি অনেকগুলি গ্যারেজ ঘর। ফটক পার হইয়া তিনি আসিয়া পড়িলেন রাজপথে। সামনেই পার্ক। রাস্তা ও পার্ক দুটিই বহন করিতেছে তাঁহার নাম। অন্য মনস্ক হইয়া তিনি পার্কে ঢুকিয়া পড়িলেন। শীতের সকাল। পার্ক তখনও নির্জন হইয়া পড়ে নাই। নানা বয়সের অনেক ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলিতেছে। এক জায়গায় আসিয়া দেখিলেন, পরিত্যক্ত একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক, আর তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া ফ্রকপরা একটি মেয়ে টিপিয়া ধরিয়াছে তাঁহার চোখ দুটি। আরও গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে বেঞ্চি ও আশেপাশের ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছে।

সার সোমেশ্বরপ্রসাদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে তিনি চিনেন। তাঁহারই প্রতিবেশী। কর্মজীবন হইতে এখন অবসর লইয়াছেন। একদিন বুঝি ছেলের চাকরীর সুপারিশের জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট। তিনি আগাইয়া আসিলেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

'কি খুকু, তোমরা চোর চোর খেলছো বুঝি?'

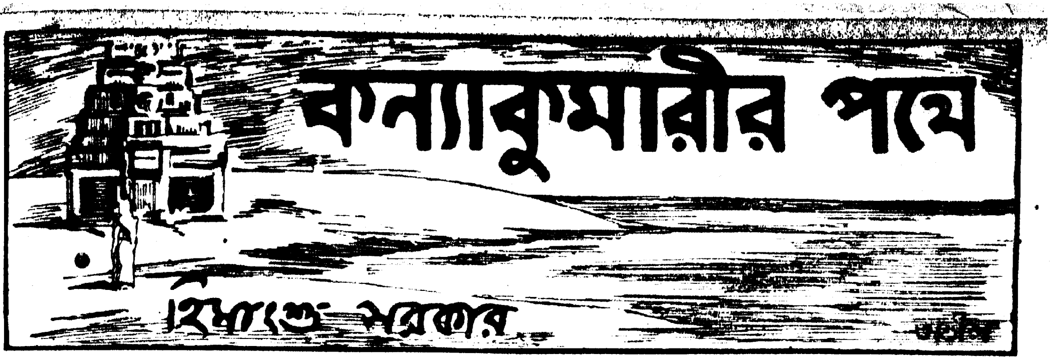
কিন্তু ছেলেমেয়েদের হাসিখুশির ভাব মুহূর্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। ভয়ে জড়সড় হইয়া তাহারা ঠাকুর দাদার হাঁটু দুটি আঁকড়াইয়া ধরিল। ভদ্রলোকটিও তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেদের ধমকাইয়া উঠিয়া কহিলেনঃ

'সাহেবের সামনে কি অমন চেঁচামেচি করতে আছে, হতভাগা পাজী কোথাকার? বাড়ি যাও—মাকে গিয়ে সব বলবো'খন, মেরে তোমার না হাড় আজ গুঁড়ো করবে।'

তিনি সার সোমেশ্বরপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। 'মাপ করবেন সার, ছেলেমানুষ সব—তাই অমন চেঁচামেচি করছিলো।'

মহা অপরাধীর মত ছেলেপিলেদের লইয়া তিনি তারপর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

মিলিয়নিয়ার সার সোমেশ্বরপ্রসাদ কিছুক্ষণ তাহাদের পিছনে চাহিয়া রহিলেন শূন্যচোখে। তারপর এক সময় ধপ করিয়া সেই বেঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িলেন। কই, পিছন হইতে কেহ আসিয়া তাঁহার চোখদুটি তো টিপিয়া ধরিল না!

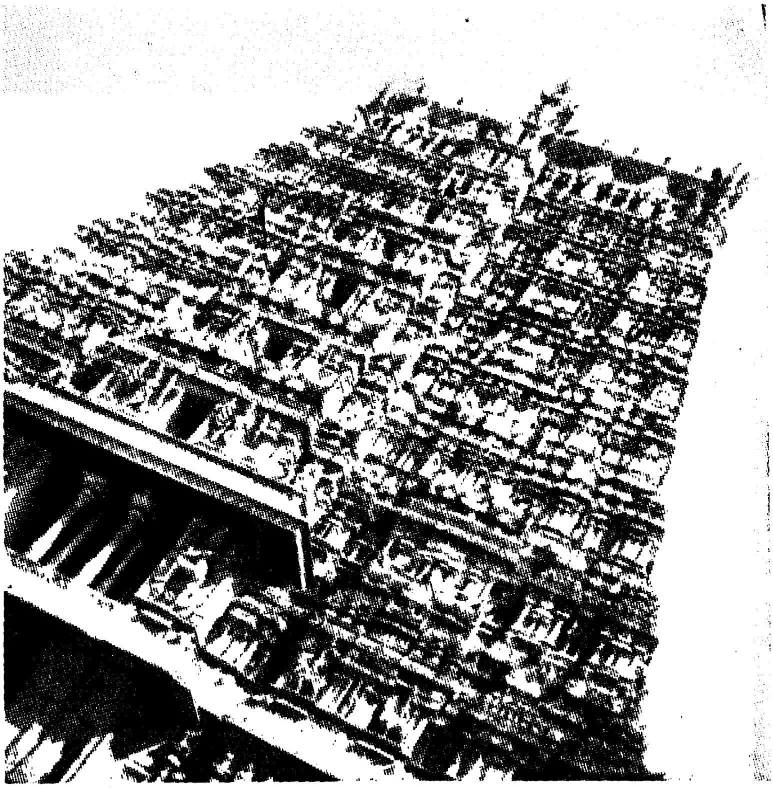


(৮)

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলো দেখবার পর এইটেই বিশেষ করে বলা যায় যে, সব মন্দিরগুলো একটা ছাঁচে ফেলে তৈরী করা হয়েছে। পরে দরকার মত এই ছাঁচের কিছু অদল-বদল করা হয়েছে।

বাঙলা দেশ এবং অন্যান্য জায়গায় সাধারণত এক সুউচ্চ, বৃহৎ মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতাকে দেখতে পাই। এদিকে কিন্তু দেবতার আসল মন্দির খুবই ছোট। এই ছোট মন্দিরকে ঘিরে আরো সব বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির; আর সমস্ত মন্দিরগুলো ঘিরে দৃঢ় পাথরের প্রাচীর। এই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চলার পথকে পরিক্রমা বলে। মন্দিরে পরিক্রমার কোন সংখ্যা নির্দেশ থাকে না। একটা থেকে সাত আটটা পরিক্রমা এক একটা মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। এই পরিক্রমাগুলোর পার্শ্বে যেমন প্রাচীর থাকে, সেই রকম ওপরে ছাদ দেওয়া থাকতে পারে। তবে সাধারণত মন্দিরের একবারে সর্বশেষ একটা কিম্বা দুটো পরিক্রমায়, অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশের সময় প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় পরিক্রমার ওপর কোন ছাদ দেওয়া থাকে না—এগুলো শুধু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলোর আর একটি নিজস্ব ধারা আছে—যেটা আর অন্য কোন স্থানের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় না—সেটা হচ্ছে "গোপুরম্"। মন্দির দেবতা ছাড়া তৈরী হতে পারে; কিন্তু 'গোপুরম্' ছাড়া এদিককার মন্দির তৈরী একবারে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। গোপুরম্ হচ্ছে মন্দিরের প্রবেশ পথের আর মন্দির থেকে বাইরে আসার পথের ওপর, অনেকটা মন্দিরের চূড়ার মত দেখতে, চূড়া। গোপুরমের উচ্চতার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে গোপুরম্গুলোকে মন্দিরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবারই চেষ্টা সব জায়গায় করা হয়।



রামেশ্বরম্ মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরের গোপুরম্

গোপুরম্গুলো ইট এবং পাথর দিয়ে তৈরী। সমস্ত গোপুরম্টার এই ইট পাথরের ওপর নানান্ দেবদেবীর মূর্তি খোদা থাকে। এগুলো নীচের দিক থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে ওপরের দিকে সরু হতে থাকে। কিন্তু একবারে মাথার দিকটা সাধারণ মন্দিরের মাথার মত ছুঁচোল না হয়ে অনেকটা চৌক ধরণের দেখতে হয়। সাধারণত মন্দিরের সর্বশেষ পরিক্রমা বা প্রবেশ পথের প্রথম পরিক্রমার ওপর দুটো গোপুরম্ থাকে। এই দুটোর

একটা হচ্ছে সামনের দিকে অর্থাৎ মন্দিরের প্রবেশ পথের ওপর, আর একটা ঠিক উল্টো দিকে, মন্দিরের পেছন দিকে যেদিক দিয়ে মন্দির দেখে বাইরে আসতে হয়, সেই পথের ওপর। এ ছাড়া অনেক মন্দিরে ছোটো আরো দুটো গোপুরম্ থাকতে পারে, পরিক্রমার যে দুপার্শ্বে কোনরকম গোপুরম্ নেই, সেই দুদিকে। অর্থাৎ, দুটো বড় এবং দুটো ছোট গোপুরম্ অনেক মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এমন দু-একটা মন্দিরও চোখে যে না পড়ে তা নয়, যেখানে শুধু প্রবেশ পথের ওপর একটাই গোপুরম্ আছে।

আমরা অনেক মন্দিরে দেখেছি যে, দেবতাকে দর্শনের পর মন্দিরটাকে অন্তত একবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এটা অনেক মন্দিরে একটা নিয়মের মত দাঁড়িয়ে গেছে। আবার যে সব মন্দিরে এই ধরণের নিয়ম নেই, সেখানে দর্শনাথীরা নিজেরাই দর্শনের পর মন্দিরটাকে প্রদক্ষিণ করে। খুব সম্ভব এতে মনে শান্তি পাওয়া যায়। সাধারণত এই ধরণের প্রদক্ষিণ দেবতা দর্শনের পরই করতে হয়। এই সব মন্দিরে সোজা প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করেই হুট্ করে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়। আর খুব বেশী হলে মন্দিরের চাতালের ওপর দিয়ে অল্প এগুলেই দেবতার দর্শন মেলে। এতে আমাদের মনে এ ধারণাটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, দেবতার দর্শন পাওয়া তো খুবই সোজা। তিনি তো আমাদের দর্শন দেবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন—আর এজন্য যাতে আমাদের কোন রকম কষ্ট স্বীকার না করতে হয়, তারও বন্দোবস্ত করেছেন। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলো দেখবার পর আমার কিন্তু মনে হ'ল এদিকে ঠিক উল্টো। এখানে দেবতার দর্শন পেতে হ'লে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এদিকে দেবতার দর্শন এত সহজে পাওয়া যায় না। 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না', সেটা এদিকের মন্দিরগুলোর ঘোরার পর, কিছু যে সত্য, সেটা বলা চলে। এদিককার মন্দিরগুলোতে দেবতাকে দর্শন করতে যাওয়ার আগেই প্রদক্ষিণ করতে করতে যেতে হয়। এই ধরণের প্রদক্ষিণ করে যাওয়াতে মানুষের মন স্বভাবতই পবিত্রতায় ভরে ওঠে। মনে এই কথাই তখন সব সময় জাগতে থাকে যে, আমি দেবদর্শনে চলেছি। প্রদক্ষিণের শেষে মন্দিরের ভেতর একটা সাধারণ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, কোন রকম আড়ম্বর নেই। অন্য সময় এই অনাড়ম্বরের মধ্যে মূর্তি দেখে মানুষের মনে ভক্তি নাও আসতে পারত, কিন্তু তখন মনে হয়—কষ্ট করে দেবতার দর্শনে এসেছি, দেবতার চরণে প্রার্থনা জানালে তা পূর্ণ হবে।

আমরা রাস্তা পার হয়ে প্রবেশদ্বারের গোপুরম্ দিয়ে প্রথম পরিক্রমায় ঢুকলাম। পাথরের প্রাচীর দেওয়া একটা চওড়া রাস্তা দিয়ে অল্প কিছুদূর গিয়ে আর একটা প্রাচীর এবং ছাদ দেওয়া রাস্তায় পড়লাম। এইটেই প্রথম পরিক্রমার আরম্ভ। ডানদিকে এবং বাঁদিকে এই রাস্তাটা চলে গেছে। প্রাচীরের গায়ে, ছাদে, স্তম্ভে নানান্ রকমের কারুকার্য করা আছে। প্রত্যেকটা পরিক্রমা সমস্ত মন্দিরটা ঘিরে রয়েছে। প্রথম পরিক্রমা ধরে প্রায় অর্ধেকটা যাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিক্রমার প্রবেশ পথ। আবার দ্বিতীয় পরিক্রমা দিয়ে খানিকটা পথ ঘোরার পর তৃতীয় পরিক্রমার প্রবেশ পথ। এই রকম করে মন্দিরে যতগুলো পরিক্রমা আছে, সেগুলো ঘুরে তবে আসল দেবতার মন্দিরে পৌঁছান যায়। এ যেন ঝুনো নারকেলের ভেতর থেকে মিষ্টি জল খাওয়ার মত। নারকেলের ছোবড়া, খোল শাঁস পেরিয়ে তবে সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। যদি একটা মন্দিরে চারটে পরিক্রমা থাকে, তবে এক একটা করে চারটে পরিক্রমা ঘুরে তবে মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। একটা গোলোকধাঁধার ব্যাপারের মত। গোলোকধাঁধার মাঝখানে দেবতার মন্দির—গোলোকধাঁধার ঈপ্সিত বস্তু। মানুষ পথ হাতড়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে এই ঈপ্সিত বস্তুর জন্য। দেবতার দর্শন হ'ল, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু নিয়ে আসা গেল না—মানুষকে আবার প্রবেশের মতই বাইরে বেরিয়ে আসার সময় ঘুরে ঘুরে বের হয়ে আসতে হ'ল।

মন্দিরের ভেতরে যাওয়া আসার জন্য পরিক্রমাগুলোয় কোনো বাঁধাধরা পথ ঠিক করা নেই—কিন্তু পরিক্রমার একটা থেকে আর একটায় প্রবেশদ্বার এ রকমভাবে অবস্থিত যে, ইচ্ছা না থাকলেও যাওয়া আসাতে প্রত্যেকটা পরিক্রমায় একটা পুরো পাক দেওয়া হয়ে যায়। এই পরিক্রমার ভেতর দিয়ে ঘুরে যাওয়া ছাড়া মন্দিরের জন্য আলাদা কোনো রকম সোজা পথ নেই। প্রত্যেককেই এই পথে যাতায়াত করতে হবে।

যেসব মন্দিরে বেশী পরিক্রমা থাকে, সেখানে প্রথম পরিক্রমা থেকে দ্বিতীয় পরিক্রমার মধ্যে প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হয়। সেই জন্য সবগুলো পরিক্রমা পার হয়ে দেবতার দর্শন করে বাইরে আসতে ৩।৪ মাইল হাঁটা কিছু আশ্চর্যের নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি। প্রায় প্রত্যেক জায়গায় পরিক্রমাগুলোর প্রবেশ পথে একটা বিরাট কাঠের দরজা চোখে পড়ে। দরজাগুলো কাঠের তৈরী হলেও, সেগুলো ঠিক লোহার দরজার মত শক্ত। দরজার পাল্লাগুলো প্রায় ৯ ইঞ্চি থেকে এক ফুটের মত পুরু। তাছাড়া সমস্ত দরজার ওপর পিতলের মোটা পেরেক ঘন করে পুঁতে এগুলো আরো শক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া দরজার সামনের দিকে সমস্ত দরজা জুড়ে লম্বায় ৫।৬ ইঞ্চি এবং ২।৩ ইঞ্চি মোটা পিতলের গজাল দরজার ওপর লাগানো রয়েছে। এটা দেখে একটু আশ্চর্য লাগে। সামান্য এই দেবতার মন্দিরে পুরাকালের দুর্গের মত দরজার ওপর এত গজাল লাগানো কেন। কিন্তু পরিক্রমার পাথরের ১৫।২০ ফিট চওড়া দেওয়াল এবং দেওয়ালগুলোর ওপর কামান রাখবার মত খাঁজকাটা জায়গা এবং এই দরজা, সব মিলিয়ে একটু চিন্তা করলেই এর হদিস্ পাওয়া যায়।

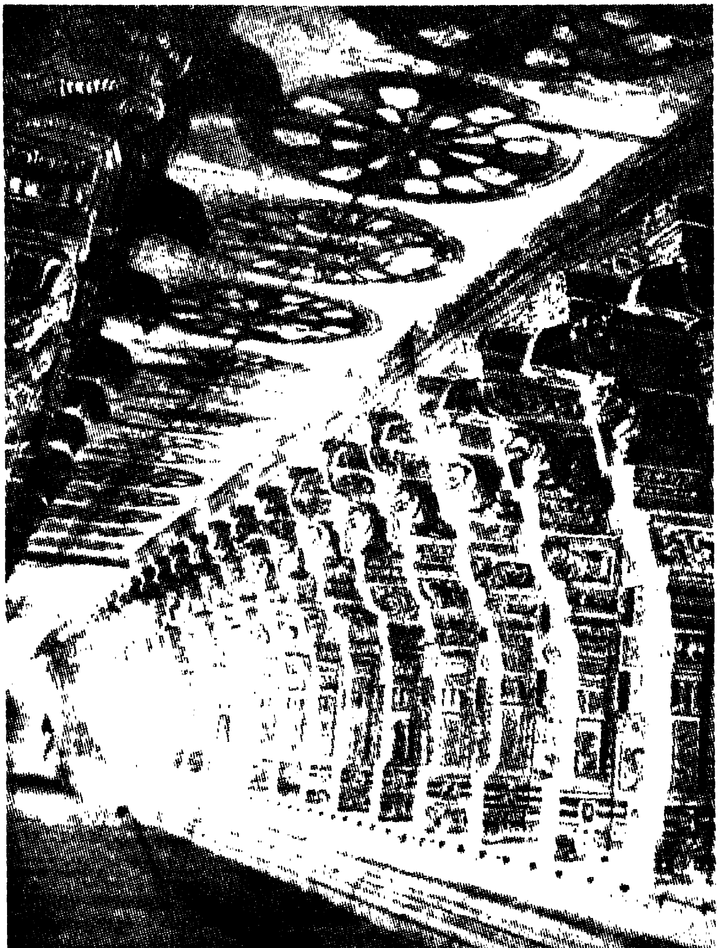
আগের কালে এই মন্দিরগুলো এই দেশীয় রাজাদের দুর্গ ছিল। মন্দিরগুলো দুর্গ ছিল না বলে দুর্গের মধ্যেই মন্দির ছিল বলা যায়। প্রবেশ পথের দ্বারগুলো ঐ রকম

ভাবে তৈরী করা হয়েছিল, যাতে দ্বার রুদ্ধ করে দেবার পর আক্রমণকারীরা হাতীর সাহায্যে দ্বার না ভাঙ্গতে পারে। দরজার ওপর গজাল থাকার দরুণ হাতী আর শক্তি প্রয়োগ করতে পারত না। দুর্গের মধ্যে মন্দিরে দেবতা থাকায় এই সুবিধা হ'ত যে, যখন শত্রুর সঙ্গে আর দুর্গের সৈন্যদের যুদ্ধ করবার শক্তি থাকত না, তখন দুর্গাধ্যক্ষ দেবতার দোহাই দিয়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করবার চেষ্টা করত। দেবতার সম্মান যেতে বসেছে, শত্রু দুর্গ জয় করে তাদের দেবতার অসম্মান করবে—এ অসহ্য। সৈন্যেরা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দুর্গ রক্ষা করবার চেষ্টা করতো। ত্রিচিনোপল্লীর 'রক ফোর্ট টেম্পল'এর নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই মন্দিরগুলো আসলে দুর্গরূপেই ব্যবহার করা হ'ত।

রামেশ্বরম্ মন্দির সম্বন্ধে কিছু লেখবার আগে আমরা 'রামায়ণ' থেকে এই রামেশ্বরমের উৎপত্তি এবং মন্দিরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি জানতে পারি, সেটাই দেখা যাক্।

শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা বিজয়ে যান, তখন এই সেতু-বন্ধ রামেশ্বরমের কোন অস্তিত্বই ছিল না। রামচন্দ্র প্রথম তাঁর সৈন্যসহ যেখানে উপস্থিত হয়ে লঙ্কা যাবার জন্য সমুদ্রের ওপর সেতু বাঁধবার আয়োজন করেন, সেটাকে 'মণ্ডপম্' বলা হয়। এখন এই জায়গায় মাণ্ডাপম্ ক্যাম্প নামে রেলওয়ে ষ্টেশন হয়েছে। 'ক্যাম্প' বলার কারণ বোধ হয় এখান থেকে সিংহল, যাত্রীদের ছাড়পত্র দেবার জন্য যাত্রীদের থাকতে হয় বলে।

রামচন্দ্র তো সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মণ শক্তিশেল লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হবার কোন আশা নেই দেখে রাজবৈদ্য বল্লেন যে, গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী লতা এনে যদি লক্ষ্মণকে শোঁকান যায়, তবে লক্ষ্মণের



রামেশ্বরম্ মন্দিরের পরিক্রমার ভিতর

আবার জ্ঞান হবে। এই কথা শুনে হনুমান বিশল্যকরণীর খোঁজে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু একে সময় কম, তার ওপর বিশল্যকরণী লতা না চিনতে পেরে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতটাকেই উপড়ে মাথায় করে লঙ্কায় এল। রাজবৈদ্য পর্বত থেকে লতা খুঁজে বার করে লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা করলেন।

কিন্তু এর পর এত বড় পর্বতটাকে নিয়ে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। পর্বতটা তো আর লঙ্কায় ফেলে রাখা যায় না। হনুমানও আবার ঘাড়ে করে পর্বতটাকে যথাস্থানে রেখে আসার কষ্ট স্বীকার করতেও অনিচ্ছুক। তখন হনুমান পর্বতটাকে আকাশে তুলে, যেখান থেকে সেটাকে তুলে এনেছিল, সেদিক লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। সেটা কিন্তু যথাস্থানে না পড়ে মণ্ডপম্ থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে সমস্ত পর্বতটা না ডুবে গিয়ে খানিকটা অংশ জল থেকে মাথা উঁচু করে রইল। এইটাই হল তখন রামেশ্বরম্ দ্বীপ।

শ্রীরামচন্দ্র তো লঙ্কা জয় করে ফিরলেন। ফেরবার পথে এই অঞ্চলের লোকরা রামচন্দ্রের কাছে নিবেদন করল যে, যদি এই লঙ্কা যাওয়ার সেতুটা তিনি না ভেঙ্গে দেন, তাহলে লঙ্কা থেকে রাক্ষসরা এই সেতুপথে এসে তাদের মেরে ফেলবে। সমুদ্রও রামচন্দ্রকে নিবেদন করল যে, তার এ বন্ধনদশা আর কেন—তাকে এই বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক্।

শ্রীরামচন্দ্র তখন এদের আবেদন শুনে এক বাণ মেরে সমস্ত সেতুটা ভেঙ্গে দিলেন। সেতুর আর কোন চিহ্ন রইল না। তখন থেকে সেই জায়গার নাম হোল ধনুষকোটি।

ধনুষকোটি থেকে আরম্ভ করে সিংহল দ্বীপে যেতে সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথর এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এখন এটাকে আদাম'স্ ব্রিজ বলা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে হত্যা করায় তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হলেন। কারণ, রাবণ রাক্ষসীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মুনি ঋষিরা বিধান দিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র যদি এই রামেশ্বরমে শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবেন। রামচন্দ্র তাতে রাজী হয়ে হনুমানকে নর্মদা নদী থেকে লিঙ্গ মূর্তি খুঁজে আনবার জন্যে পাঠালেন।

মূর্তি প্রতিষ্ঠার সব আয়োজন শেষ হ'ল। কিন্তু প্রতিষ্ঠার দিনে হনুমান আর মূর্তি নিয়ে পৌঁছয় না। উপায় না দেখে শ্রীরামচন্দ্র বালি দিয়ে এক লিঙ্গ মূর্তি তৈরী করে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। মূর্তির নাম হ'ল রামলিঙ্গ বা রামনাদ। আর সেই থেকেই দ্বীপটির নামও হ'ল রামেশ্বরম্।

শ্রীরামচন্দ্রের বালির মূর্তি প্রতিষ্ঠাকার্য শেষ হবার পর হনুমান নর্মদা থেকে খুঁজে এক পাথরের লিঙ্গ মূর্তি নিয়ে এল। হনুমান রামচন্দ্রকে এই কৈফিয়ৎ দিল যে, সেখানে মূর্তি খুঁজে না পাওয়াতেই তার পৌঁছতে দেরী হয়েছে।

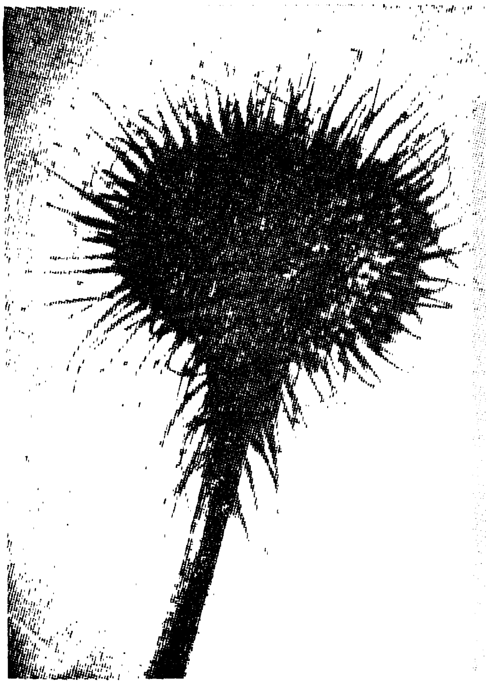
এর পর হনুমান যখন শুনল যে, মূর্তি প্রতিষ্ঠার লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে রামচন্দ্র এক বালির মূর্তি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন তো হনুমান চটেই আগুন। হনুমান বলল, তা হবে না—আগের প্রতিষ্ঠিত মূর্তি তুলে ফেলে দিয়ে তার আনীত মূর্তিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে রামচন্দ্রের কোন কথা না শুনে তার লেজ দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের বালির মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গতে গেল। কিন্তু তখন সেই বালির মূর্তিই পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। হনুমান তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মূর্তিটাকে একবারে উপড়ে ফেলা দূরে থাক্, সেটাকে তার জায়গা থেকে কোন রকমেই একটু নড়াতে বা তার অনিষ্ট করতে পারল না। হনুমানের এই লেজের জড়ান দাগ আজও নাকি এই রামলিঙ্গের ওপর দেখা যায়। আমরা অবশ্য এটা দেখিনি—দেখিনি বলেই যে এ রকম কোন দাগ নেই, সেটা বলছি না। আমরা মন্দিরে ঢুকে সেটা দেখবার সুবিধে করতে পারিনি। কেন,—সেকথা মন্দির দর্শনের সময় বলব।

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র যখন দেখলেন যে, হনুমান তার প্রতিষ্ঠিত মূর্তির কোন রকমই অনিষ্ট করতে পারল না, তখন তিনি নিজেই হনুমানের আনা লিঙ্গ মূর্তিটাকে এক শুভ দিনে তাঁর মূর্তির কাছেই প্রতিষ্ঠা করলেন। রামচন্দ্র এর নাম দিলেন হনুমান লিঙ্গ। আর তিনি হনুমানকে বললেন যে, তোমার আনীত মূর্তির পূজা আগে হবে, তারপর আমার প্রতিষ্ঠিত মূর্তির পূজা হবে। সেই থেকেই হনুমান লিঙ্গের পূজার পর রামলিঙ্গের পূজা হয়। শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর ভক্তের কাছে এমনি করেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

প্রাণীভুক্ উদ্ভিদ

শ্রীসঞ্জীব রায়

প্রয়োজনের প্রেরণাতেই মানুষের বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিম যুগের মানুষের প্রয়োজন অল্প ছিল। সেই কারণে তাদের মধ্যে বুদ্ধিরও বিস্তার ছিল না। কিন্তু আদিম মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। মানুষের মধ্যে যে প্রতিভা সুপ্ত ছিল তা প্রয়োজনের প্রেরণাতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়েছে প্রতিভার প্রাচুর্যে। জ্ঞানের ভাণ্ডারে মানুষের দানই শ্রেষ্ঠ হয়ে রয়েছে। জীবজগতে মানুষের বুদ্ধি সব থেকে বেশী, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীব যে বুদ্ধির অধিকারী একেবারে নয়, এমন নয়। বুদ্ধি তাদের আছে, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ নেই। নিম্নশ্রেণীর কোন কোন জীব অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মানুষকেও তাক লাগিয়েছে। সেই সব বুদ্ধিমান জীবজন্তুদের সহযোগিতা মানুষের একান্ত প্রয়োজন। নিম্নশ্রেণীর জীব ছাড়া উদ্ভিদ-

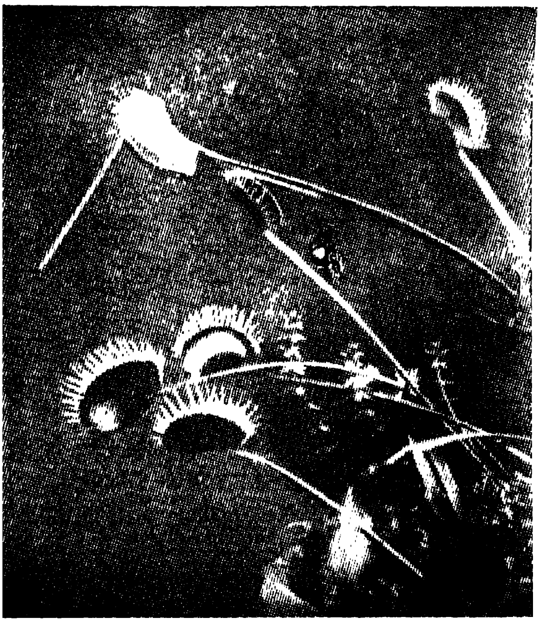


প্রাণীভুক্ Sundew উদ্ভিদ

জগতের কোন কোন উদ্ভিদের কার্যকলাপেও এমন সব ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেটাকে উদ্ভিদবিদগণ তাদের বুদ্ধির নিদর্শন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে উদ্ভিদ জীবের এই বুদ্ধির প্রভেদ অনেক। এইসব বুদ্ধিমান উদ্ভিদ প্রয়োজনের প্রেরণায় কৌশলের পরিচয় দিলেও তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত কোন বুদ্ধির নতুনভাবে বিস্তার দেখা যায়নি। তারা সৃষ্টির প্রথম থেকে প্রকৃতিগত যে কৌশলের অধিকার পেয়েছে, যুগ যুগ ধরে তারই পুনারাবৃত্তি করে চলেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ভিদ-জগতের কয়েক শ্রেণীর মাংসাশী উদ্ভিদের কথা বলব। এই মাংসাশী উদ্ভিদ অদ্ভুত কৌশলে শিকার ধরে' জীবন ধারণ করে। আমাদের সকলেরই ধারণা, উদ্ভিদ মাত্রেই নিরামিষভোজী। কিন্তু উদ্ভিদ জগতে যে কতকগুলি উদ্ভিদ মাংসাশী তার পরিচয় সকলের জানা নেই। উদ্ভিদেরা শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য তাদের পাতারও প্রয়োজন। মাংসাশী উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে নাইট্রোজেন খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না বলেই কীট পতঙ্গ সংগ্রহ করে' তার থেকে খাদ্য তৈরী করে নিতে বাধ্য হয়। কীট পতঙ্গ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাংসাশী উদ্ভিদ অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় দেয়। শিকারী জীবের মত শিকারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ান শিকারী উদ্ভিদের পক্ষে একেবারে সম্ভব নয়। এক জায়গায় মাটির উপর দাঁড়িয়ে থেকেই তাকে শিকারের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। তাদের ভাগ্যে শিকার একেবারে জুটেনি এমন দিন তাদের বহু গেছে।

Sundew নামে এক জাতীয় মাংসাশী উদ্ভিদের কথা প্রথমে বলি। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলা যায়গায় Sundew উদ্ভিদগুলির বিচিত্র সন্নিবেশ চোখে পড়ে। এই জাতীয় উদ্ভিদের লম্বা ডাঁটায় এবং সবুজ পাতার উপর অসংখ্য লোম থাকে। লোমগুলির রং লাল, মাথার উপরিভাগে একটি মোটা দানা বা গ্রন্থি আছে। এই দানাগুলি রসে পরিপূর্ণ। সূর্যের আলো এই দানগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই বিচিত্র সৌন্দর্যের জন্য এদের Sundew নাম দিয়েছে। Sundew-র এই সৌন্দর্য জীবজগতের ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের পক্ষে মারাত্মক। এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কীট পতঙ্গের দল Sundew উদ্ভিদের উপর উপস্থিত হয়। সাধারণত উদ্ভিদের লোমগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু শিকারের স্পর্শ পেয়েই তারা দারুণ উত্তেজিত হয়ে শিকারের দেহকে বেষ্টন করতে আরম্ভ করে দেয়। সেই সঙ্গে দেহের লালা প্রচুর পরিমাণে শিকারের দেহে ঢেলে দিয়ে তাকে নির্জীব অবস্থায় আনে। এই রস শিকারের দেহে পচনকার্য আরম্ভ করে দিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা একপ্রকার খাদ্যে রূপান্তরিত করে, কিন্তু খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ এরা ফেলে দেয়। এই খাদ্যই মাংসাশী উদ্ভিদের জীবন ধারণের একান্ত অবলম্বন। দেহ মধ্যস্থ এই রসকে digestive fluid অর্থাৎ হজমী রস বলা চলে। উদ্ভিদবিদগণ বলেন, এই লালা প্রোটেন জাতীয় খাদ্য হজমকারী রস। আফ্রিকার Sundew উদ্ভিদগুলির একটু গঠন বৈচিত্র্য দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে মোটামুটি তিন শ্রেণীর Sundew উদ্ভিদ জন্মায়। এদের ফুলও ধরে। আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে 'ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ' (ভেনাসের মাছি ধরা ফাঁদ) নামে এক জাতীয় কীটভোজী উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদের ডাঁটায় অদ্ভুত গঠনের এক জোড়া পাতা ফাঁদের কাজ করে। পাতাগুলি ভাঁজ করা কাগজের মত বন্ধ হয়, আবার খুলে যায়। দুই পাতার প্রত্যেক দিকের ধারে ইন্দুরের জাতি কলের মত দাঁত

আছে। পাতাগুলি সাধারণত খোলা অবস্থায় শিকারের অপেক্ষায় থাকে। পাতাগুলি সচেতন। শিকারের উপস্থিতি অনুভব করলেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন শিকার দুই পাতার মধ্যে পড়ে চিরদিনের মত সমাধি লাভ করে। বাইরে বের হবার কোন রাস্তা নেই। সুতরাং অন্যান্য প্রাণীভুক উদ্ভিদের মত লালা বের করে শিকারকে খাদ্যে রূপান্তরিত করতে এই উদ্ভিদের কোন কষ্ট হয় না। 'ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ' উদ্ভিদের পাতাগুলিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে, এদের পাতায় কোন কিছু দিয়ে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস অনুযায়ী পাতাগুলি জোড়া লেগে যায়। ছেলেমেয়েরা এইভাবে এদের প্রতারণা করে আমোদ পায়। কিন্তু Sundew উদ্ভিদকে সহজে প্রতারণা করা চলে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে Sundew উদ্ভিদ কোন অচেতন পদার্থকে আমল দেয় না। অচেতন পদার্থ এদের স্পর্শ করলে এরা লালাও বের



ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ্ (ভেনাসের মাছধরা ফাঁদ)
এই উদ্ভিদের পাতাটি একটি আলপিন ধরেছে

করে না। কিন্তু এক টুকরো মাংসখণ্ড এদের কাছে নিয়ে গেলে এরা আর চুপ করে থাকে না। লোমশ দেহটিতে তখন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে আরম্ভ করে। প্রাণীভুক উদ্ভিদের মধ্যে 'কলস' (Pitcher plant) উদ্ভিদের শিকার-কৌশল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় উদ্ভিদের পাতাগুলি কলসীর মত দেখতে। কলসীর মুখে একটি আবার ঢাকনী। কলসীর মুখের এবং গায়ের উজ্জ্বল রংয়ে আকৃষ্ট হয়ে কীটপতঙ্গ কলসীর মুখে এসে বসে। কলসীর মুখ থেকে আরম্ভ করে ভিতরে অসংখ্য কেশ আছে। কেশগুলিই লালা বের করে। কীট পতঙ্গেরা মধুর লোভে কলসীর মধ্যে প্রবেশ করলেই ঢাকনীটা বন্ধ হয়ে যায়। কলসীর ভিতরের কেশগুলি নীচের দিকে মুখ করে থাকায় শিকার উপরে উঠতে পারে না। আর উঠবার চেষ্টা করলেই কেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হয়ে শিকারকে নিস্তেজ করে দেয়। এইরূপে অসহায় পতঙ্গ "কলসী"-উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়। 'কলসী'-উদ্ভিদের বংশ ভারত-বর্ষেও দেখা যায়। আমাদের দেশের পুকুরে একপ্রকার প্রাণীভুক ঝাঁজি আছে। এই ঝাঁজি কৌশলে শিকারকে ফাঁদে ফেলে খাদ্য সংগ্রহ করে। বাঙলা দেশের Drosera Burmanni উদ্ভিদবিদ-গণের বিশেষ পরিচিত। শীতকালে ছোটনাগপুরে এবং বর্ধমান জেলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলের মাঠে এই প্রাণীভুক উদ্ভিদকে শিকারের অপেক্ষায় দেখতে পাওয়া যাবে। এই উদ্ভিদগুলির পাতা লাল। উদ্ভিদবিদগণ এদের 'পানের পিক' নাম দিয়েছেন। পানের 'পিকে'র মত পাতার রং বলেই এই নামকরণ হয়েছে। লালচে পাতাগুলি কেশে আবৃত। কেশগুলির মাথায় একটি করে গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলি রসে পূর্ণ। সূর্যের আলোতে এই কেশগুলির রস উজ্জ্বল হয়ে কীট পতঙ্গদের প্রলোভন দেখায়। এই প্রলোভনে পড়লে পতঙ্গদের আর রক্ষা নেই। বাঙলা দেশ ছাড়া গিরিডি এবং পরেশনাথ অঞ্চলে 'পানের পিক' প্রাণীভুক উদ্ভিদের জঙ্গল দেখতে পাওয়া যাবে। ড্রসেরার মতই আসাম অঞ্চলে ড্রসেরা পেলাটা নামে আর এক জাতীয় প্রাণীভুক উদ্ভিদের খবর পাওয়া যায়। এদের শিকার ধরবার কৌশল ড্রসেরা বার্মানীর মত। তবে এরা লম্বায় কিছু বড় আর পাতার আকারগুলি অর্ধবৃত্ত। এই দুই জাতীয় উদ্ভিদ শিকারকে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যে প্রস্তুত করে, উদ্ভিদবিদেরা তার নাম দিয়েছেন Pepsin Hydro-chloric Acid. পাহাড়ের জলাভূমিতে Butterwort প্রাণীভুক উদ্ভিদের জন্ম। এই জাতীয় উদ্ভিদ আবার নিরামিষ ভোজী। ছোট ছোট শাকসব্জী, কিংবা গাছের ছোট পাতা পেলেও এরা সন্তুষ্ট। আমিষ খাদ্যের অভাব পড়লে এদের আর উপোষ দিতে হয় না। উদ্ভিদবিদগণের কাছে 'Side saddle' উদ্ভিদও প্রাণীভুক উদ্ভিদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকার Trumpets উদ্ভিদ কীটপতঙ্গ শিকার করে জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদ-জগতের কোন উদ্ভিদ যে হিংস্র এবং মাংসাশী হতে পারে, এ ধারণা সাধারণের নেই। আমাদের বাঙলা দেশে যে সব প্রাণীভুক উদ্ভিদ রয়েছে, তাদের শিকার-কৌশল দেখবার সৌভাগ্য পেলে অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই জ্ঞানের খোরাক পাবেন। আনন্দের দিক থেকে ছেলেমেয়েদের কাছে প্রাণীভুক উদ্ভিদের শিকার-কৌশল কম উল্লেখযোগ্য নয়।

আজ-কাল

রাজাজী বনাম কংগ্রেস

শ্রীরাজাগোপালাচারীর ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথ কংগ্রেস নেতাদের বিক্ষুব্ধ করেছে। রাজাজী তাঁর পন্থার পক্ষে যে প্রচারকার্য করছেন, তাতে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ আপত্তি তুলেছেন। গান্ধীজী এক প্রশ্নোত্তরে রাজাজীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করা তিনি পাপ মনে করেন; অন্যে সে পাপ করলে তা হয়তো তিনি ঠেকাতে পারেন না; কিন্তু রাজাজী ভারতবর্ষ ছেদের দাবী স্বীকার করে' সেই পাপের পাপী হচ্ছেন। পণ্ডিত জওহরলাল এক বক্তৃতায় বলেন যে, বাইশ বছর অপরিমেয় আত্মোৎসর্গের ফলে কংগ্রেস এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, রাজাজী সেই অস্ত্রকে দুর্বল করছেন; কংগ্রেস যখন একটা সিদ্ধান্ত করেছে, তখন সেই অনুসারে সকলের চলা কর্তব্য। জওহরলালজী রুশিয়া ও চীনের প্রতি সহানুভূতি জানান; কিন্তু বলেন যে, চীনকে তিনি সাহায্য করতে চাইলেও সাহায্য করবার কোনো উপায় নেই। জওহরলাল জনসাধারণকে এক্সিসের জয়ে উল্লসিত হ'তেও বারণ করেন। এর একটা জবাব রাজাজী দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, বহু আত্মোৎসর্গে কংগ্রেস শক্তিশালী হয়েছে সন্দেহ নেই; সেই কারণেই সঙ্কটকালে দর্শকের মতো কংগ্রেস যে ঘটনা দেখতে থাকবে, সেটা আরো মর্মান্তিক। রুশিয়া ও চীনের প্রতি মৌখিক সহানুভূতিকে তিনি শ্লেষ করেছেন। শত্রুর জয়ে উল্লসিত হ'তে জনসাধারণকে বারণ করায় রাজাজী বলেছেন যে, এ-রকম নৈতিমূলক আবেদনে কোনো ফল নেই। তিনি গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তিতে নিজের মত-প্রচার সমর্থন করেছেন।

প্রকাশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও কেরলের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-গুলো রাজাজীর প্রচারকার্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের যোগদান সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ চায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মত নাকি এই যে, রাজাজীর প্রচারকার্য সম্পর্কিত সভা বা সম্বর্ধনায় কার্যকরী সমিতির সদস্যেরা সক্রিয়ভাবে যোগদান করলে কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হবে এবং এ-রকম সভা বা সম্বর্ধনায় তাঁদের সক্রিয় যোগদান নিষিদ্ধ করা হবে।

বহিষ্কারের উদ্যোগ

এক সংবাদে জানা গেল যে, কমিউনিস্ট এবং রাজাজীর মতাবলম্বী সদস্যদের কংগ্রেস হ'তে বহিষ্কৃত করবার জন্যে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে একটা উদ্যোগ চলছে। এই মর্মে এক প্রস্তাব আগামী ৩০শে ও ৩১শে মে যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় উপস্থিত করা হবে। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল দিল্লী থেকে ওয়ার্ধা যাত্রা করেছেন। ওয়ার্ধায় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করবেন। ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, রাজাজী এবং যে সকল বামপন্থী তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তাঁদের প্রচারকার্য প্রতিরোধের জন্যে কংগ্রেস কমিটি কি উপায় অবলম্বন করবে, সে সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে জওহরলালজী আলোচনা করবেন। এই কারণে গান্ধী-জওহর সাক্ষাতে খুব গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

হুর অত্যাচার

সিন্ধুতে হুরদের অত্যাচার এখনো চলছে। তারা ট্রেন ও বাস আক্রমণ করে', বাঁধ কেটে দিয়ে, সুযোগ পেলেই লোক খুন-জখম করে' এক বীভৎস অবস্থা সৃষ্টি করছে। গভর্নমেণ্ট হুর দমনের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন; কিন্তু এখনো তাদের আয়ত্তে আনা যায় নি। একটা হুর দমন আইন বলবৎ হয়েছে এবং পুলিশ কয়েক দিকে হানা দিয়ে কিছু হুর গ্রেপ্তার করেছে। এক জায়গায় সংঘর্ষে কয়েক-জন হুর ও পুলিশ নিহত হয়েছে। সিন্ধুর গভর্নর এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, হুর আন্দোলনের পেছনে কোনো রাজনীতিক উদ্দেশ্য নেই। হুরদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, অরাজকতা সৃষ্টি করে' তাদের নেতা পীর পাগারোকে সিন্ধুতে ফিরিয়ে আনতে গভর্নমেণ্টকে বাধ্য করা। পীর পাগারো অনেক খুন-জখমে সংলিপ্ত ছিলেন বলে' তাঁকে ইতিপূর্বে ভারতরক্ষা আইনে সিন্ধু থেকে নির্বাসিত করা হয়। গভর্নর তাঁর বিবৃতিতে আরো বলেন যে, হুর সমস্যায় অনেকগুলো বাস্তব জটিলতা আছে। কোনো কোনো লোক যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন, সেগুলো অবাস্তব। জটিলতা বলতে গভর্নর কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা ধরা গেল না। এই আন্দোলনের পেছনে কি প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আছেন, কিংবা কোনো দল কি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে এই আন্দোলনে উস্কানি দিচ্ছে? তবে গভর্নর পরবর্তী এক বিবৃতিতে সিন্ধুর জমিদারদের সাবধান করে' বলেছেন যে, তাঁরা যেন হুরদের কোনোরকম সাহায্য না দেন।

গান্ধীজীর পরামর্শ

গান্ধীজী এক প্রবন্ধে হুর-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, সিন্ধু আইনসভার সদস্যেরা এবং প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্স ও তাঁর সহকারী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে' এবং আইনসভা ছেড়ে দিয়ে হুরদের মধ্যে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করুন এবং তাঁদের ভ্রান্ত দেশবাসীকে অন্যায়ের পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করুন। এতে প্রাণহানির ভয় থাকলেও সে ঝুঁকি তাঁদের নিতে হবে। তিনি আরো প্রস্তাব করেছেন যে, পীর পাগারোর পরিচিত লোকদের এক ডেপুটেশন পীরের সঙ্গে দেখা করুন এবং তিনি যাতে তাঁর অনুচরদের খুন-জখম থেকে নিবৃত্ত হ'তে বলেন সেজন্যে তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করুন। পীরের মুক্তির সর্তে অবশ্য এটা করা হবে না; পীরের অভিযোগ থাকলে সে সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। গভর্নমেণ্টের উচিত ভিতরের খবর জনসাধারণকে জানানো।

বহরমপুরে সংঘর্ষ

গত ১৯শে মে বহরমপুর জেলে এক সাংঘাতিক সংঘর্ষ হ'য়ে গেছে। ঐ জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের কেউ কেউ খাদ্য গ্রহণে ও কাজে যোগ দিতে অসম্মত হয়। ১৯শে মে বিকেলে বন্দীরা এক সভা করে। সেই সময় জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বীল সেখানে যান।

বন্দীরা তাঁকে ইট মারে। তার পর পুলিশ ও রক্ষীরা চলে আসে। কিন্তু তারাও ইস্টক বর্ষণে হটে যায়। তখন গুলী চালানো হয়। কয়েকজন বন্দী আহত হয়। কিছু বন্দী গোলমালের সময় জেল থেকে পালায়। তাদের অধিকাংশ এখন ধরা পড়েছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বহরমপুরে গেছেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট তদন্ত আরম্ভ করবেন।

* * * * *

কুষ্ঠিয়ায় নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হ'য়ে গেছে। সভাপতি ছিলেন মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এবং মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর হাসেমালি ও মন্ত্রী মিঃ শামসুদ্দিন আহম্মদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এ বিষয়ে গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রস্তাব আকারে প্রকাশ করা হবে। সম্মেলনের এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে শত্রু-আক্রমণের বিপদ দেখা দিয়েছে বলে' দেশরক্ষার ভার অবিলম্বে ভারতীয়দের হাতে দেখা হোক।

জাপানী আক্রমণ

বর্তমানে জাপানীদের প্রধান আক্রমণ চলছে চীনের উপর। তারা দুই দিকে থেকে চীনকে আঘাত করছে—দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনান প্রদেশের উপর (ব্রহ্ম থেকে) এবং পূর্বে সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রদেশ চেকিয়াংয়ের উপর। এই দুই জায়গার মধ্যে ব্যবধান ১৩০০ মাইল। ইউনানে জাপানীরা চেষ্টা করছে বর্মা রোডের উপর অবস্থিত বড় শহর তালিকু দখল করতে। কিন্তু এদিকের ভূভাগ খুব দুর্গম বলে' চীনারা প্রতিরোধে সুবিধা পাচ্ছে। চেকিয়াংয়ে জাপ আক্রমণ প্রবল আকার ধারণ করেছে। চীনারাও দৃঢ়ভাবে বাধা দিচ্ছে; কিন্তু জাপানের সমরোপকরণ শক্তির সঙ্গে তারা এঁটে উঠছে না। জাপানীরা চেকিয়াংয়ের রাজধানী কিনওয়ার দখল করে' ফেলার উপক্রম করেছে; তবে চীনাদের এক জোর পাল্টা আক্রমণে তারা এখন শহর থেকে কিছু দূরে সরে' যেতে বাধ্য হয়েছে। বিমানের অভাবই হয়েছে বর্তমানে চীনের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক।

গত ১৮ই মে জাপানী বিমান পূর্ব-আসামের এক পল্লীঅঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে। পাছে শত্রুর সুবিধা হয়, এজন্যে স্থানটির নাম প্রকাশ করা হয়নি। ব্রিটিশ বিমান আকিয়াবের উপর বার বার আক্রমণ চালাচ্ছে।

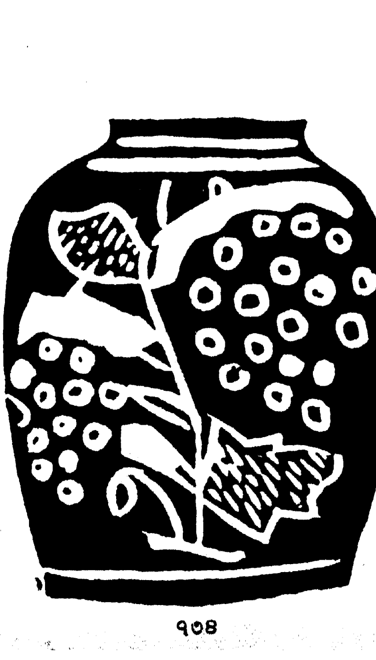
খারকভ রণাঙ্গন

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। জার্মানরা সমগ্র কার্চ উপদ্বীপ দখল করে' নিয়েছে। এখন প্রধান যুদ্ধ চলছে খারকভ রণাঙ্গনে এবং খারকভের মাইল সত্তর দক্ষিণে ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো রণাঙ্গনে। খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী ১৫ দিন আগে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং খারকভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জার্মানদের প্রাণপণ প্রতিরোধ তাদের গতি একেবারে থামাতে পারে নি, তবে অনেকটা মন্থর করেছে। খারকভের দিকে লাল ফৌজের অভিযান বিক্ষিপ্ত করে' দেবার উদ্দেশ্যে জার্মানরা ৭ দিন আগে ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো অংশে সোভিয়েট লাইনের পার্শ্ব-ভাগের অগ্রপ্রসারী কোণ্ আক্রমণ করতে থাকে। এই আক্রমণ এখন অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠেছে এবং জার্মানরা সোভিয়েট লাইনে খানিকটা ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়েছে। এই দুই রণাঙ্গনে যে যান্ত্রিক যুদ্ধ চলছে সে রকম সাংঘাতিক যুদ্ধ ইতিহাসে কখনও হয়নি। নাৎসীরা বেপরোয়াভাবে প্রচুর সৈন্য ও রণসম্ভার এখানে নিয়োজিত করছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে খারকভ যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত ফল দেখা যাবে বলে' মনে হয়।

* * * * *

মেক্সিকোর তৈলবাহী জাহাজের উপর এক্সিস সাবমেরিন ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকায় মেক্সিকোর গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণ ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হন, যার পরিণতি হয়েছে এক্সিসের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তে। প্রেসিডেন্ট কামাচো মন্ত্রিসভার পূর্ণ অনুমোদনে যুদ্ধ ঘোষণার যে, প্রস্তাব করেন, আইন-সভার স্থায়ী কমিশন তা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন।

২৬-৫-৪২ —ওয়াকিবহাল





কলিকাতা ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে ফুটবল খেলার মাঠে মহামেডান বনাম ইস্ট-বেঙ্গল দলের খেলাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পর পর ছয়টি খেলায় জয়লাভের পর ইস্টবেঙ্গল দলকে এই ম্যাচে সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইতিপূর্বে বহুবার বিভিন্ন খেলার মাঠে উপরোক্ত দুইটি দলকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং সম্ভবত ইস্টবেঙ্গল দলকেই বেশীবার পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় মহামেডান দলকেও বড় কম বার ইস্টবেঙ্গলের নিকট হার স্বীকার করিতে হয় নাই। মহামেডান দলকে এত বেশীবার পরাজিত করিয়াছে, কলিকাতায় অপর কোন দল এইরূপ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে না। সেই হিসাবে ইস্টবেঙ্গল দলের 'রেকর্ড' অতুলনীয়।

মহামেডান দলকে যে সেইদিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল পরাজিত করিতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগের শোচনীয় ব্যর্থতা। খেলা অনুপাতে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় নাই। তাহারা বেশী সময় এবং বেশীবার বিপক্ষ গোল অভিমুখে আক্রমণ চালাইতে পারিয়াছে এবং প্রকৃত গোল করিবার সুযোগও তাহাদের ভাগ্যে বেশী করিয়া মিলিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অদৃষ্টের এমন নির্ম্ম পরিহাস যে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলকেই পরাজিত হইতে হইয়াছে। প্রথমার্ধের গোড়ার দিকে ইস্টবেঙ্গল দলই বেশী আক্রমণ করিয়া খেলিতেছিল এবং যে কোন মুহূর্তেই তাহাদের গোল করিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ই একান্ত অতর্কিতভাবেই মহামেডান দল প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র গোল করিয়া বসিল। সমগ্র প্রথমার্ধে মহামেডান দল আর বিপক্ষ গোলে বল আনিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে বাতাসের আনুকূল্যে খেলিয়া এবং এক গোলে অগ্রগামী থাকায়, মহামেডান দলের খেলায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। এই সময় ইস্টবেঙ্গল দল আর তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। অনেকটা সৌভাগ্যবশতই এইভাগের মাঝামাঝি সময় ইস্টবেঙ্গল দল 'পেনাল্টি কিকের' সুযোগ হইতে গোলটি পরিশোধ করিয়া বসে। এই পেনালটি কিক্ সম্পর্কে কম বিভ্রাট হয় নাই এবং পরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

গোল পরিশোধের পর উভয় দলকেই জয়ী হইবার জন্য তুল্যভাবে প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যায়। খেলা শেষ হইতে তখনও ১০ সেকেন্ড অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ, উভয় দলের সমর্থকগণের প্রাণে জয়ের আশা একেবারে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিলেই হয়—ঠিক এইরূপ সময়েই একান্ত নাটকীয়ভাবে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়। প্রায় ৩০ গজ দূরে হইতে নূরমহম্মদের একটি উঁচু সট গোলরক্ষককে বিভ্রমে ফেলিয়া জালের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইস্টবেঙ্গল দলের অপরাজিত থাকিবার গৌরবও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এই ত হইল খেলার মাঠের মধ্যে ৫০ মিনিটের কথা, কিন্তু ইহার জের এইখানে মেটে নাই। খেলার পরও বিস্তৃত বিবরণ ইহার দিতে হয়।

রেফারীর পেনালটি কিকের নির্দেশ মহামেডান দলের একদল উগ্র সমর্থকগণের আদৌ মনঃপূত হয় নাই। রেফারীর নির্দেশ সঙ্গত হইয়াছে কি না সে আলোচনা আমরা পরে করিব, কিন্তু উক্ত সমর্থকগণের হাতে রেফারীর নিগ্রহের কথা আমরা সর্বপ্রথমে আলোচনা করিতে চাই। খেলার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠের চতুর্দিক হইতে সমবেত হইয়া, তাহারা রেফারীর অভিমুখে ধাবিত হয়। তাহাদের হাতে রেফারীর দুর্ভোগের একশেষ হয়। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া যায়, অল্প-বিস্তর তাঁহার গায়ে যে হাত লাগে নাই এমন কথা বলা যায় না। ক্ষিপ্তপ্রায় উগ্রপন্থী সমর্থকগণের হাতে রেফারীর এইরূপ নিগ্রহ ইহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। হয়ত তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল যে রেফারীর পেনালটি কিকের নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার উপর দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করা কোনমতেই বিধেয়? খেলার মাঠে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি হইবে না, এত বড় অহঙ্কার অতি বড় অহঙ্কারীও বোধ হয় করিতে পারেন না। খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের কথা ধরা যাক, বহু খ্যাতনামা ফরোয়ার্ডগণকেও বহু সহজ গোলের সুযোগ হেলায় হারাইতে দেখা যায়। রক্ষণভাগের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণকেও বহু সময় পরাজিত হইতে দেখা গিয়াছে। 'ভুলচুক' করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম এবং রেফারীও এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইবেন কি করিয়া। তবে স্বেচ্ছাকৃত কোন অপরাধ সমর্থন করা যায় না, তাহা তিনি খেলোয়াড়ই হউন বা খেলার পরিচালকই হউন। খেলার মাঠে কোন খেলোয়াড়কে বা কোন রেফারীকে স্বেচ্ছাকৃত কোন ভুল করিতে দেখা যায় না।

এই দিনকার খেলার পরিচালনা সম্পর্কে কোন কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে রেফারীর পরিচালনা কার্য ত্রুটি বা নিন্দার অতীত ছিল না। প্রথমত পেনালটি কিক্ নির্দেশ সম্পর্কে তীব্র মতভেদ দেখা যায়। রেফারীর অভিমত যে বাচ্চি খাঁ নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে বলে হাত লাগাইয়াছেন, মহামেডান দলের খেলোয়াড়রা এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানায়, তাহারা প্রথমত বলে বাচ্চি খাঁর এইরূপ বিচ্যুতি হয় নাই এবং যদিও বা অসাবধানে লাগিয়া থাকে, তাহাও পেনালটি সীমানার মধ্যে নহে। রেফারীর সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তবে এইরূপ চরম দণ্ডের বিধান দিতে পারিতেন। কারণ সুপরিচালনার উপর খেলার অনেকখানি নির্ভর করে। তাহা ছাড়া স্থানীয়

ফুটবল কর্তৃপক্ষের আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। খেলার পরিচালনা কার্য যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদের দৈহিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিবেন? ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, তাহার জন্য বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষগণকে তাঁহারা যথাযথ নির্দেশ দিতে পারেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষগণেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকা আদৌ কর্তব্য নহে, তাহাদেরও এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

মোহনবাগান দলের অপ্রত্যাশিত পরাজয়

গত সপ্তাহে মোহনবাগান দলের রেল দলের নিকট অপ্রত্যাশিত পরাজয়েও বড় কম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নাই। রেল দল মোহনবাগান দলকে পুরাপুরি তিন গোলের ব্যবধানে এবং অনেকটা শোচনীয়ভাবেই পরাজিত করিয়াছে। রেল দল ইতিপূর্বে এইরূপ গোলের ব্যবধানে জয়ী হইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

অনেকেই হয়ত এইরূপ আশা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন যে অন্যবারের তুলনায় মোহনবাগান দলে এইবার ভাল ভাল এবং বেশী খেলোয়াড় আছে এবং ঠিক মত দল গঠন করিতে পারিলে, তাহারাও যে তাহাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারিবেন না, তাহার কারণ কি? কিন্তু খেলোয়াড় সংগ্রহ করা এবং প্রকৃত খেলার মাঠে ঠিকমত নৈপুণ্য প্রকাশ করা এক কথা নহে। এমন প্রায় দেখা যায় যে অন্য দলে যাহাদের বেশ ভাল খেলোয়াড় বলিয়া খ্যাতি আছে, মোহনবাগান দলে আসিয়া প্রথম প্রথম তাহারা মোটেই সুবিধা করিতে পারেন না। এইরূপ হইবার কারণ কি—খেলোয়াড়দের নিজের উপর আস্থার একান্ত অভাব। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে নিজেদেরই যদি কোনরূপ আত্ম-বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে কোনরূপেই নৈপুণ্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া মোহনবাগান দলের নির্বাচক-মণ্ডলীকেও খেলোয়াড় মনোনয়নে বড় কম দোষ দেওয়া যায় না। প্রত্যহ খেলোয়াড় পরিবর্তন করা এবং ইহাই যেন তাহাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন খেলোয়াড় কবে কোন দিন কিরূপ খেলিল, তাহাই নিরূপণ করা যেন তাহাদের একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পরদিন অবশ্যই তাহাকে দল হইতে বাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে দল পরিবর্তনের ফলে, কোন খেলোয়াড়ই নিজেদের স্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্তমনে খেলিতে পারে না এবং প্রতিদিনই খেলোয়াড় অদল-বদল হওয়ায়, একে অপর খেলোয়াড়ের খেলার সহিত পরিচিত হইতে পারেন না, তাহাতে পরস্পরের খেলার মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব কোন-কালেই দূর হয় না। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রথম কর্তব্য কোন খেলোয়াড় কোন স্থানে খেলিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহা নিরূপণ করা এবং তাহার পর অন্তত তিনচারিদিন একই স্থানে খেলিতে সুযোগ দেওয়া এবং তাহার পরও তিনি যদি নিজের নৈপুন্য প্রকাশ করিতে না পারেন, তখন তাহাকে আবার দুই চারিদিন বিশ্রাম দিয়া পুনরায় আবার খেলিবার সুযোগ দেওয়া। অন্যথায় দল গঠন করা যায় না।

এরিয়ান্স দলের প্রথম পরাজয়

অন্যবারের চেয়ে এরিয়ান্স দল এইবার লীগে প্রথম প্রথম বেশ ভাল ফল প্রদর্শন করিতেছিল। কাহারও কাহারও মনে হয়ত বা ক্ষীণ আশা জাগিতেছে যে তাহাদের পক্ষেও লীগ বিজয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু ক্রমশই আবার এরিয়ান্স দলের খেলায় অবনতি দেখা যাইতেছে: পর পর চারিটি খেলায় জয়লাভের পর পুলিশ ও ভবানীপুর দলের সহিত তাহাদের খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ করিতে হইয়াছে এবং পরবর্তী খেলায় মোহনবাগান দলের নিকট তাহাদের হার স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখানে বলা যায় যে এরিয়ান্স দলের এই বৎসরে ইহাই প্রথম পরাজয়। ১৯৪০ সালের স্মরণীয় শীল্ড ফাইন্যাল খেলার পর, এরিয়ান্স ও মোহনবাগান দলের খেলায় বিশেষ আকর্ষণ এবং পূর্বাপেক্ষা তীব্র উত্তেজনা অনুভূত হয়। এখানেও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শীল্ড ফাইন্যালে মোহনবাগান দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর আর কোন খেলায় মোহনবাগান দলকে এরিয়ান্স দলের নিকট পরাজিত হইতে হয় নাই।

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

(প্রথম ডিভিসন—২৫শে মে পর্যন্ত)

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	৮	৭	০	১	২১	৪	১৪
মহঃ স্পোর্টিং	৬	৪	২	০	২০	৩	১০
এরিয়ান্স	৭	৪	২	১	১১	৫	১০
ভবানীপুর	৫	২	৩	০	৫	১	৭
পুলিশ	৭	৩	১	৩	১০	৭	৭
বি এণ্ড এ আর	৭	৩	১	৩	১৪	১২	৭
কালীঘাট	৭	৩	১	৩	১১	১০	৭
ক্যালকাটা	৭	৩	১	৩	৪	১৬	৭
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	৮	১	৩	৪	৭	১৩	৫
রেঞ্জার্স	৭	১	১	৫	৭	১০	৩
ড্যালহৌসী	৮	১	১	৬	৮	১৬	৩
কাষ্টমস	৭	০	০	৭	১	৩৪	০

জো লুইর পুনরায় লড়িবার সম্ভাবনা

পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই আমেরিকান সৈন্য বিভাগে যোগদান করায় সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি মুষ্টিযুদ্ধ জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় লড়িতে দেখা যাইবে না। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে, মুষ্টিযুদ্ধ প্রযোজক মিঃ মাইক জেকবস্ পুনরায় জো লুইকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এইবার যিনি জো লুইর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন তাঁহার নাম বব পেস্টার। ইহার ওজন ১৩ ষ্টোন ১½ পাউণ্ড। জো লুই অপেক্ষা কম। তবে লড়িবার কৌশল নাকি খুবই উচ্চাঙ্গের। জো লুইকে বিজয়ী হইতে বেশ বেগ পাইতে হইবে। তবে অনেকের মতে জো লুই দুই রাউণ্ডে বিজয়ী হইবেন। তাহার কারণ সম্প্রতি ম্যাডিসন স্কোয়ারে বব পেস্টারের সহিত টনি মোরেলিও নামক এক মুষ্টিযোদ্ধার লড়াই হয়। উহাতে পেস্টার ১০ রাউণ্ড লড়িয়াও বিজয়ী হইতে পারেন নাই। তবে জো লুই ঐ মুষ্টি যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, পেস্টার বিজয়ী হইয়াছেন। পেস্টারকে পয়েণ্টে বিজয়ী ঘোষণা করা উচিত ছিল। জো লুই পেস্টারের সহিত লড়িতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মিঃ মাইক জেকবস্ এই মুষ্টি যুদ্ধের সকল ব্যবস্থা করিতেছেন। এই পর্যন্ত জো লুইকে ২১ বার নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লড়িতে হইয়াছে। সুতরাং এইবার লইয়া ২২ বার তিনি লড়িবেন। জো লুই বিজয়ী হইবেন এই বিষয় অন্যের সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের নাই।

সমর বার্তা

২০শে মে

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১৮ই মে পূর্বে আসামের এক শান্তিপূর্ণ পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি বোমা পড়িয়াছিল। হতাহতের সংখ্যা খুব কম।

ব্রহ্ম-চীন গত ১৯শে মে বৃটিশ বিমান বহর আকিয়াব বিমান ঘাঁটির উপর দুইবার আক্রমণ চালাইয়াছিল। বৃটিশ বিমান বহর মিচিনার বিমান ঘাঁটিতেও বোমা বর্ষণ করে। চুংকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ, পীত নদীর উত্তর তীর ধরিয়া ২০ হাজার জাপ সৈন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৃহদাকার জাপ বাহিনী রেলপথ ধরিয়া চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিনওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

রুশিয়া—জার্মান হাইকমাণ্ডের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে, ক্রিমিয়ায় জার্মান ও রুমানিয়ান সৈন্যদল কার্চের সমস্ত উপকূল ভূভাগে গিয়া পেঁৗছিয়াছে। মস্কো রেডিওতে বলা হয় যে, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

২১শে মে

ব্রহ্ম-চীন—ব্রহ্মে বৃটিশ বিমানবহর কালেওয়ার নিকটে চিন্দুইন নদীস্থ লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। চুংকিংয়ের খবরে প্রকাশ, জাপানীরা চুংকিং পেঁৗছিবার পর পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। চীনা সৈন্যেরা ইউনান প্রদেশের প্রাচীন শহর টেংচুং-এ আক্রমণ চালাইতেছে। এই শহরটি চীন ও ব্রহ্ম সীমান্তে অবস্থিত।

রুশিয়া—মস্কো বেতারে বলা হয় যে, গতকল্য খারকভ রণাঙ্গনে এক তুমুল ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট ট্যাঙ্কগুলি ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাকে এবং তাহার ফলে জার্মান ট্যাঙ্কসমূহ রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। খারকভ রণক্ষেত্রে রুশ সৈন্যগণ প্রবল প্রতিরোধের মুখে লড়াই করিয়া জার্মানদিগকে ক্রমাগত পিছনে হটাইয়া দিতেছে।

২২শে মে

ব্রহ্ম-চীন—চুংকিং-এর সামরিক সংবাদপত্র "তাকুং পাউএ" এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, উত্তর ব্রহ্মের চীনা সৈন্যবাহিনী এখন ব্রহ্ম ভারত ও ইউনান সীমান্তের সংযোগস্থলের সন্নিকটে জেনারেল হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিতেছে। এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য প্রাতে হঠাৎ সৈন্য বোঝাই বহু সংখ্যক জাপ যুদ্ধ জাহাজ মীন নদীর মোহনায় আসিয়া উপস্থিত হয়। গোলার বেড়াজালের অন্তরালে জাপ সৈন্যেরা ফুচাও-এর নিম্নে একটি নদীর উত্তর তীরে অবতরণ করে। সেখানে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। চুংকিং-এ বোমা বর্ষণের অনুকূল আবহাওয়া আরম্ভ হওয়ায় শহর হইতে লোকাপসরণ আরম্ভ হইয়াছে।

রুশিয়া—মার্শাল টিমোসেঙ্কো খারকভ অঞ্চলে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। খাস খারকভ শহরের ঠিক পুরোভাগে এক্ষণে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। কারেলিয়া অঞ্চলে সোভিয়েট অগ্রগতি রোধের জন্য যে জার্মান সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল, সোভিয়েট সৈন্যগণ তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়া বিনষ্ট করিয়াছে।

২৩শে মে

ব্রহ্ম-চীন—বৃটিশ বিমান বহর আকিয়াবের বিমান ঘাঁটির উপর পুনরায় বোমাবর্ষণ করে। চুংকিং-এর খবরে জানা যায় যে, জাপানীরা চীনের দুইটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের উপর হানা দিতেছে। দুইটি রণাঙ্গন পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ব্রহ্ম রোড ধরিয়াই প্রধান আক্রমণ পরিচালিত হইতেছে। চীন ও শ্যাম সীমান্তের নিকটবর্তী কেংগু কেংটাং হইতে একটি আক্রমণ চালাইয়া প্রধান আক্রমণের পোষকতা করা হইতেছে। যে কোন দিক হইতে চুংকিং পেঁৗছানই জাপানীদের মতলব বলিয়া মনে হয়। অপর একটি রণাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছে চেকিয়াং প্রদেশের উত্তর প্রান্তে। দক্ষিণে ফুচাওয়ে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। চিয়েনটাংয়ের উত্তর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া জাপ বাহিনী তুংলু দখল করিয়াছে।

২৪শে মে

ব্রহ্ম-চীন—চুংকিংয়ের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, চীনারা বার্মা রোডের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত টেংচুং (ইউনান প্রদেশের অন্তর্গত) নামক একটি শহরের পূর্বদিকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং জাপানীদের অনেক সৈন্য হতাহত করে। পূর্বে চেকিয়াং প্রদেশে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ফুকিয়েনে জাপানীরা নৌবহর হইতে গোলাবর্ষণ এবং বিমান বহর হইতে বোমা বর্ষণ করিতে করিতে মীন নদীর মোহনায় চুয়ার্নাস দ্বীপটি দখল করে।

রুশিয়া—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্য বাহিনী কার্চ উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া আসিয়াছে। গতকল্য খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট ও জার্মান সৈন্যবাহিনী জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। রণাঙ্গনের কয়েকটি অঞ্চলে শক্তিশালী রুশ সৈন্য বাহিনী জার্মানীর আরও কতকগুলি আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটি কামান দাগিয়া উড়াইয়া দেয়। উভয়পক্ষ রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান আমদানী করিতেছে। গত দশ দিনের যুদ্ধে জার্মানীর অপরিমেয় সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

২৫শে মে—

রুশিয়া—হিটলারের হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, খরকভের দক্ষিণ অঞ্চলে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা 'পরিবেষ্টনের যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। তিনটি সোভিয়েট সৈন্যদলের অধিকাংশ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছে। পরিবেষ্টিত সৈন্যদের মধ্যে ট্যাঙ্ক বাহিনীও আছে। জার্মান ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সৈন্যদল কর্তৃক ৩০টি গ্রাম অধিকৃত হইয়াছে।

চীন—জাপ বাহিনী চারিদিক হইতে চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিনহোয়ার উপর হানা দিয়াছে। কিনহোয়া নগরীর তিন মাইল দূরে যুদ্ধ চলিতেছে।

২৬শে মে—

চীন—চুংকিংয়ের সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছে। চেকিয়াং প্রদেশের কিনহোয়ার উপকণ্ঠে যখন যুদ্ধ চলিতেছে তখন জাপানীরা ফুকিয়েন প্রদেশের বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে ফরমোসা দ্বীপে সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ, রণতরী ও বিমানবাহী জাহাজ সমবেত করিতেছে। চেকিয়াং-এ জাপ সেনা ব্যূহের পশ্চাতে ব্যাপকভাবে গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

রুশিয়া—সমর-সমালোচক এনালিস্ট লিখিতেছেন যে, খারকভ রণাঙ্গনের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। বারভেঙ্কোভো এবং ইজিয়ুমের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড সংগ্রাম হইতেছে। এখানে জার্মানরা পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া রুশ ব্যূহে কীলকাকারে প্রবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২০শে মে

বহরমপুরে স্পেশ্যাল জেলে এক গুরুতর হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ফলে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জেলার, ডেপুটি জেলার, ও কয়েকজন বন্দী আহত হইয়াছেন। এই হাঙ্গামা নিবারণকল্পে গুলী চালান হইয়াছে। কয়েকজন বন্দী পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, নিরাপত্তারক্ষার্থ আটক বন্দিগণ খাদ্য গ্রহণ করিতে ও তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্য করিতে অস্বীকার করাতেই এই গণ্ডগোলের উদ্ভব হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় গতকল্য কলিকাতায় এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমিতির উদ্যোগে ২৭শে ও ২৮শে মে একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়।

অদ্য প্রাতে কলিকাতা ট্রামওয়ের শ্রমিকেরা পুনরায় ধর্মঘট আরম্ভ করে এবং ফলে সকল সেকসনে ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকে।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, হুর দস্যুগণ একখানি যাত্রীবাহী বাস থামাইয়া ১৩জন লোককে হত্যা করিয়াছে। খিপড়ো থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর মোহম্মদ মুসাশাহ নিহতদের মধ্যে অন্যতম।

২১শে মে

কলিকাতার নাগরিক সাধারণকে জনরক্ষা প্রচেষ্টায় অধিকতর আগ্রহশীল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে অসামরিক জনরক্ষা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটি সভার অনুষ্ঠান হয়। উভয় সভায় বিভিন্ন বক্তা এই মত প্রকাশ করেন যে, বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য নাগরিকদের নিজেদেরই। সুতরাং এ আর পি ব্যবস্থা গভর্নমেন্টের হইলেও নাগরিক জনসাধারণের আত্মরক্ষার জন্য উহার সহিত সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করা কর্তব্য।

গত ৩১শে মার্চ তারিখে "স্টেটসম্যান" পত্রিকায় "ওয়ার এন্ড পীস" (যুদ্ধ ও শান্তি) শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ সম্পর্কে "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত হেমচন্দ্র নাগ "স্টেটসম্যানের" সম্পাদক মিঃ উইলিয়াম আর্থার মুর ও মুদ্রাকর শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাত্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে মানহানির অভিযোগে যে ফৌজদারী মামলা দায়ের করিয়াছেন, অদ্য তাহার শুনানী হইলে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা (মানহানি) অনুসারে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

লাহোরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, শ্রীযুত সি রাজাগোপালাচারী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর।

২২শে মে

'এসোসিয়েটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রেরণা উদ্রিক্ত করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। প্রকাশ, ভারত গভর্নমেন্ট প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলির নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জমিদার অথবা গ্রামের হেডম্যান বা মাতব্বরদের অধীনে গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন করা হউক। যেখানে সম্ভব, সেখানে ভারত গভর্নমেন্ট ঐ সকল গ্রামরক্ষী বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যকে আগ্নেয়াস্ত্র দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিবেন।

আমেরিকান টেকনিক্যাল মিশনের সদস্যগণ করাচী হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন।

মুন্সীগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম ও আসাম ত্যাগ করিয়া বহু লোকের আগমনের ফলে কাজির পাগলা ও অপর কয়েকটি গ্রামে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রকাশ যে, কয়েকজন রোগী মারা গিয়াছে।

২৩শে মে

বাঙলার অর্থ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিমানযোগে নয়াদিল্লী গিয়াছেন। প্রকাশ, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত লবণ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ হইতে বাঙলায় লবণ আমদানী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সহিত পরামর্শ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক ও কর্মিগণের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। গভর্নমেন্ট শ্রমিকগণ ও ট্রাম কোম্পানীর মধ্যে বিরোধের সালিশ করিয়া দিবেন, এই প্রস্তাবে উভয় পক্ষই সম্মত হইয়াছেন।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, খিপরোর নিকটে এক পুলিশ বাহিনীর সহিত হুর দস্যুদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষই গুলী বর্ষণ করে। এই সংঘর্ষের ফলে ৪জন হুর ও তিনজন পুলিশ নিহত হইয়াছে।

২৪শে মে

কুষ্টিয়ায় মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর (এম এল এ) সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

নেত্রকোণার এলাকাধীন কৈরাটিয়া গ্রামে এ এম কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাসভবনে এক সশস্ত্র ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতদের গুলীতে ডাঃ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন।

হবিগঞ্জের মাধবপুর থানার এলাকাধীন দুর্গানগর গ্রামের বিত্তশালী অধিবাসী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দত্ত চৌধুরীর বাড়িতে এক সশস্ত্র ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

২৫শে মে—

"ভারত ব্যবচ্ছেদকে আমি পাপ কার্য বলিয়া মনে করি।" মহাত্মা গান্ধী এক প্রশ্নের উত্তরে অদ্যকার "হরিজন" পত্রিকায় উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হকের নিকট এক খোলা চিঠিতে প্রতিমা নিরঞ্জন ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিযোগাদি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ও বাঙলা সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

২৬শে মে—

এলাহাবাদে আনন্দ-ভবনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার ঢাকা শহরের অধিবাসিগণের নিকট হইতে পিটুনী ট্যাক্স আদায়ের আদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীযুত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত গতকল্য কলিকাতায় বাগবাজারস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মেসার্স জন ডিকিনসন এন্ড কোম্পানীর হেড এসিস্ট্যান্ট (বড়বাবু) ছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্ত "আনন্দবাজার পত্রিকা"র হিতৈষী বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান হেলথ অফিসার ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ ঘোষ মধুপুরে পরলোকগমন করিয়াছেন।

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 6th June, 1942 [৩০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের প্রতি দরদ—

"ভারতবাসীরা নিশ্চিন্ত থাকুন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতদিন পর্যন্ত বিজিত না হইবে, আমরা ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই গভর্নমেণ্টকে স্বস্তিতে থাকিতে দিব না"—ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের দুইজন সদস্য মিঃ কোভ এবং শেলোয়ান সেদিন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধির নিকট এই কথা বলিয়াছেন। কথার কমতি কিছুই নাই। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সদস্যদের মুখে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দানের সম্বন্ধে আমরা ঐ ধরণের বড় বড় কথা ইতঃপূর্বেও একাধিকবার শুনিয়াছি। কিন্তু ইঁহাদের সেই সব কথা অনুযায়ী কাজ হইয়াছে কতখানি, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। মিঃ কোভ এবং মিঃ শেলোয়ান তো ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা না দিলে গভর্নমেণ্টকে স্বস্তি দিবেন না; কিন্তু সেদিন তাঁহাদের দলের সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কি দেখিতে পাই? সে প্রস্তাবে ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতি যথেষ্টই দেখান হইয়াছে, ইহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু সুকৌশলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান নীতিরই সমর্থন করা হইয়াছে। মিঃ গর্ডন ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ শ্রমিক দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য। ক্রীপস্ সাহেবের দৌত্যের সম্বন্ধে তিনি সেদিন একটা উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের বাহিরে অনেকের মনেই ক্রমে এই ধারণা বৃদ্ধি পাইতেছে যে, ক্রীপস্ সাহেবের দৌত্যের মূলে ভারতবাসীদের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার মতলব ততটা ছিল না, আমেরিকার জনমতকে প্রশমিত করাই ছিল উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু বিলাতের শ্রমিক দলের সম্মেলনে পরিগৃহীত প্রস্তাবে আমরা ইহার বিপরীত মনোভাবের পরিচয় পাই। সম্মেলনের সভাপতি গ্রীন সাহেব ভারতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে চড়াইয়া বলেন, ইঁহারা নির্বোধ, ইঁহারা ছায়ার লোভে কায়া অর্থাৎ সারবস্তু হারাইয়াছেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ক্রীপস্ সাহেবের দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু এজন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে দায়ী করিবার সাহস সম্মেলনের হয় নাই; কিংবা সম্মেলন তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। ভারতীয় সমস্যার যাহাতে সন্তোষজনকভাবে সমাধান হয়, সম্মেলন সেজন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং ভারতবাসীদিগকে আরও চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া একটি মামুলী ধরণের সদিচ্ছাপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন; ইঁহারা এক্ষেত্রে কথার চালে সত্যকে চাপা দিয়াছেন এবং সে সত্য হইল এই যে, ভারতবাসীদের স্বাধীনতা স্বীকৃতিই আপোষ নিষ্পত্তির মূল সূত্র। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের সে অধিকার স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়াতেই আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; এখন যদি পুনরায় চেষ্টা করিতে হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকেই সেজন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতাই যদি ব্রিটিশ শ্রমিক দলের প্রকৃত কথা হইত, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই ত্রুটির দিকটাই তাঁহাদের প্রধানভাবে নজরে পড়িত এবং ক্রীপস্ দৌত্য ব্যর্থ হইবার দায়িত্ব তাঁহারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপরই চাপাইতেন। ভারতবাসীদিগকে অনর্থক ক্রীপস সাহেবের দৌত্যের ব্যর্থতার দায়িত্বে জড়াইয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সেই ত্রুটিকে লাঘব করিবার প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা শ্রমিক সম্মেলনে পরিগৃহীত প্রস্তাবে পাইতাম না। এইরূপ দ্বৈধ মনোভাব লইয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত জাতির সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হয় না, ব্রিটিশ শ্রমিক দল এই সত্য অবধারণ করিলেই ভাল হয়। এক পথ ধরা ভাল।

দুই সমুদ্রের মাঝখানে—

ইউরোপের দেশগুলি এক একটি করিয়া জার্মানদের দখলে যাইবার পর উদ্ভব হইয়াছিল আটলাণ্টিক চার্টারের; এখন প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দেশ জাপানীদের অধিকারভুক্ত হইবার পর প্যাসিফিক চার্টারের প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা, ভারতবাসীরা আমরা আটলাণ্টিক চার্টারের মধ্যে পড়ি না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব স্পষ্টভাষাতেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ইউরোপের জার্মান অধিকৃত দেশগুলির স্বাধীনতা দানের সম্বন্ধেই শুধু ঐ প্রতিশ্রুতি। এই ভাষ্য অনুসারে প্যাসিফিক চার্টারের মধ্যে পড়িবে জাপানীদের অধিকৃত দেশগুলি; অর্থাৎ

ইংরেজ এবং আমেরিকার শত্রুপক্ষের যাহারা অধীন হইয়াছে, সেই সব জাতি বা দেশ। ইংরেজের অধীনে যে সব দেশ রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেমন মানবজাতির সার্বভৌম স্বাধীনতার সূত্র চলিবে না, তেমনই আমেরিকার অধিকৃত স্থানগুলির বেলায়ও প্যাসিফিক চার্টারের সূত্র প্রযুক্ত হইবে না। যদি তাহাই হইত, তবে চীনে ইংরেজ এবং আমেরিকার যে সব অধিকার আছে, সেগুলির কর্তৃত্বও তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন, এমন কথা আমরা শুনিতাম। আমরা ভারতবাসী আমাদের পক্ষে বাঁচোয়া এই যে, অমরা আটলাণ্টিক এবং প্যাসিফিক এই দুই সমুদ্রের মাঝখানে পড়িয়াছি এবং এই অনুগ্রহের দানের একান্ত নিগ্রহ আমাদিগকে অভিভূত করিবে, এমন আতঙ্কের কারণ সৃষ্ট হয় নাই। পরানুগ্রহ-প্রত্যাশীর দল ইহাতে হয়ত দুঃখিত হইবেন, এমন কি আটলাণ্টিক সনদ লইয়া কিছুদিন তাঁহারা যেভাবে মাতামাতি করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমন কিছু করিবেন; কিন্তু এই উভয় সনদই ভারতবাসীদের কাছে সত্যকে উন্মুক্ত করিল। ভারতবাসীরা এই সত্যে সুনিশ্চিত হইল যে, স্বাধীনতা কোন জাতিকে কোন জাতি দিতে পারে না, স্বাধীনতা নিজেদের যোগ্যতায় অর্জন করিয়া লইতে হয়।

গান্ধীজীর নূতন আন্দোলন—

মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক ক্ষেত্রে নূতন আন্দোলন প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিছুদিন হইতে আমরা এমন কথা শুনিতেছিলাম; সম্প্রতি 'হিন্দু' পত্রের প্রতিনিধির নিকট মহাত্মাজী এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। এই নূতন আন্দোলনের গতি কি আকার ধারণ করিবে, এই চিন্তায় ইংলণ্ডের শ্রমিক দল ইতিমধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন যে, বৃটেনের সঙ্গে ভারতবর্ষের মীমাংসা প্রয়াসের ব্যর্থতাই গান্ধীজীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। এই আন্দোলন ঠিক কি ভাবে পরিচালিত হইবে বলিয়া মহাত্মাজী পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে এইটুকু স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহেন এবং ব্রিটিশ-প্রভাব বিনির্মুক্ত স্বাধীনতা। মহাত্মার বিশ্বাস এই যে, ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তবে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে ভারত আত্মশক্তিকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মজী স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন যে, কোন বৈদেশিক শক্তি ভারতে প্রভুত্ব বিস্তার করুক, এমন কল্পনা তাঁহার চিন্তার অতীত। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, তিনি চীনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি বলেন, যদি আমি ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ববিধ শক্তি প্রয়োগ করিতাম। ইহার দ্বারা এই সত্যই স্পষ্ট হইতেছে যে, মহাত্মাজী পররাজ্যলোভী কোন শক্তি ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, ইহা চাহেন না। জগতের শান্তি এবং মানবজাতির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ভারতের স্বাধীনতা প্রথমে প্রয়োজন, এ সত্য আজ ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীন ভারতের জনবল এবং সামরিক সঙ্গতি যদি আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রযুক্ত হইত, তবে পররাজ্যলোভীদের পিপাসা এমন বিশ্বব্যাপী প্রলয় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইত না; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহারাজার আন্তর্জাতিকতা—

ইন্দোরের মহারাজা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের নিকট সম্প্রতি এক দীর্ঘ আবেদন দাখিল করিয়াছেন। মহারাজার যখন আবেদন, তখন ব্যাপারও মহৎ কিছু, সামান্য নয়! মহারাজা এই আবেদনে ভারতবাসী এবং ইংরেজ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে, তাহার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিয়াছেন। মহারাজার বিশ্বাস এই যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি যদি রুশিয়া এবং চীনের সহযোগিতা লইয়া এই বিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তবেই এই বিরোধ মিটিয়া যায়। বলা বাহুল্য, মহারাজা বাহাদুর ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির মধ্যে দোষের কিছুই দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে সে দিককার কোন ত্রুটিই বিরোধের মূলে নাই; ব্রিটিশ নীতির সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসই এই বিরোধের মূলে রহিয়াছে। ভ্রান্ত এই ভারতবাসীগুলার মতিবুদ্ধি ভাল হইলেই বিরোধের সমাধান হইয়া যায়। মহারাজা প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টকে এ কথাও এই সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি একজন আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ডেমোক্রাট বা গণতান্ত্রিক। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া এমনভাবে আন্তর্জাতিকতা এবং গণতান্ত্রিকতা জাহির করিবার যুগই পড়িয়া গিয়াছে। ইহা আমরা বেশ বুঝিতেছি। কিন্তু বিশাল ভারতের জন্য এই ধরণের চিন্তায় মাথা না ঘামাইয়া মহারাজা বাহাদুর নিজের রাজ্যের মধ্যে এগুলি নিবদ্ধ রাখিলেই ভাল হয়।

ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারত—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকায় গমন করিবেন, এইরূপ একটা কথা শুনা গিয়াছিল। সম্প্রতি পণ্ডিতজী এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার নিরসন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমেরিকায় যাইতে আমার খুবই ইচ্ছা আছে ইহা ঠিক; কিন্তু বর্তমানে আমার কাজ ভারতবর্ষেই, এখন আমি ভারত হইতে অন্যত্র গমন করিতে পারি না। পণ্ডিতজী যে এমন কথা বলিবেন, আমরা পূর্বেই তাহা অনুমান করিয়াছিলাম; কারণ বর্তমানের এইরূপ সঙ্কট সন্ধিক্ষণে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যদি কিছু সুবিধা হয়, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তিনি আমেরিকায় যাইতে পারেন এবং সে সুবিধা আমেরিকার জনমতের সহানুভূতির সুবিধা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কিন্তু স্বার্থ-সঙ্ঘাতপূর্ণ রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই জগতে ভারতবর্ষ যদি শক্তিশালী হয়, তবেই অন্য দেশ এবং জাতির কার্যত সমর্থন বা সহানুভূতি সে লাভ করিতে পারে। যে দুর্বল, যাহাকে দিয়া কোন কাজ পাইবার আশা নাই, তাহাকে কেহই সাহায্য করে না। আমেরিকার লোকেরা ভারতের

স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। জার্মানীর সঙ্গে আমেরিকার লড়াই বাধিবার পর হইতেই এই কথাটা বেশী করিয়া শুনা যাইতেছে এবং আমেরিকা হইতে মিঃ লুই জনসন প্রভৃতি আসিয়া ভারতের ব্যাপারে দৌত্য করিতেছেন দেখিতেছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কিনদের ভারতের প্রতি এই সব মৌখিক সহানুভূতি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভে সংকল্পশীল হইলেই বাস্তব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হইয়া উঠিবে। সুতরাং মার্কিন দেশে দৌড়ানোর চেয়ে ভারতে থাকিয়া দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার লাভের সংকল্পশক্তি জাগ্রত করাই প্রকৃতপক্ষে যিনি স্বদেশের স্বাধীনতাকামী, তাঁহার পক্ষে কর্তব্য। নাম, যশ এবং প্রতিপত্তি যিনি চাহেন, তাঁহার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পণ্ডিতজী নাম-যশের কাঙাল নহেন। তিনি ভারতে থাকিয়াই ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা বর্তমানে শ্রেয় মনে করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদের মনে যদি স্বাধীনতা লাভের জন্য দুর্জয় সংকল্পশক্তি জাগ্রত হয় এবং সেই পথে ভারতবর্ষ সংহত হয়, তবে ভারত হইতে দরবার করিবার জন্য কাহাকেও আমেরিকায় যাইতে হইবে না—আমেরিকা হইতেই কর্তারা ভারতবর্ষে ছুটিয়া আসিবেন এবং ভারতবর্ষকে কার্যকর-ভাবে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।

দ্রব্য মূল্যের সমস্যা—

কখনও আটা, ময়দা দুর্লভ, কখনও কয়লা, কেরোসিন এবং লবণ দুর্লভ। এখন হঠাৎ চিনি দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রকৃত-পক্ষে অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কখন যে কোন্ জিনিস দুর্লভ হইয়া পড়িবে, এমন কি কোন্ মুহূর্তে দুষ্প্রাপ্য হইবে, কিছুই বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। গৃহস্থ নিত্য শঙ্কায় দিন কাটাইতেছে। সব জিনিসেরই আমদানী এবং কাটতির মোটা-মুটি একটা ধারা থাকে; কিন্তু এখন দেখা যইতেছে, কোন ধারাই এদেশে নাই এবং কোন নিয়মের দ্বারা পণ্যদ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। আমদানী এবং রপ্তানির সকল হিসাব রাতারাতি উল্টাইয়া অঘটন ঘটিয়া যাইতেছে। আজ কলিকাতার বাজারে চিনি মিলা কঠিন ইহা বুঝা যায়, কিন্তু একেবারেই অমিল ইহা দুর্বোধ্য। এই অমিলটা আপনা হইতে ঘটে নাই, কতকগুলি কারণকে আশ্রয় করিয়াই ঘটিয়াছে; যাঁহারা দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব হইতে ইহা লক্ষ্য করেন নাই কেন? এবং ইহার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাই বা অবলম্বন করেন নাই কেন? বাজারে দুইদিন আগে মাল ছিল, আজ যদি হঠাৎ মাল না থাকে, তবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কাহারাও জোট করিয়া কৃত্রিমভাবে বাজারের দর চড়াইয়া লাভ ফলাইবার আশায় বাজারের সব মাল গুদামজাত করিয়াছে। বিহারের কয়েকটি স্থানে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কতকগুলি ব্যবসায়ী মাল গুদামজাত করিয়াছিল; খানাতল্লাসীর ফলে ঐ সব মাল ধরা পড়ে। কলিকাতার বাজারেও সেইরূপ মতলব বাধা রকমে বড় রকমের ফাটকাবাজী চলিতেছে কি না, কর্তৃপক্ষের দেখা দরকার। একথা সত্য যে, পণ্য সরবরাহের সমস্যার সমাধান প্রকৃতভাবে করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাই তাহা সম্ভব; তাঁহারাই বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদন এবং প্রয়োজন বুঝিয়া বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া মালগাড়ি সরবরাহের সমস্যা মিটাইতেও তাঁহারাই সমর্থ; কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টেরও এক্ষেত্রে কর্তব্য রহিয়াছে। ব্যাপারীদের ফাটকাবাজী বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং সরকারী বাঁধা দরে যাহাতে পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হয়, কড়াকড়ি রকমে সে ব্যবস্থা বজায় রাখা তাঁহাদের উচিত। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব অনাটনের জন্য যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, এই সঙ্কটের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ ইহা উপলব্ধি করিবেন।

পরলোকে রমাপ্রসাদ চন্দ—

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্য যাঁহাদের অবদানে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, রমাপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাঙলার পুরাতত্ত্ব এবং প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য গবেষণা জাতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার গ্রন্থগুলি মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। স্বর্গীয় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তিনি সহকর্মী ছিলেন; মৈত্রেয় মহাশয়ের লেখার মধ্যে বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির যেরূপ একটা পরিচয় পাওয়া যায়, রমাপ্রসাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতেও প্রাচীন বাঙলার সভ্যতার গৌরববোধে বাঙালীর চিত্তকে সেইরূপ উদ্দীপ্ত করে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিককে হারাইল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজাজীর তার্কিকতা—

শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী নিজের গোঁ বজায় রাখিয়াই চলিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে রাজাজীর উদ্যমের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখেন। সেই প্রবন্ধে মহাত্মাজী যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, রাজাজী তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মতের যেখানে পার্থক্য ঘটে, অথচ উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসায় পৌঁছানও দরকার হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যাহা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করি না, মীমাংসার দায়ে তেমন জিনিসও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। রাজাজীর যুক্তির মর্ম বুঝা গেল; কিন্তু কথা দাঁড়ায় এই যে, বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য

সিদ্ধ করিবার পন্থাস্বরূপেই ঐরূপ মীমাংসা ক্ষেত্রবিশেষে স্বীকার করা প্রয়োজন হইতে পারে। মীমাংসা সে ক্ষেত্রে পরোক্ষ বা অপ্রয়োজনীয়, এই হিসাবে বলা চলে যে, বৃহত্তর প্রয়োজন সিদ্ধিই সে ক্ষেত্রে একান্ত কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মীমাংসার ফল যদি বৃহত্তর, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক না হইয়া তাহাকে পণ্ডই করে, তবে তেমন মীমাংসার সার্থকতা থাকে না বরং তাহা অনর্থকই হইয়া পড়ে। ভারতের স্বাধীনতাই বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন, পাকিস্থানী প্রস্তাব এমন প্রস্তাব যে, সেই সর্তে বিবেকবুদ্ধিকে চাপা দিয়া যদি মোস্লেম লীগের সঙ্গে মীমাংসা করা যায়, তবে আমাদের প্রয়োজনই পণ্ড হইবে। স্বাধীনতা রূপে বৃহত্তর লক্ষ্যটিই আমরা সে ক্ষেত্রে হারাইব এবং ভারতের পরাধীনতার পথই প্রশস্ত হইবে। সেদিন শ্রীযুত সত্যমূর্তি রাজাজীর উদ্যমের সমালোচনা করিয়া একটা কথা বলিয়াছেন, কথাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীযুত সত্যমূর্তি বলেন, "কোন কোন ব্রিটিশ কর্মচারী রাজাজীকে আদর করেন; তাঁহারা মনে করেন যে, রাজাজী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করিতেছেন।" কোনও কোনও ব্রিটিশ কর্মচারীর মনে ঐরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়; কারণ, বিলাত হইতে তাঁহাদের কর্তারাই কেহ কেহ রাজাজীকে বাহবা দিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা বুঝিতেছেন না যে, অখণ্ড রাষ্ট্রীয়তার আদর্শে গঠিত স্বাধীন ভারত ব্রিটিশের সমরোদ্যমে যেভাবে সাহায্য করিতে পারে, পরাধীন ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

চীনের বিদ্যা-সাধনা—

ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে সার্জেণ্ট সম্প্রতি চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। চীন জাপানের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত আছে। এই সংগ্রাম সংকটে চীনের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার কাজ কিভাবে চলিতেছে, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই ছিল মিঃ সার্জেণ্টের চীন যাত্রার উদ্দেশ্য। জাপান যখন চীনে অভিযান করে, তখন চীনের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ জ্ঞানের আলোক অনির্বাণ রাখিবার উদ্দেশ্যে চীনের সমুদ্রোপকূলভাগের শহরগুলি হইতে দুই হাজার মাইল অভ্যন্তরভাগে এক বিরাট অভিযান করেন। চীনের ছাত্রদের এ অভিযান ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। চীনের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে অবস্থান করিয়া তথাকার ছাত্রগণ এখনও বিদ্যা-সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছে। মিঃ সার্জেণ্ট এই সাধনায় চীনা জাতির অপরিমিত নিষ্ঠাবুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। চীনের এই অবস্থার আলোচনা করিতে গেলে বর্তমান লড়াই বাধিবার পর বাঙলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা স্বভাবতই আমাদের মনে উঠিবে। চীনের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই সকল রকমে চেষ্টা করিতেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ জাপানীদের আক্রমণের ভয়ে কোথায় কোথাও স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ রাখিবার পরামর্শ দিতেছেন; আর যে সব জায়গায় স্কুল-কলেজগুলি খোলা রাখিবার ভরসা পাওয়া যাইতেছে, সেখানেও ছাত্র মিলিতেছে না। কারণ শিক্ষা বিভাগীয় কর্তারা স্কুল-কলেজগুলির শত্রুর সম্ভাবিত আক্রমণের আতঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব নিজেরা লইতেছেন না। মিঃ সার্জেণ্ট চীন হইতে আর একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলেন, চীনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বেকার সমস্যা নাই। চীনের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছেলেরা বেকার আছে, একথা তিনি শুনেন নাই। জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়াও চীন তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের গুরুত্বকে গৌণ করে নাই; কারণ ভবিষ্যৎ জাতির আশা এবং ভরসা এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরই রহিয়াছে। এদেশের শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ চীনের এই অভিজ্ঞতাকে কতটা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত থাকিলাম।



৯

আলোকোজ্জ্বল ও সংগীতময় হলঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শাশ্বতী বারান্ডা বাহিয়া অন্যদিকে অন্ধকার কোণে রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

এই মুহূর্তে এই নিস্তব্ধ অন্ধকারটাই তাহার কাছে বড় ভাল লাগিতেছিল। দীর্ঘ পথ মোটর চালাইয়া আসিয়া সে কতকটা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেজন্য খানিকক্ষণ বিশ্রামের দরকার তাহার হইয়াছিল। আজ যে স্বাতীর জন্মদিন এবং প্রতি বৎসর এই দিনটিতে উৎসব হইয়া থাকে, এ কথা তাহার মনে ছিল না।

নিস্তব্ধ ও শান্ত অন্ধকার—

দূরে—দূরে আলো জ্বলিতেছে, বাগানের ও-ধারে আলোটা দৃপ্তভাবে জ্বলিয়া ওদিককার অন্ধকার দূর করিয়াছে, এদিকে সে আলো পৌঁছাইতে পারে নাই, তাই এদিকে অনেকখানি জায়গা পর্যন্ত শান্ত অন্ধকার ছড়াইয়া আছে।

আকাশে চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদখানা জাগিয়া উঠিয়া মৃদু আলো বিকীর্ণ করিতেছে, এদিকে ওদিকে শত শত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়া চিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘরের মধ্যে যাইবার ইচ্ছা হয় নাই, আলো জ্বালিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, তাই শাশ্বতী রেলিংয়ে ভর দিয়া সামনের বিস্তৃত অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল।

এমন শান্ত স্নিগ্ধ অন্ধকার, সভ্যতার প্রতিমূর্তি মানুষ ইহাকে চাহে না—আলো চায় বলিয়াই ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া আলোকের বন্দনাই কাটিয়া যায়, অনর্থক গোলমাল করে এবং এইভাবে দিন কাটাইয়া যাওয়াকেই জীবনের পরম এবং চরম সার্থকতা মনে করে।

উজ্জ্বল আলোর পানে চাহিয়া চোখ ধাঁধিয়া যায়, পতঙ্গের মত আলোর চারিধারে লুব্ধ মন ঘুরিয়া মরে, তিলে তিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, তবু চায় তাহারা দৃপ্ত আলো, যে শীতল অন্ধকার চক্ষুর শীতলতাদায়ক, যাহা বাহিরের দৃষ্টি এবং অন্তরের চিন্তাশক্তিকে বর্ধিত করিবার অবকাশ দেয়, মানুষ তাহা চায় না।

শাশ্বতী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

একা সেই যেন সভ্য সমাজের চিরকালের বাঁধা রুটিনের ব্যতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সে আলো চায় না—চায় অন্ধকার, বাঁধা ধরা ভদ্রতা ও সভ্যতার আবরণের মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে চায় না, সে চায় সরল ও স্বচ্ছন্দগতিতে চলিতে—সহজ ভাবে হাসিতে। এই সব সভ্যতার প্রতীক নরনারীরা তাহাকে তাহাদের মধ্যে লইতে পারে না, কারণ তাহার ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ললিতভঙ্গীতে হাঁটা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, তাহার অশান্ত অস্থির চরণক্ষেপে গানের সুরের তন্দ্রাজাল প্রাণে বুনিয়া দেয় না—কালবৈশাখীর ঝঞ্জা বহিয়া আনে। তাই সে যখন আসে, সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, তাহার জননী ভগিনী পর্যন্ত।

শাশ্বতী দন্তে অধর চাপিয়া ধরিল—

না, স্বাতীর মত প্রজাপতির জীবন যাপন করিতে সে অশক্ত। স্বাতীর জীবনপথ ও তাহার জীবনপথ বিভিন্ন। স্বাতী সংসার বাঁধিবে, স্বামীর স্ত্রী হইবে, সন্তানের মা হইবে, সে গান গাহিবে, পিয়ানো, হার্মোনিয়াম বাজাইবে, লোকের কাছে প্রশংসার দাবী করিবে, শাশ্বতী তাহা চায় না। জগতের মানুষের কাছে তাহার কোন দাবী-দাওয়া নাই, সে যাহা চাহিবে নিজের কাছেই চাহিবে, যাহা করিবার নিজেই করিবে।

ড্রইংরুমে তখন স্বাতী গাহিতেছে—

শাশ্বতীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে।

নাকিসুরে ন্যাকামো-ভরা কণ্ঠে যে সব মেয়েরা গান গায়, তাহাদের সে দেখিতে পারে না। পুরুষেরা সেই সব গান শুনিয়া বাহবা দেয়—সেটা ভাল লাগে বলিয়া নয়—নিতান্ত ঠাট্টা করিয়া—শাশ্বতীর তাহাই মনে হয়। প্রশংসা মানুষ মুখে করিতে পারে না, মুগ্ধ হয় সে মনে। এমন তন্ময়তা দেখা যায় খুব কম লোকেরই। সেদিন মাসিমার বাড়ি শান্ত সন্ধ্যায় শাশ্বতী গান শুনিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীকে গানের সুরে মানুষ ব্যক্ত করিয়াছে, সেই গানের সুরেই ভাষা অন্তরে প্রবেশ করে এবং শ্রোতাকে অভিভূত করিয়া দেয়। অভিভূতা শাশ্বতী নিস্তব্ধে সে সন্ধ্যায় বারান্ডায় দাঁড়াইয়াছিল, একটি শব্দমাত্র সে করে নাই, একটা প্রশংসার বাণী তাহার মুখে আসে নাই। সে শুধু শুনিতেছিল—

আমি সাগর ছেঁচিলাম নগর বসালাম
মাণিক পাওয়ার আশে
সাগর শুকালো মাণিক লুকালো
অভাগার করম দোষে।

নিজের অজ্ঞাতসারে শাশ্বতী আকৃষ্ট হইয়া পড়িল সেই

গানের মধ্যে। যে কীর্তনের নাম শুনিয়া সে বহুদূরে সরিয়া যাইত, আস্তে আস্তে সেই কীর্তনের সুর তাহার অজ্ঞাতে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং কেবল প্রবিষ্ট হইল যে তাহা নয়—রীতিমত ছাপ দিল।

হঠাৎ ব্রজসুন্দরের কথায় তাহার সে তন্দ্রাঘোর টুটিয়া গিয়াছিল; ব্রজসুন্দর বোধ হয় তাহার তন্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়াই মাকে লক্ষ্য করিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়াছিল—"সুমন্ত আজকাল খেয়াল ধ্রুপদ ছেড়ে কীর্তনে মন দিয়েছে মা, এ যেন লাঙ্গল দিয়ে এস্রাজ বাজান। ও-গলায় তবু ধ্রুপদ খেয়াল মানায়, কীর্তন গাওয়া মানায় না। গলা খেলবে না, তবু ধরে বেঁধে সুর ভাঁজা। খেয়াল ধ্রুপদও যা হয়, তা মা সরস্বতীই জানেন। সত্যিকার সমজদার লোক থাকলে কানে প্যাঁচ কষে বুঝিয়ে দিত। আমরা যদিও জানিনে—তবু বুঝি তো কিছু কিছু।"

মাসিমা অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন, "বলি ওস্তাদ তো মোহন বাগ্দী, সে আবার কীর্তন শিখলে কবে?"

শাশ্বতী কেবল ভ্রূকুটি করিয়াছিল, বাহিরের গান থামিয়া গিয়াছিল, মনে তাহার সুর ও ভাষা গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল—

সখি, কি মোর করমে লেখি,
শীতল বলিয়া ও-চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।

আজ এই ঘনীভূত অন্ধকারের পানে তাকাইয়া শাশ্বতীর মনে কেবল গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল—

শীতল বলিয়া ও-চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।

"শাশ্বতী—"

আহ্বান শুনিয়া সে পিছনে মুখ ফিরাইল—মা আসিয়াছেন।

দেওয়ালের সুইচটা জ্বালিয়া দিতেই উজ্জ্বল আলোয় মনোমুগ্ধকর অন্ধকার দূরে সরিয়া গেল। শাশ্বতী দুই হাতে চোখ ঢাকিল।

রুষ্টকণ্ঠে মিসেস বোস বলিলেন, "বেশ, ওদিক ছেড়ে এসে এই অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে কি হচ্ছিল শুনি?"

শাশ্বতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "সে জবাব পরে দেব এখন, তুমি আলোটা নিভিয়ে দাও মা, চোখে বড় লাগছে।"

উদ্বিগ্ন হইয়া মা বলিলেন, "কেন চোখে কিছু হয়েছে নাকি—দেখি?"

শাশ্বতী হঠাৎ মায়ের অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া বড় বড় দুইটি চোখ মেলিয়া বলিল—"কিছু হয়নি মা, কিছু না—এই দেখ—।"

বলিতে বলিতে সে দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিল—খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাপ্‌রে, কি ভয়, ওই জন্যেই না বলেছি—আমি কক্ষণো মা হ'ব না। এই তুমি রাগ করে আমায় বকতে এলে, চোখে কি হয়েছে শুনে অমনি সব রাগ দূর হ'য়ে গেল,—বেশ যা হোক—"

মিসেস বোস রাগতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করি শাশ্বতী, এ-রকম করার অর্থ কি—এ-রকমভাবে হঠাৎ কোথায় উধাও হ'য়ে যাওয়া, তার পর হঠাৎ ফিরে আসা, তার পর লোককে অপমান করা—"

"অপমান—"

শাশ্বতী যেন আকাশ হইতে পড়িল,—"অপমান করলুম কাকে?"

মিসেস বোস বলিলেন, "ওঁরা তোমায় গান গাইতে বললেন, কিন্তু তুমি—"

বাধা দিয়া শাশ্বতী বলিল—"কিন্তু এ-ও ভারি অন্যায় যে আমায় গান গাইতে হবে ওঁদেরই খুসি করার জন্যে? না, না, ও-সব আমার দ্বারা হবে না মা, আমি কারও মন রাখতে পারব না তা তো তুমি জান। লক্ষ্মী মা, আর কথা নয়, তুমি ওঁদের কাছে যাও, নইলে ওঁরা আবার কি মনে করবেন। আমায় ওঁরা বেশ চেনেন, আমি না গেলেও কিছু আসবে যাবে না—যাও তুমি—"

মিসেস বোস কি বলিতে গেলেন, শাশ্বতী কোন কথা শুনিল না, জোর করিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল!

১০

বাম হাতে ছিপ ও দক্ষিণ হাতে মস্ত বড় রুইমাছ একটা লইয়া সুমন্ত ফিরিতেছিল।

আজ হঠাৎ মাছ ধরিবার সখ চাপিয়াছিল। ছোটবেলায় মাছ ধরার সখ ছিল প্রচুর, কিন্তু উপস্থিত নানাদিকে মনটা ছড়াইয়া পড়ায় মাছ ধরার ঝোঁক চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আজই হঠাৎ মাছের কথাটা মনে পড়িয়া গিয়াছিল এবং অবিলম্বে টোপ ও চার জোগাড় করিয়া সে আহার শেষে নদীতে গিয়া বসিয়াছিল।

বর্ষাকালে মাছের প্রাবল্য বেশী এবং টোপও খায় বেশ। মস্ত বড় রুইমাছটা পাইয়া সুমন্তের খুসির অন্ত ছিল না। সে অনেক কিছু ভাবিয়া আসিতেছিল—ইহার কিছু ভাজা খাইবে, কিছু দিয়া ঝোল হইবে এবং কিছুটা ভাজিয়া রাখিলেই চলিবে।

গুন্ গুন্ করিয়া একটা গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে চলিতেছিল। বাঁক ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার সামনে পড়িল একটি মেয়ে—

মুহূর্ত তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া আত্মবিস্মৃতভাবেই সে বলিয়া উঠিল, "রাজলক্ষ্মী—"

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল, সে দুই-পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া নত হইয়া সুমন্তের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে।—তবে রাজলক্ষ্মী নই সু-দা, রাজলক্ষ্মী এখন ছন্নছাড়া অলক্ষ্মী হয়েছে।"

হঠাৎ—নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবেই প্রণামটা সারা হইয়া গিয়াছিল, তাই সুমন্ত বাধা দিতে পারে নাই, এতক্ষণে হুঁস হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আবার ও-সব কেন—সোজাসুজি কথা বলাই ভাল, প্রণাম, নমস্কার—ও-সব যে আমার ধাতে সহ্য হয় না, তা তো জান। কিন্তু তুমি তো এখানে ছিলে না রাজলক্ষ্মী, আমি তোমার কথা—"

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল,—"ভুল কোরো না সুদা, রাজলক্ষ্মী বলে আর ডেক না, ও-নামে কেউ আমাকে ডাকলে আমার মনে হয় আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে। আমায় বরং শুধু লক্ষ্মী বলে ডেক—পারতো অলক্ষ্মীও বলতে পার। দুনিয়ায় এসে সব যে হারিয়ে ফেলে ভিখারী হয়, তাকে কেউ ধনী বলে সম্মান দেখালে তার উপহাসই মনে হবে না কি?"

এ-কথার অর্থ বুঝিবার জন্য সুমন্ত চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পূর্বে যে সিঁথি সে সিন্দুরচর্চিত দেখিয়াছিল, সে সিঁথি আজ শূন্য সিন্দুরবর্জিত। রাজলক্ষ্মীর হাতে কোন গহনা নাই, পরণে আধময়লা একখানা থান।

তাহার সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া রাজলক্ষ্মী বুঝিল, কেবলমাত্র বলিল, "আমি বিধবা সুদা—"

"বিধবা—"

সুমন্তের মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না, সে নিস্তব্ধে খানিক রাজলক্ষ্মীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া উদাস দৃষ্টি দূরে মেলিয়া ধরিল।

পশ্চিমের আকাশ অস্তগামী সূর্যের আলোয় লাল হইয়া উঠিয়াছে পাঁচ বৎসর পূর্বেকার রাজলক্ষ্মীর সীঁতির সিন্দুরের মতই—দিনশেষে বিহঙ্গের দল গান গাহিয়া নীড়ে ফিরিতেছে, শান্ত সন্ধ্যাকাশ তাহাদের কাকলী ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই নীচে দেখা যাইতেছে গ্রামের শস্যক্ষেত্র—নব বর্ষায় ঘোর সবুজ রংয়ের ধানগাছগুলি দুর্বারগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই শস্যক্ষেত্রের ও-পারে দেখা যায় ভিন্ন গ্রামের সীমারেখায় আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি গাছগুলি—মাঠের মাঝখান দিয়া ভিন্ন গ্রামে যাইবার যে সরু পথটি জাগিয়া থাকে, ঘন ধানগাছের আড়ালে তাহার অস্তিত্ব মিলাইয়া গেছে।

যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, রাজলক্ষ্মীর কথা কানে আসিল, "শুনলুম—তুমি নাকি আমার বাবাকে বাঁচিয়েছ, আমাদের কুঁড়েঘরখানা তোমারই দয়ায় রক্ষা পেয়েছে। একবার এস আমাদের বাড়িতে সুদা, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, পথে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা বলা যায় না।"

পাশ কাটাইয়া সে চলিয়া গেল নদীর পথে—সুমন্ত পলকহীন নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

আজ হঠাৎ সেই পাঁচ বৎসর আগেকার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

তখন রাজলক্ষ্মীর বয়স ষোল কি সতেরো—রাম বসু তাহার সহিত রাজলক্ষ্মীর বিবাহ দিবার কথা বলিয়াছিলেন—প্রায় ঠিকঠাকও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধ ভাঙিল সুমন্ত নিজেই। কোথায় আনিত সে রাজলক্ষ্মীকে, কোথায় তাহার জন্য আসন পাতা হইত? গরীবের কুঁড়েঘর না হোক, বরং সত্যকার জ্ঞান দিয়া বিচার করিলে কুঁড়েঘরও ভাল বলিয়া মনে হয়। সুমন্ত মনে ভাবে, এই বনেদী বংশে—ভাঙা প্রাসাদের ঘরে না জন্মিয়া যদি সে ওই খ্যাতিহীন দরিদ্রের ঘরে জন্মাইত।

রায় বাড়ির নাম করিলে আশপাশের পাঁচশোখানা গ্রামের লোক চিনিতে পারিবে, কোথাও কোন সভা-সমিতি, উৎসবে আনন্দে যোগ দিতে গেলে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে—অথচ আশ্চর্য—সম্মান যাহাদের দেখায়, তাহাদের সাংসারিক অবস্থার কথা কেহ ভাবে না—কেহ খোঁজ রাখে না, তাহারা কি খায়, অথবা খাইতে পাইল কি না।

রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ না করায় রাম বসু রাগ করিলেন গ্রামের লোক আশ্চর্য হইল, কারণ সকলেই জানিত তাহার সহিত রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইবে।

সুমন্তের মনে সেদিনকার ছবিটি জাগিয়া উঠিল—বৃদ্ধ জগন্নাথ মিত্র বরাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার হাতের উপর রাজলক্ষ্মীর স্বেদাক্ত হাতখানা ন্যস্ত, পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন ও রাম বসু সম্প্রদান করিতেছেন।

সুমন্ত আর দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

এক মুহূর্তে মনটা বিস্বাদ, তিক্ত হইয়া উঠিল—হাতের মাছটার পানে তাকাইয়া এই মুহূর্তে তাহার মনে হইল—নির্দোষী মাছটাকে না মারিলেই হইত, অনর্থক জীবহত্যা করিয়া কেবল পাপ অর্জনই হইল মাত্র।

হতভাগ্য মৎস্যকুল—জগতের কাহারও কোন অনিষ্ট করে না—নিজের মনে স্বচ্ছন্দগতিতে জলের মধ্যে বিচরণ করে, দেখিয়া হিংস্র মানুষের বুকের মধ্যে দারুণ জীঘাংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠে, মানুষ তাহাদের হত্যা করে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই ধুপ্ করিয়া মাছটাকে ফেলিয়া দিয়া ছিপ ফেলিয়া সে বসিয়া পড়িল।

মস্ত বড় মাছটা দেখিয়া দিবাকর মহানন্দে ছুটিয়া আসিল, পরিতৃপ্তির হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল—

"বাঃ, মস্ত বড় মাছটা পেয়েছ খোকাবাবু, এত বড় মাছ ধরলে কোথায়? আমিও ভাবছিলুম—ঘরে কিছু নেই, একটা মাছ পেলে যা-হয় একটা—"

হুঙ্কার ছাড়িয়া সুমন্ত বলিল "থাক, থাক, ভাবাবেশে আর দরকার নেই। মাছটা দিয়ে এস ওদের বাড়ি, ওরা এইবেলা রান্না-বান্না করবে এখন।"

দিবাকর যেন আকাশ হইতে পড়িল—পরম বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে সুমন্তের পানে তাকাইয়া রহিল। পরার্থে মৎস্যাহরণ খুব কম লোকেই করিয়া থাকে, বিশেষ সুমন্তের মত লোকেরা—যাহাদের মাছ না হইলে খাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়।

সে নিঃশব্দে তাকাইয়া আছে দেখিয়া সুমন্ত গলার স্বর আরও এক গ্রাম চড়াইয়া বলিল, "কথা বুঝতে পারছ না—মাছটা ওই ঘরে দিয়ে আসতে বলছি—কাকিমাদের ঘরে—।"

দিবাকর এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "এত বড় মাছটা ধরে এনে ওদের ঘরে দেবে খোকাবাবু, তাহলে ধরবার কি দরকার ছিল?"

অত্যন্ত সংক্ষেপে সুমন্ত বলিল, "ইচ্ছে হয়েছিল তাই ধরেছি, খাওয়ার জন্যে ধরিনি।"

দিবাকর এতখানি হাঁ করিয়া ফেলিল—

সুমন্ত বলিল, "আর মাছ খাব না দিবাদা, এবার হতে নিরামিষ খাব ঠিক করেছি—। এই আলু, বেগুন, পটল, ঝিঙে—কি বল, ভালো নয়?

অন্ততঃ পক্ষে মাছের গন্ধটাও যাহার চাই, তাহার মুখে এ কি কথা, এযে ভূতের মুখে রাম নাম। দিবাকর খানিকক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়াছিল, তাহার পরই দৃঢ়তার সহিত বলিল, "তা হতে পারে না খোকাবাবু, সেই দশটা হতে বসে এই সন্ধ্যেবেলায় এত বড় রুই মাছটা ধরে এনে ওদের দিতে হবে—কেন বোয়াল কি অন্য মাছ হ'লেও হতো— এযে রুই—সাক্ষাৎ রুই—"

সুমন্ত নির্বিকারভাবে বলিল, "ওই যে বললুম, আজ হতে আমি নিরামিষ খাব, আর মাছ খাব না।"

দিবাকর বলিল, "কিন্তু মাছ না খাওয়ার একটা কারণও তো আছে।"

বিরক্তভাবে সুমন্ত বলিল, "সবই তোমায় হিসাব দিতে হবে দিবা দা, আমার ইচ্ছে হ'ল খাব না—বলতে পারিনে—আবার কোনদিন হয় তো খাব—সেদিন আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না তোমার কাছে—কি বল? নাও, এখন মাছটা তোল, ওদের এই-বেলা দিয়ে এসো—।"

অপ্রসন্ন মুখে দিবাকর মাছ তুলিল, বলিল, "কিন্তু ঘরে তিনটে আলু ছাড়া আর কিছু নেই।"

সুমন্ত বেহালার উপর ছড়ি চালাইতে চালাইতে বলিল, "ওতেই ঢের হয়ে যাবে দিবাদা, গোটাকত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আলুর ঝোল—ওঃ, সে যা চমৎকার হবে—

সে জিভ দিয়া ঠোঁট চাটিয়া লইল—

দিবাকর অন্ধকারপূর্ণ মুখে বাহির হইয়া গেল।

১১

বাড়িতে রান্নার আজ কোন বালাই নাই—সুমন্তের ছুটি, সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরেরও ছুটি।

মহেশ ভোরবেলাই আসিয়া জানাইয়া গিয়াছেন, এবেলা সুমন্ত ও দিবাকর তাঁহার ওখানে খাইবে।

হাজার হোক কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা কিছু আছে তো, কাল সন্ধ্যায় সুমন্ত অত বড় পাকা রুই মাছটা পাঠাইয়া দিয়াছে, আজ তাহাদের খাইতে না বলিলে দারুণ অকৃজ্ঞতা হয়।

ঘুমের ঘোরেই সুমন্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, তখন মনে হয় নাই, সে মাছ খাইবে না বলিয়াই মাছটা কাল উহাদের বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

মহেশের সহিত রায়বংশের রক্তগত সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়। মহেশের পিতা সুমন্তের এক আত্মীয়ের জামাতৃসূত্রে এ বাড়ির একাংশের অধিকারী হন এবং মাতৃসম্পর্ক ধরিয়া মহেশ এ বাড়িতে কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। অল্পে অল্পে বাগান, পুকুর প্রভৃতি সবই তিনি গ্রাস করিয়াছিলেন; প্রজন্ত রায় পর্যন্ত তাঁহাকে ঠেকাইতে পারেন নাই।

প্রজন্তের সহিত বরাবর শত্রুতা চলিয়াছে, সুমন্তকেও তিনি সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ দিবাকরের উপর রাগ তাঁহার বরাবরই, কেন না, সুমন্তের বৈষয়িক জ্ঞান কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই। দিবাকর বাল্যাবধি এ সংসারে থাকিয়া কোথায় কি আছে সব জানে। সুমন্তের কোন জিনিসের এতটুকু সে সন্তর্পণে রক্ষা করে, মহেশের শ্যেনদৃষ্টি সে চেনে।

মহেশকে দিবাকর মোটেই পচ্ছন্দ করে না; স্পষ্টই বলিয়া দেয়—এতদিন নিজের দেশ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সেই ক্ষুদ্র গ্রামে থাকিলে তাঁহার উদরে অন্ন জুটিত না, ভাগ্যে তাঁহার পিতা এ বাড়িতে জামাতারূপে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন—ইত্যাদি—

মহেশের গা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া যায়, ইচ্ছা হয়, তাহাকে ধরিয়া গা হইতে মাথা পর্যন্ত চাবকাইয়া দেন; নেহাৎ নাকি বে-আইনী বলিয়া গায়ে হাত তুলিতে পারেন না। রুগ্ন দুর্বল ব্রজসুন্দর শীর্ণ হাতখানা তুলিয়া গর্জন করে—"তুমি একবারটি হুকুম দাও বাবা, আমি ওকে দেখে নেই, ওই বুড়ো দিবাকরকে—"

নিজেকে সে মনে মনে শক্তিশালী বলিয়া মনে করিলেও পিতা তাহার শক্তি বেশ জানেন, সেইজনাই তামাক টানিতে টানিতে উদারভাবে বলেন,—"থাক গিয়ে, যেতে দে ব্রজো, কি হবে ছোটলোকের সঙ্গে ছোটলোকোমী করে, ওতে কেবল নিজেকেই ছোট হতে হয়।"

সেই মহেশ নিজে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, প্রস্তাবটাকে অবহেলা করা যায় না।

সকাল বেলাতেই আজ সুমন্তের ঘরে বাজিল সেতার, বাঁয়াতবলা, হার্মোনিয়াম—

মোহন বাগদীকে আজ সমস্ত নিত্যকার কাজে যাইতে দেয় নাই, তাহার সংসারে চাল, ডাল, লবণ প্রভৃতি সেদিনকার আহার্য পাঠাইয়া দিয়া মোহনকে ধরিয়া রাখিয়াছিল।

বাজনার শেষ নাই।

মোহন মালকোঁচা মারিয়া বাঁয়াতবলা লইয়া বসিয়াছে, হার্মোনিয়ামের সঙ্গে তাল মিলাইতেছে, বোল ফুটিতেছে—

তেরে কেটে ধিন ধা—

বেলা বারোটা বাজিয়া যায়, উঠিবার নাম নাই, সুমন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, আজ তাহাকে পরের বাড়ি খাইতে হইবে।

দিবাকর বলিতে আসিয়া ধমক খাইয়া কয়বার ফিরিয়া গিয়াছে, শেষে করযোড়ে জানাইল—পরের বাড়ি খাওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত। কেহ যে কিছু বলিবে, সে সেটা সহ্য করিতে পারে না।

বাধ্য হইয়াই সুমন্ত উঠিল, মোহনকে ও-বেলায় বাজনা বাজাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া সে স্নান করিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ঘরের মেঝেয় আহার্য সাজানো—দিবাকর জানাইল—কাকিমা এসব দিয়া গিয়াছেন।

নিশ্চিন্তভাবে সুমন্ত বলিল, "যাক, বাঁচা গেল—নিজের ঘরে বসে মহা আরামে খাওয়া যাবে—কি বল?

পরম তৃপ্তির সহিত দুই গ্রাস ভাত খাইয়া মনে পড়িয়া গেল, সে মাছ খাইবে না; কিন্তু মাছ সরাইতেই দিবাকর বিপ্লব বাধাইল—"না না, ও হবে না খোকাবাবু, মাছ তোমায় খেতেই হবে। মাছ-মাংস না খেলে দেহ দুদিন থাকবে তোমার?"

সুমন্ত বলিল, "তুমি আর হাসিয়ো না দিবা দা, মাছ না খেয়ে শরীর যদি খারাপ হতো, তা হলে আমাদের দেশে যারা মাছ খায় না তারা এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতো। এই যে সেকালের যোগী মুনিরা—তুমি বলতে পারো—তাঁরা মাছ-মাংস খেতেন?"

দিবাকর বিজ্ঞের মত বলিল, "মাছ-মাংস না খেলেও তাঁরা খেতেন যথেষ্ট ফলমূল, যথেষ্ট দুধ ঘি যাতে করে তাঁদের শরীর ভালোই থাকতো। কিন্তু তুমি কি খাবে খোকাবাবু, দুধ ঘি তো নাই-ই, ফলও কপালে জোটে না। অত বড় একটা ফলের বাগান, সে সবই কিনা ঠকিয়ে ভোগ করছে ওই জোচ্চোর; ওর বংশে কেউ থাকবে মনে করেছো—?"

সুমন্ত শশব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা—গালাগালি করোনা দিবা দা, যে যাই করুক তবু সে যেন সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, এই কথাই বল, শাপ, গাল দিও না।"

উত্তেজিত হইয়া দিবাকর বলিল, "না, শাপ গাল দেব না, আরো আশীর্বাদ করব ওরা যেন সুখে থাকে। তুমি আর বলো না খোকাবাবু। আজ দেখলুম—তোমাদের ব্রজো বাগানের কাঁঠাল পাড়িয়ে বিক্রী করলে, শুনলুম দশ বারো টাকা পেয়েছে। মস্ত বড় একটা কাঁঠাল বাড়ি নিয়ে এসেছে—পাকলে সব খাওয়া হবে। ওই বাগানটা কি করে জোচ্চুরী করে নিলে কর্তাবাবু মারা যেতে যেতে—সে সমস্ত আমি ভুলিনি খোকাবাবু, আমার বুকে গাঁথা আছে।"

মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তোমার মুখের খাবার অন্যে খাচ্ছে, এ আমি সইতে পারি নে খোকাবাবু। আজ তোমার ঘরে কিছু নেই, চাল আসবে তবে কাল ভাত হবে,—তেল নেই, নুন নেই, আর ওরা কিনা—"

সুমন্ত বাধা দিল, "যাক যেতে দাও দিবা দা, নাই বা রইলো চাল, আজকের দিনটা খেতে পাওয়া গেছে, এই যথেষ্ট, এর পর কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কালকের ভাবনা কাল ভাবব, আজ এখন তুমি খেতে বসো, বেলা শেষ হয়ে এলো এদিকে।

সে উঠিয়া পড়িল—।

বেলা শেষে সে আবার আসর জমকাইয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ব্রজসুন্দর আসিয়া দাঁড়াইল—।

তবলায় চাঁটি দিতে দিতে সুমন্ত বলিল, "কি রকম ব্রজো, কোন দরকার আছে নাকি—?"

ব্রজসুন্দর অবহেলাভরে একখানা পত্র তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ, আজ পত্রখানা এসেছে, তোমায় দেখাবার জন্যে নিয়ে এলুম। ভেবেছিলুম যখন খেতে যাবো, তখন দেখাব, তা তো আর গেলে না—তোমার যা কাজ, এতটুকু ছুটি তোমার নেই।"

সুমন্ত পত্রখানা তুলিল না, তাহার পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "তুমিই পড় ব্রজ, ওতে দন্তস্ফুট করবার ক্ষমতা আমার নেই তা তো জান।"

সুমন্ত জড়ান লেখা পড়িতে পারে না, তাহা ব্রজসুন্দর জানে; পত্রের মধ্যে দুই-একটা ইংরেজী শব্দ আছে, অথচ সুমন্ত মোটেই ইংরেজী জানে না। গ্রাম্য পাঠশালায় খানিকটা পড়িয়া সে গ্রামের স্কুলে ব্রজসুন্দরের সঙ্গেই ভর্তি হইয়াছিল; শীর্ণ দেহ, জীর্ণ মন লইয়া ব্রজসুন্দর তবু টানিয়া টানিয়া থার্ড ক্লাস পর্যন্ত উঠিয়াছিল এবং সেই এক ক্লাসেই চারটি বৎসরের প্রত্যেকটি মাস স্কুলে মাহিনা টানিয়া আসিয়াছে। আর সুমন্ত তাহার অনেক পূর্বেই স্কুলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে।

ফলে ব্রজসুন্দর টানিয়া টানিয়া ইংরেজী তবু কতকটা পড়িতে পারে, সুমন্তের কাছে অক্ষরগুলি পর্যন্ত অচেনা থাকিয়া গেছে।

ব্রজসুন্দর অবহেলার হাসি হাসিয়া পত্রখানা আবার তুলিয়া লইল।

সুমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "লিখেছে কে? আমার সম্বন্ধে কারো যে মাথা ব্যথা হ'তে পারে, তা তো আমার জানা নেই। এমন কোন আত্মীয়ের কথা আমার মনে হয় না যে, আমার খোঁজ-খবর নেবে। সেই জন্যেই জানতে চাচ্ছি—লোকটা কে—যে আমার সম্পর্কে পত্র দেয় তোমাদের কাছে?"

গরম হইয়া ব্রজসুন্দর বলিল, "লোকটা আমারই মাসতুতো বোন্—তাকে তুমিও বেশ চেন। তোমার অসুখের সময় সে নাকি কিছু টাকা দিয়েছিল, সে কথা তোমার দিবাকর বেশ জানে—"

বলিয়া সে চারিদিকে চাহিল, দিবাকরকে দেখা গেল না, সে তখন আগামী কালের জন্য কিছু জোগাড় করিতে গিয়াছিল।

সুমন্তের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, বলিল, হ্যাঁ, সে কথা আমি শুনেছি; অবিশ্যি আমার যদি তখন সাধারণ জ্ঞান থাকতো, তাহ'লে আমি যে নিতুম না, এ কথা ঠিক।"

ব্রজসুন্দর হাসিল, সে হাসিতে যাহা ছিল, তাহাতে সুমন্তের পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল; সে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া শক্তমুখে বলিল, "তুমি কি ঝগড়া করতে এসেছ ব্রজ—এস, মারামারি করবে?"

ক্ষীণকায় দুর্বল ব্রজসুন্দর দুই-পা পিছাইয়া গেল ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "না, মারামারি করবার জন্যে আমি আসি নি, শাশ্বতী পত্রে যা লিখেছে, তাই বলতে এসেছি।"

সুমন্ত হঠাৎ যেমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই শান্ত হইয়া গেল; শান্তকণ্ঠে বলিল, "এ কথাটা আগে বললেই হ'ত যে, 'টাকার তাগাদা করতে এসেছি', তোমার বোন্ তোমায় তহশিলদার করেছেন, তোমায় শুধু আদায়পত্র ক'রে বেড়াতে হবে।" কিন্তু একটা কথা বলে রাখি ব্রজ, তোমার বোন্‌কে লিখে পাঠাও—হাতে এখন কপর্দক নাস্তি—তোমরা ওবেলা যে অতিথি সৎকার করেছ, সেটাতে যে কতখানি আমাদের উপকার হয়েছে, তা আর তোমায় বলে কি জানাব। এ-বেলাটা কিছু না খেতে পেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না—কথাটা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।"

সে আবার তবলায় হাত দিল।

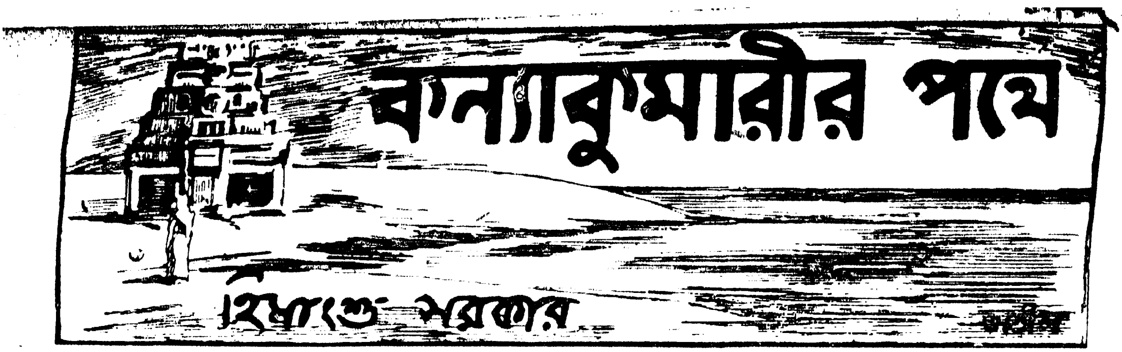
ব্রজসুন্দর বলিল, "কিন্তু পত্রটা একবার শোন—"

বাধা দিয়া সুমন্ত বলিল, "ও আর শুনতে হবে না, না শুনেই বুঝেছি ওতে কি আছে। তুমি নিয়ে যাও ব্রজ, মোট কথা ওর জবাবে তুমি স্পষ্ট আমার কথাটা জানিয়ে দিও। এ টাকা পাওয়ার আশা রাখতে হবে না,—নেহাৎ যদি নাই হয়, আমি মাস পাঁচ ছয় মধ্যে চেষ্টা দেখব। বেশী প্যাঁচ কষলে কিন্তু মূলে হাভাত হবে, কথাটা মনে রাখতে বলবে।

সে নিজের মনে তবলায়বোল ধরিল—তা ধিন তেরে ধিন, ধিন তেরে তেরে তাক—

বিরক্ত ব্রজসুন্দর আস্তে আস্তে পাশ কাটাইল।

ক্রমশঃ



(৯)

রামায়ণ থেকে রামেশ্বরম্ দ্বীপের উৎপত্তি এবং শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠার কথা এর আগেই উল্লেখ করেছি।



কন্যাকুমারীর পথে মাদুরার সহস্রস্তম্ভের একটির ওপর কারুকার্যের নমুনা

এর পর——মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর কিরূপে এই বৃহৎ মন্দির ধীরে ধীরে গড়ে উঠল, সে এক ইতিহাস। 'সেতুপতি' রাজবংশের প্রচেষ্টায় এই মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্ভব হয়েছিল। এদের বংশের রাজারা রামনাদের মহারাজা বলে পরিচিত। বংশপরম্পরাক্রমে রামনাদের মহারাজারা রামেশ্বরমের মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করেন। এই মন্দির গাত্রের শিলা এবং তাম্রলিপি থেকেই এ সব জানা যায়।

খুব সম্ভব ১৪১৯ অব্দে উদয়ন সেতুপতি কর্তৃক রামেশ্বরমের প্রধান মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছিল। সিংহল দ্বীপের রাজা পাররাজ শেখরও যে এই মন্দির নির্মাণের জন্য সাহায্য করেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পর রঘুনাথ সেতুপতি মন্দিরের অন্যান্য অংশ নির্মাণের জন্য এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক জনপদ, মণিমুক্তা ইত্যাদি দান করেন। এ ছাড়া সেতুপতি বংশের সব রাজারাই এই মন্দিরের অল্প অল্প করে উন্নতি করেন।

মন্দির নির্মাণের সব বিবরণ থেকে এটা দেখা যায় যে, এই মন্দির কোন একজন সেতুপতির দ্বারা নির্মিত হয় নাই। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর ধরে এই মন্দিরের নির্মাণকার্য চলে। সংক্ষেপে এই হোল মন্দির নির্মাণের ইতিহাস।

আমরা তিনজন সামনের গোপুরম দিয়ে প্রথম পরিক্রমায় প্রবেশ করলাম। পরিক্রমার মধ্যে প্রবেশ করে রাস্তার দু'পাশে কতকগুলো দোকান চোখে পড়ল। তার মধ্যে কয়েকটা শংখ, ঝিনুক, কড়ি, শাঁখা ইত্যাদির দোকান। অন্য কয়েকটাতে মন্দিরের বিভিন্ন ছবি, লিঙ্গ মূর্তির ছোট বড় পট ইত্যাদি বিক্রি করছে। এই সব দোকানগুলোর মাঝে মাঝে কয়েকটা সস্তার খেলনারও দোকান আছে। প্রত্যেক দোকানদারই খরিদ্দারদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, জিনিসগুলো খুবই ভাল আর এত সস্তায় অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সব জায়গার দোকানদারগুলো এক ধরণেরই সুর সাধতে জানে। সব দোকানগুলো মিলে কালীঘাটের কালী-মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার একটা ছোটখাট সংস্করণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমাদের সব দোকানদারগুলোই তার দোকানের সস্তা জিনিস দেখবার জন্য চিৎকার করে ডাকতে লাগল। মনে হ'ল, খাদ্য সদ্ব্যবহার করবার আগে কতকগুলো পাখীরা যেন জড়ো হয়ে চিৎকার করছে। যাই হোক আমরা মন্দির দেখে তখনকার মত রেহাই পেলাম।

স্তম্ভগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে আমরা পরি-

ক্রমা ধরে চললাম। একটা স্তম্ভ থেকে আর একটা স্তম্ভের দূরত্ব প্রায় ৫ ফিটের ওপর। স্তম্ভগুলো বেশ চওড়া চওড়া। প্রত্যেকটার ওপর হয় কোন রকম মূর্তি অথবা ফুল লতাপাতার কারুকার্য করা রয়েছে। সব স্তম্ভগুলো দু'পাশের চওড়া বারান্ডা বা রকের মত জায়গার ওপর থেকে উঠেছে। আর এই দু'পাশের রকের মত জায়গার ভেতর দিয়ে পাথরের বাঁধানো প্রায় ২০ ফিট চওড়া রাস্তা। কোন কোন পরিক্রমার ছাতের গায়ে বড় বড় পদ্ম আর তার আশেপাশে নানা ধরণের দেবদেবীর মূর্তি আঁকা রয়েছে। এ ছাড়া মন্দির থেকে বাইরে বের হবার সময় ১২টা বড় বড় স্তম্ভ দু'দিকে চোখে পড়ে। এর প্রত্যেকটা স্তম্ভে একটা করে বড় প্রাণীর অথবা কোন রকম মানুষের মূর্তি খোদা রয়েছে।

পান্ডার কাছে শুনলাম যে মন্দিরের ভেতর ২৪টা কুণ্ড আছে। এর মধ্যে আসল মন্দিরের এক কোণের দিকে সর্বতীর্থ কুণ্ড। এর জল স্পর্শ করলে নাকি ভারতবর্ষের সব কুণ্ডের জল স্পর্শের সমান পুণ্য অর্জন হয়। আর এই জন্যই এর নাম সর্বতীর্থ কুণ্ড। আমরা খুব তৃষ্ণার্ত হওয়াতে এই কুণ্ডের জল পান করা যায় কিনা দেখবার জন্য কুণ্ডের কাছে গেলাম। কুণ্ডটা একটা পাথরের পাতকুয়া। কুয়ার কাছেই একটা দড়ি-বাঁধা বালতি বসান আছে জল তোলবার জন্য। কুণ্ড থেকে জল তুলে একটু মুখে দিয়ে দেখি যে, জল খুব ঠান্ডা এবং সুস্বাদু। আর কথা নেই প্রত্যেকে প্রায় এক বালতি করে জল খেয়ে তবে আরামের নিশ্বাস ফেললাম।

মন্দিরের দরজার সম্মুখে পাথর খুদে তৈরী একটা বৃহৎ ষাঁড় আছে। পরে দেখলাম যে, যেখানেই শিবলিঙ্গ মূর্তি, সেখানেই হয় মন্দিরের দরজার সম্মুখে আর না হয় কাছাকাছি কোথাও পাথরের তৈরী এই শিবের বাহন বিরাজ করছে। এ ছাড়া এই বাহনের সঙ্গে একটি এর অনুচরও পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে একটা করে নাতি উচ্চ গোল পাথরের স্তম্ভ। মন্দিরের অবস্থা অনুযায়ী এই স্তম্ভ কোথাও স্বর্ণাবরণে, কোথাও তাম্রাবরণে, আর না হয় তৈলাবরণে আচ্ছাদিত।

পান্ডার কাছে শুনলাম যে, মন্দিরে অনেক সোনা এবং রূপার তৈরী হাতী ঘোড়া ইত্যাদি আছে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এগুলো শোভাযাত্রার সঙ্গে সাজিয়ে বার করা হয়। যে ঘরটায় তালাচাবির ভেতর এগুলো বন্ধ করা ছিল, আমরা সেই দরজার একটা ছেঁদা দিয়ে উঁকিমেরে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। এতে অবশ্য কিছুই দেখতে পাইনি বলতে গেলে। তবে মন্দিরের কাছে একটা মাঝারিগোছের সোনা আর রূপার তৈরী পাল্কী দেখেছিলাম। শুনলাম যে, পাল্কী করে প্রত্যেক দিন রাত্রে রামেশ্বর রামেশ্বরীর মন্দিরে শয়ন করতে যান।

মন্দিরের দ্বার খোলা থাকায় আমাদের দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল না। মূর্তির ওপর হনুমানের লেজের জড়ানোর চিহ্ন আছে কিনা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম। পান্ডার কাছে শুনলাম যে, এই দাগ দেখা যাবে না। কারণ, মূর্তিটি একটি স্বর্ণাবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে বলে সকলের এই চিহ্ন দেখবার সৌভাগ্য হয় না।

যাত্রী বিশেষে, যেমন কোন অসাধারণ যাত্রী, অথবা বেশী দক্ষিণা কবুলকারী যাত্রীরাই এটা দেখতে পায়। পান্ডারা দরকার মত এই আবরণ সরিয়ে এই চিহ্ন যাত্রীদের দেখায়।

ভারতের সব তীর্থের পান্ডাদের সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই ভক্তি অপেক্ষা ভীতিই বেশী। কারণ, এইসব পান্ডারা দক্ষিণার জন্য যাত্রীদের খুব বেশী রকম জ্বালাতন করে। অনেক ক্ষেত্রে এরা সাধারণ যাত্রীদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে বেশী পয়সা আদায় করে। মানুষ এ সবের বিরুদ্ধে অনেক কারণেই দাঁড়াতে চায় না। এই সবের আলোচনা এখানে করে লাভ নেই। পুরীর এবং ঐ ধরণের পান্ডাদের দক্ষিণার নামে জুলুমের কথা আমার ভাল করেই জানা ছিল। সেইজন্য আমার ধারণা হয়েছিল যে, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরেও বোধ হয়, এই ধরণের জুলুমের কম কিম্বা বেশী একটা কিছু দেখব। কিন্তু সমস্ত মন্দিরগুলো দেখার পর আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ রকম বদলে গেল। স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই জানেন যে, মন্দিরে ঢোকবার আগে এমন কি অনেক সময় তীর্থস্থানের কয়েক স্টেশন আগে থেকে পান্ডারা যাত্রী সংগ্রহ করে। সেই সব ক্ষেত্রে কেউ যদি এদের কাছে কোন রকমে ধরা না দিতে চায় এবং নিজের চোদ্দপুরুষের ফিরিস্তি দাখিল না করে, তবে এদের হাতে লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। এদিককার সব মন্দিরেই কিন্তু পান্ডাদের উৎপাত বলে কিছু নেই বলা যায়। এরা কখনো যাত্রীদের কাছে দক্ষিণার নাম করে ভিক্ষা চায় না। যাত্রী নিজের ইচ্ছায় কিছু দিলে নেয়, আর না দিলেও তার জন্য কোন রকম অভিযোগ বা অনুযোগ জানায় না। এরা যে সম্পূর্ণরূপে নির্লোভী—একথা আমি বলছি না। যাত্রী স্ব ইচ্ছায় যা দেয়, তাতেই এরা সন্তুষ্ট। কামাখ্যার মন্দিরের পান্ডারাও অনেকটা এই ধরণের। অনেক জায়গায় পান্ডারা আমাদের যত্নসহকারে মন্দির দেখানোর পর এদের কিছু দক্ষিণা দিবার আগেই এরা চলে যেত। খুব সম্ভব এর কারণ এই যে, এদিককার মন্দিরগুলো হয় কোন দেশীয় রাজা কিম্বা মহারাজের দানের ওপর চলে, আর না হয় মন্দিরগুলোর এত টাকা থাকে যে, পান্ডা এবং পূজারীরা সাধারণের মুখাপেক্ষী না হলেও বেশ চলে যায়।

মন্দির দর্শন শেষ করে আমরা পেছন দিককার গোপুরম্ দিয়ে বাইরে এসে একটু এগিয়ে গিয়েই সমুদ্র দেখতে পেলাম। পান্ডা আমাদের দূরের আবছা একটা ভূমিরেখা দেখিয়ে বলল যে, ঐটে ধনুষকোটী।

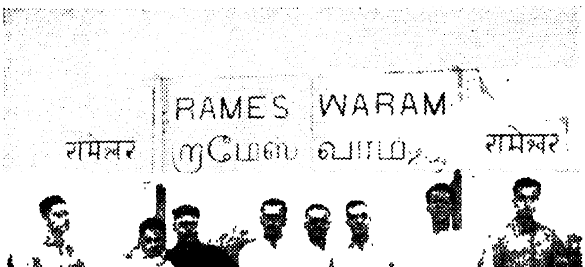
সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি, কতকগুলো ছোট বড় ছেলে হৈ চৈ করে কি সব বলছে। এদের কথার মধ্য থেকে 'এক দামড়ী' অর্থাৎ একটা পয়সা—এইটেই আমরা বুঝতে পারলাম। পান্ডা আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, ছেলেগুলো আমাদের সমুদ্রের ভেতর একটা পয়সা ছুড়ে দিতে বলছে—আর এরা সেটা জলে ডুবে তুলে আনবে। অনেক পাশ্চাত্য যাত্রীদের ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছিলাম যে, কোন বন্দরে জাহাজ লাগলে, জাহাজ থেকে সমুদ্রের ভেতর পয়সা ফেলে দিলে, একদল দেশী লোক থাকে—যারা সেগুলো জলের ভেতর থেকে তুলে আনে। আমাদের সেটা কোনদিন দেখবার সৌভাগ্য নাও হতে পারে ভেবে এইখানে এটার অভিজ্ঞতা করা যাক মনে করে একটা পয়সা জলের মধ্যে ছুড়ে দিলাম। ছেলেগুলো জলে লাফিয়ে পড়ে সেই জায়গাটার

কাছাকাছি ডুব দিল। একটা ছেলে কৃতকার্য হয়ে পয়সা তুলে এনে আমাদের দেখাল। আমরা আরও কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ওদের জলের তলা থেকে তুলে আনার ক্ষমতার পরীক্ষা করলাম।

মন্দির দেখা শেষ করে সামনের দোকানগুলো থেকে অনেক দরাদরি করে কিছু শাঁখ, ঝিনুক, কড়ি এবং মূর্তির কয়েকটা পট কিনে ঝটকায় এসে চড়লাম। দুচারজন ভিখারী 'এক দামড়ী এক দামড়ী' করে আমাদের আক্রমণ করল। তা হলেও এদিকে ভিখারীর উপদ্রব নেই বল্‌তে গেলে।

ধর্মশালায় ফিরে দেখলাম যে, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ পিল্লাই কুলী দিয়ে আমাদের মালগুলো স্টেশনে নিয়ে গেছে। আমরা গিয়ে পৌঁছন মাত্রই আর অপেক্ষা না করে সকলে স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম।

এখান থেকে আমরা এবার মাদুরায় যাব। বেলা ৫টায় আমরা রামেশ্বরম থেকে মাদুরা যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ি ধরলাম। রামেশ্বরম স্টেশন ছেড়ে গাড়ি আবার পাম্বন জংশনে থামল। কৃষ্ণ পিল্লাই এখানে নেমে গেল। সে আবার তার পুরানো কর্মস্থান, ক্রুশাডাই দ্বীপে ফিরে যাবে। আমাদের রামেশ্বরমে সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজের সুবিধা হবে বলেই মিঃ চাকো কৃষ্ণ পিল্লাইকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ পিল্লাই চলে যাওয়াতে আমাদের সকলেরই মনে বেশ কষ্ট হল। বেশ লাগত এই লোকটাকে।



রামেশ্বরমে আমরা

রাত প্রায় ১২টার পর আমরা মাদুরা স্টেশনে এসে নামলাম। স্টেশন মাস্টার প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে জায়গা না থাকায় আমাদের সেখানে রাত্রের মত থাকবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারলেন না। কোন উপায় না দেখে আমি এবং জিতেন স্টেশনের কাছের চোলট্রিগুলোতে আজ রাতটা কাটাবার মত স্থান সংগ্রহ করা যায় কিনা, তার খোঁজে বেরলাম। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা—কিছুই জানা নেই। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বলতে গেলে। কোন রকমে একটা চোলট্রি খুঁজে বার করলাম। দারোয়ান আমাদের খাকি পোষাকের দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকিয়ে বলে দিল জায়গা নেই। যাক্‌, এর পরেরটায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানেও দারোয়ান এত রাত্রে এই ধরণের যাত্রী দেখে ইতস্তত করে বলল যে, ম্যানেজার বাইরে গেছে, সে না ফির্‌লে কিছুই সে বলতে পারবে না। আর বৃথা চেষ্টা না করে স্টেশনে ফিরে ব্যাপারটা বললাম। কি করা যায়, স্টেশনের ওপরতলায় রিটায়ারীং রুমের খোঁজে গেলাম। শুনলাম, একটা কামরার ২৪ ঘণ্টার জন্য ভাড়া ২৷৷০ টাকা। আর এতে একজনের বেশী থাকতেও পারবে না। আর কি উপায়, রাত্রের শোবার কথা ছেড়ে দিলেও, আমাদের সঙ্গের জিনিসগুলো ত একটা জায়গায় রাখতে হবে। এই রিটায়ারীং রুমের একটা ২৷৷০ টাকা দিয়ে বন্দোবস্ত করে সব জিনিসগুলো ঘরে এনে জমা করা হল। জিনিসপত্র রাখবার বন্দোবস্ত করার পর একটু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। আবার এত রাত্রে খাবার চেষ্টা দেখতে হবে। সেও এখন মিলবে কিনা সন্দেহ। খোঁজ করে এক বায়স্কোপের সংলগ্ন দোকানে কিছু মাংস আর পরটা দিয়ে সকলে খাওয়া শেষ করল। স্টেশনে ফিরে এসে একটা প্লাটফর্মের নিরিবিলি জায়গা দেখে উন্মুক্ত আকাশের তলায় শুয়ে পড়লাম। এর পরেও দুএক জায়গায় এই রকম স্টেশনে প্লাটফর্মে শুয়েছিলাম—তবে সেটা ইচ্ছা করেই। কারণ, ঘরের চেয়ে এই খোলা আকাশের তলেই ঘুমটা ভাল হত।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি সকলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম—মাদুরার মীনাক্ষীর মন্দির এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার জন্য। দুটো ফিটন গাড়ি ভাড়া করে আমরা প্রথমে মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের উদ্দেশ্য রওনা দিলাম।

এই মাদুরার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে। পাশ্চাত্য দেশীয় ভ্রমণকারীরা এদেশে এলে মাদুরা দেখতে ভোলে না। এর কারণ, মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির তিরুমাল নায়কের প্রাসাদগুলো প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্যস্থান। শহর হিসাবে মাদুরা এমন একটা কিছু না। ছোটখাটো সাধারণ ধরণের শহর। ছোট শহর বলেই বোধ হয় ভ্রমণকারীরা মন্দির এবং ঐ জাতীয় সব জায়গা দেখবার সময় পায়—আর দেখতেও হয়। কারণ, এ ছাড়া ত আর কোন উপায় নেই। সাধারণ দর্শকরা মন্দিরের শিল্পকলা কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, মস্ত একজন সমঝদারের ভাব দেখাবে। কতক্ষণ আর প্রত্যেক স্তম্ভে, দেওয়ালে, খিলানের ওপর কারুকার্য পর্যবেক্ষণ করতে পারা যায়। আর তা করতে হলেই হয়েছে আর কি, সঙ্গে কিছু চাল চিড়ে থাকা দরকার। আর সব খুঁটিয়ে দেখবার কাজটা পুরাতত্ত্ববিদদের জন্যই না হয় তোলা থাক। মন্দির ত নয়, একটা ছোটখাট শহর। এত কি দেখা চলে অল্প সময়ে। কয়েকটা মূর্তি দেখতে ভাল লাগে,

তারপর সব এক ধরণের মনে হয়। ভালমন্দ সব মিলে এক হয়ে যায়। আর এই ভাল মন্দের ঢেউতে অনেক সময় যেগুলো দেখা উচিত ছিল, সেগুলো বাদ পড়ে যায়।

সাধারণ ধরণের পান্ডা কিম্বা গাইড নিলেই হয় এই মুস্কিল। তারা এই অল্প সময়ের মধ্যে বাপ-ঠাকুরদার কাছে শেখা বিদ্যার ঝুলি উজাড় করে দেবেই—সে তার শ্রোতা শুনুক আর নাই শুনুক। এরা যদি দর্শকদের প্রশ্নের শুধু উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত হত, তাহলে বোধ হয় দর্শকরা দর্শন শেষে এদের দক্ষিণা ছাড়াও কিছু বকশীষ দিত। কিন্তু এদের এটা কোন দিনই খেয়াল হবে না—গতানুগতিক ব্যাপার কিনা।

গাইড যারা হয়, তাদের ভাল রকম হিন্দি আর চলনসই ইংরেজী জানা দরকার, তাহলে দু'পক্ষেরই সুবিধা হয়। অনেক জায়গায় পান্ডা অথবা গাইড এমন সব জুটত যে, কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারছে না। এরা এদের দুর্বোধ্য ভাষায়, যেটা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হলেও এদের কাছে সহজবোধ্য, আমাদের কিছু বলবার কিম্বা বোঝাবার চেষ্টা করে চলেছে, আর আমরা মাতৃভাষা দিয়ে আরম্ভ করে, ভাঙ্গা হিন্দি, ইংরেজী, শেষকালে মূক-বধিরের ভাষা, অর্থাৎ হাতমুখের ভঙ্গী করে আমাদের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেও শেষ কালে হার মেনে চুপ করে যেতাম। কিন্তু তাতেও কি নিষ্কৃতি ছিল—সে তখন তার ভাষায়, সেটা সুশ্রাব্য কি অশ্রাব্য, তা বলতে পারি না, বলে চলেছে—আর আমরা উপায় না দেখে বোকার মত মাথা নেড়ে চলেছি।

এদিকে আবার মাথা নাড়ার মধ্যেও মুস্কিল আছে। এদের মাথা নাড়ার ভঙ্গী দুই ধরণের। এরা এক ধরণের মাথা নেড়ে এদের অসম্মতি প্রকাশ করে, আর এক ধরণের মাথা নেড়ে সম্মতি কিম্বা ব্যাপারটা যে বোধগম্য, সেটা প্রকাশ করে। প্রথম দিকটায় এই দু' ধরণের মাথার আন্দোলনের ব্যাপারটা জানা না থাকলে মনে হতে পারে যে, লোকটা সব সময়ই মাথা নেড়ে তার অসম্মতি জানাচ্ছে। একটু অদ্ভুতই মনে হয়। কারণ, এদের সম্মতির সবন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা প্রশ্ন করলাম, আর সে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে—এটা কি? আসলে কিন্তু মাথা নেড়ে সে তার সম্মতিই জানাচ্ছে।

তখন প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়ি। মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে একটি ছাত্র আমাদের ক্লাশে এসে ভর্তি হল। একদিন ক্লাশে অধ্যাপক, একটা লেকচারের পর আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি কিনা, জানতে চাইলেন। আমরা জানালাম যে, আমরা সবটা বুঝতে পেরেছি। তখন তিনি মাদ্রাজী ছাত্রটিকে আলাদা করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে বুঝতে পেরেছে কি না। ছাত্রটি মুখে কিছু না বলে সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে লাগল। সে বুঝতে পারেনি মনে করে অধ্যাপক তাকে প্রশ্ন করলেন যে, কোন্ অংশটা সে বুঝতে পারেনি। সে তখনও মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে লাগল। অধ্যাপক মহাশয় এবার একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করলেন যে, সবটাই কি সে বুঝতে পারেনি। সে এবার সেই রকম মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর করল যে, সমস্তটাই সে বুঝতে পেরেছে। অধ্যাপক তখন তাকে প্রশ্ন করলেন যে, যদি সে বুঝেই থাকে, তবে মাথা নাড়ছে কেন? এবার বোধ হয় সে ব্যাপারটা বুঝল। তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে তাদের দু'রকমের মাথা-নাড়ার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। আমরা সেদিন তখনকার মত কোন রকমে আমাদের হাসি চেপে রেখে তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। অধ্যাপকের মুখের ভাব দেখবার সুযোগ হয় নি, কারণ তখন তিনি আমাদের দিকে পিছন ফিরে বোর্ডে আর একটা কি বোঝাবার উপক্রম করছিলেন।



পরিক্রমার ছাদের উপরে নক্সা

দাক্ষিণাত্যের বড় বড় শহর-গুলোতে গাড়ির চালক, কুলি এবং সাধারণ লোকেরা একটু আধটু ইংরেজী বোঝে এবং যা জানে, তাতে কোন রকমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সেইজন্য বড় বড় শহরগুলোতে আমরা ভাষার অসুবিধা খুব বোধ করি নি; কিন্তু শহর ছেড়ে ভেতর দিকে ভ্রমণের সময়ই সবচেয়ে মুস্কিল হত। কারণ কেউ কারো ভাষা বুঝত না। যাক্, আমাদের ভাষা বিভ্রাটের অভিনয় উপভোগ করার জন্য কোন দর্শক জুটত ন—এইটেই যা আমাদের সুবিধা।

ক্রমশ

মন্দাকিনী

কুমারী ঊষা মিত্র

শিশিরস্নাত হেমন্ত প্রভাত। ছোট গ্রাম্য স্টেশন, তারি একধারে পাল্কীর ভিতর বসে মন্দাকিনী ও তার মা অন্নপূর্ণা। মায়ের চোখ দুটি অশ্রু-বাষ্পে আচ্ছন্ন। মন্দাকিনী পাল্কীর দরজা একটুখানি খুলে তার চঞ্চল নয়নের ব্যগ্র দৃষ্টিখানি পাঠিয়ে দিয়েছে, বিশ্ব-সংসারের অন্বেষণে। আজ সুখ ও দুঃখ একসঙ্গে তার অন্তরকে দোলায়িত করছে। এই ষ্টেশন ওদের বাড়ি থেকে ক্রোশ দুই মাত্র ব্যবধান। তবু এই সতেরো আঠারো বছরের জীবনে এই ওর প্রথম এখানে আসা। বন্ধুদের কাছে স্টেশনের গল্প, ট্রেনের গল্প কতবার সে শুনেছে, আর মনে মনে আশা করেছে সে-ও একদিন এই ট্রেনে করে অনেক দূর পথে যাত্রা করবে। আজ সেই অভিলষিত দিনটি একদিকে মুক্তির আনন্দে পূর্ণ করে দিচ্ছে তার মনটিকে, অন্যদিকে আজন্ম পরিচিত এই গ্রামটির সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথা তাকে ব্যাকুল করছিল।

অন্নপূর্ণা ভাবছিলেন বছর সাত আগে যেদিন মন্দাকিনীকে অপরের হাতে অর্পণ করে তিনি চোখের জল মুছেছিলেন, সেই দিনের কথা। মন্দাকিনী তাঁর একমাত্র সন্তান। তাকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠিয়ে কষ্ট তাঁর খুবই হয়েছিল, কিন্তু সে কষ্টের মধ্যেও তাঁর ছিল নিশ্চিন্ততা ও শান্তি। মন্দাকিনীর শ্বশুরবাড়ি ছিল তাঁদের গ্রামের এত কাছে যে, মেয়ের খবর পাওয়া বা মাঝমাঝে দেখা করা সহজেই হয়। কিন্তু ও-বিষয় বেশী দিন তাঁকে চিন্তা করতে হয়নি। বিয়ের বছরখানেক পরেই মন্দাকিনী আবার তাঁর কাছে ফিরে এলো চিরদিনের জন্য।

(২)

কাকা ডাকলেন,—"মন্দাকিনী, বেরিয়ে এসো, গাড়ি ছাড়বার আর বেশী দেরী নেই।" মন্দাকিনী ত্রস্তে কাকার ডাকে পাল্কী হ'তে বার হ'য়ে এলো। তার পিছনে ধীরে মৃদুপদে এসে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা।

গাড়িতে সেদিন ভীড় বেশী ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর একখানি কামরার একধারে মা ও কাকার সঙ্গে মন্দাকিনী এসে বসল। এই তার চিরপ্রার্থিত দূরযাত্রা। কাকা সান্ত্বনার স্বরে বলে চলেছেন—"গ্রাম ছেড়ে কখনও তোমরা কোথাও যাওনি, প্রথমটা একটু কষ্ট হবে, তা' সেখানে পৌঁছে গেলে সে সব কষ্ট বেশী দিন থাকবে না। বাঙালীর মেয়ের কাশীবাসের চেয়ে সুখ আর কি আছে, কি বল?" বলে তিনি অন্নপূর্ণার দিকে চাইলেন। অন্য-মনস্কভাবে অন্নপূর্ণা বললেন—"তা' ত বটেই।" মন্দাকিনী কিন্তু খুব মন দিয়ে কাকার কথা শুনছিল। কাশীর বিষয় নানা প্রশ্ন করে সে তাঁকে অস্থির করে তুলল। এবার ট্রেন ছাড়তে সত্যই আর দেরী নেই, যাত্রীদের সকলকে সচকিত করে গাড়ির গতি সুরু হ'ল। কাকা এখন বলে চলেছেন—কাশী পর্যন্ত আমি অবশ্য তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না, কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত ত' যাচ্ছি। তারপর আমাদের গ্রামের সেই ঘোষমশায়দের সঙ্গে তোমাদের তুলে দিয়ে আসব। কষ্ট কিচ্ছু হবে না। আর ওদের বোন তো পঁচিশ বছর প্রায় সেখানে রয়েছেন, তিনি তোমাদের সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" অন্নপূর্ণা এইবার একটু উৎসাহিত হ'য়ে বললেন—"শুনেছি তিনি বড় ভাল।" মন্দাকিনীর কানে কিন্তু এসব আর কিছু প্রবেশ করছিল না। ব্যাকুল দু'চোখ মেলে সে চেয়েছিল ক্ষণে ক্ষণে বিলিয়মান গ্রাম-পথটির দিকে।

(৩)

সন্ধ্যাবধূর আঁচলখানি অস্তরবির আবিররাগে রঙ্গীন হয়ে উঠেছে, গঙ্গার গেরুয়া জল ঝল্‌মল্‌ করছে তারই আভায়। স্বপ্ন-ময় তৃপ্তিভরা দুটি চোখে নির্নিমেষ দৃষ্টি গঙ্গার বুকে নিবদ্ধ করে ঘাটের সিঁড়ির একটি প্রান্তে বসেছিল মন্দাকিনী। এমনি কর্মকোলাহলহীন মধুর সন্ধ্যা আরও কত শতবার তার জীবনের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু আর কখনও মন্দাকিনীর অন্তর তাকে এমন ক'রে উপলব্ধি করেছে? চুপ করে বসে সে এই কথা ভাবছিল। ঐ যে মন্দিরে মন্দিরে আরতির ধ্বনি, সামনে চির-কলতান উদার গঙ্গার জলকলোচ্ছ্বাস, অগণ্য তীর্থযাত্রীর আনন্দ-মুখর কণ্ঠস্বর—সব মিলে আজ অধিকার করে নিয়েছে ওর সমস্ত মনখানিকে। বিশাল বিশ্বের প্রতি কণা আজ ওর কাছে সত্য সুন্দররূপে প্রকাশিত। শুধু তার মাঝখানে ও হারিয়ে ফেলেছে ওর ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী দিয়ে ঘেরা মন্দাকিনীকে। মাস কতক আগে যেদিন সে প্রথম পথে পা বাড়িয়েছিল গৃহ ছেড়ে, সেদিন ওর মনের মধ্যে ছিল অজানা সুখের কল্পনা; বাস্তব জীবনে ছিল চিরপরিচিতের বিচ্ছেদ-ব্যথা। জীবনে কোনখানে যে এত সুধা সঞ্চিত আছে, তা' ছিল সেদিন তার কাছে স্বপ্নেরও অতীত। এখানে এসে তারা যে অন্ধকার ছোট ঘরখানিকে আশ্রয় করেছে, মোটেই সেটিকে সুন্দর বলা যায় না। তা'ছাড়া আরও অনেক অভাব অভিযোগ তার নিত্যকার জীবনের সঙ্গী, কিন্তু সে সবই আজ যেন তার কাছে অবাস্তব, অনিত্য বলে বোধ হয়। নিত্য আজ প্রত্যক্ষরূপে ধরা দিয়েছে তার হৃদয়ে। এমনি আরও সে কতক্ষণ হয়তো চুপ করে বসে ভাবত; কিন্তু পিছন হ'তে পিঠের উপর কার হাতের স্পর্শ তাকে চকিত করে দিলে। মুখ ফিরিয়ে হেসে সে বলল—"গৌরী!"

(৪)

ওদেরই বাড়ির উপরতলায় অপেক্ষাকৃত ভাল একখানি ঘর নিয়ে থাকে গৌরীরা। ভাগ্যের দিক দিয়ে সে মন্দাকিনীর প্রায় সমান। অবশ্য বিধবা নয়, কিন্তু স্বামী তাকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ তার সঙ্গে রাখেন নি। বয়সেও গৌরীর মন্দাকিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল অনেকখানি। অবশ্য অবস্থা মন্দাকিনীর চেয়ে গৌরীর কিছু ভাল। বাড়ি থেকে মন্দাকিনীদের যে সাহায্য আসে, এরই মধ্যে তা' অনিয়মিত হ'তে সুরু করেছে। কাকা যদিও অনেক আশ্বাস দিয়েছিলেন, আসবার সময়, কিন্তু এখন মন্দাকিনীর ভয় হয়, তাঁর সে আশ্বাস হয়ত ভিত্তিহীন। তবু সে চিন্তা করে না। যে আনন্দধারা আজ তার দেহমনকে পরিপ্লুত করেছে, তার কাছে দৈনন্দিন জীবনের এ সকল ক্ষুদ্র অনুভূতি তুচ্ছ হ'য়ে যায়। গৌরী তার অভিভাবকদের কাছ হ'তে যে সাহায্য পায়, তা' তার পক্ষে পর্যাপ্ত।

(৫)

অন্নপূর্ণা ডাকলেন—'মন্দাকিনী!' অন্ধকার ঘরের এক কোণে মিট্‌ মিট্‌ ক'রে একটা কেরোসিনের আলো জ্বলছিল, তারই আলোয় বসে একখানা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে করতে মন্দাকিনী উত্তর করল—"কি মা?" মা বল্লেন, "আজও তো দেশ থেকে টাকা কি চিঠি কিছুই এলো না।' মন্দাকিনী মাথা নীচু করে হাতের সেলায়ের দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বলল, "কি জানি, ওরা বোধ হয় আর চিঠিপত্র কিছুই দেবে না, টাকা ত দূরের কথা।" মা বল্‌লেন, 'কিন্তু এমন ক'রে আর কদিন চলে, ধার দেবার লোকও তো ওই গৌরী ছাড়া আর কেউ নেই। ওরই বা অবস্থা এমন কি ভাল। মন্দাকিনী স্থিরভাবে বলল, 'না মা, এমন করে সত্যই আর চলে না, উপায় একটা আমাদেরই দেখ্‌তে হবে।" অন্নপূর্ণা অধীর-ভাবে বল্‌লেন, "কিন্তু উপায় আমরা কি দেখ্‌তে পারি যাঁরা আমাদের সর্বস্ব নিয়ে অনেক আশা দিয়ে কাশীবাস করতে পাঠিয়ে-ছিলেন, তাঁদের কি করবার কিছু নেই!" মন্দাকিনী আগেরই মতন স্থিরভাবে বলল, "কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য পালন না করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে করবার তো কিছু আমাদের নেই; সে পথ আমরা

নিজেরাই বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।' কথার মাঝখানে বাধা পড়ল হঠাৎ গৌরীর আগমনে। স্নিগ্ধ স্মিত তার মুখের দিকে চেয়ে, মন্দাকিনীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, অন্নপূর্ণার তিক্ত মনও কোমল হ'য়ে এলো। একটু ইতস্তত করে' গৌরী বল্‌ল, 'কাল একটা ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ আছে, ব্রাহ্মণীরাও কেউ কেউ যাবে।' একটু থেমে আবার বল্‌ল—'যাবে তোমরা? তাঁরা আমার চেনা লোক।' মন্দাকিনী মনে মনে ভাব্‌লে ভগবান যদি এইভাবে একটা দিনের সংস্থান ক'রে দেন, আপত্তি করবার আর কি আছে। মুখে বল্‌লে, "যাব নিশ্চয়।" অন্নপূর্ণা অন্যমনস্কভাবে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

(৬)

মাথার উপরে প্রখর সূর্যালোক, পায়ের নীচে রৌদ্রতপ্ত পথ, ক্ষিপ্রপদে মন্দাকিনী চলেছিল বাড়ির দিকে। কাঁধের উপর ভিজা কাপড়, ভিজা চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, হাতে জলের কলসী। গঙ্গার ঘাট হ'তে ওদের বাড়ি বেশী দূর নয়, মিনিট কয়েক পরে ও এসে থাম্‌ল দরজার সামনে। বাড়িখানার চেহারা দেখে মনে হয় কখন বুঝি কার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। তবু তার ভিতর বাস করে মানুষ। একটি দুটি নয়, বিভিন্ন পরিবারের পাঁচ সাতটি প্রাণী এরই ভিতর এসে নীড় বেঁধেছে। ওরই নীচের তলায় খান দুই ঘর নিয়ে বাস করে মন্দাকিনী ও তা'র মা। প্রথম তারা কাশীতে এসে যে বাড়িতে উঠেছিল, কয়েকমাস হ'ল সেখান থেকে এই বাসায় চলে এসেছে। সে বাসা ছেড়ে আসার জন্য আর কোন দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু তাদের দুর্দিনের সাথী গৌরীকে ছেড়ে।

(৭)

আগের মত প্রতিদিনের অন্নচিন্তা আর তেমন ক'রে মন্দাকিনীকে করতে হয় না। দেশ থেকে যদিও টাকা আর আসে না কোনদিন, কিন্তু দুর্ভাবনার নিবৃত্তি সে করেছে অন্য পথে। প্রথমে গৌরী তাকে একটি কাজ ক'রে দিয়েছিল, একজন বৃদ্ধার চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি। কিন্তু তা'তে তার অভাব মেটা সম্ভব হয়নি। আরও দু'চার রকম চেষ্টার পর সে এক বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছে। অবসর সময়ে অন্য ছোটখাটো কাজ ক'রেও সে সামান্য কিছু উপার্জন করে।

(৮)

মন্দাকিনী দরজায় কড়া নাড়তে ভিতর হ'তে আর একটি বিধবা এসে দরজা খুলে দিল। শঙ্কিতকণ্ঠে মন্দাকিনী প্রশ্ন করল, 'মা এখন কেমন আছেন?" মেয়েটি বল্‌ল—"জ্বর বেশী বলেই মনে হচ্ছে, চলনা ঘরে।" হাতের কলসী ও ভিজা কাপড় ঘরের একধারে নামিয়ে রেখে মন্দাকিনী মায়ের জ্বরতপ্ত কপালের উপর হাত রেখে ডাক্‌ল—'মা'! চোখ মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিতস্বরে মা বল্‌লেন, "এত বেলায় চান করে এলি, রান্নাখাওয়া কখন হবে?" হেসে সে উত্তর করলে, "আজ তো আর রান্নাখাওয়ার দরকার নেই মা, আজ যে একাদশী।"

(৯)

আরও বছর দুই চলে' গিয়েছে। দুঃখে সুখে বিজড়িত দিনগুলি। ক্রমশই এই জীবনের মধ্যে মন্দাকিনী বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। কষ্ট আর বিশেষ বোধ হয় না। অন্নপূর্ণার শরীর কিন্তু দিনে দিনে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। দেহ বা মনে কিছুতেই তাঁর বর্তমান অবস্থাটা সহ্য করবার মত শক্তি ছিল না। মন্দাকিনী প্রায়ই বাড়ি এসে দেখে মার অসুখ, ফলে তার কাজের ত্রুটী হয়ে যায়। ক্রমে এমন একদিন এল যেদিন তার মনিব জানিয়ে দিলেন, তিনি নূতন লোক রাখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন। কাজ না থাক্‌লে একটা দিনও উপায় নেই। মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি করে' একটা কাজের ঠিক করে নিল। এটা বাসন মাজার কাজ। বছর কতক আগে যখন সে গ্রামে ছিল, তখন কল্পনাতেও আন্‌তে পারেনি, কুলিন ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হ'য়ে কোনদিন তাকে অপরের বাড়ি বাসন মাজতে হবে। কিন্তু আজ সবই সম্ভব। মন্দাকিনীর সেজন্য দুঃখ কিছু নেই। শ্রমজীবি শ্রেণীতে একবার যে নেমে গিয়েছে, কোন শ্রমকেই আর সে ভয় করে না। মান মর্যাদারই বা কি প্রয়োজন? তা'ছাড়া যে বাড়িতে সে কাজ নিয়েছে তাঁরাও ব্রাহ্মণ।

(১০)

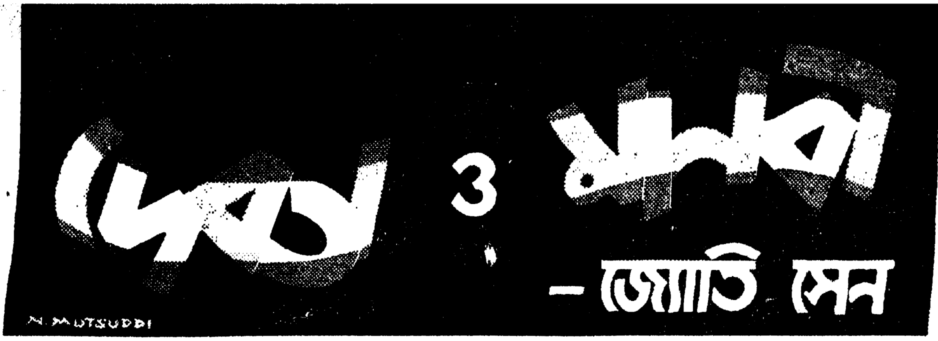
"শারদ দিনের কনক আলোতে কিবা ছবি ঝলমল,
অমৃত যুগের পূজো উপচার হেম চম্পক দল।"

বিশ্বনাথ মন্দিরের সোনার চূড়ায় শরতের নির্মল রবিকর এসে পড়েছে। জলস্থল আনন্দের কলোচ্ছ্বাসে পূর্ণ—মণিকর্ণিকার ঘাটে চিতার উপর অন্নপূর্ণার দেহ শুইয়ে দিয়ে মন্দাকিনী তার ডাগর চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিতে শেষবার চাইল মা'র মুখের পানে। আজ সকল চিন্তার অবসান; সমস্ত শঙ্কা, সমস্ত উদ্বেগ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর পর সে কি করবে, আর ভাববার ক্ষমতা তার নেই। মা'কে অবলম্বন করে এই দুঃখময় দিনগুলি তার কেটেছে, আজ শত চেষ্টাতে আর একটি মুহূর্তও তাকে ধরে রাখতে পারবে না। অনাটন অবশ্য আজকাল তাদের বিশেষ ছিল না, কারণ অভাব বোধ অনেকটা কমে গিয়েছিল। তা ভিন্ন তার মধুর স্বভাবের জন্য কাশীধামে অনেকে তা'কে সাহায্য করেছেন। এইটুকুই তার সান্ত্বনা—মা'র শেষ দিকটা চিকিৎসা, পথ্য প্রভৃতি কোন ক্ষেদ সে রাখে নি।

(১১)

"কাননে প্রাসাদ চূড়ে নেমে আসে রজনী"—ঠিক এমনি সময়টিতে মন্দাকিনী বসেছিল গঙ্গার ঘাটে, সেখানটিতে কয়েকদিন আগে তার মাকে শেষ শয্যায় তুলে দিয়ে গিয়েছে তারই একান্ত কাছে। প্রথম কাশী আসার পর কত নীরব সন্ধ্যা এমনি করে সে গঙ্গার ঘাটে কাটিয়ে গিয়েছে, কত না মধুর সে সব দিনের স্মৃতি। আজ সব স্বপন, সবই ছায়া। মন্দাকিনীর মনে হইল গৌরীর কথা। কাল সে এই সময়টিতে তার কাছে এসেছিল। আজ সমস্ত দিন একবারও দেখা হয়নি। অন্যমনস্কের মত মন্দাকিনী উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বেশী দূর তাকে যেতে হ'ল না; হঠাৎ পথের মাঝে গতি তার থেমে গেল। কলরব করে একদল যাত্রী চলেছে দেব-দর্শনে, ঠিক সামনের মানুষটিকে এই স্বল্প আলোতেও চিনে নিতে মন্দাকিনীর দেরি হ'ল না। অপ্রত্যাশিত এই যে দেখা, মন্দাকিনী কিছু ভাববার আগেই আনন্দে বেদনায় চিৎকার করে ডাকল, 'কাকা!' প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় কাকা বাস্তবিকই মন্দাকিনীকে চিনতে পারেন নি, কারণ পরিবর্তন হয়েছিল তার অনেকখানি। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কানে আসতে চিনতে তাঁরও দেরি হ'ল না। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই যে মেয়েটা সহসা আজ তার সামনে মূর্তিমতী বাধার মত তাঁর সান্ধ্যভ্রমণের আনন্দের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, এর জন্য তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন। মন্দাকিনীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিল তার কাকার দিকে। তাঁর পায়ের জুতোটি হ'তে মুখের পানের রেখাটি পর্যন্ত কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। মাত্র দশটা দিনের অশৌচ, সেটা পালন করতে এতই কি কষ্ট হ'ত! ইহলোকের আবশ্যকে মা ত' ওদের কাছ থেকে কিছুই পাননি, তার জন্য মন্দাকিনী কোনদিন দুঃখ করেনি। নিজের সকল শক্তি দিয়ে তাঁর অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করেছে শুধু। কিন্তু গোত্রান্তরা কন্যা সে,—তিন দিনের বেশী আর কিছুই তার পালন করবার নেই। পরলোকের পাথেয় বলে পুত্রহীনা অন্নপূর্ণা যে তাঁর স্বামীর সহোদর ভায়ের কাছ হ'তে নিশ্চিত নির্ভয়ে একটুখানি আশা করেছিলেন, তা থেকেও যে তাঁরা তাঁকে অনায়াসে বঞ্চিত করলেন; এই নির্মম ব্যবহার মন্দাকিনীকেও আঘাত করল কঠিনতম। এইবার তার চোখে পড়ল কাকার পিছনে কাকীমা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা, বেশভূষার ত্রুটি কারও হয়নি।

নিজের সমস্ত শক্তি এক করে চিরসহিষ্ণু মন্দাকিনী দৃঢ়বলে আপনাকে সংযত করে নিল। কোন অনুযোগ, অভিযোগ জানাবার প্রবৃত্তি তার আর রইল না। স্থির হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, দেউলের পাষাণ প্রতিমার মতই অবিচল।



১৯

কারখানা বাড়িতে যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদের খোঁজ লইবার জন্য বৈকালে জয়ন্ত পদ্মাকে লইয়া হাসপাতালে গিয়াছিল।

দুর্ঘটনার ফলে একজন মরিয়াছে, একজনের একখানি পা একেবারে গিয়াছে, আর একজন সারিয়া উঠিতেছে। যাহার পা-খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে জয়ন্তকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জয়ন্ত তাহাকে সান্ত্বনা দিবে কি, তাহার নিজেরই দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চিরজীবনের মত যে অকর্মণ্য হইয়া গেল, তাহার ক্ষতি অপূরণীয়। তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ারও কিছু নাই। জয়ন্ত সমবেদনার সহিত বলিল—'তুমি ভেব না ভাই, যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমার খাওয়াপরা সবই আমি দেব। তোমার পরিবারের ভরণপোষণ আমিই করব।'

মজুরটি বিলাপ করিয়া বলিল—'আমার পা যে জন্মের মত গেল হুজুর,—পা ত আর ফিরে পাব না। সারা জীবন খোঁড়া হয়ে থাকব!'—এই বলিয়া সে পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার পাশের বিছানা হইতে অপর মজুরটি বিরক্তির সহিত বলিল—'আরে রোও মাৎ। মজদুরকা হাল্লৎ এহি হ্যায়!'

লোকটি ঠিকই বলিয়াছে। শ্রমিক জীবনের এই ত পরিণাম! ইহাই হইয়া থাকে। আজ শরীর কর্মঠ আছে—খাটিয়া খাইতেছে; কাল যেই সে অকর্মণ্য হইয়া পড়িল, অমনি তার হাতে ভিক্ষাপাত্র উঠিল। ব্যস্।

সেখানে আর দেরী না করিয়া জয়ন্ত পদ্মাকে লইয়া মৃত মজুরের শোকার্ত পরিবারবর্গের সহিত দেখা করিবার জন্য তাহার বাড়ির দিকে চলিল।

জয়ন্ত মজুরটিকে ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পদ্মা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়াই সে জয়ন্তকে বলিল—'অতগুলো লোকের ভরণপোষণের ভার কি জন্যে তুমি নিলে?'

পদ্মার প্রশ্নে জয়ন্ত বিরক্ত হইলেও, সহজভাবেই কহিল, —'ওর অবস্থাটা ত নিজের চোখেই দেখলে! কি করে ও রোজগার করবে—আর কি করেই বা পরিবার প্রতিপালন করবে?'

—'আমার জন্যে দুটো টাকা খরচ করতে হলে তোমার ওজর আপত্তির অন্ত থাকে না, তখন তুমি অপব্যয় অপচয় কত কথাই বল। আর এর বেলা তুমি জলের মত টাকা খরচ কর, এ সময় অপব্যয় অপচয়ের কথা তোমার মনে থাকে না।'

—'তুমি কি বলছ পদ্মা! সর্বহারার সঙ্গে পৃথিবীতে কারুর দুঃখের তুলনা হয়? তোমার দুঃখটা কি?—বিলাসিতা করতে পারো না—এই ত? কিন্তু মানুষ অনাহারে থাকবে ক্ষুধার জ্বালায় খাক্ হয়ে যাবে—আর তুমি শাড়ী, গয়না আর গাড়ি নিয়ে লোকের চোখ ঝল্‌সে দেবে—তাতে তোমার লজ্জা করবে না?'

পদ্মা মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'তোমার মত বড়লোকের স্ত্রী হয়ে আমি যে দীনদুঃখিনীর মত থাকি, এতে তোমার লজ্জা করে না?'

জয়ন্ত দৃঢ় ও দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—'না, তাতে আমি মোটেই লজ্জাবোধ করি না। যতদিন পর্যন্ত এ দেশে একটি দীনদুঃখীও আছে, ততদিন আমিও নিজকে দীনদুঃখী বলেই মনে করব, দীনদুঃখীর মতই থাকব।'

দারিদ্র্যের সঙ্গে পদ্মার পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহার দংশন যে কি, সে অভিজ্ঞতা তাহার আছে। পদ্মা আর ইহার পর বাদপ্রতিবাদ করিল না।

অনেকক্ষণ বাদে তাহারা বড় রাস্তা ছাড়িয়া ইণ্টালি অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। বৃষ্টির জলে রাস্তায় কাদা হইয়াছে—কোথাও পা পড়িলে জল-কাদা গায়ে ছিট্‌কাইয়া যায়, কোথাও বা জুতাসুদ্ধ পা আটকাইয়া থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জায়গা দেখিয়া পা ফেলিবারও উপায় নাই। চলিতে চলিতে জয়ন্ত ও পদ্মা জলে কাদায় ধুতি ও শাড়ী ভিজাইয়া ফেলিল। গন্তব্যস্থান তখনও অনেক দূর।

এমনি করিয়া গলির ভিতরে গলি তার ভিতরে গলি, ক্রমাগত গলি পার হইয়া তাহারা বস্তির মধ্যে ঢুকিল।

দুই পাশে খোলার বাড়ি। কোন কোনটিকে বাড়ি না বলিয়া খোঁয়াড় বলিলেও চলে। তা-ও জীর্ণশীর্ণ। যে-কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ইহার মধ্যে মানুষ কি করিয়া বাস করে, তাহাই আশ্চর্য। অথচ লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু খোঁয়াড়ের মত অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন খোলার বাড়িতেই মাথা গুঁজিয়া থাকে। এখানেই রান্নাবান্না, এখানেই খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা-শোওয়া,—এখানেই সব।

বস্তির খোলা নর্দমায় জল জমিয়া রাস্তা ভাসিয়া গিয়াছে। নর্দমার যত জঞ্জাল রাস্তায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এক ঝাঁক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে বাচ্চা বাচ্চা ব্যাঙের মত নর্দমার জলে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া খেলা করিতেছে—ব্যাঙাচির মত

দাঁতার কাটিতেছে। ইহাদের যেন দেখিবার কেহ নাই কিংবা দেখিয়াও হয়ত কেহ দেখে না। সারাদিন খাটিয়াখুটিয়া ইহাদের বাপ-মা বোধ করি এই ঝঞ্ঝাট পোহাইবার মত ধৈর্য হারাইয়া পিতামাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত ছেলেমেয়েগুলিকে পয়সার লোভ দেখাইয়া কর্দমার জল হইতে উঠাইয়া আনিল এবং হাতে হাতে আনি, দুআনি, সিকি এমন কি টাকা ও আধুলি দিয়া যার যার বাড়ি পাঠাইয়া দিল।

অদূরে একটা র'কে বসিয়া জনকয়েক লোক গাঁজার আয়োজন করিতেছিল, তাহারা এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া কৌতূহল ও লোভের বশবর্তী হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যে ব্যক্তি অবলীলাক্রমে টাকা ছিটাইতে পারে, সে যে অনেক টাকার মালিক এবং অনেক টাকাই তার পকেটে থাকে, ইহা কে না বোঝে! লোকগুলি জয়ন্ত ও পদ্মাকে ঘিরিয়া এমন-ভাবে দাঁড়াইল যে, তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া পদ্মা ভয় পাইয়া জয়ন্তকে একরকম জড়াইয়া ধরিল।

জয়ন্ত পদ্মার হাতে একটা চাপ দিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল—'ভয় নেই।'

জয়ন্ত পদ্মাকে অভয় দিলেও মনে মনে বুঝিয়াছিল—ভয় করিবার মত কারণ যে না আছে তা' নয়। কিন্তু ভয়ের কারণ যতই হোক্ সাহসও তার তেমনি দুর্জয়। এই কয়টি লোককে সে খালি হাতেই ফিরাইতে পারে। তা'ছাড়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য তার সঙ্গে অস্ত্রও আছে, সেই অস্ত্রের সমুখে দাঁড়াইবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

একটি লোক আরও একটু অগ্রসর হইয়া জয়ন্তের একেবারে গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—'এ বাবু, পাকিটে কি আছে দিয়ে দাও।'—এই বলিয়া সে নিজেই জয়ন্তের পকেটে হাত দিল।

জয়ন্ত তাহার হাত সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিল—'খবরদার।'

—'ক্যা? তুম্ নেহি দেওগে?'

—'জবরদস্তি মাৎ করো। কুছ্ নেহি মিলেগা।'

আরও জনা দুই লোক কাছে আসিয়া ভালমানুষের মত বলিল—'আরে দে দেও বাবু, দে দেও। ফজুল বে-ইজ্জতি হো যায়গা।'

জয়ন্ত শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বলিল—'কোই একঠো আঙ্গলি ভি উঠায়গা তো উস্কো জান্ চলা যায়গা।'

পদ্মা ভয়ে ভয়ে বলিল—'কেন হাঙ্গামা বাঁধাবে—দিয়ে দাও না, কত লোককেই ত তুমি কত টাকা দাও।'

জয়ন্ত মাথা নাড়িয়া বলিল—'না। গরীব দুঃখীকে দেওয়া আর গুন্ডা বদমায়েস্কে দেওয়া এক কথা নয়।'

—'হাঁ হাঁ—ঠিক বাৎ, গুন্ডা-বদ্মাস্ ভিখ্মাঙ্গা নেহি হ্যায়'—এই বলিয়া প্রথমকার লোকটি জয়ন্তকে আক্রমণ করিল।

জয়ন্ত একটু পিছনে হটিয়া কায়দামত লোকটিকে এমন জোরে এক লাথি দিল যে, লোকটি একেবারে ডিগবাজি খাইয়া ড্রেনের জলে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

জয়ন্তের বিক্রম দেখিয়া কেহ কেহ ভয় পাইল, আবার কেহ কেহ বা মরিয়া হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। জয়ন্ত কৌশলে লোক দুটিকে ধরিয়া একজনের দিকে আর একজনকে ছুড়িয়া মারিল। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দুইজনে মুহূর্তমধ্যে ধরাশায়ী হইল। যাহারা ভয়ে ভয়ে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

গোলমাল শুনিয়া আশপাশের খোলার ঘর হইতে লোক-জন বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের কেহ কেহ জয়ন্তকে চিনিতে পারিয়া সেলাম করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। একটি মাতব্বর গোছের লোক কাছে আসিয়া সেলাম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছে হুজুর?'

—'এই ত—এই আর কি'—বলিয়া জয়ন্ত তাহার আততায়ীদিগকে দেখাইয়া দিল।

লোকগুলি জলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়া ভূতের মত মূর্তি ধারণ করিয়াছে। দেখিলে হাসি পায়।

ইহাদের দুর্দশা দেখিয়া জয়ন্তের দুঃখই হইতেছিল।

নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মনুষ্যত্ব যখন মরিয়া যায়, তখনই মানুষ দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে, তখনই চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করিবার মত হীন প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। এই সব হতভাগাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া চুরি, ডাকাতি বা রাহাজানির প্রশ্রয়ও দেওয়া যায় না, অথচ ইহাদিগকে কঠোর দণ্ড দিয়াও লাভ নাই, তার ফলে ইহারা আরও অধঃপাতে যায়।

লোকগুলি জল-কাদা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাতব্বর গোছের লোকটি উহাদিগকে ধমকাইতে লাগিল। হিন্দুস্থানী ভাষার অসংখ্য ও অকথ্য গালাগালি অসঙ্কোচে তাহার মুখ হইতে সমানে ছুটিল। লোকগুলি নির্বিবাদে গালাগালি হজম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

পদ্মা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলে সে হয়ত মূর্ছিত হইয়া পড়িত। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া জয়ন্তকে বলিল—'চল, বাড়ি ফিরে যাই।'

জয়ন্ত অনুনয় করিয়া কহিল—'আর একটু সবুর কর, আর বেশী দেরী হবে না। এত কষ্ট করে এত দূর এসেছি—কাজটা শেষ না করে বাড়ি ফিরে যাব?'

মাতব্বরটি জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় যাবেন হুজুর?'

জয়ন্ত কহিল—'গোলাম হোসেনের বাড়ি।'

—'সে ত মারা গেছে।'

—'হ্যাঁ, সে ত মারা গেছে। তার কে কে আছে?'

মাতব্বর বলিল—'তার বিবি ত নেই, বাচ্ছা ছেলে একটা আছে।'

জয়ন্ত সমবেদনার সহিত কহিল—'আহা, বেচারা! চল বাচ্চাটাকে দেখে আসি।'

'চলুন!'—বলিয়া মাতব্বর লোকটি জয়ন্ত ও পদ্মাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তামাসা দেখিবার জন্য যাহারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও অনুসরণ করিল।

গোলাম হোসেনের বাড়ির কাছে গিয়া মাতব্বর ডাকাডাকি করিতেই একটি বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া বৃদ্ধা বাচ্চা ছেলেটিকে বাহিরে আনিয়া মাটিতে বসাইয়া দিল।

মাতৃহীন শিশু। অযত্নে মানুষ হইতেছে। শরীরে শুধু হাড় কয়খানি ও চামড়ার একটা আবরণ ছাড়া যেন আর কিছু নাই। তাহার ভাবভঙ্গী একেবারে বৃদ্ধের মত। সে যেন জন্মের পূর্বেই তাহার শৈশব হারাইয়াছে।

জয়ন্ত আদর করিয়া ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল এবং পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহার দুই হাতে দুটি টাকা দিল। টাকা দুটি হাতে লইয়া গম্ভীরভাবে সে একবার পর্যবেক্ষণ করিল, তারপর তেমনি গম্ভীরভাবে জয়ন্তের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

জয়ন্ত একদৃষ্টিতে শিশুটিকে দেখিতে লাগিল। এই একটি শিশুকে দেখিলেই অধিকাংশ মজুরের অযত্নে পালিত শিশু সন্তান চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠে। শরীরে কিছুমাত্র জীবনীশক্তি নাই। যে-কোন মুহূর্তে রোগের বীজাণু রক্তে বাসা বাঁধিতে পারে। একবার কোন একটি রোগ কোন রকমে আক্রমণ করিলেই সাবাড় হইয়া যাইবে। দুটি বছর বয়স না হইতেই কত শিশু যে মায়ের কোল হইতে খসিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বৃদ্ধার কাছে ছেলেটিকে ফিরাইয়া দিয়া জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—'বাচ্চাটা কার কাছে থাকে?'

বৃদ্ধা বিনীতভাবে কহিল—'আমার কাছেই থাকে বাবু। ওর মা যখন মারা যায়, তখন থেকেই ওকে আমি পালি।'

জয়ন্ত মাতব্বরের মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

মাতব্বর কহিল—'হাঁ হুজুর। বুড়িই ছেলেটাকে পালে।'

জয়ন্ত খুশী হইয়া বলিল—'বেশ বেশ! ছেলেটাকে আর একটু যত্ন করো বুড়ি-মা। ওর জন্যে মাসে মাসে আমি তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব।'

বৃদ্ধা জলভরা চোখে জয়ন্তের পানে তাকাইয়া ধরাগলায় কহিল—'তা দিও বাবা, মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা দিও, তাহলে বাচ্চাটাকে আমি একটু দুধ খাওয়াতে পারব। আমার হাল ত দেখতেই পাচ্ছ—পয়সা অভাবে আমি ওকে দুধ খাওয়াতে পারি না।'

—'পাঁচ টাকায় তুমি পেরে উঠবে না বুড়ি-মা, আমি তোমাকে দশ টাকা করে দেব। এ মাসের টাকাটা এখনই তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি।'—এই বলিয়া জয়ন্ত বৃদ্ধার হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিয়া বিদায় হইল।

গলির মধ্যে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল। মাতব্বরটি আগে আগে গিয়া কৌতূহলীদের ঠেলিয়া সরাইয়া জয়ন্ত ও পদ্মার পথ সুগম করিয়া দিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে জয়ন্তকে বলিল—'বদমাসগুলো আপনাকে ভারি তকলিফ্ দিয়েছে হুজুর,—আমি ওদের শায়েস্তা করে দেব।'

জয়ন্ত মাথা নাড়িয়া বলিল—'না না, আর কিছু করতে হবে না। শাস্তি ওরা পেয়েছে। মারধর করে ত কোন লাভ নেই। কি হবে মারধর করে? চুরি, ডাকাতি কিংবা রাহাজানি যারা করে তারা শাস্তির ভয় করে না, শাস্তি পেয়েও তাদের শিক্ষা হয় না। জেলফেরৎ দাগী আসামী পাকা বদমাস্ হয়ে ওঠে। অভাবে যাদের স্বভাব নষ্ট হয়, তাদের স্বভাব শোধ্রাতে হ'লে অভাব আগে দূর করতে হবে।'

জয়ন্তের কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকগুলি অবাক্ হইয়া গেল। এ বলে কি! এ রকম কথা তাহারা কোন দিনও শোনে নাই। কথাগুলিও খুব খাঁটি বলিয়াই মনে হয়।

মাতব্বর বলিল—'হাঁ হুজুর, আপনার কথাই ঠিক।'

পিছন হইতে একটি লোক বলিল—'ইন্সান্‌কো যব্ খানা নেহি মিল্‌তা তব্ ক্যা করেগা? ইন্সান্‌কো খোদা পয়দা কিয়া। খোদাকা দুনিয়া মে ইন্সান্‌কো খানা জরুর মিল্‌না চাহিয়ে।'

লোকটির কথা শুনিয়া জয়ন্ত মনে মনে খুশী হইল। সমাজতন্ত্রবাদের বীজ ঐ একটি কথার মধ্যেই আছে। পুরাপুরি না থাক্, ক্ষতি নাই। লোকটি তাহার কাজে লাগিবে। জয়ন্ত লোকটিকে কারখানায় গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া দিল।

সরু গলিগুলি পার হইয়া তাহারা তখন অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। পথের ধারে খানকয়েক ঘোড়ার গাড়ি দেখা যাইতেছে। পদ্মার পা আর চলে না বুঝিতে পারিয়া জয়ন্ত ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিল। পদ্মাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া জয়ন্ত উপস্থিত সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজেও গাড়িতে উঠিল।

গাড়ি চলিতে লাগিল। কখনও অন্ধকারে, কখনও আলোকে, কখনও নির্জন গলির পথে, কখনও বা জনবহুল বড় রাস্তায়।

জয়ন্ত এবং পদ্মা একেবারে চুপচাপ। পদ্মা রাগে ও দুঃখে প্রায় ফাটিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু রাগ করিয়া লাভ নাই জানিয়াই সে চুপ করিয়াছিল। আর জয়ন্ত ভাবিতেছিল কৃষক আন্দোলনের কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে, আজ রাত্রির গাড়িতে না গেলেই নয়। সময় খুব বেশী নাই, তৈরী হইতে হইবে তাড়াতাড়ি—চট্‌পট্।

জয়ন্ত পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি যাবে আমার সঙ্গে বাইরে?'

পদ্মা ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইয়া জবাব দিল—'নিয়ে যেতে চাও, যাব। তোমার যা ইচ্ছা!'

ঘুরাইয়া প্যাঁচাইয়া কথা বলা জয়ন্ত পছন্দ করে না। পদ্মার কথা বলিবার ধরণটা জয়ন্তের ভাল লাগিল না। জয়ন্ত সোজাসুজি প্রশ্ন করিল—তোমার ইচ্ছাটা কি শুনি?

—'আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় ত কিছু আসে যায় না।'

—'তোমার বোধ করি যাবার ইচ্ছা নেই। সে কথাটা সোজাসুজি বল্লেই ত হয়!'

পদ্মা দপ্ করিয়া যেন জ্বলিয়া উঠিল—'আমার কথা তুমি শোন নাকি?'

বিস্ফোরণের মত এই আকস্মিক ক্রোধের প্রকাশ দেখিয়া জয়ন্ত বুঝিল পদ্মার ক্ষোভটা নিতান্ত সামান্য নয়, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে অতৃপ্ত বিলাসের অভাব-অভিযোগ, আর উপস্থিত এই

(শেষাংশ ৭৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদ্যুৎপ্রবাহের গোড়ার কথা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল

এই সেদিনের কথা। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে যখন তাঁর পরীক্ষাগারে বসে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, তখন কে মনে করেছিল, তাঁর এই পরীক্ষা একদিন বিজ্ঞানজগতে এনে দেবে একটা নূতন প্রেরণা। কিন্তু যে বিদ্যুৎ-শক্তি এই চুম্বক শলাকার অজ্ঞাতে অদৃশ্যভাবে কাজ করছিল, তার গোড়ার কথা হয়ত অনেকের অজ্ঞাত। বিদ্যুৎ প্রবাহের আবিষ্কার কতকটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়। বৈজ্ঞানিক জগতের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায় এমন অনেক জিনিস আছে যার আবিষ্কার আকস্মিকভাবে হয়েছে। অনেকের মতে আমরা যে বিশাল পৃথিবীতে বাস করি, এই পৃথিবী এবং তার জীব-সৃষ্টি শুধু একটা আকস্মিক ব্যাপার।

প্রথম বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে Syria থেকে। বস্তু ঘর্ষণের ফলে এক প্রকার অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি হয়, তারই নাম দেওয়া হয় বিদ্যুৎ। সংঘর্ষণের ফলে শুধু ধ্বংস হয় না—সৃষ্টিও হয়, এই বিদ্যুৎ প্রবাহই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতি প্রাচীনকালে Syria দেশের মেয়েরা এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে সূতো কাটতো, যন্ত্রটা দেখতে ছিল ঠিক আমাদের দেশের হাতে কাটা তকলীর মত। তকলীর গোল চাকাটা ছিল Amber নামক এক পদার্থ দিয়ে তৈরী, সেই চাকাটা অনেক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাদের পরণের সিল্কের কাপড় বা পরিচ্ছদে গিয়ে স্পর্শ করতো, ফলে দেখা যেতো, সেই Amberএর চাকাটা অদৃশ্যভাবে একটা শক্তি সঞ্চয় করেছে, যখন সেই তকলীটা মাটীতে শুকনো ঘাস বা ঐ রকম কিছুতে রাখা হতো তখন দেখা যেতো ঐগুলো চাকার গায়ে এসে লেগেছে। বর্তমানে যে ঘর্ষ-তড়িৎ (frictional electricity)এর সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রথম পথ প্রদর্শক Syria বাসী রমণীরা। কে তখন জানতো সিরিয়াবাসী রমণীদের এই Amberএর নির্মিত তকলীই একদিন পৃথিবীর মানুষকে নূতন পথের সন্ধান দেবে। একটা কাচের নল বা একটা ফাউনটেন পেনকে বেশ করে সিল্কের রুমাল দিয়ে ঘসে রৌদ্র-উত্তপ্ত কতকগুলো টুকরা কাগজের উপর যখন ধরা যায়, তখন কাগজগুলো লাফাতে থাকে। অনেক যাদুকর আমাদের দেশে এই মজা দেখিয়ে দর্শকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে।

খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেও দেখা যায় এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ও তার শক্তি সম্বন্ধে লোকের কিছুটা ধারণা ছিল। গ্রীস্ দেশের একজন দার্শনিক Theophrastus প্রথম দেখেছিলেন যে, যখন Amberকে কোন রকমে ঘর্ষণের দ্বারা উত্তেজিত করা যায় তখন তার ভেতর এক প্রকার শক্তির সঞ্চার হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের দ্বারা তিনি তখন তার মীমাংসা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং নানা রকম পরীক্ষা সুরু করে দিলেন, পরিশেষে দেখলেন Tourmaline নামক এক পদার্থের দ্বারাও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তারপর অনেক বছর কেটে যায় বৈজ্ঞানিক জগতে এ নিয়ে আর কোন বিশেষ চেষ্টা হয় না। খৃষ্টের জন্মের ৭০ বছর পরেও দেখা যায় Pliny নামক এক বৈজ্ঞানিক Theophrastusএর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে পরীক্ষামূলক চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করেন। কাজেই দেখা যায় এইরূপ একটা ভৌতিক শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ মানুষ অনেক আগেই পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এসব জিনিস তখনকার দিনে অদ্ভুত বলে মনে হলেও বৈজ্ঞানিকের কাছে তেমন কিছু অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল না। কিন্তু মানুষের একটা প্রবৃত্তি—সে চায় সব কিছু বুঝতে তার যুক্তি তর্ক দিয়ে। কাজেই তখন থেকে এর প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকেরা প্রবৃত্ত হলেন।

দার্শনিক Aristotleএর কথা আজ বিশ্ববিশ্রুত। তিনি প্রথমে দেখেছিলেন যে, পৃথিবীতে একরকম মাছ আছে—যার নাম হচ্ছে "Torpedo" মাছ। সেই মাছের বিশেষ কোন একটা অংগ আছে, যে অংগ দিয়ে সে যদি কোন জীবকে স্পর্শ করে, সে তখনই অচেতন হয়ে পড়ে। বর্তমানে জীবতত্ত্ববিদ্‌রাও দেখেছেন পৃথিবীতে "Torpedo" মাছের মত আরো অনেক মাছ আছে।

জিনিস যখন আছে, তার প্রয়োজনও আছে। কোন নূতন জিনিসের সন্ধান পেলেই মানুষ তখন চেষ্টা করে, কি করে তাকে কাজে লাগান যায়। কাজেই তখন থেকে চেষ্টা চলতে লাগলো "Torpedo" মাছের এই যে অচেতন করার শক্তি, এই শক্তিকে কি করে কাজে লাগান যেতে পারে। তারা দেখলো যখন এই "টর্পেডো" মাছ দিয়ে কোন বাতভুক্ত রোগীকে স্পর্শ করা যায় তখন তার বাত রোগের অনেকটা উপশম হয়। জানা যায় না, তারা সম্পূর্ণভাবে কতদূর কৃতকার্য হয়েছিলেন, তবে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, বর্তমানে বৈদ্যুতিকভাবে চিকিৎসার যে বিরাট আয়োজন চলছে ও গবেষণা চলছে তার গোড়া পত্তন এখান থেকেই।

'Electricity' এ কথারও অবশ্য একটু ইতিহাস আছে। Amber অথবা Electrone এই কথা থেকেই "ইলেকট্রিসিটি" কথাটা এসেছে। গ্রীক ভাষায় Electrone মানে হচ্ছে Abmer, Electricity ইংরেজী শব্দ; রাণী এলিজাবেথের বিখ্যাত চিকিৎসক Dr. Gilbert একে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এর পর বহু বছর কেটে যায়। মধ্য যুগে এর সম্বন্ধে বিশেষ কোন গবেষণা চলেনি; অবশ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ যে, দু একটা না আছে তা নয়। কথিত আছে সেকালে নাকি একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি যখন পোষাক পরতেন বা খুলতেন তখন এক প্রকার অগ্নি স্ফুলিংগ তার গা থেকে বের হতো, বৃদ্ধ দার্শনিক মনে করতেন—হয়ত বা এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার বা দেবতার কাজ। বৈজ্ঞানিক চোখ দিয়ে দেখতে গেলে এটা আর কিছুই নয়, বস্তু সংঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হতো এবং তার থেকেই হতো আলো।

এই বিদ্যুৎ প্রবাহের অদ্ভুত কাজ বা শক্তির ঐতিহাসিক অনেক প্রমাণ পাওয়া গেলেও পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজে তখন কেহই হাত দেননি; শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণাই ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে Dr. Robert Gilbert প্রথম গবেষণামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হন ও একটা স্পষ্ট ধারণা এনে দেন। এই বিখ্যাত ডাঃ গিলবার্ট Amber নিয়েই প্রথম তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি একটা সিল্কের সূতো দিয়ে একটা সূচকে ঝুলিয়ে দিলেন বাতাসে, তারপর দেখলেন, এমন অনেক জিনিস আছে, যাদের ভেতর ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। তারপর এলেন Robert Boyle ১৬২৭ খৃস্টাব্দে। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন এই অদৃশ্য বিদ্যুৎ প্রবাহের মূল কোথায় আর কি করে একে সঞ্চয় করে রাখা যায়, কারণ কোন জিনিসকে সঞ্চয় করে না রাখলে তাকে কাজে খাটানো যায় না। তিনি দেখলেন যে, যখন কোন Amberকে ঘর্ষণের দ্বারা উত্তেজিত করা যায়, তখন যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় সেটা আবার তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়ে যায় না।

Robert Boyleএর সমসাময়িক Ottovan Guericke, তিনি দেখলেন যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে ইচ্ছে করলে আলো জ্বালান

যায়। তিনি 'সালফার' দিয়ে একটা বল তৈরী করলেন, এবং সেটাকে খুব জোরে ঘোরাবার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে সালফারের বলটাকে খুব জোরে ঘুরিয়ে সেটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন এবং দেখলেন সেটা অন্ধকারে বেশ জ্বলে ওঠে। এর কারণ আর কিছুই নয়, এই বিদ্যুৎপ্রবাহই আলোকে পরিণত হয়েছিল। ঠিক এই সময় Guericke আর একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন, এই ঘর্ষণের ফলে দুই প্রকার বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়, একটা হচ্ছে পজেটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং এই দুই শক্তির সমষ্টিতেই বস্তু জগতের অস্তিত্ব। বস্তুর সাধারণ অবস্থায় এই দুই শক্তির পরিমাণ সমান। যখন ঘর্ষণের ফলে উত্তেজিত হয় তখন এই দুই শক্তি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই প্রবাহের দুই রকম গুণ—আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। অবশ্য এই দুই প্রকার প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণের প্রথম গৌরবটা প্রাপ্য Symmer নামক এক বৈজ্ঞানিকের। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। তিনি করলেন কি—একই পায়ে উলের তৈরী কালো একটা মোজা পরলেন, এবং তার উপর পরলেন সিল্কের সাদা আর একটা মোজা। তারপর সাদা মোজাটা পা থেকে টেনে বের করে দেখলেন দুটী মোজাতেই দু'রকম প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে এবং যখন মোজা দুটো মেঝেতে ফেলে দিলেন, তখন দেখা গেল, সে দুটো পায়ের আকারে মেঝেতে খাড়া হয়ে আছে। বিদ্যুৎ প্রবাহের আবিষ্কারের গোড়ার দিক খোঁজ করলে, এরূপ অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়।

এর পর থেকে এ বিষয়ে বহু গবেষণা এবং পরীক্ষামূলক কাজ হয়েছে, অনেক উন্নতি সাধনও হয়েছে। এ বিষয় Newton এবং Stephenএর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

এতক্ষণ ঘর্ষ-তড়িৎ সম্বন্ধে বলা হলো। এ ছাড়া যে আরো এক ভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে, তারও গোড়ার কথা একটু জানা দরকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিদ্যুতের নাম চল-তড়িৎ (current electricity)। এই বিদ্যুতের আবিষ্কারের ফলে *রসায়ন জগতে মস্ত সাড়া পড়ে গেছে। এই বিদ্যুতের কার্যকারীতার উপর নির্ভর করে অনেক কিছুর পরীক্ষা সম্ভবপর হয়েছে। Volta এবং Galvani এই দুই বৈজ্ঞানিক প্রথম এই বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সন্ধান পান। এটাকেও একটা আকস্মিক আবিষ্কার বলা চলে।*

১৭৯০ খৃস্টাব্দে Bolognaর বিখ্যাত ডাক্তার Suigi Galvani তাঁর অসুস্থা স্ত্রীর জন্যে যুস্ তৈরী করবার জন্য কতকগুলো ব্যাঙের চামড়া ছাড়িয়ে টেবিলের উপর রাখেন। কাছেই একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছিল এবং একখানা ছুরিও এই যন্ত্রের পাশে ছিল। এই যন্ত্রের প্রভাবে ছুরিখানার ভেতর পূর্বেকার ঘর্ষবিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এখন ছুরিখানা হঠাৎ এই ছাড়ান ব্যাঙের একটা পায়ে লেগে যাওয়াতে হঠাৎ ব্যাঙটা তাজা ব্যাঙের মত লাফিয়ে ওঠে। আর কতকগুলো ব্যাঙ ছিল, তামার তারে ঝুলান, আবার তামার তারটা ছিল একটা লৌহদণ্ডের সঙ্গে আটকান, ফলে হলো যখন বাতাসে ব্যাঙগুলো লোহার দণ্ডটাকে গিয়ে স্পর্শ করলো তখন দেখা গেল, সেগুলো নাচতে সুরু করেছে। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে Galvani দেখলেন যে, এই লোহা এবং তামার তারের ভেতর একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে, অর্থাৎ একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রভাবে এই মরা ব্যাঙগুলো নাচতে আরম্ভ করেছিল। এই ঘটনার পর তিনি এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন, যখন কোন বিভিন্ন ধাতু একসঙ্গে আটকান যায়, তখন তার ভেতর একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ১৮০০ খৃস্টাব্দে Voltaই প্রথম এই পরীক্ষা অনুযায়ী ব্যাটারী প্রস্তুত করবার প্রয়াস পান। বর্তমানে তাঁরই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে' বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

Volta কতকগুলো টিন এবং তামার চাকতি তৈরী করে একটার পর একটা সাজিয়ে দিলেন, মাঝে দিলেন একটা আর্দ্র জিনিসের পর্দা এবং দেখলেন যে, এইভাবে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যেতে পারে। Voltaর নাম অনুসারে এইরূপ সাজাবার পদ্ধতিকে Voltaর শ্রেণী বলা হয়। তাঁর এ বিষয় গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি তখনকার Royal Societyর সভাপতির কাছে পেশ করেন। Volta ছিলেন Paria বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তিনি মনে করলেন, তাঁর এই আবিষ্কার হয়ত অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করতে পারে, কাজেই অতি সত্বর দেশের লোকদের জানিয়ে দেন। পরবর্তী পঁচিশ বছরের ভেতর তিনি এবিষয় আর নূতন কোন গবেষণা করেন না, কিন্তু এই নূতন পথে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের গবেষণা চালাতে আরম্ভ করেন এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত রসায়ন জগতে যে মস্ত বড় একটা পরিবর্তন এসেছে তার মূলে আছে এই Voltaর সাধনা।

বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্বন্ধে কেবল গোড়ার কথাই বলা হলো। এখনো বলার অনেক কিছুই আছে। বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা কত অসাধ্য সাধন করা হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আজ আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে সব জায়গাতেই এই শক্তি অদৃশ্যভাবে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিকের স্পর্ধা, সে আজ মেঘ থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সংগ্রহ করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে—কে জানে ভবিষ্যতের পথ বৈজ্ঞানিকের কাছে কতদূর উন্মুক্ত।



জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

(৭) উপসংহার

১৯০৮ সালের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ কোন প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সেভাবে যোগ না দিলেও তিনি একেবারে উহার সংস্পর্শ এড়াইতেও পারেন নাই। দেশের ও জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য যখনই তাঁহার সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই, কয়েকটি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন আহূত হয়, তাহাতে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের মধ্যে আবার বিবাদ বাধিয়া উঠে। চরমপন্থী বা নবীন জাতীয়তাবাদী দল প্রস্তাব করেন যে, মিসেস অ্যানি বেশান্তকে ঐ অধিবেশনের সভানেত্রী করা হউক। মিসেস বেশান্ত তাহারই কিছু পূর্বে "হোমরূল আন্দোলনের" জন্য বিনা বিচারে অন্তরীণ হইয়াছিলেন। নরমপন্থী মডারেট দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মিসেস বেশান্তের সভানেতৃত্বের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে চরমপন্থী বা নবীন জাতীয়তাবাদী দলের মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মৌলবী ফজলুল হক, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের সঙ্গে মিসেস বেশান্তকেই সভানেত্রীরূপে বরণ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ লইয়াও ঐরূপ মতদ্বৈধ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটগণ বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত করিতে চাহেন। কিন্তু নবীন জাতীয়তাবাদী দল ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাহাতে সম্মত হইলেন। এইরূপে দুই দলে মতভেদ যখন প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সৌভাগ্যক্রমে একটা আপোষের ব্যবস্থা হইল। মডারেট দল মিসেস অ্যানি বেশান্তকে সভানেত্রীরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথও শেষ মুহূর্তে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের অনুকূলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং "জাতীয় প্রার্থনা" পাঠ করেন।

তৎকালীন নবজাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মোৎসব উপলক্ষে 'পরিচয়' পত্রে এ সম্বন্ধে যে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা, অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইতেছে এবং ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইতেছেন। নরম দল ও গরম দলের মধ্যে ইতিপূর্বেই মনোবাদ বাধিয়াছে—আমি গরম দলভুক্ত। আমরা চাই মিসেস বেশান্তকে সভানেত্রীর আসন দিতে—নরম দলের তাহাতে বিশেষ আপত্তি। Indian Association হলে সভা বসিয়াছে। বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে সভাপতি (অভ্যর্থনা সমিতির) করিবার প্রস্তাব পেশ হইল। আমি উঠিয়া আপত্তি করিলাম। বলা উচিত, তখন আমার ত' দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা' ছিলই না (এখনও যে বিশেষ আছে একথা বলি না)—দ্বন্দ্বপ্রিয়তা যথেষ্ট ছিল। তাহার ফলে এবং গরমপন্থীর বন্ধুদের সহযোগিতায় মিটিং ভাঙ্গিয়া গেল। অবশ্য নরম দলেরা বিলক্ষণ চটিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক করিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকে ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করিলাম। তাঁহার মত নিরীহ লোকের এ বিবাদে না যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে এবং ভারত জননীর একান্ত সেবিকা মিসেস বেশান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথ 'মদরত'দিগের বিশেষ অনুনয় উপেক্ষা করিয়া সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার ফলে আমাদের দল বেশ প্রবল হইয়া উঠিল এবং জনসাধারণ দলে দলে ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যভুক্ত হইল। অবস্থা বুঝিয়া মদরতেরা মিসেস বেশান্তকে কংগ্রেসের সভানেতৃত্বে বরণ করিলেন। কাজেই সাময়িক বিবাদ মিটিয়া গেল। তখন রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন।" (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ—পরিচয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)।

১৯১৯ সালে রাউলেট আইনের প্রতিবাদে দেশময় তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ নববৎসরের দিন—অমৃতসরের জালিওয়ানাবাগে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষিত হয়। বহুলোক হতাহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রথমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। জননায়কগণও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এই নৃশংস ব্যাপারের প্রকাশ্যে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বড়লাটকে একখানি পত্র লিখিয়া জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। এই পত্রে কবির লেখনী হইতে যে তেজোময়ী বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের পত্র যখন প্রকাশিত হইল, তখন দেশবাসী পাঞ্জাবে দমননীতির তাণ্ডব এবং জালিওয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা জানিতে পারিল। ফলে দেশের সর্বত্র ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জননায়কগণ পাঞ্জাবে গিয়া সমবেত হইলেন

এবং, জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বড়লাটের নিকট যে প্রতিবাদ পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"The enormity of the measures taken by the Govt. in the Punjab for quelling some local disturbances has with a rude shock revealed to our minds, the helplessness of our position as British Subjects in India.

* * *

Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification.

The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutory lessons.

* * *

Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vission of statesmanship in our Govt. which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror.

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their socalled insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings.

* * *

১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দীশালায় একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে। এই বন্দীশালায় বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দিগণ ছিলেন। একটা গোলযোগের ফলে প্রহরীদের সঙ্গে তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ ঘটে, প্রহরীরা গুলী চালনা করে, ফলে দুইজন রাজনৈতিক বন্দী নিহত এবং অনেকে আহত হন। এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশময় প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। গুলী চালনার প্রতিবাদে কলিকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভার আয়োজন হয় এবং রবীন্দ্রনাথকেই সেই সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সে আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু সভায় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হইতেই টাউন হলে এরূপ বিপুল জনসমাগম হইতে থাকে যে, সেখানে সভা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশেষে গড়ের মাঠে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের নীচে সভা করা হইল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে যে বক্তৃতা করেন, বহু দিন তাঁহার কণ্ঠে সেরূপ তীব্র আবেগময় বক্তৃতা শুনি নাই। তিনি যেন সমগ্র বাঙালী জাতির ক্ষোভ ও মর্মবেদনাই তাঁহার অননুকরণীয় ভাষার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিতে পারেন নাই, বরং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান" নামে পর পর দুইটি বক্তৃতা করিয়া তিনি গান্ধীজীর অবলম্বিত পন্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৯৩২ সালে মহাত্মাজী যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে আমরণ অনশন বরণ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এইজন্য গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়া শান্তিনিকেতনে কয়েকটি বক্তৃতা করেন এবং পুণার যারবেদা জেলে গিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সম্মুখেই অনশন ভঙ্গ করেন।

ইহার পর মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্বন্ধে যে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার ফল দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশের নেতারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তথা কংগ্রেসের এই 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিবার জন্য যে বিরাট জনসভা হয়, রবীন্দ্রনাথই তাহার সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভাল ছিল না। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলেন, "আমাদের পক্ষে ইহার (বাঁটোয়ারার) অপমান এমন দুর্বিসহ যে, বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতার অজুহাত দেখাইতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম এবং আমার চিরপ্রিয় নির্জনতা পরিত্যাগ করিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে আসিলাম।"

সভায় এত বেশী ভিড় হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। বক্তৃতা করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ যাহাতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা তিনি করেন। বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে সেদিন তাঁহার কর্তব্য পালনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই, ইহা তাঁহার গভীর স্বদেশ প্রেমেরই নিদর্শন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে 'সাবধান বাণী উচ্চারণ' করিয়াছিলেন, গত কয়েক বৎসরে তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তথা আমাদের জননায়কগণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ঐ কথাগুলি এখনও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত এবং বাঁটোয়ারার রদ না করিলে দেশের যে কল্যাণ নাই,—রাজনৈতিক তথা সাম্প্রদায়িক শান্তি কখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহা উপলব্ধি করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের সেই সারগর্ভ অভিভাষণ হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য একটা অভিশাপ। যে সকল দল ও সম্প্রদায় বাঁটোয়ারা চাহে নাই, তাহাদেরও উপর এই অভিশাপ

বর্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে রাজনীতি হিসাবে আঠারটা পৃথক ভাবে বিভক্ত করিবার আয়োজন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতবর্ষের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন শব মাত্রে পরিণত হইবে।......

মুসলমান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন,—

"আসুন, আমরা দূরদর্শিতা অবলম্বন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি যে, সাবধানীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সুবিধা লাভ হয়, তাহা ভাগ্যবান অনুগৃহীত এবং দুর্ভাগ্য বিমুখ—উভয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিকর। তাহার ফলে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহা পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকাইয়া দিবে এবং যাহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সস্তায় কিস্তীমাত করে, পরিণামে তাহাদেরও কোন মঙ্গল হইবে না। আমরা, যাহারা এক জন্মভূমির সন্তান, সভ্য জাতিস্বরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য, এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের উচিত পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষোভের কারণ ও প্রলোভন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া দেশ ও বিদেশের তাহাদিগকেই উপেক্ষা করা উচিত, যাহারা তাহাদের বন্ধুত্বের পথে কণ্টক স্থাপন করে।.........

"এই অন্যায় অনুগ্রহের যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া আছে, তাহাই চিন্তার বিষয়; কারণ একদিন আসিবে যেদিন আর এইরূপ অনুগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, যে দিন এক তরফা আব্দার পালনে স্বেচ্ছাচারীরও চক্ষুলজ্জা হইবে; অথচ সেই দিনও অন্যায় অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না।......

ব্রিটিশ শাসকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন,—

"যাঁহারা ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িক কালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা শিরে বহিতে বাধ্য করা যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, ঐ অপমান প্রতিনিক্ষিপ্ত হয় এবং উহার বিষ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের আর একটা দিকের কিছু পরিচয় দিয়া আমরা এখন এই আলোচনা শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম হইতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন। বাল্যে পিতার নিকট হইতে যে শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। উপনিষদের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাচীন ঋষিরা যে সব সার সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মতে উহাই ভারতের আত্মার শাশ্বত বাণী। ভারতের এই শাশ্বত বাণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তাঁহার গভীর পরিচয় ছিল, সেই সভ্যতার মধ্যে যে তেজস্কর সত্য আছে, তাহার প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি চিরদিনই তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য দিকে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের কথা দেশবাসী যাহাতে না ভুলে, সেই দিকেও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কেবল তাহাই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও মনে করিতেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে তাহার সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তা বর্তমান জগতের নিকট প্রচার করা কর্তব্য। কেননা তাহাতে বিশ্বমানবের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। জীবনের শেষ ভাগে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। এক কথায় তিনি হইয়াছিলেন আধুনিক জগতের নিকট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূত। আর এই দৌত্যকার্য তিনি এমন কৃতিত্বের সঙ্গে করেন যে, বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই 'দৌত্য কার্যের' বিবরণ লিখিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থই লিখিতে হয়। হয়ত ভবিষ্যতে কোন যোগ্য লেখক সেই কর্তব্য পালন করিবেন। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের সামান্য কিছু পরিচয় দিলাম।

১৯১২-১৩ খৃঃ—গ্রেট ব্রিটেন, নিউ ইয়র্ক (উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা); সিকাগো (ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ)।

১৯১৬—জাপান, আমেরিকা।

১৯২০—ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড; আমেরিকা (নিউ ইয়র্ক, সিকাগো, টেকসাস)।

১৯২১—ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী (কবি এইবার জার্মানীর নানা স্থানে বক্তৃতা করেন ও বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।)

১৯২৪—চীন, দক্ষিণ আমেরিকা। ১৯২৫ ও ১৯২৬—ইটালী, নরওয়ে, জার্মানী।

১৯২৭—সুমাত্রা, জাভা, বলী, মালাক্কা।

১৯২৯—কানাডা।

১৯৩০—ব্রিটেন (অক্সফোর্ড); রাশিয়া। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মনের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। রাশিয়া যে নূতন প্রণালীতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতেছে তাহার মূল সূত্র আমাদের দেশে অনুসৃত হইলে জাতির কল্যাণ হইবে, এই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছিল। 'রাশিয়ার চিঠি'তে একথা তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছিলেন।

১৯৩২—পারস্য ও ইরাক। ৭১ বৎসর বয়সে কবি বিমানযোগে এই দুই দেশ ভ্রমণ করেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ মানসিক বলেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক সভ্য জাতিদের ঘোর বর্ণ বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ও পররাজ্য লোলুপতা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধ্বংসকারী প্রবৃত্তি ও আত্মহত্যাকর নীতি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের অপরাহ্নে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৬ সালেও মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উপর তিনি একেবারে বিশ্বাস হারান নাই। কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও বিশেষভাবে ইংরেজ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"এখনো মানবতার আদর্শের প্রতি পাশ্চাত্যের মজ্জাগত আকর্ষণ বিষয়ে আমার মনে দৃঢ় আস্থা বিদ্যমান। এই জন্যই

আমাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে আমাদের গতিকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া ফেলিবার জন্য 'সুকৌশলী রাজনীতিকের দৃঢ় ফাঁদের বেষ্টন নিজেদের আশে পাশে যদিও অনুভব করিতে পারিতেছি, তথাপি আমি পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার বাহক ও পোষক ইংরেজদের বীরসুলভ মানবতার দোহাই না দিয়া পারিতেছি না।”......

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আধুনিক সভ্যজাতিদের তথা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রতি তাঁহার আস্থা একেবারেই লোপ পাইয়াছিল বলিলেই হয়। বিশেষত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরও পরাধীন ভারতের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার পোষিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উৎস একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি গভীর উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিলেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তাঁহার শেষ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে 'সভ্যতার সংকট' নামে দেশবাসীর নিকট তিনি যে বাণী প্রচার করেন, স্বদেশ, স্বজাতি ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণ চিন্তায় তাহাই তাঁহার শেষ উক্তি। রবীন্দ্রনাথের গভীর দেশপ্রেম ও মানব প্রীতির নিদর্শনরূপে ইহা চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এই অমর বাণী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ কদর্যমূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন:—“এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কি অপহরণ করেছে তা জানি। সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order—বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।......

উপসংহারে গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে কবি বলেন,—

“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসন ধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে. আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাসকরাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তার প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে—নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।”

কবি তাঁহার এই শেষবাণীতে যে মর্মান্তিক সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন, নির্মম নিয়তির মতো তাহাই যে বর্তমান মানবসভ্যতার পরিণাম নির্দেশ করিতেছে যে, সে বিষয়ে কে সন্দেহ করিবে!*

বন্দেমাতরম্

---

* লেখক কর্তৃক “রবিবাসরে” প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। —প্রঃ সঃ

দেবতা ও মানবী

(৭৫৮ পৃষ্ঠার পর)

জলকাদায় লাঞ্ছনা ও ক্লেশ ভোগ। জয়ন্ত তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য স্নিগ্ধ ও মধুরকণ্ঠে বলিল—'তোমার কথা আমি শুনি না এমন কথা তুমি বলতে পার না, কি শুনি না বল!'

—'আমি বলতে চাই না।'

—'তোমার বলবার কিছু নেই।'

পদ্মা উত্তেজিত হইয়া বলিল—'কেন থাকবে না! বললেই তুমি বক্তৃতা দিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইবে, আমি যা বলি তা' আমার বলা উচিত নয়। বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ত তোমার নেই—বক্তৃতা দিতেও খুবই ওস্তাদ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—সবার জন্যেই তোমার দুঃখ হয় দয়া হয়—আর আমার জন্যে কেন হয় না?'

কথাটা বলিয়াই বোধকরি পদ্মার মনে হইল জয়ন্ত তাহাকে দয়া করিয়াই বিবাহ করিয়াছে—তা না হইলে জয়ন্তের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইত না। মুহূর্তে তাহার ক্রোধ কোথায় মিলাইয়া গেল। আত্মগ্লানিতে অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। পদ্মা কাঁদিয়া ফেলিল।

আর্দ্রকণ্ঠে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কি চাও পদ্মা?'

'আমি কিছু চাই না,—আমি কিছু চাই না!'—বলিয়া পদ্মা অশান্ত ক্রন্দনে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জয়ন্ত সস্নেহে তাহার চোখমুখ মুছাইয়া দিয়া গলা খাট করিয়া বলিল—'কেন কাঁদছ! কান্নাকাটি করবার কি হ'য়েছে? রাস্তায় এভাবে কাঁদতে দেখে লোকে কি ভাববে বলত!'

পদ্মা কোন কথা বলিল না। ফুলিয়া ফুলিয়া কতক্ষণ কাঁদিয়া শেষে নিজেই সে শান্ত হইল।

বাড়ি ফিরিয়া জয়ন্ত পদ্মাকে বলিল—'তুমি এ যাত্রা আমার সঙ্গে নাই বা গেলে! তোমার হয়ত কষ্ট হবে। আমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাব—আবার সে জায়গা থেকে যাব অন্য এক জায়গায়,—এমনি ক্রমাগত আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমার মনে হয় তোমার তা ভাল লাগবে না। ননীমাধব রইল,—তুমি তার কাছে একটু পড়াশুনা কোরো—আর প্রতিমাও দু'এক দিনের মধ্যেই ফিরবে,—প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে একটু কাজ করতে পারত ভালই—তা' না পার অন্তত বেড়াতে বেরিও।'

ক্রমশ

ভঙ্গুর

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলোটাকে আরও একটু মৃদু ক'রে দিয়ে মায়া এসে দাঁড়ালো শেখরের শিয়রে,—খুলে দিলো দক্ষিণের জানালাটা। ঘরটার ভিতর একটা মূক আবহাওয়া এতক্ষণ যেন মুমূর্ষু রোগীর মত কষ্টেসৃষ্টে শ্বাস টেনে চলেছিল; এবার একটু শিরশিরে বাতাসের আমেজ এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল মায়ার সারা মুখখানাকে—আপনা থেকেই আবেশে নেমে এলো মায়ার তন্দ্রালু চোখের স্বপ্নভারাক্রান্ত পল্লব।...

বেশ লাগে এই জানালাটার উপরে হাত রেখে এই সময়টুকু কাটিয়ে দিতেঃ সারাদিনের কাজকর্মের পরে বেশ একটু বিলাসিতায় ভরা অবসর। এ সময়টুকু মায়ার নিজস্ব, এর থেকে সে যেমন খুসী সময় অপচয় করতে পারে—ভাবতেও ভালো লাগে মায়ার। অনেক দূরের পার্কটার দেবদারু গাছটাকে কেমন যেন অপরিচিত লাগে এ সময়ে; ও গাছটাকে যেন আর এ জগতের বলে মনে হয় না এখন; রহস্যঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে যেন আরও কালো একটা অস্পষ্ট আভাষ।

এই দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে যা কিছু চোখে পড়ে মায়ার, সব কিছুই যেন কেমন একটা আবছা অস্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে তার ছায়াতুর চোখের সামনে, এক নিমেষেই যেন সমস্ত পৃথিবীর রূপ যায় বদলে। চাঁদের উপরের পাতলা মেঘের আস্তরণটুকু ততক্ষণে সরে গেছে—নারকেল গাছটার উপরে একরাশ আলো পড়ে এবার তার পাতাগুলো ইস্পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো; তারই মাঝখান দিয়ে বাতাসের একটানা কান্নার সুর বেজে ওঠে—সর্ সর্ সর্ সর্।

আচ্ছা, দূরের ওই উঁচু পাঁচতলা বাড়িটায় কারা থাকে! বাড়িটা যেন মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আর পাঁচটা বাড়িকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে ধরেছে একটা অজানা রহস্যঘন পারিপার্শ্বিকতার মাঝখানে; বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে একটা অন্য জগতের ছোঁয়াচ-লাগা আলো-আঁধারের নেশা! সারাদিনের ভেসে-যাওয়া টুকরো টুকরো চিন্তাগুলি এবার একত্রে এসে ভীড় পাকায় মায়ার মনে।

অনেক দূরের গীর্জের পেটা ঘড়িটা বেজে চললো ঠং ঠং—রাত বারোটা। কোথায় যেন একটা মাতাল সাহেব মদ খেয়ে অসংলগ্নভাবে টেনে যাচ্ছে একটা ইংরেজী গানের সুর,—"Oh, I had a Heaven on this earth."

তারই অস্পষ্ট একটা রেশ এসে আছড়ে পড়ে মায়ার কানে। অনেক দূরের সাহেবী হোটেলটার নাচঘর আলোয় আলোময়...গানের তালে তালে সেখানে নাচ হয়ে উঠেছে উদ্দাম!

আচ্ছা,, আরো কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়ালে হয় না! তারপরে আবার যেন কি ভেবে মসৃণ শঙ্খের মতো ললাটে নেমে আসা কোঁকড়ানো চুল ক'গাছিকে ঠেলে কানের উপরে তুলে দিয়ে মায়া এসে শেখরের পাশে দাঁড়ালো।

শেখর ঘুমুচ্ছে—অকাতরে এবং নিরুদ্বেগে, ঘুমুবেই, মায়া ভাবলো—যে ঘুমকাতুরে মানুষ! চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে—সে আলোয় শেখরকেও কি জানি কেন আর চেনা যায় না। তার ঠোঁটের এক কোণে বাঁকা একটু হাসি,—স্বপ্ন দেখছে হয়তো—ভাবলো মায়া।

আবার একরাশ প্রশ্ন এসে ভীড় পাকায় মায়ার মনে। আচ্ছা, কি স্বপ্ন দেখছে শেখর, নিজেকেই প্রশ্ন করে মায়া। হয়তো স্বপ্নে দেখছে, সে আর মায়া চলে গেছে বাস্তব জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে, অনেক দূরে; কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয় মায়া—হয়তো বসে আছে দু'জনে একটা শিলাখণ্ডের উপরে—আর একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে তাদের পাশ দিয়ে। নিজের কল্পনায় নিজেরই হাসি পায়, তবু মায়া বোঝায় নিজেকে—স্বপ্ন যখন, তখন একটা নদী তো থাকবেই, আর তার জল রূপো-গলা হলেই বা এমনি কি দোষ!

শেখরের এলোমেলো চুলগুলির মাঝখান দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে সম্মোহিতের মতোই ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলো মায়া—

"দূরে হেথা দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে..."

ততক্ষণে শেখর উঠে বসেছে বিছানার উপরে।...

—একি, তুমি শুয়ে পড়নি!

তার স্বরে বিস্ময়ের আমেজ; তারপর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বলে চললো—ভারি সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম মায়া। মায়া একটুও চমকালো না, এ তো সে জানতোই; এমন সুন্দর রাত—স্বপ্ন না দেখাটাই তো আশ্চর্য; আর কি স্বপ্ন যে শেখর দেখেছে, তাও তো তার অজানা নয়! নিষ্পলক চোখে ধীরে ধীরে স্বপ্নগ্রস্তের মতো বলে চললো মায়া—

"শুক্ল চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগত প্রায়,
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো, ঝিল্লিস্বনে
তরুমূলে অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রের মতো।"

—আচ্ছা, বলো তো কি স্বপ্ন দেখেছি?

উত্তর শোনবার আগ্রহ শেখরের বলার কায়দায় পরিস্ফুট।

ভারি হাসি পায় মায়ার—এমন রাতে আর কি স্বপ্ন দেখতে পারে মানুষে! তবুও একটু অজ্ঞতার ভাণ করে মায়া।—

—পারলাম না, তুমিই বলো।

—জানতাম পারবে না...

বলে চললো শেখর,

—জানো, সেই ক্রশওয়ার্ডের ফার্স্ট প্রাইজটা আমিই পেয়েছি...

(শেষাংশ ৭৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চাঁদের দেশে

সঞ্জীব রায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর লোককে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে লোক বাধ্য হয়ে নিরাপদ স্থানের সন্ধানে ছুটছে। কবে এবং কোথায় এই যুদ্ধের যে বিরতি ঘটবে, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। এই সময় একবার চাঁদের দেশে ঘুরে এলে মন্দ কি? সৌরমণ্ডলের চাঁদই পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বলা যায়। পৃথিবী থেকে চাঁদের দেশের দূরত্ব ২৩৮৮৫৭ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের ত্রিশ গুণের অনেক বেশী। কিন্তু এই দূরত্ব সব সময় ঠিক থাকে না। কখনও কখনও এই দূরত্ব কমে ২২২,০০০ মাইলে আসে। আবার এই দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৩,০০০ মাইল দাঁড়ায়। পৃথিবী থেকে চাঁদের দেশের দূরত্ব আমরা পেলাম, এবার কি করে সেখানে যাওয়া যায়। বিনা প্রয়োজনে রেলে ভ্রমণ না করতে রেল কোম্পানীই অনুরোধ জানাচ্ছেন। তাছাড়া চাঁদের দেশে যাবার মত দ্রুতগামী ট্রেনই আমাদের পৃথিবীতে নেই।

আমরা জানি, পৃথিবীর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে; সে শক্তি উপরের নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে। কিন্তু কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে উপরে ভ্রমণ করে তাহলে সেই বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে আর এই পৃথিবীতে ফিরতে হবে না। এইরূপ শক্তিশালী যানবাহন এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নি। আমরা প্রাচীন কালের অতি দ্রুতগামী পুষ্পকরথের কথা শুনেছি। সেই পুষ্পকরথের গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল হয়, তাহলে আমরা দুই দিনের মধ্যেই চাঁদের দেশে পেঁৗছতে পারব। কিন্তু সে সব কল্পনার কথা থাক। চাঁদের দেশে পেঁৗছবার আগে আমরা সেখানের অনেক কথা আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে জানতে পেরেছি। মানুষ চাঁদের দেশে না গিয়েও সেখানের কিছু কিছু খবর আজ পৃথিবীতে বসেই পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত চাঁদের দেশের আরও রহস্য বিজ্ঞানের চোখে ধরা দিবে।

সৌরমণ্ডলের জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে চাঁদের অভিনবত্ব সব থেকে বেশী। রাত্রির এই রহস্যময়ী রাণীকে কেন্দ্র করে কত কাব্য গড়ে উঠেছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় একটা মাদকতা আছে। কত জনে এই জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে। সভ্য-মানুষই কেবল বিস্ফারিত নেত্রে চাঁদের সুধা পান করে না। জীবজগতের অন্য সকলেও এই জ্যোৎস্নায় বিভোর হয়। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে, চকোর-চকোরী পক্ষী চাঁদের সুধায় মুগ্ধ হয়ে এই সুধার উৎস সন্ধানে আকাশপথে যাত্রা সুরু করে—সে যাত্রার আর বিরাম নেই। আকাশের বুকে তাদের আর দেখা যায় না, ডানার ঝাপটানির শব্দও আর কানে আসে না। তার পর দেখা যায়, তাদের ক্লান্ত দেহ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মাটিতে এসে পড়েছে। পরিশ্রান্ত পাখীর প্রাণবায়ু এমনি করেই নাকি বের হয়ে যায়। ভাবের রাজ্যে চাঁদের সৌন্দর্যের আর পরিমাপ নেই। দিনে আমরা সূর্যের প্রখর তাপে পরিশ্রান্ত হই, রাত্রিকালে চাঁদের জ্যোৎস্নায় স্নান করে দেহের অবসাদ দূর করি।

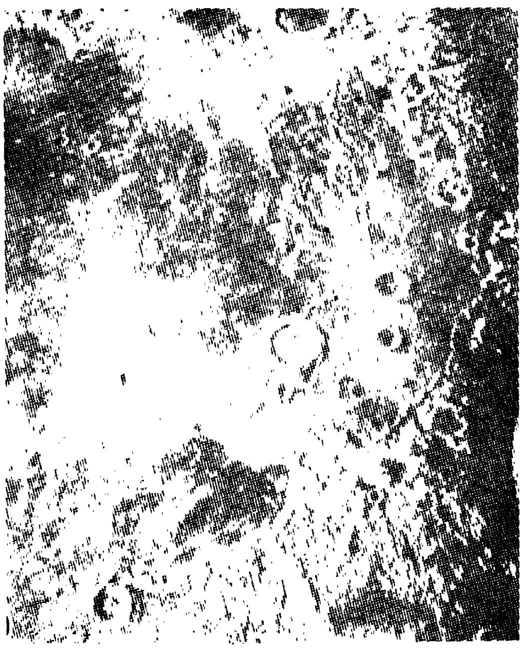
বাঁশবাগানের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, এমন সময় শোলকবলা কাজলা দিদির জন্যে শিশুর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কাজলাদিদি কবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে শিশুর তা জানা নেই, কিন্তু চাঁদামামা আকাশে দেখা দিলেই তার অনুপস্থিতি অনুভব করে। কাজলাদীঘির এক পাড় থেকে গোলাকৃতি চাঁদ দেখা দিল। নিথর জলে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমশ তালগাছের উঁচু মাথা পার হয়ে আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। পরিশ্রান্ত পৃথিবী দিনের



চাঁদের একটি আগ্নেয়গিরির গহ্বর

অবসাদ ভুলে আরামের একটা নিশ্বাস ছাড়ল। জীবজগতে একটা সুখ স্পর্শের শিহরণ দেখা দিল। চাঁদনী রাতে মানুষ কল্পনার রাজ্যে ডুব দিয়ে বিভোর হয়ে গেছে। নীড় ছেড়ে পাখীর দল আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। 'কাক-জ্যোৎস্নায়' এমনি ভুল সকলেরই হয়। এই চাঁদকে বৈজ্ঞানিকরা কিভাবে দেখেছেন, তার আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ। জীনস্ বলেছেন, যেমন একটি বিরাট নক্ষত্র অন্ধ খেয়ালে সূর্যের নিকট দিয়ে ভ্রমণ করবার সময় গ্রহ সৃষ্টির কারণ ঘটিয়েছিল, তেমনি সূর্যেরও অতি নিকটে এসে গ্রহগুলি উপগ্রহ সৃষ্টির কারণ ঘটিয়েছে। গ্রহের আয়তনের উপর উপগ্রহের সংখ্যা বিশেষভাবে নির্ভর করছে। পৃথিবীর মাত্র একটি উপগ্রহ।

চাঁদের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। চন্দ্রের ব্যাস মাত্র ২১৬০ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের সিকির কিছু বেশী। পৃথিবীর তুলনায় এই উপগ্রহটির ওজনও কম। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিয়ে দেখেছেন, পৃথিবীর ওজন চাঁদের ওজনের ৮২ গুণ বেশী। আমাদের পৃথিবীর মত চাঁদেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি পৃথিবীর তুলনায় ছয়ভাগের একভাগ মাত্র। কোন একটি গতিশীল বস্তু যদি সেকেন্ডে সাত মাইল বেগে উপরে উঠতে থাকে, তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবের বাইরে চলে যাবে। চাঁদের দেশে সে বস্তুটি সেকেন্ডে ১½ মাইল বেগে ছুটলেই চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করবে। চাঁদের দেশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানের তুলনায় কম হওয়ার ফলে সেখানে সব মজার ব্যাপার ঘটতে পারে।



চাঁদের দেশের পাহাড়

ব্যাপারটা খুবই উপভোগ্য। যেমন ধরুন, এখানে বিশ সের ভারি জিনিস তুলতে আপনি দশবার হাঁফাচ্ছেন, চাঁদের দেশে আপনি কিন্তু ২।৩ মন ওজনের ভারি জিনিস মাথায় করে নিয়ে যাবেন। সেখানের ছোট ছোট নদী, খালগুলো হেঁটে পার না হয়ে অনায়াসে লাফিয়ে যেতে পারবেন। পৃথিবীর যে মানুষ পোলভল্টে ১৪ ফিট লাফাতে পারে, চাঁদের দেশে গিয়ে ১৪।১৫ তলা বাড়িগুলো আরামে লাফাবে। মোটা লোকদের সেখানে কোন কষ্ট থাকবে না। দৌড়-ঝাঁপ করতে এখানে যে পরিশ্রম হয়, চাঁদের দেশে সে পরিশ্রমের কণামাত্র বুঝতে পারা যায় না। এই সবের কারণই হচ্ছে সেখানের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানের তুলনায় কম।

আমাদের পৃথিবী অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরছে। এছাড়া, সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এই পরিক্রমণ করতে ৩৬৫ দিন লাগে। এইটাই সৌর-বৎসর। চাঁদ চলন্ত পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে ২৯½ দিনে। এটাকেই চান্দ্র মাস বলি। চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিনে। আমরা চাঁদের যে জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হই, তা কিন্তু চাঁদের নিজস্ব আলো নয়। সূর্যের কিরণ চাঁদের উপর প্রতিফলিত হয়ে চাঁদকে আলোকিত করেছে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। চাঁদকে সূর্যের মত এক আকারে আমরা দেখি না। প্রতি মাসে এমন একটি দিন আসে, যেদিন নির্মল আকাশেও চাঁদকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ দিনকে আমরা অমাবস্যা বলি। এর পর আমরা পশ্চিম আকাশের নীচের দিকে সরু কাস্তের আকারে কিছু সময়ের জন্যে চাঁদকে দেখতে পাই। এই ক্ষীণদেহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পনের দিন পরে পূর্ণ-গোলাকার ধারণ করে পূর্ব আকাশে উদয় হয়। এই দিন পূর্ণিমা। কিন্তু এই গোলাকার আয়তন ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে অমাবস্যার দিন অদৃশ্য হয়ে যায়। জ্যোতির্বিদেরা চাঁদের এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ দেখিয়েছেন। আগেই বলেছি, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোকে আলোকিত। ঐ আলোতে চন্দ্রের যে অংশ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, চন্দ্রের পরিক্রমণের ফলে সেই অংশগুলির সমস্তটা আমরা দেখতে পাই না। এই কারণে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দেখি। পূর্ণিমাতে চাঁদকে সারারাত্রি আকাশে দেখা যাবে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন গড়ে ৪৮ মিনিট দেরিতে দেরিতে চাঁদ আকাশে উদয় হয়। এই দেরি হ'তে হ'তে অমাবস্যার দিন চাঁদকে আর আকাশে দেখতে পাব না। আবার অমাবস্যার পর শুক্লপক্ষের আরম্ভের সঙ্গে রাত্রের আকাশে চাঁদের স্থিতিকাল প্রত্যহ গড়ে ৪৮ মিনিট বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পূর্ণিমার দিন সারারাত্রি চাঁদ আকাশে থেকে যাবে। আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখেছি। চন্দ্রগ্রহণের মূলে কি কারণ আছে, তা জ্যোতির্বিদেরা ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা পূর্বেই জেনেছি, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে আবার পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র পরিক্রমণ করছে। এই পরিক্রমণের ফলে সূর্য এবং চাঁদের মধ্যে যখন পৃথিবী এসে পড়ে সূর্যকিরণকে বাধা দিয়ে ছায়া করল, সেই সময় যদি চাঁদ সেই ছায়ার মধ্যে আসে, তাহলে চন্দ্রগ্রহণ দেখব। তবে সূর্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র একরেখায় থাকা চাই। প্রতি পূর্ণিমাতে এই তিনজনে পর পর থাকে, কিন্তু একরেখায় না থাকায় আমরা প্রত্যেক পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ দেখি না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেক চন্দ্রগ্রহণ পূর্ণিমাতেই হবে, কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই যে চন্দ্রগ্রহণ হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। চাঁদের উপর কাল দাগগুলিকে আমরা চাঁদের কলঙ্ক বলি। ঐগুলিকে জ্যোতির্বিদেরা পরীক্ষা করে বলেছেন, এগুলি আর কিছু নয়, চাঁদের দেশের পর্বত, আর আগ্নেয়গিরি। পর্বতগুলি আকারে বড়। চাঁদের দেশের অসংখ্য আগ্নেয়গিরিগুলি নির্বাপিত অবস্থায় রয়েছে। চাঁদের দেশের আপেননিনিস পর্বতের শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য ৪৫০ মাইল। এই পর্বতের ৩,০০০ হাজারেরও অধিক চূড়া আছে। এদের মধ্যে মাউণ্ট হুয়িগেনসের নাম উল্লেখযোগ্য। উচ্চতায় ১৯,০০০ ফিট। এছাড়া মাউণ্ট ব্রাড্লে এবং মাউণ্ট হ্যাডলের উচ্চতা ১৫,০০০ ফিটেরও উপর। চাঁদের দেশের পাহাড় যতই উঁচু হোক না, পাহাড়ে উঠতে একটুও কষ্ট হবে না। এর কারণ পূর্বেই বলেছি। *

চাঁদের দেশের আগ্নেয়গিরিগুলির কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ওদেশের বড় আগ্নেয়গিরিগুলির গহ্বরের ব্যাস একশত মাইলের উপর। কখনও কখনও বড়গুলির মধ্যে ছোট আকারের আগ্নেয়গিরির গহ্বর দেখা যায়। কপারনিয়াস নামে একটি আগ্নেয়গিরি গহ্বরের ব্যাস ৫০ মাইল। ছোট বড় আকারের অসংখ্য আগ্নেয়গিরি চাঁদের দেশ জুড়ে রয়েছে। পৃথিবীতে যে আগ্নেয়গিরি আছে, তাদের বৈজ্ঞানিকেরা Eruptive এবং Quiet এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ভিসুভিয়াস, ক্রাকাটোয়া (Krakatoa) এবং মণ্টপিলি (Montpelee) Eruptive শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি সময়ে সময়ে পৃথিবীর মধ্যস্থ উত্তপ্ত তরল ধাতু নির্গত করে চতুর্দিকে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করে। হাওয়াইয়ের যে Quiet শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি গহ্বর রয়েছে, তাদের সঙ্গে চাঁদের দেশের গহ্বরগুলির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রয়েছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাঁদের দেশের আগ্নেয়গিরি গহ্বর আকারে বড়। গহ্বরের চারিদিকে গলিত পদার্থ নির্গত হয়ে প্রাচীরের আকার ধারণ করে। চাঁদের দেশের প্লেটো আগ্নেয়গিরি গহ্বরের ব্যাস ৫০ মাইল আর চারিপাশের উঁচু প্রাচীরগুলির উচ্চতা ৮,০০০ ফিট। পূর্বেকার প্রবন্ধে শনি গ্রহের বলয়ের জন্মের কথা উল্লেখ করেছি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদও ক্রমশ পৃথিবীর নিকটে আসছে। এইভাবে আসতে আসতে যদি খুব নিকটে এসে কাল্পনিক বিপজ্জনক গণ্ডি অতিক্রম করতে চেষ্টা করে, তাহলে শনির হতভাগ্য তিনটি গ্রহের মতই আমাদের চাঁদও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর পৃথিবী শনির মত একটি বলয় ধারণ করবে। তবে চাঁদের এই অবস্থা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। চাঁদের দেশটা জুড়ে খুঁজে দেখলে কোন জীব বা গাছপালা পাওয়া যাবে না। জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ বাতাস এবং অম্লজান ওদেশে নেই। চাঁদের দেশে মরা সমুদ্র শুয়ে আছে, কিন্তু জল নেই। ওদেশে যেতে হলে এখান থেকে বাতাসও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এত অসুবিধার মধ্যে আর দেশ বদল করে কোন লাভ নেই দেখছি। পৃথিবীর এই মাটি, জল, বাতাস—এদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ভুলে যাবার নয়।

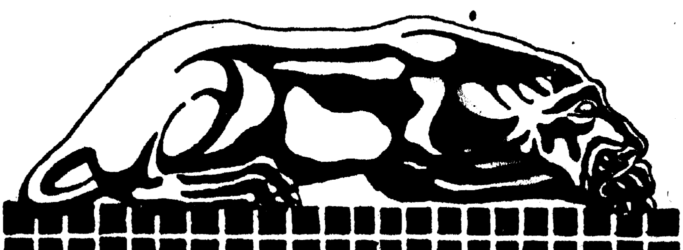
ভঙ্গুর

(৭৬৫ পৃষ্ঠার পর)

চোখের সামনে সমস্ত আলো যেন নিভে গেছে মায়ার—সব মিথ্যা, সব! মায়ার সামনে যেন একরাশ অন্ধকার; সে অন্ধকারে জ্যোৎস্না রাত, উজ্জয়িনী সমস্ত কিছু যেন একাকার হয়ে গেছে।

কোনও রকমে উঠে গিয়ে মায়া দাঁড়ালো দক্ষিণের জানালাটার পাশে; সেই মাতাল সাহেবটা এখনও জড়িয়ে জড়িয়ে গান গেয়ে চলেছে,—"Lucy, I would love thee, love and die."

শেখরের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে জানালাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিতে দিতে মায়ার মসৃণ মুখে ফুট উঠ্‌লো একটা রূঢ় কাঠিন্য।



ব্রহ্মের লড়াইয়ের পর

ব্রহ্মদেশের লড়াই আপাতত শেষ হইয়াছে। আপাতত বলিতেছি এইজন্য যে, ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশের লড়াইয়ে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন জেনারেল আলেকজেণ্ডার। তিনি সেদিন নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, পুনরাক্রমণ অবশ্যই করা হইবে এবং সেজন্য সেনাবাহিনীকে সুগঠিত করা হইতেছে। জেনারেল আলেকজেণ্ডার বলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি অংশ পুনরধিকার করা হইবে।" কিন্তু সে কথা পরের কথা। আপাতত ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ বাহিনীর এই পরাজয় কেন ঘটিল, ইহাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে জেনারেল ওয়াভেল এবং জেনারেল আলেকজেণ্ডার উভয়েই অনেক কথা বলিয়াছেন। জেনারেল ওয়াভেল রাখিয়া ঢাকিয়া কোন কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, সৈন্যদের এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের দিক হইতে ব্রহ্ম যুদ্ধ অনেক বিষয়ে নিরুৎসাহকর এবং নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রবেশের একটি মাত্র পথ ছিল। যখনই আমরা সমুদ্রে আধিপত্য হারাইলাম, তখনই রেঙ্গুন রক্ষা করা কার্যত অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে সিতাং নদীর তীরে যুদ্ধে পরাজয় না হইলে আমরা আরও দীর্ঘকাল রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ব্রহ্ম রক্ষা করিতে পারিতাম। সমগ্র ব্রহ্ম যুদ্ধে উহাই বাস্তবিকপক্ষে জাপানীদের হস্তে আমাদের একমাত্র পরাজয়। ঐ যুদ্ধে আমাদের গুরুতর ক্ষতি হয়।"

সিতাংয়ের এই লড়াইয়ে পরাজয় কেন ঘটিল? এ সম্বন্ধে জেনারেল ওয়াভেলের কথা এই যে, "শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; পক্ষান্তরে আমরা অপ্রস্তুত ছিলাম। ব্রিটিশ বাহিনীর এই প্রস্তুতের অভাবটা ধরা পড়িল, অবশ্য ব্রহ্ম যুদ্ধের পর। ইহার আগে আমরা এমন কথা কোন দিন শুনি নাই বরং এই ধরণের কথাই শুনিয়াছি যে, ব্রিটিশপক্ষ যেরূপ তোড়জোড় বাঁধিয়া আছেন, তাহাতে জাপানীরা এদিকে ঘেঁসিতে কিছুতেই সাহস পাইবে না। সেদিন ভারতসচিব আমেরী সাহেবও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা এতদিন পর্যন্ত একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া চলিতেছিলাম। আমরা মনে করিতাম যে, ব্রিটিশ নৌবহরই সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন। এজন্য ব্রহ্মের লড়াইয়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে যাহা করা দরকার ছিল, তাহা করা হয় নাই।

কি করা দরকার ছিল, জেনারেল আলেকজেণ্ডার সামরিক দিক হইতে সে সম্বন্ধে অনেক কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী যন্ত্রবলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই বাহিনী খোলা জমির উপর দিয়া লড়াইয়ের জন্যই উপযোগী। ব্রহ্মদেশের মত জায়গায় যন্ত্রবল পরিচালিত বাহিনী লইয়া সুবিধা করা সম্ভব নয়। জাপানীরা হাল্কা ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং তাহাদের রসদপত্র ঘোড়ার পিঠে কিংবা কুলীদের সাহায্যে সরবরাহ করা হয়; ব্রহ্মদেশের ন্যায় স্থানের জন্য ইহারা বিশেষভাবে শিক্ষিত। কেবল ইহাই সব কথা নয়। জেনারেল আলেকজেণ্ডার আর একটা কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাপানীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন লোক আছে। ইহাদের সংখ্যা ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের মোট জনসংখ্যার শতকরা দশজনের অধিক না হইলেও ইহারা সুগঠিত এবং জাপানীদের পক্ষে উৎসাহী কর্মী। শতকরা দশজন লোক জাপানীদের পক্ষে ছিল, আর সব লোক তবে কি ব্রিটিশের পক্ষে ছিল? জেনারেল আলেকজেণ্ডার সে কথাও বলিতেছেন না। তিনি বলেন, শতকরা দশজন লোক সুনিশ্চিতভাবে জাপানীদের পক্ষপাতী ছিল; আরও শতকরা দশজন সম্ভবত জাপানীদের পক্ষে ছিল। সুতরাং এই কুড়িজন বাদ দিলে এপক্ষে দাঁড়ায় শতকরা ৮০ জন। এই ৮০ জনের মতিগতির পরিচয়ও জেনারেল আলেকজেণ্ডার দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ৮০ জন যুদ্ধের ব্যাপারে কোন রকম আগ্রহ লয় নাই; নিজেদের মত নিজেরা থাকিতে চাহিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানীদের পক্ষ সমর্থন যাহারা করিয়াছে, তাহারা সকল রকমে জাপানী সেনাদের সাহায্য করিয়াছে। জেনারেল আলেকজেণ্ডারের উক্তি অনুসারে ইহারা সেজন্য নিজেদের জীবনকেও বিপন্ন করিয়াছে। এই সব বর্মী রাত্রির অন্ধকারে জাপানীদের সেনাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের গভর্নর কিছুদিন আগে একটি বিবৃতিতে বিশেষ গর্বের সঙ্গেই বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের বিরোধী ভাবাপন্ন লোক একজনও ছিল না এবং কেহই জাপানীদিগকে সাহায্য করে নাই। তাঁহার সেই উক্তি লইয়া কিছু বাদানুবাদও সাংবাদিক মহলে হইয়াছে। কিন্তু জেনারেল আলেকজেণ্ডার এবং জেনারেল ওয়াভেল দুইজন সামরিকের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মের গভর্নরের ঐ উক্তি ভিত্তিহীন।

শত্রুর সম্মুখ আক্রমণের ক্ষেত্রেও ব্রহ্মের ব্রিটিশ পক্ষপাতী বলিয়া যাহাদিগকে ধরা হইয়াছে, সেই ৮০ জন যুদ্ধের ব্যাপারে কেন এইরূপ উদাসীন ছিল, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ এসব ক্ষেত্রে উদাসীন থাকা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ধন, জন যেখানে বিপন্ন এখানে দার্শনিক উদাসীনতা চলে না, প্রাণের গরজও আসিয়া পড়ে। এই যে প্রাণের গরজ শতকরা ৮০ জন লোকের তাহা শিথিল হইয়াছিল কেন, ইহা ভাবিবার বিষয়। জেনারেল আলেকজেণ্ডারের উক্তি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের ব্রিটিশ পক্ষপাতিগণ সুগঠিত ছিল না, এজন্য তাহারা মিত্রপক্ষকে কার্যকরভাবে সাহায্য করিতে পারে নাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, গলদ ছিল এইখানে। ব্রহ্মবাসীদিগকে সামরিকভাবে সুশিক্ষিত করা হয় নাই এবং সমর-বিভাগের সঙ্গে তাহাদের যোগসূত্র দৃঢ় করা হইয়াছিল না; এক কথায় সামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ব্রহ্মের ব্রিটিশ সমরবিভাগ ব্রহ্মদেশে একটা বাহিরের মত বস্তুই ছিল; দেশের লোকের সঙ্গে তাহাদের যোগ ছিল না এবং ইহা ছিল না বলিয়া স্থানীয় প্রয়োজনোচিত নীতির বিশেষত্ব হইতে ব্রিটিশ সেনাদল বঞ্চিত ছিল। সেনাদল কতকগুলি সাধারণ সামরিক নীতি ধরিয়া চলিয়াছে এবং কেহ ক্ষেত্র বুঝিয়া বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মবাসীদিগকে যদি ব্রহ্মের সমরবিভাগে কর্তৃত্ব দান করিতেন এবং তাঁহাদের দেশরক্ষার দায়িত্ব যদি তাহাদের উপর পড়িত, তবে এ ভুলটা এমনভাবে ঘটিত না। কোন স্থানে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিলে সুবিধা হয়, ইহা সেই দেশের লোকে যেমন জানে বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব হয় না। তাহারা অন্যদিক হইতে হাজার শিক্ষিত হোক্। জাপানীরা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই ত্রুটির সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে। জেনারেল ওয়াভেল এবং জেনারেল আলেকজেণ্ডার দুইজনেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদশের সংগ্রাম হইতে তাঁহারা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির কর্ণধারগণ দেশের লোকের হাতে দেশরক্ষার ভার না দিলে কি ভুল হয়, ব্রহ্মদেশের অভিজ্ঞতা হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন কি? আমরা ভারতবাসী—আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমরা সেই প্রশ্নই করিতেছি।

ব্রহ্মদেশের লড়াই শেষ হইল। ব্রিটিশ সেনাদল দুর্গম ব্রহ্ম-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কতকগুলি ভারি ধরণের সামরিক তোড়জোড় তাহাদিগকে ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে; সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এগুলি এক দিক হইতে অকেজো হইয়াই পড়িয়াছিল; যেগুলি কাজ চলিবার মত ছিল, সেগুলিও

ভাঙিয়া অকেজো করিয়া আসা হইয়াছে। সুতরাং জাপানীরা সেগুলির সাহায্যে কোন রকম সুবিধা করিতে পারিবে, এমন আশঙ্কার কারণ নাই। তেলের খনিগুলিও অন্তত এক বৎসরের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মে লড়াইয়ের পর জাপানীদের গতি কোন্ দিকে হইবে, ইহাই হইতেছে চিন্তার বিষয়। আপাতত দেখা যাইতেছে, জাপানীরা চীনের উপরই সকল রকমে জোর দিয়াছে। তাহারা দক্ষিণ হইতে চীনের মধ্যে ঢুকিতেছে। তাহাদের লক্ষ্য বোধ হয় চীনের জাতীয় দলের রাজধানী চুংকিং। পূর্ব দিক হইতে তাহারা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে আগাইতে চেষ্টা করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব এবং দক্ষিণ দিক্ হইতে জাতীয় দলের কেন্দ্রস্থানকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলাই বোধ হয় তাহাদের মতলব। জাপানীরা ঘোরতর লড়াইয়ের পর চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী দখল করিয়াছে। সকল দিক হইতে জাতীয় দলের বাহিনীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়া তাহারা জাতীয় দলকে স্থায়ীরকমে এইবার কাবু করিয়া ফেলিতে চায়। তাহাদের এই প্রচেষ্টা কতটা সাফল্যলাভ করিবে বলা যায় না, তবে অন্য দিক হইতে জাপানীদের শক্তি যদি বিচ্ছিন্ন না হয়, অর্থাৎ জাপানীরা বহু দূর পর্যন্ত যে সামরিক লাইন বিস্তার করিয়াছে, যদি সেই লাইনের উপর ইতিমধ্যে চাপ না পড়ে এবং বাহির হইতে চীনারা সাহায্য না পায়, তবে জাপানীদের এই আক্রমণ চীনের জাতীয় দলকে বিপন্ন করিবে, এমন আতঙ্কের কারণ রহিয়াছে। জেনারেল চিয়াং কাইসেক সেদিন একটি বেতার বক্তৃতায় আমেরিকাকে বলিয়াছেন, তোমাদের কল-কারখানায় যে পরিমাণ সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী হইতেছে, তাহার শতকরা ১০ অংশ আমাদিগকে দাও, আমরা যুদ্ধ জিতিয়া দিতেছি। প্রকৃতপক্ষে চীনের বর্তমান সমস্যা এইখানেই। আমেরিকা ও ব্রিটিশ—এই দুই শক্তির আসন্ন সমরনীতির উপর চীনা জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে বলিয়া মনে হয়। রুশিয়া যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে, তবে অবস্থা তো অন্য দিকে ফিরিতেই পারে; কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি? জার্মানদের রণনীতির উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। জার্মানেরা উত্তর আফ্রিকায় আবার নূতন করিয়া সাড়া দিতে চাহিতেছে এবং সেখানকার লড়াই এবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে মনে হয়। ককেশাস অঞ্চলের লড়াই একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই অঞ্চল রক্ষার জন্য রুশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল টিমোশেঙ্কো যে বিক্রম এবং রণ-চাতুর্য প্রদর্শন করিতেছেন, বর্তমান সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাসে তাহা অপূর্ব। বাস্তবিকপক্ষে লড়াই কেমন করিয়া চালাইতে হয়, রুশিয়া তাহা দেখাইতেছে। রুশিয়ার এই সাফল্যের প্রধান কারণই হইল রুশিয়ার সমগ্র জনসাধারণের আন্তরিক সাহায্য। বর্তমান সংগ্রামে এই দিককার শক্তি না পাইলে সুবিধা করা সম্পূর্ণই অসম্ভব; বাহির হইতে সেনা আমদানী করিয়া এই ধরণের লড়াইতে সুবিধা করিয়া উঠা যায় না। রুশিয়ার প্রত্যেকটি লোক যে যেমনভাবে পারে, এই লড়াইতে সাহায্য করিতেছে। রুশিয়ার এই লড়াই যুদ্ধের গতি ফিরাইয়া দিতে পারে।

আমাদের দিক হইতে ইহাই মনে হয় যে, জাপানীরা এখনকার মত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইবে না। চীন যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহারা এখন ইহাই করিতে চায়, তার পরে অস্ট্রেলিয়া এখনও রহিয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিগুলি দখল করিবার চেষ্টা এখনও সাফল্যলাভ করে নাই; এমন অবস্থায় আসন্ন বর্ষার মুখে জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যোগী হইবে না; তেমন উদ্যোগ করিতে হইলে ব্রহ্মদেশস্থ লাইনকে সম্প্রসারিত করিলেই চলিবে না; এক দিক হইতে তাহা করা সুকঠিন, তারপর এত বড় একটা দীর্ঘ লাইনের সংহতি অটুট রাখিতে হইলে নৌবহরের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ভারত মহাসাগরে জাপানীদের নৌবহরের কোন সাড়া এখন আর পাওয়া যাইতেছে না। আরাকান অঞ্চল জাপানীরা দখল করিয়াছে বটে; কিন্তু নৌশক্তির দ্বারা তাহারা তাহা করে নাই; এবং এখনও আরাকানের উপকূলভাগে তাহাদের নৌশক্তির তৎপরতার কোন খবর আমরা পাইতেছি না। মোটের উপর চীনকে কাবু না করিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইয়া, সর্বোপরি ককেশাস অঞ্চলে জার্মানদের বিক্রম না দেখিয়া তাহারা পশ্চিম দিকে আর তাহাদের লাইন বাড়াইতে সাহসী হইবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ রুশিয়ার সম্বন্ধে তাহাদের এখনও আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। রুশিয়া যদি জার্মানির গতি প্রতিরুদ্ধ করিয়া জাপানকে আক্রমণ করিবার মত ক্ষমতা একটু পায় এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে, তাহা হইলে চীনের জাতীয় দল পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিবে এবং জাপানীরা এ পর্যন্ত যে সাফল্যলাভ করিয়াছে, সব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। মিত্রপক্ষ যদি ইউরোপের কোন স্থান আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করেন, তবে রুষিয়া খুবই জোর পায়। ইংরেজের বিমানপথে জার্মানীতে বিপুলভাবে হানা দেওয়ার ব্যাপারটাকে কেহ কেহ সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিরই সূচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেদিন ইংরেজের এক হাজার উড়োজাহাজ একযোগে জার্মানীতে হানা দেয়। ইহারা বিশেষভাবে কলোন অঞ্চলই আক্রমণ করে; কারণ এই স্থানটি জার্মানীর কল-কারখানার কেন্দ্র অঞ্চল। কিছুদিন পূর্বে মার্কিনদের তরফ হইতে এই ধরণের কথা আমরা শুনিয়াছি যে, মার্কিন সেনারা ফ্রান্সে অবতরণ করিবে। এমন অবতরণ যদি সত্যই ঘটে, তবে ইউরোপের লড়াইয়ের গতি ফিরিবে, তাহা ছাড়া জার্মানীর উপর যদি ক্রমাগত জোড়ে জোড়ে ব্রিটিশের বিমান আক্রমণ চলে, তাহা হইলেও রুষিয়া বিশেষভাবে সাহায্য পাইবে। ভারত সম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, বর্তমানে ভারতের উপর বিশেষভাবে পূর্ব ভারতের কোন কোন স্থানে জাপানীদের বিমান আক্রমণই হইতে পারে মাত্র, তাহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু সেই ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না; আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থায় দৃঢ় হইতে হইবে। আমাদের মতে এই ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে ভারতের সামরিক বিভাগে অবিলম্বে ভারতবাসীদের কর্তৃত্ব প্রদান করা কর্তব্য। মালয় এবং ব্রহ্মের অভিজ্ঞতা সেই সত্যকেই সুনিশ্চিত করিয়াছে। ভারতবাসীরা যদি দেশরক্ষার দায়িত্ব লাভ করে এবং কর্তব্যবোধে প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে অপর কোন শক্তির পক্ষেই এ দেশ আক্রমণ করিয়া কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। সময় যথেষ্টই নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কালবিলম্ব করিবার অবসর এখন আর নাই। ব্রিটিশ রাজনীতির কর্ণধারগণ এখনও এই সত্যকে উপলব্ধি করুন।

আজ•কাল

গান্ধীজীর নতুন আন্দোলন?

গান্ধীজী একটা নতুন আন্দোলন আরম্ভ করবেন বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এক বিবৃতিতে এ সম্বন্ধে খুব স্পষ্টা-স্পষ্টি কিছু না বললেও তাঁর মন যে একটা পরিকল্পনায় ব্যাপৃত হয়েছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি ইতিপূর্বে বর্তমান যুদ্ধ এবং ইংরেজদের পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্যার উল্লেখে বলেছিলেন যে, সব দিক থেকে একমাত্র বাঞ্ছনীয় সমাধান হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ-দের অপসারণ। তাঁর বর্তমান বিবৃতি থেকে মনে হয়, তাঁর পরিকল্পিত আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে উপরোক্ত সমাধান।

তাঁর বর্তমান নীতি চীনের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ঘোষিত বন্ধুত্বের বিরোধী কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এখনও চীনের পরম বন্ধু রয়েছেন; কিন্তু চীনকে ভারতের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভারতকে স্বাধীন করতে ব্রিটেনকে রাজি করান, যাতে ভারত সমর-প্রচেষ্টায় তার পূর্ণ সাহায্য দিতে পারে।

গান্ধীজী ঘোষণা করেন, "পণ্ডিত নেহরু আমাকে বলেন যে, তিনি লাহোরে ও দিল্লীতে লোককে বলতে শুনেছেন যে, আমি জাপ-সমর্থক হয়ে পড়েছি। আমি এ ধারণায় শুধু হেসেছি; কারণ আমি যদি আমার স্বাধীনতা-স্পৃহায় অকপট হই, তাহলে আমি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমন কিছু করতে পারি না, যাতে ভারতবর্ষ শুধু প্রভু-পরিবর্তনের অবস্থায় পড়বে। জাপ বিপদ আমার সর্বান্তঃকরণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও যদি ঘটে যায় (যার সম্ভাবনা আমি কখনও অস্বীকার করি নি), তাহলে তার সমস্ত দোষ ইংরেজদের ঘাড়ে পড়বে।"

এই নতুন আন্দোলন সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেস-সভাপতির সঙ্গে এখনো তাঁর আলোচনা বাকি। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার পর জওহরলাল এক বক্তৃতায় বলেছেন, "মহাত্মা গান্ধী গভর্নমেণ্টের দমননীতি এবং ব্রহ্মে ও মালয়ে ভারতীয়দের প্রতি আচরণে বিচলিত হয়েছেন। গভর্ন-মেণ্টের মনোভাব ও নীতি যদি কঠোর হ'তে থাকে, তাহলে মহাত্মা গান্ধী চুপ করে বসে থাকবেন কি করে? আমি গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করে দিতে চাই যে, গভর্নমেণ্ট যদি দমননীতি অনুসরণ করেন, তাহলে আমরা প্রতিরোধ করব।"

গান্ধীজী যদি কংগ্রেসকে দিয়ে নতুন আন্দোলন আরম্ভ করান তাহলে তা নিশ্চয়ই রাজাজীর নীতির বিরুদ্ধে যাবে। ইতিমধ্যে তাঁদের মতভেদ দুই পক্ষের প্রচারের মধ্য দিয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। রাজাজী এবং অন্য যাঁরা বর্তমান যুদ্ধকে প্রধানত ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ হিসেবে দেখে ব্রিটিশ ও অন্যান্য শক্তির সহযোগিতায় ফাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার নীতি গ্রহণ করেছেন, নতুন আন্দোলনকে তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে অবস্থা যে জটিল, তাতে সন্দেহ নেই।

কিষাণ সম্মেলন

বিহটায় নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধেই মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং এক্সিসবিরোধী যুদ্ধ সমর্থন করে ও কার্যকরীভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবী জানিয়ে নাগপুরে কেন্দ্রীয় কিষাণ পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। জাপ অভিযানের বিপদ দিন দিন আসন্ন হয়ে ওঠা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট তাঁদের নীতি পরিবর্তন করছেন না বলে সম্মেলনের এক প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। কিষাণ, ছাত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের এখনও মুক্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়; এ সম্পর্কে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের এবং মণিপুরের জননেতা ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের নাম উল্লেখ করা হয়।

সম্মেলন হওয়ার সময় একদল লোক হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করে। তারা নানা রকম ধ্বনি করতে থাকে; তন্মধ্যে নাগপুর প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবী অন্যতম।

গৃহরক্ষী দল সংগঠন

মৌলবী ফজলুল হকের সভাপতিত্বে বাঙলা ব্যবস্থা-পরিষদ ভবনে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের যে সভা হয়, তাতে গৃহরক্ষী দল গঠন সম্বন্ধে একটা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে আনন্দ প্রকাশ করে বলা হয় যে, অধিকাংশ বেসরকারী সদস্য নিয়ে গঠিত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কমিটির মারফৎ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও সংগঠন হলে গৃহরক্ষী দল কার্যকরী হবে। সুতরাং আইনসভার ও বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং প্রয়োজনীয় সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে অবিলম্বে একটা প্রাদেশিক দেশরক্ষা কমিটি গঠন করতে গভর্নমেণ্টকে বলা হয়। এই নীতি অনুসারে জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও ইউনিয়নেও কমিটি গঠন করতে বলা হয়। গৃহরক্ষী দলের কাজ হবে স্থানীয় এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং অধিবাসী অপসারণে ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা (গৃহরক্ষী দলে স্বেচ্ছাসেবক ও অফিসার নিয়োগে হিন্দু-মুসলমানের একটা সংখ্যানুপাত বেঁধে দেওয়া হয়)।

চট্টগ্রামের অবস্থা

প্রস্তাবের এক জায়গায় বলা হয়, "চট্টগ্রাম ডিভিসনে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, পার্টি তাতে অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হয়েছেন। সেখানে অবিলম্বে গৃহরক্ষী দল গঠন করতে এবং চট্টগ্রাম ডিভিসনের বিশেষ অবস্থার জন্যে জনসাধারণ যাতে সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নিজেরা ধনপ্রাণ রক্ষা করতে পারে, সেজন্যে তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিতে গভর্নমেণ্টকে পার্টি অনুরোধ করছেন।"

হুর দমন

সিন্ধুতে হুরদের অত্যাচার দমনের জন্যে অবশেষে গভর্নমেণ্ট হুর-উপদ্রুত এলাকায় সামরিক আইন জারি করেছেন। ইতিমধ্যে হুর-দের সঙ্গে পুলিশের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে এবং হুররা গ্রামে হানা দিয়া আরও লোককে খুন-জখম করেছে। যে জায়গায় সামরিক আইন জারি করা হয়েছে, সেটা সংহার তালুকে আখি ধ্বধ এলাকা। এই-খানেই হুররা লুকিয়ে থাকে। জায়গাটা জঙ্গলাকীর্ণ এবং আয়তনে ১২৫ বর্গ মাইলের বেশী। এই এলাকায় হুরদের নিজেদের গুপ্তচর ব্যবস্থা আছে; তাদের ভিতরকার খবর পাওয়াও খুব কঠিন। তাদের নিজেদের পরস্পরকে চিনবার সংকেত আছে, বাইরের কোনো লোক ঐ এলাকায় পা দিলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এখন সামরিক কমাণ্ডার মেজর-জেনারেল রিচার্ডসন এই এলাকার ভার নিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, এই এলাকায় শান্তি পুন প্রতিষ্ঠিত করতে চার-পাঁচ মাস সময় লাগবে।

প্রাচ্যের যুদ্ধ

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ বর্তমানে শুধু চীনেই সীমাবদ্ধ। ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ওয়েভেল এবং ব্রহ্মে বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আলেকজাণ্ডার তাঁদের বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে, সমগ্র বৃটিশ বাহিনী এখন ব্রহ্ম থেকে ভারতবর্ষে চলে আসায় ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান হয়েছে। জেনারেল ওয়েভেল বলেছেন যে, এবার জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার পালা ভারতবর্ষে পূর্ব সীমান্ত বাহিনীর। তিনি আরও বলেছেন যে, ব্রহ্ম থেকে বৃটিশ সৈন্য প্রায় সবই স'রে আসতে পেরেছে; তবে ট্যাঙ্ক প্রভৃতি কিছু সমরোপকরণ ফেলে রেখে আসতে হয়েছে। সময় পাওয়ায় ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে, এই কথা বলে' জেনারেল ওয়েভেল বলেছেন যে, বিমান আক্রমণ থেকে কলকাতা ও কলম্বোকে রক্ষা করবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সিংগাপুরের ব্যবস্থার চেয়ে অনেক ভালো।

চীনে পূর্ব উপকূলে চেকিয়াং প্রদেশেই যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে চলছে। জাপানীরা বার বার চারদিক থেকে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে চেকিয়াং-এর রাজধানী কিনহোয়া এবং অন্যতম প্রধান শহর লাঞ্চি দখল করেছে। তারা এই দুটো শহরের উপর ভীষণ বোমা বর্ষণ করে। দখল করার আগে তারা এখানে বিষবাষ্প ব্যবহার করে বলে' চীনারা অভিযোগ করেছে। পরে চীনা সৈন্যেরা পাল্টা আক্রমণ করে কিনহোয়ার কাছাকাছি চারটি শহর পুনরধিকার করেছে। ইয়াংসি নদীতীরে অন্যতম প্রধান বন্দর শাসিও তারা পুনরধিকার করেছে।

লিবিয়ার যুদ্ধ

বর্তমানে লিবিয়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। গত ২৬শে মে সন্ধ্যায় জেনারেল রোমেলের নির্দেশে জার্মান ও ইতালীয় বাহিনী সেখানে আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা উপকূল থেকে দক্ষিণে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত বিরহাকিম বেড় করে' দ্রুত উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং আক্রোমার কাছে গিয়ে সমবেত হয়। এল দুজা ও সিদি রেজেগের দিকেও তারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। এই সংগে সমুদ্র থেকে জার্মান সৈন্যেরা উপকূলে নামবার এবং দক্ষিণের বাহিনীর সংগে সংযোগ করবার চেষ্টা করে। জার্মানদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথম আঘাতেই তবুক দখল করে নেওয়া, দক্ষিণ ঘাঁটি বির হাকিম অধিকার করা এবং বৃটিশ যান্ত্রিক বাহিনীকে ধ্বংস করা। কিন্তু জেনারেল রোমেলের এই পরিকল্পনা পাঁচ দিনের যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে গেছে। জার্মান যোগপথের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলে নাৎসীরা বিপদে পড়ে যায়, বৃটিশ পাল্টা আক্রমণে তাদের বহু ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া সৈন্য ধ্বংস হয় এবং বৃটিশ নৌবহরের বাধাদানে উপকূলে সৈন্য নামাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন জার্মানরা মিত্রপক্ষের মাইন ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে সরে পড়বার চেষ্টা আরম্ভ করে। মাইনক্ষেত্রে ফাঁক সৃষ্টি করে এই চেষ্টায় তারা কিছু সফলকামও হয়। কিন্তু তাদের যান্ত্রিক বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতিও হয়। এর পর জার্মানরা আবার পূর্ব দিকে আক্রমণ আরম্ভ করেছে। বোধ হয়, পশ্চিম দিকে তাদের সৈন্যেরা যাতে সরে পড়তে পারে সেজন্য পৃষ্ঠরক্ষার জন্যে তারা এই আক্রমণ চালিয়েছে। লিবিয়ার যুদ্ধে ইতিমধ্যে একজন জার্মান জেনারেল বন্দী হয়েছেন।

বিরাট বৃটিশ বিমান আক্রমণ

জার্মানীতে বৃটিশ বিমান আক্রমণ এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ৩০শে মে রাতে এক হাজার বৃটিশ বিমান জার্মানীর অন্যতম প্রধান শিল্প শহর কলোনে হানা দেয়। এ রকম বিরাট বিমান আক্রমণ এর আগে কখনো কোনো দেশে হয়নি। কলোন শহরের কেন্দ্রভাগ একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই বিমানহানায় শহরে নাকি ২০,০০০ লোক নিহত ও ৫৪,০০০ লোক আহত হয়েছে। এই আক্রমণের পর জার্মান গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা হিমলার এ আর পি'র ভার নিয়েছেন। ১লা জুন রাতে আবার এক হাজারের বেশী বিমান পশ্চিম জার্মানীর শিল্পকেন্দ্র এসেনে হানা দেয়। মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় বলেছেন যে, জার্মানীর শহর, বন্দর ও সমরোপকরণ কেন্দ্রের উপর যে আক্রমণ এখন থেকে ক্রমাগত চালানো হবে তীব্রতায় ও ব্যাপকতায় তার তুলনা নেই। তিনি জানিয়েছেন যে, এখন শুধু বৃটিশ বিমানবহরই আক্রমণ চালাচ্ছে; শীগ্গির মার্কিন বিমানবহরও এই আক্রমণে অংশ নেবে। বাস্তবিক যদি এ রকম আক্রমণ চলতে থাকে তাহলে জার্মানীর পক্ষে অবস্থা যে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই।

কলোনের উপর আক্রমণের প্রতিশোধে জার্মান বিমান ইংলণ্ডের ক্যাণ্টারবেরি শহর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে ক্যাণ্টারবেরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং অনেক লোকের প্রাণহানি হয়েছে।

খারকভের লড়াই

সোভিয়েট জার্মান যুদ্ধ আবার অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। খারকভ রণাংগনে ও ইজিয়ুম বারভেঙ্কোভো রণাংগনে অবস্থার নতুন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সোভিয়েট প্রচার বিভাগ এক বিশেষ ঘোষণায় বলেছেন যে, জার্মান কমাণ্ড বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে রস্টভের উপর বিরাট আক্রমণের যে প্ল্যান করেছিলেন, সেই প্ল্যান ব্যর্থ করে' দেওয়াই ছিল খারকভে সোভিয়েট আক্রমণের উদ্দেশ্য, খারকভ পুনরধিকার এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে খারকভ অভিযান আরম্ভ করা হয় সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই রণাংগনে দু সপ্তাহের প্রচণ্ড যুদ্ধে জার্মানদের ৯৫০০০ অফিসার ও সৈন্য নিহত ও বন্দী হয় এবং ৫৪০টি ট্যাঙ্ক ও ২০০ বিমান ধ্বংস হয়; সোভিয়েটের ৫০০০ সৈন্য নিহত ও ৭০,০০০ সৈন্য নিখোঁজ হয় এবং ৩০০টি ট্যাঙ্ক ও ১২৪টি বিমান ধ্বংস হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিক্ষোভ

চেকোশ্লোভাকিয়ার নাৎসী শাসনকর্তা হাইড্রিক্সের উপর এক আক্রমণ হয়ে গেছে। প্রাগে বড় রাস্তা দিয়ে মোটরগাড়িতে যাবার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর বোমা ও গুলীতে হাইড্রিক্স ভয়ানক আহত হয়েছেন; তাঁর এখন জীবন সংশয়। এরপর জার্মান কর্তৃপক্ষ ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করেছেন। হাইড্রিক্সের স্থলাভিষিক্ত জেনারেল দেলাওয়ের আদেশে প্রাগে এ পর্যন্ত ৫০ জনের বেশী লোকের প্রাণ হরণ করা হয়েছে। হাইড্রিক্সের আততায়ীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

—ওয়াকিবহাল

২-৬-৪২



জাতীয় খেলাধুলার ফলাফল নির্ণয় সংখ্যার ব্যবস্থা

জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ বাঙলার বিভিন্ন জাতীয় খেলার ফলাফল সংখ্যার দ্বারা বা পয়েণ্টস দ্বারা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা জাতীয় খেলাধুলা উৎসাহী অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"নবগঠিত জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ বাঙলার জাতীয় খেলাধুলার ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" কেহ কেহ বলিতেছেন—"বৈদেশিক খেলাধুলার প্রভাব জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘকে এইরূপ কার্যে ব্রতী হইতে বাধ্য করিয়াছে।" কেহ কেহ বলিতেছেন—"এইরূপ ব্যবস্থার ফলে জাতীয় খেলাধুলাসমূহ বৈদেশিক খেলায় পরিণত হইবে।" এই সকল উক্তি যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের কেবল এইটুকু বলিব যে, জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারার ফলেই তাঁহাদের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জাগিতেছে। জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের পরিচালকগণ কোনরূপে খামখেয়ালের বশবর্তী হইয়া এইরূপ কার্যে ব্রতী হন নাই। বহু চিন্তা ও আলোচনার পর এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা চিন্তা ও আলোচনার পর দেখিতে পান যে, খেলার উন্নতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি অনেকাংশে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মনোহরণের উপর নির্ভর করে। এই মনোহরণের ব্যবস্থা সংখ্যা দ্বারা ফলাফল নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়াই পৃথিবীর বিশিষ্ট ক্রীড়া-পরিচালকগণ ইহা অনুসরণ করেন। ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই ইহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। ক্রিকেট খেলার স্কোর বোর্ড জনসাধারণকে অস্থির করে খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব খুব কম লোকেই বুঝিতে পারে। টেনিস খেলার বিষয়েও ঐ এক কথাই বলা চলে। বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস, বেস্ বল, রাগ্‌বী প্রভৃতি সকল খেলার বিষয় ঐ একই কথা বলা চলে। জাতীয় খেলাধুলায় এই জন্যই সংখ্যার দ্বারা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া জাতীয় খেলাধুলাকে পৃথিবীর উপরোক্ত খেলাধুলার সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হইলে ঐ সকল খেলাধুলার অনুরূপ ব্যবস্থা ব্যতীত সম্ভব নহে। ইহা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। ইহার উপর চিন্তা করা উচিত যুগধর্মের কথা। এক ব্যবস্থা সকল যুগে সকল ক্রীড়ামোদীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। যুগোপযোগী ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিশিষ্ট খেলাধুলার সকল ফলাফল সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় করা হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙলার জাতীয় খেলাধুলাকে বর্তমান যুগোপযোগী করিতে হইলে জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘের ব্যবস্থা অনুসরণ করা ব্যতীত উপায় নাই। জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘের পরিচালকগণ এই জন্য সকল ক্রীড়ামোদীর ধন্যবাদার্হ হওয়া উচিত।

গাদী খেলায় ফলাফল নির্ণয়ের নূতন ব্যবস্থা

গাদী খেলা বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা—শিরোগিযো, হিঙ্গেলদাড়ী, দাড়িয়াবান্দা, নুনচোর, ধাপ্‌সা, সাগরদাঁড়ী, নুনচিকে, চিকে প্রভৃতি। খেলাটির পদ্ধতি ও নিয়মাবলী মূলত একই যদিও নাম বিভিন্ন। জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ ইহার নূতন নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন। সকল নিয়মাবলী এই স্থানে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। খেলার কোন কোন বিষয় সংখ্যার দ্বারা ফলাফল নির্ণয় করা হইবে ও খেলার শেষ ফল বাহির হইবে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) যদি কোট প্রাপ্ত দলের কোন খেলোয়াড় সমস্ত ঘর ঘুরিয়া শূন্যে গাদী ঘরে প্রবেশ করে, তবে এক গাদী হইবে অর্থাৎ ৭ পয়েণ্ট পাইবে।

(২) খাটিয়ে দল কোট প্রাপ্ত দলের কাহাকে মারিলেই খাটিয়ে দল ৫ পয়েণ্ট পাইবে।

(৩) যদি কোট প্রাপ্ত দলের কোন খেলোয়াড় সমস্ত ঘর ঘুরিয়া গাদী ঘরে ঢুকিতে না পারে এবং ঐ খেলোয়াড় খাটিয়ে দলের নিকট মার খায়, তবে কোট প্রাপ্ত দল ৩ পয়েণ্ট পাইবে। তবে উক্ত খেলোয়াড়কে শেষ ঘর হইতে ৪র্থ ঘর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে কোট প্রাপ্ত দল কোন পয়েণ্ট পাইবে না।

(৪) কোট প্রাপ্ত দলের কোন খেলোয়াড় "আউট লাইন" অথবা কোর্টের বাহিরে গেলে খাটিয়ে দল ২ পয়েণ্ট পাইবে।

(৫) যে দল খেলার শেষে মোট অধিক সংখ্যক পয়েণ্ট পাইবে, তাহাকেই বিজয়ী সাব্যস্ত করা হইবে।

জো লুইর আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী

ইতিপূর্বে এক সংবাদে জানা গিয়াছিল যে, জো লুইর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য বব পেস্টার নামক একজন মুষ্টিযোদ্ধাকে প্রস্তুত করা হইতেছে। প্রসিদ্ধ মুষ্টিযুদ্ধ প্রযোজক মিঃ মাইক জেকবস্ এই প্রতিযোগিতার সকল ব্যবস্থা করিতেছেন। ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা

অনুমোদন করিয়াছেন। সম্প্রতি আর একটি সংবাদে জানা গেল সাভোল্ড নামক আর একজন মুষ্টিযোদ্ধাকে জো লুইর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করিবার খুব তোড়জোড় চলিয়াছে। সাভোল্ড কিরূপ শক্তিশালী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য লু নোভার সহিত লড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় সাভোল্ড অতি সহজেই লু নোভাকে পরাজিত করিয়াছেন। ইহার ফলে সকলেই আশা করিতেছেন, সাভোল্ড জো লুইর সহিত ভালই লড়িবেন। ফলাফল যাহাই হউক, আমেরিকার সাদা সমাজ জো লুইর অপরাজিত নাম ঘুচাইবার জন্য কিরূপ যে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা এই সকল ব্যবস্থা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। জো লুই আমেরিকার সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন এবং ভাবিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তিনি পৃথিবীর কালা সমাজের গৌরব। তাঁহার সকল প্রতিযোগিতায় সাফল্য যে তাঁহাদের কাম্য ইহা বলাই বাহুল্য।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

লীগের প্রথমার্ধের খেলা প্রায় শেষ হইতে চলিল। ইতিমধ্যেই কোন্ দল লীগ বিজয়ী হইতে পারিবে, তাহা লইয়া ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে রীতিমত গবেষণা সুরু হইয়া গিয়াছে। লীগ কোঠায় ইস্টবেঙ্গল দলের স্থান এখন সর্ব উচ্চে। মহমেডান ও মোহনবাগান দল অপেক্ষা ইস্টবেঙ্গল দল তিন পয়েণ্ট আগাইয়া আছে, অবশ্য মহমেডান দলের এখনও একটি ম্যাচ খেলিতে বাকী আছে।

ইস্টবেঙ্গল দলের প্রথমার্ধে আর দুইটি খেলা মোহনবাগান ও ভবানীপুর দলের সহিত বাকী আছে। অবশিষ্ট দুইটি খেলায় যদি তাহারা জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে লীগের প্রথমার্ধে আর কোন দলই তাহাদের 'নাগাল' ধরিতে পারিবে না।

লীগের প্রথমার্ধের খেলায় দুই-এক পয়েণ্ট আগাইয়া থাকিলে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় অনেকটা সুবিধা আছে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গলের এইরূপ সুযোগ কোনমতেই ছাড়া উচিত নয়। তবে মোহনাবাগন দলও যে তাহাদের রীতিমত বেগ দিতে পারিবে, ইহাও ত কোনমতেই অস্বীকর করা যায় না। অতীতে এই দুই দলের মধ্যে যতবারই 'সংঘর্ষ' উপস্থিত হইয়াছে, কোনবারই প্রবল উত্তেজনা বা তীব্র প্রতিযোগিতার অভাব দেখা যায় নাই। এই ক্ষেত্রেও যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহা কি করিয়া বলা যায়?

ইস্টবেঙ্গল দলের এইবার খেলার একটু বিশেষত্ব যে তাহারা প্রথম হইতেই যেন অবস্থার গরুত্ব উপলব্ধি করিয়া খেলিতেছে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিলে বোধ হয় এই দলের সমর্থকগণকে হতাশ হইতে হইবে না। ইতিপূর্বে বহুবার খুব অল্পের জন্য তাহাদের লীগ বিজয়ী হওয়ার আশা 'ভূমিসাৎ' হইয়াছে। এইবার যেন তাহাদের আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতে না হয়।

মহমেডান দলের খেলায় এইবার যেন কোনরূপ একটানা সংগতি বজায় নাই। কোন কোন খেলায় তাহারা আশানুরূপ ভাল খেলিতেছে এবং আবার কোন কোন খেলায় তাহাদের আশাতীত নৈরাশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্যবার মহমেডান দলের খেলার এইরূপ তারতম্য এত প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়িত না। রীতিমত অনুশীলন না করিবার সুযোগ পাওয়াই বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ। তাহা ছাড়া মহমেডান দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই 'খেলার বয়স' ক্রমশই অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। নূতন ভাল খেলোয়াড় এই দলে আর পাওয়াই যাইতেছে না, সেই হিসাবে তাহাদের খেলাও যে খানিকটা পড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তবে টীম হিসাবে এখনও মহমেডান দলের সহিত অপর কোন দলের তুলনা হয় না এবং লীগ বিজয়ী হইতে পারাও মহমেডান দলের কাছে কোন নূতন গৌরবের কথা নহে। সুতরাং তাহারা সত্য সত্যই যদি মনে করে, তাহা হইলে মনে হয়, কোন দলই তাহাদের লীগ বিজয়ের পথে অন্তরায় হইতে পারে না।

এইবার ফুটবল খেলার গোড়ার দিকে মাঠে প্রবল জনরব ছিল যে, মোহনবাগান দলের টীম ভাল এবং তাহাদেরও লীগ বিজয়ী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ক্রমশই তাহারা যেভাবে খেলার নমুনা দেখাইতে আরম্ভ করিল, তাহাতে এই দলের সমর্থকগণ আর কোন মতেই তাহাদের উপর ভরসা রাখিতে পারিতেছেন না। এখন খেলার অবস্থা যেভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহাদের খেলার চরম উন্নতির পরিচয় যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন মতেই তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইবে না।

এই সপ্তাহে মোহনবাগান দলকে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে এবং উপরোক্ত দুইটি খেলার ফলাফলের উপর তাহারা লীগ কোঠার কোন স্থান দখল করিতে পারিবে, তাহা অনেকটা নির্ভর করে। নিম্নে লীগ তালিকার প্রথম চারিটি দলের অবস্থা দেওয়া হইল।

প্রথম ডিভিসন—চতুর্থ স্থান পর্যন্ত

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১০	৯	০	১	২৭	৪	১৮
মহঃ স্পোর্টিং	৯	৬	৩	০	৩৩	৫	১৫
মোহনবাগান	১০	৬	৩	১	২৪	৭	১৫
এরিয়ান্স	৯	৪	৩	২	১২	৯	১১

সমরবার্তা

২৭শে মে

রুশিয়া—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো রণক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী জার্মানদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে।

চীন—চেকিয়াং-এর রাজধানী কিনহোয়ার উপর জাপানীরা তিন দিক হইতে হানা দেয়। চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ যে, চীনা বাহিনী সালুইন নদীর পশ্চিম দিকে টেংচুং ও লুংলিং-এ জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া লুংলিং-এর দক্ষিণ ও পূর্বে কতিপয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে।

লিবিয়া—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, লিবিয়ায় জেনারেল রোমেলের বাহিনী নূতন করিয়া অভিযান সুরু করিয়াছে। গতরাত্রে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে বীর-হেকেম অঞ্চলে ব্রিটিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ সাঁজোয়া বাহিনী শত্রুপক্ষের বাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

প্রাগে জার্মান অধিকৃত দেশসমূহের গেষ্টাপো (জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ) বাহিনীর অধিনায়ক হেড্রিকের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়; ফলে তিনি গুরুতর আহত হইয়াছেন।

২৮শে মে

ব্রহ্ম যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্যার এইচ আর সি আলেকজেণ্ডার ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্ম হইতে ব্রিটিশ বাহিনীর অপসারণের সঙ্গে তৎকর্তৃক উহার পরিচালনারও অবসান হইল। তিনি বলেন যে, সেনা বাহিনীর বিভিন্ন দলকে এখন শত্রুর সহিত ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

রুশিয়া—ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, খারকভের উত্তর-পূর্ব দিকে এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট বাহিনী বিয়েল-গোরোদগামী রেলপথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। খারকভের দক্ষিণে জার্মান বাহিনী যেখানে কীলকাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে মার্শাল টিমোশেঙ্কো ১২ ডিভিসন সৈন্য লইয়া পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছেন।

লিবিয়া—জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী বীর হেকেমের আত্ম-রক্ষা ব্যবস্থার উপর যে আক্রমণ চালায়, তাহা প্রতিহত হয়।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্মদেশ হইতে একদল চীনা সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—ইহারা সম্ভবত জেনারেল ষ্টিলওয়েলের বাহিনীরই একটি অংশ। আকিয়াব হইতে ব্রিটিশ বাহিনী সরাইয়া আনার পর হইতে জাপানী পরিচালিত আকিনরা আরাকানের উত্তর দিগস্থ অঞ্চলে উপদ্রব সুরু করিয়াছে বলিয়া জনৈক সামরিক মুখপাত্র জানাইয়াছেন।

প্রাগ বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, জেনারেল দালুয়েগে, হেড্রিকের স্থলে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার শাসনকর্তা হইবেন। হেড্রিকের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

২৯শে মে

চীন—কিনহোয়া জাপানীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা বিষাক্ত শেল ও বোমা বর্ষণ করিতেছে। প্রকাশ যে, কিনহোয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত লানচির চারিদিকে হাজার হাজার জাপানী সৈন্যের মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

লিবিয়া—জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী বীর হেকেমের চতুস্পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ সাঁজোয়া বাহিনী তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছে।

৩০শে মে

লিবিয়া—তব্রুকের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বিরাট ট্যাংক যুদ্ধ সুরু হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা বলিতে-ছেন যে, এইস্থানে ব্রিটিশ স্পিটফায়ার ও মার্কিন কিটিকে বোমারু বিমান প্রেরণ করিয়া ব্রিটিশ বিমান বাহিনী জেনারেল রোমেল-এর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। লিবিয়ার যুদ্ধে স্পিটফায়ার বিমান এই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইল।

চীন—চুংকিং-এ সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, চীনারা বৃহস্পতিবার (২৮শে মে) চেকিয়াং-এর রাজধানী কিনহোয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৩১শে মে

গত রাত্রে এক হাজারের অধিক বৃটিশ বোমারু বিমান রুর ও রাইনল্যাণ্ডে হানা দেয়। উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কলোন। বিমান যুদ্ধের ইতিহাসে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আক্রমণ। এই হানা অসাধারণ সফল্য লাভ করিয়াছে।

রুশিয়া—সোভিয়েট প্রচার বিভাগের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, খারকভের যুদ্ধে জার্মানীর ৯০ হাজার সৈন্য নিহত অথবা বন্দী হইয়াছে এবং রুশিয়ার পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত এবং ৭০ হাজার সৈন্য নিখোঁজ হইয়াছে। জার্মানরা খারকভ রণাঙ্গনে তিনটি রুশ আর্মি নিশ্চিহ্ন করার দাবী করে।

চীন—চুংকিং-এর সংবাদে বলা হয় যে, জার্মানদের বিষবাষ্প ব্যবহারের জনাই চীনা বাহিনী কিহোয়া পরিত্যাগ করে এবং লানচি হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

১লা জুন

লিবিয়া—জার্মান আফ্রিকা কোরের অধিনায়ক জেনারেল লুডভিগ ক্রুওয়েল বন্দী হইয়াছেন।

চীন—চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা কাণ্টন হইতে নূতন করিয়া এক অভিযান চালাইতেছে। টেংচিন, লেনকাং ও সিনিয়াই হইতে জাপানীরা অগ্রসর হইতেছে। ফেংচানের নিকট চীনারা উহাদিগকে বাধা দেয়।

গত রাত্রে এক শক্তিশলী জার্মান বোমারু বিমান বাহিনী কলোন আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাণ্টারবেরীর উপর আক্রমণ চালায়।

২রা জুন

গত রাত্রে প্রায় এক হাজার বৃটিশ বোমারু বিমান পশ্চিম জার্মানীতে, বিশেষ করিয়া রুর অঞ্চলে এবং রুরের কয়লা খনি ও ইস্পাতের কারখানা অঞ্চলের প্রধান সহর এসেনের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

লিবিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ চার্চিল অদ্য কমন্স সভায় বলেন যে, জেনারেল রোমেলের প্রাথমিক অভিযানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল রোমেলের তব্রুক দখলের প্ল্যান বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা নাইটস্ ব্রীজে পাঁচ দিনব্যাপী ট্যাংক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে।

চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব চীনে জেনারেল চিয়াং কাইশেকের বাহিনী চেকিয়াং প্রদেশে জাপ সৈন্যদের নিকট হইতে ৪টি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর পুনর্দখল করিয়াছে।

রুশিয়া—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১লা জুন রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটে নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৭শে মে

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রায়পুরা অঞ্চলে বাঙ্গলা সরকার এক হাজার বাড়ি নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে অগ্নিদাহে হাজার হাজার বাড়ি ভস্মীভূত হইয়াছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ পরিদর্শনের পর অদ্য কলিকাতায় ফিরিয়া 'ইউনাইটেড প্রেসের' প্রতিনিধির নিকট বঙ্গীয় সরকারের রাজস্ব ও বিচার-সচিব মিঃ পি এন ব্যানার্জি পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি প্রকাশ করেন।

অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর কার্যকলাপের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থালম্বিত হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শনের জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুত বুলুসু শাম্বমূর্ত্তিকে অনুরোধ করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত সৈদাবাদে একদল হুর ও সৈন্যগণের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। উহাতে দুইজন হুর গুলীর আঘাতে নিহত হয় এবং আরও তিনজন আহত হয়।

যশোহরের বাগামেরপাড়া থানার এলাকাধীন দারাঝাট গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ২৪শে মে তারিখে কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি পুলিশের উর্দি পরিহিত অবস্থায় ঐ গ্রামের মুন্সী আবদুল জব্বর এবং ধীরেন্দ্রনাথ সুরের বাড়িতে হানা দিয়া প্রত্যেক বাড়ি হইতে একটি করিয়া দোনালা বন্দুক বলপূর্ব্বক লইয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, এই সম্পর্কে পুলিশ চারিজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

২৮শে মে

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, সংঘারের নিকট পুলিশ ও একদল হুরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ১১ জন হুর নিহত এবং ১৮ জন ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হুরদের নিকট হইতে অনেকগুলি বন্দুক এবং বহু গুলী হস্তগত করা হইয়াছে। পুলিশ বাহিনীরও কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

বীর সাভারকরের ৬০তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনকল্পে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কলিকাতার হিন্দু নাগরিকবৃন্দের এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত আলোচনার জন্য ব্যগ্র—এই মর্ম্মে নিউইয়র্ক হইতে ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই সংবাদের প্রতি পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, "বর্ত্তমানে আমার ভারত ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছা নাই।" পণ্ডিত নেহরু ওয়ার্ধায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

২৯শে মে

মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন আন্দোলন প্রবর্তনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মাজী বলেন,—"আমি যাহাই করি না কেন, তাহা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারিবেন।"

মহাত্মাজী আরও বলেন, "ভারত হইতে সুশৃঙ্খলভাবে বৃটিশ শক্তি অপসারিত হইলে বৃটেন ভারতের শান্তিরক্ষার দায় হইতে মুক্ত পাইবে। তাহার ফলে সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য নহে (কেন না তাহাকে সমস্ত সাম্রাজ্যিক মতলবই ত্যাগ করিতে হইবে)—অকৃত্রিম এবং সম্পূর্ণ প্রকৃত মানব স্বাধীনতার স্বার্থের জন্যই এক স্বাধীন ভারতকে বন্ধুরূপে বৃটেন লাভ করিবে। আমরা ইহাই দাবী করিতেছি।"

নোয়াখালির সংবাদে প্রকাশ, উক্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ডাকাতির হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে।

৩০শে মে

কলিকাতায় প্রগতিশীল কোয়ালিশনী দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক উহাতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রগতিশীল কোয়ালিশনী দল যে সব নীতি ও সর্ত্তে অপর কোন দলের প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারেন, একটি প্রস্তাবে তাহা বিবৃত করা হয় এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঐরূপ ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রশ্নটির সমাধান অন্ততঃ ৬ই জুনের মধ্যেই করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অতিরিক্ত প্রতিনিধি লইয়া এবং শাসন বোর্ডের আরও দ্রুত ও সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য মন্ত্রিসভার অবিলম্বে সম্প্রসারণ দাবী করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার সুপারিশ করিয়া সভায় অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিসমূহের নিকট এই মর্ম্মে একখানি ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন যে, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর সাহায্যকারী ও সমর্থকগণ যদি তাঁহাকে অবাধে এবং সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতর যে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদিগকে সেই সমস্ত পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৩১শে মে

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট "প্রতাপ" নামক দৈনিক পত্রিকার উপর যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের সভাপতিত্বে বিহিটায় নিঃ ভাঃ কিষাণ সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

১লা জুন

সিন্ধু প্রদেশের যে সকল এলাকা হুরদের উপদ্রবে বিপন্ন হইয়াছে, তথায় অদ্য হইতে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। সামরিক অধিনায়ককে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুত এস সত্যমূর্তি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "গত ১০ দিন ধরিয়া শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন, আমি তাহার প্রত্যেকটি শব্দ পাঠ করিয়াছি। তাঁহার সহিত একমত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

২রা জুন

"ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রের সম্পাদক এবং হেরাল্ড প্রেসের কীপার পুনরায় উক্ত পত্রের নাম জারীর জন্য আবেদন করিলে লক্ষ্ণৌর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট ছয় হাজার টাকা জমানাত চাহিয়াছেন।

গত ২৭শে মে "জয়শ্রী"র সম্পাদিকা ও নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেল হইতে দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 13th JUNE, 1942. [৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গ্রেডি মিশনের রিপোর্ট—

গ্রেডি সাহেবের নেতৃত্বে মার্কিন দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এ দেশে আগমন করেন। ইঁহাদিগকে মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন বলা হইয়া থাকে। বর্তমান সমরোদ্যমে সাহায্য লাভ করিবার নিমিত্ত ভারতের সমর-সম্পর্কিত শিল্পের কার্য কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, ইহা নির্ধারণ করাই এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল। সম্প্রতি মিশন ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন; প্রথমত শুনিয়াছিলাম যে, মিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে না; কারণ তাহাতে শত্রুপক্ষ ভিতরের কথা জানিয়া ফেলিতে পারে। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার রিপোর্টের একটা চুম্বক প্রকাশ করিয়াছেন। এই চুম্বক অত্যন্ত অস্পষ্ট; ভারত সরকারের সরবরাহ সচিব স্যার হোমি মোদী রিপোর্টের সঙ্গে যে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আরও অস্পষ্ট। এমন সব অস্পষ্ট কথার উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্টের সম্বন্ধে গভীরভাবে কোন আলোচনা করা সম্ভব নহে। ইহার ভিতর সামান্য জিনিসই ধরিবার ছুঁইবার মত আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার ভিতর দিয়া ভারত সরকার এবং মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীটা এই সব ব্যাপারে ভারত সম্পর্কে মোটামুটি কিরূপ তাহা ধরা যায়, এই যাহা লাভ। মার্কিনের এই বিশেষজ্ঞ দলের তদন্তের ফল সম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজেদের তরফ হইতে কোনদিনই কোন রকম উচ্চাশা পোষণ করি নাই। মার্কিন এবং বৃটেন আজ ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামের আপাততঃ প্রয়োজন সিদ্ধ করাই মার্কিনের লক্ষ্য, ভারতের শিল্প বাণিজ্যের স্থায়ী প্রসারের জন্য তাঁহাদের মাথাব্যথা নাই; ভারত সরকারের মতিগতিও এ সম্বন্ধে কিরূপ আমাদের জানা আছে। তাঁহারা ভারতের বৃহত্তর প্রয়োজনকে এমন একটা সমর সংকটের মধ্যেও কোনদিন বড় করিয়া দেখেন নাই এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে এদিক হইতে যথোচিতভাবে উৎসাহিত করেন নাই; পক্ষান্তরে তেমন উদ্যম তাঁহাদের দিক হইতে হতাদরই লাভ করিয়াছে। মার্কিন মিশনের রিপোর্ট এবং তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মন্তব্য আমাদের সেই ধারণাকেই দৃঢ় করিয়াছে। মার্কিন মিশনের রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে ভারতীয় শিল্পের স্থায়ী বিস্তারের দিক দিয়া তাঁহারা কোন ব্যবস্থাই নির্দেশ করেন নাই। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে জাহাজ, বিমান বা মোটর গাড়ি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা না করিয়া এই সকল জিনিসের মেরামতি কাজের উপরই বেশী জোর দেওয়া দরকার। বলা বাহুল্য ভারত সরকারও মার্কিন মিশনের এই প্রস্তাব লুফিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষে জাহাজ, বিমান বা মোটরগাড়ি তৈয়ার করিবার জন্য চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার হোমি মোদী বলেন, ভারতবর্ষে আজকাল এত জাহাজ ও এরোপ্লেন আসিতেছে যে, সেগুলির মেরামতির কাজ করিয়াই কূল পাওয়া যাইতেছে না। ইহা তো গেল 'নেতির' দিক হইতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে কি করা যাইবে না সেই দিক হইতে। এদিক হইতে মার্কিন মিশনের সঙ্গে ভারত সরকারের মিল আছে; কিন্তু মার্কিন মিশন তাঁহাদের সমর প্রয়োজনের সাময়িক গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াও ভারতে যে সব শিল্পোদ্যম সম্প্রসারণের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং যেভাবে করিয়াছেন, সে সব সুপারিশগুলির একটাও যে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার উপযোগী নয়, ভারত সরকারের সরবরাহ সচিব মহোদয় ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন এবং মিশনের তৎসম্পর্কিত সব সুপারিশই কার্যত নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং মার্কিন মিশনের প্রস্তাবে ভারতের শিল্পোদ্যম সম্প্রসারণের যে সম্ভাবনা ছিল, ভারত সরকারের প্রতিকূলতায় তাহাও যে কার্যে পরিণত হইবে না, এমন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জল টানিবার ও কাঠ বহিবার কাজই ভারতবর্ষের বিধিনির্দিষ্ট কাজ—মার্কিন মিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু বাখ্যাত এই নীতিই আর এক দফায় সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতে চলিল।

রাজাজীর প্রচারকার্য—

শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারীর সূক্ষ্মবুদ্ধির খ্যাতি আছে। পাকিস্থানী প্রস্তাবকে অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু পাকিস্থানী প্রস্তাবের মূলীভূত যুক্তি ভারতের স্বার্থের পক্ষে এতটা সুস্পষ্ট-

ভাবে বিরোধী যে, রাজাজী তাঁহার এই প্রচারকার্যে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না। মাদ্রাজ প্রদেশের তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলে রাজাজীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সে অঞ্চলে তিনি জনপ্রিয়তা হারাইয়াছেন। তাঁহার অনুগতদিগকেও সেখানে ধিক্কৃত হইতে হইতেছে। রাজাজীর কূটবুদ্ধি অন্যদিকে ক্রমেই ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি সূক্ষ্ম কৌশলে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাদ্রাজের গোখলে হলে রাজাজী সেদিন যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি এই সভায় বলেন,—"এ দেশে কেহ কেহ এইরূপ আছেন, যাঁহারা ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। জাপানীরা কিছুদিন হইতে বেতারযন্ত্রে কিভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে আপনারা খোঁজ রাখেন কি না জানি না। জাপানীরা অকস্মাৎ মহাত্মাজীর অতি বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।" মহাত্মাজীর অভিমত রাজাজী অবশ্যই অবগত আছেন। তিনি কংগ্রেসের জন্য নূতন যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই, তবে একথাটা তিনি স্পষ্টভাষাতেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, বৈদেশিক কোন আক্রমণকারীকে তিনি কোন ক্রমেই সাহায্য করিবেন না। তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহেন এবং স্বাধীন ভারতই জগতের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ তিনি এই বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মহাত্মাজীর নূতন পরিকল্পনার কথা প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক দল লোক শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে কৌশলপূর্ণভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এ পরিচয় পাইতেছি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেদিন বার্দোলীতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে বোধ হয়, বেশী দিন আর আমাদের মধ্যে রাখা হইবে না। ভারতের শাসনকর্তারা ইতিপূর্বেও মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; বর্তমান সঙ্কটে তাঁহারা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিবেন ইহা অসম্ভব নয়; কিন্তু তাহার ফল অন্যান্য বারের অপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইবে। সেই নির্বুদ্ধিতার পথে কর্তারা কোনরূপ প্রেরণা লাভ না করেন, রাজাজীর অন্তত সে বিষয়ে সাবধান হইয়া কথা বলা উচিত।

বাঙলার লবণ শিল্প—

চিনির সমস্যা মিটে নাই—কয়লার সমস্যা আবার বাড়িয়াছে, বস্ত্রের সমস্যা উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে, এই সঙ্গে লবণ এবং কেরোসিনের সমস্যা তো আছেই। শুনিতেছি বাঙলা সরকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটি নাকি বাঙলা দেশে ব্যাপকভাবে লবণ শিল্পের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। সরকারের এই সাব কমিটি এবং সাব-কমিটির কাজের উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির রিপোর্ট জ্ঞানগর্ভ এবং তথ্যপূর্ণ ব্যাপার হইবে, ইহা বুঝিতেছি; কিন্তু নুনটুকুর অভাবে গরীবের মুখে অন্ন আজ জুটিতেছে না, আশু এই সমস্যার প্রতিকার কিসে হয়, গভর্নমেন্টের সেই দিকে উদ্যোগী হওয়াই বেশী প্রয়োজন। বাঙলার রাজস্ব এবং বিচার বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি মেদিনীপুর পরিদর্শনে গমন করেন। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলায় কি পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে এবং কিভাবে সেখানে লবণের কারবার সম্প্রসারিত করা সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন। বাঙলা দেশে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে এক মেদিনীপুর জেলাতেই নাকি ২০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। বাঙলা দেশের বর্তমানের এই লবণ সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভবিষ্যতে বড় রকমে এবং ব্যাপকভাবে কি হইবে সেই ভরসায় হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া বর্তমানের সঙ্গতি লইয়া এই সমস্যার যতটুকু সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে সমগ্রভাবে সেই প্রচেষ্টায় সরকারের ব্রতী হওয়া কর্তব্য। লবণের কারবার করিবার জন্য বাঙলা দেশে কয়েকটি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কারবার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের দ্বারা দেশের লবণের অভাব কিছু কিছু মিটিতেছে; কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার ভিতর এই সব কোম্পানীগুলিকে কাজ করিতে হইতেছে। আমাদের মতে এই সব কোম্পানীর সেই সব অসুবিধা দূর করা গভর্নমেন্টের কর্তব্য; তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির লবণ সাব-কমিটির রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হইবে, তখনকার প্রশ্ন তখন বিবেচনা করিবার এবং সেই সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার প্রচুর সময় থাকিবে।

যুদ্ধের গতি—

তিনটি কেন্দ্রে প্রধানত লড়াই ভীষণভাবে চলিতেছে—চীনে, লিবিয়ায় এবং রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের মিডওয়ে দ্বীপের কাছে জাপ নৌবহরের সঙ্গে মার্কিন নৌবহরের একটি বড় রকমের লড়াই হইয়া গিয়াছে এবং এই যুদ্ধে জাপ নৌবহরের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই নৌযুদ্ধের ফলে জাপান যদি কিছু কাবু হইয়া থাকে তবে ভারত মহাসাগরের অভিমুখে তাহার সমরোদ্যম সম্প্রসারিত হইতে বাধা ঘটিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই নৌযুদ্ধে জাপানের নৌবল যে বিশেষরূপে ধ্বংস হইয়াছে, আমেরিকান নৌবহরের অধ্যক্ষ এডমিরাল কিং সে কথা বলিতেছেন না। মোটের উপর আপাতত দেখা যাইতেছে যে, জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। তাহারা যুগপৎভাবে উনান, কোয়াংটান, ফুকিন এবং চেকিয়াং এই কয়েকটি প্রদেশে হানা দিয়াছে এবং তাহাদের বিপুল বাহিনীকে বাধা দেওয়া চীনের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। চীনারা সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া গরিলা নীতি অবলম্বন করিতেছে। জাপানীরা ভারত সীমান্ত হইতে ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদীর ধারে ৬৫ মাইল মাত্র দূরে আছে। তাহাদের ভারত আক্রমণের মতলব আছে কি না জানা যায় না, সম্ভবত তাহারা অধিকতর শক্তি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহারা বুঝিয়াছে যে,

ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্বে চীনকে পরাজিত করা তাহাদের প্রয়োজন। চীনকে যদি জাপান এই সুযোগে করতলগত করিতে পারে, তবে তাহার ঘাঁটি পাকা হইবে। ব্রহ্ম রোড বন্ধ হওয়ার পর চীনে বাহির হইতে সমর-সাহায্য প্রেরণ পথ বন্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র উড়োজাহাজের পথ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা কিংবা ইংরাজের পক্ষ হইতে চীনে সাহায্য পৌঁছিবার অন্য পথ নাই। একমাত্র রুশিয়ার পথ উন্মুক্ত বটে, কিন্তু রুশিয়া বর্তমান অবস্থায় চীনকে কার্যকরভাবে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। জাপান এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। জাপানীদের মনে এই ভয়ও দেখা দিয়াছে যে, মার্কিনদের নিকট হইতে চীন উড়োজাহাজের সাহায্য পাইতে পারে এবং চীনের পূর্ববর্তী অঞ্চলস্থ উড়েজাহাজের ঘাঁটি হইতে জাপানের উপর আক্রমণ হইতে পারে। এই আশঙ্কা যাহাতে কার্যে পরিণত না হয়, সে জন্য জাপানীরা আজ চেকিয়াং, কিয়াংসি ফুকিন, কোয়াংসি এবং হোনাই প্রভৃতি অঞ্চলে হানা দিতেছে এবং সমুদ্রপথে ঐ সব অঞ্চলে সেনা নামাইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে চীনের পক্ষে আজ খুবই সঙ্কট-কাল দেখা দিয়াছে। রুশিয়ার লড়াইয়ের সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, জার্মানী অদ্যাপি ককেসাস অঞ্চলে প্রবেশের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। খারকোভ এবং রোস্টভের ভিতরকার রেল লাইন ছিন্ন করিয়া জার্মানেরা রুশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল টিমোশিঙ্কোর বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়; এই দিক্-কার সীমান্তের জোর বাড়াইবার জন্য জার্মানেরা উত্তরদিকে বিশেষ-ভাবে লেনিনগ্রাদের অভিমুখে চাপ দিতে চেষ্টা করিবে। হিটলার এবং ফিনিশ সামরিক জেনারেল মেনারহামের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হয়ত ইহাই ছিল। ককেসাস অঞ্চলের লড়াইয়ের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়াই জার্মানেরা লিবিয়ার লড়াইকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। জার্মানদের পশ্চিম এসিয়ার সমরোদ্যমের মূলে আফ্রিকা এবং ককেসাসের বাহিনীর সংযোগ নির্ভর করিতেছে। জেনারেল রোমেল লিবিয়ায় আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে গাজালা এবং দক্ষিণে বীর হাকিম পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে লাইন করিয়া তোব্রুকের বৃটিশ বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিতে গিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। লিবিয়ার রণাঙ্গনে জার্মানরা আগাইতে পারে নাই। তাহারা হয়ত এই সীমান্তে পুনরাক্রমণ করিবে; কিন্তু রুশিয়ার লড়াইতে জার্মানীরা যদি সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারে, তবে পশ্চিম এসিয়ায় অভিযানের পরিকল্পনায় তাহাদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে। সমগ্র কেন্দ্রেই মিত্র পক্ষের আক্রমণাত্মক নীতি ধীরে ধীরে আকার ধরিয়া উঠিতেছে—অবস্থা দেখিয়া ইহাই মনে হয়।

বিধির বিধান—

পাটনা থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত রবিশরণ শর্মা সেদিন বর্তমান যুদ্ধের মূলীভূত দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, পৃথিবী জাতীয়তার ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু বিধাতার বিধান হইল আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সেই কারণে যুদ্ধের সাহায্যে জাতীয়তারূপে অসুর নিধন লীলা আরম্ভ হইয়াছে। আন্তর্জাতীয়তাবাদের পক্ষে এই শ্রেণীর ধোঁয়াটে কথা আমরা কিছুদিন হইতে খুবই শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু পর রাজ্য গ্রাস বা লুণ্ঠনই জাতীয়তাবাদের স্বরূপ নয়, অনেকেই এই জিনিসটা বুঝেন না। জগতের বিভিন্ন জাতির একটা বিশিষ্ট সভ্যতা আছে এবং সেই বিশিষ্ট সভ্যতার পথেই জাতির আত্মবিকাশ সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন জাতির স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং স্বাভাবিক পথে এই আত্মবিকাশ আন্ত-র্জাতীয়তার বিরোধী নয়, বরং আন্তর্জাতীয়তারই পরিপোষক। যাঁহারা মনে করেন, একই ছাঁচের মধ্যে ফেলিয়া জগতের বিভিন্ন সভ্যতার এই বৈচিত্র বিলোপ করিতে হইবে এবং আন্ত-র্জাতীয়তার তাহাই স্বরূপ, তাঁহারা আর যাহাই স্বীকার করুন, মানবের মর্যাদাকে মানেন না এবং তাঁহাদের আন্ত-র্জাতীয়তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মৈত্রী বলিতে যে বস্তু বুঝায় সে বস্তুটি নাই। বিশ্বপ্রেম বা আন্তর্জাতীয়তার যে অনুভূতি লইয়া এদেশের লোকেরা চলিয়াছে সে বস্তু মৈত্রীর উপর প্রতি-ষ্ঠিত। এদেশের মৈত্রীর সাধকগণ বলিয়াছেন,—আমরা নিজেদের বিশিষ্ট সভ্যতাকে বজায় রাখিয়া জগতকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিব এবং জগতের অন্যান্য জাতিও আমাদিগকে তাহাদের নিজেদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। জাতীয়তার ব্যভিচার হইতেছে বলিয়া জাতীয়তা নিন্দনীয় হইতে পারে না, প্রকৃত জাতীয়তার উপরই বিশ্বমানবের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে অস্বীকার করিলে ভুল হইবে।

সাম্য ও সাম্রাজ্যবাদ—

ভারত সচিব আমেরী সাহেব সেদিন বিলাতের অক্সফোর্ড ইউনিয়নে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি এই বক্তৃতায় বৃটিশ জাতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সোভিয়েট আদর্শের কিঞ্চিৎ তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়াছেন। আমেরী সাহেব বৃটিশ আদর্শের উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন এবং সোভিয়েট আদর্শের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, উপরে উপরে দেখিলে মনে হইবে যে, আমাদের আদর্শ হইল সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ, অপরকে অধীন করিয়া রাখাই ইহার নীতি এবং সে আদর্শ সোভিয়েটের আদর্শ অপেক্ষা অনেক দুর্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়, কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতাই হইল আমাদের আদর্শ। আমেরী সাহেব এই আদর্শের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার নজীর দেখাইতেন, তাহা হইলে আমাদের তেমন আপত্তি হয়ত থাকিত না; কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের নজীর উপস্থিত করিয়াছেন, এখানেই আমাদের আপত্তি। নিজেদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এ স্থলে উত্থাপন করা সম্ভবত তিনি প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন; কিন্তু

নজীরটা যুক্তিসহ হয় নাই। আমেরী সাহেব বলেন, আমরা ভারতবর্ষকে ঐক্য দিয়াছি, আভ্যন্তরীণ শান্তি দান করিয়াছি এবং আইন ও শৃঙ্খলা সেখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ভারতবর্ষের প্রতি আমেরী সাহেব এবং তাঁহার পূর্ববর্তী পদাধিকারীদের দানের মাত্রা এইখানেই শেষ হয় নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষকে আরও অধিক মূল্যবান পদার্থ দান করিয়াছেন। আমেরী সাহেব উদ্দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, আমরা গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভের আগ্রহ ভারতবাসীদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছি। এই সব বড় বড় কথা বলিতে আমেরী সাহেবের মুখে অবশ্য আটকাইবে না; কিন্তু প্রকৃত সত্যের বিচারে এগুলি অপলাপই প্রতিপন্ন হইবে। ভারতের শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্প্রসারণের নীতি নিশ্চয়ই ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক অবদান নয়; সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবী মানিবার অজুহাতে পাকিস্থানী প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক শাসনের দাবীকে পরিপুষ্ট করিবার পথ নহে। ভারতবাসীদের মধ্যে আজ গণতান্ত্রিক প্রেরণা জাগিয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু বৃটিশ রাজনীতিকদের ভারত সম্পর্কিত নীতির আনুকূল্যের দ্বারা উহা উদ্দীপ্ত হয় নাই পক্ষান্তরে সে নীতির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ দেশে উহা জাগিয়াছে, প্রকৃত সত্য হইল ইহাই।

কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন—

কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের চতুর্থ দল ডিমাপুরে প্রেরিত হইয়াছেন। এই দলকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিতে গিয়া কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সেদিন বলেন,—"বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতের স্বাধীনতার দাবী পূরণ করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিত"; কংগ্রেসের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে দুর্গতগণের সেবা এবং শুশ্রূষার কাজ লইয়াই কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। কিন্তু এই কাজও সামান্য নয়, এ জন্য প্রচুর আত্মত্যাগ এবং সঙ্কল্পশীলতার প্রয়োজন হয়। মাত্র কয়েক দিন হইল কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এই চতুর্থ সেবকবাহিনী গঠনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দেশবাসীদের নিকট আবেদন করেন। ইহার মধ্যেই সে আবেদন সার্থক হইয়াছে এবং সেবক বাহিনী গঠন করা সম্ভব হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা উৎসাহ বোধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদের মত এই যে, ব্রহ্ম সীমান্তের যতটা সম্ভব সন্নিকটবর্তী স্থানে এই সব সেবক বাহিনীকে সন্নিবিষ্ট করা সর্বাধিক প্রয়োজন। দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ব্যাধিগ্রস্থ এবং ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া যে সব আশ্রয়প্রার্থী ভারতে প্রবেশ করেন, সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁহাদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হয়, তবে অনেকের জীবনরক্ষা পাইতে পারে এবং আর্তজনের ক্লেশেরও অনেকটা লাঘব হয়। ইহার পূর্বে শিলচরে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, তাহার পূর্বদিকে মিশনের কাজ ছিল না, পশ্চিমে বাঙলার অভ্যন্তরভাগে ছিল। এখন ব্রহ্ম-সীমান্তের দিকে আরও অনেকটা আগাইয়া ডিমাপুরে মিশনের কাজ আরম্ভ হইল, ইহাতে আমাদের পরামর্শই রক্ষিত হইয়াছে, দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। আমরা আশা করি, আর্ত দেশবাসীর এই সেবাব্রত উত্তরোত্তর ব্যাপকতা লাভ করিবে।

সদিচ্ছার মূল্য—

ইংলণ্ডের 'স্পেকটেটর' পত্রে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে স্যার এ ভেলিন রেঞ্চ সাহেবের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী ভারতের বর্তমান রাস্ট্রনীতিক সমস্যার উপর অনেকখানি আলোকপাত করিবে এবং ইহাতে মহাত্মাজীর প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যেরও কিছু আভাষ পাওয়া যায়। স্যার এভেলিন মহাত্মাজীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, পনর বৎসর পূর্বের তুলনায় বর্তমানের বৃটিশ জনমত ভারতের অনুকূল। তিনি বলেন, গ্রেট বৃটেনে দুইটি শক্তিশালী দল আছে। এক দল বলেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত বৃটেনের সংস্কৃতির কোন সাদৃশ্য নাই। সুতরাং ভারতের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ইংরেজী ভাষাভাষী আমেরিকা এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে লইয়া একটি ফেডারেশন গঠন করা উচিত। আর এক পক্ষ বলেন, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই বৃটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হইতে পারিবে, ইহাই শ্লাঘার বস্তু। এ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর উত্তর সুস্পষ্ট। তিনি বলেন,—'আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতের সমান অংশীদারিত্ব ইচ্ছা করেন বৃটেনে এই মতাবলম্বী একটি দল আছে; কিন্তু তাহারা নগণ্য। তাঁহাদের মতকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং তাহাতে উৎসাহিত হইবার কিছু দেখি না; কারণ আমি জানি যাঁহারা ভারতের নীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন তাঁহারা অন্য ভাবাবলম্বী।' সমস্যা এইখানেই। ভারতবর্ষ যতদিন দুর্বল থাকিবে, ততদিন এই অবস্থার কোন প্রতিকার হইবে, আমাদের এমন আশা নাই; কারণ, ইতিহাস এই সত্যকেই প্রমাণিত করে যে, ভারতবাসীদিগকে সমানাধিকার প্রদানের আগ্রহ বৃটিশ জাতির দল বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ততদিনই সত্য থাকে, যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা ভারতের নীতি নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা লাভ না করেন। ক্ষমতা যখনই যাঁহার হাতে গিয়া পড়ে তখনই ভারতবাসীদের অযোগ্যতার দিকটা তাঁহার দৃষ্টিতে বড় হইয়া উঠে; সুতরাং ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটেনের দল বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের মতের কার্যত কোন মূল্যই নাই। ভারতবাসীরা যদি স্বাধীনতা লাভের শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হয়, তবেই ভারত সম্পর্কে বৃটিশের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে উদারতা, অনুকম্পা বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের সব কথা একেবারেই অবান্তর। মহাত্মাজীর অভিমত সমর্থন করিয়া আমরাও বলিব যে, দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ করিবার জন্যই রাজনীতিকেরা ঐ সব বাঁধা বুলি কপচাইয়া থাকেন।

প্যানিক

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আপিসের বাড়িটি পশ্চিমমুখী। বাহিরে আসিয়াই ধনেশের চোখে পড়িল, আকাশটা আশ্চর্যরকম লাল। আকাশের খানিকটা পড়িয়াছে রাস্তার অপর দিকের বাড়ির আড়ালে। অন্তরালের এই দিগন্তে নিশ্চয় স্তরে স্তরে সাজানো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মেঘ আছে। মেঘে প্রতিফলন ছাড়া আলোর ছটা এত রক্তিম হয় না।

হকারের চীৎকারে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এত জোরে চীৎকার করে কেন? খবর জানিবার তীব্র আগ্রহে মনটা চড়া সুরে বাঁধা তারের মত এমনিই টন টন করিতেছে, ফিস ফিস করিয়া 'জোর খবর' বলিলেই ঝন ঝন করিয়া করিয়া উঠে। এমন গলা ফাটানো আর্তনাদের তো কোন প্রয়োজন নাই। একটি পয়সা বাহির করিয়া ধনেশ একটা কাগজ কিনিল। অনেকেই কিনিতেছে। রবিবার তার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসিয়া একবার চোখ বুলানো ছাড়া খবরের কাগজের সঙ্গে জগদীশ কোন সম্পর্ক রাখিত না, সেও আজকাল সকালে বিকালে কাগজ কেনে। একটু বেলা করিয়া তার বাড়িতে গেলেই বিনা পয়সায় কাগজ পড়িতে পাইবে জানে, কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না।

স্পষ্টই বলে, 'না ভাই, অত পয়সার মায়া করলে আর চলে না। যে সময় পড়েছে, এক ঘণ্টা আগে জানা পরে জানার 'পরেই হয়তো বাঁচন মরণ।'

এমন করিয়া বলে যে সর্বাঙ্গ যেন সির্ সির্ করিয়া উঠে। মনে হয়, অতি সংক্ষিপ্ত একটি ঘণ্টা সময়ের ওপারেই যেন অনির্দিষ্ট ও অনন্যসাধারণ মরণ ভয়াবহ মূর্তিতে ওৎ পাতিয়া আছে, একটা অদ্ভুত অকথ্য সমাপ্তি ঘটিল বলিয়া!

জগদীশ তবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েকে মামাবাড়ি এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে। বাড়িতে সে থাকে একা, নিজে রান্না করিয়া খায়। যেমন হোক একজন ভাড়াটে পাইলে বাড়িটা ভাড়া দিয়া কোন সস্তা মেস বা বোর্ডিং-এ চলিয়া যাইবে। তার ভয় ভাবনা শুধু নিজের জন্য। স্ত্রীপুত্র পরিবারকে কোথাও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ধনেশের নাই। একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনিও আবার এমন জায়গায় থাকেন যেখানে নাকি আরও বেশি ভয়। এমন সঙ্গতিও তার নাই যে, মফস্বলে কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দেয়।

কৃপণ ও বিচক্ষণ জগদীশকে দেখিলে সাধে কি হিংসায় তার বুকটা জ্বলিতে থাকে। মনে হয়, এই লোকটাই বুঝি তার মন্দ অদৃষ্টের জন্য দায়ী।

ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় জগদীশের গোলগাল মুখে ছোট ছোট চোখ দু'টি পিট পিট করিতেছিল, ধনেশকে দেখিতে পায় নাই। ধনেশ নাগাল ধরিয়া বলিল, 'নতুন খবর কিছু নেই।'

জগদীশ বলিল, 'তা নেই, কিন্তু—'

জগদীশের মুখখানি চিন্তিত, বিমর্ষ। মাসখানেক আগে বৌ আর ছেলেমেয়েরা যখন কাছে ছিল, তখনও তার চিন্তার অন্ত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সক্রিয় উত্তেজনার ভাবও তার মধ্যে দেখা যাইত। এক মাসের মধ্যে মানুষটা কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে চলিতে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য অবসন্নভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে, কথা বলিতে সুরু করিয়া সেও আজকাল তেমনিভাবে থামিয়া যায়।

'একটা ব্যাপার ভাল ঠেকছে না।'—ঘাড়ে বসানো মাথাটা জগদীশ ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকে, 'এ আর পি'র একটা বিজ্ঞাপন বার হচ্ছিল, সাইরেণ বাজলে আশ্রয় নেওয়ার বিজ্ঞাপন, সেটা আজ ছাপে নি। আজকালের মধ্যে একটা কিছু হবে বোধ হয়, নইলে হঠাৎ—'

ধনেশের মুখ পাংশু হইয়া গেল।—'এমনি হয়তো বন্ধ করেছে।'

তাই কখনো করে? কেন করবে? একটা বিজ্ঞাপন চলছিল, কি দরকার ওদের সেটা বন্ধ করবার? এতো আর তোমার আমার খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয়, একটা মানে নিশ্চয় আছে। আমি ভাবছিলাম কি—'

কথা বলিতে বলিতে দু'জনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আরও কয়েকজন কাছে দাঁড়াইয়াছে। উৎকর্ণ, উদ্গ্রীব হইয়া আছে। ঢোঁক গিলিতে গিয়া জগদীশ প্রথমবারের চেষ্টায় ঢোঁকটা গিলিতেই পারিল না।

—'আমি ভাবছিলাম, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাত্রেই হয়তো একটা কিছু হয়ে যাবে, এটা জানাবার জন্য ওরা বিজ্ঞাপনটা বন্ধ করেছে। ভেবেছে, রোজ বিজ্ঞাপন বেরোয়, কেউ পড়ে না, আজ বন্ধ করে দিলে এদিকে সকলের নজরে পড়বে। বিজ্ঞাপন ছাপলে যতটা কাজ হত তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না ছাপলে। এইসব ভেবে—'

অপরিচিত যারা কথা শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজন সায় দিয়া বলিল, 'সেটা সম্ভব। আবার এও হতে পারে যে, খবরটা ওরা চেপে দিতে চায়। বিজ্ঞাপনটা নেই দেখে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববে এখন দু'চারদিন কোন ভয় নেই।'

আরেকজন বলিল, 'যা বলেছেন মশায়।'

ট্রামে উঠিয়া বসিয়া জগদীশ বলিল, 'এমন ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই কি বলব। দোটানায় পড়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়ে পাঠালাম এক জায়গায় উনি গেলেন আরেক জায়গায়, বিপদের সময় কার কাছে ছুটব আমি? এখানে গেলে ওখানকার ভাবনা, ওখানে গেলে এখানকার ভাবনা।—দাও, একটা বিড়ি দাও।'

'বিড়ি নেই।'

বিড়ি ছিল। জগদীশকে দিবে না। ট্রামে এতলোকের সামনেই লোকটাকে মারিবার ইচ্ছা হইতেছিল। সব সময় কেবল নিজের কথা ভাবে, নিজের কথা বলে। বিপদ যেন শুধু তার একার। ধনেশ যেন নিশ্চিন্ত মনে পরমসুখে দিন কাটাইতেছে, তার ভাবনা করিবারও কিছু নাই, বলিবারও কিছু নাই। এতকালের বন্ধু যে লোকটার, নিজে রাঁধিয়া ভাল খাইতে পায় না ভাবিয়া এক মাসের মধ্যে কতবার ওকে যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রতিদানে তাকে একদিন একটু মুখের সহানুভূতি জানানোর অবসরও ওর হয় না। যখন তখন শুধু শুনাইতে পারে, এবার পাঠিয়ে দাওহে, সকলকে এবার কোথাও পাঠিয়ে দাও, আর দেরী নয়।

জানাশোনা যত লোক শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে, জগদীশের মত প্রিয়জনকে দূরে পাঠাইয়া নিজে যাওয়ার জন্য যারা প্রস্তুত হইয়া

আছে, তাদের বিরুদ্ধে নিরুপায় বিদ্বেষ ও অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মানুষ সম্বন্ধে ধনেশের চেতনায় এক অদ্ভুত বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ট্রামে মানুষের ভিড়, পথে অজস্র লোক চলিতেছে। এতলোকের মধ্যে ভয়ার্ত ধনেশের নিজেকে একা, অসহায় মনে হয়। কেউ তার কথা ভাবিবে না, তার দিকে চাহিয়া দেখিবে না। শহরে শুধু চলাফেরা করিতেছে স্বার্থপর, হৃদয়হীন দু'পেয়ে জীব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মুখোস সকলের খসিয়া গিয়াছে।

মুখ ফিরাইয়া সে দেখিতে পায়, পিছনদিকের লম্বা সিটে বসিয়া একজন কি যেন বলিতেছে, আশেপাশে কয়েকজন মন দিয়া শুনিতেছে। রাস্তায় জগদীশের কথা শুনিয়া এই লোকটিই খবরের কাগজে এ আর পি'র বিজ্ঞাপন না থাকার নতুন ব্যাখ্যা দিয়াছিল। বেশ বুদ্ধিমানের মত চেহারা লোকটির। ভিতরের খবরও হয়তো কিছু কিছু রাখে। কাছে গিয়া শুনিলে হইত না, কি বলিতেছে?

বাড়ির সামনে ছোট রোয়াকে বসিয়া ছোট ভাই রমেশ পাড়ার ক্ষিতীশের সংগে কথা বলিতেছিল। তার হাতে ছিল সিগারেট, মুখে ছিল হাসি। ধনেশকে দেখিয়া হাসি মিলাইয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। জ্বলন্ত সিগারেটটা আড়াল করার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। ধনেশের সামনে কোনদিন সে সিগারেট খায় না। ঔদ্ধত্য দেখাইতে চাহিয়াও অভ্যাসের বশেই বোধ হয় একটু তাকে ইতস্তত করিতে হইল, তারপর সিগারেটটা মুখে তুলিয়া টান দিল জোরে।

আজ তিনদিন রমেশের সংগে কথা বন্ধ।

রমেশ বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিতে আসিয়াছিল। শুনিবামাত্র ধনেশ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল একেবারে।

'দাও, তাই পাঠিয়ে দাও। আজ পাঠিয়ে দাও—এই দণ্ডে। তুমিও থাকগে' শ্বশুরবাড়ি—আমাদের সংগে থেকে মরবে কেন!'

'চাকরী ছেড়ে আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব, তাই বুঝি ভাবলেন আপনি?'

'ভাবব না? বৌমাকে রাখতে গিয়ে তুমি আবার ফিরে আসবে, অত বোকা বুঝিয়ো না আমায়।'

'না আপনি খুব বুদ্ধিমান। এত যদি বুদ্ধি আপনার, দিনরাত ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন কেন? আপনাকে ক'দিন বারণ করেছি। আপনি কথা শোনেন না, পাগলের মত করতে থাকেন। আপনাকে ওরকম করতে দেখলে বাপ মা ভাইবোনের জন্য ছেলেমানুষের ভাবনা হবে না?'

লাবণ্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া রমেশ বক্তৃতা আরম্ভ না করিলে হয়তো অন্ধ ক্রোধের প্রথম ধাক্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেও ধনেশ আত্মসম্বরণ করিতে পারিত। রমেশকেও দোষ দেওয়া যায় না। এ বাড়ির অস্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে লাবণ্যের মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সকলের অবিরাম পরামর্শ ও আলোচনায় ভয়ংকর সব সম্ভাবনা যতই অনিবার্য ও ঘনিষ্ট হইয়া উঠে, বাপের বাড়ির সকলের জন্য সে তত উতলা হইয়া পড়ে। কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কপাল কুটিয়া অনর্থ করিতে থাকে। সে সমস্ত সহ্য করিতে হয় রমেশকেই।

'ছেলে মানুষ! বয়স ভাঁড়িয়ে ধিঙ্গী মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বাপ, ছেলেমানুষ! পারুল ছেলেমানুষ নয়? পারুল যদি এখানে থাকতে পারে, তোমার আহ্লাদী বৌও থাকতে পারবে।'

পারুল ধনেশের বড় মেয়ে। বছর সতের বয়স হইয়াছে, মানুষকে বলা হয় চোদ্দ।

'পারুল আমাদের কাছে আছে।'

'বৌমাও তাই আছেন।'

তখন রমেশও আর ধৈর্য ধরিতে পারে নাই।

'সেই জন্যই সরিয়ে দিচ্ছি। এ বাড়িতে মানুষ থাকে না।'

'এ বাড়িতে মানুষ থাকে না, না—কি থাকে, জন্তু জানোয়ার?'

'পাগল থাকে। আপনার মত যাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে গেছে।'

ঠিক পাগলের মতই তখন দু'পা সামনে আগাইয়া ধনেশ তার ত্রিশ বছর বয়সের ভাইএর গালে চড় বসাইয়া দিয়াছিল। ধনেশের নিজের বয়স পঞ্চাশের কাছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। মাঝখানে তিনটি বোন, তারপর এই ভাই। এত বড় উপযুক্ত ভাইকে চড় মারিয়া বসার ঝোঁক অবশ্য ওই একদিনের একটিমাত্র কলহে জাগে নাই। কিছুদিন হইতে মনটা বিগড়াইয়া যাইতেছিল।

মনে হইতেছিল, রমেশও বুঝি তার অবস্থা বুঝে না, তার কথা ভাবে না, অন্য সকলের মতই সে স্বার্থপর। প্রথমে রমেশের নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভাব সে বুঝিতে পারিত না। যে খবর শুনিয়া তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, খবরটা মন দিয়া শুনিবার আগ্রহ পর্যন্ত রমেশের দেখা যাইত না। পরামর্শ করিতে ডাকিলে কেমন উসখুস করিতে থাকিত, বিরক্ত হইয়া বলিত, অত ভেবে লাভ কি? আপিস যাইতেছে, আড্ডা দিতেছে, গান গাহিতেছে, বৌ আর পারুলকে সংগে করিয়া সিনেমায় যাইতেছে, কিছুই যেন হয় নাই, সর্বনাশ যেন ঘনাইয়া আসে নাই ঘরের দুয়ারে। বিস্ময়ের পর জাগিয়াছিল বিরক্তি ও ক্ষোভ আর সেই মনোভাব মনের মধ্যেই পাক খাইতে খাইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহের ঃ ছেলে নাই, মেয়ে নাই, শুধু সে নিজে আর তার বৌ, তাই কি রমেশ এমন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে?

তাই বটে। এ যুগের ভাই, বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছে এক স্কুলে পড়া ধিঙ্গী মেয়েকে, দিবারাত্রি সে মন্ত্র দিতেছে কাণে কাণে, তার কি দায় পড়িয়াছে দাদার ভাবনা ভাবিতে গিয়া মাথার টনক্ পড়িতে দিবার।

রমেশের প্রত্যেক কথা আর কাজে সে এই চিন্তার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল। তার সংগে সে যে পরামর্শ করিতে চায় না তার কারণ তার দায়িত্বের ভাগ নেওয়ার ইচ্ছা তার নাই, নিজে কি করিবে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে সরাইয়া দিতে চায় বলিয়া তাকে সে তিন মাসের ছুটি লইয়া চেঞ্জে যাইতে বলে। পাটনায় একটা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে? করিবে না, চাকরীর ছলে এই তো তার সরিয়া যাওয়ার সময়। খরচ কমাইয়া টাকা জমাইতেছে, তাকে বলে নাই, তার মানেও ধনেশ জানে। রমেশের গম্ভীর ও চিন্তিত হইয়া উঠিবার কারণ, তর্ক আর কথা কাটাকাটি আরম্ভ করার কারণ, শহরের হাজার হাজার লোক যে স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, সেইখানের বাপমা ভাইবোনের জন্য লাবণ্যকে উতলা হইতে পরামর্শ দিবার কারণ, সব ধনেশের কাছে জলের মত পরিষ্কার।

সুতরাং কারণে অকারণে খিটিমিটি বাধিতেছিল। কেউ কারো কথা সহ্য করিতে চায় না, পরস্পরের নিঃশব্দ উপস্থিতি পর্যন্ত সময় সময় দুজনের অসহ্য মনে হয়। মনের এই চিরন্তন প্যাঁচ, ঢিল দেওয়ার, আলগা করার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ। তারপর পুলককে উপলক্ষ করিয়া দু'জনের মধ্যে কয়েকবার রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল।

মুখ অন্ধকার করিয়া রমেশ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'পুলককে ক্ষৌণিতর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুক। জবরদস্তি লড়ায়ে পাঠাবার আইন পাশ হচ্ছে শুনলাম।'

'আইন পাশ হলে ওখানে ওকে ধরতে পারবে না?'

'তুমি বোঝো ছাই। কলেজ থেকে নাম, ঠিকানা জেনে খুঁজতে আসবে, এখানে না থাকলে বলতে পারব, কোথায় গেছে জানি না। ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাও বলতে পারব।' ধনেশের ভুরু

কুঁচকাইয়া গেল, 'একথাটা তো আগে খেয়াল হয়নি! কাগজে ওর নামে একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন আগে থেকে ছাপিয়ে দিলে তো মন্দ হয় না?'

'আপনি ওর মাথাটা খাচ্ছেন দাদা। কোথায় আপনি কি গুজব শুনে আসবেন আর আপনার এতবড় জোয়ান মন্দ ছেলে চোর-ডাকাতের মত লুকিয়ে বেড়াবে! এর চেয়ে লড়ায়ে গিয়ে মরা ভাল। আইন যদি পাশ হয়, লড়ায়ে না যেতে চায়, জেলেই নয় যাবে। তাও ঢের ভাল।'

'তুমি তো তা বলবেই।'

একটা বিশ্রী কলহ হইয়া গেল। কাকার কাছে বকুনি আর উপদেশ শুনিয়া পুলক একবার ঠিক করিতে লাগিল ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাইবে না, আবার উমার কান্না ও ধনেশের ধমকধামক যুক্তিতর্কে মত বদলাইয়া ফেলিতে লাগিল। ধনেশ ও রমেশের মধ্যে আরও কয়েকটা সংঘর্ষ হইয়া গেল, প্রচণ্ড এবং কুৎসিৎ। মনে হইল পুলকের ভালমন্দের প্রশ্ন ভুলিয়া রমেশও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, তার জিদ চাপিয়া গিয়াছে যে, পুলককে কোথাও সে যাইতে দিবে না।

এমনি যখন চলিতেছিল, লাবণ্যকে বাপের বাড়ি পাঠানোর কথাটা রমেশ তাকে বলিতে গেল এবং সংক্ষিপ্ত অর্থহীন কলহের পর ধনেশ তার গালে বসাইয়া দিল চড়। ক'দিন পরে মাসকাবারে বেতন ও ছুটি পাইলে রমেশ নিশ্চয় লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিবে। নিজে বোর্ডিং অথবা মেসে চলিয়া যাইবে।

মাঝখানের এ ক'টা দিন এমনিভাবে মুখের সামনে সিগারেট টানিয়া, নির্বিকার উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া, একা লাবণ্যকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া, তার সবচেয়ে গভীর হতাশা ও বিষাদের মুহূর্তে পাশের ঘরে ঠুংরী সুরে গান ধরিয়া দাদাকে আঘাত দেওয়া ও অপমান করার কাজে লাগাইতেছে।

সদরের চৌকাট পার হওয়ার সময় চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনদিনে রমেশের গায়ের জ্বালা কমে নাই। আজ ভাই-এর সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়াছিল। পয়লা কি দোসরা তারিখে লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিবে বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তারপর কিছুক্ষণ একথা ওকথা বলিবে। বিপদের কথা নয়, ভয়ের কথা নয়, সংসারের সাধারণ কথা। কিন্তু তাকে দেখিবামাত্র সাপের মত ক্রুর ভঙ্গিতে যে ফণা তুলিয়াছে, তার সঙ্গে যাচিয়া কিভাবে কথা বলা যায়!

সিগারেট খাক, সেজন্য নয়। ত্রিশ বছরের উপযুক্ত ভাই, সামনে খাইলেও দোষ হয় না। তবু একটু আড়াল দিবার, একঘরে থাকিলেও অন্তত তার পিছন দিকে জানালায় সরিয়া গিয়া সিগারেট টানিবার যে প্রথা ছিল, যুগযুগান্তের সংস্কারের চেয়ে সেটা কম বর্জনীয় নয়। রমেশ যে শত্রুতা করিতে চায় তার এত স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আর কিসে মিলিত! একটি বালা ভাঙ্গিলে শিকল ছিঁড়িয়া যায়, এই একটি নিয়ম ভাঙ্গিয়া ভাই তার স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের বাঁধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বাড়ির মধ্যে ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। এক-জনকে মারিয়া উপরে গিয়াছে উমা, আরেকজনকে পিটাইতেছে পারুল। ব্যাপারটা বুঝিয়া ধনেশ মুখ খুলিতে না খুলিতে তরবর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া কি জোরে ধাক্কা দিয়াই সে পারুলকে হটাইয়া দিল। বেহায়া নচ্ছার মেয়ে, খাইয়া খাইয়া গায়ে তার এতই কি তেল বাড়িয়াছে যে, সময় নাই অসময় নাই ভাইবোন-দের মারে?

'তুমি মারলে আমায়! তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিছু বললে না বাবা?'

পারুলের নাক ফুলিয়া উঠিয়াছে, সাদাটে সরু গলায় তিন চারটা নীল শিরা ফাঁপিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।—'থাকবো না তোমাদের বাড়িতে আমি আর। নার্স হয়ে যাবো—এক্ষুণি নার্স হয়ে যাবো।'

আঁচল ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া মেয়েকে থামাইয়া উমা বলিল, 'কোথা যাচ্ছিস্?'

'আমি এক্ষুণি শীলাদির কাছে গিয়ে নাম লেখাবো। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি আমাকে!'

গা ধুইতে নীচে নামিয়াছে, গায়ে জামা নাই। ওসব যেন গ্রাহ্যও করে না, এমনিভাবে পারুল চেঁচাইতে থাকে। উমা আঁচল ছাড়িয়া না দিলে সে যেন বিনা কাপড়েই পথে বাহির হইয়া যাইবে, এমনি উন্মাদিনী মনে হয় তাকে। দেখিলে কল্পনাও করা যায় না, কয়েকমাস আগে এই পারুল ছিল ধীর, স্থির, শান্ত ও সংযত মেয়ে, চুপচাপ সংসারের কাজ করিত, মুখে ফুটিয়া থাকিত সলজ্জ নম্র হাসি।

'তোরা কি আমায় পাগল করে দিবি!' ধনেশ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া লাবণ্য নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতেছে। নীচের উঠানে যা ঘটিতেছে সে সব যেন অজানা অচেনা প্রতিবেশীর বাড়ির ব্যাপার, তার কিছু বলারও নাই করারও নাই। ভাসুর আসিয়া দাঁড়ানোর অনেক আগে হইতেই সে এইভাবে এইখানে দাঁড়াইয়া উদাসীনের মত সব দেখিতেছিল। মাজা বাসনের তাড়া উমা পা দিয়া ছুঁড়িয়া দিল—দিক। দু'বছরের শিশুকে বেদম মারিয়া উমা উপরে উঠিল,—উঠুক। খেলা ফেলিয়া পাঁচ বছরের মিনু উপর হইতে সাবান আনিয়া দিতে না চাওয়ায় পারুল তাকে পিটাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—করুক। মা যদি পাগলা গরুর মত মেয়েকে গুঁতায়, সতর আঠার বছরের মেয়ে যদি সদরের খোলা দরজার সামনে উঠানে কোমর পর্যন্ত উদলা করিয়া দাঁড়ায়, তাতেও তার কিছু আসিয়া যায় না। তার যে বাপ মা, ভাইবোন ওদিকে মরিয়া গেল, সাতদিন খবর আসে না!

লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়া ধনেশ চীৎকার করিয়া বলিল, 'তুমি কি একবার নীচে নামতে পারনা বৌমা?'

লাবণ্য ইঞ্চি দুই ঘোমটা টানিয়া দিল। ভাসুরের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা শাঁখের ফুঁ পড়ে, ঘরে ঘরে ধুনা দেওয়া হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বলিবার আগে মাটির প্রদীপটি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মিনিটখানেকের জন্য আলো দিয়া আসে। কিছুই বাদ যায় না, সব বজায় আছে। রান্নাঘরে রান্না হইতেছে, ছেলেমেয়েরা পড়িতে বসিয়াছে, রমেশের ঘরে রেডিও বাজিতেছে, দুধ খাইয়া প্রতিদিনের মত কোলে শুইয়া ঘুমানোর জন্য খোকা আসিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব বজায় আছে। সকালে উঠিয়া চা খাওয়া, কাগজ পড়া, স্নানাহার সারিয়া আপিস যাওয়া, ছুটির পর বাড়ি ফেরা, খোকাকে ঘুম পাড়ানো, ছেলেমেয়ের পড়া বলিয়া দেওয়া, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসা, খাওয়া এবং ঘুমানো। তবু সংসার তার বেঠিক, বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। বাহিরে হইতে একটা অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত প্রচণ্ড শক্তি চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া তার সংসারের আনাচে কানাচে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ভিতর হইতে বিরামহীন সক্রিয় চাপের মত কাজ করিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের। খোকাকে কোলে শোয়াইয়া অভ্যাসমত ধীরে ধীরে তাকে থাপড়াইতে থাপড়াইতে অবসাদে ধনেশের চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। এ আর পি'র বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়াছে, জগদীশ আর ট্রামের সেই কাঁচাপাকা চুল বুদ্ধিমানের মত চেহারার লোকটি বলিয়াছে, আজ রাত্রেই হয়তো কিছু ঘটিবে। এ চিন্তা মন হইতে দূরে করিবার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। কিন্তু এই আতঙ্ক পর্যন্ত তার যেন আজ কেমন অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বুককাঁপানো উত্তেজনায় অবশ করা শিহরণের মত মুহূর্মুহু শিরায় শিরায় বহিয়া গিয়া মনকে দিশে-হারা করিয়া দিতে পারিতেছে না। একসঙ্গে আরেকটা আতঙ্ক তার

চেতনাকে দখল করিতে চাহিতেছে—বাহিরের বিপদ ঘটিবার আগেই তার ঘর ভাঙিয়া যাওয়ার, সর্বনাশ হওয়ার আতঙ্ক। একটা বিষ যেমন আরেকটা বিষের ক্রিয়া নাকচ করিয়া দেয়, সংসারের ভিত্তি ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে খেয়াল করায় নূতন এক ভয় তার এতদিনের ভয়কে দুর্বল করিয়া দিয়াছে।

জগদীশ ডাকিতে আসিলে সে তাকে ফিরাইয়া দিল। পড়িতে পড়িতে ছেলেমেয়েরা অবিরত ঝগড়া আর মারামারি করিতেছে। ওদের স্বাভাবিক দুরন্তপণার মধ্যেও যেন কেমন খাপছাড়া বেপরোয়া হিংস্র ভাব দেখা দিয়াছে। মেজাজ যেন ওদেরও তিরিক্ষি হইয়া উঠিয়াছে। তার পর এক সময় ছেলেমেয়েরা ভাত খাইতে গেল, উমার গালাগালি আর মার খাইয়া পল্টুর আর্ত ও মিনুর নাকিসুরে কান্না ধনেশের কানে আসিতে লাগিল। চুপ করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। অবসাদ ধীরে ধীরে কেমন একটা মৃদু ও শান্ত নেশায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, দুর্বল জ্বরো রোগীর আলস্যের মত। ঘরের বাহিরে বারান্দায় হঠাৎ পারুল আর লাবণ্যর মধ্যে কথা কাটাকাটি সুরু হইয়াছে। সেই পারুল আর সেই লাবণ্য! সখির মত গলায় গলায় ভাব ছিল এই দু'টি ভাসুরঝি আর কাকীমার। কাড়াকাড়ি করিয়া লাবণ্য সংসারের কাজ করিত, উমার ছেলেমেয়ে মার চেয়ে কাকীমার আদর পাইত বেশী। সংসারের কাজ করা লইয়া পারুলের সঙ্গে আজ সে ঝগড়া করিতেছে! একতলা হইতে উমা চীৎকার করিয়া একটা বিশ্রী কথা বলিল লাবণ্যকে। লাবণ্য ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল, 'তোমার খাই না পরি যে যা মুখে আসছে বলছ দিদি?'

লাবণ্য এত জোরে কথা বলিতে পারে? এত কর্কশ তার গলা?

অনেকক্ষণ পরে কি কাজে ঘরে আসিয়া ধনেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। উমা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি পাড়ায় দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে বাহির হইয়াছে। বাড়িতে তার তো চুপচাপ একা বসিয়া থাকা স্বভাব নয়, বাড়ি থাকিলে এতক্ষণ কত আলোচনা, কত পরামর্শ তার চলিতে থাকে।

'কি হয়েছে গো? আজ কিছু হবে নাকি?' ভয়ে উমার কথাগুলি প্রায় জড়াইয়া গেল।

'শরীরটা ভাল নেই। পুলক ফেরে নি?'

'না। ঘরে বসে আছ, খেয়ে তো নিতে পারতে এতক্ষণ? সারারাত হেঁসেল আগলে বসে থাকব?'

সকালে চার বস্তা চাল, এক বস্তা ডাল এবং নুন, তেল, মসলা মুদি দোকান হইতে আনা হইয়াছিল। বাজারে গিয়াছিল মাছ-তরকারী কিনিতে, রসিকবাবু এমন ভয় দেখাইয়া দিলেন যে, মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে আর ভরসা হইল না, ধার করিয়াই জিনিসগুলি কিনিয়া আনিল। মাস ছয়েকের খাদ্য বাড়িতে সঞ্চয় করা আছে, তবু আরও কিছু অবিলম্বে এই দণ্ডে সংগ্রহ করিয়া ফেলাই ভাল। মুদিওয়ালা কি সহজে ধার দিতে চায়! বিশ বছরের যে খদ্দের, তাকে পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্য বাকি দিতে সে নারাজ। বিকালে টাকা পাঠাইয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে ধনেশ জিনিসগুলি পাইয়াছিল।

পুলককে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, এখনও সে ফেরে নাই। ক'দিন সে বাড়ি ফিরিতে এমনি রাত করিতেছে। কোথায় যায়, কি করে ছেলেটা, কে জানে। সেও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তিন-চার বছর আগে বয়স যখন তার পনের-ষোল বছর, অকারণে তার চেহারা খারাপ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বভাব হইয়াছিল মেয়েদের মত লাজুক, চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে-বয়সের কদভ্যাস ছেলেকে ধরিয়াছে টের পাইয়া কত রাত্রি ধনেশের তখন ঘুম আসে নাই। তার পর ছেলের চেহারায় লাবণ্য ফিরিয়া আসিলে, স্বভাব স্বাভাবিক হইলে, ধনেশের যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। খাইতে খাইতে ধনেশের মনে পড়িল, কিছুদিন হইতে পুলকের চেহারা আর চালচলনে আবার যেন সেই আগেকার শোচনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দেখিয়াও এতদিন সে দেখে নাই। চারিদিকের অস্বাভাবিকতার পীড়নে, তার দিশেহারা ভয়-ভাবনার ছোঁয়াচে, আবার কি ছেলেটা বিগড়াইয়া গেল?

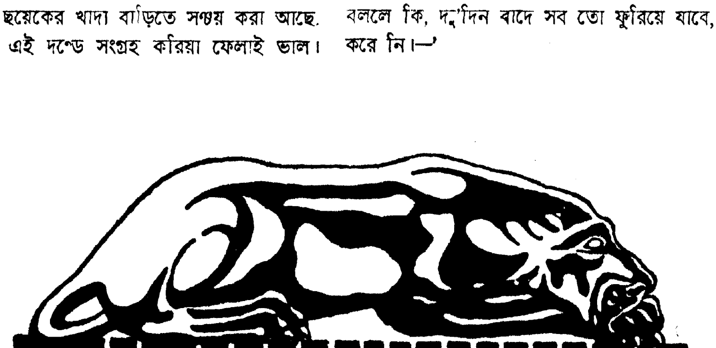
মুখে ভাত রুচিল না। অর্ধেক খাইয়া ধনেশ উঠিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল পুলকের। আজ একবার ভাল করিয়া ছেলেটাকে চাহিয়া দেখিতে হইবে। কাছে বসাইয়া কথা বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তার কি হইয়াছে। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল, সংসারের কাজ ফুরাইয়া গেল, নীচের ও উপরের আলোও নিভিয়া গেল। শুধু আলো জ্বালিয়া ধনেশ আর উমা বসিয়া রহিল ছেলের অপেক্ষায়। শ্রান্তিতে ধনেশের শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শঙ্কায় মন তার সজাগ, সচেতন হইয়া রহিল।

পুলক ফিরিয়া আসিল রাত্রি প্রায় একটার সময়। গলিতে রিক্সার আওয়াজ শুনিয়াই ধনেশ ও উমা নীচে নামিয়া সদর খুলিয়া দিয়াছিল। পুলক রিক্সা হইতে নামিল, ভাড়াও মিটাইয়া দিল। সমস্ত শরীর শক্ত আর সোজা করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সময় চৌকাটে পা বাধিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া ধনেশের ধমকে উমা চুপ করিয়া গেল। পুলক নিজেই তখন উঠিয়া বসিয়াছে।

ছেলেকে কড়া কথা বলার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। শ্রান্তকণ্ঠে অসহায়ের মত সে শুধু প্রশ্ন করিল, 'মদ খেলি কেন পুলক?'

পুলক বলিল, 'কেন খাব না? ক'দিন বাঁচব আর। তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে কি, দু'দিন বাদে সব তো ফুরিয়ে যাবে, আয় মদ খেয়ে ফুর্তি করে নি।—'





১২

শাশ্বতী কেবলমাত্র চাবুকটা লইয়া ঘরের বাহির হইতে-ছিল, এমন সময় আসিয়া পড়িল ব্যারিস্টার সুজিত সোম—

ধনীর পুত্র, খেয়ালের বশেই বিলাত গিয়াছিল এবং খেয়ালের বশেই ব্যারিস্টারী পাশ করিয়াছে, বৎসর তিন-চার বিলাতে কাটাইয়া মাস আট-নয় সে ফিরিয়াছে।

ভবানীপুরে তাহার বাড়ি, সেখান হইতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া বালিগঞ্জে এ বাড়িতে সে আসে। বাড়ির সকলেই জানে—স্বাতীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, স্বাতীকেই সে পছন্দ করে এবং স্বাতীও তাহাকে ভালোবাসে।

কি জানি কেন, শাশ্বতী প্রথম হইতে এই ছেলেটিকে দু চোখে দেখিতে পারে নাই। মিঃ সোমের গল্প বলিবার শক্তি অদ্বিতীয়, লোককে বিমোহিত করিতে, হাসাইতে তাহার সমকক্ষ খুব কম ছেলেই আছে।

শাশ্বতী মুখ বাঁকাইয়া বলিত—ধাপ্পাবাজ।

স্বাতীর সামনে বেশী কথা সে বলে নাই—কেবল গত কাল তাহার মুখ দিয়া দুই-চারিটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য শেষ পর্যন্ত সে বেশ একটু অনুতপ্ত হইয়াছে।

স্বাতীকে সে স্পষ্টই জানাইয়াছে, সুজিত সোমকে সে মোটেই বিশ্বাস করে না—তাহার মনে হয় লোকটা সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজ।

স্বাতী ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তবু স্বাভাবিকভাবেই বলিয়াছিল—"তিনি যে ধাপ্পাবাজ, সবই মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া দরকার।"

ডক্টর সুখময় বসাক কেবলমাত্র বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, সে বিলাতে পাঁচ-সাত বৎসর ছিল এবং ওখানকার ভারতীয় ক্লাবের সে একজন মস্ত বড় পাণ্ডা ছিল, সেই সূত্রে ভারতীয় প্রত্যেক ছেলের নাড়িনক্ষত্রের কথা সে জানে।

শাশ্বতী আজ চলিয়াছে তাহারই নিকটে। যেমন করিয়াই হোক এই লোকটির ভণ্ডামি সে বাহির করিবে, এই তাহার প্রতিজ্ঞা। স্বাতী তাহার যত বিরুদ্ধাচরণই করুক, তবু সে তাহার সহোদরা এবং সেই জন্যই শাশ্বতী তাহাকে ভণ্ড, প্রতারকের হাত হইতে বাঁচাইতে চায়।

ডক্টর বসাক তাহার বন্ধুস্থানীয় লোক—সেদিন তাহাদের বাড়িতে পার্টি ছিল, তাহাতে শাশ্বতী নিমন্ত্রিত হিসাবে যোগ দিয়াছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন সুজিত সোমের সম্বন্ধে ডক্টর বসাকের মুখে যে সব কথা শুনিয়াছে, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেছে; তথাপি প্রথমটা সে বিশ্ব নাই। ডক্টর বসাক সেদিন বলিয়াছিলেন, "এখ মিস বোসকে বাঁচাতে পারা যায়, কিন্তু এর পরে না, অথচ ওঁর সারা জীবনই বিকৃত হয়ে থাকবে।

শাশ্বতী কাল স্বাতীকে একথা জানাইয়াছে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছে, ডক্টর বসাক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, মিথ্যা ভাষণের মধ্যে একটা অতি হীন স্বার্থ আ স্বার্থের সন্ধান স্বাতী পাইয়াছে।

শাশ্বতী ভাবিয়া পায় না, ইহার মধ্যে থাকিতে পারে।

বিশেষ করিয়া খবরটা জানিবার জন্যই সে বসাকের কাছে।

(স্বাতীর মত মেয়ের বিবাহ হোক, কারণ সে নারী। সে স্বপ্ন দেখে, একটি সংসারে বধূরূপে, প্রতিষ্ঠা লাভের; সে নির্ভরশীল লতা মাত্র, নিজে দিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

শাশ্বতীর পুরুষ প্রকৃতিকে সে বিদ্রূপ করে, তবু তাহাকে করুণার চোখে দেখে। স্বাতী যখন প্রসাধনান্তে ভঙ্গিতে পিয়ানোর সামনে বসিয়া মিহিসুরে গান গায়; শ তখন তাহারই ঘরের পাশে মস্ত বড় ময়দানে ঘোড়া ছু তাহার পানে তাকাইয়া স্বাতী নিঃশ্বাস ফেলে—বেচারা; নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝাই উহাকে বহিতে হইবে, কোন এরূপ ডানপিটে—সোজা কথায় পুরুষপ্রকৃতি মেয়েকে জী সহচারিণীরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে না—মা তাহার ব্যব মোটেই খুসি নন—সর্বদাই ভয়—এই মেয়েটি কখন কি করি বসে। ভবিষ্যতের ভাবনা এখন মুলতুবি রহিয়াছে, বর্তমানকে লইয়াই তিনি সন্ত্রস্ত।

পিতা যদিও কোনদিন শাশ্বতীকে বাধা দেন নাই বরং উৎসাহই দিয়াছেন, তথাপি সময় সময় যেন তাঁহার চোখেও ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে, তাঁহার ললাটে রেখা ভাসিয়া উঠে।

সহিস গেটের কাছে শাশ্বতীর জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার বাহির হইবার পথে সুজিত সোম বাধা দিল—"সুপ্রভাত, এই সকাল বেলাতেই বার হচ্ছেন মিস বোস প্রাতঃকালীন ভ্রমণে—?"

গমন পথেই বাধা পাইয়া শাশ্বতী থামিল—গেটের কাছে দণ্ডায়মান ঘোড়াটার পানে তাকাইয়া বলিল—"প্রাতঃকালীন ভ্রমণই বটে—তবে—"

সুজিত সোম বলিল,— "না, না, আর তবে নয়, আসুন

যামার মোটরে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ও-ধারটায় বেড়িয়ে সা যাক্। পুরাণো মোটরটা বিক্রি করে দেব, নূতন মোটরখানা ' দিতে আজই ভোরে এসে পোঁছেছে। আসুন, একবার খুন, সেখানা কেমন হয়—।"

তী প্রমাদ গণিল, একটু থামিয়া বিনয়ের সুরে বলিল ির দুঃখিত মিঃ সোম, আমি ঠিক বেড়ানোর জন্যেই শ্য আরও একটা আছে। আমার মতে স্বাতীকে আপনার উচিত, সে আমার চেয়ে ও-সব বোঝে

। পা বাড়াইল।

.গ্গা অগ্রসর হইয়া মিঃ সোম বলিল—"আমি মস বোস, আপনার চেয়েও বেশী। অবশ্য আপনি বিশেষ দরকারে কোনও বন্ধুর বাড়ি চলেছেন, মি বাধা দিতে চাইনে, তবে আমার মনে হয়— এ-সব বিষয়ে আপনারই দক্ষতা বেশী—" ানে—"

শাশ্বতী হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ম বলিল,—"স্বাতীর নিজের কোন মত নেই বলেই ।। আমি যদি মন্দ বলি, তিনিও তাই বলবেন, আমি লি—"

ী উচ্ছ্বসিত হাসিতে এবারে ভাঙিগয়া পড়িল— ন, কিন্তু পুরুষ তো তেমনই মেয়ে চায় শুনেছি। বলেন, মেয়েদের নরম হতে হবে—স্বামীর সংসার । করবে আনন্দময়—কাজেই সুখময়। আপনি কি ী চান না মিঃ সোম?"

শব্যস্ত হইয়া সুজিত সোম বলিল—"আপনি এক কথায় একটা ধরেন মিস বোস—অর্থাৎ—

শাশ্বতী বলিল—"অর্থাৎ সব পুরুষই চায় তার স্ত্রী ঠিক তানুবর্তী হোক্; আর সেকালের স্ত্রীরা না হোক, নর সকল স্ত্রীই চায়—স্বামী তার মতানুবর্তী হোক। ানে এই দুইয়ের প্রাধান্য ঠিক রাখা চলে না বলেই চলে ন্তর, যার জন্যে আজ ডাইভোর্সের কথাও উঠেছে,—কথায় থায় চলবে ও দেখে নেবেন।"

সুজিত সোম মাথার চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সেটা করাও উচিত। আমাদের, অর্থাৎ পুরুষ-দের দিক দিয়ে এতে যথেষ্ট ক্ষতি হলেও আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট ভালো—এত ভালো যে, আমি কল্পনাই করতে পারি নে।"

শাশ্বতী ক্ষণকাল নিস্তব্ধে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিল,—"হ্যাঁ, লাভ হবে এই সব মেয়েদের, যাদের আমরা আমাদের চারিদিকে দেখতে পাই, যারা স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার দাবী করে, স্বামীকে দেবতা না বলে সাথী হিসেবে গ্রহণ করে; কিন্তু সেই সব মেয়েরা—যাদের রক্তের ধারায় আজও স্বামী দেবতা ভাবটা মিশে আছে, যারা স্বামীর কোন দোষ দেখতে পায় না, তারা তো চিরদিন অত্যাচার সয়েই চলবে মিঃ সোম, নতুন এ আইন তাদের কাছে একেবারেই ব্যর্থ হবে যে।"

উৎসাহের সঙ্গে সুজিত সোম বলিয়া উঠিল—"ব্যর্থ? ও কথাটি বলবেন না মিস বোস। একটা বিশ্বাস—যা যুগ যুগ ধরে মনের মধ্যে হাজার শিকড় জড়িয়ে গেঁথে আছে, তাকে উপড়ে ফেলা হঠাৎ ভারি মুস্কিল হবে। বরং এই কথাটিই বলুন। কিন্তু এ কথাও ভাবুন মিস বোস—মানুষই তো অসাধ্য সাধন করছে। এককালে আমাদের দেশে কত প্রথাই তো ছিল—সহমরণ, গর্ভে থাকতেই বিয়ে দেওয়া, নরবলি, গঙ্গাসাগরে সন্তান দেওয়া—এত সব সংস্কারের ধ্বংস হল কেবল আইনের জোরেই নয়, এর অপকারীতা দিনের পর দিন বুঝিয়ে। এ-ও ঠিক তাই হবে—দেখবেন বর্তমান মা কাকি পিসির দল গত হলে সেই চিরাচরিত দেবতা নিষ্ঠার ভিত্তি ধ্বসে যাবে। তারপর একদিন দেখবেন—"

বাধা দিয়া শাশ্বতী বলিল, "সেই অনাগত দিনের কথা আজ থাক মিঃ সোম, সাতটা প্রায় বাজে; এরপর গেলে আমার কাজ হবে না। ধন্যবাদ, একদিন বরং ঘরে বসে আপনার বক্তৃতা শুনব, আজ নমস্কার—"

—বক্তৃতা কথাটা শুনিয়া সুজিত সোম অন্তরে আঘাত পাইল, বিবর্ণ মুখে হাতখানা তুলিয়া শুষ্ককণ্ঠে কেবল বলিল, "নমস্কার—"

শাশ্বতী পাকা ঘোড়সওয়ারের মতই ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া উঠিল, বাম হাতে লাগাম ও বেতগাছটা লইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে দক্ষিণ হাতটা তুলিয়া বলিল, "নমস্কার—"

দুর্দান্ত তেজিয়ান ঘোড়া সগর্বে একবার এদিক একবার ওদিক মুখ ফিরাইল, তাহার পর বীরকদমে অগ্রসর হইল।

সমাপ্ত

মৃত্যু

সুবিমল গঙ্গোপাধ্যায়

শেষে এই জায়গায় আমায় বদ্‌লী করলে। দিনেরাতে ছয়খানা স্টীমার, তাও রাত আটটার পর আর স্টীমার নেই, সে সময় আমার অফুরন্ত ছুটী—মনে আর দেহের। প্রথম অপরিচিত জায়গায় এসে যে অবগুণ্ঠিত ভাব ছিলো তা কেটেছে এখন। সন্ধ্যার পর কয়েকজন ভদ্রলোক আস্‌তে লাগলেন—এখানকার স্থানীয় অধিবাসী। আমি একা তাই আড্ডাটা জম্‌তো ভাল করেই—চা আর তাসের।

একদিন বিপিনবাবুকে বল্লাম—একটা চাকর যোগাড় ক'রে দিতে পারেন, কাজ বিশেষ কিছুই নয়—খুচ্‌রো এদিক ওদিককার কাজ।

বিপিনবাবু স্থানীয় স্কুলের মাস্টার। চেহারাটা স্থূলে কিন্তু বুদ্ধিটা শান দেওয়া ক্ষুরের মত। আর সেই বুদ্ধির এমনই বিশেষত্ব যে, তা সোজা গতিতে চলে, আবিলভরা গতি নেই। তাই তার মনটা পাকা সোনার মত। পরে শুনেছি তিনি নন্‌-কো-অপারেশনে জেল খেটেছিলেন।

তিনি বলেন—পারবো না কেন। তবে একটু সময় নেবে। আপনার মনমত হওয়া চাই।

—মনমত আবার কি ; খুচ্‌রো কাজ—বদ্‌মেজাজী না হলেই হলো। আর চুরির কথা মনে করছেন। চুরি আর এমন কিই-বা করবে, আর কিই-বা আছে।

বিপিনবাবু হাসলেন—তবু দেখা উচিৎ। পরে হয়তো আমার বদ্‌নাম দেবেন।

আমি এবার হেসে উঠ্‌লাম হো হো করে।

সেদিন বিপিনবাবু বল্লেন আড্ডা ভেঙ্গে যাবার পর—আপনার চাকর ঠিক করেচি, এখন বহাল করবেন কবে।

—যেদিন নিয়ে আসবেন সেদিন থেকেই।

বিপিনবাবু বল্লেন চাকর সম্বন্ধে, বোবা কিন্তু কান তার সজাগ। টাইফয়েড্‌ হয়ে যাবার পর বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছে। ঘরে মাত্র এক ছেলে আর ও নিজে।

তার পরদিন চাকর নিয়ে এলেন নাম সুমন্ত। লম্বা দোহারা চেহারা, জমাটবাঁধা নিটোল শরীর—শিরা-উপশিরার সজাগ মূর্তি ঢাকা পড়েচে পেশীর নীচে। ভালই লাগ্‌লো ওকে দেখে।

বল্লাম বিকেলে—আপনার দেওয়া চাকরের চেহারা দুরন্ত।

—মনও দুরন্ত, দুদিন গেলেই বুঝ্‌তে পারবেন।

কিন্তু পরিচিত আমার। মৌখিক আলাপে নয় স্টেশনের কোল দিয়ে যাওয়া আসার সময়।

বিপিনবাবু হাসলেন—আপনিই যখন স্টেশনের কর্তা—তখন ওর কাজ আপনার বাইরে নয়।

সুমন্ত নদীর বুকের ভিতর চড়ার ওপর আলো জ্বালায় এ তল্লাটে, স্টীমারের রাস্তা যাতে সুগম হয়।

সুমন্ত কাজে চৌকস। এর মধ্যে আমার কি কাজ করতে হবে, তা দেখে নিয়েছে একবারে পুংখানুপুংখভাবে। ভোরে উঠেই ওকে দেখি, তারপরে চলে যাই স্টীমার পাশ করাতে, এসে দেখি নাইবার জল পর্যন্ত তৈরী করে রেখেচে।

আমি বল্লাম—নাইবার জল আর তোমায় তুল্‌তে হবে না, নদী আছে সামনে তার জন্যে আমার ভাবনা কি।

সুমন্ত হাসলো, সরল আর নির্ভাজ যেন বল্লে করলে কোন ক্ষতি তো নেই।

ঘরে মেয়েমানুষ না থাকাতে পুরুষের বলে একটু অসুবিধা হয়, ঘর গোছাবার আর সমস্ত সময় কাজ সুষ্ঠু করে রাখার—তা মিটেছে আমার। দিন পনর পর দেখি সন্ধ্যার আড্ডায় প্লেটে করে চা সাজিয়ে নিয়ে এয়েছে আর কিছু চিড়ে ভাজা। আমি আশ্চর্য হলাম—সুমন্ত আমার সব অভাব মিটাবে দেখ্‌চি! আর চা বানাবার কৌশলই বা শিখ্‌লো কোত্থেকে। বুঝ্‌লাম, আমার চা বানাবার সময় ওর তীক্ষ্ম মনোযোগ রাখার কারণ।

আমি হাসলুম—দেখুন আমার চাকরের হাতের চা তৈরী। মুখে দিয়ে দেখ্‌লুম বিস্বাদ হয়েছে, আর সুমন্ত চেয়ে রয়েচে হাসিমুখে ওর পরীক্ষার ফল সুফল দিল কিনা।

বল্লাম—বেশ হোয়েচে সুমন্ত। একেবারে পাকা হাতের কাজ।

সুমন্ত হেসে বেরিয়ে গেলো।

—দেখুন এ ওর প্রথম দিনের রপ্ত করার জিনিস, একটু বিস্বাদ লাগবে বৈকি!

বিপিনবাবু বল্লেন—তৈরী করচেন নিজের মত করেই।

—তৈরী করচি না, ও নিজেই তৈরী হচ্চে।

দিনগুলো কাট্‌ছে আমার খুব ভাল, যে এত ভাল তা আশা করতে পারিনি। দিন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফুরন্ত অবসর দিয়েচে সুমন্ত। সুমন্তের মনে সোনার ফসলের চারা, সত্যিই বলেচেন বিপিনবাবু। যত বলি সুমন্ত তোমার আমার জন্যে এত বেশী করার দরকার নেই, আমাকে প্রায় কুণো করে তুল্লে। সুমন্ত হাসে আর ওর প্রান্তিক মনের সুস্পষ্ট ছবি দেখি ওর ঠোঁট আর চিবুকের ধারে।

একদিন দেখি ওর ছেলেকে নিয়ে এলো—বছর আট নয়। রং মাজা, বোধ হয় সুমন্তের বউএর ছায়া পড়েচে। আমায় দেখে সংকুচিত হয়ে দাঁড়ালো।

—কি নাম তোমার?

স্পষ্ট বল্লে—বিশু।

কুলের গাছ ছিলো সামনে। দেখিয়ে বল্লাম—এর মালিক তুমি।

হাসি বেরুলো, সুমন্তের মতই হাসে।

সুমন্তকে বল্লাম—তোমার ছেলেকে নিয়ে এসো তোমার সাথে। আর অতটুকু ছেলে, একাই বা রেখে আসো কিভাবে? তার পরদিন বিশু হাজির দুপুর বেলায়। ইজিচেয়ারে বসে পড়্‌ছিলাম মাসিক, নামিয়ে রাখলাম। বল্লাম—কি খবর?

বল্লে—কুল খেতে এয়েছি।

—বলেছিই তো, তার মালিক তুমি।

হেসে আর উত্তরের অপেক্ষা না করেই কুলগাছে গিয়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌লুম বিশুকে যতটা শান্ত মনে করেছিলাম, ততটা নয়। কথার অগুন্‌তি জোয়ার ওর পেটে। গ্রামের কোণা ঘুন্‌চি পর্যন্ত ওর হাতের গোনার ভিতর। বুঝ্‌লাম, বিশু দুরন্তের সুষ্ঠু প্রকাশ।

একদিন নেমন্তন্ন করলাম বিশুকে যে তুমি আমায় গ্রাম দেখাবে। বিশু আশ্চর্য হলো, বোধ হয় অনুমান করলো কথাটা সত্যি বল্‌চি কিনা। তারপর যখন প্রমাণ দিলাম সত্যি বল্‌চি, ঠোঁটের প্রান্তদুটো যেন খুসীর আবেগে কুটি কুটি হয়ে যেতে লাগ্‌লো।

সুমন্ত খুসী হয়েচে আমার আর বিশুর অন্তরঙ্গতা দেখে। ও নীরবে হাসে।

সেদিন স্নানের সময় বিশুকে বল্লাম—তুমি সাঁতরাতে পারো নদীর ভিতর।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঝপাং করে নদীর ভিতর নেমে

পড়ছে। আমার ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠ্‌লো আতংকে, ও এ করে কি। বিশু নির্বিঘ্নে সাঁতরিয়ে যাচ্ছে স্রোতের মুখে মুখে। মাঝখানে যেতেই চেঁচিয়ে বল্লাম—আর যেতে হবে না, এখন ফেরো।

এলে বল্লাম—তোমার ভয় করে না।

—ভয় কি, বলেন তো ওপার থেকে মাটি নিয়ে আসি।

—কুমীর থাকে নদীতে।

—কুমীর আমায় ধরতে পারবে না।

—কেন?

—বা রে! সাঁতরাবার সময় কুমীর ধরতে পারে নাকি!

—তোমায় কে বল্লে?

—আমি শুনেচি।

বুঝ্‌লাম সেদিনকে বিপিনবাবুর গল্পের তাৎপর্য। কোন নেক্‌ড়া এয়েছিলো ওপার থেকে সাঁতরিয়ে এপারে। তাকে আর বেড়াবার ফুরসুৎ দেয়নি এখানকার লোক—খুঁচিয়েই মেরেচে। আর দেখেচি এখানকার জেলের দুরন্ত বাতাসে নদীর বুকের ওপর মাছধরা। সেই ঝাঁজ্‌ রয়েচে বিশুর পাঁজরে পাঁজরে।

এর পরে আর ছ'সাত দিন দেখিনি বিশুকে। একদিন এলে জিগ্যেস্‌ করলাম—আসনি কেন এ্যাদ্দিন।

—বা রে! আমি বুঝি সব সময় এখানে এসে বসে থাক্‌বো।

হাসি এলো আমার ওর বিস্মিত রূপ দেখে।

—বেশ, তোমার খুসীমতোই এসো।

ওর মনের তারে রয়েচে বাঁধন না মানার প্রশ্ন। দুরন্ত প্রকৃতি খামখেয়ালী পাগ্‌লা বাতাসের মত। তাই ওকে আর কিছু বলিনি এর পর থেকে। মাঝে এলে কুল আর কামলা দিতাম।

সেদিন ছিল সোমবার। ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি তার সংগে পাগলা বাতাস। ফ্লাটে বসে রয়েচি। ওপারের বাঁশবন ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে অন্ধকারে। ব্রহ্মপুত্র ফুলে উঠেছে বাতাসে, ফ্লাটটা নাচছে। ঘনায়মান অন্ধকার। আকাশে নিভাঁজ মেঘের স্তূপ। হঠাৎ একটা ডিঙি দেখ্‌লুম ফ্ল্যাটের কাছে ভিড়লো। সুমন্ত উঠে এলো ভিজে মাথায়, ভিজে কাপড়ে।

—তুমি এই ঝড়ে গিয়েছিলে কোথায়?

সুমন্ত হাত দিয়ে দেখালে চরের কাছে কাছে ঝাপ্‌সা যে আলো দেখা যাচ্চে, তার দিকে।

বুঝ্‌লাম, আলো জ্বালাতে গিয়েছিলো। আরও বুঝ্‌লাম, ওর জীবনে ফাঁকি নেই, ভরাট পাথরের মত আনুগত্যের ভীড়। দেখি সুমন্ত দাঁড়িয়ে রয়েচে, বুঝ্‌লাম বাসার চাবি চাচ্চে, কাজ করবে গিয়ে।

—না, তোমার আজকে আর কাজ করতে হবে না। আজকে তুমি ঘরে যাও।

তবু দাঁড়িয়ে রইলো সুমন্ত।

শেষে জোর করে পাঠিয়ে দিলাম, দুঃখ হলো সুমন্তের জন্যে। মানুষের এত ভালত্ব আজকালকার জগতে বেমিশাল। সুমন্ত ঠক্‌বে।

এর পরে আর সুমন্তকে দেখিনি সপ্তাহখানেক। হঠাৎ মনের ভিতর ছল্‌কে উঠ্‌লো, যে দিনের অধিকভাগ কাটায় আমার এখানে তার এমনি ডুব মারার কারণ কি। বিপিনবাবুকে জিগ্যেস্‌ করলাম—সুমন্তকে দেখছি না, কারণ কি?

বিপিনবাবু আশ্চর্য হলেন—আসে না নাকি?

—প্রায় সপ্তাহখানেক।

—ও তো এ রকম নয়।

—আমিও তো তাই ভাবচি।

বুঝ্‌লাম্‌ মাঝখানে গরমিল ঘটেছে।

বিকেল বেলার স্টীমারখানা চলে যেতেই রওনা হলাম সুমন্তের খোঁজে। তাল গাছের ছাউনি দেওয়া ওর বাড়ির কিনারাটা। বাড়িতে ঢুক্‌তেই প্রথমে চোখে পড়্‌লো বেতগাছের ঝোপ, পেঁপে ঝুলছে গাছের ডগায়, বেগুণগাছের সারি ঘরের কোল ছুঁয়ে। দেখ্‌লাম, সুমন্ত এদিকে পাকা গৃহস্থ।

বাড়ি নীরব। বিশুর সাড়া নেই। ঘরের পৈঠার ওপর পা দিতেই থম্‌কে দাঁড়ালুম, সুমন্ত উবু হয়ে পড়ে রয়েচে মেঝের ওপর। পা'র শব্দ পেয়েই মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। একি চেহারা! যেন সুমন্তের ভাঙ্গা মূর্তি। চোখের জলে ধুয়ে গেচে গালের দু'দিক। মুখ শুকিয়ে গেছে—কালো ছায়া পড়েচে সমস্ত দেহে।

আমার মনের ভিতর ধাক্কা লাগ্‌লো। এ কোথায় এলুম! তবু জিগ্যেস্‌ কর্‌লুম—তোমার কি হলো সুমন্ত?

সুমন্ত ঝর্‌ঝরিয়ে কেঁদে ফেল্লে।

সুমন্ত মূক ভাষায় হাত নেড়ে আমায় বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লো বিশু মারা গেছে। আমার ভিতরের তন্ত্রীগুলো যেন একযোগে নড়ে উঠ্‌লো—মরা গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলে মূল পর্যন্ত যেমন নড়ে ওঠে। সুমন্ত বল্‌তে চেষ্টা করচে বিশুর মৃত্যুকালের যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট, অগুন্‌তি মুখভংগী করে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করচে সে বেদনাদায়ক মুহূর্তগুলো।

আমি বল্লাম—থাক্‌ সুমন্ত, কি করবে আর।

তারপর সুমন্ত চুপ করলে। সময় যেন ঠাণ্ডা স্থবির হয়ে বয়ে যাচ্চে। বাইরে অন্ধকার জমেচে। অগুন্‌তি তারা আকাশে, সবুজ আর নীল। ঠাণ্ডা আকাশ, ঠাণ্ডা পৃথিবী। সুমন্তকে যেন অন্ধকারের ভিতর ন্যাড়া মাথা তালগাছটার মত নির্জীব মনে হচ্চে। বিশুর মৃত্যুতে সুমন্তের লয়—ওর দেহের মনের আর সময়ের। যেন প্রাগৈতিহাসিক কংকাল! এই কি মৃত্যুর বীভৎস প্রতিচ্ছায়া?

আমার মনের ভিতর একটা অবরুদ্ধ স্রোত অতি কষ্টে দামিয়ে রাখ্‌লাম।

বিশ্বলোক

অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

দিনের বেলা সূর্যের আলোর একটা গাঢ় আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে থাকে; এর বাইরে আর যে কিছু আছে, তা আমাদের দেখতেই দেয় না। দিনের শেষে সূর্য অস্ত যায়, তখন অন্ধকার ছেয়ে প্রকাশ পায় নক্ষত্রলোক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কী যে বিরাট চেহারা, তা আমাদের চোখে তখন ধরা পড়ে; এই বিশ্ব যতই প্রকাণ্ড বড়, ততই প্রকাণ্ড ছোট করে আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়েছে, সমগ্রটাকে এক করে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব বলেই। যে সূর্য প্রায় তের লক্ষ পৃথিবীর মতো বড়, অনেক দূরে আছে বলেই আকাশে তাকে দেখতে পাই ছোট একখানি থালার মতো; সমস্ত সূর্য যদি আমাদের খুব কাছে থাকত, তাহলে তার সমগ্র রূপ যে কী, তা আমরা জানতেই পারতাম না। যা আমাদের চেয়ে অত্যন্ত বড়, তাকে আমরা যতটুকু চিনতে পারি, সে দূরের থেকে। আকাশে যে তারাগুলিকে আলোর বিন্দুর মতো দেখি, তাদের বেশির ভাগই সূর্যের চেয়ে অনেক বড়; এর থেকেই বোঝা যায় কী অচিন্তনীয় দূরত্বের মধ্যে এই নক্ষত্রের দল ছড়িয়ে আছে। আকাশের যে গোলকার্ধ আমাদের পৃথিবীর দিক্-সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেইটুকুর মধ্যেই এমন বিরাট দূরত্ব সংহত হয়েছে বলেই বিশ্বলোকের ছবি আমরা দেখতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এই বিশ্বলোকের যে-সব রহস্যের সন্ধান দিয়েছে, তার মোটামুটি আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যে অসীম দূরত্বের মধ্যে জ্যোতিষ্কের দল ছড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে; এদের যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কারণ আকাশ পার হয়ে ওখান থেকে আলো এসে পড়ছে আমাদের চোখে। দূরে কোথাও যদি আলো জ্বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেটা দেখতে পাই, সেখান থেকে আলোটা চলে এসে আমাদের চোখে লাগে, তাই আলো জ্বালা জানতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে আলো চলে, এই চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা জগতের আর কোন পদার্থের নেই; এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পার হয়ে যায়, এত দ্রুত তার গতি। আমরা ছোট পৃথিবীর মানুষ, আলোর এই প্রচণ্ড দৌড় শুধু অনুভবে বুঝব এত বড় জায়গা এখানে পাব কোথায়! তাই আলোর চলার কথাটা জানবার সুযোগ হয় না। সেই সুযোগ ঘটে মহাশূন্যের বিরাট দূরত্বের মধ্যে। এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে সূর্যই আমাদের নিকটতম আত্মীয়, তবু পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব কম নয়, প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল; এই রাস্তা পেরিয়ে তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় প্রায় আট মিনিটে। কিন্তু নক্ষত্রলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে পৃথিবী-সূর্যের ব্যবধান দূরত্বের মধ্যেই গণ্য নয়; সূর্যের পরেই নক্ষত্র মহলে যাকে আমাদের পাড়া-পড়শি বলা চলে, তার থেকে আলো আসতে লাগে তিন-চার বছর। এর চেয়ে যে-সব নক্ষত্র দূরের, তাদের দূরত্ব অনুসারে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে অনেক শত, অনেক হাজার, অনেক লক্ষ বছর লাগে। সাধারণত আমরা দূরত্ব গণনা করি মাইল বা ক্রোশ হিসেবে, কিন্তু এ-সব নক্ষত্রের দূরত্ব মাইল বা ক্রোশ হিসেবে গণনা করতে গেলে সংখ্যা-সংকেত বিপুল জায়গা জুড়বে, অঙ্কের বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর দূরত্ব হবে প্রায় ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল (পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল)। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের সীমানায় ঢুকলেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপের মতো শোনায়। তাই এ-সব ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আর এক সংকেত ব্যবহারে লাগিয়েছেন। আগেই বলেছি, আলো এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায়, এক বছরে আলো যতটা পথ চলে, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল, তাকে বলা হয় "আলো-বছর",



নীহারিকা

ইংরেজিতে বলে Light-Year; এই আলো-বছরকেই একক ধরে মহাশূন্যে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব বর্ণিত হয়। এমন অনেক জ্যোতিষ্ক আছে, যাদের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ আলো-বছর, তার মানে আকাশে আমরা যে-সব নক্ষত্র দেখছি, তাদের কোনটাই এই মুহূর্তের দেখা নয়, অর্থাৎ এইমাত্র যে আলো আমাদের চোখে এসে পৌঁছল, সেটা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোণো। তাদের এখনকার আলো পেতে হলে আরও লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

এককালে মানুষ ভাবত সমস্ত বিশ্বের মাঝখানে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, আর তাকেই কেন্দ্র করে সূর্য ও নক্ষত্রের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সহজ দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সে দেখেছিল যে জ্যোতিষ্কের দল সরে সরে যাচ্ছে, পূব দিকসীমানাতে উদয় হয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু

বোধের সঙ্গে বুদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগ তখনও তার হয়নি, তাই বুঝতে পারে নি যে, পৃথিবীর চলা থেকেই নক্ষত্র দলের চলা সম্বন্ধে তার বিভ্রম জন্মাচ্ছে। আজ বোধের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির যোগ হয়েছে নিগূঢ়, তাই সহজ-দেখা 'ছেলে-ভুলোনো' খবর সে দিয়েছে বাতিল করে, আকাশ-দেখা দূরবীন তৈরি করে সে তার চোখ বানিয়েছে বিশ্ব-দেখা। এই দূরবীন তৈরি হওয়ার পর প্রথম জানা গেল যে, পৃথিবী স্থির হয়ে নেই, লাটিমের মতো পাক খেতে খেতে প্রকাণ্ড একটা গোলাকার পথে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে, তাই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও ক্রমাগত আমাদের কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছে। চলতি গাড়ির ভিতরে বসে বাইরের দিকে তাকালে যেমন মনে হয় দু'ধারের গাছপালা, বাড়িঘর সব সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে ঘুর-খাওয়া এই চলতি পৃথিবীতে বসে তেমনি আমাদের মনে হয়, আকাশের নক্ষত্রগুলিই পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। এই দূরবীনের যুগ আসার পরেই মানুষ দূরবীনের শক্তি বাড়িয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল মহাশূন্যে তার দৃষ্টির সীমা; আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠল বিশ্বের রূপ। আকাশের যেখানে আগে ছিল ফাঁকা শূন্য, সেখানে দেখা দিল অসংখ্য নক্ষত্র, জানা গেল, কোটি কোটি দল-বাঁধা নক্ষত্র নিয়েই এই বিশ্বলোক। আপাতদৃষ্টিতে এ-সব নক্ষত্রকে স্থির আলোর বিন্দু বলে মনে হ'লেও এদের ছড়িয়ে দেওয়া আলোর বর্ণবৈচিত্র্য পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এরা প্রত্যেকেই অগ্নিবাষ্পের এক-একটা বৃহদায়তন পিণ্ড, অদ্ভুত দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। আমাদের কাছে থেকে কল্পনাতীত দূরে আছে বলেই এদের আকার ও গতির কোন খবরই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

দূরবীন দৃষ্টির বাইরে এমন আরও অনেক নক্ষত্র-জগৎ আছে, যাদের আলো এত ক্ষীণ যে, দূরবীনের ভিতর দিয়ে এলেও দৃষ্টির বোধে কোন সাড়া দেয় না; তাদের খবর পাওয়া গেছে দূরবীনের সঙ্গে ফটোগ্রাফ-তোলা ক্যামেরা লাগিয়ে, ক্যামেরার প্লেটে তারা রেখে গেছে তাদের স্বাক্ষর। এভাবেই খোঁজ পাওয়া গেছে, নক্ষত্রের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়ো হাজার হাজার জ্যোতিষ্কের; এদের বলা হয় নীহারিকা, ইংরেজিতে বলা হয় Nebula। রাত্রের আকাশে খালি চোখে এদের দু'একটিকে দেখতে পাই লেপে দেওয়া আলোর মতো এই বিশ্বে নীহারিকার সংখ্যা কত, তা ঠিক করে বলা চলে না; তার কারণ প্রায়ই নূতন নূতন নীহারিকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দূরবীনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে।

আজকাল জানা গেছে, একটি নীহারিকার ভিতর রয়েছে আমাদের পৃথিবী, যাকে ছায়াপথ বলি বোধ হয় তাই তার সীমানা। এটা একটা "প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা ঘুরপাক খাওয়া জগৎ।" কোটি কোটি নক্ষত্র এর দখলে এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে লাগে প্রায় ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বছর, আমাদের সূর্য তার গ্রহপরিবার নিয়ে সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে ঘুর খাচ্ছে। এই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে এক পাক ঘুরে আসতে তার লাগে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বছর। চলতি গাড়ির চাকা থেকে কাদা যেমন ছিটকে বাইরে পড়ে, আমাদের সূর্যও তার ঘোরার বেগে এই নক্ষত্রচক্র থেকে তেমনি করেই ছিটকে পড়তো; কিন্তু এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণ তাকে এই অপঘাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করছে। এই যে নক্ষত্রজগৎ এ যেন মহাশূন্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। এর বাইরে অনেক দূরে আছে আরো অনেক নক্ষত্রদ্বীপ। এণ্ড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটি প্রকাণ্ড নীহারিকার সন্ধান মিলেছে, এর আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো, চাকার মতোই এ আবার ঘুর খাচ্ছে; হিসেব করে জানা গেছে যে, একবার ঘুরে আসতে এর লাগে প্রায় দু'কোটি বছর। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে আট লক্ষ আলো-বছর। অসংখ্য নক্ষত্রের সন্নিবেশেই এই নীহারিকা, গতি আর আকর্ষণের শক্তিতে ধরা পড়েছে এক ঘূর্ণিপাকের আবর্তে। বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে এক ঘূর্ণিনাচ 'চলা আর টানার ছন্দে'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ব-পরিচয় গ্রন্থে বলেছেন, "এই জগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ-শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। এক-দিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহাদৌড় আর একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা-টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলা যদি একা থাকত, তা'হলে চলন হোত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। বিশ্বের অনীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও, সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব কিছু। কালস্রোত বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্তে। এই জন্যই আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলছে জগৎ। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে—চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।" আর এর পরিণতি বলে যদি কিছু থাকে, তা'হলে এই চলাই এর পরিণতি।

দূরবীনের সঙ্গে আলো-পরখ-করা যন্ত্র (Spectroscope) যোগ করে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী থেকে আজকাল এমন সব আশ্চর্য খবর পাওয়া যাচ্ছে, যাতে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আগেকার ধারণা আমূলে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। কোনো কোনো নক্ষত্র ও নীহারিকার ভিতর এমন সব খবর লুকোনো আছে, যা শুনলেও বিশ্বাস করা কঠিন। যে সব নক্ষত্রকে চোখে দেখে একটি মাত্র আলোর বিন্দু বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেক-গুলি আছে, যাদের সঙ্গে দুটি বা তারও বেশি নক্ষত্র মিলেছে। এদের বলা হয় জুড়ি-নক্ষত্র, ইংরেজিতে বলে Binary System. বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এদের মধ্যবর্তী কোনো এক বিন্দুকে কেন্দ্র করে এরা চক্রপথে ঘোরে। আকাশে মিথুন রাশিতে (Gemini) ক্যাস্টর (Castor) নামে একটি নক্ষত্র আছে; চোখে দেখলে মনে হয় না এর কোনো সঙ্গী আছে, কিন্তু দূরবীনে দেখলে এর জুড়িটি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। এও জানা গেছে, এই দুটি নক্ষত্রই আবার জুড়ি-নক্ষত্র। কিন্তু এই শেষ কথা নয়—এদের সঙ্গে রয়েছে আরো একটি নক্ষত্র, যার খবর জানা গেছে অধিকতর শক্তিশালী দূরবীনে, পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীনের তীক্ষ্ণ চোখে আবার এরও একটি সঙ্গী ধরা পড়ে গেছে। একটি মাত্র আলোর বিন্দু ছাড়া যার মধ্যে আর কোনো বৈচিত্র্য চোখে ধরা পড়ে না, তারই ভিতর রয়েছে

(শেষাংশ ৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেহ ও মন

—জ্যোতি সেন

২০

রাত্রির গাড়িতে জয়ন্ত চলিয়া গিয়াছে। পদ্মাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু পদ্মার আগ্রহ না দেখিয়া লইয়া যায় নাই। পদ্মার আগ্রহ হঠাৎ তিরোহিত হইবার কারণ আর কিছুই নয়,— অভিমান।

এত অভিমান তাহার আগে ছিল না। বড়লোকের স্ত্রী হইবার পর হইয়াছে। দারিদ্র্যের মধ্যে এতকাল যে দম আটকাইয়া ছিল, দৈবক্রমে সে দৌলতের মুখ দেখিয়াছে, অথচ সেই দৌলত দীন দুঃখীর দুয়ারে যাচিয়া যাইতেছে—আর সে চাহিয়াও পায় না। অভিমান ত হইতেই পারে! সব পাইয়াও যদি কিছুই ভোগ করা না গেল তাহা হইলে পাইবার সার্থকতা কোথায়—এই চিন্তাই দুষ্ট গ্রহের মত তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই জন্যই সে জয়ন্তের উপর অভিমান করিয়াছে।

পরদিন সকাল বেলা পদ্মার মনে হইল জয়ন্তের সঙ্গে না গিয়া সে ভাল করে নাই। যতদিন সে না ফিরে, ততদিন তাহাকে একলা অলস দিন কাটাইতে হইবে। একা একা তাহার ভালও লাগে না। বিবাহিত জীবনে একা থাকা বড় দুঃখের।

জয়ন্ত তাহাকে ননীমাধবের কাছে পড়াশুনা করিতে বলিয়া গিয়াছে। তাহাই সে করিবে স্থির করিল। কিন্তু এ বয়সে নূতন করিয়া পড়াশুনায় মন দেওয়াও দুঃসাধ্য। অধিকন্তু গোড়া হইতে সুরু করিতে হইবে।

ননীমাধব আসিলে পদ্মা কোন ভূমিকা না করিয়া বলিল, —'উনি আমাকে আপনার কাছে পড়াশোনা করতে বলে গেছেন?'

ননীমাধব বিনীতভাবে কহিল,—'আচ্ছা! তা'হলে বই নিয়ে আসুন।'

—'কি বই আনব, আমার পড়বার মত বই ত কিছু দেখছি না।'

—'বই ছাড়া কি করে' পড়া হবে?'

—'তাই ত! ...বই না কিনলে ত চলবে না। কিন্তু আমার কাছে ত টাকা নেই।

—'বলেন কি! টাকা নেই!'

কথাটা বলিয়া ননীমাধব মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত কচ্‌লাইয়া সে সংশোধন করিয়া কহিল—'আপনাদের কাছে কখনো টাকা থাকে না, এটা যেন ভাবতেই পারি না।......আচ্ছা, কাল আমি কিনে নিয়ে আসব। পরে আমাকে টাকাটা দিয়ে দিলেই হবে।'

পদ্মা গম্ভীরভাবে কহিল—'না, থাক্। আপনাকে কিনতে হবে না। উনি এলে পর বই কেনা যাবে।'

—'কেন? তাতে কি!'

—'আমি যা বলছি শুনুন।'

—'তা হ'লে আমি এ ক'দিন কি করব!'

—'কিছু করতে হবে না।'

—'আপনি কি রাগ করলেন?'

—'না না, রাগ করব কেন?'

ননীমাধব ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন সে কি দোষ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার অবস্থাটা দেখিয়া পদ্মা বলিল—'আপনি ভাববেন না। আপনার ওপর আমি রাগ করি নি।'

পদ্মার নিকট আশ্বাস পাইয়া ননীমাধব খুসী হইয়া বলিল—'সত্যি আমি বড় ভাবনায় পড়েছিলাম। দেখুন, যাঁর চাকরি করতে এসেছি তাঁর স্ত্রীকেই যদি চটিয়ে দিই, তা হ'লে চাকরি রাখাই দায় হবে। আজকাল চাকরি পাওয়াই দুঃসাধ্য, তারপর পেয়েও যদি হারাতে হয়, তবে দুঃখের আর অবধি থাকবে না।'

ননীমাধবের কথায় পদ্মা হাসিয়া বলিল—'কি বিড়ম্বনা!'

'বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!' —বলিয়া ননীমাধব উদ্গত হাসি কোন রকমে চাপিয়া পুনরায় বলিল—'কিন্তু সেকথা যাক্। আপনি যদি পড়াশোনা না করেন তা হ'লে আমাকে যে বসে থাকতে হয়! বসে বসে আমি মাইনে নেব কি করে?'

'বসে থাকবেন কেন? রোজই সকাল বিকাল এখানে আসবেন—হাজিরা দেবেন।'

—'শুধু শুধু এলে আর গেলে ত সত্যিকার কোন কাজ করা হবে না, কেবল ফাঁকি দেওয়া হবে।'

পদ্মা ঠোঁট বাকাইয়া বলিল—'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

ঠিক এই সময় দরজার সমুখে মোটরগাড়ি আসিয়া থামিবার শব্দ হওয়ায় পদ্মা পড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল, প্রতিমা আসিয়াছে। কিন্তু প্রতিমা আসে নাই, আসিয়াছে দিলীপ।

দিলীপ দুই হাত তুলিয়া পদ্মাকে ছোট্ট একটা নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'জয়ন্তবাবু আছেন?'

পদ্মা প্রতিনমস্কার করিল। কহিল—'না। দিন কয়েকের জন্য উনি কলকাতার বাইরে গেছেন।'

—'কবে ফিরবেন?'

—'সাত-আট দিন বাদে।'

'এলে বলবেন আমার কথা—আমি দেখা করতে এসেছিলাম।' বলিয়া দিলীপ চলিয়া যাইতেছিল, যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া পুনরায় বলিল—'আপনি হয়ত আমাকে চেনেন না, আমার নাম দিলীপ। আমার নাম বললেই তিনি চিনতে পারবেন।'

দিলীপকে পদ্মা একদিন মাত্র দেখিয়াছে, কিন্তু তখন তাহার নাম সে জানিত না, পরে যখন তাহার নাম শুনিয়াছে, তার পর আর তাহাকে দেখে নাই।

দিলীপ চলিয়া গেলেও পদ্মা বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ননীমাধব সেখানে আসিয়া পদ্মাকে বলিল—'আমি যাই তাহ'লে?'

পদ্মা বলিল—'যান।'

—'ও-বেলা কি আমার আসবার কোন দরকার আছে?'

—'না।'

পদ্মা মনে করিয়াছিল বৈকালে প্রতিমা আসিবে। কিন্তু প্রতিমা আসিল না। সমস্ত বৈকালটা পদ্মা একাকী একরকম ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল।

পরদিন পদ্মা ননীমাধবকে অনুযোগ দিয়া বলিল—'কাল বিকালে আপনি এলেন না কেন? সারাটা বিকাল আমি একলা কাটিয়েছি।'

ননীমাধব বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'আমি ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিকেলে আমার আসবার দরকার আছে কিনা! আপনি বল্লেন— না, কাজেই আসিনি।'

—'দরকার না থাকলেই কি আসতে নেই?'

—'আমি ভেবেছিলাম শুধু শুধু এলে আপনি বিরক্ত হবেন।'

'আপনি ওরকম ভাবেন কেন!'—বলিয়া পদ্মা হাসিল।

ননীমাধব এ রহস্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিল,—পদে পদে যদি তাহাকে মনস্তত্ত্বের এ সব সূক্ষ্ম ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে ত চাকুরী করা পোষাইবে না। জয়ন্তবাবু তাহাকে এ কী বিপদে ফেলিলেন! প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত হইয়া সে প্রাইভেট টিউটরের কাজ করিতেও রাজী আছে। কিন্তু স্পষ্ট 'না' বলিলে নির্ঘাত 'হাঁ' বুঝিতে হইবে—আভিধানিক অর্থের এই ব্যাভিচার সহ্য করিতে সে রাজী নয়।

কিছুক্ষণ বাদে পদ্মা কি ভাবিয়া বলিল—'পড়াশোনা ত সুরু করা গেল না,—কি যে হবে—উনি এসে কি বলবেন কে জানে!'

ননীমাধব কহিল—'আমি ত বলেছিলাম বই কিনে আনব—আপনিই মানা কল্লেন।'

পদ্মা হাসিয়া বলিল—'আচ্ছা, ওবেলা বই নিয়ে আসবেন—উনি এলে বই'র দামটা আপনাকে দিয়ে দেব।'

একবার থামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'কি পড়ব বলুন ত? যা' পড়েছিলাম, সবই ত ভুলে গেছি।'

—'গোড়া থেকে সুরু করলেই চলবে!'

—'কিন্তু আমার কি কিছু হবে?'

ননীমাধব উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলিল—'কেন হবে না!'

পদ্মা নৈরাশ্যের সহিত বলিল—'যখন পড়বার আগ্রহ ছিল—তখন ত পড়বার সুযোগই পেলাম না, আর এখন যদি বা সুযোগ পেলাম—আগ্রহ যেন পাচ্ছি না। বয়েস হ'য়ে গেছে অনেক, এখন কি আর শিশুপাঠ পড়তে ভাল লাগে?'

ননীমাধব হাসিয়া বলিল—'শিশুপাঠ আপনাকে পড়তে হবে না। গোড়ার দিকটা আমি মুখে মুখে ঝালিয়ে নেব, অল্পেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিটাও ত প্রখর হয়, পুরাণো পড়া চট্‌ করেই আয়ত্তে আসে। প্রাইভেট্‌ টুইশানি আমি ঢের করেছি—ও আমার জানা আছে।'

ননীমাধবের কথায় পদ্মা মনে মনে একটু ভরসা পাইল। বলিল—আপনি যখন জেনেশুনেই বলছেন হবে, তখন হ'তেও পারে। ওবেলা তা'হলে আমার জন্যে বই, খাতা, পেন্সিল সব নিয়ে আসবেন।'

'আচ্ছা।'—বলিয়া ননীমাধব চলিয়া গেল।

বেলা তিনটা না বাজিতেই ননীমাধব বই লইয়া আসিল। পদ্মা বইগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একবার দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল—'কত টাকা লাগলো?'

ননীমাধব কহিল—'বত্রিশ টাকা কয়েক আনা।'

সেদিনই পড়াশোনা সুরু হইল।

ননীমাধব পড়ায় ভাল। কঠিন বিষয় সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার আছে। পদ্মা একাগ্র মনে ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিল। কিন্তু পড়া বেশী দূর অগ্রসর হইল না, প্রতিমা আসায় পড়া বন্ধ হইল।

বই রাখিয়া পদ্মা প্রতিমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—'এস প্রতিমা, বুড়ো বয়েসে লেখাপড়া সুরু করেছি—দেখে যাও।'

প্রতিমা হাসিয়া কহিল—'তাতে দোষ কি? ভালই ত।'

—'হ্যাঁ, তোমার হাসি দেখেই তা' বুঝতে পারছি। তোমার হাসির খোরাক জুটল!'

—'কি যে বল পদ্মা তার ঠিক নেই।'

—'আমি ওরকমই বলি।'

—সত্যি তোমার পড়া দেখে হাসিনি, তোমার কথা শুনে হেসেছি। তোমাকে পড়তে দেখে আমি খুশীই হ'য়েছি।'

পদ্মা ননীমাধবকে বলিল—'আজ আর পড়া হবে না ননীবাবু, আপনি এখন যান। কাল সকালবেলা আবার আসবেন।'

ননীমাধব চলিয়া গেলে প্রতিমা দুঃখিত হইয়া কহিল—'আমি এলাম বলে তোমার পড়া বন্ধ হ'ল! আগে জানলে আসতাম না।'

পদ্মা সহজভাবে কহিল—'এসেছ ভালই করেছ। না এলে অন্যায় হ'ত। উনি যাবার সময় আমাকে বলে' গেছেন, তুমি এলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে।'

—'আমি ত কাজ ছাড়া কোথাও বড় একটা যাই না। আচ্ছা চল, বেড়িয়ে আসি। আমার পিসিমার বাড়িতে একটু যাবার দরকার আছে, সেখান থেকে আমার পিসতুত বোনকেও সঙ্গে নিয়ে নেব।'

—'বেশ ত!'

পদ্মা সাজিয়া গুজিয়া লইল। সুন্দরী পদ্মাকে

সাজসজ্জার পারিপাট্যে চমৎকার দেখাইতেছে। প্রতিমার রূপ পদ্মার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। পদ্মা যেন জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে।

গাড়িতে উঠিয়া পদ্মা ও প্রতিমা ইন্দুমতীর বাড়ির দিকে চলিল।

পদ্মা বলিল—'গাড়িতে চড়তে আমার এত ভাল লাগে। তোমার গাড়িটা দেখে আমার ভারি হিংসে হয়।'

প্রতিমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'সত্যি?'

পদ্মা কহিল—'হ্যাঁ।'

—'জয়ন্তবাবুকে বল না, তিনি ত ইচ্ছা করলেই তোমাকে একটা গাড়ি কিনে দিতে পারেন।'

—'এতদিনেও তুমি ওঁকে চিনতে পারনি। দরকার হ'লেও যিনি গাড়িভাড়া করতে চান না, তিনি কিনবেন গাড়ি? অসম্ভব!'

তাহারা যখন ইন্দুমতীর বাড়ি গিয়া পেঁাছিল সেই সময় ড্রয়িংরুমে বসিয়া রাণু অর্গ্যান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, আর দিলীপ একটা কৌচে হেলান দিয়া তাহার গান শুনিতেছিল। প্রতিমা ও পদ্মা ড্রয়িংরুমে ঢুকিলে গান থামিল।

দিলীপ উঠিয়া পদ্মাকে নমস্কার করিল—পদ্মাও প্রতি-নমস্কার জানাইল। প্রতিমা তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল।

পদ্মা বলিল—'দিলীপবাবুর সঙ্গে কালই আমার আলাপ হ'য়ে গেছে। উনি যে কাল গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি।'

'ও! তাই নাকি?'—বলিয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিলীপের মুখের পানে তাকাইল।

দিলীপ কহিল— 'হ্যাঁ, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

পদ্মা তখনও দাঁড়াইয়াছিল। রাণু তাহার কাছে আসিয়া কহিল—'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

পদ্মা আপ্যায়িত হইয়া হাসিয়া বলিল—'বেশীক্ষণ বসব না ভাই!'

প্রতিমা কহিল,—'আমরা লেকের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি। মনে করেছিলাম, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

রাণু অনুনয় করিয়া কহিল—আজ না হয় না-ই গেলে প্রতিমাদি। পদ্মা দেবীকে আমাদের বাড়িতে যখন ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি, তখন এত শীগ্‌গীর ছেড়ে দেব না।'

পদ্মা রাণুকে প্রশ্ন করিল—'আমাকে পাওয়া কি সত্যি ভাগ্যের কথা? কি বল?'

পদ্মার প্রশ্নে রাণু বিস্মিত হইল। এ রকম প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ম্লান একটু হাসিয়া রাণু বলিল—'সকলে তা না-ও মনে করতে পারে, কিন্তু আমি সত্যি ভাগ্য মনে করি।'

পদ্মা বলিল—'শুনে খুশী হ'লাম।'

অপ্রীতিকর কথাটা অল্পেই চাপা পড়িয়া যাওয়ায় প্রতিমা ও দিলীপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল

দিলীপ রাণুকে বলিল—'সন্ধ্যের সময় ঘরে বসে জটলা পাকিয়ে লেকের হাওয়া খেলে কিন্তু মন্দ হ'ত না।'

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি যাবেন?'

দিলীপ হাসিয়া কহিল—'তোমরা যদি নিয়ে যাও, কেন যাব না?'

পদ্মা উৎসাহের সহিত বলিল—'চলুন না, সবাই গেলে ভালই হবে!'

অবশেষে সকলে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

এভাবে দল বাঁধিয়া বেড়াইতে যাওয়া পদ্মার পক্ষে একেবারে নূতন। বেড়াইয়া যেন তাহার আশ মিটে না।

বাড়ি ফিরিয়া পদ্মা প্রতিমাকে বলিল—'কালও কিন্তু এস।'

প্রতিমা আপত্তি করিয়া বলিল—'কাল বিকেলে আমার কাজ আছে।'

পদ্মা কহিল—'তুমি না আসতে পার, তোমার গাড়িখানা পাঠিয়ে দিও।'

প্রতিমা ইহাতে আপত্তি করিতে পারিল না।

পরদিন পদ্মা যখন প্রতিমার গাড়ি লইয়া ননীমাধবের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় জয়ন্ত কৃষকসভায় বক্তৃতা করিতেছিল।

কৃষকদের সম্বোধন করিয়া জয়ন্ত বলিতেছিল—'লক্ষ লক্ষ লোককে ভাতকাপড়ে বঞ্চিত রেখে যারা সেই ভাতকাপড়ের পয়সা নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়, তাদের আজ বাধা দিতে হবে। এভাবে কারুর ফুর্তি করা চলবে না, একথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। চাষী ভাই, তোমরা যদি আজও একজোট হ'য়ে এর প্রতিবাদ না করতে পার, তাহ'লে তোমাদের দুর্দশা কিছুতেই ঘুচবে না।'

একবার থামিয়া জয়ন্ত পুনরায় বলিতে লাগিল—'পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী খাটুনি খাটে চাষীমজুরেরা, অথচ তারাই পেট ভরে' দুবেলা খেতে পায় না, দুখানা কাপড় তাদের পরণে জুটে না। চাষীমজুরের ওপর যে শোষণ চলেছে, এভাবে চলতে থাকলে তারা চিরকালই দরিদ্র হয়ে থাকবে। এই দারিদ্র্য মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেয়। তার ফলেই মানুষ চুরি, জুয়া-চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, যে শোষক সম্প্রদায় মানুষকে দরিদ্র করে' এই অন্যায় পথে টেনে আনায়, সেই সম্প্রদায়ই আবার তাদের আইনকানুনের বলে তাদের সাজা দেয়, জেলে পাঠায়। আসলে কিন্তু যারা শোষণ করে, তারাই এ সব পাপের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত সকলের আগে। শাস্তি তারা নিশ্চয়ই পাবে। যারা সব খুইয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে পারবে না। প্রাসাদের বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ এদের হুঙ্কারে স্বপ্নের মত একদিন কোথায় মিলিয়ে যাবে।

ক্রমশ

বাঙলা ছন্দের ত্রিধারা

আবদুল কাদির

(১)

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ "বাঙলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে—সেই ভাষা বাঙলার স্বাভাবিক ধ্বনি রূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি সচল বাঙলা ভাষাকে নিয়ে—এই ভাষা বাঙলার হসন্ত ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাঙলায় ভেঙে নিয়ে।" * বাঙলা ছন্দের এই তিনটি প্রধান ধারার নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে (১) অক্ষরবৃত্ত বা সাধু-ভাষার ছন্দ; (২) স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত বাঙলার ছন্দ এবং (৩) মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ছন্দঃ-সরস্বতী" প্রবন্ধে "বাঙলা ছন্দের ত্রয়ী" বা "ছন্দের তিন ধারা" বলিতে বুঝাইয়াছেন, যথাক্রমে (১) 'অক্ষর-গোনা ছন্দ; (২) Syllable বা শব্দ-পাপড়ি গোনা ছন্দ' এবং (৩) 'মাত্রা' গোনা ছন্দ। † নিম্নে এই তিন শাখার নানা ছন্দোবন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(১) মিশ্রবৃত্ত বা সাধু-বাঙলার ছন্দ

সংস্কৃতে 'অক্ষর' অর্থে বুঝায় স্বর (Syllable), আর বাঙলায় বুঝায় 'হরফ' (letter), ফলে সংস্কৃত অনুষ্টুভের রীতিতে বাঙলা আক্ষরিক ছন্দ গড়িয়া উঠিলেও তাহাতে নানা শৈথিল্য অপরিহার্য হইয়া উঠে। প্রাচীন বাঙলা কাব্যে সিলেবলকে অক্ষরের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহার ফলে ছড়ার-ছন্দের প্রভাবে অক্ষর-সংখ্যার বাঁধন অধিকতর শিথিলই হইয়া যায়।

সংস্কৃত অনুষ্টুভের মত বাঙলা পূর্ণ-পয়ারে আট অক্ষরের চারিটি পাদ (foot) থাকে। যথা—

"ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে,
বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবারে।"
—রবীন্দ্রনাথ, মৌন ভাষা, মানসী।

ইহাতে দুইটি পংক্তি, প্রতি পংক্তিতে দুইটি ভাগ, প্রতি ভাগে আট অক্ষরের একটি যুক্তপর্ব, পংক্তিদ্বয়ের শেষে আছে মিত্রবর্ণ। দেশজ ছন্দে সংসাম্য (Symetry) বিধানের জন্য পংক্তির শেষ পদটি প্রায়শ কিছু ছাটিয়া দেওয়া হয়; তাহারই প্রভাবে সাধারণ পয়ারের ছন্দঃ-পংক্তি (metrical line) রচিত হয় ৪+৪+৪+২ অক্ষরযোগে।

হৃদ্-সরোবরে দুটি কলিকা কমল;
কিবা ক্রীড়া করে সুখে চকোর যুগল।.........
অপরূপ নখ কিবা পদ-অঙ্গুলিকা,
কদলী-বৃক্ষের অগ্র, চম্পক-কলিকা।
—সৈয়দ আলাওল, সপ্ত পয়কর।

ইহা 'চতুরক্ষর-পার্বিক' সাধারণ পয়ার। মহাকবি আলাওল ইহাকে কোথাও বলিয়াছেন "জমক ছন্দঃ", কোথাও বলিয়াছেন 'দ্বিপদী' ছন্দ। ইহার প্রতি পংক্তিতে দ্বিপদ (dimeter) আছে বটে; তবে দ্বিতীয় পদটি অপূর্ণ, তাহাতে আছে ছয় অক্ষর। উপরোক্ত উদাহরণের প্রথম Coupletয়ে কোন যুগ্মবর্ণ নাই, কিন্তু দ্বিতীয় Coupletয়ে আছে। এই ছন্দে যুগ্ম অযুগ্মনির্বিশেষে "প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিই সমান দরের একক" (unit) রূপে গণ্য হইয়া থাকে। ধ্বনিগতভাবে এ-ছন্দের ব্যাখ্যা এই যে, ইহাতে যুগ্মধ্বনি (closed Syllable) শব্দ মধ্যে স্বরবৃত্তের সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে সাধারণত এক য়ুনিট, কিন্তু শব্দ-প্রান্তে মাত্রাবৃত্তের বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে সর্বদা দুই য়ুনিট। এই ছন্দে শব্দ মধ্যে স্বর (Syllable) এবং শব্দপ্রান্তে মাত্রা (mora) য়ুনিট বলিয়াই আমি এ-ছন্দের নামকরণ করিয়াছি মিশ্রবৃত্ত (Composite) ছন্দ।

"বক্রেশ্বর বোকাশ্বর খোসামুদে পাক্কা।
চলে যান, কিল্ খান, খান গলাধাক্কা॥"
—প্যারীচাঁদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল।

ইহাকে বলা হয় তরল-পয়ার। ইহার পূর্ণ-পর্ব (Complete measure) চতুরক্ষর; ৪র্থ ও ৮ম অক্ষরে মিল (rhyme) হয় এবং পংক্তিদ্বয়ের শেষে মিত্রাক্ষর থাকে। প্রতি পংক্তির ৪র্থ, ৮ম ও ১২শ অক্ষরে মিল থাকিলে তাহাকে বলা হয় মালঝাঁপ।

"তত্ত্বচিন্তা করি' ফিরি ভবপুরী ভিতরে।
না দেখিনু হেন রূপ কোন্ ঠাঁই বিহরে॥"
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দশমহাবিদ্যা

ইহার প্রতি পংক্তিতে আছে ৪+৪+৪+৩ অক্ষর; ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে রঙ্গিল-পয়ার। লঘু-ভঙ্গ পয়ারের সহিত ইহার পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন।

"কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।"
—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজার উৎসাহ, পদ্মিনী।

ইহাকে বলে বিশাখা-পয়ার। ইহাতে ৮ম ও ১৫শ অক্ষরে যতি (metrical pause) পড়ে এবং সপ্তাক্ষরী-পদের শেষাক্ষর ব্যতিরেকে ষটাক্ষরী পদটির পুনরাবৃত্তি হয়।

"বসন্ত বায়ুতে হেথা কুসুমিত নিকুঞ্জ-বিপিন
মরমে মরিয়া হয় সমীরের একান্ত অধীন।"
—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্নপ্রয়াণ

ইহাকে বলা হয় 'বর্ধিত' পয়ার। ইহার প্রতি পংক্তিতে থাকে ৮+১০ অক্ষর। দ্বিতীয় ভাগে কোথাও ৪ অক্ষরের পর এবং কোথাও ৬ অক্ষরের পর স্বল্প-বিরতি থাকে। দ্বিতীয় ভাগটি হইতেছে দিগক্ষরা।

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যামরায়॥......
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥"

ইহাকে বলা হয় দশাক্ষরাবৃত্তিঃ বা দিগক্ষরা। ইহার প্রতি চরণে থাকে ৪+৬ অথবা ৬+৪ অক্ষর।

"শুয়ে শুয়ে অশোক পাতায় মুমূর্ষু শিশির বলে, হায়!
কোনো সুখ ফুরায়নি যার তার কেন জীবন ফুরায়!"
—রবীন্দ্রনাথ, শিশির, সন্ধ্যাসংগীত।

ইহার প্রতি পংক্তিতে দুইটি ভাগ; প্রতি ভাগে ১০ অক্ষর নিম্নে ২২ অক্ষরের পয়ার দেখুন—

"রাত্রিদিন ধুক্ধুক্ হৃদয়-পঞ্জর-তটে অনন্তের ঢেউ॰॰
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে, শুনিছে না কেউ॰॰।"
—রবীন্দ্রনাথ, প্রতীক্ষা, সোনার তরী

ইহার নামকরণ হইতে পারে 'অতি-বর্ধিত' পয়ার। বর্ধিত পয়ারে থাকে ৮+৪+৬ অক্ষর; আর ইহাতে আছে ৮+৮+৬ অক্ষর কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, 'যতিমাত্রাসমেত ২৪ মাত্রায় এই ত্রিপদী অবয়ব।' ইহাতে ত্রিপদ (trimeter) আছে বটে, কিন্তু পংক্তি প্রান্তে পদটিতে দুই অক্ষর কম, অর্থাৎ ছয় অক্ষর আছে। এরূপ ২ অক্ষরের পংক্তিকে দুই ভাগ করিয়া প্রতি ভাগে ১১ অক্ষর সন্নিবেশ করিয়া পয়ার রচনার রীতি প্রচলিত নয়।

"কটির উপরে কিঙ্কিণী-নাদ।
রতন-মঞ্জীর কর বিবাদ॥
চরণ-কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস-মন জুড়াও তায়॥"

---

* রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, ছন্দ, ৫৫ পৃঃ। † ছন্দ সরস্বতী, ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৫ দেখুন।

ইহাকে বলা হয় একাদশাক্ষরাবৃত্তিঃ বা একাবলী পয়ার। সংস্কৃত ত্রিষ্টুভের প্রতি পদে থাকে ১১ অক্ষর, আর ইহার প্রতি পংক্তিতে আছে ১১ অক্ষর। সাধারণত পংক্তির প্রথম ভাগে ৬ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ভাগে ৫ অক্ষর থাকে।

"যার ঘরে কান্ত সে যে সোহাগিনী পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী নিজ্জর্ন সংকেত ঠাম॥"

—কাজী দৌলত, লোর-চন্দ্রাণী।

ইহাকে বলা হয় লঘু-ত্রিপদী বা ললিত ত্রিপদী। ইহার প্রতি পংক্তিতে তিনটি পূর্ণ পদ ও একটি অপূর্ণ পদ (trimeter with hypermeter) থাকে। পূর্ণ পদ ছয় অক্ষরযোগে এবং অপূর্ণ পদ দুই অক্ষরযোগে গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অক্ষরে যতি পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে "অক্ষর-গণ্তি-করা তিন মাত্রামূলক ছন্দ" বলিয়াছেন।

"এই মোর দোষ নৃপ হৈল রোষ নহে বেশী অপরাধ।
আমার বিচ্ছেদ নৃপ-মনে খেদ, কেবা পুরাইবে সাধ॥"

—সৈয়দ আলাওল, সপ্ত পয়কর।

ইহাও লঘু-ত্রিপদী পয়ার। তবে ইহার প্রতি পংক্তিতে ষষ্ঠ ও ১২শ অক্ষরে মিল আছে। আলাওল ইহাকে বলিয়াছেন "চন্দ্রাবলী ছন্দ।"

"———কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া আসিয়া মিলল মোরে॥"

—চণ্ডীদাস।

ইহার নাম হীনপদ লঘু-ত্রিপদী। কারণ ইহার প্রথম পংক্তিতে দুইটি পদ কম থাকে।

"অদূরে উদয় রবি।
নিদ্রা ত্যজি' ওঠে কবি।
শিরসি-কমলে দশ-শতদলে চিন্তায়ে শ্রীনাথ-ছবি॥"

—রামপ্রসাদ সেন, বিদ্যাসুন্দর।

ইহাকে বলে ভঙ্গ-লঘু-ত্রিপদী। হীনপদ লঘু-ত্রিপদীর প্রথম পংক্তিতে থাকে ৮ অক্ষর; ভঙ্গ-লঘু-ত্রিপদীতে তদ্রূপ দুইটি পদ থাকে।

"সেবিবাম রাত্র-দিন না জানিমু ভিন্ন-ভিন্
যেমত আছয়ে ব্যবহার।
কাটিমু চিকণ সূতি তুমিহ বুনিবা ধূতি
হাটেতে নিবা যে বেচিবার॥"

—শেখ ফয়জুল্লাহ্, গোরক্ষ-বিজয়।

ইহাকে বলা হয় দীর্ঘ-ত্রিপদী। বাঙলার আদি মুসলমান-কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ ইহাকে বলিয়াছেন, "লাচাড়ী দীর্ঘ ছন্দ।" ইহার প্রথমে ৮ অক্ষরের দুইটি পদ থাকে, তৃতীয় পদটি দিগক্ষরা। ৮ম ও ১৬শ অক্ষরে মিল হয় এবং চরণ-অন্তে মিত্রাক্ষর থাকে।

"পাহাড়ীয়া বাঁশুরী বাজায়।
পাষাণের বুক চিরে ধ্বনি কি জন্মিল ফিরে,
বাথায় বাতাসে চিড় খায়॥"

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নীহারিকা।

ইহার নাম হীনপদ দীর্ঘ-ত্রিপদী। কারণ ইহার প্রথমে ৮+৮ অক্ষরের দুইটি পদ থাকে না।

"কেন আজি যাও একাকিনী।
কেন পায়ে বাঁধিছে কিঙ্কিণী।
এ দুর্দ্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী॥"

—রবীন্দ্রনাথ, ঝড়ের দিনে, কল্পনা।

ইহাকে বলে ভঙ্গ-দীর্ঘ-ত্রিপদী। হীনপদ দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম পংক্তিটি দিগক্ষরা; ভঙ্গ-দীর্ঘ-ত্রিপদীতে তদ্রূপ দুইটি পদ থাকে।

"স্তবন গদ্য-পদ্যে সঘন মুখ-বাদ্যে অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ নতি।
বাসব পূজে নিত্য একান্তভাবে চিত্ত, তুষিল দেব উমা-পতি॥"

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

ইহার নাম নর্ত্তক-ত্রিপদী। ইহার প্রতি পংক্তিতে ৭+৭+৭+২ অক্ষর আছে; প্রতি ৭ অক্ষরের পর যতি পড়িয়াছে। এই ছন্দে অক্ষরের পূর্ণ পদ গঠিত হয় ৩+২+২ অথবা ২+৩+২ অক্ষরযোগে।

"কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী করিলা রাজধানী অশোক-মূলে॥"

—ভারতচন্দ্র রায়, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, অন্নদামঙ্গল।

ইহার চরণে চারিটি ভাগ, প্রতি ভাগে ৭ অক্ষর, ৭ম, ১৪শ ও ২১শ অক্ষরে মিল রহিয়াছে। নর্তক ত্রিপদীর শেষ পাদে দুই অক্ষর থাকে, আর ইহাতে আছে পাঁচ অক্ষর। উভয় চরণের শেষে মিত্রবর্ণ আছে।

"কেহবা লিখিছে সংবাদ-পত্রিকা, কেহবা লিখিছে কেতাব,
বহু কষ্ট করি কেহ পায় কৃষ্ণ, কেহবা পাইছে খেতাব।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, হিমালয়-দর্শনে, মন্দ্র।

ইহাকে বলা হয় তরল-ত্রিপদী। ইহার প্রতি পংক্তিতে থাকে ৬+৬+৬+৩ অক্ষর। মহাকবি হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যায়' ইহাকে বলিয়াছেন লতিকাপদী ছন্দ।

—চরণে অরুণ রঙ্গিমা।
হইতে সোগর শম্ভু হৈলা হর দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা॥

—ভারতচন্দ্র রায়, অন্নদার মোহিনী-রূপ, অন্নদামঙ্গল।

ইহাকে বলা যাইতে পারে হীনপদ তরল-ত্রিপদী। কারণ ইহার প্রথম পংক্তিতে দুইটি ৬+৬ অক্ষরের পদ কম আছে।

"স্বপন-নিশায় জাগরণ মম অনাদি-কালের তারকা সাথে,
চির-অনির্বাণ প্রেমের লিখন লিখেছে যাহারা অনন্ত-পাতে।"

—প্রিয়ম্বদা দেবী, মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা, অংশু।

ইহাকে বলা হয় লঘু-চৌপদী। ইহার প্রতি পংক্তিতে চারি পদ (tetrameter) থাকে; তন্মধ্যে পংক্তিপ্রান্তের পদটি হয় অপূর্ণ, তাহাতে এক অক্ষর কম অর্থাৎ পাঁচ অক্ষর থাকে। পংক্তিদ্বয়ের শেষে মিত্রাক্ষর থাকে।

কুসুমিত চ্যূত চারু কর্ণিকার
সমদ কোকিল ভ্রমর-ঝঙ্কার;
বরষি শায়ক মানিনী বালার
বিদরে হৃদয় বসন্ত-রাজ।

—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, বসন্ত, গোধূলি।

ইহার নাম ঊন-চৌপদী পয়ার। এখানে তিনটি পদ দ্বাদশাক্ষরা, প্রতি পদে দুইটি ভাগ, প্রতি ভাগে আছে ছয় অক্ষর। চতুর্থ পদটি একাদশাক্ষরা। হেমচন্দ্রের সুবিখ্যাত "ভারত-সংগীত" এই ছন্দে বিরচিত। রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা" কাব্যের "দুঃসময়" শীর্ষক কবিতাটি এই ধরণে রচিত; তবে তাহার চতুর্থ পদে ৬+৫ অক্ষরের স্থলে ৫ অক্ষর রহিয়াছে।

মনের আবেগ-ভরে আছে একাধারে পড়ে',
নাহি ওর বেশ-ভূষা, চটুল চাহনি।
রুক্ষ্ম কেশ বায়ুভরে চোখে মুখে উড়ে পড়ে,
বিষাদের ছবি যেন ,চির-তপস্বিনী॥

—কায়কোবাদ, মহাশ্মশান কাব্য।

ছন্দজ্ঞ দিলীপকুমার এই ধরণটির নাম দিয়াছেন "লঘু-চতুষ্পদী জাতীয়" পয়ার। ইহার প্রথম পংক্তি পূর্ণ পয়ারের মতো, দ্বিতীয় পংক্তি সাধারণ পয়ারের মতো। প্রথম ও তৃতীয় চরণ ৮ম ও ১৬শ অক্ষরে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিল আছে।

ছুটিছে এয়োর দল সর্ব-অঙ্গে কোলাহল;
ছুটিছে বালিকা-দল, সর্ব-অঙ্গে দামিনী!
বাজে শঙ্খ, জ্বলে ধূপ, এ কি শোভা অপরূপ,
রূপ যে ফাটিয়া পড়ে তোর, হর-কামিনী।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন, উন্মাদিনী, গোলাপ-গুচ্ছ।

ইহাকে বল দীর্ঘ-চৌপদী। দীর্ঘ-ত্রিপদীর মতো ইহারও প্রথম দুই পদে থাকে ৮+৮ অক্ষর। দীর্ঘ-ত্রিপদীর তৃতীয় পাদে থাকে ১০ অক্ষর, কিন্তু তৎস্থলে দীর্ঘ-চৌপদীতে থাকে ৮+৭ অক্ষর। প্রকৃত কথা এই যে, এই ছন্দে আছে চারিটি পাদ, তন্মধ্যে চতুর্থ

পাকে এক অক্ষর কম অর্থাৎ সাত অক্ষর থাকে। হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যায়' এই ছন্দকে বলিয়াছেন ললিত-দীর্ঘ-ত্রিপদী।

সাধারণত ১৪ অক্ষরের পয়ারে 'আটে-ছয়ে' যতি দেওয়াই রীতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র সে-রীতি মান্য করেন নাই। তাঁহার পয়ারের চাল হইতেছে দুয়ের কদমে। চতুর্দশপদী কবিতা, অমিত্রাক্ষর পয়ার প্রভৃতিতেও তিনি দুয়ের গুণকের পর যতি স্থাপন করিয়াছেন। এজন্যই তিনি পয়ার জাতীয় ছন্দের অন্য নাম দিয়াছেন দুইমাত্রামূলক ছন্দ বা 'সম-মাত্রার ছন্দ'। দুয়ের চলনে তাঁহার কবিতার ভাব পয়ারের পংক্তিসীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে।

সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণ-রাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা;
তারাময় রাত্রি
দেয় তা'রে বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্ম্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি।

—রবীন্দ্রনাথ, জলপাত্র, পরিশেষ

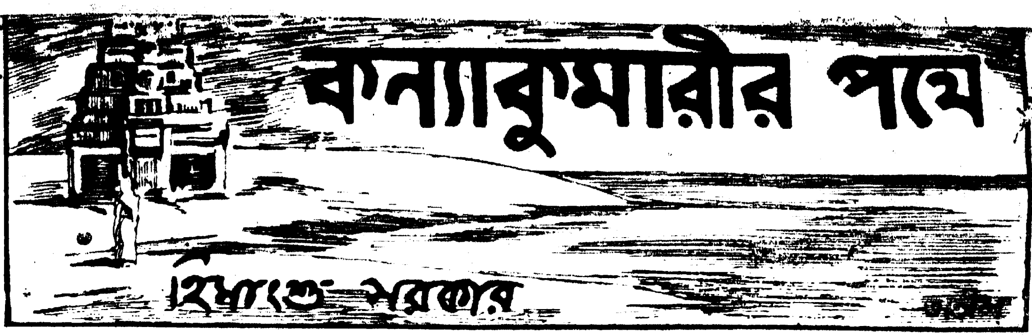
এখানে কোন পংক্তিতে ছয় অক্ষর, কোন পংক্তিতে আট অক্ষর, কোন পংক্তিতে দশ অক্ষর, কোন পংক্তিতে ১৪ অক্ষর এবং কোন পংক্তিতে আঠার অক্ষর আছে। পংক্তির দৈর্ঘের স্থিরতা নাই বলিয়াই ইহাকে বলা হয় মুক্তক ছন্দ। গৈরিশী ছন্দ ও হুসেনী ছন্দ আসলে হইতেছে অমিল-মুক্তক পয়ার। অধুনা একদিকে যেমন অক্ষরবৃত্তে অমিল-মুক্তক রচনার প্রতি প্রবণতা দেখা দিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই লঘু-ত্রিপদী, তরল-ত্রিপদী, নর্তক-ত্রিপদী প্রভৃতি আক্ষরিক ছন্দে প্রণয়ন অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশ

বিশ্বলোক

(৭৯০ পৃষ্ঠার পর)

ছয়টি নক্ষত্র, সম্পূর্ণ আলাদা তাদের গতি ও চলার পথ। এই যে শেষ কথা—তাও বলা যায় না।

মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করতে আরো একটা অতি আশ্চর্য খবর এসে পৌঁছেছে ; এই বিশ্বের নীহারিকাগুলি ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে এক অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে। শুনলে চমক লাগে, কোনো কোনো নীহারিকার বেগ সেকেণ্ডে ২৪।২৫ হাজার মাইল। এই বিপুলায়তন বস্তুসংঘের এই অসম্ভব গতি বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত করেছে। কেউ কেউ বলেন, যে-আলোর পরীক্ষা থেকে এদের গতি স্থির করা হয়েছে, আলো-পরখ-করা যন্ত্রে ধরা দেবার আগে সেই আলো বহু কোটি বছর ধরে একটানা পথ চলেছে এই বিশ্বের মহাশূন্যের মধ্যে। এতো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার যে ক্লান্তি আলোর পক্ষেও তা খুব অসঙ্গত নয় বলেই তাঁরা মনে করেন। এই ক্লান্ত-আলোর (tired-light) পরীক্ষার উপর নির্ভর করে এতো বড়ো একটা প্রশ্নের যাচাই করা চলে না। পৃথিবীর যে বৃহত্তম দূরবীন তৈরী হচ্ছে, তার কাজ শেষ হলে তার সাহায্যে এদের গতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য আরো তথ্য যখন যোগাড় হবে, তখন হয়তো এই জটিল প্রশ্নের একটা মীমাংসা হবে। বিশ্বের আয়তন অতি প্রকাণ্ড হলেও নির্দিষ্ট এই কথাই অনেক বিজ্ঞানী এতদিন বলে এসেছেন—বুদ্বুদের মতো আকাশটা নাকি বেড়েই চলেছে এবং তারই জন্যে এই নক্ষত্রদ্বীপগুলির পরস্পর দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু নক্ষত্র-জগতের এই প্রচণ্ড গতি যদি সত্যি বলেই প্রমাণ হয়ে যায়, তা'হলে বিশ্বের নির্দিষ্ট আয়তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বর্তমান যে ধারণা রয়েছে, তার আমূলে পরিবর্তন করতে হবে। এই বিশ্বকে তখন বলতে হবে সীমাহীন, আর পরস্পর আকর্ষণে নক্ষত্রমণ্ডলীর ভিতর একটা সাম্যস্থিতি আছে বলে যে-মত এতদিন ধরে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, তা' যাবে একেবারে নিরর্থক হয়ে। তখন ভাবতে হবে, এই বিশ্বের অনন্ত শূন্যের অনির্দিষ্ট পথে নক্ষত্র-জগৎগুলি সব পরস্পর সম্বন্ধবিহীন একক যাত্রী। প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম চলা আর টানার বাঁধনে ধরা না দিয়ে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছতে এরা এই মহাদৌড়ের পালা আরম্ভ করেছে, তা' অনুমান করতে মানুষের কল্পনাশক্তিও আজ হার মানছে।



১০

মাদুরা অনেক কালের পুরোনো শহর। এই শহরের ওপর দিয়ে অনেক যুদ্ধ এবং অত্যাচারের ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। এই সবকে কাহিনী বলা যায় না, কারণ ইতিহাসে এর নজির পাওয়া যায়। ইতিহাসের আলোচনা এখানে করবার দরকার নেই—কারণ কোন রাজা কতকাল রাজত্ব করেছেন—কবার তিনি শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন ইত্যাদির আলোচনা অনেকেরই ভাল লাগবে না।

সংক্ষেপে মাদুরার ইতিহাস এই। পাণ্ড্য রাজবংশ মাদুরায় প্রথম রাজত্ব আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকেই মাদুরা সমৃদ্ধিশালী শহর। সেই সময় পাণ্ড্য রাজারা গ্রীক এবং রোমবাসীদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই পাণ্ড্য রাজাদের দূত গ্রীস এবং রোমের রাজসভায়ও গিয়েছিল। ক্রমে এই রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়াতে এদের হাত থেকে মাদুরা নায়ক নামক রাজবংশের অধিকারে চলে যায়। এই দুই রাজবংশ, পাণ্ড্য আর নায়কদের রাজত্বকালে মুসলমানরা মাঝে মাঝে মাদুরা আক্রমণ করে জয় করেছিল। কিন্তু আবার তার পরেই মাদুরা হিন্দু রাজাদের হাতে ফিরে যায়। এটা ঠিক যে, নায়ক রাজবংশ দক্ষিণ ভারতকে সর্বদিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই রাজবংশের তিরুমাল নায়কের নাম বিখ্যাত। এর পর প্রায় ১৭৫৮ সালে নায়ক রাজাদের কাছ থেকে মাদুরা ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হয়। এই তো গেল মাদুরার ইতিহাস।

এছাড়া অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে, যার থেকে আমরা এই মাদুরার নামের উৎপত্তি, শহর এবং মীনাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে জানতে পারি। এই সব কাহিনী কাহিনীই—না সত্য তা বলা যায় না।

মাদুরা নামের উৎপত্তি এই ধরণের। শোনা যায়, আগে এইখানে অনেক কদম্ব বন ছিল। আর এই কদম্ব বনের মধ্যে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ ছিল। ইন্দ্ররাজ স্বর্গ থেকে নেমে এসে এই শিবলিঙ্গের পূজা করতেন। এক সওদাগর একদিন এই কদম্ব বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ইন্দ্রের শিবলিঙ্গের পূজা দেখতে পেয়ে রাজাকে এসে সেটা জানায়। রাজা তখনি এই কদম্ব বন কাটিয়ে এইখানে মন্দির তৈরী করে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবলিঙ্গই এখন শ্রীসুন্দরেশ্বরম বলে পরিচিত। আজও একটা কদম্ব গাছ শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দিরের পাশে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া শহরের অন্য কোথাও আর কোন কদম্ব গাছ আছে কিনা সেটা জানবার সুযোগ হয় নি।

মন্দির তৈরী হল, শহরও গড়ে উঠতে লাগল—কিন্তু রাজা ভাবতে লাগলেন, শহরের কি নাম রাখা যায়। এদিকে শিব রাজার ভক্তি এবং আন্তরিকতায় রাজার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে দর্শন দিয়ে তার জটা থেকে কয়েক ফোঁটা মধু রাজার ওপর ছিটিয়ে দেন। সেই থেকে এই শহরের নাম হ'ল 'মাধুরা'। ক্রমে 'মাধুরা' নামটা সভ্যতার হাতে পড়ে বদলাতে বদলাতে ইংরেজীতে হয়ে দাঁড়াল 'মাদুরা' বা 'মাজুরা'। আর আমরা এই মাদুরা বা মাজুরাকে বাঙলা ভাষায় বেশ স্বচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বলে আনন্দ পাই। আসল নামটা ভুলেই গেছি, বলতে গেলে এখন লোকদের 'মাধুরা' গিয়েছিলাম বললে বোধ হয় অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

এর পর আর একটা কাহিনী থেকে আমরা মীনাক্ষী দেবীর জন্ম, তার বিবাহ এবং তার মন্দির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখতে পাই। পাণ্ড্য রাজবংশের এক রাজা সন্তান লাভের জন্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞের শেষে কুণ্ডের ভেতর থেকে মীনাক্ষীদেবী উদয় হন এবং পরে শ্রীসুন্দরেশ্বরমের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পূর্বে অনেকেই মীনাক্ষী দেবীকে বিবাহ করতে উৎসুক হন। কিন্তু মীনাক্ষী দেবী বলেন যে, তাঁর ৮টি প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে তাকেই তিনি বিবাহ করবেন। সকলেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় পরাজয় স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীসুন্দরেশ্বরম কৃতকার্য হয়ে মীনাক্ষী দেবীকে লাভ করেন। এদের বিবাহ চৈত্র মাসে সমাপন হয়েছিল বলে প্রত্যেক বৎসরে চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসব হয়।

শ্রীসুন্দরেশ্বরমের সঙ্গে বিবাহের পর মীনাক্ষী দেবীর জন্য সুন্দরেশ্বরমের মন্দিরের কাছে আলাদা একটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করা হয়। সেই মন্দিরে মীনাক্ষী দেবীকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দক্ষিণ দিকের মন্দিরটা মীনাক্ষী দেবীর মন্দির—আর উত্তর দিকের মন্দিরটা শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দির। এই দুই মন্দিরের সঙ্গে আরো অনেক ছোট ছোট মন্দির নিয়ে প্রথম পরিক্রমার প্রাচীর সবটা ঘিরে রেখেছে। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে এবং শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দিরে আলাদা আলাদা পূজা হয়।

গোপুরম দিয়ে ঢুকে প্রথমে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির পাওয়া যায়। প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা মণ্ডপ পাওয়া যায়। এখানে স্তম্ভের গায়ে লক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্তি আছে, তাছাড়া মীনাক্ষী দেবীর জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ, পুত্র সুব্রাহ্মণের জন্মের কাহিনী সব খোদা রয়েছে। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কয়েকটা ছোট বড় দরজা পার হয়ে অনেক প্রকার দেবদেবীর মূর্তি দেয়ালে দেখতে দেখতে আমরা একবারে লিলি ট্যাঙ্ক বা 'কমল পুষ্করিণী'র সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। কথিত আছে, আগের কালে মন্দিরের দেবদাসীরা এই পুষ্করিণীতে স্নান করত বলেই এই নামের উৎপত্তি। তা হলে ধরে নিতে হবে যে, সেকালের দেবদাসীরা লিলি বা কমলের মত দেখতে ছিল—সেটার প্রমাণ এখন পাওয়া মুস্কিল। —হ্যাঁ, পুষ্করিণীই বটে। একটা বড় পাথর দিয়ে ঘেরা চৌবাচ্চা আর কি। এই লিলি ট্যাঙ্কের চারদিক ঘিরে ছাত দেওয়া প্রশস্ত বারান্দা আছে। আর এই বারান্দার চারদিক থেকে পাথরের তৈরী অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে নামবার পর তবে ট্যাঙ্কের জলে পৌঁছন যায়। জলের চেহারা দূর থেকে লক্ষ্য করে কাছে এগোবার ইচ্ছা থাকলেও নিবৃত্ত হলাম। পচা এঁদো পুকুরের সঙ্গে তফাৎ নেই, শুধু জাতে উঠেছে মন্দিরের ভেতর বলে আর পাথর দিয়ে বাঁধান বলে।—

এই বারান্দার মধ্যে শ্রীসুন্দরেশ্বরমের লীলা কাহিনী সব চিত্রিত করা কিম্বা দেয়ালে স্তম্ভে খোদা আছে। আর এছাড়া মাদুরা শহরের স্থাপনা ঐ সংক্রান্ত সব পৌরাণিক কাহিনী শিলা লিপি এবং মূর্তির দ্বারা প্রকাশ করা রয়েছে। এই লিলি ট্যাঙ্কের প্রশস্ত

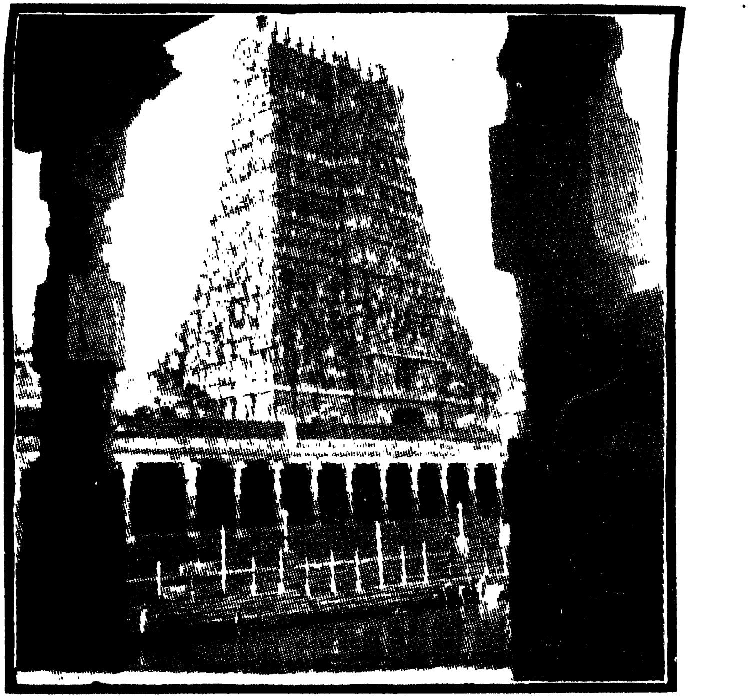
বারান্দা থেকে শ্রীসুন্দরেশ্বরমের স্বর্ণ মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে মীনাক্ষী দেবীর পুত্র সুব্রাহ্মণের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হলাম। সুব্রাহ্মণের মন্দিরের দুপাশে দুই দ্বারপাল—সুগ্রীব আর বলির দুই বৃহৎ পাথরের মূর্তি চোখে পড়ে। এই মন্দির পার হয়ে মীনাক্ষীদেবী আর শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দির। এর কাছেই একটা গণেশের মন্দির আছে। শোনা যায় যে, এই মন্দির নির্মাণের সময় এই জায়গায় একটা পুষ্করিণীর মধ্যে এই গণেশের মূর্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্তিটিকে এইখানে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দিরের দুপাশেও দুটো দ্বারপালের মূর্তি আছে।

মন্দিরের ঠিক প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে বসা অবস্থায় একটা বড় ষাঁড়ের মূর্তি। একটা পাথর থেকে এই ষাঁড় এবং এর মাথার ওপরকার চাঁদোয়া, চাঁদোয়ার স্তম্ভ সব তৈরী করা হয়েছে। এখানে পাথরের কাজ এত সুন্দর এবং সুক্ষ্ম যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সত্যই মীনাক্ষীর মন্দিরের পাথরের কাজ দেখলে মনে বিস্ময় জাগে। আমাদের এ যুগের শিল্পী এবং ভাস্করদের এই সব পাথরের কাজ দেখে তারিফই করতে হবে শুধু। পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগে আমাদের শিল্পকলার উন্নতি হয়েছে কিনা, তাই আমাদের সে-কালের সাধারণ কারিকররা যা করতে পারত, আজকালকার শিল্পীদের কাছে তা দুরূহ। ষাঁড়ের সম্মুখেই নাতিউচ্চ পাথরের গোল স্তম্ভ—সোনা দিয়ে সবটা মোড়া বলে শুনলাম। আবরণটা অবশ্য বেশ ঝক্‌মক্‌ করছিল।

শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দির-দরজা বন্ধ থাকায় অন্য দর্শনার্থীদের মতই মন্দিরের দরজার নিকট ঘোরাফেরা করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দর্শনার্থীরা সবাই মদ্রদেশীয়। আমাদের দেশের কাউকে দেখতে পেলুম না। আর কেউ থাকলেও বোধ হয় আমাদের কাছে ঘেঁষত না—কারণ আমাদের পোষাক। পোষাক সেই বাঘছাল—অর্থাৎ খাকি হাফ প্যান্ট, আর হাফ সার্ট। মন্দিরে প্রবেশের আগে মনে ভয় ছিল, বোধ হয় এ বেশে প্রবেশ করতে গেলে দ্বার থেকেই ফিরতে হবে। কিন্তু প্রবেশে বাধা আমরা কোথাও পাই নি। আর বাধা পাব কি না পাব সেটা রামেশ্বরমের মন্দিরে পরখ করে নিয়েছিলাম। তবে আমাদের পোষাক যে প্রায় সকলেরই একটু কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না। অনিচ্ছায় আমাদের এ ধরণের পোষাক পরে মন্দিরে যেতে হোত—কারণ দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার জন্য আমাদের সময় এত অল্প থাকত যে, ট্রেন থেকে নেমে প্যান্ট সার্ট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে মন্দির ইত্যাদি দেখবার জন্য বের হতে গেলে ওর জন্য অনেকটা সময় নষ্ট হোত। আমরা ট্রেন থেকে নেমে জিনিসগুলো ওয়েটিংরুমের জমাদারের কাছে জমা দিয়ে সেই স্থানের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পরতাম।

আজ দাক্ষিণাত্যের সব মন্দিরের দ্বারই হিন্দুদের সব জাতের কাছে উন্মুক্ত। নীচুজাতের প্রশ্ন তুলে আজ আর কেউ মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে দেবতার দর্শন থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এদিকে আর কিছু না হোক দেবতার দর্শনে সকলের অধিকার। আগে এই দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার অনধিকারের গোঁড়ামিটা এদিককার লোকদের মধ্যে একটু বেশি রকম ছিল। পরে হরিজন আন্দোলনের ফলে আর কিছু না হোক মন্দিরে প্রবেশাধিকার সকলেই পেয়েছে। দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তত এরা মনে মনে বুঝতে পারে যে, সকলেই আমরা এক।

আর এদেশীয় আমরা একটু লোকদেখান উদারনৈতিক কিনা তাই সকলকে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেবার মত সাহস এখন পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারি নি। কি জানি যদি নীচুজাতের ছোঁয়া লেগে দেবতা অস্পৃশ্য হয়ে যান। এর ফলে মানুষের গড়া সমাজের চাপে পড়ে এই নীচুজাতের লোকরা দলে দলে সনাতন হিন্দুধর্মের মায়া কাটিয়ে এমন ধর্ম গ্রহণ করছে যেখানে তারা অন্তত দেবতার সামনে একসঙ্গে দাঁড়াবার অধিকার পায়।



মাদুরার জিলি ট্যাঙ্কের সম্মুখ থেকে একটা গোপুরম দেখা যাচ্ছে

অবশ্য দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে দেবতার আসল মন্দিরে বিধর্মীদের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারে।

আমাদের পোষাকের জন্য অবশ্য কোন মন্দিরেই ঢোকবার আগে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্ন কেউ করে নি। খুব সম্ভব হয়ত তারা এই মনে করেই আমাদের কোন রকম প্রশ্ন করে নি যে, যারা মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করবার সাহস করে তারা স্বধর্মীয়।

অল্পক্ষণ পরে মন্দিরের দ্বার খুললে আমরা মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলাম। লিঙ্গ মূর্তি। পূজারী কর্পূর জ্বালিয়ে মূর্তির সম্মুখে ধরে দর্শনার্থীদের মূর্তি দেখাতে লাগল। মূর্তির সামনে যেখান থেকে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে হয়, সেখানে একটা চৌকা মত জায়গা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে। এই রেলিং ঘেরা জায়গাটায় প্রবেশ করা যায় না। এরূপ ঘিরে রাখার কারণ যে ভীড়ের সময় মূর্তির সামনে ভীড় বেশি হলে সব দর্শনার্থীদের দর্শন করতে অসুবিধা হয়। এই রেলিং ঘেরা থাকার দরুণ সকলে রেলিংএর বাইরে থেকে চারদিক ঘিরে ভালরূপে মূর্তি দর্শন করতে পারে।

আমাদের দেশে মন্দিরে দেবতার সম্মুখে দর্শনের পর ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করি, আর এ না হলে নিদেনপক্ষে হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মাথা নীচু করে প্রণাম করি। এদিকে কিন্তু এধরণের প্রণামের প্রথা নেই দেখলাম। আমাদের এদিককার প্রণামের প্রথা না জানা থাকার দরুণ প্রথমে একটু অসুবিধায় পড়েছিলাম। এদিকে প্রণাম করবার প্রথা হচ্ছে যে, দর্শনের পর সকলেই দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাত দুটো জড়ো করে, মাথার পেছন দিকে মাথা স্পর্শ না করে ধীরে ধীরে হাত দুটো দু তিনবার অন্দোলন করে। এই প্রথায় দেবতাকে প্রণাম করা আমাদের কাছে একটু নতুন। ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম জানালে নাকি দেবতার অসম্মান করা হয়। কারণ জানতে গিয়ে কোন উত্তরই মেলে নি। কি করা যায় যস্মিন দেশে যদাচার। আমরাও ওদের মত প্রণাম না করলেও ভূমি স্পর্শ করে আর প্রণাম কোথাও করি নি ব্যাপারটা জানবার পর থেকে। দু'এক জায়গায় মেয়েরা হাত দিয়ে নিজেদের গালের ওপর আস্তে আস্তে চাপড়ায়—এও নাকি দেবতাকে ভক্তি জানাবার একটা প্রথা। মেয়েদের এই ধরণটা শুধু এক ক্ষেত্রেই চোখে পড়েছিল। তবে আগে যে ধরণের প্রণামের কথা বলেছি সেটা সর্বত্রই একরূপে দেখলাম।

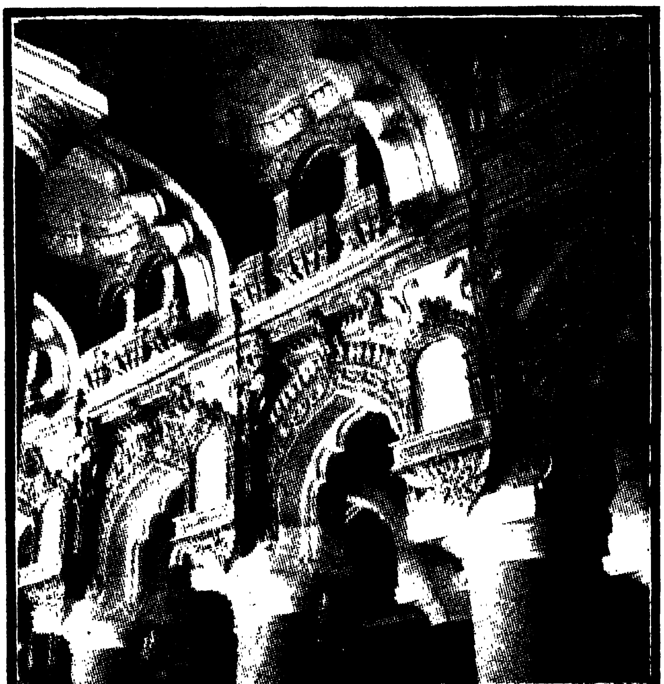
মন্দিরে দেবতার চরণামৃত দেবার প্রথা আছে। পূজারী কর্পূর জ্বালান প্রদীপ ধরলে দর্শনার্থীরা আগুনের ওপর হাত রেখে সেই হাত মুখে, কপালে, বুকে, শরীরে বোলায়। এছাড়া অল্প করে ভস্মও দর্শনার্থীদের দেওয়া হয়। এই ভস্ম দিয়ে এদেশীয় লোকরা কপালে তিলক টানে। ব্রাহ্মণ হলেই কপালে সব সময় লম্বা টানা টানা তিলক পড়বে।

শ্রীসুন্দরেশ্বরমের মন্দির থেকে বের হয়ে মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরে মীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করে আমরা সহস্র স্তম্ভী মণ্ডপে (Hall of thousand pillars) গিয়ে উপস্থিত হলাম। সহস্র স্তম্ভের কথায় গৌড়-এর হাজার দুয়ারীর কথা মনে পড়ল। গৌড়ে আজ এই হাজার দুয়ারের সবগুলোর অস্তিত্ব না থাকলেও এক সময়ে যে সেখানে এক হাজার দুয়ার ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সহস্র স্তম্ভী মণ্ডপে এক সহস্রটা স্তম্ভ আছে কিনা সেটা গোনবার চেষ্টা করিনি। প্রত্যেকটা স্তম্ভে সুন্দর সুন্দর মূর্তি এবং নানান ধরণের ফুল লতাপাতার কারুকার্য করা আছে। এই মণ্ডপের ভেতর প্রবেশ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেদিকেই তাকানো যাক না কেন স্তম্ভগুলো সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধ বলে মনে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে স্তম্ভের গায়ের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে। যতদূর দেখা যায় মূর্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায় এবং মনে হয়, সেগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মন্দির দেখা শেষ করে বাইরে এসে সংগীত স্তম্ভ (music coloumn) দেখলাম। কিছু দূরে দূরে পর পর কয়েকটা পাথরের তৈরী স্তম্ভ আলাদা আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলোর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, প্রত্যেকটা স্তম্ভে ২১টা করে বাঁশের মত ভেতর ফাঁপা পাথরের তৈরী সরু স্তম্ভ গোল করে সাজিয়ে সমস্তটা তৈরী করা হয়েছে। এই সরু সরু স্তম্ভগুলোর গায়ে একটা ছোট পাথর দিয়ে আঘাত করলেই সুন্দর মিষ্টি শব্দ বের হতে থাকে। মজা এই যে, সব সরু স্তম্ভগুলোই বাইরে থেকে দেখতে লম্বায় এবং পরিধিতে এক রকম হলেও প্রত্যেকটা থেকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শব্দ বের হয়। আমাদের মধ্যে সংগীতজ্ঞের অভাব থাকায় এটা নিয়ে বেশিক্ষণ গবেষণা করা সম্ভব হল না।

মন্দিরের বাইরে এসে রাস্তার অপর পাশে তিরুমাল নায়কের চোলট্রি দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দির দেখা শেষ করে আমরা সকলে এবার তিরুমাল নায়কের প্রাসাদ দেখবার জন্য রওনা দিলাম। মন্দির থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে এই প্রাসাদ। তিরুমাল নায়কের রাজত্বকালে এই সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মিত হয়।



মাদুরা তিরুমাল নায়কের প্রাসাদের ভিতরের একটি অংশের দৃশ্য

লর্ড নেপিয়ার যখন এদিককার গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি এই প্রাসাদটি গভর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত করেন। এখন সরকারী কোর্ট এবং অন্যান্য সাব অফিসের জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয়। প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারটি নেপিয়ার গেট নামে পরিচিত। প্রাসাদটা খুব বড়। প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করার পর সুউচ্চ প্রশস্ত বারান্দা পাওয়া যায়। বারান্দার ওপর ছাত দিয়ে আবৃত। খিলানে, স্তম্ভে নানান রকম কাজ চোখে পড়ে। আমরা যখন প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম, তখন অফিস এবং কোর্টের কার্য আরম্ভ হয়েছে। এর জন্য আমাদের প্রাসাদ দেখবার কোন অসুবিধা হয় নি—কারণ দর্শকদের ভেতরে প্রবেশের কোনরূপ বাধা নেই।—অধিকাংশ ঘরেই কোর্টের কার্য চলছে দেখলাম। এসব ঘরগুলির ভেতর দেখবার মত কিছু নেই, কারণ তিরুমাল নায়কের আমলের কোনরূপ আসবাবপত্র জাতীয় কিছু এই প্রাসাদে নেই। একটা প্রশস্ত থালি ঘরে প্রবেশ করে শুনলাম যে, এটা তিরুমালের রাজসভা ছিল। ঘরের চারদিকে অলিন্দ থেকে মহিলাদের রাজসভার কার্য দেখবার বন্দোবস্ত ছিল। আর একটা ঘরে প্রবেশ করে শুনলাম যে, সেটা তিরুমালের শয়নঘর ছিল। ছাত থেকে সোনার শেকল দিয়ে রাজার পালঙ্কে ঝোলান অবস্থায় থাকত—আর রাজা সেই

(শেষাংশ ৮০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমাদের বর্তমান সমস্যা

বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে আজ আপনাদের আলোচনা শুনে অনেক নতুন জিনিস জানা গেল। আমার কাছে আপনারা এ সম্বন্ধে কিছু শুনতে চেয়েছেন, আমার বিশেষ বলবার কিছুই নেই। আমার শুধু একটি কথা বলবার আছে তা এই যে, বৈষ্ণব ধর্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম নয়। মানুষের পক্ষে যা ধর্ম—বৈষ্ণব ধর্ম সেই জিনিস। দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষের মধ্যে এ ধর্ম নিবদ্ধ নয় কিংবা এই ধর্মের বিচার সন তারিখের হিসেবের মধ্যেও পড়ে না। ধর্ম কি, এ নিয়ে অনেক বিচার আছে, ধর্ম সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তিগত অর্থও আপনারা জানেন ; সে সব বৈয়াকরণ-বিচার আমার কাছে একান্ত অবান্তর বলেই মনে হয়। মোটামুটি কথা এই যে, সাধারণভাবে মানুষমাত্রেই কতকগুলো জিনিস পাবার জন্যে চেষ্টা করে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কাছে সে কথা বলেছিলেন, জন্মভূমির অনুসারিণী কতকগুলো বিশিষ্ট রীতিনীতির বৈষম্যসত্ত্বেও মানুষের অভীষ্টগত একটা সাম্য আছে, মানুষ মাত্রেরই যা প্রয়োজন, একেই বলা চলে মানুষের ধর্ম। 'সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ মানুষ চায় সুখ এবং সেই সুখকেই বলা চলে তার ধর্ম। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে, সুখ তো পশুতেও চায় ; কিন্তু পশুর সুখ আর মানুষের সুখ এক নয়। এইজন্যে পশুর ধর্ম আর মানব ধর্মকেও এক বলা চলে না। পশুর সুখ একান্তভাবে বাহিরের বস্তুর উপর নির্ভর করে ; কিন্তু মানুষের তা নয়। বাহিরের বস্তু নিরপেক্ষভাবেও মানুষ তার অন্তরে সুখকে অনুভব করতে পারে। অন্তরে এই অচল-প্রতিষ্ঠ সত্যকে অনুভব করাই মানুষের ধর্ম। এই কথাই মানবধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋষিরা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, আত্মার মধ্যে যে সুখ পাওয়া যায়, বিষয়ের মধ্যে সে সুখের তুলনাই হ'তে পারে না।

অনপেক্ষ একান্ত সুখের আশ্রয়—যাকে পেলে মানুষের সকল খোঁজাখুঁজি শেষ হ'য়ে যায়, সকল বিতর্কের অবসান ঘটে—'আত্মা' শব্দে তাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ভাগবত একথাও বলেছেন যে, যারা আত্মাকে পেয়েছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সভ্য হয়েছে, তারাই মানুষ হয়েছে। আত্মাকে পেলেই মানুষের চাই চাই বন্ধ হয়ে যায় এবং এ জগতে যত কাটাকাটি হানাহানি চলেছে, এই চাই চাই বা তৃষ্ণার জন্যেই। আত্মাকে পেলে মানুষ ক্ষীণতৃষ্ণ হয়—কুশল হয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আত্মা বলতে আমাদের অনেকেরই কোন ধারণা হয় না। আত্মা কি পদার্থ, এ কি শরীরের ভিতরকার যন্ত্রবিশেষ? বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ সহজ কথায় আত্মার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আত্মা প্রিয়, আত্মা অর্থ, আত্মা ভগবান, আত্মা অনন্ত। তাঁদের মতে অনন্তের সঙ্গে যোগই হ'ল আত্মজ্ঞানের লক্ষণ ; সমুদ্রের ভিতর নদীসকল যেভাবে প্রবেশ করে, সেই রকম সমস্ত কামনা যার অনন্তের ছন্দে যুক্ত হয়, সেই শক্তি লাভ করে থাকে। কঠিন কথা! আমাদের কামনা সবই খণ্ডের পথে, সবই অন্তের দিকে। খণ্ডের পথে যদি কামনাগুলোর গতি না হ'ত, আমাদের কামনা যদি অন্তযুক্ত না হ'ত, তা'হলে প্রকৃতপক্ষে সেগুলো বহু থাকতেই পারত না, এক হয়ে যেত। ঋষিরা বলেন, আত্মানম্ একম্ জানথ। আত্মাকে এক বলেই জান। অনন্তের মধ্যেই তোমার বহু কামনাকে বিলীন করে দাও ; তা'হলে আর আক্ষেপ করবার কিছু থাকবে না। তোমার আনন্দ বা সুখ স্থায়ী হবে। আপনারা বলবেন, ফরমাইসটা করা সোজা, কিন্তু কাজে করা শক্ত এবং কার্যকর প্রস্তাব কিনা সে বিষয়েও দস্তুরমত সন্দেহের কারণ রয়েছে। যে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে ফরমাইস দেওয়া হ'ল, সে অনন্তকে পাই কোথা! *আমি সান্ত—আমার বাক্য, মনের গতি অনন্ত পর্যন্ত পৌঁছে না এবং অনন্তের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন একটা ধারণা করতেও সে সমর্থ নয়।* যে জিনিস ধারণাতেই আসে না, তার সঙ্গে মনের যোগ হবে কেমন করে? এ ত সম্ভব নয়। এ একটা একান্ত অবাস্তব, উদ্ভট পরিকল্পনা মাত্র।

বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ অভয় দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সামর্থ তোমার রয়েছে এবং তাতেই তোমার মনুষ্যত্ব। সেই অনন্তকেই তুমি চাও এবং তাকে পেতেও পার। অনন্ত ও তোমার মাঝে একটি রোধ রয়েছে—তৎরোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবং আত্মনঃ। এই রোধই আত্মশক্তি পেতে হানি ঘটাচ্ছে। এই রোধটি হ'ল অহঙ্কার। অহঙ্কারের বাঁধটা ডিঙিয়ে যেতে পারলেই অনন্তের সঙ্গে তোমার যোগ হবে, তুমি আত্মাকে পাবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে এই যে, অহঙ্কার যাবে কিসে? এর উত্তর এই যে, অহঙ্কার যাবার পথ হ'ল ত্যাগের পথ। এই ত্যাগের পথ তোমাকে ধরতে হ'বে। আগে ভাগে এই ত্যাগের পথ ধরানোই হ'ল যত সমস্যার মূলে। আত্মা যেখানে অনুমান মাত্র রয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ ভোগের পথ ছেড়ে মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় পরোক্ষ ত্যাগের পথ ধরবে কেন? ভোগের পথ যতদিন পর্যন্ত সে ভুল ব'লে না বুঝছে, ততদিন পর্যন্ত ত্যাগের পথ সে ধরছে না, ধরতে পারেও না। এ ক্ষেত্রে ত্যাগের অন্তর্নিহিত লাভকে তার প্রত্যক্ষতার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্ম এই প্রত্যক্ষতারই সাধনা এবং এই হ'ল বৈষ্ণবদের শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ হলেন এই ত্যাগের ছন্দ। তাঁর স্মরণে, চিন্তায় এবং তাঁর অনুধ্যানে ত্যাগের সুরটি অন্তরে বেজে উঠে এবং সান্ত জীব অনন্তকে লাভ করে। তাঁকে পেলে খণ্ডতা পূর্ণের মধ্যে বিলীন হয়। কেমন করে হয়; সে কথা অনেকটা অনুভবের ব্যাপার। সার্বভৌম সত্যরূপে তা নির্দেশ করা সোজা নয়। অল্প কথার মধ্যে ভেঙ্গে ভাবটি ভাষায় এনে ব্যক্ত করা সাধকের পক্ষেই সম্ভব, আমার মতো সাধারণ জীবের পক্ষে তা দুঃসাধ্য। বৈষ্ণবেরা বলেন, তাঁদের কৃষ্ণ মধুর, তিনি অখিল রসামৃত মূর্তি। মানুষের স্বভাবই হ'ল এই যে, যা মধুর, তা তার অহঙ্কৃত বিচারকে ছাপিয়ে ফেলে আর সে জিনিস তার চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়মিত করতে থাকে। ক্রমে সে ঐ মাধুর্যের দ্বারাই চালিত হয়। সে নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে ও মধুরকে অতিক্রম করতে পারে না। এই পথে সে ভাবের রাজ্যে গিয়ে পড়ে। তার সকল অভাব তখন গৌণ হ'য়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানের অন্তর্নিহিত এই যে মাধুর্যের প্রভাব, ইহা মানুষের ধর্ম বা আশ্রয়। মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের উপর মাধুর্যের এই প্রভাবেই মানুষ আত্মার প্রত্যক্ষতা লাভ করে থাকে, আত্মার দ্বারা সে পরিস্নাত হয়। এই অবস্থায় সর্বত্র সুন্দরের উপলব্ধি ঘটে, প্রিয়কেই সে দেখে, কিছু অপ্রিয় দেখে না। সকল লোকসানের অতীত স্তরে সে উঠে যায়। সকল গ্লানির সে চলে যায় উপরে।

এখানে মানুষের কাজ বন্ধ হ'ল এবং তার মধ্যে অনন্তের কাজ আরম্ভ হ'ল। সে কাজটা কি? ভাগবত বলেন, "ব্যসনং হিং পুংসাং প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং।" তিনি মানুষের অশেষ রকমে ব্যসন দূর করেন। কিভাবে দূর করেন, বাঙলার বৈষ্ণবাচার্য ভেঙ্গে বলেছেন, "সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান, নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান।" নাম-সাধক বলবেন, এ অবস্থায় নাম করতে হয় না,

নাম শুনা যায়। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আস্বাদনের এ অবস্থা—এ অবস্থা কৃষ্ণসেবা সমুদ্রে মজ্জন।

অভাবের রাজ্যে আমরা পড়ে আছি, প্রভাবের পরিচয় আমরা জীবনে লাভ করি নাই। কাজেই প্রভাবের খেলাটা আমাদের জীবনে কেমন করে হয়, আমাদের ধারণায় আসবে না। মহাপ্রভু নিজে এর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শ্রীমুখের বাণী হ'ল এই—"সবাকার ঊর্ধে হয় গোপীকার ভাব, কহিতে কে অধিকারী সে সব প্রভাব।" মাধুর্যের সে তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। আমাকে এখানে পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে; কারণ এ কথার সুর পেতে হ'লে সমাহিত মনের প্রয়োজন; প্রয়োজন অতি প্রশান্ত প্রতিবেশের। সাধারণ ভাষায় এ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, মানুষ সে অবস্থায় প্রেমের প্রাচুর্যের দ্বারা পরিস্নাত হয়, প্লাবিত হয়। সে ক্ষুদ্র হলেও বৃহত্তের দ্বারা সান্ত হ'লেও অনন্তের দ্বারা বৃত হয়,—"সংবৃতঃসন্ নিয়তার্থো ভজেত"—অনন্তের দ্বারা বৃত হলেই সে নিয়তার্থ হয়, অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় অহংকৃত বিচারের খণ্ডের মধ্যে; অন্য কথায় কামের মধ্যে সে যে সুখ পাচ্ছে, যে অর্থ তার লাভ হচ্ছে, তা নিয়ত নয়; শুধু ক্ষণিক কিন্তু প্রভাবের মধ্যে পড়লে অভাব যায় স্থায়ীভাবে। সে অবস্থায় "রঙ্গ বিনা নাহি অঙ্গ ভাব বিনা নাহি সঙ্গ।" এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনির্বচনীয় প্রেম, অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে দেহে, মনে, প্রাণে।' মানুষ তখন দিব্য জীবন লাভ করে এবং দিব্য সুখের অধিকারী হয়। উপনিষদে এই তত্ত্বকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপনিষদ বলেছেন, এই আত্মা যাকে বরণ করেন, তাঁর কাছে তিনি লভ্য হন। তিনি তাঁকে নিজের তনুর দ্বারা বরণ করেন। এই বরণের ব্যাপারটা রসতত্ত্বের ব্যাপার। সামবেদ বলেছেন, হে দেবতা, তোমার অনেক সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি, এ সব ডুবিয়ে দিয়ে তোমার কথা আমার হৃদয়ে সৃষ্টি কর, তবেই এক তোমার দিকে আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত হবে। তখন আমি রসরাজ্যে প্রবেশ করবো এবং তোমাকে রসময় পুরুষ স্বরূপে "ঋষভং পতিং" পতি স্বরূপে পাব।

প্রশ্ন হবে এই যে, অবস্থা এতে ব্যাবহারিক জগতের কাজ চলবে কি করে? সাধকের পক্ষে এ প্রশ্ন অনেকটা অবান্তর। এর উত্তরস্বরূপে এই কথা বলা যেতে পারে যে, ব্যবহার বলতে পশু ব্যবহার একমাত্র ব্যবহার নয়। মানুষকে পশুর ব্যবহারের উপরে উঠতে হবে, যদি সে সত্যই শান্তি চায়, সুখ চায়। ব্যবহারিক জগৎ বলতে আমরা মারামারি, কাটাকাটি, স্বার্থের হানাহানির জগৎকেই বুঝতে শিখেছি। যে জগতে আনন্দের খেলা চলছে, সে জগৎকে অসত্য করে রেখেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের এ বিভ্রমকে আরও পাকা করে তুলছে এবং আমরা মনে করছি যে, এই বিভ্রমই বুঝি বাস্তব। কিন্তু এ দেশের দৃষ্টি সে দৃষ্টি নয়। সেদিনও স্বামীজী আমাদের কি শুনিয়ে গেলেন? তাঁর মুখেই তো আমরা শুনেছি—"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" এ সব কি অবাস্তব বা ভিত্তিহীন উক্তি? এ-সব কথাকে আমরা কি লঘুভাবেই উড়িয়ে দেবো? দিতে পারি, পাশ্চাত্যের স্বার্থ-সর্বস্বতার সংস্কার যখন মনের উপর এসে পড়ছে, তখন সেটাই সম্ভব; কিন্তু তাতেই অসত্য সত্য হবে না, মৃত্যু অমৃতত্বে পরিণত হবে না, অধর্মও ধর্ম হবে না। আমরা মৃত্যুর মাঝে ডুবে পড়ছি এবং মৃত্যু-দেবতাই যাদের বড় দেবতা, তাদের দৃষ্টি দোষই আমাদের দৃষ্টিকে আজ কলুষিত করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু মানুষের ধর্ম মৃত্যু নয়—অমৃতই তার ধর্ম। এ দেশের বৈষ্ণবেরা দ্বারে দ্বারে এই ধর্মই প্রচার করে গেছেন। মৃত্যুভয়ে অভিভূত মানবের দুয়ারে তাঁরা শিরে করে বয়ে নিয়ে গেছেন অমৃতের পশরা। তাঁরা একথা বলে গেছেন যে, অমৃতের এই আকিঞ্চন বিশ্বের মানুষের মধ্যে একদিন জেগে উঠবেই এবং সেজন্য ভারতভূমির কাছে তাদের আসতে হবেই। মননের দ্বারাই মানুষ জীবনধারণ করে, সভ্যতার নামে যারা আজ হিংসার তাণ্ডবলীলায় মেতেছে, মনস্বিতা তারা লাভ করতে পারেনি। পশুর মত ইন্দ্রিয়ের জড় ভোগের দ্বারাই তারা চালিত হচ্ছে—দুঃখে থেকে দুঃখের মধ্যে গিয়েই পড়ছে সুখের লোভে। "কৃতং মনস্বিনঃ সংনস্য যান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ'—এদের কর্মোদ্যম যখন ত্যাগের পথে চলবে, সেবার অভিমুখে হবে তার গতি, তখন এরা হবে মনস্বী, এরা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য পদবাচ্য হবে তখন এবং তখন এরা অভয়ত্ব লাভ করবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, যে কথা আমি বলতে চেষ্টা করছি, বলে উঠতে পেরেছি কিনা জানিনে। বৈষ্ণব ধর্মের মর্মকথা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-তত্ত্বের অনুধ্যান যদি আপনারা সত্যই লাভ করতে চান, তবে বাঙলার বৈষ্ণবসাধকগণের অবদানসমূহ আপনাদের অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। তবে ধরতে হবে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে—মানবধর্মের তিনিই পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তাঁকে জানতে চেষ্টা করুন, বুঝতে চেষ্টা করুন, ত্যাগ আপনাদের জীবনে সত্য হবে, শক্তি আপনাদের জীবনে নিত্য হবে। আমরা যাকে অহংকার বলি, একে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থের বিরোধ, কার্পণ্য—এ ছাড়া ওর মধ্যে অন্য বস্তু খুব কমই আছে; কিন্তু ওর কোনটিই প্রকৃত শক্তি দিতে পারে না। ওর যত দাপট ক্ষুদ্রতার গণ্ডির ভিতর। একে অতিক্রম না করতে পারলে কোন জাতিই বড় হ'তে পারে না। বৈষ্ণব ধর্মে একে অতিক্রম করবার কৌশলই দেখিয়েছে। সে ধর্ম আমাদের মর্মস্থল যদি স্পর্শ করে, তবে জীবন আমাদের সার্থক হবে, শক্তি আমাদের সব দিক থেকে সফল হবে। শত বিপর্যয়ের ভিতরও আমরা বিচলিত হব না। আমাদিগকে সব দিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ভয়। এমন অপরিমিত ভীতি নিয়ে কোন বড় কাজ করা যায় না—ভয়কে জয় না করতে পারলে আমরা মানুষ হ'তে পারব না। বৈষ্ণব ধর্ম এই ভয়কে অতিক্রম করবারই পথ এবং সে পথ জয়েরই পথ।*

*বাউরিয়া বৈষ্ণব সম্মিলনে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।

বিচিত্রা বার্তা

ভূগোল আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। নিতান্ত পরীক্ষায় পাশের প্রয়োজনে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের নামগুলিকে মুখস্থ রাখতাম তারাও স্মৃতি থেকে অদৃশ্য হ'তে চলেছিল। ছোটখাট দেশের নাম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আসার কোন সম্ভাবনা না থাকায় আমরা তাদের তুচ্ছজ্ঞানে অবহেলা করে এসেছি। সেইসব অখ্যাত শহরগুলিই দেখছি সামরিক প্রয়োজনের দিক থেকে আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। যুদ্ধের খবরের মধ্যে আমরা যেমন অনেক নতুন নতুন দেশের নামের পরিচয় পাচ্ছি তেমনি অনেক নতুন নতুন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র এবং কলাকৌশলের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। 'কমোফ্লেজ' (Comouflage) কথাটি সকলেই যুদ্ধের খবরের মধ্যে পেয়েছেন। সামরিক কলাকৌশলের দিক থেকে 'কমোফ্লেজ' আজ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সৈন্যদের তাঁবু, যুদ্ধের যানবাহন, জাহাজ কামান প্রভৃতির মত সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারকে রং লাগিয়ে গাছের আচ্ছাদনে অথবা ধুম্রজালের মধ্যে শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন রাখার কৌশলই হচ্ছে 'কমোফ্লেজ'। গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই কথাটি অজ্ঞাত ছিল। ১৯১৭ সালে এই কথাটির প্রথম ব্যবহার হয় বিলাতী সংবাদপত্রে। ঐ সময়ে জনসাধারণের নিকট এই শব্দটির অর্থও প্রকাশ করা হয়। কমোফ্লেজ কথাটি ফরাসী ভাষার একটি অশ্লীল শব্দ। ও দেশের লোকে কারওকে অপমান করতে হ'লে পাকান গোল কাগজের একদিকে আগুন ধরিয়ে ধুঁয়াটা তার মুখে ছুড়ে দিত। এটাকেই 'কমোফ্লেজ' বলা হ'ত। বর্তমানে সামরিক কলাকৌশলে 'কমোফ্লেজের' যে ব্যবহার তার উৎপত্তি নাকি এইখান থেকেই।

* * *

আমাদের দেশের রাস্তায় এক একটি লোকের খুব লম্বা দাড়ি দেখা যায়। কিন্তু জার্মান দেশের বার্নায়ু শহরের মেয়রের দাড়ির সঙ্গে বোধ হয় কারও দাড়ির তুলনা চলে না। এই মেয়র ১৫৭২ সালে মারা যান। এই ভদ্রলোকের দাড়ি চিবুক থেকে নীচের দিকে পা পর্যন্ত নেমে আরও ছয় ইঞ্চি বেড়ে ছিল। একবার ভদ্রলোকের দাড়ির কথা ভাবুন। এই দাড়ি কম বিপদের নয়। দুর্বৃত্তরা লম্বা দাড়ির সুযোগ পেয়েই অনেক কিছু সুবিধা করে নিতে পারে। ছোট ছেলে মেয়েরা ত এই ধরণের লম্বা দাড়িওয়ালা লোক দেখে ভয়ে আর কোনদিন সহজে সে রাস্তায় হাঁটিবে না যে রাস্তায় দাড়িওয়ালা লোকটি চলবে। গ্রীষ্মের দিনে কি অসুবিধা—ছারপোকার কামড়ও হয়ত সহ্য করতে হবে। কিন্তু মানুষের সখের কাছে এই সমস্ত অসুবিধা কিছুই নয়। এই মেয়র ভদ্রলোকটি রাস্তায় হাঁটার সুবিধার জন্যে লম্বা দাড়িটা একটা কাঁধের উপর তুলে নিতেন। রাস্তার দু'পাশের লোক অবাক হয়ে এই ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে থাকত। দুষ্টু ছেলের দল পিছন থেকে তাঁকে বিরক্ত করত কিনা সে খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের মনে হয় সুযোগ পেলে তারা ছেড়ে কথা কইত না। যাই হউক, এই ভদ্রলোকটি একদিন টাউনহলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দাড়ির সঙ্গে পা জড়িয়ে একেবারে সিঁড়ির নীচে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভদ্রলোকের ঘাড়টি ভেঙে গিয়েছিলো।

পৃথিবীর বৃহত্তম, দীর্ঘতম এবং উচ্চতম

পর্বত	মাউণ্ট এভারেস্ট (২৯,০০২ ফিট)
লাইব্রেরী	ন্যাশনাল লাইব্রেরী (ইউ, এস এস আর)
মরুভূমি	সাহারা (আফ্রিকা)
অট্টালিকা	সোভিয়েট প্যালেস (১৩০০ ফিট, রাশিয়া)
বৃহত্তম প্রাসাদ	ভাটিকান (রোম)
জাহাজ	কুইন এলিজাবেথ (৮৫,০০০ টন)
মর্মর মূর্তি	স্বাধীনতার মর্মর মূর্তি (১৫১ ফিট, নিউইয়র্ক)
বৃহত্তম এবং গভীরতম সমুদ্র	প্রশান্ত মহাসাগর
দীর্ঘতম করিডোর	দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বেরম মন্দিরের করিডোর (বারান্দা—৪০০০ ফিট লম্বা)
দীর্ঘতম রেলওয়ে প্লাটফর্ম	শোনপুর স্টেশন (বিহার)
বৃহত্তম উদ্যান	ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক

* * * *

শরীরের রক্তের ওজন নির্ভর করে বয়স এবং শরীরের ওজনের উপর। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের দেহস্থ রক্তের ওজন তার শরীরের ওজনের ১৩ ভাগের একভাগ। একজন সদ্য জাত শিশুর রক্তের ওজন শরীরের ওজনের ১৯ ভাগের একভাগ। যে লোকের দেহের ওজন ১৩ স্টোন হিসাব নিয়ে দেখা গেছে তার দেহের রক্তের ওজন দাঁড়ায় ১৪ পাউণ্ড। ঘোড়া শক্তিশালী জন্তু। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখেছেন ঘোড়ার দেহে শরীরে ওজনের ১৮ ভাগের একভাগ রক্ত আছে।

* * *

পাড়ায় পাড়ায় কত রকম ক্লাবই ব্যাঙের ছাতার মত আবির্ভাব হয়। একটা কোন রকম উপলক্ষ পেলেই হল। নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে আবার কত ভিন্ন রুচী-সম্পন্ন লোক ক্লাব গড়ে তুলেছে। আমেরিকা দেশটির এ বিষয়ে একটু অভিনবত্ব আছে। ১৯৩৮ সালে ব্রিসটোনে Bald-Head Club (টেকোদের ক্লাব)-এর রজত জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে। মাথায় টাক না পড়া পর্যন্ত এই ক্লাবের কেউ সভ্য হতে পারেন না। টাকের অতি উৎকৃষ্ট ওষুধ ব্যবহার করেও যাদের মাথায় কেশোদ্গম হয় না তাঁরা অবশেষে এই ক্লাবের সভ্য হয়ে গৌরব অনুভব করেন।

কন্যাকুমারীর পথে

(৭৯৯ পৃষ্ঠার পর)

পালঙ্ক থেকে নীচে রাজনর্তকীদের নৃত্য-গীত দেখতেন।

এখন থেকে আমরা প্রায় তিন মাইল দূরে টেপাকুলম দেখবার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। টেপাকুলম হচ্ছে একটা বড় পুষ্করিণীর মধ্যেখানে একটা মন্দির। টেপাকুলম এদিককার প্রায় সব মন্দিরের সঙ্গে অথবা কিছু দূরে দেখতে পাওয়া যায়। টেপাকুলম ছাড়া যেন মন্দির নির্মাণ শেষ হয় না।

প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে আমরা বেলা প্রায় ২টায় স্টেশনে ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করলাম। এবার আমরা এখান থেকে কন্যাকুমারীর দিকে রওনা হব। বেলা ৫টায় মাদুরা থেকে কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরে রাত প্রায় ১১টায় আমরা টিনাভেলী স্টেশনে নামলাম। এইটিই এদিককার শেষ রেলওয়ে স্টেশন। এখানে আমরা রাত কাটিয়ে পরের দিন সকাল বেলা এখান থেকে মোটর বাসে চড়ে কন্যাকুমারী যাব। কন্যাকুমারী এখান থেকে প্রায় ৫০ মাইল। টিনাভেলীর পর আর রেলওয়ে না থাকায় সকলকেই এদিক দিয়ে কন্যাকুমারী যেতে হলে এই ৫০ মাইল পথ মোটর বাসে করে যেতে হয়।

রাত্রেই মোটর বাসের অফিসে খবর দিয়ে রাখলাম যে আমরা সকালের প্রথম বাস ধরে কন্যাকুমারী যেতে চাই।

(ক্রমশ)



শক্তি মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী:—শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী সম্পাদিত। মূল্য তিন টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা।

চণ্ডীর মূল এবং বাঙলা অনুবাদ আছে। অনুবাদ বেশ সরল এবং কোন কোন স্থানে বেশ বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

হাতের বাণী:—শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী প্রণীত। মূল্য তিন টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, বরাহনগর পোঃ, কলিকাতা।

কিভাবে হাত দেখিতে হয়, তাহার কৌশল ঐ পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কয়েকখানি চিত্র আছে।

বন্দিনী বালিকা:—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশান্তিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮।২, বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া। দাম এক টাকা।

বেদুইনের লেখক পীযূষকান্তির 'বন্দিনী বালিকা' পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তাঁহার লেখায় সত্যকার কবিত্ব আছে এবং রসানুভূতিতে ভাব সাবলীল, সর্বোপরি বলিষ্ঠ মানবতার প্রেরণা পীযূষকান্তির কয়েকটি কবিতাকে প্রাণময় ছন্দ দিয়াছে, তাহা অন্তরকে স্পর্শ করে।

কবিতা

ক্যারাভান

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ ক্যারাভান চ'লেছে,
মন্থর আত্মনিবেদনের ভংগী থেকে বিশ্লেষিত করুণ একটি
কান্নার মতো!

গভীর নৈঃশব্দের যবনিকা কাঁপলো একবার,
স্তব্ধতার দেওয়ালে গম্ভীর কতোগুলি কথা প্রতিহত হোল।
কারা যেন আস্‌ছে!
পায়ের শব্দে উপত্যকার বাতাসে কম্পন উঠ্‌লো সবেগে
কারা যেন আস্‌ছে!
'কতদূর?' একটি নারী আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো,
'আমরা যে মরলাম্‌!'
'মরো!'—পর্বত প্রান্ত থেকে গম্ভীর শব্দ ভেসে এলো!

একটু পরে।
দীর্ঘ কতগুলি ছায়া এগিয়ে চল্‌লো।
ছায়াগুলি দীর্ঘতরো হোল।
পিঠে তাদের কি যেন ঝুল্‌ছে।
আঃ! নিজেদের পঙ্গু দেহগুলোকে
তারা যদি পাহাড়ের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতো!

সর্বপ্রথম ছায়াটি পাথরের মতো থাম্‌লো।
বল্‌লে, 'কোন্‌ দিকে?'
একটি নারী অসহায়ভাবে কাঁদলো,
'পূবে না পশ্চিমে?'
সম্মুখের বৃদ্ধ থম্‌কে দাঁড়ালেন;
হাস্‌লেন একটু, বল্‌লেন,
'যেখানে পূর্ব এবং পশ্চিম মিলেছে বন্ধু!'

উটের পায়ের শব্দ কানে আস্‌ছে,
তারা ফিরে দাঁড়ালো।
একজন কাছে এলো, বল্‌লে,
'পিরামিড্‌', এগিয়ে যাওয়ার উপায় রাখেনি এরা!'

হো হো ক'রে একটা অট্টহাসি কেঁপে উঠ্‌লো,
সেই দীর্ঘ ছায়ারা নিকটতর হোল।
কয়েকজনে এক সংগে বল্‌লে,
'বহুদূর থেকে আমরা এনেছিলাম পাথর,
আমাদের রক্তে ও-পাথর কোনোদিন লাল হ'য়েছিলো?'

'রাত কত হোল?'
সেই অসহায়া নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন।
কেউ উত্তর দিলো না।

পাহাড়গুলো গম্ভীরভাবে আকাশে উঠে গেছে!

আবার কতোগুলো পায়ের শব্দ জাগ্‌লো
আর একদল উটের শীর্ণ ছায়া পড়লো তাদের শরীরের কাছে!
'কি খবর?' বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করলেন।
'পথ নেই।' প্রথম ছায়াটি এগিয়ে এলো,
'ইফেল টাওয়ার আকাশকে বিঁধেছে।'

মেয়েটী এবারে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লোঃ
বল্‌লে, 'আলো, আলো।—আলো আমরা দেখ্‌তে পাবো না?'

'না!'—পর্বত-প্রান্ত থেকে গম্ভীর শব্দ ভেসে এলো!
হু হু ক'রে মেয়েটী কাঁদ্‌লো।
বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'থামো, উত্তর থেকে এখনো
আমাদের শেষ খবর আসেনি!'

নিস্তব্ধ হিম-প্রান্তর থেকে যেন মৃত্যুর ঠান্ডা বাতাস এলো!
মেয়েটীর চুল উড়লো।
বল্‌লে, 'আমরা এবারে সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছি!'
'তাই নাও!'
পর্বত-প্রান্তের গম্ভীর শব্দ সমস্ত পথকে কাঁপিয়ে দিলে!
একটি কংকালসার ছায়া এগিয়ে এলো।
বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'আমরা ক্লান্ত, বলো কোন্‌দিকে আমাদের সূর্য?'

লোকটা তাঁর পায়ের কাছে ব'সে পড়লো,
তারপরে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লো! বল্‌লে,
'অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার! ওরা সে অন্ধকারে ডুবে গেছে!'

হু হু ক'রে বাতাস কেঁপে উঠ্‌লো।
দিগন্তশায়ী মরু-বালুকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে,
কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ বল্‌লেন, 'চলো!'

মন্থর আত্মনিবেদনের ভংগী থেকে বিশ্লেষিত
করুণ একটি কান্নার মতো
সেই দীর্ঘ আর ক্লান্ত ক্যারাভান্‌ ফিরে চল্‌লো!

আজ-কাল

প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান

এ সপ্তাহে জাপানের প্রধান উদ্যম দেখা গেল প্রশান্ত মহাসাগরে। কিন্তু সে উদ্যম প্রাথমিক অবস্থাতে ব্যর্থ হয়েছে। যতখানি বোঝা যাচ্ছে, জাপান একটা ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিল, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা চড়াও করা। জাপানের আক্রমণের আশু প্রধান স্থান ছিল আমেরিকার মিডওয়ে দ্বীপ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আলাস্কা ও অস্ট্রেলিয়ার উপকূল। জাপানীরা বৃহৎ নৌবহর নিয়ে মিডওয়ে, বিমান দিয়ে আলয়শিয়ান দ্বীপ (আলাস্কা) এবং সাবমেরিণ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল আক্রমণ করে। মিডওয়ে হাওয়াই-এর পশ্চিম দিকে; এই দ্বীপ দখল করলে হনলুলুর পশ্চিমে আমেরিকার আর কোনো প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘাঁটি থাকত না এবং হনলুলুর উপর আক্রমণ চালানো জাপানীদের সহজসাধ্য হ'ত। আর সে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ রাখা দুরূহ হ'ত। আলয়শিয়ান দ্বীপে ডাচ হারবার উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধান মার্কিন নৌ-ঘাঁটি এবং আলাস্কার রক্ষা-ব্যবস্থার চাবিকাঠি। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও নিউ ক্যাস্‌ল্ বন্দরের উপর সাবমেরিণের আক্রমণের উদ্দেশ্যও আমেরিকার সঙ্গে সামুদ্রিক যোগাযোগ ব্যাহত করা।

জাপ নৌশক্তির ক্ষতি

মিডওয়ে অভিযান কিন্তু বানচাল হয়ে গেছে। মার্কিন রণতরী ও বিমানের প্রতিরোধে জাপানী নৌবহর সাংঘাতিকভাবে ঘায়েল হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহরের কমান্ডর-ইন-চীফ্ এডমিরাল নিমিটস্ মিডওয়ে যুদ্ধের ফলকে "পার্ল হারবারের প্রতিশোধ" বলে' বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, জাপানের নৌশক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মার্কিন সমরবিদ্‌রা বলেছেন যে, এই যুদ্ধের ফল যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতিকে বেশ প্রভাবিত করবে। অভিযাত্রী জাপ নৌবহর সরে যাওয়ায় বর্তমানে মিডওয়ের জলযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জাপানীদের ক্ষতি এই রকম: দুই বা তিনটি বিমানবাহী জাহাজ এবং তাদের সমস্ত বিমান ধ্বংস; এক বা দুইটি বিমানবাহী জাহাজ গুরুতর জখম এবং তাদের অধিকাংশ বিমান ধ্বংস; তিনটি ব্যাটলশিপ জখম, অন্তত একটি গুরুতরভাবে; চারটি ক্রুজার জখম, দুইটি গুরুতরভাবে; একটি ডেস্ট্রয়ার নিমজ্জিত; তিনটি সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত। আমেরিকার একটি বিমানবাহী জাহাজে আঘাত লাগে ও কিছু বিমান বিনষ্ট হয় এবং একটি ডেস্ট্রয়ার নিমজ্জিত হয়। এ সব হিসেব অবশ্য মার্কিন ইস্তাহারে দেওয়া হয়েছে।

আলাস্কার ডাচ হারবারে একদিনে দুইবার বিমান-আক্রমণের খবর দেওয়া হয়। বলা হয় যে, এ হানায় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। কিন্তু এর পর আর কোনো খবর দেওয়া হয় নি। মার্কিন নৌবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ এডমিরাল কিং বলেছেন যে, ডাচ হারবারের অবস্থা অস্পষ্ট অর্থাৎ সেখানে কি ঘটছে তার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

চীন ও ব্রহ্ম

চীনে যুদ্ধ এখন পূর্ব দিকেই প্রচণ্ডভাবে চলছে। জাপানীরা সমুদ্রকূলবর্তী প্রদেশ চেকিয়াং, ফুকিয়েন ও কোয়াংতুংএর উপর বেশী নজর দিয়েছে। সাংঘাতিক যুদ্ধের পর তারা পূর্ব চীনে প্রধান বিমান ঘাঁটির শহর চুসিয়েন দখল করেছে; ফুকিয়েন প্রদেশে ফুচাও শহরও তাদের করতলগত হয়েছে। কোয়াংতুং-এ এখন তারা বিমান-হানা দিচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দুর্গম ইউনান প্রদেশে তারা এখনো সুবিধে করতে পারে নি।

ইতিপূর্বে কিন্‌হোয়া ও লাণ্চিতে এবং বর্তমানে চুসিয়েনে জাপানীরা চীনাদের বিরুদ্ধে বিষ-বাষ্প ব্যবহার করে বলে' অভিযোগ করেছে। প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট এই বলে' জাপানকে সাবধান করে' দিয়েছেন যে, সে যদি চীনে বিষ-বাষ্প ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধ নেবে। জাপানীরা চীনাদের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। চীন কিন্তু সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে যে, গত পাঁচ বছরে জাপানীরা চীনে অন্তত এক হাজার বার বিষ-বাষ্প দিয়ে আক্রমণ করছে।

ব্রহ্মে জাপানী সৈন্যরা ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে এসেছে। জাপ্‌ সৈন্য চিন্দুইন নদীর পূব তীরে হোমালিন-এ পেঁচেছে। হোমালিন ভারত সীমান্ত হইতে ২০ মাইল এবং মনিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বৃটিশ বিমান বর্তমানে হোমালিন-এ জাপানী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আকিয়াবেও বৃটিশ বিমান-হানা চল্‌ছে।

জার্মানী থেকে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে যে, জাপানীরা ব্রহ্মে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্রহ্মে জাপ-অধিনায়ক একটা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত করবেন, যা সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে' চল্‌বে।

লিবিয়া

লিবিয়া যুদ্ধের তীব্রতা আগের মতো রয়েছে। জার্মান জেনারেল রোমেল বৃটিশ মাইন ক্ষেত্রে যে দুটো ফাঁক করেছিলেন তার মধ্যবর্তী এলাকাটা দখল করে' নিয়েছেন। দক্ষিণে বীর হাকিম ঘুরে আসার চেয়ে এই পথে তাঁর সরবরাহ আনার সুবিধে হয়েছে; উপরন্তু বৃটিশ ব্যূহে তিনি খানিকটা ঢুকে থাক্‌লেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য তাঁকে এই ঘাঁটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করতে দিচ্ছে না। নাইট্‌স্ ব্রিজের উপর জার্মানদের আর একটা আক্রমণ ইংরেজরা হটিয়ে দিয়েছে। বীর হাকিমের উপর বার বার আক্রমণ চালিয়েও ইতালীয়ানরা এখনও পর্যন্ত সফলকাম হয় নি। লিবিয়া যুদ্ধে বর্তমানে এক্সিসের তুলনায় বৃটিশ পক্ষের কিছু বেশী সুবিধে হয়েছে; তবে সমস্ত যুদ্ধের ফলাফলই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে যোগাযোগ রক্ষা করার উপর। যে পক্ষ তার সরবরাহের পথ টিঁকিয়ে রাখ্‌তে পারবে সেই জিত্‌বে।

জার্মাণীর লড়াই

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধে নতুন কোনো পরিবর্তন হয় নি। জার্মানরা বর্তমানে ক্রাইমিয়ায় প্রধান কৃষ্ণসাগরীয় নৌ-ঘাঁটি সেবাস্তোপোল দখল করবার জন্যে স্থল ও বিমান আক্রমণ করছে। শহরের উপর প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ চল্‌ছে। সোভিয়েট ব্যূহ এখনও অটুট রয়েছে।

জার্মানীর উপর বৃটিশ বিমানবহর প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই হানা দিচ্ছে। হাজার বিমান আর না গেলেও বড় বড় বিমানবহর *ব্রেমেন ও অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রে আক্রমণ চালাচ্ছে।*

হাইড্রিখের মৃত্যু

চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসী শাসনকর্তা এবং জার্মান গোয়েন্দা পুলিশ গেস্টাপোর পাণ্ডা হাইড্রিখ প্রাগে আততায়ীর আক্রমণে আহত হয়ে মারা গেছেন। ঘটনাটা নাৎসীদের পক্ষে যে মর্মঘাতী তাতে সন্দেহ নেই। হিটলার-পদানত ইওরোপে জন-বিক্ষোভ যে কি রকম তীব্র এবং প্রতিশোধ নিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে, এ তারই একটা মস্ত বড় প্রমাণ। প্রতিহিংসামত্ত নাৎসীরা চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রতি দিন বহু লোকের প্রাণহরণ করছে। হাইড্রিখের উপর আক্রমণের পর এ পর্যন্ত ২৩৪ জনকে নিধন করা হয়েছে ; তার মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও আছে।

ফিনল্যাণ্ডে হিটলার

হিটলার কয়েক দিন আগে ফিনল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। তাঁর যাওয়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য—মার্শাল মানেরহাইমের ৭৫তম জন্ম-বার্ষিকীতে অভিনন্দন জ্ঞাপন। কিন্তু ব্যাপারটা অভূতপূর্ব বলে' সে কথা বিশ্বাস হয় না। হিটলার এক রোম ছাড়া আর যেখানে গেছেন সেখানে বিজয়ীরূপে গেছেন। ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডে তাঁর অত তুচ্ছ কারণে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মনে হয় ফিনল্যাণ্ডের ভিতরে সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে তাকে এখন তোয়াজ করে' হাতে রাখা একান্ত দরকার হ'য়ে পড়েছে।

ভারতে কনভয়ের আগমন

ভারতের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে যথাসাধ্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে যে, গত মাসে বৃহত্তম কনভয় নিরাপদে ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছে। এই কনভয়ে কামান, ট্যাঙ্ক, মোটর গাড়ি নিয়ে বৃটেনের সৈন্যবাহিনীর বড় বড় দল এবং বিমান স্কোয়াড্রন এসেছে। এই সঙ্গে ডাক্তার, নার্স, বৈজ্ঞানিক ও টেকনিশিয়ানও এসেছেন। যে সব বৈমানিক এসেছে তাদের মধ্যে অনেকে বৃটেনে ও লিবিয়ার যুদ্ধে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই কনভয়ে হাজার হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য, মেকানাইজ্‌ড্ দল ও সম্মুখ আক্রমণের জন্যে বাছাই করা সৈন্য এই কনভয়ে এসে পৌঁচেছে। মার্কিন জঙ্গী বিমান এবং ট্যাঙ্ক *ও বিমানধ্বংসী কামান ভারতবর্ষে আসারও খবর দেওয়া হয়েছে।*

মার্কিন মিশনের রিপোর্ট

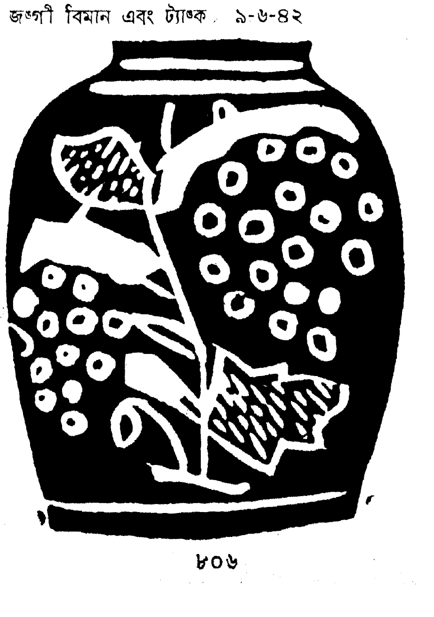
যে মার্কিন টেক্‌নিকাল মিশন এখানে এসেছিলেন, তাঁরা ভারত গভর্নমেণ্টের কাছে তাঁদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছেন। যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের শ্রমশিল্প সংগঠন সম্পর্কে তাঁরা কতকগুলো সুপারিশ করেছেন। মিশন বলেছেন যে, ভারতবর্ষে শ্রমশিল্প ঠিক আধুনিক নয় ; বর্তমান পদ্ধতি বদলে ব্যাপক উৎপাদনের পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার। এ জন্যে যে সরকারী সংগঠন প্রয়োজন হবে সে সম্বন্ধে মিশন কিছু না বলতে চাইলেও কয়েকটা সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন ; তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই—একটা সমর-মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন, যার দপ্তর খুব শক্ত হবে এবং সমর-উৎপাদনের সমস্ত ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করবে ; উৎপাদন, যান-বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেশরক্ষা ও অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে এই সমর-মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা হবে। ভারত গভর্নমেণ্টের অনুমোদনে মিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছে যে, দুইজন সহকারীসহ একজন বিশেষ পারদর্শী মার্কিন রেলওয়ে পরিচালককে পরামর্শদাতারূপে ভারতবর্ষে কাজের জন্যে ধার দেওয়া হোক।

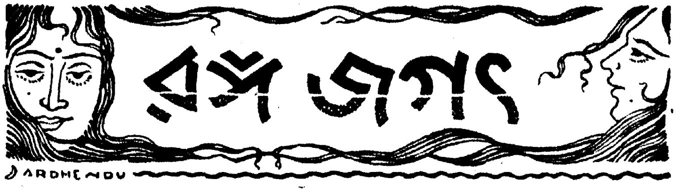
ভারত গভর্নমেণ্টের সরবরাহ সচিব স্যার হোমি মোদী এই রিপোর্ট সম্বন্ধে সাংবাদিক সম্মেলনে যে বিবৃতি দেন তাতে মার্কিন সংবাদদাতারা মোটেই প্রীত হন নি। তাঁরা বলেন যে, স্যার হোমি মোদীর মন্তব্য থেকে মনে হয়, মার্কিন মিশনের সমস্ত প্রধান সুপারিশগুলো অস্বীকার করা হচ্ছে। স্যার হোমি প্রতিবাদ করে' বলেন যে, সমস্ত সুপারিশই ভারত গভর্নমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে এবং তাঁরা শীগ্গিরই তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

* * *

বহরমপুর জেলে যে হাঙ্গামা হয় সে সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট এক ইস্তাহার দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, বহরমপুর জেলে যাদের আটক রাখা হয়েছে তারা পেশাদার বা স্বভাব দুর্বৃত্ত গুণ্ডা প্রকৃতির লোক (এরা কেউই রাজনৈতিক বন্দী নয়)। এরাই দাঙ্গা বাধায়। পুলিশের গুলী চালনায় দুইজন বন্দী নিহত হয়, একজন হাসপাতালে মারা যায়। মোট ১০০ জন আহত হয় ; জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলর, ৮ জন জেল কর্মচারী ও ৬ জন পুলিশের আঘাত গুরুতর।

৯-৬-৪২ ওয়াকিবহাল





রূপবাণী—গরমিল

চিত্রবাণী লিমিটেডের নতুন বাঙলা ছবি গরমিল 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে চলছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নীরেন লাহিড়ী এবং এর কাহিনীকার হচ্ছে শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যোগেশ চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, শ্রীলেখা, শীলা হালদার, রবীন মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, ইন্দু, প্রভা প্রভৃতি।

ছবির কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের চোখের সামনে ভবিষ্যৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি আদর্শ তুলে ধরা—যে সভ্যতা প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব আর পল্লী ও যান্ত্রীক সভ্যতার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ও প্রগতিবাদী দুইটি চরিত্রকে খাড়া করা হয়েছে, এরা সর্বদাই সংগ্রামরত। কিন্তু তাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্য দিয়ে এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্যও মিলন ঘটিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। যে সমস্যা নিয়ে কাহিনী খাড়া করা হয়েছে সে সমস্যা আমাদের দেশে পুরাতন সুতরাং গল্পের মধ্যে নূতন চিন্তাধারার কোন খোরাক নেই। পরিচালক পরিশ্রম করেছেন এবং অভিনেতৃবর্গ স্বীয় চরিত্রগুলি সু-অভিনয়ের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে অতি সাধারণ কাহিনী অবলম্বিত ছবিটির মধ্যে কিছুটা রসের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন প্রগতিবাদী মিঃ মুখার্জ্জির ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস। প্রাচীন পন্থী মাধব ঠাকুরের চরিত্রটি যোগেশ চৌধুরী স্বাভাবিক অভিনয়গুণে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। মাধব ঠাকুরের দুই কন্যার ভূমিকায় শ্রীলেখা ও শীলা অচল; শেষোক্তর চেহারা আছে প্রথমোক্তর তাও নেই। আর অচল শ্যাম লাহা। রতীন, জহর, সন্তোষ এরা সবাই ভালই অভিনয় করেছেন। গানগুলি গাওয়া হয়েছে ভাল, কথা অত্যন্ত কাঁচা। সংলাপ বক্তৃতাবহুল। ছবির উদ্দেশ্য যদি পয়সা পাওয়া হয় তবে আংশিকভাবে সফল হয়েছে বলতে হবে, আর যদি দর্শকদের সামনে আদর্শ খাড়া করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলব যে আরো পাকা কাহিনীকারের প্রয়োজন ছিল।

নিউ থিয়েটার্সের 'মীনাক্ষী'

আগামী ১২ই জুন শুক্রবার নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা চিত্র 'মীনাক্ষী' চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে। কাহিনী রচনা করেছেন মন্মথ রায় এবং পরিচালনা করেছেন মধু বোস। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন সাধনা বোস এবং সঙ্গে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ, নরেশ মিত্র, প্রীতি, পান্না, দেববালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রেণুকা, সন্তোষ সিংহ, ইন্দু মুখার্জি প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন পঙ্কজ মল্লিক।



নবাগতা অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী। নিউ থিয়েটার্সের "কাশীনাথ" চিত্রে এঁকে দেখা যাবে

১৯৪১ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি

১৯৪১ সালে কলিকাতায় দেশী ও বিদেশী যে সব ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছবিগুলি বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। ব্যালটে ভোটের দ্বারা এই বিচার সম্পন্ন হয়েছে।

১০ খানি বিদেশী শ্রেষ্ঠ চিত্রের নামঃ—সিটিজেন কেন, কিটি ফয়েল, হোল্ড ব্যাক দি ডন, দি লেটার, ফিলাডেলফিয়া স্টোরি, মিট জন ডো, ব্লসমস্ ইন দি ডাস্ট, দি গ্রেট ডিক্টেটর, মাই লাইফ উইথ ক্যারোলিন, ব্যাক স্ট্রীট।

দশখানি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রঃ—প্রতিশ্রুতি, পড়শী, সিকান্দার, নয়াসংসার, খাজাঞ্চী, পরিচয়, পুনর্মিলন, পরদেশী, রাজনর্তকী (বাঙলা), নন্দিনী।

শ্রেষ্ঠ অভিনয়—পাহাড়ী সান্যাল (প্রতিশ্রুতি), কানন (পরিচয়), জাগিদার (পড়শী), দুর্গা খোটে (চরণো-কী-দাসী)।

শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—হেমচন্দ্র (প্রতিশ্রুতি), ভি শান্তারাম (পড়শী)।

১৯৪১ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি—প্রতিশ্রুতি (বাঙলা) পড়শী (হিন্দি)।

রক্সি ও প্যারাডাইস—'ঝুলা'

অশোককুমার ও লীলা চিট্‌নীশকে নিয়ে বম্বে টকীজ এপর্যন্ত যে ক'খানি ছবি তুলেছে তার কাহিনী ও পরিচালনার মধ্যে ধরাবাঁধা একই ফরমুলা আমাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হয়। এ যেন কুমীরের এক ছানাকে সাত-বার দেখাবার মতো। বম্বে টকীজের এই শেয়াল পন্ডিতী বুদ্ধি নিয়ে আর বেশী দিন যে লোক ঠকানো চলবে না, এ সত্যটুকু তারা উপলব্ধি করেন কি না জানি না।

নাচ-গানওয়ালা ছবির চাহিদা এখনও আছে—সুতরাং সেদিকদিয়ে ছবিটি দর্শকদের নিরাশ করবে না। এক মোবারক ছাড়া বম্বে টকীজের 'বন্ধন' 'কংগনে'র অভিনেতার দল এখানে রয়েছে এবং অভিনয়ও হয়েছে একই ধরণের।



এম পি প্রডাকসন্সের "শেষ উত্তর" চিত্রে কানন

বোম্বের চিঠি

ভায়া—

ভর দুপুর। স্টুডিওর নিভৃত বিতানের তলে চিৎ হয়ে গুন-গুন করচি—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী—' ভোমরাটা খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া ফুলে হুল ফুটিয়ে রাগে গোঁগোঁ করে ফিরচে। পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়া, থেকে থেকে কামানের অগ্নিশিখার ঝলক এনে দিয়ে যাচ্ছে। কোন্‌ সুদূর মেঘহীন নভে, চিল না হয়ে একখানা এরোপ্লেন ডানামেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। আবেশে আমার চোখ দুটি বুজো বুজো। —

এহেন সময়ে ওষ্ঠের উপর যেন হিপোপটেমাসের দাঁত বসে গেল। চমকে, আতঙ্কে চোখ মেলে দেখি, স্টুডিও মালিকের মারাঠীন্‌ পরকিয়া—আকর্ণ বিস্তৃত শুভ্র মুলোর মত দাঁত নিয়ে হাসচেন। পানরাগে রক্তিম, হিপোপটেমাসবৎ বিম্বোষ্ঠ পূর্ণ বিকশিত।...........

হি, হি, হি, আমার এ বুড়ো বয়সে! এ পোড়াদেশে আবার গঙ্গাজলও মেলে না যে মুখটা শুদ্ধ করে নেব। গিন্নির তরে রেজেস্ট্রী করা ওষ্ঠ দুটো! এ দেশের সবই সমুদ্রের নোন্‌তা জল।

কোনরকমে, ধুতির আঁচল দিয়ে মুখের রক্তরাগ মুছতে মুছতে কয়েক গজ পিছিয়ে গিয়ে, করুণ নয়নে নিবেদন করলুম—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি,

গজদন্ত রুচিনী—

তবে ঐ দূরের থেকেই বলো দেবী। গরীব বুড়ো। মালিক দেখতে পেলে—চাকুরীটা—তা বোঝই তো সিনেমা ঠাকুরুণ্‌!

সিনেমা জগতের উর্বশী তিনি। গরীবের ব্যথার ধার ধারেন না, হেসে গলে চলে, তাঁর বহু বছরের পাকখাওয়া পাকা বুনো পোক্ত-লতার মত দেহখানা নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পোড়-খাওয়া বাহুলতা দুখানা দিয়ে জড়িয়ে ধরে হিন্দি-মারাঠী মেশানো ভাষায় বল্লেন—'মী বাঙলা শিখেগী'

ব্যাপার কি! কাল রাতে মালিকের সাথে শৈলবনবিহারে নৈশযাপন করতে গিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন, কলিকাতার স্টুডিও গুলিতে বাঙলা বই হওয়া অদূর ভবিষ্যতে আর সম্ভব হবে না। তার উপরে বহু বাঙালী পুরুষ ও মেয়ে আর্টিস্ট বোম্বেতে বর্তমান। একাধিক বাঙালী ডিরেক্টার ও টেকনিসিয়ানও এখন বোম্বের বাজারে মজুত। এ অবস্থায় বোম্বেতেই বাঙলা বই তুলে বাঙলার সিনেমা-বাজার হাত করার সুবর্ণ সুযোগ।

তাঁর শেঠজী তাঁকে ভরসা দিয়েছেন, তিনি বাঙলা শিখতে পারলে, এই সুযোগে বাঙলা বইয়ের নায়িকা নিশ্চয় হতে পারবেন। সায়গল বাঙলায় 'হিরো' হয়েচে। শান্তা আপ্‌টে বাঙলা শিখচে—হিরোইন্‌ হবার জন্য। কেন তিনি পারবেন না?

* * * *

বোম্বে সিনেমা জগতে দেখচি হালে বেশ ঘূর্ণি হাওয়ার 'লু' ঘুরচে। পাঞ্জাবী আর্টিস্ট ডিরেক্টাররা পাঞ্জাবের উত্তুরে হাওয়া বেশ ছড়াচ্ছিলেন এতদিন। বাঙলার পুবে হাওয়ার দুর্নাম গেয়ে আকাশে জলো মেঘ জমতে দেননি। হঠাৎ আজকাল এদেশের মারাঠী, গুজরাতি, কোট, ডাইরেক্টার, টেকনিসিয়ান আর্টিস্ট দেখতে পাচ্ছে—সারা দেশে অনাবৃষ্টি। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। তাদের অন্ন অর্থ দুই শুকিয়ে যাচ্ছে, যা আছে, তাও চলে যাচ্ছে—বাঙলায় নয় পাঞ্জাবে। সারা দেশময় হাহাকার। হায় বারি! হায় বারি! মনে হচ্ছে—এতদিনে তারা বুঝতে পারবেন পুবের হাওয়ার সাথে দক্ষিণী ও পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়ার মিলনেই তাদের বারি পাবার সম্ভাবনা। বাঙালীরা যারা এসেছে—লুটেরাজ হয়ে নয়, বন্ধু হয়ে। কুমতলবে ভরা প্রপাগান্ডায় পঞ্চমুখ পঞ্চনদ, বোম্বেতে প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াতে গিয়ে নিজেদেরই অমঙ্গলের বীজ বপন করবেন কিনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারচি না। সিন্ধুর চেয়েও গঙ্গার যে সরসতা ও সৃজনী শক্তি বেশী, তা কি প্রপাগান্ডার ধুলো দিয়ে ঢাকা সম্ভব? ইতি—

বোম্বাইওয়ালা

* * *

যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল

তরুণ যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের বাড়িতে যাদুক্রীড়া দেখাইয়া উপস্থিত সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছে। মেয়র মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া একখানি উচ্চপ্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। তের চোদ্দ বৎসর বয়সেই স্বীয় নৈপুণ্যে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়া শ্রীমান দেবকুমার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক, বিচারপতি মিঃ সি সি বিশ্বাস, মিঃ বি এম সেন প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের নিকট হইতে উচ্চপ্রশংসাপত্র ও মূল্যবান পদকাদি লাভ করিয়াছে। বৈদেশিক অভিযানের জন্যও সে আমন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আপাততঃ উহা স্থগিত আছে।



কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের সকল খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়েকটি মাত্র খেলা বাকী আছে তাহা এই সপ্তাহেই শেষ হইবে। তবে যে কয়েকটি খেলা অবশিষ্ট আছে তাহাতে লীগ তালিকার উপরিভাগের বিশেষ অদল বদল হইবে না। বিশেষ করিয়া প্রথম তিনটি স্থানে যে তিনটি দল বর্তমান আছে তাহাদের ঐ স্থান হইতে বঞ্চিত করিতে কোন দলই সক্ষম হইবে না। ইস্টবেঙ্গল দল শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় স্থানে লীগ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দল ও তৃতীয় স্থানে মোহনবাগান দল। এরিয়ান্স দল বর্তমানে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু এই স্থানে এই দল থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ভবানীপুর দলের এই স্থানে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপভাবে কালীঘাট ও বি এণ্ড আর দলের মধ্যেও অদল-বদল হইতে পারে। এই সকল দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার কোনই আশা নাই। সুতরাং এই সকল দলের স্থান লইয়া ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষ আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপীয় পরিচালিত দলসমূহের তালিকায় স্থান উল্লেখযোগ্য। এইরূপভাবে এক সঙ্গে সকল দলগুলিকে একে একে সর্বনিম্ন স্থানসমূহ দখল করিতে ইতিপূর্বে কখনই দেখা যায় নাই। খেলোয়াড়ের অভাবেই এই সকল দল ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারে নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। কাস্টমস দল সম্পর্কে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। খেলোয়াড় অভাবের জন্য এই দলকে অযথা পয়েন্ট হারাইতে হইয়াছে। এই অবস্থা হইতে এই দল যে উন্নীত হইতে পারিবে তাহা কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারে না। এই বৎসরের আই এফ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের 'উঠানামা' বন্ধ আছে। সুতরাং কাস্টমস দল তালিকার সর্বনিম্ন স্থানে শেষ পর্যন্ত অবস্থান করিলেও দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইবে না।

উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্যের অভাব

প্রথমার্ধের এতগুলি খেলার মধ্যে কোন দিনই কোন খেলায় কি ব্যক্তিগত, কি দলগত হিসাবে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় নাই। মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। উভয় দল নিজ নিজ খ্যাতি রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে খেলাটি বেশ দর্শনযোগ্য হয়। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাটিও দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। তবে এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই। মোহনবাগান দলের প্রাধান্য বিশেষভাবেই বজায় ছিল। প্রথমার্ধের যতগুলি খেলা হইয়াছে তাহার মধ্যে এই দুইটি খেলাই উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি খেলার মধ্যে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য যে প্রদর্শিত হয় নাই ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। বাঙলাদেশের ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড যে নিম্নস্তরের হইতেছে ইহা তাহারই প্রমাণ দিয়াছে। ইহা খুব সুখের বিষয় নহে। বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ এই ফুটবল খেলাটি জাতীয় খেলারূপে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইহার উন্নতি সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত।

ইস্টবেঙ্গল দল

ইস্টবেঙ্গল প্রমার্ধের লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মহমেডান স্পোর্টিং দলের সহিত ইহার চারিটি পয়েন্টের ব্যবধান। প্রথমার্ধে এইরূপভাবে চার পয়েন্টে অগ্রগামী থাকায় এই দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই দল প্রথমার্ধে একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। অপর সকল খেলায় বিজয়ী হইয়াছে। এইজন্য ১২টি খেলায় ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিপূর্বে লীগ প্রতিযোগিতায় কোন বৎসরই প্রথমার্ধে এত অধিক পয়েন্ট সংগ্রহ করিতে পারে নাই। মহমেডান স্পোর্টিং দলের নিকট তাহাদের পরাজয় অনেকটা দুর্ভাগ্যক্রমেই হইয়াছে এবং সেইসঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে, মোহনবাগান দলের বিপক্ষে সেইরূপ ভাগ্য বলেই এই দল বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন খেলায় যদি প্রথমার্ধের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত খেলিতে পারে তাহা হইলে লীগ বিজয়ীর পথে কোন দলই আর বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তবে আশঙ্কা হয়, ইস্টবেঙ্গল তাহা পারিবে কিনা। কারণ প্রথমার্দ্ধের শেষ-ভাগের কয়েকটি খেলায় এই দল নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইতিপূর্বে বহুবার লীগ বিজয়ী হইবার আশা ইস্টবেঙ্গল দল অল্পের জন্য একান্ত মন্দ ভাগ্যবশতই নষ্ট করিয়াছে। নিজেদের শক্তি সামর্থের উপর একটু বেশী আস্থা রাখাই বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ।

মহমেডান স্পোর্টিং দল

কলিকাতা ফুটবল লীগ খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দল যে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে তাহা কোনদিন যে ভঙ্গ হইবে ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তবে সেই খ্যাতি গৌরব এই বৎসর অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা, ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। প্রথমার্ধের কোন খেলাতেই মহমেডান দল পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারে নাই। এই দলের খেলা যেন অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষিপ্রতার অভাব সকল খেলোয়াড়গণের মধ্যে বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। আত্মবিশ্বাসও যেন নাই। যে কোন দলের সহিত খেলিবার সময় এই দলের খেলোয়াড়গণকে ভয়ে ভয়ে খেলিতে দেখা যায়। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স প্রভৃতি দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় ইহা যথেষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে এই দলের জয়লাভ অনেকটা সৌভাগ্যবশত হইয়াছে। এরিয়ান্স দলের সহিত খেলা অমীমাংসিত হওয়াও ভাগ্যবলেই সম্ভব হইয়াছে। কোন দল দৃঢ়তার সহিত খেলিলে মহমেডান স্পোর্টিং দল যে খেলায় শেষ পর্যন্ত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না ইহা মোহনবাগান দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সময়ই প্রমাণিত হইয়াছে। খেলার সূচনায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক গোলে অগ্রগামী হইয়াও এই দল মোহনবাগান দলের নিকট ২—১ গোলে পরাজিত হইয়াছে। খেলার শেষের দিকে এই দলের খেলোয়াড়গণের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নেহাৎ ভাগ্যবলেই অধিক গোলে

রক্ষি ও প্যারাসুইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এ দলের রক্ষণভাগ পূর্বাপেক্ষা অনেক শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

মোহনবাগান দল

মোহনবাগান দল প্রথমার্ধের সূচনায় যেরূপ খেলিয়াছিল তাহাতে অনেকের আশা হইয়াছিল—এই দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় বেশ ভালভাবেই লড়িবে। কিন্তু বর্তমানে এই দল যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই দলের লীগ বিজয়ীর আশা অনেকটা দূরাশা। রেল দল, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ভবানীপুর প্রভৃতি দলের নিকট মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপের পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ পয়েন্ট নষ্ট করা ও সমর্থকদের হতাশ করা মোহনবাগান দলের চিরাচরিত প্রথা। কবে কোন দলের সহিত কিরূপ খেলিবে পূর্ব হইতে তাহা অনুমান করা যায় না। তবে সাধারণত এই দল যে-কোন শক্তিশালী দলের সহিত ভাল খেলিয়া থাকে। এই খ্যাতি এই বৎসরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল অপেক্ষা ভাল খেলিয়াও এই দল পরাজয় বরণ করিয়াছে। এইদিন এই দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ খেলিয়াছিলেন তাহাতে ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকগণ কেহই কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, মোহনবাগান পরাজয় বরণ করিবে। খেলোয়াড়গণের মধ্যে দৃঢ়তার পরিচয় বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। এ বছরের লীগ খেলায় মহমেডান দল ২—১ গোলে মোহনবাগানের কাছে সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করে। আক্রমণ ভাগের এ রায় চৌধুরী প্রথমার্ধেই আহত না হইলে হয়তো মোহনবাগান দল আরও অধিক গোলে বিজয়ী হইতে পারিত। মোহনবাগানের আক্রমণ রক্ষণ সকল বিভাগের খেলোয়াড়গণই ভাল খেলেন।

এরিয়ান্স ও ভবানীপুর ক্লাব

এই বৎসরের এরিয়ান্স ও ভবানীপুর ক্লাব অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হইলেও লীগ প্রতিযোগিতায় ভাল ফলই প্রদর্শন করিয়াছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না সত্য, কিন্তু বিভিন্ন খেলায় ইহারা যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা উৎসাহব্যঞ্জক। বাঙলা দেশে ভবিষ্যতে উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী খেলোয়াড়ের যে অভাব হইবে না, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এরিয়ান্স ক্লাবের এই বিষয়ে খ্যাতি চিরকালই আছে। বাঙলার বহু বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় যে এই ক্লাবের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ভবানীপুর ক্লাব এই পথ অনুসরণ করিতেছে—ইহাও খুবই সুখের বিষয়। এই প্রসঙ্গে কালীঘাট ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের নামও উল্লেখ করা উচিত। কারণ, এই দুইটি ক্লাবের পরিচালকগণ এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছেন। প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ভাল ফল হয়তো প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু কতকগুলি উৎসাহী তরুণ বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়কে যে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার সুযোগ দিতেছেন, ইহা মানিতেই হইবে। ভারতীয় দলের মধ্যে এই যে নূতন পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। গত ১০ বৎসর ধরিয়া আমরা এই দিকে প্রত্যেক দলের পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাহিরের খেলোয়াড় আনায় দলের শক্তি বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু বাঙলার উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রতি অবিচার করা হয়। তখন কেহই এই বিষয় চিন্তা করেন নাই। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দলপুষ্ট করিয়াছেন। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য তাহা সম্ভব না হওয়ায় স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করিতেই তখন বাধ্য হইয়াছেন। যখন দেখিলেন এ অবস্থা আশাপ্রদ, তখনই তাঁহারা এই দিকে দৃষ্টি দিলেন। একবার যখন মত পরিবর্তন করিয়াছেন, তখন আমাদের আন্তরিক অনুরোধ যে, তাঁহারা যখন সুবিধা আসিবে, তখন পুনরায় মত পরিবর্তন করিবেন না। কয়েক বৎসর এইভাবে চলিলেই দেখিতে পাইবেন, বাঙলা দেশে বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়ের আর অভাব নাই। সুযোগ সুবিধা না পাইলে কোন খেলোয়াড়ই উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী হইতে পারে না।

শুধু সুযোগ দিলেও হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন জাতির ক্রীড়া পরিচালনা বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা শিক্ষার দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জানেন, শিক্ষার সাহায্য পাইলে উৎসাহী যে কোন খেলোয়াড়ই উন্নততর নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণকে এই ব্যবস্থার জন্য আগ্রহশীল দেখা গিয়াছিল; এমন কি তাঁহারা কয়েকটি ক্লাবের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু গত বৎসর হইতে পুনরায় তাঁহাদিগকে সেই সকল ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া কৃতী খেলোয়াড় সংগ্রহ করিয়া দল গঠনের জন্য ব্যস্ত হইতে দেখা যাইতেছে। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণের সুনাম ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শিক্ষার ব্যবস্থারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগের ৮ই জুন পর্যন্ত যে ফলাফল হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

টীমের নাম—		খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ইস্টবেঙ্গল	...	১২	১১	০	১	৩০	৫	২২
মহমেডান স্পোর্টিং	...	১২	৭	৪	১	৪১	৯	১৮
মোহনবাগান	...	১২	৭	৩	২	২৭	১০	১৭
এরিয়ান্স	...	১১	৫	৪	২	১৭	১০	১৪
ভবানীপুর	...	১০	৪	৫	১	১০	৫	১৩
কালীঘাট	...	১২	৫	৩	৪	১৭	১২	১৩
বি এণ্ড এ আর	...	১১	৫	৩	৩	১৯	১৬	১৩
ক্যালকাটা	...	১২	৪	৩	৫	৮	৩০	১১
পুলিশ	...	১১	৪	২	৫	১৫	১২	১০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	...	১২	২	৪	৬	১২	১৯	৮
রেঞ্জার্স	...	১১	২	১	৮	১২	১৮	৫
ডালহৌসী	...	১২	১	২	৯	১০	৩২	৪
কাষ্টমস্	...	১২	১	০	১১	৪	৪৪	২

সমরবার্তা

৩রা জুন

জাপানী বিমানবহর অদ্য দুইবার আলাস্কায় ডাচ হারবার আক্রমণ করে। ফলে গুরুতর কোন ক্ষতি হয় নাই এবং খুব অল্প লোকই হতাহত হয়। ডাচ হারবার আলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অতি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন নৌঘাঁটি। উত্তর আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে হ্রস্বতম বাণিজ্য পথের উপরে আলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত।

গত রাত্রে এক বৃহৎ বৃটিশ বোমারু বিমানবহর পুনরায় জার্মানীতে এসেন এবং রুরের অন্যান্য লক্ষ্যস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। বৃটিশ বিমানসমূহ উত্তর ফ্রান্সের উপরও বোমাবর্ষণ করে।

চীন—চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, কিনহোয়ার ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত চুসিয়েন দখলের জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীরা তিন দিক হইতে শহরটির উপর হানা দিতেছে।

রুশিয়া—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী উত্তর পশ্চিম রণাঙ্গনে ইলমেন হ্রদ এলাকায় জার্মানদের উপর চাপ দিয়া তাহাদের পিছু হটিতে বাধ্য করিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড আকাশযুদ্ধ চলিতেছে।

৪ঠা জুন

লিবিয়া—লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হয় যে, এক্সিস সৈন্যদিগকে নাইটস্‌ ব্রীজের ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত টামার হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

চেকোশ্লাভাকিয়ার নাৎসী শাসনকর্তা হেড্রিক মারা গিয়াছেন। গত ২৭শে মে বিদ্রোহী চেকেরা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। প্রাগ-বার্লিন রোড দিয়া মোটরে যাইবার সময় দুই ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়। ফলে হেড্রিক গুরুতরভাবে আহত হন।

মার্কিন নৌবিভাগ ঘোষণা করেন যে, গত ৬ই এপ্রিল বঙ্গোপসাগরে মিত্রপক্ষের ৬টি বাণিজ্য জাহাজ জাপানী ক্রুজারের গোলার আঘাতে নিমজ্জিত হয়; তন্মধ্যে একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রবাল সাগরের যুদ্ধে অসামান্য সাফল্য লাভ ঘটিয়াছে এবং অস্ট্রেলিয়ার আশু বিপদাশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে।

৫ই জুন

নয়াদিল্লীর সংবাদে বলা হয় যে, কিছু সংখ্যক জাপানী সৈন্যের হোমালিন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছান ছাড়া ব্রহ্ম হইতে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই স্থানটি চিন্দুইন নদীর পূর্ব উপকূলের সীমান্ত হইতে ২০ মাইল এবং ইম্ফল হইতে ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

অদ্যকার চীনা ইস্তাহারে দক্ষিণ-পূর্ব শান রাজ্যের কেংটুং নামক অন্যতম প্রধান শহরটির পতন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। চেকিয়াং প্রদেশে চুসিয়েনের বাহিরে সারাদিনব্যাপী যুদ্ধ চলে। কিয়াংসি, কোয়াণ্টাং ও ইনান প্রদেশের নানা স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে।

বার্লিনের ঘোষণায় প্রকাশ যে রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগে হের হিটলার ও ফিনল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি মার্শাল ম্যানারহাইমের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছে। হিটলারের সঙ্গে ছিলেন সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেল।

৬ই জুন

লিবিয়া—লণ্ডনের সংবাদে বলা হয় যে, বৃহস্পতিবার (৪ঠা জুন) শেষ রাত্রি হইতে লিবিয়ায় বৃটিশের পাল্টা আক্রমণ সুরু হয়। বৃটিশ বাহিনী তাহাদের লক্ষ্যস্থলসমূহে উপনীত হইয়াছে।

বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ গতকল্য রুর, লাহাভর ও নেপলস-এ বোমা বর্ষণ করে।

রুশিয়া—সোভিয়েট নৈশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে এক্সিসের রক্ষাব্যূহ ভেদ করা হইয়াছে। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যেরা জার্মানগণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এ সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মিত্রপক্ষীয় জাহাজসমূহের উপর জাপ সাবমেরিণ আক্রমণ। এই সাবমেরিণ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের একখানি মালবাহী জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে জলমগ্ন হইয়াছে। সিডনী বন্দরে আরও একখানা জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। জাপানীদের মোট ছয়খানা সাবমেরিণ জলমগ্ন হইয়াছে।

৭ই জুন

চীন—চুংকিংয়ের ইস্তাহারে ফুচাও-এর পতন এবং জাপবাহিনী কর্তৃক চুসিয়েন-এর বিমান ক্ষেত্র দখল করার কথা ঘোষিত হইয়াছে। গতকল্য প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুসিয়েনের শহরতলীতে অবিরাম যুদ্ধ চলে। চুসিয়েনের উত্তর পশ্চিমের জাপ দল চুসিয়েনের পশ্চিমে হানপুর নিকটে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যায়। চুসিয়েন রণাঙ্গনে জাপ সৈন্যের মোট সংখ্যা একলক্ষ কুড়ি হাজার হইবে।

৮ই জুন

ব্রহ্ম—উত্তর-পশ্চিম ব্রহ্মে চিন্দুইন নদীর পূর্ব তীরে হোমালিন-এ জাপানী সৈন্যদের সমাবেশের উপর বৃটিশ বিমানবহর আক্রমণ চালায়। ৭ই জুন বৃটিশ বোমারু বিমান আকিয়াবে হানা দেয়।

চীন—চেকিয়াং প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিমান ঘাঁটি সমন্বিত চুসিয়েন শহরে জাপবাহিনী প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

রুশিয়া—মস্কোর ইস্তাহারে বলা হয় যে, সেবাস্তোপোলের উপর প্রচণ্ড বিমান যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানরা রুশিয়ার এই কৃষ্ণসাগরীয় নৌঘাঁটির উপর এক নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

৯ই জুন

চীন—বৃটিশ ও মার্কিন বিমান সাহায্য চীনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চীনা ইস্তাহারে জানা যায় যে, চুসিয়েনের চারিদিকে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে গত দুই দিনে ৭ হাজারের বেশী জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে। চুসিয়েন এক্ষণে চীনাদের হাতেই আছে। নানচাং-এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তুংসিয়াঙ্গ শহর ত্যাগ করিয়া চীনারা পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। চুংকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব চীনের চেকিয়াং ও কিয়াংসি প্রদেশের পূর্ব হইতে পশ্চিম অভিমুখে যে রেলপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানীরা প্রভূত পরিমাণে সৈন্য নিয়োগ করিতেছে। একদল জাপানী সৈন্য চুসিয়েন শহরে প্রবেশ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে।

লিবিয়া—কায়রো সংবাদে প্রকাশ, বীর হাকিমের বিরুদ্ধে এক্সিস পক্ষের সোমবারের (৮ই জুন) ব্যর্থ আক্রমণে কিছু পূর্বে বীর হাকিম কর্মচারিগণ এক্সিস পক্ষের আত্মসমর্পণ দাবী পঞ্চমবার অগ্রাহ্য করিয়াছিল। এইভাবে ৫ দিনের মধ্যে এই পঞ্চমবার জার্মানদের দাবী অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩রা জুন

বোম্বাইয়ের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গত ১লা জুন তারিখে নাসিক রোড সেন্ট্রাল জেলে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে তিনজন দাঙ্গাকারী নিহত ও প্রায় ২৫ জন আহত হইয়াছে।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর বীনায়ক দামোদর সাভারকর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পাকিস্থান সম্পর্কে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর আন্দোলনের নিন্দা করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের হিন্দুদিগকে মাদ্রাজ প্রদেশে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন আরম্ভ করিতে আবেদন জানাইয়াছেন।

গত ১৯শে মে তারিখে বহরমপুর স্পেশ্যাল জেলে যে হাঙ্গামা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে জানা যায় যে, উক্ত হাঙ্গামার ফলে জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, জেলার, জেল স্টাফের আটজন লোক ও পুলিশ পক্ষের ছয়জন লোক গুরুতর আহত হয়। প্রায় ৫০ জন কনেস্টবল সামান্য আহত হয়। দুইজন বন্দী নিহত হয় এবং পরে একজন হাসপাতালে মারা যায়। মোট প্রায় একশত লোক আহত হয়।

৪ঠা জুন

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের হাতে পতিত হইবার পূর্বে যে সকল বন্দীকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া লওয়া সম্ভব হয় না, তাহাদিগের উপর নির্ভরশীল পরিবার-বর্গকে মাদ্রাজ সরকার উর্দ্ধ ৭, টাকা করিয়া মাসোহারা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন ভারত সরকারের নিকট যে প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকাশ, শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব অসুস্থতা নিবন্ধন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

৫ই জুন

আসামের গভর্নর এসেন্সিয়াল সার্ভিস অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নিম্নলিখিত চাকুরীগুলিকে সাফল্যের সহিত সুপরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ঃ—(১) শিলং এবং গোহাটীতে কমার্শিয়াল ক্যারিং কোম্পানী (আসাম) লিমিটেডের অধীন চাকুরীগুলি, (২) শ্রীহট্ট এবং শিলং-এ ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর অধীন চাকুরীগুলি, (৩) বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীন চাকুরীগুলি, (৪) কোনও সিডিউল ব্যাঙ্কের অধীন চাকুরীগুলি, (৫) গভর্নমেন্ট অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও হাসপাতালের অধীন চাকুরীগুলি এবং (৬) লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এবং টাউন কমিটিগুলির চাকুরীগুলি।

শিলং-এ এ আর পি সার্ভিসের কন্ট্রোলার শিলং মিউনিসিপ্যালিটি এবং শিলং ও নং মাইমাই এবং কাওলাই-এর প্রত্যেক গৃহস্বামীকে তাঁহার বাড়ির সংলগ্ন নিজস্ব স্থানে অবিলম্বে একটি করিয়া পরিখা খননের নির্দেশ দিয়া ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

আসামের গভর্নর আসাম প্রদেশে সুরা ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

৬ই জুন

আগ্রা ও অযোধ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ দত্ত পালিওয়ালকে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব মাননীয় খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সম্প্রতি বাঙ্গলায় একটি এসেন্সিয়েল সার্ভিসে যে ধর্মঘট হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার জনসাধারণের জ্ঞানগোচর করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন যে, এই জাতীয় ধর্মঘট সম্পূর্ণ বে-আইনী। যে কোন এসেন্সিয়াল সার্ভিসে এবং অনুরূপ কার্যে ধর্মঘট করিতে হইলে ভারতরক্ষা আইনের ৮১-এ ধারার বিধানে পূর্বেই রীতিমত নোটীশ দিতে হইবে। অন্যথা এইরূপ ধর্মঘট বিধিবহির্ভূত হইবে।

আচার্য নরেন্দ্রদেবের সভাপতিত্বে বেদাউলে (মজঃফরপুর) নিখিল ভারত কিষাণ সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আচার্য নরেন্দ্রদেবের অভিভাষণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সর্বপ্রকারের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবই বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার বিদায়ী সভাপতি শ্রীযুত অবধেশ প্রসাদ সিংকে একটি বক্তৃতা সম্পর্কে মজঃফরপুরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাহোরের খবরে প্রকাশ, দায়রার বিচারে লাহোরের সিনেমা অভিনেত্রী সামসাদ বেগমকে হত্যা করিবার অভিযোগে ঝঙ্গ জেলার দেবকালনের নবাব সর্দার মহম্মদ নেওয়াজ* খাঁর যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

৭ই জুন

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ যে সব স্থানে বিমান আক্রমণ হইবে, সেই সব স্থানের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা পূর্ব হইতে অনুমতি না লইয়া কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া যাইবে, ভবিষ্যতে তাহাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ এইচ জি ডেনেহী, সি আই ই, আই সি এস শুক্রবারের (৫ই জুন) এক সাংবাদিক বৈঠকে আভাষ দিয়াছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ডেনেহী বলেন যে, আসাম সরকার ইতিমধ্যেই এই মর্মে একটি সার্কুলার জারী করিয়াছেন এবং যাঁহারা কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে এসেন্সিয়াল সার্ভিস অর্ডিন্যান্স অনুসারে অভিযুক্ত করা হইবে।

৮ই জুন

নয়াদিল্লীর একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, বড়লাট ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার সফর উপলক্ষে বাঙলা গভর্নমেন্টের রাজস্ব ও বিচার সচিব অনারেবল মিঃ পি এন ব্যানার্জি বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করেন। উক্ত কারখানায় কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই জেলায় যে পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র প্রদেশের লবণ সরবরাহ সমস্যার নিরসন হইতে পারে কি না, তাহা নির্ধারণ করাই উক্ত কারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল। সারা বাঙলায় বৎসরে ৮০ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় মাত্র ২০ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া সকলে অনুমান করেন।

৯ই জুন

সিন্ধুর জেকবাবাদ জেলার কন্ধ কোট হইতে চলন্ত ট্রেণে দুঃসাহসিক ডাকাতি ও সরকারী কর্মচারী হত্যার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, দাখান ও খাসমর স্টেশনদ্বয়ের মধ্যে দুইজন ডাকাত আগ্নেয়াস্ত্র সহ গাড়িতে প্রবেশ করিয়া রাজস্ব বিভাগের তপাদারের নিকট ৩ হাজার ৩ শত টাকা ও সরকারী কাগজপত্র চুরি করে। তত্ত্বাবধায়ক তপাদার বাসুমল ইন্টার ক্লাশের যাত্রী ছিলেন। দস্যুরা তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 20th JUNE, 1942. [৩২ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সপ্তদশ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশবন্ধু গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া রহিয়াছে। যিনি মর্ত জীবনের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেছিলেন তিনি আজ দেশ এবং কালের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অমৃতময় দেহলাভ করিয়াছেন এবং জাতির অন্তরে উপদেষ্টাস্বরূপে কাজ করিতেছেন। সঙ্কীর্ণ স্বার্থেরই লয় হয়, কিন্তু নিঃস্বার্থ যে জীবন, প্রেমের যে জীবন সর্বজয়ী কালকেও তাঁহার কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। এমন জীবন পরাভবের অতীত জীবন। প্রতিকূল শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, স্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যেই সে শক্তির পরাক্রম নিবদ্ধ থাকে, নিঃস্বার্থ এবং উদার আদর্শকে নষ্ট করিবার মত প্রচুর বল তাহার নাই। দেশবন্ধুর প্রকট জীবনের স্পর্শ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, বাহিরের বিচারে এ অভাব সামান্য নয়, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রভাব হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই এবং একথাও সত্য যে, প্রত্যক্ষতা যেখানে নাই, অর্থাৎ যেখানে অস্তিত্বের সর্বতোভাবে অসংশয়িত উপলব্ধি নাই, সেখানে প্রভাবও সম্ভব নহে। এই প্রভাবের ভিতর দিয়াই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জাতির অন্তরে নিত্য এবং সত্যকার জীবনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহার সে নিত্য জীবনের প্ররোচনা প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে। দেশবন্ধু দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে তিলে তিলে দান করিয়া গিয়াছেন, স্থূলে ঐতিহাসিকতার বিচারের দিক হইতে হয়ত মনে হইবে যে, স্বাধীনতাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই; কিন্তু সে বিচার সত্য নয়। দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে মর্ত দেহকে উৎসর্গ করিয়া তিনি অমৃতময় দেহই লাভ করিয়াছেন এবং জাতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া সেই দেহের সংশয়চ্ছেদী প্রভাবের দ্বারা স্বাধীনতার সাধনা করিতেছেন। বৈদেশিক শক্তি মর্ত জীবনে তাঁহার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দেশবন্ধুর প্রেরণা বিপুলতর বল লাভ করিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার দুর্জয় সঙ্কল্পকে আজ জাগ্রত করিয়াছে। দেশপ্রেমিকের দিব্য জীবনের সেই প্রভাব আমাদের মধ্যে নিত্য হউক এবং সত্য হউক, তবেই তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।



স্বাধীনতার আদর্শ ও ভারত—

সম্রাটের ভ্রাতা ডিউক অব গ্লস্টার সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়াছেন। তিনি সম্রাটের একটি বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। সেদিন বেতারযোগে এই বাণী ভারতের সর্বত্র প্রচার করা হইয়াছে। সম্রাট তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন,—"শান্তি এবং স্বাধীনতার আদর্শে ভারতের উন্নতির জন্য আমি যে উচ্চাশা পোষণ করি, এই নিদারুণ যুদ্ধ তাহার পরিপূরণে প্রতিবন্ধকতা ঘটাইয়াছে। সদিচ্ছা এবং সহযোগিতায় সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়, যেমন সঙ্কট মুহূর্তে, তেমনি শান্তির সময়, ইহাই আপনাদের মূলমন্ত্র হউক।" সম্রাট স্বাধীনতার আদর্শে ভারতের উন্নতি কামনা করেন, এ কথা জানিয়া ভারতবাসীরা আশ্বস্তি বোধ করিবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে ডিউক মহোদয়ের কাছে আমাদের একটা বক্তব্য আছে। বর্তমান যুদ্ধে যে উক্ত আদর্শ পরিপূরণে বাধা ঘটাইতেছে, আমরা ইহা মনে করি না। ভারতবর্ষ এখনও বর্তমান সংগ্রামে রত কোন বৈদেশিক শক্তির অধীন হয় নাই এবং ভারতবাসীদের বিশ্বাস এই যে, ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে অধীন করিতে পারে, জগতে এমন কোন শক্তি নাই। ইহা সত্য যে, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন থাকিত, ভারতের সম্মুখে সম্রাটেরই উক্তি অনুসারে যে অসংখ্য বিপদ বর্তমানে দেখা দিয়াছে, সেগুলি দেখা দিতে পারিত না। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির ফলে ভারতবর্ষ আজ অসহায় এবং দুর্বল; ভারতের আটত্রিশ কোটি লোকের জনবল এবং অপরিমিত সমরসঙ্গতি বল আজও

সংগঠিত নহে; এই দিককার বিঘ্নই ভারতের পক্ষে প্রকৃত বিঘ্ন। সম্রাট এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সদিচ্ছা এবং সহযোগিতায় সর্বপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়। ভারতবাসীরাও সর্বান্তঃকরণে ইহা সমর্থন করে; কিন্তু ভারতের পরাধীনতাজনিত যে বিঘ্ন আজ ভারতের চারিদিকে বিপদ সৃষ্টি করিয়াছে, সে বিঘ্নকে অতিক্রম করিবার জন্য ব্রিটিশের প্রতি ভারতবর্ষ সদিচ্ছাই পোষণ করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের সহযোগিতা সকল রকমে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাই হইতেছে দুঃখের বিষয়।

শহরের সঙ্কট—

জাপানীদের আক্রমণের ভয়ে যাঁহারা শহর ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন; কলিকাতা শহর পূর্বাপেক্ষা নিরাপদ হইয়াছে ইহা বুঝিয়াই যে তাঁহারা শহরে ফিরিতেছেন, এমন কথা আমরা বলি না, অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়াই অনেককে শহরে ফিরিতে হইতেছে। বাঙলার বহু অঞ্চলেই জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। তারপর ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এবার ম্যালেরিয়া ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে, অথচ কুইনাইন মিলিতেছে না। যাঁহারা পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখানকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এবং লুর উত্তাপে অতিষ্ঠ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় অনেক ঝুঁকি লইয়া যাঁহারা শহরে ফিরিতেছেন, শহরে আসিয়াও তাঁহাদের দুর্দশার অন্ত নাই। কলিকাতা শহরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দুর্মূল্য তো হইয়াছেই, কোন কোন জিনিস দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমন অবস্থায় শহরে তাঁহারা কতদিন যে তিষ্ঠিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; জাপানীদের বোমার জন্য না হইলেও খাদ্যবস্তুর অভাব এবং দুর্মূল্যতার জন্য তাঁহাদের অনেককে হয়ত পুনরায় শহর ছাড়িবার পথ খুঁজিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শহরের এই অবস্থার প্রতীকারের জন্যও যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত কাজ হইতেছে না। কলের জলের সম্পর্কে কর্পোরেশনের ব্যাপারেই ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ মিলিয়াছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে শহরে জল মিলে না; প্রথমত মনে হইয়াছিল কয়লার অভাব; তারপর সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইল যে, জলে শেওলা জন্মিতেছে। সেই শেওলা বালুর মধ্যে আটকাইয়া জল পরিষ্কারে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। প্রতীকার কি জানা ছিল, কিন্তু কাজে করা হয় নাই, নিয়মসঙ্কট দেখা দেয়। যথারীতি কর্পোরেশনের সভায় আন্দোলন হইল, বিশেষজ্ঞদের তলব হইল, তারপর প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। শত্রুর আক্রমণে পাছে পানীয় সঙ্কট ঘটে, এজন্য কলিকাতা শহরে কতকগুলি টিউবওয়েল বসান হইয়াছিল। সেগুলি যদি ঠিক থাকিত, তবে জলের অভাব অনেকটা মিটিত; কিন্তু কর্পোরেশন হইতে কিছুদিন পূর্বে জানান হয় যে, টিউবওয়েল জল জীবাণু দোষ মুক্ত নয়; কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এই বিধি নিদারুণ এই জলকষ্টের সময় নিশ্চয়ই প্রতিপালিত হইত না। কাদা খুঁড়িয়া জল খাইতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা দূষিত জীবাণু সহিতও জলপান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিত; কিন্তু সে পথও বন্ধ। অধিকাংশ টিউবওয়েলই অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে। কোনটির হাতল-ভাঙ্গা, কোনটিতে জল উঠে না, এমনই ব্যাপার। এত টাকা খরচ করিয়া টিউবওয়েলগুলি অনর্থক কেন বসান হইল, এই প্রশ্ন সকলের মনেই জাগে; এখন শুনিতেছি যে, টিউবওয়েলগুলি মেরামত করিবার ব্যয় গভর্নমেণ্টই বহন করিবেন, না কর্পোরেশন বহন করিবেন, ইহা লইয়া বিতর্ক চলিতেছে এবং সে বিতর্কের এখনও অবসান হয় নাই। কবে হইবে সে প্রশ্ন অবান্তর; কারণ ট্যাক্স দিবার কর্তব্য যাহাদের তাহারা ট্যাক্সই দিবে, কর্ম হইবে কর্তাদের ইচ্ছায়, ইহাই এ দেশের সনাতন ধর্ম।

ইঙ্গ-সোভিয়েট সন্ধি—

গোপনে গোপনে একটা বড় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। গত ১১ই জুন মিঃ এডেন পার্লামেণ্টে ইঙ্গ-সোভিয়েট সন্ধির সর্তগুলি যখন ঘোষণা করেন, তখন ঘটনাটির আকস্মিকতায় সদস্যদের মধ্যে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আকস্মিক হইলেও অস্বাভাবিক ছিল না। বিপদের চাপে পড়িয়া অনেক কিছু অঘটন ঘটিয়া থাকে। ইঙ্গ-সোভিয়েট মিলনও তেমন একটি ব্যাপার। মিঃ এডেন কথাটা স্বীকার করিয়াছেন। সন্ধির সর্তগুলিতেও এমন নূতন কিছুই নাই। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট পরস্পরকে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিবেন; সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে হইতেই এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের বহুদিন হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন, সেই সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া হইয়াছে এবং ১৯৪২ সালের মধ্যেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা হইবে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এইদিক হইতে একটা লাভ হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ব্যবস্থা সবই ভাল হইয়াছে, কিন্তু এই সন্ধির সর্তগুলি পড়িয়া অনেকেরই মনে এই প্রশ্নের উদয় হইবে যে, ইউরোপের সমস্যাই জগতের একমাত্র সমস্যা এবং ইউরোপের মানুষগুলোই দুনিয়ায় বোধ হয় একমাত্র মানুষ, কর্তাদের এমনই ধারণা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব আটলাণ্টিক চুক্তির ভাষ্যমূলে এইরূপ মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির মধ্যেও সেই মনোভাবই স্পষ্ট দেখা যাইবে। কারণ এসিয়ার কোন কথা সন্ধি সর্তে নাই। এসিয়ার বিষয় সে ক্ষেত্রে তুলিবার পক্ষে একটা বাধা ছিল তাহা আমরা বুঝি। রুশিয়া এখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, এরূপ ক্ষেত্রে এসিয়ার সম্বন্ধে কোন কথা তুলিতে গেলে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে জাপান জড়িত হয়। রুশিয়া এখন হয়ত তাহা চাহিবে না; কিন্তু এসিয়াতে ইংরেজের স্বার্থ রহিয়াছে, আমেরিকারও স্বার্থ রহিয়াছে এবং এই দুই শক্তিই বর্তমানে জাপানের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। জাপানের শত্রুপক্ষ এই দুই শক্তির কথা তুলিতে রুশিয়ার যদি আপত্তির কারণ না থাকে, তবে চীনের কথা তুলিবার পক্ষেই বা এমন কি বাধা থাকিতে পারে? যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার সম্পর্কে সে কথা তোলা যদি

আন্তর্জাতিক ব্যবহার-বিধির দিক হইতে এমন আপত্তিকরই হয়, তবে সন্ধি সর্তে যুদ্ধের পর শান্তির প্রতিষ্ঠাকালে পুনর্গঠন-মূলক যেসব প্রস্তাব আছে, অন্তত সেইসব ক্ষেত্রে তো চীনের রাষ্ট্র মর্যাদা উপযুক্তভাবে স্বীকার করিতে বাধা ছিল না; কিন্তু সন্ধি সর্তের মধ্যে সে জিনিস পরিলক্ষিত হইল না। এডেন সাহেব সন্ধি সর্তের ভাষ্য মুখে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সোজাসুজি ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রিটিশ, সোভিয়েট এবং আমেরিকা এই তিন শক্তি, শুধু ইউরোপের নয়, জগতের শান্তি এবং সভ্যতার একমাত্র রক্ষক। চীন আজ নিজের সর্বস্ব দিয়া স্বাধীনতার আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিতেছে, সম্মিলিত শক্তির দলভুক্ত অন্য ২৪টি শক্তির মধ্যে তাহাকে ফেলা কি উচিত হইয়াছে? রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধির এই সর্তের গন্ডীর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরবর্তী পুনর্গঠনের যুগে সোভিয়েট এবং আমেরিকার সমাধিকার সূত্রে চীনের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা স্বীকার করা যদি সম্ভব না হয়, তবে রুশিয়ার ন্যায় চীনের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করিয়া সে অধিকারকে স্বীকার করা ব্রিটিশ এবং আমেরিকার পক্ষে কর্তব্য।

ইউরোপের দৃষ্টিতে এসিয়া—

বিশ্ব সভ্যতা, বিশ্বমানবের স্বাধীনতা এই ধরণের বড় বড় বুলি আমরা ইউরোপের রাজনীতিকদের মুখে সময় সময় শুনিতে পাই। ইউরোপের রাজনীতিকদের সহিত স্বার্থ-সংস্রবে লিপ্ত হইবার পর আমেরিকার মুখেও আমরা সেই ধরণের কথা শুনিতেছি। মার্কিন রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়ালেস সম্প্রতি একটি বক্তৃতাতে বলিয়াছেন,—"আমেরিকা যে শান্তি চাহে, তাহা জনসাধারণের শান্তি, প্রত্যেক স্থানে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এই শান্তির পরিণতি। পৃথিবীর জন-সমাজ যতদিন না শিক্ষিত হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক শিশুর জন্য যতদিন না উপযুক্ত পরিমান দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না বিশ্বমানব সমাজে এমন দায়িত্ববোধ আসে যে, সকলে মিলিয়া গণতান্ত্রিক শাসনের অধিকার ভোগ করিতে পারে, ততদিন আমাদের কার্য শেষ হইবে না।" খুব বড় কথা; কিন্তু কার্যত, কি ঘটিতেছে ইহাই প্রধানত বিবেচ্য। কাজের বেলা এইসব বড় বড় কথা ইউরোপের রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে যেমন মূল্যহীনই থাকিয়া যায়, আমেরিকার বেলায়ও তাহাই। সুতরাং ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতিকদের এই ধরণের উক্তিকে এসিয়ার অধিবাসীর পক্ষে নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। চীনের পররাস্ট্র সচিব মিঃ সুঙ কথাটা সেদিন আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"এসিয়ার কথা যখনই উত্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহাতে ব্যবসা করিবার বাজার, কারখানার সুবিধার ক্ষেত্র অথবা রবার, টিন ও তেলের ভাণ্ডার বা কাঁচামাল উৎপাদনের ও মজুর সরবরাহের কেন্দ্রস্বরূপে গণ্য করা হইয়াছে। এই ধরণের কথা শুনিতে শুনিতে এসিয়াবাসীদের চিত্তে ক্লান্তি আসিয়াছে। চীনের লক্ষ্য এসিয়ার রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং আর্থিক সুবিচার ইহার কোনটিই কোনটিকে ছাড়া অর্জন করা যায় না।' সোজা সত্য কথা, ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইউরোপ এবং আমেরিকা বর্তমানে এসিয়াকে শোষণের ক্ষেত্রস্বরূপেই দেখিয়া থাকে এবং যতদিন পর্যন্ত এসিয়ার রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা অর্জন না করিবে, স্বপ্রতিষ্ঠ না হইবে, দুর্বল থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত শুধু নৈতিক আদর্শের যুক্তি আওড়াইয়া এসিয়ার সম্বন্ধে ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতিকদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন সম্ভব নহে; কারণ ক্ষুদ্র স্বার্থ সকল বিচারকে বিভ্রান্ত করে। এসিয়ার দুর্বলতার দরুণ ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ যতদিন এখানে থাকিতেছে ততদিন পর্যন্ত এসিয়ার ক্ষেত্রে বৃহত্তর কর্তব্যবোধও তাহাদের মনে সত্য হইয়া উঠিবে না।

উদ্দেশ্য কি—

রাজসাহী জেল এবং মেদিনীপুর জেল হইতে কয়েকজন বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার বন্দীদের মুক্তির বিষয় নাকি বিবেচনা করা হইতেছে। শুনিতেছি, ভারত সরকার নাকি কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন; তদনুসারেই এই বন্দীরা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বন্দীদের মুক্তিদানের মূলে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে; কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ হয় না এবং বর্তমান সমরোদ্যমে ও দেশরক্ষার ব্যাপারে এইসব বন্দীর মুক্তি সহায়তা করিবে ইহাই যে এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যস্বরূপে কাজ করিতেছে ইহা বুঝিতেও বেগ পাইতে হয় না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে এই যে, কমিউনিস্ট বন্দী এবং অন্য রাজনীতিক বন্দীদের মধ্যে পার্থক্য কি? রাজনীতিক বিশিষ্ট মতবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়, বিচার্য হইল ইহাদের কাজ। কমিউনিস্ট বন্দীরা আন্তর্জাতীয়তা-বাদী হইতে পারেন, অন্য বন্দীরা হইতে পারেন জাতীয়তাবাদী; কিন্তু ইহা সত্য যে, অন্যান্য রাজনীতিক বন্দীরা যেমন দেশের স্বাধীনতাই চাহেন, কমিউনিস্ট বন্দীরাও নিশ্চয়ই সেইরূপ কোনক্রমেই দেশের অধীনতা কামনা করেন না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতার ধর্মে উভয় শ্রেণীর বন্দীই সমধর্মী এবং সে-ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতার উদ্দেশ্যও উভয়েরই সমান। দেশের আবহাওয়া যদি স্বাধীনতার অনুকূল হয়, তবে সরকারের পক্ষে এই উভয় শ্রেণীর বন্দীরই আনুকূল্য লাভ সম্ভব হইতে পারে; যদি তাহাই না হয়, তবে এমন মুক্তির কোন মূল্যই থাকে না। ভারতবর্ষে বর্তমানে বিদেশীয় আক্রমণ আসন্ন হইয়াছে, ভারত সরকার যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া সত্যই ইহাদের সহযোগিতা কামনা করেন, তবে ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। এইদিক হইতে বিচার করিলে এক শ্রেণীর রাজনীতিক বন্দীকে ছাড়া, অন্য শ্রেণীর বন্দীকে না ছাড়া, ইহা যেমন দুর্বোধ্য সেইরূপ একদিকে বন্দী-মুক্তি অন্যদিকে বিনা-বিচারে আটক এবং ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজাল বিস্তার ইহাও সেইরূপ দুর্বোধ্য মনে হইবে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, রাজনীতিক বন্দীদের ব্যাপকভাবে মুক্তিদানের

বলিষ্ঠ এবং উদ্যমশীলতাই এসব ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করে এবং সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ কোন ব্যবস্থা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না।

খাদ্যসঙ্কট ও গভর্নমেণ্ট—

সম্প্রতি গভর্নমেণ্ট কলিকাতা শহরের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। জরুরী অবস্থার মধ্যে শহরের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা যাহাতে বিপর্যস্ত না হয়, সে জন্য গভর্নমেণ্ট অন্তত এক মাসের উপযুক্ত চাউল, ডাউল, আটা, ময়দা, তেল, লবণ, কয়লা, কেরোসিন, দিয়াশলাই প্রভৃতি মজুত রাখিতে চাহেন। গভর্নমেণ্ট কিভাবে এই কর্মপ্রণালী অনুযায়ী কাজ করিবেন, আমরা জানি না; কলিকাতা শহরে হঠাৎ যেভাবে এক একটি জিনিস দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কর্মপ্রণালী একটা নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়, তা কতটা কার্যকর হয়, ইহা প্রথমে দেখা দরকার। তাহা ছাড়া কেবল কলিকাতার কথা ভাবিলেই চলিবে না; কলিকাতার সমস্যাকে প্রধানভাবে সমগ্র বাঙলা দেশের সমস্যা বলা যাইতে পারে। কলিকাতার বাজারের অবস্থার উপর গোটা বাঙলা দেশের বাজারের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করিবে; এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতাকে নিরাপদ করিবার আগ্রহে অতিরিক্ত পরিমাণ মাল কলিকাতায় আটক রাখিতে গেলে মফঃস্বল অঞ্চলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়; গভর্নমেণ্টের এই সব বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং যেসব জিনিসের আমদানীর উপর বাঙলা দেশকে বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেগুলির আমদানীর সুবিধা করিতে হইবে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, এক চাউল সম্বন্ধে বাঙলা দেশটা কতকটা আত্মনির্ভর বলা যায়; কিন্তু রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে ভরসাও অনেকটা শিথিল করিয়া দিয়াছেন। সেদিন বর্ধমানে তিনি বলিয়াছেন, চাউল সব সময় যে বাজারে মিলিবে এমন ভরসাও করিবেন না। ব্রহ্ম দেশ হইতে ভারতে ৫ কোটি টন আন্দাজ চাউল প্রতি বৎসর আমদানী হইত; এখন ঐ আমদানী বন্ধ হইয়াছে; এখানে ঐ পরিমাণ চাউল উৎপাদনের দ্বারা যদি ঐ অভাব পূরণ করা না যায়, তাহা হইলে চাউল দুর্মূল্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।। এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন চাউল বাজারে হয়ত মিলিবে না। গভর্নমেণ্ট অবশ্য খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রচার কার্যের উপর জোর দিয়াছেন, কিন্তু শুধু কথার জোরে জমিতে বেশী ধান্য উৎপন্ন হইবে না। বাঙলা দেশের ধান্যের আবাদ বৃষ্টির উপর অনেকটা নির্ভর করে; পশ্চিম-বঙ্গে তো বিশেষভাবে। জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা বাঙলা সরকার করেন নাই এ কথা বলিতেই হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কাজের মধ্যে এক দামোদর ক্যানেল, সেখানেও ট্যাক্সের হার এত বেশী যে, চাষীদের পক্ষে তাহা বহন করা দুঃসাধ্য। এ বৎসর যেরূপ অনাবৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ধানের আবাদে সাফল্য কতটা হইবে সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে; তাহার উপর, বাঙলা দেশে কল কারখানা প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে বাঙলার বাহিরের লোকদের বাস এদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইসব অ-বাঙালী সম্প্রদায়, আটার দাম চাউলের চেয়ে বেশী হওয়াতে অনেকেই ভাত খাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে; এই তো গেল বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের সমস্যা। ইহার পর লবণের সমস্যা; বাঙলা সরকার জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে বাঙলা দেশে যে পরিমাণ লবণ মজুদ আছে, তাহাতে বড় জোর ৪৫ দিন চলিতে পারে; ইহার পর লবণের অভাব মিটাইবার জন্য করাচী প্রভৃতি পশ্চিম ভারতের বন্দরের উপর নির্ভর করিতে হইবে; যাহাতে ঐসব অঞ্চল হইতে লবণ আমদানীর সুবিধা হয়, সেজন্য মালগাড়ির ব্যবস্থা করা হইতেছে; এ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন হইল এই যে, অন্য প্রদেশের ভরসায় না থাকিয়া বাঙলা দেশে বাঙলার লবণের অভাব যাহাতে পূরণ হয়, সে ব্যবস্থা কেন করা হইতেছে না? এখানে লবণ প্রস্তুতের কারখানা যে কয়েকটি আছে, সেগুলিকে সমধিক সুবিধা কেন দেওয়া হইতেছে না? ইহার পর কেরোসিন তেলের প্রশ্ন; দেখা যাইতেছে এ প্রশ্ন আরও জটিল। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীযুত রামস্বামী মুদালিয়র সেদিন বলিয়াছেন যে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাজারে কেরোসিন তেল একেবারেই পাওয়া যাইবে না। তখন কি অবস্থা হইবে? বাঙলার রাজস্ব সচিব এই ভরসা দিয়াছেন যে, সরকার হইতে ভেরেণ্ডার বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে; কিন্তু আগে বীজ বিতরণ, পরে তাহা বপন, ইহার পর গাছ জন্মিবে, ভেরেণ্ডা ফলিবে, তবে তাহার তেল, এতদিন বাঙলা দেশ জুড়িয়া কি ব্ল্যাকআউট চলিবে? প্রকৃতপক্ষে জীবন ধারণের সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। এমন দুর্দিনের বাজারে দেশের লোককে প্রবঞ্চিত করিয়া যেসব মহাজন অতিলাভে পুষ্ট হইতেছে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের সততার। দেশের জনসাধারণ যদি এ সম্বন্ধে জাগ্রত থাকে, তবেই সে বস্তু জিনিস বজায় থাকতে পারে। আমরা দেশবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন জনসেবার দিক হইতে এই সম্পর্কে কোনরূপ অন্যায়কে প্রশ্রয়দান না করেন।



১৩

শাশ্বতীর বিমর্ষ গম্ভীর মুখখানা দেখিয়া স্বাতী যেন ভরসা পায় না।

শাশ্বতী যখন ফিরিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। ঘোড়াটাকে সহিসের হাতে দিয়া সে অসংযতপদে বাড়িতে প্রবেশ করিল,—নিজের ঘরে গিয়া জুতা না খুলিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নিঃশব্দে মা কখন আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাহা সে জানে না,—চক্ষু মুদিয়া সে শুইয়াছিল। চেয়ার টানার শব্দে সচকিতভাবে তাকাইয়া দেখিল, মা আসিয়াছেন।

সে নিঃশব্দে শুইয়া রহিল, উঠিবার কিংবা কথা বলার প্রবৃত্তি বা শক্তি তাহার তখন ছিল না।

"শাশ্বতী—"

মা ডাকিলেন, এ ডাকের অর্থ শাশ্বতী জানে।

সে তাকাইল মাত্র।

মিসেস বোস একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন, উগ্রকণ্ঠ যথাসম্ভব নরম করিয়া বলিলেন, "আজ আমি এই নির্জনে তোমার সঙ্গে কয়েকটা গোপনীয় কথা বলতে চাই, সেই-জন্যেই এসেছি। আজ কয়দিন—সেই দুই তিনদিন অজ্ঞাত যাত্রা হতে ফিরে আসা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার নির্জনে কথা বলার অবকাশই হ'ল না—"

মিষ্ট সুরে শাশ্বতী বলিল, "সে জন্যে আমিও আন্তরিক দুঃখিত মা, আমি যথেষ্ট নির্জনেই থাকি, কিন্তু তোমাকে আমি পনের মিনিটের জন্যেও নির্জনে পাই নি।"

মিসেস বোস থতমত খাইয়া গেলেন, মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন, "অবশ্য এর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ স্বাতীর বিয়ের কথাবার্তা হওয়ার জন্যে বাড়ির সবাই ব্যস্ত আছি, কিন্তু—"

শাশ্বতী উঠিয়া বসিল, "আমিও ঠিক এই সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চাই মা, কিন্তু সেটা পরে হবে—আগে তোমার কথাটা শুনি, আমার কাছে তোমার কি দরকার, সেটা আগে বল—"

মেয়ের কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া মায়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, "প্রথমত আমি বলতে চাই, তোমার আচরণগুলি মোটেই এ সমাজের উপযুক্ত নয়—শুধু এ সমাজেই বলি কেন, যে কোন সমাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। যে সব মেয়েদের মাথার পরে কেউ নেই, তারাই তোমার মত বেপরোয়া-ভাবে যা খুসি তাই করে যায়। আমি মোটেই আশা করতে পারি নি শাশ্বতী, আমার মেয়ে হয়ে তুমি এ রকমভাবে চলবে, যাতে ঘরে বাইরে সকলের কাছেই আমায় অপমানজনক কথা শুনতে হবে।"

শাশ্বতীর শ্যামল মুখ লাল হইয়া উঠিল, রুদ্ধশ্বাসে সে কেবলমাত্র বলিল, "অপমান—?"

মিসেস বোসের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, রুমালে মুখখানা মুছিয়া লইয়া তিনি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "অপমান বই কি? লোকে যে তোমার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তা আমি সইতে পারি নি শাশ্বতী—কোন মায়েই তা সইতে পারে না। তুমি যদি মা হও, সেদিন বুঝবে কেউ যদি সন্তানের নিন্দা করে, সেটা মায়ের বুকে কি রকম কঠিন হয়ে বাজে—"

শাশ্বতী হাসিল, বলিল—"আমি তো মা হওয়ার জন্যে জন্মাই নি মা—"

মিসেস বোস সে কথা প্রসঙ্গে কিছু না বলিয়া নিজের কথার জের টানিয়া চলিলেন—"সেদিন মিসেস চৌধুরী বিদ্রূপ করলেন, মিসেস ব্যানার্জি কত কথা বললেন, মিসেস—"

বাধা দিয়া অধীরভাবে শাশ্বতী বলিল, "ও সব মিসেসদের কথা ছেড়ে দাও মা, ওঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মেয়ে, ভাইঝি, বোনঝিদের অনেক বড় বলে পরিচয় দেন, কিন্তু আসলে আমার সকলকে জানা আছে। আমি বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরতে চাইনে, কিন্তু আমার স্বাধীনতা আমার একার—যেখানে খুসি যাব, যা খুসি করব, তাতে কেউ সমালোচনা করে, করুক।"

সে আবার শুইয়া পড়িল।

মিসেস বোস অন্তরে অন্তরে গর্জিতেছিলেন—মুখ ফুটিয়া তাহা প্রকাশ করার যো নাই, শাশ্বতীকে তিনিও কতকটা এড়াইয়া যান, এমন স্পষ্টবাদিনী খুব কমই দেখা যায়।

মুহূর্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "সেদিন কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? হঠাৎ সেই রাত্রে ফিরলে, জিজ্ঞাসা করলুম—কোন উত্তর দিলে না, আশা করি আজ সে কথা বলা চলবে।"

শাশ্বতী শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি কিন্তু এসেই বাবাকে বলেছি।"

বোমার মত ফাটিয়া পড়িয়া মিসেস বোস বলিলেন, "তবেই আর কি—আমি সবই জেনেছি। উনি কোনদিন কোন কথা আমায় বলেন, শুনেছো? তুমি তোমার যা কিছু কথা

তোমার বাবাকে বলতে পারো, আমায় কোনদিন কোন কথা বলেছ?"

শাশ্বতী চুপ করিয়া রহিল।

মিসেস বোস তাহার সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ম দৃষ্টি বুলাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "থাক, আমি এখন জানতে চাচ্ছি, তুমি সেদিন গিয়েছিলে কোথায়?".

শাশ্বতী ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার বোনের কাছে গেয়েছিলুম।"

"আমার বোনের কাছে!—"

মিসেস বোস যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—তাঁহার বোন,—কথাটা মনে করাইয়া দিতে ছোটবেলার কথা মনে পড়িয়া গেল।

গ্রামের মেয়ে—দুইটি বোন; থাকমনি জ্যেষ্ঠা, কাত্যায়নী কনিষ্ঠা। বিধবা মা কি কষ্টে দুইটি বোনকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। দিদি ছোট বোনটিকে কতখানি গভীরভাবে ভালবাসিতেন। মা মারা গেলে পনের বৎসরের থাকমনি সাত বৎসরের ভগিনী কাত্যায়নীকে কি করিয়া ভুলাইয়া রাখিতেন—নিজের মুখের আহার্য লুকাইয়া তাহাকে দিতেন, তাহা জানেন শুধু কাত্যায়নী, আর কেহ জানে না।

সে কাত্যায়নী আজ কোথায়?

ভগ্নিপতির বাড়িতে বেশীদিন থাকা হয় নাই, সম্পর্কীয় কাকা তাঁহাকে কলিকাতায় আনেন এবং এইখানেই মিঃ বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সেদিনকার কাত্যায়নী আজ কে টি বোস, আভিজাত্য সমাজে বিশেষ বিখ্যাত; তাঁহার চালচলনে কেহ এতটুকু ত্রুটি দেখিতে পায় না, বরং অনেককেই তিনি ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার নিজের পক্ষে—

সেদিনে যাহা ছিল অহঙ্কার বা গর্বের জিনিস, আজ তাহা যেন লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া তাঁহার সন্তান হইয়া শাশ্বতী মাঝে মাঝে এমন কথা বলিয়া বসে, যাহাতে তিনি কুণ্ঠিতা হইয়া উঠেন, রাগ করিলেও প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁহার থাকে না।

মেয়েরা স্বামীর নিকট সাম্রাজ্ঞী হইতে পারে, সন্তানের নিকট তাহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া যায়, এ কথা ঠিক। মিসেস বোস মিঃ বোসকে কোনদিনই গ্রাহ্য করেন নাই, একমাত্র শাশ্বতীর নিকট তিনি অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছেন, কারণ শাশ্বতী ভিন্ন পথে যেখানে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানকার নাগাল পাওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য।

শাশ্বতী মায়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার পানে তাকাইয়াছিল। বলিল, "তোমার বোনের কাছে গেলুম, কিন্তু তুমি তো কই, তাঁদের কথা একটিবার জিজ্ঞাসাও করলে না?"

মিসেস বোস মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করার সময় এখনও ফুরায় নি শাশ্বতী—"

শাশ্বতী খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সময় থাকলেও দরকার ফুরিয়ে গেছে মা মোটের পরে তাঁরা একরকম আছেন। তোমায় একবার দেখবার ইচ্ছা তোমার বোনের খুব বেশী দেখলুম, সামনে একটা কি গঙ্গাস্নানের পর্ব আছে, এইদিনে আসতে বলেছি।"

"আসতে বলেছো—এখানে?"

মিসেস বোস বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন।

থাকমণি এখানে আসিবেন? হইলেই বা তাঁহার বোন, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের বউ; জুতা পরে না, গায়ে জামা নাই, সিঁথিভরা সিঁদুর, তাহার উপর চালচলন? উঃ, লোকেরা বলিবে কি,—তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা যে দারুণ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিবে। আজকার এই মিসেস বোসকে দেখিয়া কেউ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না, ইঁহার নাম ছিল কাত্যায়নী, নোলক নাকে এতটুকু একটি মেয়ে, রুক্ষ মাথা, ময়লা গা কাপড়—

মিসেস বোস চোখ মুদিলেন।

শাশ্বতী বুঝিয়াছিল, আঘাতটা কোথায় লাগিয়াছে। সে শান্তমুখে বলিল, "কিন্তু আমি বললেও মাসীমা আসতে চাচ্ছেন না, বলছেন, তুমি নিজে না বললে তিনি আসবেন না। তুমি কেন একখানা পত্র দাও না মা, বেচারা মাসীমা পাড়াগাঁয়ের মানুষ—একবার কলিকাতাটা বেড়িয়ে যান।"

সর্বরক্ষা—

মিসেস বোস হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মেয়ের কাছে ছোট হওয়া চলে না—তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, "দেখা যাবে, এর পরে পত্র লিখে দিলেই হবে একখানা। এখনই তো গঙ্গাস্নানের পর্ব নেই, এর পর—তার এখনও অনেক দেরী—"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—

"কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি শাশ্বতী, ওরকমভাবে যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়। তোমার বাবা তোমায় অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছেন, লোকে কি বলবে না বলবে, সে কথা তিনি ভাবেন নি। যাই হোক, তোমাকে বলে রাখছি, তুমি এখন ছেলেমানুষ নও, তোমায় সমাজের মুখ চেয়ে চল্‌তে হবে, কাজেই—"

শাশ্বতী একটু হাসিল, বলিল, "কিন্তু মা, আমি আগেই বলে রাখছি, তোমার এ সমাজের নিয়ম অনুযায়ী চলা আমার পক্ষে কঠিন হবে। চিরদিন বাইরে বাইরে থেকে আজ হঠাৎ এর ভেতরে এসে নিয়ম পালন করা আমার দ্বারা চলবে না। আমায় দয়া করে ছেড়ে দাও মা—স্বাতীকে দিয়ে তোমার যা কিছু করবার তা কর, আমি ওসব পারব না।

মিসেস বোস রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "লোকের নিন্দে কুড়াবে—?"

শাশ্বতী সংক্ষেপে বলিল, "নিন্দে-প্রশংসা আমি শুনি নে।"

"বেশ," বলিয়া মিসেস বোস বাহির হইয়া গেলেন।

শাশ্বতীর গান শুনা গেল—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিভে যায় বারে বারে—

ক্রমশঃ

বাঙলা ছন্দের ত্রিধারা

(পূর্বানুবৃত্তি)

আবদুল কাদির

(২)

স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত বাঙলার ছন্দ

বাঙলার দেশজ ছন্দটি হইতেছে স্বরবৃত্ত-ভঙ্গিম। রাম-যাত্রা, ভাসান-যাত্রা, বাউল-গান, পালা-গান, ভাট-গাথা, বচন, ছড়া, জারি, কীর্তন, কিম্বদন্তী, কথকতা, রাখালী, বারমাসী, ভাটিয়ালী, মুর্শীদি প্রভৃতিতে ইহা পল্লীবাসীদের নিকট সুপরিচিত। একালে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে দেশের শিক্ষিতদের দৃষ্টি ইহার অপরিসীম সম্ভাব্যতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কবিতায় স্বরবৃত্ত-ভঙ্গী ছিল; কিন্তু অধুনা এই ছন্দটি আশাতীতরূপে মার্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বরবৃত্ত (Syllabic) ছন্দে স্বর (Syllable) ব্যষ্টি (unit) রূপে গণ্য; ইহার পর্বে সচরাচর চারিটি স্বরব্যষ্টি থাকে। তবে পর্ব মধ্যে অন্যূন একটি এবং অনধিক দুইটি যুগ্মস্বর (Closed Syllable) ব্যবহৃত হইলে সুন্দর ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। ইহার পর্বে চারিটি যুগ্মস্বরের প্রয়োগ একেবারে অচল। পর্ব বিশেষে তিনটি যুগ্ম ও একটি অযুগ্ম (open) স্বরের প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু তাহা প্রায়শ 'শ্রুতিকটু' হয়। স্বরবৃত্তের পর্বে চারিটি স্বর-ব্যষ্টির স্থলে তিনটি যুগ্মস্বর অথবা দুইটি যুগ্মস্বর ও একটি অযুগ্মস্বর, প্রযুক্ত হইতে পারে; তাহাতে রসহানি ঘটে না। স্বরবৃত্তের পর্বে চতুঃস্বরের বিনিময়ে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত পদের প্রয়োগ ব্যতিক্রম (variation) হিসাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

স্বরবৃত্তে দ্বিস্বর (disyllabic) ও ত্রিস্বর (trisyllabic) কবিতা আছে বটে; কিন্তু ছন্দঃধ্বনির অতিরিক্ত এক-ঘেয়েমি প্রকট হইয়া ওঠে বলিয়া সে-সব ধরণ সুপ্রচলিত হইতে পারে নাই।

বাজছে শূন্যে অভ্র-কম্বু;
কাঁপছে অম্বর কাঁপছে অম্বু।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ছন্দঃহিন্দোল।

ইহার প্রতি পংক্তিতে চারিটি পদ, প্রতি পদ দ্বিস্বর এবং যোড় স্বর-গুলিতে (even syllablesএ) যতি পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে ছন্দঃকৌশল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বরবৃত্তের স্বাভাবিক সুরলালিত্য (euphony) ও লাস্যলীলা চতুঃস্বরপার্বিক ছন্দেই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হইয়া ওঠে।

পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবে, এমন কথা শাস্ত্রে বলে;
আমরা বলি বাণপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।
—রবীন্দ্রনাথ, শাস্ত্র।

এখানে প্রতি পংক্তিতে আছে ৪+৪+৪+৪ স্বরব্যষ্টি। ৪র্থ, ৮ম ও ১২শ সিলেবলে হইয়াছে পর্বচ্ছেদ। ইহাকে বলা যাইতে পারে 'পূর্ণ স্বরবৃত্ত পয়ার।'

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার কহ আমায় ধনী,
তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের করব মহা-জনী।
—রবীন্দ্রনাথ, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ক্ষণিকা।

ইহার চরণে আছে ৪+৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি। সুতরাং ইহার নামকরণ হইতে পারে 'সাধারণ স্বরবৃত্ত পয়ার।'

একটি মেয়ে আছে জানি পল্লীটি তার দখলে;
সবাই তা'রে পূজো জোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে।
—রবীন্দ্রনাথ, পরিচয়, শিশু।

রঙ্গিল পয়ারে থাকে ৪+৪+৪+৩ অক্ষর; আর ইহাতে আছে ৪+৪+৪+৩ স্বরব্যষ্টি।

আজ বাঁশীতে বেসুর বাজে আচমকা,
সত্যি হলো স্বপ্নে-দেখা আশঙ্কা।
—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার প্রতি।

একাবলীতে থাকে একাদশ অক্ষর, আর ইহার চরণে আছে ৪+৪+৩ স্বরব্যষ্টি।

মালঞ্চ মোর তারি আলোয় ঘেরা,
তা'রে ছেড়ে যায় কি ঘরে ফেরা?
—করুণানিধান, বাসন্তী, ধান-দূর্বা।

দিগক্ষরায় থাকে দশ অক্ষর, আর ইহাতে আছে ৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি।

কবি কহে, সন্ধ্যা হ'লো বটে, শুনেছি ব'সে লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি, আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ।
—রবীন্দ্রনাথ, কবির বয়স, ক্ষণিকা।

উপরোক্ত উদাহরণের প্রতি পংক্তিতে আছে দুইটি ভাগ, প্রতি ভাগে আছে ৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি। উভয় পংক্তির শেষে ছন্দোমিল (rhyme) রহিয়াছে।

নিরীহ যে | সত্যাগ্রহী, || কি লাভ হ'লো | তারে লাথি | মেরে,
সে করেছে তোমায় ক্ষমা, তার চোখে আজ দেখে যাও খুন্টেরে।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কোনো ধর্মধ্বজের প্রতি, বিদায়-আরতি।

মহাপয়ারে থাকে ১৮ অক্ষর, আর ইহাতে আছে ১৮ স্বরব্যষ্টি। প্রতি পংক্তিতে দুইটি ভাগ, প্রথম ভাগে ৪+৪ স্বরব্যষ্টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি রহিয়াছে। ৮ স্বরব্যষ্টির পর বিরতি (coesura) এবং ১৮ স্বরব্যষ্টির পর ছেদ-চিহ্ন (Punctuation) আছে। প্রতি চতুঃস্বরের পর যতি (seat of the accent) পড়িয়াছে। ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'বর্ধিত স্বর-বৃত্ত পয়ার।'

আছে মাত্র ক্ষুধা তাহার, || ক্ষুধা পেলে কাঁদে সেটা, || তৃপ্ত হলে হাসে;
বাড়ে শিশু, পরে তাহার মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে কোথা হ'তে আসে?
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যযুগ, আলেখ্য।

ইহার চরণে আছে ৮+৮+৬ স্বরব্যষ্টি; সুতরাং ইহাকে বলা যাইতে পারে 'অতি বর্ধিত স্বরবৃত্ত পয়ার'। স্বরবৃত্তের নিয়মে এখানে প্রতি চারি সিলেবলের পর পর্বচ্ছেদ হইয়াছে।

তুমি যাচ্ছ যেন | রাস্তা দিয়ে হে'টে, | দেখছ দু'টি ধারে | চাহি রে;
সবাই আছে ঘরে আপন নিয়ে নিয়ে, তুমিই শুধু একা বাহিরে।
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নর্তকী, আলেখ্য।

ইহার চরণে আছে ৬+৬+৬+৩ স্বরব্যষ্টি; ইহার পর্বতরঙ্গ ষট্‌স্বর-পার্বিক। ইহাকে বলা যাইতে পারে 'তরল-ত্রিপদী' ধরণের স্বরবৃত্ত।

এলোথেলো চুলের মাঝে বিষাদ-মাখা যে-মুখখানি
চাঁদের আলো পড়েছে তার পরে;
পথের পানে চেয়েছিল পথের পানেই চেয়ে আছে
পলক নাহি তিলেক কালের তরে।
—রবীন্দ্রনাথ, বিদায়, ছবি ও গান।

ইহাকে বলা চলে 'দীর্ঘ-ত্রিপদী' ধরণের স্বরবৃত্ত। ইহার প্রথম চরণে ৮+৮ স্বরব্যষ্টি, দ্বিতীয় চরণে ১০ স্বরব্যষ্টি এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিত্র বর্ণ রহিয়াছে।

সেদিন ভোরে দেখি উঠে' বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে',
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে বাঁশের ডালে ডালে।
ছুটীর দিনের কেমন সুরে পূজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ্ ঝগ্‌ড়া করে রান্না-ঘরের চালে॥
—রবীন্দ্রনাথ, খেলা-ভোলা, শিশু ভোলানাথ।

ইহাকে বলা যাইতে পারে 'লঘু চতুষ্পদী জাতীয়' স্বরবৃত্ত। ইহার প্রথম চরণে আছে ৮+৮ স্বরব্যষ্টি এবং দ্বিতীয় চরণে আছে ৮+৬ স্বরব্যষ্টি। ইহাতে ৮ম ও ১৬শ সিলেবলে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিল আছে।

যে করেছে পণ ভঙ্গ বাড়ায়েছে প্রেম-তরঙ্গ
তারি সঙ্গে রঙ্গ-রসে করিব কাল যাপনা;

লোকে করে কানাকানি বিদ্যা হবে সন্ন্যাসিনী—
আমি তো সই মনে জানি, সন্ন্যাসিনী হ'ব না।
—গোপাল উড়ের গান।

ইহার নামকরণ হইতে পারে দীর্ঘ-চৌপদী ধরণের স্বরবৃত্ত, কারণ ইহার দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে ৮+৭ স্বরব্যষ্টি।

মধু এসে সোহাগ ভরে সাজায় সবে যতন করে'
ছড়িয়ে মেঘের প্রাণের মধ্যে অফুরন্ত সুধারাশি।
ঋতুপতির আমন্ত্রণে কী আনন্দ সবার প্রাণে,
পাপিয়া গায় 'পিউ' 'পিউ', কোয়েলা গায় আসি' আসি'।
—কায়কোবাদ, শিবমন্দির কাব্য।

ইহাতেও পূর্ণপদগুলি চতুঃস্বর। কিন্তু এখানে ৮ সিলেবলে পদক্ষেপ হইয়াছে বলিলে ইহার নামকরণ করিতে হয় পূর্ণ-চৌপদী (tetrameter) ধরণের স্বরবৃত্ত। উক্ত উদাহরণে আছে মোট ৩২+৩২ স্বরব্যষ্টি; ৮ম ও ১৬শ সিলেবলে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিল রহিয়াছে।

প্রতি চতুঃস্বরের পর যতি স্থাপন করিয়া এবং পর্বসংখ্যা প্রয়োজন মতো হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া স্বরবৃত্তে মুক্তক (free verse) সৃষ্টি করা যাইতে পারে। মুক্তক স্বরবৃত্তের পংক্তিপ্রান্তের পদটি একস্বর (monosyllabic) দ্বিস্বর বা ত্রিস্বর হইতে পারে।

সাহির-ঘরে ডেকে
শাশুড়ী তার বল্লে ধীরে, হাতটি শিরে রেখে,—
নিমাই!
আজকে তুমি নও কো কেবল শুধু আমার জামাই,
তুমি আমার বাবা আমার ছেলে,
ভালো-মন্দ ভাবনা যত তোমার হাতে দিলাম আজকে ফেলে।
একটা কথা সত্য বল্‌বো আজ,
নাই-ক আমার শঙ্কা-শরম, নাই-ক কোনো লাজ
আজকে তোমার কাছে;
নইলে ধর্ম্ম বিরূপ হ'বে পাছে।
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নিমাই, বন্ধুর দান।

এখানে কোনো পংক্তিতে ২ স্বরব্যষ্টি, কোন পংক্তিতে ৪+২ স্বরব্যষ্টি, কোনো পংক্তিতে ৪+৪+১ স্বরব্যষ্টি, কোনো পংক্তিতে ৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি, কোনো পংক্তিতে ৪+৪+৪+১ স্বরব্যষ্টি, কোনো পংক্তিতে ৪+৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি এবং কোনো পংক্তিতে ৪+৪+৪+৪+২ স্বরব্যষ্টি আছে। এ-ছন্দে পংক্তির দৈর্ঘ্যের কোনো স্থিরতা নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' কাব্যের মাতৃহারা কবিতাটিতে স্বরবৃত্ত-ভঙ্গিম মুক্তক ছন্দের প্রথম প্রবর্তন দেখা যায়। অবশ্য গ্রামের "মাধবের গান", "বেনিয়ার গীতি" প্রভৃতিতে ইহার অমার্জিত নিদর্শন রহিয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের "পলাতকা" কাব্যেই এ-ছন্দের সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।

(৩) মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ

সংস্কৃত ছন্দে বর্ণের লঘু-গুরু বৈষম্য আছে; কিন্তু বাঙলা ছন্দে বর্ণের উচ্চারণে দীর্ঘ-হ্রস্ব-ভেদ সুব্যক্ত নয়। তবে সংস্কৃত ছন্দের মতোই বাঙলা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে অনুস্বার, বিসর্গ ও যুক্তবর্ণের পূর্ব বর্ণ সর্বথা দ্বিমাত্রার মর্যাদা পাইয়া থাকে। 'ঐ' এবং 'ঔ' বাঙলা মাত্রাবৃত্তেও দ্বৈমাত্রিক।

আক্ষরিক পয়ারের মতো ত্রিপদীতেও "যুক্তবর্ণ ঐকমাত্রিক শ্রেণীতে গণ্য" হইয়া থাকে। বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে স্থানে স্থানে সংস্কৃতের নিয়মে কোনো কোনো স্বরান্ত-বর্ণ দীর্ঘোচ্চারিত হইয়াছে এবং কোনো কোনো যুক্তবর্ণ দ্বিমাত্রার গৌরব লাভ করিয়াছে।

কিয়ে গিরিবর কনয়া-কটোর, তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত বেড়িয়া বালক চন্দ।
—বিদ্যাপতি।

এখানে 'শম্ভু' শব্দে দুই অক্ষর থাকিলেও তন্মধ্যে একটি যুক্তাক্ষর বলিয়া তাহার ধ্বনি-পরিমাণ (quantity) হইয়াছে তিন মাত্রা। পরবর্তীকালের কাব্যাদি হইতেও যুগ্মবর্ণের এরূপ বৈকল্পিক ধ্বনি-মহিমা লাভের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা চলে। একটি উদাহরণ দেখুন,—

বাঁধিছে ঝগড়া, নাদিছে দগড়া কড়া কড়া কড়া করি' রে।
বাজিছে ঝম্প সহিত ডম্ফ লম্ফ দম্ভ ভরি' রে॥
—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ম্মদেবী কাব্য

"ঝম্প" "ডম্ফ" "লম্ফ" ও "দম্ভ" আক্ষরিক বিধানে দুই হইলে এখানে তিন মাত্রার মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কাব্যাদিতে এরূপ বৈলক্ষণ্য সামান্যই দৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' রচনা যুগে যুক্তবর্ণের পূর্ব বর্ণের (অর্থাৎ যুগ্মস্বরের) 'দুই মাত্রার মূল দিয়া 'ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত' হন; তাহারই ফলে বাঙলায় বিশুদ্ধ মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ছন্দের সৃষ্টি হয়।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে;
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু-জল থাকে।
—রবীন্দ্রনাথ, সহজপাঠ

ইহার প্রথম চরণটি দেখিয়া ইহাকে ১৪ অক্ষরের সাধারণ পয়ার বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণে 'বৈশাখ' পদটির ধ্বনি মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাকে ১৪ মাত্রার মাত্রিক পয়ার বলিয়া চিনিতে দেরী হয় না। ইহার প্রতি পংক্তিতে আছে ৪+৪+৪+২ মাত্রা (mora); অতএব ইহার নামকরণ হইতে পারে 'সাধারণ মাত্রাবৃত্ত পয়ার।"

দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর শির দেগা, নাহি দেগা আমামা।
—নজরুল ইস্‌লাম, অগ্নিবীণা

রঙ্গিল পয়ারে থাকে ৪+৪+৪+৩ অক্ষর, আর ইহাতে আছে ৪+৪+৪+৩ মাত্রা।

রিম্ ঝিম রিম্ ঝিম্ বাজে মেঘে মল্লার
প্রিয়া মোর কোথা গেছে তাই দুটি আঁখি ভার।
অরবিন্দজিৎ মুখোপাধ্যায়, আকাশ-গঙ্গা

উপরোদ্ধৃত উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে আছে চারিটি পূর্ণ পর্ব, প্রতি পর্বে আছে চারি মাত্রা। সুতরাং ইহাকে বলা যাইতে পারে 'পূর্ণ মাত্রাবৃত্ত পয়ার'।

তাহে গুরু-গঞ্জন-বোল্।
অহর্নিশি অন্তরে রোল॥ —জ্ঞান দাস

দিগক্ষরায় থাকে দশ অক্ষর, আর ইহার চরণে আছে দশ মাত্রা।

কিরূপ এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥ —জ্ঞান দাস

একাবলীতে থাকে ৬+৫ অক্ষর, আর ইহার পংক্তিতে আছে ৬+৫ মাত্রা।

ধূপের ধূঁয়ায় ধূসর বাসর গেহ,
অগুরু-গন্ধে আকুল সকল দেহ।
—রবীন্দ্রনাথ, ভ্রষ্টলগ্ন, কল্পনা।

ইহার প্রতি পংক্তিতে মোট ১৪ মাত্রা আছে বটে, তবে ইহার ছন্দপর্বে আছে ৬+৬+২এর লয়। মাত্রিক পয়ারের পূর্ণপর্ব (Complete measure) চতুর্মাত্রিক; আর ইহাতে পূর্ণপর্ব হইতেছে ষণ্মাত্রিক। কিন্তু এখানে এই ষণ্মাত্রা গঠিত হইয়াছে ৩+৩ মাত্রার যোগে; কাজেই রাবীন্দ্রিক পরিভাষায় ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তকে বলা হইয়া থাকে 'তিন-মাত্রামূলক' ছন্দ বা 'অসম মাত্রার' ছন্দ।

নিমেষের লাগি দ্বন্দ্ব ভুলিল অঞ্চল চঞ্চল,
আকাশের পানে চাহি দুঞ্জনারি ঘনালো নয়নে জল।
—হুমায়ুন কবীর, সাথী।

ইহার প্রতি চরণে আছে ৬+৬+৬+২ মাত্রা; কাজেই ইহাকে বলা যাইতে পারে লঘু-ত্রিপদী ধরণের মাত্রাবৃত্ত। ইহাতে ষণ্মাত্রিক তিনটি পদ (trimeter) এবং পংক্তিপ্রান্তে দ্বৈমাত্রিক একটি অতিরিক্ত পদ (over measure) রহিয়াছে।

—কুন্তল দিব খুলে।'
অঞ্চল-মাঝে ঢাকিব তোমায় নিশীথ-নিবিড় চুলে।
—রবীন্দ্রনাথ, ভালো করে ব'লে যাও, মানসী।

ইহার রকমটি হইতেছে হীনপদ লঘু-ত্রিপদীর মতো ইহার প্রথম পংক্তিতে দুইটি পর্ব (metrical measure) কম রহিয়াছে।

করে নখ রঞ্জনী   চাঁছয়ে নখের কণ,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায়   ঘুম লাগে আধ-গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥
—চণ্ডীদাস

ইহা দীর্ঘ-ত্রিপদী ভঙ্গীর মাত্রাবৃত্ত। ইহার প্রথমে আছে দুইটি অষ্টমাত্রিক পদ, অতঃপর আছে দশ মাত্রা। ৮ম ও ১৬শ মাত্রায় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে মিল রহিয়াছে।

অয়ি সুনয়না তন্বী সন্ধ্যা, তপস্বী অয়ি বিলাসী,
হীরা-মণিজালে কুন্তল রচি', বয়ানে মিষ্ট সুহাসি।
—শশাঙ্কমোহন সেন, বিমানিকা।

ইহার চরণে আছে ৬+৬+৬+৩ মাত্রা। ইহার ধরণটি হইতেছে তরল-ত্রিপদীর মতো।

ওগো সুন্দরী সুখাম-কুমারী নবারা আমার নয়ন-তারা
কোন্ বালিয়াড়ি গিরির আড়ালে সব্জীর বাগে হইলে হারা!
—মোহিতলাল মজুমদার, স্বপন-পশারী।

ইহার প্রতি চরণে চারিটি পর্ব; তবে চতুর্থ পর্বটি অপূর্ণ, তাহাতে ১ মাত্রা (metrical moment) কম অর্থাৎ পাঁচ মাত্রা আছে। ইহার রকমটি হইতেছে লঘু-চৌপদীর মতো।

মৌন নিথর নিশি   বনান্তে যায় মিশি
তীরে তীরে ছায়া-রাণী আঁচল বিছায়;
সবুজের হাসি-গান   আজি হ'লো অবসান,
ছায়া-পথে মায়া-রথে শরৎ বিদায়।
—শাহাদাৎ হোসেন, কল্পলেখা।

ইহাকে বলা যাইতে পারে "লঘু-চতুষ্পদী জাতীয়" মাত্রাবৃত্ত। ইহার প্রথম চরণে দুই ভাগ, প্রতি ভাগে ৮ মাত্রা, উভয়ের শেষে মিল রহিয়াছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ হইতেছে সাধারণ মাত্রিক পয়ার; উভয়ের শেষে মিত্রবর্ণ আছে।

ভাণ্ডার খালি ক'রে   আনে থালি ডালি ভ'রে,
দিতে রাজ-ভিখারীরে গৃহীগণ ব্যস্ত;
ভিখারী না লয় কিছু,   বদন করিয়া নীচু
মুষ্টিভিক্ষা তরে পাতে শুধু হস্ত।
—কালিদাস রায়, আহরণী।

ইহাকে বলা চলে দীর্ঘ-চৌপদী ধরণের মাত্রাবৃত্ত। ইহার প্রতি ভাগে আছে ৮ মাত্রা; চতুর্থ ভাগে ১ মাত্রা কম অর্থাৎ ৭ মাত্রা আছে।

মাত্রাবৃত্তে ৭ মাত্রাযোগে পূর্ণপদ রচিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বনের পাখী বলেঃ 'আকাশ ঘন নীল, কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখী বলেঃ 'খাঁচাটি পরিপাটী, কেমন ঢাকা চারি ধার।'
রবীন্দ্রনাথ, দুই পাখী, সোনার তরী।

ইহার নাম নর্তক ত্রিপদী। কিন্তু এই কবিতাটিতে কোনো যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া ইহার ছন্দঃপ্রকৃতি (base) নিরূপণ করা কঠিন। যুক্তাক্ষরের নিকটেই অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের পার্থক্য পরখ করা হয়। যে কবিতায় কোনো যুক্তাক্ষর প্রযুক্ত হয় নাই, আক্ষরিক ও মাত্রিক এই উভয় বিধানেই তাহার ছন্দঃবিশ্লেষণ সম্ভব হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে, এই "সাত মাত্রার" ছন্দে "যুক্তবর্ণকে এক মাত্রার মর্যাদা" দিলে "ছন্দটার কোমর ভেঙে" যায়।

কিছুতে নাহি তোষ, এযে বিষম দোষ, গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে;
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি, ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে?
রবীন্দ্রনাথ, বধূ, মানসী।

ইহাতে আছে চারিটি ভাগ, তবে চতুর্থ ভাগে ২ মাত্রা কম অর্থাৎ ৫ মাত্রা রহিয়াছে। ইহার নামকরণ হইতে পারে সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। সাধারণত সপ্তমাত্রিক পদে থাকে তিন-চারের "মিলিত মাত্রার চলন", কোনো কোনো পদে থাকে ২+৩+২ অথবা ৩+২+২এর লয়।

যেথানে ধরণীর সীমার শেষে স্বর্গ আসিয়াছে নামি',
সেখানে একদিন মিলেছি এসে কেবল তুমি আর আমি।
—রবীন্দ্রনাথ, মিলন, পূরবী।

উক্ত উদাহরণের প্রতি পংক্তিতে আছে ৭+৫+৭+২ মাত্রা। এই বিষমপদী তালের কবিতাটির পর্ববিভাগ বেশ বিচিত্র। নর্তক-ত্রিপদী ভঙ্গীর মাত্রাবৃত্তের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহার পংক্তির দ্বিতীয় পাদটি পঞ্চমাত্রিক। রাবীন্দ্রিক পরিভাষায় ইহাকে বলা যাইতে পারে "যৌগিক মাত্রার ছন্দ।"......রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত "গান-ভঙ্গ" কবিতাটির পর্বগঠন অনুরূপ বটে, তবে তাহাতে পঞ্চমাত্রিক পদটির শেষে মিত্রাক্ষর নাই। নিম্নে স্বাধীন পঞ্চমাত্রাপর্বিক মাত্রাবৃত্তের নমুনা দেখুন—

মনের কুহু মনের কেকা অনাদি তারো মূর্চ্ছনা;
গোপনতার প্রচার তবু তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুহু ও কেকা।

ইহার চরণে আছে চারি ভাগ; তবে চতুর্থ ভাগে আছে অপূর্ণ পর্ব (Catalectic measure) তাহাতে ১ মাত্রা কম রহিয়াছে। অতএব ইহার নামকরণ হইতে পারে 'পঞ্চমাত্রিক অপূর্ণ-চৌপদী' মাত্রাবৃত্ত। এ ছন্দে ৫ মাত্রা ৩+২ অথবা ২+৩ (সম+অসম) মাত্রার যোগে গঠিত বলিয়া ইহাকে রাবীন্দ্রিক পরিভাষায় বলা যাইতে পারে 'বিষম-মাত্রার' ছন্দ। জয়দেবের "স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" প্রভৃতি পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রচিত; তাহারই অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দটি বাঙলায় প্রবর্তন করেন। অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের যে-কোনো ধরণের কবিতার মতো এই ছন্দঃভঙ্গীতেও পদগুলিকে নানাভাবে বিন্যস্ত করিয়া, পদসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এবং পংক্তিপ্রান্তের পদে নির্দিষ্ট নিয়মে মাত্রাসংখ্যার তারতম্য করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। একটি নজীর দেখুন—

সকাল বেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি কিছুতে যেতে চায়না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী পানে, বিদায় নাহি চায়॥
—রবীন্দ্রনাথ, অপেক্ষা, মানসী।

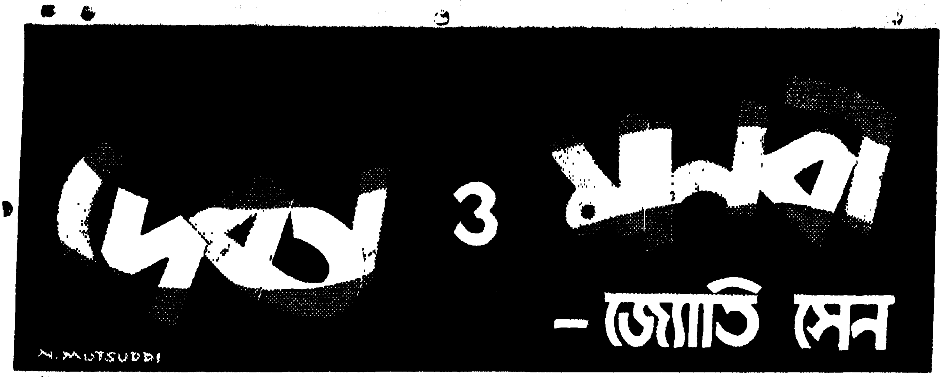
এখানে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে আছে ৫+৫+৫+২ মাত্রা। দ্বিতীয় পংক্তিতে দুইটি ভাগ, প্রতি ভাগে আছে ৫+৫ মাত্রা। এখানেও প্রতি পঞ্চমাত্রিক পদে "দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলন" রহিয়াছে।

অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মতন মাত্রাবৃত্তেও মুক্তক-ভঙ্গীর কবিতা আছে। তবে অনেকের ধারণা যে, মাত্রাবৃত্তের পংক্তিশেষে স্থিতি-স্থাপন প্রায়শ অপরিহার্য বলিয়া তাহাতে প্রবহমানতা (enjamblement) সৃষ্টি তেমন সম্ভবপর নয়। চণ্ডীদাসের কীর্তনে ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের অমার্জিত মুক্তক আছে। নজরুল ইস্‌লামের হাতে এই ছন্দটি প্রথম নিখুঁত রূপ লাভ করে।

তুই   তার চেয়ে কিরে শক্ত,
        তার চেয়ে কিরে ভক্ত?
তুই   দুর্বল, চির-দুর্বল,
তুই   পথের ধূলায় পড়িয়া আছিস্, কোথায় সে কত দূরে বল্!
তুই   যার সাথে ভাই বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়ালি,
        তাহারি হুকুমে মরিস্ বাঁচিস্, শুধু অভিশাপ কুড়ালি!
ওগো বীর!
তবে   সংযত কর, সংহত কর, উন্নত তব শির!
—গোলাম মোস্তফা, নিয়ন্ত্রিত, রক্তরাগ।

এখানে কোনো কোনো ছন্দঃপংক্তির পূর্বে একটি দ্বৈমাত্রিক অতিপর্ব আছে। কোনো পংক্তিতে আছে ২ মাত্রা, কোনো পংক্তিতে ৬+৩ মাত্রা, কোনো পংক্তিতে ৬+৪ মাত্রা, কোনো পংক্তিতে ৬+৬+৩ মাত্রা, কোনো পংক্তিতে ৬+৬+৬+২ মাত্রা, কোনো পংক্তিতে ৬+৬+৬+৩ মাত্রা এবং কোনো পংক্তিতে ৬+৬+৬+৪ মাত্রা আছে। উক্ত কবিতাটি নজরুলের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী'র অনুসরণে রচিত। এই ছন্দে পংক্তিগুলি প্রয়োজন মতো খণ্ডিত

(শেষাংশ ৮২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



২১

কৃষকদের সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় বড় ঘনিষ্ঠ। কৈশোরে সখ করিয়া ইহাদের সঙ্গে লাঙ্গল ঠেলিয়াছে, মাঠের আগাছা নিড়াইয়াছে। ইহারা বাধা দিলে ইহাদের হুকোকল্কি ও নিড়ানী লইয়া ছুট দিয়াছে। আবার নিজেই সে বাড়ি বাড়ি গিয়া পেঁৗছাইয়া দিয়া আসিয়াছে।

তখনই জয়ন্ত দেখিয়াছে এই হতভাগারা সারাদিন বলদের মত খাটে। রোদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া, এমন কি অসুখবিসুখে অতি কষ্টে দেহটাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়াও প্রতিদিন মাঠে কাজ করে। বিশ্রাম বা ছুটি বলিয়া কিছু ইহাদের নাই। কিন্তু এত খাটিয়াও হতভাগারা পেট ভরিয়া দু'টি খাইতে পায় না, এক টুকরা নেংটি ছাড়া পরণে একখানি কাপড় ইহাদের জোটে না। স্ত্রী ও কাচ্চাবাচ্চা লইয়া দিনের পর দিন ইহারা অভাব অনটনের মধ্যে হাবুডুবু খায়।

ইহাদের অবস্থা বোধ করি ক্রীতদাসের চেয়েও অধম। মানব সমাজের পায়ে ইহারা নিজেদের বিকাইয়া দিয়াছে, আর সমগ্র সমাজ নির্দয় প্রভুর মত ইহাদের উপর জুলুম করিতেছে। শরীরের রক্ত জল করিয়া যা' কিছু শস্য ইহারা পায় তার অধিকাংশই প্রভুর অন্যায় দাবী মিটাইতে নিঃশেষ হইয়া যায়, অবশিষ্ট যাহা থাকে তারও ন্যায্য দাম আদায় করিতে পারে না। একনিষ্ঠ পরিশ্রমের এই ত পুরস্কার!

কৈশোরে কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়া জয়ন্ত তাহাদের যে দুর্দশা নিজের চোখে দেখিয়াছে তাহা সে ভোলে নাই, কোন দিন ভুলিবেও না। সেই হইতে কৃষকদের প্রতি জয়ন্তের এমন একটা সমবেদনা জন্মিয়াছে যে, তাহাদের জন্য কিছু করিতে পারিলে সে ছাড়ে না।

ছেলেবেলায় কতদিন সে বাড়ি হইতে নারিকেল, কলা, আম, কাঁঠাল ও মুড়ি, চিড়া লইয়া গিয়া কৃষকদের খাওয়াইয়াছে। কতদিন সে নিজের জামাকাপড় ও মায়ের শাড়ী যাচিয়া দিয়া আসিয়াছে। মনে মনে ভাবিয়াছে বড় হইলে ইহাদের দুর্দশা সে ঘুচাইবে।

কিন্তু বড় হইয়া সে দেখে দেশের রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা কৃষকদের স্বার্থের এমন প্রতিকূল যে তার আমূল পরিবর্তন না হইলে তাহাদের দুর্দশা দূর হইবে না, দূর হইতে পারে না।

একজনের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া দয়া করিয়া তাহাকে একবেলা দু'টি খাইতে দেওয়াও যা, হৃতসর্বস্ব কৃষকদের আজ দু'টি ডালভাত বা দু' একখানা কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করাও ঠিক তাই, গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা মাত্র। ইহার সার্থকতা কতটুকু? মানুষের মত মানুষকে বাঁচিতে হইবে। সেই ব্যবস্থা করা দরকার। ধনীর কুকুর বিড়ালটা যেভাবে লালিত-পালিত হয়, কৃষক-মজুরেরা সেই সুখসাচ্ছন্দ্যটুকুও পায় না। ইহাই কি মনুষ্য জীবনের পরিণাম?

সমগ্র পৃথিবীর সম্পূর্ণ মানব সমাজের যাহারা স্তম্ভ-স্বরূপ, যাহাদের উপর ভর দিয়া মানব সমাজ দাঁড়াইয়া আছে, যাহারা মানুষকে রাজা, উজীর, সেনাপতি, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হইবার সুযোগ দিয়াছে, যাহারা না থাকিলে জমিদারের জমিদারি করা চলে না, ব্যবসাদারের ব্যবসা বলিয়া কিছু থাকে না, সরকারী আমলা-পয়লার অস্তিত্বই লোপ পায়, সেই কৃষক-মজুরদের নিতান্ত সোজা পাইয়া এই সব লোকই ছলে, বলে ও কৌশলে ইহাদের ক্রমাগত ঠকাইতেছে এবং তাহাদের ফাঁকিবাজি পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে ইহাদের মূর্খ করিয়া রাখিয়াছে, পাছে ইহারা বিদ্রোহ করে, এই আশঙ্কায় ইহাদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন চলিয়াছে।

এমন যদি কখনো হয়—কোন দিন যদি কৃষক-মজুরেরা হাত গুটাইয়া বসে—কোন দিন যদি ইহারা মৃত্যু পণ করিয়া বলে—'এই রহিল লাঙ্গল আর এই রহিল তোমাদের হাতুড়ি, আমরা ত মরিতেই বসিয়াছি—মরিব, এবার তোমাদেরটা নিজের হাতে করিয়া লও—পার খাও না পার উপবাস করিয়া মর', তাহা হইলে কোথায় থাকিবে সমাজ, কোথায় বা থাকিবে সভ্যতা,—সমাজ ও সভ্যতার সব কিছু তালগোল পাকাইয়া যাইবে,—তখন 'এ ব্যাটা চাষা আর ওই ব্যাটা মজুর'—এই পার্থক্যও থাকিবে না।

জয়ন্ত মনে মনে ভাবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম পার্থক্য কেনই বা থাকিবে? একজন চরিত্রবান ও কর্মঠ কৃষকের চেয়ে একজন দুশ্চরিত্র অলস ধনী কেনই বা বেশী সম্মান পাইবে? ধনসম্পত্তিই কি মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি।

পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন ধনীই নিষ্ঠুরভাবে অপরের ন্যায্য পাওনা না দিয়া নানারকম অসাধু উপায়ে ধনসম্পত্তি করিয়াছে। যেহেতু কৃষক অপরকে ঠকাইয়া খাইতে জানে না, অপরের ন্যায্য পাওনা না দিয়া টাকা জমাইতে পারে না, নিজেই কেবল ঠকে, সেই হেতুই কি সে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র?

তবে কি চুরি, জুয়াচুরি ও ডাকাতিরই জয়জয়াকার হইবে?

ঠিক তা'ও হয়ত নয়। চুরি, জুয়াচুরি ও ডাকাতি করিয়া যে আইনের চোখে ধূলি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে এ পৃথিবীতে তারই জয়জয়কার।

গরীব মানুষ খাইতে না পাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় একখানা রুটি চুরি করিয়া খাইলে তার সাজা হয়, কিন্তু ধনী ধনলিপ্সায় লিমিটেড কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা মারিলেও তার কিছু হয় না। পয়সার জোরে ধনী অনায়াসেই রেহাই পায়। ইহাদের মাসতুত ভাইরা যে পুলিশ বিভাগে এবং বিচারালয়েও আছে।

এই সব অসাধু ও অলস ধনীরা সমাজে মাথা উঁচু করিয়া

দাঁড়াইয়া আছে। ইহারা অসার আমোদ-প্রমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইতেছে আর যাহারা নিতান্তই সৎ ও পরিশ্রমী তাহারা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া দিগ্বিদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। অথচ অদৃষ্টের পরিহাসও এমনি, এই সব অসাধু ও অলস ধনীরাই সৎ ও পরিশ্রমী লোকের কাছে সততা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বুলি আওড়ায় আর ইহাদের ভণ্ডামি গরীবেরা নির্বিকার চিত্তে সহ্য করে।

জয়ন্ত কৃষক ও মজুরদের সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই তাহাদিগকে দাঁড়াইতে বলে। সে বলে প্রত্যেকের ন্যায়-সংগত দাবী যেমন করিয়াই হোক্ আদায় করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি চরম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—চরম দুঃখ ডাকিয়া আনিতে হয়—এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করিতে হয়—তাহাই করিতে হইবে।

শুধু বক্তৃতা দিয়াই জয়ন্ত ক্ষান্ত হয় না। আসন্ন সংগ্রামে যাহাদের সে নামাইতে চায় তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া সে আশার বাণী শুনায়, তাহাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করে।

সেদিন বক্তৃতার পর ঠিক সন্ধ্যার সময় জয়ন্ত স্থানীয় একটি কর্মীকে লইয়া কৃষক পল্লীর ভিতর দিয়া ফিরিতেছিল। এমন সময় দারুণ প্রহারের শব্দ ও নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

প্রহার ও ক্রন্দন যেন পাল্লা দিয়া চলিয়াছে।

জয়ন্ত কর্মীটিকে বলিল—'দ্যাখত হে, ব্যাপারখানা কি!'

কর্মীটি একটা বাড়ির দরজায় গিয়া হাঁকডাক সুরু করিল। সংগে সংগে প্রহারের শব্দও বন্ধ হইয়া গেল। একটু বাদেই এক বৃদ্ধ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কর্মীটি জিজ্ঞাসা করিল—'কি হে, বাড়িতে মারধর হ'চ্চে কেন?'

বৃদ্ধ কৃষক লজ্জিত হইয়া কহিল—'আমাদের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন বাবু—আমরা কি মানুষ—আমরা হয়েছি জানোয়ারেরও অধম।'

ইহার পর বৃদ্ধ আসল ব্যাপারটা বলিল।

ঘরে চাউল ছিল না, তাই রান্না হয় নাই। ছেলে মাঠ হইতে ফিরিয়া বউয়ের কাছে ভাত চাহিলে বউ রাগ করিয়া বলিয়াছিল, ভাত আনিয়া দিবে সে কোথা হইতে, নিজের দেহ বিক্রয় করা বাকী আছে, তাহাই করিবে নাকি। কথাটা সে অশ্লীল ভাষায় বলিয়াছিল, ইহাতেই ছেলে ক্রুদ্ধ হইয়া বউকে প্রহার করিয়াছে।

ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কৃষকটি কহিল—'মাঠে কাজ ক'রে ক'রে চাষীদের মেজাজ তিরিক্ষ হ'য়ে থাকে বাবু, তার ওপর না খাওয়া না দাওয়া'—

কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। জয়ন্ত সে কথায় কান না দিয়া বৃদ্ধকে দু'টি টাকা দিয়া প্রয়োজনীয় চাল ডাল আনাইবার জন্য তাহার ছেলেকে দোকানে পাঠাইয়া দিতে বলিল। কিন্তু টাকা লইতে বৃদ্ধ সম্মত হইল না। দারিদ্র্য তাহার যত কঠোরই হোক ভিক্ষা লইতে সে অভ্যস্ত নয়। জয়ন্ত তাহাকে বুঝাইয়া শুনাইয়া এক রকম জোর করিয়াই টাকাটা গছাইয়া দিল।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। প্রয়োজনই বা কি! স্বামীকে অশ্লীল ভাষায় তিরস্কার করা এবং স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা কৃষক মজুরের ঘরে সচরাচরই দেখা যায়। ক্ষুধার জ্বালায় যাহারা অহরহ জ্বলিয়া মরে তাহাদের কাছে সুরুচি ও সুনীতি প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র এবং তা' শিক্ষা দিতে যাওয়াও পাগলামি। আগে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে হইবে, তারপর আর সব। পেটের ক্ষুধা না মিটিলে মানুষ পশু ধর্মী হইতে বাধ্য, তাহার ক্ষুধা না মিটাইয়া তাহাকে উপদেশ দেওয়া আর চাবুক মারা একই কথা।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হইবে, জয়ন্ত ইহাই আশা করিয়াছিল, কিন্তু গড়াইল অনেক দূর। সচরাচর এতদূর গড়ায় না।

পরদিন সকাল বেলা জয়ন্ত ঘুম হইতে উঠিলে সেই কর্মীটি আসিয়া সংবাদ দিল, যে-লোকটি কাল সন্ধ্যার সময় তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছিল, সে শেষ রাত্রে তাহার স্ত্রী, শিশুপুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করিয়া নিজে থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কেন যে এতগুলি লোককে সে হত্যা করিয়াছে এ সম্বন্ধে লোকটি বলিয়াছে, পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা নাই বলিয়া হত্যা করিতে সে বাধ্য হইয়াছে।

দোকানদার পূর্বের পাওনা বাবদ টাকা দুইটি রাখিয়া চাল ডাল আনিবার জন্য দিয়াছিল, তাহা লইয়া সে দোকানে গিয়াছিল, কিন্তু দোকানদান পূর্বের পাওনা বাবদ টাকা দুইটি রাখিয়া চাল ডাল দিতে অস্বীকার করে। ফলে দুইজনের মধ্যে বচসা ও মারামারি হয়। শেষ পর্যন্ত লোকটি শূন্য হাতেই বাড়ি ফিরে। উপবাস না করিয়া তাহাদের আর উপায় থাকে না।

বাস্তবিকই এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের একমাত্র কারণ অনাহার। দিনের পর দিন অনাহারে জীর্ণ হইয়া তিলে তিলে মরার চেয়ে ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মরা ঢের ভাল, এই মনে করিয়াই লোকটি তাহার নিতান্ত প্রিয়জনদের হত্যা করিয়াছে। কত দুঃখে ও কত যন্ত্রণায় যে লোকটি এই ভয়াবহ কাণ্ড করিয়াছে তাহা ধারণা করা যায় না।

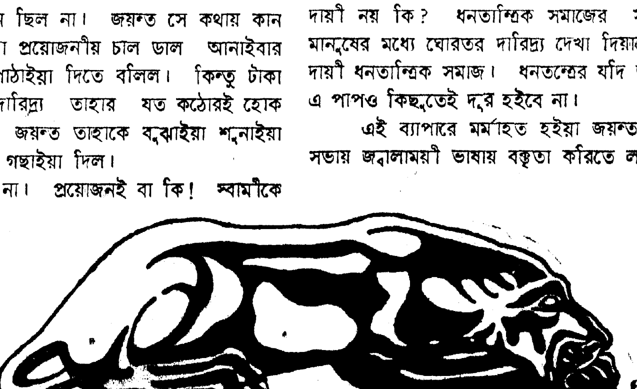
সবাই বলাবলি করিতেছে ওই লোকটির প্রকৃতি এরূপ ছিল না। বরাবরই তাহাকে শান্তশিষ্ট দেখা গিয়াছে। কোনদিন কাহারো সংগে কলহ বা মারামারি করা দূরে থাক মনোমালিন্যও করে নাই। মস্তিষ্কের সাময়িক বিকৃতি ঘটিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় সে এই কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।

মস্তিষ্কের সাময়িক বিকৃতি ছাড়া আর কি!

কিন্তু এই শান্তশিষ্ট নিরীহ লোকটি যে এত বড় হত্যাকাণ্ড করিয়া বসিল ইহার জন্য দায়ী কে? দারিদ্র্য, অনশন ও সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি যে কারণে ঘটিয়াছে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য উহাই দায়ী নয় কি? ধনতান্ত্রিক সমাজের সুবিন্যস্ত চক্রান্ত জালেই মানুষের মধ্যে ঘোরতর দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে,—এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ধনতান্ত্রিক সমাজ। ধনতন্ত্রের যদি উচ্ছেদ না হয়, তাহা হইলে এ পাপও কিছুতেই দূর হইবে না।

এই ব্যাপারে মর্মাহত হইয়া জয়ন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষক সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ





জার্মানীর বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বোমা বর্ষণের জন্য চ্যানেলের উপর দিয়া বিমানপোত অতিক্রম করছে



ভারতের পূর্ব অঞ্চলে মণিপুরে রাস্তার উপর মোটর যানবাহনের দৃশ্য

নূতন বাড়

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য

দেখতে দেখতে মোক্ষদার এ হল কী? সে দিনের কচি মেয়ে মোক্ষদা আজ এত দাম্ভিকতা পেল কোথা থেকে? অবশ্য, গরীবের মেয়ে বড়লোকের সংসারে প্রবেশ করলে অনায়াসেই অতি অল্প দিনের মধ্যেই দাম্ভিক হয়ে উঠে, অনেক পারিবারিক ইতিহাসে এ কথা লেখা আছে। আর তার দোষই বাকী? এ সংসারে মোক্ষদা প্রবেশ কর্লেন যখন, রূপলাল তখন সামান্য কেরাণী মাত্র। কিন্তু মাত্র ৪ বছরের মধ্যে বধূ মোক্ষদা গিন্নিপনার প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন যখন, স্বামী তখন অফিসের বড়বাবু। দারিদ্র্য কাকে বলে, তার বিষ যে কি, অনায়াসেই মোক্ষদা ভুলে গেলেন। দারিদ্র্যকে এখন তিনি বিলাসিতা বলেই মনে কর্তে আরম্ভ করেছেন। কেউ খেতে পায় না শুনলে মোক্ষদার হাসি পায়। খেতে পায় না—তার একমাত্র কারণ সে অলস। মোক্ষদা আজ তাই মনে করে। সংসারে অনেক পরিবর্তন—যে বাড়িতে ফুলদানীর বিলাস ছিল না, সে বাড়িতে দেশ-বিদেশ থেকে অন্তত ডজন খানেক ফুলদানী আনা হয়েচে। জানালার পর্দা যে বাড়িতে ছিল "বড়লোকের বিলাস দ্রব্য" সে বাড়িতে এক এক ঋতুতে এক এক রঙের জানালার পর্দা পড়ল। জানালার ধারে বাগানের পলাস গাছে ফুল ফুটেছে। মোক্ষদা জানিয়ে দিলেন, সবুজ পর্দা এখন আর চলে না। ফলে বিকালেই চলে এল লাল পর্দা। বাগানে পলাসের লাল ফুল, জানালায় লাল পর্দা, মিলিয়ে বেশ একটা পটভূমিকা রচিত হল।

রূপলাল বলল ঃ তোমার মন বেশ আর্টিস্টিক মোক্ষদা।

মোক্ষদা কৃতার্থ হল।

একটা চাকরেই এতদিন চলত। কিন্তু মোক্ষদার মনে হল, বাড়িটায় লোকজনের একান্ত অভাব। সর্বক্ষণ ব্যস্ততা এবং হৈচৈ, কলহ এবং কলরবেরও যেন প্রয়োজন আছে। তা' ছাড়া দোতলার ঘরে যে চাকর ঝাঁটা দিবে, নীচের বাগানে জল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এল আরও দু'টি চাকর, আরও দুটি ঝি। হাঁ এতদিনে বাড়িতে বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব এসেছে।

মোক্ষদা বলল ঃ পৃথিবীর সেদিনের কথা মনে কর্তে পারো, মোক্ষদা, যেদিন অরণ্য ছিল প্রান্তর রূপে, পাখি ছিল আকাশে, নদীতে ছিল স্রোত—মানে সবই ছিল, কিন্তু এক জিনস ছিল না—সে মানুষ—অর্থাৎ মানুষের কলরব। তাই বুঝি বাড়িতে ঝি চাকরের হাট বসিয়েছ?

মোক্ষদা মোটেই লজ্জিত হল না এ জন্য। বরং আবদার করে বলল ঃ শহরের বাইরে একটা বাড়ি না হলে তেমন ভাল লাগছে না।

—সবুর করো, চাকুরীর বাজারে আর একধাপ উত্তীর্ণ হ'তে দাও—তারপর গাড়ি আর বাড়ি, তার জন্য ভাবনা কী?

রূপলালের ভাল লাগে এ সমস্ত মোক্ষদার এ সকল আবদার—হাঁ, তার কাছে খুবই ভাল লাগে। এম্নি করে স্পষ্ট কথার জোয়ারে সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলা, রূপলালের বেশ লাগে কিন্তু।

এমনি করে চলল দীর্ঘ আট বছর। এ আট বছর কেটে গেছে জীবনকে বাহুল্যভারে জর্জরিত করে। যা কিছু প্রয়োজন ছিল না, দুজনে মিলে তাকেই প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলাই নাকি সভ্যতা। রূপলাল তাই মনে করে। শহরের বাইরে নূতন জমিতে বাড়ি উঠবে—ই'ট, কাঠ এবং আরও সাজসরঞ্জাম সেদিকে রওনা হচ্ছে আজ।

নূতন বাড়িটার গায়ে কি রকম রঙ দিতে হবে তা নিয়ে তাদের দুজনের গবেষণার অন্ত নাই। রূপলাল বললে, সাদা রঙে মানাবে ভাল। মোক্ষদা বললেঃ গোলাপী রঙটাই আজকাল ফ্যাসান—।

রূপলাল বললে ঃ যেটা সর্বসাধারণের পছন্দ সেটাই ফ্যাসান। আর যাই হতে পারি 'সর্বসাধারণের একজন' কদাপি হয়ে উঠতে পারব না। তাতে না থাকবে রুচি, না থাকবে সৌন্দর্যপ্রীতি।

রূপলাল তার বুর্জোয়াবুদ্ধির চরম প্রকাশে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল ঃ সৌন্দর্য এবং সুরুচি, এ কখনও জনসাধারণের জিনিস নয়। যাক গে, অনেক বুদ্ধি বিবেচনার পর স্থির হল, ছ'মাস দেয়া হবে রূপলালের পছন্দ মত রঙ; তারপর সেটা তুলে আবার ছ'মাসের জন্য রঙ বাতলে দেবে মোক্ষদা।

ঠিক এম্নি দিনে একদিন রূপলাল অপিস থেকে ফিরে এসে বলল ঃ আফ্রিকা চল্লাম মোক্ষদা। মোক্ষদা বিস্মিত হল। বলল আফ্রিকা! কেন কি ব্যাপার?

রূপলাল বিস্তৃত করে যা বলল সংক্ষেপে তা দাঁড়ায় এরূপ ঃ আফ্রিকায় একটা জঙ্গল পরিষ্কার করার কনট্রাক্ট তাদের অফিসের বড়বাবু নিয়েছেন। রূপলালকে সেটারই তদারকীর ভার নিতে হবে।

এবার আর মাসে তিন'শ টাকা নয়, তিন হাজার টাকা। এবার আর একটা বাড়ি নয়—বাঙলার বাইরে স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েকটা বাড়ি। এর পর থেকে তারা চেঞ্জে যাবে, মাণিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের পৈত্রিক বাড়িতে দু দশ দিনের জন্য নয়। এর পর থেকে তারা যাবে মুসৌরীতে—সময়মত জুহুতেও তাদের মন্দ কাটবে না। শুধু এখনকার মত আফ্রিকা পাড়ি দিতে পারলেই হয়।

মোক্ষদা বলল ঃ বেশ ত, কবে যাচ্ছ তুমি!

—তা, আর দেরী করে লাভ কী? আগামী হপ্তায় রওনা হওয়া কি ভাল নয়?

সাতটি দিন কেটে গেল—সাতটি মুহূর্তের মত। তারপর একদিন রূপলাল যাত্রা করল।

—এরপর আমাদের দেখা হবে ওয়ালটেয়ারে?

—আশা করতে পারো, জবাব দিল, রূপলাল।

দীর্ঘ সাত বছর পেরিয়ে গেছে। মোক্ষদার জীবনে রূপলাল আজ কোথাও নাই। শুধু যাত্রা করে যাবার মাস দুয়েকের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একদিন রূপলালের একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র এসেছিল। সে পত্রে রূপলাল বলেছিল, সে ভাল আছে। কাজ-কর্মও ভালই চলছে। বছরখানেকের মধ্যে সে একবার দেশে ফিরে আসতে পারে।

মোক্ষদা জবাবে লিখল ঃ বছরখানেকের মধ্যে তুমি আসবে এ আশায় আছি। ইতিমধ্যে বসন্তকালের উপযোগী করে বাড়িতে সবুজ রঙ দিবার কথা বলেছি। তুমি হয়ত এটা পছন্দ করলে না। সে যাক্, তুমি এসে তোমার পছন্দ মত নতুন রঙ দিয়ো—মোক্ষদার দীর্ঘ পত্রের সংক্ষিপ্ত জবাবও আসে নাই।

তারপর দীর্ঘ সাত বছর সেদিন পেরিয়ে গেছে। পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তনের সাথে মোক্ষদার জীবনে ও পারিপার্শ্বিকতায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। বাড়িতে নূতন আর কোন রঙ পড়ে নাই। বর্ষা বাদলা ও ঋতু পরিবর্তনের জন্য সবুজ রঙ উঠে গিয়ে ফ্যাকাসে, বিবর্ণ একটা স্থায়ী রঙ আপনা থেকেই পড়েছে। আঙিনায় এখনও ইট, কাঠ, শুরকির স্তূপ পড়ে আছে। নূতন বাড়ি আজ পুরানো হয়ে উঠেছে; পুরানো বাড়ি আরও পুরানো হতে চলেছে। জানালার পর্দা বদলানো হয় নাই পুরোপুরি এক বছর। পাখীর খাঁচাগুলোই পড়ে আছে পাখী নাই। কিন্তু তার জন্য কী? মোক্ষদা জানে, একদিন আবার সমস্ত কিছুই আসবে, আসবে দ্বিগুণতর হয়ে। শুধু রূপলালের একবার খবর পেলেই হয়। আবার ফুলদানীগুলি টেবিলের উপর যথাস্থানে অনায়াসেই চলে আসবে—লাইব্রেরীতে বই-

গ্লো আবার যথাস্থানেই উঠে আসবে। শুধু, রূপলাল ফিরে আসুক। মোক্ষদা প্রতিশোধ নেবে আবার। যারা আজ বলে মোক্ষদার রুচি নাই—যারা আজ বলে রূপলালকে সে পথে বসিয়েছে, তাদের মোক্ষদা সেদিন মুখের উপর জবাব দিয়ে আসবে। মোক্ষদা কোন-দিন কারু তোয়াক্কা রাখে নাই—সেদিনও রাখবে না। কিন্তু.........।

একখানা অজানা হাতের চিঠি। চিঠি বলা ভুল—আইনগত নোটিশ মাত্র। তাতে সতীশচন্দ্র বসু নামক একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি লিখেছেন আপনার স্বামী আফ্রিকা যাবার কালে যে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করেছিলেন—দু-মাসের মধ্যে তা পরিশোধ করতে না পারলে বাধ্য হয়েই আমাকে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। মোক্ষদা জ্বলে উঠল। আইনের আশ্রয়! বেশ ত নাও না। কিন্তু আফ্রিকা থেকে যেদিন ফিরে আসবেন রূপলাল মিত্র, সেদিন কোথায় থাকবে তুমি শ্রীমান সতীশচন্দ্র বসু? মোক্ষদা চিঠিখানা সাতখণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালার পথে—তারপর একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল—।

একদিন কোথা থেকে কি যে ঘটল, পরবর্তী জীবনে মোক্ষদা তা' ভাল করে মনেও করতে পারে নাই। শুধু মনে আছে, কনিষ্ঠ সহোদর অমৃত, তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তোমার ভাবনা কি দিদি—এ বাড়ি না থাকে ক্ষতি কি তাতে? আমার বাড়ি কি তোমারও নয়?

মোক্ষদা কোন জবাব দেয় নাই। ট্রেন তখন হুহু করে নদী, অরণ্য, প্রান্তর পেরিয়ে চলছে। তার দিকে তাকিয়ে মোক্ষদার কেবলই মনে হয়—আফ্রিকা। সেখানে রূপলাল আছে, রূপলালের স্বপ্ন আছে। তাদের পুরানো বাড়ি নিলাম করে নিল যারা, নূতন বাড়িতে মোক্ষদা তাদের দরোয়ান রাখবে। শুধু একবার আসতে দাও রূপ-লালকে। তারপর প্রতিশোধ নেবার পালা!

তারপর আজ আবার দীর্ঘ আট বছর কেটে গেছে। এ দিনে মোক্ষদার খোঁজ করলে দেখা যায়, অমৃতলালের বাড়ির নীচতলায় একখানা অন্ধকার কুঠরীতে মোক্ষদা আছে। কিন্তু মোক্ষদা নয়, মোক্ষদার প্রেতাত্মা। সে প্রেতাত্মা এক এক সময় জীবনের দিকে তাকায়—কিন্তু জীবনের যা' কিছু সমস্তই মোক্ষদাকে এড়িয়ে চলে। বাড়ির দোতলা, তিনতলা, কি আশেপাশে, সকল সময়ে কর্ম ব্যস্ততা, লোকজনের আনাগোনা, কোনদিন বা মেয়ের বিয়ে ছেলের অন্নপ্রাশন; কিন্তু কেউ মোক্ষদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। মোক্ষদার ঘরের কাছ দিয়ে উপরের দিকে সিঁড়ি উঠে গেছে। সেই সিঁড়িতে গভীর রাত্রিতে কাদের যেন পদশব্দ শুনা যায়। মোক্ষদা উঠে আসে, জানালার পাশে দাঁড়ায়—জিজ্ঞাসা করে যায়? কেউ কোন জবাব দেয় না—জবাব দিতে চায় না।

খাটের উপর অমৃতলালের ছ'মাসের ছেলেটি হাত পা ছুঁড়তে থাকে। মোক্ষদা যায়, আদর করে, কখনও বা জড়িয়ে ধরে। ছেলেটি খিলখিল করে হেসে উঠে। মোক্ষদা আর একটু আদর করে।

বাইরে বালক বালিকাদের খেলাধুলা এবং কলরব। এক একবার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় তারা কৌতূহলী হয়ে সমস্ত কিছু দেখে—আবার সবাই মিলে অট্টহাস্য করে উঠে।

—এ তুমি কি করছ, পিসিমা, বুড়ো বয়সে 'ডল'টাকে নিয়ে খেলা করছ!

মোক্ষদা অর্থহীন, বিবর্ণ চোখে বাইরের দিকে তাকায়। 'ডল নাকি?' অশোক নয়! আমি ভাবছিলাম............।

—অশোককে মা কখন ত উপরে নিয়ে চলে গেছেন।

মোক্ষদার বিশ্বাস হয় না। 'ডল'টাকে আর একটু হাতড়ে দেখে—নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে মোক্ষদা অযথাই প্রাণ খুঁজে বেড়ায়—। চোখ দুটোকে এক এক সময় বিস্ফারিত করে সে সমস্ত কিছু দেখতে ধায়—কিন্তু দৃষ্টিহীন সে চোখের পাতায় পৃথিবীর কোন বর্ণনা বা বর্ণ প্রতিফলিত হয় না। মোক্ষদার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। তথাপি, যদি রূপলাল আসে আফ্রিকা থেকে মোক্ষদার চিকিৎসা হতে পারে। মোক্ষদা পৃথিবীকে আবার দেখবে—এর বর্ণ, এর বিলাস থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। শুধু রূপলাল আসুক—রূপলালকে আসতে দাও।

বাইরের সন্ধ্যাটা আজ করুণ। দিনান্তে আকাশ বিবর্ণ। তবু নিজের জানালার ধারে নিঃসঙ্গ বন্দী মোক্ষদা আজ আকাশের সকল ঐশ্বর্য, জীবনের সকল সম্পদকে দুহাতে মুঠি মুঠি করে ধরে নিতে চায়। সাধ্য নাই, কেউ তাকে বঞ্চনা করে—সাধ্য নাই, কেউ তাকে বলে, মোক্ষদা তোমার জীবন শেষ হয়ে গেছে।

বাইরে আকাশে বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদ—মোক্ষদা আজ আবার তার দিকে তাকাতে চায়। কিন্তু দীর্ঘ পনর বছর পর।

অমৃতলাল এসে বলে গেছে : জামাইবাবু কাল আসছেন, দিদি।

* * * *

—আসারকালে ইউরোপ ঘুরে এলাম মোক্ষদা—কটা হাল-ফ্যাসানের প্লানও নিয়ে এসেছি এই দেখ।

টেবিলের উপর সমস্তগুলি প্ল্যান মেলে ধরেছে রূপলাল। তার উপর নিজের চোখ দুটি মেলে ধরবার আপ্রাণ প্রয়াসে মোক্ষদা মেতে উঠল। কিন্তু অসহায় সে—তার কাছে পৃথিবীর কোন বর্ণ নাই, বর্ণনা নাই'। তথাপি, অনায়াসেই সে বলে ফেলল : কি হবে, প্লান দেখে? তুমি আমায় মুক্তি দাও এ বন্ধন থেকে, অনায়াসেই তুমি তা পারো।

রূপলাল তাকাল বাইরের দিকে। নিঃশব্দ, জনবর্জিত নীচের এই কোঠা থেকে উপরেরতলায় ছেলেদের কলরব শুনা যায়। আর সমস্ত কিছু নীরব—সেই নীরবতার মধ্য থেকে একবার অসহায় মোক্ষদার কণ্ঠ করুণ আকুতিতে বলে' উঠল : আমাকে নিয়ে চলো তুমি।

পৃথিবীতে চিরকালের মত বসন্ত আসছে, গ্রীষ্ম আসছে, শরৎ আসছে, হেমন্ত আসছে কিন্তু তা মোক্ষদার জন্য নয়। তথাপি, একটি হালফ্যাসানের নূতন বাড়ির বাগানে একদিন আবার দুইজনকেই দেখা গেল। একটা বেঞ্চির উপরে বসে অনায়াসেই রূপলাল জিজ্ঞাসা করল : বাড়িটা তোমার পছন্দ হল মোক্ষদা?

মোক্ষদার জবাব দিবার মত কিছুই নাই। কিন্তু আজ আবার সে চেষ্টা করল চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে দেখে নিতে। হাঁ, এই দিনে, অগ্রহায়ণ, কার্তিকে আকাশে নিশ্চয়ই নীল রঙ—সেই নীল রঙের সাথে মিলিয়ে বাড়ির রঙও কি নীল হওয়াই ভাল নয়?

জীবন চলছে অব্যাহত ছন্দময়তায়। হয়ত, এমনইভাবে আরও কতকাল চলবে, শেষ হবে না। কিন্তু আজ এই দিনে একজন তাকাচ্ছে এই বাড়ির দিকে, এ বাড়িকে অবলম্বন করে 'যা' কিছু সম্ভাবনা, তারই দিকে। আর মোক্ষদা? সেও তাকাল কিন্তু আর সে তাকাবে না। তথাপি তারা দু'জন প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এখানে পাশা-পাশি বসবে। দু'জনের যাত্রা দুদিকে—কিন্তু এই একটি মাত্র জায়গায় তারা মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে।

বাঙলার মৃৎশিল্প

অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্ত রায় এম এ

ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মাটীর জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই সব মাটীর জিনিস কেবল মাটীর হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে এক দিকে যেমন মাটীর সাধারণ জিনিসপত্র আছে, অন্য দিকে তেমনি পাথরের ঘটী-বাটী-থালি-গেলাস আছে, চীনা মাটীর রেকাব-পেয়ালী আছে, পোরসেলিনের (Porcelain) নানাবিধ দ্রব্যাদিও আছে এবং রং-বেরংয়ের পুতুল ও প্রতিমা আছে।

ভারতের এই শিল্প নূতন নহে। কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই শিল্পের আরম্ভ হইয়াছিল একথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু হারাপ্পা ও মহেঞ্জদোরার খনন কালে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দুই একটি চকচকে পালিশ করা মৃত্তিকা-নির্মিত পাইপের টুকরা, তৈজসপত্রের ভগ্নাংশ দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতের মৃৎশিল্প হিন্দু সভ্যতার চাইতেও প্রাচীন। তারপর বৌদ্ধ যুগের নানাবিধ প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ —এমন অনেক মাটীর জিনিসের টুকরা পাওয়া যায়, যাহা শুধু এক গৌরবোজ্বল স্বর্ণময় যুগের আভাষ আনিয়া দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে মৃত শিল্পের উচ্চতম উন্নতিরও প্রমাণ আনিয়া দেয়। বৌদ্ধ যুগের 'অহিংস নীতির' আওতায় পড়িয়া রাজ শক্তি শক্তিহীন হইয়া পড়িল। ফলে, বিদেশী শক, হূন, গ্রীক ইত্যাদির আক্রমণের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের রাজশক্তি কীটদষ্ট কাষ্ঠ-খণ্ডের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কলা, কৃষ্টি ও শিল্প লোপ পাইল কিনা কে জানে ?

কিন্তু আবার এক নূতন অধ্যায় আসিয়া দেখা দিল মোগল পাঠান যুগে। আজও ভারতের নানা স্থানে মৃৎ-শিল্পের যে সামান্যতম বিকাশ দেখা যায় তাহার বীজ হয়ত বপন হইয়াছিল মোগল যুগে আর না হয় পাঠান যুগে। যে সব সম্প্রদায় আজও নানাবিধ সুদৃশ্য কারুকার্যময় মাটীর জিনিস তৈয়ার করে তাহারা হয়ত যুগ যুগ ধরিয়া ইষ্টমন্ত্রের মত এই পেশাটুকু সযত্নে গোপন রাখিয়া আসিয়াছে। কালের করাল নিষ্পেষণে আজ হয়ত তাহারা প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাতেই জন-সাধারণের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। নাদিপুর, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের লাল রংয়ের চকচকে (Glazed) মাটীর জিনিস, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থিত আজিম-গড়ের এবং ভাগলপুর জেলার সুরাজগড়ের কালো ও রূপালী রংয়ের চকচকে মাটীর জিনিস, পাটনা ও সুরাটের 'বিদ্রীর' অনুকরণে প্রস্তুত মাটীর জিনিস, কোটা ও কৃষ্ণনগরের চিত্রিত মাটীর পুতুল ও প্রতিমা, রাজপুতানার অন্তর্গত 'ওমরাহ' স্থানের সোনালী রংয়ের মাটীর দ্রব্যাদি সত্য সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

অথচ এই সমস্ত দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে যে সমস্ত কাঁচা মালের প্রয়োজন তাহা এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং উহাদের প্রস্তুত প্রণালী এদেশে অজ্ঞাত নহে। যুগ যুগান্ত ধরিয়া এ দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত কুম্ভকার শ্রেণীর লোকেই তাহাদের পর্ণ কুটীরে প্রাচীনতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ সব জিনিস তৈয়ার করিয়া আসিয়াছে। আজ বিদেশীর প্রতি-যোগিতায় পড়িয়া মৃৎশিল্প শুধু কয়েকটি হাঁড়ি-কলসীতে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সর্বদা ইহা এই অবস্থায় ছিল না। এখন ইহার বিকাশ দেখা যায় শুধু গ্রাম্য কুম্ভকারের পর্ণ কুটীরে আর কয়েকটি আধুনিক শ্রেণীর কারখানায়। তাহাদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে ৮।১০টি বড় মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, বার্ন কোং—রাণীগঞ্জ; গোয়ালিয়র পটারিস্ লিঃ—গোয়ালিয়র; চুনার পটারিস্—মীর্জাপুর; থান পটারিস্—কাথিয়াবাড়; মহীশূর সরকারী শিল্প—বাঙ্গালোর; আর্ট পটারিস্—বেলঘরিয়া, কলিকাতা; হিন্দুস্থান পটারিস্ লিঃ—বেহালা, কলিকাতা; ভারত ফায়ার ব্রীক্স্ এণ্ড পটারী ওয়ার্কস—ঝরিয়া।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মাটী দ্বারা পাইপ, ইট, টালি ইত্যাদি নানাবিধ মাটীর জিনিষ তৈয়ারী করিয়া থাকে। কুমারধুবী ফায়ার ব্রীক্ এণ্ড সিলিকা ওয়ার্কস বেঙ্গল ফায়ার ব্রীক কোং পাথরের নানাবিধ দ্রব্যাদি এবং চকচকে পাইপ ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করে। বেঙ্গল পটারিস্ লিঃ চীনা মাটীর পেয়ালা, পিরিচ, ইলেকট্রীকের সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়া থাকে। ভারতের ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বোধ হয় বেঙ্গল পটারিস্ একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাঁহারা চীনা মাটীর নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সফলকাম হইয়াছেন। অল্প কয়দিন হইল টীচানাং পটারিশ লিঃ বলিয়া একটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের কর্মসূচী পুরোপুরি না জানিলেও তাঁহারা মৃৎ-শিল্পের যে কোন বিভাগে মনোনিবেশ করেন, সফলকাম হইবেন সন্দেহ নাই।

অথচ এই শিল্পের উপাদান নিতান্ত সাধারণ। মাটীর জিনিস তৈয়ার করিবার জন্য স্থানীয় লাল কালো ও হলুদে রংয়ের আটালো মাটীই যথেষ্ট। চক্‌চকে রং পালিশ করিবার জন্য সোহাগা, চুন, সীসা, দস্তা, মেগ্নেসিয়া, অক্সাইড ইত্যাদি নানাবিধ খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চীনা-মাটীর বাসন-কোসন তৈয়ারী করিবার জন্য সাধারণ মাটীর পরিবর্তে চীনা মাটী এবং কেয়োলীন (Kaolin)এর প্রয়োজন পড়ে। এদিকে চীনা মাটী ও কেয়োলীন ভারতে কোন কম নহে। আসামের গারো পর্বত, ডোরামুখ, বিহারের রাজমহল, মঙ্গলহাট, উড়িষ্যার সেরাইখলা, মাদ্রাজের বেলগাঁ, মহীশূর; যুক্তপ্রদেশের নৈনীতাল, আল্‌মোড়া, মীর্জাপুর, বোম্বাইয়ের রত্নগিরি, বাঙলার পাহাড়পুর, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চীনা-মাটী এবং কেয়োলীন পাওয়া যায়। এই সমস্ত মাটী রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখ গিয়াছে যে ইহারা কোন অংশেই বিদেশী মাটী হইতে নিকৃষ্ট নহে।

চক্‌চকে বার্ণিশ করিবার যে সব রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তন্মধ্যে সোহাগা, কেল্‌স্পার, সীসা ও দস্তাই প্রধান। সোহাগা তিব্বতে পাওয়া যায়; কেল্‌স্পার রাজপুতানার

তারাগড় পাহাড়ে এবং চূণ, কাটনী, বিস্‌রা, পুণা ও আম্বালা জেলাতে পাওয়া যায়। এতকাল রাসায়নিক সীসা ও দস্তা এদেশে বিদেশ হইতেই আমদানী হইত, সম্প্রতি কলিকাতার মেসার্স ডি ওয়াল্দি কোঃ (Messrs. D. Waldi & Co.) সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক সীসা ও দস্তা উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ দেশে যে ভাবে আজকাল চীনা মাটীর প্লেট-পেয়ালা ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রায় অর্ধ কোটী টাকার চীনা মাটীর বাসন-কোসন বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর আমদানী হইয়া থাকে।

বাঙলা দেশের আবহাওয়া, মাটী, জ্বালানী কাঠ ও কয়লা, কারিগর ইত্যাদির অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে মৃৎশিল্পের পক্ষে বাঙলা দেশ ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক উপযোগী। বাঙলা দেশের এমন কোন পল্লী নাই, যেখানে কুম্ভকারের জাতীয় কারিগর শ্রেণী পাওয়া যায় না। তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে মাটীর হাঁড়ী ও অন্যান্য নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে গোয়ারি কৃষ্ণনগরের খ্যাতি জগদবিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের পুতুল ও প্রতিমা ইউরোপ ও আমেরিকাতেও সমাদৃত হইয়া থাকে। এখানকার শিল্পীদের শিল্প-প্রতিভা বংশানুক্রমিক এবং আধুনিক কোন আর্ট স্কুলের শিক্ষা-প্রসূত নহে। অথচ ইহাদের পরিকল্পিত পুতুল ও প্রতিমাতে রূপ-স্রষ্টার যে প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে, প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে নবীন রূপ-সৃষ্টির যোগাযোগ হইলে হয়ত সোনায় সোহাগা হইত।

দেশে বৈজ্ঞানিক তরুণের অভাব নাই, কারিগরের অভাব নাই, মাটী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদিরও কোন অভাব নাই। এবং দেশে বর্তমান যুগে সৃষ্টির উন্মাদনা আসিয়াছে, বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার মত শক্তির উন্মেষ আসিয়াছে, এত কালের দেশী 'লাজুক' (Shy) ধনী তাঁহাদের অর্থ শুধু ব্যাঙ্ক এবং শেয়ারে না খাটাইয়া শিল্প ও সংগঠনে (organisation) খাটাইবার জন্য আজকাল উন্মুখ হইয়াছেন। সুতরাং এই সুযোগে যুগ পরিবর্তনের মাহেন্দ্রক্ষণে, যদি দেশের তরুণ আসিয়া এই সব জীর্ণ শীর্ণ শিল্পের মধ্যে নবীনতার সুরুচি ও সুষমার নব জীবন-প্রবাহ আনিয়া দেয় তাহা হইলে হয়ত একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হইবে, অন্য দিকে তেমনি একটি আবশ্যকীয় শিল্প সুষমামণ্ডিত হইয়া বাঁচিয়া উঠিবে।

বাঙলা ছন্দের ত্রিধারা

(৮২১ পৃষ্ঠার পর)

বর্ধিত ও প্রলম্বিত হইতে পারে বলিয়াই ইহাকে বলা হয় মুক্তক ছন্দ। অধুনা মাত্রাবৃত্তে 'অমিত্রাক্ষর' মুক্তক রচনার দিকে অতি-আধুনিক কবিদের বেশ আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পূর্বে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, বাঙলায় অক্ষরবৃত্ত স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই তিনটি প্রধান ছন্দ ছাড়া আরও তিনটি অপ্রধান ছন্দ আছে; তাহাদের নামকরণ হইয়াছে (১) দীর্ঘহ্রস্বমাত্রিক ছন্দ, (২) স্বরমাত্রিক ছন্দ ও (৩) প্রাস্বনিক ছন্দ। সংস্কৃতের নিয়মে স্বরের দীর্ঘহ্রস্ব ভেদ অনেকাংশে স্বীকার করিয়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শশিশেখর, নসীর মামুদ, ভারতচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, ভুজঙ্গধর, দিলীপকুমার প্রভৃতি কিছু কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। সে সমস্ত স্বল্পসংখ্যক সংস্কৃতপন্থী কবিতার ছন্দকে 'দীর্ঘহ্রস্বমাত্রিক' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

অসমমাত্রিক ছন্দে সূক্ষ্ম ধ্বনিলীলার সৃষ্টি করিতে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ স্বরমাত্রিক ছন্দের উদ্ভাবন করেন। পর্বমধ্যে স্বর-সংখ্যা ও মাত্রাসংখ্যা স্থির রাখিয়া এ ছন্দ গঠিত হয় বলিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে স্বরমাত্রিক। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই উভয় প্রণালীতেই স্বরমাত্রিক কবিতার ছন্দঃসাম্য সিদ্ধ হয়। স্বরমাত্রিকের উন্নততর প্রক্রিয়া হইতেছে প্রাস্বনিক ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দকে বাঙলায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ এ ছন্দের প্রবর্তন করেন। সংস্কৃতের গুরু (accented) স্বরের স্থানে যথানির্দিষ্ট পর্যায় অনুসারে যুগ্ম (closed) স্বরের প্রস্বন (stress) প্রয়োগ করিয়া তিনি বাঙলায় সংস্কৃতের ধ্বনিকল্লোল ও ছন্দঃস্পন্দ (rhythm) সৃষ্টির প্রয়াস পান। প্রাস্বনিক রীতিতে অনেক স্থলে ছন্দঃকৌশল (acrobatism) ও একঘেয়েমি (monotony of verse) অতিরিক্ত প্রকট হইয়া ওঠে সত্য; তবে শক্তিমান কবিগণ বিদেশী ভাষার বহুবিধ ছন্দকে প্রাস্বনিক পদ্ধতিতে বাঙলায় আমদানীর চেষ্টা করিলে তাহাতে আমাদের ছন্দঃসম্পদ বর্ধিতই হইবে।

আমিনা

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

কাছারী ঘরের পাশেই গোলাঘর—মাঝে মাত্র ছোট একটু উঠানের ব্যবধান। বারান্দায় বসিলে গোলাঘর পুরাপুরি দেখা যায়। মাটি হইতে কিছু উপরে কাঠের মেঝের উপর চাটাই বিছানো এবং ইহার চারিদিক ঘিরিয়া গোবর-মাটি দিয়া পুরু করিয়া লেপা তরজার বেড়া সোজা চাল পর্যন্ত গিয়া তবে থামিয়াছে। ছোট এক জানালা ব্যতীত আর কোন বিচ্ছেদ নাই। ভিতরে ঢুকিলে অতি গরম দিনের দুপুরে বেলাও ভাপসা, শীতল স্পর্শে এবং নিষ্প্রভ আভায় মন কেমন আড়ষ্ট হইয়া যায়। আলো বাতাস হইতে বিচ্ছিন্ন এই অবস্থায় ধানস্তূপের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলে, গৃধ্নুতার স্পৃহা দুর্বার হইয়া উঠে, এর লোক গভীর অতৃপ্তিতে বলিয়া বেড়ায়—আরো চাই, আরো চাই!

ব্যাপারীর দল কলরব করিয়া ধান মাপিয়া চলিয়াছে—একে, এক, দুই—দুই পুরা......এক ভার!

তারক চৌধুরী কাছেই বসিয়াছিলেন, কহিলেন—ধান তো মোটে এই; কিন্তু এ নিয়ে কি অশান্তিতে আছি এবার। ও বলে আমায় দাও, ও বলে আমায়।

মনধন তাহার অনুগৃহীত প্রজা, কহিল—"আজ্ঞা হ বাবু।"—"রোজ রাত্রে চোর হাঁটে, রোখ ঐ ধানের উপর—ভাবে কতো না জানি আছে। কাল রাত্রে দুটা চোঙ বসিয়েছিল।"

চোঙ বসাইয়া ধান চুরি করা একবিশেষ পদ্ধতি। গোলা-ঘরের বেড়ায় ছোট এক ছিদ্র করিয়া একটা বাঁশের চোঙ তেরছাভাবে বসাইয়া দেয়। কোন শব্দ নাই। কোন হাঙ্গামা নাই। চোঙের ভিতর দিয়া ধান সর সর করিয়া আসিয়া নীচের ঝুড়িতে বা কাপড়ে জড়ো হয়।

ব্যাপারী হাসিয়া কহিল—"চোরের বুদ্ধি আছে বাবু। এ বাড়িতে চোর না এলে বাড়ির যে অপমান হবে, বাবু। যার আছে তার-ই তো চোরের ভয়।"

মনধন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"অ, অ, ঠিক কথা। যার মাথা আছে, তার-ই ব্যথা!"

চৌধুরী মনে মনে খুশী হইলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ব্যাপারী চোরের যে তবে তোমার বাড়িও যেতে হয়।"

—"সে হিসাব ওদের আছে, বাবু! ছেড়া-কাঁথা চুরি করে ওরা বুঝেছে আমাদের কেবল নামটা-ই সার। ঢাকের মত বাজনা-ই বড় কিন্তু ভিতর ফাঁপা। ঐ দেখুন দল বেঁধে, আপনার কাছেই বোধ হয় এরা আসছে।"

চৌধুরী চাহিয়া দেখিলেন, পনের কুড়িজনের একদল ফটক পার হইয়া এই দিকে আসিতেছে। অগ্রভাগে ফকির, হাতে একটা তেল চক্‌চকে লাঠি। মৃদু গুঞ্জরণে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তাহারা যখন চৌধুরীর সামনে আসিয়া পেঁৗছিল, অজানা আশঙ্কার দুর্ভাবনায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কোন রকমে সংযত কণ্ঠে কহিল,—"কি খবর ফকির—ভালো আছো? বসো বসো।"

ফকির কহিল,—"সেলাম বাবু! এ বাড়িতে দাবী করেই আমরা বসতে পারি—এ জোর আমাদের আছে। এবার আপনার আশ্রয়ে আমরা বাঁচবো, এ ভরসায় বুক বেধে এসেছি বাবু।"

ব্যাপার কি ইহা বুঝিতে চৌধুরীর আর বাকী রহিল না এবং গভীর অসন্তোষে তাহার মন বিষাইয়া গেল। কিন্তু রাগ করিলেন না, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এতো লোক দেখে আমি ভয়-ই পেয়েছিলাম। কিন্তু ফকির, তোমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি—যা হোক কোন হাঙ্গামা বাধেনি।"

—"তা কিছু হয়নি কিন্তু হলে মরে বাঁচতাম। এখন আর বাঁচিনে বাবু। আজ এসেছি দয়া ভিক্ষা করতে, ছোট-বড় সবাইকে আজ দয়া করতে হবে।"

—"সাধু ফকিরেরা-ই দয়া সকলকে করে—দয়ার উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার! আজ দেখছি উল্টো—হায়, হায়, ব্যাপার কি ফকির।"

ফকিরও হাসিল, কহিল,—"সেদিন আর নেই বাবু। জলে এবার সব ধান নিয়েছে। সারা মাঠ জুড়ে এক মুঠো ঘাসও পাওয়া যাবে না। কি করে বাঁচবো, জানিনে বাবু।"

চৌধুরী কোন কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। ফকির আস্তে আস্তে বলিয়া চলিল—"আপনার কাছে এর জন্য আমরা সবাই এসেছি। একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। আপনার বলে দাবী করতে পারি, আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই! বাবু!"

চৌধুরী বলিলেন,—"কিন্তু আমার কি শক্তি আছে।"

—"ও কথা বলবেন না বাবু, এ অঞ্চলে সকলেই সে কথা জানে। কোন গাছের কাছে আশ্রয় পাবে, একথা বিপন্ন পাখীকে বলে দিতে হয় না,—নিজেই চিনে নেয়। আমাদের কিছু কিছু ধান দিন—নইলে বাঁচবো না। বাবু! বাবু!!"

ফকিরের কথা হইতে, তাহার বলিবার ভঙ্গি এবং আশ্রয়প্রার্থী দুই চোখের অসহায় দৃষ্টি হইতে এক করুণ আবেদন, বাতির চঞ্চল শিখার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং উপস্থিত দলের মৌন মুখ হইতে ক্ষরিত ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত আবহাওয়ায়, কপালের বক্ররেখাবলীর মধ্যে নিজের গম্ভীরতা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চৌধুরী বসিয়া রহিলেন।

কেহ কোন কথা বলিল না। কিছুক্ষণ পরে চৌধুরী বলিলেন —"কিন্তু।"

ফকির কহিল—"ধান আমরা ভিক্ষে চাইছিনে বাবু। ধার চাইছি। ধান যখন হবে, সুদ মিটিয়ে দিবো। উপরওয়ালা সাক্ষী—এ কথার খিলাব হবে না।"

উপস্থিত কয়েকজন প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"হাঁ বাবু।"

চৌধুরী কহিলেন—"তোমরা সবাই আমার কাছে এসেছো, কিন্তু এতো ধান আমার কোথায়। যা পাই তাতে কোনরকমে খাওয়া পরা চলে মাত্র।"

ফকির কহিল,—"একটু বেয়াদফি মাফ করবেন বাবু। আপনার কাজ আমরা করি, আমরা জানি ,কত ধান আপনি পান এবং কত ধান আপনি বিক্রি করেন। এবার বিক্রি না করে, আমাদের একটু দয়া করুণ বাবু।"

চৌধুরী একটু চুপ রহিয়া বলিলেন,—"তা হয় না ফকির। তবে আমার চলবে কি করে—হাতীর খোরাকও যেমন বেশী, ল্যাদাও তার বেশী। বেশ ভালই হয়েছে—তোমরা সবাই এসেছো—আমার খাজনা মিটিয়ে দাও।"

ফকির কোন জবাব দিল না, মাথা গুজিয়া বসিয়া রহিল। আর একজন কহিল,—"খেতে পাইনে, খাজনা কি করে দিবো।"

চৌধুরী বাঁকা-হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"তবে? এখন বুঝো—জয়গুরু! বেলা যে অনেক হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা বসো—!"

চৌধুরী উঠিয়া আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং আর ফিরিয়া আসিলেন না। চাকর জবানী বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখন স্নান করিতে গিয়াছেন, সন্ধ্যা করিবেন, খাইবেন এবং এর পর বিশ্রাম না করিয়া বাহির হইবেন না। তদুপরি তাঁহার শরীরও

বিশেষ ভাল নয়। ইহার নিহিত ইঙ্গিত কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না—হতাশায় হতবাক হইয়া সকলে স্থাণুর মত বসিয়া রহিল।

ফকির কহিল—"আর বলে কি হবে—চলো।"

ফকির ক্রুদ্ধ হইল বেশী। নিরুপায় হইয়া যে উপায়ের প্রার্থী তাহারা হইয়াছিল, তাহা শুধু প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যতার অপমান তাহারা ইহার সঙ্গে ফিরিয়া পাইয়াছে। অসহায় তাহারা, অবস্থার বিপর্যয়ে প্রপীড়িত তাহারা, লাঞ্ছনার অবধি নাই, কিন্তু তবু ফকির স্থির থাকিতে পারিল না। চৌধুরীর এই ব্যবহারে তাহার শরীর আগুন হইয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড ক্রোধে তাহার দুই চোখ মধ্যাহ্নের খরতাপ সূর্যের মত তীব্র হইয়া উঠিল।

বাড়িতে যখন আসিয়া পেঁৗছিল তখন বেলা পুড়িয়া গিয়াছে। আমিনা পাকের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, শব্দে জাগিয়া বাহিরে আসিল এবং ফকিরের মৌন রাগক্ষুব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা সরিল না।

আস্তে আস্তে কহিল,—"বাপজান।"

—"কি মা।"

—"তোমার কি হয়েছে।"

ম্লান হাসিয়া ফকির কহিল—"কি আর হবে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, স্নান করে আসি। এ কি তোর যে স্নান খাওয়া হয়নি।"

আমিনা নতমুখে কহিল—"না।"

—"এতো ঠিক হয়নি, কখন ফিরি তার ঠিক নেই—আমার জন্য না খেয়ে থাকলে যে তোর কষ্ট হবে মা। যা তুইও স্নান করে আয়।"

আমিনা কহিল—"আচ্ছা, তবে আমি যাই, তুমিও দেরী করো না।"

খাইতে বসিয়া কেমন আচ্ছন্নের মত ফকির মাথা গুঁজিয়া খাইয়া চলিল, হঠাৎ শূন্য হাড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমিনা! এ কি!"

আমিনা আস্তে আস্তে বলিল—"শরীর আমার ভাল নেই। খাবো না, তাই ভাত রাঁধি নি।"

একটু মৌন রহিয়া ঈষৎ হাসিয়া ফকির কহিল—"শরীর ভাল নয়, এ তো ভাল কথা নয় মা। সকলের অসুখে ফুঁ দিয়ে আমি বেড়াই, আর আমার ঘরে অসুখ হবে, এ হতে পারে না।—এই ভাতে আমি মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছি—তুই খা—অসুখ ভাল হয়ে যাবে—দে আচানোর জল দে।"

আমিনা সেখানে দাঁড়াইয়া কহিল—"তোমার যে খাওয়া হয় নি।

—"এতেই আমার চলবে, কিছু না খেয়ে থাকলে যে সত্যি তোর অসুখ করবে।"

একটু থামিয়া ফকির বলিল—"আমার কাছে এ সব কথা লুকিয়ে লাভ কি মা।"

ঘরের দাওয়ায় ফকির চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সামনে চারিদিকে সোঁ সোঁ বাতাসে উল্লাস-মুখর হাওরের ঢেউ! হাহাকার ও অনশন-ক্লিষ্টতার সর্বনাশী করাল ছায়ায় মুহ্যমান বিপুল মৌন-ব্যাপ্তির মধ্যে ঢেউগুলির কলকল ছলছল শব্দ নিষ্ঠুর হাসির মত তাহার কানে আসিয়া বাজিল। দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে ইহার পরিণাম কি, ইহা সে ভাবিয়া পাইল না এবং এই সঙ্গে যখন আমিনার কথা মনে পড়িল সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, অথচ কি যে করিবে ইহাও সে ভাবিয়া পাইল না। কোমল অথচ নিঃস্করুণ এক ভাব তাহার দৃঢ় শক্ত স্নায়ুগ্রন্থি শিথিল করিয়া বিহ্বল বিমূঢ়তায় তাহার মনকে পূর্ণ করিয়া দিল। সারেঙ্গী নিয়া বাজাইতে বসিল, কিন্তু তাহার শীর্ণ আঙুল শুধু কাঁপিয়া গেল, কোন সুর বাহির হইল না।

একবার ডাকিল,—"আমিনা।"

আমিনা তখনও ঘুমায় নাই, কাছে আসিয়া বসিল। আমিনার দিকে একবার চাহিয়া ফকির কহিল—"একটা কথা তোকে আমি বলবো ভেবেছি; বল তুই রাগ করবি‍নে।"

আমিনা মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমি খুব বদরাগী, না বাবা!"

ফকির অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আমি সে কথা বলছি নে।"

—"তোমার উপর কোনদিন আমি রাগ করি নি, কিন্তু আজ আমার কথা না শুনলে সত্যি রাগ করবো।"

—"কি কথা মা।"

আমিনা একটু চুপ রহিয়া আস্তে আস্তে কহিল—"আমার বিয়ে বন্ধ করে দাও।"

ফকির এই কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না, অবাক হইয়া কহিল—"কি বলছো!"

—"হ্যা বাবা, যা বলছি সত্যি। দেশ জোড়া এই দুঃখের দিনে এ বিয়ে মানায় না; তা ছাড়া এই দিনে তোমাকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না।"

ফকিরের চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল, কোন রকমে চাপিয়া কহিল—"কিন্তু জাফরকে যে কথা দিয়েছি।"

—"এতে কথা তোমার যাবে না,' দুদিন পরে বিয়ে হবে।"

ফকির কহিল—"কিন্তু দুঃখ যে এতে আমার আরো বাড়বে। দুবেলা তোকে খেতে দিতে পারি নে এবং অভাবে তোর বিয়ে বন্ধ করতে হলো, এ ব্যথা কি কম মা।"

আর কোন কথা ফকির বলিতে পারিল না। উন্মত অশ্রুর ভারে সব কথা চাপা পড়িয়া গেল। আমিনা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, আস্তে আস্তে কহিল—"অভাব শুধু তোমার একার নয় বাবা!"

ফকির কহিল—"সেইটেই তো বেশী চিন্তার কারণ মা"

আমিনা পাক করিতেছিল; লাকড়ি ভিজা, ধুয়ায় ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাঁশের চোঙ দিয়া ক্রমাগত ফুঁ দিয়া চলিয়াছে। লম্বা তেল-অভাবে রুক্ষ্ম চুলের মাঝে মাঝে ছাই লাগিয়াছে।

এমন সময় জাফর আসিয়া ডাকিল—"আমিনা।"

আমিনা ঘরে বসিয়া জবাব দিল—"আমিনা বাড়িতে নেই।"

জাফর হাসিয়া কহিল—"তবে আর কি। ফকির সাহেবও বাড়ি নেই, তবে চলে যাই!

আমিনা বাহিরে আসিয়া কহিল—"যাবি না ছাই—দাঁড়িয়ে কেন বস্।"

আমিনার দিকে চাহিয়া জাফর হাসিয়া কহিল—বা "বেশ সুন্দর লাগছে।

—"সুন্দরকে সুন্দর লাগবে, এতো নূতন কথা নয়।"

"ইস খুব যে অহংকার।"

—"করলাম-ই বা একটু; দোষ কি। কিন্তু এই মাছ পেলি কোথা।"

জাফরের হাতে গোটা দুই ছোট-বোয়াল ও শোল মাছ দড়িতে গাঁথা ছিল, কহিল—"কাল বিলে গিয়েছিলাম। আমি, বিপিনের বেটা হরিচরণ আর ছোট ঘরের চাচা। মাছ নেই—সারাদিনে ধরেছি মাত্র এক ঝাঁপি—শোল বোয়াল, লাটি—এই সব।"

ভাল মাছ তাহারা অনেক দিন খায় নাই—মকার গুড়া ও আজে-বাজে মাছ ছাড়া কিছুই বড় মিলে না। এই মরা বিবর্ণ মাছের দিকে চাহিয়া খুশীর দীপ্তিতে তাহার চোখ উজ্জ্বল হইয়া আসিল।

কহিল—"দুপুর বেলা, আর মরতে যাবি কোথা। এখানেই চারটে খেয়ে যাস।"

জাফর হাসিয়া কহিল—"মরতে কোথাও যেতে রাজী নই। আর তোর হাতের রান্নার উপর আমার দাবীও সহজে ছাড়ছি নে।"

অন্য সময় হইলে, আমিনার মনখোলা অবাধ হাসির স্রোতে চারিদিক আনন্দ মুখর হইয়া উঠিত। আজও হাসিতে চেষ্টা করিল কিন্তু মেঘাবৃত চন্দ্রকিরণের মত তাহার ক্ষীণ হাসি ঠোঁট প্রান্তে আসিয়াই বিলীন হইয়া গেল এবং একটা চাপা ব্যথার দুঃসহ যন্ত্রণা প্রাণপণে চাপিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দেহকান্তি নিষ্প্রভ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। জাফরের চোখে ইহা অতি সহজেই ধরা পড়িল, অবাক হইয়া কহিল—"তোর কি হয়েছে।"

আমিনা চুপ করিয়া রহিল এবং অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে কহিল—"ভেবেছিলাম তোকে বলবো না কিন্তু না বলেও উপায় নেই। কিন্তু তোকে একটা কথা দিতে হবে।"

—"তোকে অদেয় আমার কিছুই নেই ; কোন দিন না বলিনি আজও বলবো না।"

—"দেওয়া আমাকে কিছুই নয়। দুঃখ জয় করবার শক্তি আজ আমি তোর কাছে প্রার্থনা করছি। যা বলবো, শান্তভাবে তা মেনে নিতে হবে।"

জাফর কোন কথা বলিল না। আমিনার ধীর, শান্ত অথচ ব্যথাভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমিনা আস্তে আস্তে কহিল—"বিয়ে এবার আমাদের হবে না, এর মাঝে আর কেউ নেই, আমিই বাবাকে বারণ করে দিয়েছি।"

জাফরের মুখ নিমেষে কালো বিবর্ণ হইয়া গেল। অভিভূতের মত কহিল "কেন।"

জাফরের দিকে চাহিয়া আমিনার মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইতে চাহিল না, জমাট বাধিয়া ভিতরেই রহিয়া গেল। প্রচণ্ড ঝড়ের পর প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মধ্যে পরাজয়ের গ্লানিতে সব কিছু সুন্দর যেমন চাপা পড়িয়া যায়, বিপুল দুঃখের ভারে জাফরের যৌবন-দীপ্ত বলিষ্ঠ দেহের তেজ-গরিমার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। মাথা গুজিয়া বসিয়া রহিল।

আমিনা কহিল—"দেশের এই অবস্থাতে বিয়ের কোন সুখই থাকবে না বরং দুঃখের বোঝা হয়ে আরো দুঃখকেই ডেকে আনবে। এই যাঃ—ভালকথা—ভুলেই গেছি। ঘরে চাল নেই। বিনি ভাতে তোর পেট ভরবে না—তোকে এখনি একটু বেরুতে হবে।"

জাফর কোনমতে ম্লান হাসিয়া কহিল—"তবে একটু ঘুরে আসি।"

আহারের পর ফকির কোন কথা বলিল না। এমন কি তাহার সামনে বসিয়া যখন জাফর মাথা গুজিয়া নীরবে আহার করিয়া গেল, ফকির তাহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না এবং বাহিরে আসিয়া যখন তামাক নিয়া বসিল, তখন নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিল না। আমিনার সুখের দিনের যে কল্পনা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল, বিরাট দুঃখের আঘাতে, ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে দেখিয়া ক্ষোভে, নিষ্ফল ক্রোধে তাহার মন স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার ধূসরম্লান মহাআশঙ্কায় ম্রিয়মাণ চারিদিকের পানে চাহিয়া তাহার অটল দৃঢ় মনের সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল এবং দুঃখচঞ্চল অস্থিরতায় মন পূর্ণ হইয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইল, একটা লাঠি হাতে নিয়া ডাকিয়া কহিল—"আমিনা আমি বাইরে যাচ্ছি; ফিরতে বোধ হয় রাত হবে।"

ফকিরের মুখের দিকে চাহিয়া আমিনা ভয় পাইল, সামনে আসিয়া কহিল—"বাপজান।"

—"কি বেটি।"

—"কোথায় যাচ্ছ।"

—"ব্যাপারীদের নৌকায়—ওদের ধান কিনতে বারণ করবো।"

ফকিরের দুই হাতে ধরিয়া আমিনা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"না, তুমি যেতে পারবে না।"

ফকির আশ্চর্য হইয়া গেল অপলক দৃষ্টিতে আমিনার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে কহিল—"কোন ভয় নেই মা, আমি ওদের কিছু বলবো না।"

—"কিন্তু......।"

—"সত্যি বলছি—কোন হাঙ্গামা করবো না। হাতজোড় করে বলবো, ধান তোরা কিনিস নে। আসি মা—ঘরে যা।"

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক একাকার হইয়া গিয়াছে। দেখিল, বহুদূরে অল্পস্থান বিস্তৃত বেশী অন্ধকারের বুক ভেদ করিয়া কয়েকটি ঋজু আলোর রেখা জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং গানের সুরে আমিনার বুঝিতে বাকী রহিল না, এই স্থানেই ব্যাপারীদের নৌকা নোঙর গাড়িয়াছে। সেই-দিকে চাহিয়া কি এক আশঙ্কায় তাহার ভিতর শিহরিয়া উঠিল এবং মুখ ফিরাইয়া দেখিল, জাফর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কহিল—"তুই এখানে যে।"

জাফর কহিল—"তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো! আমিনা!"

—"বল।"

জাফর কথাটা বলিতে গিয়া পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া আমিনার এক হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"আমি কি দোষ করেছি।"

আমিনা নিজেকে মুক্ত করিবার কোন চেষ্টা করিল না। স্পর্শের আরাম-অলস ভাবটি কাটাইয়া কহিল—"দোষ কারো নয় ; অদৃষ্টকে মেনে নিতে হয়।"

—"কিন্তু অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, তোকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না।"

—"এতে আমারও কি কম কষ্ট হচ্ছে—জাফর।"

—"তবে চল—আর কোথাও আমরা চলে যাই।"

আমিনা স্তব্ধ হইয়া জাফরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করিয়া জোর করিয়া বলিয়া উঠিল—"এ হয় না জাফর।"

—"আমিনা।"

—"না, না, এ হয় না, তুই চলে যা, জাফর তুই চলে যা। মাগো!"

জাফর আর সেখানে থাকিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

প্রেম-আকাঙ্ক্ষী মনের ক্ষণ দুর্বলতাকে চাপিতে গিয়া প্রবল উত্তেজনায় আমিনা কিছুই ভাবিতে পারিল না। চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশির একটানা শব্দের মধ্যে, একটা বিরাট হাহাকার তাহার মনকে আকুল করিয়া তুলিল। নিঃস্ব, নিরবলম্ব মনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া অশ্রুতে তাহার চোখ ভরিয়া গেল এবং তাহা রোধ করিতে পারিল না। শ্রাবণের অবিরল ধারার মত তাহা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কান্নায় —ভারি এক বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ভবিষ্যতের সুখ-উজ্জ্বল জীবনের মধুর কল্পনার সমস্ত স্থানে ব্যাপ্ত এক অন্তহীন অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহার শিথিল হাতের মুঠি শক্ত হইয়া আসিল। উপর দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে কহিল,—"ভগবান, শক্তি দাও! শক্তি দাও!"

কবিতা

শাশ্বতী

শ্রীগিরিজাপতি সান্যাল

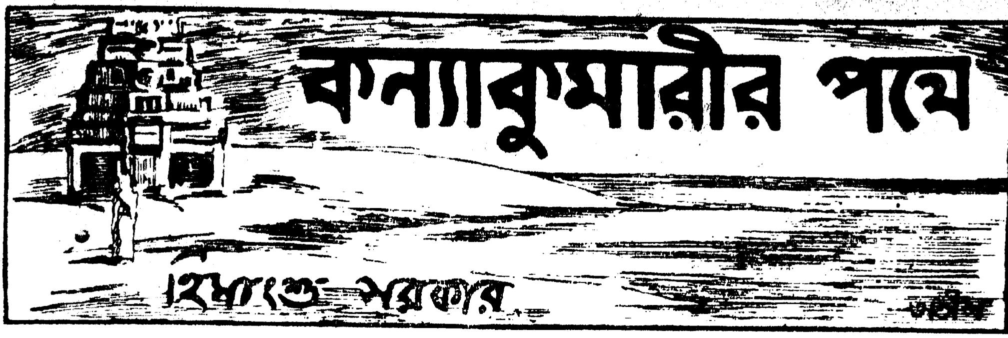
স্তরে স্তরে কেশভার নামে—নীল আকাশের গায়ে
মেঘের সজ্জার মতো, দেয় শোভা স্থির বিদ্যুতের
অপরূপ মুখখানি; কালো ঘন পল্লবপ্রচ্ছায়ে
বড়ো বড়ো আঁখি দুটি টেনে ঢলে স্নিগ্ধতার জের।
পূবে হাওয়া দুলাইয়া দিল তার কালো কেশপাশ,
অঙ্গে অঙ্গ-সন্ধুক্ষিত উতলা সুগন্ধি সমীরণ
বহিয়া আসিল হেথা ক্লেদসিক্ত মৃদুল সুবাস
বরষা নারীর মতো সুষমায় ভরি সারা মন।
মনে হলো পুঞ্জীভূত সৌন্দর্যের বিষণ্ণচ্ছটায়
দিগন্তের বুকে লাগা সন্ধ্যার কালিমা রেখাসম
রেখায়িত ওইরূপ প্রদোষের মলিন আভায়,
একরতি অতি ছোট কালো তিলে ওই মুখকম
আরো কমনীয় হয়ে অন্তর দুলায়ে তোলে মোর—
নামায় আঁখির পাতে স্বপনের অঞ্জন ঘোর।

দিন

গোপাল ভৌমিক

প্রেতায়িত অন্ধকারে
এইসব ভাঙাচোরা অন্ধ খোঁড়া দিন
রাত্রি শেষে ঝ'রে পড়া
এরা যেন শিউলীর ফুল ঃ
বাতাসের মৃদু ঘায়ে
এরা যেন নিতান্ত চঞ্চল—
একান্ত দোদুল।
এমন নরম দিন কাম্য নয় মোটে ঃ
আমি ত চেয়েছি দিন জমাট পাথর
যার ঘায়ে আকাশ সাগর
হবে কম্পমান—
আমার দিনেরা হবে নিরেট পাষাণ।

বরফ-জমাট দিন
অন্ধকারে কেঁদেকেঁদে ফেরে ঃ
আমি তার পেয়েছি খবর
মায়া-পাহাড়ের পারে তাহাদের ঘর।
এ কঠিন অভিযান তাই নিরন্তর।



১১

টিনাভেলী স্টেশন এস, আই, আর-এর একদিকের শেষ রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনটা খুব বড় নয়। মাঝারি গোছের স্টেশন। তাছাড়া অন্যান্য জংশন স্টেশনের চেয়ে বেশ নিরিবিলি। এখানকার স্টেশন মাস্টারের অনুমতি নিয়ে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র নিয়ে গেলাম। ওয়েটিংরুমটা বেশ বড়, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা এবং ভাল স্নানাগারের বন্দোবস্ত আছে। আমরা রাত্রে ওয়েটিংরুমের ভেতর এবং উন্মুক্ত আকাশের তলায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম।

ভোর বেলায় উঠে আমরা ভাঁড়ারের বাক্স খুলে ইকমিক কুকারে ভাতে-ভাত সিদ্ধ করবার জোগাড়ে লাগলাম।—কারণ আমরা যখন কন্যাকুমারীতে পেঁছিব, তখন আর দুপুরের খাওয়ার কোন বন্দোবস্তই করা যাবে না। সেখানে এমন কোন হোটেলও নেই যে, সেখানে আমরা খেতে পারব। তাই দুপুরের খাওয়াটা এইখানেই কোন রকমে শেষ করবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

খাওয়া শেষ করে আট-টার ভেতর আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ঠিক করা গেল যে, দুদিনের জন্য যখন কন্যাকুমারী যাচ্ছি এবং ফেরার সময় আবার এই টিনাভেলী হয়েই ফিরতে হবে, তখন সঙ্গে আমাদের সমস্ত জিনিস না নিয়ে শুধু খুব সামান্য বিছানা-পত্র, দু'চারটে কাপড় জামা নেওয়া যাক। অন্য জিনিসগুলো স্টেশন মাস্টারের জিম্মাতে স্টেশনের গুদামে রেখে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা গেল।

প্রায় সাড়ে আট-টার সময় মোটর বাস স্টেশনে আমাদের নেবার জন্য এলো। বড় জিনিসগুলো বাসের ছাদের ওপর তুলে দিয়ে ছোট খাট জিনিসগুলো ভেতরে আমাদের বসবার জায়গার নীচে রেখে বাসে চড়ে বসলাম। স্টেশন থেকে কিছু দূর এসে স্ট্যান্ডএ বাসটা দাঁড়াল। স্ট্যান্ডএ প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে শুনে আমরা বাস থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম যে, প্রায় সব বাসই কাঠ কয়লার দ্বারা চালানো হয়। বাস গুলো খুব ভাল নয়। দুপাশই খোলা। ক্যানভাসের পর্দা দুপাশে ফলে দরকারের সময় রৌদ্র এবং বৃষ্টি আটকানো হয়। বাসের ভেতরে সামনের দিকে মুখ করে চারজন করে বসবার মত টানা লম্বা সিট্। পাওনিয়ার বাস সার্ভিস নামে একটা কোম্পানীর একচেটে ব্যবসা। এখান থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মাথাপিছু ভাড়া এক টাকা করে'।

বাস্ স্ট্যান্ডএ আসবার পর বাস চালক বলেছিল যে, ঠিক ৯টার সময় বাস ছাড়বে। কিন্তু ছাড়বার সময় এই ছাড়ছি—ছাড়ব করে' প্রায় ১০টার সময় বাস ছাড়ল। তাছাড়া স্টেশনে আমাদের জিনিস বাসে তোলবার সময় বলেছিল যে, আমাদের মালের জন্য কোনরূপ ভাড়া দিতে হবে না—কিন্তু স্ট্যান্ডএ এসে আমাদের মালের জন্য ভাড়া দিতে হবে বল্ল। কিন্তু আমরা জোর করে বল্লাম যে, আমরা


কন্যাকুমারীর সমুদ্রের দৃশ্য

মালের জন্য কোনরূপেই ভাড়া দেব না—কারণ আমাদের সঙ্গে এরূপ কোন কথা হয়নি; তখন তারা আর কিছু বল্ল না। এই সব দেখে এইটেই মনে হোল যে, এদের পরিচালনার মধ্যে অনেক গলদ আছে।

কন্যাকুমারীকে আমরা সকলেই "কেপ্ কমরিন" বলে জানি। ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আমরা জানি যে কন্যাকুমারী ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের শেষে, এটা একটা অন্তরীপ। ভারতবর্ষের নীচের দিকে বলেই আমরা অনেক সময় কন্যাকুমারীকে ভারতবর্ষের পাদদেশ বলি। কন্যাকুমারী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধীনে। এই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য একটি করদ রাজ্য, ভারতবর্ষের পশ্চিমে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। টিনাভেলী যেমন পূর্ব ধারের এস, আই, আর-এর শেষ-রেলওয়ে স্টেশন, সেইরূপ পশ্চিম ধারের এই এস, আই, আর-এর শেষ-রেলওয়ে স্টেশন ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রাম। ভারতবর্ষ ঘিরে যে সব সমুদ্র রয়েছে তাদের সংমিশ্রণ হয়েছে এই কন্যাকুমারীতে। পূর্ব

দিক থেকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিম দিক থেকে আরব সাগর এসে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে মিশেছে। কন্যাকুমারী থেকে আরম্ভ করে' আরব সাগরের পাড় ধরে' এই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য চলে গেছে। সারা ভারতবর্ষের করদ রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্য সমৃদ্ধিশালী। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই রাজ্য অনেক দিক দিয়েই উন্নতি করেছে। এর জন্য বর্তমানের ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ এবং দেওয়ান বাহাদুরের মহৎ প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে হয়।

কন্যাকুমারীতে পূর্ব এবং পশ্চিম, দুপাশ থেকেই যাওয়া যায়। কিন্তু কোন দিক থেকেই কন্যাকুমারী পর্যন্ত কোন রকম রেলওয়ে সংযোগ নেই। কন্যাকুমারীতে যেতে হলে, হয় টিনাভেলী আর না হয় ত্রিভেন্দ্রাম পর্যন্ত রেলে করে এসে, তারপর মোটর বাসে করে' যেতে হয়। যাতায়াতের জন্য মোটর বাসই একমাত্র যান। টিনাভেলী থেকে কন্যাকুমারীর দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল এবং ত্রিভেন্দ্রাম থেকে দূরত্ব প্রায় ৫৪ মাইল।

আমাদের বাস টিনাভেলী শহর ছাড়িয়ে চলল। শহরের বাহিরে কিছুদূর আসার পর একটা নদীর ওপর একটা পাকা সুন্দর ব্রীজ পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। সমস্ত রাস্তাটা খোয়া পাথরে বাধান। রাস্তার বাঁ দিকে মিশনারীদের একটা স্কুল এবং ডান দিকে মূক বধিরদের স্কুল। এর পর থেকে রাস্তার দু পাশে বড় বড় বটের গাছ চোখে পড়ে। প্রত্যেকটা গাছের গুঁড়িতে সংখ্যা দেওয়া আছে। বোধ হয় সংখ্যা দেওয়া থাকার দরুণ গাছগুলো দেখা-শোনা করবার সুবিধা হয়। বাস চলেছে—বাম পার্শ্বে যতদূর চোখ যায় অনন্ত প্রসারিত মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে তাল, নারকেলের শ্রেণী। প্রায় সমস্ত জমিই চাষ আবাদ করা হয় দেখলাম। ডান দিকে পূর্ব ঘাটের পর্বতমালা মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ সেদিক্ তাকিয়ে থাক্‌লে মনে হয়, যেন বাসের সঙ্গে এরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে। পর্বতমালা এক-একবার রাস্তার খুব কাছে এগিয়ে এসেই—দূরে সরে যাচ্ছে। ছোট বড় পাহাড় মিলে এই পর্বতমালা। পাহাড়গুলো বেশীর ভাগই পাথর এবং কাঁকড়ে ভর্তি। এই জন্য পর্বতমালাতে গাছপালা বেশী চোখে পড়ে না।

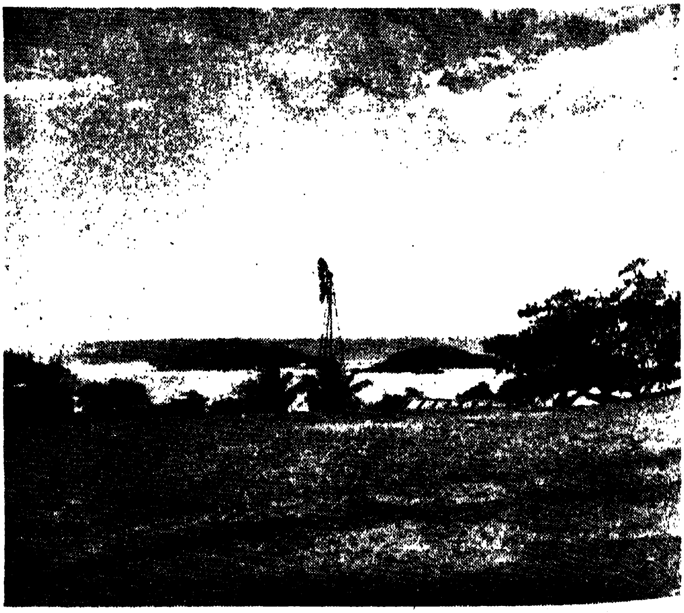
২০ মাইল একটানা চলে প্রায় ১১টায় আমরা নাগুনারী নামে একটা গ্রামে এসে থামলাম। পরে শুনলাম যে, এটাকে তোত্রাদ্রিও বলে। এটা একটা ছোট গ্রাম। প্রায় ১৫ মিনিট বাস দাঁড়াবে শুনে আমরা রাস্তার ওপরের একটা কফিখানায় ঢুকে এক কাপ করে' কফি খেয়ে নিলাম। তোত্রাদ্রিও থেকে বাস আবার ছাড়ল। রাস্তার দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে আর এর মাঝে ছোট ছোট গ্রাম চকিতের জন্য ছুঁয়ে আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম।

প্রায় ৩০ মাইল আসার পর পানাগুড়ি বলে একটা গ্রামে এসে বাস থামল। এখানে ছোট নারায়ণের মন্দির আছে। কিছুক্ষণ এখানে বাস দাঁড়াবে শুনে এবং বাস যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে মন্দিরটা কাছেও শুনে আমরা এই সুযোগ ছাড়লাম না। আমরা সকলে ছোট নারায়ণের মন্দির দেখতে গেলাম। অনেকে আবার এটাকে রামলিঙ্গের মন্দির বলে। মন্দিরটা ছোট। অনেককালের পুরানো এবং সংস্কারের অভাবে আরো বেশী পুরানো দেখায়। ছোট একটা মন্দিরে নারায়ণের মূর্তি রয়েছে—আর আসল মন্দিরে শিবের লিঙ্গ মূর্তি রয়েছে। এখান থেকে বাস ছেড়ে প্রায় ৩৬ মাইল আসার পর দুটো রাস্তা পেলাম। একটা রাস্তা নাগরকোয়েলের দিকে গেছে—আর একটা রাস্তা কন্যাকুমারী পর্যন্ত গেছে। এই দুই রাস্তার সংযোগ স্থল থেকে কন্যাকুমারী ১৫ মাইল।

এই রাস্তায় ৯ মাইল আসার পর বাসটা রাস্তার এক পাশে দাঁড়াল। শুনলাম এর পর থেকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সীমানা আরম্ভ। এতক্ষণ আমরা ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানার মধ্যে ছিলাম। রাস্তার ডান পাশে ত্রিবাঙ্কুর রাজার কাস্টম্ অফিস রয়েছে। একজন কর্মচারী এসে যাত্রীদের সব জিনিস-পত্র পরীক্ষা করে এবং দরকার হলে প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে তবে যাওয়ার অনুমতি দেয়। আগেই মোটর চালকের কাছে শুনেছিলাম যে, প্রয়োজনের বেশী তামাক জাতীয় জিনিস থাকলে সেগুলো আটক করে। আমরা এর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। কিন্তু কর্মচারী যখন শুনল যে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিতত্ত্ব সংক্রান্ত ভ্রমণে বের হয়েছি—তখন সে আর আমাদের জিনিস পরীক্ষা না করে এবং কোন রকম প্রশ্ন না করেই আমাদের যাবার অনুমতি দিল।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করার পরই যেন রূপ বদলে যায়। রাস্তার দুপাশে ধানের ক্ষেতে ভর্তি। গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ি মাটীর তৈরী—ওপরে নারকেল পাতার ছাউনী দেওয়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বাড়ির সামনে এবং আসে পাশে নারকেল গাছ। আরও কিছু দূর এগোবার পর সমুদ্রের নোনা হাওয়া গায়ে এসে লাগতে লাগল। প্রায় ১১ মাইল আসার পর আর একটা রাস্তা ডানদিক থেকে এসে আমরা যে রাস্তা ধরে চলছি, সেই রাস্তার সংগে মিশেছে। এই রাস্তাটা ত্রিভেন্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারী আসবার রাস্তা। আরো প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর সমুদ্র দেখতে পেলাম। এর অল্পক্ষণ পরেই প্রায় ১-১৫ মিনিটে আমরা কন্যাকুমারী পেঁৗছলাম।

কন্যাকুমারীতে ভ্রমণকারীদের থাকবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অতিথিশালা, কয়েকটা ইউরোপীয়ান হোটেল ছাড়া একটা সাধারণ ধরণের চোলট্রি আছে। আমরা অতিথিশালায় জায়গা পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা না করেই এই চোলট্রিতে এসে নামলাম। অতিথি-শালায় জায়গার চেষ্টা না করার কারণ যে এখানে সব সময় এত



কন্যাকুমারীর চোলট্রি থেকে সমুদ্র দূরে সমুদ্রের ভিতর বিবেকানন্দ পাহাড়

লোকের ভীড় থাকে যে—জায়গা পাওয়া কষ্টকর। তার চেয়ে আরামে চোলট্টিতে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল। এই চোলট্টিতে থাকবার জন্য কোন রকম পয়সা দিতে হয় না। এটা একটা একতলা বাড়ি। একটু উঁচু জায়গায় এটা অবস্থিত বলে, চোলট্টি থেকে সামনে তাকালেই সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়। আমরা থাকবার জন্য চোলট্টিতে একটা ঘর পেলাম। ঘরে জিনিস-পত্র রেখে আমরা সমুদ্রের পাড়ের দিকে রওনা দিলাম।

চোলট্টির পাশ দিয়ে একটা পিচ্ দেওয়া রাস্তা সমুদ্রের ধার পর্যন্ত চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে খানিকটা যাওয়ার পরই রাস্তাটা একটা সুন্দর প্রশস্ত সমতল জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এই সমতল জায়গাটা পার হয়ে এখানকার সাধারণের স্নানের ঘাট। স্নানের জন্য একদিকে পুরুষদের আর একদিকে মহিলাদের বন্দোবস্ত আছে। মহিলাদের স্নানের জায়গায় একটা পাকা বড় ঘর আছে। পুরুষদের সেরকম কোন বন্দোবস্ত নেই।

হয় না। এই কারণে স্নানের ঘাটে ভাল করে পাথর দিয়ে প্রাচীরের মত ঘেরা রয়েছে। এতে স্নানের সময় অনেক বিপদ কম হয়। এছাড়া সমুদ্রের ধারেই একটা বেশ বড় পাথর দিয়ে বাঁধান চৌবাচ্চা আছে। এখানে স্বাস্থ্যান্বেষী ইংরেজ এবং রাজা মহারাজারা এসে সমুদ্র স্নান করেন। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা এবং ঢেউয়ের সঙ্গে এই চৌবাচ্চার জল বাড়ে কমে।

সাধারণের স্নানের জায়গাটা ওপর দিক থেকে ধাপে ধাপে জলের দিকে নেমে গেছে। প্রত্যেকটা ধাপের চারপাশ বেশ শক্ত করে পাথর দিয়ে বাঁধান। জোয়ারের সময় এই ধাপ গুলোর একটা কি দুটো জলে ডুবে যায়।

স্নানের ঘাটের কাছেই কন্যাকুমারীর মন্দির। সমুদ্রের দিক থেকে একটা মন্দিরের প্রবেশদ্বার আছে। এটা পূব মুখে। এই দরজা এখন সব সময়ই বন্ধ থাকে। উত্তর দিককার দ্বার দিয়ে এখন



কন্যাকুমারীর রাস্তায় একটি গ্রাম

কন্যাকুমারীর সমুদ্র সব সময়েই খুব অশান্ত। বড় বড় ঢেউ পাড়ের ওপর এসে ভেঙ্গে পড়ে। সমস্ত পাড় জুড়ে জলের ভেতর ছোট বড় ডোবা পাথরে ভর্তি। ঢেউ গুলো পাড়ের ওপর আসবার আগে এই সব পাথরের ওপর প্রথমে আছড়ে পড়ে।

"তটের পায়ে মাথা কুটে
তরঙ্গ দল ফেনিয়ে ওঠে
গিরির পাদ মূলে,"

পুরীর দিকের সমুদ্রে বৎসরের কোন সময়ই এরকম অশান্ত ঢেউ দেখতে পাওয়া যায় না। প্রায় দোতালা সমান এক একটা ঢেউ যখন পাড়ের দিকে গর্জন করতে করতে ছুটে আসে তখন তার দিকে তাকিয়ে সত্যই মনে ভয় হয়। ঢেউ পাথরের ওপর আছড়ে জল ছেটানর সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের ধারে যারা থাকে তারা জলের ছাঁটে ভিজে যায়।

সমুদ্রে এই রকম ঢেউয়ের জন্য সব জায়গায় স্নান করা সম্ভব

মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সমুদ্রের দিকের দরজা বন্ধ থাকার কারণ সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়।

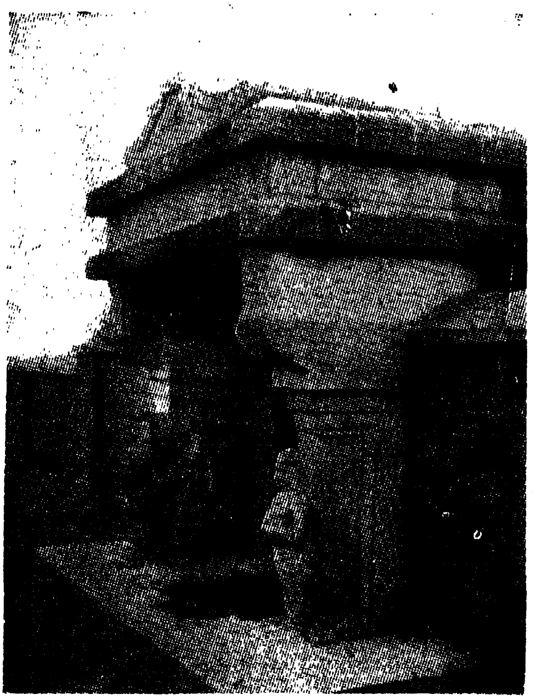
অনেককাল আগে যখন এই দিককার দরজা খোলা থাকত তখন সমুদ্র থেকে মূর্তির কপালে এবং থুতনীর ওপরের দুটো পাথর এ রকমভাবে জ্বলতো যে জাহাজের নাবিকেরা এটাকে আলোক-স্তম্ভের আলো বলে মনে করত। মন্দির এবং মূর্তি এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সমুদ্রের দিকের পূব দরজা খোলা থাকলে মূর্তির অঙ্গাস্থিত পাথরের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি সমুদ্র থেকে দেখা যেত। একদল নাবিক মন্দিরের ঐশ্বর্যের কথা এবং মূর্তির অঙ্গাস্থিত বহু-মূল্য পাথরের কথা জানতে পেরে একদিন মন্দির লুঠপাঠ করে মূর্তির অঙ্গের হীরক খুলতে গিয়ে সেখানে দেবমূর্তির প্রভাবে চলত শক্তি রহিত হয়ে পড়ে। এর পর থেকেই এই সমুদ্রের দিকের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এখনও মূর্তির কপালে এবং থুতনীর ওপর দুটো বহুমূল্য

হীরক দেখতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে সামান্য প্রদীপের আলোকে হীরক দ্বটো এত সুন্দর জ্বলে যে বহু দূরে থেকে এটা লক্ষ্য করা যায়। পূবে দিকের দরজা সকালবেলা খুললে প্রথম সূর্যের আলো মূর্তির ওপর এসে পড়ে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই দিককার দরজা খোলা হয়। আমরা ঠিক করলাম যে সন্ধ্যাবেলা মন্দির দেখতে যাব—কারণ সন্ধ্যার পর মন্দিরের দ্বার খুলবে।

আমাদের সাহস কিছু বাড়াতে আমরা এবার জলের ধার ঘেষে চলতে লাগলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটায় যে কপড় জামা ভিজে যেতে লাগল, সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। অবাক হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সমস্ত জায়গায় কি সুন্দর শান্তি বিরাজ করছে। মনে হয় অনন্তকাল ধরে এই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিই। এতে কোনদিনই ক্লান্তি কিংবা বিরক্তি আসবে না।

একটু দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটা বেশ বড় পাহাড় দেখে জানলাম যে এটাকে বিবেকানন্দ পাহাড় বলা হয়। বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম জীবনে কন্যাকুমারীতে এসে সমুদ্রের মধ্যে এই পাহাড় দেখে তার সাধনার স্থানরূপে পছন্দ করেন। কিন্তু তখন তার কাছে এমন



কন্যাকুমারীর মন্দিরের প্রবেশ দ্বার

পয়সা ছিল না, যা দিয়ে তিনি নৌকা করে ঐ পাহাড়ে যেতে পারেন। বিনা ভাড়ায় যখন কোন নৌকাওয়ালাই যেতে রাজী হল না, তখন বিবেকানন্দ সাঁতার দিয়েই ঐ পাহাড়ে গিয়ে পেৌঁছলেন। যে মানুষের জীবনে বড় হবার প্রেরণা আছে—তার কাছে কোন বাধাই বাধা বলে মনে হয় না। এর পর তিনি এইখানেই বসে ভগবানের সাধনা আরম্ভ করেন এবং মুক্তির পথ দেখতে পান। মনে মনে বঙ্গের বীর সন্তানকে প্রণাম করে ভাবলাম যে, বিবেকানন্দ তাঁর সাধনার জন্য উপযুক্ত স্থানই নির্বাচন করেছিলেন। সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে এই বীর সন্ন্যাসীর ভৈরবস্বরে আহবান বাণী শুনতে পেলাম—"কে মুক্তি-কাম নির্ভীক বীর আছ মোহময় সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও, জাগ্রত হও।"

সমুদ্রের ধার দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে খানিকদূরে এগিয়ে একটা মস্ত উঁচু বালির পাহাড় পেলাম। বালির পাহাড়ের ওপর উঠে দেখি যে, তার মাঝে মাঝে নারকেল গাছের হয় শুধু মাথাটা আর না হয় পাতার অংশ দেখা যাচ্ছে।

সমুদ্রের পাড়ে এক সময় হাওয়ার গতি কিছুক্ষণ কিংবা কিছুকালের জন্য একদিকেই বইতে থাকে। যখন এই হাওয়ার গতি কিছুকালের জন্য একদিকেই থাকে তখন সমুদ্রের বালি সেই দিক থেকে উড়ে আসতে আরম্ভ করে। এই সময় যদি এই বালি কোন কিছুতে বাধা পায় তা হলে সেই স্থানে এই বালি জমা হতে আরম্ভ করে। তারপর ধীরে ধীরে এই বালি জমা হতে হতে এক বালির পাহাড় গড়ে ওঠে। আবার বৎসরের অন্য ঋতুতে অথবা অন্য বৎসরে হাওয়ার গতি বদলে গিয়ে আর একদিকে হাওয়া বইতে পারে। তখন সেই দিকে ঠিক আগের মতই আর একটা বালির নতুন পাহাড় গড়ে উঠতে পারে। অনেক সময় আগেকার বালির পাহাড়ের সব বালি উড়ে গিয়ে সেই জায়গা পূর্বের মত সমতল স্থান হতে পারে।

এই নারকেল গাছগুলোর চারপাশে ধীরে ধীরে বালি জমা হতে হতে এগুলো এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে। নারকেল গাছগুলোর অবস্থা দেখে কষ্টই হতে লাগল। এদের যেন চারদিক থেকে বালি টুঁটি চেপে ধরে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। আর এরা অসহায়ের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সমুদ্রের ধারের যে রাস্তাটা ধরে আমরা যাচ্ছিলাম তার ডান পাশে কিছু দূরে দূরে দু-চারখানা সুন্দর বাড়ি দেখতে পেলাম। এইসব বাড়ির মধ্যে কোনটা রাজা মহারাজার বাড়ি কোনটা ইউরোপীয়ান হোটেল—আবার কোনটা বা গির্জা। বাড়িগুলো এরূপভাবে তৈরী আর সমস্ত জায়গার মধ্যে ছড়ান রয়েছে যে, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এগুলো বেশ মানানসই মনে হচ্ছিল। এদিকটায় সমুদ্রের ধারে খুব বেশী বাড়ি না থাকার কারণ বোধ হয় যে এদিকে বাড়ি তৈরী করার অনুমতি সম্বন্ধে কড়াকড়ি আছে। যাই হোক, এই অল্প বাড়ি থাকায় ভালই লাগে—মানুষ যদি একবার নিজের ইচ্ছা এবং সুবিধামত বাড়ি করতে আরম্ভ করে তাহলে এখানকার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

কন্যাকুমারীতে খুব বেশী লোকের বাস নেই। সমুদ্রের ধারে এ দেশীয় ধীবররা বাস করে। সমুদ্র থেকে মৎস্য শিকার করেই এরা এদের জীবিকা উপার্জন করে। পুরীর সমুদ্রে ধীবররা ছোট ছোট ডিঙি নিয়ে মৎস্য শিকার করে; কিন্তু এদিকে দেখলাম যে, ছোট ছোট ডিঙির বদলে কাঠের ভেলার ওপর ৮।১০ জন চড়ে দাঁড় ঠেলে ঢেউ-এর ওপারে গিয়ে মৎস্য শিকার করে। এরা এত বেশী অভ্যস্ত যে এত বড় বড় ঢেউ তারা অনায়াসেই এই সামান্য ভেলা করে পার হয়ে যায়। মাছ ধরার পর সেগুলো এরা রৌদ্রে শুকিয়ে রাখে। এই শুকনো মাছ দিয়ে এরা বৎসরের খাবার কাজ চালায় এবং বাকি মাছ বাজারে বিক্রি করে।

ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিম সমুদ্রে অস্ত গেল। আকাশ বিচিত্র রং-এ ভরে উঠল। ক্রমে সমস্ত জলেস্থলে সন্ধ্যা নামল—সমস্ত আকাশ তারায় ভরে গেল। আবছা জ্যোৎস্নার আলো সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত মিলে মনে মোহের সৃষ্টি করে। মনে পড়ল—

"সূর্য হতে ঝরে ধারা চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান, যত প্রাণ,
ভেসে আসে সেই স্রোতো ভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধু পারে।"

সন্ধ্যার পর আমরা মন্দিরে যাওয়ার জন্য সমুদ্রের ধার থেকে সকলে চোলাট্রিতে ফিরলাম।

ক্রমশ

জীবনের উন্নয়ন

আপনারা যে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেছেন, তা বড়ই জটিল। দার্শনিক পরিভাষার দিক থেকে আমার দুর্বলতা আছে; দর্শন শাস্ত্র আমার কিছুই পড়া নেই, আমার সামান্য জ্ঞানে যেটুকু বুঝতে পারি, সেইটুকুই আপনাদের কাছে বলতে চেষ্টা করতে পারি মাত্র। আসল কথা হ'ল এই যে, সব সাধনার সাফল্য নির্ভর করে জীবনের ধারাটা একেবারে বদলে ফেলার ওপর। অধ্যাপক রাধাকিষণ কিছুদিন আগে বেনারসে একটি বক্তৃতায় এ কথাটা ভেঙে বলেছেন। কাজ করলাম অনেক, কিন্তু সেই যা ছিলাম, তাই থাকলাম, তবে লাভ হ'ল কি? 'শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াৎ যস্তস্য যত্নঃ শ্রমমেব কেবলং' এত কাজ করেও যদি চারিদিক থেকে ভয়েই জড়সড় মেরে থাক্‌তে হ'ল, কখন কি যাবে, কখন কি গেল এই চিন্তাতেই পঞ্চপ্রাণ থাক্‌লো যদি তটস্থ হ'য়ে, তবে যত কাজ সব পণ্ড শ্রম হয়েছে মনে করতে হবে। ভবিষ্যতের একটা ভ্রান্ত আশা—বড় জোর একটা অনুমান, জীবনের ধারাকে বদলাতে পারে না। জীবন স্বীকার করে শুধু প্রত্যক্ষতার সঙ্গে পাকাপাকিভাবে সংযোগকে। এটি হ'লে জীবনের ধারা তবে বদলে যায়। শান্তিকে নিত্য এবং সত্য করতে হ'লে এটি করতে হবে। ভয়ের থেকে যেতে হবে অভয়ত্বে, ক্ষয়ের থেকে যেতে হবে জয়ের দিকে, মৃত্যুর থেকে যেতে হবে অমৃতত্বের পথে। কি ক'রে এটি সম্ভব হতে পারে? অনুমানের স্তর ছেড়ে প্রত্যক্ষ সুখের সূত্রকে শক্ত করে ধরবার, নিত্য ক'রে লাভ করবার উপায় কি? মনঃ-শিক্ষায় প্রেমানন্দ এ প্রশ্নটার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"দেখিয়া পাইছ সুখ প্রকৃতি বাঘিনী মুখ," এতো জীবনের পথ নয়। প্রকৃতির আনন্দময় মুখকে একবার দেখতে হবে; বিশ্বের ভেতর নিত্য সত্য আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। নাম রূপের সংস্কার বলবেন দার্শনিকেরা যাকে। সে সংস্কার বদলে ফেলে সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত সত্যকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভ করবার জন্যে বৈষ্ণবেরা যে পথ দেখিয়েছেন, সেই পথই সহজ পথ। তাঁরা বলেন, ইষ্টই তোমার সব জায়গায় রয়েছেন। মধুর যিনি, তিনি সর্বত্র বিরাজ করছেন, তুমি তাঁকে দেখছ না। বিচার করলে তর্ক করলে দৃষ্টির এ দোষ কাটবে না, তোমাকে গোড়া ধরে চিকিৎসা করতে হবে। সে গোড়াটা কোথায়? উত্তর হলো এই যে মনোমূলে। এই মনোমূলে রস সংযোগ করতে হবে। তুমি সুখকে লাভ করবার জন্যে যে সব চেষ্টা করছ, কোনটিই মনের মূল পর্যন্ত যাচ্ছে না। সে পর্যন্ত যাবার আগেই তুমি সুখ বলে যাকে বুঝেছিলে, তা অসুখ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। মন তার দরজা খুলে দিয়ে যে সব উপচারকে তুমি গুছিয়ে এনে তার কাছে হাজির করছ, তাকে অকপটে অভিনন্দিত করতে পারছ না। পক্ষান্তরে তার ভিতর হানিকে উপলব্ধি ক'রে মন গ্লানিগত হচ্ছে। সকল সুখের মূল হ'ল মনে, মনের গোড়ায় যদি সুখের সংযোগ ঘটে, তবেই সমগ্রভাবে তোমার সুখ হ'তে পারে। তুমি সুখ পেতে পার, বুঝতে পার। এখন সুখের মধ্যে ডুবে থাকলেও মনের এই স্ফূর্তির অভাবে তুমি সুখ পাবে না।

মনের গোড়া পর্যন্ত সুখকে নেবার উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আগে সে সুখ কোথায় আছে, কার কাছে পাওয়া যাবে, সেটি জানতে হবে। আনুমানিক সুখ, যে সুখের সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে, যে সুখের মধ্যে হানির ভয় রয়েছে, সে সুখে তোমার তৃপ্তি নাই। প্রয়োজন আত্যন্তিক সুখের, অনপেক্ষ সুখের। এজন্য যাঁরা অনপেক্ষ সুখের অধিকারী হয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে সুখকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের কাছে যেতে হবে। একে বলা হয়েছে সাধুসঙ্গ। তোমাকে সাধুসঙ্গ করতে হবে, সাধুদের কথা শুনতে হবে। গুরুবাদের গন্ধ পেয়ে এতে অনেক বিরক্ত হ'য়ে উঠবেন জানি। তাঁরা বলবেন কেন, সাধুদের কথার মধ্যে এমন কি জিনিস আছে? যাতে আমাদের অভাব মিটবে—সে অভাব হ'ল বাস্তব, সে অভাব হ'ল প্রত্যক্ষ, সাধুদের কথার ভিতর কি টাকা থাকবে না পয়সা থাকবে? এ কথার উত্তর এই যে, হাঁ—থাকবে। তোমার প্রাপ্তি ঘটতে পারে তেমন সাধুদের কাছ থেকেই। তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ সত্য এবং নিত্য কোন জিনিস দিতে পারে না, সবাই শুধু নেওয়ার তালেই আছে। সাধুরা আত্মাকে লাভ করছেন, তাঁদের দৈন্য ঘুচেছে। নিজেই যে অভাবের ভেতর ডুবে আছে, সে অপরকে দেবে কি? সাধুরাই দিয়ে থাকেন, আর তাঁরা নিজেকে নিঃশেষ করে দেন। তাঁদের দান পূর্ণের দান। তাঁদের দান মনের গোঁড়া পর্যন্ত পেঁছে। আর অবসাদ কেটে মন তখন আত্মস্থ হয়। সে সত্যকে সত্য বলে নিত্যকে নিত্য বলে বুঝতে পারে। তুমি স্মৃতি হারিয়েছ সাধুরা তোমার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলেন। কেউ বলবেন, শাস্ত্রের দ্বারা কি কাজটা চলে না? এর উত্তর এই যে, কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে কর্তব্য নির্ণয় করা কঠিন; কারণ শাস্ত্রে নানা মত আছে। শাস্ত্র, আমরা আমাদের নিজেদের অহংকারের গণ্ডির ভেতর থেকেই বিচার করি এবং সেই আলোতে দেখি, এর ফলে অনেক সময়ই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করি। এজন্য শাস্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝতে পারি না বা ধরতে পারি না। শাস্ত্র, যুক্তি তর্ক এগুলো এজন্য জীবনের উন্নয়নের পক্ষে ব্যর্থ হ'য়ে থাকে। ঠাকুর নরোত্তম এজন্যই বলেছেন, 'সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য।' শাস্ত্রে বিধি আছে কিন্তু কেবল বিধিজ্ঞানেই কাজ হয় না। আমরা জীবনে কত বিধিই জানছি, কিন্তু কাজে পরিণত করে থাকি কয়টা? এজন্যই আচার্য কুমারিল বলেছেন—বিধিকে কাজে প্রবর্তনায় আনতে হ'লে তাতে বচনত্বের প্রয়োজন অর্থাৎ প্রত্যক্ষতার একটা প্রেরণার তা'তে দরকার। বিধি কাজে প্রবর্তিত হবার যোগ্যতা পায় যে বচনে, সে বচন কেমন উত্তর হ'ল—'সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠাকুর; নয়নে, শ্রবণে মনে বচন মধুর।' অল্প কথায় বলা চলে যে, সাধু সঙ্গ করার ফলে গুরুর কৃপা হ'লে বিধিগুলো কাজে প্রবর্তনার প্রেরণা ভিতর থেকে পায়। বৈষ্ণবদের কথায় "গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায়। আপনে।" এই শিখানোর অর্থই স্মৃতিকে জাগানো। স্মৃতির বাতিতেই তুমি সুখকে খুঁজছ। তোমার মন খুঁজছে তার চেনা জিনিসকে, যেখানে তুমি মিষ্টি যা কিছু মনে করছ তোমার স্মৃতির দ্বারাই। তোমার নিজের বস্তুই তোমার কাছে মিষ্টি হচ্ছে। যাকে তুমি হারিয়েছিলে, তাকে ফিরে পাওয়াতেই তোমার মিষ্টত্বের উপলব্ধি। কিন্তু স্মৃতিটা তোমার ঠিক নেই; স্মৃতির সেই বাতির উপর গতানুগতিক সংস্কারের কালি পড়েছে, তাই খুঁজছ বটে, কিন্তু আপনার জিনিসকে ঠিক পাচ্ছ না। মন সংশয়ের মধ্যে পড়ে বলছে এই বুঝি, এই বুঝি, একটু পরেই তাকে ছেড়ে দিচ্ছে—না, না এ তো নয়। তোমার অবস্থা এই বোঝাবুঝি, আর খোজাখুঁজির অবস্থা, উপপত্তি এতে নাই, আছে বিপত্তি। তুমি কুযোগের ভিতর পড়েছ, সাধুরা তোমার কাছে সুযোগ এনে দিবেন, তোমার মধ্যে স্মরণ সত্য হবে। ঠাকুর নরোত্তম বলছেন, 'মনের স্মরণ প্রাণ'। মন স্থায়ী স্মৃতির মধ্যে

প্রাণকে পায়, অর্থাৎ সত্যকার সুখের স্থায়ী আশ্রয় লাভ করে। ভাগবত বললেন, তখন রজ এবং তম প্রভৃতি ভাব ও কাম এবং লোভাদি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, মনকে স্বত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে প্রসন্নতাপ্রাপ্ত হয়। মন যখন এমন প্রসন্নতা একবার পেয়ে যায়, তখন সব জায়গায় এবং সব অবস্থায় স্বচ্ছন্দ হয়, বিশ্বজগতের কোথায়ও আর তার বিরোধ থাকে না। সব জায়গা থেকে আসে অন্তরে প্রেমের স্পর্শ। ভগবতপ্রেমের অভিব্যক্তি হ'তে থাকে এ অবস্থায় স্থাবর জঙ্গম সব থেকে। সকলেই তাঁর ভাব মনে জাগিয়ে তোলে, সকলেই মধুরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর নামই শুনোয়। ভক্তিসাধনায় জপ একটি প্রধান অঙ্গ, আপনারা সকলেই জানেন। 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোস্মি'—গীতার একথা সকলেই শুনেছেন। এ অবস্থায় জপ সত্য হ'ল, নিত্য হয়ে দাঁড়ালো। মনু বলেছেন, ব্রাহ্মণ শুধু জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তিনি অন্য কিছু করুন বা না-ই করুন; কারণ মৈত্রই ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ। জপের সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ কোথায়, এই দিক থেকে বিষয়টি বিচার করলেই বুঝতে পারবেন। মহাভারত কথাটা আরও ভেঙ্গে বলেছেন। মহাভারতের সে কথাটি হ'ল এই যে, জপ সকল ধর্মের মধ্যে পরম ধর্ম; সর্বভূতে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হ'লেই জপ-যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়; অর্থাৎ বিশ্বের সব জায়গা থেকে প্রেমের ছন্দটি এসে মনকে স্পর্শ করে, এর আর বিরাম ঘটে না।

প্রেমের ছন্দ এসে মনকে স্পর্শ করছে, বললে কথাটার ভিতরের জিনিসটা ধরা গেল না। বৈষ্ণব সাধকেরা কথাটা আরও ভেঙে বলছেন। তাঁরা বলেন, প্রত্যক্ষতা ছাড়া মনকে অন্য কোন জিনিসই স্পর্শ করতে পারে না। মন যে স্পর্শটি পেয়ে নিরুদ্বিগ্ন হয়, সে জিনিসটা হচ্ছে মধুর হাসি—'মনঃস্পর্শ-স্মিতেক্ষণম্'। ভাগবতের বাণী আরও স্পষ্ট। ভাগবত এই স্পর্শের ব্যাখ্যা করে বলছেন—'অদীনলীলাহাসিতেক্ষণোল্লসৎ-ভ্রূভঙ্গ-সংসূচিত-ভূর্যনুগ্রহং'—ভ্রূভঙ্গীর ভিতর থেকে ভূরি অনুগ্রহ সূচিত হ'তে থাকে। ভ্রূভঙ্গীর এই ভূরি অনুগ্রহই তাঁর বিগ্রহ। 'চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার হেন ভগবানকে তুমি তখন পেলে। কথাটা বলা হ'ল বড় সাহস করে। কারণ পরোক্ষের স্তর থেকে, সংশয়ের মধ্যে থেকে, বিতর্কের ব্যাপারে জড়িত অবস্থায় এই 'ভ্রূভঙ্গী' ঠিক বুঝে উঠা যেতে পারে না, বড় জোর ও একটা কথার অলঙ্কার বলেই মনে হবে। কিন্তু স্মরণ যখন নিত্য হয়, সে অবস্থায় সাধক সম্যক্ লাভের রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভগবান তখন ভক্তের কাছে সুলভ হন, গীতার বাণীই তো রয়েছে আপনারা জানেন। সম্যক্ লাভের রাজ্য যেখানে সেখানে জড়ের কারবার নেই; কারণ জড় জিনিস কখনও এবং কোন অবস্থাতেই সম্যক্ লাভের বিষয়ীভূত হ'তে পারে না—ব্যবধান থেকে যাবেই। সম্যক্ লাভের রাজ্য হ'ল চিন্ময়। এ অবস্থায় সাধক জড়ের গণ্ডী পার হয়ে যান, আত্মাকে অব্যবধানরূপে আশ্রয় করেন; জীবন দেবতাকে তিনি কাছে পান, সখা স্বরূপে পান। বিভূতি তখন রতি-রসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে। বৈষ্ণব পরিভাষা থেকে বাঁচিয়ে এইটুকু বলা যায় মাত্র। চিৎশক্তির এই বিলাসের রাজ্যের বাইরে থাকতে বৈষ্ণব সাধনার অন্তর্নিহিত রসতত্ত্ব, মাধুর্যতত্ত্ব বুঝবার উপায় নেই; বৈষ্ণব মহাজনদেরও ঠিক বিচার করা যাবে না সে অবস্থায়। এই অবস্থাতেই জীবনে ব্রজভাবের প্রভাব ঘটে—যিনি বহুভাবের বিস্তার করে কেবল দূর থেকে দূরেই যেয়ে পড়ছেন, তিনি তখন নিকট থেকে নিকটে আসেন; তাঁকে তখন 'আপন হ'তে হও আপনার' বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। একান্ত আপনার এ উপলব্ধির মধ্যে তাঁকে পেলে ভয় ভেঙে যায়; আর ভয়ই তো মৃত্যু। সাধক তখন অমৃতত্ব লাভ করেন। জড়ের সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই এ অবস্থায় থাকতে পারে না; জড় তখন থাকে কি না থাকে, সাধকের পক্ষে এ আবন্তর; তাঁর পক্ষে জড় বলতে কিছুই থাকে না; জড়ের মধ্যে তিনি চৈতন্যকেই দেখেন, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকেই তিনি উপলব্ধি করেন, সত্যের সঙ্গেই তাঁর ঘটে সকল অবস্থায় সংযোগ। দেহের ব্যাপার তখন কি হয়? প্রশ্নটা কূট তর্কের সন্দেহ নাই। সাধকেরা বলেন, সেই অবস্থাতেই দেহ নিজের দেহ হয়। এ বিষয়ে ভারতের ঋষিদের বাণী এই যে, যে দেহ তুমি তোমার দেহ বলছ, এ দেহ তোমার দেহ নয়। এ হ'ল পারক্য। এ পরের—শিয়াল, কুকুরের না হয় শ্মশানাগ্নির। তোমার এ দেহ যদি সত্যই তোমার হ'ত, তাহ'লে এ তোমার এক্তিয়ারে থাকতো, কিন্তু তা মোটেই নয়। এ দেহ তোমার কাজ সিদ্ধ করে না বরং পণ্ডই করে। অর্থাৎ তুমি এ দেহের সাহায্যে যা করতে চাচ্ছ, তা কোন সময়ই সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তোমার মন যদি নিত্য সুখে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তুমি সত্যকার তোমার দেহ লাভ করবে। এখন মনের খোরাক জুটছে না; মন কেবল খাই খাই করছে। সে দুর্বল, দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করবার মত শক্তি তার নেই। যে মুহূর্তে মন সত্যকার রসের সন্ধান পাবে পঞ্চেন্দ্রিয় তার শিষ্য হ'য়ে পড়বে। দেহ তখন হ'ল তোমার। দরকার তোমার নিজের মধ্যে এই জীবন দেবতাকে উপলব্ধি করা, তবেই দেহ জীবন পাবে এবং মরণের ভয় তার কাটবে। সে দেবতার স্পর্শ লাভ করলে তোমার দেহের গঠন হবে রসময়, চিন্ময়। তোমার শুদ্ধ মন, সিদ্ধ দেহে রসময় সেই পুরুষেরই সমগ্রভাবে এবং অসংশয়িতভাবে সেবারই মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। তবে বাহিরের এই যে দেহ? এর উত্তর এই যে, 'দেহঞ্চ নশ্বর মিদং স্থিতং অস্থিতং বা'—এ দেহ থাকলো বা গেল, সে জন্য তোমার কোন ভাবনা-ই মনে জাগবে না। এ দেহের যা প্রয়োজন, আপনা আপনি মিটে যাবে। আত্মনিবেদনের মাধুর্যের মধ্যে অহং-বুদ্ধি যখন বিলীন হ'য়ে যাবে, তখন এ দেহের ভারও তিনিই নিবেন এবং দেহের দ্বারা তাঁর কার্যই সাধন করবেন। তোমার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সব হ'য়ে পড়বে তাঁরই যন্ত্র মাত্র। তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর প্রসাদের রাজ্যে গিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তুমি হ'লে 'নিত্য মুক্ত স্বভাববান্'। এ অবস্থায় আনন্দ তোমার পক্ষে বাস্তব হ'ল, নিত্য হ'ল। সংসার, সমাজ সকলই হ'ল তোমার পক্ষে মধুর। তখন তোমার পক্ষে কোন দ্বন্দ্ব থাকল না, সংঘাত থাকলো না, বিশ্ব হ'ল শান্তিময়।

প্রশ্ন আরও আছে। প্রশ্ন রয়েছে এই যে, এটা ব্যক্তির পক্ষে হ'তে পারে, কিন্তু জাতির পক্ষে, সমষ্টির পক্ষে এ আদর্শ কোনদিন সত্য হবে কি? হবে কিনা কে বলবে? তবে এ কথা সত্য যে, মানুষকে যদি শান্তি পেতে হয়, সুখ পেতে হয়, তবে এই পথই হ'ল একমাত্র পথ এবং মানব জগতের কাছে ভারতের ঋষিরা এই আদর্শই রেখেছেন। এই আদর্শের সাধনার ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষ তার মর্যাদার আসন লাভ করবে। জগতের গতি আজ প্রধাবিত হচ্ছে মৃত্যুর অভিমুখে, অশান্তির পথে, জীবনের পথে একে আনবে যারা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই আশাই আমরা পোষণ করতে পারি যে, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এ ভারতেই তেমন মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। যতদিন পর্যন্ত তা না ঘটছে, বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু উপচার জগৎকে মহতী বিনষ্টির মধ্যেই নিয়ে যেতে থাকবে এবং আসুরিক পীড়নে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ হবে, আর্তের হাহাকার উঠতে থাকবে দিকে দিকে।

'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।

আজ-কাল

এলিউশিয়ান-অভিযান

আমেরিকা মহাদেশের উত্তরে তুষারাবৃত আলাস্কা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দ্বীপমালার আকারে যেন বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। এই দ্বীপমালার নাম এলিউশিয়ান। এলিউশিয়ানের অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন। এশিয়া ও আমেরিকা দুই মহাদেশ যেখানে প্রায় পরস্পর-সংলগ্ন তারই নীচে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ দুই মহাদেশের যোগাযোগের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে, সাইবেরিয়াকে পেছন থেকে বিব্রত করতে পারে এবং আলাস্কার রক্ষা ব্যবস্থাকে আয়ত্তে আনতে পারে।

এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রধান মার্কিন নৌঘাঁটি ডাচ হারবারের উপর জাপানী বিমান আক্রমণের খবর গত সপ্তাহে দিয়েছি। সে আক্রমণ যে বিচ্ছিন্ন নয়, একটা বৃহৎ পরিকল্পনার অঙ্গ এ কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জাপ আক্রমণ যে ঠিক কি ধরণের হয়েছে, প্রথমে তা জানা যায় নি। পরে জানা গেল যে, জাপানী সৈন্যেরা এলিউশিয়ানের পশ্চিম প্রান্তের একটা দ্বীপে অবতরণ করেছে ও কিস্‌কা দ্বীপের পোতাশ্রয়ে জাপানী জাহাজ উপস্থিত হয়েছে এবং মার্কিন বিমানবহর পাল্টা আক্রমণে তাদের খানিকটা হটিয়ে দিয়েছে। অধুনাতম মার্কিন ইস্তাহারে জানা গেল যে, এলিউশিয়ানে জাপানী সৈন্যদের উপর মার্কিন বিমান আক্রমণ চলাচ্ছে এবং টর্পেডো বিমানের আক্রমণে জাপানীদের তিনটি ক্রুজার, একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি গান বোট ও একটি সৈন্যবাহী জাহাজ ঘায়েল হয়েছে। একটি ক্রুজার নিমজ্জিত হওয়ারও খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে সুমেরু বৃত্তের কাছে ঐ অঞ্চলে আবহাওয়া সব সময় এত খারাপ থাকে যে, আমেরিকানরা আক্রমণে অসুবিধা বোধ করছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জাপানীরা একটা বড় নৌবহর নিয়ে আলাস্কার কাছে আক্রমণ আরম্ভ করেছে। তাদের অভিপ্রায় কি? আমেরিকা আক্রমণ? মার্কিন সমরবিদ্‌রা মনে করেন, বর্তমানে আলাস্কার প্রধান ভূখন্ড চড়াও করা জাপানীদের উদ্দেশ্য নয়; তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মার্কিন নৌশক্তিকে উত্তরে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া, যাতে তারা দক্ষিণ বা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নতুন কোনো অভিযান আরম্ভ করতে পারে এবং জাপানের ম্যান্ডেটি দ্বীপগুলোকে অপেক্ষাকৃত সহজে রক্ষা করতে পারে। গত সপ্তাহে উল্লিখিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিকল্পনা এবং মিডওয়ে অঞ্চলে ও অস্ট্রেলিয়ার আশ পাশে আক্রমণের কথা স্মরণ করলে এই ধারণাই যুক্তিসংগত মনে হয়। কিন্তু আলাস্কা আক্রমণ না করলেও এলিউশিয়ান হাতে পেলে, বিশেষত নৌঘাঁটি ডাচ হারবার হাতে পেলে জাপানের বর্তমান যুদ্ধ চালাবার এবং ভবিষ্যতে সাইবেরিয়া আক্রমণ করবার যে সুবিধে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রবালসাগর ও মিডওয়ে

প্রবালসাগরে ও মিডওয়ে অঞ্চলে নৌযুদ্ধের ফলাফল এখন মার্কিন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। এ হিসেব ঠিক হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, জাপানের নৌশক্তি সাংঘাতিক ঘা খেয়েছে। মার্কিন নৌবিভাগের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, প্রবাল সাগরে ১৫ খানা জাপ রণতরী নিমজ্জিত হয়েছে; তার মধ্যে নতুন বিমানবাহী জাহাজ 'রিউকাকু', ৩টি বড় ক্রুজার, একটি হাল্‌কা ক্রুজার, ২টি ডেস্ট্রয়ার ও কয়েকটা সৈন্যবাহী জাহাজ আছে। এ ছাড়া ২২ খানা জাপ জাহাজ জখম বা সম্ভবত নিমজ্জিত হয়েছে। ১৯৪১ সালে নির্মিত জাপ বিমানবাহী জাহাজ 'শোকাকু'তে বোমার আঘাতে আগুন লেগে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বিমানবাহী জাহাজ 'লেক্সিংটন' (৩৩০০০ টন), ডেস্ট্রয়ার 'সিম্‌স্‌' এবং তৈলবাহী জাহাজ 'নিওশো' এই যুদ্ধে জলমগ্ন হয়। পার্ল হারবারে মার্কিন নৌমহল থেকে জানা গেছে যে, মিডওয়ে যুদ্ধে জাপানের চারখানা বিমানবাহী জাহাজ বিনষ্ট হয়েছে এবং ১০ হাজারের উপর সৈন্য মারা গেছে। এ হিসেব অবশ্য অসম্পূর্ণ এবং মার্কিন নৌবিভাগ এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নি।

চীনের যুদ্ধ

স্থলভাগে চীনেই জাপানের অভিযান প্রচন্ড আকার ধারণ করেছে। এখন অন্য কোনো দেশ আক্রমণের আগে জাপানীরা যেন চীনকে খতম করতে চায়, এই রকম মনে হচ্ছে। তারা পূর্বদিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে ইউনানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। চেকিয়াং ও কিয়াংসিতে তাদের অভিযান বেশ সাফল্য লাভ করছে। চেকিয়াং-এ চুসিয়েন দখলের পর তারা কিয়াংসিতে নানচাং এবং কোয়াংফেন অধিকার করেছে। অবশ্য চীনা সৈন্য অনেক জায়গায় পেছনে থেকে যাচ্ছে এবং পাল্টা আক্রমণ করে' কোনো কোনো জায়গা পুনরধিকার করছে; কিন্তু জাপানের সাঁজোয়া, বিশেষত বিমান শক্তিকে তারা প্রতিহত করে' রাখতে পরছে না। জাপানীরা বর্তমানে চেকিয়াং, কিয়াংসি, ফুকিয়েন ও কোয়াতুং প্রদেশে যুগপৎ প্রবল বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। চীনের পক্ষে সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছে যে, বাইরের সঙ্গে তার সংযোগ এক রকম বন্ধ হয়ে এসেছে। অবরুদ্ধ চীনকে সাহায্য দেবার নতুন উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা এখন চিন্তা করছেন। দেখা যাক, কি হয়।

লিবিয়ার অবস্থা

লিবিয়াতে যুদ্ধের গতি জার্মানদের অনুকূলে চলে' গেছে। স্বাধীন ফরাসী সৈন্যেরা প্রবল আক্রমণের ফলে বীর হাকিম ছেড়ে দেওয়ার পর জেনারেল রোমেল ব্যাপকভাবে আক্রমণ আরম্ভ করেন। তব্রুক দখল করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং তিনি এখন তব্রুকের ২০ মাইলের মধ্যে পেঁৗছে গেছেন বলে' শোনা যাচ্ছে। রোমেল তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করে তব্রুকের পশ্চিমে গাজালায় বৃটিশ সৈন্যদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আক্রোমার কাছে আক্রমণ করছেন; জার্মান আক্রমণের গতি ত্রিগ-কাপুৎসো থেকে উত্তর দিকে। অপর পক্ষে বৃটিশ সৈন্যদল দক্ষিণ থেকে জার্মান বাহিনীর পেছনে আক্রমণ করছে। এল আদমের পূর্বদিক থেকে জার্মানরা বিতাড়িতও হয়েছে। কিন্তু আক্রোমা অঞ্চলে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে তাতে দুই পক্ষেরই সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে; ফলে বৃটিশ অষ্টম আর্মি নতুন ঘাঁটিতে সরে এসেছে। লিবিয়া যুদ্ধের অবস্থা যে গুরুতর তাতে সন্দেহ নেই।

খারকভ ও সেবাস্তোপোল

একদিকে তুরুক এবং অন্যদিকে খারকভ ও সেবাস্তোপোল —এবার জার্মান পরিকল্পনায় মধ্যপ্রাচ্যের উপর অগ্রসর হবার এরা দুটো নাকি বিরাট সাঁড়াশিবাহু। খারকভে নাৎসীরা ব্যাপক আক্রমণ সুরু করেছে; সেবাস্তোপোলের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চলছে। খারকভ এলাকায় জার্মানরা কিছু অগ্রসর হলেও সে অগ্রগতি গত বছরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। শেষ সংবাদে জানা যায় জার্মান ট্যাঙ্ক-বহর সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণে আবার পিছু হটছে। সেবাস্তোপোল রক্ষী সৈন্যেরা অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করছে। তাদের সব চেয়ে অসুবিধে হয়েছে বিমান ঘাঁটির অভাব। এক লাখ সৈন্য এবং বিমান প্রাধান্য নিয়েও জার্মানরা এখনও সেবাস্তোপোলের প্রধান ব্যূহ ভেদ করতে পারে নি। এখন সোভিয়েট কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর ক্রাইমিয়ার উপকূলে এসে জার্মানদের উপর প্রবলভাবে কামান দাগ্‌ছে।

বৃটেন-সোভিয়েট-আমেরিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সপ্তাহের বড় ঘটনাঃ বৃটেন-সোভিয়েট চুক্তি। সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ মলোটোভ লণ্ডনে গিয়ে আলোচনার পর এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন; তারপর তিনি সেখান থেকে আমেরিকায় যান এবং সেখানে ঐ চুক্তির অনুরূপ একটা বোঝাপড়া সোভিয়েট ও আমেরিকার মধ্যে হয়। মঃ মলোটোভ মস্কোতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তি প্রকাশ করা হয়। মঃ মলোটোভের লণ্ডনে ও সেখান থেকে ওয়াশিংটন গমন একেবারে গোপন রাখা হয়েছিল, ঘুনাক্ষরেও কেউ আগে জান্‌তে পারে নি। মঃ মলোটোভের সঙ্গে সামরিক সহকারীরা গিয়েছিলেন। সুতরাং আলোচনা রাজনীতিক ও সামরিক দুই রকমই হয়।

যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাই হচ্ছে চুক্তির মূল কথা। যুদ্ধের বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে ইওরোপেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। চুক্তির মেয়াদ ২০ বছর। হিটলারী জার্মানী ও তার সহযোগী রাষ্ট্রদের সঙ্গে কোনো পক্ষই পৃথক আলোচনা বা সন্ধি করবে না এবং ইওরোপে এক্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনায় পরস্পরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবে; যুদ্ধের পর শান্তি রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধে তারা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে (এই সহযোগিতায় যোগ দিতে অন্য সমস্ত সমমতাবলম্বী রাষ্ট্রকে আহ্বান করা হয়েছে); পররাজ্য লোভ ও অপরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বর্জনের নীতি অনুসারে যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যে তারা সহযোগিতা করবে।

আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েটের যে যুক্ত বিবৃতি বেরিয়েছে তাতে এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিবৃতিতে একটা খুব আগ্রহোদ্দীপক বিষয় আছে; সেটা হ'লো "১৯৪২ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ বোঝাপড়া হয়েছে।" এই ব্যাপারটা কার্যত কি হয় তা দেখ্‌বার জন্যে সমস্ত পৃথিবী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবে।

ভারতবর্ষ

ওয়ার্ধায় আলোচনা

ওয়ার্ধায় গান্ধীজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলালের মধ্যে চারদিন ধরে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। মৌলানা আজাদ বলেন যে, পরে আরও একদিন আলোচনার প্রয়োজন হবে। শোনা যায়, গান্ধীজী যে নতুন আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছেন সেই সম্বন্ধে প্রধানত আলোচনা হয়। গান্ধীজীর বিবৃতি অনুসারে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের অপসারণই হচ্ছে এই আন্দোলনের লক্ষ্য। শোনা যাচ্ছিল যে, গান্ধীজীর সঙ্গে জওহরলালজীর মতভেদ হয়েছে; কারণ জওহরলালজী আন্তর্জাতিক দৃষ্টি থেকে বিচার করে নাকি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে জাপান তথা এক্সিসের সুবিধা হবে, যা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু পরে জওহরলালজী বিদেশী সংবাদদাতাদের কাছে বলেছেন, "আমি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি তাঁর দাবী পুরোপুরি সমর্থন করি।" গান্ধীজীর নতুন আন্দোলনের সার্থকতা সম্পর্কে নেহরু বলেন, "আপনারা দুই মাসের মধ্যে ফলাফল দেখ্‌তে পারবেন।" আগামী ৪ঠা জুলাই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা; এই বৈঠকের পরে বোধ হয় গান্ধীজী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন।

এক খবরে শোনা গেল যে, গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে পত্রালাপ চল্‌ছে। যে সব জায়গায় লবণের অভাব ঘটেছে, সেই সব জায়গার লোককে লবণ তৈরীর অধিকার দেওয়ার জন্যে গান্ধী-আরুইন চুক্তিকে সম্প্রসারিত করবার দাবী গান্ধীজী তুলেছেন। তাঁর নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের এটা নাকি একটা বিষয়; আর একটা বিষয় হচ্ছে কোনো কোনো এলাকা থেকে যে সব অধিবাসী সরিয়ে দেওয়া হবে, তাদের ক্ষতিপূরণ ও বাসস্থান দেওয়ার দাবী।

বাঙলায় মিটমাট?

ওয়ার্ধায় এই আলোচনার সময় বাঙলার প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির অর্গানাইজিং সেক্রেটারী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এম এল এ সেখানে যান এবং গান্ধীজী, আজাদ ও জওহরলালের সঙ্গে আলাপ করেন। প্রকাশ, বাঙলার দুটো কংগ্রেস কমিটির মধ্যে মিটমাট যাতে হয়, তার একটা উপায় করাই ছিল শ্রীদত্ত মজুমদারের ওয়ার্ধা যাওয়ার প্রধান কারণ। এর পর তিনি এক বিবৃতিতে বাঙলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ দূর করে একটা পুনরৈক্যবদ্ধ কংগ্রেস কমিটি গঠনের আশা প্রকাশ করায় ঐ অনুমান সমর্থিত হয়েছে। মৌলানা আজাদ কলকাতায় ফিরলে দুই কংগ্রেস কমিটির একটা যুক্ত সভা আহ্বানের নাকি সম্ভাবনা আছে।

পাঞ্জাবে চুক্তি

পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর উদ্যোগে সরকারী ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং সর্দার বলদেব সিংএর নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পাঞ্জাব পার্টির (প্রধানত শিখ, হরিজন অল্প কিছু) মধ্যে এক চুক্তি হয়ে গেছে। মন্ত্রিসভায়, সরকারী চাকরীতে এবং ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে শিখরা এর ফলে কিছু সুবিধে পাবে এবং গুরুমুখী ভাষা ও মাংসের জন্যে স্বধর্মের নিয়ম অনুসারে পশুহত্যা সম্পর্কে শিখদের অভিযোগ অনেকটা দূর হবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা এ চুক্তিতে আনন্দ করবার কারণ পান নি। তাঁদের মতে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট বর্তমান নীতি যতদিন না পরিবর্তন করবেন, ততদিন পাঞ্জাবে প্রকৃত জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে না।

* * *

বাঙলা গভর্নমেণ্টের আদেশে ৯ই জুন মেদিনীপুর জেল থেকে নিম্নলিখিত ১১ জন কমিউনিস্ট রাজবন্দী মুক্তি পেয়েছেনঃ আবদুল হালিম, আবদুল মোমিন, প্রমোদ দাসগুপ্ত, নিরঞ্জন সেন, রণেন সেন, ধরণী গোস্বামী, গোপাল আচার্য, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ ইস্মাইল ও গোপেন চক্রবর্তী।

১৬-৬-৪২

—ওয়াকিবহাল

রঙ্গ জগৎ

ARDHENDU

মীনাক্ষী—(নিউ থিয়েটার্স)। পরিচালনা—মধু বোস, কাহিনী—মন্মথ রায়, সংগীত পরিচালনা—পঙ্কজ মল্লিক, আলোক-চিত্র—বিমল রায়, শব্দানুলেখন—বাণী দত্ত।

ভূমিকায়—সাধনা বোস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দেববালা, প্রীতি মজুমদার, পান্না, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, সন্তোষ সিংহ, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি।



নিউ থিয়েটার্সের মীনাক্ষী চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী সাধনা বোস

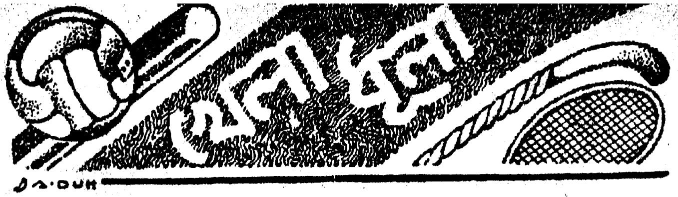
'মীনাক্ষীর' সমালোচনা করতে গিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। এই ছবিখানিকে প্রাণ খুলে যেমন ভালও বলা চলে না, তেমনি আবার একে নিকৃষ্ট ছবির পর্য্যায়েও ফেলা চলে না। মুস্কিল হ'ল এইখানে; ছবিখানি সম্বন্ধে বড় জোর বলা চলে মন্দ নয়। কিন্তু আমরা ঠিক এমনটি আশা করি না; মীনাক্ষী একখানি উল্লেখযোগ্য প্রথম শ্রেণীর ছবি হবে, এই আমরা আশা করেছিলুম। এ-রকম আশা করার কারণ কি বলছি। নিউ থিয়েটার্স বাঙালীর শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রতিষ্ঠান; মধু-সাধনার অভিনয়-সম্প্রদায়ও বাঙালীর গৌরবের বস্তু। ইতিপূর্বে বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে এই অভিনয়-সম্প্রদায় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র নির্মাণ ক'রে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইতিপূর্বে নানা কারণে নিউ থিয়েটার্সের সংগে তাঁদের যোগাযোগ সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। অবশেষে মীনাক্ষীতে এ'দের যোগাযোগ যখন সম্ভব হ'য়ে উঠল, তখন ভাবলাম যে, মীনাক্ষী নিঃসন্দেহে একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র হবে। আমাদের সে-আশা সফল হ'ল না দেখে দুঃখিত হয়েছি।

মীনাক্ষীর গল্প দেখে মনে হয় যে, নাট্যকার মন্মথ রায়ের গল্পের ধার যেন ক্রমশ কমে আসছে। মীনাক্ষীর কাহিনীতে চিত্রোপযোগী বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। এর মধ্যে যা কিছু বৈচিত্র্য ঢোকানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা যেন কাহিনীর সংগে অবশ্যম্ভাবিতার সূত্র দিয়ে গ্রথিত নয়; এ বৈচিত্র্য যেন নিতান্তই জোর ক'রে বাইরে থেকে টেনে-আনা। ফলে কাহিনীর গতি বহু স্থানেই শ্লথ এবং মন্থর হ'য়ে উঠেছে। শুধু শেষের দিক ছাড়া কোথাও কাহিনীটি ভালভাবে জমে ওঠে নি। বিশেষ ক'রে প্রথমার্ধে ছবির গতি এত মন্থর যে, কাহিনীটি যে এগুচ্ছে, একথা বোঝাই যায় না; তাই স্থানে স্থানে চমৎকার ঘটনা-সংস্থান থাকা সত্ত্বেও প্রথমার্ধ দর্শকদের কাছে একান্তই বিরক্তিকর ঠেকে। মনে হয়, কাহিনীটি যেন বৃত্তাকারে ঘুরছে। এ গল্পের নায়িকা মীনাক্ষীই গল্পটির প্রাণ—অথচ মীনাক্ষীর চরিত্র খুব ভালভাবে ফুটে ওঠে নি; ফলে ছবিটি শেষ হ'য়ে গেলে মীনাক্ষী আমাদের মনে খুব বেশী ছাপ রেখে যেতে পারে না। মীনাক্ষীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যই আমাদের নজরে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার বার বার পালিয়ে যাওয়া। প্রথমার্ধে নায়ক অমিতাভ ও নায়িকা মীনাক্ষীর ডায়ালোগও অত্যন্ত নীরস এবং দুর্বল। কিন্তু ছবির শেষার্ধটি উপভোগ্য হয়েছে।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলেই প্রথমে বলতে হয় ক্ষীণ-দৃষ্টি-সম্পন্না আই-এ পাশ করা তরুণী মীনাক্ষীর ভূমিকায় সাধনা বসুর অভিনয়ের কথা। সাধনা বোসের অভিনয়ে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; তাঁর অভিনয়ের সংযত সাবলীলতা এবং শালীনতা আর কোন ভারতীয় অভিনেত্রীর মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু একান্তই দুঃখের বিষয় এই যে, তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করার দিন বোধ হয় তাঁর ফুরিয়ে গেছে। মেক্-আপের প্রাচুর্য সত্ত্বেও বয়সের রেখা আর আটকিয়ে রাখা যায় নি। তাছাড়া তাঁর প্রথম দিকের অভিনয়ে কেমন যেন একটা প্রাণহীন জড়ত্ব এবং কৃত্রিমতার ভাব পরিস্ফুট। তাঁর কথাবার্তা বলার ধরণ নিতান্তই ন্যাকামিপূর্ণ মনে হয়। শেষের দিকে তিনি তাঁর এ দোষ কাটিয়ে উঠেছেন; অন্ধ হ'য়ে যাবার পর হাসপাতালে ডাক্তারের সংগে তিনি যে অভিনয় করেছেন, তা সত্যই অপূর্ব। বঞ্চিত প্রেমের অন্তর্নিহিত বেদনাবোধ এবং চোখ ফিরে পাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার তিনি যে রূপ দান করেছেন, দর্শকের মনে তা গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। তাঁর মোহিনী নৃত্যটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু গল্পের সংগে নাচের কোন সংগতি নেই। সাধনা বোসের বইয়ে নাচ থাকবে না, এটা কেমন কথা? তাই পরিচালক যেন জোর ক'রেই এ নাচটি ঢুকিয়েছেন। তা নইলে ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী মীনাক্ষী ছেলেমেয়েদের কাছে দেবাসুরের অমৃত-বণ্টন এবং বিষ্ণুর মোহিনী রূপ ধারণের কথা বলতে বলতেই আমরা পর্দায় মোহিনী রূপিনী সাধনা বোসকে নাচতে দেখি কি রূপে? পরিচালক এ নাচটি ঢোকানোর লোভ সম্বরণ করলেই পারতেন।

নায়ক অমিতাভের ভূমিকায় জ্যোতিপ্রকাশকে মানিয়েছে বেশ ভাল; কিন্তু তিনি উচ্চাঙ্গের অভিনয়-কলা প্রদর্শন করতে পারেন নি। তাঁর অভিনয় প্রায় ক্ষেত্রেই মধ্যম শ্রেণীর হয়েছে—মাঝে মাঝে নিকৃষ্ট শ্রেণীরও হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ মাতালের অংশে তাঁর অভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাভাবিকতার অভাবে তাঁর অভিনয় হয়েছে প্রাণহীন। তাছাড়া, মাইকের দোষে কিনা জানি না, তাঁর গলার স্বরটাও ভয়ানক কর্কশ শুনিয়েছে। ডাক্তার শুভঙ্করের ভূমিকাটি ছোট হ'লেও অহীন্দ্র চৌধুরী একে প্রাণবান্

(শেষাংশ ৮৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে থাকিয়া যেরূপ চার পয়েণ্টে অগ্রগামী ছিল, এখনও তাহাই আছে। কোন খেলায় পরাজিত অথবা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে নাই। প্রথমার্ধের শেষভাগে এই দলের খেলা সেইরূপ ভাল হইতেছিল না, কিন্তু বর্তমানে খেলা উন্নততর হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার জন্য এই দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। কয়েকবার এই দল অল্পের জন্য চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে নাই। এই বৎসর তাহার পুনরাবৃত্তি না হইলেই ভাল।

মহমেডান স্পোর্টিং দল দ্বিতীয় স্থানেই অবস্থান করিতেছে। এই দলের খেলাও পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। ওসমান ও সত্তর দলে যোগদান করায় দলের শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমার্ধে যেরূপভাবে ভবানীপুর, এরিয়ান্স, পুলিশ প্রভৃতি দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পয়েণ্ট হারাইয়াছিল, এইবার সেইরূপ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। দল পূর্ব গৌরব লাভ করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িবে বলিয়া আশা হয়।

মোহনবাগান দল তৃতীয় স্থানেই অবস্থান করিতেছে। এই দলের খেলার উন্নতি হয় নাই, বরং অবনতিই হইয়াছে। সরোজ দাস, এ গড়গড়ি, অমিয় ভট্টাচার্য, এ রায় চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ খেলায় যোগদান না করায় তাঁহাদের স্থানে নূতন তরুণ খেলোয়াড়গণকে খেলান হইতেছে। ইহাতে দলের শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই সকল খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে মোটেই সুবিধা করিতে পারিবে না। এমন কি, কালীঘাট, ভবানীপুর, এরিয়ান্স প্রভৃতি দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও পরাজিত হইতে পারেন। লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা এই দলের খুবই কম। তাহার উপর এই দলের পরিচালকগণ যদি এইরূপ শক্তিহীন একটি দল লইয়া প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট খেলাগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তবে এই দল যে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিবে না, ইহা এখন হইতেই জোর করিয়া বলা চলে।

এরিয়ান্স ক্লাব এতদিন চতুর্থ স্থানে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বি এণ্ড এ রেল দল উক্ত স্থানের অধিকারী হইয়াছে। এরিয়ান্স দলকে ষষ্ঠ স্থানে নামিয়া যাইতে হইয়াছে। ভবানীপুর ক্লাব উন্নতি করিয়া পঞ্চম স্থান দখল করিয়াছে। তবে এই তিনটি দল এইভাবে থাকিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না। দুই-একটি করিয়া খেলা হইতেই ইহারা স্থান অদলবদল করিবে। অপর সকল দলের অবস্থা পূর্ববৎ। এই সকল দল সম্পর্কে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। নিম্নে লীগ তালিকার প্রথম ছয়টি দলের ১৪ই জুন পর্যন্তের ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

	খেঃ	জঃ	ডঃ	পঃ	পক্ষে	বিঃ	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৪	১৩	০	১	৪১	৫	২৬
মহামেডান স্পোর্টিং	১৩	৮	৪	১	৪৩	৯	২০
মোহনবাগান	১৩	৮	৩	২	২৮	১০	১৯
বি, এণ্ড এ	১৩	৭	৩	৩	২৪	১৭	১৭
ভবানীপুর	১২	৫	৫	২	১৪	৮	১৫
এরিয়ান্স	১২	৫	৫	২	১৮	১১	১৫

যুক্তপ্রদেশ হার্ডকোর্ট টেনিস

যুক্তপ্রদেশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি মুশৌরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইফতিকার আমেদ, দিলীপ বসু, খসু সেন, মিস লীলারাও, মিস কে হাজী প্রভৃতি ভারতীয় বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ইফতিকার আমেদ পুরুষদের বিভাগে সিঙ্গলস ও ডাবলসে এবং মিস লীলারাও মহিলাদের বিভাগে সিঙ্গলস ও ডাবলসে বিজয়ী হইয়াছেন। মিক্সড ডাবলসে ইফতিকার আমেদ ও মিস লীলারাওকে ইরসাদ হোসেন ও মিস কে হাজীর নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছে। এই খেলাটি সর্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য হয়। খেলার শেষ মীমাংসা ১৬টি গেমের পর হয়। ইফতিকার ও মিস লীলারাও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। পুরুষদের সিঙ্গলস ও ফাইনালে তরুণ খেলোয়াড় মানমোহন ইফতিকার আমেদকে বিশেষ বিব্রত করেন। এক এক সময় তাঁহার খেলা এতই ভাল হয় যে, দর্শকগণকে ইফতিকারের পরাজয় কল্পনা করিতে হয়। অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তার জন্য ইফতিকার শেষ পর্যন্ত রেহাই পান। এই খেলোয়াড়টি ভবিষ্যতে ভারতীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের মধ্যে যে স্থান পাইবেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী খেলোয়াড় খসু সেন ও দিলীপ বসু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। প্রতিযোগিতার কোন বিষয়ে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছান ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহাদের এই শোচনীয় পরিণাম প্রকৃতই দুঃখের। বিশেষ বাঙালী টেনিস খেলোয়াড়ের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। দিলীপ বসু, খসু সেন, নসু সেন এই তিনজন বাঙালী টেনিস খেলোয়াড় ভারতীয় টেনিস ক্রীড়াক্ষেত্রে কিছু সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ইহাতে আশা হইয়াছিল—ইহারা বাঙালী খেলোয়াড়গণের সম্মান ও সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ টেনিস প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের পর সেইরূপ আশা ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল

ইফতিকার আমেদ ৮-৬, ১-৬, ৬-০, ৬-২ গেমে মানমোহনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল

মিস্ লীলারাও ৭-৫, ৬-১ গেমে মিস্ হাজীকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস ফাইনাল

ইফতিকার আমেদ ও ইরসাদ হোসেন ৬-২, ৬-৩, ৬-৪ গেমে শ্যামসের সিং ও ভগতকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস ফাইনাল

ইরসাদ হোসেন ও মিস হাজী ৬-৪, ৯-৭ গেমে ইফতিকার আমেদ ও মিস লীলারাওকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস ফাইনাল

মিস লীলারাও ও মিস হাজী ৬-১, ৭-৫ গেমে মিসেস ম্যাকেনাবেকার ও মিস ভরুম্বারকে পরাজিত করেন।

সাইকেল চালনা স্পোর্টস নহে?

সাইকেল চালনা অলিম্পিক স্পোর্টসের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার পর হইতেই এই বিষয়টি স্থানলাভ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে, এমন কি স্কুল কলেজের অনুষ্ঠানে পর্যন্ত সাইকেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পৃথিবীর সকল স্পোর্টস উৎসাহীই জানেন যে সাইকেল চালনা একটি স্পোর্টস। কিন্তু সম্প্রতি লণ্ডনে এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিমান-মন্ত্রী-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, সাইকেল চালনা স্পোর্টস নহে। আর-এ-এফ বোর্ডস ইচ্ছা করিলে ইহার ব্যবস্থা করিতেও পারেন অথবা নাও পারেন। এই উক্তি নাকি বিমান চালকগণের মধ্যে যাঁহারা সাইকেল চালনায় উৎসাহী তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা এই উক্তির বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই উক্তি খুবই অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা ন্যাশানাল সাইক্লিষ্ট ইউনিয়নকে এই বিষয় প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করেন। ন্যাশানাল সাইক্লিষ্ট ইউনিয়নের সম্পাদক ইহার উত্তরে বলিয়াছেন "ইহা জাতীয় কলঙ্ক। আর-এ-এফ স্পোর্টস বোর্ডের সাইকেল চালনাকে স্থান না দেওয়া খুবই অন্যায় হইবে। এই বিষয়ের জন্য বোর্ডকে অতিরিক্ত কিছুই ব্যয় করিতে হইবে না। যাঁহারা সাইকেল চালনায় উৎসাহী তাঁহারা নিজেরাই সকল ব্যবস্থা করিবেন। ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতির ব্যবস্থায় যাঁহারা বহু টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ একটি বিষয়কে তালিকা হইতে বাদ দেওয়া কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।"

ন্যাসানাল সাইক্লিস্ট ইউনিয়নের সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর অধিক বলা চলে না।

সাম্প্রদায়িক ক্রিকেট খেলা

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িকতার বিষ সাধারণের মধ্যে সংক্রামিত করিতেছে এবং উহা বন্ধ হওয়া উচিত এই আন্দোলন গত দুই বৎসর হইতে চলিয়াছে। দেশের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত এই আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ প্রতিযোগিতা এখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। বরং ঐ জাতীয় প্রতিযোগিতা ক্রমশই দেশের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি করাচী পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়াই আমাদের উহা বেশী করিয়া মনে হইতেছে। করাচীতে এইরূপ প্রতিযোগিতা একটি অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম 'সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা'। এই প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিতে সম্প্রতি আর একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, করাচী পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট নাম দিয়া। বোম্বাই-এর পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যাঁহারা আন্দোলন করেন তাঁহারা এই সকল প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন করেন না? বোম্বাই-এর অনুষ্ঠান যদি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া থাকে তবে ইহারাও ঐ কার্যে সহায়তা করিতেছে না কি? বিষের উচ্ছেদ করিবার জন্য যখন তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তাঁহাদের উচিত যেখানে ঐ বিষের কণামাত্র দেখা দিয়াছে সেখানেই তাহার প্রসারলাভের পথ রোধ করা।

রঙ্গজগৎ

(৮৪১ পৃষ্ঠার পর)

ক'রে তুলেছেন। বিশেষ ক'রে মীনাক্ষীর রোগশয্যা পার্শ্বে অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় সত্যই আমাদের মুগ্ধ করে। চাকর ভুলোর ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন এবং আমাদের অনেক হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। রাধাগোবিন্দরূপী নরেশ মিত্র এবং পত্রিকা ম্যানেজার সত্য মুখোপাধ্যায়ও আমাদের অনেকবার হাসিয়েছেন। কিন্তু হাস্যরসের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নায়েবরূপী ইন্দু মুখোপাধ্যায়। স্ত্রী চরিত্রগুলোর মধ্যে দেববালা এবং পান্নার অভিনয় মন্দ হয় নি। অন্ধের ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে চলনসই।

এ বইয়ের সংগীত পরিচালক হিসাবে পঙ্কজ মল্লিক ব্যর্থ হয়েছেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-ই বেশীর ভাগ গান গেয়েছেন—অথচ একখানা গানও সংগীত হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বের গলা আর নেই। সন্ধ্যারাণীর গাওয়া গানখানি এবং সাধনা বোস ও জ্যোতিপ্রকাশের দ্বৈত সংগীতখানি উপভোগ্য হয়েছে। সংগীত রচনা উচ্চাঙ্গের হয় নি।

আলোক-চিত্রে বিমল রায় নিউ থিয়েটার্সের পূর্ব খ্যাতি যে শুধু অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাই নয়—স্থানে স্থানে সে খ্যাতি বাড়িয়েও তুলেছেন। কিন্তু শব্দানুলেখন সে অনুপাতে ভাল হয় নি; শব্দের অস্পষ্টতা বহু স্থানেই কর্ণপীড়াদায়ক হয়েছে। দৃশ্যসজ্জায় বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব; ঘুরে ফিরে প্রধানত লেকের পারেই কাহিনীটি গ'ড়ে উঠেছে। অমিতাভের গাঁয়ের দৃশ্য ছাড়া, বাইরের দৃশ্য বড় বেশী নেই। এতে নিউ থিয়েটার্সের টাকার দিক থেকে হয়ত সুবিধা হয়েছে, কিন্তু ছবিতে বৈচিত্র্যের অভাব হয়েছে। এই সব কারণে মীনাক্ষী বিশেষ বিশেষ অংশে ভাল হওয়া সত্ত্বেও, সমগ্রতার দিক থেকে দর্শকের মনে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। এই অসামর্থ্যের মধ্যেই মীনাক্ষীর ব্যর্থতা অন্তর্নিহিত।

সমর বার্তা

১০ই জুন

সোভিয়েট রক্ষা ব্যূহের চারিদিকে জার্মানেরা যে লৌহ বেষ্টনী করিয়াছে, তাহাতে তাহারা ১,০০,০০০ সৈন্য নিয়োজিত করে। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, সেবাস্তোপোল এলাকায় আমাদের গোলন্দাজবাহিনী কামান দাগিয়া শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে এবং ফলে একটি পদাতিক রেজিমেন্ট আংশিকভাবে বিপর্যস্ত হয়।

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে অল্পবিস্তর বিমান ও স্থল যুদ্ধ চলে।

বীর হাকিমে এক্সিসবাহিনী যে প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহা প্রতিহত হয়। স্বাধীন ফরাসীবাহিনীর সাহায্যার্থে বৃটিশ সাঁজোয়াবাহিনী এবং মোটর সজ্জিত বাহিনী প্রেরিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার জেনারেল ম্যাক আর্থারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, লায়ে এবং টিমরে মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর শত্রু অধিকৃত এলাকায় দারুণ আক্রমণ চালায়, ফলে বহু অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, কয়েকটি শত্রু বিমান গত রাত্রে এংলিয়ার উপকূলে বোমা ফেলায় কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু কাহারও হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নি।

১১ই জুন

বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে যে নূতন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা কমন্স সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেন ঘোষণা করেন। পারস্পরিক সম্মতি অনুসারে বর্তমান চুক্তির পরিবর্তে আবার কোন চুক্তি সম্পাদিত না হইলে বর্তমান চুক্তি কুড়ি বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে। বর্তমান চুক্তি দ্বারা এই দুই রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্য-সাধনে একত্রে সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও এক চুক্তি হইয়াছে। এই সম্পর্কে ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্পর্কে এবং গ্রেট বৃটেন হইতে রাশিয়ায় সমরোপকরণ প্রেরণ সম্পর্কেও পুরাপুরি বোঝাপড়া হইয়াছে।

সেবাস্তোপোলের বহির্ব্যূহ ভেদ করিয়াছে বলিয়া জার্মানরা দাবী করে। কিন্তু উত্তরে মস্কো বেতার ঘোষণা করে যে, সমস্ত আক্রমণ সাফল্যের সহিত হঠাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং রুশ সৈন্যেরা প্রায়ই পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। জেনারেল ফন মানস্টাইন এই ঘাঁটি দখলের জন্য ক্রমাগত নূতন নূতন পদাতিক, ট্যাঙ্ক ও বিমান সৈন্য নিয়োগ করিয়া প্রবল আক্রমণ চালাইতেছেন।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ১০ই জুন রাত্রিতে বীর হাকিমে অবস্থিত সৈন্যদলকে অপসারিত করা হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বীর হাকিম অঞ্চলে জার্মানবাহিনীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাধীন ফরাসীবাহিনী সাহসের সহিত ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং পাল্টা আক্রমণ চালায়। বীর হাকিমের উপর প্রতিপক্ষের বিমান হানার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

এই মাসের প্রথম হইতে এ পর্যন্ত মোট নয়খানি জাপানী সাবমেরিনের সলিল সমাধি হইয়াছে।

১২ই জুন

খারকভ অঞ্চলে লাল ফৌজের আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের সংবাদ পাওয়া যায়।

সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, সেবাস্তোপোলের তিন দিনের যুদ্ধে জার্মানদের প্রায় পনর হাজার অফিসার ও সৈন্য নিহত ককেসাসের মূল ভূখণ্ডে পর্যবেক্ষণ কার্যের পর জার্মানদের প্রত্যা-বর্তনের সংবাদ পাওয়া যায়।

জার্মান সাঁজোয়াবাহিনী তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পূর্বদিকে কিছু দূরে অগ্রসর হয়। হারমাট ও বীর হাকিমের মধ্যবর্তী এলাকাতে জার্মানরা অগ্রসর হয়। কিন্তু বাধা পাইয়া উত্তরে হারমাটের পূর্ব দিকবর্তী অঞ্চলের দিকে ঘুরিয়া যায়। এই স্থানেও বৃটিশবাহিনীর সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়।

ওয়াশিংটনের সামরিক পর্যবেক্ষকগণ বলিয়াছেন, মিডওয়ে দ্বীপে জাপানীরা মার্কিন 'উড়ন্ত কেল্লা' বিমানগুলির আক্রমণে যে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, তাহা তাহাদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরাজয়। টুংগুইন অধিকারের পর য়ুনানের দিকে জাপানীদের অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যায়। নানচাং শহরের নিকট চীনারা একটি স্থান পুনরধিকার করে।

১৩ই জুন

মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধে জাপানীদের চারখানি বিমানবাহী জাহাজ ধ্বংস হয় এবং দশ হাজারের অধিক সৈন্য নিহত হয়। নৌ বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, প্রবাল সাগরের যুদ্ধে জাপানীদের ৩৭খানা জাহাজ নিমজ্জিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার তিনখানা যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হয়। এই তিনখানির মধ্যে লেক্সিংটন অন্যতম। আমেরিকার 'সিমস্' নামক ডেস্ট্রয়ার এবং নেসেও নামক তৈলবাহী জাহাজও নিমজ্জিত হয়।

বার্লিনের এক সংবাদে জানা যায়, খারকভের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিকে নূতন করিয়া ট্যাঙ্ক যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। সেবাস্তো-পোলে ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের উপর লাল ফৌজ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সুইস সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত মস্কোর সংবাদে জানা যায় যে, সেবাস্তোপোল রণক্ষেত্রে গত তিনদিনে ৬০ সহস্র জার্মান সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে।

নৌ বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ, অল্পসংখ্যক জাপ সৈন্য আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম প্রান্তস্থিত আত্তু দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। বিস্‌কো পোতাশ্রমে জাপ জাহাজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়।

চেকিয়াং-কিয়াংসি সীমান্তস্থিত ইউসান শহর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়। লণ্ডনের সরকারীভাবে বলা হইয়াছে, কলোনের উপর সহস্রাধিক বৃটিশ বিমান হানা দেওয়ার ফলে ২৫০টির বেশী কারখানা ধ্বংস হইয়াছে।

১৪ই জুন

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে, শুক্রবার জাপানীরা কিয়াংসি রণাঙ্গনের নানচেং-এ প্রবেশ করিয়াছে।

আনকারায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মে মাসের মধ্যভাগ হইতে এ পর্যন্ত জার্মান সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান ও সাবমেরিণের অংশ বোঝাই প্রায় ২০০ ট্রেন যুগোশ্লাভিয়া হইতে বুলগেরিয়ায় গমন করিয়াছে। এই সকল ট্রেনের প্রত্যেকটিতে ৪০টি করিয়া ওয়াগন ছিল। প্রকাশ, লিবিয়ার আফ্রিকা কোরের ব্যবহারের জন্য এই সকল সমরোপকরণ স্যালোনিকায় পাঠান হইতেছে।

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে, জার্মানরা সেবাস্তো-পোলের নৌ ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইতেছে। জার্মানরা খারকভ এলাকায় ডোনেৎস অতিক্রমের যে দাবী করিয়াছে, তৎসম্পর্কে লণ্ডনে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে

সাপ্তাহিক সংবাদ

১০ই জুন

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে ১১ জন কমিউনিস্ট বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বড়লাট বঙ্গীয় টাউট বিলে সম্মতি দিয়াছেন। এক্ষণে ঐ বিল আইনে পরিণত হইল।

১১ই জুন

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলের আপীল দায়ের করিবার অনুমতি প্রার্থনায় রাণী বিভাবতী দেবীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে যে দরখাস্ত করা হয়, বৃহস্পতিবার বিচারপতি মিত্র, বিচারপতি খোন্দকার ও বিচারপতি পালকে লইয়া গঠিত স্পেশাল বেঞ্চে তাহার শুনানী হয়।

লাহোরের উর্দ্দু দৈনিক 'প্রতাপে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকে তাঁহার নিজের নামে একখানি অননুমোদিত নিউজ সীট প্রকাশের অভিযোগে জরুরী প্রেস আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি ২০০০৲ টাকার জামীনে মুক্তিলাভ করেন।

১২ই জুন

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এ বৎসর যে দুইজন বাঙালী 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কলিকাতা মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর অংশীদার শ্রীযুক্ত বি এন মুখার্জি এবং ভারত সরকারের সেক্রেটারী মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় আই সি এস।

এলাহাবাদের নিউ গ্র্যান্ড হোটেলে এক ভদ্রলোক আকস্মিক-ভাবে মারা গিয়াছেন। সর্দ্দি গর্ম্মিতেই তাঁহার মৃত্যু বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার কাপড়ের ভাঁজ হইতে, বালিসের নীচে এবং কোর্টের মধ্যে থেকে সর্বসমেত ১০০০৩২৬৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ধুতির ভাঁজেই এক লক্ষ টাকা পাওয়া যায়।

ভারতের কোটি কোটি নরনারীর উদ্দেশে সম্রাট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে ডিউক অব গ্লস্টার বেতারযোগে ভারতের সর্বত্র তাহা প্রচার করেন।

নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে দ্বীপ অঞ্চল হইতে দেশী নৌকাগুলি সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞাত গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করা হইতেছে।

নয়াদিল্লীর ১২ই জুন তারিখের এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সর্বত্র একরূপ ওজন প্রবর্তন সংক্রান্ত আইন আগামী ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী হইবে।

আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শিলংয়ের সমস্ত কলেজ এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি সার্কুলার পাঠাইয়াছেন। উহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ হোস্টেলের ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগকে সময় থাকিতে তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে বাড়িতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অথবা কোনও নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। আগামী ২৫শে জুন হইতে ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ বলবৎ হইবে।

বিমান আক্রমণকালে জীবজন্তু সম্পর্কেও সতর্কতামূলক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

১৩ই জুন

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত একখানি পুস্তিকায় জরুরী অবস্থায় কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সমস্যা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে যতদূর সম্ভব বিশৃঙ্খলা নিবারণের চেষ্টা করা এবং আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য ও জীবনযাপনোপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে জনসাধারণকে যাহাতে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

কালিকটের জামোরিণ রাজা মনোবিক্রমণের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই জুন

হুরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের পর হইতে প্রায় ২০০০ হুরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৫ই জুন

ভারত সরকারের অসামরিক জনরক্ষা সচিব ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও অদ্য অপরাহ্নে মারা গিয়াছেন।

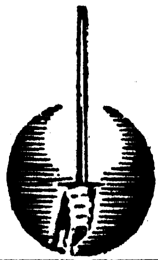
তোমরা কি সংক্রমণ ছড়াচ্ছ?

দেশে একটি অতি ভয়ানক ব্যাধি আছে, যা নাকি মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে এবং তাহার সাহস হরণ করে। এই ব্যাধিই হ'চ্ছে "গুজব"। ইহা সর্ব্বসাধারণের শত্রু জাপানীদের হ'তে ছড়াতে আরম্ভ করে। তোমার বন্ধুবান্ধবদের ইহাদ্বারা সংক্রামিত হ'তে দিও না।

গুজব বিশ্বাস

- - ক'রো না - -

জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের



সমর শক্তি গ'ড়ে তোল।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাশুল সহ ৬৷৷৹ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৷৹ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ— ৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভরতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পেঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵৹ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ--

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর টাকা	৬ মাস টাকা	৩ মাস টাকা	১ মাস টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পেঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনি-অর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 27th June, 1942 [৩৩শ সংখ্যা

দেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ

গান্ধীজীর পরিকল্পনা—

গান্ধীজীর নূতন পরিকল্পনা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা করিতেছে। শুনা যাইতেছে, গভর্নমেণ্ট উক্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি নির্ধারণ করিবেন না, ঘটনার গতির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া চলিবেন। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট নহেন; ভবিষ্যতের ঘটনার গতি যেরূপই দাঁড়াক, গভর্নমেণ্ট ইহা অবশ্যই বুঝিতেছেন; কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতবাসীদের হাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়িয়া দিতে কি তাঁহারা প্রস্তুত? 'ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাউক,' মহাত্মাজীর এই উক্তির তাৎপর্য হইল তাহাই। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ যে আলোচনা চালাইয়া গেলেন, তাহার ব্যর্থতার কারণ হইল এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের হাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মহাত্মাজীর তৎপরবর্তী বিবৃতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পূর্ব মনোভাব পরিবর্তনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মহাত্মাজী বলেন, ভারতবর্ষে অন্য কোন বিদেশী শক্তির প্রভুত্ব ঘটে, তিনি ইহা চাহেন না। মহাত্মাজীর বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত জগৎ পররাজ্যগ্রাসীদের প্রতিষ্ঠা পিপাসা হইতে মুক্ত হইবে না। জগতের স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শের জন্যই তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাহিতেছেন। মহাত্মাজীর দৃষ্টিভঙ্গী একদিক হইতে পুরাপুরি জাতীয়তাবাদ-মূলক হইলেও আন্তর্জাতীয়তার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার উপর মিত্রশক্তির সমরোদ্যমে সহায়ক আন্তর্জাতিক প্রতিবেশ-প্রভাব অনেকটা নির্ভর করিতেছে। কংগ্রেসও এই সত্যটি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে উপলব্ধি করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনেও ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহাদের এই বিশ্বাস এখনও দৃঢ় যে, যুদ্ধোদ্যমে সাফল্য লাভ করিবার জন্য ভারতের স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নাই; পরাধীন ভারতের শক্তিই সে পক্ষে পর্যাপ্ত; তাহা ছাড়া আমেরিকা রহিয়াছে। ভারতবাসীরা ভারতবর্ষ রক্ষা করিবে, এ কথা তাঁহারা মুখে বলিতেছেন বটে, কিন্তু কাজে অন্যরূপ আচরণ করিতেছেন। ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষার অধিকার দেওয়া হইতেছে না—আমেরিকা হইতে সৈন্য আমদানী করিয়া ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থা করা হইতেছে। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর ভারতে উপস্থিতিতে মহাত্মাজীর আপত্তি নাই; তিনি ইহাই চাহিতেছেন যে, স্বাধীন ভারতের সহিত সন্ধি করিয়া ঐরূপ নীতি অবলম্বন করা হউক। অস্ট্রেলিয়ার দেশরক্ষা ব্যাপারেও মার্কিন সামরিকদের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে; কিন্তু সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেণ্টের স্বাধীন কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; স্বাধীনতালব্ধ ভারতের জনশক্তিই ভারতের সমস্যা সমাধানে প্রকৃতপক্ষে সহায়ক হইতে পারে, মহাত্মাজীর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জটিলতা নাই। তিনি যে দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখিতেছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি সেই দৃষ্টি লাভ করিতেন, তাহা হইলে ভারতের সমস্যা এবং সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের সমরোদ্যম সম্পর্কিত সমস্যা এই শেষ মুহূর্তেও অনেকটা সরল হইয়া আসিত; কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের সংস্কার কাটানো সহজ নয়, সে সংস্কার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে আজও বিভ্রান্ত করিতেছে। মহাত্মাজী সে বিভ্রম কাটাইতে চাহিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কাজ—বন্ধুরই কাজ; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি?

গান্ধীজী ও জওহরলাল—

জগতের স্বাধীন রাষ্ট্রসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের যোগ নাই। স্বাধীনতালব্ধ ভারতই আন্তর্জাতিক নীতি এবং মানব-মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে সে অধিকার লাভ করিতে পারে। এই দিক হইতে অন্যান্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা বর্তমানে যেরূপ, ভারতের তাহা নয়। ভারতের শক্তিকে আন্তর্জাতিক আদর্শ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করিতে হইলে জাতীয়তার পথেই তাহা সম্ভব হইবে, অন্যভাবে নহে। পণ্ডিত জওহরলাল

আন্তর্জাতীয়তাবাদী। নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসিস্টবাদের সঙ্গে তাঁহার প্রবল বিরুদ্ধতা। এ বিরুদ্ধতার ভাব ভারতের অন্যান্য রাজনীতিকদের অন্তরেও সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু সে বিরুদ্ধতাকে প্রতিরোধের প্রবল শক্তির পথে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইলে আগে প্রয়োজন ভারতের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা, প্রয়োজন ভারতের স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া। নতুবা আন্তর্জাতীয়তার ধ্বনির কোন মূল্যই বর্তাইবে না। শুধু ফ্যাসিস্টবাদের সূত্র আওড়াইলে কিংবা আন্তর্জাতীয়তাবাদের বড় বড় কথা বলিলেই বর্তমান যুদ্ধ ভারতের পক্ষে জনযুদ্ধে পরিণত হইবে না। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শের উদ্দীপিত জনমত বর্তমান সমরোদ্যমের মূলে প্রেরণা যোগাইলেই এই যুদ্ধ অন্তত ভারতের পক্ষে জনযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। সেদিন বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় পণ্ডিত জওহরলাল কথাটা খুলিয়াই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'কেবল কতকগুলা বাঁধা-জিগীর তুলিলেই বর্তমান যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হইবে না। যাঁহারা ঐরূপ জিগীর তোলেন, তাঁহারা কেহ যদি কোন শহরে বা গ্রামে যান, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতের ৪০ কোটি লোকের মধ্যে কয়েক হাজার লোকও বর্তমান যুদ্ধকে যাঁহারা জনযুদ্ধ বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে।' আমরা আশা করি, আন্তর্জাতীয়তাবাদের বাঁধা বুলি ছাড়া যাঁহারা অন্য কথা বলেন না এবং বর্তমান সমরোদ্যমে ভারতের স্বাধীনতাও যাঁহারা সেই আদর্শের নিকট পরোক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে পরামর্শ দান করেন, পণ্ডিতজীর উক্তি তাঁহাদের ভ্রান্তদৃষ্টি দূর করিতে সহায়তা করিবে।

হিংসা ও অহিংসার সমস্যা—

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সমস্যাকে হিংসা এবং অহিংসার দ্বন্দ্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসা এই জিনিসটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে অকেজো বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে; এদেশেও যে না হয়, ইহাও নহে, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অধিকার দাবী, বিশেষভাবে কংগ্রেসের দাবী অহিংসার ভিত্তির উপর যখন প্রতিষ্ঠিত এবং অহিংসা যখন অকেজো, তখন ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অধিকার দাবীও অকেজো হইবে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের উক্তির ইহাই অনেকটা তাৎপর্য। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটি বিবৃতিতে ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হিংসা কিংবা অহিংসার নীতি কংগ্রেসের পক্ষে বড় নয়। দার্শনিক ও বিশ্বপ্রেমকদের পক্ষেই উহা বিবেচ্য। কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল ভারতের স্বাধীনতা। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে রাষ্ট্র-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভারতবাসীরা যে পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করিবে, তাহাই করিবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে হিংসার পথেও নিজেদের শক্তি প্রয়োগ সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যেখানে শক্তি প্রয়োগ করিবার পথই নাই, সেখানে শক্তি হিংসার সঙ্গে কি অহিংসার সঙ্গে প্রযুক্ত হইবে, এই দ্বন্দ্বের ধুয়া তোলা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া এবং আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

সুবিধাবাদের যুক্তি—

কথাটা শুনিতে আমাদের বাকী নাই, বহুবারই শুনিয়াছি। বিলাতের 'টাইমস্' পত্র পুনশ্চ আমাদিগকে কথাটা শুনাইয়া দিয়াছেন। 'টাইমস' মাতব্বরীর সুরে বলিয়াছেন, ভারত সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেন ক্রীপসের প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত বজায় রাখিবে এবং কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিবে না। ঐ প্রস্তাব ব্রিটেনের এক পরম সম্পদ ছিল এবং এখনও তাহাই আছে। যাহারা ভারতবর্ষের স্বাধীতাকামী, তাহারা অন্তরে অন্তরে জানে, গান্ধীর নীতিতে স্বাধীনতা আসিবে না। ব্রিটিশ যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহার সারার্থ হইল অবিলম্বে ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীদিগকে কার্যকরভাবে কর্তৃত্ব প্রদান; সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ফলে আক্রমণকারীরা বিতাড়িত হইলে পরে ভারতবাসীকে অভীপ্সিত পূর্ণ স্বাধীনতা দান।' আমাদের মতে এ যুক্তি বড় অদ্ভুত যুক্তি। প্রথম কথা এই যে, ক্রীপ্সের প্রস্তাবে ভারতবাসীদিগকে শাসন-ব্যবস্থায় কার্যকর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় নাই। 'দৈনন্দিন' এই কথার আড়ালে প্রকৃত সত্যকে গোপন করা হইয়াছে। অবিলম্বে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতবাসীদিগকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া যে কথাটা রটান হইতেছে, সেই কর্তৃত্ব আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার ক্ষেত্রে নয়। আক্রমণকারীরা বিতাড়িত হইলে পরে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের অভীপ্সিত স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, এ কথাটা শুনিতে অবশ্য ভাল; কিন্তু ভবিষ্যতের এমন প্রতিশ্রুতি সমরোদ্যমে ভারতবাসীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতার ভাব জাগ্রত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতাই কামনা করেন। জাপানের অধীনতার শৃঙ্খল তিনিও চাহেন না, কোন ভারতবাসীই চাহে না; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, স্বাধীন ভারতই ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে। বিদেশী আক্রমণের মুখে ভারতের সেই স্বাধীনতার দাবীকে যাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তাঁহারাই ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় করিতেছেন; কিন্তু এই পথে সাম্রাজ্যবাদীদের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবারও বিপদ রহিয়াছে; তাঁহারা এ সত্যকে এখনও সোজাসুজি উপলব্ধি করুন।

ঐক্য প্রয়োজনীয়তা—

গত ২০শে জুন, শনিবার কলিকাতার টাউন হলে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্তমানের এই সঙ্কটকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যই যে প্রথমে

প্রয়োজন, এ সত্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লীগপন্থীদের অনিষ্টকর প্রচেষ্টার ফলে বাঙলা দেশে যে বিভীষিকার যুগ আসিয়াছিল, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অবলম্বিত নীতিকে তাহা বিদূরিত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতেছে, বাঙলা দেশের পক্ষে ইহা সত্যই আশার কথা। ১৯৩৭ সালে বাঙলা দেশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমিতি প্রথমে স্থাপিত হয়। সমিতি নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া যে আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছিলেন, আজ সমগ্র দেশে সেই আদর্শের অনুকূল আবহাওয়া ফিরিয়া আসিতেছে; কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারে কাটিয়াছে, ইহা বলা যায় না। সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি লোক নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিবেই। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে এদেশে বৃহত্তর স্বার্থের উদারবুদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে প্রতি পদে পদে তৃতীয়পক্ষের প্ররোচনাও রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের প্রভাব হইতে জাতি মুক্ত না হইবে, সে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানও স্থায়ী হইবে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আদর্শকে ঊর্ধে উত্তোলন করিয়া ধরিতে হইবে। এই দিক হইতে ঐক্য সম্মেলনে পরিগৃহীত প্রস্তাবসমূহ আমাদের অন্তরে আশা জাগাইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, বাঙলার হিন্দু এবং বাঙলার মুসলমান উভয়কেই লইয়াই বর্তমান বাঙালী জাতি এবং এক সম্প্রদায়ের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করিয়া ইহাদের কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থই সিদ্ধ হইবে না, সিদ্ধ হইবে তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য। সে পথে এদেশের লোকের হইবে সর্বনাশ, অপরের আসিবে পৌষ মাস। বাঙালী আজ নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া চলিবে, ঐক্য সম্মেলনের বাণী, বাঙালী জাতির এই নব জাগরণের বাণী। জাতীয় ঐক্যের এই আদর্শে বাঙালী পুনরায় সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক হইবে, ইহাই আমরা আশা করি।

অশান্তির আশংকা—

বাঙলা দেশের নানাস্থান হইতে চুরি, ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি জায়গায় হাট-লুটের ব্যাপার বিশেষ আতঙ্কের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিশেষভাবে চাউল, কাপড়, নুন এবং কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধিই এই সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। এই সব জিনিসের অভাব যাহাতে অনর্থ বৃদ্ধি করিতে না পারে, সরকারের সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য; সেই সঙ্গে এই সব উপদ্রব দমন করিবার জন্য বাঙলার গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনীও গঠন করা উচিত। একথা আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি। ইতিমধ্যেই পুনরায় ঢাকার সাম্প্রদায়িক অশান্তির সম্পর্কিত ব্যাপার বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক; এমন দুর্দিনে সাম্প্রদায়িক অশান্তির উপদ্রব যদি নূতন করিয়া দেখা দেয়, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় যাহাতে এই অশান্তির ভাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, সকলেরই সেজন্য অবহিত হওয়া কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার মধ্যযুগীয় বর্বরতায় বাঙলা দেশকে অশেষ রকমে দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, বলিতে গেলে বাঙলার সীমান্তের সন্নিকটে আজ শত্রু-পক্ষ হানা দিয়াছে; দেশের সর্বত্র দারুণ অন্নসংকট এবং অর্থসংকট; এমন সময় সাম্প্রদায়িক অশান্তির ভাব যদি কোন রকমে প্রশ্রয় পায়, সমগ্র দেশে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। আমরা সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি এবং জানি, বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না; কিন্তু শুধু সরকারের প্রচেষ্টাই এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়, বাঙলার সমগ্র শুভবুদ্ধিকে এজন্য প্রযুক্ত করিতে হইবে।

আসামের মন্ত্রিমণ্ডল—

আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতেছে এবং ন্যাশনালিস্ট কোয়ালিশন দলের নেতা শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরীও অবশেষে সেই মন্ত্রিসভায় যোগদান করিতেছেন, সংবাদপত্রে এই সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। আমরা এই সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলাম; কারণ স্যার মহম্মদ সাদুল্লা যে আসামের সর্বসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, একবার দুইবার নহে, অনেকবার এবং অনেক রকমে তাহা নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় জন-নেতৃত্বের নাম লইয়া, নিজেদের লব্ধাধিকারের সুযোগে কেহ যদি স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লন, তবে তিনি জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গই করিবেন। রোহিণীবাবু উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ঐরূপ সংবাদকে তিনি বিরোধী দলের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। আসামের শাসক-বর্গ স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে প্রাধান্য দিতে চাহেন এবং কেন দিতে চাহেন, তাহা আমরা জানি। শ্বেতাঙ্গ চা-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ আসামের শাসনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে কতরকমে চেষ্টা হইতেছে, ইহা আমাদের অবিদিত নাই। আমরা এ সত্য সম্যক্‌রূপেই অবগত আছি যে, আসামের শাসকবর্গের দৃষ্টিতে তথাকার শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থ যদি দেশের জনসাধারণের স্বার্থের অপেক্ষা বড় না হইত, তবে বহু পূর্বেই আসামে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা সম্ভব হইত। এ সম্বন্ধে শাসক-দের শুভবুদ্ধি যদি এখনও জাগ্রত না হইয়া থাকে, তাঁহারা তাঁহাদের মত অনুসারে চলুন; কিন্তু যাঁহাদের কাছে দেশের স্বার্থের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাঁহারা কেহই শাসকদের তেমন রায়ে সায় দিতে পারিবেন না।

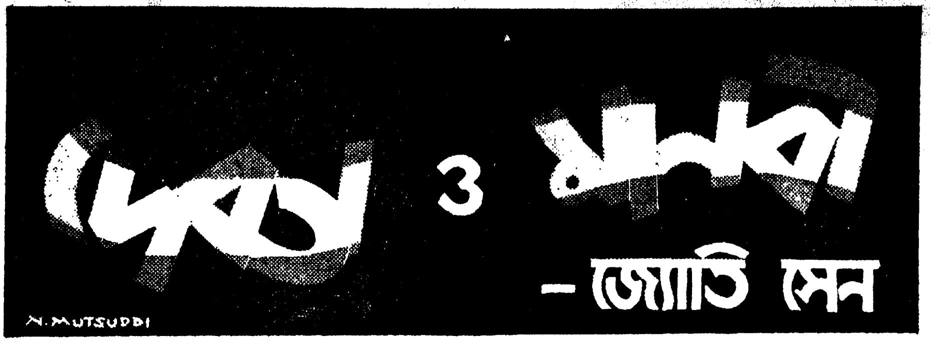
লিবিয়া ও রুশিয়া—

লিবিয়ার লড়াইয়ের এক পর্যায় শেষ হইয়াছে; তব্রুকের পতন হইয়াছে। দীর্ঘকাল তব্রুক রক্ষার জন্য তুমুল সংগ্রামের পর তব্রুকের লড়াইতে ব্রিটিশ বাহিনীর এই পরাজয়ের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিতেছেন। এবারকার পরাজয়েও নূতন কিছু নাই। জার্মানির যন্ত্রবল এবং সৈন্যবলের প্রাধান্যই এবারও এই মরুযুদ্ধে তাঁহাদের জয়ের কারণ। বীর হাকিমের পতন হইবার পরই বুঝা গিয়াছিল যে, জার্মান বাহিনী যেরূপ প্রবলবিক্রমে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে এ যাত্রা তব্রুক রক্ষা করা কঠিন হইবে। গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের উদ্যমস্বরূপে তব্রুকের দিকে অভিযানের উপর জার্মানেরা কিছুদিন হইতে খুবই জোর দিতেছিল। পুন পুন মাল্টা আক্রমণ করিয়া পশ্চিম আফ্রিকায় সেনা এবং সমরোপকরণ সরবরাহের পথ তাহারা প্রশস্ত করিতেই চাহিয়াছে। তব্রুক পতনের পর ব্রিটিশ বাহিনীকে আবার মিশরের সীমানায় হটিয়া আসিতে হইবে, কারণ মাঝে প্রতিরোধ করিবার মত উপযুক্ত ঘাঁটি আর নাই। তব্রুক জার্মানিদের অধিকারে যাওয়ায় ব্রিটিশ পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ হইয়াছে, এখনও সঠিক জানা যাইতেছে না। শুনিতেছি, বহু সৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দী হইয়াছে; কিন্তু এ-সব ছাড়াও ক্ষতির গুরুত্ব আর একদিক হইতে রহিয়াছে। তব্রুক অধিকার করিয়া জার্মানেরা ভূমধ্যসাগরের ধারে উৎকৃষ্ট একটি পোতাশ্রয় তাহাদের হাতে পাইল এবং ইহাতে মিশর আক্রমণের পক্ষে তাহারা সুবিধা লাভ করিবে। ইহা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। লিবিয়ার এই সংগ্রামের সঙ্গে রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের লড়াইয়েরও সম্পর্ক রহিয়াছে। জার্মানি অবশ্য এখনও ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে নাই; কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সিবাস্তোপোল এবং খারকভের পূর্ব-দিকে তাহাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্মানেরা বুঝিতে পারিয়াছে, সিবাস্তোপোল যতদিন তাহারা দখল করিতে না পারিবে এবং ক্রিমিয়ার উপকূলভাগ হইতে রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন পর্যন্ত ককেশাসের অভিযানে তাহাদের উদ্যম সফল হইবে না। জার্মানির এই পূর্বাভিমুখী চাপকে দুর্বল করিতে হইলে ইউরোপের কোন স্থানে তাহাকে আক্রমণ করাই প্রধান উপায়; শুনিতেছি, এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শ করাই মিঃ চার্চিলের আমেরিকা গমনের প্রধান কারণ ছিল। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজারা এবং বন্ধকী বিভাগের বড়কর্তা মিঃ হেরি হপকিন্স বলিয়াছেন, সম্মিলিত পক্ষ জার্মানিকে প্রবল আক্রমণ করিবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে শুধু দ্বিতীয় রণাঙ্গন কেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ রণাঙ্গনও সৃষ্টি করিবে। পরের কথা পরে হইবে, আপাতত রুশিয়ার উপর জার্মানদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে, ইউরোপে যদি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা যায়, তবেই যুদ্ধের অবস্থা অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

চাউলের দর নিয়ন্ত্রণ—

গভর্নমেণ্ট যেভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহার ব্যর্থতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা যে দর বাঁধিয়া দেন, সে দরে জিনিসপত্র খুব কম ক্ষেত্রেই মিলে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শুধু পুলিশের হাতে প্রদত্ত ক্ষমতার জোরে এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে, আগে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা পাকা করা দরকার। তাহা না করিয়া দ্রব্যমূল্য বাঁধিয়া দিতে গেলে বাজারে মাল আমদানী একেবারেই বন্ধ হইতে পারে। চাউলের দাম কিছুদিন হইতে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ গভর্নমেণ্ট মোটা এবং মাঝারি চাউল কি দরে ১লা জুলাই হইতে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহা বাঁধিয়া দিয়া বসিয়া আছেন; অনেক স্থানেই তাঁহাদের সেই বাধা দরের চেয়ে চড়া দরে ইতিমধ্যেই চাউল বিক্রয় হইতেছে। ১লা জুলাই হইতে সে দর নামিবে কেমন করিয়া? যদি দর নামাইতে হয়, তবে যে সব স্থানে চাউলের অনটন দেখা যাইতেছে, সেই সব স্থানে চাউল আমদানীর সুবিধাই আগে করা দরকার। নতুবা দর বাঁধিয়া দিলেই চাউল সে দরে পাওয়া যাইবে না। ব্যবসায়ীরা চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়াই হয়ত বসিবে এবং তাহার ফলে সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে। সুতরাং বিষয়টি অতটা ছোট করিয়া দেখিলে চলিবে না এবং দর বাঁধিয়া দিবার ক্ষমতা যখন হাতে আছে, তখন যখন খুসি দর বাঁধিয়া দিলেই জিনিস-পত্রের দুষ্প্রাপ্যতা কমিবে না। এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ব্যাপক এবং সর্বভারতীয় পরিকল্পনা লইয়া গভর্নমেণ্টের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। দর বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, আমরা একথা অস্বীকার করি না; কিন্তু মাল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা অধিক রহিয়াছে, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সফল তো হইবেই না, বরং যাহারা খরিদ্দার, তাহাদের পক্ষে উহা কুফলই প্রসব করিবে।

লবণ এবং কেরোসিনের ক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গভর্নমেণ্ট লবণের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বাহির হইতে বাঙলা দেশে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা তাঁহারা কি করিয়াছেন জানা যায় নাই। কলিকাতার ভারতীয় বণিক-সভা সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ডের নিকট যে তার প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, কলিকাতা শহরে বর্তমানে দশ লক্ষ মণের অধিক লবণ নাই; এই পরিমাণ লবণ বড় জোর এক মাস চলিতে পারে; কিন্তু তাহার পরে? বিহার গভর্নমেণ্ট ভারত সরকারের মারফতে চেষ্টা করিয়া সেখানে লবণ আমদানী করিবার জন্য ৪০খানা মালগাড়ির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত বাঙলা দেশে লবণ আমদানীর জন্য মালগাড়ির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সমস্যার গোড়া রহিয়াছে এইখানে, শুধু দর বাঁধিয়া দিলে সমস্যা মিটিবে না, বাঙলা সরকারকে আমরা সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।



২২

পদ্মার দিনগুলি ননীমাধবের কাছে পড়াশুনা করিয়া ও প্রতিমার গাড়িতে এখানে ওখানে বেড়াইয়া একরকম ভালই কাটিতেছিল। জয়ন্ত না থাকায় তাহার প্রথম দিন যে রকম খারাপ লাগিয়াছিল, তার পরদিন হইতে আর তেমন খারাপ লাগে নাই। বরং নিজের ইচ্ছামত চলিতে ফিরিতে পারিয়া জয়ন্তের অনুপস্থিতিটাই তাহার ভাল লাগিতেছিল।

রাণু আসিয়াছিল বেড়াইতে। রাণু বলিয়াছিল, তাহার বন্ধুবান্ধবেরা পদ্মাকে দেখিবার জন্য ও পদ্মার সঙ্গে পরিচয় করিবার জন্য উৎসুক। পদ্মাও ইহাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। রাণু সকলকে তাহাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়া আলাপ করাইয়া দিয়াছে। সেই হইতে পদ্মার আর নিমন্ত্রণের কামাই নাই। আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি, নিমন্ত্রণ লাগিয়াই আছে।

এই সব নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে দিলীপের সঙ্গেও পদ্মার কয়েক বার দেখা হইয়াছে। যতবারই দেখা হইয়াছে ততবারই দিলীপ পদ্মাকে জয়ন্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। কোথায় আছে সে, কি করিতেছে, কবে আসিবে? পদ্মার যেমন জানা আছে—জবাব দিয়াছে।

জয়ন্তের যেদিন আসিবার কথা তার পরদিন বৈকালে দিলীপ গিয়াছিল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে। সেদিনও জয়ন্ত আসে নাই শুনিয়া দিলীপ চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পদ্মা তাহাকে যাইতে দিল না।

দিলীপকে বসিতে বলিয়া পদ্মা নিজেও বসিল।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল—'ওঁর কাছে আপনার কি দরকার বলুন ত?'

দিলীপ কহিল—'দরকার এমন কিছু নয়।'

পদ্মা একটু বিস্মিত হইল। জয়ন্ত এখানে থাকিতে দিলীপকে সে একদিনও আসিতে দেখে নাই। জয়ন্ত বাহিরে যাইবার পর সে এত খোঁজখবর লইতেছে কেন?

পদ্মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'দরকার নেই ত এসেছিলেন কেন?'

দিলীপ কহিল—'শুনেছিলাম আমাকে পেলে নাকি উনি একটা হাসপাতাল খুলবেন শ্রমিকদের জন্যে, তাই বলতে এসেছিলাম—আমি রাজী আছি।'

—'সরকারী হাসপাতাল থাকতে আর হাসপাতালের দরকার কি?'

—'গরীবের দেশে এ সব যত হয় ততই ভাল।'

পদ্মা উষ্ণ কণ্ঠে কহিল—'ভাল ত বুঝলাম! কিন্তু টাকাটা কোত্থেকে আসছে শুনি? টাকার কি গাছ আছে যে গাছ থেকে পড়বে আর কুড়িয়ে নিয়ে হাসপাতালের খরচ জোগাবেন?'

একবার থামিয়া পদ্মা পুনরায় বলিল—'হাসপাতালের জন্য সমস্ত টাকা খরচ করে উনি যদি ফতুর হ'য়ে পড়েন তা হ'লে আমাদের কি দুর্গতি হবে একবার ভেবে দেখুন দেখি! আপনারা কি আমাদের পথে বসাতে চান?'

পদ্মার কথা শুনিয়া দিলীপ একেবারে দমিয়া গেল। জয়ন্তের কি পরিমাণ টাকা আছে তা-ও দিলীপ জানে না, হাসপাতাল খুলিবার প্ররোচনাও সে দেয় নাই। দিলীপ বলিল—'আপনি যদি মনে করেন, হাসপাতাল খুলতে গেলে তিনি টাকার অসুবিধায় পড়বেন, তা' হ'লে আপনি তাঁকে মানা করবেন।'

—'না, আমি মানা করব না, আমি মানা করলে কোন ফল হবে না। মানা করতে হবে আপনাকে।'

—'আমার কথাই বা তিনি শুনবেন কেন?'

—'আপনি এতে যোগ না দিলেই উনি এতে হাত দেবেন না।'

—'কিন্তু আমি যে প্রতিমাকে বলেছি একাজে যোগ দিতে আমি প্রস্তুত আছি. এখন ত আর কথা ফিরিয়ে নিতে পারি না।'

পদ্মা উত্তেজিত হইয়া কহিল—'প্রতিমাকে কথা দিয়েছেন তাতে কি হ'য়েচে? আপনার কথাটাই কি বড় হ'ল? তাই যদি মনে করেন তা' হ'লে নিজেই হাসপাতালটা খুলে ফেলুন না।—আপনারও ত ঢের টাকা আছে শুনেছি।'

দিলীপের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। কিছুক্ষণ সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে সে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ বাদে সে কহিল—'আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখব'—বলিয়া দিলীপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

পদ্মা কহিল—'উঠলেন যে বড়?'

—'যাই।'

—'না, আর একটু বসুন। আমার ওপর রাগ করে' চলে' যাচ্ছেন ত? রাগ নিয়ে আমি আপনাকে যেতে দেব না।'

বাধ্য হইয়া দিলীপ বসিল। হাসিয়া কহিল—'আমি রাগ করলেইবা আপনার ক্ষতি কি!'

পদ্মা সে কথার জবাব না দিয়া বলিল—দেখুন, অপ্রিয়

কথা বলতে আমার মুখে বাধে না, কিন্তু বলেও আবার অনুতাপ হয়। আপনাকে অনেক কথাই বলেছি, আপনি না জানি কি মনে করেছেন!'

দিলীপ সহজ ভাবেই কহিল—'অন্যায় ত কিছু বলেন নি। অপ্রিয় হ'লেও কথাগুলি খুবই খাঁটি। জয়ন্তবাবু যদি দান করে' ফতুর হয়ে পড়েন তবে ত' আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। আপনার এ বিষয়ে সাবধান না হ'লে চলবে কেন! এতে আমি যদি কিছু মনে করি সে দোষ আমার।'

—'আপনি তা হ'লে রাগ করেননি বলুন!'

—'আত্মাভিমানে একটু লেগেছিল স্বীকার করছি—কিন্তু সে ব্যথাও আর নেই। আপনার সরলতায় আমি মুগ্ধ হ'য়েছি।

পদ্মা হাসিয়া বলিল—'জানেন ত আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। আমার যা' মনে আসে আমি তা' সোজাসুজি বলে ফেলি। এজন্যে অনেকে আমার ওপর বিরক্ত হয়। কিন্তু কি করব, স্বভাব যায় না মলে' !'

'শহরের সভ্যতা এখনো আপনার স্বভাব শোধরাতে পারেনি দেখছি!'—বলিয়া দিলীপও হাসিল। তারপর পুনরায় কহিল—'কিন্তু শহরে যারা থাকে তা'দের ত এ রকম স্বভাব থাকলে চলে না।'

পদ্মা বলিল—'তা'ত বুঝতেই পারছি। সোসাইটির মেয়েদের সঙ্গে এজন্যে আমার খাপ খায় না। সামনে থাকলে একজনের সঙ্গে আর একজনের কি গলাগলি ভাব, আর আড়ালে গেলেই চোদ্দ পুরুষের পিণ্ডি চট্‌কায়। আমি সে সব পারিও না, আমার তা' ভালও লাগে না।'

কথায় কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হাত-ঘড়িটার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িলে দিলীপ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণ বসিয়া থাকা সঙ্গত হয় নাই বুঝিতে পারিয়া দিলীপ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইতে যাইতে বলিয়া গেল,—জয়ন্ত ফিরিলে তাহাকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়।

দিন দুই বাদে জয়ন্ত কলিকাতায় ফিরিলে দিলীপ খবর পাইয়া দেখা করিতে আসিল। পদ্মার কাছে জয়ন্ত সমস্তই শুনিয়াছিল। দিলীপকে সাদরে জড়াইয়া ধরিয়া জয়ন্ত বলিল—'My dear fellow, I knew—you would take part in our noble work?'

'Yes, that's Why I Came to you.'—বলিয়া দিলীপ নিজকে ছাড়াইয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তারপর পুনরায় কহিল—'I would do anything you wished.'

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল—'ডাক্তার, আমি জান্‌তুম একদিন তোমাকে এ পথে আসতেই হবে। যে কারণেই হোক্—তুমি যে এসেছ, তাতে আমি খুশী হ'য়েছি। বর্তমান সমাজের গ্লানি নিজের চোখে দেখেও যদি কেউ উদাসীন থাকে, তা' হ'লে তাকে মানুষ বলা যায় কি?—সে ত ইতর প্রাণীরও অধম। তুমি যে তাদের অনেক ওপরে, তা' আমি জান্‌তুম।'

—'আমাকে মহৎ মনে করবারও কোন কারণ নেই।'

—'বল কি ডাক্তার! আত্মত্যাগের মন্ত্র তুমি পেয়েছ, এ মন্ত্রের সাধনা করতে করতেই একদিন তোমাকে প্রাণ দিতে হবে, তোমাকে মহৎ মনে করব না!'

তারপর কাজের কথা সুরু হইল।

দিলীপ বলিল—'আমাকে তা' হ'লে কি কাজ দেবেন—দিন।'

জয়ন্ত কহিল—'শ্রমিকদের জন্য আমি একটা নার্সিংহোম্ খুলব, তার সম্পূর্ণ ভার তোমাকে নিতে হবে।'

'কিন্তু একটা কথা',—বলিয়া দিলীপ ইতস্তত করিতে লাগিল।

জয়ন্ত অভয় দিয়া বলিল—'বল!'

এমন সময় পদ্মা আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। দিলীপ তাহার দিকে একবার তাকাইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—'নার্সিংহোম্ খুলতে যে টাকা লাগবে, সে টাকা সর্বসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগ্রহ করতে হবে।'

কথাটা জয়ন্তের মনঃপূত হইল না।

জয়ন্ত বলিল—'চাঁদা তুলে কাজ আরম্ভ করতে ঢের সময় লাগবে। তা' ছাড়া চাঁদাও বেশী আদায় হবে না।'

পদ্মা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—'দিলীপবাবু যদি সে ভার নেন তা হ'লে তোমার তাতে আপত্তি করবার কি আছে?'

দিলীপ সহজ ভাবে কহিল—'চাঁদা আদায় করে' যা সংগ্রহ হয় হবে, আর বাদ বাকী আমি নিজে দেব।'—এই বলিয়া সে পদ্মার পানে তাকাইল।

পদ্মাও তাহার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্ত বলিল—'তা' বেশ, তোমার ওপর সমস্ত ভার রইল, ছ' মাসের মধ্যে আমি নার্সিংহোম্ Complete দেখতে চাই।'

পদ্মা দিলীপকে বলিল—'দিলীপবাবু, আপনার নার্সের তালিকায় আমার নামটাও লিখে নেবেন।'

দিলীপ হাসিয়া বলিল—'নার্সিং করতে হ'লে নার্সিং আগে শিখতে হবে। না শিখলে চলবে না। কাজটা তুচ্ছ নয়।'

—'বেশ ত, আপনি শিখিয়ে দেবেন।'

সেবার কাজে পদ্মার আগ্রহ জন্মিয়াছে দেখিয়া জয়ন্ত মনে মনে খুশী হইল। একদিন সে-ই পদ্মাকে শ্রমিকদের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পদ্মা তেমন গা করে নাই। আজ তার মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে মনে করিয়া জয়ন্ত তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল—'তোমার প্রস্তাব ডাক্তার নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতে পারবে না পদ্মা, বরং খুশী হ'য়ে তোমাকে শেখাবে। কি বল ডাক্তার, এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি?'

দিলীপ হাসিয়া কহিল—'উনি যদি সত্যি আমাদের নার্সিংহোমে যোগ দেন তা' হ'লে আমি যত্ন করেই শেখাব। কিন্তু উনি ত আরো কাজ করতে পারেন। নার্সিংহোমের জন্য মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে হবে, সে ভার যদি উনি নেন,—'

জয়ন্ত তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—'এ বিষয়ে প্রতিমাকে বল্লেই বোধ করি ভাল হয়। প্রতিমা এর আগেও অনেকবার চাঁদা তুলেছে।'

জয়ন্তের কথায় পদ্মার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল।

(শেষাংশ ৮৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্যাসুয়ালটি ব্লক

শ্রীকনাদগুপ্ত

হাসপাতাল। ক্যাসুয়ালটি ব্লক। প্রায় মধ্যরাত্রি।

জেনারেল ওয়ার্ডের লম্বা হলঘরে প্রায় সব আলোগুলোই নিভানো, কেবল একটি জ্বালা—তার তলায় পাত্লা লাল কাগজ। আলোর অভাব থাকলেও ঘরে কিন্তু ধ্বনির অভাব নেই। উত্তর কোণের রেলে চাপাপড়া কুলীটার আজ পা বাদ দেওয়া হয়েছে, এখনও 'জান্ গিয়া' 'জান্ গিয়া' করছে ; দাঙ্গা করে পেটে ছোরা খেয়েছে যে কাল্লু সেখ সে এখনও তার আততায়ীর উদ্দেশে অভিশাপ পাড়ছে ; তিন নম্বর বেডে আগুনে পোড়া ছোট ছেলেটি এখনও ককিয়ে ককিয়ে মাকে ডাকছে—মা প্রবেশাধিকার পায়নি, তাই বাইরের বারান্দায় শুয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে। ওপাশের ছোট ঘর থেকে মাঝে মাঝে নার্সের তীক্ষ্ণ কাংস্যকণ্ঠের ধমক ভেসে আসছে—শো যাও, শো যাও, এ তোমরা ঘরবাড়ি নেহি হ্যায়, এ হাসপাতাল হ্যায়।

একটা বুড়ো মাজাভাঙা পেসেণ্ট বহুক্ষণ ধরে ভাঙা-গলায় মেথরকে ডাক্ছে। মেথর বাইরে থেকে ঘুমেভরা স্বরে রসিকতা করছে, 'মেথর মর্ গিয়া', অবশেষে বুড়োটা কেঁদে উঠলে রাগতভাবে উঠে এসে তার বেডে বোতল গুঁজে দিচ্ছে।

জেনারেল ওয়ার্ড বলে পেসেণ্টরা সাধারণত নিম্নশ্রেণীর হলেও, জনকয়েক ভদ্রলোকও আছেন। কারুর কারবাঙ্কল্, কারুর কানের ফোড়া প্রভৃতি অপারেসন হয়েছে। এখন সেরে উঠ্ছেন। ঘরের ধ্বনিমুখরতায় নিদ্রা আকর্ষণ না হওয়ায় মাঝে মাঝে হাই তুলছেন এবং হল ও ছোট ঘরের মাঝে যে লম্বা কাচের ব্যবধান আছে, সেইদিকে পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, একটি নার্স দিয়াশলাই জেলে একটি ছোক্রা হাউস্-সার্জনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঘটনাটার যা অর্থ, তাকে বেশ একটু বড় এবং বিকৃত করে ভদ্রলোকেরা নিজেদের জন্য যৎকিঞ্চিৎ কৌতুক আহরণের চেষ্টা করছেন।

একজন আর একজনকে বললেন, "কেমন দেখছেন, সেনমশাই ?"

দীর্ঘ হাই তুলে সেনমশাই একটু চুপি চুপি বললেন, "আর কি, বায়স্কোপ।",

বাইশ নম্বর বেডে পা-ভাঙা পাকড়াশী মশায়ের ডান পা লম্বা করে এক্সটেনসনে বাঁধা ছিল। যথাসম্ভব ঠ্যাংটিকে কোলের দিকে টেনে আওয়াজ করে হেসে বললেন, "বায়স্কোপ কি মশায়, বিন্দাবন, বিন্দাবন।"

কথাটায় সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নার্সের কাংস্যকণ্ঠের ভর্ৎসনা আবার ভেসে এল, "শো যাও, এ ঘরবাড়ি নেই হ্যায়, এ হসপাতাল হ্যায়।"

এ অবধি যা ঘটল, তা হাসপাতালের দৈনন্দিন ঘটনা। এর ঊনিশ-বিশ হয়, কিন্তু ব্যতিক্রম হয় না। বড় জোর কোন রাতে হয়তো কোন নতুন পেসেণ্ট আসে—আগুনে পুড়েছে, কি গুলী খেয়েছে, কি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছে—নার্স হয় জায়গা নেই বলে ফিরিয়ে দেয়, নয় দুমিনিটের মধ্যে এ্যাড্‌মিট করিয়ে নিয়ে আবার তার পাশের ঘরের চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। আধা ঘুম, আধা জাগায় পেসেণ্টদের রাত পুইয়ে যায়। ভোরের আলো আর কলরবকে তারা অভ্যর্থনা করে।

আজ রাতে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম ঘট্লো।

হঠাৎ রাত-ডিউটির কুলি খিলাওয়েন হলঘরের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে নার্সের কামরায় উপস্থিত হয়ে বললে, "মেমসাব্ পেসেণ্ট আয়া।"

মেমসায়েব খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "আয়া তো মেরা শিরপের চড়্‌হা দেও। যাও, বলো জায়গা নেই, এ ওয়ার্ডে এ্যাডমিসন্ হবে না।"

"বড় ভারী কেস, মেম্‌সাব্", খিলাওয়েন বললে, "পেসেন্ট মটর চাপা পড়েছে, ধুঁকছে, বাঁচবে বলে মনে হয় না।"

"যাও যাও, বলো, জায়গা নেই ! রাস্তার ভিখারী বা কুলীটুলি হবে বোধ হয়, ওসব রাস্তায় মরাই ভাল।"

কুলি চলে গেল। নার্স একখানা এড্‌গার ওয়ালেস্ পড়ছিলেন, পুনরায় সেইদিকেই মনোনিবেশ করলেন।

মিনিট দুই পরে বুটের শব্দে ওয়ার্ড সচকিত করে প্রবেশ করলেন, জুনিয়ার হাউস সার্জন ডক্টর রায় চৌধুরী। নার্সের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে টাইটাকে একবার নেড়েচেড়ে ডান হাত দিয়ে চশমাটিকে নাকের ঢিপিতে বসিয়ে পর্দা ঠেলে ঢুকে বললেন, "নার্স পার্লহোয়াইট, কি হলো, রোগী এ্যাড্‌মিট করলে না কেন ?"

পার্লহোয়াইট ক্রোধে রাঙা হয়ে হাতের বই ধপাস করে মাটিতে ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ডক্টর রায় চৌধুরী, পেসেন্ট কি আমি পকেটে রাখব। ওয়ার্ড অলরেডি ভর্তি, আর বেড্ কোথা যে পেসেণ্ট নেবো ?"

ডক্টর রায় চৌধুরী বললেন, "তা হলেও এক্সট্রা-পেসেণ্ট তো এক-আধজন রোজই নেওয়া হচ্ছে।"

নার্স বললেন, "আমি সিস্টার ইন্‌চার্জকে ডেকে দিচ্ছি।"

সিস্টার ইনচার্জ ঘরে প্রবেশই করলেন ঘাড় নাড়তে নাড়তে।

"না না, ডক্টর, রোগীটোগী আর নতুন নেওয়ার আদপেই জায়গা নেই। আর দেখ, যত সব কুলি মজুর আর লোক্লাস লোকগুলোর জন্য রোজ রোজ তোমরা আমাদের এমন দিক্ কর কেন বল তো? আমরা কি কলের মানুষ? খাটলে টায়ারড্ হই না?"

"তা বটে", জুনিয়ার একটু চুপ করে থেকে মন্তব্য করলেন। "কিন্তু রেসিডেণ্ট সার্জন বলে পাঠিয়েছেন রোগীকে এ্যাডমিট করার জন্য।"

এক মুহূর্তে সিস্টারের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল, কণ্ঠস্বর সাত পর্দা নেমে গেল।

"তাই নাকি? তা তো বটেই, রাত্রে এসেছে বলে কি এমার জেন্সি কেস্ নেওয়া হবে না নাকি? এসব হলো নার্স আর কুলিদের বদমায়সি। ডক্টর, এসব স্টাফ নিয়ে যে কাজ করা কি ঝকমারী তা আর তোমায় কি বলব? Nurse, what makes you stand still? Hurry up, admit the patient. খিলাওয়েল, তোম্ কেয়া দুষ্মন হ্যায়, জল্‌দি যাও, নার্স মেম্‌কো assist করো।"

তারপর জুনিয়ারের দিকে চেয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "Doctor, is he a very big man?"

জুনিয়ার বললেন, "তা তো জানি না, আমি নিজে এখনও পেসেণ্টকে দেখিই নি।"

"তাই নাকি? ওঃ, কই আর এস এর চিঠি দেখি।"

"চিঠি নয়, মুখে কুলিকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন।"

"ওঃ, তাই বুঝি" সিস্টারের ভয়ে কোঁচকানো কপাল আবার বলিহীন হলো। "আমিও তো তাই বলি। আর এস তো টপ্

করে পক্ষপাতিত্ব করবার লোক নন যে, যাকে তাকে রেকমেণ্ড করবেন—তা ছাড়া, এই রাতে কোনও ভদ্রলোক কখনও এ্যাকসিডেণ্ট করেন। এই কুলি, যাও, তোম অপ্‌না কামমে যাও।"

জুনিয়ার হাসপাতালে রোগীকে নেওয়ার সঙ্গে পিতৃশ্রাদ্ধ পালন করার কোন সাদৃশ্য না পেয়ে আর পেড়াপিড়ি না করে নীচে নেমে গেলেন।

সিস্‌টারও আপদ চুকলো মনে করে প্রস্থানোদ্যত হচ্ছিলেন, আবার ওয়ার্ডে জুতার শব্দ। বিরক্ত চিত্তে পিছনে ফিরে দেখলেন, সিনিয়র হাউস সার্জন।

ব্যস্তভাবে সিনিয়র বললেন, "ভয়ানক ভারী কেস্‌ সিস্‌টার, নিতেই হবে।"

সিস্‌টার কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন. উঃ! ডক্টর, life miserable করে তুললে দেখছি। রাত্রে গাড়ি চাপা পড়া কি তোমার দেশের সকল শ্রেণীর লোকের স্বভাব! বেস, আমি হাসপাতালে আর ভিড় বাড়াতে পরবো না। তোমার ইচ্ছা হয়, এ্যাডমিট্‌ করাও।"

সিনিয়র ভাবলেন, ইচ্ছা করলে সিস্‌টারের উপর হুকুম চালাতে পারেন বটে, কিন্তু নার্সদের কর্ত্রীকে চটালে সুবিধা হবে না।

শুধু বললেন, "বেশ, তাহলে ফিরিয়েই দি। কিন্তু সাহেবকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনলে ওপরওয়ালারা কি খুব খুসী হবেন?"

"সাহেব!" সিস্‌টার-ইন-চার্জকে যেন কেউ আকাশ থেকে সবেগে ফেলে দিল। "সাহেব! কই, সে কথা তো আপনি আমায় বলেন নি। আপনাদের কর্তব্যজ্ঞান তো বেশ! একটা মানুষ আহত হয়ে বাইরে পড়ে আছে, বলছেন সিরিয়স্‌ কেস, অথচ এখনও তাকে ওয়ার্ডে এ্যাডমিট করেন নি? কি সাহেব, ডক্টর, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান না ইউরোপীয়ান?"

"রং দেখে তো মনে হোল খাস ইউরোপীয়ান।"

"Good God! কুলি, কুলি, মেথর, নার্স—কেয়া করতা তোম্‌? জল্‌দি পালং লে আও। Doctor, why don't you hurry up and take him in?"

ডাকে হাঁকে সিস্‌টার-ইন-চার্জ রাত্রিকে দিনের মত মুখর ও চঞ্চল করে তুললেন। কুলিদের সঙ্গে নিজেও হাত ভিড়িয়ে কোণের আরামপ্রদ বেডের পেসেণ্টকে দূরে বারান্দায় সরিয়ে দিয়ে সেখানে একটা ডবল তোষক-আঁটা, চারদিক ঘেরা খাট নিয়ে এলেন। চাদর, কম্বল প্রভৃতি পেতে দিলেন। ইন্‌জেকসন, ওষুধ, প্যাসনল প্রভৃতি যা যা আশু দরকার হতে পারে, হাতের কাছে রেখে দিলেন। চীৎকারে পেসেণ্টদের বিনিদ্র করে তুললেন এবং সর্বক্ষণ গজরাতে লাগলেন, "Devil of a doctor! A European, and still kept waiting!"

অল্পক্ষণ পরেই চলমান স্ট্রেচারের উপর পেসেণ্টকে নিয়ে কুলিরা ওয়ার্ডে প্রবেশ করল। পিছনে ডাক্তারদ্বয়। সিস্টার-ইন-চার্জ পার্ল হোয়াইট এবং কুলিদের সাহায্যে পেসেণ্টকে বেডে তুলে নিলেন। পেসেণ্টকে দেখতে সত্যই ইউরোপীয়ানদের মত—সাদা ধব্‌ধবে রঙ্‌, মুখে লাল লাল ছোপ, চুলে জট, মাথার পিছন দিকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে—কেসটা হেড ইনজুরির কেস। চোখ দিয়েও খানিক খানিক রক্ত গড়িয়ে কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফের উপর এসে পড়ছে। পেসেণ্ট অজ্ঞান।

থানার জমাদার রিপোর্ট নিতে এলে সিস্‌টার হাঁকিয়ে দিলেনঃ "মানুষটা মরছে, আর তুমি এখন এসেছ রিপোর্ট নিতে! Wait."

নার্সকে বললেন, "Perhaps a clergyman."

"Perhaps" নার্স সায় দিলেন।

সিস্‌টার নিজে রোগীকে স্পঞ্জ করিয়ে দিয়ে হাসপাতালের রোগী-ইউনিফরম পরিয়ে দিলেন। ডাক্তাররা ইনজেক্‌সন দিয়ে অক্সিজেনের নল নার্সের সাহায্যে রোগীর নাকে গুঁজে দিলেন। পীড়িত সন্তানের শয্যাশিয়রে যেমন জননী দাঁড়িয়ে থাকেন, সিস্‌টার এবং নার্স তেমনিভাবে সোদ্বেগে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অন্যান্য পেসেণ্টরা পরস্পর জনান্তিকে বলাবলি করতে লাগল, "ও কি আর বাঁচবে? ওর টাইম হয়ে এসেছে।"

এক সময় সিস্‌টার একটু ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, "ডক্টর, আমার মনে হচ্ছে, একে আমি যথেষ্ট যত্ন করতে পারছি না, আর এস এঁকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে নিলেন না কেন?"

সিনিয়র বললেন, "তা তো জানি না, বোধ হয় বেড ছিল না।"

ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। কিন্তু ইনজেক্‌সন, অক্সিজেন গ্যাস বা সিসটারের মাতৃযত্ন কিছুই বিশেষ কাজে এল না। অন্য জাতির রোগী হলে হয়তো এতক্ষণ জাতি হারাত বোধহয় ইউরোপীয়ান বলেই যুঝছে।

অন্য পেসেণ্ট হলে নার্সের এডগার ওয়ালেস এতক্ষণ শেষ হয়ে যেত। কিন্তু পার্ল হোয়াইট আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রোগীর গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। রাত চারটের সময় নাড়ী পাওয়া যায় না, এমন হোল। সিস্‌টার ফোন ঘরে ছুটে গেলেন। পেসেণ্ট সেকেণ্ড সার্জনের ;—সেকেণ্ড সার্জনকে ডেকে—আসার অনুরোধ করলেন। পেসেণ্টের বর্ণ এবং জাতি কি তাও জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সেকেণ্ড সার্জনের তখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। রোগীর ইউরোপীয়ানত্বও তাঁকে সেই রাতে ঘরের বার করতে পারলো না। সিস্‌টার ডাকলেন ডেপুটী সার্জনকে। আধঘণ্টা পরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে সিনিয়র হাউস সার্জনকে একটা ইনজেক্‌সান দেবার উপদেশ দিলেন এবং বললেন, "যদি টেঁকে তো কাল একটা অপারেশন করতে হবে।" ডেপুটী সার্জন বাড়ি চলে গেলেন; সিনিয়র এবং জুনিয়ার হাউস সার্জনও একটু গড়িয়ে নেবার জন্য নীচে গেলেন। শুধু সিস্‌টার-ইন-চার্জ নিজে ইতিহাস-খ্যাত ফ্লোরেন্স নাইটইঙ্গেলের মত রোগীর গায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলেন।

পাশের ঘরের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। ভোরের হাওয়া পেয়ে সিস্‌টার একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন।

হঠাৎ এক সময় একটা আর্ত চীৎকারে সিস্‌টার-ইন-চার্জের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"ইস্‌কো নিকাল দিজিয়ে মেম্‌সাব, ইস্‌কো নিকাল দিজিয়ে।"

ইউরোপীয়ান পেসেণ্টের পাশের বেড থেকে একটা হাতভাঙ্গা কাপড় কলের কুলী তারস্বরে চীৎকার করছে।

তখন পূবের জানালা দিয়ে অনেকখানি সূর্যের আলো ওয়ার্ডে প্রবেশ করেছে। হেড সর্দার ওপাশ থেকে রোগীদের পাউরুটী বিলি করা সুরু করেছে।

"কেয়া হুয়া?" সিস্‌টার-ইন-চার্জ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিরক্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন।

"সিস্‌টার মেম্‌সাব, এ পেসেণ্টকো নিকাল দিজিয়ে, নেহি তো হম্‌ হাসপাতালমে নেহি রহেগা। ইন্‌কো কুঠ্‌ হ্যায়।"

"কুঠ! কুঠ কেয়া," বলিয়া সকৌতুকে ইউরোপীয়ান পেসেণ্টের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতেই সহসা ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় এবং ওই শ্রেণীর আরও নানাপ্রকার আবেগে সিস্‌টার মেমসাহেবের সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল।

"Good God! A leper!"

তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে গ্যালন গ্যালন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিয়ে বার বার দুই হাত ধুয়ে ফেললেন, মনে মনে বলতে লাগলেন, "And I have all out massaged him."

অতঃপর বস্ত্রাদি বদলে ওয়ার্ডে পুনঃপ্রবেশ করে নার্স এবং কুলিদের ডেকে তিরস্কারের ফোয়ারা ছোটালেন।

নার্সকে বললেন, "ছি ছি, ইংরেজী তোমার নিজের ভাষা আর তুমি ইউরোপীয়ান চেনো না! একটা রাস্তার কুঠে ভিখারী তোমার

কাছ থেকে ইউরোপীয়ানের মর্যাদা নিয়ে নিল? ধবলের রং আর ইউরোপীয়ানের সাদা রঙে কি তফাৎ তা তুমি বোঝ না? আর সে ডাক্তারগুলোই বা কি রকম? চোখের মাথা খেয়েছে? Good God! A leper! And I've all out massaged him."

নার্স গতিক সুবিধা নয় দেখে শুধু বললে, "I'm helpless. He had white skin."

কুলিদের ডেকে সিস্টার-ইন-চার্জ তেড়ে উঠে বললেন "যাও, এ পেসেন্টকে এখনি নিয়ে ঐ বারান্দায় ফেলগে। আভি। আর এ জায়গা জল দিয়ে মুছে সোয়াব্ করে দাও। জলদি। Good God! A leper!"

সিস্টার মেমকে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দু'জন তখুনি কার্যে তৎপর হল। স্ট্রেচার এনে রোগীকে তুলবার সময় কিন্তু একজন হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, "মেমসাব, এ তো হো গিয়া।"

"কেয়া হো গিয়া?"

"শ্বাস নেহি, পেসেণ্ট মর গিয়া।"

"মর গিয়া! Then rightly served."

এদেশী একজন ধবল রোগী ফাঁকি দিয়ে সিস্টার-ইন-চার্জের হাতে যে ইউরোপীয়ানের যত্ন আদায় করেছিল, মৃত্যুতে তার উচিত শাস্তি হল মনে করে সিস্টার-ইন-চার্জ আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তারপর সহসা ডানহাতের তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে দুই কাঁধ আর বুকের কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করে ত্রাণ-কর্তাকে স্মরণপূর্বক বোধকরি বা প্রবঞ্চকের জন্য মার্জনা ভিক্ষা চেয়ে নিলেন।

দেবতা ও মানবী

(৮৫২ পৃষ্ঠার পর)

পদ্মা আহত কণ্ঠে কহিল—'সবটাতেই তোমার প্রতিমাকে না হ'লে চলে না। কেন? প্রতিমার যোগ্যতা যে সব বিষয়েই সকলের চেয়ে বেশী তা' তুমি কি ক'রে জানলে? প্রতিমা অনেকবার চাঁদা তুলেছে সুতরাং আর কেউ তার মত চাঁদা তুলতে পারবে না, এটা একটা অদ্ভুত যুক্তি!'

জয়ন্ত হাসিয়া কহিল—'তুমি যদি মনে কর, এ ভার তুমি নিতে পারবে তা' হ'লে নাও না ভার। পারলে আমিই সবচেয়ে খুশী হব। আমিও ত তাই চাই।'

'পারি কিনা তুমি দেখে নিও'—বলিয়া পদ্মা সদর্পে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

একটু বাদে জয়ন্ত বলিল—'ডাক্তার, আমি কিন্তু তোমার ওপর এ বিষয়ে নির্ভর করে' নিশ্চিন্ত থাকব। আমার আপাতত এ দিকে নজর দেবার সময় নেই। কারখানাটা খুব শীগগীরই Open করা হবে। আমার সহকর্মীরা এ উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের নিয়ে এক বিরাট মিছিল বের করবে। তারা বলছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক এতে যোগ দেবে। অন্যান্য পার্টিরও এতে সহানুভূতি আছে। কারখানার শ্রমিকদের আশীর্বাদ করবার জন্যে সকলকেই আমরা ঐ দিন উপস্থিত থাকতে বলেছি, অনেকেই রাজী হ'য়েছেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ—কিছুদিন আমাকে এ ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। তুমি পদ্মাকে নিয়ে নার্সিংহোমের জন্যে চাঁদা তুলতে সুরু কর, আশা করি তোমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।'

সেদিন হইতেই দিলীপ পদ্মাকে লইয়া নার্সিংহোমের জন্য চাঁদা তুলিতে সুরু করিল। ক্রমশ





১৪

বড় সাধ করিয়াই মেয়ের নাম রাজলক্ষ্মী রাখা হইয়াছিল; সে সাধে ভগবান যে বাদ সাধিবেন, তাহা কেহই জানে নাই, রাজলক্ষ্মীও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সুমন্তের উপর রাগ করিয়াই রাম বসু অন্যত্র কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। সুমন্তের পিতা প্রমন্ত রায় এই সুন্দরী মেয়েটিকে সর্বসুলক্ষণা দেখিয়া বিনাপণে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন; রাম বসুর পক্ষে ইহা বড় কম লাভের কথা ছিল না। গ্রামের মধ্যে কৃপণ বলিয়া তাঁহার নামে খ্যাতি ছিল, কেহ সকালে তাঁহার নাম করিতে চাহিত না। এমন দরিদ্রের ভাবে তিনি দিন কাটাইতেন, যাহা দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারিত না, তাঁহার অবস্থা যথেষ্ট উন্নত।

বাঙলা দেশে মেয়ে সুন্দরী হইলেও বিনা যৌতুকে বা পণে ভাল ঘরে পড়ে না—তাই রাজলক্ষ্মীর অদৃষ্টে জুটিল জগন্নাথ মিত্রের মত বৃদ্ধ স্বামী, যাঁহার পুত্র, পৌত্র, কন্যা ও দৌহিত্রে গৃহ পূর্ণ হইয়া আছে।

জগন্নাথ মিত্র ব্যবসায়ী এবং এই ব্যবসায় উপলক্ষ্যেই রাম বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম বসু ইহারই হস্তে অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে তাঁহার পুত্রাদির অগোচরে সমর্পণ করেন। বলা বাহুল্য, স্বামীর আলয়ে রাজলক্ষ্মী সুখে বা স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারে নাই।

জগন্নাথ মিত্র অত্যন্ত কোপন প্রকৃতির লোক ছিলেন; অতি অল্পতেই তিনি চটিয়া উঠিতেন। রাজলক্ষ্মীকে সেজন্য নির্যাতন বড় কম সহিতে হয় নাই।

একমাত্র সুধন্বা ছাড়া স্বামীর আলয়ে তাহার বন্ধু কেহ ছিল না। সুধন্বা জগন্নাথ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র, এইবারে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেশ ব্যবসা লইয়াই থাকেন; সংসারের কোন কিছুর সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, নিঃসন্তানা পত্নী বিন্দুবাসিনীও সংসারের কোন কিছুর মধ্যে নহেন। পিতা আবার বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া নরেশ কেবল একটু হাসিয়াছিলেন; বিন্দুবাসিনী যখন রাজলক্ষ্মীকে তাঁহার নিকটে আনিয়া পরিচয় দিয়া মুখ দেখাইয়াছিলেন, তখন নরেশ সেই মুখের পানে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন—সেই মুহূর্তে অদূর ভবিষ্যতের ছবি তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মধ্যম পুত্র ও পুত্রবধূ মোটেই খুসি হয় নাই—সুধন্বাও প্রথমে আকাশ হইতে পড়িয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে বাসে চাপিয়া শ্যামবাজারে গিয়া ভগিনীকে খবর দিয়াছিল। পিতা একটি সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন।

স্বামীর আলয়ে যতদিন রাজলক্ষ্মী ছিল, সে থাকা কেবল বিন্দুর জন্যই। বিধবা হইবার পরই পরমেশ তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বিন্দু তাহা করিতে দেয় নাই। এই নিঃসন্তানা রমণী তাহার অন্তরের সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা দিয়া এই মেয়েটিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল, নিজের মেয়ের মতই ইহাকে দেখিয়াছিল।

বিন্দু হঠাৎ মারা গিয়াছে—

রাজলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে সব হারাইয়াছে।

নরেশ কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন, বিন্দুর মৃত্যুর বেদনা তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। তাই তিনি নিজেই রাজলক্ষ্মীকে কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন—"আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন এখানে থেকো মা-মনি, ফিরেই তোমায় নিয়ে যাব, ছেলের শূন্য ঘরে লক্ষ্মী মা হয়ে আবার বসো মা—।"

রাজলক্ষ্মী সেদিন বড় কম কান্না কাঁদে নাই।

রামবসু বিশেষ খুসি হইতে পারেন নাই। কন্যাকে ধনীর গৃহিণী করিলেও তাঁহার কোন লাভ হয় নাই। মৃতের উইল অনুসারে রাজলক্ষ্মী যাহা পাইয়াছে, তাহা নরেশের নিকট রহিয়াছে,—সে নিজে কিছুই লয় নাই।

রামবসু ভাবিতে পারেন না, তাঁহার কন্যা হইয়া, তাঁহার শিক্ষা লাভ করিয়া রাজলক্ষ্মী কেমন করিয়া এমন মূর্খ রহিয়া গেল—যে মূর্খ নিজের ভালো বুঝিতে পারে না।

পাঁচ বৎসর পূর্বে রাজলক্ষ্মী যে গ্রাম দেখিয়া গিয়াছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, যে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া সে গৃহ আর পাইল না।

মা অনেককাল আগে মারা গিয়াছেন,—তিনি বর্তমান থাকিলে হয়তো জগন্নাথ মিত্রের মত পাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পণ

করা রামবসুর পক্ষে দুরূহ হইত, জানিয়া শুনিয়া কন্যার সর্বনাশ তিনি করিতেন না।

রিক্তহস্তে কন্যা যখন তাঁহার নিকটেই ফিরিল, তখন কেবলমাত্র তিনি গম্ভীরভাবে তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন, কেবলমাত্র একটা অস্ফুট উক্তি তাঁহার মুখে ফুটিল—"হুঁ—"

হুঁকার উপরে কলিকাটা বসাইয়া তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরমুখে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর,—ওরা কি তোমায় চিরকালের মতই এখানে রেখে গেল নাকি—?

রাজলক্ষ্মী নতমুখে আস্তে আস্তে উত্তর দিল, "না, বোধ হয় কিছুদিন পরে আবার যেতে হবে।"

পিতা আবার একটা শব্দ করিলেন—"হুঁ—"

তাহার পর বলিলেন, "তোমার যা কিছু সবই কি ছেলেদের কাছে আছে, না এনেছো?"

রাজলক্ষ্মী একবার মুখ তুলিয়া পিতার পানে তাকাইল, তাহার পর বলিল, "না, কিছু আনি নি।"

রামবসুর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "কিন্তু সেগুলো তোমার নিজের কাছে রাখা উচিত লক্ষ্মী, সৎ-ছেলেদের হাতে দেওয়া মোটেই ভালো হয় নি।"

রাজলক্ষ্মীর কাছেই তিনি শুনিলেন, তাহার একখানি গহনা পর্যন্ত নাই, সবই সেখানে পড়িয়া আছে।

রামবসু কেবল মাথা দুলাইলেন।

কন্যার সম্পত্তি রক্ষার জন্য তিনি বড় বেশীরকম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং সেইজনাই মহিমের নিকট ছুটিলেন।

আইন আদালত মহিমের হাতের মধ্যে; গ্রামের সকলে তাঁহার নিকট বিপদে পড়িয়া পরামর্শ চায়, পরামর্শ দিয়া মহিম লাভও করেন মন্দ নয়।

মহিম পরামর্শ দিলেন, নালিশ ছাড়া উপায় নাই।

রামবসু কেবল মাথা কাৎ করিলেন।

১৫

ব্রজসুন্দরের কাছে শাশ্বতীর পত্রখানা দেখিয়া সুমন্তের পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া গিয়াছিল,—ভারি তো কুড়ি টাকা, তাহার জন্য কি না পাড়ায় পাড়ায় পত্র লিখিয়া জানানো—

সুমন্ত দিবাকরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জিতে লাগিল, "তোমার কেমন আক্কেল, তাই টাকা ধার করতে গেছো ওই ব্রজসুন্দরের মাসতুতো বোন—সেই অহঙ্কারী মেয়ের কাছে? সে কি মেয়ে? সে নিজের হাতে মোটর চালায়, হৈ হৈ করে বেড়ায়, সে কি আমাদের ঘরের মেয়ে? ছিঃ ছিঃ, তোমার এতটুকু আজও জ্ঞান হ'ল না দিবা দা; ওর কাছ হতে টাকা নিয়ে বাঁচার চেয়ে আমার যে মরাই ভালো ছিল।"

দিবাকর মাথা চুলকাইল।

ইহার উপর থাকমনি যখন তাঁহার বিপুল শরীর লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সুমন্তের ঘরের দরজায় আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, তখন সুমন্ত প্রমাদ গণিল। হাতের বাজনাটা থামাইয়া রাখিয়া বলিল, "কাকীমা এখানে হঠাৎ—মানেটা—"

বাধা দিয়া থাকমনি বলিলেন, "দরকার পড়লেই আসতে হয় শুনি।" বাবা,—তোমার তো দেখা পাওয়ার যো নেই। সেদিন মাছটা পাঠালে, খাওয়ার কথা বললুম, ত্রিসীমানায় গেলে না। বেরজোকে ডেকে নিয়ে যেতে পাঠালুম, সে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে জানালে তুমি নাকি তাকে তাড়া করেছো। সেই কথা নিয়েই আমি এসেছি।"

তিনি ভালোভাবে জাঁকিয়া বসিলেন। সুমন্ত ঠিক বুঝিয়াছিল, তিনি অনেক কিছু মতলব লইয়াই আসিয়াছেন। তথাপি শান্তকণ্ঠে বলিল, "বলুন, আপনি কি বলবেন।"

থাকমনি নিতান্ত অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "বেরজো রোগাপটকা ছেলে, কত দেবতার মানত করে ওর গলায়, হাতে, কোমরে হাজার গণ্ডা তাগা-মাদুলী বেঁধে তবে ও আমার কোনরকমে বেঁচে আছে। ওকে অমনভাবে তেড়ে মারতে যাওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে সুমন্ত? থাক না কেন হাজার রকমের শত্রুতা, তবু রোগাপটকা ছেলেটাকে মারবে তুমি?"

সুমন্ত অবাক হইয় গিয়া বলিল, "আপনার রোগাপটকা মুখসর্বস্ব ছেলেকে আমি মেরেছি, আপনি এ কথা ঠিক বলছেন?"

থাকমনি বলিলেন, "মার নি, কিন্তু মারতে গিয়েছো তো? রোগা ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে চার দণ্ড একটি কথা বলতে পারে না, কতক্ষণ বাদে দম ধাক্কা সামলে তবে কথা বললে।"

সুমন্ত কেবলমাত্র বলিল, "সে বললে—আমি তাকে মারতে গিয়েছিলুম?"

কথার উপর জোর দিয়া থাকমনি বলিলেন, "তা আর বলবে না? কেন, সে কি তোমার চালায় মাথা দিয়ে বাস করছে, না তোমার কাছে দু'পাঁচশো টাকা ধারে যে বলবে না? আর অপরাধ সে তোমায় টাকার কথা বলতে এসেছিল, তাই"—

অধৈর্যভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া সুমন্ত বলিল, "হয়েছে হয়েছে, আপনার রোগাপটকা ছেলে আগাগোড়া সব সত্য কথা বলছে। এখন নিজের ঘরে যান, এখনি আবার মোহন কি আর কেউ এসে পড়বে, আবার আপনার সঙ্গে ছোঁওয়া-লেপা হয়ে যাবে—তখন আবার একখানা কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন তো।"

শেষের দিককার কথাগুলো থাকমনির কানে গেল না, তাঁহাকে চলিয়া যাইবার কথা সুমন্ত বলিয়াছে, এই অপমানটাই তাঁহার মাথার মধ্যে প্রবেশ করিল।

দারুণ রাগে তিনি একেবারে বেগুনি হইয়া গেলেন, খানিকক্ষণ কথা বলিতে পারিলেন না। তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিলেন—"বটে, আমি চলে যাব, আর তুমি এখানে রাজত্বি করবে? সে কথা মনের কোণেও ভেবো না সুমন্ত, আমাদের এখান হতে উচ্ছেদ করে তুমি চার হাত-পা মেলে খাবে। লোকে কথায় বলে না—জ্ঞাতি শত্তুর সবচেয়ে শত্তুর, ওর মত শত্তুর আর কেউ নেই—তাই—"

সুমন্ত বাধা দিয়া বলিল, "তাই না তোমরা আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস করে বসেছো, আমার আজ এই ঘরখানা ছাড়া আর কিছু নেই। আমার বাগান, পুকুর, আমার আম, নারিকেলের সব গাছ, পুকুরের মাছ কারা ভোগদখল করছে, কারা খাচ্ছে

থাকমনি অকস্মাৎ একেবারে আড়ষ্ট কাঠ হইয়া গেলেন, সুমন্ত যেন তাঁহার মাথায় একটা লাঠির বাড়ি বসাইয়া দিল। খানিকক্ষণ স্তব্ধশ্বাসে বিস্ফারিত চোখে তিনি সুমন্তের পানে তাকাইয়া রহিলেন, কাঁদিবেন কি চীৎকার করিয়া উঠিবেন, তাহার কিছুই তিনি ঠিক করিতে পারিলেন-না।

হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল ওস্তাদ মোহন বাগ্‌দী, তাহার সঙ্গে প্রধান সাইসমারেদ ইগাইল ও নফর মুচির ছেলে বাদল।

দরজার উপরে বিরাট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বসিয়া আছেন থাকমনি, গালের উপর হাতখানা পর্যন্ত দিবার কথা তাঁহার মনে পড়ে নাই।

বেগতিক দেখিয়া সুমন্ত ডাকিল—"আপনি উঠুন, নিজের ঘরে যান, এখনি এদের ছোঁওয়া গেলে আবার আপনাকে এই বিকেলবেলায় স্নান করতে হবে।"

থাকমনি একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন। সুমন্ত আশা করিয়াছিল, তিনি এখই ঝড় বহাইবেন, চোখে শ্রাবণের জল ধারা ছুটাইবেন, কিন্তু দেখিয়া পরম আশ্চর্য হইল—তিনি একটি কথাও বলিলেন না। আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একেবারেই ওদিকে নিজের অংশে চলিয়া গেলেন।

শ্রাবণের জলভরা থম্‌থমে আকাশ—এতটুকু নাড়া পাইলেই ঝর ঝর ধারে জল ঝরিয়া পড়িবে, কিন্তু বাড়িতে কেহ নাই, কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করিল না, কি হয়েছে।

মহেশ গিয়াছেন তাগাদায়, ব্রজসুন্দর গিয়াছে মাছ ধরিতে।

সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে কয়েকটা শোল মাছ লইয়া ব্রজসুন্দর বাড়ি ফিরিল, তাহার সঙ্গে ফিরিলেন মহেশ,—

উঠানে মাছ ফেলিয়া ব্রজসুন্দর চীৎকার করিতে লাগিল, "মাছ দেখে যাও মা—এগুলো যা হয় কর—আমি চললুম, আমাদের ক্লাবে আজ গান বাজনা আছে।"

থাকমনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—মুখের ভাব অত্যন্ত থম্‌থমে—অন্ধকার।—

"দাঁড়াও, তোমাদের দুজনের সঙ্গেই কথা আছে।"

মায়ের এমন মূর্তি ব্রজ কোনদিনই দেখে নাই। সে থত-মত খাইয়া দাঁড়াইল—মহেশও বিস্মিতভাবে স্ত্রীর পানে চাইলেন।

থাকমনি পা ছড়াইয়া বসিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "একটা কথার উত্তর দাও, সুমন্ত আজ আমাকে যা না তাই বলে অপমান করেছে, আমায় এখনি তার বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। নইলে সে নাকি আমাকে জোর করে তাড়িয়ে দেবে"—

"চলে যেতে বলেছে,—তাড়িয়ে দেবে"—

মহেশ একেবারে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ব্রজসুন্দর আঁটিয়া কাপড় পরিতে পরিতে বলিলেন, "তোমায় অপমান করেছে মা—এত বড় স্পর্ধা তার। আমি একবার তাকে দেখে নিচ্ছি, এখনই দেখে নেব, হয় এসপার, নয় ওসপার, যা হয় একটা কিছু করবই"—

থাকমনি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন,—"নানা তোর ওসবে কাজ নেই ব্রেজো—ওই দানবের সঙ্গে তুই পারিস কখনও! ওই তো তোকে ধরে আছাড় দিতে এসেছিল—তা ও পারে, তোর মত রোগা পট্‌কা তো নয় যে, "বাঁয় হেলতে বাতাসে দুলবে?"

ব্রজসুন্দর আস্ফালন করিল, "তুমি দেখ না মা, ওকে যদি জব্দ করতে না পারি, আমার নামই মিথ্যে। সামনা সামনি নাই বা গেলুম, পথ দিয়ে যখন চলবে—সন্ধ্যের অন্ধকারে ধাঁ করে এমন এক ঢিল বসাবো যাতে মাথা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।"

মহেশ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, ওসব করতে যেও না ব্রেজো, ওসব এক গুঁয়েমি ভাল নয়। তোমরা স্থির হও, যা করবার তা আমিই করব, তোমরা শুধু দেখে যাও।"

ব্রজসুন্দর বসিয়া পড়িল—নেহাৎ পিতৃ বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয় বলিয়াই লঙ্ঘন করিল না।

ক্রমশ



সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডিয় সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূচনা। এই বিশেষ ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের নবযুগের প্রথম অধ্যায় গঠিত হয়েছে। ইংলণ্ডিয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছি। ইউরোপীয় তথা ইংলণ্ডিয় সংস্কৃতির প্রভাব অনুকরণ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম আমরা লক্ষ্য করি গত শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত ইংরেজী শিক্ষিত দেশীয় সমাজের মধ্যে;— যারা প্রথম এই নবাগত সভ্যতাকে নানা দিক দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, অনুকরণ করেছিলেন এবং একই সঙ্গে অতি অল্পকালের মধ্যে আমাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিকূল আন্দোলন এনেছেন। ক্রমে গত যুগে সম্ভ্রান্ত ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের অনুকরণ ও প্রভাবের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা তথাকথিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত ইউরোপীয় প্রভাব এবং যেখানে তার প্রতিকূল মনোভাব জেগেছে, উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজ রাস্ট্রনীতি ও গত যুগের শিক্ষিত ভারতীয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষভাবে আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত সমাজের আচার ব্যবহার, তাহাদের প্রবর্তিত আন্দোলন এবং তাহাদের চিন্তাধারার মধ্যে এই প্রভাব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য সমসাময়িক সমাজ, রাস্ট্র, ধর্ম, সাহিত্য সব কিছুরই বর্তমান রূপ বিশ্লষণ করতে হলে ইউরোপীয় প্রভাবের অল্পবিস্তর আলোচনা দরকার। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা বা রূপশিল্পের পরচয় দিতে গিয়ে ইউরোপীয় এবং বহু স্থানে প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের প্রভাবের উল্লেখ অপরিহার্য। এই কারণে সমসাময়িক রূপকলার পরিচয় দেওয়ার পূর্বে ইউরোপীয় শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের শিল্পীর পরিচয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে দেওয়া দরকার।

প্রথম দেখা যাক কি ভাবে ইউরোপীয় শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্ব থেকে প্রাচ্যে (১৬১৭শ শতাব্দী) ইউরোপীয় পর্যটক নাবিক ও জেসুইট মিশনারীদের গতায়াত সুরু হয়। বিশেষভাবে তৎকালীন বণিক ও জেসুইট মিশনারীদের দ্বারাই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে শিল্পবস্তু ও চিত্রকলার বিনিময় ঘটে। ক্রমে বাণিজ্য সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হওয়ায়, এবং প্রাচ্যে স্থানে স্থানে জেসুইট মিশনারীদের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় ১৭০০ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতার মধ্যে যোগ আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সম্রাট আক্‌বরের কালে



আকবরের দরবারের শিল্পী বসাবন ও ফারুক্ অঙ্কিত একটি যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য

গোয়াতে জেসুইট মিশনারীরা একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে এইটি সর্বপ্রথম মিশনারী কেন্দ্র। এই ক্ষুদ্র মিশনারী কেন্দ্রটি কেবল যে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন তা নয়, এদের মধ্যে কয়জন ওস্তাদ কারুশিল্পী ছিলেন। সম্রাট আকবর এই বিদেশী কারিকরদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। এই কারণে এবং নূতন ধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলবশত রাজধানীতে এঁদের কয়জনকে নিমন্ত্রণ করেন। এই মিশনারীদের মারফৎ আকবরের দরবারে ইউরোপীয় চিত্রের সঙ্গে দেশী চিত্রকরদের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। সম্রাটের নিমন্ত্রণে মিশনারীরা রাজধানীতে আগমনকালে সঙ্গে উপহারস্বরূপ নিয়ে আসে

কতকগুলি খ্রীস্টবিষয়ক চিত্র। আকবর এই চিত্র ছাড়া বিখ্যাত flemish engraver দ্বারা অঙ্কিত বাইবেল উপহার পান। সম্রাটের অতিথিরূপে থাকাকালীন মিশনারীরা নিজেদের আবাস স্থানের দেয়ালে এবং আকবরের ইচ্ছানুযায়ী আরও কয়েক স্থলে চিত্র অঙ্কিত করেন। আকবরের দরবারে মিশনারীদের যথেষ্ট সমাদর ছিল, কিন্তু সে সমাদর তাঁরা পেয়েছিলেন প্রধানত ধর্ম-যাজকরূপে। সম্ভবত নূতন ধর্মের প্রতি কৌতূহলবশত বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি সম্রাটের আগ্রহ জেগেছিল। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে চিত্রের প্রতি সম্রাটের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এবং সেই দিক দিয়ে বিদেশী ছবির প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে এই নূতন শিল্পের প্রভাব আসবার সুযোগ তখন আসে নি।



আকবরের প্রতিকৃতি : মোগল দরবারের শিল্পী অঙ্কিত পেনসিল স্কেচ্

ইউরোপীয় চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূচনা সম্রাট জাহাঙ্গীরের কালে (১৬০৫—১৬২৭)। এই সময়ে নানা ইউরোপীয় শিল্পবস্তু ও তৈলচিত্র জাহাঙ্গীরের হস্তগত হয়। বিখ্যাত ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার টমাস রো, সম্রাটকে একাধিকবার নানাবিষয়ক তৈলচিত্র ও বিলাতী চিত্রকরদের অঙ্কিত প্রতিকৃতি উপহার দেন। তৈলচিত্র ছাড়া ইউরোপীয় engraving miniature-painting ইত্যাদি ভিন্ন প্রকৃতির রূপকলার সঙ্গে এই সময়ে দরবারী চিত্রকরদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। দুষ্প্রাপ্য বস্তু হিসাবে ইউরোপীয় চিত্র বা অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর সংগ্রহ করার আগ্রহ সম্রাটের যথেষ্ট ছিল, কিন্তু দরবারী অঙ্কন পদ্ধতি বা তৎকালীন শিল্প আদর্শকে পরিবর্তিত করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, এমন কোন প্রমাণ মেলে না। দরবারী চিত্রকরদের বিদেশী চিত্র সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব ছিল, সে সম্বন্ধেও সঠিক নির্দেশ পাওয়ার কোন উপায় নেই। তৈলচিত্র অপেক্ষা বিলাতী miniature বিশেষভাবে engraving থেকে চিত্রকররা যে motive গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয় আমরা তৎকালীন চিত্রের মধ্যে পাই। কতকগুলি বিশেষ কারণে এই সময়ে গ্রহণ কখন অনুকরণে পতিপন্ত হয় নি। একটি সর্বপ্রধান কারণ তৎকালীন অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্য (convention)। সেই জন্য দেখা যায় কোন বিদেশী বিষয় এমন কি বিদেশী প্রতিকৃতির অনুলেখনও নির্দিষ্ট conventionএর বাঁধা পথের মধ্য দিয়ে নূতনরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত চিত্রকররা বিদেশী motive ব্যবহার করেছিলেন, পারিপার্শ্বিক হিসাবে। যথা,—Borderএর অলংকৃত অংশের মধ্যে ইউরোপীয় motiveএর ব্যবহার সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি তৎকালীন চিত্রকরদের প্রতিভা কখন ব্যর্থ অনুকরণের দিকে শিল্প সংস্কৃতিকে অগ্রসর হ'তে দেয় নি। সকল যুগের প্রতিভাবান চিত্রকরদের ন্যায় এই সময়ের চিত্রকরদের অসামান্য প্রতিভা ও প্রকাশ করবার অঙ্কনদক্ষতা (technical skill) বিদেশীয় শিল্পের থেকে অবলীলায় গ্রহণ করেছিলেন নিজের স্বকীয়তা নষ্ট না করে। সর্বশেষে আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যে বিশেষ পদ্ধতির ছবির সঙ্গে চিত্রকররা পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ engraving এবং তৎকালীন মোগল অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল; সেই জন্য assimilation খুব কঠিন হয় নি।

যদিও সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং দরবারী চিত্রধারাকে সাক্ষাৎ ভাবে ইউরোপীয় শিল্প আদর্শের সংস্পর্শে এনে বিকৃত করতে চান নি, কিন্তু পরবর্তীকালে ইউরোপীয় চিত্রের naturalismএর আদর্শ যে মোগল শৈলীকে সহজেই প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত রুচি এবং তার শিল্প আদর্শ।

জাহাঙ্গীরের কালে মোগল দরবারী চিত্র যে বিশেষ অনুকরণমূলক হয়ে উঠেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। এই naturalism'এর প্রেরণা কোন বিশেষ aesthetic idealকে কেন্দ্র করে জেগেছিল বলে মনে হয় না। অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের দরবারে চিত্রকরদের অনুকরণশীল মন তৈরী হয়েছিল প্রয়োজন সাধনের জন্য এবং প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টার ফলে মোগলশৈলীতে naturalism-এর প্রকাশ হয়েছিল। মোগলশৈলীর রচনার মধ্যে প্রতিকৃতি অঙ্কনের রীতি প্রথম থেকেই দেখা যায়। আকবরের কালেই প্রতিকৃতি অঙ্কনের রেওয়াজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের দরবারে portrait অঙ্কনের প্রচলন যেমন প্রাধান্য পেয়েছিল, তেমনি উৎকর্ষতার দিক দিয়ে জাহাঙ্গীরের কালের portraitকেই শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া যেতে পারে। Portrait অঙ্কনের যে বিশেষ মনোভাব তারও প্রকাশ কোন আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে নয়—অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রতিকৃতি অঙ্কনের কোন পদ্ধতি বা কোন আদর্শ তৎকালে ছিল, সে কথা বলা যায় না। এখানেও সম্রাটের বিশেষ প্রয়োজন মিটাবার চেষ্টাই চিত্রকরদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্তন এনেছিল এবং প্রতিকৃতি চিত্রের একটা মূল বিষয় হয়েছিল।

আকবরের দরবারে চিত্রকর ছিলেন মূলত Book Illustrator, ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রাচীন আখ্যানের বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রকরদের ছিল চিত্ররচনার কাজ। জাহাঙ্গীরের কালে সম্রাটকে কেন্দ্র করে দরবারের জীবনযাত্রার ঘটনাবলী হল চিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু। ব্যবহারিক প্রয়োজন চিত্রের রূপকে কতদূর

পরিবর্তিত করতে পারে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ জাহাঙ্গীরের দরবারের চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। দরবারের জীবনযাত্রাকে প্রকাশ করার চেষ্টা পরোক্ষে সম্রাটের মনোরঞ্জনে পরিণত হল এবং সম্রাটের প্রিয় এবং অসাধরণ যা কিছু, তারই রূপকে স্থায়িত্ব দেওয়া হল চিত্রকরদের প্রধান কাজ। এই দিক দিয়ে জাহাংগীরের ব্যক্তিত্ব কতদূর চিত্রকরদের ওপর চাপ দিয়েছিল, তার উদাহরণরূপে জাহাঙ্গীরের নিজের কথার উল্লেখ করতে পারা যায়, যেমন—এক স্থানে তিনি একটি বাজপাখীর বিচিত্র রংএর বাহার দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দরবারের বিখ্যাত চিত্রকর মনসুরকে আদেশ করছেন, পাখীটির ছবি কোরে রাখতে; আর অন্যত্র দেখা যায়, কোন অতিরুগ্ন লোকের জরাজীর্ণ শরীর দেখে জাহাঙ্গীর তাঁর চিত্রকরকে আদেশ করেন, মরণাপন্ন লোকটির প্রতিকৃতি করে রাখতে—ছবি শেষ হবার পূর্বেই লোকটির মৃত্যু ঘটে। এই দুই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, জাহাঙ্গীর তাঁর অনুগত চিত্রকরদের কাছ থেকে কি চাইতেন। বিচিত্র পশু, পাখী, ফুল ইত্যাদি ছবির বিষয়বস্তুরূপে স্থান পেল এবং একই কারণে ও একই উদ্দেশ্যে সম্রাট ও তাঁর পার্শ্বচরদের



বাদসা ঔরংগজেব

প্রতিকৃতি মোগলরচনার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল। এই সব প্রতিকৃতির মধ্যে সম্রাট কি পেয়েছিলেন, তারও পরিচয় এই উক্তি থেকে পাব। অর্থাৎ এখানে বলা যেতে পারে যে, মোগল দরবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে স্থায়িত্ব দেবার ইচ্ছার ফলে প্রতিকৃতি অংকন প্রাধান্য পেয়েছিল। এখানে প্রতিকৃতির প্রধান আকর্ষণ ছিল ব্যক্তিত্বর চেয়ে দরবারের আনুষঙ্গিক হিসাবে। জাহাঙ্গীরের দরবারের চিত্রকররা যে ওস্তাদিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সে সম্বন্ধে মতভেদ নেই। মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি যে জাহাঙ্গীরের কালে হয়েছিল, একথাও সত্য। কিন্তু মনে হয় সম্রাট করণ-কৌশলের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং এই দিক দিয়ে ছবির রস উপভোগ করতেন। সেইজন্য তৎকালীন চিত্রের বাহ্যিক রূপ ও আলংকারিক বাহুল্য স্থানে স্থানে চিত্রকে ভারাক্রান্ত করেছে বলে মনে হয়। বহু প্রশংসনীয় গুন (quality) থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, মোগল চিত্রধারা ইতিমধ্যে সংকীর্ণতার মধ্যে এসে পড়েছে। চিত্রকরদের বস্তুজগৎ হয়ে এসেছে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সমগ্রভাবে প্রকৃতিকে অনুভব করবার সুযোগ এই সকল চিত্রকরদের হয়নি। বস্তুর রূপকে বিচ্ছিন্নভাবে এবং খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিত্রকররা দেখেছিলেন এবং আশ্চর্য কৌশলে তাঁদের বস্তু বিশেষের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা চিত্রের মধ্যে প্রকাশ করে গেছেন। এখানে অভিজ্ঞতা বলবার একটি বিশেষ অর্থ আছে। বস্তু সম্বন্ধে চিত্রকরদের মনে কি রকম অনুভূতি জেগেছিল, তার চেয়ে বস্তু সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা কি রকম ছিল অর্থাৎ চাক্ষুষ পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ ছিল, সেইটাই আমরা জাহাঙ্গীরের কালের ছবিতে পাই। সেইজন্য ফুল, পাখী এবং প্রতিকৃতি আমাদের মুগ্ধ করে বহুমূল্য অলঙ্কারের মত, চিত্রকরদের চাতুর্যে আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু কোন গভীর অনুভূতি জাগাবার শক্তি জাহাঙ্গীরের দরবারে চিত্রের মধ্যে আমরা দৈবাৎ পাই।

চিত্রের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলে যেমন বিষয়ের পরিবর্তন দেখা দিল, তেমনি অঙ্কনভঙ্গী ও শিল্প, আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটল। মোগলশৈলীর মধ্যে বস্তুর রূপকে অনুকরণ করবার চেষ্টা কিভাবে দেখা দিয়েছিল, তার কারণ এ পর্যন্ত দিয়েছি। এই থেকে মোগলশৈলীর মধ্যে naturalismএর প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় প্রভাবের কারণ পাওয়া সম্ভব হবে। প্রথমতঃ দরবারের সংকীর্ণ কেন্দ্রের মধ্যে এসে পড়ায় চিত্রকরদের সামনে বস্তুর রূপ প্রধান হয়ে উঠল এবং বস্তুরূপকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হল। দ্বিতীয়ত appearanceকে প্রকাশ করতে গিয়ে তারা naturalismএর দিকে ঝুঁকলেন। বস্তুর সমষ্টিগত রূপের চেয়ে বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট চিত্রকররা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন—এই চেষ্টার ফলে চিত্রকরদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। আকবরের কালে বস্তু চিত্রের আনুষঙ্গিক হিসাবে দেখা হত, সেইজন্য রূপের জটিলতাকে চিত্রকররা যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করতো। জাহাঙ্গীরের কালে এই আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ চিত্রশৈলীতে দেখা দিল। বস্তুর জটিলতাকে প্রকাশ করার চেষ্টা দেখা দিল। এই চেষ্টা একদিক দিয়ে মোগল অঙ্কনরীতি রেখা-প্রধান পার্সীয়ান সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হল, তেমনি অঙ্কনশৈলী অনুকরণ-ধর্মী হওয়ায় এবং চিত্র বস্তুপ্রধান হওয়ায় মোগল চিত্রে ইউরোপীয় naturalismএর ছাপ পড়বার পথ মুক্ত হল।

সব শুদ্ধ নিয়ে দেখা যায়, যে Realistic মনোভাব তৎকালীন দরবারী শৈলীর মধ্যে অভিনবত্ব এনেছিল, সেই অনুকরণধর্মী মনোভাবই পরবর্তীকালের মোগলশৈলীকে বিকৃত করেছিল। জাহাঙ্গীরের কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মোগল চিত্রধারা ধীরে ধীরে প্রাণহীন হয়ে এসেছে, আমরা দেখতে পাই। এই মরণোন্মুখ চিত্রধারার মধ্যে ইউরোপীয় naturalismএর প্রভাব ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে চোখে পড়ে। যে অনুকরণের মনোভাব জাহাঙ্গীরের দরবারে অঙ্কুরিত হয়েছিল,

(শেষাংশ ৮৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দূরের পরশ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মালতীর চিঠি আসিয়াছে। এইমাত্র পিওন দিয়া গেল।

নীলরঙের মোটা কাগজের পুরু খাম, দেখিলেই যেন মালতীর চিত্ত ভরিয়া ওঠে, মনে হয় কত অজানা আনন্দই না বহন করিয়া আনিয়াছে খামখানা! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিঠিটা খুলিতেই ইচ্ছা করে না তাহার, শুধু খামখানা হাতে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয়, খুলিলেই সমস্ত সম্ভাবনাটা শেষ হইয়া যাইবে, আনন্দটা আর অভাবিত থাকিবে না। ললিত যে এই বড় খাম ব্যবহার করে তাহার জন্যই মালতী কৃতজ্ঞ। তাহার মেজদির বর যেন কি, বরাবরই সরকারী খামে চিঠি লেখে, আবার বলে, মিছামিছি খামের পয়সাটা খরচা করিয়া লাভ কি?

মালতীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র দুই মাস, গত বৈশাখের ষোলই —দিনটা চিরকাল মালতীর মনে থাকিবে। ললিতের মত স্বামীই সে চিরকাল কল্পনা করিয়াছে, কামনা করিয়াছে—রূপবান, স্বাস্থ্যবান, ভদ্র! সেই স্বপ্ন তাহার সার্থক হইয়াছে বৈশাখের ঐ তারিখটিতে;— স্মরণীয় বৈকি দিনটা!

কিন্তু বেচারী মালতী! বিবাহের পর এগারটি দিন মাত্র সে স্বামীকে পাইয়াছে, বিবাহের আট দিন শ্বশুর বাড়িতে এবং এখানে জোড়ে আসিয়া তিন দিন। তাও তিন রাত্রি নয়—এগারো দিনের দিনই সে চলিয়া গিয়াছে, এখান হইতে সোজা তাহার কর্ম্মস্থানে, সুদূর বিহারের পাটনা শহরে! তাহার পর হইতে এই চিঠিই ভরসা তাহার, একদিন অন্তর একখানি নীল খাম পাটনা শহর হইতে তাহার স্বামীর বার্ত্তা বহন করিয়া আসিয়া হাজির হয়। কোনদিন বা দীর্ঘ, কোনদিন বা সংক্ষিপ্ত, অপিসের কাজের তাড়া যেদিন থাকে সেদিন আর ললিত বড় করিয়া চিঠি লিখিতে পারে না; কিন্তু ছোটই হউক আর বড়ই হউক প্রতিদিনই নতুন নতুন কথা লেখে সে—এত কথা কোথায় খুঁজিয়া পায় ললিত, কে জানে! মালতী কত চেষ্টা করে কিন্তু লিখিবার মত বেশী কথা মনে পড়ে না তাহার, ফলে মালতীর প্রত্যেক চিঠিই হয় ছোট, সে জন্য আবার ললিত কত অনুযোগ করে।

খামখানা বাবা ডাকিয়া হাতে দিলেন। প্রতিদিন তিনিই ডাকিয়া দেন। সকালে বাহিরে বসিয়া চা খাইবার সময় পিওন তাঁহার হাতেই দিয়া যায়। তিনি চা খাওয়া শেষ করিয়া হাসিহাসি মুখে ভিতরে আসিয়া ডাকেন, আমার মালু-মা কৈ গো; চিঠি আছে!

মালতীর বড় লজ্জা করে কিন্তু—রোজই তাঁহার হাতে চিঠি পড়ে, কী মনে করেন তিনি, কে জানে। তাঁহার ঐ হাসিটা বিশেষ করিয়া—! আজও সেই হাসি তাঁহার মুখে, মালু-মা তোমার চিঠি নাও।

মালতী কোনমতে খামখানা তাঁহার হাত হইতে লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল একদম তেতালার ছাদে। এখানে বড় একটা কেহ আসে না, নির্জ্জনে চিঠি পড়িবার পক্ষে এইটিই নিরাপদ স্থান। সে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দরজাটা উপর হইতে বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর পাঁচীলের সামান্য ছায়ায় বসিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু তখনই সে চিঠিটা বাহির করিল না। কোন দিনই করে না, সে চিঠিখানা খুলিবার আগে কল্পনা করিতে চেষ্টা করে ললিত কি-কি লিখিয়াছে। নানা কথা ভাবে সে, দু-তিন রকম চিঠি সে মনে মনে ভাঁজিয়া রাখে তাহার পর চিঠি খুলিয়া দেখে তাহার কল্পনার সঙ্গে মেলে কিনা। এইটাই তাহার খেলা, জুয়া খেলার আনন্দর মত একটা তীব্র নেশা অনুভব করে সে। প্রায়ই চিঠি তাহার কল্পনার সহিত মেলে না, আরও নূতন কথা, প্রেম নিবেদনের নূতন পদ্ধতি থাকে তাহার মধ্যে—কিন্তু তাহাতেই মালতীর আনন্দ হয় বেশী।

আজও সে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া নানা কল্পনা করিল। তাহার পর কৌতূহল যখন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল তখন সে চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। নীল রঙেরই পুরু কাগজ, চমৎকার লাইন টানা—আর তাহারই উপর মুক্তার মত ললিতের সুন্দর হাতের লেখা। মালতীর বুক আশু আনন্দের সম্ভাবনাতে কাঁপিয়া উঠিল, রোজই এমনি ওঠে, ললিতের হাতের লেখা দেখিলেই তাহার এমনি হয়।

আজ কিন্তু চিঠিটা বড়ই ছোট। একখানি মাত্র কাগজের এক পিঠে আঠারো-ঊনিশ লাইন লেখা। সে জন্য ললিত ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছে; লিখিয়াছে, "মধুমালতী গো, আজ আফিস থেকে বেরিয়েছি রাত নটার পর। এমন খাটুনী গেছে আজ তা আর বলবার নয়। এসে স্নান করেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, ঘুমে যেন চোখ জুড়ে আসছে। আজ বোধ হয় খাওয়াও হবে না, চিঠি শেষ করেই শুয়ে পড়ব। কাজেই চিঠি ছোট হ'লো বলে কিছু মনে করো না।—"

মালতীর মন বেদনায় ভরিয়া গেল। আহা বেচারী! সাহেবটা যেন কি, এত খাটায় কেন বাবু! একটু সকাল করিয়া ছাড়িলে কি হয়? এই খাটুনী, তাহার উপর খাওয়া-দাওয়ার এই রকম অনিয়ম, শরীর টিকিবে কেন?

কিন্তু গর্ব্বও বড় কম হইল না তাহার। সারাদিনের পর বরং খাওয়াটাও ললিত বাদ দিতে পারে; কিন্তু তাহাকে চিঠি লেখা বন্ধ করিতে পারে না! বিবাহের পর হইতে এই দুই মাসে একদিনও তাহার চিঠি লেখার বেনিয়ম হয় নাই। ঠিক একদিন অন্তর তাহার চিঠি আসে—

মালতী আবার চিঠিটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। চিঠির ভাঁজের একটা দিক কি করিয়া জলে ভিজিয়া গিয়াছে, ফলে অনেকগুলি অক্ষরই হইয়া উঠিয়াছে অস্পষ্ট। তা হোক,—তবু পড় যায়।

কিন্তু কিসে ভিজিল কে জানে! জলে পড়িয়াছে? না, তাহ হইলে আরও ভিজিয়া যাইত, সমস্ত কালি লেপিয়া চুপসাইয় একেবারে একাকার হইয়া যাইত, কিছুই পড়া যাইত না। তবে?.....

হঠাৎ মালতীর একটা কথা মনে পড়িল। ঠিক হইয়াছে, চিঠি লিখিয়া ললিত নিশ্চয় তাহার জামার বুক পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল তাহার পর অফিসে আসিয়াও কাজের ভীড়ে অনেকক্ষণ চিঠি ফেলিবার কথা তাহার মনে ছিল না, গরমের দিন, ঘামে গেঞ্জি-জাম ভিজিয়া উঠিয়াছে, চিঠিটাও সেই সঙ্গে ভিজিয়াছে! জলের ভিজ এত সামান্য হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া চারভাঁজ করা চিঠি একটি দিক মাত্র ভিজিয়াছে; যে দিকটা তাহার দেহের দিকে, বুকে দিকে ছিল—

আকস্মিক উত্তেজনায় মালতীর বুক ধক্-ধক্ করিতে লাগিল সমস্ত ব্যাপারটা যেন সে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখিতে পাইল অফিসের টেবিলে ঘাড় গুঁজিয়া ললিত এক মনে কাজ করিয় যাইতেছে, বুক পকেটে চিঠিখানা গোঁজা, তাহা খেয়ালও নাই। তাহা

কপাল, গলা সব ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, সংগে সংগে জামাটাও—আর তাহারই সংস্পর্শে চিঠিখানি উঠিতেছে সে'তাইয়া!......

কথাটা মনে হইতেই ললিতের চেহারাটা তাহার চোখের সামনে পরিষ্কার ভাসিয়া উঠিল। সুন্দর চেহারা তাহার, ঘামিলে আরও সুন্দর দেখায়। বিবাহের পর সামান্য যে কয়দিন সে স্বামীকে কাছে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছে।......অমন সুন্দর দেহ, অনিয়মে অযত্নে হয়ত মলিন হইয়া যাইতেছে। কেই বা সেখানে তাহাকে দেখিবে, কে বা যত্ন করিবে!

ললিতকে কাছে পাইবার জন্য তাহার মনটা আকুলিবিকুলি করিয়া উঠিল। উড়িয়া যাইবার উপায় থাকিলে সেই মুহূর্তে সে উড়িয়া যাইত।......নানা অসম্ভব অসম্ভব কল্পনা তাহার মাথাতে আসিতে লাগিল। আচ্ছা, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে একা যদি চুপি চুপি ট্রেনে চাপিয়া পাটনা চলিয়া যায়, তাহা হইলে কেমন হয়? হঠাৎ ললিতের অফিসে বা বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলে সে কী পরিমাণই না বিস্মিত হইবে!......কল্পনায় ললিতের বিস্মিত দৃষ্টি অনুমান করিয়া সে আপন মনেই হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু না, তাহা সম্ভব নয়। বাবা-মা ভাবিবেন, এখানে একটা হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার!...তাহার পর আর বাপের বাড়িতে মুখ দেখানো যাইবে না। ললিতও হয়ত তিরস্কার করিবে। মালতী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সংগে সে কল্পনাকে বিদায় দিল।

সহসা তাহার নজর পড়িল চিঠিখানার উপর। ললিত কাছে নাই সত্য; কিন্তু তাহার পরশ ত আছে! তাহারই চিঠি—ললিতেরই হাতের লেখা এবং বুকের স্পর্শ আসিয়াছে নীলরঙের এই খামখানায় ভরিয়া। তাহার দেহের স্বেদবিন্দুর স্মৃতি এখনও ঐ কাগজটাতে লাগিয়া আছে।

সে চিঠিখানা নাকের কাছে তুলিয়া ধরিল। বোধ হয় ভাবিয়াছিল ললিতের দেহের সৌরভও কিছু আছে উহাতে, কিন্তু কাগজ-কালির একটা অতি পরিচিত গন্ধ ছাড়া কিছুই পাইল না। তা না থাক্—তবু ললিতেরই স্পর্শ আছে উহার মধ্যে। মালতী চিঠিখানাকে সজোরে গালের উপর চাপিয়া ধরিল, তাহার পর বুকে, কপালে। অজস্র চুম্বনে চুম্বনে ভরাইয়া দিল চিঠিখানা। এখানি প্রতিদিনের সাধারণ চিঠি নয়—বিশেষ চিঠি এটি। এটি শুধু বাণীই আনে নাই, পরশও আনিয়াছে তাহার স্বামীর!

মালতীর চিঠি থাকিত তাহার ট্রাংকের মধ্যে, সমস্ত কাপড়-জামার তলায়। কিন্তু এখানা সে সেখানে রাখিল না। এটা সে কাছে কাছেই রাখিয়া দিল। কখনো থাকিত ব্লাউজের মধ্যে, কখনো বা বালিশের নীচে। চিঠিখানা সে আর একবারও পড়ে নাই, কিন্তু তবু সে উহাকে ছাড়িতে পারে না। যখনই ললিতের কথা মনে হয় তাহার, চিঠিখানা বাহির করিয়া মুখে-বুকে চাপিয়া ধরে। তাহার মনে হয় উহারই মধ্য দিয়া সে ললিতের স্পর্শ পাইতেছে। স্বপ্ন দেখে সে, চিঠিখানা বুকে করিয়া ললিত অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহার ললাটে কণ্ঠে স্বেদবিন্দু—

এমনি করিয়া হপ্তা দুই কাটিবার পর হঠাৎ একদিন ললিত আসিয়া উপস্থিত হইল, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। অফিসেরই কি একটা কাজে সে আসিয়াছে, একটি রাত্রি থাকিয়া কালই আবার চলিয়া যাইতে হইবে। তা হোক্—এই ক্ষণিক মিলনের মূল্যই কি কম! মালতী আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল, যত রকমের প্রসাধন, যত রকমের বাক্যবিন্যাস মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কোনটাই মনে পড়িল না। সুখে, লজ্জায়, অকারণ হাসিতে রঞ্জিত হইয়া কোনমতে সে ভাইবোনদের সহিত হাস্য-পরিহাসে সন্ধ্যাটা কাটাইয়া দিল, তাহার পর এক সময়ে দুরু দুরু বক্ষে স্বামীর কাছে উপস্থিত হইল।

তার পরের ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত এবং অতি সাধারণ। হাসিতে, খুশীতে, গল্পে কোথা দিয়া রাত গভীর হইয়া গেল, তাহা বোঝা গেল না। ললিত বাসা ঠিক করিয়াছে পাটনাতে, কদমকুঁয়ার দিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট-মতো বেশ বাড়ি। মালতীর শ্বশুর-শাশুড়ীরও মত আছে—শুধু আষাঢ় মাস, মালতীর জন্মমাস বলিয়া মা আপত্তি করিয়াছেন, শ্রাবণ মাস পড়িলেই চার-পাঁচদিনের ছুটি লইয়া ললিত আসিবে, এখান হইতে দেশে দুইদিন থাকিয়া সোজা পাটনায় যাইবে তাহারা। সেখানে বামুন-চাকর পর্যন্ত ঠিক হইয়া আছে—ললিত শুনাইয়া দিল।

মালতী কহিল, ঠাকুর আবার কি হবে আমি রাঁধব।

ললিত জবাব দিল, হ্যাঁ, তাই না!...তারপর ভাত রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলো, আর আমি অফিস কামাই ক'রে ডাক্তারবাড়ি ছুটোছুটি করি!...তার চেয়ে একটা বাবাজীর মাইনে গোনা ঢের সহজ!

মালতী মুখে আঁচল দিয়া কহিল, বামুনঠাকুর আবার বাবাজী! তুমি যেন কি, সে কি তোমার জামাই?

ললিত কহিল, হ্যাঁ, একবার ঠাকুর ব'লে দেখো না—লাঠি নিয়ে তাড়া করবে! ওখানে ঠাকুর বলে নাপিতদের, বামুনঠাকুর হ'লো বাবাজী।......

এমনি সব টুক্‌রো টুক্‌রো কথা। ছোট ছোট পরিহাস। অকারণে হাসি।

সহসা এক সময়ে মাথার বালিশটা নিবিড় করিয়া টানিতে গিয়া ললিতের হাতে একটা কাগজ ঠেকিল। সে কহিল, ভাল কথা, শুতে এসে দেখি, মাথার বালিশের নীচে আমারই একখানা পুরোনো চিঠি। এসব চিঠি যেখানে সেখানে ফেলে রাখো কেন, তুলে রাখতে পারো না? কেউ যদি দেখতে পায়, কি কেলেঙ্কারী হব বলো দেখি—! ছিঁড়ে ফেললেও তো পারো।

মালতী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। ললিতেরই বালিশের খাঁজে মুখ লুকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, না, না, সব চিঠিই আমি পড়া হওয়ার সংগে সংগে বাক্সয় পুরে ফেলি। এটা—

এটা কি?

এটা আমি কাছে-কাছেই রাখি কি না। ও প্রায় আমার বুকের মধ্যেই থাকে।

দারুণ বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, কেন বলো দেখি?

মালতী জবাব দিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

ললিত জোর করিয়া তাহার মুখের উপর হইতে হাত দুটা সরাইয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, তাহার পর চুপি চুপি কহিল, ব্যাপার কি বলো ত?

মালতী তখন জবাব দিল, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?

কৈ না! চিঠি পড়ে ত আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বরং ওখানাই বোধ হয় সবচেয়ে ছোট চিঠি, কিছুই ত নেই ওতে—

তবু মালতী বলিতে পারে না। অবশেষে অনেক পেড়াপীড়িতে ললিতের বুকের মধ্যেই মুখ রাখিয়া থামিয়া থামিয়া আসল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

কথাটা শেষ হইবার সংগে সংগে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ললিত যেন ভাঙিয়া পড়িল। তাহার হাসি থামিতেই চায় না। অনেকক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিল, তুমি মাসিকপত্রে গল্প-কবিতা লিখতে আরম্ভ করো মালতী, তোমার খুব পসার হবে—

মালতী তাহার হাসিতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সে চুপ করিয়া রহিল। ললিত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, রাগ করলে মধুমালতী?......ঘটেছিল যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, তাই হেসে উঠেছিলুম। কিন্তু তোমার কল্পনার জোর আছে, সত্যি!

মালতী রাগ করিয়া কহিল, হোক্ অন্যরকম। আমি শুনতে চাইনে।

কিন্তু ললিত আসল কথাটা খুলিয়াই বলিল, চিঠিটা লিখে খামে মুড়ে টেবিলেই রেখে দিয়েছিলুম। তারপর ভোর বেলা চাকর লাল্লু চা ঢেলে দিতে এসে দিব্যি ক'রে টেবিলের ওপর যে খানিক চা ফেলে গিয়েছিল অতটা লক্ষ্য করি নি। ব্যাস্—বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে একটা বই টেনে নিতে গিয়ে একেবারে চিঠিখানা সেই চায়ের ওপর!......তখন আর চিঠি লেখবার সময়ও ছিল না, আর দেখলুম খামখানাই বেশী ভিজেছে, ভেতরের চিঠিখানা বেশ পড়া যায়, তাই খামটা পাল্‌টে চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিলুম। এই হ'ল তোমার চিঠির ইতিহাস!

মালতীর সমস্ত আবেগ, সমস্ত কল্পনার উপর যেন কে খানিকটা ঠান্ডা জল ঢালিয়া দিল। এমন কি স্বয়ং ললিতের উপস্থিতি, এই প্রণয়লীলা—ইহাও যেন সেই মুহূর্তের মত সম্পূর্ণ ব্যর্থ, অর্থহীন হইয়া গেল। সে আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

ললিত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া কহিল, রাগ করলে, হ্যাঁ গো?

মালতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না।

কিন্তু আর কোন কথা কহিল না। ললিত হাসিয়া কহিল, তুমি নিতান্তই ছেলে মানুষ মালতীমঞ্জরী, ছি ছি, একটা সামান্য চিঠির জন্যে তুমি আমার ওপর অভিমান করলে, সে-ও আমারই চিঠি! সত্যি কথা বলার জন্য আমার এই শাস্তি?

সত্যই ত! মালতীও হাসিয়া ফেলিল। তাহার স্বামীর চিঠি বড় হইয়া উঠিল। শুধু তাহার কল্পনার সহিত আসল সত্যটা মেলে নাই বলিয়া এ তাহার কী অহেতুক রাগ!

সে চুপি চুপি বলিল, ছাই চিঠি। বালিশের তলায় হাত ঢুকাইয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া চিঠিখানা ছুঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সজোরে ললিতের গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, কিন্তু তুমি সত্যি কথাটা না বললেই ভাল হ'ত বোধ হয়।

পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া মালতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছিল, চিঠিটার কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু স্নান শেষ করিয়া ললিতের জন্য চা লইয়া ঘরে ঢুকিতে দিনের আলোতে তাহার প্রথমেই নজরে পড়িল সেই চিঠিখানা, তাল পাকাইয়া জানলার কাছে পড়িয়া আছে ললিত তখনও ঘুমাইতেছিল। মালতী টেবিলের উপর কাপটা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইল। ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত, এখনই চাকর ঘর ঝাঁট দিতে আসিবে, সে যদি পড়িয়া ফেলে।

কিন্তু চিঠিটা ছিঁড়িতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল সে। তাহার যেন মনে হইল সারা বুকটা কে মুচড়াইয়া ধরিতেছে, চিঠিখানার সহিত যেন প্রাণটাও তাহার বাহির হইয়া যাইবে। এই বিশেষ চিঠিটিকে কেন্দ্র করিয়া এই দশ বার দিন যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছে, তাহার নিজের কাছে সে স্বপ্নের মূল্য ত কম নয়। হোক না তাহার মূলের ইতিহাসটা মিথ্যা, তবু এ চিঠি তাহার কাছে সত্য সত্যই তাহার স্বামীর পরশ বহন করিয়া আনিয়াছিল। আজ সত্যকার ইতিহাসটা জানা গেল বলিয়া কি সেদিনের সমস্ত অনুভূতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে?......না, এ চিঠি মালতী ছিঁড়িতে পারিবে না। কিছুতেই না।

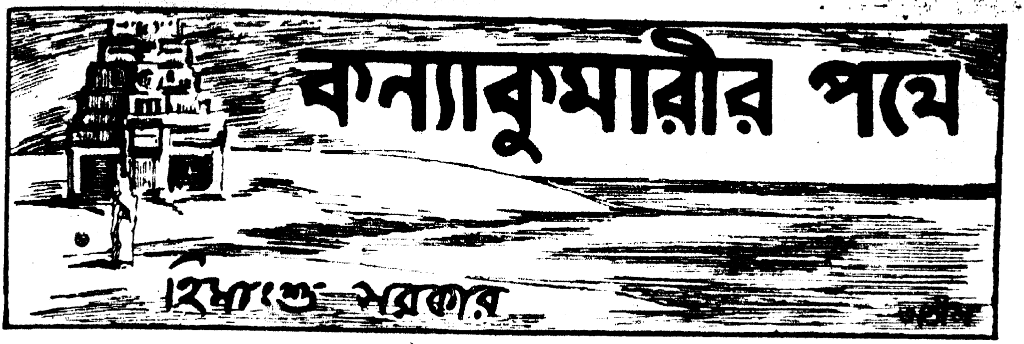
সে চিঠিখানা সযত্নে আবার সোজা করিয়া ব্লাউজের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল, তাহার পর ললিতের গা ঠেলিয়া ডাকিল, ওগো শুনছ, ওঠো। তোমার চা এনেছি—

সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র

(৮৬১ পৃষ্ঠার পর)

তারই পরবর্তী রূপ সাজাহানের কালের চিত্রের মধ্যে আমরা পাই। সাজাহানের দরবারে Mahamad Zaman নামক জনৈক পার্সীয়ান চিত্রকর আসেন। Zaman শিক্ষা করেছিলেন, রোমের কোন শিক্ষাকেন্দ্রে। এই ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত পার্সীয়ান চিত্রকরের সংস্পর্শে তৎকালীন চিত্রকরদের মধ্যে কোন বিশেষ নূতন পরিবর্তন হয়েছিল কি না, বলা শক্ত। তবে সাজাহানের কালের চিত্রে আমরা সত্যকারের ইউরোপীয় প্রভাবের পরিচয় পাই। জাহাঙ্গীরের কালে বস্তুরূপ সম্বন্ধে চিত্রকররা অনুকরণধর্মী হলেও, অঙ্কন-পদ্ধতির কতকগুলি গতানুগতিক সংস্কার তাঁরা মেনে চল্‌তেন। সাজাহানের কালে ছবির আলঙ্কারিক রূপকে ভাঙ্গবার চেষ্টা প্রথম দেখা দেয়। ছবির মধ্যে বস্তুকে দূর নিকট করে সাজাবার চেষ্টা (optic illusion) ইউরোপীয় প্রভাবের ফল বলা চলে। ছবির বিস্তৃত আলংকারিক বর্ডার ও সম্ভবত বিলাতী gild frame-এর অনুকরণে হয়েছিল, কিন্তু চিত্রকরদের পরম্পরাগত শিক্ষার ফলে এবং গতানুগতিক বিষয়-বস্তুর ব্যবহারের জন্য ইউরোপীয় প্রভাব উগ্র হয়ে ওঠেনি। এ পর্যন্ত assimilation (আত্মিকরণ)এর শক্তি মোগল চিত্রকরদের মধ্যে দেখা যায়।

ক্রমশ



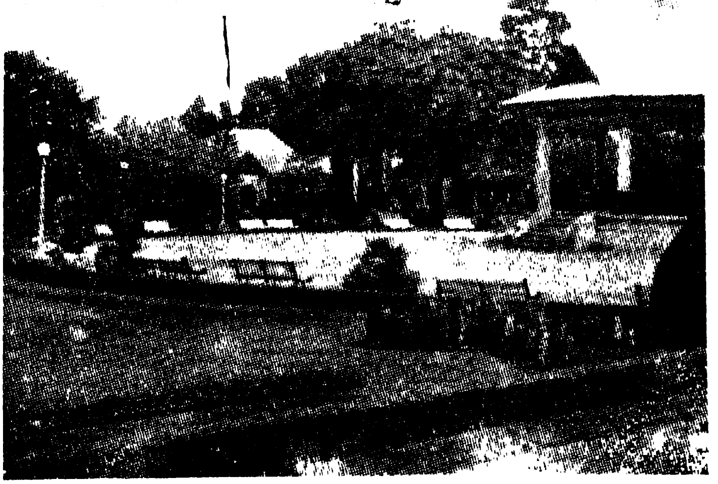
(১২)

মন্দিরে যাওয়ার আগে জানলাম যে, মন্দিরে দর্শন করতে যাবার সময় কাপড় পরে, খালি গায়ে, খালি পায়ে যেতে হয়। ধনী দরিদ্র সকলেই এইরূপে মন্দিরে যায়। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাও মন্দিরে দর্শন করতে যাবার সময় এই নিয়ম মেনে চলেন।

আমরা কাপড় পরে খালি গায়ে, খালি পায়ে মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেখলাম যে, সব জায়গায় তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়েছে, এ ছাড়া অন্য কোন রকম আলোর বন্দোবস্ত এখানে নেই। এই কন্যাকুমারীর মন্দির ছাড়া ভ্রমণের মধ্যে যতগুলি বিখ্যাত মন্দির দেখেছিলাম, সেগুলোতে তেলের প্রদীপ ছাড়াও মন্দিরের ভেতরে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত আছে।

মন্দিরে প্রবেশের আগে, মন্দিরের ভেতরে সমবেত কণ্ঠের সুমধুর স্তব পাঠ এবং গান শুনতে পেলাম। সেদিনের গানের কথা যদিও বুঝতে পারি নি, তবুও মন এক অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠেছিল। মন্দিরের যে জায়গায় গান হচ্ছিল, আমরা সেখানে অন্যদের সঙ্গে মাটির ওপর বসে নিস্তব্ধ হয়ে গান শুনতে লাগলাম। সামান্য কয়েকটি প্রদীপের স্বল্পালোকে দেখলাম যে, কয়েকটি ছোট বড় ছেলেমেয়ে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গান করছে। গানের সঙ্গে কোনরূপ যন্ত্রের ব্যবস্থা নেই, শুধু হাতের করতালি দিয়ে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দরভাব গান করছে। সেদিনকার সন্ধ্যার সমবেত কণ্ঠের গান খুবই সুন্দর লেগেছিল। অনেকক্ষণ বসে শোনবার পরও সেখান থেকে উঠে আসবার ইচ্ছা করছিল না।

মন্দিরের ভেতরে কুমারী মূর্তি। কালো পাথরের তৈরী। মাথায় প্রায় ১২।১৩ বৎসরের মেয়ের সমান। মূর্তি কালো পাথরের তৈরী হলেও সমস্ত মূর্তির ওপর এরূপভাবে শ্বেত চন্দন লেপা রয়েছে যে, মূর্তি যে কালো পাথরের তৈরী সেটা বোঝবার কোন উপায় নেই। এই কুমারী মূর্তি এক অপূর্ব মূর্তি। এত সুন্দর মূর্তি পূর্বে আর কোথাও দেখিনি—জীবনে আর এমনটি কোনদিন দেখব বলে মনে হয় না। একবার দেখলেই চীর জীবনের মত মনের ওপর একটা ছাপ রেখে দেয়। মূর্তির ওপর থেকে আর চোখ ফেরান যায় না। মুখ দেখলেই মনে হয় যে, সমস্ত মুখ এক অপূর্ব লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। সামান্য কয়েকটা প্রদীপের আলোতেও মূর্তি দেখবার কোনরূপ অসুবিধা হয় না। মূর্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছি—এমন সময় মন্দিরের ভেতর থেকে পূজারী হাতে কপূরের প্রদীপ নিয়ে বের হয়ে এল। সুন্দর চেহারা—শুধু সুন্দর বলে শেষ করা যায় না—সমস্ত শরীর থেকে জ্যোতি ফুটে বের হচ্ছে। গঠনে, বর্ণে, স্বাস্থ্যে মানুষের যে এমন চেহারা হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। যেমন অপূর্ব কুমারী মূর্তি—সেই রকম সুন্দর পূজারীর চেহারা।



ত্রিভেন্দ্রাম যাদুঘরের দৃশ্য

মন্দির দেখা শেষ করে আমরা চোলট্রিতে ফিরে এসে রান্নার বন্দোবস্ত করে সকলে চোলট্রির সাধারণ দালানে এসে বসলাম। আমাদের ভ্রমণের পঞ্জির মধ্যে কন্যাকুমারীই ভ্রমণের শেষ সীমা—কন্যাকুমারী দেখার পর আমরা কলকাতার দিকে ফিরব। আর এই ফেরার পথে দু চারটে নতুন জায়গা আর যে সব জায়গা আসবার সময় না দেখে এসেছি সেগুলো দেখব। কিন্তু এখন আমরা ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রাম দেখা সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। মাস্টার মশাইকে বললাম যে, এতদূর এসে ত্রিভেন্দ্রাম না দেখে ফিরে গেলে মনে চিরদিনের জন্য আফশোষ থেকে যাবে। জীবনে বোধ হয় আর কোনদিনই এদিকে আসা হবে না—সেইজন্য ত্রিভেন্দ্রাম শহরটা এবারই দেখে যাওয়া যাক। মাস্টার মশাই প্রথমে রাজী হতে চাইলেন না—কিন্তু আমরা আরো বেশী

করে তাকে অনুরোধ করায় তিনি শেষে আমাদের ত্রিভেন্দ্রাম যাওয়ার মত দিলেন। ঠিক হোল যে, আমাদের যে আরো একদিন কন্যাকুমারীতে থাকার কথা ছিল, সেটা আর না থেকে আমরা ত্রিভেন্দ্রামে যাব। ভ্রমণকারী হিসাবে কন্যাকুমারী আমাদের দেখা হয়েছে বলা যায়। আর একদিন যদি কন্যাকুমারীতে না থাকলে একটা নতুন জায়গা দেখা যায়, তাহলে সেটাই ভাল। পরের দিন সকালের বাস ধরে আমরা ত্রিভেন্দ্রামের দিকে রওনা হব, ঠিক করলাম।

রাত্রের খাওয়া শেষ করে অনেকেই শুয়ে পড়ল—আমরা তিন চারজন সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে আসবার জন্য চোলট্রি থেকে বের হলাম। সকলে গিয়ে সমুদ্রের একটা উঁচু পাড় দেখে বসলাম। সমুদ্রের ভিজে নোনা বাতাস এসে গায়ে লাগতে লাগল—হাওয়াতে একটু শীতও বোধ হতে লাগল। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের ঢেউ এর দিকে তাকিয়ে সকলে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। ক্রুশাডাই দ্বীপেও চাঁদের আলোতে সমুদ্র দেখেছিলাম—আর এখানেও চাঁদের আলোতে সমুদ্র দেখলাম; কিন্তু সমুদ্রের রূপ দু জায়গায় দু রকম দেখলাম। ক্রুশাডাই দ্বীপে সমুদ্রের ঢেউ শান্ত ভীরুর মত নিশব্দে এসে পাড় ছুঁয়ে চলে যাচ্ছিল, আর এখানে ঢেউ হচ্ছে অশান্ত, গম্ভীর হুঙ্কার দিয়ে সে পাড়ের ওপর আঘাত করছে।

সমুদ্রের পাড় ছেড়ে উঠবার ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের উঠতে হ'ল—কারণ পরের দিন ভোর বেলায় আবার আমাদের ত্রিভেন্দ্রামের দিকে যাত্রা করতে হবে; তাই অনিচ্ছায় চোলট্রিতে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য ফিরলাম।

রাত থাকতেই আবার ঘুম ভাঙল—সকালে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখবার জন্য সমুদ্রের ধরে গেলাম। কন্যাকুমারীতে সূর্যোদয় হয় বঙ্গোপসাগরে—আর সূর্যাস্ত হয় ভারত মহাসাগরে। তখনও ভাল করে অন্ধকার কাটেনি। ধীরে ধীরে পূর্বদিকের সমুদ্রের ভেতর থেকে অল্প অল্প করে আলো ফুটতে লাগল। তারপর আরম্ভ হ'ল আকাশে রংএর খেলা। আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় এই অপূর্ব সৌন্দর্য আমরা বেশ ভাল করেই দেখলাম। ক্রমে আকাশের রংএর প্রতিচ্ছবি জলে পড়ে জলের ভেতর এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হল। সূর্যোদয়ের সময় যে এতো রং আকাশে ও জলে সমাবেশ হতে পারে তা না দেখলে কাউকে বলে প্রকাশ করা যায় না। মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশের এবং জলের রূপ বদলাচ্ছে—একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সকলে নিষ্পন্দ হয়ে তাকিয়ে এই সৌন্দর্যলীলা দেখতে লাগলাম। আস্তে আস্তে জলের ভেতর থেকে সূর্য মস্ত বড় এক লাল টকটকে থালার আকারে দেখা দিয়ে জল থেকে যেন এক লাফ দিয়ে আকাশের গায়ে দেখা দিল। কবি গুরুর কয়েকটা লাইন মনে পড়ল—

"তখন তরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থল থল
রাঙা রেখা জ্বল জ্বল
কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগন ভালে।"

সূর্যাস্তের চেয়ে সূর্যোদয়ের বেশী শোভা হয় দেখলাম।

সূর্যোদয় দেখবার পর আমরা চোলট্রিতে ফিরে জিনিসপত্র গোছগাছ করে ত্রিভেন্দ্রাম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

চোলট্রি থেকে রওনা হবার সময় দেখলাম—বন্ধুবর জিনিসপত্র উল্টে পাল্টে এবং ঘরের সব কোনায় কি খুঁজছে। বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে কি খুঁজছে। তার কাছ থেকে শুনলাম যে, তার মানি ব্যাগটা হারিয়ে গেছে, সেইটাই সে খুঁজছে। মানি ব্যাগে কত টাকা ছিল জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, প্রায় ৪।৫ টাকার মত ছিল। বন্ধুবর বলল যে, আগের দিনের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত সে তার ব্যাগটা দেখেছে—তারপর সে আর সকালে উঠে দেখতে পাচ্ছে না। গত রাত্রে মন্দির যাওয়ার সময় খালি গায়ে যাওয়ার দরুণ ব্যাগটা ঘরের ভেতরে জামার পকেটেই সে দেখেছিল—এটা তার ভাল করেই মনে আছে। আমায় প্রশ্ন করতে দেখে বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করল যে, হারান ব্যাগটা আমি পেয়েছি কিনা। আমি হেসে শুধু উত্তর করলাম যে, রাত্রে তার জামার ভেতরে রাখা মানি ব্যাগের কথা আমি কি করে জানব। ব্যাগ হারানোর কথা বর্তমানে ঐখানেই শেষ হলেও পরে দেখলাম যে এই ব্যাগের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়নি।

টিনাভেলী থেকে কন্যাকুমারী আসবার সময় আমরা ভারতবর্ষের পূর্ব ধার দিয়ে এসেছিলাম—এবার আমরা কন্যাকুমারী থেকে ত্রিভেন্দ্রাম যাওয়ার সময় ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার ধরে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভেতর দিয়েই যাব। চোলট্রির সামনে বাস আসলে আমরা তাতে উঠে বসলাম। এদিককার সব বাসই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। বাসগুলো দেখতে আগের বাসের মতই। ওগুলোও কাঠ কয়লা দ্বারা চলে। মাথা পিছু ভাড়া ১৲ টাকা করে।

বাস ছাড়ল। এখান থেকে ত্রিভেন্দ্রাম প্রায় ৫৪ মাইল। কেপ্ ত্রিভেন্দ্রাম রোড ধরে বাস চললো। প্রায় তিন মাইল পিচের রাস্তা পেরিয়ে আমরা এবার সুন্দর কন্‌ক্রিটের রাস্তায় পড়লাম। এই কন্‌ক্রিটের রাস্তা এখান থেকে আরম্ভ করে ত্রিভেন্দ্রামে গিয়া শেষ হয়েছে। এত চওড়া রাস্তা যে তিনখানা মোটর গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি যেতে পারে। এই রাস্তাটাই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় কন্‌ক্রিকেটের রাস্তা।

এদিককার রাস্তার দৃশ্যও খুব মনোরম। রাস্তার পাশে



ত্রিভেন্দ্রামের একটি বাড়ি

ঘাট পর্বতমালা দেখতে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করে দেখলাম যে, ওদিককার চেয়ে এদিককারের রাস্তার দুপাশের জমি বেশী উর্বর। কয়েক মাইল আসার পর আর ঘাট পর্বতমালা রাস্তার পাশে দেখতে পাওয়া যায় না। এখন রাস্তার দুধারেই ঘন তাল নারকেলের গাছে ভর্তি। গাছগুলোর সবুজ মসৃন পাতার ওপর রৌদ্র পড়ে অল্প অল্প চিক্ চিক্ করছে।



কন্যাকুমারীর রাস্তার একটি গ্রামের দৃশ্য

"স্নিগ্ধ শ্যাম পত্র পুটে
আলোক ঝলকি ওঠে
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।"

মাঝে মাঝে ছোট বড় জলাশয় চোখে পড়তে লাগল। গ্রামের সংখ্যাও বেশী—আর গ্রামগুলো বেশ সমৃদ্ধশালী বলে মনে হয়।

প্রায় ৮ মাইল আসার পর রাস্তার ডান ধারে সুচিন্দ্রমের বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরের খ্যাতি খুব বেশী। মন্দির হিসাবে একটা দেখবার মত জিনিস। মন্দিরটি পুরাণো দ্রাবিড় স্থাপত্য-কলার একটি ভাল নিদর্শন। মন্দিরে নটরাজের মূর্তি আছে। মন্দিরেতে অনেক পুরাণের কাহিনী চিত্রিত করা আছে।

এই সুচিন্দ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা আমরা পুরাণে পাই। স্থল পুরাণের জ্ঞানারণ্যে আছে যে, সেই কালে অত্রি এবং তার স্ত্রী অনুসয়া এই স্থানে বসবাস করতেন। এই অনুসয়া সর্বগুণসম্পন্না ছিলেন। এদিকে একদিন স্বর্গদেবতাদের মধ্যে তর্ক হল যে, পৃথিবীর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে কে মহৎ এবং সর্বগুণের অধিকারিণী। নারদ বল্লেন যে, অত্রির স্ত্রী অনুসয়াকে এই সম্মান দেওয়া যায়। নারদের কথা শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য গরীব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে একদিন অত্রির অনুপস্থিতিতে অনুসয়ার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে এরা অনুসয়াকে বল্লেন যে, আজ তাঁরা এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন। তখন অনুসয়া এদের কথা অনুযায়ী রান্না শেষ করে ছদ্মবেশী দেবতা তিনজনকে খাবার জন্য ডাকলেন। অনুসয়া যখন এদের পরিবেশন করতে গেলেন তখন ছদ্মবেশী দেবতারা বল্লেন যে তাঁরা এই ব্রত নিয়েছেন যে, কোন মেয়ে তাঁদের খাদ্য পরিবেশন করবার সময় তার অঙ্গ কোনরূপ বসন দ্বারা আবৃত থাকবে না। অনুসয়া এদের কথা শুনে আর কোন উপায় না দেখে কমণ্ডুল থেকে এক গণ্ডুষ জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে দেবতাদের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া মাত্র তিনজনে তিনটি শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তখন অনুসয়া এই শিশুরূপী দেবতাদের কোলে করে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। এই সময় অত্রি বাড়ি ফিরে এসে অনুসয়ার কোলে তিনটি শিশু দেখে আনন্দিত হয়ে তিনজনকে এক সঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে যাওয়া মাত্রই শিশু তিনজনের শরীর এক সঙ্গে মিলে গিয়ে একটি শিশুতে পরিণত হয়ে গেল। স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অবস্থা দেখে অনুসয়ার কাছে গিয়ে সমস্ত প্রকাশ করে বলতে অনুসয়া কমণ্ডুল থেকে আবার এক গণ্ডুষ জল নিয়ে শিশুটির গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া মাত্রই এই একটি শিশু থেকে আবার দেবতারা নিজেদের রূপ ফিরে পেলেন। এই সময় অনুসয়া দেবতাদের কাছে তাঁদের তিনজনের মত গুণসম্পন্ন তিনটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা জানালেন। দেবতারাও সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের গুণের অংশ দিয়ে অনুসয়াকে একটি পুত্র দান করলেন। এই পুত্রত্রয়ের নাম হ'ল দত্তাত্রেয়ী। এই ঘটনাটি সকলের মনে জাগরুক রাখবার জন্য এখানে এই সুচিন্দ্রমের মন্দির স্থাপিত হ'ল।

সুচিন্দ্রম ছাড়িয়ে প্রায় ৪ মাইল আসার পর আমরা নাগের কয়েল পেঁাছলাম। এখানে বাস বদল করে অন্য আর একটা বাসে চড়লাম। এই বাসটা সোজা ত্রিভেন্দ্রাম যাবে। নাগের কয়েলে ত্রিবাঙ্কুরের পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে দেখলাম। এদের পরনের প্যাণ্ট, কোট, মাথার পাগড়ী এবং পায়ের পট্টীও খাকি—পোষাকের ধাঁজটা অনেকটা কলকাতার শহরের বাইরের বাঙলাদেশের পুলিশের মত। নাগের কয়েল একটা বেশ বড় শহর। প্রায় ৫০ হাজার লোকের বাস এই শহরে।

রাস্তার ধারেই একটা দোকান দেখে আমরা আমাদের পথের দরকারের জন্য কিছু চা পাতা কিনতে গেলাম। টাকা দেবার পর দোকানদার আমাদের ইংরেজীতে প্রশ্ন করল যে, আমরা টাকার চেঞ্জ এই দেশের পয়সায় নেব কিনা। তার কাছ থেকে শুনলাম যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বৃটিশ ভারতের এবং এই রাজ্যের নিজের পয়সা - এ দুটোরই চল আছে।

এ দেশের পয়সা কে 'চক্রম' বলে। এই চক্রমের মূল্য বৃটিশ ভারতের দু পয়সার অপেক্ষা কিছু বেশী। ২৮ই চক্রমে বৃটিশ ভারতের একটা পুরো টাকা হয়। এ ছাড়া বৃটিশ ভারতে যেমন পয়সা—আধ পয়সা এবং পাই পয়সায় বিভক্ত; সেইরূপ এদিককার এক চক্রমও ১৬টি ছোট ছোট চক্রমে বিভক্ত। ১৬টি পাই পয়সার চেয়ে ছোট চক্রম মিলে একটি বড় পুরো হয়। চক্রম ছাড়া এদিককার দু আনি, চার আনি এবং আট আনি জাতীয় মুদ্রাও আছে। টাকা অবশ্য সেই বৃটিশ ভারতের একই টাকা।

নাগের কয়েল থেকে বাস ছাড়ল। মাঝে মাঝে রাস্তায় বাস দাঁড়িয়ে লোকদের ওঠাতে এবং নামাতে লাগল। দেখলাম যে বাসে আরোহীদের খুব বেশী ভীড় হয়। সোজা রাস্তা হ'লেও রাস্তা কিছুদূরে ওপরে উঠে আবার নীচের দিকে নেমে গেছে। কয়লা দ্বারা বাস চালানোর দরুণ বাস রাস্তার চড়াইতে উঠবার সময় খুব আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। এই রকমভাবে প্রায় ১ ঘণ্টা চলে আমরা প্রায় ১২টার সময় ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভেন্দ্রামে এসে পেঁাছলাম। মোটর বাসের স্ট্যান্ড ত্রিভেন্দ্রাম স্টেশনের ধারেই। আমরা বাস থেকে আমাদের মালপত্র নামিয়ে একটা থাকবার মত আস্তানার খোঁজ করতে লাগলাম। স্টেশনের কাছেই রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুরের নামে একটা রেস্ট হাউস আছে। সুন্দর দোতলা বাড়ি। বৈদ্যুতিক পাখা এবং আলো আছে। প্রত্যেক ঘরের ভাড়া খুবই সস্তা। কিন্তু আমরা স্টোর খোঁজ নিয়ে জানলাম যে—সেখানে একেবারে জায়গা নেই। আমরা তখন স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে শহরের ভেতর দিকে আর একটা রেস্ট হাউসে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। এটাও একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি। নীচের তলার ঘরের ভাড়া আট আনা ওপর তলার দশ আনা করে। একটা ঘরে যতজন ইচ্ছা থাকা যায়। পরে শুনলাম যে এখানে স্টেটের তৈরী অনেক সস্তা ভাড়ায় রেস্ট হাউস, চোলট্রি এবং বিনা ভাড়ায় চোলট্রি আছে।

রেস্ট হাউসে জিনিসপত্র রেখে আমরা দুটো মোটর ভাড়া করে শহর দেখবার জন্য বের হ'লাম। প্রথমে আমরা থার্ডণ্ট রোড ধরে চল্লাম। রাস্তায় পোস্ট অফিস, আইন কলেজ, বিজ্ঞান কলেজ, মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী স্কুল, টাউন হল, কুন্নমোরা বাজার, ঘোড় দৌড়ের মাঠ, কলা বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার দেখে আমরা যাদুঘরে গেলাম। যাদুঘরের বাড়ি বেশ সুন্দর। বাড়ির চারপাশে সুন্দর বাগান আছে। একটা সাধারণের বসবার জন্য উদ্যান যাদুঘরের মধ্যে আছে। যাদুঘরটা খুব বড় না হ'লেও—অনেক রকম দর্শনীয় বস্তু এখানে আছে। সামুদ্রিক প্রাণী এবং বিভিন্ন প্রবালের বাসাগুলো দেখবার মত। যাদুঘর থেকে বের হয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম। চিড়িয়াখানাটা বেশ সুন্দর। সব চেয়ে ভাল লাগে জানোয়ারগুলো রাখবার বন্দোবস্ত দেখে। জন্তুদের আলাদা আলাদা করে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। অনেক জন্তুকে আবার কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সমস্ত চিড়িয়াখানাটা একটা অসমতল জমির চার দিকে ধাপে ধাপে সাজান রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচের ধাপ থেকে ওপরে উঠতে হয়। এখানেও বেশ ফুলের বাগান রয়েছে। কয়েকটা নতুন জন্তু চিড়িয়াখানায় দেখলাম। সমস্ত চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর দেখার পর এটাই মনে হয়, এগুলো তৈরী করার আগে স্থাপত্য বিসারদরা চিন্তা করেই এগুলোর নক্সা করেছেন।

চিড়িয়াখানা থেকে বের হয়ে আমরা যে রাস্তায় পড়লাম তার নাম নিউ ব্রুক রোড। এই রাস্তায় সেক্রেটারিয়েট, মহারাণীর পুরোনো প্রাসাদ, টেনিস ক্লাব, ভট্টীবিলাসম্—রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুরের বাড়ি, বিশপস্ কলেজ দেখে আমরা একটা বড় তোরণ দ্বার পার হয়ে এগিয়ে চল্লাম। বর্তমান মহারাজার প্রাসাদ দেখে আমরা ওয়াটার ওয়ার্কস পার হয়ে পার্ক ভিউতে এসে পড়লাম। এই রাস্তায় চীফ্ সেক্রেটারীর অফিস, ত্রিবাঙ্কুরের বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ হাসপাতাল, রাজ্যের ট্যাকশাল, পশু হাসপাতাল দেখে আমরা শহরের বাইরে শহরতলীতে এলাম।

শহরতলীও বেশ সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শহরতলী পার হয়ে আমরা এবার সমুদ্রের ধারে চল্লাম। এদিকে একটা রবারের ফ্যাক্টরী আছে। এ ছাড়া এখানে একটা একুইরিয়াম (Aquarium) আছে। একুইরিয়াম বলতে আমরা সাধারণভাবে এইরূপ বুঝি যে, ছোট বড় কাঁচের অনেক জলাধারের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় সামুদ্রিক মৎস্য এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীদের রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়। এই একুইরিয়ামটি মাত্র এক বৎসর হ'ল নির্মিত হয়েছে। বেশ বড় একটা বাড়ির মধ্যে এই একুইরিয়ামটি।

এই ধরণের একুইরিয়াম মাদ্রাজেও একটি আছে। এই মাদ্রাজের একুইরিয়াম মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হয়।

একুইরিয়াম দেখে আমরা সমুদ্রের ধারে গেলাম। এখানে একটা সুন্দর বাড়ি আছে। মহারাজা সমুদ্রের ধারে ভ্রমণে এলে এই গৃহটি ব্যবহার করেন। সমুদ্রের ধারে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করেন,—বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগরের জল স্পর্শ করার পুণ্য অর্জন করলাম।

সমুদ্রের ঢেউ এখানে খুব বেশী নয়। ঢেউএর অবস্থা দেখে একবার সমুদ্র স্নান করবার ইচ্ছা হ'ল—কিন্তু সঙ্গে সে রকম কোন বন্দোবস্ত না থাকায় এবং সময়ও কম থাকায় ইচ্ছা আর পূরণ করা হ'ল না।

সমুদ্রের ধার থেকে এসে আমরা আবার মোটরে উঠলাম। এবার মোটর সমুদ্রের ধারের একটা রাস্তা দিয়ে চল্ল—খানিক দূরে গিয়ে এখানকার জাহাজ ঘাটে পেঁাছলাম। ঘাটে তখন কোন জাহাজ ছিল না। জাহাজ ঘাটটি খুব বড় না হ'লেও, এদের একটা নিজস্ব জাহাজ ঘাট আছে দেখে বেশ ভালই লাগল।

এখান থেকে এবার আমরা মন্দিরের দিকে গেলাম। মন্দিরে বিষ্ণুর পদ্মনাভ মূর্তি রয়েছে। শহর দেখা শেষ করে আমরা মোটর বিদায় দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেরলাম। ইচ্ছা যে এদিককার হাতীর দাঁতের কাজ নাকি খুব সুন্দর এবং সস্তা—যদি কিছু সওদা করা যায়। একটা দোকানে ঢুকলাম। দোকানের ভেতরে কাঁচের শো কেসের মধ্যে হরেক রকমের হাতীর দাঁতের কাজ করা জিনিস রয়েছে। যেটাই দেখা যায় সেটাই কিনতে ইচ্ছা করে। দাম শুনেই কেনবার ইচ্ছা নিবৃত্ত হ'য়ে যায়। দাম মোটেই সস্তা মনে হ'ল না। আমাদের মধ্যে অনেকে কিছু না কিছু কিনল। আমরা যেখানে কারিকর বা এইসব হাতীর দাঁতের ওপর কাজ করছিল—সেখানে গিয়ে এদের কাজ দেখলাম। সত্যই এত সূক্ষ্ম কাজ করবার জন্য এদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু এই সব কারিকররা এদের কাজের তুলনায় মজুরী পায় না। লাভের অঙ্ক বেড়ে চলে দোকানদারের। এটা প্রায় সব দেশেরই নিয়ম—শুধু এইখানকার দোকানদারদের এর জন্য দোষারোপ করছি না।

ক্রমশঃ

রবারের ব্যবহার

শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল

অনেক দিন আগের কথা। সভ্যতার হাওয়া তখনও পৃথিবীর সব জায়গায় প্রবাহিত হয়নি। কাজেই অনেক কিছুই প্রয়োজনীয় বস্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল; তার মধ্যে যেমন একটি রবার। 'কাঠ-ঠোক্‌রা' নামক একজাতীয় পাখীর সাহায্যে সভ্য সমাজের সংগে হ'ল রবারের প্রথম পরিচয়।

আমেরিকার গভীর জংগলে এক প্রকার গাছ হ'ত সেই গাছকে এই 'কাঠ-ঠোক্‌রা' পাখী তার ঠোঁট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করত এবং দেখা যেত আঠা জাতীয় এক প্রকার পদার্থ গাছের কান্ড থেকে নিসৃত হয়, তারপর থেকেই আস্তে আস্তে এই প্রয়োজনীয় জিনিসটা নানা কাজে লাগতে আরম্ভ করল।

মানব সভ্যতার যে কয়টি উপাদান, তার মধ্যে রবার যে একটি প্রধান, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। পুস্তকে আমরা পড়েছি ইন্ডিয়ান রবারের কথা, কিন্তু এই নামের সংগে 'ইন্ডিয়া' নামের কোন সম্বন্ধ নেই। সম্ভবত, আমেরিকা, মেক্সিকো এবং আমাজনের উপকূলে গভীর জংগলে রবারের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে রবার আবিষ্কারের কোন বিশেষ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কথিত আছে, কলম্বসের নাবিকগণই প্রথমে রবার সম্বন্ধে জানতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই নাবিকগণ দেখতে পায় যে, তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা এক প্রকার বল নিয়ে খেলা করে; এই বলগুলোকে যখন মাটিতে ফেলা যায়, তখন সেটা লাফাতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই বলগুলো এক প্রকার গাছের আঠা দিয়ে তৈরী ছিল। ১৬১৫ খৃস্টাব্দে স্পেনিয়ার্ডরা এই আঠা মোমের সংগে মিশিয়ে ক্যানভাস কাপড় তৈরী করে ব্যবহার করত, যাতে করে কাপড়ের ভেতর জল প্রবেশ করতে না পারে।

১৭৩১ খৃস্টাব্দে La Condanino-কে প্যারিসের এক শিক্ষায়তন থেকে বিষুব অঞ্চলে এক বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাঠান হয়। তিনি যখন দেশে ফিরে গেলেন, তখন ব্রাজিল ও মেরু প্রদেশ থেকে এক প্রকার কালো রজন জাতীয় পদার্থ নিয়ে যান, তিনি আরও দেখলেন যে, সেখানকার অধিবাসীরা রবারের জুতাও পরে। স্পেনিয়ার্ডদের প্রায় দুইশত বৎসর পরে, সভ্য জগতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়; আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা এ বিষয় প্রথম লক্ষ্য করেছিল বলে তারা এর নাম দিল ইন্ডিয়ান রবার। রবারের প্রচলন তখন থেকে আরম্ভ হ'তে লাগল। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে Dr Prislay উল্লেখ করেন যে, ছোট ছোট ছেলেরা তখনকার দিনে পেন্সিলের দাগ উঠাবার জন্য এই রবার প্রথম ব্যবহার করতে আরম্ভ করে এবং এক কিউবিক রবার তিন শিলিং মূল্যে বিক্রয় হ'তে লাগল। তখন রবারকে শুধু পেন্সিলের দাগ তোলবার জন্য ব্যবহার হ'তে লাগল। কিন্তু এত বড় একটা জিনিসকে ব্যবসায়ের দিক থেকে মূল্য যার অনেক বেশী, তাকে এত ছোট কাজে খাটান মানুষের পছন্দ হ'ল না। তার প্রায় বিশ বছর পরে চেষ্টা চলতে লাগল, কি করে একে শিল্প হিসাবে কাজে লাগান চলতে পারে। Samual peel নামক এক ব্যক্তি, তিনি একটি উপায় অবলম্বন করেন, রবারকে Turpentine-এ মিশিয়ে জাল দিয়ে সেটাকে কাপড়ে লাগিয়ে তাই দিয়ে water-proof তৈরী করলেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে **Charles Macintosh**, তিনিও এই পথ অবলম্বন করে এর থেকে ভালভাবে রবারের water-proof তৈরী করতে সমর্থ হলেন এবং তাঁর নামানুসারে তার নাম দিলেন Macintoshes। এইভাবে রবার ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়াল। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে লণ্ডনের Thomas Hancock দেখলেন যে, এই রবারকে যখন খুব করে ময়দা মাখার মত মেখে উত্তপ্ত করা যায়, তখন তাকে যে কোন আকারে পরিবর্তিত করা যায়। অসুবিধা অনেক কিছুই রয়ে গেল; প্রথমত, হ'ল এই যে, রবারকে উত্তাপ দিলে সেটা হ'য়ে যায় ডবল, আর ঠান্ডা করলে হয় শক্ত; এই অসুবিধা দূর হ'ল না। কিন্তু অগ্রণীদের কাজের বিরাম নেই। তাঁরা এই অসুবিধা দূর করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। অবশেষে আমেরিকার Charles Good Year এবং ইংলণ্ডের Thomas Hancock—এঁরা দুজনে অনেক দূর কৃতকার্য হলেন, ধরতে গেলে ব্যবসায় হিসাবে রবারের প্রচলন এখান থেকেই।

১৮৪০ খৃস্টাব্দে রবারকে উন্নততর প্রণালীতে প্রস্তুত করবার প্রথম চেষ্টা হ'ল। Good Year এবং Hancock, তাঁরা রবারের সঙ্গে সলফার চূর্ণ মিশিয়ে খুব উত্তাপ দিলেন এবং পরে দেখলেন যে, এই প্রণালীতে রবারের কাঠিন্য চলে যায়, ফলে রবার খুব নরম হয়। এই প্রণালীর নাম হ'ল—'Vulcanisation Method'. বহু বছর ধরে Good Year রবার সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন, এতে তাঁর বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করতেও হয়েছিল এবং বড় কাজ করতে গেলে যে সব বিপদ বা বাধা আছে, তারও সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল; অবশেষে সমস্ত উপহাস বা পরিশ্রমের পরিবর্তে তাঁর কৃতকর্মের পুরস্কার পেয়েছিলেন। তারপর থেকে অনেকে অনেক নূতন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। Good Year দেখলেন, যদি রবারের সঙ্গে অনেক করে সলফার চূর্ণ মিশিয়ে অনেক সময় ধরে উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহ'লে Etory-র মত শক্ত একটা জিনিস পাওয়া যায়; সেটার নাম দিলেন Vulcanite.

আজকাল এই Vulcanite নানা কাজে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে; যেমন, গ্রামোফোনের রেকর্ড, পেন, চিরুণী ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, তখন থেকে চেষ্টা হ'তে লাগল কি করে সাইকেল, ঘোড়ারগাড়ি প্রভৃতির চাকাতে রবারের টায়ার লাগিয়ে কাজ চালান যেতে পারে।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে Robert William Thomsom গাড়ির চাকাতে লাগাবার উপযোগী বাতাসপূর্ণ টায়ার তৈরী করবার

জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। বিখ্যাত J. B. Dunlop তিনি ছিলেন একজন পশু-চিকিৎসক। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে Thomsom-কে অনুসরণ ক'রে এ বিষয়ে খুব কৃতকার্যতা লাভ করেন। তিনি একটা রবার টায়ার তৈরী করে নিজের সাইকেলে লাগান এবং তাঁর ছেলের সাইকেলেও লাগিয়ে দেখলেন যে, তাঁর ছেলে একটা সাইকেল প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। Dunlop সাহেবের এই আবিষ্কারের পরে সারা পৃথিবীতে রবারের চাহিদা বেড়ে যায়; আজ আমেরিকার প্রত্যেক লোকই এই Dunlop সাহেবের তৈরী টায়ারযুক্ত মোটর গাড়ি চালায়। বরাবরের চাহিদা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রবার সংগ্রহের উদ্যমও বেড়ে গেল খুব। পৃথিবীর নানা স্থানে রবার উৎপাদনের ব্যস্ততা বেড়ে গেল।

Brazil থেকে Kew-তে কি করে রবার চাষের আমদানী হ'ল, তার একটা ইতিহাস আছে। Kew শহরের M. H. A. Wickham ছিলেন একজন বোটানিস্ট। তিনি দেখলেন যে, Brazil-এর He vea নামক গাছ থেকে উত্তম রবার পাওয়া যায় এবং এই রবারের নাম Para। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, কি করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এর প্রচার করা যায় এবং এ বিষয় নানারকম অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর এই ইচ্ছাটা Kew-এর Botanical garden-এর অধ্যক্ষ Sir Joseph hook-কে জানান; তাঁরা দু'জনে ভারতবর্ষ এবং মালয় প্রদেশে এই He vea নামক গাছ চাষ করবার মনন করেন। Mr. Wickham তখন অনেকগুলো রবার গাছের বীজ সংগ্রহ করলেন, কিন্তু Brazil বাসীরা তাকে এই রবারের বীজ আনতে দেয় না। তখন অতি গোপনে ভারতবর্ষের শাসনকর্তার সহায়তায় এই বীজ Kew-তে আনেন। Kew-তে রীতিমত চাষ আরম্ভ হ'ল, দেখতে দেখতে প্রচুর রবার উৎপন্ন হ'তে লাগল। এখান থেকে তখন ছোট ছোট রবার গাছের চারা সিংহল এবং সিঙ্গাপুরে আমদানী হ'তে লাগল। দেখতে দেখতে রবারের চাষ মালয়ের সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। দেখা যায়, ১৯১০ খৃস্টাব্দের শেষভাগে পৃথিবীতে যত রবারের কাজ হয়েছে, তার বেশীর ভাগ রবার এসেছে ব্রাজিল এবং আফ্রিকা থেকে।

আজকাল রবার প্রত্যেক জাতির পক্ষে একটা লোভনীয় বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্য জগতের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হ'লে চাই রবার শিল্পের প্রসার—সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজকাল ভারতবর্ষেও প্রচুর রবার জন্মায়। মাদ্রাজ, মহীশুর কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় রবারের চাষ হচ্ছে। দু'-একটা দেশীয় রবারের কারখানা থাকলেও এর প্রসার আরও দরকার। নিজেদের কারখানা থাকলে অন্তত আর কিছু হোক না হোক, বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হবে; এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে। বর্তমানে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, প্রায় ৩২ হাজার লোক রবারের কারখানায় কাজ করে এবং প্রস্তুত রবারের পরিমাণও নেহাৎ কম নয়, প্রায় ৫৬,০০০০০ পাউণ্ড। আজকাল ভারতবর্ষ থেকে, আমেরিকা, জার্মানি, সিংহল প্রভৃতি দেশে রবার প্রচুর পরিমাণে চালান যাচ্ছে।



ইলিশ মাছের কাঁটা

রস-রচনা

—শ্রীবিজন ভট্টাচার্য—

ওদিকে সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার শহরও উজাড় হইয়া গেল। খল জাপানী বোমার আকস্মিক পতনের সম্ভাব্য বিপদ সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিলকুল শহর ঝাঁটাইয়া একেবারে জনশূন্য করিয়া ফেলিল। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মৌনীবাবার আখড়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যূহের আড়ালে স্থির বিশ্বাসের খোঁটা পুঁতিয়া যাহারা এতদিন নিশ্চিন্ত নির্ভরে কালাতিপাত করিতেছিল 'এই পড়ে তো সেই পড়ে'র টানা পোড়েনে তাহাদের আস্থার শিকড়ও আলগা হইয়া গেল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা নেড়ী বুড়ী—বেলার দিদিমা,' জপের মালাটা হাতে করিয়া বাকী জীবনের স্বল্প মেয়াদটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার শুভ-সংকল্প লইয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া পড়িতেছেন। বাবা 'জগড়নাথের' অনিন্দ্যসুন্দর আবক্ষমূর্তি ঘিরিয়া উড়িষ্যার কশ্চিৎ-অঞ্চলের যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণ একদা মহেশ আচার্যের লেনে একটি প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রত্যহ অষ্টপ্রহরের ধুয়া তুলিত আজ তাহাও শুনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অফিসের পথে ঠিক হেমচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে বহুদিন যাবৎ একটা নাঙ্গা বাবাজীকে ভষ্ম মাখিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। কিন্তু ইদানীং দেখিতেছি—তিনিও সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছেন। আছে শুধু চুল্লীটা আর একখানা আধপোড়া মোটা কাঠের গুঁড়ি; আমারই মনের বিতৃষ্ণা লইয়া যেন দাঁতছিরকুটে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া আছে। কলিকাতা আর সে কলিকাতা নাই। শ্মশান-বৈরাগ্য যেন ওর সারা অঙ্গে অনাসক্তির ভষ্ম লেপিয়া দিয়াছে! গৃহ আছে লক্ষ্মী নাই, পথ আছে পথিক নাই, অফিস আছে বাবু নাই, আমরা আছি তো ওঁরা নাই। সারা শহরটা এক নিদারুণ রিক্ততায় যেন দিবারাত্র খাঁ খাঁ করিতেছে।

দায়িত্বহীন রবিবারের সকাল। আটটা বাজিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ; কিন্তু শয্যা ত্যাগের আজ আর কোন তাড়া নাই। দশটা বাজিয়া দুইচার মিনিট হইতে না হইতেই রেজিষ্ট্রির খাতাটা আজ আর বড় সাহেবের ঘরে চলিয়া যাইবে না। সুতরাং শুইয়া আছি আর ভাবিতেছি। ভাবিতেছি—সংসারধর্ম বিসর্জন দিয়া এমন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় আর কতদিন চলিবে। সহসা সধুম চায়ের বাটি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল সৌদামিনী—বাড়ির ঝি। হ্যাঁ, ঝি ছাড়া আর কি! তা আমার সংসারে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সৌদামিনী মনে মনে যে ধারণাই পোষণ করুক না কেন, আমি তো আর তাকে অন্য কোন আখ্যা দিতে পারি না। এখন সে যদি জোর করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে যে, সে এ বাড়ির আর যে কেউ হোক না কেন, অন্তত ঝি নয়, এক্ষেত্রে আমার কিছু বলিবার নাই। হ্যাঁ তবে তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি না হোক আকারে ইঙ্গিতে সমঝাইয়া দেওয়া যায় যে, সে ঝি—ঝিই থাকিবে। এটা অবশ্য করা যায়। আর নানান দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে তা করাও উচিত। কিন্তু কে করিবে! আমিই করিব। কিন্তু সে শক্তি যদি আমার না থাকে। এমনও তো হইতে পারে যে রূঢ় কথা আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না। সে চরিত্রই আমার নয়। যে যা বলে তাই শুনি। নিজের কাছা-কোঁচার ঠিক থাকে না। একটা আত্মভোলা ক্ষ্যাপা বাউল। খেয়ালের স্রোতে ভাসিয়া যাই একটা শেওলার মত—সে ক্ষেত্রে। আর হইয়াছেও তাহাই। যেমন, এই চায়ের ব্যাপারটাই ধরা যাক। সৌদামিনী চা আনিল। ভাল কথা, উত্তম কথা। ঘর-সংসার ছাড়া একটা লোক নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিরহী যক্ষের মত এই ডামাডোলের বাজারে কোনমতে কলিকাতায় দিন কাটাইতেছে, তুমি সৌদামিনী, বাড়ির ঝি, নেমক খেয়েছ আমার অনেক, চা আনিয়া দিলে। তোমার কর্তব্য তুমি করিলে। ব্যস্। এইখানেই ফুরাইয়া যাক না কেন। কিন্তু তুমি চা আনিলে হাসিতে হাসিতে। কেন হাসিলে! বাবুকে চা দিতে যাইয়া ঝি-চাকর হাসিবে কেন! বেশ, হাসিলে হাসিলে, কিন্তু অমন করিয়া হাসিলে কেন! তোমার জানা উচিত ছিল যে, অভিব্যক্তির দিক দিয়া কোন কোন হাসি মুখের ভাষণকেও ছাপাইয়া ওঠে। বেশ, ধরিলাম, হাসিটি তোমার স্বেচ্ছাকৃত নহে, স্বতস্ফূর্ত। কিন্তু অমন সাজ-গোজ করিয়া তুমি কাজ করিতে আস কেন! বলতো কোন্ বাড়ির ঝি সায়া-সেমিজ পরিয়া বাসন মাজিতে আসে! আচ্ছা মানিলাম, সায়া-সেমিজ ব্যবহার ভদ্র পরিবারেরই একচেটিয়া নহে। ঝিকুলও মানুষ। তাহাদেরও সাধ-আহ্লাদ আছে। সায়া-সেমিজে তাহাদের অধিকারও স্বীকার্য। বেশ কথা। ধরিলাম, এ-সব ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির ব্যাপারে অপরের কথা বলা অনুচিত। কিন্তু তোমার রুচি তোমাতেই সীমাবদ্ধ থাক, এটা তো আশা করিতে পারি। আমাকে তাহা কেন স্পর্শ করিবে। যেমন তুমি কোন্ সাহসে বল—ও-জামাটায় আপনাকে মানায় ভাল, কাপড় বদলে ফেলুন, দাড়িটা আজকেই কাটতে হবে কিন্তু। আমার শরীর খারাপ হোক ছাই ভাল হউক, তার জন্যে তোমার শরীর কাঁদিবে কেন!

এই রকম সৌদামিনী আমার প্রতি অনেক অবিচার করে। কিন্তু ঐ যে পূর্বেই বলিয়াছি, আমি আত্মভোলা ক্ষ্যাপা বাউল। তাই প্রতিবাদ করি নাই।

এখন সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অধুনা এই সমস্যাটিই দেখিতেছি সব চাইতে বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিতেছে। চোখের উপর সদ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ঘটনা-প্রবাহের ঘাত-

প্রতিঘাতে সংস্কার বিমুক্তির দোহাই দিয়া সংস্কারান্ধ গোঁড়া আমিটি ক্রমেই সব বিষয়ে উদার হইয়া উঠিতেছে। সৌদামিনী শুধু ঝিই নয়, সর্বোপরি মানুষ, এই কথাটাই যেন আজ বার বার আমার মনের বনে উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছে। আর মানুষ হিসাবে তার ঝি-জীবনের ব্যর্থতার জন্য মাঝে মাঝে নিজেকেই কেন যেন অকারণে দায়ী সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতেছি। অথচ এই আত্মনিপীড়ন সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেহ কেহ আবার গর্হিতও মনে করিতে পারেন।

* * * *

এই এক দিক। আর অন্যদিকে শ্রীমতী স্নেহপ্রভা: আমারই একান্ত আপনার জন--এক গাদা কাচ্চাবাচ্চার কোর্ট অব ওয়ার্ডস হিসাবে যে নাকি এক সুদূর পল্লীপ্রান্তে নির্বাসিতার জীবন যাপন করিতেছে। আর আমারই মঙ্গলার্থে জাপানীদের মতিগতি ফিরাইবার জন্য ভগবানের আশীষ শয়তানের মাথার উপর টানিয়া নামাইতেছে। এমন চিঠি নাই, যাহাতে আমার কল্যাণের জন্য বুড়াশিবতলায় তাহার সোয়া পাঁচ আনার ডালা দিবার সংবাদ থাকে না। আজ মনেপড়ে তাহার একনিষ্ঠ পতিভক্তির কথা। বিরাট সংসারের অশেষ দায়িত্বের মধ্যেও আমার পায়ে হাত বুলাইয়া দিবার জন্য তাহার সেই ঐকান্তিক একাগ্রতা। আমার অন্যায় রক্তচক্ষু ও অপ্রশমিত ক্রোধকে আদর্শ পত্নীসুলভ সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার অবলেপে স্নিগ্ধ ও করুণ করিয়া তোলার কথা। নিষ্ঠুর দেবতার পাদমূলে আজীবন তাহার সেই ধূপ হইয়া পুড়িবার অত্যাশ্চর্য কাহিনী। আমি তো তাকে চিনি।

লইয়া আসিয়াছি স্নেহপ্রভাকে। ওর স্বামী ভক্তির নিষ্ঠার আঁচে আমার অন্তর-শুদ্ধি হইয়াছে। জাগতিক সব কিছু আকর্ষণ ডিঙ্গাইয়া স্নেহপ্রভার প্রতি আমার প্রেম আবার সদ্য-স্নাত মারাঠি ব্রাহ্মণের টিকির মত পবিত্র—শুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমি কথা দিয়াছি স্নেহপ্রভাকে, তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নাই।

কিন্তু সব কিছুর সুরাহা হয় নাই। বিদায় লইবার সময় সৌদামিনী নাকি তাহার অনামিকার সোনার আংটিটি গৃহিণীকে দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছে, বাবু দিয়েছেন। তাহা মিথ্যা কথা। কিন্তু কে বিশ্বাস করিবে? জগৎ বিশ্বাস না করিলে স্নেহপ্রভা কাঁদিতেই থাকিবে। হয়তো কখন হাসিবেও, কিন্তু সৌদামিনীর হাতের আংটিটা ইলিশ মাছের ত্রিভুজ কাঁটার মত স্নেহপ্রভার গলনালীর ঝিল্লীর মধ্যে কোথায় কিভাবে যে বিঁধিয়া রহিল, কারণে-অকারণে তাহা খচ খচ করিবেই।

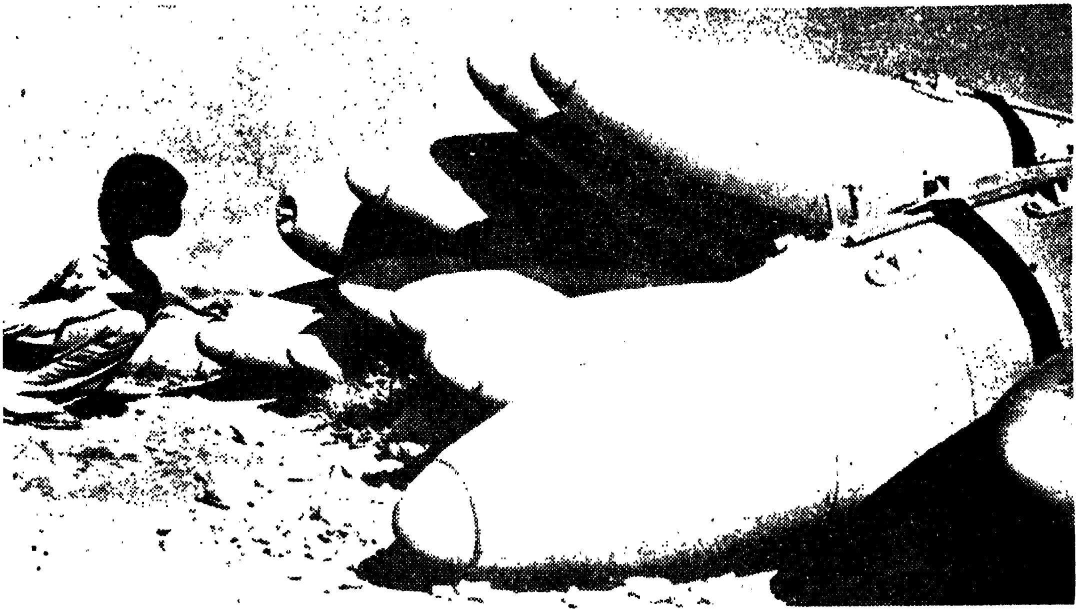
কি দুর্দৈব!

সাহিত্য সংবাদ

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন

বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও 'সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী'র উদ্যোগে কলিকাতায় "বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে"র আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে চারিটি বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইবে। যথা--(১) সাহিত্য, (২) দর্শন, (৩) কাব্য ও (৪) কীর্তন। সম্মেলনের অধিবেশনের ঠিকানা, তারিখ ও কার্যতালিকা যথাসময়ে সংবাদপত্র মারফৎ বিজ্ঞাপিত হইবে। বিভিন্ন শাখার পাঠোপযোগী প্রবন্ধ ও কবিতা সাহিত্যিক, কবি ও ভক্তবৃন্দের নিকট আহবান করা যাইতেছে। মহিলাবৃন্দের সহযোগিতা প্রার্থনীয়। প্রবন্ধাদি আগামী ২রা জুলাই তারিখের মধ্যে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীকুঞ্জকিশোর ভাগবতভূষণ, ২৭, আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা--এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। (স্বাঃ) শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-এ ডি-লিট সভাপতি ও শ্রীকুঞ্জকিশোর ভগবতভূষণ বি-এ, সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি, বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন।



লিবিয়ায় জার্মান বিমানে ব্যবহৃত অতিরিক্ত পেট্রল ট্যাংকসমূহ



লিবিয়ার রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত জার্মানির কয়েকটি ট্যাঙ্ক

কবিতা

বেসাতি

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীরু বনপথ কবে থেকে ছিল চেনা?
কবে থেকে চেনা বাঁকা চাঁদ আর তারা,
পথ ধারে ধারে তবুও ত বেচাকেনা—
অতনুর ফুলে তনুরে সাজানো সারা!
মাধবিকা তুমি মাধবীর বনে বনে
গুন্ গুন্ ক'রে কী যে গাও মনে মনে!
সাগরিকা তুমি গাগরী ভোরো না আর
এপারের খেয়া চলে গেছে ঐপার!
নিশীথিনী থাকো স্বপন-শিয়রে সাজি'
একা এ'পৃথিবী-প্রান্তে লাগিয়া কার!
কার তরে জাগো ক্লান্ত ভূষণে আজি—
এ'নীলরাত্রি কারে দেবে উপহার?
ওপারের বধূ পরেছে রূপালী টিপ্,
এপারে শিকারী গুটায়ে রেখেছে ছিপ্,

এপার-ওপার—মাঝখানে কাঁপে ঢেউ,
পসারী তোমার পসরা নেবে কি কেউ?
সজ্জিতা তব সজ্জা চেনে বা কারা?
কেবা জানে কী বা পণ্য এনেছো ঢেকে,
তব ইঙ্গীত, সংগীত কবে সারা?
কী যে নিয়ে যাবে, কী যে যাবে তুমি রেখে!
মনের বেপারি! হারায়ে ফেলেছো মন?
এ'হাটের ভিড়ে কেন খোঁজো অকারণ!
চলার বেগেতে হয়েছে ধূলি-ধূসর,
উর্ব্বরা ক্ষেত কেমনে হ'লো ঊষর!
প্রাণ-অভিসারি! কিবা পেলে তুমি বলো,
আঁচলের তলে কী লুকায়ে একা চলো?
জীবনের ফাঁকে কী পূরণ করি লবে,
তিল তিল করি' আপনারে গড়ি তবে?

ধূসর

নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

আমার প্রাণের পাখী ভাবছো কেন
বর্ষা বিধুর এই কাজলা রাতে,
ঘুমের ঘুঙুর শুনি বাজিছে যেন
শিরায় শিরায় বাঁধা একতারাতে।
একলা বিজন বনে সন্ধ্যা বেলা
কত গান শুনিয়াছি খেয়ালে মাতি' ঃ
জীবনের ভাঙা-গড়া রঙীন্ খেলা,
সেখানে আমরা শুধু ভুলের সাথী।
হেথা হোথা জমে গেছে কত অভিলাষ
নিঃশ্বাসে শেষ হয় ক্ষীণ পরমায়ু!
কোথা তুমি যাবে পাখী? একী পরিহাস!
গাছে গাছে হাহা করে ফুলেলা বায়ু।

ধ্বংসের মুখোমুখি তুমি ও আমি
এমন দিনেতে পাখী কোথায় যাবে?
বাঁচিবার যত বেগ গিয়াছে থামি',
মুক্তির গানখানি হেলায় গা'বে।
প্রাচীন দিনেরা সব কোথায় তারা
সরষে পাতার বুকে লুকালো নাকি?
ওখানে হাজারো ফুলে কিসের তাড়া,
তোমার সেখানে যাওয়া মিথ্যা, ফাঁকি!
আজ তবে গাও তুমি ধ্বংসের গান
জীবনের যত কথা নিঃস্ব করি'
দিকে দিকে প্রলয়ের উঠুক্ তুফান
ঝঞ্ঝার কূলে কূলে ভাসাবো তরী।

আজ-কাল

লিবিয়ায় বৃটিশ বিপর্যয়

লিবিয়ায় বৃটিশ পক্ষের মস্ত বড় বিপর্যয় হয়েছে। জেনারেল রোমেল যে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করেন, তাতে সাইরেনেকায় বৃটিশ অষ্টম বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে এবং সমগ্র সাইরেনেকা জার্মানদের হাতে চলে গেছে। ইংরেজের পক্ষে তব্রুকের পতনই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি; প্রায় দেড় বছর শত্রু-আক্রমণ ঠেকিয়ে তব্রুক এই প্রথম জার্মান করতলগত হ'ল।

বীর হাকিম থেকে স্বাধীন ফরাসী বাহিনী চ'লে আসার পর রোমেল ব্যাপক আক্রমণ চালান। বৃটিশ সৈন্য সে আক্রমণের সামনে টিঁকে থাক্‌তে পারে নি; প্রথমে গাজালা ও নাইট্‌স্‌ব্রিজ, তারপর এল আদেম ও সিদি রেজেগ, তারপর আক্রোমা তাদের হাতে ছাড়া হয় এবং তব্রুক ঘেরাও হ'য়ে পড়ে। তব্রুকের উপর জার্মানরা ট্যাঙ্ক এবং প্যারাশুট সৈন্য দিয়ে আক্রমণ চালায়। সকলে প্রত্যাশা করেছিল যে, এই লিবিয়ান ঘাঁটি জার্মানদের আগের মতো প্রতিহত করবে; কিন্তু আক্রমণের অল্পক্ষণের মধ্যে তব্রুক আত্মসমর্পণ করে।

তব্রুক লিবিয়ার শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। বৃটিশ বাহিনীর এটা সরবরাহ কেন্দ্রও ছিল। সুতরাং তব্রুকের পতনে ইংরেজদের ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে। যদিও কিছু বৃটিশ দ্রব্যসম্ভার জার্মান দখলের প্রাক্কালে সেখানে ধ্বংস করে' দেওয়া হয়, তবু যথেষ্ট সমরোপকরণ ও বহু সৈন্য জার্মানদের কবলে গেছে বলে মনে হয়। এইভাবে তব্রুকের পতন হওয়ায় বৃটিশ জনমত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সাইরেনেকায় সমর পরিচালনা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে বৃটিশ সংবাদপত্রে দাবীও জানানো হয়েছে। তব্রুক হাতছাড়া হওয়ায় আফ্রিকায় বৃটিশ সামরিক শক্তি তো ঘা খেলই, উপরন্তু মিশর তথা সুয়েজের দ্বার আলেক-জান্দ্রিয়ার বিপদ খুব বেড়ে গেল। জার্মান বাহিনী ইতিমধ্যে বারদিয়া দখল করে' মিশর সীমান্তে পৌঁছে গেছে। সেখানে হালফায়া-সোল্লুম-ফোর্ট কাপুৎসো এলাকায় বৃটিশ সৈন্য এখন জার্মানদের রুখ্‌বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তব্রুক পতনের পর জার্মানরা এখন মল্টাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করবে; কারণ মধ্য ভূমধ্যসাগরে এখন মল্টা ছাড়া বৃটিশদের আর কোনো পোতাশ্রয় ও ঘাঁটি থাক্‌ল না। এরপর জার্মানরা হয়তো আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে না গিয়ে ভূমধ্যসাগরে ক্রীট ও ঈজিয়ান এলাকা থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ এবং সিরিয়া চড়াও করবার চেষ্টা করতে পারে।

সোভিয়েট প্রতিরোধ

সেবাস্তোপোল এখনও অপরাজিত রয়েছে। ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান সব রকম অস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং বহু সৈন্য বলি দিয়ে জার্মানরা অবশ্য উত্তর দিকে সোভিয়েট ব্যূহের এক জায়গায় কীলকের আকারে প্রবেশ করেছে; কিন্তু রক্ষী সৈন্যদের পরাভূত করতে পারে নি। সোভিয়েট সৈন্যেরা বরং এর মধ্যে সেবাস্তোপোলের দক্ষিণ দিকে একটু অগ্রসর হয়েছে।

খারকভ রণাঙ্গনে জার্মান অভিযান মোটেই সুবিধে করতে পারছে না। মার্শাল টিমোশেঙ্কো কয়েকদিন আগে তাঁর আক্রমণে যে জায়গাগুলো দখল করেছিলেন, জার্মানরা এখনও সেগুলো কেড়ে নিতে পারল না। গত বছরের বিদ্যুৎগতির তুলনায় এ শম্বুক গতি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মঃ কালিনিন এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, জার্মানরা গত বছরের মতো আর অগ্রসর হতে পারবে না এবং সমগ্র রণাঙ্গনে অভিযান করবার ক্ষমতাও আর তার নেই। জার্মানদের এত সৈন্যক্ষয় হয়েছে যে, তাদের এখন অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের উপর সৈন্যের জন্যে নির্ভর করতে হচ্ছে। সোভিয়েট সংবাদ দপ্তর থেকে এক বছরের হিসাবনিকাশে বলা হয়েছে যে, এক বছরে জার্মানদের এক কোটি সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হয়েছে, ৩০৫০০ কামান, ২৪০০০ ট্যাঙ্ক ও ২২০০০ বিমান ধ্বংস হয়েছে; আর সোভিয়েটের ৪৫ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হয়েছে এবং ২২০০০ কামান, ১৫০০০ ট্যাঙ্ক ও ৯০০০ বিমান ধ্বংস হয়েছে।

চীনাদের পাল্টা-আক্রমণ

চীনে চীনা সৈন্যদের অটল সমরোদ্যম যুদ্ধের গতি খানিকটা পরিবর্তিত করেছে। জাপানীরা কিয়াংসি এবং চেকিয়াং প্রদেশে সমস্ত রেলওয়ে ও রাস্তা দখল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছিল; কিন্তু চীনাদের পাল্টা-আক্রমণে তাদের প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। চীনারা বিমানঘাঁটি চুসিয়েনের ২৬ মাইল পশ্চিমে চাংসান পুনরধিকার করে এবং আরও অনেকগুলো শহর তাদের দখলে আনে। তখন চেকিয়াং-এ জাপানীরা পূবে চুসিয়েনের দিকে এবং কিয়াংসিতে পশ্চিমে নানচাং-এর দিকে পশ্চাদপসরণ করে। শেষ খবরে জানা যায় যে, জাপানীরা চেকিয়াং-এর রাজধানী কিনহোয়ার উত্তর-পূবের ঘাঁটি-গুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং চীনারা চুসিয়েনে জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

ক্যান্টন থেকে একটা জাপানী বাহিনী ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে।

যুগোস্লাভিয়া

ইওরোপে নাৎসী-পদানত সমস্ত দেশের মধ্যে কৃতিত্ব দেখাচ্ছে যুগোস্লাভিয়া। সেখানে জেনারেল মিহাইলোভিচ-এর অধীনে দেশ-প্রেমিক যুগোস্লাভদের এক সৈন্যবাহিনী নিরন্তর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স গুপ্তস্থানে; সৈন্যেরা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে' থেকে এতদিন তাদের সংগঠন বজায় রেখেছে। বর্তমানে তারা দেশদখলী ইতালীয় সৈন্যদের ভয়ানকভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করেছে; তাদের সংগে সংগে গেরিলারাও আক্রমণ-তৎপর। মন্টিনিগ্রোতে তারা কয়েকটা ইতালীয় ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে; বোস্‌নিয়াতেও ইতালীয়দের অবস্থা সংকটাপন্ন এবং স্লোভেনিয়াতে রাজধানী লিউবলিয়ানা পরিবেষ্টিত হয়েছে। এক্সিস সৈন্যের সংগে তাদের কয়েক জায়গায় বড় সংঘর্ষও হয়ে গেছে।

ওয়াশিংটনে চার্চিল

মঃ মলোটোভ ওয়াশিংটন থেকে মস্কোতে ফেরার অব্যবহিত পরেই মিঃ চার্চিল গেছেন ওয়াশিংটনে। বৃটিশ সমর-নায়করাও তাঁর সংগে গেছেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট ও মার্কিন সমর-অধিনায়কদের সংগে তাঁদের আলোচনা চল্‌ছে। আলোচনা খুব গোপন রাখা হয়েছে। সমর-পরিচালনাই যে আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়, তাতে সন্দেহ নেই। অনেকে বল্‌ছেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে ইওরোপে দ্রুত দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবার জন্যেই চার্চিল আমেরিকায় গেছেন।

ভিশির মতিগতি

অনধিকৃত ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল এক বেতার বক্তৃতায় খোলোখুলি বলেছেন যে, তিনি জার্মানীর জয় চান; কারণ "জার্মানী না থাকলে আগামীকালই সমস্ত ইওরোপে বলশেভিজম্ প্রতিষ্ঠিত হবে।" জার্মানীর সংগে ফ্রান্স ১৯৩৯ সালে যুদ্ধে

অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি অনুতাপ প্রকাশ করেন এবং ফরাসী শ্রমিকদের জার্মানীতে গিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করেন।

মঃ লাভাল হয়তো তাঁর জার্মান-তাঁবেদারীর মনোভাব এখনই প্রকাশ্যে বলতেন না, যদি না ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংগ-মার্কিন অভিযানের সম্ভাবনা আজ দেখা দিত। কিছুদিন আগে মার্শাল পেত্যাঁ সাধারণভাবে বলেন যে, তিনি লাভালের সংগে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। ভিশি-কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্যে নাৎসী-পদলেহনের একমাত্র কারণ এই যে, তাঁরা আশঙ্কা করছেন, বাইরে থেকে কোনো অভিযান হ'লেই ফ্রান্সে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক অধিবাসীরা অভ্যুত্থান করবে এবং অভিযাত্রীদের সংগে যোগ দেবে। সেক্ষেত্রে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং ফ্রান্সে বৈপ্লবিক শক্তি দুর্জয় হবে। তাই তাঁরা আগে থেকে ফ্রান্সকে জার্মানীর পক্ষে ভিড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন।

* * *

বৃটেনের যুদ্ধের খরচার জন্যে কমন্স-সভা আরও ১০০ কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ করেছেন। এ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্যে সবশুদ্ধ ১০০৫ কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ হয়েছে। বৃটেনের এখন প্রতি সপ্তাহে ৮,৪২,৫০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হচ্ছে।

ভারতবর্ষ

ফরোয়ার্ড ব্লক বে-আইনী

গত ২২শে জুন ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতরক্ষা আইনের নব প্রবর্তিত ২৭ (ক) বিধানে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লককে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে' ঘোষণা করেছেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের যুক্তি হিসেবে গভর্নমেণ্ট বলেছেন যে, বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সংযোগ হয়েছে এবং বৃটিশ ভারতের রক্ষা, দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উপযুক্তভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই নতুন বিধান অনুসারে কোনো লোক (১) এই রকম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে বা পরিচালনায় সাহায্য করতে পারবে না, (২) এই রকম প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের কোনো সভার ব্যবস্থা করতে এবং সভায় কোনোভাবে যোগ দিতে পারবে না, (৩) ঐ রকম সভার কোনো নোটিস প্রকাশ করতে পারবে না এবং (৪) এই রকম প্রতিষ্ঠান সমর্থন করতে কিংবা অন্য কোনো-ভাবে তার কার্য পরিচালনায় সাহায্য করতে কোনো লোককে বলতে পারবে না। এই বিধান লঙ্ঘন করলে ৭ বছর পর্যন্ত জেল কিংবা জরিমানা কিংবা দুই রকম শাস্তি হবে।

এই ঘোষণার ঠিক আগে ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষ ভাবে বাঙলা দেশে গোয়েন্দা পুলিশ একযোগে হানা দেয়। নানা জায়গায় ফরওয়ার্ড ব্লক কার্যালয়, কংগ্রেস কমিটি, যুব-প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়িতে খানাতল্লাসী চলে। কলকাতার আনন্দ-বাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কার্যালয়েও তল্লাসী হয়। পুলিস বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায় এবং অনেককে জেরা করার জন্যে নিয়ে যায়। কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে ; তন্মধ্যে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ অন্যতম।

গান্ধীজীর অভিমত

গান্ধীজী সম্প্রতি কয়েকটা বিবৃতি দিয়েছেন যা লক্ষ্য করা দরকার। ভারতবর্ষে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতিতে তাঁর আপত্তি নেই এই কথার ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "মিত্ররূপে স্বাধীন ভারত যা করতে পারে তার সীমা নেই। আমার ইচ্ছে ছিল যে, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনকে রক্ষা করবার জন্যে সম্মিলিত [illegible] জন্যে (ভারত থেকে) আমার আবেদনকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বেরিয়ে যাওয়ার দাবী বলে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু এ ব্যাখ্যা আমি মানি না। আমি কোনো মারমুখী মনোভাব নিয়ে এ আবেদন করি নি।........ আমি যে ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছি তাতে সমস্ত বিঘ্ন দূর হবে, অহিংসা সম্বন্ধে সমস্ত বিতর্কের অবসান হবে এবং মিত্রপক্ষের লক্ষ্য সাধনে, বিশেষত আশু বিপদাপন্ন চীনকে শ্রেষ্ঠ সাহায্য দেবার জন্যে ভারতকে বাধামুক্ত করবে।"

আর এক বিবৃতিতে গান্ধীজী বলেছেন, "ভারতকে পরাধীন-তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কাজে কোন রাষ্ট্রের সাহায্য যাচ্ঞার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। বৃটিশ শাসনের বদলে আর এক শক্তির শাসন বরণ করতে আমি চাই না।.........এক্সিস শক্তির বন্ধুত্বের বুলিতে আমি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব কখনও দিই নি। তারা যদি ভারতবর্ষে আসে তা'হলে মুক্তিদাতা হিসেবে আসবে না, আসবে লুঠের বখরাদার হিসেবে।" তিনি এই বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের সংগে তাঁর মত ও পথের অনৈক্যের কথা বলেন।

চতুর্থ বিবৃতিতে গান্ধীজী বলেছেন, "আমার মত হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছানির্বিশেষে বৃটিশ কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান হওয়া উচিত। তবে আমি তাদের নিজেদের সামরিক প্রয়ো-জন স্বীকার করব। জাপানী দখল নিবারণ করবার জন্যে তাদের ভারতবর্ষে থাকতে হতে পারে। এই দখল-নিবারণ তাঁদের এবং আমাদের উভয়েরই লক্ষ্য। চীনের জন্যও এর প্রয়োজন হ'তে পারে। অতএব আমি ভারতে তাদের উপস্থিতি—শাসক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে—সহ্য করব। অবশ্য আমি ধরে নিচ্ছি যে, বৃটিশ অপসরণ ঘোষণার পরে ভারতে একটা স্থিতিশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। ......যে সর্তে মিত্রপক্ষ কাজ করবে তা সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের গভর্ন-মেণ্টই ঠিক করবে।"

মিত্রপক্ষের সংগে স্বাধীন ভারতের সন্ধি করা এবং ভারতে মিত্রপক্ষের সৈন্য থাকার কথা গান্ধীজী ইদানীং স্পষ্ট করে বলতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর চিন্তা যখন প্রকাশ্যত এই রকম গতি নিয়েছে তখন তাঁর নূতন আন্দোলন বাস্তবিক বৃটিশ শক্তিকে বিব্রত করতে চাইবে কি না, এটা একটা বড় প্রশ্ন।

সিমলা-কালকা রেলপথের ঘটনা

দুজন ইংরিজি জানা লোক গত ২০শে জুন রাত্রে সিমলা-কালকা রেলপথে একটা মোটর-রেল থামিয়ে দুজন সামরিক অফি-সারকে ও ড্রাইভারকে গুলী করে মারে এবং অপর কয়েকজনকে আহত করে। তার মধ্যে দুজন সামরিক অফিসার ও একজন অসামরিক শ্বেতাংগ হাসপাতালে মারা গেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সামরিক অফিসাররাই আততায়ীদের আক্রমণের আসল লক্ষ্য ছিলেন। ঘটনাটা রহস্যাবৃত। গভর্নমেণ্ট অনুসন্ধান করছেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

মৌলবী ফজলুল হকের উদ্যোগে ভারতে 'প্রোগ্রেসিভ মুস-লিম লীগ" নামে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। মুসলিম লীগের প্রতি-ক্রিয়াশীল নীতি এবং জিন্না ও তাঁর চক্রের স্বৈরাচার ফজলুল হককে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মুর্শিদাবাদের নবাবের সভাপতিত্বে কলকাতায় এক সাম্প্র-দায়িক মৈত্রী সম্মেলন হয়। বহিরাক্রমণের এই বিপদের সময় বাঙলার হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় একত্রে যাতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণে অগ্রসর হয় সেজন্যে সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ঢাকায় খেলার মাঠের বিরোধ দাংগায় পর্যবসিত হয়েছে। ছোরা মারামারি ও খুন জখম চলছে। গভর্নমেণ্ট দাংগা দমনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন।



বোম্বের সিনেমা-প্রতিষ্ঠানে বাঙালী

বাঙলা দেশ থেকে একদল অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালক বর্তমানে বোম্বাইয়ের বিভিন্ন সিনেমা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং এ'দের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত যে কয়টি ছবি মুক্তিলাভ করেছে, সেগুলি পয়সা ও সুনাম দুইই সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করছে বলে বোম্বাইয়ের কতকগুলি কাগজ প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মন নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বাঙলা দেশ কেন নাম কিনবে, আর বাঙালী কেন পয়সা নিয়ে যাবে। এই সব পত্রিকার এ ধরণের মন্তব্যই যে বোম্বাইয়ের জনমত, আমরা তা মেনে নিতে রাজি নই; তথাপি দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই মনোভাবের জন্য আমরা লজ্জিত। একটা কথা তাঁদের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, শিল্পীরা যেখানেই অথবা যে প্রদেশেই কাজ করুন না কেন, তাঁরা সকলেই ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পেরই উন্নতি সাধনে ব্রতী। এক প্রদেশের ক্ষতি হয়তো অন্য প্রদেশের লাভের কারণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র শিল্পই লাভবান হচ্ছে। আমেরিকার Lease and Lend Policy-র মতো আমাদের দেশেও যদি এই শিল্পী বিনিময় রীতির প্রচলন করা যায়, তাহ'লে কোনো প্রদেশেরই আক্ষেপ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

যুদ্ধকালীন নানা অসুবিধার জন্য বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র-গুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে যদি বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদেরও বেকার অবস্থায় অর্থাভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসে থাকতে হয়, তাহলে সেটা জনসাধারণের এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিরই ক্ষতি। যুদ্ধ একদিন থামবেই, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিরও সুদিন আসবে, কিন্তু শিল্পীদের ক্ষমতা ও অভিনয়নৈপুণ্য হয়তো তখন আর থাকবে না।

বোম্বাই প্রদেশ সমগ্র ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের কেন্দ্রস্থল। ভাল ছবি তৈরী করার দায়িত্ব এই প্রদেশেরই সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং বাঙলা দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও পরিচালকের সহযোগিতায় তাঁরা যদি সত্যিকারের ভাল ছবি তুলতে পারেন, তাতে দর্শকরাই বেশী খুসি হবে এবং দর্শকদের খুসি করতে পারলে পয়সার মার নেই, সেটা তাঁদেরই লাভ।

বর্তমানে দেশের অবস্থা সংকটজনক। ভবিষ্যৎও অন্ধকার। এ সময়ে ছায়াচিত্রের শিল্পীরা পেটের দায়ে যদি অন্যত্র রোজগারের জোগাড় করেন, তা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা না ক'রে যাতে সকলের মধ্যেই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় থাকে, সেই চেষ্টাই করা উচিত। বর্তমান সময়ে কোন একজন নবাগত অভিনেতাকে গড়েপিটে তৈরী ক'রে নিয়ে ছবি তোলা সহজ-সাধ্য নয়। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্ ও নিপুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের যদি পাওয়া যায়, তাঁদের নিয়ে ছবি তোলায় আপত্তি হওয়া উচিত নয়।



সারকো প্রডাকসনের 'আপনা ঘর' চিত্রে শান্তা আপ্তে

ছায়াচিত্র সংবাদ

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ ছবি নির্মাণের পরিকল্পনার কিছু অদলবদল করা সম্বন্ধে চিন্তা করছেন বলে খবর পাওয়া গেল। জানা গেল যে, নীতিন বোসের পরিচালনায় 'কাশীনাথ' নামে যে দ্বিভাষী ছবিটির কাজ চলছে, তা সাময়িকভাবে মাসাধিক-কালের জন্য বন্ধ রাখা হবে। কারণ সম্প্রতি ভারত সরকার ছবির

সর্বাধিক দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ জারী করেছেন, তার জন্যে নীতিনবাবুকে তাঁর ছবির চিত্রনাট্য পুনরায় কেটে ছেঁটে নতুন করে লিখতে হবে। নীতিন বসু চিত্রনাট্য সংশোধনের জন্য কাজ থেকে ছুটি নিয়ে গিরিডি চলে গেছেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে নিউথিয়েটার্সের যে চুক্তি হয়েছিল, ইত্যবসরে সেই ছবি তোলার জন্য শ্রীযুক্ত আতর্থীর ডাক পড়তে পারে। হয়তো অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি 'দিকশূল' ছবি তোলার কাজ সুরু করে দেবেন।

"আপনা-ঘর"

সার্কো প্রোডাকসন্সের চিত্র 'আপনা ঘর' আগামী ২৭শে জুন 'রক্সি' সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দেবকী বসু এবং শান্তা আপ্তে ও চন্দ্রমোহন নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

চিত্রা প্রোডাকসন্স

চিত্রা প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্র 'বিটুইন ইউ এণ্ড মী' একযোগে চিত্রা, নিউ সিনেমা ও গণেশে মুক্তিলাভ করবে বলে স্থির হয়েছে। এই চিত্রে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্ন্যাল ও লীলা চিট্‌নীশ।

ইন্দ্র মুভিটোন

ইন্দ্র মুভিটোনের বাঙলা পৌরাণিক চিত্র 'ভীষ্ম' আগামী ৩রা জুলাই 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বিভিন্ন ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, অমল বন্দ্যো, সুশীল রায়, চন্দ্রাবতী, মীরা, শিশুবালা, সন্ধ্যারাণী, রেখা মিত্র প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ছবি পরিচালনা করেছেন জ্যোতিষ ব্যানার্জি।

নিউ টকীজ লিঃ

নিউ টকীজের পরবর্তী ছবি 'প্রায়শ্চিত্তে' শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন। পদ্মা দেবী এই ছবিতে অহীন্দ্রবাবুর কন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন ধীরেন গাঙ্গুলী।

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত নিউ টকীজের হ'য়ে আরেকটি ছবি পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ছবিটির হিন্দী ও বাঙলা—উভয় সংস্করণ হবে এবং নাম হবে "বেদুইন"।

সাইগল ও লীলা চিট্‌নীশ

সাইগল ও লীলা চিট্‌নীশকে নিয়ে চিত্রা প্রোডাকসন্স একটি ছবি তোলার চেষ্টায় আছে। সম্প্রতি পাহাড়ী-চিট্‌নীশকে নিয়ে একটি ছবি তোলা হয়েছে; পরবর্তী ছবি হবে মতিলাল ও চিট্‌নীশকে নিয়ে। তার পরের ছবিটির জন্য সাইগলকে জোগাড় করার খুবই চেষ্টা চলছে। সাইগল বর্তমানে রঞ্জিতের "সুরদাস" চিত্রে খুরশিদের সঙ্গে একটি ছবিতে কাজ করছেন।

এ সম্পর্কে চিত্রা প্রোডাকসন্সের পক্ষ থেকে একজন নিউ থিয়েটার্সের কর্মকর্তা শ্রীযুত বি এন সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জানা গেল, শ্রীযুত সরকার সাইগলকে আরও কিছু-দিনের ছুটি দিতে সম্মত হয়েছেন।

বোম্বের চিঠি

এখানকার সিনেমা রাজ্যে যে সব বাঙালীরা এসে উৎপাত সুরু করেছেন, তাদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আপনাদের কিছু কিছু জানতে ইচ্ছে হয়—নিশ্চয়ই। তাই জানাচ্ছি।

শ্রীমান্ ফণি মজুমদার বাঙালী 'তমান্নায়' তাঁর তমান্না (আমার বাসনা) পূরো করেছেন। বোম্বের বাজারে বইখানার সুনাম হয়েছে। ফলে, মজুমদার মহাশয় নূতন ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন—আরও অনেক বেশী টাকায়। তাঁর করিৎকর্মা সহকারী অরবিন্দ সেন মহাশয়ও রয়েছেন দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বিজন সেনগুপ্ত মহাশয় মজুমদার মহাশয়ের সুনামের অনেকখানি ভাগীদার। সর্বতোভাবেই, 'তমান্না' বোম্বের সিনেমা রাজ্যে রসবেত্তা ও রস পরিবেষক বাঙালীর সুনাম বর্ধিত করেছে।

কলিকাতায় থাকাকালীন মজুমদার মহাশয়কে যেভাবে দশের ষড়যন্ত্রে পড়ে অপদস্থ হতে হয়েছিল; যেভাবে তাঁর 'অপরাধ' ছবিখানির পতন তাঁকে দেখতে হয়েছিল, তাতে একথা বলতে দোষ নেই যে, তিনি বোম্বেতে চলে এসে ভাল করেছিলেন। নয়তো বাঙলার কুচক্রীদের হাতে পড়ে তাঁর প্রতিভার বিনাশ ঘটত।

* * * * *

তমান্না ছবিতে আরেকজনের জয়জয়কার। তিনি হচ্ছেন—অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়। তাঁর অভূতপূর্ব অভিনয় অতি পাষণ্ডের চোখকেও সজল করে।

ধন্য লক্ষ্মী প্রডাকশনের বাঙালী দল। বোম্বেতে এসে তাঁরা দেখাতে পাচ্ছেন—চরিত্রে, গুণে, মনে, ব্যবহারে তাঁরা কত উন্নত। বোম্বের বিমুখ সিনেমা-জগৎ আজ তাঁদের শ্রদ্ধাভরে, বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে।

* * * * *

প্রফুল্ল রায় মহাশয়, মহাশয় সুধীর সেন—এঁরা এবং এঁদের বাঙালী সাঙ্গোপাঙ্গরা সকলেই আজ বাঙলার গৌরব বাড়াচ্ছেন।

প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের কর্মশক্তি ও ব্যক্তিত্ব; সুধীর সেন মহাশয়ের অতি সাধারণ গল্পকেও অদ্ভুত সিনেমা উপযোগী করে তৈরী করবার শক্তি ও সেমত ছবি তোলবার কায়দা—সকলেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। তিনি যে শ্রীযুক্ত নীতিন বসুর সুযোগ্য সহ-পরিচালক ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি প্রতি পদক্ষেপেই দিচ্ছেন।

ফণি মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, সুধীর সেন, প্রত্যেকেই আজ এই বোম্বেতে এসে প্রমাণ করেছেন, নিউ থিয়েটার্স শুধু ভালো ছবিই করে না; ভালো ভালো কর্মীর সৃষ্টিও তারা করে।

* * * * *

বোম্বেতে আজ এমন ষ্টুডিও কমই আছে, যেখানে নিউ থিয়েটার্স নেই। কৃষ্ণচন্দ্র দে, সায়গল, পৃথিবরাজ, জগদীশ শেঠী, পাহাড়ী সান্ন্যাল, লীলা দেশাই, ছায়াদেবী এবং ফণি মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, সুধীর সেন ও তাঁদের দলববল সকলেই আজ বোম্বের চারিধারে ছড়িয়ে রয়েছেন।

ফণি মজুমদার মহাশয়ের নূতন যে ছবি সুরু হবে—তার নাম এখনো জানতে পারি নি, তবে শুনছি—সে বইয়েতে নায়ক হবেন—পাহাড়ী সান্ন্যাল।

মহাশয় প্রফুল্ল রায়ের 'মেরাগাঁও' এখনো মধ্যপথে। সুধীর সেন মহাশয়ের ছবির নাম 'একেলী'—নায়ক পাহাড়ী, নায়িকা লীলা দেশাই। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙলার গণ্ডগ্রাম—পটভূমি।

জয় নিউ থিয়েটার্সের—যাঁরা সিনেমাকর্মী তৈরী করে ভারতের নানা স্থানে পাঠাচ্ছেন—চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য।

ইতি—বোম্বাইওয়ালা।



কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের খেলা ক্রমশঃই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠিতেছে। "কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে," "কোন্ দলের সম্ভাবনা আছে" এই চিন্তায় ও আলোচনায় সকলেই অস্থির। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, দ্বিতীয়ার্ধের এখনও খেলা বাকী। বিভিন্ন দল মাত্র দুই তিনটি করিয়া খেলা খেলিয়াছে। অবশিষ্ট খেলাগুলিতে কি ফল হইবে কেহই বলিতে পারে না। তবে বর্তমানে লীগ তালিকা অবলোকন করিলে সকলেই মনে মনে স্বীকার করিবেন যে, ইস্টবেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দল এখনও পর্যন্ত অন্যান্য সকল দল অপেক্ষা কয়েক পয়েন্ট অগ্রগামী থাকিয়া লীগ পয়েন্টের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছে; দলের খেলারও উন্নতি হইয়াছে। পাগ্সলে, আপ্পারাও প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ দলে যোগদান করায় দলের শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দল একমাত্র বি এণ্ড এ রেল দলের নিকট একটি পয়েণ্ট হারাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দলের অবস্থা কোনরূপ খারাপ হয় নাই। অবশিষ্ট খেলাগুলির মধ্যে দুইটি খেলায় পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত কোন দলই ইহার নাগাল পাইবে না। এই দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ খেলিতেছেন তাহাতে অবশিষ্ট খেলাগুলির মধ্যে দুইটিতে পরাজিত হইবে বলিয়া কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না এবং একথাও ঠিক যে, ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা পূর্ব হইতে কেহ কল্পনা করিতেও পারেন না। মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দল এখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বর্তমান আছে। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলই যে শীর্ষস্থানে থাকিবে, ইহা অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস। পরবর্তী দুই বা তিনটি খেলা হইলেই ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। মহমেডান স্পোর্টিং দল শেষ পর্যন্ত লড়িতে পারিবে, যদি এই দলের খেলোয়াড়গণের ক্রীড়াকৌশলের উন্নতি হয়। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ মন্দ খেলিতেছেন না। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তাঁহারা প্রতিপক্ষের গোলে হানা দিতে পারেন। রক্ষণভাগে গোলরক্ষক ওসমান ব্যতীত কাহারও উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। যে কোন দ্রুতবিচরণশীল খেলোয়াড় ইঁহাদের ফাঁকি দিয়া গোল করিতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিহ্রাস পায় ইহা পরিচালকগণের উপলব্ধি করিবার অভাবেই দলকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। দীর্ঘ ১০।১২ বৎসর ধরিয়া একই খেলোয়াড়ের উপর ইঁহারা রক্ষণভাগের, বিশেষ করিয়া ব্যাকের দায়িত্ব অর্পণকরত নিশ্চিন্ত আছেন। সকল দলেরই এই বিভাগের খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং দলেই এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রক্ষণভাগের এই শক্তিহীনতাই এই দলকে হয়তো শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ হইতে বঞ্চিত করিবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। না বলিলে প্রকৃতই কয়েকজন খেলোয়াড়ের উপর অবিচার করা হইবে। তাঁহারা হইতেছেন গোষ্ঠ পাল ও সামাদ। এই দুইজন খেলোয়াড় ১০।১২ বৎসর কেন, তাহারও বহু অধিক বৎসর খ্যাতির সহিত খেলিয়াছেন এবং যতদিন ফুটবল খেলার মাঠের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল ততদিন শক্তিহীনতার পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহাদের ন্যায় সকল খেলোয়াড়ই দীর্ঘ দিন খেলিতে পারিবেন, ইহা আশা করা অন্যায়। ইস্টবেঙ্গল দলের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কোন দল বর্তমানে থাকিয়া থাকে, তবে তাহা মোহনবাগান ক্লাব। এই দল লীগের প্রথমার্ধের খেলায় কয়েক পয়েন্টের ব্যবধানে পশ্চাতে পড়িয়াছিল বলিয়াই এখনও পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলের সমান পয়েণ্ট সংগ্রহ করিতে পারে নাই। যেভাবে এই দলের খেলোয়াড়গণ খেলিতেছেন ও পয়েণ্ট সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব একটি কি দুইটি খেলায় পয়েণ্ট হারাইলেই ইঁহারা ইস্টবেঙ্গল দলের সমকক্ষ হইয়া পড়িবেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনা হইতেই এই দলকে সমানে প্রত্যেক খেলায় প্রতিপক্ষ দলকে বিপর্যস্ত করিয়া পরাজিত করিতে দেখা যাইতেছে। প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভ করার জন্য দলের খেলোয়াড়গণ যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই দল শেষ পর্যন্ত কি করিবে, এখনও কেহ বলিতে পারে না। তবে এই কথা ঠিক যে, ইষ্ট বেঙ্গল দল অযথা পয়েণ্ট নষ্ট না করিলে এই দল অবশিষ্ট সকল খেলায় জয়লাভ করিয়াও ইষ্টবেঙ্গল দলকে চ্যাম্পিয়ানসিপ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এই তিনটি দল ব্যতীত অপর সকল দলের বর্তমান অবস্থা যেরূপ তাহাতে ঐসকল দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র ভবানীপুর দলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দলের খেলা পুনরায় উন্নততর হইতেছে এবং শেষ পর্যন্ত এইভাবে খেলিতে পারিলে লীগ তালিকার চতুর্থস্থান এই দল অতি অবশ্যই লাভ করিবে। নিম্নে ২২শে জুন পর্যন্ত খেলার প্রথম চারিটি দলের ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

ইষ্টবেঙ্গল	১৬	১৪	১	১	৪৮	৭	২৯
মোহনবাগান	১৬	১১	৩	২	৩৭	১১	২৫
মহমেডান স্পোর্টিং ...	১৫	৯	৫	১	৪৭	১০	২৩
ভবানীপুর	১৫	৮	৬	২	২১	৬	২২

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রবর্তক হইতেছে বাঙলার ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশন সন্তোষের মহারাজার স্মৃতিকল্পে একটি কাপ প্রদান করে ও নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করে। এই অনুরোধের ফলেই এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। গত বৎসর এই প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বৎসরে এই অনুষ্ঠান হইবে কি না সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধজনিত যে গুরুতর পরিস্থিতি হইয়াছে তাহাই এই অনুষ্ঠানের বাধা হিসাবে দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হয় তাহাতে আশা হইয়াছিল যে যুক্তপ্রদেশ ফুটবল ফেডারেশন এই প্রতিযোগিতার ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন পর্যন্ত বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এই অনুষ্ঠান এই বৎসর করা সম্ভবপর হইবে কিনা। এই বিষয় শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য আগামী জুলাই মাসে ফেডারেশন এক জরুরী সভার আহ্বান করিয়াছেন। ফেডারেশনের সভায় এই অনুষ্ঠান হইবে—এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশন অথবা যুক্তপ্রদেশ ফুটবল এসোসিয়েশন ইঁহাদের যে-কেহ এই প্রতেযোগিতার ভার গ্রহণ করিলেই আমরা সুখী হইব। সকল প্রাদেশিক এসোসিয়েশন হয়তো দল প্রেরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু সেই জন্য প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। বোম্বাই, দিল্লী, সীমান্তপ্রদেশ, বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে ফুটবল খেলা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং এই সকল প্রদেশের দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। প্রতিযোগিতায় যখন দলের অভাব হইবে না তখন আই এফ এর প্রতিনিধিগণ ফেডারেশনের সভায় একটু জিদ ধরিলেই অন্য সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানের বিপক্ষে মত দিতে পারিবেন না।

ব্যায়ামে কৃতি বাঙালী বালিকা

জাতীয় যুব সঙ্ঘের বিশিষ্ট সভ্যা ও বালিকা বিভাগের পরিচালিকা কুমারী শোভনা দাস সাধারণ ড্রিল, ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ, ব্রতচারী নৃত্য, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসু, প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বালিকাটি ১৯৩৪ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় যুব সঙ্ঘে যোগদান করে। নিজ অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার জন্য এতগুলি বিষয় শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুমারী দাস সামরিক বাদ্য বা ব্যান্ড এবং সামরিক ড্রিল, প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারিণী। হাওড়া সাধনা সমিতি পরিচালিত নিখিল ভারত প্যারেড প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও বালিকাদের উভয় বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কম্যাণ্ডার বা পরিচালক বিবেচিত হওয়ায় কুমারী দাস পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহারই পরিচালনাগুণে, গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন পরিচালিত খালি হাতে সম্মিলিত ব্যায়াম প্রতিযোগিতার বালিকা বিভাগে, জাতীয় যুব সঙ্ঘ দল পর পর দুই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শীল্ড লাভ করে। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন মহিলা ও পুরুষের সম্মেলনে বা কন্‌ফারেন্সে কুমারী শোভনা দাসের পরিচালনার জন্য জাতীয় যুব সঙ্ঘ বালিকা ব্যাণ্ড দল অশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছে। কোন ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্রের বা কলেজের সাহায্য ব্যতীত ক্লাবের সামান্য সাহায্যে ও উৎসাহেই নিজ প্রচেষ্টায় ব্যায়ামের বিভিন্ন বিভাগে এমন কি ব্যাণ্ড বাদ্যেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারা যায়—এই আদর্শ কুমারী শোভনা দাস বাঙালী বালিকাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা এই বালিকার আরও উন্নতি কামনা করি।



কুমারী শোভনা দাস (জাতীয় যুব সঙ্ঘ)

সমর বার্তা

১৫ই জুন

লিবিয়ায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। এক্রোমা-নাইটস্‌ব্রীজ-এল আদেম এই ত্রিভুজাকার রণক্ষেত্রের যুদ্ধ রবিবার সারাদিন ধরিয়া চলে; গত ২৪ ঘণ্টায় তব্রুকের বিপদাশংকা গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীন—অদ্যকার চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চেকিয়াং ও কিয়াংসি সীমান্তে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। জাপনীরা সমস্ত রণাঙ্গনেই বহুসংখ্যক বিমান লইয়া আক্রমণ চালাইতেছে। ১৩ই জুন জাপানীরা কাওয়াংফেন-এ প্রবেশ করে।

১৬ই জুন

লিবিয়া—ব্রিটিশ অষ্টম বাহিনীর হেডকোয়ার্টার হইতে রয়টারের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, লিবিয়ায় দিবারাত্র সংগ্রাম চলিতেছে। এল আদেমের পশ্চিমে নাইটস্‌ব্রীজ অঞ্চলে যে ব্রিটিশ বাহিনী ঘাঁটি রক্ষা করিতেছিল, কয়েকদিন পূর্বে তাহাদের সরাইয়া আনা হইয়াছে।

রুশিয়া—জার্মান রেডিওতে আজ স্বীকার করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যদল ইফলটা এবং মারিউপোলে অবতরণ করার চেষ্টা করিয়াছিল। অবরুদ্ধ সেবাস্তোপোল দুর্গের সাহায্যার্থে সোভিয়েটের নৌবহরের সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যে জাপানী সৈন্য নামিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে মার্কিন সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী বিমান আক্রমণ চালাইতেছে। জাপানের ৩টি ক্রুজার, ১টি ডেস্ট্রয়ার, ১টি গান-বোট ও ১টি সৈন্যবাহী জাহাজ জখম হইয়াছে।

১৭ই জুন

লিবিয়া—বুধবার মধ্যপ্রাচ্যের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এক শক্তিশালী এক্সিস বাহিনী গতকল্য মঙ্গলবার সিদিরেজেগের দিকে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়। এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি তব্রুকের সীমারেখা হইতে ১০ মাইল এবং এল আদেম হইতে কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত।

রুশিয়া—'রেড স্টার' পত্রিকায় রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণ চালাইয়া জার্মানদিগকে তাহাদের ব্যূহের কয়েক স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। 'টাস এজেন্সী'র সংবাদদাতা কর্তৃক অদ্য অপরাহ্নে সেবাস্তোপোল হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য প্রাতে জার্মানরা দ্বিমুখী আক্রমণ চালাইয়া একটি পর্বত-শৃঙ্গ দখল করে।

চীন—চীনারা সাংগিও ত্যাগ করিয়াছে। সাংগিও কিয়াংসি প্রদেশের কাওয়ানফেংএর ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

১৮ই জুন

লিবিয়া—তব্রুকের অবস্থা সঙ্গীন। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, এল আদেম ও সিদিরেজেগ হইতে মিত্রপক্ষের বাহিনীকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রুশিয়া—বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, 'হ্যামবুর্গার ফ্রেম ডেনরাৎ' পত্রিকার সমর সংবাদদাতা স্বীকার করিয়াছেন, "সেবাস্তোপোল পৃথিবীর মধ্যে দুর্ভেদ্যতম দুর্গ। জার্মান সৈন্যেরা এ পর্যন্ত আর কখনও এইরূপ দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই।"

খারকভ এলাকায় জার্মানরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু রাশিয়ানরা তাহা ব্যর্থ করিয়াছে।

চীন—জাপান চীনের চেকিয়াং এবং কিয়াংসি প্রদেশের মধ্যে বিস্তৃত সমস্ত রেলপথ দখলের মতলব করিয়াছিল, উহা দখল প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গতকল্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনারা সাঙ্গিও শহরটি ত্যাগ করিয়াছে।

১৯শে জুন

লিবিয়া—লিবিয়া রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনী সরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তব্রুক এলাকা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। লম্বার্ট প্রতিপক্ষের করতলগত হইয়াছে।

রুশিয়া—জার্মানরা কোন এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি নদী অতিক্রম করিতে গিয়া মার্শাল টিমোসেঙ্কোর বাহিনী কর্তৃক প্রতিহত হয়। অনুমান ১৫ শত জার্মান হতাহত হয় এবং বিমানধ্বংসী কামান ইত্যাদিসহ প্রচুর রণসম্ভার সোভিয়েটের হস্তগত হয়।

২০শে জুন

লিবিয়া—রোমেলের আফ্রিকান বাহিনী অদ্য রাত্রে তব্রুকের বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছে। লিবিয়ার যুদ্ধ চতুর্থ সপ্তাহে পড়িল। অনিবার্য সংগ্রামের জন্য অষ্টম বাহিনী এখন তাহার নূতন পূর্ব ব্যূহটি সুরক্ষিত করিতেছে।

রুশিয়া—মস্কোতে প্রাপ্ত শেষ-সংবাদে প্রকাশ, রুশ সৈন্যেরা স্মলেনস্ক অভিমুখে এক নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

অদ্য মিত্রপক্ষের অস্ট্রেলিয়াস্থিত হেডকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে রাবাউলের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষের শক্তিশালী বিমান বাহিনী রাবাউলে প্রতিপক্ষের বিমান-ঘাঁটি ও জাহাজসমূহের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়।

চীন—পূর্ব চীনের কিয়াংসি ও চেকিয়াং প্রদেশে জাপ আক্রমণ শিথিল হইয়া আসিতেছে। দুইটি প্রদেশের রেলপথ করায়ত্ত রাখা সম্ভবপর নহে দেখিয়া জাপানীরা চেকিয়াং হইতে পূর্বদিকে চুসিয়েন এবং কিয়াংসো হইতে পশ্চিমদিকে নানচাং অভিমুখে সরিয়া যাইতেছে।

২১শে জুন

লিবিয়া—কায়রোর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, গতকল্য শত্রুপক্ষ বিপুল শক্তি লইয়া তব্রুকের বহিঃসীমা আক্রমণ করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও রক্ষিব্যূহ ভেদ করিতে এবং অভ্যন্তরভাগে অনেকখানি অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মার্কিন নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীগণ এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে 'কিস্কা' দ্বীপটি দখল করিয়াছে।

২২শে জুন

লিবিয়া—তব্রুকের পতন সংবাদ সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

সোল্লুম গিরিবর্ত্মস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, হালফায়া, সোল্লুম ও ফোর্ট ক্যাপুজ্জো দ্বারা গঠিত ত্রিভুজাকার রণক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত মিত্রবাহিনী জেনারেল রোমেলের পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মিশরের সীমান্তের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ চলিবে বলিয়া মনে হয়।

রুশিয়া—অদ্য 'প্রাভ্‌দা'র সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, খারকভ রণাঙ্গনের একাংশে একটা বড় রকমের ট্যাঙ্কযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্মানদের ১০৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস বা অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে এবং ৫০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৫ই জুন

দ্বারভাঙ্গা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গতরাত্রে বি এন ডবলিউ রেলের এসিস্টেন্ট সিগন্যাল ইন্সপেক্টর ১৬নং ডাউন ট্রেনের মধ্যে নিহত হইয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এই মৃতদেহ পাওয়া যায়।

যোধপুর রাজ্যে যে গোলযোগ সুরু হইয়াছে, সে বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ মহাত্মা গান্ধীকে জানাইবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ডি কাচরুকে যোধপুর যাত্রার জন্য তার করিয়াছেন।

কটকের চৌদ্দগ্রাম পল্লীবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ায় কতকগুলি গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়। ১২০টি পরিবার গৃহহীন হয় ও ১৫ জন আহত হয়।

১৬ই জুন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সপ্তদশ মৃত্যুস্মৃতিবার্ষিকী কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

অদ্য স্টেট্‌স্‌ম্যানের বিরুদ্ধে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নাগ যে মানহানীর মামলা করেন, তাহার আরেক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

১৭ই জুন

ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সম্প্রতি পণ্ডিত নেহরুর যে আলোচনা হইয়াছে, পণ্ডিত নেহরু তৎসম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"আমি আশা করি, আমরা পরস্পরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি। বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা সত্ত্বেও এবং সময় সময় মতভেদ ঘটিলেও, অতীতের ন্যায় এখনও আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী।"

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ "ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া"র নিকট এক বিশেষ বিবৃতিতে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদের অপসারণের জন্য গান্ধীজীর পুনঃ পুনঃ দাবীর উল্লেখ করিয়া বলেন—"যুদ্ধের মাঝখানে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিতে রাজী নই, যদিও আমরা সেখানে কোন সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে থাকিতে ইচ্ছা করি না।"

অদ্য কমন্স সভায় যুদ্ধের জন্য আরও একশত কোটি পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছে। অর্থসচিব স্যার কিংসলি উড বিল উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ব্রিটেনের এখন সপ্তাহে যুদ্ধের জন্য খরচ হয় প্রায় আট কোটি চল্লিশ লক্ষ আড়াই হাজার পাউণ্ড।

১৮ই জুন

লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্নমেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন যে, গত মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে ওয়ারস'র রাস্তায় রাস্তায় ব্যাপক ধরপাকড় চালাইয়া জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে চীফ অব ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফ স্যার এলান ব্রুক এবং চীফ অব স্টাফ কমিটির সেক্রেটারী মেজর জেনারেল ইসমেও গিয়াছেন। চার্চিল-রুজভেল্ট আলোচনা বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

জার্মান নিউজ এজেন্সীতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, হেড্রিকের হত্যাকারীদের প্রাগে এক গীর্জায় পাওয়া গিয়াছে—গ্রেপ্তার করিবার সময় তাহাদের গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

ঢাকায় পল্টনের ময়দানের দুইদল খেলোয়াড়ের মধ্যে মারামারির ফলে ফজলুল হক নামক জনৈক ছাত্র ছুরিকাঘাতে আহত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র দে মুসলমান কর্তৃক পৃষ্ঠদেশে ছোরার দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত হন। ঐদিন রাত্রে একটি গোয়ালাকে দুর্বৃত্তেরা লৌহদণ্ড দ্বারা গুরুতর আঘাত করে।

১৯শে জুন

অদ্য নিউইয়র্ক টাইমস্‌ কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছেঃ—

"অদৃষ্টক্রমে ভারতবর্ষ কিছুকালের জন্য জাপানের হাতে রেহাই পাইয়াছে; কিন্তু আমরা ধরিয়া লইতে পারি, জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেই।"

পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ ও বলদেব সিংএর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আপোষ সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইয়াছে।

২০শে জুন

"আশ্রিত রাজ্য" বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল এলিয়াস বার্লিনের আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার দশ মাস পরে তাঁহার প্রাণ হরণ করা হইয়াছে।

অদ্য সায়াহ্নে কলিকাতা টাউন হলে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ঐক্যের জন্য আবেগময়ী ভাষায় আবেদন জানান।

২১শে জুন

নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ডিভিসন্যাল ট্রান্সপোর্টেসন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গতরাত্রে দুইজন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি সিমলা-কালিকা লাইনে একখানি ট্রেন থামায় এবং গুলীবর্ষণ করে। ফলে ৩ জন যাত্রী ও ড্রাইভার নিহত হইয়াছে।

যোধপুর হইতে শ্রীযুত বি এন কুচরু 'আনন্দ ভবনে' যে তার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, যোধপুরে লোক পরিষদ আন্দোলন সম্পর্কে একজন অনশনব্রতী বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে।

২২শে জুন

অদ্য প্রত্যূষে কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' অফিস ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ৪ ঘণ্টাব্যাপী তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া যায়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ১৮-বি, মোহনলাল স্ট্রীটস্থ বাড়ি খানাতল্লাসী করা হয়।

অদ্য সন্ধ্যায় নূতন ভারতরক্ষা বিধানের ২৭এ, ধারা অনুসারে ভারত সরকার নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লককে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। অদ্য প্রত্যূষে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এইচ ভি কামাথ ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। অদ্য পুলিশ লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক কার্যালয়ে খানাতল্লাসী করে।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এখনও মারপিট চলিতেছে। এ পর্যন্ত ৫ জন নিহত এবং ২৬ জন আহত হইয়াছে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 4th July, 1942 [৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মার দাবীর তাৎপর্য—

মহাত্মাজী ব্রিটিশের ভারত হইতে চলিয়া যাওয়ার যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, জনৈক পত্রপ্রেরক তাঁহার সেই দাবী সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে অনুরোধ করিয়া মহাত্মাজীর নিকট একখানা পত্র লিখেন। মহাত্মাজী উত্তরে 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"মিত্রশক্তির সেনা বাহিনীকে সহসা সরাইয়া লইয়া গেলে জাপান কর্তৃক ভারত অধিকার অবশ্যম্ভাবী এবং চীনের পতনও সুনিশ্চিত। আমার কার্যকলাপের ফলে এমন কোন দুর্বিপাক উপস্থিত হইতে পারে, তাহা আমি কল্পনায়ও স্থান দেই নাই। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি বুঝা যায় যে, জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য মিত্রশক্তিসমূহের ভারতে থাকা একান্ত আবশ্যক, তবে ভারতে যে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিত্রশক্তিসমূহ ভারতে থাকিতে পারিবেন।" মহাত্মাজীর উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জাপান কর্তৃক ভারত অধিকৃত হয়, কিংবা চীনের পরাজয় ঘটে—তিনি ইহা কিছুতেই চাহেন না; সেজন্য মিত্রশক্তিসমূহের এদেশে অবস্থানেও তাঁহার আপত্তি নাই। মহাত্মাজীর কথা বুঝিতে গেলে গোল কোথাও নাই, তবু গোল ঘটিতেছে। কেন ঘটিতেছে পত্রপ্রেরকের একটি যুক্তির উত্তরে মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই সে বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী লিখিয়াছেন, "পত্রলেখক এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ব্রিটেনের যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার কোন হেতু থাকে না।" অর্থাৎ ভারতবর্ষকে নিজেদের অধিকারে রাখিবার জন্যই যেন ব্রিটেনের যুদ্ধ—তাহা ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর আদর্শ নাই। মহাত্মাজী ইহা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, "ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র রক্ষা, বাক্যের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে সকল লম্বা-চওড়া কথা বলা হয়, সেগুলির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করিবার অধিকার ভারতের আছে।" এসিয়ার ও আফ্রিকার অধিকারগুলি বজায় রাখার জন্যই কি ব্রিটেন যুদ্ধ করিতেছে? মহাত্মাজীর ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। মহাত্মাজী চাহেন, ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। এই স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক হইতে হানি ঘটিতে পারে—মহাত্মাজী ইহা স্বীকার করেন; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সন্তোষজনক পরিসমাপ্তিরূপ বৃহত্তর স্বার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে ব্রিটিশের পক্ষে তাহা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতই মহাত্মাজীর মতে মিত্রশক্তির সেই বৃহত্তর প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হইবে। মহাত্মাজীর দাবীর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের দাবীর কোন পার্থক্য নাই। স্বাধীন ভারতের জাতীয় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিত্রশক্তিসমূহের সেনা দলের এদেশে থাকাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া মহাত্মাজী তাঁহার ব্যক্তিগত অহিংসার নীতি-নিষ্ঠা হইতেও জাতিকে মুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। অধীন ভারতে বৃটিশের অর্থনৈতিক দিক হইতে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ আছে, ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া বৃটিশ তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে কিনা ইহাই হইতেছে সমস্যা এবং সে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ভারতবাসীদের নহে, বৃটেনের উপর সে দায়িত্ব বর্তাইতেছে।

ক্রীপস প্রস্তাবের যুক্তি—

কংগ্রেস স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রস্তাব কি কারণে অগ্রাহ্য করিয়াছে এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিবৃতিতে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তিতে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে; কিন্তু দাসমনোবৃত্তির প্রভাব বড় দুর্নিবার; দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে চিন্তাশক্তিতে পরানুগ্রহ-প্রত্যাশার যে আবিলতা আসিয়া জুটে তাহা কাটাইয়া ওঠা কঠিন হয়। 'প্রচণ্ড বিপ্লবী' মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিভিন্ন বিবৃতিতে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার মতে ক্রিপস সাহেবের প্রস্তাব অতি উদার এবং মহৎ। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীও এতদিন পরে পরানুগ্রহ-প্রত্যাশায় সেই মনোবৃত্তিতেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন এবং প্রকারান্তরে ক্রীপস প্রস্তাবেরই সাফাই গাহিতে সুরু করিয়াছেন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মডারেট রাজনীতিক; তাঁহার চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের মিল হইবে না; তবুও সেদিন পুণা আইন কলেজে তিনি ক্রীপস প্রস্তাবের যে সমালোচনা করিয়াছেন, আমরা আশা করি তাহা বিপ্লবী রায় মহাশয়ের মনোভাব পরিবর্তনে কার্যকর হউক না হউক, রাজাজীর

ভ্রান্তি দূর করিতে সাহায্য করিবে। উক্ত প্রস্তাবের ত্রুটিসমূহ পণ্ডিত হৃদয়নাথ, অকাট্য যুক্তি সহকারে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ক্রীপস্ প্রস্তাব ফাসিয়া গেল কেন? ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব দিতে শাসকেরা অস্বীকৃত হইয়াছেন, এই জন্য। এই কর্তৃত্ব না দিবার পক্ষে ক্রীপস্ সাহেব এই যুক্তি দেখান যে, সমর-পরিষদের নীতির দ্বারাই ভারতের সমর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এই সমর-পরিষদে সম্মিলিত শক্তিবর্গের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন। ভারতের দেশরক্ষা-সচিব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে অসম্মত হইতে পারেন। কিন্তু এমন অবিশ্বাসের কারণ শাসকদের মনে দেখা দিল কেন? পণ্ডিত হৃদয়নাথ এ ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার নজীর উপস্থিত করিয়াছেন এবং এইভাবে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ রাজনীতিকদের অন্তর্নিহিত গূঢ় মনোভাবের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি সমর-পরিষদে রহিয়াছেন; এবং অস্ট্রেলিয়ার দেশরক্ষার ভার অস্ট্রেলিয়ান সমর-সচিবের উপরই আছে। অস্ট্রেলিয়ার বেলায় যদি সন্দেহের কারণ না থাকে, তবে ভারতের বেলায়ই বা তেমন সন্দেহের প্রশ্ন উঠে কেন? বৃটিশ গভর্নমেন্ট অস্ট্রেলিয়ার বেলায় যে উদারতা দেখাইতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ততটুকু উদারতা দেখাইতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইলেন ইহার মূলে ন্যায়সঙ্গত কি কারণ থাকিতে পারে? ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষার কর্তৃত্ব কিছুতেই দেওয়া হইবে না, এমন একগুঁয়েমি তাঁহাদের কিসের জন্য? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর দাঁড়ায় এই যে, ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বর্ণবৈষম্যগত সংস্কারই এ ক্ষেত্রে বৃটিশ রাজনীতিকদের স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের জাতীয় মর্যাদাবুদ্ধির উপর এমন আঘাতকেও যাঁহারা পরানুগ্রহ-প্রত্যাশায় বিস্মৃত হইতে পরামর্শ দান করেন, স্বাধীনতার সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাদের না বলিলেই ভাল হয়।

সোভিয়েটের পররাষ্ট্র নীতি—

ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি প্রকাশিত হইবার পর বহু দিক হইতে তাহার সমালোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি, আমরা বলিয়াছি এই চুক্তিতে ভারতের কোন স্বার্থ নাই; এমন কি ভারতের কথা ইহাতে উল্লেখও করা হয় নাই; শুধু তাহাই নহে, ভারতবর্ষের বিষয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণস্বরূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং স্বাধীনতার দাবীদার জাতিসমূহের সমশ্রেণী হইতে ভারতকে সুকৌশলে বাহিরেই রাখা হইয়াছে। ভারত সম্বন্ধে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের মতিগতির এই প্রশ্নটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মনেও উঠিয়াছিল। কিছুদিনপূর্বে বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন,—'এই চুক্তি বৃটেন এবং সোভিয়েটের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে, অন্য দেশ ও গভর্নমেন্টের পক্ষেও কল্যাণকর হইতে পারে; কিন্তু ভারতবাসী অথবা এসিয়াবাসী হিসাবে অন্য শক্তিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন নিঃশঙ্কভাবে গ্রহণ করা যায় না। ইহাতে এসিয়ার স্থান কোথায়? ভারতের স্থান কোথায়, চীনেরই বা স্থান কোথায়?' প্রকৃতপক্ষে স্থান কাহারও নাই—আছে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিদ্বয়ের নিজেদের দেশ এবং নিজেদের জাতির। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের যে দৃষ্টি, সোভিয়েট রাষ্ট্রের দৃষ্টি সেই একই। অন্য দেশ বা অন্য জাতি স্বাধীনতার প্রশ্ন ইহাদের কাহারও কাছেই ব প্রশ্ন নয়। অন্য দেশ ও অন্য জাতির স্বাধীনতার প্রশ্ন ইহাদে পক্ষে ততটুকুই বিবেচ্য হইয়াছে, যতটুকু নিজেদের রাষ্ট্র স্বার্থ এব রাষ্ট্র প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে তাহা আবশ্যক ভারতবর্ষ পরাধীন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সম্পর্কি প্রশ্ন, সে ক্ষেত্রে ইহারা বিবেচ্য বলিয়া মনে করেন না। ভারতে ভাগ্যবিধাতা বৃটিশ গভর্নমেন্টের সহযোগিতা লাভ করিলে ভারতের সমর-সঙ্গতির সাহায্য পাওয়া যাইবে, ইহই সোভি য়েটেরও বিশ্বাস। এক্ষেত্রে সোভিয়েট নীতি সম্পূ জাতীয়তাবাদমূলক ইহা সুস্পষ্ট। এ দেশের তথাকথিত আন্ত জাতীয়তাবাদিগণ সে নীতির উপর কল্পনার রং ফলাইয়া নিজের যতই আশ্বস্তি বোধ করুন না কেন, ইতর-বিশেষ কিছুই নাই।

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গভর্নমেন্ট—

বর্তমান জরুরী অবস্থায় বাঙলা দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের নিমিত্ত গত ২রা জুলাই বাঙলা সরকার সাংবাদিকগণের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সাংবাদিকগণ এ সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। তাঁহারা বহুদিন হইতেই এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা এই কথাই বলিতেছেন যে, যুদ্ধ কতদিন চলিবে, ইহার কিছু স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় অনির্দিষ্টকালের জন্য এদেশের বালকবালিকাদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থগিত থাকিতে পারে না। শত্রুর আক্রমণকে পরাভূত করিয়া দেশকে নিরাতঙ্ক রাখা প্রয়োজন, কিন্তু জাতির যাহারা আশা এবং ভরসার স্থল সেই সব বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা ততোধিক প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করা হয় নাই; সুদীর্ঘকাল সমর-সঙ্কটের মধ্যেও চীনা জাতীয়তাবাদী গভর্নমেন্ট দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাকে জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কিন্তু বাঙলা সরকার এ সম্বন্ধে এখনও মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গ্রীষ্মাবকাশ অতীত হইবার পরও তাঁহারা শহরের স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। গভর্নমেন্টের যুক্তি এই যে, স্কুল-কলেজ সব খোলা হইলে কলিকাতায় লোক-সমাগম বৃদ্ধি পাইবে। লোকে শহরকে নিরাপদ মনে করিবে; কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে, গভর্নমেন্টের সতর্কতা সত্ত্বেও কলিকাতা শহরে লোকসংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সব পরিবার শহরে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও আসিতেছে। গভর্নমেন্ট এমন কোন কর্মপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই, যাহাতে অভিভাবকগণ কলিকাতায় থাকিলেও মফঃস্বলের স্কুলে ব কলেজে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উপযুক্ত সুবিধা হইতে পারে। গভর্নমেন্ট বলিতেছেন বটে যে, স্কুলগুলি স্থানান্তরিত

কর, প্রয়োজন হইলে অর্থ দেওয়া হইবে। প্রয়োজন হইবে না হইবে, গভর্নমেন্টের কর্ণধারগণের ইহা উপলব্ধি করিবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়াই আমরা মনে করি, সুতরাং উপদেশ না দিয়া কার্যত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই উচিত। স্কুল-কলেজগুলি স্থানান্তরিত করিতে হইলে—আগে কোন কোন স্থান সে পক্ষে নিরাপদ হইবে, তাহা স্থির করা প্রয়োজন; তারপর প্রয়োজন ঘরবাড়ির এবং পরবর্তী প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের থাকিবার বোর্ডিং,—শুধু ইহাই নহে, অভিভাবকদের পক্ষে সেই সব বোর্ডিং-এ ছেলেমেয়েদের রাখিবার অর্থ-সামর্থে যাহাতে কুলায়, বোর্ডিংগুলির খরচা এমন হওয়াও প্রয়োজন। গভর্নমেন্ট যদি এ সব দায়িত্ব কিছু গ্রহণ না করেন, তবে মফঃস্বলে ছেলেমেয়েদের পাঠানোর উপদেশ একেবারেই অকেজো হইয়া পড়ে এবং কার্যত কলিকাতায় যে সব পরিবার আসিয়াছেন, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধই হয়। আমরা আশা করি, গভর্নমেন্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে অবিলম্বে একটি কার্যকর পরিকল্পনা অবলম্বন করিবেন এবং কেবল ভবিষ্যতের ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। যুদ্ধের জরুরী অবস্থার মধ্যে যদি সব কিছু চলে এবং সব কাজ ধীর স্থিরভাবে চালাইয়া যাওয়াই কর্তৃপক্ষের মতে উচিত হয়, তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থাই হইবে অচল—আমরা ইহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখিতে পাই না।

অন্নবস্ত্রের সমস্যা—

চাউলের দর ক্রমেই বাড়িতেছে। গভর্নমেন্ট সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন এবং এই বিবৃতিতে দেশের লোককে এই ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, গভর্নমেন্ট যে দর পূর্ব হইতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, চাউলের দর তাহার সঙ্গে খাপ খাইয়া যাইবে; কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিবে এই যে, তবে পূর্ব হইতে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন? যাউক, অতীতের বিষয় লইয়া বিতর্ক তুলিয়া লাভ নাই, ভবিষ্যতের সমস্যার কতকটা সমাধান হইলেই ভাল। গভর্নমেন্ট বলিতেছেন, চাউলের অভাব হইবে না এবং কলিকাতায় যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই দরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মফঃস্বলের দর নির্দিষ্ট করার জন্য তাঁহারা জিলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। গভর্নমেন্ট আশা করেন যে, মফঃস্বলের দর কলিকাতার দর হইতে মণকরা চারি আনা হইতে ছয় আনা কম হইবে। কিন্তু এতো কাগজপত্রের হিসাব; সাধারণের পক্ষে সমস্যা হইল বাস্তব। সরকার যে মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন সেই মূল্যে জিনিস পাওয়া লইয়া তাহাদের কথা। দোকানদারদের মুখে তো একই কথা যে মাল পাওয়া যাইতেছে না। কেন পাওয়া যায় না? গভর্নমেন্ট যদি মজুদ মাল এবং কার্টতি সকল দিক হইতে হিসাব করিয়াই দর বাঁধিয়া দিয়া থাকেন তবে মাল না পাইবার কারণ কি? গভর্নমেন্টকে এই প্রশ্নের আশু কার্যকরভাবে মীমাংসা করিতে হইবে। অন্নের সমস্যার পরেই বস্ত্রের সমস্যা; এই সমস্যাও দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাপড়ের মিলগুলি সরকারের সেনা-বিভাগের ফরমাইস মিটাইতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সাধারণের অভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। মিলের দ্বারা সে অভাব পূরণ হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙলার তাঁতীদের ঘরের তাঁতগুলি যদি সব চলিত, তবে এ সমস্যা এতটা গুরুতর আকার ধারণ করিত না; কিন্তু তাঁত অচল। সুতা মিলে না। সুতা তৈয়ারী করিবার মত বেশী মিল এদেশে নাই; নূতন করিয়া মিল বসাইবার প্রশ্ন তো বর্তমানে উঠেই না; কারণ সব জিনিসই আসে পোতে। কলকব্জা ভারতে কিছুই তৈয়ার হয় না; সব বাহির হইতে আনিতে হয়। এমন অবস্থায় গরীবের পক্ষে চরকাই প্রধান অবলম্বন। ঘরে ঘরে সুতা কাটিবার ব্যবস্থা এবং সেই সুতার সাহায্যে তাঁত চালানোর ব্যবস্থা হইলে বর্তমানের বস্ত্র সমস্যা অনেকটা মিটিতে পারে; কিন্তু সে সম্বন্ধে ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। সম্মুখে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে এবং সে দুর্দিন কতদিন চলিবে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই; সুতরাং শুধু সরকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। আসন্ন এই সংকটে দেশের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানের জন্য সকলকেই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। আজ শুধু নিজেদের স্বার্থই নয়, অন্য দশ জনের স্বার্থের দিকেও তাকাইতে হইবে নতুবা নিজের স্বার্থও নিরাপদ থাকিবে না।

ব্যাপার কি?—

দিল্লীর সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙালী অধ্যাপকদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য উদ্যম চলিতেছে, এই সংবাদে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। রামযশ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর এস কে দত্ত এবং কমার্সিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেনকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। রামযশ কলেজের অধ্যাপক এন এন চৌধুরী এবং অধ্যাপক ডক্টর এন ভি বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তিন মাসের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক এ ভট্টাচার্যকেও পদচ্যুত করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এক সঙ্গে এতগুলি বাঙালী শিক্ষাব্রতীকে পদচ্যুত করিবার মূলে কি কারণ থাকিতে পারে? ইঁহারা অনেকেই সুদীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতে নিযুক্ত আছেন এবং সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযশও অর্জন করিয়াছেন, ব্যক্তিগত অযোগ্যতা এক্ষেত্রে কারণ হওয়া সম্ভব নয়। এতগুলি অধ্যাপক এক সঙ্গে একই সময়ে অযোগ্য হইয়া পড়িবেন, এ যুক্তি একান্তই উদ্ভট। সুতরাং বাঙালী বিদ্বেষ ছাড়া এরূপ প্রচেষ্টার মূলে অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের প্রশ্ন এই যে, এই বিদ্বেষ কি জন্য? বাঙালীরা কোন্ অপরাধে অপরাধী হইল যে, নিরীহ এই সব শিক্ষাব্রতীর উপর আকস্মিকভাবে সেই আক্রোশ আপতিত হইল? বাঙালীরা কোন দিন প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। বাঙলার শিক্ষা ক্ষেত্র সকল রকমে প্রাদেশিকতা হইতে মুক্ত। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রদেশের ভাষাভাষীদের সমান সুবিধাই দেওয়া হইতেছে। এ বিদ্বেষ কি বাঙালীর সেই উদার ও প্রাদেশিকতাহীন আদর্শেরই প্রতিদান? অকারণ এইভাবে প্রাদেশিকতার ভাবকে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল অনিষ্টকরই হইবে এবং বাঙলা দেশেও ইহার প্রতিক্রিয়ার কারণ ঘটিবে। এমনভাবে গায়ে পড়িয়া বাঙালীর জাতীয় মর্যাদায় আঘাত

করিলে বাঙালীরাও তাহা দীর্ঘ দিন সহ্য করিতে চাহিবে না ; তাঁহারা নিজেদের প্রদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্য নহে। দিল্লীর এই ব্যাপারের প্রতি আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

ভারতের জন্য চিন্তা—

ওয়াশিংটনে রুজভেল্টের সঙ্গে চার্চিলের যে বৈঠক হইয়াছে, তাহাতে ভারতের সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইয়াছে কিনা, এবং হইয়া থাকিলে কিভাবের কথা হইয়াছে, ইহা লইয়া ইতিমধ্যে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন কর্ণেল লুই জনসন আলোচনার সময় যখন ওয়াশিংটনে উপস্থিত ছিলেন, তখন ভারতের কথা নিশ্চয়ই হইয়াছে, আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, চীনের কথা যখন উঠিয়াছে, তখন ভারতের কথাও বাদ পড়ে নাই। আমরা নিজেদের দিক হইতে এই ধরণের গবেষণাকে কোন মূল্যই দান করি না। ভারতের সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন রাস্ট্রবীরদের ভাবনা কতখানি এবং কি ধরণের আটলান্টিক চুক্তি, প্যাসিফিক চুক্তি এগুলির ভিতর দিয়া আমাদের বুঝিতে বাকী কিছুই নাই। ভারতবর্ষ যদি কোন দিন স্বাধীনতা লাভ করে, রুজভেল্ট কিংবা চার্চিল সাহেবের অনুগ্রহের জোরে নিশ্চয়ই তাহা লাভ করিবে না, ভারতকে নিজের যোগ্যতায় তাহা অর্জন করিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তর ভারতের অবস্থা—

অর্থ নৈতিক স্বার্থই বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে বড়; অধীন ভারতের সঙ্গে বৃটিশ জাতির এই অর্থনৈতিক স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সেই গোড়াকার কথাই তুলিয়াছেন। আজ আমেরিকা ইংরেজের বন্ধু। সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই যুক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের দিক হইতে বিচার করিলে ঐ চুক্তির বহু বিপদের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির আলোচনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ শিল্পের সহিত সঙ্ঘর্ষ ঘটিতে পারে, যুদ্ধের পর ভারতে তেমন কোন শিল্প যাহাতে উন্নতি লাভ না করে ইস্টার্ন গ্রুপ কাউন্সিল তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। গ্রেডি কমিশনের রিপোর্টের সুরও সেই একই। মার্কিন অর্থনীতি ধুরন্ধর ডাক্তার গ্রেডিও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাঁচা মাল উৎপাদনই ভারতের প্রধান কার্য হইবে। ভারতকে কাঁচা মাল উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিবার জন্য বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ এতাবৎকাল যে সব যুক্তি দেখাইয়া আসিয়াছেন, সেগুলির মূলে যেমন কোন যুক্তি নাই, এ সম্বন্ধে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের যুক্তিও তেমনই অমূলক। পণ্ডিতজী বলেন,—'দ্রুত শিল্পোন্নতির পক্ষে ভারতে কিছুরই অভাব নাই এবং শিল্পোন্নয়নের পথেই ভারতের সমস্যার সমাধান এবং জীবিকা-নির্বাহের মানের উন্নতি হইতে পারে।' কিন্তু সেজন্য কি বৃটিশ বিশেষজ্ঞদের মাথা ব্যথা নাই, দেখা যাইতেছে মার্কিন বিশেষজ্ঞ- [illegible] তদ্রূপ। তাঁহারা ভারতকে কাঁচা মাল উৎপাদনের ক্ষেত্রস্বরূপেই পরিণত রাখিতে চাহেন। কিছুদিন পূর্বে চীনের জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নেতা মিঃ সুঙ আমেরিকায় একটি বক্তৃতায় যে কথা বলিয়াছিলেন, আমাদের সেই কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। তিনি বলেন এসিয়া আর ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্য বিক্রয়ের বাজারস্বরূপে থাকিতে চাহে না, তাঁহাদের শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত থাকিতে সে আর প্রস্তুত নয়। ভারতবাসীদের পক্ষ হইতেও আজ এই কথা কর্তাদিগকে জানাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে, ভারতবর্ষকে দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের জল টানিবার এবং কাঠ বহিবার কাজ অনেক করা হইয়াছে। এখন আর তাহা চলিবে না, ভারতের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। শ্রুতি মধুর বাক্য-বিন্যাসের দিন কাটিয়া গিয়াছে, ভারতবাসীরা এখন বাস্তব ক্ষেত্রে নিজেদের দেশের [illegible] বুঝিয়া চলিবে।

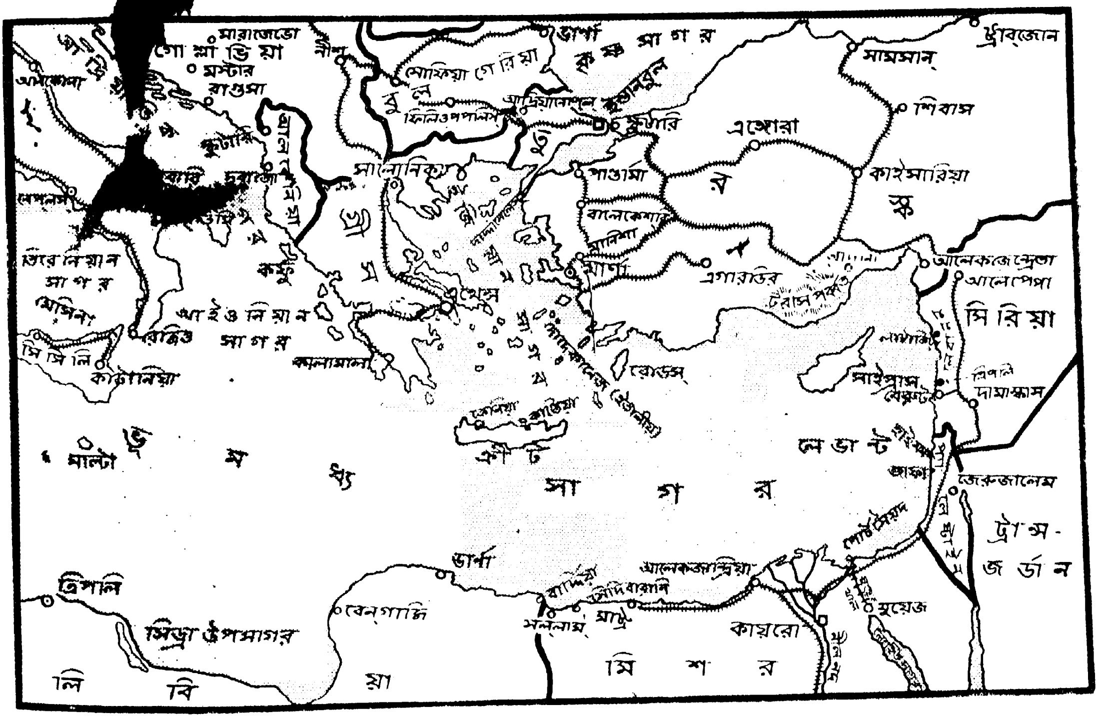
পাট-শিল্পের সম্প্রসা[illegible]—

পাট হইতে উৎপন্ন বিবিধ শিল্পজাত দ্র[illegible] বাজারে প্রচলন করিবার জন্য বাঙলা সরকারের শিল্প-বা[illegible] বিভাগ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। পাটের আয়ের উপর বাঙ[illegible]র অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। স[illegible] এই প্রচেষ্টার ফলোপধায়কতা সকলেই স্বীকার ক[illegible] এই চেষ্টা যেভাবে চলা উচিত, সেভাবে চলিতেছে বলিয়া [illegible]র মনে হয় না। এই কর্মোদ্যমকে সফল করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অধিকতর আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন এবং প্রচেষ্টাকে স্থায়ীভাবে কার্যকর করিবার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রংপুর জেলার অন্তর্গত ডোমার পাট-ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং পাট হইতে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুতের জন্য এই স্থানের খ্যাতি অনেক দিন হইতেই আছে। বাঙলা সরকারের শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ হইতে ডোমারে পাটের সুতার একটি উইভিং স্কুল খোলা হইয়াছে। এই স্কুলটি বেশ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এখানকার পাট সূত্র হইতে উৎপন্ন কোটের ছিট, তোয়ালে, বিছানার চাদর, হাতব্যাগ প্রভৃতি দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষ স্কুলটি অন্যত্র অপসারিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ডোমারের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে গতানুগতিক ধারাকে বদলাইয়া নূতন কোন শিল্পকে এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রবর্তন করা যায় না, সে জন্য স্থায়ীভাবে কাজ চালাইতে হয়। ডোমারের পাট-শিল্প বয়ন বিদ্যালয় হইতে সত্যই কাজের মত কাজ সুরু হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং পরিচালকগণ সকলেই যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁহারা সকলেই জনসেবার জন্য আগ্রহশীল কর্মী। আমরা আশা করি, বাঙলা সরকার এই বিদ্যালয়টি স্থায়ীভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং উত্তর বঙ্গের পাট ব্যবসায়ের এই কেন্দ্র স্থান হইতে স্থায়ী প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া পাটশিল্পের উজ্জীবনে সহায়ক হইবেন। আমাদের মতে বিদ্যালয়টি অন্যত্র অপসারণ করা কিছুতেই উচিত হইবে না; পক্ষান্তরে এই বিদ্যালয়ের কার্য যাহাতে অধিকতর সম্প্রসারিত হয়, তৎপ্রতি অবহিত হওয়াই কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

মিশরের লড়াই

তব্রুকের পতন হইয়াছে। কেন হইল? তব্রুকের উপর জেনারেল রোমেল যে তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া চাপ দিতেছেন; ইহা তো জানাই ছিল, আকস্মিক আক্রমণ নয়; তথাপি মিত্রপক্ষ তব্রুক রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই কেন? এবং তব্রুক রক্ষা করা যদি বা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইলে তথা হইতে সর্বাধিক সাফল্যের সঙ্গে সমগ্র সেনাবাহিনী এবং সমরোপকরণ প্রভৃতি পূর্বেই সরাইয়া আনা হয় নাই কেন? এ প্রশ্ন অনেকেই তুলিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, ত্রুটি কোথাও মারাত্মক রকমের কিছু ঘটিয়াছে; কিন্তু এমন ত্রুটি মিত্রপক্ষের সমরোদ্যমে নূতন ব্যাপার কিছু নয়। তথাপি, এ সম্বন্ধে বোধ হয় একটা তদন্ত হইবে এবং পার্লামেন্টেও প্রচুর বক্তৃতাদি চলিবে। তব্রুকের পতনের কারণ সম্বন্ধে যাঁহারা সামরিক বিশেষজ্ঞ তাঁহারা [illegible] বলিতেছেন যে, শত্রুপক্ষের যন্ত্রবল

জেনারেল রোমেলের বাহিনী পূর্বদিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এখন প্রকৃত ব্যাপার নির্ভর করিতেছে জার্মানীর পানৎসার বাহিনী এবং ইতালীর কালকোর্তা দলকে প্রতিরুদ্ধ করিবার মত সামরিক বলবৃদ্ধির উপর, সমুন্নত যন্ত্রবল পরিচালিত সেনাবাহিনীকে সংহত করিবার উপর। জেনারেল রোমেল যতটা দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবেন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ব্রিটিশ পক্ষের পাশ কাটাইয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ দিকে আগাইয়া গিয়া ঘুরিয়া ব্রিটিশ বাহিনীকে বেষ্টন করাইবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার চেষ্টা হইবে এবং আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরই হইবে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, এইরূপ মনে হয়। মিশরে নূতন সমর সাহায্য লাভ করিয়া বৃটিশ পক্ষ তাহাদের বল বৃদ্ধি করিতে পারে, তিনি এ সুযোগ বৃটিশ পক্ষকে দিতে চাহেন না। তব্রুকের পতনের ফলে



এবং সেগুলির প্রয়োগ-কৌশল যে মিত্রপক্ষের অপেক্ষা উন্নত ছিল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাঁহারা একথাও বলিতেছেন যে, এই পরাজয়ের ফল কিছু গুরুতর ধরণের পরিবর্তন ঘটাইবে। পরিবর্তনটা কোন দিক দিয়া হইবে? বৃটিশের অষ্টম বাহিনী মিশরের সীমানায় আসিয়া প্রথমে ঘাঁটি করিয়াছিল; কিন্তু সীমান্ত দেশ হইতে শত্রুপক্ষের চাপে ইতিমধ্যেই তাহাদিগকে মিশরের অভ্যন্তরভাগে ঘাঁটি সরাইয়া লইতে হইয়াছে। সোল্লুম-হালফায়া, কাপুৎজো, সিদ্দি ওমর হইতে বৃটিশ বাহিনী মার্শা মাতরুতে সরিয়া যায়। মার্শা মাতরু হইতে আলেকজেন্দ্রিয়া পর্যন্ত রেলপথ রহিয়াছে এবং এখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থাও ভাল; তাহা ছাড়া, মার্শা মাতরুর পশ্চিম দিকে সুদূরপ্রসারী কোমল বালুকাস্তূপ বা বালিয়াড়ী আছে, এগুলি রক্ষা ব্যবস্থার সাহায্য করিবে বলিয়া তহাদের বিশ্বাস ছিল। বৃটিশ পক্ষের লাইন এখানে ছোট হয়। সে জন্য শত্রুপক্ষের উপর সমবেতভাবে বলপ্রয়োগ করা সম্ভব হইবে বলিয়া সামরিকগণ মনে করে। কিন্তু এ সবই অনুমান মাত্র। ব্রিটিশ পক্ষকে মার্শা মাতরু ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

তিনি কতকগুলি সামরিক সুবিধা লাভ করিয়াছেন। আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলে ইউরোপের উপকূলভাগ হইতে সেনা আনিয়া নামাইবার সুরক্ষিত একটি পোতাশ্রয় তিনি পাইয়াছেন; অবশ্য জার্মানী এবং ইতালী হইতে সেনা আনিয়া নামাইবার মত আরও কতকগুলি স্থান ইহার পূর্বেও তাঁহাদের হাতে ছিল; কিন্তু তব্রুকে এ সুবিধা অনেক বেশী হইবে এই দিক হইতে যে, মিত্রপক্ষের সুরক্ষিত সেনাবাহী জাহাজ এ পর্যন্ত সমুদ্রপথে প্রতিপক্ষের সেনা সঞ্চালনে যত বাধা দিতে ছিল, এখন তাহাদের পক্ষে ততটা বাধা দেওয়া কঠিন হইবে। বৃটিশের সাইপ্রাস এবং আলেকজেন্দ্রিয়ার ঘাঁটির ক্ষমতা তব্রুকের পতনে সর্বাধিক দুর্বল হইয়া পড়িল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্রীটে জার্মানদের উড়োজাহজের পাকা ঘাঁটি ইহার পূর্ব হইতেই আছে; এখন তব্রুকেও তাহারা উড়ো জাহাজের ঘাঁটি করিতে পারিবে। এ দিকে ক্রীট এবং অন্যদিকে তব্রুকের ঘাঁটি হইতে উড়োজাহাজ পরিচালিত করিয়া তাহারা একদিকে মাল্টা, অপরদিকে সাইপ্রাস আলেকজেন্দ্রিয়া এবং প্যালেস্টাইনের উপকূলবর্তী হাইফায় অবস্থিত বৃটিশের আক্রমণ-

সত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমধ্যসাগর নিজেদের পক্ষে নিরাপদ করিয়া তুলিবে। ব্রিটিশের পক্ষে ভূমধ্যসাগরের পূর্বভাগ অবিলম্বে অবরুদ্ধ হইয়াও পড়িতে পারে। বৃটিশ পক্ষে সেনা সাহায্য আসিতে হইলে এখন আসিবে আটলান্টিকের পথে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া—সুদীর্ঘ সে পথ; কিন্তু জার্মানীর সেনা সরবরাহের পথ হইল একেবারে সোজাসুজি এবং সে পথ নির্বিঘ্ন রাখিবার জন্য উপকূলভাগে কতকগুলি উড়োজাহাজের ভাল ঘাঁটিও তাহাদের হাতে থাকিবে। তারপর আটলান্টিক পাড়ি দিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরিয়া মিশরে সাহায্য পেঁাছিবার পথেও যে শত্রুপক্ষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চেষ্টা না করিবে, এমন কথা বলা যায় না। মোজাম্বিক দ্বীপ দখল করিয়া বৃটিশ পক্ষ এই আতঙ্ক অনেকটা হ্রাস করিয়াছেন ইহা সত্য; এবং ভারত মহামহাসাগরে জাপানীদের নৌবহরের কর্মতৎপরতাও এখন একরূপ নাই বলিলেও চলে; কিন্তু শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজ এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে উপদ্রব সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে এমন আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং মিশরের লড়াই এবার গুরুতর আকার ধারণ করিবে এবং তাহার উপর জার্মানীর পূর্বাভিমুখী সমরপরিকল্পনার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করিবে। সেই পরিকল্পনার স্ফুটতর কর্মোদ্যম আরম্ভ হইল বলা চলে; জার্মান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল রোমেল যদি কাইরো এবং আলেকজেন্দ্রিয়া দখল করিতে পারেন, তবে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক এবং ইরাণ পশ্চিম দিক হইতে বিপন্ন হইবে। তুরস্ক পরিবেষ্টিত হইবে। কাইরোতে উড়োজাহাজের ভাল ঘাঁটি রহিয়াছে এবং আলেকজেন্দ্রিয়া বৃটিশ পক্ষের প্রধান নৌঘাঁটি বলা চলে। এই দুইটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী; সুতরাং বৃটিশ বাহিনী এই দুইটি স্থান হইতে জেনারেল রোমেলকে দূরে রাখিবার জন্য সকল রকমে চেষ্টা করিবে; প্রকৃতপক্ষে মিশর রক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই লিবিয়ার লড়াইয়ের গুরুত্ব, নতুবা মরু-প্রদেশের কয়েকটি স্থান অধিকার কিংবা তথা হইতে পশ্চাদপসরণে বৃটিশ পক্ষের দিক হইতে অন্য বিশেষ কোন মূল্য নাই। এখন সমস্যা হইতেছে মিশরের উপকূলভাগে দ্রুততার সঙ্গে সেনা ও সমরোপকরণ সরবরাহের—সে সরবরাহের ঘাঁটিও নিকটে নহে। ভারতবর্ষে যদি যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিত, তবে মিশরের এই সংকট এমন গুরুতর হইত না; কিন্তু ভারতবর্ষের সামরিক যন্ত্রশিল্প সুগঠিত করা হয় নাই, ভরসা শুধু আমেরিকার। আমেরিকার সে শক্তি প্রচুর আছে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু সমারাঙ্গনও সুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

জেনারেল রোমেলের এই পুনরাক্রমণের সঙ্গে ককেসাস অঞ্চলের লড়াইয়ের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। জার্মানেরা রুমেনিয়ার বাহিনীর সহায়তায় ককেসাস অঞ্চলে প্রবেশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; এ পক্ষে তাহাদের প্রধান অন্তরায় হইতেছে সেবাস্তপোল; কিন্তু সেবাস্তপোলও যে কতদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ককেসাস অঞ্চল রক্ষার জন্য রুশিয়া যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহা সত্যই অতুলনীয়; কিন্তু অবিলম্বে ইউরোপের কোথাও জার্মানীকে যদি আক্রমণ করা হইত, তবে এপক্ষে আরও বেশী সাহায্য হইত। এই সব বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনার জন্যই ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল আমেরিকায় গিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু তব্রুকের পতনের পর মিশরের সংগ্রামের গুরুত্ব যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারিলে জার্মানীর সমগ্র শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইবে এবং তাহার বিমান শক্তিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ হইতে ইউরোপের দিকে অপসারণ করিবার মত অবস্থাও সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবার আগে বর্তমান রণাঙ্গনগুলিতে সমর ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। অনেকেই বলিতেছেন যে, এবার মিশরের দিকেই সব শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; নতুবা মিশরের পথে জেনারেল রোমেলের বাহিনী যদি আগাইতে পারে, তবে সে অগ্রগতির প্রতিকূল প্রভাব হইতে ককেসাস অঞ্চলও মুক্ত থাকিবে না। আর ককেসাস অঞ্চল ভেদ করিয়া জার্মান বাহিনী যদি জেনারেল রোমেলের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইতে সমর্থ হয়, তবে ভারতবর্ষের সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিবে। তুরস্কের অবস্থাও কিছু গোলমেলে হইয়া উঠিয়াছে মনে হইতেছে। রুষ দূতগণ সপরিবারে তুরস্ক ছাড়িয়া গিয়াছেন। তুরস্ককে নিজের দিকে পাইবার জন্য জার্মানী বহু দিন হইতেই চেষ্টায় ছিল। সে যদি তুরস্কের ভিতর দিয়া সিরিয়ায় আসিবার পথ পায়, তবে অবস্থা জটিল হইবে। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে জাপান উপস্থিত হইয়াছে, পশ্চিমদিকে সংকট এতদিন অনেকটা দূরে ছিল, এখন সেদিক হইতেও আশঙ্কার কারণ নেহাৎ কম হইয়া দাঁড়াইল না; সুতরাং আমরা ভারতবাসী, মিশরের এই আসন্ন লড়াইয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট থাকিবে ইহা স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে, আসন্ন এই সমরোদ্যমে মিশর কি করিবে এবং সে দেশের জনমত কোন দিকে ইহাও এ ক্ষেত্রে উপেক্ষার বিষয় নয়; কারণ, দেশের লোকের সমর্থন কিংবা বিরুদ্ধতা আধুনিক রণনীতির সাফল্য এবং অসাফল্যের কিরূপ নিয়ামক হইয়া থাকে, আমরা কয়েক স্থানের লড়াইতে ইহার পরিচয় পাইয়াছি। মিশরের গভর্নমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিতেছেন না। সেদিনও মিশরের প্রধান মন্ত্রী জাতীয় দলের নেতা নাহাস পাশা বলিয়াছেন যে, মিশর জার্মানী কিংবা ইতালীর বিরুদ্ধে সেনা সাজাইতেছে; কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য মতলব আঁটিতেছে, এই ধরণের কথা যাহারা রটাইতেছে, তাহাদের কথায় কেহ বিশ্বাস করিবেন না। মিশর বর্তমান সংগ্রামে নিরপেক্ষতাই রক্ষা করিবে; কিন্তু রাজনীতিক পরিভাষাসম্মত এই নিরপেক্ষতার প্রকৃত মূল্য কি থাকিতে পারে, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। তুরস্ক নিরপেক্ষ আছে, ইহার অর্থ বুঝা যায়; কারণ তুরস্ক এখনও কোন পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। মিশরের অভ্যন্তরভাগে লড়াই বাধিতে চলিল এবং কিছুদিন পরেই কাইরো, আলেকজেন্দ্রিয়ার অধিকার লইয়া হইবে লড়াই, এ ক্ষেত্রে মিশরের নিরপেক্ষতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবেই। জেনারেল রোমেলের কাছে মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন মোটেই প্রশ্ন নয়; তাঁহার উদ্দেশ্য হইবে মিশরের সামরিক সুবিধাগুলি হস্তগত করিয়া বৃটিশ পক্ষকে পর্যুদস্ত করা—সে জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন, তিনি কিছুতেই ইতঃস্তত করিবেন না; এমন অবস্থায় মিশরকে কার্যত হয়, জার্মানীর কাছে নত হইতে হইবে, নতুবা মিশরের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা রক্ষার জন্য বৃটিশকে সাহায্য করিতে হইবে। নাহাস পাশা বৃটিশ পক্ষের বলবাহনের উপরই সমধিক আস্থা স্থাপন করিতেছেন, তাঁহার বিবৃতি হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। বিরোধী দল মিশরে একটি আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সম্প্রতি যে নির্বাচন হইয়াছে তাহাতে জাতীয়তাবাদী নাহাসের দলেরই সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিশরের অভ্যন্তরভাগে প্রকৃতপক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে তথাকার রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিবে বা করিতে পারে ইহাও বিবেচনার বিষয় রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মিশরের এই সংগ্রামের রাজনীতিক গুরুত্ব সব দিক হইতেই অনেক বেশী। ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রয়োজনীয়তা সে গুরুত্বের কাছে আপাতত অনেকটা লঘু বলিয়াই মনে হইবে।



২৩

প্রথম দিন চাঁদার খাতা হাতে করিয়া দিলীপ ও পদ্মা জনকয়েক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ি গিয়া ধর্ণা দিয়াছিল। কিন্তু টাকা আদায় করা দূরের কথা, কাহারো নিকট কোন প্রতিশ্রুতিও আদায় করিতে পারে নাই।

প্রথম দিনের এই ব্যর্থতায় দিলীপ নিরুৎসাহ না হইলেও পদ্মা রীতিমত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

চাঁদা সংগ্রহ করিতে না পারায় পদ্মার মনে হইয়াছিল চাঁদা আদায় করিবার যোগ্যতা হয়ত তার নাই। চাঁদা যে কি করিয়া আদায় করিতে হয় তাই হয়ত সে জানে না।

টাকা সংগ্রহ না হইলে যে একটা মহৎ কাজ অসম্পন্ন থাকিবে এই দুশ্চিন্তা পদ্মার ছিল না, তাহার যা' কিছু ভয় ভাবনা দেখা দিয়াছিল তা' শুধু নিজের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবে বলিয়া। প্রতিমার তুলনায় সে একেবারেই অযোগ্য প্রমাণিত হইলে কোথায় থাকিবে তার দর্প! জয়ন্তের কাছে তাহার আর জোর করিয়া কথা বলিবার উপায় থাকিবে না।

পদ্মার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহার মনের অবস্থাটা দিলীপ বুঝিতে পারিয়া সহানুভূতির সহিত বলিল,—'আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কি হ'য়েছে? চাঁদা আপনি আদায় করতে পারেন নি তা'ত নয়। আমি যে টাকাটা দিচ্ছি সেটা ত আপনিই আমার কাছ থেকে আদায় করেছেন। আপনার কথায়ই আমি টাকাটা দিচ্ছি। ওটা আপনার খাতায়ই জমা হবে।'

মিথ্যা কি! দিলীপকে টাকা দিতে সে এক রকম বাধ্য করিয়াছে বলিলেই হয়। ইহা তাহারই কৃতিত্ব। আত্মতৃপ্তিতে পদ্মার সমস্ত দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। হাসিয়া কহিল—'আপনি তা' হলে খাতায় লিখে দিন। আর ওঁকেও কথাটা বলবেন।'

"নিশ্চয় বলব!"—এই বলিয়া দিলীপ তৎক্ষণাৎ পদ্মার খাতায় বেশ মোটা টাকার একটা অঙ্ক লিখিয়া দিল।

দিলীপের খাতাই বা কেন খালি পড়িয়া থাকিবে ভাবিয়া পদ্মা ঝোঁকের মাথায় তাহার খাতাটা লইয়া জয়ন্তের নামেও কিছু টাকা জমা করিল।

প্রথম দিনের ব্যর্থতা পাছে স্বীকার করিয়া লইতে হয় এই জন্যই হয়ত পদ্মার খাতায় দিলীপ ও দিলীপের খাতায় পদ্মা টাকা জমা করিয়া একটা তহবিল খাড়া করিয়া ফেলিল।

টাকায় টাকা আনে, একটা কথা আছে। কথাটা হয়ত একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পরদিন উভয়ের খাতায় টাকার অঙ্ক দেখিয়া আরও অনেকে টাকা দিল। এমনি করিয়া প্রতিদিন টাকা উঠিতে লাগিল। প্রতিদিনই পদ্মার সঙ্গে দিলীপের দেখা হয়। সন্ধ্যার পর দিলীপ হিসাব মিলাইতে আসে। কে কি পরিমাণ চাঁদা তুলিয়াছে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলে। দাতা যে অনেক সময় চক্ষুলজ্জায় দান করিতে বাধ্য হয়, এই লইয়া তাহারা হাসাহাসি করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসিগল্পে কাটিয়া যায়।

এই ব্যাপারে পদ্মার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমনকি জয়ন্তের সঙ্গেও দেখাশুনা খুব কমই হয়।

জয়ন্ত নিজে কাজে ব্যস্ত থাকে, পদ্মাকেও কাজে ব্যস্ত রাখিতে চায়। কাজই সে ভালবাসে। সুতরাং পদ্মার সঙ্গে দেখাশুনা কম হয় বলিয়া জয়ন্ত অনুযোগ দেয় না।

পদ্মারও আর সে দিন নাই। জয়ন্তকে না দেখিয়া একসময় সে বিছানায় লুটাইয়া কাঁদিয়াছে, আর এখন জয়ন্তকে না দেখিলেই সে ভাল থাকে।

জয়ন্তের প্রতি পদ্মা বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে। অগাধ ঐশ্বর্য থাকিতেও জয়ন্ত নিজে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাকেও বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। অথচ দান করিবার সময় সে মুক্তহস্ত। পদ্মার ইহা সহ্য হয় না জয়ন্তের মহত্ত্ব তাহাকে পীড়া দেয়, মনে মনে সে জ্বলিয়া মরে।

দুই জনের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। শুধু এই একটি বিষয়েই নয়, অন্যান্য বিষয়েও জয়ন্তের সঙ্গে পদ্মার গরমিল বড় বেশী। পাথরের মত যে কঠিন এবং ইস্পাতের মত যে তীক্ষ্ণ তাহার সঙ্গে মানাইয়া চলা সত্যই শক্ত। মানাইয়া চলিবার সাধ্য বা সাধনাও পদ্মার নাই। তাই জয়ন্তের সঙ্গে চলিতে গিয়া পদে পদে পদ্মা ঠোক্কর খায়, আর বিগড়াইয়া যায়।

জয়ন্তের সঙ্গে মানাইয়া চলিবার চেষ্টাও পদ্মা ছাড়িয়া দিয়াছে। জয়ন্তের মত সে নিস্পৃহ নয়। তাহার সখ সাধ সবই আছে। আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া পদ্মা সমুদ্র তীরে বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, পিপাসা মিটাইবার উপায় নাই, মরিয়া গেলেও না। জয়ন্ত ভোগ বিলাসের ভয়ানক বিরোধী।

এই জন্যই পদ্মা জয়ন্তকে সহ্য করিতে পারে না। তাহাকে সে এড়াইয়া চলিতে চায়।

নার্সিংহোমের কাজে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যও পদ্মার তাই। অপর কোন মহৎ উদ্দেশ্য তার নাই। শ্রমিকেরা কঠিন অসুখ-বিসুখে নার্সিংহোমে আসিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা

২

শুশ্রূষার সুযোগ সুবিধা পাইবে সে কথা তার চিন্তায় স্থান পায় না। নিজের সুযোগ সুবিধাই সে খোঁজে। নার্সিংহোমের কাজে যোগ দিলে সে জয়ন্তকে এড়াইয়া চলিতে পারিবে এবং জয়ন্তও খুশী থাকিবে, এই উদ্দেশ্যেই পদ্মা এ কাজে যোগ দিয়াছে।

শুধু ইহাই নয়। উদ্দেশ্য আরো আছে। অবাধে সে চলিতে চায়,—নিজের ইচ্ছামত। সে সুযোগ পদ্মা পাইয়াছে।

জয়ন্ত কারখানা লইয়াই ব্যস্ত। অন্যদিকে মন দেওয়ার অবসর পায় না। পদ্মা কোথায় যায়, কি করে, সে সব ভাবিবার সময়ও তাহার নাই, তা' ছাড়া প্রয়োজনও বোধ করে না।

চাঁদা আদায় করিবার জন্য পদ্মাকে অনেক জায়গায় যাইতে হয়, অনেকের সঙ্গে মিশিতে হয়, ইহা জয়ন্তের জানা আছে। ভালমন্দ সব রকম লোকের সংস্পর্শেই তাহাকে থাকিতে হয়, তা থাক। অত বাছ বিচার করিলে কাজ করা যায় না। কার্যক্ষেত্রে খানিকটা স্বাধীনতার দরকার। জয়ন্ত সেই স্বাধীনতা পদ্মাকে দিয়াছে।

স্বাধীনতা পাইয়া পদ্মা মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে। এমন-কি স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা যে এক নয় তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর দিলীপ আসে নাই।

পদ্মা তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে।

আটটা বাজিয়া গেল। তথাপি দিলীপ আসিল না। পদ্মা নিজেই দিলীপের বাড়ি ছুটিল।

শরীরটা ভাল না থাকায় দিলীপ বাড়ি হইতে বাহির হয় নাই। পদ্মাকে রাত্রিকালে একা তাহার বাড়িতে আসিতে দেখিয়া সে অবাক হইল।

পদ্মা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"আপনি যাননি যে!"

দিলীপ হাসিয়া কহিল—"শরীরটা ভাল নেই। কিন্তু—আপনি—আপনার কি কোন দরকার ছিল?"

—"দরকার না থাকলেও কি আপনি আর কোনদিন যাননি!"

—"আমি আপনার কথা বলছি। রাত্রি করে আপনার আসাটা ভাল দেখায় না।"

পদ্মা বেপরোয়া হইয়া বলিল—"তা আমি জানি।"

তাহার এই বেপরোয়া ভাব দেখিয়া দিলীপ মনে মনে শঙ্কিত হইল। ভীতকণ্ঠে কহিল—"এ নিয়ে একটা Scandal হতে পারে!"

—"তা হোক্। আমি গ্রাহ্য করি না।"

—"না না, গ্রাহ্য না করলে চলবে কেন? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে। সকলের কাছে মাথা হেঁট্ করে থাকতে হবে যে!"

"Coward!"—বলিয়া দিলীপকে গালি দিয়া পদ্মা জুতার খট্ খট্ শব্দে সমস্ত বাড়িখানা তোলপাড় করিয়া চলিয়া গেল।

পদ্মার গালি খাইয়া দিলীপ হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়া গেলে সে মনে মনে ভাবিল, স্ত্রীলোকের গালি খাওয়াও তাহার অদৃষ্টে ছিল! কিন্তু অপরাধটা কি? এত রাত্রে পদ্মার আসা উচিত হয় নাই, এই ত সে বলিয়াছে! এই অপরাধে তাহাকে গালি খাইতে হইল! পদ্মার ভালর জন্যই ত সে পদ্মাকে তাহার ত্রুটি ধরিয়া দিয়াছে। ইহাতে কাপুরুষ বলিয়া গালি দেওয়ার মানেটাই বা কি? আত্ম-সম্মান খোয়াইবার ভয় যে-কোন সম্মানিত ব্যক্তিরই আছে। এ জন্যে কাহাকেও কাপুরুষ বলা চলে না। পদ্মা যে কেন তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া গেল দিলীপ তাই ভাবিতে লাগিল।

বুঝিতে অবশ্য বাকী রহিল না। সম্মান খোয়াইবার সাহস তার নাই বলিয়াই পদ্মা তাহাকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিয়াছে। একদিন নিজের দুর্বলতার জন্য দিলীপ নিজকে ধিক্কার দিয়াছিল, কিন্তু আজ তার সে দুর্বলতা নাই বলিয়াও ধিক্কার দিতে হইল।

পদ্মা দিলীপের উপর ভয়ানক চটিয়াছিল। গালি দিয়াও তাহার রাগ মিটে নাই। রাত্রে জয়ন্তের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র পদ্মা বলিল—"তোমাদের নার্সিংহোমের কাজ কিন্তু আমি আর করতে পারব না।"

জয়ন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছিল। কথাটা শুনিয়াও শুনিল না। হাত পা ছড়াইয়া দিয়া সে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

পদ্মা পুনরায় কহিল—"সারাদিন এত ঘোরাফেরা আমার ভাল লাগে না। সময় নেই অসময় নেই, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোসামোদ করা—আমি করতে পারব না।"

জয়ন্ত হাসিয়া কহিল—"এত অল্পেই দম ফুরিয়ে গেলে ত চলে না, কাজের ভার যখন নিয়েছ তখন একটু কষ্ট হলেও কাজটা করতেই হবে।"

—"কেন আমি এসব করব? আমার কি দায়!"

—"সে কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। তোমাকে ত জোর করে কেউ কাজটা গছিয়ে দেয়নি, নিজেই যেচে নিয়েছ। আমি ত প্রতিমার ওপর ভার দিতে বলেছিলাম দিলীপকে, তুমিই প্রতিবাদ করলে। আর এখন বলছ—আমার কি দায়!"

পদ্মা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"একবার ভার নিয়েছি বলে কি আর ছেড়ে দিতে পারব না?"

"ছাড়া উচিত নয়,"—বলিয়া জয়ন্ত কঠিন দৃষ্টিতে পদ্মার পানে তাকাইল। তারপর পুনরায় কহিল—"একান্তই যদি ছেড়ে দিতে চাও—তা হলে অবশ্য অনিচ্ছায় তোমাকে কাজ করতে আমি বলি না। কিন্তু যা-ই কর ভেবে চিন্তে কোরো।"

পদ্মা ভাবিয়া দেখিল কাজটা ছাড়িয়া দিলে তাহাকে পুনরায় জয়ন্তের সঙ্গে কুলীবস্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। জয়ন্ত নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি দিবে না। তার চেয়ে নিজের ইচ্ছা মত ঘুরিয়া মরাও ঢের ভাল। কিন্তু কার্যোপলক্ষে দিলীপের সঙ্গে আবার দেখা হইবে ভাবিয়া পদ্মার মনটা যেন সংকুচিত হইয়া গেল। দিলীপকে যে সে অপমান করিয়া আসিয়াছে তার প্রতি-

(৮৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এক আর এক

শ্রীঅমূল্য পাল

বাড়ির লাগাও ছোট একটু জমি।

এই গ্রাম্য শহরটিতে ভাড়াটে বাসার অভাব অনেক। অন্যস্থান হতে চাকরিতে হঠাৎ বদলি হয়ে যারা আসে, তাদের পক্ষে ভালো বাসা পাওয়া দুষ্কর। তাদেরই সুবিধের জন্যে ছোট জমিটার উপর রামজীবনবাবু দুখানা কাঁচা ঘর তৈরি করে রেখেছেন। একটা ক্ষুদ্র পরিবারের বাসোপযোগী। ভাড়ার তেমন কড়াকড়ি নেই, তদুপরি রামজীবনবাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সহৃদয়া মহিলা। যে কোন অপরিচিত পরিবারকেই তিনি দুদিনে আপন করে নিতে পারেন। বিদেশ-বিভুঁয়ে আশাতীত আত্মীয়তা পেয়ে ভাড়াটেরাও স্বজন-বিরহ ভুলে গিয়ে অচিরেই বাড়িওয়ালার পরিবারের আপন জন হয়ে যায়।

অনেক খোঁজা-খুঁজি করে যোগেন্দ্র রায় রামজীবনবাবুর বাসার সন্ধান পেয়ে সেখানে তার ক্ষুদ্র সংসারটি পেতে বসল। দীর্ঘ শীর্ণ অথচ শক্ত চেহারা যোগেন্দ্রর। চুলগুলি কাঁচায় পাকায় মিশানো। বয়স চল্লিশের উর্ধে নয়; কিন্তু হঠাৎ দেখলে পরে পঁয়তাল্লিশ বলেই মনে হয়। স্ত্রী বিন্দুকে দেখলে যে কোন বাইরের লোকেই যোগেন্দ্রর সঙ্গে তার সম্বন্ধের বিভ্রমে পড়বে।

যোগেন্দ্র বয়স উত্তীর্ণ করেই বিবাহ করেছিল। ভালো চাকরি লাভ এবং স্বাধীনভাবে সংসার চালাবার মত টাকার জোর আয়ত্ত করবার ফাঁকে বয়সটা পিছলিয়ে পঁয়ত্রিশের ধাক্কা থেকে আটত্রিশে পড়তেই বিন্দুকে সে সঙ্গী করে নিলে। সে প্রায় ছয় মাস আগে এবং বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই অনাগত আর একটি সঙ্গীর আগমনের আভাসও তারা জানতে পারল।

যোগেন্দ্রর সংসারটি ক্ষুদ্র হলেও বিন্দুর কাজের চাপ বৃহৎ। একহাতে তাকে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ থেকে আরম্ভ করে রান্না-বান্না পর্যন্ত করতে হয়। সপ্তাহে তিন দিন যোগেন্দ্রকে অফিসের কাজে বাইরে থাকতে হয়, এই দিন তিনটা বিন্দুর গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকে। প্রথম প্রথম বিন্দুর এই দিন কয়টা বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হত; কিন্তু এখন সেটা সয়ে গেছে। এই ফাঁক কয়টা পূর্ণ করে দেয় রামজীবনবাবুর স্ত্রী ও তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। রামজীবনবাবুর শিশুপুত্রের আধ-আধ বুলি, দন্তবিহীন নরম ঠোঁট-চেরা হাসি বিন্দুকে বিহ্বল করে তোলে। তার অজস্র চুম্বনে শিশুপুত্রের হাসির মাত্রা বেড়ে যায়। তার হৃদয়ে এর রূপ অনাগতের রূপের সঙ্গে যেন মিলে যায়।

একদিন রামজীবনবাবুর স্ত্রী যোগেন্দ্রকে বললেন, 'দেখুন রায়মহাশয়, বিন্দুর এখন অত খাটা ভালো নয়। বাইরের কাজের জন্যে একটা ঠিকে ঝি যোগাড় করে নিন।'

সলজ্জ হাসি হেসে যোগেন্দ্র বললে, "তাইত গিন্নি-মা, আমি ত ওকে এ কথাই বলি। কিন্তু কিছুতেই যে রাজি হয় না।"

তার দিকে তাকিয়ে গিন্নি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'ও ত বলে, কিইবা কাজ; ও আমি একাই করতে পারব। ঝির খরচটা জমা থাকলে আখেরে কাজ দেবে।'

এর পরে গিন্নি-মার বলবার আর কিছু নেই।

সেদিন সকাল বেলা যোগেন্দ্র গিন্নি-মার সম্মুখে এসে বললে, 'গিন্নি-মা আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে। এ ওর নিজের কাজ, তাই ওকে দিয়ে করানো ভালো দেখছিনে। পোলাও-পায়েসের জন্যে জিনিসও এনেছি। ওর পছন্দসই শাড়িও একটা কিনেছি। এ বিদেশে আপনিই ত আমাদের মায়ের মত। অতএব কর্তব্যের ভার আপনারই ওপর।' 'বেশ ত, ভালো কথা। আমাদের হেঁশেলের ভার মোতির মার ওপরে দিয়ে আমি এখনি যাচ্ছি।' 'আপনাদের হেঁশেল যে আজ বন্ধ রাখতে হবে, গিন্নি-মা। এ ব্যাপারে কেবল আমরা দুজনে থাকলে আনন্দ পুরোপুরি পাব না।'

রাত্রি তখনও গভীর হয় নি; অবেলায় আহারের ফলে রামজীবনবাবুর ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

চৌকির ওপর বসে যোগেন্দ্র তখন তাম্রকূট সেবন করছিল। আটপৌরে শাড়িখানা পরেই বিন্দু তার পাশে এসে বসল। আড়-চোখে তাকিয়ে যোগেন্দ্র বললে, 'উহুঁ, এতে চলবে না। যে শাড়ি-খানা আজ এনেছি সেখানা পরতে হবে।'

বিন্দু যোগেন্দ্রর পিঠে মৃদু একটি কিল বসিয়ে বললে, 'থাক, আর প্রেম ফলাতে হবে না। এখন শুয়ে পড়।'

'রাত যখন অনেক আছে, শোবই ত। কিন্তু শাড়ি না পালটালে বসে থাকতে হবে।'

বিবাহের পর থেকে এ কয়টা মাসের মধ্যে বিন্দুকে যোগেন্দ্রর অনেক জেদ রক্ষা করতে হয়েছে। নতুন শাড়িখানা না পরলে যোগেন্দ্র আজ বিন্দুকে কিছুতেই ছাড়বে না। তাই সে শাড়ি পালটাবার জন্যে উঠে গেল।

ফিরোজ রঙের শাড়িখানা বিন্দুর শুষ্কদেহে রূপ ফিরিয়ে আনল। আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে তার চোখে পড়ল মুখশ্রীর পরিবর্তন। গণ্ডস্থলের মাংস বসে গেছে। উঁচু হাড় দুটো মাত্র চোখে পড়ে; তাদের ছায়া ঢেকে রেখেছে কোলে-কালি-পড়া চোখ দুটিকে। তার নয় মাস আগেকার কমনীয় যৌবনের উচ্ছলতায় যেন রূঢ়তা ও রুক্ষতা নতুনভাবে চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এ চিহ্ন কোনকালে মুছে যাবে না, সেই পুরাতন যৌবন আর ফিরে আসবে না। সে-মুহূর্তে অতীতের ঘটনা তার মনের দুয়ারে ঘন ঘন করা-ঘাত করতে লাগল। বিস্মৃতির রুদ্ধ আবরণ অকস্মাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

বিবাহের আগে বিন্দু যোগেন্দ্রকে দেখেনি। সে কল্পনা করেছিল বলিষ্ঠ যুবক যোগেন্দ্র অপরূপ সৌন্দর্য নিয়েই তার কাছে আসবে। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময়ে ঘটে গেল বিপর্যয়। যোগেন্দ্রর ঈষৎ পক্ব কেশ, তার শীর্ণ প্রৌঢ় মুখমণ্ডল বিন্দু সহ্য করতে পারেনি। যোগেন্দ্রর পানে তাকিয়েই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। লোকে মনে করল—এ মূর্চ্ছা সারাদিনের উপবাসক্লান্তি জনিত।

বিবাহের প্রথম শয্যায় যোগেন্দ্র বিন্দুকে কাছে টেনে এনে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আমি বুঝতে পেরেছি বিন্দু, আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু বিন্দু, মানুষের বাইরের রূপটাই কি সব? ভিতরটা কি একেবারে ফাঁকা?' যোগেন্দ্রর দরদী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার বাইরের কাঠামোটা যে একেবারেই বেমিল তা বিন্দু এবার ভালো করে তার মুখের পানে তাকিয়ে বুঝে নিলে। পরদিনই বিন্দু আগ্রহের সহিত তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগেন্দ্রকে পরিচয় করে দিয়েছিল।

যোগেন্দ্র মিট মিট করে হেসে বললে 'কিগো, আয়নার দিকে চেয়ে ভাবছ কি? নিজের রূপেই নিজে মুগ্ধ হয়ে পড়লে নাকি? মুখ তুলে আমার পানে চাও। আমাকেও মুগ্ধ হতে দাও।'

'থাক, থাক আর রসিকতা করতে হবে না। এই ত শাড়ি পরলুম। এখন হয়েছে ত?'

বিন্দুকে কাছে টেনে এনে যোগেন্দ্র বললে, 'দিলে ত সব রস মাটি করে। আরও কাছে এস না।'

'যাও, তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।'

সেদিন যোগেন্দ্রর বাইরে যাবার তারিখ। কিন্তু বিন্দুর বর্তমান অবস্থাতে তাকে একা রেখে যেতে তার মন সরছে না। তবু চাকরি-রূপোর মায়ায় তাকে যেতেই হল। যাবার সময় সে রামজীবন-বাবুর স্ত্রীকে বললে, 'গিন্নি-মা, আমাকে ত আজ বাইরে যেতে হচ্ছে। ওকে আপনারা দেখবেন।'

গিন্নি-মা বললেন, 'আমাকে কি সে-কথা বলতে হবে, রায়-মশায়। আমি আছি, মোতির মা আছে—আপনাকে সে-ভাবনা ভাবতে হবে। ফিরে এসে ছেলের মুখ দেখতেও পাবেন।"

দুদিন পরের ঘটনা

ভোর থেকেই বিন্দু জ্বর জ্বর বোধ করছিল। রামজীবন-বাবুর স্ত্রী, মোতির মা ক্ষণে ক্ষণে এসে তার সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে। বারম্বার কিছু-না-কিছু খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে। আজ আহারে বিন্দুর মোটেই রুচি নেই। কিছু ফল ও গরম দুধটা ঠাণ্ডা হয়ে টেবলের উপর পড়ে রয়েছে। ওদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা অজানা উন্মনা ভাব তার মনকে প্রতিক্ষণেই বিধ্বস্ত করে যাচ্ছে। রাজ্যের যত চিন্তার আবর্জনার স্তূপ তার শ্রান্ত বিবশ মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, মোতির মা'র সান্ধ্য বন্দনাও সে শুনতে পেলে না।

মাটির প্রদীপটা টেবলের ওপর রেখে নিকটে এসে মোতির মা বললে, 'সন্ধ্যের সময়ে শুয়ে থাকতে নেই, বৌমা। উঠে বস। ভগবানকে ডাক।' সে বিন্দুর পিঠের নীচে তিন চারটা বালিশ গুঁজে দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলে। বিন্দুর কম্পিত যুক্তহস্ত কপালে ঠেকতে-না- ঠেকতেই পাশে গড়িয়ে পড়ল। সে স্থির দৃষ্টিতে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে—যেখানে গোধূলির ছায়া পড়েছে; যেখান থেকে পৃথিবীর শিশুদের পদধ্বনি তার কানে এসে পেঁছায়। সে চোখ বুজে মন নিবিষ্ট করলে নিজের দেহের ভিতরে। মিনিটের পর মিনিট চলে গেল; কিন্তু তার দেহাভ্যন্তরের শিশুর পদধ্বনি সে শুনতে পেলে না। তার বিবশ, বিশীর্ণ দেহ মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এল।

রাত্রে মোতির মা তার পাশে শুতে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখে গাটা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। রাত্রি দশটা নাগাদ একটা চাপা ক্রন্দন ধ্বনিতে মোতির মা'র ঘুম আচমকা ভেঙে গেল। প্রসব বেদনা-তুরা বিন্দু। আলো জ্বালিয়ে মোতির মা দেখে যে, বিন্দুর বিবস্ত্র দেহটা চৌকির একপ্রান্তে উবুড় হয়ে পড়ে আছে। তার দেহের ফরসা চামড়া ভেদ করে যেন বিষরক্ত দ্রুত গতিতে বেরতে চায়। কালো শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। অসহ্য জ্বালায় শান্তি পাবার জন্যে বোধ হয় বিন্দু নিজের মাংস নিজেই কামড়াতে আরম্ভ করেছে।

এ দৃশ্য দেখে বিভ্রান্ত হয়ে মোতির মা চীৎকার করে উঠল। না-ঘুমোবার ইচ্ছে সত্ত্বেও রামজীবনবাবুর স্ত্রীর চোখের পাতা লেগে এসেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলেন সেখানে। রামজীবন-বাবু জাগলেন; ছেলেমেয়েরা জাগল। নীরব বাড়িটা সরব হয়ে আশু বিপদের আশংকায় আবার নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল। শহরের নামকরা ডাক্তার এলেন, পাশকরা ধাত্রী এলেন। যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা বার করলেন একটা মৃত শিশু। প্রসূতিকে বাঁচানো গেল না। মৃত আত্মার সিন্ধুতে বিন্দু মিলিয়ে গেল।

রাত্রির অন্ধকারের ওপর প্রাগুষার স্তিমিত আলোক ছড়িয়ে পড়েছে। নবজাত শিশুর মুখ দেখবার আশায় বোধহয় যোগেন্দ্র আহ্লাদিত মনে বাসায় ঢুকল। ঘরের দরজার সম্মুখে এসে সে দাঁড়াল থমকে—শেষ রাত্রিতে ঘরে আলো জ্বলে কেন! সে ভাবল, নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে বোধহয় এ ঘরেই রাখা হয়েছে। বিন্দুর এ সঙ্কট সময়ে সে থাকতে পারেনি বলে মনে মনে নিজেকে তিরস্কারও করলে। কত কষ্ট না-জানি পেয়েছে বিন্দু! কাল সকালেই ভালো একজন ডাক্তার ডেকে স্বাস্থ্যপ্রদ ভালো ভালো ওষুধ বিন্দুর জন্যে ব্যবস্থা করাবে।

বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে যোগেন্দ্র ডাকলে, 'বিন্দু, বিন্দু ঘুমিয়েছ?' কোন উত্তর নেই। শুধু এক দমকা চৈত্রের হাওয়া ঘরের বেড়ার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। হাওয়ায় ঘরে মাটির প্রদীপের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। দরজায় হাত দিয়ে যোগেন্দ্র বুঝতে পারলে দরজাটা বাইরে থেকে শিকল আঁটা। রামজীবনবাবুর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যোগেন্দ্র ডাকলে, 'গিন্নি-মা, গিন্নি-মা জেগে আছেন?'

শুধু গিন্নি-মা নয় ঘরের সবাই জাগ্রত ছিল; কিন্তু দুঃসংবাদটি যোগেন্দর নিকট পেঁছাবার মত মনের অবস্থা তাদের কারও ছিল না। তথাপি এগিয়ে এলেন গিন্নি-মা। কিন্তু তিনি কিছুই না বলে কেবল কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে যোগেন্দ্র বললে, 'জানতুম গিন্নি-মা, ও আমার কাছে বেশি দিন থাকবে না। কেঁদে কি আর হবে গিন্নি-মা, যা হবার তাত হয়েছেই। দুঃখ রইল, শেষ সময়ে ওকে একটি বার দেখতে পেলুম না। চাবিটা দিন, ঘরে যাই।'

গিন্নি-মা আঁচল থেকে খুলে চাবিটা দিলেন।

ঘরে গিয়ে যোগেন্দ্র কিছুক্ষণ শূন্য চৌকিটার ওপর চুপ করে বসে রইল। সে দেখতে পেলে যে, সেদিনের নতুন শাড়িটা এখনও আলনায় ঝুলছে। বিন্দুর জন্যে আনা ফলগুলো ও দুধটা তখনও টেবলের ওপর পড়ে রয়েছিল। তার সে-মুহূর্তে মনে হতে লাগল—এ সংসার কিছুই নয়, শুধু মরীচিকাময়, সব অসত্য, সব মিথ্যা। হঠাৎ আধ্যাত্মিক বোধে জাগরিত হয়ে সে গুন গুন করে রামপ্রসাদের গান গাইতে লাগলে।

ওপর থেকে গিন্নি-মা ধারণা করলেন, হঠাৎ শোক পেয়ে যোগেন্দ্র বিবাগী হয়ে যাবে। এমনকি সংসারের মায়া কাটিয়ে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণও করতে পারে।

দিন সাতেক পরে যোগেন্দ্র যখন গিন্নি-মাকে বললে যে, সে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবার উদ্দেশ্যে এক মাসের ছুটি নিয়েছে, তখন গিন্নি-মা'র এ ধারণা বদ্ধমূলই হ'ল।

এক মাস পরে যোগেন্দ্র ফিরে এল; কিন্তু একা নয়, সঙ্গে এল আর একটি মেয়ে—তার নবপরিণীতা ভার্যা। গম্ভীর মুখে গিন্নি-মা বধূবরণ করলেন, মিষ্টিমুখ করালেন তারপর তার কচি মুখটি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নামটি, কি মা?'

খিলখিল করে হেসে মেয়েটি উত্তর দিলে, 'আমার নাম রাধা।' তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি ও'র কাছে যাব না, মা। তোমার কাছেই থাকব। আমার মা ত নেই। আমার পিসিমার কাছ থেকে ও' আমায় ধরে এনেছে।'

'তা বেশ মা, তুমি আমার কাছেই থেকো।' একগাল হেসে যোগেন্দ্র বললে, 'বড় একটা পুণ্যের কাজ করেছি গিন্নি-মা। চন্দ্রনাথ গিয়েছিলুম তীর্থ করতে। সেখানে ওর বিধবা পিসিমার সঙ্গে আলাপ হল। বুড়ি কেঁদেকেটে আমায় ধরলে ওকে বিয়ে করতে। কি আর করি গিন্নি-মা, বাধ্য হয়ে ওকে ঘরে আনতে হ'ল। একটা অসহায়া বিধবাকে উদ্ধার করা কি কম পুণ্যের কাজ গিন্নি-মা?'

যোগেন্দ্রর এ ব্যবহারে গিন্নি-মা'র মন তিক্ততায় ভরে উঠেছিল। এরূপে উত্তীর্ণ বয়সে বিয়ে না করে রাধার একটা ভালো ব্যবস্থা যোগেন্দ্র চেষ্টা করলে হয়ত করতে পারত। উদ্ধারের নামে নিজের কামনার বহ্নিতে একটা কাঁচা মেয়েকে পুড়িয়ে মারবার বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রকে কিছু বলবার ইচ্ছে গিন্নি-মা'র এখন আর নেই। যা ঘটে গেছে সে সম্পর্কে বাক্যব্যয় বৃথা। রুষ্টমনে গিন্নি-মা শুধু বললেন, 'হুঁ'।

কিন্তু গিন্নি-মা বিপদে পড়লেন রাধাকে নিয়ে। সারাদিন সে যোগেন্দ্রর সংসারের যাবতীয় কর্ম সমাপন করে এমনকি তার এ'টো থালায় নিজের খাওয়া পর্যন্ত সেরে নেয়; কিন্তু বিপদটা আরম্ভ হয় রাত্রিতে। প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই খাওয়ার পর রাধা এসে গিন্নি-মা'র পিঠ ঘে'ষে শুয়ে পড়ে। সে কিছুতেই ও-ঘরে যাবে না। গিন্নি-মা বুঝিয়ে বলেন, 'ছি ছি, এমন করতে নেই রাধা। স্বামীর ঘর করতে হয়। স্বামীর অবাধ্য হতে নেই।'

আরও কাছে ঘে'ষে বলে, 'স্বামী না কচু। ও বড় অসভ্য। আমি ওর কাছে কিছুতেই যাব না।'

রাধার কথাগুলো যোগেন্দ্রর কানে গিয়ে পে'ছিয়। ও-ঘর থেকেই সে রাগে থন থন করে ওঠে; 'ন্যাকামি পেয়েছে! রোজ রোজ এত ফ্যাচাং কিসের! ওকে মেরে তাড়িয়ে দিন গিন্নি-মা। এক রত্তি মেয়ে জেদ কত!'

গিন্নি-মা রাধাকে বলে, স্বামীকে কুবাচ্য করতে নেই, রাধা। যা ঘটে গেছে তার ওপর অভিমান করে শুধু শুধু নিজের সংসারে অশান্তি ডেকে এনো না।'

গিন্নি-মা রাধাকে বলে, 'স্বামীকে কুবাচ্য করতে নেই, রাধা।

কয়েক বছর পরে যোগেন্দ্রর এখান থেকে বদলির আদেশ এল। এখনও যোগেন্দ্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি হয়। তবে তার সংসারটি আর ক্ষুদ্র নয়, বৃহৎ। রাধা অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যোগেন্দ্রর কাছে বাঁধা পড়েছে।

দেবতা ও মানবী

(৮৯০ পৃষ্ঠার পর)

দানে দিলীপও হয়ত তাহাকে অপমান না করিয়া ছাড়িবে না। এই ভয়েই ত সে সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছিল।

পদ্মা মনে মনে স্থির করিল দিলীপের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে দিলীপের সঙ্গে পদ্মার দেখা হইল না। দিলীপও আসিল না, পদ্মাও আর সাহস করিয়া গেল না। এ কয়দিন দিলীপকে না দেখিয়া পদ্মার মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

পদ্মা জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিলীপবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?"

জয়ন্ত বলিল—"হ্যাঁ, প্রায় রোজই দেখা হয়। আজও দেখা হয়েছিল। নার্সিংহোমের জন্যে একটা জায়গা কিনবে বলছিল। আমাকে বলছিল জায়গা দেখতে। কিন্তু আমার ত এখন ঘুরে ঘুরে জমি দেখবার সময় হবে না। কারখানাটা open না করে অন্য কাজে আমার হাত দেবার উপায় নেই।"

দিলীপ জয়ন্তের সঙ্গে প্রায় রোজ দেখা করে অথচ এখানে একবার আসে না ইহার কারণ কি এ বিষয়ে পদ্মার মনে কোন প্রশ্নই উঠিল না। কারণটা তাহার জানাই আছে।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল—'কারখানাটা খুলছো কবে?'

জয়ন্ত কহিল—'আগামী সপ্তাহের সোমবার।'

কারখানা বাড়ি তৈরী হইয়া গিয়াছে। কল বসিয়াছে, মিস্ত্রি ও মজুর ভর্তি হইয়াছে। কারখানা চালাইবার জন্য যা' কিছু প্রয়োজন সমস্তই প্রস্তুত।

কারখানার দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে সেদিন হাজার হাজার শ্রমিক, বিভিন্ন শ্রমিকসঙ্ঘের নেতা এবং জয়ন্তের সহকর্মিগণ কারখানার সমুখে জড় হইয়াছে। লোকে লোকারণ্য।

একজন শ্রমিক দ্বারোদ্ঘাটন করিল।

দ্বার উদ্ঘাটন করা হইলে দলে দলে সকলে কারখানার ভিতরে ঢুকিল। এই ভিড়ের মধ্যে দিলীপ, পদ্মা এবং প্রতিমাও আছে। প্রতিমার সঙ্গে তাহারা কারখানা প্রাঙ্গণে গিয়া সভার মধ্যে বসিল।

সভা আরম্ভ হইল। জয়ন্ত বক্তৃতা করিয়া কারখানার আদর্শ উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিল। সভা ভাঙ্গিলে নেতারা শ্রমিকদের লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিল।

শোভাযাত্রার সমুখে জয়ন্ত। তার পিছনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক। দীর্ঘ পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। কণ্ঠে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি। আকাশ বাতাস ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছে। এক একটা ধ্বনি যেন বুকের মধ্যে আসিয়া এক একটা ধাক্কা দেয়। সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

প্রতিমা শোভাযাত্রার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিলীপ ও পদ্মা যায় নাই। পদ্মা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, আর দিলীপকে পদ্মার চিকিৎসার ভার লইতে হইয়াছে।



(১৬)

কুড়ি টাকার ভাবনা সুমন্তকে অস্থির ও অধীর করিয়া তুলিয়াছিল।

একবার ভাবিল পুষ্করিণীর মাছগুলি বিক্রয় করিয়া দিয়া সেই মূল্যে সে দেনা শোধ করিবে।

রতন জেলেকে বলা মাত্র সে রাজি হইয়া গেল—বলা রহিল কাল সকালেই সে জাল লইয়া আসিবে। বাড়িতে ফিরিয়া দিবাকরকে ডাকিয়া সুমন্ত সহর্ষে বলিল—টাকাটার যোগাড় করে এলুম দিবাদা;—আগাম তিন টাকা দিয়েছে, এটা তোমার কাছেই রাখ, কাল বাকি টাকা পেলে কত হয় হিসেব করে একেবারে সরাসরি পাঠিয়ে দেব—কি বল?

আশ্চর্য হইয়া গিয়া দিবাকর বলিল, "কোথায় পেলে, কেই বা তোমায় আগাম টাকা দিলে আমি তার কিছুই তো বুঝতে পারলুম না খোকাবাবু।"

সুমন্ত বলিল, "দিলে রত্না জেলে। কাল সকালেই পুকুরের মাছ ধরাবো কিনা—"

"পুকুরের মাছ—"

দিবাকর মাথা চুলকাইল—"ওতে কি তোমার পুরো অধিকার আছে খোকাবাবু, তোমায় যে সহজে ধরতে দেবে তা তো মনে হয় না।"

রুখিয়া উঠিয়া সুমন্ত বলিল, "তার মানে? তুমি কি বলতে চাও দিবা দা; ও পুকুরে আমার অধিকার নেই—ও পুকুর ওদের? এ কথা বলতে পারো—বাবা মারা যাওয়ার পর আমি কুঁড়েমি করে কিছু দেখি নি, ওরা সেই সুযোগ পেয়ে সব কিছু ভোগ দখল করছে, তাই বলে আমার সব কিছুতে যে ওদের স্বত্ব দাঁড়িয়েছে সে কথা তুমি বলতে পারো না দিবা দা।"

দিবাকর ধীরকণ্ঠে বলিল, "তোমার কাকাবাবু অনেক কিছুই নিজের বলে দখল করেছেন খোকাবাবু। আমি তাই না আজ কতদিন হতে তোমায় বলছি এখনও সব দেখ, শোন, এর পরে আর কিছু পাবে না। সংসার-ধর্ম তো করতে হবে—ছেলে-পুলের জন্যেও তো কিছু—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুমন্ত বলিল, চুলোয় যাক সংসার-ধর্ম ছেলেমেয়ে, আমার নিজের জন্যেই যা করবার তা আমি করব দিবা দা, কারও জন্যে করব না। ওই একটা কথা ঠিক বলেছো—এরপরে আমি কিছু পাব না,—সেই জন্যে আমি সব কিছু করব—আমি প্রাণপণে লড়ব—দেখি ওঁরা কি করতে পারেন।"

সত্যই বিপদ বাধিল পরদিন সকালে—

রত্না জেলে পুষ্করিণীতে প্রথম ক্ষেপ জাল ফেলিতেই মহেশ রায় হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া গেলেন, ব্রজসুন্দরও আসিল, পাড়ার দু পাঁচজন লোকও আসিয়া জুটিল।

মহেশ রায় চেঁচাইয়া বলিলেন, "খবরদার রতন পুকুরে জাল ফেলবে না বলে দিচ্ছি। গাঁ শুদ্ধ সবাই জানে যে—"

পিছন দিক হইতে সুমন্ত আগাইয়া আসিল—"কি জানে সবাই সে কথা বলুন না কাকামশাই—স্পষ্ট করে বুকে হাত দিয়ে বলুন, আমার দিকে তাকিয়ে বলুন। কি রতন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুমি জাল ফেল। বাজার বেলার আগে আমার পুকুরের সব মাছ ধরা চাই।"

"আমার পুকুরের" কথাটার উপর সে জোর দিল বেশী রকম।

ব্রজসুন্দর পিতার পিছন হইতে মুখ বাড়াইল,—"তোমার পুকুর কি রকম?"

সুমন্ত গর্জন করিল—"তোমায় কথা বলতে ডাকা হয়নি রোগাপট্‌কা, তুমি যেমন কাকামশাইয়ের আড়ালে আছ, তেমনি থাকো।"

"রোগাপট্‌কা—"

ব্রজসুন্দর অত্যন্ত আহত হইল। সে আবার কি বলিতে যাইতেছিল, মহেশ রায় তাহাকে থামাইয়া দিলেন। বলিলেন—"তুই চুপ কর ব্রজ, কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে—তাই হোক। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি সুমন্ত, আমাকে বিন্দুমাত্র না জানিয়ে পুকুরে মাছ ধরানোর কারণ কি? এ বাড়ির সর্বময় প্রভু কি তুমি?"

সুমন্ত নরম সুরে বলিল, "সর্বময় না হই, অর্ধেকের মালিক যে একা আমিই, সে কথা মনে করে দেখবেন কাকামশাই। আর অর্ধেকের অনেক ভাগীদার থাকতে পারে, আমার ভাগীদার কেউ নেই।"

অদূরে দণ্ডায়মান রতনকে লক্ষ্য করিয়া সে হাঁক দিল, "তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন রতন—তোমার কাজ তুমি কর। সাতটা বাজে সে খেয়াল আছে?"

রতন জাল লইয়া অগ্রসর হইল।

মহেশ রায় আবার চেঁচাইলেন, "থামো রতন—"

সুমন্ত বাধা দিল, "না না, থামবে কেন—তুমি জাল ফেল রতন; কোন ভয় নেই, আমি যতক্ষণ আছি, কেউ তোমার এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না।"

মহেশ রায়ের মুখখানা একেবারে কালো হইয়া উঠিল, তিনি কেবলমাত্র ডাকিলেন—"সুমন্ত—"

বিনীতকণ্ঠে সুমন্ত বলিল, "বলুন—।"

মহেশ রায় অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বললেন, "জানো আমি তোমায় সহজে ছাড়ব না, আমি তোমার নামে নালিশ করব।"

সুমন্ত বলিল, স্বচ্ছন্দে করতে পারেন, কিন্তু সে নালিশ টিকলে হয়। আমার পুকুরে আমি মাছ ধরেছি, এতে আপনিই বরং বাধা দিতে এসেছেন; সে হিসেবে বরং আমারই নালিশ করা উচিত। যাক্‌গে, আমি না করে না হয় আপনিই করলেন, ও দুটো একই কথা। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কি—নালিশ করতে সাক্ষীর দরকার তো, আপনার সাক্ষী সাবুদ ঠিক আছে তো?

বর্ধিত রোষে মহেশ প্রথম খানিকক্ষণ কথাই বলিলেন না, তাহার পর কেবল একটা আঙুল বাড়াইয়া আশপাশের লোকদের দেখাইয়া দিলেন।

সুমন্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"হা ভগবান, আপনি ওই সব লোকের ভরসাও করেন কাকামশাই, ওদের আপনি এখনও চেনেন নি? ওরা কেবল মজা দেখতে এসেছে বই তো নয়। মজা দেখা শেষ হলে সোজা বাড়ি চলে যাবে—সাক্ষী আপনার কেউ হবে না, কেউ একটি কথাও বলবে না।"

মহেশ দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিলেন, "দেয় কি না, তা দেখা যাবে, সহজে আমি ওদের ছাড়ব না। যে না বলবে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাব না?"

সুমন্ত গম্ভীর মুখে বলিল,—হ্যাঁ, আমিও দেখে নেব কে কত সাক্ষী দিতে যায়?"

বলিতে বলিতে সে হাঁক দিল—"এই ভোলা শুনে যা এদিকে।"

হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী ভোলা নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইল।

সুমন্ত বলিল, "তোরা নাকি আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিবি আমার কাকামশাইয়ের সঙ্গে মিশে? কিন্তু মনে রাখবি ভোলা, আমি থাকি তো বেশ ভালোমানুষ, অথচ রাগলে পরে—"

ভোলা বিব্রতভাবে হাতযোড় করিল, সেটা কি আর জানতে বাকি আছে ছোটকর্তা।"

সুমন্ত বুকের উপর আড়াআড়িভাবে হাত দু'খানি রাখিয়া বুক ফুলাইয়া বলিল, "সাক্ষী দিতে পারবি—এ পুকুর কার—পুকুরের মাছ কার?"

ভোলা হাত কচ্‌লাইয়া বলিল, "আজ্ঞে—"

ঝাঁজের সুরে সুমন্ত বলিল, "ও-সব আজ্ঞে টাজ্ঞে চলবে না, সত্যি কথা বল।"

মহেশ রায়ও হাঁক দিলেন,—"হ্যাঁ, সত্যি কথা বলবি ভোলা—"

ভোলা পাংশুমুখে খানিকক্ষণ আম্‌তা আম্‌তা করিল; সুমন্ত তাহার হাতখানা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিল—"বল বলছি—"

সঙ্গে সঙ্গে মহেশ রায়ও গর্জন করিলেন—"হ্যাঁ, বল শিগ্‌গির—"

ভোলা সকল দ্বিধা কাটাইয়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল—"আজ্ঞে পুকুর বড়কর্তার—আপনার বাবা প্রশান্ত রায়ের, কিন্তু মাছগুলো—

'হুর রে' করিয়া সুমন্ত লাফাইয়া উঠিল, "শুনুন কাকামণি, শুনুন একবার—পুকুর আমার বাবা প্রশান্ত রায়ের। অতএব আপনি পুত্র সহ—"। বাকি কথাটা শেষ না করিয়া সে অঙ্গুলী সঙ্কেতে লম্বা পথের সীমানা যতটুকু দেখা যায় দেখাইয়া দিল।

মহেশ রুদ্ধস্বরে ডাকিলেন,—"ভোলা, নেমকহারাম।

ভোলার কণ্ঠস্বর মিলাইয়া আসিতেছিল, তবু সে প্রাণপণ করিয়া বলিতে গেল—"কিন্তু পুকুরের মাছগুলো—আজ্ঞে ওগুলো আমাদের মেজোকর্তাই ছেড়েছিলেন গত বছর।"

"হো হো হো—"

হাসিতে হাসিতে সুমন্তের পেট ব্যথা হইয়া যায়। অকস্মাৎ সেই উচ্ছ্বসিত হাসি থামাইয়া সুমন্ত ডাকিল—"রতন—"

রতন বলিল, "আজ্ঞে করুন ছোটকর্তা—"

সুমন্ত বলিল হিসেব করে বল দেখি—এক বছরের মাছ কত বড় হয়?"

পাকা জেলে রতন, মাছের বয়সের সঙ্গে মাপ বা ওজন ভালো জানিয়াও ছোটকর্তার প্রশ্নে ঘাবড়াইয়া গেল। একটু ভাবিয়া মাথা চুলকাইয়া হাতখানা তুলিয়া মাপ দেখাইল—"তা এতখানি হবে বোধ হয় ছোটকর্তা—"

মহেশ প্রশ্নের ধরণ শুনিয়াও উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন উত্তর শুনিয়া একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওই অতটুকু মাছ হয়, তুমি ঠিক বলছো জেলের পো? হক কথা বল, নিজের বুকে হাত দিয়ে উপরে ধর্মের পানে চেয়ে বল। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর বাপু, অধর্ম করো না, সইতে পারবে না।"

ধর্ম ও অধর্ম এবং ছেলেপুলে লইয়া ঘর করা—রতন আগুন হইয়া উঠিল, বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আপনি আজ রতন জেলেকে ধর্ম অধর্ম শিখাতে এসেছো রায় মশাই। নিজে বরং শিখে নাও গে পরকে শিখানোর আগে। নেহাৎ বলিনি বলে তাই, বললে আপনার যে অনেক কীর্তি বলতে পারি—সেটা জানো তো?

সুমন্ত বলিল—"যাক্, কেলেঙ্কারীর আর দরকার নেই মানে মানে ঘরে ফিরে যান কাকামশাই। পরের পুকুরে মাছ ছেড়েছেন এটা ভয়ানক অনধিকার চর্চা হয়েছে আপনার, সেটা বুঝছেন তো?"

মহেশ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ফিরিলেন।

সুমন্ত আগাইয়া সামনে আসিল, অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে বলিল—"আপনার নিজের কোন পুকুর টুকুর আছে কি কাকা

মশাই? তা হলে এই যে মাছগুলো ধরা হবে, রতনকে মাপ দিলে সেই মাপের মাছগুলো না হয় সেই পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আসব এখন।"

কি মহানুভবতা—

কিন্তু এ মহানুভবতার মূল্য মহেশ দিলেন না। মুখখানা অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া বলিলেন—"থাক্, ঢের করেছো বাবাজি—আর তোমার এ ভদ্রতায় দরকার নেই।"

সপুত্র মহেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

১৭

মাছ বিক্রয় করিয়া টাকা উঠিল মন্দ নয়। সুমন্ত টাকার হিসাব করিয়া বাক্সে তুলিয়া পাঁচটা টাকা ও একটা মস্ত বড় রুইমাছ লইয়া মহেশ রায়ের দরজার নিচে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল—"কাকামশাই—কোথায় গো?"

ভিতরে থাকমনির কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"দরজাটা ঝট করে বন্ধ করে দে মোহিনী, আমি ও পাষণ্ডটার মুখও দেখতে চাইনে।"

দাসী মোহিনী দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া দেখিল—ততক্ষণে সুমন্ত দরজার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কুণ্ঠিত-কণ্ঠে সে বলিল, "মা যে দরজা বন্ধ করতে বললেন ছোটবাবু—"

বিকৃতকণ্ঠে সুমন্ত বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দরজা বন্ধ না কচু। তুমি সরে যাও মোহিনী, আমি নিজেই একবার কাকীমার সঙ্গে কথা বলি।"

উঠানে ধপাস করিয়া সে মাছটাকে ফেলিয়া দিল। সেই শব্দে থাকমনি রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইলেন। সুমন্ত মোহিনীকে হাতে জল দিতে আদেশ করিল। হাত ধুইয়া নিজের ট্যাঁক হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া বারাণ্ডার ধারে রাখিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিল, "মাছটা নিয়ে এলুম কাকিমা, সের চার পাঁচ হবে মনে হয়—তোমরা খেয়ো, তা হলেই আমার কষ্ট সার্থক হবে।"

মাছ দেখিয়াও কাকিমা গলিলেন না, নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, "মাছ আমরা কি করব বাছা, বিশেষ অত বড় মাছ আমার খাবে কে? ও তুমি নিয়ে যাও সুমন্ত, আমি নেব না।"

সুমন্ত দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল—"উঁহু, তা আর হতে পারে না কাকিমা, যা এনেছি, তা আর ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। এই রইলো পাঁচটা টাকা, আজ মাছ বিক্রী করে যা পেয়েছি, তা হতে কাকামশাইয়ের খরচটা দিয়ে গেলুম।"

"কাকামশাইয়ের খরচাটা কি?"

তাঁহার কথার ভাবেই বুঝা গেল—পুষ্করিণীতে মাছের ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এখনও তাঁহার কানে আসে নাই। মহেশ সকালে বাড়ি ফিরিয়াই বারাসতে উকিলের পরামর্শ লইয়া নালিশ করিতে গিয়াছেন, ব্রজসুন্দর গ্রামে সাক্ষী যোগাড়ের চেষ্টায় গিয়াছে, থাকমনিকে কেহ কোন কথা জানাইয়া যায় নাই।

সুমন্ত বলিল, "ওই যে তিনি নালিশ করতে গেছেন না, তার খরচপত্র আছে তো—রেলভাড়া বাবদ দিয়ে গেলুম, তাঁকে দেবেন।"

থাকমনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন—"কিসের নালিশ, কার নামে নালিশ?"

"সে সব শুনবেন, কাকামশাইয়ের কাছে—" বলিয়া সুমন্ত বিদায় লইল।

ইহারই ঘণ্টা দুই তিন পরে ব্রজসুন্দর ফিরিল। বাড়ি টাট্‌কা ভাজা মাছের সুগন্ধে তখন ভরিয়া উঠিয়াছে।

পেটুক ব্রজসুন্দর হাত পা ধুইয়া রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ডাকিল, "চমৎকার গন্ধ বার হয়েছে মা, একখানা দিতে পারো?"

থাকমনি একটা ছোট ডিসে করিয়া খান তিন চার ভাজা মাছ দিয়ে গেলেন, ব্রজসুন্দর দুই মিনিটের মধ্যে সেগুলি প্রায় নিঃশেষ করিয়া তারিফ করিল, "চমৎকার মাছ, কিন্তু পেলে কোথায় এত বড় মাছটা?"

থাকমনি আত্মপ্রসাদে হাসিলেন, বলিলেন, "ওই যে কথায় আছে না—কপালে যদি থাকে, যেমন করেই হোক হরিণ ঠিক আসবেই, তাকে ধরার জন্যে কষ্ট করে আর বনে যেতে হবে না। এ মাছও হয়েছে তাই, পুকুর ছেড়ে লাফিয়ে এলো বাড়িতে—পুকুরে আর ওরা থাকবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে!"

ব্রজসুন্দর বলিল, "দেখি আর দুখানা—মাছটা বড় বলেই মনে হচ্ছে,—ক্ষিধেও বড় ভীষণ লাগছে কি না—"

থাকমনি আর দুখানা মাছ পুত্রের বাটিতে দিলেন—

ব্রজসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কথা বল না মা, মাছটা পেলে কোথায়?"

থাকমনি উত্তর দিলেন, "সুমন্ত দিয়ে গেল কি না—মস্ত বড় মাছ, সের আণ্টেক হবে মনে হয়—"

"সুমন্ত দিয়ে গেছে!—"

মুহূর্তে মাছের স্বাদ ব্রজসুন্দরের মুখে তিক্ত হইয়া গেল. সে মাছ ফেলিয়া দিয়া সগর্জনে বলিল, "রাম কহো, এ যে সেই গল্পের মত করলে মা—যার ধন তারে খাওয়ালুম, এই দেখ মোর কলা—তোমার পুকুরের মাছ জোর করে ধরিয়ে তোমাকেই খেতে দিলে রাসকেলটা—"

কড়ার মাছ নাড়িতে ভুলিয়া গিয়া থাকমনি খুন্তি হাতে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন—"ওমা, তুই বল্‌ছিস কি ব্রেজো—"

ব্রজসুন্দর হাত মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "আর ব্রেজো—আমাদের দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে কি না সব মাছ ছেঁকে তুলে নিয়ে বিক্রী করলে। আজ জোর করে বলে—ও পুকুর নাকি তার বাবার, আমাদের তাতে বিন্দুমাত্র অধিকার নেই—?"

থাকমনি দুম্ করিয়া কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া সুমন্তের সন্ধানে বাহির হইলেন। এ অপমানের প্রতিশোধ লওয়া চাই-ই—হয় এস্পার নয় ওস্পার।

সুমন্তের ঘরে চাবিতালা বন্ধ, ভিতরের দিকে দিবাকর রন্ধনের যোগাড় করিতেছে।

থাকমনি ফিরিয়া আসিবার মুখে দেখিতে পাইলেন, সুমন্ত ফিরিতেছে—তাহার সঙ্গে রহিয়াছে ওস্তাদ মোহন। সুমন্ত এইমাত্র বাহির হইয়াছিল, কি একটা জিনিস ভুলিয়া ঘরে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাই লইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতেছে।

প্রথম দর্শনেই থাকমনি চেঁচাইলেন—"যত সব ছোটলোকের সঙ্গে মিশে মিশে মনও হয়েছে ছোটলোকের বাড়া। বলি, একেবারেই অধঃপাতে গেছিস সুমন্ত—গুরু লঘু কোন জ্ঞান নেই—আবার আমায় ঠাট্টা,—আমি না তোর কাকিমা হই? ওই যে, কথায় বলে না—

অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে—
অতি ছোট হয়ো না, ছাগলে মুড়িয়ে খাবে—;

এ হয়েছে তাই, অতি বাড় বেড়েছিস, ঝড় এলো বলে—গোড়া সুদ্ধ লুটিয়ে পড়তে হবে মনে রাখিস।"

স্থূলাঙ্গিনী থাকমনি এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

ছোট নয়হাতি শাড়ি—যেখানা পরিয়া তিনি রাঁধেন, সেই-খানিই তাঁহার পরণে রহিয়াছে—অঞ্চল কোমরে জড়ানো, খুন্তি-খানা তখনও তাঁহার হাতে, বেশ অতি অপূর্ব।

সুমন্ত পুলকের দৃষ্টিপাতে তাঁহাকে দেখিয়া লইয়া বলিল, "আপনি এখন ঘরে যান কাকিমা, আপনার সঙ্গে আমার পরে দেখা হবে, তখন কথাবার্তাও হবে।"

থাকমনি জোর করিয়া বলিলেন, "না, আমি যাব না সুমন্ত, আমি—"

সুমন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আপনি বললেও আমি শুনতে বাধ্য নই, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি জোর করে আমায় শুনাতে পারেন না। আমার এখন ভারি তাড়াতাড়ি, অসুখে সেবা করতে হবে—দাঁড়ানোর সময় আমার নেই।"

থাকমনির পাশ দিয়া সে সোজা ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া অগ্রসর হইল।

থাকমনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ফাঁকি দিয়ে আমার সর্বনাশ করছিস, অথচ কথা বলতে গেলেও কানে নিবি নে। আমি এখনও বাসি মুখে জল দেই নি সুমন্ত, তোকে শাপ দিচ্ছি—তোর সর্বনাশ হবে—একেবারে সর্বনাশ হবে—"

সুমন্ত ফিরিল, তাহার মুখে শান্ত হাসির রেখা, দুখানা হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, কি বলব কাকিমা, আপনার এই আশীর্বাদরূপ শাপ দেওয়ার জন্যে আপনার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটি তো সহজ সম্ভব নয়, পায়ে হাত দিতে গেলে হয়তো পুরস্কার পাব এক পদাঘাত—আর সেটা নিতে আমি মোটেই রাজী নই। যাই হোক, এখান হতেই প্রণাম করলুম কাকিমা, কিছু মনে করবেন না। ওই যে সর্বনাশের কথাটা বললেন, সত্যি আমার ওকে বড় ভালো লাগে—লোকে যাতে ভয় পায়, আমার তাতেই হয় আনন্দ—চিরকাল এ তো দেখে আসছেন, আমার কে-ই বা আছে বলুন, কে সর্বনাশের ভয়ে কাঁদবে? একেবারে বেপরোয়া—একেবারে মরিয়া—একেবারে সৃষ্টিছাড়া। ওই সর্বনাশটাকেই ভালোবাসি কি না, তাই যে কেউ আমার সর্বনাশ হবে বললে আমার ভারি আনন্দ হয়।"

সে অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "এসো হে মোহন, আগে মনি-অর্ডারটা করে আসি। কাল আবার রোববার কি না, আজ একটার মধ্যে টাকাটাকে পাঠিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

আবার সে থাকমনির দিকে তাকাইল। বলিল, "আজ আপনার বোনঝির টাকাটা পাঠাচ্ছি কাকিমা—বাপ, কি তাগাদাই লাগিয়েছে। ভদ্রলোকের মেয়ে যে কাবুলীওয়ালা হয়, তাগাদা করে, তা জানতুম না। অবিশ্যি আমি যদি ভালো থাকতুম—ওই দজ্জাল মেয়ের একটি পয়সা আমি নিতুম না, দিবা জানে না বলেই নিয়েছে।"

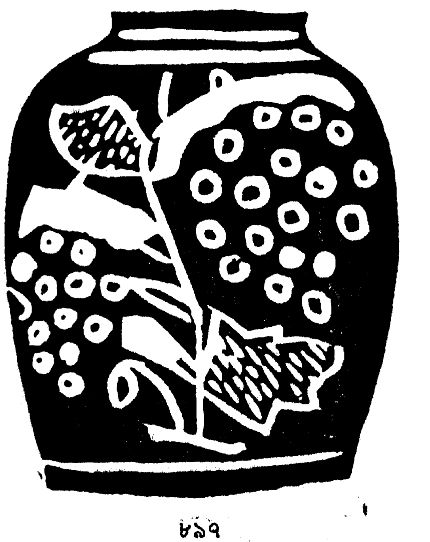
কথাটা গায়ে বাজিল, থাকমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "দজ্জাল মেয়ে?"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সুমন্ত বলিল, নয়? "বাবাঃ, অমন পুরুষ প্রকৃতি মেয়ে আমি জীবনে কোনদিন দেখি নি, যেমন চালচলন, তেমনই কি কথাবার্তা—"

থাকমনি কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

আর কথা বলিলে কথা বাড়িবে মাত্র, তাই তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন।

(ক্রমশ)



সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

(২)

সাধারণ বিশ্বাস, সম্রাট আওরংজেবের উগ্র ধর্মান্ধতার ফলে মোগল চিত্রকলা নষ্ট হয়েছিল, একথা আংশিক সত্য হ'লেও সম্পূর্ণ সত্য বলা চলে না। সম্রাট আওরংজেব এই মৃতপ্রায় চিত্রধারাকে কোন নূতন উৎসাহ দেন নি। কিন্তু সম্রাটের উপেক্ষাই অনতিকাল মধ্যেই মোগল চিত্রের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনেছিল। একথা খুবই সত্য যে, পূর্ববর্তী বাদশাহদের আশ্রয়ে চিত্রকরদের যে সম্মান ও আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, তুলনায় আওরংজেবের কালের চিত্রকরদের অনেক দিক দিয়ে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলেও চিত্র-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আওরংজেবের উপেক্ষা খুব বেশী ক্ষতিকর হয়নি। দরবারের আশ্রয় হারিয়ে মোগল চিত্রকলা অপেক্ষাকৃত সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হ'ল। চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিল, অনেকদিন পর্যন্ত মোগল চিত্রকরদের জগৎ, প্রাসাদ ও প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রচ্যুত হওয়ার ফলে মনে হয়, চিত্রকররা যেন প্রথমে স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু, অর্থাৎ বস্তু রূপকে দেখলে।

অনেকগুলি পরিবর্তন এবং নূতন বৈশিষ্ট্য চিত্রের মধ্যে দেখা দিল, বর্ণের দীপ্তির প্রতি আগ্রহ কমল, তার পরিবর্তে আলো ছায়া অন্ধকার রাত্রের রূপ চিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেল। এ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্র থেকে মোগল চিত্রকররা গ্রহণ করেছিলেন, প্রধানত বস্তুরূপ (form and motive)। মূলত engraving থেকে এই সব motive গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইজন্য বর্ণের প্রয়োগ রীতি বা অন্য কোন ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য মোগল শৈলীর মধ্যে প্রভাব ফেলে নি। বর্ণের ব্যবহার পদ্ধতি চিত্রের গঠনকৌশল ছিল সম্পূর্ণ চিত্রকরদের নিজস্ব। ক্রমে সাজাহানের কালে form and motive অপেক্ষা ইউরোপীয় perspective এবং বিশেষভাবে প্রাকৃতিক বর্ণের অনুকরণ দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রাকৃতিক বর্ণের অনুকরণ চেষ্টার ফলে চিত্রকররা আকাশকে একটা ভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশ করবার চেষ্টা করলেন। এইভাবে আকাশ বিশেষভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা আওরংজেবের কাল থেকে আরও স্পষ্ট। এই বিশেষভাবে আকাশকে চিত্রিত করবার চেষ্টা পূর্বে দেশীয় চিত্রের মধ্যে ছিল না। দেশীয় আদর্শে কাগজের বা চিত্রের পটভূমির মধ্যে যে অংশে বস্তু নেই, সেই অংশ আকাশ নির্দেশ করে: অপর দিকে আকাশের স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেখানর চেষ্টা প্রাচ্য শিল্প-সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ; এখানে ইউরোপীয় চিত্রকরদের ভাষায় atmosphere, effect-ই আকাশের গুণ (quality), অর্থাৎ বলা চলে, দেশীয় ছবিতে Surface-ই ক্ষণে ক্ষণে বর্ণবৈচিত্র্যময় আলোকের যবনিকার মত দেখা দেয়, আবার বস্তুই যে সেই যবনিকার সামনে দাঁড়ায়। এখানে Surface আকাশ। যেমন



আকবরের দরবারের শিল্পী অঙ্কিত একটি সামাজিক উৎসবের ছবি

পারস্য চিত্রের বর্ণোজ্জ্বল পটভূমি আকাশকে প্রকাশ করেছে বলতে পারি। পুরানো রাজপুত চিত্রের পটভূমি ইউরোপীয় শিল্পের সংস্পর্শে এসে যখন থেকে Surface-এর পরিবর্তে আকাশকে দেখাবার চেষ্টা করেছে, তখন থেকে ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট বলে ধরা চলে। এখানে বস্তুর সঙ্গে তার পটভূমি (Surface)র সম্বন্ধ। কেবল ভারতীয় চিত্রে নয়, সমগ্র প্রাচ্য-চিত্রের আধুনিক ইতিহাসে যেখানে Surface-এর পরিবর্তে আকাশের গুণ (quality) দেখা দিয়েছে, তখন থেকে নিঃসঙ্কোচে শিল্প-সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় প্রভাবান্বিত বলা চলে।

পরবর্তী মোগল চিত্রে আকাশ এবং আলোছায়ার খেলা দেখাবার চেষ্টা খুবই হয়েছিল। সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তু এবং ইউরোপীয় অঙ্কনকৌশলকে আয়ত্ত করবার আগ্রহের ফলে কিছু কালের জন্য এই সব চিত্রকরদের মধ্যে নূতন ভাবাবেগ জেগেছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রাধান্য সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে ছবি করবার আগ্রহ এবং আমীর-ওম্‌রা ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি ইত্যাদির চাহিদা হওয়ায় ক্রমে সাধারণ জীবনের খুব নিকটে থেকে এই সব চিত্রকররা দেখতে পেরেছিলেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে এই ভাবধারা সংস্কারে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই সময়ের মোগল দরবারী চিত্র বৈচিত্র্যময় লোকরঞ্জক চিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মোগল চিত্র সংস্কৃতির মধ্যে কারিগরি প্রধান হ'য়ে উঠেছিল। করণ-কৌশলের জটিলতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রকরদের প্রধান লক্ষ্য হ'য়ে উঠেছিল।

অভিনবত্ব আনবার মত কোন নূতন প্রতিভা এই সব চিত্রকর-দের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। রাষ্ট্রীয় অশান্তির মধ্যে তখনও যারা চিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের কাছ থেকে এমন কোন নূতন চাহিদা আসেনি, যার দ্বারা চিত্রকরদের সামনে কোন নূতন সমস্যা উদয় হ'তে পারে। মোগল চিত্রের অপূর্ব বর্ণবিন্যাসের কৌশল প্রায় নষ্ট হ'য়ে এসেছিল, পরিবর্তে আলোছায়ার জটিলতা এই সময়ের ছবিকে একেবারে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। চিত্রের এই দুর্গতি সম্ভবত তৎকালে শিল্পীদের চোখেও পড়েছিল। কারণ তারই প্রতিক্রিয়ারূপে মহম্মদসার কালে ছবির মধ্য দিয়ে বর্ণের উজ্জ্বলতাকে ফিরিয়ে আনবার ক্ষীণ চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রের অব্যবস্থিত অবস্থার মধ্যে এই চেষ্টা স্থায়ী হ'তে পারে নি। এতকাল পর্যন্ত শক্তিশালী মোগল সম্রাটদের কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইউ-রোপীয় সংস্কৃতি কৌতূহলের বস্তু ছিল। নিজেদের শক্তি ও সংস্কৃতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকায় পৃষ্ঠপোষক ও চিত্রকর কারুরই মনে বিদেশীয় সংস্কৃতিকে অনুকরণ করার প্রশ্ন জাগে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মোগল দরবারের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল। সেই জন্যই ভারতের একাধিক স্থানে মোগল দরবারের তৈলচিত্রের অনুকরণ আমরা দেখি।

আকবরের কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউ-রোপীয় চিত্রকলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।—

ইংরেজের রাষ্ট্রীয় অধিকারের অনতিকাল মধ্যে শিল্পকলার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত ও অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে দেখা দেয়। সাক্ষাৎভাবে ইংরেজের স্বার্থবুদ্ধি দেশীয় কারুশিল্প কিভাবে নষ্ট করেছিল, সে ইতিহাস নূতন ক'রে উল্লেখ করার প্রয়োজন এখানে নেই। মোগলের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে মোগল চিত্র-ধারার অবসান ঘটেছিল বলা চলে, তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষের নানা স্থানে রূপকলার সংস্কৃতি অটুট ছিল। এবং সমগ্রভাবে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের শিল্প-প্রতিভা তখনও লোপ পায় নি। ইংরেজ যেভাবে দেশীয় কারুশিল্পের উৎখাতের চেষ্টা করেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রূপকলার ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এই ঔদাসীন্য এবং তারি সঙ্গে ঠিক সেইভাবে না হ'লেও ভারতীয় সংস্কৃতিকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। মিশনারীরা যখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁদের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তার থেকে আমরা এই মনোভাবের কিছু পরিচয় পাই।



আকবরের আমলে পুস্তক চিত্রাঙ্কণ

হীন প্রতিপন্ন করবার এই চেষ্টা ইংরেজ আমাদের মধ্যে যতদূর জাগাতে পেরেছিলেন, সেই পরিমাণে দেশীয় শিল্প, রূপ-কলা এবং বহু পরিমাণে দেশীয় সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইংরেজী সভ্যতার আগমনের পরে চিত্রকরদের মধ্যে কতকগুলি নূতন উপকরণের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। যে সব নূতন ব্যবহারিক উপকরণ ইংরেজদের কাছে আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে তৈলবর্ণের ব্যবহার দেশীয় চিত্রকরদের মধ্যে প্রথম প্রবর্তিত হয়। ইউরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দ্বারা মোগল-শৈলী ধীরে ধীরে কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত (১৭১২) কোন ইউরোপীয় চিত্রকর এদেশে পদার্পণ করেন নি। এই প্রথম আগন্তুক ইংলণ্ডীয় চিত্রকরদের দ্বারাই তৈল-বর্ণের ব্যবহার ও বিলাতী ধরণে প্রতিকৃতি অঙ্কনের মনোভাব দেখা দেয়। তৈলবর্ণের ব্যবহার ছাড়া গত শতাব্দীর প্রথমদিকে মিশনারী-দের সাহায্যে দেশীয় কারিগরদের মধ্যে Steel engraving, Wood engraving ও Lithograph, (১৮২২-এর মধ্যে এগুলি প্রচলিত হয়)—এই কয়টি নূতন ব্যবহারিক উপকরণ আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। নূতন উপকরণ ব্যবহারের চেষ্টায় এক বিশেষ শ্রেণীর ছবি এই সময়ে আমরা পাই, যা সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে একান্ত-ভাবে যুক্ত। আমরা দেখেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে ইউরোপীয় চিত্রকরদের গতায়াত সুরু হয়। অনতিকাল মধ্যে বহু ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় চিত্রকর এদেশে আসেন। এই সকল চিত্রকরদের অঙ্কিত সমসাময়িক ভারতীয় জীবনযাত্রার ছবি ভারতীয় শিল্পের অন্তর্ভুক্ত না হ'লেও আমাদের কাছে একটি বিশেষ মূল্য

আছে। প্রধানত এই ছবিগুলির মধ্য দিয়েই তৎকালীন বহু সামাজিক ঘটনা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার পরিচয় পওয়া যায়। সেইজন্য এই ছবির প্রধান মূল্য ইতিহাসের দিক দিয়ে। রূপ সৃষ্টি হিসাবে যদিও পরবর্তী যে সকল ইংরেজ-চিত্রকর এদেশে এসেছিলেন তাঁদের তুলনায় পূর্ববর্তী চিত্রকরদের রচনা বহুগুণে আন্তরিকতাপূর্ণ। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ এই যে, প্রথম দিকের চিত্রকররা জনসাধারণের মধ্যে যত সহজে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, পরবর্তী ইংরেজ বা অন্যান্য বিদেশীয় চিত্রকরদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

বিদেশীয় ব্যবহারিক উপকরণ প্রবর্তনের ফলে আমাদের চিত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল দেখা যায়। চিত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, কোন নূতন অঙ্কনরীতি বা কোন নূতন উপকরণ ব্যবহারের চেষ্টার দ্বারা চিত্রের রূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ইউরোপে যখন তৈলবর্ণের ব্যবহার প্রচলিত হ'ল, তখন ঠিক এই কারণে অর্থাৎ কেবলমাত্র ভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের ফলে চিত্রের মধ্যে অপ্রত্যাশিত রূপ-পরিবর্তন ঘটেছিল। চিত্র এবং সকল রূপকলার মধ্যে ব্যবহারিক উপকরণের ছাপ এবং নূতন কৌশলের প্রবর্তন আশ্চর্যরকমে চিত্রের রূপকে বদলেছে, তার বহু উদাহরণ দেওয়া চলে। এদেশে প্রথম দেশীয় engraver-দের দ্বারা অলংকৃত বইয়ের উদাহরণ যা আমরা পাই, বা তৎকালীন তৈলবর্ণ অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে যে একটি বিশেষত্ব ছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ, নূতন ব্যবহারিক উপকরণের প্রয়োগ। এই সকল চিত্রকর বংশানুক্রমে কারিগরশ্রেণীর মধ্য থেকে এসেছিলেন। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সকল কারিগর বা চিত্রকর বিলেতী ব্যবহারিক উপকরণের সাহায্য নিয়েছিলেন, তাঁদের রচনার প্রতি অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পড়েনি। সামাজিক মর্যাদা না থাকায় তৎকালীন মার্জিত সমাজে এ-সব কারিগরদের স্থান মেলে নি। প্রায় একই কারণে জাপানে "টোকিও" স্কুলে কাঠের খোদাই ছাপা ছবি সমকালীন জাপানে সম্ভ্রান্ত সমাজে আদর পায় নি। কিন্তু সমসাময়িক চিত্রের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে যেমন এগুলির মূল্য, তেমনি রসের বিচারে এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করতে গেলে দেখা যায়, ইউরোপীয় প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে এবং ভিন্নরূপে এই সকল ছবির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মোগল শৈলীর মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাব দেশীয় ব্যবহারিক উপকরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছিল। আধুনিক কালে আমরা দেখি, ইউরোপীয় ছবির অপেক্ষা ইউরোপীয় ব্যবহারিক উপকরণের প্রভাব চিত্রের রূপ বদলিয়েছে। মোগল যুগের গতানুগতিক শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রকররা যেমন অনুকরণের চেষ্টা সত্ত্বেও ইউরোপীয় আদর্শে অন্ধ অনুকারক হ'য়ে ওঠেন নি, চিত্র প্রাণহীন হ'লেও তার বাইরের রূপ স্বতন্ত্র ছিল, তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বংশানুক্রমিক কারিগররা যখন নূতন ব্যবহারিক উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন, তখন এই নূতন উপকরণের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত হ'ল, তারও বাইরের রূপ রইল দেশীয়। উভয় স্থলেই আমরা দেখি, সংস্কারগত শিক্ষা দুই দলকে একেবারে অন্ধ অনুকারক হ'তে দেয়নি।

প্রথম দিকের দেশীয় steel engravingএর মধ্যে চোখে পড়ে ইউরোপীয় perspective এবং বিলেতী engraving থেকে বস্তুরূপ গ্রহণ। কিন্তু দেশীয় সনাতন রীতিতে ছবির বাঁধুনি এবং ছবির আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে। মোগল যুগে বাঁধা সংস্কৃতির মধ্যে এসেছিল ইউরোপীয় প্রভাব। যার ফলে মোগল-শৈলী ইউরোপীয় করণ-কৌশল অনুসরণ করবার চেষ্টা এসেছিল। কিন্তু সনাতন শিক্ষার প্রভাবে একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করেনি। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর কারিগররা করণ-কৌশল পেলেন বিদেশী, কিন্তু সেই কৌশল ব্যবহার করলেন অত্যন্ত দেশীয় রূপ প্রকাশের জন্য। ফলে একস্থানে পরবর্তীকালের মোগল চিত্র এবং গত যুগের কারিগরদের অঙ্কিত তৈলচিত্র বা খোদাই কাজের মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। ভিন্ন প্রকারের হ'লেও দুই-ই ইউরোপীয় প্রভাবান্বিত লোকরঞ্জক চিত্রের পর্যায়ভুক্ত। যদি এই দুই ভিন্ন শৈলীর রচনার মধ্যে তুলনা করা যায়, তবে আমরা দেখতে পাব যে, ইউরোপীয় প্রভাবান্বিত মোগল-শৈলীর চিত্রের চেয়ে এই সকল কারিগরদের কাজ অনেক দিক দিয়ে হৃদয়গ্রাহী। ক্রমে মিশনারীদের আশ্রয় হারিয়ে এই সকল কারিগর একেবারে সাধারণের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। কলিকাতায় সস্তা জনপ্রিয় পুস্তক পঞ্জিকার চিত্র এবং দুই এক স্থানে লোকরঞ্জক ছবি করে কিছুকাল এইসব কারিগররা জীবিকা অর্জন করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত আমরা দেশীয় চিত্রকলার পরিচয় থেকে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে পারি। আমরা দেখতে পাই, এই সময় লোক-চিত্রের (popular painting) যুগ। পারিপার্শ্বিক ঘটনা রাষ্ট্রীয় অশান্তির ফলে চিত্রকররা কোন নির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষকের আশ্রয়ে অধিককাল থাকতে পারেনি। বারংবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আশ্রয় পেয়েছিল। এইজন্য দীর্ঘকাল এই সকল কারিগরদের চিত্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে রচিত হয়েছিল। ক্রমে printing press বিলাতী print এবং বিশেষভাবে ইংরেজী শিক্ষার মনোভাবের পরিবর্তন হওয়ার ফলে লোক-শিল্পী হিসাবে এদের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ল। জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হওয়ার এবং নূতন জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টার অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তনে সমাজ থেকে এই শ্রেণীর চিত্রকর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। অন্যদিকে যে মুষ্টিমেয় দরবার চিত্রকরের দল শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট আশ্রয় হারায়নি তাদের বংশধরদের দিল্লী, জয়পুর এবং রাজপুতনার নানাস্থানে এখনও দেখা যায়।

এইসব চিত্রকরদের রচনার মধ্যে রসের দিক দিয়ে বা ওস্তাদের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। সমসাময়িক চিত্র সংস্কৃতির মধ্যে এ'দের কোন প্রভাব দেখা যায় না। বহির্জগতের সঙ্গে মেলবার সুযোগের অভাবে এবং সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ না থাকায় East Indian Company'র কারীগরদের মধ্যে যেটুকু ব্যক্তিত্ব ছিল সে শক্তিও এরা বর্তমানে হারিয়েছে। প্রধানত বিদেশী পর্যটকদের জন্য পুরাতন ছবির নকল করে এবং কোন কোন স্থানে লোকরঞ্জক ধর্মবিষয়ক ছবি এঁকে এরা জীবিকা অর্জন করে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশে ইউরোপীয় শিল্প-বস্তু ধনী-বিলাসী সমাজের মধ্যে দেখা দেয়। বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে বিলাতী গৃহসজ্জা তৈলচিত্র এবং বিরাট আকারের আয়না যে ধনীগৃহে স্থান পেয়েছিল, তার কারণ ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব বলা চলে না। এদেশে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ধনীরা ইউরোপীয় গৃহসজ্জা তথা ইংলণ্ডীয় fashion গ্রহণ করেছিলেন। এই সকল ধনী সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্য দিয়ে কিছু ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ছাপ আমরা পাই—যদিও এই ছাপ সেই সময় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে মিশনারীদের এবং দেশীয় চেষ্টায় ইংলণ্ডীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আরও নিকট সম্বন্ধ হয়। কিন্তু সত্যকারের আমাদের মধ্যে ইংরেজী সংস্কৃতির প্রভাব এসেছে তৎকালীন শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত ভারতবাসীর মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান পরলোকগত রাজা রবি বর্মা। (১৮৪৮—১৯০৬) রাজা রবি বর্মা জীবিতকালে যেমন অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, মৃত্যুর অনতিকাল মধ্যে তাঁর সে খ্যাতি অনেক পরিমাণে ম্লান হয়ে এসেছে। তাঁর সম্বন্ধে অতি দ্রুত মত পরিবর্তনের কারণ পাওয়া কঠিন নয়। যুগসন্ধিক্ষণে রবি বর্মার আবির্ভাব। একদিকে নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে তখন পারিপার্শ্বিক আর কিছু দেখবার অবকাশ আমাদের ছিল না। এই নূতন সভ্যতা যেমন আমাদের নূতন পথের নির্দেশ

(শেষাংশ ৯০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অধঃপতন

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারই হইয়াছে। ভয় নাই, আপনাদের নহে! পাতাটা উল্‌টাইয়া খুব ভালো করিয়াই আবার দেখিলাম, না, ভুল করি নাই। লেখিকা শ্রীমতী চন্দ্রাবলী দেবীই! আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু না ঃ কিছুতেই পারিতেছি না, মনে হইতেছে কে যেন আপাদমস্তক আমাকে আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া সরু লিক্‌লিকে একটা লম্বা চাবুক দিয়া অনবরত চাবকাইতেছে, প্রত্যেকটি আঘাত আমার শরীরে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছে।

আর পারিলাম না, পত্রিকাটা বন্ধ করিয়া বসিলাম।

আপনারা হয়তো কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। না পারাই স্বাভাবিক, বুঝিতে হইলে ইহার পূর্বইতিহাসটা জানিতে হয়। নিচে জানাইতেছি।

আই এ পাশ করিয়া সেবার সরকার বাহাদুরের সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। তখন রীতিমত গোঁফ কামাইতে আরম্ভ করিয়াছি। শিশু সাহিত্যের ধনুর্ধর লেখকদিগের 'এ্যাড-ভেনচার' উপন্যাস পড়িয়া রাত্রির অন্ধকারে পিঠের উপরে ব্যাগ ফেলিয়া এবং বুকে 'ফ্লাস্ক' ঝুলাইয়া বাঘা কুকুরটার গলার চেন ধরিয়া প্রায়ই বাহির হইবার সংকল্প করিতেছি। (বলা কি যায়, আমিই হয়তো মহীশূরে স্টেটের এদিকে কোথাও একটা সোনার-খনি আবিষ্কার করিয়া ফেলিব একদিন!) হঠাৎ এই সময়েই আমার ডাক পড়িল ওয়াজিরিস্তানে, একেবারে সীমান্ত প্রদেশে। বাবা ও মাকে কাঁদাইয়া, ভাই এবং বোন্‌দের চোখ মুখ ম্লান করিয়া 'ওয়ারলেশ অপরেটার' হইয়া ভারতের আর এক প্রান্তে পাড়ি জমাইলাম। একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না—কি অনন্ত দুঃখসাগরে আমি ঝাঁপ দিতেছি!

কথাটা একটু খুলিয়া বলা ভালো। চাকুরী লইয়া বিদেশে রওনা হইবার পূর্বে আমি একটু আধটু কবিতা লিখিতাম, (কোন্‌ বাঙালীর ছেলেই বা লিখেন না বলুন?) আর আমার শয়নে স্বপনে একমাত্র সঙ্গী ছিলো বই—অবশ্য তাহার অধিকাংশগুলিই বাঙলার খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী চন্দ্রাবলী দেবীই লিখিয়া-ছেন। সত্যকথা বলিতে কি চন্দ্রাবলী দেবীর লেখা পড়িয়া আমি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়াছি, কতদিন যে আমার উপাধান ভিজিয়া ভিতরের তুলা শক্ত হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই! তাঁহার মতো আমি আর কাহাকেও লিখিতে দেখি নাই। চাকুরীর ডাক পড়াতে সেই জন্যই আমার সব থেকে দুঃখ হইয়াছিল তাঁহার নব প্রকাশিত পুস্তকগুলি আর পড়িতে পারিব না বলিয়া। কিন্তু উপায় নাই। চাকুরীর কাছে মা-ও নাই বাপও নাই—তা'র তুচ্ছ লেখিকা চন্দ্রাবলী দেবী।

চলিয়া গেলাম। কয়েকটা মাস যে আমার কি করিয়া কাটিল তাহা স্মরণ করিলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। আমাদের দলে আমরা মাত্র দুইজন বাঙালী ছিলাম। এক আমি আর একজন যশোহর জিলার ভদ্রলোক, নাম—কালিকিঙ্কর বসু। বি এ পাশ করিয়া এই কাজ লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার পড়া-শুনার কোন বালাই ছিল না, সময় মতো ডিউটি সারিয়া আসিয়া চুপ চাপ পড়িয়া ঘুমাইতেন। একদিন কি কথায় কথায় 'বালজাক'এর প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, কালিকিঙ্করবাবু বলিয়াছিলেন, উনি তো ইটালীর একজন বড়ো বৈজ্ঞানিক ছিলেন, না নৃপেনবাবু?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আলুর দর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মানে এখানে আলু কি রকম পাওয়া যায় তাহাই আর কি!

যাক্‌, অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে, যাহা বলিতে চাই তাহা আর বলা হইতেছে না। দেখিলাম, চন্দ্রাবলী দেবীর বই আর আমার পড়া হইল না, এই সুদূর বিদেশে চন্দ্রাবলী দেবী দূরের কথা একখানা বাঙলা বইও চোখে দেখিবার উপায় নাই। ক্ষুণ্ণ মনে দিন কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো। টমসন্‌ বলিয়া একটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়া গেল। ছেলেটি আমাদেরই সমবয়সী এবং সহকর্মী। বড়ো ভালো ছেলেটি। তাহার সুটকেশ হইতে অনেক বই বাহির হইতে লাগিল। বাঙলা অভাবে তাহাই গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

ছোট গল্পের বইয়ের উপরেই টমসনের দেখিলাম খুব ঝোঁক। এক এক করিয়া আস্কার ওয়াইলড, শেকভ্‌, রোমানফ্‌, মোঁপাসাঁ, ও' হেনরী শেষ করিয়া ফেলিলাম। বেশ লাগিত গল্প-গুলি—আস্কার ওয়াইলড্‌ দুইবার পড়িয়া ফেলিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইহার মধ্যে অনেকটা সময় কাটিয়া গিয়াছে। প্রায় আট বৎসর। ঘটনাচক্রে পড়িয়া ইহার মধ্যে বাঙলা দেশে আমার আর আসা ঘটিয়া উঠে নাই। মাঝখানে মাস ছয়েকের ছুটিতে ইরাক বেড়াইতে গিয়াছিলাম টমসনের সহিত। ইহা ছাড়া আরো বহু জায়গায় ঘুরিয়াছি।

এবারে আর বাঙলা দেশে না ফিরিয়া পারিলাম না। বহু-দিন আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও দেখি নাই, আমাকে দেখিয়া সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

বহুদিন পরে বাঙলা খবরের কাগজ খুলিলাম। দেখিলাম 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি সাহিত্য সম্মিলন' হইতেছে। অনেক মনীষী সভায় বাণী দিবেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধও ছাপা হইয়াছে, তাহার বক্তব্য হইতেছে বাঙলা সাহিত্য সম্প্রতি আশা-তীত উন্নতি করিয়াছে—কবিতা, যাহা আমরা লিখিতেছি, তাহাতে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা ইউরোপের অতি আধুনিক কবিদেরও ধরিয়া ফেলিয়াছি—শুধু ধরিয়া ফেলি নাই, একেবারে তাঁহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিতেছি। গল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যেও তাহাই—কেবল যা নাটকটা লইয়াই আর কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে শীঘ্রই যে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনটা সত্যই বড় পুলকিত হইয়া উঠিল। আহা বাঙলা সাহিত্যের গৌরবে আমাদেরই তো গৌরব। নাই-বা হইল

আমার একটা লেখা প্রকাশিত—কিন্তু একদিন আমিও তো বাঙালী বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারিব ইহার জন্য!

পিওন আসিয়া ঝপাস করিয়া একখানা পত্রিকা জানালা দিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। উপরের কাগজ খুলিয়া দেখি চৈত্র মাসের 'বল্লকী'। বাবা পত্রিকাটি আজ বছর চারেক লইতেছেন।

পাতা উল্টাইয়া সূচীপত্র দেখিতে লাগিলাম। একটুখানি পড়িয়াই আনন্দে মন নাচিয়া উঠিল। একেবারে সকলের প্রথমেই গল্প লিখিয়াছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবলী দেবী। তাড়াতাড়ি গল্পটি বাহির করিলাম। ওঃ সেই চন্দ্রাবলী দেবী তাহা হইলে এখনও লিখিতেছেন! যাঁহার বই পড়িয়া কত রাত্রি হাপুস নয়নে কাঁদিয়াছি, যাঁহার বইয়ের নায়কের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া দেখিয়াছি কতোবার এবং রিভলবার লইয়া গুলী করিবার কথা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি—যাঁহার সৃষ্ট নায়িকাকে সত্য সত্যই অন্তর দিয়া ভালোবাসিয়াছি এবং আমি যে মেয়েটিকে বিবাহ করিব তাহাকে উক্ত নায়িকার মতো তৈয়ারী করিতেই হইবে—ইহা ভাবিয়া কতো বর্ষামুখর রাত্রি ভোর করিয়া দিয়াছি তাহা সব মনে পড়িয়া গেল। রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করিলাম।

গল্পটির নাম 'পাষাণের প্রেম'। গিলিতে লাগিলাম। কিন্তু এক জায়গায় আসিয়া নিদারুণ খট্‌কা লাগিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিলাম না। নায়িকার সঙ্গে নায়কের রেলের মধ্যে হঠাৎ দেখা হইয়া গিয়াছে। নায়ক নায়িকার সৌন্দর্যে এতখানি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে মুহূর্ত মধ্যে অচৈতন্য হইয়া একেবারে দড়াম করিয়া বেঞ্চির নীচে আছাড় খাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া চক্ষু কপালে তুলিলেন। ইহার পরের ঘটনা পড়িতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। কেবলি মনে হইতে লাগিল, কেহ যেন আমার হাত পা বাঁধিয়া নির্মমভাবে চাবকাইতেছে!

বুঝিলাম, আমি মরিয়াছি—অর্থাৎ আমার অধঃপতন হইয়াছে!

অর্থাৎ শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর লেখা আর আমি বুঝিতে পারিতেছি না—বোধশক্তি আমাকে চিরকালের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে!

ডাক ছাড়িয়া আমার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। একবার মনে হইল পিওনটা পুরণো অন্য একখানা মাসিক পত্র দিয়া গেল না তো? ভালো করিয়া আবার দেখিলাম, না, এই তো 'বল্লকী' চৈত্রমাস ১৩৪৮ সাল লেখা!

মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। বুঝিলাম টমসন সাহেবের বইগুলিই আমার মাথা খাইয়াছে!

আমার ঠাকুরদাদাকে মনে পড়িল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, ইংরেজি শিক্ষা আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে—আমাদের সব কিছুকে উহাই একদিন ধ্বংস করিবে। আমরা অধঃপাতে যাইব।

আজ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

ইচ্ছা করিতেছিল, যদি আজ আস্কার ওয়াইলড্, শেকভ, রোমানফ, মোপাসাঁ অথবা ও' হেনরী প্রভৃতির যে কোন একটাকে হাতের কাছে পাই তাহা হইলে মনের সুখে পায়ের পামসুটা খুলিয়া জুতাইয়া মুখটাকে লম্বা করিয়া দিয়া আসি—মানুষের সর্বনাশ কি মানুষে এইভাবেই করিয়া থাকে?

আজ আমার ঠাকুরদাদার পায়ে হাত দিয়া একবার বড় প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে, বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, সত্যিই আপনি দূরদর্শী।

কিন্তু উপায় নাই—ভদ্রলোক গত বছরে মরিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন।

বড়ই দুঃখ বোধ করিতেছি!

সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র

(৯০০ পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছিল, তেমনি একই সঙ্গে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, এমন সময় রবি বর্মার মধ্যে দেশবাসী এমন প্রতিভা দেখেছিলেন যা লক্ষ্য করে সে কালের অনুকরণধর্মী শিক্ষিত সমাজ অভিভূত হয়েছিলেন। তুলনা করে দেখবার মতন দেশবাসীর সামনে তখন কিছু ছিল না। ভারতীয় ভাস্কর্য, ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের চোখে অধিকাংশ স্থলে কুসংস্কারের প্রতীক মাত্র। মোগল চিত্রধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখন লোকরঞ্জক চিত্রের পর্যায়ভুক্ত মোগল চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং রাজপুত চিত্রধারা যদিও তখন অপেক্ষাকৃত জীবন্ত কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে। সেইজন্য রাজপুত চিত্রধারা সম্বন্ধে তখন অধিকাংশই একেবারে অজ্ঞ। কাজেই রাজা রবি বর্মার অবির্ভাব সে সময় একেবারে অভূতপূর্ব ঘটনা মনে হয়েছিল। শিক্ষিত সমাজের উপর তাঁর যে এতটা প্রভাব হয়েছিল তার কতগুলি কারণ আছে। (প্রথমত বিদেশী করণ-কৌশলকে তিনি যেভাবে আয়ত্ব করেছিলেন সমসাময়িকদের মধ্যে সে দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।) আরেকটি বিশেষ কারণে রাজা জনপ্রিয় হয়েছিলেন, সে সময় রবি বর্মার অঙ্কিত ছবি গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসাবে একটি সহজ স্থান পেয়েছিল। চিত্রকর হিসাবে রবি বর্মার স্থান ঠিক কিরূপ, বলা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে রবি বর্মা সম্বন্ধে অনুকূল আলোচনা কোথাও দেখা যায় না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ রবি বর্মার জনপ্রিয়তার আর একটি প্রধান কারণ। অর্থাৎ যারা বিলাতী ভাবাপন্ন ধনী, তাঁরা রবি বর্মার মধ্যে নিজেদের রুচির প্রতিধ্বনি পেয়েছিলেন, জনসাধারণ তাঁর বিষয়বস্তুর থেকে নিজেদের সংস্কারগত বিস্তর খোরাক পেয়েছিলেন, যুগপৎ এই দুই শ্রেণীর দর্শককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন বলেই নব্যশিক্ষিত ও প্রাচীনপন্থী দুই দিক থেকেই তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমকালীনদের তুলনায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকারকরূপে যাঁদের সে সময় আমরা দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে রবি বর্মা সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে দ্বিমত হওয়া উচিত নয়।

ক্রমশ

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বাস

যাদুকর—পি সি সরকার

কোন বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করা কিম্বা তদ্রূপ জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হওয়ার নাম 'বিশ্বাস' (Faith) কারণ মনোবিদ্‌গণ বলেন যে, আমরা জগতে যতকিছু করি, সমস্তই এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া। ইহা সংশয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবাপন্ন এবং ইহার সহিত ইচ্ছাশক্তির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়াই বিশ্বাস দ্বারা নানরূপ অদ্ভুত কার্য সম্পাদন হয়।

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূরে"। কোন বিষয়ের বাহ্যিক খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করিয়া তাহার সমস্ত কিছুর মীমাংসা করা যায় না। এরূপ স্থলে বিশ্বাসের ক্রিয়াই অধিকতর সুফল প্রদান করে। ডাক্তারগণ রোগীর ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া বলিয়া দেন যে "এই ঔষধে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে।" উহা রোগীর মনে বিশ্বাসের সৃষ্টি করে এবং সে বাস্তবিকই খুব ভাল ফল লাভ করে। পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে রোগীর গায়ে একপ্রকার কাগজের জামা পরাইয়া দেওয়া হয়। ঐ জামায় সর্বত্র তাহাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরাণ'এর কতকগুলি অংশ আরবী ও পারস্য ভাষায় লিখিত থাকে। উহাতেই তাহারা রোগমুক্তি লাভ করে। পবিত্র কোরাণের উপর তাহাদের অচল বিশ্বাস আছে বলিয়াই ঐরূপ সম্ভব হয়।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হ্যাকটুক (Hack Tuke) সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিশ্বাসের ফলে ঔষধের গুণও অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন যে, একবার একজন রোগী কোষ্ঠশুদ্ধির ঔষধের জন্য আসিলে, কম্পাউন্ডার ভ্রম করিয়া অহিফেন ও এন্টিমনী মিশ্রিত ঔষধ দেয়। এই ঔষধের গুণ অনুযায়ী খুব ঘাম ও ঘুম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আসলে উহা না হইয়া, রোগী যে জন্য ঔষধ খাইয়াছিল সেই ফল দিয়াছিল। ডাক্তারগণ তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনুরূপ বহু উদাহরণ দিতে পারিবেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিস্টার উডহাউস ব্রেন একটি চমৎকার ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একবার একজন মহিলা তাহার মাথার টিউমারের অস্ত্রচিকিৎসা করাইতে আসে। ডাক্তার ইথারের (ether) বোতলে হাত দিয়া দেখেন যে উহাতে বিন্দুমাত্র ইথারও নাই। নিঃশ্বাস লইবার যন্ত্রটিতেও অজ্ঞান করিবার ঔষধের কোনরূপ গন্ধমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না তিনি উক্ত ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া রোগীকে ঐ যন্ত্রের সম্মুখে মুখ লইয়া উহাতে গভীরভাবে নিঃশ্বাস টানিতে উপদেশ দেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে রোগিণী ঐরূপ ক্রিয়ার পূর্বে হইতেই একটু অভ্যস্ত হউক। কিন্তু কি আশ্চর্য, কয়েকবার নিঃশ্বাস টানিবার পরই সে চিৎকার করিয়া উঠিল "ও আমি বুঝিতেছি, আমি অজ্ঞান হইতেছি, আমি অজ্ঞান হইতেছি।" কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহার চক্ষু মুদিত হইল এবং সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পূর্বোক্ত ঔষধ (ether) তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, এদিকে রোগিণী গভীরভাবে অজ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া ডাঃ ব্রেন সর্জেনকে টিউমারে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নির্দেশ দেন। এইভাবে তাহাকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া একটি টিউমার কাটা হইবার পর, পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত একজন ভদ্রলোক বলিয়া উঠেন যে, 'সে শীঘ্রই জাগ্রত হইবে।' কি আশ্চর্য, তখন রোগিণী আস্তে আস্তে জাগ্রত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। এইবার ডাক্তার পুনরায় তাঁহার যন্ত্রটি হাতে লইয়া তাহার নাকের কাছে লইয়া যান এবং আবার বলেন, 'তুমি অজ্ঞান হইতেছ, শীঘ্রই আবার অজ্ঞান হইতেছ।' ইহাতে সে পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া টিউমার দুইটিই কাটা শেষ হয়। উক্ত রোগিণী পূর্বোক্ত যন্ত্র ও ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই বিশেষ অভিজ্ঞা ছিল বলিয়াই ঐরূপ সহজে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পূর্বে ইথার (ether) দ্বারা রোগিণীকে অজ্ঞান করা হইয়াছিল; সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই এই বিশ্বাস তাহার হইয়াছিল যে, ঐ ঔষধ ও যন্ত্র দ্বারা অজ্ঞান করা যাইবেই। এই গভীর বিশ্বাসের ফলেই ঐভাবে সম্মোহিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

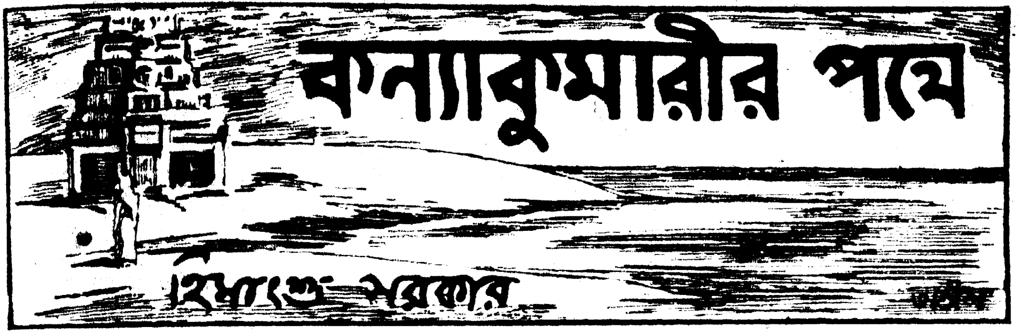
পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকিলেও শুধু বিশ্বাসের ফলেও নানারূপ অদ্ভুত ব্যাপার হইতে দেখা যায়। স্যার হামফ্রে ডেভী একবার 'হাস্যোদ্দীপক বাষ্প' (লাফিং গ্যাস) সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইহা তৎকালে নাইট্রাস্ অক্সাইড্ নামে পরিচিত ছিল। তিনি ইহার একটি পরীক্ষা করিবার জন্য একজন মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূলগ্রস্ত (Ticdouloureux) রোগীর উপর ইহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টিত হন। ইহা করিবার পূর্বে তিনি রোগীর দেহের উত্তাপ জানিবার জন্য তাহার মুখে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার লাগান। রোগী মনে করিল যে, এই যন্ত্রটি কোনপ্রকারের অসীম গুণসম্পন্ন নব-আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু হইবে এবং সেই বিশ্বাসের ফলে কিছুকাল মধ্যেই সে বলিয়া উঠে যে, তাহার বেদনা সারিয়া গিয়াছে। বিশ্বাসের ফলেই এখানে বেদনা রোগ আরোগ্য হইল। থার্মোমিটার সম্পর্কে এরূপ আরও বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার লয়েড টাকী তাঁহার পুস্তকে থার্মোমিটারের এরূপ অলৌকিক ক্ষমতার আর একটি বিশেষ উপাদেয় কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে নানারূপ উচ্চধারণা পোষণ করিয়া থাকে। একজন ডাক্তার হাসপাতালে বিশেষ কাজের চাপে একদিন সমস্ত রোগীকে থার্মোমিটার দ্বারা জ্বর পরীক্ষা করিলেও ইচ্ছা করিয়া একজন রোগীকে পরীক্ষা করেন নাই। ইহার কারণ সেদিন ডাক্তার অন্য জরুরী কাজে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, শুধু তাহাই নহে উক্ত রোগীটিরও গত কিছুদিন যাবৎ উক্ত সময়ে জ্বর থাকিত না। এইজন্যই অন্য সকলের জ্বর পরীক্ষা করিলেও উক্ত রোগীর তাপ পরীক্ষার মোটেই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পরদিন প্রাতে জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত রোগী বলে যে, সেদিন সে মোটেই ভাল বোধ করিতেছিল না। ইহার কারণও সে বলে যে, পূর্বদিন ভ্রমক্রমে ডাক্তার তাহার মুখের মধ্যে ঐ সাদা কাঁচের চকচকে যন্ত্রটি দেন নাই—এইজন্যই তাহার জ্বর

পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষেত্রেও বিশ্বাসের দরুণ রোগীর মনে ক্রিয়া হইতেছে। পূর্বদিন থার্মোমিটারটি লাগাইলে নিশ্চয়ই সে মানসিক এতটা দুর্বল হইত না। আমাদের নিজেদের বিষয় আলোচনা করিয়াই দেখা যাউক না কেন। যদি আমাদের কোনও বন্ধুকে প্রতিদিন দেখিয়া বলা যায় যে, তাহার চেহারা দিন দিন খারাপ হইতেছে! ইহা যদি তাহার বিভিন্ন বন্ধু (যাহাদের উপর তাহার বিশ্বাস আছে) সর্বক্ষণ বলেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার চেহারা নিশ্চয়ই খারাপ হইবে। এক্ষেত্রে নানাদিক হইতে প্রেরিত আদেশ বা ইঙ্গিত পাত্রের মনে উপস্থাপিত হইয়া গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই ফলে সে দিন দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে। বিলাতে এই বিশ্বাস ও সম্মোহন আদেশ (suggestion) প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া নানারূপ গবেষণা চলিতেছে। তাহারা সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, এই সমস্ত ক্রিয়ার ফলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার হ্যাক্ টুক (Hack Tuke) সাহেবের বর্ণিত একটি সত্য ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার ফরাসী দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কোন অন্যায় কার্য করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। সর্বসমক্ষে ফাঁসি দেওয়ার কেলেঙ্কারীর হাত হইতে কিছুটা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষার কার্যে তাঁহাকে ব্যবহার করিতে অনুমতি লওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয় যে, তাঁহার দেহ কাটিয়া রক্তপাত দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। তাঁহার চক্ষু দুইটিকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার হাতে সামান্য একটু পিনের খোঁচা দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে নীচে একটি গামলা পাতিয়া হাতের উপরে ঈষৎ উষ্ণ জলের ধারা বহাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার পার্শ্ববর্তী লোকজন বলিতে আরম্ভ করিলেন "লোকটার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমেই দুর্বল হইয়া আসিতেছে, নাড়ীও প্রায় ডুবিয়া আসিল, লোকটি প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল।" কিছুকাল মধ্যেই একবিন্দু রক্তপাত না করিয়াও লোকটি প্রভূত রক্তপাতের লক্ষণ লইয়া ঐস্থানে মানবলীলা সংবরণ করিল। এখানেও 'বিশ্বাসের' জন্যই লোকটি অত সহজে প্রাণ হারাইল।

তীর্থযাত্রীরা কত পরিশ্রম করিয়া, কত স্বল্প আহার করিয়া, কত রৌদ্রবৃষ্টিতে ভিজিয়া তীর্থ পর্যটন করিয়া যখন ফিরিয়া আসে, তখন প্রায়ই তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখা যায়। বিলাতের মিস্ হ্যামিল্টন্ তাঁহার গবেষণামূলক একটি পুস্তকে (Incubation in the cure of Disease in Pagan Temples and Christian Churches) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীস, এসিয়া মাইনর, ইতালী,ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে রোগিগণ মন্দিরদ্বারে ধর্ণা দিয়া নিজেদের ব্যাধিমুক্ত করিত। তিনি বলেন, সেকালে রোগিগণ মন্দির দুয়ারে রাত্রিযাপন করিত এবং স্বপ্নমধ্যে দেবতারা আসিয়া রোগারোগ্যের উপায় বলিয়া দিতেন। স্বপ্নে এরূপ দেখা যাইত যে, দেবদেবীগণ ব্যথিতের পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন, ব্যথার স্থানে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। ইহার পর ঐ সমস্ত রোগীরা আরোগ্যলাভ করিয়া নিজেদের কথা প্রস্তর-ফলকে (কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সমস্ত প্রস্তরফলক অদ্যাপি ঐ মন্দির গাত্রে পাওয়া যায় এবং এখনও উহা পাঠ করিয়া বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। উহাতে দেখা গিয়াছে—চক্ষুর ব্যাধি, অন্ধত্ব, অবসাঙ্গ, ক্ষত, বাত প্রভৃতি ব্যাধিই বেশী আরোগ্যলাভ করিত। একটি অন্ধের বিবরণ খুবই বিস্ময়কর। এপিডউরাসের য়্যাসক্লিপিয়স্ মন্দিরে একবার একজন অন্ধ চিকিৎসার্থে আসে। তাহার চক্ষুগোলকই ছিল না বলিয়া তৎকালে মন্দিরে সমুপস্থিত সকলেই তাহাকে হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া যাইতে বলে। কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে রাজী হয় না এবং মন্দির দুয়ারে ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকে। রাত্রিকালে স্বপ্নে দেবতা শুধু তাহাকে দেখাই দেন নাই, তাহার জন্য বিশেষ একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহার চক্ষুমধ্যে ঢালিয়া দেন। পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া সে দেখে যে, সে সম্পূর্ণ চক্ষুষ্মান্ হইয়াছে। এক ব্যক্তি কঠিন ডিস্‌পেপসিয়া রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া ভগবানের নিকট হইতে স্বপ্নে নির্দেশ পান যে, নিয়মিত স্নান, আহার ও পরিশ্রম করিলে উহা দূর হইবে। পদদেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন রোগী স্বপ্নে দেখে যে, ঈশ্বর অশ্বচালিত রথে যাইবার সময় রথের অশ্ব দুইটি তাহার পদদ্বয় মাড়াইয়া দেয়। ইহাতে স্বপ্নের মধ্যেই সে দাঁড়াইয়া উঠে এবং পরদিন আরোগ্যলাভ করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া যায়। এই ধর্ণা দিবার পূর্বে পুরোহিতগণ নানারূপ যাগযজ্ঞাদি বিচিত্র অনুষ্ঠান করিতেন এবং ঐ সমস্ত ব্যাপারের জন্য মোটা দক্ষিণা আদায় করিতেন। তাঁহারা প্রচার করেন যে, বেশী দক্ষিণা না দিলে রোগারোগ্যে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত রোগিগণ তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের জন্যই যে রোগমুক্ত হইত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশ্বাসের এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতার কথা আরও অনেক পাওয়া যায়। রাজা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া অনেক দেশে বিবেচিত হন। বর্তমান যুগেও আমি দেখিয়াছি, জাপানে সম্রাট দেবতাজ্ঞানে পূজিত হন। (Life of Victor Emanuel by G. S. Godkin) গডকিন সাহেব লিখিত সম্রাট ইমানুয়েলের জীবনকাহিনী গ্রন্থে (২১৩ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যায় যে, রাজার স্পর্শে অনেক রোগারোগ্য হইত। একবার নেপলস্‌এ কলেরা রোগ মহামারীর ন্যায় দেখা দেয় এবং প্রত্যহ এত লোক মারা যাইতে আরম্ভ করে যে, প্রজারা সকলে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পলায়নে উদ্যত হয়। তখন রাজা ইমানুয়েল হাসপাতালে যাইয়া রোগীদের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নানারূপ সমবেদনার কথা বলেন ও তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। একজন মৃতপ্রায় লোকের হিমশীতল হাতে হাত দিয়া তিনি বলেন, "হে গরীব, সাহসী হও, তুমি শীঘ্রই ভাল হইবে।" রাজার উত্তপ্ত করস্পর্শে, উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষা শুনিয়া ও রাজার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঐ মৃতপ্রায় লোকটিরও মনে সঞ্জীবনীর ক্রিয়া হয়। সেইদিন রাত্রিতে রাজা জানিতে পারেন যে, তাঁহার আগমনে প্রজারা আশ্বস্ত হইয়াছে। সেদিনের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। তিনি অজ্ঞাতসারে এক অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করিয়াছেন—কারণ, প্রাতের সেই মৃতপ্রায় রোগীটি আরোগ্যলাভ করিতেছে। ডাক্তারগণ বলিতেছেন যে, তাঁহার করস্পর্শে অর্ধমৃতের দেহে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। এখানেও রাজার প্রতি প্রজাদের অচল ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলেই

(শেষাংশ ৯০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



১৩

ভারতবর্ষের করদ রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান ত্রিবাংকুর রাজ্য যে অনেক বিষয়ে অগ্রণী এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ত্রিভেনদ্রাম শহরটি দেখলেই মনে হয় যেন যত্ন সহকারে এবং নিপুণতার সংগে আঁকা একটি ছবি। শহরের রাস্তা ঘাট, গৃহ ইত্যাদিতে কোন দিক দিয়েই কোন খুঁত ধরবার সুযোগ রাখা হয়নি এবং এগুলি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। এখানকার শহরের লোকদের মন্ত্রটি এই যে build the city more beautifully—শহরকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোল। ভারতবর্ষে এমন একটি সুন্দর শহর যে চেষ্টা করলে গড়ে উঠতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই ত্রিভেনদ্রাম। এই শহরটি দেখলে সত্যই মনে আনন্দ হয়।

ত্রিবাংকুর রাজ্যকে সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য যাঁরা অগ্রণী তাঁদের নাম করতে গেলে প্রথমেই রাজ্যের বর্তমান মহারাজা এবং দেওয়ান বাহাদুরের কথা উল্লেখ করতে হয়।

প্রায় ১২ বৎসর আগে বর্তমান মহারাজা রাজ্যের এক দরবার সভায় যা বলেছিলেন তা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, কতখানি মহৎ উদ্দেশ্য মহারাজার সব কাজের পেছনে ছিল এবং আছে। আর এটা যে তাঁর অন্তরের কথা তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"I now take up the reins of a settled and well-ordered Government, but I do so, not in a spirit of vainglory or self-satisfaction, but full of an abiding sense of the tremendous responsibility entailed by this magnificent heritage........ Need I say that it will be my earnest and constant endeavour to assist in the further development of the state on the same lines and to enable it to take its place in the vanguard of progress".

এইটির ভাবার্থ এই যে,—আমি এই রাজ্যের ভার শুধু নিজের সুখ-সুবিধা এবং বাহ্যাড়ম্বরের জন্য নিচ্ছি না—এটা আমার সব সময় মনে আছে যে, আমার ওপর কতবড় একটা দায়িত্ব ভার এসে পড়েছে। আমি আমার পূর্বপুরুষদের মহৎ কার্যের কথা মনে রেখে সব সময়ই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব যে কি করে এই রাজ্য একটা উচ্চ স্থান অধিকার করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে।

বর্তমান মহারাজার পূর্বপুরুষরাও এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। Erasmusএর একটা কথা মনে পড়ে—

"A Prince exists for the sake of the State, not the State for the sake of the Prince".

—রাজা রাজ্যের জন্য, রাজ্য রাজার জন্য নয়।

ত্রিবাংকুরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে—এই রাজ্য কোন কালেই বিদেশী শত্রুর অধীনে যায় নি। ত্রিবাংকুরের বর্তমান রাজারা গর্বের সংগে দাবী করতে পারেন যে, তাঁদের বংশ দাক্ষিণাত্যের পুরাতন চেরা রাজবংশ থেকে চলে আসছে। পুরাতন শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই রাজবংশ অন্তত এখানে ৮৮৫ খৃঃ অঃ থেকে চলে আসছে। কুইলন ছিল এই রাজ্যের পূর্বের রাজধানী। সেই সময় পাণ্ড্য রাজাদের সংগে এই রাজাদের প্রায় যুদ্ধ লেগে থাকত।



ত্রিভান্দ্রামের একটি গ্রাম্যমেয়ে

কিন্তু এর পর অষ্ট শতাব্দীর শেষ দিকে এই বংশের রাজারা পাণ্ড্য রাজবংশীয়দের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং একচ্ছত্র রাজা হন। মাদ্রাজে প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে পাওয়া যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজবংশের রবিরাম কুলশেখর নামে এক রাজা পাণ্ড্য এবং চোল রাজাদের পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় থেকে ত্রিবাংকুর রাজ্যের উল্লেখ আমরা দাক্ষিণাত্যের বহু শিলালিপি এবং পুরাতন বিবরণীতে দেখতে পাই।

বর্তমান ত্রিবাঙ্কুরের নির্মাণ-কর্তা মহারাজা বীর মার্তণ্ড বর্মা (১৪৩৫-৬৯ খৃঃ অঃ)। মার্তণ্ড বর্মাকে তাঁর রাজত্বকালে দেশের বহু বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল।

বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাজ্য উদ্ধার করে এবং রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করে মার্তণ্ড বর্মা যখন রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন করতে পারলেন—তখন তিনি রাজ্যের সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

মহারাজা মার্তণ্ড বর্মা যখন রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করছিলেন তখন তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল। এই সময় তাঁর সৈন্য বৃদ্ধির জন্য এক নারী সৈন্য বাহিনী গঠনের উল্লেখও পাওয়া যায়। এই সব যুদ্ধের সময় তিনি ভগবানের কৃপায় বহুবার আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার লাভ করেন। এখানে দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি।

একবার তিনি শত্রুদের তাড়নায় বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করছিলেন। সেই সময় একদল শত্রুসৈন্য তাঁকে দেখতে পেয়ে তাড়া করে। তিনি আর কোন উপায় না দেখে প্রাণভয়ে বনের মধ্যে পালাতে লাগলেন। কিন্তু শত্রুরা যখন তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে ধরে ফেলবার উপক্রম করল—সেই সময় তিনি তাঁর সম্মুখে একটা বড়গাছের ফাঁপা গুড়ি দেখতে পেয়ে তার মধ্যেই ঢুকে পড়লেন। তিনি এইরূপভাবে আশ্রয় গ্রহণ করাতে শত্রুরা তাঁকে আর দেখতে না পেয়ে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার পর তিনি গাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে সেবারের মত রক্ষা পেলেন।

আর একবার তিনি এক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে আছেন জানতে পেরে শত্রুরা চতুর্দিক থেকে মন্দির ঘিরে ফেলে। শত্রুরা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে আর তাঁকে হত্যা করতে চাইল না—কারণ প্রথমত তারা মন্দিরের পবিত্রতার কথা ভাবল, দ্বিতীয়ত তারা এটা ধরে নিল যে, রাজা তো ধরাই পড়েছে, তাঁর মন্দির থেকে আর পালাবার কোন উপায় নেই। তাঁকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। কিন্তু সে যাত্রায়ও তিনি মন্দিরের পুরোহিতের কৃপায় উদ্ধার পেলেন। রাজা পুরোহিতের বেশ গ্রহণ করে শত্রুদের সম্মুখ দিয়েই পলায়ন করতে সক্ষম হন। তাঁর জীবনে এইরূপ সব নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াতেই তাঁর মনের মধ্যে ভগবানের উপর ভক্তি এবং বিশ্বাস গাঢ় হয়।

এই সব কারণে রাজ্যে শান্তি আসবার পর মার্তণ্ড্য বর্মার মনে হিংসানীতি, রক্তপাত প্রভৃতির প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব এল। তাই তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে প্রচার করলেন যে, শ্রীবিষ্ণু পদ্মনাভই রাজ্যের সর্বময় কর্তা, তিনি শুধু তাঁর দাস মাত্র এবং প্রজাদের হিতের জন্যই এই দাসরূপে রাজ্য শাসনভার পরিচালনা করবেন। মার্তণ্ড্য বর্মা মুখেই শুধু ভগবানের দাস এই কথা বলে ক্ষান্ত হলেন না—তিনি তাঁর রাজ তরবারী মন্দিরে বিষ্ণুপদে রেখে খুব সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেত লাগলেন। প্রজাদের হিতসাধনের জন্য, রাজ্যের যথার্থ উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। প্রজারা রাজার এই পরিবর্তন এবং আন্তরিকতা দেখে—সব দিক দিয়ে তারাও রাজাকে সাহায্য করতে লাগল।

আর সেই সময় থেকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজাদের প্রথা হল যে, শাসনকারী রাজাদের নামের শেষে শ্রীবিষ্ণু পদ্মনাভদাস বলে উপাধি থাকবে। এই উপাধি বংশানুক্রমে মার্তণ্ড বর্মার সময় থেকে চলে আসছে।

মার্তণ্ড্য বর্মার মহৎ অনুপ্রেরণা তার পরবর্তী সব রাজারাই যথাযথভাবে পালন করে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহারাজা মার্তণ্ড বর্মার পর রাজা হন রামা বর্মা। তিনিও মার্তণ্ড বর্মার মতই ধার্মিক এবং প্রজানুরঞ্জন ছিলেন। প্রজারা রামা বর্মাকে ধর্মরাজ বলত—কারণ তিনি সারাজীবন ধর্মের পথে থেকে রাজ্য শাসন করে গিয়েছিলেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের নাম রেখেছিলেন—ধর্মস্তঃ কুল দৈবতম, অর্থাৎ ধর্মই কুলদেবতা।

সংক্ষেপে এই হ'ল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ইতিহাস। এর পর আমাদের মনে সাধারণতই এই কৌতূহল জাগে যে, বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কতদূর এবং কিরূপ উন্নত।

প্রায় গত দশ বৎসরের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের সর্বদিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতির পশ্চাতে এখানকার কর্তৃপক্ষদের চেষ্টা এবং প্রেরণা আছে বলেই এটা এত শীঘ্র সম্ভব হতে পেরেছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সর্বতোভাবে কৃষি প্রধান দেশ। কিছুকাল আগেও দেশে যেসব কাঁচা মাল উৎপন্ন হত, সেগুলো দেশের মধ্যে কোন কলকারখানা না থাকার দরুণ কোনরূপ শিল্পজ বস্তুতে পরিণত করা যেত না—সব কাঁচা মালই দেশের বাহিরে চলে যেত। কিন্তু মহারজার চেষ্টায় আস্তে আস্তে রাজ্যের মধ্যে কলকারখানা তৈরী হতে লাগল। আর এগুলো বেশীর ভাগই রাজ্যের সরকারের পরিচালনা এবং কর্তৃত্বাধীন। এতে সুবিধা এই যে, কোন ধনী ব্যক্তির একচেটে অধিকার না থাকায় প্রথমত উন্নত দ্রব্যগুলি ন্যায্য দামে দেশের লোকেরা পেতে লাগল। তা ছাড়া কোন ধনী শ্রেণী লোক না থাকায় মজুরদের মজুরী থেকে আর কোনরূপ লাভ করবার সুযোগ না থাকায় শ্রমিকরাও তাদের শ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক পেতে লাগল।

এখানে এই রাজ্যের কুটীর শিল্প এবং কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায়।

নারকল এদিককার দেশগুলিতে খুব বেশী পরিমাণেই হয়। বিনা কষ্টে এবং বিনা যত্নে এসব গাছ জন্মায়। অবশ্য নারকল গাছ ভারতবর্ষের সমুদ্রের ধারের সব দেশেই জন্মায়—কিন্তু এই নারকল গাছ থেকে যে বহু প্রকারের দরকারী বস্তু উৎপন্ন করা যায় সেটার সমন্ধে লোকের লক্ষ্য খুব কমই দেখা যায়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সেই কারণে, এই গাছ থেকে যে বিভিন্ন ধরণের বস্তু উৎপন্ন করা যায়—সেটার প্রমাণ খুব ভাল রকমেই করছে। এবং এর গাছ থেকে আমরা তেল, দড়ি, পাপোষ এবং ঐ জাতীয় আরো অনেক জিনিস পাই। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য নারকলের শুকনো খোলগুলো পুড়িয়ে কয়লা করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই কয়লার বিষাক্ত বাষ্প শোষণ করবার ক্ষমতা আছে। সেই কারণে এই কয়লা গ্যাস মুখোস নির্মাণে প্রয়োজন হচ্ছে। বাঙলা এবং উড়িষ্যায় সমুদ্রের তীরস্থ দেশগুলিতেও বহু পরিমাণে নারকেল বৃক্ষ জন্মায়। এই প্রদেশগুলির কর্তৃপক্ষ যদি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মত ঐ জাতীয় জিনিস উৎপন্ন করাতে মনোযোগী হন, তা হলে, প্রদেশগুলিতে কিছু পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় বোধ হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের রবারের কারখানায় মোটরের সাইকেলের টায়ার এবং টিউব এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত হয়। এই কারখানা থেকে উৎপন্ন প্রায় তিন কোটি টাকার জিনিস দেশের বাইরে চালান যায়।

এখানে চীনা মাটি পাওয়া যাওয়াতে একটি কারখানা এইসব জিনিসপত্র তৈরী করবার জন্য গড়ে উঠেছে। এই কারখানা থেকে যেসব চীনা মাটির জিনিস তৈরী হয় সেগুলো খুব উৎকৃষ্ট ধরণের। এই কারখানা ছাড়া কুমররাও অনেক চীনা মাটির জিনিস প্রস্তুত করে। সেগুলো কারখানায় প্রস্তুত জিনিসের মত এত ভাল না হলেও বাজারে বিক্রি হয়।

মনোজাইট (Monozite), ইলমেনাইট (Ilmenite), জিরকন (Zircon) জাতীয় মিনারেল স্যাণ্ড (Mineral sands) এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাজু বাদাম এদিকে খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এই বাদাম মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের দিকেও পাওয়া যায়—সেই জন্য এগুলি অনেকের কাছে কাঁথি-বাদাম বলে পরিচিত। বর্তমানে এই কাজু বাদাম বহু পরিমাণে এখান থেকে বাইরে চালান যায়। ভ্রমণের মধ্যে দেখলাম যে, এই কাজু বাদাম প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে ফিরিওয়ালারা

বিক্রি করছে। প্রথম দিকে "চিরে পুম্পু" ডাক শুনে কোন একটা নতুন কিছু দেখব মনে করে ট্রেনের জানলা দিয়ে মুখ বার করে কাজু বাদাম দেখে হতাশ হয়েছিলাম।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই জঙ্গলে ভর্তি। এইসব জঙ্গল থেকে বিভিন্ন জাতের গাছের কাঠ কেটে সেগুলোকে কাজে লাগান হয়। এই জঙ্গলে এক ধরণের শর (reed) জাতীয় গাছ জন্মায় —যেগুলো বাঁশের বদলে কাগজ উৎপন্নের জন্য দরকারে লাগে। আর এই কারণে একটি কাগজের কল বনের কাছেই একটা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। কাঠ থেকে বিভিন্ন রকমের খেলনা প্রস্তুতের জন্য ছোট একটা কারখানাও খোলা হয়েছে। একটি বড় চিনির কারখানাও এখানে আছে। এতে চিনি তৈরী ছাড়া তালের রস থেকে তালের মিছরি, চিনির চিটে গুড় (molass) থেকে মদও প্রস্তুত করা হয়। একটা লবণ প্রস্তুতের কারখানা আছে। পল্লীভাসল হাইড্রো ইলেকট্রিক ছাড়া একটি রেডিও স্টেশনও আছে। একটি সিমেণ্ট প্রস্তুত করবার কারখানা খোলবার চেষ্টাও চলছে।

রাজ্যের বহু লোক তাঁতে কাপড় বুনে এবং হাতীর দাঁতের কাজ করে জীবিকা অর্জন করে।

ত্রিবাঙ্কুরের বিশ্ববিদ্যালয় এদের একটা গর্বের বস্তু। মাত্র ৫ বৎসর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এর সর্ববিভাগ উন্নতি করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, আমাদের দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় শুধু গতানুগতিক-ভাবে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষাতে উৎসাহিত করে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নিয়ে একটা শ্রমিক দল (Labour Corps) গড়ে তুলেছেন। আর এই দলের ছাত্ররা মাঠে কোদাল হাতে মাটি কোপাতে লজ্জা অনুভব করে না। এ ছাড়া ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষার বন্দোবস্তও আছে।

ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীবিষ্ণু পদ্মনাভের মন্দিরের শুধু উল্লেখ দু-এক স্থানে করা হয়েছে। এই মন্দির সারা দাক্ষিণাত্যের সব বিখ্যাত মন্দির গুলির মধ্যে একটি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক গল্প আছে, তার মধ্যে দুটো এখানে উল্লেখ করছি।

অনেক কাল আগে, এখন যেস্থানে মন্দির নির্মিত হয়েছে, সেখানে গভীর বন ছিল। এই বনে হিংস্র পশু বাস করত। এই বনের ধারেই এক কাঠুরিয়া তার স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। একদিন বনের ধারে কাঠ কুড়তে কুড়তে এরা এক গাছের তলায় একটি সুন্দর শিশু পড়ে রয়েছে দেখল। কাঠুরিয়ার স্ত্রী শিশুটিকে একটু দুধ খাইয়ে গাছের তলায় শুইয়ে রেখে দিয়ে আবার কাঠ কুড়তে লাগল। বাড়ি ফেরবার সময় গাছেরতলা থেকে শিশুটিকে নিতে এসে তারা দেখল যে এক পাঁচ ফনাওয়ালা কেউটে সাপ শিশুটির ওপর তার ফণা-বিস্তার করে তাকে রৌদ্র থেকে আড়াল করে রেখেছে। সাপটা কাঠুরিয়াদের দেখবা মাত্রই শিশুটিকে নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজার কানে একথা পৌছন মাত্রই রাজা এই বন কেটে পরিষ্কার করে সেখানে এক মন্দির তৈরী করবার আজ্ঞা দিলেন। —রাজার ধারণা হল যে শিশুটি আর কেউ না, স্বয়ং বিষ্ণু।

আর একটি কাহিনী এইরূপ। বিল্বমঙ্গল নামে এক ধর্মভীরু লোক বাস করত। সে তার বাড়িতে শালগ্রাম শিলা পূজা করত। প্রত্যেক দিন সে পূজোয় বসে চোখ বন্ধ করলেই দেখত যে, একটি সুন্দর শিশু তার সব পূজার ফুল এবং শালগ্রামশিলা ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। একদিন সে আর ক্রোধ দমন করতে না পেরে, চোখ বন্ধ অবস্থায় শিশুটিকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ধাক্কা খেয়ে শিশুটি চলে যাবার সময় বিল্বমঙ্গলকে বলল যে, যাকে সে তাড়িয়ে দিল, সেই হচ্ছে ভগবান যাকে পাবার জন্য সে পূজো করছে। শিশুরূপী ভগবান চলে যাওয়া মাত্রই বিল্বমঙ্গল তার ভুল বুঝতে পেরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকতে লাগল। এদিকে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে একদিন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বল্লেন যে, সে যদি অনন্তকাদ নামে জায়গায় যায় তবে সে তাঁর দেখা পাবে। ঘুম থেকে উঠে বিল্বমঙ্গল লোকের কাছে এই স্থানের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কেউ তাকে এই স্থানের খোঁজ দিতে পারল না। এদিকে ভগবানকে পাবার ইচ্ছা তার এত প্রবল হল যে, সে একদিন গৃহ ত্যাগ করে এই অনন্তকাদ স্থানের খোঁজে বের হয়ে গেল। অনেক স্থান ঘুরে ঘুরে একদিন এক গৃহের সামনে দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলে যে, একটি স্ত্রীলোক একটি ক্রন্দনরত শিশুকে বলছে যে, সে যদি চুপ না করে তাহলে তাকে 'অনন্ত-কাদে' নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। এখান থেকে এই অনন্তকাদের খবর পেয়ে বিল্বমঙ্গল সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হল। অনন্তকাদে এসে বিল্বমঙ্গল দেখল যে, প্রায় ৬ মাইল লম্বা এক সহস্র ফণাযুক্ত সাপের ওপর স্বয়ং বিষ্ণু বসে রয়েছেন। বিষ্ণু বিল্বমঙ্গলকে দেখে এবং তার আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে তার সমস্ত শরীরকে গুটিয়ে ছোট করে নিলেন যাতে তাঁর ভক্ত বিনাকষ্টে তাঁর পূজা করতে পারে। বিল্বমঙ্গল সে স্থানে দেবতাকে ভোগের জন্য দেবার মত কিছু না পেয়ে এক নারকলের মালায় করে অন্নের ভোগ দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করল। আজও এই জন্য এই মন্দিরে পূজোর সময় এই নারকলের খোলে করে অন্নভোগ দেবার প্রথা আছে। এই অনন্তকাদ—যেখানে বিল্বমঙ্গল বিষ্ণুর পূজা করেছিলেন—পরে সেখানেই এই শ্রীবিষ্ণুপদ্মনাভ মন্দির গড়ে ওঠে।

সাধারণ লোকের মধ্যে যদি মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হয়, তখন তাদের সামাজিক জীবনে আনন্দধারার প্রবাহ আপনা হতেই ফুটে ওঠে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অনেকরূপে সামাজিক উৎসব আছে, তার মধ্যে দুটো নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উৎসবের মধ্যে 'ওনাম' উৎসবই প্রধান। এই উৎসবটি বর্ষা ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়। এই রকম একটা প্রবাদ আছে যে, মহাবালী নামে এক রাজা এখানে বহুকাল পূর্বে রাজত্ব করতেন। এই রাজার রাজত্বকালে পৃথিবীতে কোন লোকেরই দুঃখ বলে কিছু ছিল না—সকলেই সুখী ছিল। দেবতারা এই কারণে মহাবালী রাজাকে হিংসা করতে লাগল। একদিন দেবতারা গিয়ে বিষ্ণুকে ধরলেন, এর একটা কিছু বিহিত করবার জন্য। বিষ্ণু আর কোন উপায় না দেখে একদিন এক বামনের মূর্তি ধরে মর্ত্যে মহাবালী রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজা অতিথি সৎকারের পর বামনরূপী বিষ্ণুকে তার প্রার্থনার কথা জানাতে বললেন। এ কথা শুনে বিষ্ণু রাজার কাছে থেকে মাত্র তিন পা'র সমান জমি চাইলেন। রাজা সানন্দে বিষ্ণুর প্রার্থনায় রাজী হলেন। এমন সময় বিষ্ণু বামনের রূপ ত্যাগ করে নিজ মূর্তি ধারণ করে প্রথম পদক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী, দ্বিতীয় পদক্ষেপে সমস্ত আকাশ জুড়ে ফেলে, তৃতীয় পদ রাখবার মত স্থান না দেখে রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোথায় তিনি তাঁর তৃতীয় পা রাখবেন। রাজা আর কোন উপায় না দেখে বিষ্ণুকে তার মস্তকে তৃতীয় পদটি রাখবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিষ্ণু কিন্তু রাজার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে চিরকালের মত পাতালে গিয়ে বাস করবার জন্য আজ্ঞা করলেন। রাজা বিষ্ণুকে অনেক অনুনয় বিনয় করবার পর, বিষ্ণু বৎসরের মধ্যে ১০ দিন মাত্র রাজাকে পৃথিবীতে আসবার অনুমতি দিলেন। প্রত্যেক বৎসরে বর্ষার সময় ১০ দিন ধরে এই 'ওনাম' উৎসব হয়ে এই কাহিনীকে উপলক্ষ্য করে। লোকেরা ধরে নেয় যে, রাজা মহাবালী এই ১০ দিনের জন্য পাতাল থেকে পৃথিবীতে তাঁর প্রজাদের মধ্যে আবার ফিরে আসেন।

এই 'ওনাম' উৎসব ছাড়া আর একটি উৎসবও এখানে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে হয়, সেটা হচ্ছে 'মুর্যপম' উৎসব। এই মুর্যপম উৎসব ৬ বৎসর পর পর একবার করে হয়। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই মুর্যপম উৎসব এই রাজ্যে চলে আসছে। এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৭০০০ ব্রাহ্মণ এতে যোগদান করেন। স্টেট থেকেই এই উৎসবের সব বন্দোবস্ত করা হয়। ৫৬ দিন ধরে এই উৎসব চলে;

আর এই উৎসবের সময় শ্রীবিষ্ণুপদ্মনাভের মন্দিরে প্রায় সব সময়, যেসব ব্রাহ্মণরা এতে যোগদান করেন, তাঁরা মন্ত্র এবং স্তোত্রাদি পাঠ করেন। উৎসব আরম্ভের পূর্বে মহারাজা দেওয়ান বাহাদুরকে উৎসবের সব বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করেন। মহারাজা নিজে এই উৎসবে যোগদানেচ্ছুক ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান। মহারাজার নিমন্ত্রণ পত্র আবার একদল ব্রাহ্মণ রাজ্যের সর্বস্থানে বহন করে নিয়ে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা রাজধানীতে এসে উপস্থিত হবার পর তাঁদের খাওয়া-থাকার সব সুবন্দোবস্ত করা হয়। এই ৭০০০ ব্রাহ্মণদের খাদ্য প্রস্তুত করবার জন্য প্রায় ৭০০ রাঁধুনী ব্রাহ্মণ নিয়োগ করা হয়। যে স্থানে এই রান্না হয়, সেখানে বড় বড় সব পাত্র থাকে এবং কোন কোন এই ধরণের পাত্র প্রায় ১৫ ফিট পর্যন্ত গভীর।

ক্রমশ

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বাস

(৯০৪ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপ অলৌকিক ফল হইতেছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, বিশ্বাস সর্বজয়ী। আমরা যাহা ভাবিয়া থাকি বা বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহা সেখানেই শেষ হইয়া যায় না। উহা আমাদের মনে দৃঢ় রেখাপাত করে এবং তাহা দ্বারা আমাদের শারীরিক যন্ত্রসমূহ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) প্রভাবিত হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বিশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ইহা অমিত ক্ষমতাসম্পন্ন ও সর্বজয়ী।

পুস্তক-পরিচয়

পান্থ-পাদপ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। ১৬৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে পরাগ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত—মূল্য দেড় টাকা

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ চিন্তাশীল ও কবিতার ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কাজেই তাঁহার নূতন পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই। তাহার উপর কৃতবিদ্য কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বিশেষ যত্নসহকারে একটি সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানির অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে সম্যকরূপে প্রণিধান করিবার সহায়তা করিয়া দিয়াছেন। কুমার বিমলচন্দ্র স্বীয় মনঃস্বিতার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন এবং কবিতাগুলি নির্বাচনেও কবিকে সাহায্য করিয়াছেন। কাজেই গ্রন্থখানিতে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে মোট ১০৮টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি সাজানোতে বেশ একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা আছে। কবিতাগুলি সবই চতুর্দশপদী এবং এই ধরণের কবিতায় কৃতিত্ব অর্জন করিতে হইলে যে পাকা হাতের দরকার তাহা কবিবরের আছে। বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তিনি চতুর্দশপদী কবিতা একরূপ নিয়মিতভাবেই লিখিয়া আসিতেছেন। স্বল্পায়তনে এবং সুষ্ঠুভাবে বিগাঢ় ভাবধারাকে সহজবোধ্য করিয়া ভাষাদানে কবি যে অনন্যসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন পান্থ-পাদপের প্রতি কবিতায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। বঙ্গ সাহিত্যে চতুর্দশপদী কবিতার ক্ষেত্রে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্থান যে বহু উচ্চে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ ধরণের একখানি কবিতাগ্রন্থ বহু বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন সাধাণার ফল, বেশ বুঝা যায়। চির আশাপ্রদ উদ্দীপনামূলক এই পথ চলার গানগুলিতে বিশ্ব-বৈতালিক আজ দুনিয়ার দরবারে দরবেশ সাজিয়াছেন। গ্রন্থখানি সহজেই স্কুল কলেজের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবে। প্রত্যেক গ্রন্থালয়ে গ্রন্থখানি রাখা উচিত।

স্তোত্র গীতা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—৩৫নং বাদুরবাগান রো, কলিকাতা এবং কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়। মূল্য এক টাক।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং সর্বোপরি তিনি ধর্মনিষ্ঠ ভক্ত পুরুষ। তাঁহার রচিত স্তোত্র গীতা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের নিজের রচিত ১৬টি স্তোত্র আছে। স্তোত্রগুলির ভাবের গভীরতায় এবং ভাষার মাধুর্যে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থকার তাঁহার জন্মস্থানে সম্প্রতি একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেই মন্দিরের সেবাকার্যে ব্যয়িত হইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঃ—(শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত) ৭ম খণ্ড। শ্রীঅনিলবরণ রায় সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—গীতপ্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য—সাধারণের জন্য—১৷৹, গ্রাহকদের জন্য—৸৹ আনা।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহোদয়ের সম্পাদিত গীতার পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক; কারণ, গীতার এই সংস্করণ বাঙলা দেশের সর্বত্র বিশেষ ভাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বর্তমান খণ্ডে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২৪ হইতে ২৮ শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা বিশদ এবং প্রাঞ্জল। ব্রহ্মনির্বাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বৌদ্ধদর্শন, সাংখ্য এবং গীতোক্ত আদর্শকে তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, "গীতার মতে অহংভাব ছাড়াইয়া উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্রহ্মনির্বাণ। এজন্য সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় না।" জীবনের মধ্যে সুসমঞ্জস সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিক হইতে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে রায় মহাশয়ের এই গীতাভাষ্য বাঙলার জাতীয় জীবনে সমগ্রভাবে নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে—আমরা ইহাই আশা করি। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে এমন গ্রন্থের সমাদর হওয়া উচিত।

শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্যঃ—শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

গ্রন্থকারদ্বয় আলোচ্য গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলিও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বড়দিদি, বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, রাঙ্গামণি ও কুসুম, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, বিজলী, কিরণময়ী ও সাবিত্রী, অচলা—এই কয়েকটি চরিত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—'লেখকদ্বয় শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে অজ্ঞাত নন, তাই তাঁরা লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র কোন নীতি, প্রশ্ন, কোন আদর্শের কথা উত্থাপন করেন নাই। তিনি নারীর আন্তরশক্তির সহজ রূপ যেমন দেখিয়াছেন, তেমনই আঁকিয়াছেন। কারণ, তিনি সমাজকর্তা নন, নীতিজ্ঞ নন, অর্থ-শাস্ত্রবিৎ নন—তিনি কবি, স্রষ্টা ও শিল্পী। সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রই এই পুস্তক পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

কৃষ্ণার্জুন সংবাদঃ—(গৃহস্থের দৃষ্টিতে লিখিত গীতার্থ-প্রকাশ) তৃতীয় ষট্‌ক। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী, বি এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রেস—তেমাথা, চন্দননগর। মূল্য—আট আনা মাত্র।

প্রথম দুই ষটকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমরা ইতঃপূর্বেই করিয়াছি। তৃতীয় ষটক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত এবং উপকৃত হইয়াছি। লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, তিনি বহুশ্রুত ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার অন্তর-সাধনার অনুভূতির যে আলোক এই আলোচনার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা চিত্তকে উন্নত করে। এমন গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই লাভবান হইবেন।



সমরাবর্তে মিশর

শ্রীদিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লিবিয়ায় তব্রুকের পতনের পরই মিশরের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠেছে। মিশরের সীমান্তবর্তী শহর সোল্লুম ও সিদি ওমর থেকে বৃটিশ পক্ষ কয়েকদিন আগেই সৈন্য সরিয়েছেন। এ কয়দিনে কিন্তু মার্শাল রোমেলের বাহিনী মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করে মের্সা মাত্রুর প্রায় কাছাকাছি এসে পে'ছৈছে এবং লিবিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে এখন মিশরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

মিশরের উপর একরূপ সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এর পূর্ব দিকেই রয়েছে প্রসিদ্ধ সুয়েজ খাল এবং তারই উত্তর মুখে রয়েছে সৈয়দ বন্দর। সেই বন্দর থেকে সমুদ্রোপকূল ধরে সোজা পশ্চিম দিকে চলে এলে মিশরের উত্তর সীমান্তের প্রায় মাঝামাঝি এলাকায় রয়েছে সুদৃঢ় বৃটিশ নৌঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সমুদ্রোপকূল ঘে'ষে মের্সা মাত্রু পর্যন্ত গিয়েছে এক রেলপথ। সেখান থেকে সিদি বারাণী, বুক বুক এবং সোল্লুম হয়ে তব্রুক পর্যন্ত সুপ্রশস্ত মোটর রাস্তা রয়েছে। এই মোটর রাস্তা ধরেই এক্সিস বাহিনী বর্তমানে মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মের্সা মাত্রু পর্যন্ত যদি তারা অগ্রসর হতে পারে তবে সেখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে রেলপথ ধরে অগ্রসর হবার জন্যে একবার তারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখবে। আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে পে'ছাতে পারলে তারা সোজা পূর্বদিকে যাবার চেষ্টা না করে খানিকটা ঘুরে মিশরের রাজধানী কায়রোর দিকে ধাওয়া করতে পারে। কিংবা আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত না গিয়েও জার্মান বাহিনী ডান-দিকে মোড় ঘোরাতে পারে। ঘুরে গিয়ে তব্রুকের মত এই নৌ-ঘাঁটিকে স্থলপথে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সোজা পূবে সৈয়দ বন্দরের দিকে যেতে কিছু অসুবিধা আছে, কারণ আলেকজান্দ্রিয়ার পূবেই রয়েছে নীল নদের মোহনা। যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে শাখা নদীগুলি পার হওয়া খুব সহজ হবে না। কায়রোতে এসে পে'ছাতে পারলে ফিল্ড মার্শাল রোমেল দুই দিকে দুই বাহু প্রসারিত করতে পারেন। এক বাহু হয়ত যাবে সৈয়দ বন্দরের দিকে এবং অপর বাহু হয়ত যাবে সুয়েজ বন্দরে দিকে। ১৯৪০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যখন ইতালীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখনও ওয়াকিবহাল মহল এইরূপই অনুমান করেছিলেন। বৃটিশ বাহিনীকে সেই সময় মের্সা মাত্রুতে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং ইতালীয়গণ সিদি বারাণীতে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল। তারপর ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সিদি বারাণী ও সোল্লুম পুনরুদ্ধার করে এবং তব্রুক দখল করে তারা ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বেন্‌গাজীতে গিয়ে হাজির হয়। জেনারেল ওয়াভেল লিবিয়ার সমগ্র সাইরে-নাইকা প্রদেশ দখল করেন। যুদ্ধের চাকা এবার আবার ঘুরে গেছে। সমগ্র সাইরেনাইকা প্রদেশ পুনরুদ্ধার করে এক্সিস বাহিনী আজ আবার মিশরের অভ্যন্তরে উপস্থিত।



মিশরের বর্তমান রাজা ফারুক

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি পিরামিডের দেশ মিশরের উপর বিদেশী শক্তির প্রলুব্ধ দৃষ্টি নূতন নয়; অতীতকাল থেকেই চলে আসছে। নীলনদ বিধৌত মিশরীয় উর্বরক্ষেত্র এ পর্যন্ত অনেক সাম্রাজ্যবাদীর অন্তরেই উদগ্র লালসার সৃষ্টি করেছে এবং তার ফলে তাকে একাধিকবার পরের কুক্ষিগত হতে হয়েছে। মিশর জয়ের জন্য একদিন নেপোলিয়ান কম চেষ্টা করে যান নি। সাম্রাজ্যবাদের চাপে পড়ে মিশরকে অনেকবারই নিষ্পেষিত হতে হয়েছে; কিন্তু মিশর মরে যায় নি। তার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, কিন্তু সে বে'চে আছে। তার ইতিহাস উত্থান-পতনের বিচিত্র কাহিনীতে পূর্ণ।

মিশর বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র। ক্ষেত্রফল তার প্রায় ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা অনুমান ১ কোটি ৬০ লক্ষ। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরবী ভাষা বলে। রাজধানী কায়রো। বর্তমান রাজার নাম প্রথম ফারুক। ইরাণের বর্তমান শাহের ভগ্নীকে তিনি বিবাহ করেছেন।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস টানবার ক্ষেত্র এ নয়। নব্য মিশরের ইতিহাস কিভাবে গড়ে উঠেছে সংক্ষেপে তারই কিছু আভাষ দিতে চেষ্টা করব।

১৮৪১ থেকে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মিশর তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যভুক্ত থাকলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মিশরের খানিকটা অধিকার না ছিল এমন নয়। তুর্কী সম্রাটের অধীনে মিশরে একজন করে ভাইসরয় থাকতেন। তাঁদেরকে বলা হত খেদিব। বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই খেদিব পদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ হত। বংশানুক্রমে খেদিবের পুত্রই খেদিব হয়ে আসছিলেন।



জগলুল পাশা

এদিকে মিশর অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ৃটিশ আধিপত্য ক্রমশ সেখানে বিস্তার লাভ করছিল। বিদেশী াধিপত্য থেকে মিশরকে মুক্ত করবার জন্যে ঊনবিংশ শতকের শষভাগে আরবী নামে এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা রেন। খেদিব গিয়ে তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় আশ্রয় নেন। ১৮৮২ ্স্টাব্দে ইংরেজেরা এই বিদ্রোহ দমন করে এবং খেদিব তাঁর সনদ ফিরে পান। ইংরেজরা নিষ্কাম হয়ে বিদ্রোহ দমন করল া, দক্ষিণাস্বরূপে মিশরের খানিকটা অঞ্চল তারা দখল করে বসল াবং মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তারা হস্তক্ষেপ করতে াগল। ফলে তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে এ নিয়ে গোলমাল াধল। ইংরেজরা দেখল ব্যাপারটা বড় সুবিধাজনক নয়। মিশর নয়ে সুলতানের সঙ্গে কোন গোলমাল বাধলে ফ্রান্স সুলতানকে াহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। যাতে একটা আপোষ য় তদুদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে স্যার হেনরী মেন্ড উল্ফকে কনস্টান্টিনোপলে পাঠালেন। তিনি সেখানে গয়ে আলাপ-আলোচনার পর এই মর্মে এক সন্ধির প্রস্তাব রলেন যে, অটোমান সরকার ও বৃটিশ সরকার দুইজন হাই মিশনার রাখবেন। তারা খেদিবের সঙ্গে পরামর্শ করে মশরীয় সৈন্য দলকে কিভাবে পুনর্গঠিত করা যায় এবং শাসন ্যাপারে কি কি পরিবর্তন হওয়া দরকার, সেগুলি ঠিক করবেন।

তার পর আলোচনায় আরও দুই বৎসর কেটে গেল এবং ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে যথারীতি সন্ধিপত্র রচিত হ'ল। কিন্তু পরে ফ্রান্স ও রুশিয়ার চাপে পড়ে তুরস্কের সুলতান সেই সন্ধিপত্র অনুমোদনে অস্বীকৃত হলেন।

অতঃপর কিছুকাল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও অটোমান কর্তৃপক্ষের মধ্যে মিশর নিয়ে টানা হেঁচড়া চলল এবং এই ফাঁকে মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিছুটা দানা বেঁধে উঠল। তার পর এল ১৯১৪ সালের মহাসমর। মিশরের খেদিব তখন কন্স্টান্টিনোপলে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না, জার্মানদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এদিকে মিশর গভর্নমেন্ট বৃটিশ পক্ষ অবলম্বন করলেন। আইন সভার অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হ'ল এবং মন্ত্রীরা মিশরীয় বন্দরগুলিতে জার্মান জাহাজ সব আটক করলেন। তার পর সামরিক আইন জারী করে সর্বত্র কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল। সামরিক আইন জারী হওয়ায় আর আইন সভার মতামত গ্রহণের প্রয়োজন হ'ল না। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই সুযোগে অন্য কোন বিদেশী শক্তির সঙ্গে পরামর্শ না করেই তখন তাঁদের তাঁবেদার মিশর গভর্নমেন্টকে দিয়ে দরকারী সব কিছু করিয়ে নিলেন। তুরস্ক প্রকাশ্যে জার্মানীর দিকে যোগ দেওয়ায় মিশরের অবস্থাটা কিছু গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিশরীয়দের মনে কোন খট্কা না থাকে সেই জন্যে ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হ'লঃ—

"তুরস্কের কাজের ফলে যুদ্ধের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা বিবেচনায় মিশরকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের আশ্রয়ে নেওয়া হ'ল এবং এখন হতে মিশর বৃটিশ-আশ্রিত রাজ্যরূপেই পরিগণিত হবে। মিশরের উপর তুরস্কের এতদিন যে সাম্রাজ্যিক অধিকার ছিল তার শেষ হ'ল এবং এবার থেকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মিশর রক্ষা এবং তথাকার অধিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করলেন। এই কর্তব্য পালনের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রয়োজনবোধে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।"

জার্মানদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় খেদিব আব্বাস হিল্মীকে গদিচ্যুত করে তারই আত্মীয় হোসেন কামালকে মিশরের সুলতান বলে ঘোষণা করা হ'ল। তুরস্কের সঙ্গে মিশরের সাম্রাজ্যিক সম্বন্ধ এখানেই শেষ।

এর পর মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপে যখন শান্তির প্রস্তাব চলল তখন মিশরের জাতীয়তাবাদীরা তাদের স্বাধীনতার দাবী জ্ঞাপন করল। তাহাদের নেতারূপে জগলুল পাশা লণ্ডনে গিয়ে স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করবার অনুমতি চাইলেন; কিন্তু বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল। জগলুল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। সমগ্র মিশরে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করলেন। বিলাতী পণ্য বর্জিত হ'ল। দু'এক স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন জারী করলেন এবং জগলুল এবং তাঁর তিনজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত হলেন। জগলুল পাশাকে নির্বাসনে পাঠাবার ফলে মিশরে আরও আগুন জ্বলল; লোক ক্ষেপে গিয়ে রেল লাইন তুলে ফেলল এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দিলে। কায়রোর সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ ছিন্ন হ'ল।

মিশরের গোলযোগ কিছুতেই থামাতে না পেরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বজ্রমুষ্টি খানিকটা শিথিল করলেন এবং জগলুল ও তাঁর সঙ্গে সাতজন প্রতিনিধি লণ্ডনে যাবার অনুমতি পেলেন। আলোচনায় একটা নিষ্পত্তির পথ দেখা দিল। দেশের লোকের মনোভাব জানবার জন্যে তিনি চারজন প্রতিনিধিকে দেশে পাঠালেন। তাঁদের মুখে সব শুনে জগলুল বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, ইংরেজ কর্তৃত্বের অবসান সম্বন্ধে কোন আশ্বাস না দিতে পারলে তিনি দেশবাসীর কাছে কোন আপোষের প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর এই দাবী মেনে নিতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নানাভাবে গাফিলতি দেখালেন এবং তার ফলে আর কোন আপোষই সম্ভব হ'ল না।



মাদাম জগলুল পাশা

তারপর ১৯২১ খৃস্টাব্দে আদলী পাশা নামে একজন নরমপন্থী লোক মিশরে এক মন্ত্রিসভা গঠন করলে জগলুল তার বিরোধিতা করেন। এর পর আরম্ভ হয় আবার হাঙ্গামা। জগলুলের ১৬জন অনুচরের প্রাণদণ্ড এবং আরও অনেকের কারাদণ্ড হ'ল। জগলুল এবং আরও পাঁচ ব্যক্তি পুনরায় নির্বাসনে গেলেন।

জানুয়ারী মাসে এই কাণ্ড, ফেব্রুয়ারীতে লর্ড এলেনবি মিশরের রাষ্ট্রিক সার্বভৌমিকত্ব স্বীকার করলেন এবং বললেন যে, বৃটিশ অভিভাবকত্বেরও অবসান হ'ল। কিন্তু কতকগুলি বিষয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতেই সংরক্ষিত রয়ে গেল; যেমন মিশরীয় এলাকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের চলাচল পথ, মিশরে অপর কোন বিদেশী শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ, বিদেশী ও সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ এবং সুদান ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার।

অতঃপর মিশরে এক নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হ'ল এবং জগলুল তখন নির্বাসন থেকে ফিরবার অনুমতি পেলেন। ফিরে এসে আইন সভার উভয় পরিষদের নির্বাচনে তিনি সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন এবং তাঁর দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। কিন্তু সুদানের গোলমাল না মেটায় অশান্তি একটা রয়েই গেল।

১৯২৭ সালের ২৩শে আগস্ট জগলুল দেহরক্ষা করলেন। তাঁর অভাবে মিশরের জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দলের নেতৃত্ব ভার পড়ল তাঁরই অনুচর নাহাস পাশার উপর। তিনিই মিশরের প্রধান মন্ত্রী।

জগলুলের মৃত্যুর পর ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে মিশরের সঙ্গে বৃটেনের এক সন্ধির প্রস্তাব হ'ল কিন্তু সেই প্রস্তাবে নাহাস এই বলে অসম্মত হলেন যে, তাতে বৃটিশ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে মিশর ছেড়ে যাবে এমন কোন স্পষ্ট সর্ত নেই। এর পর আবার নাহাস পাশার সঙ্গে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দীর্ঘকাল টানা-হেঁচড়া চলে এবং কয়েক বৎসর মিশরে অশান্তির আগুন জ্বলে। অবশেষে ১৯৩৬ সালে মিশর ও বৃটেনের মধ্যে এক স্থায়ী সন্ধি হয় এবং তাতে মিশর যথার্থ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। উক্ত সন্ধিপত্রে অন্যান্য সর্তের মধ্যে এই সর্তও থাকে যে, বৃটেন মিশর হইতে তার সৈন্য সরিয়ে নেবে তবে সুয়েজ এলাকা রক্ষার জন্যে সে ১০ হাজার সৈন্য ও ৪ শত বিমান রাখতে পারবে; বৃটেন আলেকজান্দ্রিয়া ও সৈয়দ বন্দর নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে; যুদ্ধ বাধলে বা বাধবার উপক্রম হ'লে বৃটেন মিশরের অভ্যন্তর দিয়ে সৈন্য চালাতে পারবে। পক্ষান্তরে মিশর অন্য কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে বৃটেন তাকে রক্ষা করবে।

এই সন্ধিই বর্তমানে মিশর ও বৃটেনের মধ্যে বলবৎ আছে এবং উভয় দেশ তদনুসারেই চলছে।

১৯৩৬ সালে যখন এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন মিশরের আইন সভায় ওয়াফদ দলের সদস্য সংখ্যা কম থাকলেও তাঁদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং নাহাস পাশা সে সময় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মিশরের পক্ষ থেকে তিনিই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এর পর নানা কারণে ওয়াফদ দলের প্রতিপত্তি খানিকটা খর্ব হয় এবং কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল দল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমান সংকট মুহূর্তে তারা টিকে থাকতে পারে নি। ১৯৪২ সালের নির্বাচনে ওয়াফদ দলেরই আবার জয় হয়েছে এবং দলপতি নাহাস পাশাই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি মিশরবাসীরা আস্থা হারিয়েছে।

বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশর জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকলেও নাহাস পাশা সেদিন ঘোষণা করেছেন যে, এই যুদ্ধে মিশর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেই চলবে। কিন্তু যুদ্ধের গতি যেভাবে চলেছে তাতে তাঁর এ নীতি মেনে চলা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে কি না বলা যায় না। সন্ধি অনুযায়ী অবশ্য বৃটেন মিশর রক্ষার জন্য দায়ী, কিন্তু যুদ্ধ যদি একান্তই মিশরের হৃদপিণ্ডের উপর এসে দেখা দেয় তবে সে কি তা কেবল নিরপেক্ষ দর্শক রূপেই দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে, অস্ত্রবল তার যতই হীন হোক তার ঝনৎকার কি একবারও হবে না? তেমন সংকটকাল উপস্থিত হ'লে মিশর সত্যই কি নীতি অবলম্বন করে দেখবার বিষয়।

কবিতা

চাঁদ

শ্রীঅপরূপ ভট্টাচার্য

অনাদি কালের ওগো অক্ষয় চাঁদ
সত্য যে তুমি সুন্দর তব জ্যোতি
তোমার জীবনে ঘটে কত পরমাদ
তবু কেন হায়! নাহি তব কোন ক্ষতি?
মূঢ় আঁখি লয়ে অনিমিষ চেয়ে থাকি
উৎস তোমার কোথাও পাই না খুঁজি'
চির রহস্যে নিজেরে এরূপে ঢাকি,
যুগে যুগে তুমি বল কি করিছ পুঁজি?
বিপুলা পৃথিবী ইতিহাস আছে তার
ঐতিহাসিকে অন্ধ করেছ তুমি

তুমি কি গো শুধু ইন্ধন কবিতার
হয়ে রবে চির, পৃথিবী বক্ষ চুমি'?
পৃথিবীর বুকে বাজিবে প্রলয় ভেরী
সুন্দর তুমি জাগিয়া রবে কি তবু?
এমনি করিয়া কালের প্রবাহ ঘেরি'
তোমার মৃত্যু দেখিবে না কেহ কভু?
ওগো সুন্দর তুমি শুধু একবার
অসীম হইতে আমাতে আসিবে কি?
'মোনালিসা' হের আজো ফেলে আঁখিধার
তেমনি করিয়া কাঁদ বসে আমি দেখি

কঙ্কালময়ার প্রেম

শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম এ

পৃথিবীর জীর্ণ কক্ষদ্বার প্রকম্পিয়া,
মাগিছে পিড়ীত আত্মা করুণার দান।
ভিক্ষুকের অনন্ত কামনা,
গুমরিয়া ফিরে,
অতৃপ্তির ব্যর্থ বেদনায়।
গোধূলি প্রহরে কেন প্রভাতের আশীর্বাদ মাগি,
মেঘলুপ্ত ধ্রুবজ্যোতি দীর্ঘ তমসার
প্রেমিকার অভিমানে হে কঙ্কালময়ী
চাহিতেছো পুণ্য অধিকার,
বিশ্ববাসন্তিকা যবে ঘোষে বিশ্বে
কালবৈশাখীর রুদ্র অভিশাপ?
তুমি কি শোন নি গূঢ় অবোধ ক্রন্দন,
দেখনি কি হুতাশন আমার নয়নে?
সত্য সাধনায় রাজে জীবনের প্রেম।
উচ্চ-চূড়ে বাঁধি বাসা যে সব দানব,
বণিকের বৃত্তি লয়ে রচে গন্ডী প্রতি মুহূর্তের,
ক্ষুধিতের প্রতি করে ইঙ্গিত চালনা,
বঞ্চিতের পরম প্রসাদ
ভাগ করি লয়ে, রচে সৌধ মনোহর
সহস্র বিলাসে,
মানবের অধিকারে নিষ্ঠুর হেলায়,
নাসিকা কুঞ্চনে ঠেলি দূরে,
মত্ত থাকে রাত্রি অভিসারে;
গর্বান্ধ সেই হিংস্রতা জর্জর
করে ক্ষুব্ধ নিখিলের প্রত্যেক জীবন।
হে কঙ্কালময়ী,
সেই তব বক্ষ হ'তে রক্ত চুষি লয়ে
রেখে যায় ব্যাধির সমাধি ;—
প্রেমের নিকুঞ্জে তাহা ঘোর ব্যতিক্রম।
হে কঙ্কালময়ী, আমি যে কঙ্কালময়,
কোথা মোর প্রেম?
আমার বিষাক্ত শ্বাস আবর্তিছে বেদনা আকাশে।
আমার প্রেমের তৃপ্তি যৌবন চক্রান্তে
কামনান্ত পরম বিস্বাদে।
তাই দেখা দেয় কোলাহল

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কলহ-বিষাদ।
তোমার বিশীর্ণ আত্মা দেয় অভিশাপ।

আজ-কাল

মিশরের যুদ্ধ

লিবিয়া থেকে মিশরে জেনারেল রোমেলের অভিযান বৃটিশ আধিপত্যকে বিপন্ন করে' তুলেছে। প্রথমে বৃটিশবাহিনী লিবিয়া-মিশর সীমান্তে হালফায়া-সোল্লুম-কাপুৎসো ত্রিভুজে জার্মানদের প্রতিরোধ করবার জন্যে ঘাঁটি করে ছিল। সকলে মনে করেছিল যে, এইখানে একটা জোর যুদ্ধ হবে; কিন্তু জার্মানবাহিনীর মিশর আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল যে, জার্মানরা সিদিবারানির পূবে এসে গেছে এবং তারা এক দিনে ৮০ মাইল মরু পথ অতিক্রম করেছে। সীমান্তে লড়াইয়ের যে কি হ'ল এবং কিভাবে জার্মানরা আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে এল তার কোনও বিবরণ দেওয়া হয় নি। তারপর শোনা গেল যে, প্রধান যুদ্ধটা মার্সা মাত্রুর সামনে হবে। মার্সা মাত্রু মিশরে বৃটিশ নৌ ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রায় ১৭০ মাইল পশ্চিমে। মাত্রুর পর আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত আর উল্লেখযোগ্য কোনও উপকূল ঘাঁটি নেই।

কিন্তু এর পরই জানা গেল যে, জার্মানবাহিনী দক্ষিণ দিক দিয়ে মার্সা মাত্রু পার হ'য়ে গেছে; পর দিন শোনা গেল, বৃটিশবাহিনী মার্সা মাত্রু পরিত্যাগ করেছে। অর্থাৎ মার্সা মাত্রুর পশ্চিমে আর প্রধান যুদ্ধটা হ'ল না, এখন পূবে আলেকজান্দ্রিয়ার আগে হ'বে বলে' আশা করা যায়। মাত্রু থেকে বৃটিশবাহিনী পেছনে সরে' আসছে; কিন্তু জার্মানরা মাত্রুর পূবে সমুদ্র তীরের পথ বিচ্ছিন্ন করে' দিয়েছে একটা খবর পাওয়া গেছে। বৃটিশবাহিনী এর পশ্চিমে আছে কিনা জানা যায় নি, থাক্‌লে তারা ঘেরাও হয়ে পড়্‌বে। এখন আলেকজান্দ্রিয়া রক্ষা করবার জন্যে ইংরেজকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে; কারণ এই ঘাঁটি হাত ছাড়া হ'লে মধ্য প্রাচ্যে বিপদ সাংঘাতিক হ'য়ে উঠ্‌বে এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে বৃটিশ নৌবাহিনী বিদায় নিতে হয়তো বাধ্য হবে। মিশরের যুদ্ধে বৃটিশ নৌবাহিনী কি অংশ গ্রহণ করছে তার কোনও খবর প্রকাশ পায় নি। জার্মানরা উপকূল ধরে' আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক দিয়েও নীল নদের উপত্যকার দিকে যাচ্ছে। জার্মানদের বাধা দেবার জন্যে ইংরেজরা কি পরিকল্পনা করেছে, কর্মক্ষেত্রে সেইটাই এখন দেখ্‌বার বিষয়। তব্রুকের পতনের পর মিঃ চার্চিল ভরসা দিয়ে বলেছিলেন যে, অবস্থা যতটা গুরুতর মনে করা হচ্ছে ততটা গুরুতর নয়, ইংরেজরা মিশরের অবস্থা সামাল দিতে পারবে।

কিন্তু তব্রুকের পতনে ইংলণ্ডে যে বিক্ষোভ দেখা দেয় তা শান্ত হয় নি। কমন্স সভার রক্ষণশীল সদস্য স্যার ওয়ার্ডল মিল্‌নে যুদ্ধের কেন্দ্রীয় পরিচালনা অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ প্রধানত মিঃ চার্চিলকে (কারণ তিনি দেশরক্ষাসচিব) নিন্দে করে' এক প্রস্তাব এনেছেন। ভূতপূর্ব সমরসচিব মিঃ হোর বেলিশা, এডমিরাল স্যার রজার কীজ এবং অন্যান্য দলের কয়েকজন সদস্য এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। মিঃ চার্চিল গভর্নমেণ্ট গঠন করার পর তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব। শীগ্গিরই লিবিয়া সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এই বিতর্ক হবে।

জার্মানরা মিশর-সীমান্ত পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশরের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাহাস পাশা তাঁর গভর্নমেণ্টের নীতি সম্পর্কে এক ঘোষণা করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ঘোষণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং আগ্রহজনক, বিশেষত ভারতবাসীর পক্ষে। নাহাস পাশা বলেন যে, গত ২১শে এপ্রিল পার্লামেণ্টে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী মিশরীয় গভর্নমেণ্ট যুদ্ধে যোগদান করবে না। তিনি আরো বলেন, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁরা মিশরের বিরুদ্ধে যে কোনো আক্রমণ হটিয়ে দেবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প। তিনি গুজবের বিরুদ্ধে এবং গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে' দেন এবং বলেন যে, মিশরীদের নিরাপত্তার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

সোভিয়েট ভূমিতে জার্মান আক্রমণ

সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনী এক নতুন আক্রমণ আরম্ভ করেছে। এ আক্রমণের গতি হচ্ছে কুর্স্ক-এর দিকে। এটা মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের সংযোগস্থল অর্থাৎ এইখানে জেনারেল জুকভ এবং মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর সংস্পর্শ-সীমা। অনেকে জার্মানীর এই আক্রমণকে বহু ঘোষিত গ্রীষ্মকালীন অভিযান বলে' অনুমান করেছেন। জার্মান হাইকমাণ্ড নাকি সোভিয়েট বাহিনীকে তিনভাগে বিচ্ছিন্ন করে' ফেল্‌বার পরিকল্পনা নিয়ে এই আক্রমণ আরম্ভ করেছে। ভোলখভ রণাঙ্গনে ইতিমধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

খারকভ এলাকায় জার্মান আক্রমণ খানিকটা সাফল্য লাভ করেছে। জার্মানরা খারকভের দক্ষিণ-পূর্বে রেলওয়ে জংশন কুপিয়ান্স্ক দখল করেছে। ঐ এলাকায় যুদ্ধ এখনো সাংঘাতিকভাবে চল্‌ছে।

এখনো সেবাস্তোপোল অবিচলিত আছে। জার্মানরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে'ও আক্রমণ চালাচ্ছে এবং নতুন নতুন সৈন্য আমদানী করছে। সেবাস্তোপোলের অবস্থা যে সঙ্গীণ তাতে সন্দেহ নেই; শিশুদের ও কিছু অসামরিক অধিবাসীকে সেদিন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেভাবে প্রায় চার সপ্তাহ ধ'রে সেবাস্তোপোল প্রতিরোধ করছে তা অভূতপূর্ব। এর আগে কোনো একটা স্থান এ রকম আক্রমণ সহ্য করে নি। জার্মনরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, ইতিহাসে এ রকম তীব্র যুদ্ধ কখনো হয় নি; প্রত্যেক ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই করতে হচ্ছে। বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও সেবাস্তোপোলে চমৎকার। একদিন ৮০০ বোমা পড়ে; কিন্তু তাতে নিহত হয় মাত্র একজন ও আহত হয় একজন। সোভিয়েট নৌ-সৈনিকদের ক্রাইমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করার একটা বে-সরকারী সংবাদ পাওয়া যায়; কিন্তু এর পর কোনো খবর আসে নি।

তুরস্ক থেকে হঠাৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সহকারী সামরিক উপদেষ্টা এবং দৌত্য-বিভাগের কর্মচারীদের পত্নীরা রুশিয়ায় চলে' এসেছেন। এর তাৎপর্য কি? মিশরে এবং দক্ষিণ রুশিয়ায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী কি তুরস্কের ভিতর দিয়ে অভিযান করবার মতলব করেছে?

সুদূর প্রাচ্য

চীনে যুদ্ধ একইভাবে চল্‌ছে। জাপানীরা চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলওয়ে দখল করার চেষ্টা করছিল; কিন্তু চীনাদের বাধাদানে তা সফল হয় নি। চীনারা জাপানীদের পূব দিকের বাহুর প্রান্তে কোয়েকি শহর পুনরধিকার করেছে। জাপানীরা আবার চেকিয়াং প্রদেশে লিশুই দখল করেছে। চীনারা শান্‌সি-হোনান সীমান্তে লিনশিয়েন পুনরধিকার করেছে। কিয়াংসির টাংস্টেন খনিগুলো দখল করা জাপানীদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কোয়াংতুং প্রদেশের সীমান্তের কাছে অবস্থিত এই খনি-এলাকা থেকে জাপানীরা এখনো যথেষ্ট দূরে আছে।

কোরিয়ায় ফেব্রুয়ারী মাসে এক বিদ্রোহ হওয়ার খবর সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রোহ হয় উত্তর কোরিয়ায় এবং বিদ্রোহের ফলে

১০০০ জাপানী নিহত হয়; ২২টি বিমান আগুনে ধ্বংস হয় ও অন্যান্য সামরিক ক্ষতি হয়।

মিডওয়ে যুদ্ধে জাপানীদের ক্ষতির হিসাব মার্কিন নৌ-বিভাগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, জাপানীদের চারটি বিমানবাহী জাহাজ ও সেই সঙ্গে ২৭৫টি বিমান, দুটি ভারি ক্রুজার, তিনটি ডেস্ট্রয়ার এবং এক বা ততোধিক সৈন্যবাহী জাহাজ জলমগ্ন হয়। এ ছাড়া দু তিনটে ব্যাট্‌ল্‌শিপ, দুটো ভারি ক্রুজার ও চারটি সৈন্যবাহী জাহাজ জখম হয়।

অন্যান্য খবর

এক হাজারের বেশী বিমান আবার জার্মনীর উপর হানা দেয়। লক্ষ্য ছিল ব্রেমেন। এই জার্মান বন্দরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে বলে' ইংরেজরা দাবী করছে।

সোভিয়েট সরকারী বিবৃতিতে জানা গেল যে, জাপানের উপকূলের কাছে জাপানী সাবমেরিনের আক্রমণে একটা সোভিয়েট জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। জাপানীরা দোষটা মার্কিন সাবমেরিনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে।

চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসীরা হাইড্রিখের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে এখনও ক্ষান্ত হয় নি। ২১শে জুন পর্যন্ত তারা ৫২০ জনের (তার মধ্যে ৭২ জন স্ত্রীলোক) প্রাণ হরণ করেছে; আর একটা গ্রামও তারা ধ্বংস করেছে।

মিঃ চার্চিল নিরাপদে ইংলণ্ডে ফিরেছেন। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের সঙ্গে তাঁর আলোচনার শেষ দিকে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ লিট্‌ভিনফ এবং সোভিয়েট সমরবিদরা আলোচনায় যোগদান করেন। আশা করা যায়, অনতিবিলম্বে এই বৈঠক সম্বন্ধে একটা যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হবে।

ভারতবর্ষ

গান্ধীজীর অভিমত

ভারতবর্ষে বৃটিশ অবস্থান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত গান্ধীজী এক প্রবন্ধে পূর্ণতরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের পরিকল্পিত অবস্থান নিয়ে জনসাধারণের মনে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তা খুবই বাস্তব। অপসরণ ঘোষণার পর মিত্রশক্তির সামরিক কার্যকলাপের প্রয়োজন জনগণ কিংবা উচ্চ শ্রেণী কেউই উপলব্ধি করবে না। কিন্তু প্রয়োজন যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরিহার্য ঘটনাকে জনসাধারণ মেনে নেবে বলে' আশা করা যায়। আমার প্রথম লেখায় ফাঁক ছিল; সেটা প্রথম আমাকে দেখিয়ে দেওয়া মাত্রই আমি পূরণ করি। জাপানীদের ঠেকিয়ে রাখ্‌বার মতো নিশ্ছিদ্র অহিংস কাজের কোনও গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি না। মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা হঠাৎ সরে' গেলে জাপানীরা ভারতবর্ষ দখল করে' নিতে পারে এবং চীনের নিশ্চিত পতন হবে। আমার কাজ থেকে এ রকম সর্বনাশ দেখা দিতে পারে বলে' আমার কোনও ধারণা ছিল না। অতএব আমি মনে করি যে, আমার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, যদি মিত্রপক্ষ জাপানী দখল নিবারণের জন্যে ভারতবর্ষে থাকা প্রয়োজন মনে করে তাহলে থাক্‌তে পারে। তবে বৃটিশ অপসরণের পর যে জাতীয় গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হবে সেই গভর্নমেণ্টের নির্ধারিত সর্ত মেনে তাদের থাক্‌তে হবে। বৃটেন বা আমেরিকা কেউই আমার মতো অহিংসায় বিশ্বাসী নয়। আমি এ কথা বল্‌তে পারি না যে, অহিংস প্রচেষ্টা ভারতবর্ষকে জাপানী বা অন্য কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে অজেয় করবে। এ কথা পর্যন্ত আমি দাবী করতে পারি না যে, সমস্ত ভারতবর্ষ ঠিক মতো অহিংস। এ অবস্থায় আমার প্রস্তাবের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মিত্র সৈন্যদের অবিলম্বে অপসরণ দাবী করা আমার পক্ষে ভণ্ডামি হবে। আমার পক্ষে এইটুকু ঘোষণা করা যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষের সৈন্য দিয়ে আত্মরক্ষার দরকার নেই; কারণ জাপানের সঙ্গে তার বিবাদ নেই।"

শ্রীরাজাগোপালাচারী ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে' বোম্বাইতে যান। সেখানে দুই দিন তিনি জিন্নার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেন। বোম্বাই থেকে ফেরার পথে তিনি আবার গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এখন তাঁর স্লোগান হচ্ছেঃ "ঐক্যবদ্ধ পরাধীন ভারতের চেয়ে বিভক্ত স্বাধীন ভারত কাম্য।"

জওহরলালের সতর্কবাণী

পণ্ডিত জওহরলাল এক বিবৃতিতে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তি সম্বন্ধে ভারতবাসীকে সতর্ক করে' দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আবার পৃথিবীকে এক দিকে শ্রমশিল্পপ্রধান ও উৎপাদক গোষ্ঠী এবং অন্য দিকে কাঁচা মাল উৎপাদক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ধরে' নেওয়া যেতে পারে ভারতবর্ষ শেষোক্ত দলে। দ্বিতীয়ত, মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের উপর দিয়ে বৃটেনের কাছ থেকে সুখসুবিধে চাচ্ছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, বৃটেনের সুবিধের জন্যে ভারতবর্ষকে প্রায়ই বোঝা বইতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে জওহরলাল আরও বলেছেন, "যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটা দিক বৃটিশ স্বার্থ ভোলে নি। সে হচ্ছে বৃটিশ পণ্যের জন্যে বিদেশের বাজার, বিশেষত ভারতীয় বাজার ধরে' রাখা। যুদ্ধের পর ভারতের শ্রমশিল্প যাতে বৃটিশ শ্রমশিল্পের সঙ্গে সংঘর্ষে না আসে সেজন্যে ঈস্টার্ন গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল ভারতের কোনও শ্রমশিল্পকে উৎসাহ না দিতে বিশেষ যত্ন নেন। ভারত গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের প্রয়োজন পর্যন্ত উপেক্ষা করে' মূল ভারতীয় শ্রমশিল্পের বিকাশ চেপে দিয়েছেন।" ভারতবর্ষে "ইউনাইটেড কিংডম কমার্সিয়াল কর্পোরেশন" যেভাবে কোনও কোনও জিনিসের একচেটে ব্যবসার অধিকার পেয়েছে, জওহরলালজী তারও উল্লেখ করেন।

খানাতল্লাস

ফরওয়ার্ড ব্লক বে-আইনী করার পর গোয়েন্দা পুলিস বাংলার বহু জায়গায় খানাতল্লাস করেছে। মফঃস্বলে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে হানা হয়েছে। কার্সিয়ংএ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতেও তল্লাস হয়েছে।

ঢাকার দাঙ্গা প্রশমিত হয়েছে। সামরিক পাহারা এখন তুলে নেওয়া হয়েছে।

৩০-৬-৪২

ওয়াকিবহাল



রক্সী—'আপনা ঘর'

সার্কো প্রডাকসন্সের 'আপনা ঘর' ছবিটি গত সপ্তাহ থেকে রক্সী ও মীনার চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শান্তা আপ্তে ও চন্দ্রমোহন। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন জগদীশ, মায়া ব্যানার্জি, গোপ প্রভৃতি। ছবির পরিচালক দেবকী বসু। প্রথমে গল্পের একটু আভাস দিয়ে নিই—

জগদীশ একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীর ম্যানেজার, তার একমাত্র কন্যা শান্তা, সুন্দরী বিদুষী ও দেশপ্রেমিকা। শহরের যত ভিখারী আর কুলী-মজুরের সে বন্ধু, লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের জীবনকে উন্নত করে তোলাই তার সাধনা, এর জন্য টাকা সে খরচ করে প্রচুর। স্নেহপরায়ণ পিতা মেয়ের খরচ যোগাতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়লেন, কোম্পানীর ডিরেক্টররা তাঁকে কাজ থেকে রেহাই দিলেন। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর চন্দ্রমোহন বয়সে তরুণ কিন্তু অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। এক মোটর দুর্ঘটনার ঘটনাচক্রে জগদীশের কন্যা শান্তার সঙ্গে তার চাক্ষুস পরিচয় হয়েছিল। চন্দ্রমোহন জগদীশকে বাঁচাবার জন্যে কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালে। পিতার মঙ্গলের জন্য শান্তা এ বিবাহে সম্মতি দিল। ইতিমধ্যে জগদীশের মৃত্যু হয়েছে।

বিবাহের পর শান্তা এল স্বামীর জমিদারীতে। এখানে এসে সে অনুভব করল যে, যে আদর্শ নিয়ে সে এতদিন দেশের সেবা করেছে সেই আদর্শকে প্রতিমুহূর্তে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা চলছে চতুর্দিকে। জমিদার চন্দ্রমোহন অত্যাচারী, তার আভিজাত্য সম্বন্ধে সে সচেতন। শান্তা গোপনে প্রজাদের মধ্যে গিয়ে তাদের সুখ সুবিধা ও জমিদারের অনুচরদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল।

চন্দ্রমোহন স্ত্রীর এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করলেন না, তাকে বন্দী রেখে উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে শান্তার একটি পুত্র ভূমিষ্ট হোলো। শান্তা ছেলেকে নিয়ে জমিদার ভবন ত্যাগ করে চলে যেতে চায়—যে দরিদ্রদের এতদিন সে সেবা করে এসেছিল সে দরিদ্রদের মাঝেই। চন্দ্রমোহন বাধা দিল, ছেলেকে নিজের কাছে রেখে স্ত্রীকে সে তাড়িয়ে দিলে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে।

এই গ্লানি ও বেদনাকে সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করবে বলে নদীতে ঝাঁপ দিল। এদিকে জমিদারের প্রজারা তাদের মাতৃতুল্য দেবীকে হারিয়ে হয়ে উঠলো বিদ্রোহী; তারা চন্দ্রমোহনকে হত্যা করবে বলে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। অনুতপ্ত চন্দ্রমোহন তাদের হাতে বন্দুক তুলে দিলে, প্রজারা জমিদারের এই পরিবর্তনে বিস্মিত হোলো। চন্দ্রমোহন তার স্ত্রীর স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখবার জন্যে অজস্র টাকা ঢেলে দিলেন প্রজাদের মধ্যে। স্ত্রীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হোলো।

শান্তার প্রাণরক্ষা পেল এক ধীবরের হাতে। মাছ ধরতে গিয়ে সে জল থেকে শান্তাকে উদ্ধার করলে। এদিকে চন্দ্রমোহনের পুত্রর মরণাপন্ন অসুখ, শহরের ডাক্তার এসে কিছুই করতে পারছে না। প্রজারা খবর দিল শান্তাকে দেখা গেছে জেলেদের পল্লীতে। জমিদার চন্দ্রমোহন নিজে লোক পাঠালেন তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। শান্তা প্রতিজ্ঞা করে যে গৃহ পরিত্যাগ করেছে, সে গৃহে সে ফিরে যেতে চাইলে না। কিন্তু ছেলের মরণাপন্ন অসুখের সংবাদে প্রতিজ্ঞা ভুলে সে ছুটে গেল এবং মরা ছেলেকে সে বাঁচিয়ে তুললে। চন্দ্রমোহনের সঙ্গে আবার তার মিলন হলো।

বাঙলা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর দেবকী বসুর এইটিই প্রথম ছবি। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। এই ছবির মধ্য দিয়ে দেবকী বসু একটি বলিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই ছবির মূল মন্ত্র হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সব দহে।" এই কারণেই বোধ হয় ছবিটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অন্যায় অত্যাচার আর দরিদ্রদের পক্ষ থেকে সেই অন্যায়কে নীরবে সহ্য করা এই দুইয়েরই প্রতিবাদস্বরূপ শান্তার চরিত্রটি খাড়া করা হয়েছে।

দেবকীবাবু জহুরী লোক, তিনি জানেন ভাবপ্রবণ ভারতবাসীর মনের পরিচয়। তাই ছবির আরম্ভ থেকেই সুরু হয়েছে ট্র্যাজেডী আর ক্লাইম্যাক্স তার জের চলেছে একটানা ছবির শেষার্ধ পর্যন্ত। ছবিটিকে মিলনান্তক করবার জন্যে শেষের দিকে অত্যন্ত স্থূলভাবে টেনে লম্বা করা হয়েছে। ছবি শেষ হয়েও যেন হতে চায় না। পরিচালনার দিক দিয়ে দেবকীবাবু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আগাগোড়া, শেষ রক্ষাটুকু করতে পারেন নি। শেষের দিকে ছবিটি অতিরিক্ত মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়ায় রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

সিনেমা জগতে শান্তা আপ্তে গান ও অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত, অভিনেতা হিসাবে চন্দ্রমোহনের খ্যাতি আছে। শান্তা আপ্তের অভিনয় আশানুরূপ হয়নি, কারণ চরিত্রের দৃঢ়তা ফুটে ওঠেনি। চন্দ্রমোহনের চরিত্রের গাম্ভীর্যের দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে দর্শকদের মনকে নাড়া দেয়। শান্তার গানগুলি ভাল, ছবির দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয়।



কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন ডিভিসনের খেলা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে, ইহাই বর্তমানে সকল ক্রীড়ামোদীর একমাত্র আলোচ্য বিষয়। প্রথম ডিভিসনে ইস্টবেঙ্গল দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহাই সকলের ধারণা। এই দল এখনও পর্যন্ত মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দল অপেক্ষা কয়েক পয়েন্টে অগ্রগামী আছে। তবে দলের খেলা পূর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হইয়াছে। পাগসলে, আপ্পারাও প্রভৃতি খেলোয়াড় দলে যোগদান করায় দলের শক্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহার বিপরীত ফলই দেখা যাইতেছে। বিশেষ করিয়া পাগসলেকে দলে স্থান দেওয়া অনুচিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে মনে করেন। এই খেলোয়াড়টি পূর্বে কলিকাতা মাঠে যেরূপ সুনামের সহিত খেলিয়াছিলেন বর্তমানে সেই নৈপুণ্য, সেই দক্ষতার কোনই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। বরঞ্চ ইনি দলের জয়লাভের অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছেন। ফাঁকা গোলের মুখে বল পাইয়া পর্যন্ত গোল করিতে পারিতেছেন না। প্রথম খেলাতে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ার পরেও ইস্টবেঙ্গল দলের পরিচালকগণ কেন যে ইঁহাকে দলে রাখিয়াছেন ইহা বুঝা যাইতেছে না। লীগের প্রথম ভাগের খেলায় এইরূপ একজন খেলোয়াড়কে পরীক্ষামূলক হিসাবে দলে রাখা চলিত, কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা যুক্তিসংগত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। মোহনবাগান দল লীগের দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনায় যেরূপ দৃঢ়তার সহিত খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এখনও পর্যন্ত তাহা বর্তমান আছে। লীগের শেষ খেলাটি পর্যন্ত এইরূপ খেলিতে পারিলে চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা তার আছে। সম্প্রতি পুলিশ দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, "মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ান হইবার কোনই আশা নাই।" কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সেরূপ হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। চ্যাম্পিয়ানসিপের আশা এখনও আছে। মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়গণকে কিন্তু সেইজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। অবশিষ্ট সকল খেলায় বিজয়ী হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা এখনও উন্নততর হয় নাই। লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় এই দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ খেলিতেছিলেন বর্তমানেও সেইরূপ খেলিতেছেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, তাহাতে দলের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের আশা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। মোহনবাগানের সহিত এই দল সমান তালেই পা ফেলিয়া চলিয়াছে। মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলের সহিত যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া ধারণা হয়, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রচেষ্টাও তাহা অপেক্ষা কম হইবে না। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এই দুইটি দলকে শেষ পর্যন্ত যে চ্যাম্পিয়ানসিপ হইতে বঞ্চিত করিবে কিনা তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলা চলে না। মহমেডান দলের রক্ষণ ভাগের শক্তি পূর্বে যেরূপ দুর্বল বলিয়া মনে হইয়াছিল বর্তমানে তাহার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। এই বিভাগের খেলোয়াড়গণ উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবানীপুর দল লীগ তালিকার চতুর্থ স্থানেই শেষ পর্যন্ত থাকিবে বলিয়া মনে হয়। এই দলের খেলোয়াড়গণের খেলাতেও উন্নতি দেখা দিয়াছে। খ্যাতনামা অভিজ্ঞ গোলরক্ষক কে দত্ত এই দলের সুনাম বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার বিচক্ষণ খেলা দলের শক্তি বিশেষভাবেই বৃদ্ধি করিয়াছে। এরিয়ান্স ক্লাবের খেলা পূর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ ভাল খেলিলে কি হয়, রক্ষণভাগের দোষেই এই দলের পক্ষে পয়েন্ট সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি দলের খেলা লীগের সূচনায় যেরূপ ছিল বর্তমানে তাহার কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। লীগ তালিকার নিম্নভাগে এই সকল দলকে প্রতিযোগিতার শেষেও দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয়। ইউরোপীয় কোন দলেরই লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা নাই। লীগ তালিকার নিম্নভাগেই এই সকল দলকে শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় ডিভিসন

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের খেলায় রবার্ট হাডসন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। লীগ তালিকায় এই দল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর সহিত এই দলের ৯ পয়েন্টের ব্যবধান হইয়াছে। অবশিষ্ট খেলার মধ্যে এত অধিক পয়েন্টের ব্যবধান কোনরূপেই অপসারিত হইবে না। রবার্ট হাডসন দলের বিশেষ কৃতিত্ব যে, এই পর্যন্ত লীগের কোন খেলাতেই এই দল পয়েন্ট নষ্ট করে নাই। প্রত্যেকটি খেলাতেই সে বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। রাণার্স আপ কোন্ দল হইবে বলা কঠিন। তবে এই নামটি অর্জনের জন্য সুবার্বণ ও অরোরা দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

তৃতীয় ডিভিসনে উত্তরপাড়া ও ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। কোন্ দল যে চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না। তবে অনেকের মতে ক্যালকাটা পুলিশ দলই এই সৌভাগ্য লাভ করিবে।

নিম্নে বিভিন্ন ডিভিসনের লীগ তালিকার প্রথম চারিটি দলের নাম প্রদত্ত হইল :—

প্রথম ডিভিসন

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৫	৩	১	৪৯	৭	৩৩
মোহনবাগান	১৮	১২	৪	২	৪৩	১৩	২৮
মহমেডান স্পোর্টিং	১৭	১০	৬	১	৩১	১০	২৬
ভবানীপুর	১৮	৯	৬	৩	২৩	৯	২৪

দ্বিতীয় ডিভিসন

রবার্ট হাডসন	১২	১২	০	০	৩৪	৪	২৪
সুবার্বন	১২	৫	৫	২	১২	৭	১৫
অরোরা	১১	৫	৪	২	১৫	৬	১৪
হাওড়া ইউঃ	১২	৬	১	৫	১৬	৭	১৩

তৃতীয় ডিভিসন

উত্তরপাড়া	১১	৮	২	১	১৭	৬	১৮
ক্যালঃ পুলিশ	১০	৮	১	১	২০	৩	১৭
সাউথ ক্যালঃ	১১	৫	৪	২	১০	৪	১৪
জোড়াবাগান	১০	৬	২	২	১৭	৫	১৪

করাচী পেণ্টাংগুলার ক্রিকেট

করাচী পেণ্টাংগুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় হিন্দু দল বিজয়ী হইয়াছে। এইবার লইয়া পর পর তিনবার হিন্দু দল বিজয়ী হইল। ফাইন্যালে হিন্দু দলের সহিত মুসলিম দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও ৫ উইকেটে পরাজিত হয়। উভয় দলে নামজাদা কোন খেলোয়াড় না খেলিলেও খেলাটি কোন অংশেই নিম্নস্তরের হয় নাই। রাণ উঠাইবার জন্য উভয় দলের খেলোয়াড়গণই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং সকল বিভাগেই খেলোয়াড়গণের কৃতিত্ব প্রদর্শনের কোন ত্রুটি হয় নাই। ভবিষ্যতে এই সকল খেলোয়াড়গণের মধ্যে কেহ কেহ যে নামজাদা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করিবেন সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। নিম্নে ফাইনাল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

হিন্দু দলঃ—প্রথম ইনিংসে ৩৪৪ রাণ, দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইঃ ১৩০ রাণ।

মুসলিম দলঃ—প্রথম ইনিংসে ২৬৭ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২০২ রাণ।

পাঞ্জাবে সন্তরণ বিষয়ের উন্নতির প্রচেষ্টা

পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিনই সন্তরণ বিষয়ে বাঙলাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। যতবার নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ততবারই বাঙলার সাঁতারুগণকে প্রাধান্য লাভ করিতে করিতে দেখা গিয়াছে। নিখিল ভারত সন্তরণ অনুষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাঞ্জাবের সাঁতারুগণ যতবার বাঙলা দেশে বিভিন্ন ক্লাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আসিয়াছেন, ততবারই প্রত্যেক ক্লাবের নিকট সন্তরণের বিভিন্ন বিষয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রশংসার বিষয় এই যে, পাঞ্জাবের সন্তরণ পরিচালকগণ ইহাতে কোন দিনই হতাশ হন নাই। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, একদিন না একদিন তাঁহারা বাঙলার সাঁতারুগণকে বিভিন্ন বিষয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবেন। এই আশা কবে পূর্ণ হইবে বলা কঠিন, তবে ইহাতে উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় কোনরূপ শৈথিল্য দেখা যায় নাই। সেইজন্য তাঁহারা যে সন্তরণের বিভিন্ন বিষয় উন্নতি করেন নাই ইহা বলিলে অন্যায় করা হইবে। ৭ বৎসর পূর্বে এই প্রদেশের সাঁতারুগণ যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন, তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছেন। সম্প্রতি লাহোরে যে সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহার ফলাফল খুবই আশাপ্রদ। সন্তরণের কয়েকটি বিষয় তাঁহারা প্রায় বাঙলার স্ট্যাণ্ডার্ডের নিকট পৌঁছিয়াছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলে বাঙালী সাঁতারুগণ এই সকল বিষয়ে সহজে বিজয়ী হইতে পারিবেন না; রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে। পুরুষ বিভাগের উন্নতির সংগে সংগে এই প্রদেশের পরিচালকগণ মহিলা বিভাগেও দৃষ্টি দিয়াছেন। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রীগণ যাহাতে সন্তরণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৌশল সকল আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফল স্বরূপ সম্প্রতি লাহোরে মহিলাদের এক বিশেষ সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেশী না হইলেও সকল বিভাগে প্রতিযোগিতা করিবার বালিকা বা মহিলার অভাব হয় নাই। এইরূপভাবে পাঞ্জাবের সন্তরণ পরিচালকগণ যদি কর্মতৎপর হন, তবে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা যে মহিলা বিভাগেও বাঙলাকে বেশ বেগ দিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণ এই সকল ব্যবস্থা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি করিয়া যে নীরব থাকিতে পারেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। "নিজ প্রদেশের সন্তরণের উন্নতি কি করিয়া হয়" এবং "কেমন করিয়া সেই সুনাম অক্ষুন্ন থাকে" তাহা চিন্তা করিবার অবসর যদি পরিচালকগণের না থাকে, তবে আমাদের মনে হয় তাঁহাদের উচিত এই গুরুভার পরিত্যাগ করা। তাঁহারা হয়তো বলিতে পারেন যে, কেহ এই ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন না বলিয়াই তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাহার উত্তরে এইটুকুই বলিব "একবার ছাড়িয়া দেখুন না কেন?" বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতির দোহাই তাঁহারা দিবেন ও বলিবেন অনেক কিছু স্থির করিয়াও কার্য করা সম্ভব হইতেছে না। সে কথা হয়তো বর্তমানে খাটিতে পারে, কিন্তু ইতিপূর্বেও তাঁহাদের কার্যকলাপে বাঙলার সন্তরণ উন্নতির জন্য তাঁহারা যে খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কেবল বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দিন স্থির করিয়া দিয়া ও অনুষ্ঠানের সময় বিচারকের কার্য করিয়াই তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য কর্ম শেষ করিয়াছেন। শিক্ষার ব্যবস্থা দূরের কথা, কোন দিন উন্নতি করিবার উপায় বা পথ সম্পর্কে কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন নির্দেশ, দেন নাই। বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালীর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। উৎসাহী সন্তরণকারী বা কারিণীগণ যাহাতে বৈদেশিক সন্তরণ বিশেষজ্ঞগণের পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করে, তাহার জন্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত করিবার কল্পনাও তাঁহারা করেন নাই। এইরূপভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সন্তরণ প্রয়োজনীয় যতগুলি ব্যবস্থা আছে, তাহার একটিরও প্রতি তাঁহারা কোনদিন দৃষ্টি দেন নাই।

সমর বার্তা

২৩শে জুন

রুশিয়া—মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, খারকভ রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। 'প্রাভদা'র সংবাদে প্রকাশ, সেবাস্তোপোলের কর্তৃক অধিবাসী, বিশেষ করিয়া শিশুদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে।

মিশর সীমান্তে চরম মুহূর্ত দেখা দিয়াছে। সোল্লুম—ফোর্ট ক্যাপুজো-হাল্‌ফায়া এলাকায় এবং সীমান্ত বরাবর আরও দক্ষিণে অষ্টম আর্মি শত্রুর প্রথম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ফিল্ড মার্শাল জেনারেল রোমেলের বাহিনী আক্রমণের জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি গাড়িতেছে।

চীন-চুংকিং-এর ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিনহোয়ার উত্তর-পূর্বে তাহাদের অবস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

২৪শে জুন

রুশিয়া-সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, খারকভ রণাঙ্গনে রুশ সৈন্যেরা অল্প কিছু হটিয়া নূতন ঘাঁটিতে আসিয়াছে।

চীন-চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, কিয়াংসি-চেকিয়াং রেলওয়ের উপর জাপানীদের সাঁড়াশী ব্যূহের দুই মূল বিচ্ছিন্ন রাখিবার প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইয়া চীনারা কেঙ্কি শহর পুনরধিকার করিয়াছে। জাপ সৈন্যগণ চেকিয়াং প্রদেশের লিসুই দখল করিয়াছে।

২৫শে জুন

মিশর রণাঙ্গন—সোল্লুম ও সিদিওমর হইতে বৃটিশ বাহিনীকে সরাইয়া আনা হইয়াছে। গত রাত্রে প্রতিপক্ষের সম্মুখ সেনা সিদি-বারানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এক স্থানে গিয়া উপনীত হয়।

২৫শে জুন—

রুশিয়া—রুশ নৌ সৈন্যেরা ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। জার্মান রেডিওতে ঘোষিত হয় যে, সেবাস্তোপোল আক্রমণকারী জার্মান ও রুমানিয়ানদিগকে 'প্রতি গজ জমির জন্য লড়িতে হইতেছে।'

সোভিয়েট বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানের উপকূলের নিকটে একখানি সোভিয়েট জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। মনে হয়, একখানি জাপানী সাবমেরিণের দ্বারাই উহা নিমজ্জিত হইয়াছে।

তব্রুকের পতন হওয়ায় কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলের সদস্য স্যার জন ওয়ার্ডল' উইলনে চার্চিল গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। কমন্স সভার আরও ২০ জন সদস্য এই অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২৬শে জুন—

মিশর রণাঙ্গন—অগ্রগামী এক্সিস বাহিনী মার্সা মাত্রুর ত্রিশ মাইল পশ্চিমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গত রাত্রে সহস্রাধিক বৃটিশ বিমান জার্মানীর ব্রেমেন শহরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

রুশিয়া—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা খারকভের দিকে তাহাদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিপুল ক্ষতি সত্ত্বেও তাহারা পূর্বদিকে চাপ দিতেছে। সেবাস্তোপোল রণাঙ্গনে নূতন দুই ডিভিসন জার্মান ও এক ডিভিসন রুমানিয়ান সৈন্য আসিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রুশ সৈন্যেরা কুপিয়ানস্ক শহর হইতে সরিয়া আসিয়াছে।

২৭শে জুন—

মিশর রণাঙ্গন—এক্সিস সৈন্যদল মার্সা মাত্রুর প্রায় ১৫ মাইল

রুশিয়া—মস্কোর বেতারের সংবাদে বলা হয় যে, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যদল ট্যাঙ্কের সাহায্যে জোর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সেবাস্তোপোলরক্ষী রুশ সৈন্যদল শহরের প্রবেশ পথের প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিতেছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় আমেরিকার সর্বপ্রথম অভিযাত্রী নৌবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। এই বাহিনীতে কয়েক সহস্র সৈন্য আছে বলিয়া অনুমান হয়।

২৮শে জুন—

মিশর রণাঙ্গন—গতকল্য অপরাহ্নে এক্সিস ও মিত্রবাহিনীর মধ্যে দুইটি প্রধান সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষ হইতেই মিশরের বিরাট সংগ্রাম সুরু হয়। একটি সংঘর্ষে শত্রুপক্ষীয় সাঁজোয়া-বাহিনী মার্সা-মাত্রুর দক্ষিণে বৃটিশ সৈন্যশ্রেণীর সহিত যুদ্ধ করে। অপর সংঘর্ষে বৃটিশ সাঁজোয়াবাহিনী আরও পশ্চিমে শত্রুপক্ষের একটি বড় সৈন্যদলকে আক্রমণ করে।

রুশিয়া—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মান ট্যাঙ্কসমূহ সেবাস্তোপোল রক্ষীদের পরিখা শ্রেণীর উপর আসিয়া পড়িলেও সোভিয়েট পদাতিক বাহিনী এক পদও পশ্চাদপসরণ না করিয়া তাহাদের ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করে।

২৯শে জুন—

রুশিয়া—হিটলারের সৈন্যদল কুরস্ক এবং খারকভের পূর্ব-দিকে আক্রমণ চালাইয়া সম্ভবত তাহাদের বহু বিঘোষিত গ্রীষ্ম-*কালীন অভিযান সুরু করিয়াছে। রুশ সৈন্যবাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করার জন্য হিটলার এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। মধ্য রুশিয়া হইতে ককেশাসকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে রস্টোভ দখল করার জন্যই সম্ভবত কুপিয়ানস্ক অঞ্চলে হিটলার আক্রমণ সুরু করিয়াছেন।* কেন্দ্রীয় রণাঙ্গনে সংগ্রামরত জেনারেল জুকভ পরিচালিত বাহিনীর সহিত মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনীর বিচ্ছেদ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে হিটলার সম্ভবত কুরস্ক অঞ্চলে নূতন আক্রমণ চালানর নির্দেশ দিয়াছেন।

মিশর রণাঙ্গন—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল মার্সা-মাত্রু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

চীন—চুংকিং-এর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, শত্রুর প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও চীনারা গত ২৩শে জুন সেনসি-হোনানে লিনসিয়েন পুনরধিকার করে। চীনা বিমানবহর কিয়াংসিতে জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া প্রায় ২ শত জাপানীকে নিহত করিয়াছে।

৩০শে জুন—

মিশর রণাঙ্গন—আজ লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিশরের অবস্থা স্পষ্টতঃই গুরুতর হইয়াছে। অদ্য মধ্য প্রাচ্যের সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য মার্সা মাত্রু এবং ফুকার মধ্যে কয়েকশত স্কোয়ার মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। গত ২৮শে জুন বৃটিশবাহিনী ফুকার পশ্চিমে এক স্থানে শত্রুপক্ষের একটি শক্তিশালী ট্যাঙ্কবহরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শত্রুপক্ষ পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু গতকল্য তাহারা পুনরায় অগ্রসর হইলে বৃটিশবাহিনী তাহাদিগকে বাধা দেয়। 'রয়টারের' সামরিক সংবাদদাতা কায়রো হইতে জানাইয়াছেন যে, শত্রুপক্ষের অগ্রগতি মন্দীভূত হইয়াছে এবং তাহারা এক্ষণে ফুকার পশ্চিমে রহিয়াছে। মার্সা মাত্রু হইতে ফুকার দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। মিঃ চার্চিল আজ লণ্ডনে ঘোষণা করেন যে, জেনারেল অকিনলেক লিবিয়ায় বৃটিশ অষ্টম আর্মির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

চীন—চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, শানসী-হোনান সীমান্তে থাইচেং-এর দক্ষিণ পূর্বে এলাকায় যে যুদ্ধ চলিতেছে.

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৩শে জুন—

গতকল্য ঢাকায় মোট ১৭ জন লোককে ছোরা মারা হয় এবং ছুরিকাঘাতের ফলে ৪ জনের মৃত্যু ঘটে।

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকার মোট ১৬২ জন রাজবন্দীর মধ্যে ১৩৮ জনকে মুক্তি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ক্রয় মিশনের দলপতি স্যার ষন্মুখম চেট্টি ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতার মেসার্স মার্টিন এন্ড কোম্পানীর মিঃ কে সি মহীন্দ্র স্যার ষন্মুখম চেট্টির স্থলে ভারতীয় ক্রয় মিশনের দলপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

সিন্ধু সরকার হুর অত্যাচার দমন আইন অনুসারে সাহাদাদপুর এবং সিনঝোর তালুকের অধিবাসী প্রায় দুই হাজার লোককে হুর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমানে সিন্ধু প্রদেশে হুর বন্দীদের সংখ্যা দুই হাজারেরও অধিক।

গতকল্য প্রাতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কার্শিয়াং গিদ্দা পাহাড়ের বাড়িতে খানাতল্লাসী হইয়াছে।

২৪শে জুন—

গতকল্য ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১৯টি ছুরিকাঘাত ও মারপিটের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গতকল্য যে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া মোট ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অদ্য প্রাতে এক ব্যক্তি ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে সকল দল ও উপদলের সর্বসম্মত মীমাংসার ভিত্তিতে ১৯৪২-৪৩ সালের নিমিত্ত ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয়।

গৌহাটির এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২৫শে জুন হইতে ডিমাপুরে আশ্রয়প্রার্থীদের ক্যাম্প বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজ গভর্নমেন্টে মাদ্রাজ শহরের কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত এস সোহন কুমার (ডাঃ সুব্বারায়নের পুত্র), পি রামমূর্তি এবং অন্যান্য তিনজনকে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। সর্বসমেত ১৬ জন কম্যুনিস্ট বন্দীকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেড় ঘণ্টারও অধিকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

২৫শে জুন—

ঢাকার দাঙ্গায় আহত আরও দুই ব্যক্তি হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া মোট ১৭ জনের মৃত্যু হইল। এ পর্যন্ত প্রায় ৫১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত দশ মাস ধরিয়া দিনাজপুরে প্রতিমা নিরঞ্জন সমস্যা ঝুলিতেছিল, অবশেষে উহার আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের আপোষ নিষ্পত্তির ভিত্তিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আগামীকল্য সকাল ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বাহির করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

২৬শে জুন—

পাঞ্জাবের গভর্নর সর্দার দলাউন্ধার স্থলে সর্দার বলদেব সিংকে তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্দার বলদেব সিং ইউনাইটেড পাঞ্জাব পার্টির নেতা। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ এবং তাঁহার মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তৎফলেই তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান পাইলেন।

পাঞ্জাবের সেখপুরা জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে একটি তরুণী ও অপর আটজনকে হত্যা করার অভিযোগে লাহোরের দায়রা জজ ১৩জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

"হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড"-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাগ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের আদালতে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের সম্পাদক এবং মুদ্রাকর যথাক্রমে মিঃ উইলিয়াম আর্থার মুর এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র পাত্রের বিরুদ্ধে যে মানহানির অভিযোগ করিয়াছেন, অদ্য তাহার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। এই দিন আসামী পক্ষ হইতে 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জি ডবলিউ টাইসনকে জেরা করা হয়। ১১ই জুলাই পর্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত আছে। ঐ দিন আসামীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইবে।

২৭শে জুন

ঢাকার অবস্থা এখন শান্তিপূর্ণ। হাঙ্গামার প্রারম্ভ হইতে এ পর্যন্ত মোট ৬১ জন হতাহত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা ১৭ জন।

হায়দরাবাদ সেণ্ট্রাল জেলে আরও ছয়জন হুরের ফাঁসী হইয়াছে। সামরিক আইন জারী হইবার পর এই ছয়জনকে লইয়া মোট ২৫ জনের ফাঁসী হইয়াছে।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, একটি প্রেস নোটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট প্রত্যেক গ্রামে পল্লীরক্ষীদলকে দুইটি পর্যন্ত বন্দুক দিতে সম্মত আছেন।

২৮শে জুন

"গান্ধীজীর চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিউ-ইয়র্কের "হেরাল্ড ট্রিবিউন" বলিয়াছেন, ওয়ার্ধা হইতে গান্ধীর হরেক রকমের মন্তব্যের সংবাদ আসিতেছে। এই সকল মন্তব্যে কেবল দুইটি উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ হইতে পারে—প্রথমতঃ ইহাতে জাপানীদের তুষ্ট করা যাইতেছে, দ্বিতীয়তঃ দিন দিন সংবাদের মধ্যে মিঃ গান্ধীর নাম বিশিষ্টভাবে ছাপা হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী বৃটিশেরে ভারত হইতে চলিয়া যাওয়ার যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, জনৈক সংবাদদাতা তাঁহার সেই দাবী সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন, উত্তরে মহাত্মা গান্ধী হরিজনে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

২৯শে জুন

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ওয়ার্ধায় গিয়াছেন। সেখানে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

গতকল্য বোম্বাই শহরের ফোর্ট অঞ্চলে পাঁচতলা দালানটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ফলে চারিজন শ্রমিক দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় এবং প্রায় একশত আহত লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়ছে।

৩০শে জুন

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর পক্ষ হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, অদ্য হাইকোর্টের বিচারপতি মিত্র, বিচারপতি খন্দকার ও বিচারপতি পালকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চ কর্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। হাইকোর্টের আর একটি স্পেশ্যাল বেঞ্চের (বিচারপতি কস্টেলো, বিচারপতি বিশ্বাস ও বিচারপতি লজকে লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার অনুমত চাহিয়া এই দরখাস্ত করা হইয়াছিল এবং সেই স্পেশ্যাল বেঞ্চ ঢাকার বিচারকারী জজের সহিত একমত হইয়া বাদী সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে পাঁচতলা দালানখানি ধ্বসিয়া পড়িবার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পরে ধ্বংসস্তূপ হইতে ২৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

দেশ

৯ম বর্ষ] শনিবার, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 11th July, 1942. [৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাম্রাজ্যবাদের মোহ—

ভারতের জনমতকে গ্রাহ্য করি না, নিজেদের মর্জি অনুসারেই চলিব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণের মুখে বরাবর এই কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। আজিকার এই সমর-সংকটেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারতীয় নীতির অন্তর্নিহিত সে মনোবৃত্তির এক তিলও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এদেশে এমন একদল লোক আছেন, যাঁহারা কিছুতেই পরানুগ্রহ-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোক এত ব্যাপারের পরও আশা করিতেছিলেন যে, চার্চিল সাহেব শুভবুদ্ধি লইবার জন্য আমেরিকায় যখন ছুটিয়াছিলেন এবং রুজভেল্টের সংগে পরামর্শ যখন তাঁহার হইয়াছে, তখন ভারতের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির নূতন পরিণতি নিশ্চয়ই একটা কিছু আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারত সচিব আমেরী সাহেব ইঁহাদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়াছেন। সেদিন পার্লামেণ্টের কোন সদস্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীদের সহিত পুনরায় আপোষ-আলোচনা চালাইবার জন্য কোন চেষ্টা হইবে কিনা। ভারত সচিব অবিচলিতচিত্তে উত্তর দিলেন,—না, ক্রীপস্ সাহেব যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহার পর এ সম্বন্ধে নূতন কিছু আর করিবার নাই এবং ক্রীপস্ সাহেবের সিদ্ধান্তই আজও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। ভারত সচিবের উক্তির একরূপ সংগে সংগেই নয়াদিল্লী হইতে আমেরী সাহেবের ঐ উক্তির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। একটি সংবাদে বড়লাটের শাসন পরিষদের দ্বিতীয় দফা সম্প্রসারণ ঘোষণা করা হইল। ঘোষণায় দেখা গেল ১২ জন সদস্যের স্থলে এবার ১৫ জন সদস্যকে লইয়া বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছে এবং এই ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন ভারতীয়। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কার্যত কি মূল্য আছে? প্রধান প্রধান দপ্তর যে কয়টি, সেগুলি ইংরেজদের হাতেই রাখা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগ প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনের ক্ষেত্র যে দুটি সে দুটির একটিতেও ভারতবাসীদের স্থান হয় নাই। ইহা ছাড়া ওয়ার-ট্রান্সপোর্ট বিভাগের ভার, যেখানে প্রকৃত দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব প্রতিপালন ব্যাপারে ব্রিটিশ স্বার্থের ঝুঁকি কিছু আছে, সে দপ্তরটিও বিশ্বাস করিয়া ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হয় নাই। বিলাত হইতে ব্রিটিশ বণিক সমাজের স্বার্থের বড় একজন প্রতিনিধি স্যার এডওয়ার্ড বেন্থালকে সেখানে আনিয়া বসান হইয়াছে। বস্তুত সরকারের পক্ষের নীতির কার্যত পরিপোষক কয়েকজন ভারতীয় ভদ্রলোকের ইহাতে চাকুরী লাভ হইল ছাড়া শাসন ব্যাপারে দেশের লোকের ক্ষমতালাভের দিক হইতে ইহার কোন মূল্যই নাই। শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের এই নীতিতে ভারতের কোন রাজনীতিক দলের দাবীই মানিয়া লওয়া হয় নাই। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মোস্লেম লীগ, উদারনৈতিক দল ইহাদের সকলের দাবীকেই সমভাবে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজেদের মর্জিকেই বড় রাখিয়াছেন। এই ব্যাপার হইতে কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, ভারত সম্পর্কে যাঁহার অবলম্বিত নীতির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে এক মোস্লেম লীগ ছাড়া ভারতের অন্য সব রাজনীতিক দলই সুনিশ্চিত হইয়াছেন সেই ভারত সচিবকেই ভারতের শাসন-ব্যাপারে হর্তাকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং তিনি শিখণ্ডীর পশ্চাতে পার্থ ধনুর্ধরের মত থাকিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারতীয় নীতি পরিচালনা করিতেছেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে কয়েকজন ভারতীয় সদস্যপদ বৃদ্ধির এই অপচেষ্টা ভারতের জনমতের প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপেক্ষাজনিত বিক্ষোভ প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

দেশরক্ষার অধিকারের নিরিখ—

নয়াদিল্লীর ইস্তাহারে গর্বের সংগে এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বড়লাটের শাসনপরিষদের সম্প্রসারণ উপলক্ষে এবার একটা বড় কাজ করা হইয়াছে। দেশরক্ষা বিভাগের ভারটা একজন ভারতবাসীর হাতেই দেওয়া হইয়াছে। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন সেই দুর্লভ দেশরক্ষা সচিবের পদ লাভ করিয়াছেন। ঢাল নেই, তলোয়ার নাই নিধিরামের সর্দারীর মত ভারতবাসীকে এইভাবে দেশরক্ষা সচিবের পদে বসাইয়া দেওয়াতে আমরা উল্লসিত হইবার একটুও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। সমর বিভাগের মূল নীতি থাকিবে সমরসচিব অর্থাৎ জঙ্গীলাটেরই হাতে; নূতন দেশরক্ষা সচিব কোন্ কোন্ বিভাগের ভার পাইবেন, তাহার একটা তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকাদৃষ্টে বুঝা যাইতেছে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের অধিকার সম্বন্ধে

যে তালিকা গত ৭ই এপ্রিল উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই তালিকার কয়েকটি বিষয় রদবদল করা হইয়াছে এবং দেশরক্ষা সচিবের হাতে পরিবর্তিত কয়েকটি অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কাগজপত্রে অধিকার দেওয়ার কোন মূল্য নাই। সেই সব অধিকার পরিচালনায় দেশরক্ষা সচিবের দেশের জনমতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য করিবার ক্ষমতা কতটা থাকিবে, দেশবাসীর দিক হইতে প্রকৃতপক্ষে ইহারই হইতেছে প্রশ্ন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠার দাবীকে স্বীকার করিয়া লইতেন, তবেই দেশরক্ষা সচিবের কার্যত কর্তৃত্ব কিছু থাকিত; কিন্তু সে দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। দেশরক্ষা সচিবের হস্তে যেসব অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত কিংবা শাসনপরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত যে রক্ষিত হইবে, শাসনতন্ত্রে এমন কোন বিধান নাই। বড়লাটের হাতে অপরিসীম ক্ষমতা রহিয়াছে এবং বড়লাট ইচ্ছা করিলেই দেশরক্ষা সচিবের সিদ্ধান্তকে বাতিল করিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থায় স্যার ফিরোজ খাঁ নুন যে তাঁহার অধীনস্থ বিধানগুলির ব্যাপারে নিজের স্বাধীন মত অনুসারে চলিতে পারিবেন, আমরা ইহা মনে করি না; তবে স্যার ফিরোজের রাজনীতিক মত অনুসারে ইহা অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, এসব ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাধীন মত অনুসারে চলিবার হয়ত কোন প্রশ্নই দেখা দিবে না। দেশের জনমতের সঙ্গে দায়িত্বগত কোন সম্পর্ক তাঁহার নাই এবং কর্তার রায়ে সায় দিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তিস্বরূপেই তিনি বিবেচিত হইয়াছেন। সুতরাং স্যার ফিরোজের অবলম্বিত নীতি প্রধানত জঙ্গীলাটের দ্বারাই পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশরক্ষা সচিবের প্রভাবের মূল্য হইল এইরূপ। সমরোদ্যমে ভারতের স্বতস্ফূর্ত জনমতের সাহায্য লাভ করিবার পক্ষে যেরূপ প্রতিবেশ প্রভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল, বর্তমান দেশরক্ষা সচিবের দ্বারা সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য; কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় দেশরক্ষার ব্যাপারে দেশবাসীর অধিকার স্বীকার করা হয় নাই।

সমরোদ্যম ও ভারত—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিকট নিজের বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন। মহাত্মাজী সম্প্রতি যাহা বলিতেছেন, তাহার তাৎপর্য হইল এই যে, স্বাধীন ভারতই জগতের বর্তমান সমস্যার সম্যকরূপে সমাধান করিতে পারে। তিনি বলেন, 'মিত্রপক্ষের সেনাদিগকে ভারতে অবস্থান করিতে দিতে আমি সম্মত আছি। স্বাধীন ভারতের অনুমতিক্রমে তাহারা ভারতে অবস্থান করিবে। তাহারা ভারতের প্রভুস্বরূপে এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদিগকে এখানে যদি থাকিতে হয়, আমাদের বন্ধুস্বরূপে থাকিতে হইবে।' মহাত্মাজীর মতে ব্রিটেন যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয় এবং এই সর্তে সম্মত থাকে, তবে ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। মহাত্মাজীর কার্যক্রমে নৈতিক, অর্থাৎ হিংসা বা অহিংসার তত্ত্বের দিকটা আমরা বড় করিয়া দেখি না, কার্যকর রাজনীতির দিক হইতে ব্রিটেন কর্তৃক বর্তমান অবস্থায় ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা আমরা প্রধান বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে ব্রিটেনের বর্তমান নীতিতে ভারতবাসীদের প্রতি একটা অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাত্মাজী সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন —'আমাদিগকে সকল ভয় এবং অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে মিত্র সৈন্যদের অবস্থানে আমাদের ভয় বা সন্দেহের কোনও হেতু থাকিবে না।' কিন্তু মিত্রপক্ষের সেনাদের এদেশে অবস্থানই বর্তমান সমস্যা সমাধানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। যে উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষের সেনাদের এদেশে অবস্থান, সেই উদ্দেশ্যসাধনে এদেশের লোকের স্বতস্ফূর্ত এবং আন্তরিক সহযোগিতাও প্রয়োজন। সৈন্যদের অবস্থান যদি প্রয়োজন হয়, তবে উদ্দেশ্যও একটা থাকিবে এবং সৈন্যদের অবস্থানের সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অহিংস হইবে না। সুতরাং অহিংসার প্রশ্ন, প্রকৃত প্রশ্ন নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নাগপুরের বক্তৃতায় কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"যুদ্ধ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কংগ্রেস সে কথা বারংবারই বলিয়াছে। আমাদের দাবী হইল এই যে, তোমরা স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার জন্য সংগ্রাম করিতেছ, এই সব বড় বড় কথা বলিতেছ, অথচ তোমাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগকেই তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দান করা হয়, তবে চীন, রুশিয়া যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, ভারতবাসীরাও সেইরূপভাবে লড়াই করিত।" বর্তমান সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে দেশের লোকের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা লাভ করা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত বর্তমান নীতি সমরোদ্যমে এদেশের লোকের তদ্রূপ সহযোগিতা লাভ করিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি যদি এখনও ভাঙ্গে, তাহা হইলেও সঙ্কটের সমাধান হইতে পারে; কিন্তু আমরা তেমন কোন পরিচয় পাইতেছি না, ইহাই হইতেছে দুঃখের বিষয়।

স্বাধীনতার আদর্শ ও আমেরিকা—

গত ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস জগতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের কয়েকটি স্থান হইতেও এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। আমেরিকার স্বদেশপ্রেমিক আত্মদাতা সন্তানগণ হৃদয়ের রক্ত দিয়া একদিন যে আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা মানবসমাজে সার্থকতা লাভ করে, ইহাই আমাদেরও কামনা। কিন্তু আজ যাঁহারা সেই আদর্শের কথা বলিতেছেন তাঁহাদের তৎসম্বন্ধে আন্তরিকতা কতখানি রহিয়াছে, আমরা ভারতবাসী আমাদের মনে সেই প্রশ্নই উঠে। মার্কিন স্বাধীনতার সাধকগণের আদর্শ ছিল দেশ এবং জাতি-নির্বিশেষে মানুষের স্বাধীনতা। তাঁহারা এই সত্যকে অভ্রান্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং মানুষকে তাহার এই জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। 'আমেরিকা দিবস' অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতের মার্কিন রাজদূত মিঃ জর্জ মেরেল

নয়াদিল্লী হইতে বেতারযোগে সেদিন সেই আদর্শের কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'আমরা কেবল আমাদের মার্কিন জাতির নামে এই অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতেছি না। যাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা আমাদের শক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাদের সকলের নামেই আমরা এই অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতেছি। আমরা চাই বিশ্বমানবের স্বাধীনতা।' ১৬৬ বৎসর পূর্বে মার্কিনের দেশপ্রেমিকগণ যে আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই আদর্শের অনুযায়ী কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সংরক্ষক সেই আমেরিকাকে যখন আমরা আটলাণ্টিক চুক্তির গণ্ডী হইতে ভরতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশকে বহির্ভুক্ত করিবার অনুকূল ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে সমর্থন করিতে দেখি, তখন তাহার বিঘোষিত আদর্শের আন্তরিকতা সম্বন্ধে স্বতঃই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

বঙ্গে জাতীয়তার সাধনা—

"বাঙলার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য স্থাপন এবং বাঙলার সন্তানদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার গুরুদায়িত্ব পূর্ণভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে। বাঙলার জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহ, অনশন ও বেকার সমস্যা হইতে তাহাদের মুক্তি, সংস্কৃতি ও ধর্মগত স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় গঠন করিতে হইবে। বাঙলার ব্যবস্থাপরিষদের প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল সম্প্রতি এই মর্মে একটি ঘোষণা করিয়াছেন এবং ঘোষণায় বিবৃত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি সংগঠন কমিটিও গঠিত হইয়াছে। আমরা এই কমিটিকে অভিনন্দিত করিতেছি। গত কয়েক বৎসর সাম্প্রদায়িক শাসনের পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু দুঃসময় এখনও কাটে নাই। কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য এখনও চেষ্টা করিতেছে। পুনরায় অশান্তি দেখা দিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকায় স্বাভাবিক শান্তির অবস্থা অনেকটা ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ঢাকার অশান্তির সংবাদ পুনরায় দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ অশান্তির মূল কারণ কোথায়? অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু দিন পূর্বে একটি বিবৃতিতে কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'আমি এই কথাই বলিব যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে হতাশ এবং বিপর্যস্ত একদল লোক অনন্যোপায় হইয়া মনে করিতেছে যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অনৈক্য, এমন কি, রক্তপাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতে পারিলেই তাহাদের ব্যক্তিগত রাজনীতিক স্বার্থসাধন হইবে, ইহারাই এই অশান্তির মূলে রহিয়াছে।' সাম্প্রদায়িক নীতি এইরূপ হীন স্বার্থ সাধনেরই নীতি। দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে যাহাদের কিছু মাত্র বোধ আছে, সাম্প্রদায়িকতার নীতির সঙ্গে তাঁহারা কিছুতেই সম্পর্ক রাখিতে পারেন না। বাঙলার বাহিরের কতকগুলি ভাগ্যান্বেষী বাঙলায় আসিয়া নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের উপর জোর দিতেছে এবং বাঙলার অর্থ শোষণের সুবিধা খুঁজিতেছে। প্রগতিশীল দল এবার ইঁহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার সংকল্প করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। বাঙলার দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। সস্তা সাম্প্রদায়িকতার অনিষ্টকর অন্ধ ভাবাবেগের উত্তেজনা হইতে প্রগতিশীল দল বাঙলা দেশকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তাঁহারা বাঙলা দেশের স্বার্থকেই বৃহত্তর স্বার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সত্যই আশার কথা। তাঁহাদের কার্যক্ষেত্র ব্যাপক। সংগঠিত কমিটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সামরিক প্রয়োজনে যাহাদের স্থান ত্যাগ করিতে হইতেছে, তাহাদের যথাযোগ্য সাহায্যের এবং প্রচুর খাদ্য শস্য উৎপাদন ও দেশের প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য শস্যের সঞ্চয় এবং বণ্টনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। এসব সমস্যা সহজ নয় এবং এগুলি সমাধানের পক্ষে প্রতিকূলতা আছে অনেক দিক হইতে, তথাপি যতটা কাজ হয়, তাহাই ভাল। কমিটির কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বাঙলা দেশের সর্বত্র নবীন জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

লাভখোরদের উপদ্রব—

চাউলের দরকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য বাঙলা সরকার চেষ্টা করিতেছেন। সেদিনও তাঁহারা চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার ফলে আড়তদারেরা কেহ কেহ মজুদ চাউল অন্যত্র সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যবসায়ীরা যাহাতে কেহ এইরূপ কার্য না করিতে পারে, গভর্নমেণ্ট তজ্জন্য জনসাধারণকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড বিধান করা হইবে। গভর্নমেণ্ট বলিতেছেন যে, বাঙলা দেশে যে পরিমাণ চাউল মজুদ আছে, তাহাতে চাউলের অভাব সৃষ্টি হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। গভর্নমেণ্টের মতে লাভখোর ব্যবসায়ীরা চাউল মজুদ রাখিয়া অধিক দরে বিক্রয় করিবার ফিকিরে আছে, এজন্যই চাউলের বাজারে এরূপ বিভ্রাট হইতেছে। সাধারণ খরিদ্দারদের পক্ষে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এই ধরণের গবেষণার বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। গভর্নমেণ্ট কলিকাতার চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু সমস্যা এই যে, বাজারে সে দরে চাউল মিলিতেছে না। গভর্নমেণ্ট যে শ্রেণীর চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে শ্রেণীর চাউল বাজারে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সরকার যে কয়েকটি দোকান শহরে খুলিয়াছেন, শুধু সেই কয়েকটি দোকানেই সেই চাউল পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সরকারী দোকানের সুবিধা লাভ করা সব সময়ে সম্ভব নহে। প্রথমত,

স্থানের দূরত্ব রহিয়াছে ; তারপর কয়েকটি মাত্র সরকারী দোকান, সেগুলিতে লোকের এমন ভিড় যে মাল পাওয়া সহজসাধ্য নয়। গভর্নমেণ্ট যখন বুঝিতেই পারিয়াছেন, লাভখোরদের ফাট্‌কা বাজীর ফলেই চাউলের দর এভাবে বাড়িতেছে, তখন অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করা তাঁহাদের কর্তব্য ; কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে তাঁহাদের নিজেদের দোকান খোলা উচিত; এইভাবে খরিদ্দারেরা সরকারী দোকানের সুবিধা সহজে পাইলে অন্য দোকানীদের লাভের পিপাসা ক্রেতার অভাবে আপনা হইতেই সংযত হইয়া আসিবে। দুঃখের বিষয়, সরকারের অবলম্বিত সতর্কতার বিধান সত্ত্বেও কার্যত শহরে বা মফস্বলে কোথায়ও লাভখোরদের উপদ্রব প্রশমিত হইতেছে না। তাহারা চাউল, কেরোসিন, চিনি, আটা প্রভৃতি জিনিসের দাম ইচ্ছামতভাবে নিজেরা বাড়াইয়া ক্রেতাদের ঘাড় ভাঙিয়া আদায় করিতেছে। অবিলম্বে এই শ্রেণীর অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা সরকারের কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ী চীন—

গত ৭ই জুলাই চীনের যুদ্ধ ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৯১৮ সালের পর চীন প্রথমে জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চীনের প্রধান বন্ধু ; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জাপানের দ্বারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত চীন তখন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোন সাহায্যই পায় নাই। তাঁহারা জাপানীদের সেই আক্রমণকে চীনের একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। আমেরিকা অবশ্য চীনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল ; কিন্তু চীনের সাহায্যার্থ জাপ আক্রমণের প্রতিবাদ করিবার মত প্রয়োজনবোধও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মনে আমেরিকার সে চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুমাত্র জাগে নাই। চীনের জাতীয় দলকে প্রবল অন্তরায়ের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প সহকারে জাপানের সঙ্গে একাকী সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছে। পাঁচ বৎসরব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামে চীন অনেক কিছুই হারাইয়াছে। চীনের কয়েকটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে, শিল্প-বাণিজ্য প্রধান অঞ্চলগুলি এখন জাপানীদের হাতে। চীনের জাতীয়তাবাদের পুণ্য-পীঠস্বরূপ ক্যাণ্টন, নানকিং এবং সাংহাই বর্তমানে বিদেশীর করতলগত ; সমুদ্রোপকূলবর্তী বন্দরগুলির সকল সুবিধা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে ; সুতরাং চীনের অনেক কিছু গিয়াছে ; কিন্তু সে সব যাইয়াও জাগ্রত আছে তাহার মনুষ্যত্ব। পররাজ্যগ্রাসীদের পশুবলের পীড়ন এবং বজ্রাগ্নি বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া চীনের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনা করিতেছেন। স্বাধীনতার পথ কুসুমে আস্তৃত নয়, সে পথ আত্মোৎসর্গকারীদের হৃদয়ের রক্তধারায় সিক্ত। স্বাধীনতার সাধনায় চীনা জাতীয়তাবাদীদের আত্মোৎসর্গের অপরিম্লান মহিমা আজ সমগ্র এশিয়াকে উদ্দীপিত করিতেছে। চীনের এ আত্মোৎসর্গ বৃথা যাইবে না—স্বাধীনতার জন্য সাধনা কোন দিন ব্যর্থ হয় না। উদ্ধত পশুবলকে নির্জিত করিয়া মহাচীনের সাধনা মানব মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, পশু-শক্তির সমগ্র শস্ত্রবলকে কলঙ্ক কালিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়া চীনের আত্মদাতা স্বদেশপ্রেমিকদের রুধির স্রোত এশিয়ার পূর্বাকাশ ঊষার অরুণরাগে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় শোণিতাক্ত চীন আজ আত্মমহিমায় অধিষ্ঠিত। এই উপলক্ষে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী চীনকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাত্মাজীর কর্মপ্রণালী ও ভবিষ্যৎ

মহাত্মাজীর ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী কি আকার ধারণ করিবে, এখনও সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে না। তবে এই সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা যে সকল দিকে একটা বড় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য স্টিফেন ডেভিস এই মর্মে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ভারতবর্ষ যাহাতে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং অন্যান্য সৈন্য বাহির হইতে রাখা অনাবশ্যক হইতে পারে, সেজন্য সেখানে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে অবিলম্বে আপোষ-নিষ্পত্তির পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন? উত্তরে ভারত সচিব আমেরী সাহেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, ভারতের নির্বিঘ্নতা এবং মিত্র-শক্তির জয়কে সুনিশ্চিত রাখিবার জন্য ঐ সব সেনাদল বর্তমানে ভারতে রাখা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। সুতরাং জয়লাভ না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে ভারতে রাখা হইবেই। কিন্তু এই উত্তরের পরও একটা প্রশ্ন অনেকের মনে উঠিবে, অর্থাৎ ঐ সব সৈন্যদল ভারতে রাখিবার পক্ষে মহাত্মাজী যে সর্তের প্রস্তাব করিয়াছেন, গভর্নমেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন কি? অন্য কথায় ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীন ভারতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে সেনাদলকে সেখানে রাখিতে ব্রিটিশ সরকার রাজি আছেন কি? কিন্তু ভারত সচিবের উত্তরের মধ্যেই ইহার উত্তর উহা রহিয়া গিয়াছে। তিনি জানাইয়াই দিয়াছেন যে, ভারতে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে গভর্নমেণ্ট পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে যাহাতে আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনা চালাইতে উদ্যোগী হন, সেজন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া ভারনন বার্টলেট, ব্রেলসফোর্ড, হিউলেট জনসন, ক্যাণ্টারবেরীর ডিন, ল্যাস্কি লর্ড স্ট্রাবলগী, পেথিক লরেন্স ইঁহারা একখানা আবেদন দাখিল করিয়াছেন ; কিন্তু সে আবেদনের ফল কি হইবে, ভারত সচিবের উত্তর হইতেই বুঝা যাইতেছে। এই ধরণের আবেদন নিবেদনে আমরা অনেকদিন হইতেই আস্থা হারাইয়াছি। ভারতের আত্মসাধনার উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, আবেদন-নিবেদনের যুগ কাটিয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।



১৮

মিঃ বোস তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন ; রক্তবর্ণ মুখে শাশ্বতী ঘরে প্রবেশ করিল। হাতের ছড়িটা টেবলে ফেলিয়া সে একটা সোফায় বসিয়া পড়িল, পিতার পানে তাকাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "বারে, তুমি এখনই বার হয়ে যাচ্ছো, বাবা? উঁহু, ওটি হচ্ছে না, বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মেয়ের আব্দারে বিব্রত হইয়া মিঃ বোস বলিলেন, "তাই তো ভারী অসময় যে শাশ্বতী, আমার পক্ষে বসা এখন একেবারেই অসম্ভব। ভয়ানক জরুরী কাজ আছে অফিসে, ম্যানেজার এই-মাত্র ফোন করে ডাকলে ; এক মিনিট নষ্ট করলে আমার এক লাখ টাকা যাবে।"

পরম ঔদার্যভরে শাশ্বতী বলিল, "যাক্ আপনার এক লাখ টাকা, এদিকে যে কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সেটা তো দেখছেন না বাবা,—এর পরে যে মুখ দেখাতে পারবেন না।"

"মুখ দেখানো—তুমি কি বলছো শাশ্বতী?"

মিঃ বোস হাসিলেন, কন্যার স্কন্ধে হাতখানা রাখিয়া বলিলেন, "আজ তোমার মুখখানা যে রকম গম্ভীর দেখাচ্ছে এমন মূর্তি আমি কোনদিন দেখিনি, আজ মনে হচ্ছে মা, তোমার বয়স আরও কুড়ি বছর এগিয়ে গেছে, চল্লিশে মানুষ যতখানি গম্ভীর হয়, ঠিক ততখানি দেখছি তোমায়। কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলতো মা।"

শাশ্বতী গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল, "সেই সব কথা বলতেই তো চাচ্ছি বাবা ; মাকে বললে কোন কথা তিনি বিশ্বাস করেন না, সব কথা তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। মা মেয়েছেলে, ভবিষ্যৎ বুঝতে পারেন না, কিন্তু আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন বাবা!"

মা মেয়েছেলে—

কথাটা শুনিয়া মিঃ বোসের গম্ভীর মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও হাসিবার যো নাই মেয়েটি একেবারে বিগড়াইয়া যাইবে। এই দুর্দান্ত মেয়েটিকে মিঃ বোস যতখানি ভালবাসেন, ততখানি ভয় করিয়া চলিতে হয়, ইহার শাসন উপেক্ষা করার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

স্বাতি মায়ের আদর্শে মানুষ হইয়াছে, শাশ্বতী মায়ের প্রভাব এড়াইয়া গিয়া কেমন করিয়া যে পিতার আদর্শ লইয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না।

মেয়েরা পুরুষদের মত পরুষভাবে চলাফেরা করিবে, ইহা মিসেস বোস সহ্য করিতে পারেন না ; কারণ, ইহা লইয়া লোকের কাছে তাঁহাকে কথা শুনিতে হয় প্রচুর। লোকের ঠাট্টা, পরিহাস তিনি সহ্য করিতে পারেন না। স্বামীর নিকট তাঁহার অভাব অভিযোগের অন্ত ছিল না এবং এই দ্বন্দ্ব মনান্তরের ভয়েই মিঃ বোস স্ত্রীকে এড়াইয়া চলিতেন।

গম্ভীরভাবে মিঃ বোস হ্যাট্‌টা হাতে তুলিয়া বলিলেন, "এই কথা তো? আচ্ছা, এক কাজ কর, আমি যতক্ষণ না ফিরি তুমি তোমার মায়ের কাছে যেও না। আমি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ফিরছি, খাওয়ার টেবলে তোমার মা-ও থাকবেন, তখন এ এ সম্বন্ধে যা হয় আলোচনা করা যাবে।"

শাশ্বতী প্রবলভাবে মাথা নাড়িল—"সে হয় না বাবা, এখন না শুনে রাখলে আপনি তখন মাকে কি বলবেন বলুন দেখি? না না, আপনি হ্যাট্ নামান বাবা, পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমার কথা শেষ হয়ে যাবে।"

সে পিতার হাত হইতে হ্যাট্ লইয়া টেবলে রাখিল। মিঃ বোস হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "তার মানেই আধ ঘণ্টা। তুমি বুঝছো না শাশ্বতী, এই আধ ঘণ্টা আর যেতে সময় পনেরো মিনিট,—এই তিন কোয়ার্টারে আমার কি ক্ষতিটাই হবে। যাক্, —তোমার হাতে যখন পড়েছি নিস্তার আমার নেই। আমি বসছি, তোমার যা বলবার, তা যদি পাঁচ মিনিটে হয়, আর দশ মিনিট করো না।"

তিনি কন্যার সামনাসামনি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন।

শাশ্বতী বলিল, "আমি আপনাকে স্বাতির কথা বলছি বাবা, কাল সন্ধ্যায় সুজিত সোমের সঙ্গে স্বাতি বিয়ের এন্‌গেজ্‌-মেণ্ট আছে, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি বাবা, এ বিয়ে হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। আপনি এখনই এর প্রতি-বিধান করতে পারেন, যাতে শেষ পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারীটা আর বেশীদূর না গড়ায়!"

"এনগেজমেণ্ট—কেলেঙ্কারী—"

মিঃ বোস বিস্ময়ের নির্বাক হইয়া গেলেন, আর একটি কথা তাঁহার মুখে ফুটিল না।

শাশ্বতী পিতার হাতখানা নিজের কোলের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সেই হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "হ্যাঁ, কেলেঙ্কারী বাবা। • সুজিত সোম এক নম্বর লোফার, তার অতীত জীবন খুঁজে দেখলে আপনি যা পাবেন, তাতে করে কেউ তাকে বিয়ে করতে পারে না। আপনিও তার সঙ্গে স্বাতির বিয়ে দিতে পারবেন না।"

মিঃ বোস একবার নিজের মাথায় হাত বুলাইলেন, তারপর বলিলেন, "আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছিনে শাশ্বতী। আজ সন্ধ্যায় বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবে, বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সবারই সামনে এই অনুষ্ঠানটা যাতে হয়—"

বাধা দিয়া অধৈর্যভাবে শাশ্বতী বলিল, "আজ যার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করবেন, কাল যদি শুনতে পান, সে বিলেতে গিয়ে কী ঘৃণিত জীবনযাপন করে এসেছে—"

মিঃ বোস বলিলেন, "কিন্তু সে সব দেখতে গেলে যে সবারই খুঁত বার হয়ে পড়ে মা। আমাদের দেশের কয়টি ছেলে আছে যে তরুণ বয়সে ওদের দেশের মত দেশে গিয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছে? আমি নিজেও তো কতবার গেছি; অনেকের অনেক ঘটনা জানি, অনেক কথা শুনেছি। সে সব নিয়ে বিচার করতে গেলে ঠকতে হয় যে নিজেদেরই শাশ্বতী। সেই জন্যেই বলি—সে অতীতটাকে বাদ দিয়ে বর্তমান নিয়েই চলুক কারবার, আর সেই বর্তমানকে ভবিষ্যতে টেনে নিয়ে চলবার জন্যেই চাই বিয়ের অনুষ্ঠান, যার ছেদ নাই—কোনদিন হবেও না।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া শাশ্বতী বলিল, "কোনদিন হবে না এ কথা আপনি জোর করে বলতে পারেন বাবা। ধরুন আজ স্বাতির বিয়ে হল, তার পর বিয়ের পর স্বাতি যখন শুনবে তার স্বামীর একটি ইউরোপীয়ান স্ত্রী আছে, একটি সন্তানও আছে, তখন তার অবস্থা কি হবে সেটা আপনি ভেবে দেখছেন?

মিঃ বোস উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "স্ত্রী—সন্তান? তুমি বলছো কি শাশ্বতী?"

শাশ্বতী উত্তর দিল, "হ্যাঁ, স্ত্রী, সন্তান। সেখানে ওই সুজিত সোমকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল বাবা, আপনি খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। সুজিত সোম শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে পারছিল না, ডক্টর বসাক তখন তাকে টাকা পাঠান—নিজে দেশে ফিরে এসে, তবে সুজিত সোম দেশে ফিরতে পারে।"

মিঃ বোস অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, "তার স্ত্রী-পুত্র তারা ইংলণ্ডে আছে?"

শাশ্বতী উত্তর দিল, "শুনলুম এখানে তাদের আসার খরচ পাঠাবে কথা দিয়ে সুজিত সোম চলে এসেছে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "কিন্তু সে ফিরেছে আজ দুই বছরের কথা শাশ্বতী; কথাটা যদি সত্য হতো তার স্ত্রী কি এখানে আসতো না?"

শাশ্বতী বলিল, "সে খোঁজও আমি নিয়েছি বাবা। শুনলুম সে মেয়েটি কয়খানা পত্র দিয়েছে, সোম তার কোন উত্তর দেয় নি। তারপর তার কোন এক বন্ধুকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে জানিয়েছে সে মরে গেছে—মেয়েটি এখন যা খুসি করতে পারে।"

"ওঃ স্কাউণ্ড্রেল—"

মিঃ বোস চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শাশ্বতী বলিয়া চলিল, "আমি জিজ্ঞাসা করলুম সে মেয়েটি সেই পত্রের পরে বিশ্বাস করেই নিশ্চিন্ত থাকবে? শুনলুম সুজিত সোম ইংলণ্ডে নিজের নাম বদলেছিল—তার নাম সেখানে ছিল সুতেন সোম। সুজিতের বড় ভাইও বিলেতে গিয়েছিল এবং সে মারাও গেছে আজ এক বছর হল; কাজেই সুজিতের খোঁজ করে সে মৃত জেনে মেয়েটি তার আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে।

মিঃ বোস দুইহাতের মধ্যে মাথা চাপিয়া ধরিলেন—

শাশ্বতী বলিল, "সে মেয়েটি কোন একটা হসপিটালে নার্স ছিল, তার নাম এডিথ। আপনি যদি খোঁজ নেন বাবা, সব খবর পান, আপনার অনেক বন্ধু ওখানে আছেন, তাঁরা সব খবর নিয়ে আপনাকে জানাবেন। শুধু এই-ই নয় বাবা, বিলেতে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েও সে এই রকম অনেক কেলেঙ্কারী করে. কোন একটি মেয়েকে নাকি মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে তার আংটি আর মাণিব্যাগ চুরি করে জেল পর্যন্ত খেটেছিল—"

মিঃ বোস বাধা দিলেন, "থাক থাক, আর বলতে হবে না শাশ্বতী, যার অতীতজীবন সম্বন্ধে এমন কেলেঙ্কারীর আভাস পাচ্ছি তার সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ না নিয়ে তার সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। আমি এখন ফোনে সুজিতকে জানিয়ে দিচ্ছি আজ বিয়ের কথাবার্তা হতে পারে না।"

তিনি ফোন করিতে গেলেন।

শাশ্বতী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

সহোদরা ভগিনী স্বাতী, সে গৃহিণী হোক, মা হোক সুখী হোক, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যেন দুঃখময় না হয় এ কামনা সে সর্বান্তঃকরণে করে। স্বাতীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না—চায়ও না।

ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুমালে ললাটের ঘাম মুছিতে মুছিতে মিঃ বোস বলিলেন, "ফোন করে বারণ করলুম, বললুম আজ কথাবার্তা পাকা হবে না, আমরা বাড়িতে থাকব না। নিমন্ত্রিত যাঁরা আসবেন আসুন, খাওয়ানোর আয়োজন পণ্ড করে কোন লাভ নেই কি বল শাশ্বতী?"

উৎসাহিত শাশ্বতী বলিল, "আপনি ফোন করায় সুজিত সোম কিছু বললে না বাবা?

মিঃ বোস বলিলেন, "সে আন্তরিক দুঃখিত হ'ল। হাতের ঘড়িটার পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, বেলা হয়ে গেছে এখন আর অফিসে যাব না। আমি খানিকক্ষণ এই ঘরে ভাবি শাশ্বতী তুমি ম্যানেজারকে ফোন করে দাও—বিশেষ কাজে আমি যেতে পারলুম না, তিনি যেন আমার কাজগুলো করে দেন।"

তিনি একখানা সোফায় শুইয়া পড়িলেন।

১৭

সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে মিসেস বোস ব্যস্তভাবে বাড়ি ফিরিলেন। কন্যার জন্য কতকগুলি জিনিস কিনিতে তিনি

লেড ল'র দোকানে গিয়াছিলেন—আরদালি সেগুলো নামাইয়া আনিয়া ঘরের ভিতরে টেবলে রাখিয়া আসিল।

সারাদিন স্বামী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। মিঃ বোস যে বাড়িতেই আছেন তাহা মিসেস বোস জানিতেন না, ঘরে প্রবেশ করিতেই স্বামীকে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন—।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরেছো দেখছি।"

হাতের কাগজগুলো টেবলের উপর রাখিয়া মিঃ বোস উত্তর দিলেন, "আজ সারাদিন আমি তো কোথাও যাই নি কেটি; বাড়িতেই আছি।"

"বাড়িতেই আছ—"

মিসেস বোস বিস্ময় দমন করিতে পারেন না। তাঁহার বিবাহিত জীবনে স্বামীকে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে দেখা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে। আজ তিনি তাঁহার এত গুলো ফার্ম, অফিসের কাজ ছাড়িয়া নিষ্কর্মাভাবে বাড়িতে বসিয়া আছেন এটা যেন কি রকম অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

মিঃ বোস বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে কেটি, আশা করি সে কথা শুনবার অবকাশ তোমার এখন হবে।

মিসেস বোস একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন "এত আয়োজন করে যে কথার সুরু, সেটা শুনতে হবে বই কি। বল কি কথা, আর সেটি একটু তাড়াতাড়ি করে শেষ করবে আশা করি কারণ—"

অধৈর্যভাবে বাধা দিয়া মিঃ বোস বলিলেন, "তোমায় আমি অত বাধাধরা সময় দিতে পারিনে কেটি যদিও সময়ের মূল্য আমি তোমার চেয়ে বেশী বুঝি। যাক ও সব কথা, শাশ্বতী যে সব কথা তোমাকে বলেছে আমি সেই কথাগুলো সম্বন্ধে বলব মাত্র।

মিসেস বোস প্রথমটায় মিঃ বোসের গম্ভীর মুখ, গম্ভীর কথা শুনিয়া একটু থতমত খাইয়াছিলেন, এতক্ষণে তিনি হাসিবার সুযোগ পাইলেন।

"আ ভগবান, তুমি সেই পাগলা মেয়েটার কথায় বিশ্বাস করেছো? সে যে কোথা হতে কি সব শুনে আসে, দশখানা করে বলে তার ঠিক নেই। স্বাতীকে কি সব বলেছে, সে তো কেঁদেই অস্থির।"

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হইয়া উঠিল—"ওই মেয়েকে নিয়ে আরও যে কত জ্বালা আমায় সইতে হবে তার ঠিক নেই। নিজের ওজন বুঝে কথা বলার শক্তি নেই, যা মনে এলো তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে পারলে বাঁচে। অতি আদরে বাঁদর গড়িয়েছো তুমিই,—এতটুকু ভদ্রতা শিখতে দিলে না—আমি নিশ্চয়ই বলবো—ওই মেয়ের জন্যে শেষটায় আমায় মরতে হবে—নিশ্চয়ই মরতে হবে—"

মিঃ বোস মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মরা বললেই যদি মরণ হতো তা হ'লে ভাবনা থাকতো না কেটি। শুনেছি আগেকার দিনে—এখনও গ্রামের দিকে বা শহরে অশিক্ষিত মেয়েরা আত্মহত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা পুকুর, নদীর জলে ডুবে; কিন্তু আজকাল শহরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সোজা মৃত্যুর পথ বার করেছে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে, তুমি কোন্ উপায়ে মরতে চাও জানতে পারলে সে দিকটায় একটু অবহিত হওয়া যেতো না হয়।"

কথাটা বলিয়াই তিনি পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন, মিসেস বোসের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত নিস্তব্ধে বসিয়া থাকিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন,—"এই কথাই শুনাতে বসিয়েছিলে তো—? কথা ত হয়েছে, আমি এবার চলি, আমার ওদিকে কাজ আছে যথেষ্ট। কাল স্বাতীর বিয়ের এনগেজমেণ্ট—"

মাথা দুলাইয়া মিঃ বোস বলিলেন, "ওইখানেই আমার প্রবল আপত্তি; অর্থাৎ কালকের ব্যাপারটা কেবল ভোজসভাই হোক তাতে আমার আপত্তি নেই—এনগেজমেণ্ট কাল হতে পারে না। অথবা শুধু কাল বলি কেন, কোন দিনই সুজিত সোমের সঙ্গে আমার মেয়ে স্বাতীর বিয়ে হতে পারে না।"

মিসেস বোস একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন,—একটি শব্দ তাঁহার মুখে ফুটিল না।

মিঃ বোস বলিয়া চলিলেন, "আমি আজ সারাদিন বাড়ি আছি শুধু এইজন্যে—এই সব সন্ধান জানার জন্যে। আমার এক বন্ধু মিঃ মজুমদার আজ বৎসর খানেক বিলেত হতে ফিরেছেন, তিনি বিকেলে এসেছিলেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিয়ে যা জানতে পারলুম কেটি, তাতে তাঁকে ভদ্রসমাজে মিশতে না দেওয়াই উচিত বলে মনে করি।"

তিনি ললাটের ঘাম মুছিলেন।

মিসেস বোস হাঁফাইয়া উঠিলেন, "কি জেনেছো তুমি—কি বললেন মিঃ মজুমদার?"

মিঃ বোস একটা মোটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "সে এক নম্বর জোচ্চোর—ধাপ্পাবাজ। শুধু জোচ্চোর নয়—সে চোর, সে জেলও খেটেছে। আর একটা মজার কথা শোন—যে দেশের মেয়েদের তুমি কোন দিন উঁচু জায়গা দিতে চাওনি, যাদের পতিপরায়ণতা বা সতীত্ব নেই বলে তুমি ঘৃণা কর—সেই দেশেরই একটি মেয়ে তার যথাসর্বস্ব বিক্রি করে সেই পাপিষ্ঠের মামলার খরচ চালিয়েছে, পথে পথে ভিক্ষা করে কোর্টের খরচ জুগিয়েছে। আর তারই পুণ্যে দীর্ঘ কারাদণ্ড হতে বেঁচে গিয়ে সেই মহাপাপিষ্ঠ দেশে ফিরে অন্য বন্ধু দিয়ে তাকে জানিয়েছে—এস সোম মারা গেছে। বল দেখি কেটি, এরকম মুক্তি কোন মেয়ে কামনা করে কি?"

মিসেস বোস হাঁ করিয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিলেন এবং মাথা নাড়িলেন—"না—"

মিঃ বোস সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন, "হ্যাঁ পারে না,—আমাদের দেশের মেয়ে যেমন পারে না, ওদের দেশের মেয়েও পারে না এমনভাবে নিঃশেষে শেষ হয়ে যেতে, দেশলাইয়ের কাঠির মত দপ করে জ্বলে নিভে যেতে। তুমি কি বল কেটি—এই রকম একটা মহাপাপিষ্ঠের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে—কে বলতে পারে—আবার কোন্‌দিন সে প্রশান্ত মহাসাগরের পারে আমেরিকায় পাড়ি দেবে কিনা—আবার সেখানে এমনই কোনদিন কাণ্ড করবে কিনা। সেদিন আবার তোমার মেয়ের কাছে খবর

আসবে—সুজিত সোম মারা গেছে; সেদিনে তোমার মেয়ে কি মহামুক্তি পাবে মনে কর?"

মিসেস বোস দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন;—স্বামীর কথা শেষ হইলে তিনি মুখ তুলিলেন, বিবর্ণ, মলিন মুখ—।

কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিন্তু স্বাতী—সে কি এ সব কথা বিশ্বাস করবে, সে কি শুনবে?"

মিঃ বোস উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "না শোনে জোর করে শুনাতে হবে, তাকে বাধ্য করতে হবে। সুজিত সোম জানে আমার যা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে সব কিছুর অর্ধেক পাবে স্বাতী আর অর্ধেক শাশ্বতী পাবে, সেই জন্যই সে স্বাতীকে বিয়ে করার চেষ্টায় আছে। স্বাতীও ঠিক এই কথাই জানে। তুমি তাকে জানিয়ে দিয়ো কেটি, যদি সে আমার অমতে সুজিত সোমকে বিয়ে করে, আমার সম্পত্তি হতে একটি পাও সে পাবে না। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা, এর পরে তুমিও আর কোন দিন কোন কথা আমায় বলতে এসো না স্বাতীর সম্বন্ধে।"

তিনি হাতের সিগারেটটা জানালা পথে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রাখিয়া তিনি ঘরের ভিতর পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃস্তব্ধে পাদচারণা করিয়া তিনি স্ত্রীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

"স্বাতীকে তুমি নিজে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছো একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে, তাই বলে তার ভালোমন্দের দায়ী যে আমার হতে হবে না তা নয়। সে যেমন তোমার মেয়ে তেমনি আমারও মেয়ে, তার ভালোমন্দের, সুখ-দুঃখের ভাগ যেমন তোমায় নিতে হয়—তেমনি আমাকেও নিতে হয়—সেটা মনে রেখো কেটি।"

মিসেস বোস ভাবিতেছিলেন।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে অস্থির চঞ্চল চরণে আসিয়া পড়িল শাশ্বতী; দরজার পরদা সরাইয়া প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "এ পরদাগুলো না দিলেই ভালো হয় বাবা, পরদার বালাই আমি সহ্য করতে পারিনে। এই যে মাও এখানে রয়েছো, আমি তোমারই কথা বলতে বাবার কাছে আসছিলুম, তুমি এ সব করেছো কি বল দেখি, বিলিতি জিনিস রাশিকৃত করেছো যে? আমি অনেক দেশী দোকান জানি যেখানে আজকাল সবই পাওয়া যায়—বরং অনেক ভালো পাওয়া যায়, যা দেখলে—"

উত্তেজিত মিসেস বোস বলিলেন, "হয়েছে হয়েছে তোমার দেশী প্রীতির বেশী পরিচয় আর নাই-বা দিলে শাশ্বতী। তুমি নিজে দেশী জিনিস ব্যবহার কোর, আমি সে জন্য তোমায় কোন কিছু বলব না, অবাধ্য মেয়ে—"

শাশ্বতী মায়ের ভর্ৎসনায় হাসিল, বলিল, "মোটেই অবাধ্য নই মা, খুব বাধ্য মেয়ে হব যদি তুমি আমার বাধ্য হও। লক্ষ্মী মা মণি, তুমি ওই বিলিতি জিনিসগুলো কিনো না, ওতে দেশের পয়সা বিদেশে চলে যায়, দেশের লোক না খেয়ে মরে। তুমি আজ আমার সঙ্গে একবার দোকানে যেয়ো মা, আমি তোমায় দেখাব—যা তুমি কিনেছো, সে সব আমাদের এখানেও তৈরী হয়। আপনি বলুন বাবা—পাওয়া যায় না?"

মিঃ বোস কন্যার মাথায় হাত খানা রাখিয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, কি দরকার মা এদেশের ওই গরীব লোকেদের মুখের অন্ন জুটিয়ে—? জিনিস আমার চাই—পয়সা আমায় দিতে হবে, যেই পাক্‌না পয়সা তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।"

পিতা কন্যার হেঁয়ালি ভরা কথার মধ্যে মিসেস বোস উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি চললুম, ওদিকে কাজ আছে। তিনি দ্রুত চলিয়া গেলেন।

ক্রমশ



সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

[৩]

ইতিহাসে দুই ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিভা দেখা যায়। এক শ্রেণীর প্রতিভা আছে যাদের সৃষ্টি বা আদর্শ সাধারণের রুচিকে পরিবর্তিত করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভার বৈশিষ্ট এই যে, তারা জনপ্রিয় আদর্শকে রূপ দেয়। রাজা রবি বর্মার প্রতিভা ছিল দ্বিতীয় প্রকারের। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমকালীন আদর্শকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন, যার ফলে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এতদূর লোকপ্রিয় হতে পেরেছিলেন। যদিও আজকের দিনে রাজা রবি বর্মাকে আমরা অনুকারক হিসাবে দেখি, কিন্তু তার খ্যাতি হয়েছিল সে সময় স্রষ্টারূপে। ভারতীয় আখ্যান বস্তুকে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর আন্তরিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। চিত্রকলার আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন ইউরোপ থেকে, কিন্তু সত্যকারের তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁর শিল্পগুরু থিওডোরের কাছে। তাঁর এই ইউরোপীয় শিল্পগুরুর সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর একাডেমিক শিল্পের আদর্শ তিনি পান। ইউরোপীয় classic আদর্শ পাবার সুযোগ তাঁর হয়নি। কাজেই অত্যন্ত প্রাণহীন বিলেতী করণ-কৌশল তিনি চিত্রকর থিওডোরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ইউরোপীয় অংকন রীতির সাহায্যে ভারতীয় উপাখ্যান ইত্যাদিকে যেভাবে তিনি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন,



রাম লক্ষণের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা: শিল্পী—রবি বর্মা

সে সময় সত্যিই তা অভাবনীয়। কিন্তু প্রকৃত স্রষ্টার অনুভূতি না থাকায় রসের গভীরতা তাঁর ছবির মধ্যে প্রকাশিত হ'তে দেখা যায় না, সেইজন্য আজকের দিনে রবি বর্মাকে বিচার করতে হ'লে প্রতিকৃতিমূলক ছবিগুলিকেই কেন্দ্র করে আলোচনা হওয়া দরকার—কারণ এই জাতীয় ছবির মধ্যে তাঁর করণ-কৌশলের জ্ঞান এবং তাঁর সত্যকারের প্রতিভা খুঁজে পাওয়া সহজ হ'বে। রাজা রবি বর্মার জীবিত কালেই ভারতীয় রূপকলা এবং সমগ্রভাবে শিল্প রুচির ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা করেন পরলোকগত ই বি হ্যাভেল। ই বি হ্যাভেল যে সময় এদেশে আসেন, তখন ভারতের সর্বত্র এক শ্রেণীর সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। প্রাচীন সংস্কৃতির সংগে যোগ নেই এবং নূতন সংস্কৃতিকে তখন সম্পূর্ণভাবে জানবার সুযোগ ঘটেনি, এমনই এক অস্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে শিক্ষিত ভারতবাসী তখন কেবলমাত্র অনুকরণের বিপদ সবেমাত্র উপলব্ধি করছেন এবং সেই মোহ কাটাবার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এমন সময় হ্যাভেল মান্দ্রাজ থেকে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। ইংরেজ সরকার দেশীয় কারিগরদের জন্য কয়েক স্থানে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে আগত ইংরেজ শিক্ষক ও দেশীয় কারিগরদের সহযোগীতায় এই কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালে এই কেন্দ্রগুলি আর্ট স্কুল নামে পরিচিত হয়েছে। মান্দ্রাজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন, ই বি হ্যাভেল সর্বপ্রথম দেশীয় কারুশিল্প বিশেষভাবে তাঁতশিল্প সম্বন্ধে ভারত সরকার এবং দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। তৎকালীন সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষের পক্ষে এ জাতীয় আন্দোলন কেবল আশ্চর্যজনক নয়, অনধিকার চর্চার মতই অপ্রিয় লেগেছিল। তাঁর সত্যকারের কর্মজীবন সুরু হয় কলকাতায় আগমনের পর। কলকাতায় আগমনের অনধিকাল পরেই তৎকালীন শিল্পরুচির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু করেন, সাধারণত সে আন্দোলনকে চিত্র সংস্কৃতির আন্দোলন রূপেই জানি, তার কারণ চিত্র সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে হ্যাভেলের আন্দোলন সার্থক হয়েছে এবং হ্যাভেলের প্রধান খ্যাতি এই দিক দিয়েই। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনকে এবং তার নানা সমস্যাকে নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন এবং যাঁরা পরবর্তীকালে এই সব জটিল সমস্যা থেকে আমাদের মুক্তির পথ করে দেবাব চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজ হ্যাভেল তাঁদের অন্যতম। ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরেজী শিক্ষা যেমন মূলত বাঙলাদেশ থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যপ্ত হয়েছিল, তেমনি প্রতিকূল আন্দোলন অনেক দিক দিয়েই বাঙলাদেশে প্রথম দেখা দেয়। বিশেষভাবে শিল্প এবং সাহিত্য সম্বন্ধে একথা খুবই সত্য। অন্ধ অনুকরণ এবং জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে আমাদের মধ্যে যে রুচির বিকৃতি ঘটেছিল, তারই প্রতিক্রিয়া হ্যাভেলের আন্দোলনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা দেখি। হ্যাভেলের আন্দোলন ভালরূপে বোঝার পূর্বে বাঙলাদেশের তৎকালীন অবস্থা জানা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে সাধারণভাবে ভারতীয় রূপকলার পরিচয় দিয়েছি। ইউরোপীয় চিত্রের অনুকরণ এবং দেশীয় রূপকলার সংগে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাব এবং তারই ফলে জাতীয় শিল্প আদর্শ সম্বন্ধে অগাধ অজ্ঞতা, দেশের সর্বত্র তখন বিরাজ করছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতন 'বাঙলাদেশে তখন ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ চেষ্টা শিল্প আদর্শ সম্বন্ধে নূতন কোন আন্দোলন তখনও দেখা দেয়নি। কিন্তু অন্যান্য দিকে তখন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, সাহিত্য আন্দোলন তখন অনেক দূর অগ্রসর

হয়েছে—বাইরে অনুকরণের মনোভাব বিদ্যমান থাকলেও অন্তরে অন্তরে বাঙলাদেশ তখন বিদেশীয় অনুকরণের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। বঙ্কিমের সাহিত্যে এবং তৎকালীন বহু সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা তার প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। আমাদের নানা সামাজিক বন্ধনে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে নেতাদের দৃষ্টি পড়েছে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য এ পর্যন্ত জাতীয় শিল্প এবং রূপকলা সম্বন্ধে কেউই দৃষ্টি দেন নি। এ প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে যে, কেন শিল্পরুচি সম্বন্ধে সে কালের সমাজ এতদূর উদাসীন ছিলেন, কিন্তু সত্যই সে কালের সমাজ শিল্প সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, কিন্তু শিল্পের আদর্শ তাদের অত্যন্ত বিকৃত ছিল। বলা বাহুল্য এখানে কেবল ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের কথাই বলা হচ্ছে। ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণে আমাদের রুচির এমন শোচনীয় অবনতি ঘটতে পেরেছিল। দেখা যায় আমরা যখনই গত শতাব্দী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি, প্রধানত তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত দেশীয় সমাজকে লক্ষ্য করেই সে আলোচনা করে থাকি, সেইজন্য আমরা শিল্প সংস্কৃতির আলোচনা করতে গিয়ে যখন আমরা তার বিকৃতি দেখি তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে সেটা সমগ্র সমাজের ওপর আরোপ করি। কিন্তু সত্যকারের এই বিকৃতি ঘটেছিল বেশী পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষিত দেশীয় সমাজের মধ্যে। বিকৃত রুচি এবং অনুকরণের মনোভাব চোখে পড়ে মনে হয়, এই মনোভাবই ভারতের সর্বসাধারণের মধ্যে বিরাজিত।

উচ্চ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে রুচির পরিবর্তন হওয়ার কারণ ইংরেজী শিক্ষা ও আদর্শ এবং দেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। যারা সম্ভ্রান্ত এবং মূলত সংস্কারগত শিক্ষা যাদের মধ্যে বিদ্যমান তাদের মধ্যে তখনও রসবোধ ছিল রুচির একটা আদর্শও ছিল—যে আদর্শকে অনেকাংশে আমরা দেশীয় বলতে পারি। কিন্তু তার মধ্যে ব্যয় বাহুল্য এত অধিক পরিমাণে দেখা দিয়েছিল, যার ফলে, তাকে আর রসবোধ বলা যায় না সে আড়ম্বরে পরিণত হয়েছিল। যদিও এই সমাজ তখনও অনেক পরিমাণে দেশীয় ভাবাপন্ন, কিন্তু সৌন্দর্য তখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কারু কার্যে ও মূল্য দেখে ধার্য করা হ'ত। তবু ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে রুচির যে আদর্শ তার তুলনায় প্রাচীন পন্থি ভারতবাসীদের মধ্যে আদর্শ উচ্চতর ছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের রুচির (Standard) যে ইংলণ্ডীয় আদর্শের অনুকরণে তৈরী হয়েছিল, সেই ইংলণ্ডীয় রুচির অবস্থা তখন অনেক দিক দিয়ে আমাদের ধনী সমাজের আদর্শের সহধর্মী। কাজেই দেখা যায় তৎকালীন রসবোধের মধ্যে যে স্থবিরতা এসেছিল, তার মূলে একান্তভাবে ইংরেজী শিক্ষা বা কোন একটি বিশেষ কারণ নেই। কালে কালে সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছে, আবার তার মৃত্যুও ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনতিকাল পূর্ব থেকেই শিল্প সংস্কৃতি এমনই মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পোঁছেছিল। শিল্পের এই যে অবনতি তার কারণ ভিন্ন হ'লেও সে সময় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই শিল্পের অবস্থা এক। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে শিল্প সংস্কৃতির প্রাচীন আদর্শের অবসান ঘটল।

এখানে একটি ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে। এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে তৎকালীন ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও প্রাণ ছিল না। এ কথা বলা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। কারণ ভারতবর্ষের মত স্থানে বিচিত্র শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং চিত্র-শৈলীর মধ্যে কোথাও প্রাণের চিহ্ন ছিল না এ কথা বলা চলে না। আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজপুত চিত্র মোগল দরবারী চিত্রের মত প্রাণহীন হয়ে আসেনি। স্থাপত্য বা ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে সুদক্ষ কারিগরের অভাব ছিল না। এই সকল কারিগরদের মধ্যে সৃজনী শক্তি ছিল কিনা আমরা জানি না। কারণ তাঁদের সৃজনী শক্তি প্রকাশিত হবার সে সময় ক্ষেত্র মেলেনি। এমন কি যে ভারতীয় কারুশিল্প তখনও বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। পূর্বেই বলেছি যে, সাক্ষাৎভাবে ইংরেজ আমাদের রূপশিল্পকে নষ্ট করবার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ তাঁরা এমন কোন আইন করেননি, যার ফলে আমাদের রূপশিল্প নষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমগ্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিরাট উপেক্ষার ভাব সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম যুগের ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারকদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের আন্দোলন ঘটনাচক্রে দেশীয় রূপশিল্প বোঝবার পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়েছিল। এ কথা খুবই সত্য যে, বাঙলাদেশে এই সকল সংস্কারক (reformer) আমাদের অর্থহীন প্রাচীন সংস্কার থেকে মুক্ত হবার পথ করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বিদেশীয় সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবার অবাধ পথ করে দিয়েছিলেন। নূতন সংস্কৃতির সাহায্যে আমাদের অনেক বিষয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক বিষয় আমরা উপকৃত হয়েছি, কিন্তু আমাদের ক্ষতিও হয়েছে অনেক।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে হ্যাভেল যখন তাঁর আন্দোলন সুরু করেছিলেন, তখন সহযোগিতার চেয়ে বিরুদ্ধতা তিনি বেশী পেয়েছিলেন। এই বিরুদ্ধতার কারণ যেমন একদিকে দেশীয় বা বিদেশীয় রূপকলা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এবং জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে চিন্তার যোগ না থাকা, তেমনি আরও একটি কারণ আছে যে জন্য হ্যাভেলের আন্দোলন দেশবাসী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যে আগ্রহ ও আবেগের সঙ্গে একদিন দেশবাসী নবাগত ইংরেজ জাতীয় সংস্কৃতি আচার ব্যবহার সব কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে মোহ নানা কারণে অনেকখানি তখন মিলিয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বর্তমান শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। ইংরেজের শুভ বুদ্ধির প্রতি তখন সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে এবং নিজেদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে আত্মচেতনা তখন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। সেইজন্য ইংরেজ হ্যাভেলের চেষ্টা এবং তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ জেগেছিল। যে বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি হ্যাভেল দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং হ্যাভেলের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ দুই মিলিয়ে বিরুদ্ধতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বিশেষভাবে যাঁরা শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত, সংক্ষেপে যে বিশেষ শ্রেণী তখন জাতীয় জীবনের পথ নির্দেশ করছিলেন হ্যাভেলের আদর্শ তাঁদের রুচি ও বিশ্বাসকে আঘাত করেছিল। যে পাশ্চাত্য রুচি তখন বিশেষ গর্বের বস্তু এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হ্যাভেল সেকালে দেখা দিয়েছিলেন। হ্যাভেল কেবলমাত্র যদি মৃতপ্রায় ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কোন আদর্শ বা কোন আন্দোলন প্রবর্তন করতেন, তবে তার কাজ সহজ হ'ত, কিন্তু তিনি সমগ্রভাবে তৎকালীন রুচির বিরুদ্ধে আন্দোলন এনেছিলেন—তাই এত কঠিন হয়েছিল তাঁর কাজ এবং এইজনাই তিনি আমাদের নূতন যুগের সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে উদ্দেশ্য করে হ্যাভেল এই সময় একটি পত্র প্রকাশিত করেন। এই পত্র থেকে তাঁর আদর্শ, তাঁর উদ্দেশ্য এবং প্রতিপক্ষের মনোভাব আরও স্পষ্ট করে পাওয়া যাবে। এই পত্রখানি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে যে আঘাত দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং একই সঙ্গে তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চিত্রকর রাজা রবি বর্মা এবং তাঁরই মত সকল তৈলচিত্রকরদের আদর্শের বিরুদ্ধতা এই পত্রের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়।

এইবার আমরা সংক্ষেপে হ্যাভেলের কর্মজীবনের কিছু পরিচয় দিই। এ পর্যন্ত সরাকরী আর্ট স্কুলে যে শিক্ষাপদ্ধতি ছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে ইংলণ্ডীয় শিল্পের সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। এই আদর্শকে পরিবর্তন করবার চেষ্টা করেন হ্যাভেল এবং নানাভাবে তিনি তাঁর সহকর্মীদের এবং শিক্ষিত সমাজকে বোঝাবার

(শেষাংশ ৯৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রত্যাঘাত

অমিয়া সেন

অবশেষে সলিলের চাকরী হইল।

শশাঙ্কই চেষ্টা করিয়া তাঁহার অফিসে ঢুকাইয়া নিলেন। চল্লিশ মুদ্রা মাহিনায়।

শশাঙ্ক বড় ভাই, পদস্থ গভর্নমেণ্ট চাকুরে। ছ'মাস দিল্লী ছ' মাস সিমলা শৈলে কাটান।

সলিল দিল্লীতেই কায়েমী হইল।

সমস্যা বাধিল সলিলের স্ত্রী তাপসীকে লইয়া।

শশাঙ্ক মাথা চুলকাইয়া গৃহিণী চিত্রার নিকট কহিলেন, তারপর সলিলের ত এখানে চাকরী হল।

চিত্রা দেবী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, হল ত, তাতে হয়েছে কি?

শশাঙ্ক কহিলেন, সারা বছরে ছুটি ত ওর মোটেও নেই। ভাবছি, ও যখন এখানে রইল, তখন বাবা মাকেও ত এখানে আনিয়ে নেওয়া যায়!

চিত্রা আশ্চর্য হইয়া কহিল, তুমি কি ক্ষেপেছ! তোমার চার শ' টাকা মাইনেতে আমি সংসার খরচই কুলিয়ে উঠতে পারিনে, এর উপর তাঁদের আনালে চলবে কি করে?

শশাঙ্ক স্ত্রীকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন। প্রথমত চিত্রা ধনী কন্যা, দ্বিতীয়ত শিক্ষিতা, তৃতীয়ত পিতৃগৃহে সাহেবী ষ্টাইলে প্রতিপালিতা। নিজের সংসারে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ প্রভৃতি বাজে লোকের ঝামেলা সহ্য করিতে সে অপারগ। সলিলের সুদর্শন চেহারা ও নম্র স্বভাবের জন্য সে একটু বৌদির প্রীতিভাজন। তথাপি শশাঙ্ক প্লেটের উপরের ফলের টুকরাগুলো চামচ দিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলেন, বলছিলেম এইজন্যে যে, তা হলে তাপসীও আসতে পারে। নইলে মা বাবার জন্য তাকেও দেশে পড়ে থাকতেই হবে। বেচারী!

একটু থামিয়া পুনরায়—আর তুমি ত মাসে মাসে মা বাবাকে দেশে টাকা পাঠাওই—যে টাকাটা—

চিত্রা বিরক্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল—কী যে বলছ তুমি! বাড়িতে তাঁদের পাঠাই মাত্র কুড়িটি টাকা। সেই টাকায় কি এখানকার খরচ চলে? না, তোমার আত্মীয় বলে যখন সমাজে পরিচিত হবেন, তখন যেমন তেমন ষ্টাইলে থাকা পোষাবে? তাতেও তোমারি মাথা হেঁট। সলিলের মাইনের কথা বলবে? ঐ মাইনেয় আগে ওর নিজের খরচই চালাক। তারপর অন্য কথা।

শশাঙ্ক আরো কিছু বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিলেন না। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন তাপসীর করুণ সুন্দর মুখখানি একটু বেদনা জাগাইয়া দিল।

আর একদিক—

ছায়া সুনিবিড় সুন্দর পল্লীভবন।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুইয়া এক বৃদ্ধ খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। বেলা প্রায় এগারটা বাজে। পড়িতে পড়িতে কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বৃদ্ধ হাঁকিলেন, বৌমা—

—যাই বাবা, সতের আঠারো বছরের সুশ্রী একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিল।

পদ শব্দে বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, বৌমা, কি রকম মেঘ করেছে দেখেছ?

বৌমা আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল, কিন্তু বাবা, বেলাও কম হয়নি, এগারোটা প্রায় বাজে......

বৃদ্ধ চেয়ারের উপর আড়ামোড়া ভাঙিয়া কহিলেন, কিন্তু শরীরটা বড্ড ম্যাজ ম্যাজ করছে যে—

বৌমা হাসিয়া কহিল, এখন চান করতে গেলেই ভালো হত বাবা, চানের জল গরম হয়ে গেছে।

—তা হোক্, তুমি লাইট করে এক কাপ চা করে দাও মা লক্ষ্মী। এত ভূমিকা ফাঁদিবার এই হইল আসল কথা। বৃদ্ধের চায়ের তৃষ্ণা পাইয়াছে।

বৌমা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া যাইতে যাইতে কহিল, তা দিচ্ছি। কিন্তু মা জানলে আমাকে বকবেন। আর এত চা খাওয়াই আপনার পক্ষে মোটে ভালো নয়।

আর কদিনই-বা বাঁচব বৌমা, একটু খেতে দাও।

বৃদ্ধ হেরম্বনাথ বসু আমাদের পূর্বোক্ত শশাঙ্ক ও সলিলের পিতা। তরুণী তাপসী।

ঘণ্টা খানেক পরে গ্রামের পিয়ন চিঠি বিলি করিতে আসিয়া হেরম্বনাথের হাতে দুখানা চিঠি দিয়া গেল। একখানা পোষ্টকার্ড ও একখানা এনভেলাপ। দুখানাই সলিল লিখিয়াছে। চাকুরী প্রাপ্তির সংবাদ। পোষ্টকার্ডখানি হেরম্বনাথের নামে, এনভেলাপখানি তাপসীর নামে।

চিঠি পড়িয়া বৃদ্ধ উল্লাসে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বৌমা ও বৌমা—

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, অমন করছ কেন, হয়েছে কি?

—এই দেখ, ছোটখোকার চাকরী হয়েছে—

তাপসী আসিল,—আমাকে ডাকছিলেন বাবা?

—হ্যাঁ মা, তুমি যে আমাকে বড্ড চা খেতে দিতে চাও না, এই দেখ, ছোটখোকার চাকরী হয়েছে। এখন আর এক কাপ চা না দিলে আমি নাইবও না, খাবও না, এই বসলাম।

খামের চিঠিটা তাপসীর হাতে দিয়া পরম উল্লাসে হেরম্বনাথ আবার চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন।

গৃহিণীর মেজাজ অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কহিলেন, নাও আবার এখন চা! তা রোখ্ যখন চেপেছেই, আর দাঁড়িয়ে থেকে করবে কি বৌমা, জল চাপাওগে—

তাপসী হাসি চাপিয়া মনের চাঞ্চল্য যথাসম্ভব সংযত করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে কর্তা গিন্নীতে এই রকম পরামর্শ হইল,—আলবোলার নল মুখ হইতে নামাইয়া কর্তা কহিলেন, ছোটখোকার চাকরী হল, এত দিনে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

গৃহিণী বেদনার স্বরে কহিলেন, বাছা আমার চাকরী চাকরী করে তিন বছর বাড়ি ছাড়া।

কর্তা কহিলেন, এবার বৌমাকে পাঠিয়ে দিতে হয়।

—তা ত দেবই। অত দূর দেশে থাকবে, অসুখে বিসুখে দেখবে শুনবে কে? যত্ন আত্তিইবা করবে কে? বড় বৌমা ত মেম সাহেব, খোকার খাওয়া-শোওয়াই সে দেখে না, তারপর ত ছোটখোকা!

—কিন্তু বৌমা গেলে থাকব কি করে? মিনিটে মিনিটে আমায় চা-ইবা করে দেবে কে?

লণ্ঠনের আলোতে গৃহিণী দেখিলেন, কর্তার চোখের কোণে যেন জল জমিয়া উঠিয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিয়া কহিলেন, কষ্ট হলেই বা আর উপায় কি? ওদের ত এই সুখ শান্তির বয়েস। আমাদের দরকারে কি এখন ওদের ছাড়াছাড়ি করে রাখব?

সবেগে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ কহিলেন, না-না, তা ত নয়-ই। তবে কিনা বৌমা—তাপসী চলে গেলে...আঃ, আলোটা অত চড়িয়ে দিয়েছ কেন, লাগে—হাতের পাতা দিয়া বৃদ্ধ আলো হইতে চোখ আড়াল করিলেন।

গৃহিণী দুঃখেও, স্বামীর এই ছলনায় মনে মনে একটু না হাসিয়া পারিলেন না।

কহিলেন, কষ্ট যা হবার তা হবেই। ঠাকুর একটা রান্নার জন্য রাখতে হবে। রান্নাবান্না কতকাল ছেড়ে দিয়েছি, রাত্রে চোখেও ভাল দেখতে পাইনে, ও আর পারব না। তবে এ জন্যে টাকা কিছু বেশী লাগবে বটে, সে ব্যবস্থা ছোটখোকা করে দেবে। খোকা ত চার শ' টাকা মাইনে পায়, পাঠায় মাত্র কুড়িটি টাকা। উতেই নাকি বড়বৌর সংসার খরচে টানাটানি পড়ে যায়।

আলবোলার নল কখন হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, কলিকার আগুন কখন নিভিয়া গিয়াছে, হেরম্বনাথ কিছুই টের পান নাই। কি যেন ভাবিতে ভাবিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, বৌমার যখন বিয়ে হল তখন বয়স ছিল কত যেন গো?

—চোদ্দ। তুমি অত ভাবছ কেন, বৌমা যাবে, আবার আসবে...

বৃদ্ধ তেমনি অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, কি জানি!

শশাঙ্ক সলিলের নিকট তাপসীর যাওয়ার বিষয় লেখা হইল। যথা সময়ে তার উত্তরও আসিল।

সলিল লিখিয়াছে, তাপসীকে এখন আনিলে মা বাবার সেবার ত্রুটি হইবে, কাজেই সে তা পারিবে না। তার মাহিনা যদি আর কিছু বেশী হইত, তবে মা বাবার সঙ্গে তাপসীকেও আনা যাইত। হেরম্বনাথ মনে মনে শিশুর মত অবুঝ আনন্দের নেশায় বিভোর হইয়া গেলেন। গৃহিণী ছেলের উপর বিরক্ত হইলেন। আর তাপসী! তার যে কি হইল, কিছুই বোঝা গেল না।

পল্লীর বাসভবনে সে তাপসীরই মত রহিয়া গেল।

বৎসর পাঁচেক পরের কথা।

হেরম্বনাথ মারা গিয়াছেন। অল্প কয়েক দিনের ছুটি লইয়া শশাঙ্ক সলিল চিত্রা বাড়ি আসিয়া মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া আবার চলিয়া গিয়াছে।

সলিল চাকরী পাইবার পর আর একবার আসিয়াছিল বছর তিনেক পূর্বে। এবার আসিয়া দেখিল, তাপসীর কোলে বছর দুইয়ের একটি সুন্দর সুকুমার শিশু।

সলিল চাকরী পাইবার পূর্বে তাপসীকে ছাড়িয়া দুই তিনবার এখানে ওখানে গিয়াছে। চাকরী পাইবার পরেও একবার আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার তার কি যেন হইল। এক ফোঁটা শিশুর দুটি চঞ্চল চোখের হাস্যময় চাহনীতে তার অন্তর পুরুষকে যেন অবহেলে বন্দী করিয়া রাখিয়া দিল। ইহাকে এড়াইয়া যাইবার সাধ্য আর তার নাই বোধ হয়।

তাপসীকে বলিল, এবার চল তাপসী—

বিস্মিতা তাপসী মুখ তুলিয়া চাহিল শুধু, কথা কহিল না।

—কথা কইছ না যে!

—কোথায় যাব?

নিদ্রিত পুত্রের মুখপানে চাহিয়া সলিল বলিল, আমার কাছে চল্লিশ টাকা মাহিনা হইতে সম্প্রতি সে আশী টাকা পাইতেছিল।

তাপসী কহিল, ঐ মাইনেয় আমাদের আর মা'র খরচ কুলোবে?

—মা ত কাশী যেতে চাইছেন, তাঁকে কাশী পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। দাদা কিছু খরচ দেবে, আমি কিছু দেব—

সেই সলিল—যে একদিন,—মনে মনে তাপসী একটু হাসিল। কহিল, তা হয় না। এতকাল এ'দের সেবা করে কাটিয়েছি, এখন এই অসময়ে দূরে যেতে আমি পারি না।

অনিচ্ছা সত্ত্বে অত্যন্ত বেদনার সহিতই সলিল বিদায় লইয়াছে। শিশু পুত্রের মুখখানির স্মৃতি তার দুটি চোখকে কেবলই বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল।

ইহার পর আরও দুই তিনবার সলিল তাপসীকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে যায় নাই।

তারও পরে—

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর দুসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহিয়া গৃহিণীর মৃত্যু হইল।

এবার আর দেশে বসিয়া শ্রাদ্ধ হইল না। শশাঙ্ক ছুটি পাইল না। দিল্লী বসিয়াই দুই ভাই মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিল।

গৃহিণীর মৃত্যুর পর ছায়ায় ঢাকা পল্লীভবন যেন মৃত্যুর মত হিমশীতল ও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একা বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাপসী যেন বহির্জগৎকে সহসা ভুলিয়া যাইতে চায়। এই যে, মৃত্যু সহসা ঘটিয়া গেল—এ যেন শুধুই অকারণ নয়—এ শুধু শোকই আনে না—আনে উপলব্ধি—আনে আত্মার প্রতি গভীর চেতনা—'আমি সামান্য নয়'—এই পরমতম বিশ্বাস। শিশু তাপস ছায়ার মত মায়ের পিছনে পিছনে ঘোরে...জ্যোৎস্না রাত্রে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে মা, ধ্রুবর গল্প বল—

মা গল্প বলে—পিতার নিকট ধ্রুবর নির্মম অনাদরের কথা শুনিতে শুনিতে শিশুর মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে, ডাকে, মা! মা চমকিয়া ওঠে, শঙ্কাতুর বক্ষে ছেলেকে কাছে টানিয়া বলে, কেন বাবা?

—আমার বাবা দেখতে কেমন মা?

দুই হাত ললাটে ঠেকাইয়া খুব মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাপসী বলে, খুব সুন্দর—

—ঐ রাজার মতন?

অন্যমনস্ক তাপসী বলে, হ্যাঁ।

তাপস আবার বলে, বাবা যখন আমায় দেখবেন, ভালোবাসবেন ত?

—তিনি তোমায় খুব ভালোবাসেন তাপস।

—বাবা কবে আসবে মা?

—কেন তাপস, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

জ্যোৎস্নার আলোতে তাপস দেখিল, মায়ের দুই চোখে বিগলিত অশ্রুর ধারা।

তাপসের চোখ সজল হইয়া উঠিল, দুই হাত দিয়া মায়ের চোখ মুছাইয়া দিয়া বলে, আবার তুমি কাঁদছ মা! কেঁদনা। আমি বড় হয়ে—

তাপস থামিয়া গেল। বড় হইয়া কি করিলে মায়ের দুঃখ ঘুচিবে, তা সে এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। চোখ মুছিয়া তাপসী বলে, বড় হয়ে তুমি মানুষের মত মানুষ হোয়ো। সংসারে দু'একজনের দুঃখের চেয়ে অনেক মানুষের দুঃখ অনেক বড়। বড় হয়ে সেই দুঃখ তুমি বুঝতে শিখো।

তাপসী গ্রামের নারী সংগঠন সঙ্ঘের নেত্রী। তার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় সঙ্ঘ ক্রমশ বড় হইয়া উঠিতেছে।

—তা হলে কিছুতেই তুমি যাবে না তাপসী?

—কেন যাবে না বল? এতদিন মায়ের জন্য যেতে চাওনি। আজ ত মা নেই!

—মা নেই, কিন্তু তাঁর সমাধি আছে, সেই সমাধিতে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য আমার থাকতে হবে।

—এ তোমার কি খেয়াল তাপসী?

অবনত মুখ উন্নত করিয়া তাপসী স্বামীর মুখপানে চাহিল। কহিল, খেয়াল আমার! আমার কুসুম সকুমার প্রথম জীবন তোমার খেয়ালের অত্যাচারে জ্বলে গেছে, সেকি মনে পড়ে? কই, তখন ত একদিনও জানতে চাওনি, কিসে আমার সুখ, দুঃখ আমার কোথায়! সুখে দুঃখে স্ত্রীর ঠাঁই স্বামীর পার্শ্বে, সে ঠাঁই হতে আমাকে বঞ্চিত করেছিলে কোন্ অধিকারে? আর আজ? তোমার আত্মজ, তোমার বংশধর এসেছে আমার কোলে, আমাকে কাছে পাওয়ার জন্য তাই তোমার এত ব্যাকুলতা। এত আমার সম্মান নয়, সমাদরও নয়, এ আমার অপমান।

তাপস আসিয়া মায়ের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, অসহায় দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া সলিল কহিল, তুমি যাবে না আমার সাথে খোকন?

তাপস একবার মায়ের মুখপানে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, এতদিন পরে কেন এলে বাবা?

—তোমার মা যে ঠাকুরমাকে ফেলে যেতে চাননি, তাই।

—মা যাবে?

—তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ খোকন—

তাপস মায়ের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাবে মা?

—না বাবা।

—কেন?

—আমার কাজ কে করবে?

—তা হলে আমিও যাব না বাবা,

—আমি তা হলে একাই ফিরে যাব খোকন?

সলিলের কথা যেন অনেকটা আর্তনাদের মত শুনাইল। মায়ের আঁচল ধরিয়া তাপস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাকুল কণ্ঠে সলিল আবার কহিল, ভুলে যাও—ভুলে যাও তাপসী—আমি ভুল করেছিলাম—

—ভুলেই গেছি। নিজেকে ভুলেছি, তোমাকে ভুলেছি, প্রেম কি, তাও বোধ হয় ভুলেছি। তাই আজ যেতে পারব না। তোমার মধ্যে একদিন বাঁচতে চেয়েছিলাম, পারিনি। বেঁচে উঠেছি সন্তানের মধ্যে। নতুন করে জীবনকে গড়ে তুলতে আজ আর পারব না।

একটু দূরে সরিয়া গিয়া তাপসী একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। তুলসীতলায় প্রদীপটা বাতাসে নিবু নিবু করিয়াও নিবিতেছে না।.........

ঐ পাশে চেয়ারের উপর শরাহতের মত যন্ত্রণা-ব্যাকুলহৃদয় লইয়া সলিল নীরবে বসিয়া রহিল।

উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিস্মিত তাপস। তার দিকে চোখপড়ায় সলিলের দুই চোখে সহসা জল আসিল। পুত্রকে ধরিবার জন্য সে হাত বাড়াইল।

কিন্তু তাপস ছুটিয়া গিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, মা!

সিক্তকণ্ঠে মা বলিল, তাপস!

উভয়ের পিছনে বসিয়া অনাদৃত সলিল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল.........

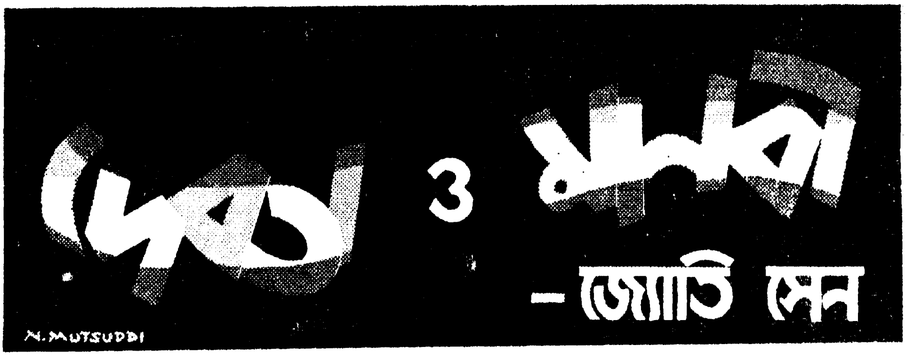
তুলসীতলায় প্রদীপটা নিভিয়া গেল।

সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র

(৯৩০ পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা করেন পুরাতন আদর্শের ব্যর্থতা সম্বন্ধে। যে সকল শিক্ষার্থী তখন আন্তরিক আগ্রহে তৈলচিত্র শিক্ষার জন্য আর্ট স্কুলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে দেশীয় কারিগররা অপাংক্তেয় ছিল, সেইজন্য শিক্ষার্থীদের কারুশিল্প শেখান প্রায় বাধ্যতামূলক করবার চেষ্টা করেন, তখন শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাপারটি রুচিকর হয়নি। এই সময় পাটনার লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে হ্যাভেল আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। দেশীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কলিকাতা আর্ট স্কুলে করেন। বর্তমানে এই জাতীয় উদ্যোগের অভিনবত্ব আমরা তেমনভাবে হয়তো উপলব্ধি করি না, কিন্তু ৯০০ সালের কলিকাতাবাসীর কাছে ভারতীয় আদর্শের চিত্রশিক্ষা দেওয়া বা ভারতীয় আদর্শের চিত্র কথাটারই মধ্যে অতি হাস্যকর ও অদ্ভুদ ভাব ছিল। হ্যাভেলের সহায়ক এই সময় বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। রাজেন্দ্রলালের ন্যায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের আবির্ভাব সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পের আদর্শ তখনও গ্রহণযোগ্য বলে কারও মনে হয়নি। ভারতীয় শিল্প কেবলমাত্র ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়, এই সংস্কৃতিকে নিয়ে নূতন যুগের শিল্প যে গড়ে উঠতে পারে, সে কথা হ্যাভেলের পূর্বে কেউ বলেননি। হ্যাভেল ভারতবাসীর শিল্পরুচিকে জাগ্রত করার জন্য নানাভাবে নানাদিক দিয়ে চিন্তা করেছিলেন। সমগ্রভাবে তিনি আমাদের মধ্যে একটা আদর্শ উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। চিত্রকলা এই চেষ্টার একটা অংশমাত্র ছিল। হ্যাভেল নিজে কখনও চিত্রকলাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেননি। সমগ্রভাবে দেখলে মনে হয় ভারতের কারুশিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। রসশিল্প ধনীর ভোগের জিনিস নয়। একথা তিনি বারংবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু হ্যাভেলের এই আদর্শ সর্বাঙ্গিন সফলতা লাভ করেনি। তাঁর আন্দোলনের মধ্যে চিত্রকলা সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল এবং চিত্রকলার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর আন্দোলন সার্থক হয়েছে এবং সত্যকারে তারই ফলে আজকে আমাদের রুচির পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। এই সার্থকতা এনেছেন হ্যাভেলের সর্বপ্রধান সহায়ক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৮৭৯।

(ক্রমশ)



২৪

ভিড় ভাঙ্গলে দিলীপ পদ্মাকে ধরিয়া ধরিয়া তাহার গাড়িতে উঠাইল। গাড়িতে উঠিবার সময় পদ্মা পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। দিলীপ আরও শক্ত করিয়া না ধরিলে সে হয়ত পড়িয়া যাইত। অতি সন্তর্পণে গাড়ি চালাইয়া আনিয়া দিলীপ জয়ন্তের বাড়ির সমুখে গাড়ি থামাইল। নিজে গাড়ি হইতে নামিয়া পদ্মাকে নামাইল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল—'হেঁটে যেতে পারবেন ত?'

পদ্মা ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—'আমাকে ধরে' নিয়ে চলুন।'

'আপনি আমার কাঁধে ভর দিন, তা' হলে আর কষ্ট হবে না।'—এই বলিয়া দিলীপ পদ্মাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া গেল।

পদ্মাকে এভাবে ঘরে আনিতে দেখিয়া ভৃত্য গোকুল তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। সাহস করিয়া যে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে এমন ভরসা পাইল না। কি হইয়াছে জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পদ্মা গোকুলকে বলিল—'ডাক্তার সাহেবের জন্যে একটু চা করত গোকুল—আর খাবার'—

দিলীপ বাধা দিয়া বলিল—'না না, ওসব কিছু করতে হবে না। ওকে একটু ওষুধ আনতে পাঠাব।'

—'ওষুধের দরকার হবে না, এমনি ভাল হ'য়ে যাব।'

'দু' পা হাঁটিতে যে পড়ে' যায় সে অমনি ভাল হয় আর কি! বাজে কথা বলবেন না।'

পদ্মা কহিল—'সত্যি, আমি প্রায় ভাল হ'য়েই গেছি।'

দিলীপ অবাক হইয়া বলিল—'ভেল্কিবাজি নাকি! এই হ'ল আর এই গেল! আপনার রোগটা কি তা'ত আমি ঠাওর করতে পারছি না।'

পদ্মা হাসিয়া কহিল—'হার্ট ডিজিজ্।'

'হার্টটা এগ্‌জামিন করলেই তা' বুঝতে পারব।'—বলিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দিলীপ পদ্মার পানে তাকাইল।

পদ্মা অসুস্থ হয় নাই, অসুস্থতার ভাণ করিয়াছিল। কিন্তু কার সাধ্য হঠাৎ বুঝিতে পারে। অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসাই করিতে হইবে। দিলীপকে সে অনায়াসে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে।

ফাঁকি দেওয়ার আর প্রয়োজন নাই দেখিয়া পদ্মা স্পষ্টই বলিল—'বুক পরীক্ষা করে' দেখতে চান দেখতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু অসুখটা বুক পরীক্ষার যন্ত্র দিয়ে আপনি ধরতে পারবেন না। চিকিৎসা শাস্ত্রের হৃদ্‌রোগ ত এ নয়, আপনার চিকিৎসা বিদ্যাও এখানে চলবে না।'

পদ্মার কথা শুনিয়া দিলীপ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

পদ্মা গোকুলকে বলিল—'দাঁড়িয়ে রইলি কেন গোকুল, আমার কিছু হয়নি, তুই যা—চা-টা নিয়ে আয়।'

গোকুল চলিয়া গেলে দিলীপ কহিল—'আপনার কাণ্ড দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছি।'

—'খুব অন্যায় করেছি বলে আপনার মনে হচ্ছে কি?'

—'নিশ্চয়। কত বড় অন্যায় তা' হয়ত আপনি বুঝতে পারলেন না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

পদ্মা চটিল। চটিয়া বলিল—'আপনি ছিঃ ছিঃ করবেন না। শুনতে ভাল লাগে না।'

দিলীপও তেমনি চটিয়া কহিল—'আপনি অন্যায় করতে পারলেন আর আমি ছিঃ ছিঃ করতে পারব না! কত বড় অন্যায় বলুন ত! আপনি নিজেও ডুবছেন আমাকেও ডোবাচ্ছেন।'

—'বেশ করেছি! আমি ত তাই চাই।'

—'কিন্তু আমি তা' চাই না।'

—'সত্যি বলছেন?'

—'তবে কি মিথ্যা বলছি?'

পদ্মা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—'দিলীপবাবু, আপনার যে পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ, তা' আমি জানি। আপনার প্রথম চাউনি দেখেই আমি তা' বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন যে আপনি সত্যি কথাটা স্বীকার করেন না'—

'আপনি ভুল বুঝেছেন, আপনার ধারণাটা ভুল।'—বলিয়া দিলীপ আত্মপক্ষ সমর্থন করিল।

কিন্তু যত জোরের সহিত সে কথাটা বলিতে চাহিল তত জোরের সহিত বলিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যেই সেই জোর ছিল না। কথাটা তাহার নিজের কানেই বেসুরো শুনাইল।

নিজের মনের অগোচরে পদ্মার প্রতি কখন যে সে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তা' তার কাছে রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। হয়ত প্রতিমার আশা ছাড়িয়া দেওয়ার পর তাহার মন পদ্মাকে অবলম্বন করিয়াছিল—শূন্য স্থানটা ভরাট রাখিবার জন্য। কিন্তু সে যে পদ্মাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে নাই ইহাও মিথ্যা নয়। পদ্মা পরস্ত্রী। তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা সে করিতে পারে না। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বিপদ ঘটিতে পারে, তা-ও সে জানে। তথাপি সে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, ইহার সে কি করিবে!

পদ্মা ভাবিতেছিল সে ভুল বুঝিল কি করিয়া! ভুল হইতেই পারে না। কিন্তু দিলীপের জেদ দেখিয়া ভুলই স্বীকার করিয়া লইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পদ্মা বলিল—'তা' হবে! হয়ত আমারই ভুল! কিন্তু দিলীপবাবু, আপনাকে ভুল বুঝে আমি যে

ক্রুত একটা ভুল করে' বসেছি তার কি হবে? এ ভুলের জন্য চিরজীবন আমি কষ্ট পাব—আর আপনি তাই চুপ করে' চেয়ে দেখবেন? আপনার একটু কষ্ট হবে না?

—'আমি কি করতে পারি বলুন?'

—'আপনার ওপরই আমার সুখদুঃখ সব নির্ভর করছে, আপনার যা' ইচ্ছা তাই আপনি করতে পারেন।'

দিলীপ ভাবনায় পড়িল। পদ্মার কাতর আবেদন উপেক্ষা করাও নিষ্ঠুরতা, অথচ এই আবেদনে সাড়া দেওয়াও অন্যায়।

দিলীপ শক্ত হইয়া বলিল—'আপনি ওরকম করে' বলবেন না। নিজেও অন্যায়ের মধ্যে যাবেন না, আমাকেও তার মধ্যে টেনে নামাবেন না!'

পদ্মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'অন্যায়টা কি? আর তাই যদি হয় হোক্। কেন অন্যায় করব না! একশ বার করব।'

—'এ কি রকম জেদ আপনার?'

—'আক্রোশে আমি জ্বলে যাচ্ছি দিলীপবাবু, তাই আমার এমনতর জেদ চেপেছে।'

আক্রোশটা যে জয়ন্তের উপর তা' দিলীপের বুঝিতে বাকী থাকিল না। কিন্তু কেন? জয়ন্ত পদ্মার কি ক্ষতি করিয়াছে? একদা তার নিজেরও আক্রোশ ছিল জয়ন্তের উপর। প্রতিমাকে পাওয়ার পথে সে-ই ছিল মস্ত বড় অন্তরায়। তবে কি এক্ষেত্রে প্রতিমাই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার এ আক্রোশ কেন? কি হ'য়েছে বলুন ত?'

পদ্মা দুঃখের সহিত বলিল—'আপনিও জানেন না দিলীপবাবু আমি কি ভাবে আছি! বাইরে থেকে আপনারা দেখছেন আমার মত সুখী কেউ নেই, কুবেরের ঐশ্বর্য আর মহাদেবের মত স্বামী নিয়ে আমি মহা সুখেই দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু শ্মশানচারী ভিখারী স্বামীর ঘর করা যে কি সুখের তা' যে ঘর করে সে-ই জানে!'

একবার থামিয়া পদ্মা পুনরায় বলিতে লাগিল—'টাকা থাকতেও দীন দুঃখিনীর মত আমাকে থাকতে হয়! যত সব নোংরা কুলী-বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে উনি ভালবাসেন—আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হয়, না গিয়ে রক্ষে নেই। কেননা ধর্মেকর্মে দুজনের এক হ'তে হবে। যতক্ষণ একসঙ্গে থাকি ততক্ষণ শুধু কাজ আর কাজের কথায় কেটে যায়। কি সুখে যে আমি আছি তা'ত বুঝতেই পারছেন!'

দিলীপ যে আশঙ্কা করিয়াছিল তা' অমূলক বুঝিতে পারিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বিদ্রূপ করিয়া বলিল—'আপনার অসুখটা যে কি এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।'

দিলীপের কাছে পদ্মা সহানুভূতি প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু তার বদলে পাইল বিদ্রূপ। পদ্মা জ্বলিয়া উঠিল—'আপনি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন?'

কথাটা বলিয়া পদ্মা আহত হরিণীর মত বড় বড় চোখ দুটি দিয়া কাতর দৃষ্টিতে দিলীপের মুখের পানে তাকাইল। তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

পদ্মাকে কাঁদিতে দেখিয়া দিলীপ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই সামান্য কথায় পদ্মা যে কাঁদিয়া ফেলিবে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—'আমার সত্যি অন্যায় হ'য়ে গেছে—আপনি কিছু মনে করবেন না।'

পদ্মা অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল—'নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে দিলীপবাবু! আপনি যে এমন হৃদয়হীন তা' আমি ভাবিনি।'

পদ্মার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। সে আর থামে না। কান্নার বেগে তাহার সমস্ত শরীর দুলিয়া উঠিতে লাগিল। চোখের জলে বিছানা ভাসিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দিলীপ আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার কাছে গিয়া দিলীপ রুমাল দিয়া চোখ মোছাইয়া দিল। তারপর তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—'আমাকে আর অপরাধী করবেন না। আপনাকে ব্যথা দিয়ে আমি নিজেই ব্যথা পেয়েছি। আমাকে ক্ষমা করুন!'

পদ্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। আপনি যা' বলেছেন ভালই বলেছেন। আপনার কাছে এ ছাড়া আমি কি প্রত্যাশা করতে পারি?'

—'কেন আপনি অবুঝের মত কথা বলছেন! আপনাকে সুখী করতে পারলে আমি নিজেও সুখী হ'তে পারতাম। কিন্তু কি করব! উপায় যে নেই!'

—'আমি আজ অধঃপাতের যে ধাপে নেমে এসেছি—এখান থেকে আমারও ফেরবার উপায় নেই।'

পদ্মার কথা শুনিয়া দিলীপ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার জন্যই যে পদ্মা অধঃপাতে নামিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুখে সে অস্বীকার করিলেও মনে মনে আর অস্বীকার করিতে পারে না। ইহার দায়িত্ব তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। পদ্মার অধঃপতনের জন্য সে-ই দায়ী।

গোকুল চা লইয়া আসিল। দিলীপের সমুখে একটা টিপয় টানিয়া আনিয়া তাহার উপর চা রাখিয়া গোকুল চলিয়া গেল। দিলীপ এক চুমুক চা খাইয়া বলিল—'আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার কি ধারণা জয়ন্তবাবু আপনাকে ভালবাসেন না?'

—'বিশ্ব সংসারের সকলকেই উনি ভালবাসেন, আমাকেই বা ভালবাসবেন কেন? কিন্তু সে ভালবাসা আমি চাই না।'

—'তা' হ'লে শুনুন, আমার ভালবাসাও যে খুব গভীর তা' আপনি মনে করবেন না। একদিন হয়ত তাতেও আপনার অরুচি হ'তে পারে। তখন কি হবে?'

—'তখনকার কথা এখনই ভাববার দরকার কি, সে তখন ভাবা যাবে।'

—'তা' বেশ! ভবিষ্যতের কথা আমরা ভাববো না। বর্তমান নিয়েই মাথা ঘামাব।'

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিন্তু আলো জ্বালাইবার কথাটা কাহারো মনে হইল না। জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই স্বপ্নময় আলো আঁধারে দিলীপ ও পদ্মা কপোত কপোতীর মত কুজন গুঞ্জনে মত্ত হইয়া রহিল।

হঠাৎ এক সময় পায়ের শব্দ শুনিয়া দু'জনে চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরের আলোটা জ্বলিয়া গেল। সেই আলোয় দেখা গেল জয়ন্ত অবাক্ হইয়া তাহাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

২৫

জয়ন্ত যে হঠাৎ আসিয়া পড়িবে ইহা পদ্মা বা দিলীপ কেহই ভাবে নাই। সাধারণত এ সময় সে বাড়ি আসে না। আর আজ ত তাহার অনেক কাজ। আজ আসিতে আরও দেরী হইবার কথা। কিন্তু তাহাদের হিসাবে ভুল হইয়া গিয়াছে। পদ্মা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া জয়ন্ত যে ছুটিয়া আসিবে এটা কাহারো মনে হয় নাই।

জয়ন্তকে দেখিয়া দিলীপ ও পদ্মা দু'জনেই যেন কাঠ হইয়া গেল। কাহারো মুখে আর কথা নাই। কি কথা বলিবে, কোন কথাই কেহ খুঁজিয়া পাইল না। অপরাধীর মতই তাহার মাথা নীচু করিয়া রহিল।

জয়ন্ত ধীরে ধীরে পদ্মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এখন কেমন আছ?'

পদ্মা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল—'ভাল আছি।'

—'কিন্তু চোখমুখ দেখে ত ভাল মনে হ'চ্ছে না। কি হয়েছে ডাক্তার? ওর অসুখটা কি?'

—'বিশেষ কিছু না। চিন্তা করবার কিছু নেই।'

জয়ন্ত বলিল—'মাথা ঘুরে নাকি পড়ে' যাচ্ছিল; আমি ত তাই শুনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলাম'—এই বলিয়া সে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।

দিলীপ বলিল—'মাথাটা একটু ঘুরেছিল—দুর্বলতার জন্যে। ওরকম হয়!'

'হুঁ!'—জয়ন্ত ভাবিতে লাগিল।

দিলীপ বলিল—'আমি তা' হ'লে উঠি?'

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল—'সেকি ডাক্তার! আমি এলাম বলেই তুমি চলে' যাবে?'

—'আমার ত আর থাকবার দরকার দেখছি না।'

—'দরকার আছে। বস।'

অনেকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ বাদে পদ্মা বলিল—'তোমার কি দরকার বল না। উনি কতক্ষণ বসে' থাকবেন?'

জয়ন্ত কহিল—'আচ্ছা, আজ তা' হ'লে তুমি যাও ডাক্তার। কাল তোমাতে আমাতে কথা হবে। আজ আমিও ক্লান্ত।'

—'আপনি কি বলতে চান বলুন না! দরকার থাকলে আমি বসতে পারি।'

—'পদ্মার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।'

জয়ন্তের কথা শুনিয়া দিলীপ ও পদ্মার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের মুখের অবস্থা জয়ন্ত বেশ ভালো করিয়া লক্ষ্য করিল।

একটু বাদে পুনরায় সে বলিল—'সেদিন পদ্মা আমাকে বলছিল সে আর নার্সিংহোমের কাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করায় ওকে কাজ করতে হচ্ছিল। বোধ করি বাইরের খাটুনি ওর সহ্য হচ্ছে না। ওকে ছুটি দেওয়াই ভাল।'

পদ্মা আপত্তি করিল—'না, আমার ছুটির দরকার হবে না। আমি পারব কাজ করতে।'

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল—'দিন কতক-এ দূষিত আবহাওয়া থেকে তোমাকে দূরে থাকতেই হবে। তোমাকে নিয়ে আমি চেঞ্জে যাব। কলকাতার আবহাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না।'

—'কেন, আমার কি হয়েছে?'

—'কিছু হয়নি? কিছুই যদি না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে পালিয়ে এলে কেন? যে কাজে আমরা নেমেছি—আজ তার জন্মদিন; আজকের দিনে তোমার কাজে ফাঁকি দেওয়া উচিত হয়নি। আজকের শোভা-যাত্রায় আমার পাশে তোমারও থাকা উচিত ছিল।'

ধরা পড়িয়া গিয়া পদ্মা উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। উচ্চকণ্ঠে কহিল—'পালিয়েছি—বেশ করেছি। আমার যা খুসী তাই করব।'

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল—'বেশ ত! ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও। তারপর তোমার যা খুসী তাই কোরো।'

দিলীপ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল। তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল—'আপনি ওঁকে নিয়ে চেঞ্জে চলে যান, সেই ভাল হবে।'

জয়ন্ত বলিল—'পদ্মা অনুপস্থিত থাকলেও তোমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না ডাক্তার। প্রতিমাকে তুমি পাবে। প্রতিমা তোমার সঙ্গে কাজ করবে।'

দিলীপ আর দেরি না করিয়া উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তও উঠিল। সদর দরজা পর্যন্ত দিলীপকে পৌঁছাইয়া দিয়া জয়ন্ত দিলীপের হাতখানি ধরিয়া বলিল—'ডাক্তার, আশা করি, এ-সব তুচ্ছ কথা ভুলে গিয়ে পুরা উদ্যমে কাজ ক'রে যাবে। মানুষ মাত্রেরই দোষ-ত্রুটি হ'য়ে থাকে— তা ত জানই। তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কাজ করাই ভাল।'

দিলীপের অনুশোচনা হইয়াছিল। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সে কি যেন বলিতে উদ্যত হইল। জয়ন্ত তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—'কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। অনেক রাত হচ্ছে, আর দেরি কোরো না। যাও।'

দিলীপ চলিয়া গেলে জয়ন্ত ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পদ্মা বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। জয়ন্ত তাহার কাছে গিয়া ডাকিল—'পদ্মা!'

পদ্মা সাড়া দিল না।

জয়ন্ত আবার ডাকিল। তথাপি পদ্মা সাড়া দিল না। আরও শক্ত করিয়া সে বালিশে মুখ লুকাইল।

জয়ন্ত আদর করিয়া তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। তারপর সস্নেহে বলিল—'কেন কাঁদছ?'

পদ্মা জোর করিয়া সরিয়া গিয়া বলিল—'আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি জবাব দেব না।'

—'বেশ! তুমি যদি তাতেই খুসী থাক, তাহ'লে তাই হবে।'

—'আমাকে খুসী করবার জন্যে তোমার ত ঘুম আসে না।'

জয়ন্ত প্রশান্তকণ্ঠে বলিল—'তুমি কি চাও পদ্মা, কি পেলে তুমি খুসী হও, তাই বল। তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমি সবই করতে প্রস্তুত আছি।'

পদ্মা কোন কথা বলিতে পারিল না। বুক ফাটিয়া তাহার কান্না পাইল। ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

জয়ন্ত আর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিল না। যে কাঁদিতে চায় তাহাকে কাঁদিতে দেওয়াই ভাল। নিজের মনে যখন মানুষ সান্ত্বনা পায়, তখন সে নিজেই শান্ত হয়। চুপ করিয়া জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। পদ্মার কান্না একটু কমিয়া আসিলে সে উঠিয়া গায়ের জামাটা ছাড়িয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

একটু বাদে পদ্মাও উঠিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুটি ফুলিয়াছে। সমস্ত মুখে একটা শোকের ছায়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয় তাহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

স্নান করিয়া জয়ন্ত ঘরে ঢুকিলে পদ্মা শান্ত ও সংযত কণ্ঠে কহিল,—'আমাকে নিয়ে তুমি আর সংসার করতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—'কেন?'

পদ্মা মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

'কি বলতে চাও বল না?' এই বলিয়া জয়ন্ত তাহার পাশে বিছানাটার উপর বসিল।

পদ্মা বলিল—'এর পর তুমি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না।'

—'তুমিই কি আর অবিশ্বাসের কাজ করতে পারবে?'

—'আমি তা' বলতে পারি না।'

—'অবিশ্বাসের কাজ তোমাকে আমি করতে দেব না।'

পদ্মা অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—'কিন্তু যা' করে ফেলেছি তার জন্যেও আমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।'

জয়ন্ত সহজভাবেই বলিল—'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিশ্চয়ই। আত্মশুদ্ধির জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করাই দরকার।'

—'তুমি যা করতে বল আমি তাই করব।'

—'তোমার যদি সত্যি অনুতাপ হ'য়ে থাকে, তবেই ত আমি বলতে পারি।'

পদ্মা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—'অনুতাপে আমি জ্বলে যাচ্ছি। আমি নিজে অন্যায় করেছি সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে অন্যায়ে লিপ্ত করেছি। আমার উচিত খুব কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করা।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—'এমন কি অন্যায় করেছ শুনি? আমার কাছে সত্যি করে বল।'

'সত্যি বলছি—এমন কিছু অন্যায় করিনি। এই তোমার গা-

ছুঁয়ে বলছি'—বলিয়া পদ্মা জয়ন্তের গায়ে হাত দিয়া কহিল—'বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু আজ এখানেই যদি এর শেষ না হ'ত তা' হলে কোথায় কোন্ অতল তলে যে ডুবে যেতাম তার ঠিক নেই।'

জয়ন্ত মৃদু একটু হাসিয়া বলিল—'তুমি ডুবে গেলেও আমি তোমাকে তুলে আনতাম।'

—'তুমি তা' পার, আমি বিশ্বাস করি, তুমি যে মানুষের মধ্যে দেবতা—তা' আমি জানি। কিন্তু তুমি দেবতা বলেই আমি তোমাকে পাচ্ছি না,—তুমি যদি দয়া করে' উঁচু থেকে একটু নেমে আসতে তা' হ'লে হয়ত আমি তোমার নাগাল পেতাম।'

—'তা নয় পদ্মা। মানুষের মধ্যে আমিও মানুষ, তবে অমানুষ নই। মনুষ্যত্ব লাভের জন্যে মানুষের যে তপস্যা করা দরকার, সেই তপস্যা আমি করেছি, তুমিও যদি তাই করতে তাহ'লে তোমাতে আমাতে তফাৎ থাকত না। তোমাকে সেই তপস্যা করতে হবে।'

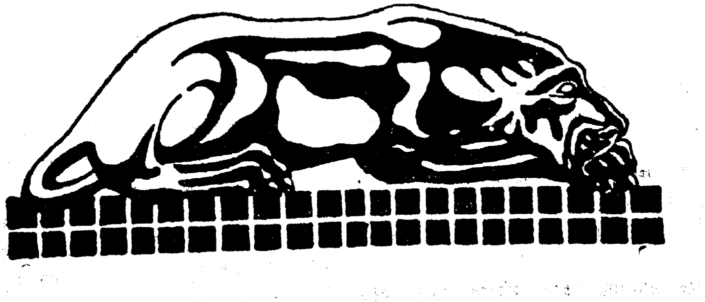
পদ্মা বলিল—'তপস্যা করতে বল—তাই করব। কিন্তু কি করে' তপস্যা করতে হয় তুমি আমায় শিখিয়ে দিও। আমি ত কিছুই জানি না। তেমন কোন শিক্ষাই পাইনি।'

জয়ন্ত পদ্মাকে একটু আদর করিয়া বলিল—'তোমার শিক্ষা-দীক্ষার একান্ত দরকার বলেই ত তোমাকে নিয়ে দিন কতক • কোন নিরালা জায়গায় গিয়ে থাকব।' (ক্রমশ)

সাহিত্য সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

"দামচাইল পল্লীমঙ্গল সমিতি" কর্তৃক পরিচালিত "পল্লী-মঙ্গল পাঠাগারের" উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। সকলেই যোগদান করিতে পারেন। ১। প্রবন্ধের বিষয়—পল্লী-সংস্কার (৪ পৃষ্ঠার অনধিক), ২। কবিতার প্রথম লাইন হইবে—"পল্লীমায়ের স্নেহের দুলাল নবীন তরুণ দল" (কবিতা ২০ লাইনের অনধিক)। প্রবন্ধে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারিগণকে ও শ্রেষ্ঠ কবিতা রচয়িতাকে রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। রচনা ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৯ বাং মধ্যে শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সম্পাদক, পল্লীমঙ্গল পাঠাগার, পোঃ সাদকপুর, ত্রিপুরা, এই ঠিকানায় প্রবেশ মূল্য এক আনার ডাক টিকিটসহ পাঠাইতে হইবে। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ও কবিতাটি কুমিল্লার "দরদী" পত্রিকায় ২রা ভাদ্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।" শ্রীহরিমঙ্গল বাড়রী, সম্পাদক, পল্লী-মঙ্গল সমিতি;



কুয়াসা

পরিমল মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ দু' মাস পরে অশোক চলেছে ছন্দাদের বাড়ি। ওর মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা। আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়, সম্প্রতি মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছে। কত সুখ, কত আনন্দই যে হচ্ছিল আজ ওর মনে। এই পথ দিয়ে দু' মাস আগেও কতবার যাওয়া-আসা করেছে। কিন্তু ওর মনে হচ্ছিল, পথের আলোর সঙ্গে আজ যেন নতুন করে পরিচয় হ'ল।

'অশোক!'

কে ডাকলে নাম ধরে! অশোক ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাল চারদিকে। দেখলে, যে ট্রামটা ওকে ছাড়িয়ে চলে গেল সামনের দিকে, তার ভিতরে বসে ছন্দা। কিছুদূরে থামল ট্রামটা। ছন্দা নামল।

কাছে এসে বললে, জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। আমাদের বাড়ি চলেছ? একি, এ দশা কেন চেহারার?

এগিয়ে যেতে যেতে মৃদু হেসে জবাব দিলে অশোক, বাঁ পা-টা লক্ষ্য করেছ কি?

ছন্দা তাকাল, দেখলে, হাঁটুর একটু নিচে থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অশোকের বাঁ পা-টা ব্যাণ্ডেজ করা।

ছন্দা ত্রস্ত, প্রশ্ন করলে, কী ক'রে হ'ল?

কোন মূষিক—বন্ধুই বোধ হয় কামড়েছিল। একদিন সকালে উঠে দেখি, গোড়ালিতে সামান্য একটু জায়গা কাটা, রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না। দু'-একবার আইডিন দিলুম; ভাবলুম, সেরে যাবে। কিন্তু দু'দিন বাদেই পেকে ফুলে উঠল সমস্ত পা-টা। হাসপাতালে ভর্তি হলুম। আটটা অপারেশনের পর বেঁচে উঠেছি ছন্দা। মানে, যমরাজার বৈঠকখানায় বসে এ যাত্রা একটু গল্প করে এলুম আর কি।

হো-হো করে হেসে উঠল অশোক। দু'মাস আগে এ হাসি শুনলে ছন্দার শরীরে পুলক-শিহরণ হ'ত। আজ সে ভয়ে কেঁপে উঠল।

ওরা বাড়িতে এসে পেঁছিল।

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করে ওরা বসতে না বসতেই ছন্দার মা এসে উপস্থিত হলেন।

সব শুনে বললেন, এই বিপদ গেল তোমার, একবার খবর দিতে নেই বাবা। আমরা ত ঠিকানাও জানি না তোমার।

চুপ করে রইল অশোক।

আজ আর চা নয় অশোক। রোগা শরীর তোমার, দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কি বল?

তাহলে ত রোজ রোজ আসব মা আপনাদের বাড়ি।

হ্যাঁ, তুমি তা আসছ।—বলতে বলতে ছন্দার মা বেরিয়ে গেলেন।

কি—ন্তু, এ দু'মাসের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, তুমি ত অনেকদিন থেকেই কলেজে যাচ্ছ না।

পড়ালেখা ছেড়ে দিলুম ছন্দা।

অপরাধ পড়ালেখার?

ভাল লাগে না।—বলে জানালার বাইরে নীরবে চেয়ে রইল অশোক।

পড়ালেখায় অশোক ভাল ছেলে, ছন্দা তা জানত। তথাপি অশোক কলেজ ছেড়ে দিলে। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন বিশেষ কারণ আছে, যা সে প্রকাশ করতে রাজী নয়। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে না ছন্দা।

ভৃত্য দুধ-মিষ্টি নিয়ে এল। অশোক আহারে প্রবৃত্ত হ'ল।

নীরবতার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ছন্দা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে। দু'মাস ধরে যে-কথাটি অশোককে বলবে বলে ভেবে রেখেছে, অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সে আজ তা উত্থাপন করলে, আচ্ছা অশোক, বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কি বিশেষ কোন কল্পনা বা অভিমত আছে?

প্রশান্ত দৃষ্টিতে অশোক ছন্দার দিকে তাকাল। ছন্দা নিষ্প্রভ হয়ে গেল, চোখ দু'টি নত করলে।

আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর অশোক ধীরে ধীরে জবাব দিলে, বিবাহ বিষয়ে ত কোনদিনই বেশী কিছু ভাবি নি, সুতরাং ঠিক উত্তর দিতে পারছি না। তবে একটা কথা কখনো-কখনো ভাবি বটে যে, আমার মত দরিদ্রদের আবার প্রেম কী, বিবাহের চিন্তা তারা করবে কেন।

তাহলে ত দেশের অধিকাংশ লোককেই বিয়ে না করে থাকতে হয়।

সম্ভব হলে তাই করতে হবে। আসল কথা কি জানো, আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতাই আমাদের মনকে—যাক, আমার মত ত বললুম।

আরও কিছুক্ষণ পরে অশোক বিদায় নিলে।

এম-এস-সি ক্লাসে ওদের পরিচয় হয়েছিল। তারপর, আর পাঁচটা ক্ষেত্রে যা হয়, ওদেরও তাই হ'ল—পরিচয় হ'ল নিবিড়তর। এর জন্যে ছন্দার দিক থেকেই প্রচেষ্টা হয়েছিল বেশি। পড়ালেখায় অশোকের মেধাই এর কারণ। প্রথম পরিচয় হবার কিছুদিন পরেই ছন্দা একদিন প্রস্তাব করলে, 'মাঝে মাঝে আসুন না আমাদের বাড়ি, একসঙ্গে পড়াশুনো করা যাবে।' অশোক সেদিন অসম্মতি জানাতে পারে নি বটে, কিন্তু প্রস্তাবটা তার কাছে লোভনীয় বলে মনে হয় নি। এর কারণ হচ্ছে, ছন্দারা ছিল ধনী, অন্তত বাঙালীর মাপ-কাঠি অনুসারে ধনী, এবং ধনীর সঙ্গে অশোক কেন যেন কোনদিনই ভাল করে মিশতে পারে নি। বন্ধুরা বলত, এটা হচ্ছে অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতি ওর মনের অবচেতন ঘৃণা; কেউ কেউ বলত, এটা ওর দারিদ্রের অহংকার। যাই হোক, মনের কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে ও একদিন গিয়ে উঠেছিল ছন্দাদের বাড়ি, আর সেদিন থেকেই ওদের মধ্যে নিবিড়তার ভিত গড়ে উঠতে শুরু হয়েছিল।

অসুখের পূর্বে শেষ যেদিন অশোক ছন্দাদের বাড়ি গিয়েছিল, সেদিন কথায় কথায় ছন্দা অশোকের ঠিকানা চেয়েছিল। অশোক মৃদু হেসে চুপ করে ছিল।

কেন, এতে আপত্তি কী?—ছন্দা বলেছিল, যেহেতু আমি তোমার পুরুষ-বন্ধু নই, সেই হেতু আমি তোমার বাড়ি বেড়াতে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? এত দুর্বলতা কেন তোমার?

স্ত্রী-পুরুষের কথাই নয় ছন্দা।—মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল অশোক, আসল কথা হচ্ছে, তোমার মত সম্মানিত অতিথি আমার মত দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরে এলে আমি লজ্জিত ও বিব্রতই হ'ব। তোমাকে উপযুক্ত সম্মান করবার ক্ষমতা আমার মোটেই নেই।

ছন্দা ইঙ্গিতটা বুঝেছিল। মনে মনে বিরক্ত হয়ে সে চুপ করে গিয়েছিল।

......সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে কেমন একটা অকারণ পুলকে অশোক সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এতদিন ছন্দার সান্নিধ্যে থেকেও অশোক তার প্রতি খুব বেশি রোমাঞ্চ অনুভব করে নি, কিন্তু সেদিন যেন কেমন একটা অজানা আবেশ সে অনুভব করলে অন্তরের গোপন কোণে। কিন্তু এ সুখ সে বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারল না। সেদিন রাত্রেই বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের মত এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা তার জীবনের গতিকে দিলে ঘুরিয়ে।

রাত্রি বারোটা তখন। সারা বাড়ি অন্ধকার। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। অশোকের মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে বুঝি একমাত্র সে-ই জেগে আছে। ছন্দা তখনো ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল, পাশের ঘরে তার বাবা বলছেন, জিনিসপত্রের দাম যা চড়ে গেল, দু'বেলা দু'টি ভাত, এর পরে দেখছি তা-ও জুটবে না। আমার দুধটাও বন্ধ করে দাও।

মা বললেন, এক পো ত দুধ- হ্যাঁ, তা'ও বন্ধ করে দিতে হবে, দুধওলার টাকা জমে গেছে অনেক।

বাবা হাসলেন বোধ হয়, খালি জল খাচ্ছ। জল খেয়ে কি পেট ভরানো যায়। তখন বললে, পেট ভরল না। খাবার আনতে বললুম, আনতেও দিলে না।

সম্ভবত মা ও হাসলেন, দ্যাখো, ছ'-সাত আনার বাজারে ও বেলাটাই তবু যা হোক করে চলে, এ বেলাটা যেন আর চলতেই চায় না। তরকারি যা'ও বা থাকে, ছেলেমেয়েদের দিয়ে আর আমাদের জোটে না।

যাক, ওরা জানতে না পারলেই হ'ল।

না গো, অনু বোঝে সব। এত লক্ষ্মী মেয়ে, নিজে খাবার সময় কিছু নিতে চায় না।

একটু থেমে মা আবার বললেন, ওই এক মেয়ে! যাই বল বাপু, এখন আর ওর বিয়ে না দিলেই নয়। গাছের মত হয়ে উঠেছে।

চুপ করো। জেগে উঠলে শুনতে পাবে এক্ষুণি। আমি কি কিছুই ভাবি না। যা করবার ভগবানই করবেন। ঘুমোও ত এখন।

ব্যাস্, নিস্তব্ধ রাত্রিতে অশোকের যে মধুর কল্পনার অভিযান আরম্ভ হয়েছিল, মুহূর্তের আঘাতে তা শতচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যত রাজ্যের বৈষয়িক চিন্তা তার মাথায় এল ভিড় করে। বাবা মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণি। পঞ্চান্ন বছর বয়সে পঞ্চান্নটা টাকা মাইনে পান না। বি এসসি'তে অশোক জলপানি পায় নি। এম এস-সি'তেও যে সে ভাল ফল করতে পারবে, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। আর, করতে পারলেও, অর্থাগমের দিক দিয়ে কোন সুবিধে হবে কিনা কে জানে। খুড়তুত ভাই-বোন তিনটির ত্রিভুবনে কেউ নেই। তারা অশোকদেরই আশ্রয়ে রয়েছে। তার মধ্যে অনুকে ত এখনই —নাঃ, মনে বহু আশা ছিল, সবই ত্যাগ করতে হ'ল। এখনই টাকার দরকার, যেরকম করেই হোক টাকা চাই।

পরদিন থেকে অশোক নিয়মিত চাকরির সন্ধান করতে লাগল। যেখানে যত ওষুধের ল্যাবরেটরি আছে, সেখানেই সে একের পর এক দরখাস্ত করে যেতে লাগল।

এর কিছু দিন পরেই মূষিক-দংষ্ট্র পা নিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল।

দীর্ঘ দু' মাস বন্ধ হয়ে ছিল বন্ধ ঘরে, তাই অশোক গিয়েছিল ছন্দার সঙ্গে দেখা করতে। ছন্দাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে সে পরম স্বস্তি সহকারে ভাবলে, যেন সে মস্ত বড় একটা কর্তব্য শেষ করে এল। বিবাহ সম্বন্ধে ছন্দার প্রশ্নটা স্মরণ করে সে মনে মনে হেসেও নিল বেশ খানিকটা,ছন্দা বিয়ে করতে চায় আমাকে! এতে ত পরে ও-ই ঠকত। ভাবত, কী ভুলই না করেছি।

পরদিন থেকে জীবিকার অনুসন্ধানে অশোক আবার আত্ম-নিয়োগ করলে।

একটু হাঁটলেই পা দুটো ফুলে ওঠে। ঘা এখনও ভাল করে শুকোয় নি, রস পড়াও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নি। তাই নিয়েই অশোক দিন পনের কুড়ি হাঁটাহাঁটি করলে। ইতিমধ্যে দু' জায়গা হতে আহ্বান এসেছিল, চাকরি দুটোই হতে হতে ফস্কে গেছে।

বেকার জীবনে প্রবেশ করে অশোক মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে, চাকরি বস্তুটা কত দুর্লভ। যদিও-বা কোথাও একটু আশা পাওয়া যায়, পরক্ষণেই সেটা যে কেমন করে হাত ছাড়া হয়ে যায়, তা সে বুঝতেও পারত না।

ডাকে দরখাস্ত দেওয়ার পয়সা সব দিন জোটে না। সুতরাং পদব্রজেই যেতে হয় তাকে চাকরির উমেদারিতে। পা ফুলে ওঠে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভের জন্য যদিও-বা সে কয়েকদিন ঘরে বসে বিশ্রাম নেয়, তখনই তার বেশি করে মনে পড়ে তাদের দারিদ্রের কথা। মনে পড়ে, আজ যদি বাবার চাকরি যায়, কিংবা হঠাৎ যদি বাবা মারা যান। অশোক শঙ্কিত হয়ে ওঠে। পরদিনই আবার সে বেরিয়ে পড়ে চাকরির সন্ধানে।

ধৈর্যের বাঁধ যখন ভগ্ন প্রায় হয়ে উঠেছে, তখন একদিন একটা বিখ্যাত দেশী ওষুধের কোম্পানি থেকে আহ্বান এল। এর আগে এখানে সে দু' তিন দিন যাওয়া আসা করেছিল।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আসা ও আশঙ্কা দোদুল মনে অশোক অফিসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। চাপরাশির হাতে স্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে সে বাইরে বসে রইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন।

ভিতরে গিয়ে ম্যানেজারের আদেশক্রমে সে একটি চেয়ার গ্রহণ করল। ম্যানেজার কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। সে যথাযথ উত্তর দিলে। উত্তরে খুশী হয়ে ম্যানেজার মাসিক ষাট টাকা বেতনে অশোককে নিযুক্ত করলেন।

নিয়োগপত্রটি হাতে নিয়ে অশোক চলে আসবে, এমন সময় ম্যানেজারের কর্মচারী তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনার বাঁ পায়ে কি কোন দোষ আছে?

অশোকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, বললে, না।

ম্যানেজার কর্মচারীর সস্মিত মুখের দিকে একবার চেয়ে অশোকের পায়ের দিকে তাকালেন।

বললেন, চৈত্র মাসের এই গরমে আপনি মোজা প'রে এসেছেন। দেখি—হ্যাঁ, ডান পায়ের চেয়ে বাঁ পাটা ত একটু ফুলো ফুলোই দেখছি। হাঁটুন ত দেখি একটু।

যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে চলবার চেষ্টা করলে অশোক। তারপর ফিরে এসে ম্যানেজারের কাছে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, মোজাটা খুলে ফেলুন ত।

অশোক কম্পিত হস্তে মোজা খুললে। ব্যাণ্ডেজ বেরিয়ে পড়ল। ব্যাণ্ডেজ খোলার আদেশ হ'ল। এবার বুঝি অশোক ভেঙে পড়বে। কিন্তু অতি কষ্টে আদেশ পালন করলে সে। পা দেখে ম্যানেজার আঁৎকে উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছিল, সেলুলাইটিস?

অশোকের গলা যেন কে চেপে ধরেছে।

শুধু মাথা নেড়ে সে জানাতে পারল যে, হ্যাঁ তাই।

অশোকের থেকে নিয়োগপত্রটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন ম্যানেজার। এবার আর অশোক স্থির থাকতে পারল না, কাতরস্বরে বলে উঠল আমি পারব স্যার কাজ করতে, দিয়ে দেখুন না আমায় চাকরিটা।

অসম্ভব। ল্যাবরেটরির কাজ, সাত আট ঘণ্টা সমানে দাঁড়িয়ে

কাজ করতে আপনি পারবেন না। আপনার ভালর জন্যেই বলছি। আপনি কি মারা পড়বেন?

চাকরি না পেলে আরও শীগ্‌গির মারা পড়ব যে।—অশোকের স্বরে মিনতি।

হয় না, তা হয় না। আচ্ছা, আপনি তাহলে আসুন।—বলে ম্যানেজার নিজের কাজে মন দিলেন।

এর পরেও অশোক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

অফিসের বাইরে এসে রাস্তাটা পার হবার সময় একবার শুধু সে আপন মনে বলে উঠল, দু' তিন মাস পার হয়ে গেল, এখনও শত্রুতা বন্ধু।

পাশের এক ভদ্রলোক পাগল ভেবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু পরক্ষণেই 'চাপা গেল, চাপা গেল' বলে একটা সোর-গোল উঠল। অশোক একটা চলন্ত ট্রামের সামনে তার পা-টা বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিন পাঁচ ছয় পরের কথা। পা কাটা অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজের একটি বেডএ অশোক শুয়ে ছিল। বাড়ি থেকে সবাই দেখতে এসেছে। অশোক তাদের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছিল। এমন সময় ছন্দা এসে উপস্থিত, হাতে একরাশ আঙুর বেদানা।

একি, তুমি কি করে এলে?—অশোক জিজ্ঞেস করলে।

একটা টুলে বসতে বসতে ছন্দা উত্তর দিলে, খবরের কাগজে সংবাদ পেয়েই অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। এ ক'দিন ধরে অনেক খুঁজে খুঁজে আজ এসে উঠেছি।

অশোক ছন্দার সঙ্গে তার মার পরিচয় করিয়ে দিলে। ছন্দা অশোকের মার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। একটু পরে ছুটির ঘণ্টা বাজতে অশোকের বাড়ির সকলে চলে গেল। ছন্দা ইচ্ছে করেই একটু দেরি করলে।

এইবার মৃদু হেসে অশোক বললে, বিবাহ সম্বন্ধে তোমার সেই প্রশ্নটা—

নাঃ, আর চাই না।—ছন্দা বলে উঠল।

কেন, আমার এই অবস্থা দেখে?

হ্যাঁ তাই। ওকি, তোমার মুখ কালো হয়ে গেল কেন? শোনই আগে। দ্যাখো অশোক, এতদিন তোমায় একটা কথা বলি নি। ডাক্তাররা অনেক দিন থেকেই আমার টি বি হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন। তাই ভেবেছিলাম, জীবনে বিয়ে করব না। কিন্তু তোমাকে চেয়েছিলুম। তোমাকে দেখে সত্যিই—যাক, যে দুঃখের পশরা এখন থেকে আজীবন তোমায় বইতে হবে, তার ওপরে আমি আর বোঝা হতে চাই না।

বলে একটু চুপ করল ছন্দা, তারপর আবার বললে, আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি। কাল আবার আসব। কেমন?

ছন্দা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। অশোক নিষ্পলকে তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।



রুশ-জার্মান যুদ্ধে ইরাণের গুরুত্ব

বসুবন্ধু শর্মা

ইরাণে অনেক জার্মান গুপ্তচর আছে এবং তারা বিপ্লবের সুযোগ খুঁজছে এই অজুহাতে গত আগস্ট মাসে ব্রিটিশ এবং রাশিয়া একযোগে ইরাণ আক্রমণ করে। এই সময়ে সংবাদপত্রে এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খৃস্টাব্দের বক্তৃতায় ইরাণ আক্রমণের দ্বিতীয় একটি কারণও প্রদর্শিত হয়। ইরাণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমরসম্ভার প্রেরণের সুবিধা হবে—এইটাই দ্বিতীয় কারণ। তবে মনে হয় যে, এই দুইটি প্রকাশিত কারণের পিছনে আসল কারণটি চাপা পড়ে গেছে। আসল কারণটি এই যে, সম্ভাবিত জার্মান আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে বাঁচানোর জন্যই ব্রিটিশ ইরাণ আক্রমণ করেছিল। ইংরেজ এবং রুশেরা ইরাণ দখল করার পর থেকে এ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের দিক থেকে বিপজ্জনক কতজন বিদেশী লোককে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। শুধু তেহেরাণে নাকি ৭০০ জার্মান ছিল; রাজধানীর বাইরে হয়ত তার চেয়ে কমসংখ্যক জার্মান ছিল। তুরস্কের মধ্য দিয়ে ৪০০র অধিক জার্মানকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।



হিটলার

ইরাণের রাজা শাহ রেজা পহলবী যে কিছুটা জার্মান প্রিয় ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি সিংহাসন হারানোর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং সেই জন্য গত পনর বৎসর ধরে তিনি তেহেরাণের চতুর্দিকে যাট হাজার সৈন্য মজুত রেখেছিলেন। ইরাণের মোট সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার। ইরাণের যা' কিছু রণসম্ভার তার প্রায় সব কিছুই ছিল এই তেহেরাণের চতুপার্শ্বস্থ সৈন্য দলের হেপাজাতে। ফলে সীমান্ত রক্ষার বিশেষ কোন সুব্যবস্থাই ছিল না। সেই জন্যেই গত আগস্ট মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ব্রিটিশ বাহিনী ও উত্তর থেকে রুশ বাহিনী এত সহজে ইরাণে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ইরাণীয় রাজসভায় এবং অনেক বড় বড় ইরাণী রাজপুরুষদের মধ্যে প্রবল জার্মান-প্রীতি ছিল; মনে হয় জার্মান গুপ্তচরদের অন্তরীণ করার চেয়ে এই সর্বব্যাপী জার্মান প্রীতি দূর করাই ছিল ব্রিটিশ এবং রুশদের প্রধান উদ্দেশ্য। রসিদআলীর অধীনে ইরাকে যেমন জার্মান-প্রীতি প্রবল ছিল, ইরাণেরও অবস্থা ছিল অনেকটা তেমনি। ইরাণ আক্রমণের আর একটা উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল, সোভিয়েটকে সাহায্য প্রেরণের সুব্যবস্থা করা। এই সময় ইউক্রেণ থেকে হটে আসতে বাধ্য হয়ে সোভিয়েট প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—তাই ব্রিটিশ এবং রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেছিলেন যে, সোভিয়েটকে সাহায্য করতে হলে ইরাণের মধ্য দিয়ে অপর একটি "বার্মা রোডের" সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ায় সমরোপকরণ প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হ'তে পারে এমন তিনটি পথ ইরাণে আছে। আমরা একে একে এই তিনটি পথ সম্বন্ধে আলোচনা করব।



ষ্ট্যালিন

জহিদান থেকে আফগানিস্থানের সীমান্ত ঘেঁসে পূর্ব ইরাণের মধ্য দিয়ে একটি পথ চলে গেছে মেসেদ অবধি। এই মেসেদ থেকে রুশীয় তুর্কিস্থানে যাওয়া যায়। করাচী থেকে কোয়েটার মধ্য দিয়ে যে বেলুচিস্থান রেলপথ চলে গেছে তারই শেষ স্টেশন হ'ল জহিদান। দ্বিতীয় পথটি হল ট্রান্স ইরাণীয় রেলপথ; পারস্য উপসাগরতীরস্থ বন্দর শাহপুর থেকে এই রেল-পথ সোজা কাস্পীয়ান্ সাগরতীরস্থ বন্দর শাহ পর্যন্ত গেছে। তৃতীয় পথটি হচ্ছে পারস্য উপসাগর তীরস্থ বসরা থেকে বাগদাদ্ পর্যন্ত সরু রেলপথটি এবং সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত বড় রেল-পথে খানিকিন্, কিকার্ক হ'য়ে এর্বিল পর্যন্ত। এই এর্বিল থেকে একটি পথ রোয়াণ্ডাজ্ গিরিপথের (Rowanduz Pass) মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইরাণে প্রবেশ ক'রেছে এবং তারপর উত্তর দিকে গিয়ে রাশিয়ার অধীনস্থ তাব্রিজ রেল স্টেশনে মিশেছে। এই তিনটি রাস্তার কোনটিই সুগম নয় এবং এই সব পথে সমর-সম্ভার প্রেরণে বহু বাধাবিঘ্ন আছে।

ইরাণের পূর্বাঞ্চল দিয়ে জহিদান থেকে উত্তর দিকে যে পথ গেছে, সে পথ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জনমনুষ্যহীন অঞ্চল দিয়ে গেছে—ফলে এ পথে জল পর্যন্ত পাওয়াও মুস্কিল—বিশেষ করে সিস্তান্ প্রদেশ সম্বন্ধে একথা ভাল-ভাবেই খাটে। এই পথটির অবিরাম মেরামত দরকার—বর্তমানে মেরামতের বিশেষ সুবন্দবস্ত নেই। হাজার হাজার ট্রাক্ এনে, অনেক ঘাঁটি সংস্থাপন করে, তবে যদি এ রাস্তার কোন উন্নতি সম্ভব হয়। যদি কোনক্রমে এই উন্নতি সম্ভব হয়, তবে মেসেদ দিয়ে রুশীয় তুর্কিস্থানে ট্রাকগুলো যেয়ে পৌঁছাতে পারে। সেখানে



রেজা শা পহলবী

কোন সুবিধাজনক স্থানে মাল নামিয়ে রেলপথে কাস্পিয়ান্ সাগরের পূর্বতীরস্থ ক্রাস্নোভডস্কে (Krasnovosk) চালান দেওয়া যেতে পারে। ক্রাস্নোভোডস্ক বাকুর ঠিক বিপরীত দিকে। এখানে মালগুলো আবার স্টীমারে তুলতে হবে। কাস্পিয়ান সাগরে ভাল স্টীমার পাওয়াও মুস্কিল ব্যাপার। হাজার দুয়েক টনের গোটা পাঁচেক স্টীমারের বেশী কাস্পিয়ান সাগরে নেই—এই স্টীমারগুলোর বেশীর ভাগই আবার গত মহাযুদ্ধের পূর্বে নির্মিত। উপকূলস্থ বাণিজ্য চালনার জন্য গোটা পঞ্চাশেক ছোট ছোট স্টীমার আছে বটে—তবে তাদের গতি খুব কম, আর তা' ছাড়া ভারী রণসম্ভার বহন করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বাকুতে আবার জাহাজে শত্রু বিমান আক্রমণের আশঙ্কা আছে। মোট কথা এই পথে ছয় মাস কঠোর পরিশ্রম প্রয়োগ করতে পারলে, তবে প্রতিদিন রাশিয়াতে পাঁচশ টন সমর-সম্ভার পাঠানো সম্ভব। অতএব এটা প্রধান সরবরাহের পথ হতে পারে না।

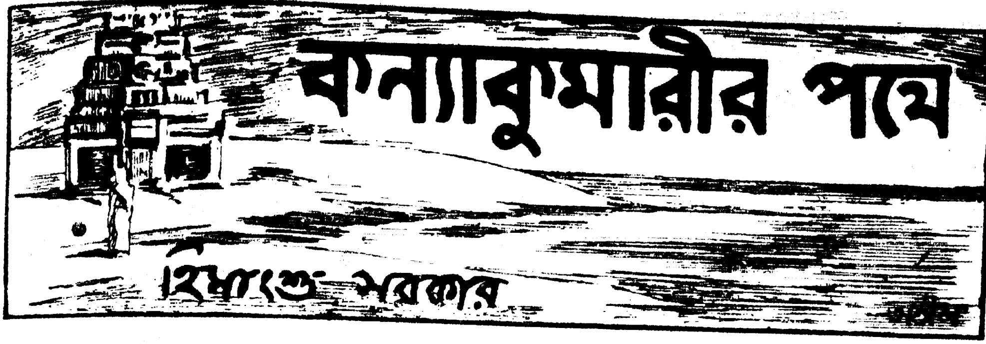
১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত ট্রান্স্-ইরাণীয় রেলপথটি এঞ্জিনীয়ারের অপূর্ব কৃতিত্বের নিদর্শন। ৮৭০ মাইল পার্বত্য পথে কত তরাই উৎরাই উৎরে যে এ রেলপথ চলে গেছে তার সংখ্যা নেই। এই পথে মোট ২২৪টা সুড়ঙ্গপথ (tunnel) আছে—আর আছে ৪১০২টি সেতু। দক্ষিণের শেষ স্টেশন-বন্দর শাহপুর ত্যাগ করার পর এই লাইনটি উপকূলবর্তী সমতল ভূমি ছাড়িয়ে কোটালে পেঁছায়—এখানে শুধু পরপর পর্বতশ্রেণী সাজানো। ট্রেন যখন খুরমাবাদের কাছে অধিত্যকা অঞ্চলে এসে পেঁছায় তখন দুটো এঞ্জিন ব্যবহার করার দরকার হয়। এই-ভাবে কাস্পিয়ান্ হ্রদের তীরে বন্দর শাহে পেঁছানোর পর মাল-পত্র নামিয়ে নিতে হয়। এখান থেকে মাল পাঠাতে সেই পূর্বের মতই জাহাজের অসুবিধা। কাস্পিয়ান্ সাগরের পথে রণ-সম্ভার প্রেরণ সত্যই ঝকমারি ব্যাপার। তা' ছাড়া বর্তমানে ট্রান্স ইরাণীয় রেলপথে মাত্র আশীটি এঞ্জিন আছে—উঁচু জায়গায় দুটো এঞ্জিনের দরকার হয় ব'লে বর্তমান অবস্থায় মাত্র চল্লিশ-খানি ট্রেন চলতে পারে। সমস্ত রকমের মোট তিন হাজারখানি মালবাহী কামরা আছে। বর্তমানে এ লাইনে দৈনিক পাঁচ শ' টনের বেশী মাল যাতায়াত করতে পারে না; তাতে শান্তির সময়েই ইরাণের প্রয়োজন মেটে না—তার উপর বর্তমানে সামরিক প্রয়োজন। এই পথটির উন্নতিসাধন করতে পারলে এটি প্রধান সরবরাহ পথে পরিণত হ'তে পারে। পারস্যোপসাগর তীরস্থ বন্দরগুলোরও বিশেষ উন্নিসাধন প্রয়োজন। বন্দরগুলোর সংস্কার না করা পর্যন্ত ট্রান্স্-ইরাণীয় রেলপথে ভারী সমরোপকরণ চালান দেওয়া কষ্টসাধ্য। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে এই রেল পথের একটি শাখা তাব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। কিন্তু অর্ধপথে জেন্জান্ পর্যন্ত গিয়েই এ শাখা-রেলপথ শেষ হ'য়েছে। জুল্ফার পথে বাকুর সঙ্গে তাব্রিজের রেলপথের সংযোগ আছে। যদি এ শাখাটি সম্পূর্ণ হ'ত তবে রাশিয়ার রেলপথের সঙ্গে ট্রান্স-ইরাণীয় রেলপথের যোগাযোগ সাধিত হ'ত এবং কাস্পিয়ান সাগরে নৌপথে আর সমরোপকরণ চালান দেবার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু এ শাখাপথ সম্পূর্ণ করতে হ'লে শিবুলির গিরিপথে বড়-সুড়ঙ্গ পথের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাজেই এ বাকী পথটা মোটর ট্রাকে মাল নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

তৃতীয় পথটির অসুবিধা সব চেয়ে বেশী। বস্রা থেকে বাগ্দাদের দূরত্ব ৩৫৩ মাইল। এই রেলপথটি অতি সংকীর্ণ—গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত থেকে আনা যন্ত্রপাতি দিয়েই এ রেল-পথটি নির্মিত হয়েছে। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে এ লাইনে ৫৫টি এঞ্জিন ছিল আর ছিল ২৫৪৬খানা মালবাহী রেল কামরা। এই সব গাড়ি মোটেই প্রধান লাইনের উপযুক্ত নয়। এ লাইনের দৈনিক মালবহনের ক্ষমতা হাজার টন; শুধু রাশিয়ায় সমর-সম্ভার পাঠানোর জন্যই এ লাইনটি ব্যবহৃত হতে পারে না—ইরাকের সাধারণ দৈনন্দিন প্রয়োজনও এই লাইনকেই মেটাতে হয়। এই রকম সংকীর্ণ রেলপথের জন্য গাড়ি এবং এঞ্জিন আমেরিকা থেকে পাওয়া সহজ নয়—তাই ভারত থেকেই এর অভাব পূর্ণ করতে হবে। অথচ বর্তমান যুদ্ধের জন্য ভারতীয় কোম্পানীগুলোর কাজ এত বেড়ে গেছে যে, তাদের পক্ষে এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। বাগদাদে মাল নামিয়ে অন্য গাড়িতে চাপাতে হয়, কারণ এ লাইনের উত্তরাঞ্চলে জার্মানগণ নির্মিত বার্লিন বাগ্দাদ রেলপথের বিস্তৃততর অংশ। এখানে সংকীর্ণ লাইনের গাড়ি চলতে পারে না। এখানে গাড়ির সংখ্যাও খুব কম। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে বাগদাদ থেকে মসুলের (৩০০ মাইল) মধ্যে মাত্র ১১টি এঞ্জিন এবং ৫২৫খানি মালবাহী কামরা ছিল। গত যুদ্ধে জার্মানদের কাছ থেকে এগুলো অধিকার করা হ'য়ে-ছিল—তারপরে আর এ লাইনে নতুন কোন গাড়ি যোগ করা হয় নি। এই পথে প্রেরিত সমরোপকরণ যখন অবশেষে তাব্রিজে পেঁছে, তখন রাশিয়ার রেলপথের সাথে সংযোগ সাধিত হয়। কিন্তু তাব্রিজ্ থেকেও ককেশাস পার হয়ে সোজা যাওয়া চলে না—রাশিয়ার সমতল ক্ষেত্রে পেঁছাতে ছয় শ' মাইল ঘুরে যেতে হয়। মোট কথা বসরা থেকে এ পথে রাশিয়ায় সমরোপকরণ পাঠাতে প্রায় ১৬০০ মাইল অতিক্রম করতে হয় এবং তিনবার গাড়ি বদল করতে হয়।

বর্তমান অবস্থায় একযোগে তিনটি পথে রাশিয়ায় সমরোপকরণ পাঠালেও, প্রতিদিন হাজার টনের বেশী মাল পাঠানো সম্ভব নয় ব'লেই মনে হয়। যদি এর মধ্যে রেলপথ-গুলোর উন্নতি সাধিত হয়, বন্দরগুলোর সংস্কার করা হয়, পথ-গুলোর উন্নতি করা হয় এবং যদি হাজার হাজার ট্রাক্ পাঠানো সম্ভব হয়, তবে দ্বিগুণের বেশী মাল পাঠান সম্ভব হবে ব'লে মনে হয়। এতে রুশদের পক্ষে ককেশাসে জার্মান আক্রমণ প্রতি-হত করা সম্ভব হবে বটে—তবে এই সামান্য সমরোপকরণের সাহায্যে তাদের পক্ষে রাশিয়ার বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে বাধাদান সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

ইরাণ আক্রমণের তৃতীয় কারণটি যদিও খুব স্পষ্ট নয়—তবু এর গুরুত্ব খুব বেশী। সেটা হ'চ্ছে ভারতকে জার্মান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিব্রত হ'য়ে লর্ড রদারমিয়ার ব'লেছিলেন:—"If we lose India, the linchpin of the

(শেষাংশ ৯৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



১৪

মুর্পম উৎসবের ৫৬ দিন যদিও স্তোত্র এবং মন্ত্র পাঠই হয়, তবুও এই ৫৬ দিন আবার ৮ দিন করে ৭টি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে অর্থাৎ ৮ দিন এক জাতীয় স্তোত্র এবং মন্ত্র পাঠ হয়। তারপরের ভাগে আবার আর এক জাতীয় স্তোত্র এবং মন্ত্র পাঠ হয়—এইরূপভাবে চলে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা উৎসবের প্রত্যেক দিন প্রাতঃস্নান শেষ করে শ্রীবিষ্ণু পদ্মনাভের মন্দিরে গিয়ে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে মন্ত্র এবং স্তোত্রাদি পাঠ করেন। এর পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার স্তোত্র ও মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন।

এরপর সন্ধ্যার সময় যে মন্ত্র এবং স্তোত্র পাঠ হয়, সেটা একটু অন্য ধরণের। একে 'জল জপ্পম' বলে। এই সময় সব ব্রাহ্মণরা এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্তোত্র এবং মন্ত্র পাঠ করেন।

উৎসবের শেষ দিন সমস্ত মন্দিরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সমাপন হয়। মহারাজা এই মুর্পম্ উৎসবের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব থেকে খরচ করেন।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভেনদ্রাম দেখা শেষ করে, আমরা এখান থেকে সন্ধ্যাবেলার ট্রেন ধরে ত্রিচিনপল্লী যাব ঠিক করলাম। স্টেশনে যাওয়ার পথে আমরা একটা হোটেল থেকে রাত্রের খাওয়া শেষ করে নিলাম। ট্রেন স্টেশনে আসার পর একটা বেশ বড় খালি কামরায় উঠলাম—কারণ আমাদের প্রায় সারা রাত এই ট্রেনে কাটাতে হবে। ট্রেন ছাড়বার পর সকলে শোবার জন্য বিছানা পেতে নিলাম। কিন্তু শোবার আগে সকলেই একটু চিন্তিত হ'লাম—কারণ আমাদের ত্রিচিন-পল্লীতে নামতে হবে ভোর বেলা ৪টা নাগাদ। শুনতে ভোর ৪টা হ'লেও—এটাকে শেষ রাত্রি বলা চলে, অন্তত পক্ষে আমাদের কাছে। তাছাড়া আমাদের সকলেরই ঘুম যা—ভোর ৪টার আগে ঘুম ভাঙলে হয়। কি আর করা যায় সকলে মিলে ঠিক করলাম যে একটু সজাগ হয়ে না হয় ঘুমান যাবে। সকলকে বলা রইল যে রাত্রে যারই ঘুম ভাঙবে সে ঘড়িতে সময়টা দেখে নেবে। এইরূপ বন্দোবস্ত করে সকলে শুয়ে পড়লাম।

ট্রেনের একটানা ঝাঁকুনীতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না—হঠাৎ একটা খুব জোর ঝাঁকুনীতে ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে দেখলাম যে গাড়ি একবারে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার মত আর সকলেও বিছানায় উঠে বসে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। গাড়ি হঠাৎ এ রকমভাবে দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ সম্বন্ধে আমরা যখন কিছুই ঠিক করতে পারলাম না—তখন জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বার করলাম। ইচ্ছাটা যে বাইরে তাকিয়ে কিছু বোঝা যায় কিনা। তারও কোন উপায় নেই দেখলাম। অন্ধকার রাত। বাইরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ বাইরে মুখ বার করে থাকবার পর দেখলাম যে গার্ডের গাড়ির কাছে যেন কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে। তার মধ্য থেকে দু একজন টর্চ জেলে কিছু খুঁজছে। এমন সময় একজন লোক গার্ডের গাড়ির দিক থেকে আমাদের দিকে আসছে দেখলাম। লোকটা কাছে আসতে তার পোষাক আর চেহারা দেখে ইঞ্জিনের ড্রাইভার অথবা ড্রাইভারের সহকারী বলেই মনে হ'ল।

আমরা তাকে প্রশ্ন করে জানলাম যে এক আরোহীর বুক পকেট থেকে টাকা শুদ্ধ মানি ব্যাগটা ট্রেনের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সে ট্রেনের বিপদ সংকেতের শিকল টেনে ট্রেন থামিয়েছে। এই অন্ধকারের মধ্যে রেল লাইনের ধারে সেই ব্যাগ খোঁজবার চেষ্টা যে



তাঞ্জোরের একটি মন্দিরের স্তম্ভ

বৃথা, সেটা সকলেই বুঝলাম। ব্যাগের অধিকারী কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেই টর্চ জেলে-তার ব্যাগ খুঁজতে আরম্ভ করেছে—কারণ টাকাটা যে তার নিজের। রেলের কর্মচারীরা তাকে বোঝাতে ব্যস্ত যে, এখন ব্যাগ খোঁজবার চেষ্টা করা অসম্ভব—তা হ'লে সারা

রাত এখানে ট্রেন দাঁড় করিয়ে—দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যাই হোক কিছুক্ষণ বাদেই আবার ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। অবশ্য এটা জানতে পারলাম না যে আরোহীটি কি করলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে তার দুটো পথ খোলা ছিল—হয় টাকার মায়া ছেড়ে ট্রেনে উঠে বসা—আর না হয় প্রাণের মায়া ছেড়ে অন্ধকারে সেখানে টাকা খুঁজতে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করা। আমার যতদূর মনে হয়, আরোহীটি টাকার মায়া ছেড়ে ট্রেনেই উঠে বসেছিল।

ট্রেন আবার চলতে আরম্ভ করার পর সকলে শুতে যাবার উপক্রম করতেই দলের যারা বাংকের ওপর শুয়েছিল, তাদের একজন বলল যে, সে আর বাংকের ওপর শোবে না—কারণ ট্রেনের এই বিশ্রী রকমের ঝাঁকানীর দরুণ বাংক থেকে সে প্রায় নিচে পড়ে যাচ্ছিল। কথাটা সে ঠিকই বলেছে—কিন্তু বাকি রাতটুকু মধ্যে, এ ধরণের যে আর কিছু হবে না এটা এক রকম ধরে নেওয়া যায়। তা ছাড়া এরপর বাংকে না হয় একটু সাবধান হয়ে শুলেই চলবে। সে কিন্তু দেখলাম যে আর বাংকে শুতে সম্পূর্ণরূপে নারাজ—এতে যদি তাকে নিচে বেঞ্চের ওপর বসে যেতে হয়, তাতেও সে আপত্তি করবে না—কিন্তু বাংকের ওপর আর সে উঠছে না। অন্য উপায় না দেখে নিচের একজনের সঙ্গে তার শোবার জায়গা বদল করে দেওয়া হ'ল।

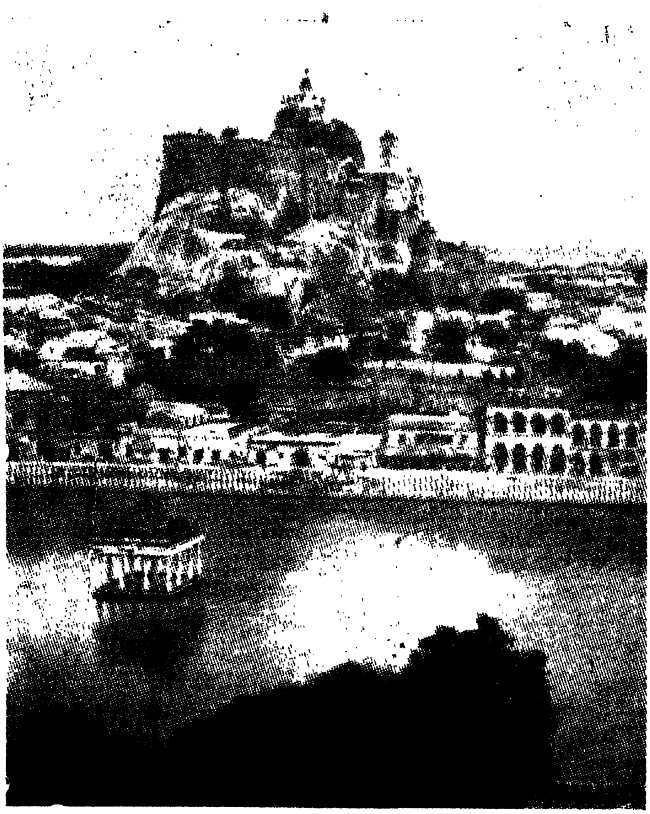
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে রাত খুব বেশী হয় নি—আর এক দফা ঘুমের কোন অসুবিধা হবে না দেখে, আমরা সকলে শুয়ে পড়লাম।—বেশ ঘুমিয়ে পড়েছি—হঠাৎ বাংকের নিচে একটা গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে দেখি নিচে তখন হাসির ধুম পড়ে গেছে। ব্যাপার কি? হঠাৎ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে এত হাসির কারণ কি। হাসির ফাঁকে ফাঁকে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম যে দলের একজন ঘুম ভাঙবার পর নিজের কাছে ঘড়ি না থাকার দরুণ সে পাশের বেঞ্চির আর একজনের হাতটা তুলে নিয়ে দেখছিল যে কটা বেজেছে। যার হাতঘড়ি দেখছিল, সে ঘুমের ঘোরে অপর জনকে চোর মনে করে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল। সকলেরই এতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর ব্যাপারটা শুনে সকলে হাসতে আরম্ভ করেছে।

আমার হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম যে রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। এরপর আর ঘুমের চেষ্টা করা বৃথা—তা ছাড়া আর প্রায় ঘন্টাখানেকএর মধ্যেই আমরা ত্রিচনপল্লী পৌঁছাব। সেই জন্য আর শোবার চেষ্টা না করে বাংকের ওপর থেকে নিচে নেমে এলাম। সকলেই কাপড় জামা পরে বিছানাপত্র গুটিয়ে ত্রিচনপল্লীতে নামবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম।

প্রায় সওয়া চারটার সময় ত্রিচনপল্লী স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। স্টেশন মাস্টারের অনুমতি নিয়ে আমরা আমাদের জিনিসগুলো ওয়েটিং রুমে রাখবার বন্দোবস্ত করলাম।

ত্রিচনপল্লী জংসন স্টেশন ছাড়া, শহরের কাছাকাছি ছোট বড় আরও তিনটে রেলওয়ে স্টেশন আছে। সব স্টেশনগুলির মধ্যে এই ত্রিচনপল্লী জংসন স্টেশনটিই প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা বড়। সমস্ত স্টেশনটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্টেশনে ট্রেন যাতায়াতের জন্য চার পাঁচটি প্ল্যাটফর্ম আছে। এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আর একটিতে যেতে হ'লে, প্ল্যাটফর্মের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গের মত রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এরূপ বন্দোবস্ত আমাদের দেশে অনেক ছোট বড় রেলওয়ে স্টেশনে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার নিকটস্থ শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশনে কিছুটা এই ধরণের বন্দোবস্ত আছে।

স্টেশনে সকালের চা পান শেষ করে আমরা ত্রিচিনপল্লী শহরটা দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশনের বাইরে এলাম। বাইরে থেকে



ত্রিচিনপল্লীর রক্ টেম্পল ও লেক

স্টেশনটা দেখতে খুব সুন্দর। বেশ বড় বাড়ি—নতুন তৈরী হয়েছে। স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আমরা স্ট্যান্ডে গিয়ে শহর দেখতে যাওয়ার জন্য দুটো ট্যাক্সির কত ভাড়া পড়বে জিজ্ঞাসা করাতে, ট্যাক্সি চালকেরা দুটো ট্যাক্সির জন্য আমাদের কাছে ষোল টাকা ভাড়া চাইল। কিন্তু আমরা এর পূর্বেই স্টেশনের এক কর্মচারীর নিকট খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে দুটো ট্যাক্সির দশ টাকার বেশী ভাড়া হতে পারে না। আমরা ষোল টাকা ভাড়া শুনে এই ভদ্রলোকের কথা অনুযায়ী ট্যাক্সি চালকদের দশ টাকা ভাড়ায় যেতে বললাম। তারা কিন্তু দশ টাকায় রাজী হল না।

এদের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা সকলে স্টেশন সীমানার বাইরে এসে এখন কি করা যায় এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। এমন সময় একটি লোক আমাদের এসে বললে যে, তার দুটো প্রাইভেট মোটর গাড়ি আছে—সে এ দুটা ভাড়া খাটায়। আমরা যদি তাকে দশ টাকা দি তা হলে সে আমাদের নিয়ে শহর এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়ে আনতে পারে। আমরা রাজী হয়ে তাকে গাড়ি

...ানতে বললাম।—এদিকে ট্যাক্সি চালকরা যখন দেখল যে, আমরা ...ন্য দুটো গাড়ি ভাড়া করে শহর দেখতে যাচ্ছি, তখন এরা এগিয়ে ...য়ে প্রাইভেট গাড়ির চালককে ভয় দেখাতে লাগল যে, তাদের ভাড়া ...লে ভাল হবে না। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ির চালক যখন এদের ...থায় কর্ণপাতও করল না, তখন এরা স্ট্যাণ্ড থেকে কয়েকখানা ট্যাক্সি ...নে একটা প্রাইভেট গাড়িকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ফেলল ... গাড়িটার চলবার পথ সব দিক দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। এদের ...ঙ্গে গোলমাল করে কোন লাভ হবে না দেখে আমরা স্টেশনে গিয়ে ...লওয়ে পুলিসকে আমাদের অসুবিধার কথা বলা মাত্রই তিন চার ...ন পুলিস আমাদের সাহায্য করবার জন্য আমাদের সঙ্গে এলো। ...দিকে ট্যাক্সি চালকরা দূর থেকে আমাদের সঙ্গে পুলিস দেখবা ...ত্রই যে-যার গাড়ি নিয়ে হয় শহরের দিকে ছুট্ দিল আর না ...য় খুব শান্তশিষ্টভাবে কিছু না জানার ভাণ করে আবার স্ট্যান্ডে ...এসে দাঁড়াল। আমরা আগেই সব গাড়ি ক'টার নম্বর টুকে রেখে-ছিলাম বলে, গাড়িগুলো সব না থাকা সত্ত্বেও, পুলিসকে গাড়িগুলোর নম্বর দিয়ে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য অনুরোধ করলাম। পরে আমাদের ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন বাদে আমরা ত্রিচিনপল্লীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে এক পত্রে জানতে পেরেছিলাম যে, সেদিনকার আচরণের জন্য অপরাধী-দের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মোটর গাড়ির হাঙ্গামা মেটাতে মেটাতেই আমাদের স্টেশনে প্রায় ঘণ্টা দুই দেরী হয়ে গেল। আমরা আর দেরী না করে দুটো গাড়িতে চড়ে বসলাম শহর দেখতে যাওয়ার জন্য।

ত্রিচিনপল্লীকে একটা বেশ বড় শহর বলা যায়। শহরের দুটো অংশ আছে—একটা হচ্ছে ক্যান্টনমেণ্ট, আর একটা হচ্ছে ফোর্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ক্যান্টনমেণ্টের মতই এখানকার ক্যান্টন-মেণ্ট পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ক্যান্টনমেণ্টে বড় বড় সাহেব সুবো, সৈন্যদের ব্যারাক এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইত্যাদিদের বাস। ফোর্টের অংশটি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন—একেবারে ঘিঞ্জি। এখানে যত সব দেশীয় লোকেরা গাদাগাদি করে বাস করছে—আর সময় মত মিউ-নিসিপ্যাল ট্যাক্স জুগিয়ে চলেছে ক্যান্টনমেণ্টের অংশকে পরিষ্কার রাখতে এবং তার আরও উন্নতি করবার জন্য। এই তো গেল শহরের এখানকার রূপ।

এই শহরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে যে, চোল রাজবংশীয় কোন রাজা এইখানে এই শহর স্থাপন করেন। চোল রাজাদের পর নায়ক রাজারা এবং মুসলমানরা এখানে হাত বদলাবদলি করে এখানে রাজত্ব করে। এ ছাড়া এইখানে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজ-দের কিছুকাল যুদ্ধও হয়। এরপর অন্যান্য সব স্বাধীন রাজত্ব-গুলির মতই ঊনিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তখনকার রাজত্বকারী নবাবের কাছ থেকে ইংরেজরা ত্রিচিনপল্লী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। ইতিহাসের পাতা ছেড়ে আমরা যদি পুরাণের পাতা ওলটাই তা হলে দেখব যে, বর্তমানের ত্রিচিনপল্লীকে 'দক্ষিণ কৈলাস' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

একবার পবন দেবতা আর সর্প দেবতা নাগরাজের মধ্যে কে বলশালী এই নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ হল। ঠিক হল যে, নাগরাজ কৈলাস পর্বতকে তার দেহ দিয়ে বেষ্টন করে থাকবেন, আর পবন দেব সেই বেষ্টনী আলগা করবেন। নাগরাজ কৈলাসকে বেষ্টন করার পর আর পবন দেব সে বেষ্টনী আলগা না করতে পেরে রেগে গিয়ে সমস্ত বিশ্বটাই ঝড়ের বেগে তছনচ করে দেবার উপক্রম করলেন। বিশ্বের এই দুর্দশা দেখে মহাদেব আর স্থির থাকতে না পেরে নাগরাজকে তার বেষ্টনী একটু আলগা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। নাগরাজ মহাদেবের অনুরোধে যেই তার বেষ্টনী একটু আলগা করে-ছেন, অমনি পবন দেব সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে কৈলাস পর্বত ওপর তার প্রতাপ দেখাতে লাগলেন। বায়ুর বেগে সারা পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই সময় এই কৈলাস পাহাড়ের একটা পাথরের টুকরো এই ত্রিচিনপল্লীর ওপর এসে পড়ে—এবং কৈলাস পর্বতের অংশ বলে এর নাম হয় 'দক্ষিণ কৈলাস'।

পরে এই পাহাড়ের ওপর মন্দির স্থাপিত হয়। এবং বর্তমানে এই মন্দিরকেই রক ফোর্ট টেম্পল বলা হয়।

আমরা স্টেশন থেকে বের হয়ে যে রাস্তা ধরে চললাম, সেটা বেশ ভাল রাস্তা। পিচ দেওয়া। রাস্তার দু পাশে বড় বড় শিরীষের গাছ সমস্ত রাস্তাটা ঢেকে রেখেছে। রাস্তায় যানবাহনও কম চলে দেখলাম।

এই রাস্তা দিয়ে প্রথমে আমরা 'গোল্ডেন রক' বা স্বর্ণ পাহাড়ে গিয়ে পৌছলাম। নামটা খুবই লোভনীয়। দেখবার আগে নামটা শুনে মনে হয় যে একটা আশ্চর্য কিছু দেখব। কাছে গিয়ে একেবারে নিরাশ হতে হল; কোথায় কি সোনার পাহাড়—সারা পাহাড় থেকে এক ফোঁটা সোনাও পাবার কোন উপায় নেই। একটা ছোটখাট গ্রেনাইট পাথরের পাহাড়। কোথাও কোনরকম একটু নামটা শুনে মনে হয় যে, একটা আশ্চর্য কিছু দেখব। কাছে গাছ পালারও বালাই নেই। পাহাড়টার ওপর একটা খুব ছোট সাধারণ মন্দির আছে। পাহাড়ের তলার দিকে একটা পরিশ্রুত জলাধারা আছে—শহরের এই অংশের জল এইখান থেকে সরবরাহ করা হয়। এই পাহাড়ের নামটা যে কেমন করে 'গোল্ডেন রক' হল সেটার কোন কারণ ঠিক করতে পারলাম না। তবে খুব সম্ভব সকাল বেলার রোদ মসৃণ লাল পাথরের ওপর পড়ে সোনার মত চিক চিক করে বলেই 'গোল্ডেন রক' নাম হয়েছে।

গোল্ডেন রক দেখে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। মোটর চালক মাঝে মাঝে রাস্তার দুপাশের বিশিষ্ট বাড়িগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল—আমরা শুধু চলন্ত মোটর থেকে এক-একবার মুখ বার করে দেখতে লাগলাম। একটা বড় শহরে যে সব ধরণের সব ঘর বাড়ি থাকা দরকার তার সবই ত্রিচিনপল্লীতে আছে বলা চলে।

অনেকগুলো রাস্তা পার হবার পর দূর থেকে রক ফোর্ট টেম্পল দেখতে পেলাম। একটা মাঝারিগোছের উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দিরে গণেশমূর্তি আছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একেবারে পাকা সিঁড়ি পাহাড়ের ওপরকার মন্দির পর্যন্ত চলে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার আগে দুপাশে দুটো পাথরের তৈরী হাতী দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে মনে হল, যেন পাহাড়টা তিন চারটে ধাপে বিভক্ত। ওপরে ওঠবার সিঁড়ির প্রথম দিকটা পাহাড়ের গা কেটে তৈরী। মাথার ওপর ছাদ থাকার দরুণ মনে হয়, সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছি। এই সুড়ঙ্গ পথের দেওয়ালে কিছু দূরে দূরে ছোট ছোট ঘুল্ ঘুলির মত আছে। এই ঘুল ঘুলিগুলোর ভেতর দিয়ে যে আলো ভেতরে আসে তাতেই যতদূর সম্ভব সিঁড়িগুলো দেখে চলতে হয়। প্রথম ধাপ ছেড়ে দ্বিতীয় ধাপে পৌছনর পর দুপাশে ছাদ ঢাকা দুটো প্রশস্ত মণ্ডপম্ পাওয়া যায়। প্রত্যেক মণ্ডপমে এক শত করে পাথরের স্তম্ভ আছে। শুনলাম যে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় দক্ষিণ মণ্ডপে পূজার ভোগের জিনিস রাখা হয়—আর বা-দিকেরটায় গণেশের মূর্তি যাত্রীদের দর্শন করবার সুবিধার জন্য রাখা হয়। দ্বিতীয় ধাপ থেকে তৃতীয় ধাপে ওঠবার সিঁড়ির ওপর কোন ছাদ নেই—মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ। তৃতীয় ধাপে ওঠবার পর গণেশের মন্দির।

গণেশের মন্দিরে প্রবেশের আগেও একটা মণ্ডপম আছে। এটাকে হরপার্বতীর মণ্ডপ বলে। এই মণ্ডপমের দেওয়ালে, ছাদে খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে। এই ছবিগুলো পুরানো হলেও দেখলে মনে হয় যেন এই অল্প দিনই হল আঁকা হয়েছে। প্রায় সব ছবিই দেবদেবীর। এ ছাড়া সমস্ত পাহাড়টা জুড়ে আরও অনেক

দেবদেবীর মন্দিরে ভর্তি এবং পাহাড়ের গায়ে সব জায়গাই দেবদেবীর মূর্তি খোদা রয়েছে। পাহাড়ের শেষ ধাপে উঠে একবারে পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলাম। এখানেও একটা ছোট মন্দির আছে। মন্দিরের চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা থাকার দরুণ এখান থেকে ত্রিচিনপল্লী শহর এবং এর চারিদিক দেখবার বেশ সুবিধা হয়। ওপর থেকে নীচের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়; শহরের ঘর বাড়িগুলো ছোট ছোট খেলা ঘরের মত মনে হয়। দূরে কাবেরী নদী একটা সাদা সুতোর মত দেখায়। নদীর ওপরকার সেতুগুলোও খেলা ঘরের সাঁকোর মত মনে হতে লাগল।



রকফোর্ট টেম্পলের উপর থেকে ত্রিচিনপল্লী সহরের দৃশ্য

পরে যখন শ্রীরঙ্গম দেখতে যাই, তখন এই কাবেরীর একটা সেতু পার হবার সময় বিশ্বাস হয় নি যে, এই এত বড় সেতুটা পাহাড়ের ওপর থেকে এত ছোট দেখেছিলাম। কাবেরী নদীর ওপর দুটো সেতু আছে। একটার ওপর দিয়ে শুধু ট্রেন চলে, আর একটার ওপর দিয়ে সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল করে।

পাহাড়ের ওপরের রেলিংঘেরা জায়গা থেকে কিছুদূরে নীচের দিকে একটা চৌকীঘর (watch tower) রয়েছে। এই ঘরটি এখন বন্ধ থাকে। শোনা যায় যে, ইংরেজরা এখান থেকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এই চৌকীঘর ব্যবহার করেছিল। ঘরের ভেতর গোলাবারুদ ইত্যাদি রাখা হয়েছিল। এখন অবশ্য এই চৌকীঘরের আর কোন ব্যবহার হয় না—ঘরটি তালাবন্ধ থাকে। তবে শোনা যায় যে, বন্ধ ঘরটিতে এখনও নাকি ইংরেজদের সেইকালের যুদ্ধের বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্র সব রয়েছে। চৌকীঘরের মাথার ওপর এখনও ইংরেজদের পতাকা ওড়ে—তাদের সেদিনকার বিজয় ঘোষণা করবার জন্য।

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলোর ধাঁজ অনুযায়ী রক ফোর্ট টেম্পেলের গায়ে একটা টেপাকুলম আছে। পাহাড়ের নীচে, পাহাড়ের গা ঘেঁষেই একটা মস্ত বড় পুকুরের মাঝখানে একটা মাঝারিগোছের মন্দির।

রক ফোর্ট টেম্পল দেখা শেষ করে আমরা শ্রীরঙ্গম দেখতে যাওয়ার জন্য মোটরে উঠলাম।

শ্রীরঙ্গমকে একটা ছোট দ্বীপ বলা যায়—কারণ কাবেরী নদী এখানে দু'শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে শ্রীরঙ্গম শহরটিকে এই দুই শাখা দিয়ে দ্বীপের মত করে ঘিরে রেখেছে। শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে ত্রিচিনপল্লীর যোগ এই কাবেরীর ওপরকার সেতু দিয়ে। কাবেরী নদীর ওপরকার দুটো সেতুই বেশ বড়—লম্বায় প্রায় ১৮৭৬ ফিট ক'রে।

সেতু পার হয়ে আমরা শ্রীরঙ্গমের বিখ্যাত 'বিষ্ণু মন্দিরে' গিয়ে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বের সীমানা নিয়ে এটা একটা বিরাট মন্দির। মন্দির ঘিরে সাতটা পরিক্রমা আছে। এই পরিক্রমাগুলোর ওপর সবশুদ্ধ ১৫টা গোপুরম আছে। মন্দিরে বিষ্ণুর মূর্তি—সকলেই 'রঙ্গনাথম' বলে।

এই বিষ্ণুমন্দির থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরেই জম্বুকেশ্বরমের মন্দির। এখানে শিবের মূর্তি। জম্বুকেশ্বরম শিবের আর এক নাম—এর থেকেই এই মন্দিরের নাম জম্বুকেশ্বরম। এই মন্দিরে ৫টি পরিক্রমা আছে। এখানকার পরিক্রমার দেওয়ালগুলো বিষ্ণু-মন্দিরের পরিক্রমার দেওয়ালের চেয়ে অনেক বেশী চওড়া এবং উঁচু দেখলাম। এখানকার কোন কোন পরিক্রমা প্রায় ১০ ফিট চওড়া এবং ৩৫ ফিট করে উঁচু। পরিক্রমাগুলোর ভেতরে ছোটবড় অনেক মন্দির এবং খণ্ডপথ আছে। এই মন্দিরে একটা ঘরে বহু সুন্দর সুন্দর পুরানো হাতী-দাঁতের কাজ করা দেবদেবীর এবং অন্যান্য মূর্তি কাচের আলমারীতে সাধারণের দেখবার জন্য রাখা হয়েছে। কারুকার্য খুব সূক্ষ্ম এবং খুব উন্নতধরণের। এ ছাড়া আগের কালে ব্যবহৃত বিভিন্নধরণের ছোটবড় তালাও দেখবার জন্য রাখা হয়েছে। এরই সংলগ্ন একটি বড় ঘরে একটা পাঠাগার আছে। এই পাঠাগারে অনেক পুরানো পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সব পুঁথি নিয়ে অনেকে এখানে গবেষণার কার্য করেন দেখলাম।

ত্রিচিনপল্লী এবং শ্রীরঙ্গম শহর দেখা শেষ ক'রে আমরা বাজারের রাস্তা দিয়ে স্টেশনের দিকে ফিরলাম। এখান থেকে আমরা তাঞ্জোরে যাব।

ত্রিচিনপল্লীতে যে সব জিনিস উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে চুরুটই প্রধান। এখানকার চুরুট ধূমপানকারীদের নিকট খুব প্রিয়। এছাড়া এখানকার সোনা-রূপার প্রস্তুত দ্রব্যও খুব সুন্দর। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, কলা, নারকেল এবং আম প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

বেলা তিনটার ট্রেন ধরে আমরা ত্রিচিনপল্লী থেকে তাঞ্জোরের দিকে রওনা হলাম। বেলা ৩টায় আমরা তাঞ্জোর স্টেশনে এসে নামলাম। এটা একটা ছোট শহর।

এই শহরের নামকরণ হয় তানজান নামে এক রাক্ষসের নাম থেকে। পুরাকালে এই তানজান নামক রাক্ষসটি এই প্রদেশের লোকদের ওপর খুব অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। তানজানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিষ্ণুর কাছে গিয়ে লোকেরা প্রার্থনা জানাল। বিষ্ণু তখন তানজানকে হত্যা করে লোকদের এর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করলেন। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য এই শহরের নাম হয় তাঞ্জোর।

স্টেশনের বাইরে এসে শহর দেখতে যাওয়ার জন্য কোন রকম মোটরগাড়ি এখানে পাওয়া যায় না দেখে আমরা তিনটে ঝট্‌কা ভাড়া করে মন্দির এবং শহর দেখবার জন্য বেরুলাম।

ইতিহাসে আমরা পাই যে, প্রায় ১১ শতাব্দীর সময় চোল রাজবংশীয় কোন রাজা এই তাঞ্জোরের স্থাপনা করেন। এর পর থেকে তাঞ্জোরে বহুকাল চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। চোল রাজাদের পর তাঞ্জোরে নায়ক রাজবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। নায়ক রাজবংশের পর মারাঠারা এখানে রাজত্ব করেন। এই মারাঠা রাজত্বের শেষ দিকে হায়দার আলি কিছুকালের জন্য তাঞ্জোর অধিকার করেন, কিন্তু ইংরেজরা হায়দার আলির নিকট থেকে এটি অধিকার করে নেয়। ইংরেজদের অধিকারের সময় মারাঠা রাজবংশের শিবাজীই শেষ রাজা।

চোল রাজবংশের রাজা—রাজা চোলের রাজত্বকালে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির নির্মিত হয়। রাজা রাজার পুত্র রাজেন্দ্র চোল

এই বৃহদীশ্বর মন্দিরের নির্মাণ কার্যে সব দিক দিয়ে সাহায্য করেন।

মন্দিরের চারিপার্শ্বে গভীর পরিখা রয়েছে—পরিখার পর দৃঢ় প্রাচীর। এই পরিখা এবং প্রাচীর থেকে বোঝা যায় যে, সেই আমলে এগুলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করত।

এই বৃহদীশ্বর মন্দিরের কারুকার্য এবং স্থাপত্যকলা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সম বর্মা নামে কাঞ্চীদেশীয় এক ব্যক্তি এই বৃহদীশ্বর মন্দির স্থাপনার নক্সা প্রস্তুত করেন। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, সম বর্মা একজন ভবিষ্যদ্রষ্টা ব্যক্তি ছিলেন। তার প্রমাণ তিনি মন্দিরের গায়ে মূর্তি খুদে রেখে গেছেন। চোল রাজবংশের পর নায়ক রাজবংশের এবং পরে যে মহারাষ্ট্রীয়দের আধিপত্য এখানে বিস্তার হবে এবং সর্বশেষে ইংরেজরাই যে এদেশে প্রাধান্য লাভ করবে, এই ভবিষ্যৎ ইতিহাস স্থপতিবর সম বর্মা বুঝতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণে বিভিন্ন মূর্তি এবং ঘটনাবলী দিয়ে সেগুলো তিনি মন্দিরগাত্রে দেখিয়ে গেছেন; কিন্তু একটা জিনিস এই যে, এই সবের মধ্যে মুসলমান রাজত্বের কোনরূপ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের অধিকারের ইতিহাসের অংশটি যে কি কারণে বাদ পড়েছে, তার কোন কারণ দেখান যায় না।

বৃহদীশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে পরিখার ওপর একটা সেতু পার হয়ে তবে যেতে হয়। একটা বড় গোপুরমের পর আর একটা ছোট গোপুরম পেরিয়ে আসল মন্দির। মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই একটি পাথরের বড় বেদীর ওপর কালো পাথরের খোদা বিরাট ষাঁড়, নন্দী বসে রয়েছে।

বৃহদীশ্বর মন্দিরের পর আমরা পুরানো রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিকে সুউচ্চ এবং দৃঢ় প্রাচীরের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারা যায় যে, এই রাজপ্রাসাদটি একটি দুর্গের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

প্রাসাদের ভেতরে দুটো দরবার কক্ষ—একটা নায়ক রাজাদের আমলের, দ্বিতীয়টি মারাঠা রাজাদিগের সময়ের। মারাঠা রাজাদের আমলের রাজদরবারের দেওয়ালে বড় বড় মারাঠা রাজাদের তৈলচিত্র তাঁদের বীরত্ব কাহিনী ইত্যাদি আঁকা রয়েছে। ছাদে খিলানে লতাপাতা ফুল ইত্যাদির কারুকার্য রয়েছে।

এই রাজপ্রাসাদের ভেতর একটা সুড়ঙ্গপথ আছে। এই সুড়ঙ্গপথ শ্রীরঙ্গম ত্রিচিনপল্লীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলে শোনা যায়। দরকারের সময় মারাঠা রাজারা এই সুড়ঙ্গপথ ব্যবহার করতেন। আমরা আলো নিয়ে এই সুড়ঙ্গের ভেতর প্রবেশ করলাম। অনেক দূর যাওয়ার পর দেখলাম যে, গভর্নমেণ্ট থেকে পথের ওপর প্রাচীর গেঁথে দিয়ে রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেটুকু পথ আমরা যেতে পেরেছিলাম, তাতে মনে হল যে, এই রাস্তা দিয়ে দরকার হলে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যেতে পারত—কারণ ছাদ এত উঁচু এবং পাশ এত চওড়া। এই রাজপ্রাসাদের একদিকে বর্তমানে 'সরস্বতী মহল' বলে একটি বিরাট পাঠাগার আছে। এখানে বহু পুরাণ পুঁথি যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রায় কুড়ি হাজার সংস্কৃত পুঁথি এখানে আছে—এর মধ্যে আট হাজার তালপাতার পুঁথি। এখানকার লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদের শিবাজীর নিজের হাতের সইকরা বহু পুস্তক, পত্র এবং অন্যান্য সব পুরাণ পুঁথি দেখালেন।

'সরস্বতী মহল' থেকে বের হয়ে সামনে একটা নতুন তৈরী দরবার কক্ষের মতন ঘরের মধ্যে শিবাজী মহারাজের দণ্ডায়মান কালো পাথরের মূর্তি একটা উঁচু বেদীর ওপর রয়েছে দেখলাম।

একটা ঘরে সেই আমলের সব যোদ্ধাদের পোষাক পরিচ্ছদ, তরবারী, বন্দুক, কামান সব সাধারণের দেখবার জন্য সাজিয়ে রাখা আছে। আমরা রাজপ্রাসাদ দেখে ঝটকা করে বাজারের পথে স্টেশনে ফিরলাম।

(আগামীবারে সমাপ্য)

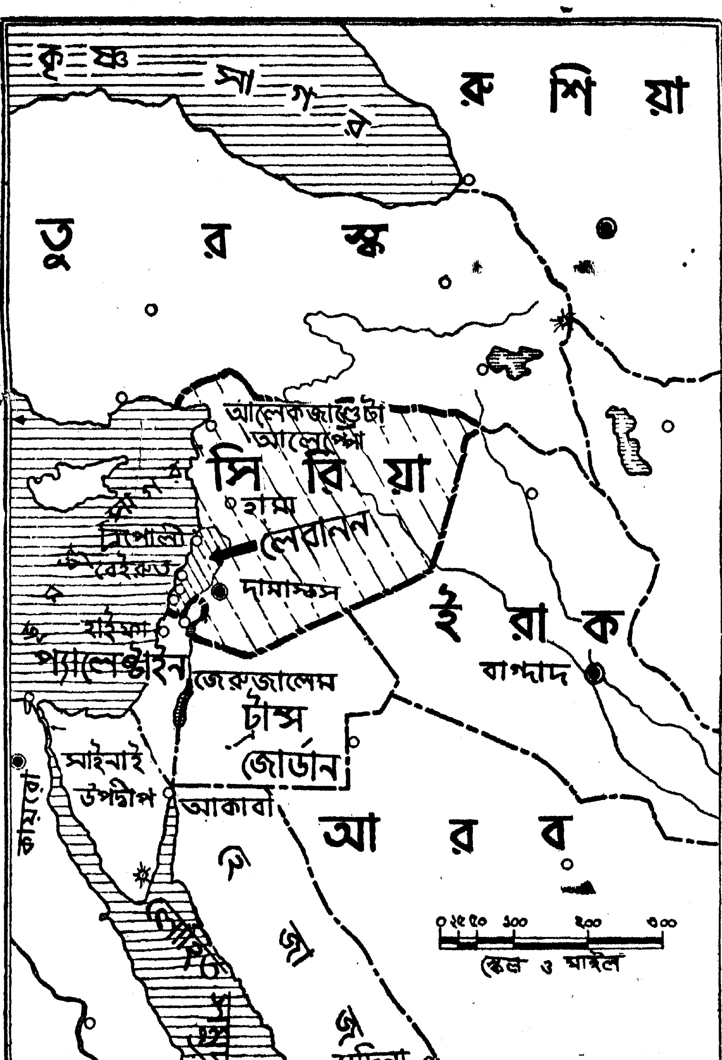
রুশ-জার্মান যুদ্ধে ইরানের গুরুত্ব

(৯৪২ পৃষ্ঠার পর)

British Empire, the Empire must collapse, first economically, then politically." ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এ মনোবৃত্তি আজও বদলায় নি'। ভারত-রক্ষার পক্ষে ইরাণের গুরুত্ব খুব বেশী ঃ ব্রিটিশরা এ বিষয়ে ইরাণী সৈন্যদলের উপর নির্ভর করতে পারছিল না; আর প্রকৃত-পক্ষে আধুনিক সুসজ্জিত যান্ত্রিক বাহিনীকে বাধা দেবার মত ক্ষমতাও ইরাণের নেই। কাজেই ভারতের নিরাপত্তার জন্য ব্রিটেনের পক্ষে ইরাণ আক্রমণ না ক'রে উপায় ছিল না। তা' ছাড়া ইরাণের তৈল খনিগুলোও প্রাচ্যে ব্রিটিশের আত্মরক্ষার জন্য পরম প্রয়োজনীয়। এই তৈল খনিগুলোতে বছরে প্রায় এক কোটি দুই লক্ষ টন (১০২০০০০০) তৈল উৎপাদিত হয়—এ তৈল পরিমাণে ইরাকী তৈলের দ্বিগুণ এবং রুমানিয়ার তৈলের ৩ গুণ। এই তৈল খনিগুলোর উপর নিশ্চয় নাৎসী জার্মানীর লোভ আছে। ইরাণের আজারবাইজান অঞ্চলের পর্বতের মধ্য দিয়ে ককেশাস থেকে ইরাণে প্রবেশ করার পথ—জার্মানীরা এই পথে এসে ইরাণের তৈলখনিতে পেঁছাতে পারে কিংবা উত্তর ইরাণ এবং বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণও করতে পারে। কাজেই সময় মত ইরাণ দখল ক'রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিমানের কাজই ক'রেছেন। যদি ইরাণের পথে নিয়মিত রাশিয়ায় সমর-সম্ভার প্রেরণ সম্ভব হয় এবং ইরাণে জার্মানীকে প্রবলভাবে বাধা দেবার জন্য যদি ব্রিটিশরা প্রস্তুত থাকে, তবে এই ইরাণই হয়ত হিটলারের পরাজয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।

জার্মানীর গ্রীষ্মকালীন অভিযান

জার্মানীর গ্রীষ্মকালীন সমরাভিযান আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল রোমেল তাঁহার বিপুল বাহিনী এবং যন্ত্রবল লইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যদিকে রুশিয়ার দক্ষিণে ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে জেনারেল ম্যানস্টিন এবং মার্শাল ফন বক উভয়ে প্রচুর সৈন্য লইয়া সমরোদ্যমে প্রবৃত্ত আছেন। আট মাসকাল বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিবার পর ক্রিমিয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ সেবাস্তপোলের পতন হইয়াছে। সেবাস্তপোলের সংগ্রামে জার্মানীর লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই সংগ্রামের ভীষণতার কথা বিবেচনা করিলে জার্মানীর এই লোকক্ষয় অসত্য বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ লোকক্ষয় স্বীকার করিয়া সেবাস্তপোল অধিকার করিবার পর জার্মানদের পক্ষে তদনুপাতে বিশেষ কি সুবিধা হইবে, সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের বিজয়লাভের পর, সেই বিজয়ের গুরুত্ব লঘু করিবার প্রচেষ্টা বরাবরই সমরনীতির একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে; বর্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনের বিপর্যয়ে আমরা প্রচারের দিক হইতে এই সত্যের পরিচয় নানাভাবেই পাইয়াছি। সেবাস্তপোল অধিকার করিতে জার্মানীর বিপুল লোকক্ষয় ঘটিয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু সমর বিশারদগণের কাছে এ বিষয়টি ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, জার্মানেরা নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য ধরিয়া চলে এবং সেই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাহারা কোন ক্ষতি স্বীকার করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদের সমরনীতি কতকগুলি ছকের মধ্যে সুকৌশলে এবং সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হইতেছে। জার্মান রণনীতিকগণ বিভিন্ন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও সেই ছক অনুসারে চলিবার ধারাটা মূলত বদলাইতেছেন না, সাময়িক দৃশ্যত কিছু ওলটপালট কিছুদিনের জন্য হইতেছে মাত্র। সমগ্র রুশিয়া অধিকার করাই জার্মানীর লক্ষ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না: তাহাদের লক্ষ্য হইল রুশিয়াকে যথেষ্ট রকমে কাবু করিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট সামরিক পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা। রুশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল—ইউক্রেন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী ডোনেৎস্ অববাহিকা রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশ করাই জার্মানীর লক্ষ্য। জার্মানী জানে যদি এই উদ্দেশ্য সে সিদ্ধ করিতে পারে, তবে রুশিয়া কার্যত তাহার অনিষ্ট করিয়া উঠিতে সমর্থ হইবে না। ককেশাসের প্রচুর তৈল সম্পদ তাহার হাতে যাইবে; এদিকে কৃষ্ণসাগরস্থ রুশ নৌবহর অকেজো হইয়া পড়াতে ইরাক এবং ইরাণের দিকে জার্মানীর গতি একরূপ অবাধ হইয়া পড়িবে।



এই দিকেই যে জার্মানদের প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে এবং এই পথেই যে রুশিয়ার সমরাঙ্গণের গতিকে সে পরিবর্তিত করিয়া নিজেদের অনুকূলে আনিবার চেষ্টা করিতেছে; রুশ সামরিকগণও সে গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেজন্যই তাঁহারা ককেশাস অঞ্চলে প্রবেশে প্রতিরোধশক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য রুশিয়ার সর্বপ্রধান সমরকৌশলী জেনারেল টিমোশেঙ্কোর উপর খারকোভ-রষ্টভ এই লাইনের সৈনাপত্য প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে এই লাইনকে ভেদ করিতে না পারিলে দক্ষিণ দিকে লালফৌজের চাপ দিবার চেষ্টাকে রুদ্ধ করা যাইবে না। রষ্টভ হইতে উত্তর এবং মধ্য রুশিয়ার কতকগুলি প্রধান প্রধান বাণিজ্য-প্রধান

শহরের সঙ্গে রেলপথের সংযোগ রহিয়াছে। ককেশাস অঞ্চলের প্রবেশপথ নিঃশঙ্কভাবে নিজেদের অগ্রসর হইবার পক্ষে উন্মুক্ত করিতে হইলে এই লাইনকে ভেদ করা আবশ্যক। সেবাস্তপোলের পতন হইয়াছে; কিন্তু খারকোভ, রস্টভ, টাগানরগ এই লাইন এখনও অটুট রহিয়াছে। সেবাস্তপোল দুর্গ পিছনে রাখিয়া জেনারেল ম্যানস্টিন কার্চ দখল করা সত্ত্বেও ককেশাসের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেবাস্তপোলের নৌদুর্গের সমগ্র শক্তি এবং তথাকার নৌবহর কার্চ প্রণালী অতিক্রম করিতে গেলে পিছন হইতে তাহাকে বাধা দিবে। পিছন হইতে তিনি তেমন বাধা পাইলে উত্তর দিকেও তাঁহার পক্ষে বিপদ বাড়িবে। জেনারেল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া একেবারে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। ইহা বুঝিয়াই তিনি কার্চ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পুনরায় সেবাস্তপোলের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়ান এবং বিপুল সেনাদল লইয়া সেবাস্তপোল আক্রমণ করেন। ক্ষতি তাহাদের সেনাদলের যতই হউক, সেবাস্তপোল তিনি দখল করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে কি জার্মানীর ককেশাস অঞ্চলে অভিযান এখনও অপ্রতিহত হইয়াছে? সেবাস্তপোলের পতনের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেবাস্তপোলের পতনেই ককেশাস অঞ্চলে জার্মান বাহিনীর প্রবেশপথ নিরাতঙ্ক হইয়াছে, আমরা এমনও মনে করি না। ককেশাসের প্রবেশপথে উত্তর দিকে লালফৌজ এখনও প্রবল রহিয়াছে। মার্শাল ফন বক, জেনারেল ম্যানস্টিনের সেবাস্তপোলের উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল টিমোশেঙ্কোর বাহিনীর উপরও চাপ দিয়াছিলেন এবং এখনও সমানভাবেই দিতেছেন। খারকোভ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসাগরের সন্নিকট-বর্তী টাগানরগ এবং ডোনেৎস্ অববাহিকার মুখে রস্টভ এই সমগ্র লাইন ধরিয়া তিনি সমরনীতি পরিচালনা করিতেছেন; এতদিন পরে কয়েকটি স্থানে লালফৌজ গতি ভেদ করিয়া ডন নদী পার হইতেছিল বলিয়া শুনা যাইতেছে; সুতরাং এদিকে সংগ্রাম গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ককেশাস অঞ্চলে পাশ কাটিয়া প্রবেশ করিবার জন্য যে কৌশল হিটলার প্রয়োগ করিতে চাহেন, লালফৌজের অধিনায়কগণ সে কৌশল তাঁহাকে দিতে চাহিতেছেন না। সমগ্র রুশ সীমান্তের সঙ্গে হিটলারকে যাহাতে বুঝাপড়া করিতে হয়, তাঁহারা তদ্রূপ সুকৌশলেই সমর-নীতি পরিচালনা করিতেছেন। অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ডোনেৎস অববাহিকা প্রবেশে সুবিধা করিতে হইলে জার্মানীকে রুশ সীমান্তের কেন্দ্রভাগে অর্থাৎ মস্কোর দিকে জেনারেল জুকোভের বাহিনীর উপর চাপ দিতে হইবে এবং সেই বাহিনীকে দুর্বল করিতে হইলে উত্তর দিকে লেনিনগ্রাদ মারমানস্ক লাইন ছিন্ন করিতে হইবে; এইভাবে সমগ্র রণাঙ্গন জড়াইয়া জার্মানীকে তাহার দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং সেবাস্তপোলের পতনেই যে ককেশাস অঞ্চলে জার্মান বাহিনী দেখিতে দেখিতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ার বর্তমান লড়াইতে খারকভ-রস্টভ লাইনই কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে এবং এই লাইনকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে এক পক্ষে জার্মানী যেমন তাহার সমগ্র বলবাহন লইয়া লেনিনগ্রাদ হইতে আরম্ভ করিয়া রস্টভ পর্যন্ত ব্যাপক সীমান্ত ভাগে সৈন্যশক্তি প্রয়োগ করিতেছে এবং অন্য পক্ষে লালফৌজের দলও সেইরূপ অতন্দ্রিত উদ্যমে মরণের ঊর্মিমালা মন্থন করিয়া তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে প্রাণপণ করিতেছে।

এদিকে এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী অন্যদিক হইতে তাহার পূর্বাভিমুখী জয়ের পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টারই পরিচয় আমরা পাইতেছি জেনারেল রোমেলের সেনাদলের গতিপথে। তব্রুকের পতনে জেনারেল রোমেল অনেক সুবিধা পাইয়াছেন, এ সত্যকে অস্বীকার করিলে ভুল করা হইবে। তব্রুকের পতন কতকটা অপ্রত্যাশিত-ভাবেই ঘটিয়াছে। চার্চিল সাহেব সেদিন পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হইয়া এই যুদ্ধের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়া-ছেন, তাহাতে তব্রুকের পতনের অন্তর্নিহিত রহস্য কিছু কিছু উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, "১৩ই জুন পর্যন্ত যুদ্ধে দুই পক্ষই সমান ছিল; কিন্তু উক্ত তারিখেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। প্রাতঃকালে আমাদের ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল তিনশত; কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে উহার সংখ্যা ৭০টি হইয়া দাঁড়ায়, অথচ ইহার তুলনায় শত্রুপক্ষের কোনই অনিষ্ট হয় নাই। শত্রুপক্ষ বিনা ক্ষতি স্বীকার করিয়াই কি কৌশলে এতগুলি ট্যাঙ্ক নষ্ট করিল, প্রধান মন্ত্রী সে কথা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই, তবে সমরকৌশল প্রয়োগের ত্রুটি যে ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। জেনারেল রোমেলের বাহিনী এল ডাব্বা ছাড়াইয়া এল আলামেন পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে, অর্থাৎ মার্সা মাতরু এবং আলেকজান্দ্রিয়া এই দুই-স্থানের মাঝামাঝি আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে আসিয়াছে। এই পর্যন্ত আসিয়া রোমেলের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ার জন্য সংগ্রাম প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিউজিল্যান্ড হইতে সেনাদল মিশরে পেঁৗছিয়াছে এবং জেনারেল অকিনলেকের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়াই লড়াই করিতেছে। আমেরিকা হইতেও সেনাদল গিয়া পেঁৗছিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতীয় সেনাদল তো আছেই। কিন্তু কামানের শক্তিতে মিত্রপক্ষ মিশরে জার্মানদের তুলনায় এখনও হীনবল রহিয়াছেন, সমরবিশারদগণ একথা বলিতেছেন। মোটের উপর, মিশরের এই লড়াইতে পশ্চিম এশিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। জেনারেল রোমেল সম্ভবত উপকূলভাগ ধরিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবেন এবং কায়রো আপাতত তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইবে না। তিনি যদি আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করিতে সমর্থ হন, তবে কায়রো শহর দখল করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না; সুতরাং আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার লইয়াই হইবে মিশরের প্রধান লড়াই। আলেকজান্দ্রিয়া ব্রিটেনের বড় নৌঘাঁটি এবং ব্রিটিশের ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অঞ্চলের প্রভুত্ব ইহার উপরই অনেকটা নির্ভর করিতেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার এই লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, এখনও কিছু বলিবার উপায় নাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল নিজেও তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি শুধু এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, তব্রুকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মিশরের লড়াইয়ের ভবিষ্যৎও সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহাদের সে আশঙ্কা অমূলক। মিশরে সেনা সাহায্য কিরূপ পেঁৗছিয়াছে বা শীঘ্রই পেঁৗছিবে, তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই কথা বলিয়া-ছেন যে, তাহা পর্যাপ্ত এবং মিশরের সংগ্রামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। অমীমাংসিত এই সংগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোন অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়; কারণ, বিশেষজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারাই সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারেন না। আমরা শুধু ঘটনাচক্রের গতির দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া জার্মানীর এই গ্রীষ্মকালীন অভিযানের ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি।

আজ•কাল

মিশরে বৃটিশ প্রতিরোধ

উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধের গতি কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। রোমেলের বাহিনী যে রকম অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে আসছিল তাতে মনে হয়েছিল যে, আলেকজান্দ্রিয়ার পতন বোধ হয় আসন্ন। কিন্তু নাৎসী সাঁজোয়া বাহিনীর গতি প্রতিহত হয়েছে এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও নীল উপত্যকার আশু বিপদ কমে গেছে। এই নতুন বৃটিশ প্রতিরোধের কৃতিত্ব জেনারেল অকিনলেকের। জার্মানরা মিশরের মধ্যে প্রবেশ করায় তিনি স্বেচ্ছায় জেনারেল রিচির জায়গায় নিজে অষ্টম আর্মির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এখন তাঁরই প্ল্যান অনুসারে বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধ করছে।

নাৎসী বাহিনী মিশরে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে মার্সা মাত্রু, ফুকা, এল দাবা অতিক্রম করে আলেকজান্দ্রিয়ার মাইল সত্তর দূরে এল আলামেনের পশ্চিমে গিয়ে পে'ছায়। মিত্রপক্ষ ঐ জায়গায় শত্রুকে ঠেকাবার জন্যে ব্যূহ রচনা করে। গত ১লা জুলাই থেকে জার্মানরা এল আলামেনের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে; কিন্তু বৃটিশ ব্যূহ ভেদের জন্যে তাদের সমস্ত চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম আক্রমণের বেগ সামলে নেবার পর বৃটিশ বাহিনী আক্রমণোদ্যম জার্মানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আলামেনের দক্ষিণে এক গিরিপৃষ্ঠ জার্মানরা আয়ত্তে এনেছিল; কিন্তু বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করে সেখান থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। আলমেনের দক্ষিণে একটা নাৎসী ঘাঁটিও তাঁরা দখল করে। কিছু জার্মান সৈন্যও ইতিমধ্যে বন্দী হয়েছে। রোমেলের অভিযান প্রতিহত হওয়ার একটা কারণ তাঁর সাঁজোয়া বাহিনীর ক্ষতি, আর একটা কারণ মিত্রপক্ষের বিমান প্রাধান্য; কিন্তু প্রধান কারণ মনে হয়, মরুভূমিতে দীর্ঘ অভিযানের ফলে জার্মান বাহিনীর শ্রান্তি। জার্মানরা পরাজিত হয়নি এবং রোমেল নিশ্চয়ই আবার প্রবল আক্রমণ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী যদি রোমেলকে অবসর না দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে এবং নতুন জার্মান সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী ব্যাহত করতে পারে, তাহলে রোমেলের পক্ষে নীল উপত্যকায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হবে। তবে সরবরাহ পাওয়া রোমেলের পক্ষে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে তব্রুকের কাঁটা দূর হওয়ায় কি সমুদ্রপথে, কি স্থলপথে যোগাযোগ রাখা জার্মানদের পক্ষে আর আগের মতো দুরূহ নয়।

কমন্স সভায় বিতর্ক

লিবিয়ার বিপর্যয় সম্পর্কে স্যার জন ওয়ার্ডল মিলনে কমন্স সভায় গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন, তা নিয়ে দুই দিন জোর বিতর্ক চলে। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি ৪৭৫—২৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের সমরনীতি ও সমর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য শুনতে হয়েছে। বৃটিশ সমর-নায়কদের শ্রেণীগত রক্ষণশীলতা কেউ কেউ আক্রমণ করেন। একজন রক্ষণশীল সদস্য ভূতপূর্ব উৎপাদন সচিব লর্ড বীভারব্রুককে পঞ্চম বাহিনীর লোক বলে প্রকাশ্যে দোষারোপ করেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল দেশরক্ষার দপ্তর নিজের হাতে রাখাতেও অনেকে কঠিন সমালোচনা করেন। মিঃ চার্চিল তাঁর জবাবে ওজস্বিনী ভাষায় গবর্ণমেণ্ট ও সমরনায়কদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সমর পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার দাবী করেন। তবে দুটি ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা তিনিও দিতে পারেননি; প্রথমত, তব্রুকের [illegible] আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আগে থেকে করা সত্ত্বেও কেন যে তব্রুক আত্মসমর্পণ করল তা তিনিও জানেন না, জেনারেল অকিনলেকও জানেন না। দ্বিতীয়ত, ১৩ই জুনের লড়াইয়ের ফল। ঐ তারিখে আক্রোমা ও নাইটসব্রিজের কাছে সকালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ইংরেজদের ৩০০ ট্যাঙ্ক ছিল; কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যে তাদের মাত্র ৭০টি ট্যাঙ্ক অবশিষ্ট থাকে; অথচ জার্মানদের সে রকম কিছুই ক্ষতি হয়নি। এই যুদ্ধের ফলে রোমেল দুর্ধর্ষ হয়ে পড়েন। সেদিনকার যুদ্ধে কি ঘটেছিল তা মিঃ চার্চিল পর্যন্ত জানেন না।

মার্কিন এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে, গত ১১ই ও ১২ই জুন লিবিয়ার যুদ্ধে পর্যবেক্ষক মার্কিন সাঁজোয়া দলের একটা অংশ যুদ্ধে যোগ দেয়। মার্কিন ট্যাঙ্ক চালিয়ে মার্কিন যোদ্ধারা কয়েকটা জার্মান ট্যাঙ্ক ঘায়েল করে।

সোভিয়েট রণাঙ্গন

সোভিয়েট রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি বর্তমানে জার্মানীর অনুকূল। সোভিয়েটের পক্ষে সবচেয়ে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খারকভ ও কুরস্ক-এর মধ্যে ১০০ মাইলব্যাপী প্রচণ্ড জার্মান আক্রমণ। এখানে জার্মান বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য ডন তীরবর্তী ভরোনেজ। এই রেলওয়ে কেন্দ্র দখল করতে পারলে মস্কো রস্টভ রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী উত্তরে জেনারেল ঝুকভের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জার্মান বাহিনীর আক্রমণের মুখে লাল-ফৌজ খানিকটা হটে গেছে। কুরস্ক থেকে জার্মানদের একটা দল সোজা পূবে এগিয়ে গেছে ভরোনেজের দিকে আর একটা দল দক্ষিণ-পশ্চিমে বিয়েলগরোড থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। আরও দক্ষিণ-পূবে কুপিয়ানস্ক থেকে জার্মান বাহিনী বিয়েলগরোড থেকে আগত জার্মান বাহিনীর সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। জার্মানরা দাবী করছে যে, তারা ইতিমধ্যেই ডনের তীরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এ দাবী এখনো সমর্থিত হয়নি। সোভিয়েটের পক্ষে ভরসা এইটুকু যে, জার্মানদের অগ্রসর হবার জন্য অজস্র সৈন্য বলি দিতে হচ্ছে এবং প্রভূত সমরোপকরণ হারাতে হচ্ছে।

দীর্ঘ আট মাস পরিবেষ্টনের পর নৌঘাঁটি সেবাস্তোপোলের পতন হয়েছে। সোভিয়েট রক্ষী সৈন্যেরা ও সেবাস্তোপোলের অধিবাসীরা যে বীরত্ব দেখিয়েছে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। বিমান, কামান, ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যের কেন্দ্রীভূত আক্রমণের মুখে তারা কখনও পরাজয় স্বীকার করেনি প্রত্যেকটি ইঞ্চি জমি দখল করতে জার্মানদের অসম্ভব ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। নবপর্যায়ের আক্রমণে সেবাস্তোপোল অধিকার করতে গিয়ে তাদের অন্ততপক্ষে দেড় লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

চীন-জাপান যুদ্ধ

৭ই জুলাই তারিখে চীন-জাপান যুদ্ধের পাঁচ বছর পূর্ণ হল। আজও চীনের প্রতিরোধ পাঁচ বছর আগের মতোই অনমনীয় রয়েছে। এক ধাক্কায় মালয় সিঙ্গাপুর, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, ফিলিপিন ও ব্রহ্ম দখল করে জাপান আবার ঠেকেছে চীনে। চেকিয়াং ও কিয়াংসি প্রদেশে যুদ্ধ এখনও সে শেষ করতে পারলে না। চেকিয়াং-কিয়াংসি রেলপথ কিছুতেই সে আয়ত্তে আনতে পারছে না। এক একটা জায়গা দখল করে; আবার চীনা পাল্টা আক্রমণ তার কিছু কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কিয়াংসির রাজধানী নানচাং থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূবে ইহোয়াং জাপানীরা দখল করেছিল; কিন্তু চীনারা সে শহর আবার অধিকার করে নিয়েছে। কিয়াংসিতে তাদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান

ও চীনা পাল্টা আক্রমণে হটে গেছে। উত্তরে অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে অত্যাবশ্যক যোগপথটি বন্ধ করার জন্যে পশ্চিম সুইউয়ানে জাপানীরা যে আক্রমণ করেছিল চীনাদের বাধাদানে তা ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিমধ্যে চীনে মার্কিন বিমান বহিনী তৎপর হয়ে উঠেছে। আমেরিকান ভালান্টিয়ার গ্রুপ (বিমান বহর) ভেঙে দিয়ে ঐ দলকে রেগুলার মার্কিন বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মার্কিণ বিমান বহর ক্যান্টন ও হ্যাংকাওতে জাপ বিমান ক্ষেত্রের উপর হানা দিয়ে অনেক বিমান ধ্বংস করেছে। কিয়াংসি ও হুনানে মার্কিন বিমান নাকি এখন আকাশে প্রাধান্য স্থাপ করছে।

জাপান এখন নতুন কোন জায়গা আক্রমণ না করে' চুপচাপ আছে। এ নিয়ে স্বভাবতই নানা জপনাকল্পনা চলছে। তার সামনে আক্রমণ করবার তিনটে জায়গা রয়েছে—সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ। কোন্‌টা সে এবার আক্রমণ করবে? নানা সূত্রে শোনা যাচ্ছে, সাইবেরিয়ার উপর তার নজর। পশ্চিমে জার্মান অভিযানের গতি সে এখন লক্ষ্য করছে; ঠিক সময় বুঝলেই সে আঘাত করবে। এদিক থেকে এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের পদার্পণ খানিকটা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তারা নাকি কিস্কা বন্দরে একটা বড় বিমান ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করছে। আমেরিকানরা সেখানে জাপ নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। মার্কিন সাবমেরিণ গত ৪ঠা জুলাই এলিউশিয়ানের নিকটে চারখানা জাপানী ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিয়েছে। মার্কিন বিমানবহরও ঐখানে জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

মার্কিন বিমান ও বৈমানিকরা ইউরোপেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। গত ৪ঠা জুলাই অর্থাৎ আমেরিকান স্বাধীনতা দিবসে মার্কিণ বৈমানিকরা বৃটিশ বৈমানিকদের সঙ্গে একত্রে জার্মান অধিকৃত লক্ষ্যস্থান আক্রমণ করে।

* * * *

হাইড্রিখের উপর আক্রমণের পর ৩রা জুলাই পর্যন্ত প্রাগ ও ব্রনোতে মোট এক হাজারের বেশী চেকের প্রাণ হরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে একশ জন স্ত্রীলোক।

ভারতবর্ষ

কংগ্রেসের আলোচনা

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়েছে। জানা গেল, বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর মতামত সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন এবং সংক্ষেপে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাবের উল্লেখ করেন। তারপর সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয় এবং "সমস্ত সদস্যের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য" দেখা যায়। প্রকাশ, গান্ধীজীর প্রস্তাব কিভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, ওয়ার্কিং কমিটি তার একটা ফর্মুলা এবার ঠিক করবেন। এই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে যে, গান্ধীজী তাঁর মূল প্রস্তাব যেভাবে পরে তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিতে সংশোধন করেছেন, তাতে হয়তো ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ তাঁর আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হবে না; বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভিত্তিতে সম্ভবত আন্দোলন চালানো হবে; তবে সর্বক্ষেত্রে আসল পটভূমিকা থাকবে ব্রিটেন কর্তৃক বার বার উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত "জাতীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তি।"

ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীরাজাগোপালাচারী ও তাঁর সমর্থকদের প্রচারকার্য সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, তামিলনাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন, তখন ওয়ার্কিং কমিটি আর তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিবিধান জারী করবেন না। কংগ্রেসের কমিউনিস্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তি-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটি বিবেচনা করছেন।

শ্রীভুলাভাই দেশাই অস্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

সরকারী বিবৃতির উত্তর

বাঙলা দেশে সম্প্রতি মুক্ত কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের প্রতি সতর্কবাণী হিসেবে গভর্নমেণ্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে গভর্নমেণ্ট বলেন যে, কমিউনিস্ট বন্দীরা বিনাসর্তে সমর-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে জেনেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাঁরা যদি বেরিয়ে এসে সমর-প্রচেষ্টা কোনো রকমে ব্যাহত করেন, তাহলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এর জবাবে মুক্ত কমিউনিস্টরা এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, মুক্তিলাভের জন্যে তাঁরা গভর্নমেণ্টকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি এবং কোনো কড়ারে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। ফ্যাসিজম্‌ প্রতিরোধের সংগ্রামে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এবং তাঁদের মতে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনই সে সাহায্যদানের উকৃষ্ট উপায়; তবে যতদিন জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন বর্তমান গভর্নমেণ্টের ফ্যাসিস্টবিরোধী ব্যবস্থাতেও সাহায্য করতে তাঁরা প্রস্তুত; কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁদের যে কোনো কাজকে সমর-প্রচেষ্টা বলে জাহির করলেই কমিউনিস্টরা তা সমর্থন করতে রাজি নন; কোন্‌টা ফ্যাসিস্টবিরোধী সমর-প্রচেষ্টা তা কমিউনিস্টরা নিজেরাই বিচার করতে সমর্থ।

কোয়ালিশন পার্টির কার্যক্রম

বাঙলায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির অর্গানাইজিং কমিটি পার্টির প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন। পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে, বাঙলার জনসাধারণের জীবিকার ব্যবস্থা করা, অনশন ও বেকার অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল সুখী বাঙলার উদ্ভব হবে। আশু কার্যক্রম হিসেবে পার্টি নিম্নলিখিত বিষয়ে মনোযোগ দেবে; (১) সাম্প্রদায়িক সুসম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা; (২) পার্টির প্রস্তাব অনুযায়ী গৃহরক্ষী দল গঠন; (৩) অধিবাসী অপসারণ ও শত্রুকে কিছু না দেওয়ার নীতি অনুসরণের জন্যে লোকের যে কষ্ট হবে, অবিলম্বে তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সাহায্যের ব্যবস্থা অবলম্বন; (৪) খাদ্যশস্য উৎপাদন, সঞ্চয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা।

বড়লাটের শাসন-পরিষদ

বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এখন বারজনের জায়গায় পনেরজন সদস্য হলেন। এর মধ্যে এগারজন বেসরকারী ভারতীয়, একজন বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ, আর তিনজন সরকারী শ্বেতাঙ্গ। নিম্নলিখিত ছয়জন নূতন সদস্য মনোনীত হয়েছেন; স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, ডাঃ আম্বেদকর, স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল, স্যার যোগেন্দ্র সিং, স্যার জে পি শ্রীবাস্তব ও স্যার মহম্মদ ওসমান। তিনজন বেশী সদস্য নেওয়ার কারণ হচ্ছে দেশরক্ষার এক দপ্তর (দেশরক্ষার সমন্বয় সাধনের কাজ) সৃষ্টি, ব্রিটেনে সমর-মন্ত্রিমণ্ডলীতে ও প্রশান্ত সমর-পরিষদে একজন সদস্য প্রেরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দপ্তরকে দুইভাগে বিভক্ত করে সমরকালীন যানবাহন ব্যবস্থার দপ্তর এবং পোস্ট ও বিমান দপ্তর সৃষ্টি। কমাণ্ডার-ইন-চীফের দপ্তর এখন থেকে সমর-দপ্তর বলে অভিহিত হবে। শাসন-পরিষদের এই সম্প্রসারণের জন্যে আগেকার সদস্যদের কার্যভারের অদলবদল হয়েছে।

৭-৭-৪২ ওয়াকিবহাল।



নিউ থিয়েটার্স—

নীতিন বসু সম্প্রতি গিরিডি থেকে ফিরে এসে 'কাশীনাথ' ছবির কাজ সুরু ক'রে দিয়েছেন। 'কাশীনাথে'র চিত্রনাট্য দীর্ঘ হ'য়ে পড়ায় তাকে কেটে ছে'টে অনেক সংক্ষেপ করা হয়েছে।

সুনন্দা দেবী নিউ থিয়েটার্সে'র নূতন আবিষ্কার, "কাশীনাথ" ছবিতে প্রথম অভিনয় করবেন। কাশীনাথের প্রধান দুটি নারী চরিত্রের একটিতে অভিনয় করবেন শ্রীমতী ভারতী দেবী, অপর ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুনন্দা। নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন অসিতবরণ।

*   *   *   *

পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'দিকশূল' ছবির কাজ শীঘ্রই সুরু করবেন বলে জানা গেছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন ছবি বিশ্বাস ও অঞ্জলি রায়।

নিউ টকীজ লিঃ

নিউ টকীজের 'প্রায়শ্চিত্ত' ছবিতে প্রথমে অহীন্দ্রবাবুর প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করার কথা হয়েছিল। জানা গেল, তাঁকে বাদ দিয়ে নূতনভাবে অভিনেতা নির্বাচন হয়েছে। তালিকা দেওয়া হোলোঃ—রায় বাহাদুর—ছবি বিশ্বাস; সুমিত্রা—পদ্মা দেবী; ডাঃ শিশির—ধীরাজ ভট্টাচার্য; মিনু—মণিকা গাঙ্গুলী; হরিহর কম্পাউণ্ডার—ডি জি; হীরালাল—অর্ধেন্দু মুখার্জি; শিক্ষয়িত্রী—কমলা অধিকারী; ঝি—তারা ভাদুড়ী; ইলা— শীলা রায়; লীলা—পূর্ণিমা; বেণীমাধব—ফণী রায় এবং ডাঃ ঘোষ—হেম গুপ্ত।

শ্রীভারতলক্ষ্মী

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে'র 'জীবন-সঙ্গিনী' ছবিটি উত্তরা চিত্রগৃহে শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে।

স্নেহপ্রভা প্রধান

বোম্বাইয়ের নৃত্যগীতকুশলী অভিনেত্রী স্নেহপ্রভা সম্প্রতি নিজেই চিত্রনাট্য রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। নবযুগ ফিল্ম কোম্পানী তাঁর একটি গল্প অবলম্বন ক'রে ছবি তুলবে এবং সে ছবির নায়িকার ভূমিকায় স্নেহপ্রভা নিজেই অভিনয় করবেন।

দেবকী বসু

সিনেমা জগতে গুজব যে, পরিচালক দেবকী বসু সার্কো প্রডাকসন্স ছেড়ে পুনরায় নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করবেন। এ বিষয়ে নিউ থিয়েটার্সে'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে।

ফজ্‌লি ব্রাদার্স

ফজ্‌লি ব্রাদার্সে'র নূতন ছবি 'চৌরঙ্গী' গত সপ্তাহ থেকে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে। কলকাতার চৌরঙ্গীর এক ভিখারী মেয়েকে নিয়ে এই ছবির কাহিনী রচিত। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন মেহ্‌তাব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন আনিস আমজাদ এবং নাজির কাশ্মিরী প্রভৃতি।

ফজ্‌লি ব্রাদার্স এদের পরবর্তী ছবি তুলবেন বোম্বের কোন একটি স্টুডিওতে। কাজী নজরুল ইসলাম এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন বলে জানা গেল।



চিত্রা প্রডাকসনের 'কিসি-সে-না-কহনা' ছবিতে লীলা চিটনীশ ও পাহাড়ী সান্যাল



কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল। মোহনবাগান দল এই প্রতিযোগিতা হইতে বাদ পড়িয়াছে। এই দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সকল আশার অবসান হইয়াছে। একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং দলের ইস্টবেঙ্গলের সহিত শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলিবে বলিয়া মনে হয়। তবে এই প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সাফল্য লাভ করিতে পারে যদি ইস্টবেঙ্গল দল অবশিষ্ট তিনটি খেলার মধ্যে দুইটি খেলায় পরাজিত হয়। এইরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় ইস্টবেঙ্গল দলের হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই দলের খেলায় এইরূপ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিত করিয়া বলা চলে। এই দলকে বর্তমানে মোহনবাগান, কালীঘাট ও এরিয়ান্স এই তিনটি দলের সহিত খেলিতে হইবে এবং এই তিনটি খেলার দুইটি খেলায় জয়ী হইতে পারিলেই মহমেডান দলের পক্ষে ইহার নাগাল ধরা অসম্ভব। মহমেডান স্পোর্টিং রানার্সআপ হইবে। মোহনবাগান ক্লাব তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে। চতুর্থ স্থানে ভবানীপুর দল বর্তমানে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিবে কিনা ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। বি এণ্ড এ আর দলের পক্ষে এই স্থান লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এরিয়ান্স, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি অবশিষ্ট ভারতীয় দলসমূহ পরবর্তী স্থানসমূহ দখল করিবে। ইউরোপীয় দলসমূহ তালিকার সর্বনিম্ন স্থানসমূহ দখল করিয়াই থাকিবে। এই সকল দলের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় যে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোনই কারণ নাই। লীগ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের "উঠানামা" এইবার বন্ধ আছে। অতএব ইউরোপীয় দলের পরবর্তী ডিভিসনে নামিয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। নিম্নে প্রথম ডিভিসন লীগ প্রতিযোগিতার তালিকার প্রথম চারিটি দলের নাম প্রদত্ত হইল :—

লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	২১	১৭	৩	১	৫৬	৭	৩৭
মহমেডান	২০	১৩	৬	১	৫৮	১০	৩২
মোহনবাগান	২০	১৩	৪	৩	৪৫	১৬	৩০
ভবানীপুর	২০	৯	৭	৪	২৫	১১	২৫

লীগের খেলায় গোলদাতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

এই বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব হইতেছে যে, বিভিন্ন দলের গোলদাতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। সর্বাধিক গোলদাতা কে হইবে এখনও বলা খুবই কঠিন। ইস্টবেঙ্গল দলের সোমানা ও বি এণ্ড এ আর দলের বিমল করের গোলসংখ্যা সমান সমান হইয়াছে। ইহাদের পরেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুনীল ঘোষ ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের সাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে লীগ প্রতিযোগিতার খেলায় কোন বৎসর এইরূপ গোলদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক গোলদাতার সম্মান লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যায় নাই। নিম্নে সর্বাধিক গোলদাতা চারিজনের নাম প্রদত্ত হইল :—

সোমানা	(ইস্টবেঙ্গল ক্লাব)	... ...	২১টি
বিমল কর	(বি এণ্ড এ আর)	... ...	২১টি
সুনীল ঘোষ	(ইস্টবেঙ্গল ক্লাব)	... ...	১৬টি
সাবু	(মহমেডান স্পোর্টিং)	... ...	১৬টি

খেলা পরিচালনা সমস্যা

প্রতি বৎসর লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলার পরিচালনায় রেফারীগণের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নানারূপ গণ্ডগোল সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনেক সময় রেফারিগণের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া দর্শকগণ খেলা পণ্ড করিয়াছেন এবং রেফারীকে প্রহার করিয়াছেন এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিয়াছে। গত বৎসর পর্যন্ত এইরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয়, এই বৎসর এইরূপ ঘটনা বিশেষ ঘটে নাই। যে কয়েকটি ঘটনা হইয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিছুই নহে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইহার কারণ বোধ হয় নূতন রেফারিগণের উপর খেলা পরিচালনার ভার অর্পণ করা। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য ইতিপূর্বে বহুবারই আমরা অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না রেফারী এসোসিয়েশন সেদিকে দৃষ্টি দেন নাই। যাহা হউক, এই বৎসরে হঠাৎ এইদিকে দৃষ্টি দিয়া যখন ফল ভাল হইল তখন আমরা আশা করি প্রতি বৎসর এইরূপ ব্যবস্থা করিতে রেফারী এসোসিয়েশন কোনরূপ দ্বিধা করিবেন না। তবে একটি বিষয় এখনও উল্লেখ না করিয়া আমরা পারি না। রেফারী নির্বাচনে অতিরিক্ত সাহেব-প্রীতি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের মধ্যে বর্তমান আছে। ইহা পরিত্যাগ করিলে আমরা প্রকৃতই সুখী হইব।

৬-৭-৪২

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে, ইহারা প্রকৃতই ব্যাডমিণ্টন খেলার উন্নতির জন্য উদগ্রীব। বাঙ্গলার খেলোয়াড়গণের সম্মান যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেইদিকেও দৃষ্টি আছে। সম্প্রতি এই এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের এক সভা হইতে জানা গেল যে, তাহারা আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করিয়াছেন। নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা যাহাতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতা

পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে, কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় যে সকল খেলোয়াড় যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যেই কেহই ভারতের নামজাদা খেলোয়াড় না হওয়ায় কোন ক্রীড়ামোদীই এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু আমেরিকার এই বিষয় বিশেষত্ব আছে। বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়গণকেই পেশাদারের দলভুক্ত করা হয়। সুতরাং এই সকল খেলোয়াড়দের খেলা দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ দর্শক এই সকল খেলা দেখিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকেন। বিশ বৎসরের অধিককাল হইতে পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত বৎসর এই প্রতিযোগিতায় ডোনাল্ড বাজ সিংগলস ও ডাবলসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। এই বৎসরও পুনরায় তিনি সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন ডোনাল্ড বাজের পক্ষে সম্মান রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। কারণ তিনি আমেরিকার সৈনিক দলে যোগদান করিয়া অনুশীলন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইতে দেখা গেল ডোনাল্ড বাজ গত বৎসরের মতন উচ্চাংগের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। তরুণ খেলোয়াড় রিগস্ ডোনাল্ড বাজের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিবেন ইহাই সকলে আশা করিয়াছিলেন। সিংগলস ফাইনালে ডোনাল্ড বাজ ও রিগস্ উন্নীত হইলে দর্শকগণ আশা করিলেন তীব্র প্রতিযোগিতামূলক খেলা দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহারা লাভ করিবেন। কিন্তু খেলা অনুষ্ঠিত হইলে সকলেই হতাশ হইলেন। রিগস্ ডোনাল্ড বাজের তীব্র মারের বিরুদ্ধে একেবারেই লড়িতে পারিলেন না। ডোনাল্ড বাজ স্ট্রেট সেটে রিগস্‌কে পরাজিত করিলেন। তবে ডাবলস খেলাটিতে জোর প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হইল। কোভাকর্স ও বার্ণিশ, ডোনাল্ড বাজ ও রিগস্‌কে রীতিমত বেগ দিয়া পরাজয় বরণ করিলেন। প্রথম সেটে কোভাক্‌সের খেলা এত ভাল হইল যে, ডোনাল্ড বাজ ও রিগসের পক্ষে মাত্র দুইটি গেম দখল করা সম্ভব হইল। কিন্তু ইহার পর ডোনাল্ড বাজ দৃঢ়তার সহিত খেলায় কোভাকর্স দল পরাজিত হইলেন। ডোনাল্ড বাজ সিংগলস ও ডাবলসে বিজয়ীর সম্মানলাভ করিলেন। এই প্রসংগে একটি কথা মনে পড়িতেছে, ১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিলে কয়েকজন টেনিস বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন, ডোনাল্ড বাজের সমকক্ষ খেলোয়াড় সহজে পাওয়া যাইবে না। ইহার ক্রীড়ানৈপুণ্য ১০ বৎসর পর্যন্ত সমানভাবে বর্তমান থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি যে সত্য তাহার প্রমাণ এই বৎসরে পাওয়া গেল। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

সিংগলস ফাইনাল

ডোনাল্ড বাজ ৬-২, ৬-২ গেমে ববী রিগস্‌কে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল

ডোনাল্ড বাজ ও ববী রিগস্ ২-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে কোভাকর্স ও বার্ণিশকে পরাজিত করেন।

আই এফ এ শীল্ড

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড আগামী ২০শে জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর বাহির হইতে যেরূপ বহু দল যোগদান করিয়া থাকেন, এই বৎসর সেইরূপ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের জন্য সৈনিক দলসমূহকে যে যোগদান করিতে দেখা যাইবে না সেই বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে এই প্রতিযোগিতাটি আকর্ষণীয় করিবার জন্য আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী এক ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটিকে এক একটি দল প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। এই সকল প্রাদেশিক দলসমূহ কলিকাতায় আগমন করিলে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানেও সুবিধা হইবে, সংগে সংগে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিবে। প্রাদেশিক ফুটবল দলসমূহের গঠনকার্য সহজ হইয়া যাইবে। স্থানীয় দল সমূহকে লইয়া যদি এই প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়, তবে খুবই দুঃখের বিষয় হইবে। ক্রীড়ামোদিগণও প্রতিযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা

পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায়, এই বৎসরের অনুষ্ঠানে যদি বাহিরের কোন দল যোগদান করে তবে তাঁহারা আর্থিক সাহায্য করিতে পারিবেন না। বাহিরের সকল দলকেই নিজ নিজ ব্যয় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হইবে। এই বিজ্ঞপ্তি বোম্বাইর ক্রীড়ামোদীদের সম্মান হানি করিয়াছে। ঐ স্থানের ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে যাঁহারা বিত্তশালী, তাঁহারা নিজ প্রদেশের সম্মান রক্ষার জন্য যে অগ্রসর হইলেন না ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে। যে স্থানে ব্যবসার জন্য লক্ষ টাকার ছিনিমিনি খেলা হয়, সেখানে কয়েক সহস্র টাকার অভাব হইল ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

নানা আলাপ আলোচনার পর নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় ১২টি দল যোগদান করিয়াছে। নিম্নে ঐ প্রতিযোগিতার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

(১) মহীশূর ঃ হায়দরাবাদ (১৬ই আগস্ট বাংগালোরে অনুষ্ঠিত হইবে)।

(২) মাদ্রাজ ঃ বোম্বাই (২২শে আগস্ট, বাংগালোর)।

(৩) বিজয়ী (১) ঃ বিজয়ী (২) (২৩শে আগস্ট, বাংগালোর)

(৪) ঢাকা ঃ বিহার (২রা সেপ্টেম্বর, পাটনা)।

(৫) বিজয়ী (৩) ঃ বিজয়ী (৪) (৪ঠা সেপ্টেম্বর, পাটনা)।

(৬) আই এফ এ ঃ রাজপুতনা (২রা সেপ্টেম্বর, লক্ষ্ণৌ)।

(৭) দিল্লী ঃ ইউ পি (৩০শে আগস্ট, লক্ষ্ণৌ)।

(৮) উত্তর সীমান্ত ঃ উত্তর-পশ্চিম ভারত দল (২৯শে আগস্ট, লাহোর)।

(৯) বিজয়ী (৭) ঃ বিজয়ী (৮) (১লা সেপ্টেম্বর, লক্ষ্ণৌ)।

(১০) বিজয়ী (৬) ঃ বিজয়ী (৯) (৪ঠা সেপ্টেম্বর, লক্ষ্ণৌ)

ফাইনালঃ—বিজয়ী (৫) ঃ বিজয়ী (১০) (৬ই সেপ্টেম্বর, লক্ষ্ণৌ)।